P. 27 2823

UNIVERSITY OF CALCUTTA
LIBRARY
THE ADVANCEMENT OF LEARNING

উপাসনা

১৪শ বর্ষ। } বৈশাখ—১৩২৫ { প্রথম সংখ্যা।

756 3
028

নববর্ষের সম্ভাষণ

বর্ষ শেষ হইয়া নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ হইল, কিন্তু কোথায় নূতন আশার সঞ্চার? কোথায় নূতন জীবনের সজল-জলদ-রেখা? কিছু নাই, কোথাও নবরাগ রেখের আভাষ মাত্র নাই—শুধু কুসংস্কার দীর্ঘ জীবনপথে রাশি রাশি শুষ্ক ধূলি উড়িতেছে। আশা নাই, কারণ সকল আশাই এখন কুসংস্কার। আদর্শ নাই—কারণ সকল আদর্শই এখন বাস্তবের আর বিজ্ঞানের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে উপহাস-যোগ্য কল্পনামাত্র। স্নেহ নাই, প্রেম নাই—সৌন্দর্য্য নাই—আছে কেবল অস্থির সুখের প্রতি হিংস্রতা, আছে কেবল মানুষে মানুষে সন্দেহ মানুষে মানুষে অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস, মানুষে মানুষে গলা কাটাকাটি। দর্শন নাই, সাহিত্য নাই, কবিতা নাই—এই সমস্তই মানুষের চৈতন্য বস্তু মিথ্যা বলিয়া ধারা-ধারা বন্যার পূর্বের ন্যায় একেবারে মারিক বস্তু। আছে কেবল ইন্দ্রিয় অতিসূক্ষ্ম-বিজ্ঞান এবং তাহার অতিস্পষ্ট অতিপ্রত্যক্ষ এবং অতি অপ্রিয় সত্য কথা, "যুদ্ধস্য যুদ্ধ কর—ভাইয়ের গলায় ছুরি বসাও, মাতা ভগিনীর ইজ্জত কাড়িয়া তাহাদিগকে পদদলিত কর, কারণ সুখই একমাত্র সত্য। যে জাতি যত বলিষ্ঠ, সে জাতি নিজের স্বার্থ বিষয়ে তত সজাগ। এবং সেই জন্য যে দেশ, পশু, মায়া প্রভৃতি সমস্ত মানবিকতা ভূতকে সমষ্টির পদে বলি দিয়া যত নিষ্ঠুর যত নির্দ্দয় হইতে পারিবে, তবেই সে উপযুক্ত হইবে, তবেই সে জিতিবে।"

এই জাতীয় নিষ্ঠুরতার আদর্শের দিনে, এই স্নেহ-প্রেমহীন অন্ধ আদর্শের নিষ্ঠুরতার মধ্যে দাঁড়াইয়া আজ দুর্ব্বল বাঙ্গালী কোন দিকেই কোন আশা দেখিতে পাইতেছে না। যখন চতুর্দ্দিকে কাড়িয়া খাও মারিয়া খাও এই ধ্বনি উঠিতেছে, তখন দুর্ব্বল অসহায়ী, অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গালীর জীবন যাত্রাই যে তাহার পক্ষে লজ্জার বস্তু হইয়াছে। আমাদের মত হীনপ্রাণ হিন্দুর অস্তিত্বই যে আমাদের পরম লজ্জা। যখন বীর্য্যের সাধনা একটা মহান মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উপহসিত—যখন বৃদ্ধের জ্ঞানগর্ভ মূর্খতার নামান্তর বলিয়া প্রমাণিত, তখন আর আমাদের আশা কোথায়? নিরাশা, নির্দ্দয়তা, আত্মহীনতার মধ্যে বৎসর শেষ হইয়া গেল। এবং এই যে বৎসর আরম্ভ হইল, ইহা যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, নীতি-মন্ত্র দেহের—মৃতদেহের শিয়রে অভিশপ্ত

হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সমরপ্রনার তাহার সাহস নাই, সম্মুখে নিরাশার মরুভূমি, পশ্চাতে এক বিশাল ভগ্নস্তূপ। যেন সে সাধ্যাপথ সম্পর্কে লুপ্তিয়া হঠাৎ এক আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'হায়—কি হইল—সব শেষ! এত আয়োজন, এত চেষ্টা, এত প্রাণপণ কাড়াকাটী সমস্তই এই পরিণাম!'

তবে এই জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাধনা, জাতীয় সভ্যতা এই সব বিধির বিসাড়ম্বর কেন? শিক্ষাই যখন মনুষ্যত্বের কোন উচ্চতর আদর্শের জন্য নয়, শুধু National efficiencyর জন্য তখন কিসের এত চেষ্টা?

তাই আমরাও ভাবিতেছি, কি হইবে ঐ আপাতীন বস্তুকে নবলব্ধ সভ্যতার আদর্শ এবং শিক্ষা লইয়া? যাহার সর্বশেষ আবিষ্কৃত সত্য এই যে, 'মানুষকে কেবল মারামারি কাটাকাটিই করিতে হইবে, আর কিছু নয়,' সে সভ্যতা, সে শিক্ষা লইয়া ত' কেবল আমাদের দুঃখই বাড়িবে। যুদ্ধের শক্তি আমাদের নাই, আছে কেবল এই মহামানবমেধযজ্ঞের যজ্ঞভূমি হইতে দূরে দাঁড়াইয়া সভয়ে সকাতরভাবে চাহিয়া থাকা; আর মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলা—"হে প্রভু, এই পুণ্যলোভহীন নিষ্ঠুর বেদিগুলির যেন ঐ যজ্ঞভূমিতে স্থান না পড়ে।"

কোন্ আদর্শের সঙ্গে কোন্ আদর্শের যুদ্ধ বাধিয়াছে! কোথায় গেল পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা'? তাহারা বলিয়াছে—বাজি বলিয়াছে, জাগিয়াছে কেবল দলবদ্ধ হিংস্রতা, সঙ্ঘপ্রেমের ক্রূরতা।

এতকাল জাতীয়তা বলিতে আমরা কি বুঝিতাম? বুঝিতাম জাতীয়তা একটা এমন বস্তু, যাহার মধ্যে ব্যক্তি আপনাকে হারাইয়াও হারাইত না। সে আপনাকে জাতির সুখ, দুঃখ ও আদর্শের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া এমন এক অপূর্ব রূপ ধারণ করিয়া নূতনতর আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ লইয়া বাহিরে আসিত, যাহা দেখিলে মানুষের মাথা অভিমানে, প্রেমে ও আনন্দে আপনি নত হইয়া আসিত। জাতীয়তার মধ্যে ব্যক্তি মূর্ছিত হইয়া যাইত না, পরন্তু নববলে নবশক্তিপূর্ণ উচ্চতর ব্যক্তি হইয়া উঠিত। কিন্তু এখনকার আদর্শ হইয়াছে, ব্যক্তিকে Stateএর মধ্যে ডুবাইয়া একেবারে মারিয়া ফেল। এই বিংশ শতাব্দীতে উনবিংশ শতাব্দীর সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি সমস্ত আদর্শই অলীক স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। Stateএর নিকট হইতে উহাদের অস্তিত্বই নাই। State-সমস্ত বৈশম্যকে একটা প্রাণহীন ঐক্যে পরিণত করিয়া যে বিশাল নিষ্ঠুর efficiency লাভ করিবে, তাহাই এখনকার ব্যক্তির একমাত্র আদর্শ অস্তিত্ব।

উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ সাম্যমৈত্রীর মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতার অস্তিত্ব পূর্ণভাবে বর্তমান থাকায় বস্তু বিজ্ঞানে, কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে মহাপুরুষগণের দর্শনলাভ এত কাল সম্ভব হইয়াছিল। যে মহামানবের আবির্ভাবের জন্য এই সৃষ্টি-স্থিতি-সর্বস্ব, নীতির আশা, ধর্মের ত' মনে হয়, সেই আশাই সুদূরপরাহত হইয়া গিয়াছে। নিউটন প্যাসকাল, কাণ্ট-হেগেল, স্পেন্সার সেক্সপীয়র, লামার্ক ডারুইন, ইহাদের আবির্ভাবের আর স্থান কোথায়? ইহারা যে দেশেই বা পক্ষের এক জন করে ইহারা যে বিশ্বকেবারে সকলকে ছাড়াইয়া নিজস্বটিকে সাধনাকে ছাড়িয়া বিশ্বের মহান্ প্রতিমূর্তি! ইহারাই State নামক ঐক্যের মধ্যে, Nation নামক সঙ্ঘের মধ্যে আপনাদের ডুবাইয়া মারিয়া রাখিয়া যান নাই। ইহারা মানবের বিশাল সত্তার মধ্যে আপনাদের ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্রতাকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের দেখার আর সার্থক কি? কোন State Subsidized শিক্ষা, কোন National economy কোন Trade Syndicate এই সব মহাপুরুষের জন্ম দিবে? কোন Mass consciousness এই একবারে সম্পূর্ণভিন্নরূপ একক মহাপুরুষের আবির্ভাবের কারণ হইবে? কোন State ratio যীশুর মাইকেল এঞ্জেলোর, বোদ্ধ-বিটোফেনের রাফেলের নাইটিংগেলের জননী হইবে? কোনো প্রকৃত Modern state ই তাহা হইতে না, কারণ যেহেই ঐ পুরাতন রূপ-রসের আদর্শকে আদর্শ বলিয়া মানিতে পারিবে না। ঐ প্রাচীন সৌন্দর্য আর সাহিত্যের প্রতি যে ভক্তি, তাহাই যে এখনকার জীবনবিজ্ঞানের মূলে একটা

কুসংস্কার Superstition কুসংস্কার। প্রাচীনের প্রতি ভক্তিই যে চিন্তা ও কার্য্যের সুধা যায়। এখন একথার কথা বাঁচো, কিন্তু Plainly বাঁচিও না, সমস্ত সকলের মাথার উপর সমূহ লাঘাত করিয়া এবং দুর্ব্বলের এবং অনুন্নতদের বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া বাঁচো। যেমন তেমন করিয়া বাঁচিলে চলিবে কেন? বীরের মত বাঁচো:—বীর মানে Nietzche এর বীরের মত বাঁচিবার চেষ্টা কর, বীর খৃষ্টের মত ভিক্ষুক বীরের মত নয়, পোষাক পরিচ্ছদ, সুখাদ্য সুভোগ্য বস্তুসমন্বিত গর্ব্বিত ভীমের মত বাঁচো। বীরত্ব যে ত্যাগকে এতকাল পূজা করিয়া আসিয়াছে, উহা Superstition. উহা ত্যাগ করিয়া তোমার জাতিকে ভোগে নিরন্তর অর্থে-সামর্থ্যে জগতের পক্ষে বহুখানি আগুয়ান করিয়া তুলিতে পার, ততই তোমার বীরত্ব, ততই তোমার Fitness।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের শক্তি যাহাকে যে মুক্তি দান করিয়াছিল, সেই মুক্ত ব্যক্তিও আজ সেই বিজ্ঞানের মোহেই আবার নিজ আত্মগত স্বাধীনতাকে নিজের পরাধীনতায় শেষ করিল কেন? ফরাসিবিপ্লব যে মুক্তিদান করিল, নেপোলিয়ন যুদ্ধ সেই মুক্তিকে নিজের স্বার্থপরতার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিল কেন? ইহার কারণ কি বিজ্ঞানকে দর্শনের ও সৌন্দর্য্যবোধের সাহচর্য্য হারাণোর মধ্যে নিহিত নয়? মানুষের মনের মধ্যে যে রসবোধ যে লোকোত্তরানন্দ ছিল, তাহাকে কুসংস্কার বোধে বর্জ্জন করার জন্যই কি আজ এই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে হইতেছে না? যাহা কিছু মানুষকে এতকাল আনন্দিত করিয়াছে, সেগুলি রাষ্ট্রবুদ্ধি ও রাষ্ট্রশক্তির বিরোধী ও দুর্ব্বলতার কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়াই কি এই পরিণামের কারণ নয়। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত বিবেক যেমন সাংসারিক উন্নতির বিরোধী, তেমনি রাষ্ট্রগত ধর্ম্ম, রাষ্ট্রগত বিবেক (conscience) ও তেমনি ব্যক্তিস্বার্থের বিরোধী ইহাই কি এখনকার ধারণা নয়? বিজ্ঞান বলিয়াছে, অস্তিত্বের যুদ্ধে এবং পশুজীবনের উন্মেষের মধ্যে conscience বা বিবেক বুদ্ধির স্থান নাই—সুতরাং রাষ্ট্রজীবন হইতে উহা বাদ দিতে হইবে, এই ধারণায় বর্ত্তমান জগৎ উদ্‌ভ্রান্ত তাই উন্মার্গগামী।

বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই ভাবের জিনিষই দেখিয়া আসিতেছি। তাই রক্তাক্ত, মুমূর্ষুত্ব, ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বর্ত্তমান ইউরোপ যে নীতি এতকাল অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল সেই নীতিরই আজ এই আত্মঘাত। যে নীতি ফরাসিবিপ্লব আপন হৃদয়রক্তে জগতের সম্মুখে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল, বর্ত্তমান ইউরোপ যদি তাহাকেই অন্তরে বাহিরে অনুসরণ করিত, তাহা হইলে আজ এই ভীষণ আত্মঘাতের দৃশ্য দেখিতে হইত কি না সন্দেহ। সকল মানুষেরই বাঁচিবার দাবী আছে—এই সত্য যদি সত্য বলিয়া গত শতাব্দীর ইউরোপ মানিত, তাহা হইলে কি আজ এই আত্মঘাত ঘটিত?

সমস্ত প্রেমধর্ম্মহীন এই যে রাষ্ট্রধর্ম্ম ইহার সমাপ্তি এইরূপেই হইবার কথা। এই ভীষণ আত্মঘাতের মধ্যে "নিখিলের বিরাট বিধাতার" নিষ্ঠুর তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়া রাষ্ট্রবীর, শক্তিহীন, এমন কি অস্তিত্বহীন আমরা সভয়ে ইহাকে অকাল ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিতেছি না।

এই শতাব্দী যে ভাবকে মস্তকে লইয়া আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেখা দিয়াছে, সেই ভাব, সেই পরম-নিষ্ঠুর বৈজ্ঞানিক সত্যকে মস্তকে লইয়া এই বৎসরও আরম্ভ হইল। আজ আমরা পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি দিয়া কোন সাহসে বলিব, "ওরে আশা আছে—ওরে ভয় নাই। নিষ্ঠুর বৈজ্ঞানিক সত্যই একমাত্র সত্য নয়। মানব-চরিত্রের মধ্যে আর যে চিরন্তন পশুত্বই একমাত্র সত্য নয়। eternal beastএর অন্তরের মধ্যে eternal god আছে—আছে—আছে। সে কেবলই যে পরের গলায় ছুরী বসায়, তা নয়, সে আপন বুকের রক্ত দিয়া পরকে বাঁচাইতেও পারে, বাঁচাইয়াও থাকে।"

এই ভারতবর্ষ একদিন সংসারকে দুঃখময় জ্ঞান করিয়া সেই দুঃখ কমাইবার কতই না চেষ্টা করিয়াছিল। কখনো বা বুদ্ধের ত্যাগের দ্বারা, কখনো বা মহাবীরের বৈরাগ্যের দ্বারা, কখনো গোপীদের মাধুর্য্যের দ্বারা এই ভীষণ সত্যকে আড়ালে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল, সে বিচার আজ কে করিবে? কে আজ সজ্ঞানে সদর্পে এই জগদ্ব্যাপী মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিবে, "মৃত্যু

তুমি নাই।" যে বিজ্ঞান একদিন তাহার অস্ত্রত্যাগী বীরগণের দ্বারা মৃত্যুর উপর সত্যের জয় ঘোষণা করিয়াছিল, সত্যের জন্য নির্য্যাতন কাহাকেও এমন কি মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিল, সেই বিজ্ঞানই আজ জগতের মৃত্যুধর্ম্মই প্রচার করিতেছে। সেই বলিতেছে, প্রেম মিথ্যা, স্নেহ মিথ্যা, সহানুভূতি মিথ্যা, সত্য কেবল পরের সঙ্গে যুদ্ধ এবং আপন স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা। সে বলিতেছে, পর হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য পরকে হত্যা কর, ধ্বংস কর, পদদলিত কর, নহিলে সেই পরই তোমার ধ্বংস করিবে, দলিত করিবে। এই রুক্ষ সতর্কতা ও জিঘাংসাই জগতে একমাত্র সত্য—আর সবই মায়া—সবই মিথ্যা।

এই যে অপূর্ব্ব মায়াবাদ জগতে দেখা দিয়াছে, ইহার দাবী বিশ্বাসী—। মানবের সমস্ত সৃষ্টিই ইহার মতে মায়িক, কাল্পনিক, অলীক সৃষ্টি। ভারতের মায়াবাদীরা জগৎ মিথ্যা বলিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্রহ্ম সত্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু এই আধুনিক মায়াবাদীদের মতে ব্রহ্মই মিথ্যা, কিন্তু জগৎ সত্য! যে জগৎ ক্ষণে ক্ষণে অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার আবরণে মৃত্যুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন, তাহাই প্রচণ্ডভাবে সত্য, আর যাহা পরিবর্ত্তন সমস্ত উৎক্ষেপনের মধ্যেও স্থিতিশীল সেই পরম সত্তাই মিথ্যা! এই স্থিতিকে অস্বীকার করিয়া একমাত্র গতিকে স্বীকার করার দুর্নীতির পরিণাম এই প্রচণ্ড, ভয়াবহ, মরণধর্ম্মই বটে।

যাক, বৃথা এই অরণ্যে রোদন। বৃথা স্থিতিধর্ম্মী ভারতের দীর্ঘ শ্বাস! আমরা কোথায়, আর ইহারা কোথায়? আপনাদের প্রয়োজনকে স্বার্থকে যাহারা পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিয়াছে, যাহারা সংসারের ঐহিক সুখকে বিরাট সুখায় পরিণত করিয়াছে, যাহারা বাস্তবিক যাহা মায়িক, কাল্পনিক তাহাকেই চিরসত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য এই আঘাতেরই প্রয়োজন। তাহাদের সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বাণিজ্যনীতি, যুদ্ধনীতি, সমস্ত নীতিই হিংসানীতির বিভিন্ন মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। যাহারা সর্ব্বজীবেরই যে জীবনের উপর দাবী আছে, এ-কথা স্বীকার করে না, তাহাদের কাছে তাহারাই জীবনযোগ্য, যাহারা পরের জীবনকে আপন স্বার্থে নিয়োজিত করিতে পারে, যাহারা সমরোপযুক্ততা ছাড়া অন্যোপযুক্ততা স্বীকার করে না—তাহারা সেই অঘটনঘটনপটীয়সী সংসার-মায়ার কবলে যাইবার পতিত হইয়া মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিবেই। ইহাদের ইতিহাস প্রমাণ করিবেই যে, সেই জাতিই জগতে বাঁচিয়া আছে, যে যত পরজীবনাসহিষ্ণু! তাহারা বলিবেই, যে জাতি ক্রীতদাস নয়, মৃত্যুভীরু, যুদ্ধকীর্ত্তিহীন, সে জাতি জগৎ হইতে মুছিয়া যাইবেই, কারণ তাহারা অতিমাত্রজীবনধর্ম্ম-বিরোধী অর্থাৎ ইন্দ্রজালিক জীবনধর্ম্মবিরোধী।

তাই আজ ভয়ে ভয়ে উপাসনা তাহার বৎসরারম্ভে তাহার পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইল। আশার কথা বলিবার তাহার সাহস নাই—তবু সে আশা করিতে বিরত নয়, কারণ আমরা আশাজীবী বাঙ্গালী। চারিদিকে মেঘধর্ম্ম, মরণধর্ম্ম, সৌন্দর্য্যধর্ম্ম, রসধর্ম্ম, বিপর্য্যস্ত, ধূলিলুণ্ঠিত, অবমানিত,—তথাপি এই লোকক্ষয়কৃৎ এই মহাকালমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সকল চক্ষে "উপাসনা" বলিতেছে,—

"লিখাসি লোকস্য চরাচরস্য"

তুমিই জগতের পিতা। তোমার পিতৃধর্ম্মও মিথ্যা নয়—মায়া নয়, কল্পনা নয়। তোমাকে নমস্কার, তোমার বাম মুখ দেখিতেছি বলিয়াই যে তোমার দক্ষিণ মুখ নাই, যে রুদ্র, এমন মিথ্যাদৃষ্টি যেন আমাদের না হয়।

"রুদ্র যত্তে দক্ষিণমুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি, এল্

সমর বনাম সভ্যতা

প্রথম বৈশাখের সঙ্গে সঙ্গে কাল-দেবতা বিশ্ব-মানবের জীবনচরিতের আর একটী নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিলেন। বিশ্বের চির অধ্যায়ের মত উহার যে মানবসঙ্গের লাল কালিতে লেখা চলিবে, তাহার সূচনা সুরু হইতেছে।

যে দাবানল গগনস্পর্শী প্রজ্বলিত শিখায় সমগ্র ইয়ুরোপের মর্ম্মস্থল ভাস্বর করিয়া দিতেছে, তাহা যেন আঁধিরার সুদূর পূর্ব্বদিগন্তে তাহার লোলুপ রসনা বিস্তার করিতে উদ্যত বলিয়া বোধ হইতেছে।

যাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিয়া সমস্ত বিষয়ে প্রতীচ্য সভ্যতা শিরের বুকে এই শ্মশান কালীর তাণ্ডব সুরু দেখিতেছেন, তাঁহাদের মনের অবস্থা কি, একবার বলা সম্ভব করিলে মন্দ হয় না।

অন্যান্য প্রতীচ্য জাতির মনের ভাবভঙ্গি কি, তাহা আমাদের মত নিরীহ, ইহলোকে মুকমজ্জ, পরলোক-পিপাসু অন্যান্য জাতির আন্দাজ করিতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা তবে আমাদের মনে মনে কি ভাবভাব, কি আশা বা নিরাশা জাগিতেছে, তাহার আলোচনা করা বা বিচার করা সম্ভব।

আমাদের মধ্যে অনেকেই এই সর্ব্বনাশকর নরমেধযজ্ঞে ইয়ুরোপীয় সভ্যতার গর্ব্ব চূর্ণ দেখিতেছেন। তাঁহারা ডাকিয়া বলিতেছেন "ভো—ভোঃ—ভ্রাতৃবৃন্দ, এই দেখ, তোমাদের সাধের সভ্যতার পরিণাম! রাক্ষসরাজমহিষী যে যাগোদ্যিনীর মোহনমন্ত্রে ভুলিয়াছিলে এই দেখ তার যথার্থরূপ, আসল মূর্ত্তি, উপকথার সেই রাজমহিষী আর কিছু নহে, আর কেহ নহে, সেই রক্তলোলুপা মন্ত্রমুগ্ধকারিণী সর্ব্বগ্রাসিনী রাক্ষসী ধরা!" বাস্তবিকই দেখিয়া মনে হয়, এই কি সেই? যুগ যুগ ধরিয়া জাতিতে জাতিতে মিলিয়া যে শিরের সাধনা করিয়া আসিল, তাহা কি শেষে শবে পরিণত হইল? শত শত শতাব্দী ধরিয়া সভ্য মানুষ সাহিত্য শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া শান্তিমন্ত্র প্রচার করিয়া আসিল, বিশ্বপ্রেমের বাণী শুনাইয়া আসিতেছিল, তাহা কি একদিনে হিংসাপীড়ন সহস্র অভিশয় অনুকরণায় নিঃশেষ হইয়া গেল? এ কি হইল? যে দেশ শেলী-শেক্সপীয়রের মোহন বীণাধ্বনিতে জগৎ মুগ্ধ করিতেছিল—যে দেশ কোমতের বিশ্বমানবপূজা প্রচার করিয়াছিল—যে দেশ গেটের সুর দিয়া বস্তু বিজ্ঞান জ্ঞানের ব্যর্থতা বুঝাইতেছিল—যে দেশ ইমানুয়েলের সাম্য শান্তি-নীতি প্রচার করিয়া বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করাইতেছিল—যে দেশ র‍্যাফেল মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্প-সাধনায় অনন্ত সুন্দরের উপাসনা শিখাইতেছিল—আজ সেই সব দেশ পরস্পরের চুঁটি চিরিয়া রক্ত শোণিত পান করিতেছে! প্রাকৃতিক জীবনসংগ্রামের লেহাই দিয়া এক জন আর একজনের বুকের উপর দাঁড়াইয়া যোগাড়ের উদ্বর্ত্তন প্রমাণ করিতেছে, শত শতাব্দীর সভ্য সাধনা কি এই ফলরচনা মাত্র? তবে কি মানবসঙ্ঘ এই মানবদেহের ভাব দেখানো একটা মুখোস পরা ভাণ মাত্র?

আমাদের অনেকের মধ্যেই এমনি ধারণা সঞ্চার হইয়াছে। আমরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, মানুষ প্রকৃতির এই বিকট উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই ধারণা হইয়াছে যে, মানুষের আর আশা নাই। ঈশা, বুদ্ধ, পল পিটরের সমবেত চেষ্টাতেও যদি আজ দুহাজার বৎসরব্যাপী সাধনার ফলে এই দাঁড়ায়, তবে আর কি আশা আছে!

আশা নাইও বটে, আশা আছেও বটে। দুঃখবাদীর এই হতাশের আক্ষেপের মূল কোথায়, একটু সন্ধান করিয়া দেখা যাউক।

দুঃখবাদীরা মানুষ সম্বন্ধে একটা নূতন ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন বলিয়া মনে হয়। মানুষের মধ্যে

তাঁহারা ষোল আনা দেবতার প্রত্যাশা করেন ; মানুষ যখন মানুষ ; মানুষ যখন যীশু মহম্মদ বুদ্ধ চৈতন্যরূপী গুরুর শিষ্য, তখন তার মধ্যে ষোলআনা দেবতাই জাগিয়া উঠিবে। তার পশুত্ব সমূলে নষ্ট হইয়া যাওয়াই উচিত। তার ব্যক্তিত্ব ও জাতিত্বের মধ্যে দেবত্বই ক্রমশঃ পূর্ণমাত্রায় প্রকট হইবে। সে নিজেকে ভুলিয়া পরের প্রেম ও প্রেমকে জীবনের ব্রত করিবে, ব্যক্তিতে যেমন, জাতিতে জাতিতেও তেমনি ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ হইয়া সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইবে। ব্যক্তি বা জাতির নিকট হইতে এতটা আশা করা হয় কেন ? না—মানুষ যে অমর আত্মার অধিকারী,সে আত্মা যে পরকাল প্রয়াসী,মানুষ যে ভিতরে বাহিরে ঈশ্বরের প্রতিরূপ মানুষের সম্মুখে যে অনন্ত উন্নতির পথ অধ্যাত্মজীবনের সীমা-হীন অসীমতা উর্দ্ধলোক হইতে তাহার অন্তরের lurking Angel টীকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছে। হইতে পারে মানুষের মধ্যে এইরূপ একটা দেবতা আছেন,কিন্তু দেবতারও যে একটা বাহন আছে, আর সে বাহন যে পশু, সে কথাটা আমরা আদৌ আনিতে চাই না। এই পশুই যে মানুষকে নিম্নতন সমস্ত জীবজন্তুর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনসূত্রে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, এই অন্তর্নিহিত পশুই তাহাকে চরাচরের নির্দ্দয় জীবনসংগ্রামে জয়ী করিয়াই তাহাকে একটা উর্দ্ধে তুলিয়াছে। সে পশু যে এখনো পনেরো আনা প্রবলভাবে তার মধ্যে কাজ করিতেছে। উদ্ভিদ, কীট, পশু চতুষ্পদের মত সেও অবিরাম সংগ্রামে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহে! মানুষ দেবতা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তার এই আদৌ সে পূর্ণমাত্রায় আর অতি নিশ্চয় সত্য ভাবে একটী Biological being প্রকৃতির রাজ্যে জীব জীবনের যে কঠোর সংগ্রাম চলিতেছে, তার দৌরাত্ম্যের এক পা বাহিরে যাইবার এখনো তার শক্তি দেখা দেয় নাই। কেবল এই নিয়মের অধীন থাকিয়াই সে অন্যান্য জীব এক জাতি আর এক জাতির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। কেবল এই নিয়মের শাসনে থাকিয়া সে তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়াছে। এই নিয়মের বশেই মানুষে মানুষে ব্যক্তিত্ব সম্ভবে পরিণত হইয়াছে। যে জীবনযুদ্ধ আদিম কাদুল ব্যক্তিতে নিবদ্ধ ছিল, এখন তাহাই জাতি বা সঙ্ঘে দেখা দিয়াছে। নিম্ন জীবনের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত, তাহাদের মধ্যেও এই সঙ্ঘবদ্ধন প্রথা দেখা যায়। ব্যক্তির বিশিষ্টতার বিকাশ যেখানে সম্ভব হইয়াছে, জাতি বা সঙ্ঘের ভিতর দিয়া ; তাই মানুষ আজ তার বাহ্য সমস্ত স্তরের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া জাতিকে দাঁড়াইয়াছে। উদ্দেশ্য একই কি না Will to live। আপত্তি হইতে পারে, মানুষের মধ্যে এই যে রক্তারক্তি, টুঁটি ছেঁড়াছিঁড়ি, গলা টেপা-টেপি ইহাতে শুধু Will to live নীতির জয় নহে, ইহা যে হেলিতেছি, আরও সাম্রাজ্যিক নীতি অর্থাৎ Will to power বড় হইয়া থাকিবার চেষ্টা ! বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা ত দুর্বলেরও নাই, বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার সকলেরই আছে, এ যে তারও বাড়া, এ যে সব ক্ষেত্রে বড় হইবার চেষ্টা, এ যে আত্ম-ঘাতী লোভের প্রণোদন ! সত্য বটে, কিন্তু মানুষ যে মানুষ ; মানুষতো ইতর প্রাণী নহে ; আর বাঁচিয়া থাকা যে কীট-পতঙ্গ চতুষ্পদের বাঁচিয়া থাকার চেয়েও জটিলতর ব্যাপার। বড় না হইলে যে বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব। যে দুর্বল, যে হীন তার শুধু খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকাও আর নিরাপদ নয়, তাকে বড় হইতেই হইবে, নচেৎ যে বড়, সে তাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবেই। Will to live এই নীতির অবশ্যম্ভাবী Corol lary হইতেছে Will to power প্রকৃতির রাজ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা বলিয়া কোনো জিনিষ নাই। কবির কল্পনাই কেবল প্রকৃতি স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, মধুময়ী। বাস্তবের দৃষ্টিতে যে তার অন্যরূপ ! সে প্রকৃতি যে Red in tooth and claw ! কোথায় Harmony ? কতটুকু ? কি বিপুল বিশাল রোমহর্ষকারী Discord সমুদ্রমন্থনে এই Harmony বিন্দুটুকু দেখা দিয়াছে, ভাবিলে চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ! এই প্রকৃতির প্রকৃতি এই বিধিবিধি। যত দিন এই বিশ্বজগৎ, ততদিন এই প্রবল, দুর্বল, সক্ষম, অক্ষম, যোগ্য-অযোগ্য ভেদ থাকিবেই। যতদিন জীবসৃষ্টিতদিন এই জীবযুদ্ধের নির্দ্দয় লীলা চলিবে। কবিকল্পিত সে-দিন কবে আসিবে জানি না, যে দিন পৃথিবী হইতে এই পাশবিক মারামারি, কাটাকাটি, কাড়াকাড়ি, ছেঁড়াছিঁড়ি অন্তর্হিত হইয়া বিশ্বপ্রেম সমস্ত জাতিগুলিকে এক স্বর্গসূত্রে

বাঁচিয়া এক 'মহামানবপরিবারে' পরিণত হইবে ; কিন্তু যত দিন না সে দিন আসিবে, ততদিন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম, যোগাতর হইয়া বাঁচিয়া থাকা, এ বল সঞ্চয়ের দ্বারা যোগাতর বলিয়া এ জীবধর্ম্ম থাকিবে ও সুযোগমতে কাজ করিবে।

দূর হইতে আমরা সভয়ে এই কেন্দ্রাভিত্তি নরপাশুবির প্রলয়ঙ্কর শুরু গর্জ্জনে ত্রস্ত ও ভীত হইয়া চোখ বুজিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিতেছি, আর ভাবিয়া মুহ্যমান হইতেছি, এ কি হইল! এ কি সর্ব্বনাশকর জীবনমরণাগ্নিনয়! সব গেল, সব গেল, ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল, শান্তি গেল, স্বস্তি গেল, মান গেল, জ্ঞান গেল, মানুষ আবার রক্ত-পিপাসু রাক্ষস হইল! দেবতাকে দেবতার দানব প্রাস্থলিত করিল—প্রলয় আসন্ন হইল!"

আমার মনে হয়, এ বিলাপ অর্থহীন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের আরম্ভমুখে অর্জ্জুনের যে মোহ ও ভয় হইয়াছিল, এ ভয়, এ মোহ, এ হতাশ সেই জাতীয়। এ ভয় দুর্বল চিত্তের স্বভাবধর্ম্ম। যুদ্ধ ত জীবধর্ম্ম। কোন্ যুগে কোন্ জাতির মধ্যে যুদ্ধ হয় নাই? আজ যে ইউরোপ প্রাচীন গ্রীস ও গ্রীসের সভ্যতালোক হইতে স্বকীয় নীতি সংগ্রহ করিয়াছে, সে রোম, সে গ্রীস যুদ্ধেই বড় হইয়াছিল। যুদ্ধ করিয়াই রোম ও গ্রীস তাহার জাতীয় সত্ত্ব ও ধর্ম্ম রক্ষার রাখিয়াছিল; এই মহাযুদ্ধের সাহায্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন—ভারতীয় ক্ষত্রিয়কুলের অস্তিত্বনেই ধর্ম্মযুদ্ধের পুণ্যাভিষেক হইয়াছিল। নেপোলিয়নের জিঘাংসাদীপ্ত প্রজ্বলিত সমরানলে মধ্যযুগীয় ইউরোপের জড়ত্বের উপর বর্ত্তমান ইউরোপের সাম্যবাদের সৃষ্টি। যদি বিশ্বেরই বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত পশুর জয় স্থায়ীরূপে ঘটিয়া থাকে, তবে এই যুদ্ধেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। যুগে যুগেই বিশ্বে বিষ ক্ষয় হইতেছে; মানবসমাজের কুটিলতর লোভ ও কাম মুক্তিতে যখনি আঘাত বা বাধার ভিতর দিয়া বাধাবন্ধহীনতা অন্তর্দেবতাকে লঙ্ঘিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখনই যুদ্ধে আবার পরাজয় ঘটিয়াছে। হাজার-হাজার বৎসর আগে এই পশুশক্তি তাহাদেরই বিশ্বমানবের সমাজের পশুশক্তি দুর্য্যোধনের ভিতর দিয়া মাথা তুলিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মযুদ্ধে তাহা আঘাত পাইয়া নত হয়; এই পশুভাব নেপোলিয়নের মধ্যে পররাজ্যলালসা ভাবে আশ্রয় করে—ধর্ম্মযুদ্ধেই তাহা বিনষ্ট হয়—আবার সেই জিঘাংসা প্রবৃত্তি আধুনিক German Militarism রূপ ধরিয়া War Lord-এর ভিতর দিয়া বিশ্বশান্তিকে অথবা বিশ্বকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে—এইধর্ম্ম যুদ্ধেই তাহা বিলয় লাভ করিবে। কেবল মাত্র সাম্য মৈত্রীর বাক্‌প্রচারে তাহা হইবে না, কেন না বিশ্বমানব এখনো রজোধর্ম্মী বিশ্বমানবের দুরন্তপশুর আক্রমণ পূর্ণরূপে হয় নাই। Paleolithic যুগের বিশ্বমানব ছিল তমোধর্ম্মী, তার সে তমোভাব কাটিয়া এখন রজোভাবে দাঁড়াইয়াছে। এই রজোধর্ম্মের বিনাশ যুদ্ধের ভিতর দিয়াই সত্ত্বগুণে উপনীত হইবে। যতদিন তা না হয়, ততদিন বিশ্বমানবের ধর্ম্ম ক্ষাত্র ধর্ম্ম। ততদিন

"স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।"

হে অর্জ্জুন, নিজ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ভয় পাইও না। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ ছাড়া অন্য ধর্ম্ম নাই। আজ যে ইংরাজ ফরাসীপ্রমুখ বিশ্বরাজবর্গ ভগবান দৈত্যকে শাসন করিতে সকার্ম্মুক সমুদ্যত, সে শুধু বিশ্বমানবের ক্ষাত্র ধর্ম্ম রক্ষার জন্য। এ বিশ্বমানবের বর্ত্তমান ইষ্টদেবতা দেবী করুণারূপিণী কেমব্রুরী শুভ্রা দুর্গনেশ্বরী নহেন, ইহার ইষ্টদেবতা এখন—

"যদ্ভ্রূ কুটীকুটিলে শিরোঘালাবিকূণে
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি—

যিনি সেই—"দেবীং ভগবতি ধৃতমুলসদ্ঘণ্টাবীণিকাবাদ্য" যিনি "সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ, শক্তিরূপেণ ও তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা" আধুনিক

করুণাময়ী রজোধর্ম্মী বিশ্বমানবের এই উগ্রতম ইষ্টদেবতা নীট্‌শের মতে War is ever the less Apollo; the true divinity for consecrating and purifying The state যত দিন মহামানবের মধ্যে সেই সত্ত্ব গুণের পূর্ণ প্রকট না হয়, ততদিন তাহাকে এই প্রচণ্ডরৌদ্রভৈরবী-রূপিণীমূর্ত্তিনী "রণাম্ভীর করালাস্যে নগ্নকায় হইয়া উপাসনা করিতে হইবে—

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।" আর

উন্নতির জন্য তাহাকে স্বতন্ত্র মানুষের নীতি অনুসারে চলিতেই হইবে। আর সে নীতি রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তির নীতির মত এক রকমের হইতেই পারে না। ব্যক্তির পক্ষে নিজের স্বাধীনতা বা স্বার্থপরতা কতকটা রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য বিসর্জ্জন করিতে পারে, করাও দরকার, কেন না তাহাতে ব্যক্তির মঙ্গল আছে—সে ক্ষেত্রে তার কোনো কাজে স্বার্থপরতা দেখিলে আমরা তাকে দোষ দিয়া থাকি; কিন্তু রাষ্ট্র তার স্বাধীনতা বা স্বার্থপরতা বিন্দুমাত্র বিসর্জ্জন করিতে পারে না, করিলে তার লয় অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তি অধীন হইয়াও স্বাধীন হইতে পারে, জাতি তাহা পারে না। কাজেই রাষ্ট্র আত্মরক্ষার্থে যে স্বার্থপরতা, ক্রূরতা বা প্রবঞ্চনা অভ্যাস করে, তাহা সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়, তাহা ব্যক্তির নৈতিক মাপকাঠিতে বিচার্য্য নহে। আজ ইংলণ্ড বা ফ্রান্স সন্তানরক্তে নিজভূমি সিক্ত করিতেছে; লক্ষ লক্ষ অনাথ ও আতুরের আর্ত্তনাদে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, হাজার হাজার পিতৃমাতৃহীন শিশুর কাতর ক্রন্দনে কর্ণ বধির হইতেছে—সুখ শান্তি ও আনন্দের মধুপ্রবাহ দুঃখ ব্যাধি ও বিষাদের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে—কিন্তু কেন? রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য। আজন্ম সত্যসেবী ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথার সাহায্যে গুরুবধ করিয়া যুদ্ধ জয় করেন, আর স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহা sanction করিয়াছিলেন—আমরা তো উভয়ের কাহাকেও দোষ দিই না? এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভরতবর্ষের উপায় ইঙ্গিতের দ্বারা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবকে জানাইলেন—তার যুদ্ধের নীতিকে অযাচ্য করিয়া—কই, আমরাতো তাঁহাকে দোষী করি না? আমরা সমর্থন করি Diplomacyর দোহাই দিয়া—। কেন করি? সোজা কথায় উত্তর এই—ছোট আদর্শ ও বড় আদর্শের সমর্থ যেখানে সেখানে বড় আদর্শের সাধনাই শ্রেয়স্কর। তার পন্থা তার দিক দিয়া যথার্থতর পন্থা।

আদর্শের কথা উঠিল যখন তখন আপত্তি হইতে পারে মারিয়া কাটিয়া কাড়িয়া খাওয়া প্রতিবেশীকে পদদলিত করিয়া বড় হওয়াই কি মানবজাতির বা একটা রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ? আর কি উন্নততর আদর্শ নাই? মানুষ কি শুধু বলবান্ পশু হওয়াটাকেই চরম সার্থকতা মনে করিবে? আমরা বা পরকাল বলিয়া কিছুই নাই, মানুষের সম্মুখে উচ্চতর পবিত্রতর উদ্দেশ্য কি কিছুই নাই? যদি না থাকিবে, তবে সত্যের জন্য, মানুষ সম্পদসুখ বিসর্জ্জন দিয়া বনবাসী হয় কেন? ধর্ম্মের জন্য আগুনে পুড়িয়া মরে কেন? জ্ঞানের জন্য চিরবৈরাগ্য সার করে কেন? আর্ত্তের সেবার জন্য পুত্রকলত্র, গৃহপরিজন, অর্থসামর্থ্য সমস্ত ত্যাগ করে কেন? পরিপাটী রকমে জীবধর্ম্ম পালন করা অর্থাৎ পরের গলায় ছুরী দিয়া পরকে ঠকাইয়া পরস্বকে নিজস্ব করিয়া নিজে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাড়িয়া উঠাই যদি মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এ সব আত্মত্যাগ, স্বার্থবিসর্জ্জন তো বাতুলতা?

এই যে আদর্শ, যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মানুষ পরের জন্য মরে, জ্ঞানের জন্য পোড়ে, সত্যের জন্য জগৎ ভোলে, সে অতি মহান্ আদর্শ, শুধু মহান্ কেন উচ্চতর আদর্শ, কে তা অস্বীকার করিবে। এই আদর্শ কল্পনা করিয়াও দু'চারিটী মানুষ মহাত্মা যে আপনাকে পরের জন্য ভুলিতে পারে, ইহাতেই বুঝা যায়, মানুষের মধ্যে এমন একটা পদার্থ রহিয়াছে, যাহাতে সে পশু হইতে অনেক উর্দ্ধে, এবং দেবতার সমকক্ষ। বুদ্ধ নিউটন যে খাঁটী Biological Being মাত্র এ কথা নির্ব্বাধেই বলিবে। নিউটন বুদ্ধের অর্দ্ধেক কি জোর দশ আনা Biological Being হইতে পারে, কিন্তু বাকী আট আনা বা ছয় আনা অতি মানুষ পদার্থ। তাহারা যুগের supermanএর pioneer মাত্র। এ সব স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষের সংখ্যা কোটিতে একটি। কাজেই আমরা মানুষসম্বন্ধে যখনি সিদ্ধান্ত করি, তখন সাধারণ মানুষই বুঝি। সাধারণ মানুষ এখন ১৫ আনা Biological Being অর্থাৎ মানববেশী পশু। আহার, নিদ্রা, মৈথুন তাহার প্রথম ও প্রধান চিন্তা; পেটভরা ও কোলপোঁছা থাকিলে সে মানুষ সখ বা সাধ বুঝিয়া একটু সাহিত্য, দর্শন, বা শিল্পিত কলার চর্চ্চা করে। এমানুষের কখনো যদি বৈরাগ্য হয়, সে শ্মশান-বৈরাগ্য বই কিছু নহে। এমানুষের কাছে জীবধর্ম্ম পালনই প্রথম ও প্রধান আদর্শ। মুখে না মানিলেও মনে মানে, জীবনসমস্যার জয়ী হওয়াই তার মহত্তম আদর্শ। সুতরাং যতদিন না নীট্‌শের ভবিষ্যপুরাণোক্ত অতিমানবের অভ্যুদয় হয়—ততদিন সাধারণ

মানুষ জীবধর্ম্ম পালনকেই মহান্ আদর্শ বলিয়া বুঝিবে। healthy, wealthy, wise Animal হওয়াই তাহার সমস্ত সাধনার মূলমন্ত্র বলিয়া গণ্য হইবে। তমোভিভূত হইয়া সব ভাবের ভাণ করিয়া মরা অপেক্ষা রজোধর্ম্মী হইয়া বাঁচিয়া থাকা কি Biological Being-এর পক্ষে প্রকৃষ্টতর পথ নহে?

আমার মনে হয়, ওই পথ। পশুধর্ম্মী মানুষের স্বধর্ম্ম হইল জীবনচেষ্টায় সফলতা লাভ করা, জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়া, অত্যাচারী আক্রমণকারীর দংষ্ট্রা হইতে নিজকে রক্ষা করিয়া সবল হওয়া, এক কথায় ইহার বর্ত্তমান কি বাকি কি রাষ্ট্র প্রত্যেকেরই স্বধর্ম্ম। ঈশা-মুশা-চৈতন্যপ্রচারিত বিশ্বপ্রেমধর্ম্ম উহার পরম ধর্ম্ম। কাজেই "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" এই আপ্তবাক্যের মহাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই ইউরোপের মিত্রশক্তি-শক্তিবর্গ আজ অত্যাচারী মদমত্ত কাইজারের···সমরদর্প চূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আজ যদি মিত্রশক্তি আমাদের মত ধর্ম্মসাধনপূর্ব্বক টীকি রাখিয়া মালা জপ করিয়া বৈরাগ্যের ঝুলি সার করিত, তাহা হইলে উহারা কোথায় থাকিত? কি হইত? কাজেই বলি Biological জীবের জীবধর্ম্ম সাধনাই মহত্তম আদর্শ—

তার পর দ্বিতীয় কথা। সত্যই কি ইয়ুরোপীয় জাতিবর্গ নিঃস্বার্থ জগৎ-হিতসাধনরূপ মহান্ আদর্শের কোনো খবর রাখে না? এ কথা অতি অগ্রাহ্য। ইহাদেরই সভ্যতার ইতিহাসেই এমন সব আদর্শের পরিচয় পাই, যাহা আমরা (এখনকার আমরা) কল্পনাই করিতে পারি না। জ্ঞানের জন্য প্রাণ দিতে, আর্ত্তের জন্য আপনা ভুলিতে, সত্যের জন্য অনল অনিলে ঝুঁকিতে, সাহিত্যসাধনার আদর্শ প্রচার করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে না। কোন জাতি পারিয়াছে? উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, উত্তর মেরুর অনন্ত তুষারাচ্ছন্ন হিমানীতে বিনা কারণে মরিয়া যাইবার যে একটা নিঃস্বার্থ উৎকট আনন্দ, এ আর কোন জাতি আস্বাদ করিতে ধরণী কয়ে। আর ইহাদের শুধু যশের জন্য, গৌরবের জন্য নহে। জ্ঞানের অনুরোধে ওই মেয়েই ল্যাবরেটরির কারাগারে যন্ত্রণা ভোগ করেন; রোগে সত্যের জন্য আগুনে প্রাণ দেন; দেশের জন্য অবলা কুমারিকা মোহান্ধ আর্ত্ত অরিকে বরণ করেন; আর্ত্তের জন্য কোমলা সুকুমারী শ্রেস্ ডারলিঙ্ কুষ্ঠকারিমুক্তকিঙ্করদের তাড়নাকেও ভয় না করিয়া কাঁপাইয়া পড়েন। এই জাতিরই একজন, নাম Father Damien স্বতঃপ্রণোদিত কুষ্ঠরোগীদের সেবা করিয়া সেই রোগেই নিজে প্রাণত্যাগ করেন।

উন্নততর আদর্শের প্রেরণায় বা উদ্দীপনায় অধিকতর মত বর্ত্তমানে আর কোন জাতিই বা হইয়াছে? চিরকুমার মহাসন্ন্যাসী বীশু যাহাদের শিক্ষাগুরু, নিউটন লাপলেস্ কাণ্ট গ্যালেন যাহাদের শিক্ষাগুরু, তাঁহারা যে উন্নততর আদর্শের সন্ধান পায় নাই, ইহা কি কথা? তবে আজ তাহাদেরই দেখে কেন:—

দেখিতে দেখিতে হল উপনীত
জগতের যত ফল-পোষিত
ত্রাসিত ধরণী করিল ধ্বনিত
প্রলয় ধ্বজা গানে।

কেনই বা—কেনারে উঠিল মরণঘূর্ণি
বিশ্ব রহিল নিশ্বাস রুধি
কাঁপিছে গগন পড় আধি যুদি
নিবারে সূর্য্যতারা?

তাহার কারণ, সেই অতি সহজ ও সত্য কথা—জীব চিরকালই জীব, আর মানুষ কেবল উচ্চ শ্রেণীর জীব; ইতর জীবের মত তাহারও জীবনধর্ম্ম, ত্রাসে বিধিনিষেধে শাসিত ও চালিত। আর "জীবঃ জীবস্য জীবনম্।" কাজেই বর্ত্তমান রাষ্ট্রও ব্যক্তির মত জীবধর্ম্মী।

ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের কোথায় মিল ও কোথায় ভেদ, তাহা কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। জীবত্বের দিক দিয়া উভয়ে সধর্ম্মী, কর্ত্তব্যের দিক দিয়া উভয়ে একটু ভিন্ন অবস্থাযুক্ত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলিয়া যে রাষ্ট্রগঠন হইয়াছে, তাহার মূলে একটা স্বাভাবিক উদ্দেশ্য বা কারণ আছে। মানুষ সমাজবাসী বা সংঘ-জীবী প্রাণী। সংঘবদ্ধ হওয়াতে তাহার ক্রমবিকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিলিত হইয়া একটা মহারাষ্ট্রের অধীনস্থ হওয়ার প্রবৃত্তি মানবব্যক্তির এখনো হয় নাই। কাজেই ব্যক্তি কতক স্বাধীন কতক অধীন; রাষ্ট্র পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন। তাহার

কার্য্যকলাপের নিয়ামক বিধিনিষেধ তাহার থাকিবে নাই। সেইজন্য তাহার কাজকর্ম্মের নৈতিকবিচার ব্যক্তির Ethical code এ হইতে পারে না। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিলিয়া একটা মহারাষ্ট্র সঙ্ঘ যখন হইবে, তখন আন্তর্জাতিক নীতি-শাস্ত্র হইবে। আর সেই শুভদিনেই পৃথিবী হইতে যুদ্ধ উঠিয়া যাইবে। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন রাষ্ট্র মাত্রেই নিজের মঙ্গলামঙ্গল নিজেই Expediency সাহায্যে নির্ণয় করিবে।

ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত মানবজাতি এক মহারাষ্ট্রের অধীনস্থ ও অন্তর্গত হইবে, তার কি সম্ভাবনা আছে? ইহা সম্ভব হইবে সেইদিন, যেদিন প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়ক একই ভাবে উদ্দীপিত হইয়া সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকে জীবনের ব্রত বলিয়া ধারণা করিবেন—যেদিন বা যে সময়ে সমগ্র মানবজাতি একই বহিঃপার্থিব (extra-terrestrial) বিপৎপাতের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য সমবেত-চেষ্টা করিতে উদ্যত হইবে—সেদিন প্রত্যেক রাষ্ট্রাধীন জনবর্গের (Mass) মধ্যে যুদ্ধের অনিষ্টকারিতা পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিবে। এখনো অনেক রাষ্ট্রের জনবর্গ যুদ্ধের যথার্থ কারণসম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞ। রাষ্ট্রনায়ক স্বার্থসাধনের জন্য জনবর্গকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছে বা মিথ্যা প্রবঞ্চনায় মায়ামুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ফলতঃ জনবর্গের এই অবস্থা। ফলতঃ জনবর্গকে রাষ্ট্রনায়ক কাইজার ও তাঁর মন্ত্রিবর্গ বুঝাইয়াছেন যে, জর্ম্মণী শুদ্ধ আত্মরক্ষার্থই ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের যুদ্ধঘোষণা ঈশ্বর অভিপ্রেত, ভাগ্যানুমোদিত। সুতরাং মন্ত্রমুগ্ধ জর্ম্মণ দেশ প্রেমের মোহন উদ্দীপনায় দলে দলে এই প্রজ্বলিত সমরানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে! ইঁহারা বলেন, আদর্শের প্রেরণায় উহারা যুদ্ধ বাধাইয়াছে। আবার মিলিত মিত্ররাজবর্গও এক আদর্শের মুখ চাহিয়াই মাতৃভূমি সন্তানদলকে শিক্ষিত করিতেছে।

কল বন্ধু, যতদিন পৃথিবীতে জীবধাত্রী প্রাণুলের অত্যাচার থাকিবে, যতদিন অত্যাচারী প্রবলের আগে পাশে নিরীহ দুর্ব্বল দাবে পড়িয়া বাস করিবে, ততদিন নৃশংস জীবনযুদ্ধের এই নিষ্ঠুর অভিনয় চলিবে। কি ব্যক্তি, কি জাতি, কি রাষ্ট্র সকলের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। সকলেই আত্মরক্ষার্থ ছলে বলে কৌশলে কার্য্য উদ্ধার করিবে। যতদিন "স্বার্থে স্বার্থে রাজিবে সংঘাত" ততদিন এই মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি চলিবে। স্বর্গেও দেব ও দৈত্যের ঈশ্বর ও শয়তানের, আহুরমজদ ও আরিমানের মধ্যে যখাতিনং চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবে। এ যে বিশ্বের শাশ্বতী লীলা!!

তবু এই সনাতন দ্বন্দ্বলীলার ফলে বিশ্বপদ্ম একটু একটু করিয়া রূপে রসে গন্ধে ভরিয়া উঠিয়া তার শত শত দল মেলিতেছে। এ সমুদ্রমন্থন যে দেবলীলা! অনন্তকাল ধরিয়া একদিকে দেবতা অন্যদিকে দৈত্য সহস্রফণ অনন্তরূপী স্বার্থরজ্জুতে জীবনসমুদ্র মন্থন করিবে, আর তার ফলে শুচিস্মিতা চিরকল্যাণময়ী লক্ষ্মী অমৃতের চতুর্ভাণ্ড করিয়া হাতে উঠিবেন। যুগে যুগে সে সুধা পান করিয়াই পশু বর্ব্বর মানুষ হইয়াছে, আবার সেই সুধা খাইয়া এই মানুষ অতিমানব বা Superman এ উন্নীত হইবে। যতদিন না মানুষে সেই পূর্ণদেবতার আদর্শ ধরে, ততদিন জীবধর্ম্মী মানবজাতিমাত্রেরই উপাস্য দেবতা রণচণ্ডী; আর তার স্তোত্র হইবে;—

"জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽলঃ সুতানিব॥
অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে! ত্বাং নতা বয়ম্॥"

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি, এ,

আলোচনী

বিবেকানন্দস্মরণে *

পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিবেকানন্দের বাণী

বিচিত্র কর্মক্ষেত্র হইতে যখন মহৎ ব্যক্তিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন নানা দিক হইতে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের বিচিত্র মহিমা আমাদের মানসপটে আজ মুদ্রিত হইয়া যাইবে। তাঁহার ব্যক্তির বিশাল ও বিরাট্, সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও অতলস্পর্শ। কখনও সেখানে রাজহংসের চকল লহরী খেলিয়া বেড়াইতেছে, কখনও তাহা নির্মল উষার বালার্কিরণদীপ্ত সমুদ্রের মত ক্রীড়ারত শিশুর স্বচ্ছ ও সরল হর্ষে পরিপূর্ণ কখনও তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের শান্তি ও গভীরতা অতল সমুদ্র অপেক্ষাও নির্বিকল্প ও গভীর, আবার কখন বা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রের মত তাঁহার আত্মা অসীম উদ্বেলপূর্ণ অসীম ব্যথায় প্রপীড়িত, অনাদি ক্রন্দনে বিমূঢ়,—আর ইহাও ঠিক, সমুদ্রের মত তাঁহার বিরাট্ আত্মা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে জুড়িয়া দিয়া—অর্থ ও পণ্যের বিনিময় নহে, শক্তি ও ত্যাগের, বিচার ও ভক্তির, কর্ম ও জ্ঞানের বিশ্বের যুগধর্মোপযোগী এক অদ্ভুত বিনিময়ের সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন করিয়াছে; আর সর্বাপেক্ষা এইটাই ঠিক দিবসের বা রজনীর, জাগরণের বা স্বপ্নের প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ইচ্ছা ও উদ্বেগ ভারত-সমুদ্র-তরঙ্গের মত একটির পর একটি আপনি উঠিয়া দেশের মলিনতা ও কলঙ্ক ধুইয়া দিতে চাহিয়াছে, পারে নাই, আবার উঠিয়া শুষ্ক বেলাভূমি বা মরু কান্তারে আছড়াইয়া পড়িয়াছে—এই ক্লান্তিহীন নিরুদ্যমহীন দিতে যাওয়া এবং ক্লান্ত হইয়া নিজের অন্তরের শক্তি ও লীলার মধ্যে ফিরিয়া আসা, ইহার আদিও নাই, অবসানও নাই—"নাগর-লহরীসমানা"। এইটাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের বর্তমান ভারতের আসল ভাবিবার ও সাধন করিবার দিক। আমি তাঁহার অতলস্পর্শ ব্যক্তিত্বের যেটা একবারে বাহিরের দিক—তাঁহার ধর্ম, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার অধ্যাত্ম জীবন নহে,—তাঁহার বাহিরের কর্মের যতটুকু অংশ, দেশের কর্মজীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, শুধু সেইটুকুর কথা কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

এই সংস্পর্শের কথা আলোচনা করিতে গেলেই আমরা তাঁহাকে যুগধর্মরূপে পাই। "পরানুবাদ, পরানুকরণ, দাসসুলভ দুর্বলতার" যুগে যখনি তিনি চিকাগোর ধর্মসভায় হিন্দুর বেদান্তবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বর্তমান যুগধর্মোপযোগী পরিণামবাদের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য দেখাইয়াছিলেন, তখন সেটা শুধু ভারতীয় দর্শনের মহিমা-প্রচার হয় নাই—সেটা বিশ্বসভ্যতায় ভারতীয় সভ্যতার বাণী-প্রচার হইল। কারণ—

বেদান্তবাদ ভারতের শুধু দর্শন নহে, বেদান্তবাদ যে ভারতের ধর্ম। ভারতের সমাজগঠন, ভারতের সামাজিক রীতি নীতি, ভারতের আচার অনুষ্ঠান, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় যে এই বেদান্তবাদকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে ও বিকাশ লাভ করিয়াছে। ভারতের এই বেদান্তবাদকে না বুঝিলে ভারতীয় সভ্যতার অধিকারভেদ ও ব্যক্তির স্বাধীনতা, প্রতিযোগিতা ও সমবায়, ত্যাগ ও শক্তি, ভোগ ও বৈরাগ্যের, কর্ম ও মুক্তির যে অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, তাহা কিছুতেই বুঝা যাইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দের নূতন ভারত গঠনের মন্ত্র, আশ্রয় ও আধার হইল—এই বেদান্তবাদ। হিন্দুর মায়াবাদ যেখানে অত্যধিক সংসার-বিমুখীনতায় প্রশ্রয় দিয়া দুর্বলতার সামান্তর বাত্র হইয়াছে, তাহা তিনি যুক্তে নিক্ষেপ করিলেন। বৈরাগ্য যে শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে শক্তের ভূষণ, অক্ষমের নহে। হিন্দুর বেদান্তবাদ যেখানে অধ্যাত্ম-জীবনের রসকারে অভিভূত ও আবদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ সেই বেদান্তবাদকে কর্মজীবনে প্রয়োগ করিয়া সফল করিয়া

* বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্তৃক অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের বাৎসরিক স্মৃতিসভায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে পঠিত।

তুলিতে আবদ্ধ দিলেন। সে আবদ্ধ, সে আহ্বান গীতার সেই অমর আহ্বানের মত, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে"—দেশের প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, ও স্বীয় স্বরূপজ্ঞানের ও প্রত্যক্ষানুভূতির অমল বিশ্বাসে তাহা পাঞ্চজন্যের আহ্বানের মত শুনাইয়াছিল।

যুগশক্তি অন্তরিক্ষেই মহাপুরুষের এই আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছিল। শাসন নাই, শিক্ষা নাই, সমাজ-ব্যবস্থা নাই, আমাদের সভ্যতা পরমুখাপেক্ষী হইয়া একবারে আত্মবিক্রয় করিয়া বসিতেছিল। বাহির হইতে বণিকের তুলাদণ্ড ও রাজার শাসনদণ্ড হইতে জড়বাদ আপনার গুরু-ভারে ও প্রভুর ঔদ্ধত্যে গর্বিত ও স্ফীত হইয়া দেশের হৃদয়-সিংহাসন জুড়িয়া বসিতেছিল। ভিতর হইতে অসংযম ও বিলাসিতা দেশের চিরন্তন সংযম ও বৈরাগ্যের ভিত্তিকে নষ্ট করিতে উদ্যত। ভারতীয় সমাজের একান্নবর্ত্তী পরিবার, গ্রাম্য সমাজ, নানা সামাজিক সম্বন্ধসমূহ ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। সমাজ যখন খণ্ডবিখণ্ডতা প্রাপ্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর, তখন সত্য সত্যই একটা বহ্নী শক্তির নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা এই বহ্নী শক্তি।

পূর্ব্বে দুই জন তাঁহার অগ্রে সমাজবন্ধনের রজ্জু লইয়া আসিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন ও ভূদেব। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে আমরা দুই জনকে তেমন নিবিড়-ভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। এক জন রহিয়া গেলেন শুধু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আর একজন শুধু সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক।

স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি, যুগ-ধর্ম্ম-নির্দ্দেষ্টারূপে, যুগপ্রবর্ত্তকরূপে।

কেমন করিয়া তাঁহার ধর্ম্মোদ্যম সমাজকে স্বেরাচার ও খণ্ড-বিখণ্ডতা প্রাপ্তি হইতে রক্ষা করিল, তাহা বলিতে হইবে না। তিনি বলিলেন, তুমি তোমাকে ভাল করিয়া জান, অন্তরস্থ কর, সমাজের সকলেই যে তুমি, তোমার মুখ দিয়া তাহারা আহার তোমারই গ্রহণ করিতেছে, তুমিই রাজারূপে ঐশ্বর্য্য বিভব ভোগ করিতেছ, আবার তুমিই দীনহীন ভিখারীর বেশে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ও প্রেম যাচিতেছ। সমাজ যে তোমারই শরীর। তোমার সুখ-দুঃখ অনুভব যে অন্যের, নিখিল প্রাণীর, জগতের সুখ দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া। সমাজের মঙ্গল না হইলে যে তোমার মঙ্গল নাই। সভ্যতার মুক্তি না হইলে যে তোমার মুক্তি নাই। তিনি আরও বলিলেন, তুমিই নারায়ণ, আর এই সমাজ নারায়ণের বিরাট্ শরীর। তুমি দরিদ্রনারায়ণ দুঃখীনারায়ণ, আতুরনারায়ণের সেবা কর, সেই সেবাতেই তোমার ভিতর যে পূর্ণ অথচ ক্রমবিকাশশীল, বিশ্বব্যাপক অথচ জিগীষু আত্মাটি আছে, তাহার তৃপ্তি হইবে। সভ্যতার চরম জীবনে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান যে অপরিসীম শক্তি অথবা ভোগ প্রদান করিতে পারে, তাহাতে চরম তৃপ্তি নাই। বৈরাগ্যই পরম আনন্দ ও বল, সম্ভোগে অতৃপ্তি, অবসাদ ও ব্যর্থতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তাঁহার এই বজ্রগম্ভীর সতর্কবাণী।

বিবেকানন্দপ্রচারিত দর্শন আজ হিন্দু সভ্যতার স্বধর্ম্ম-রক্ষার সহায় হইয়াছে। তাঁহার সেবাধর্ম্ম আজ নূতন ভারতকে বিচিত্রভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন ত্যাগ ও কর্ম্মের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। নূতন সেবাধর্ম্ম যে শুধু সমাজকে খণ্ড বিখণ্ডতা প্রাপ্তি হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহা নহে, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র, লোকহিত প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহা এক অভিনব ভাবুকতার সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন করিয়া চলিয়াছে। নূতন ভারতের কর্ম্মের যজ্ঞশালায় তিনিই প্রধান পথিকৃৎ। আমাদের এই যজ্ঞের ক্রিয়াকর্ম্ম পদ্ধিতের পূজা আমাদের ভারতের নবীন কর্ম্মোপাসনার দ্বারা।

স্বামীজি সমাজের পুনর্গঠনের জন্য সমাজসংস্কার চাহিয়া-ছিলেন। সমাজকে তিনি কম বিদ্রূপ করেন নাই, কম তীব্র কষাঘাত করেন নাই। সকলের মূলে তাঁহার হিন্দু-সভ্যতার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বদেশবাসীর প্রতি অসীম প্রীতি। তাই তিনি যখন তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা সন্ন্যাসীর স্নেহাশীর্ব্বাদরূপে লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। বিভিন্ন বর্ণে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহার তিনি প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও যে বিবাহ-কর্ম্মকে অবশ্য-কর্ত্তব্য মনে করিয়া সমাজে পরমুখাপেক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি

করিতেছে তাহার বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত শিক্ষার তিনি সংস্কার চাহিয়াছিলেন, লোকশিক্ষার, বিস্তারকল্পে তিনি ম্যাজিক্‌লণ্ঠন সাহায্যে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবহারিক বিদ্যার প্রচার তিনি চাহিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম ও দর্শন সার্ব্বজনীন; হিন্দুধর্ম, হিন্দুর আচার ও অধিকারভেদ হইতে তিনি যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, ধ্বংস ও ভেদোৎপাদক, তাহারও আত্মার পূর্ণ বিকাশ ও বিমুক্তির বিরোধী তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তরুণ সন্ন্যাসীর আশা ছনিবার, বাসনা অসীম ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐশ্বর্য্য ও ভোগের আড়ম্বরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বৈরিকবসনধারী দরিদ্রাত্মমহল শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য-সন্ন্যাসী সিন্ধুতরঙ্গ ভঙ্গ ধ্বনির বরণ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য জগতের ক্ষমা, প্রেম, সহানুভূতি ও বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ হইয়া তিনি পাশ্চাত্য জগতকে এক অভিনব মন্ত্রে দীক্ষা দিবার ভার লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার ধার্ম্মিক আরও গুরুতর, কর্ত্তব্য আরও কঠিন হইয়াছিল। তিনি লোকসমূহের যুগপরম্পরাসঞ্চিত হলাহল পান করিয়া, বিশ্বসংসারের আর্ত্তি-দুঃখ-ভাবনাদাহের জটাভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া, ললাটে গুরুর আশীর্ব্বাদের চিরনবীন শশীক্তিলক ধারণ করিয়া আপনাকে সেই জীবনমরণজয়ী বৈরাগীর মত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর দীপ্তিতে যেখানে কৃষক শ্রমক্লান্ত হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে নিযুক্ত, তাহার উদ্বেগ ও বেদনা, ভীতি ও নৈরাশ্য তিনি বরণ করিয়াছিলেন, যেখানে মাঝিমাল্লা উজান গঙ্গায় নৌকার রশি টানিতে টানিতে গান ধরিয়াছে—'মন যাকি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারি না'—তাহার বিশ্বাস ও বল আপনার করিয়া তিনি তাহাদের বৈঠা লইয়াছিলেন। কলিকাতার রাস্তায় কুলী যেখানে গুরুভার বোঝা বহিতে না পারিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া আপনার দুরদৃষ্ট স্মরণ করিয়াছে, তাহার অদৃষ্টকে তিনি পরুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। অনন্ত জনপূর্ণ কোলাহলমুখরিত রাজনগরীর উত্তপ্ত জনস্রোতের ক্রতালসঞ্চার, তাহার শিরায়-শিরায় কলকল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী সঞ্চার করিত। জন-সমূহ মনের শক্তি ও উদ্বেগ পুতগঙ্গাবারির মত বিন্দু বিন্দু এমনি পান করিয়া, সকল লোকের উদ্বেগ আপনার বিরাট বক্ষে এমনি ধারণ করিয়া, তিনি আপনার হৃদয় শান্ত ও শীতল করিতেন। তাহার পর সেই আনন্দ ও শান্তিধারায় জগৎকে প্লাবিত করিতে চাহিতেন। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্ম, কুপ্রথাদুষ্ট সমাজ, অজ্ঞানান্ধের জনসমাজ, পরমুখাপেক্ষী দেশবাসী, বিরোধী যুগশক্তির মধ্যে বাংলার শিক্ষিতবন্ধু রাজদ্বারের বেদনা ও নৈরাশ্য তাঁহার তাপো বিদ্যাপুরুষ লিখিয়াছিলেন। বাস্তব ও তাঁহার আদর্শের বিরোধ যে তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, তাই যখন তাঁহার শক্তি ও সাধনার শ্রেষ্ঠ অবস্থা, যখন তাঁহার অধরের দেহ তাঁহার আত্মার অসীম উদ্বেগের উত্তাপ সহ্য করিতে একবারে অপারগ হইয়া উঠিতেছিল, তখন বিধাতা পুরুষ তাঁহাকে সেই দেহ হইতে আপনার বিরাট শান্তির ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। তবুও তিনি আশা ছাড়েন নাই, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, আমি যদি না পারি, আমার কাজ করিবার জন্য অন্য কেহ নিশ্চিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন,—

"উৎপংস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

আমার সমানধর্ম্মা অন্য কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন—কারণ কালের অন্ত নাই এবং পৃথিবীও বিপুলা।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের tragedyটুকু, তাঁহার চিত্তের রুদ্ধ আবেগ, তাঁহার হৃদয়ের অনাহত সঙ্গীত, তাঁহার মর্ম্মের অকথিত বাণীই আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে ও আঘাত দেয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আমাদের সভ্যতা আজ বিষম অগ্নিপরীক্ষা ও বিপদের মধ্যে পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎ বিবেকানন্দের বৈরাগ্যবাণী আজও শুনে নাই। আমাদের সভ্যতারও সংস্কার হয় নাই। "সেই পরানুকরণ, পরানুকরণ, দাসসুলভ দুর্ব্বলতা", যাহার বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত জীবন ধরিয়া অসীম অধ্যবসায়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আজও যায় নাই। আমরা মনশ্চক্ষে দেখিতেছি, একটা নূতন ভারত—যেখানে লোকে একমন, সমাত্মঃকরণবিশিষ্ট

হইয়া কাজ করিতেছে, সকলেই আশিষ্ট, বলিষ্ঠ, ত্রুটিহীন, মেধাবী, জ্ঞানে ও কর্ম্মে, ধন্ধানুশীলনে ও বিদ্যাচর্চ্চায়, শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক সরল, সহজ, সন্তুষ্ট স্বাধীন জীবন গড়িয়া উঠিতেছে—সে জীবনে দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলি কেমন এক সুরে বাঁধা, ইন্দ্রিয়ভোগ কেমন বৈরাগ্যের সংস্পর্শে রূপান্তরিত, সেখানে সমাজের প্রত্যেক বিভাগ পরস্পরের কল্যাণে নিয়োজিত, পরোহিত শিক্ষিত ও যুগধর্ম্মনির্দ্দেষ্টা, বক্তমান শিক্ষিত ও অধ্যবসায়শীল, বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক বিদ্যায় নিপুণ, বণিক্ সাহসিক ও উৎসাহী, কৃষক শিল্পী শ্রমজীবী শিক্ষিত ও শ্রমকুশল শ্রমজীবিগণ আপনারাই আপনাদের কারখানার পরিচালনের ভার লইয়াছে, সেখানে হাট হইতে, বাজার হইতে, মুদীর দোকান হইতে, ফুলওয়ালার উদ্যানের পাশ হইতে, মুচী মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হইতে নূতন ব্যক্তিত্বের অভিনব পরিচয় পাওয়া যায়—তাহাদের আশা আছে, ভাষা আছে, শিক্ষা আছে, সুবিধা আছে। নারী সেখানে বিদুষী ও শক্তিমতী হইয়া সমগ্র সমাজকে আপনার স্বজনগৃহরূপে পালন করিতেছেন—এই জীবন যখন ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে, তখনই বিবেকানন্দের হৃদয়ের অনাগত গীত ও রুদ্ধ আবেগ মুক্ত হইয়া অসংখ্য নর-নারীর হৃদয় আলোড়িত করিয়া তাহাদের জ্ঞানে ও কর্ম্মে উদাত্ত ভাবে জাগিয়া উঠিবে।

সেই জাগরণের দিনে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত, সহজ, অবাধ ও স্বাধীন জীবন দেখিব। কারণ তিনি যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সফলতা অপেক্ষা ব্যর্থতাই আমাদের নিকট অধিক শিক্ষাপ্রদ, তাঁহার সেই অধীরতা—"আমি ভাঙিব পাষাণ কারা, চালিব করুণাধারা, জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পারা"—ইহা তাঁহার তৃপ্তি ও আনন্দ অপেক্ষা আমাদের সাধনার ভেতর ধন।

যে দিন সে জাগরণ আসিবে, সে দিন নূতন যুগের নূতন যুগধর্ম্মের উপযোগী কর্ত্তব্য আমরা সম্পাদন করিব—সমাজে, শিক্ষায়, বিজ্ঞানশীলনে, রাষ্ট্রশিল্পে, সাহিত্যে আমরা জাতীয় প্রাণাধারটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া আবার নূতনভাবে সকলই গঠন করিয়া তুলিব। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট আরও নূতন নূতন জটিল ও দুরূহ সমস্যা উঠিয়াছে। বৈষয়িক সমস্যা, শ্রমজীবিসমস্যা, সমাজ ও রাষ্ট্রসংগঠন সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা, শান্তিসমস্যা নূতনভাবে হিন্দু সভ্যতাকে বুঝিতে হইবে ও সেই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যুদ্ধের মধ্যেই হউক, যুদ্ধাবসানেই হউক,—হিন্দু সভ্যতা যদি এখন বাঁচিয়া থাকে, তবে ইহা সে করিবেই—কারণ প্রতিক্রিয়াই যে জীবনের চিহ্ন।

সে দিন হিন্দু সভ্যতার অন্তরতল হইতে পরিব্রাজক আবার বাহির হইবেন, একটা আত্মঘাতী সভ্যতার হস্ত হইতে শাণিত তরবার কাড়িয়া লইবার জন্য। তিনি হিংসা-প্রপীড়িত পাশ্চাত্য জগৎকে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিবেন, "মা হিংসা"। কাহাকে হিংসা করিতেছ, মারিতেছ, কাটিতেছ, —তোমাকেই ত। আপনাকে কেহ কখনও হিংসা করে না। বিজ্ঞান সভ্যতার শত্রু হইয়াছে। বিজ্ঞান-জ্ঞানসম্পদ বিধ্বস্ত তিনি উৎপাটন করিয়া তাহাকে দিয়া শিব ও সুন্দরের লজ্জা নিবারণ করাইবেন, সত্যের অলঙ্কাররূপে সাজাইবেন। বিজ্ঞান বলিতেছে, হিংসার ভিতর দিয়া জীবের উন্নতি। পরিব্রাজক বলিবেন, জীবের পক্ষে যাহা সত্য, মানুষের পক্ষে তাহা মিথ্যা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পরের শত্রুতাচরণ করিতেছে; পরিব্রাজক বলিবেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে সমাজ-দেহের অকল্যাণ। জাতিগণ ভূমি ও অর্থলোভে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। পরিব্রাজক বলিবেন, জাতির নিকট সাহিত্য, আর্ট, অন্যান্য-সাধনাই আসল সম্পদ্; তাহাই সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজাতির। তাহাদের পৃষ্টিবিধানে একের স্বার্থসাধন নহে, সকলের কল্যাণবিধান। বিভিন্ন জাতিসমূহই নারায়ণের বিরাট্ আত্মা। প্রত্যেক জাতির বিশিষ্ট সাধনায় ঐ বিরাট্ ক্রমবিকাশমান আত্মার এক একটি স্বতন্ত্র ভাব অভিব্যক্ত, এবং তাহার নিখোদে সেই বিরাট্ আত্মার হিংসা ও অবমাননা। সে দিন পরিব্রাজক পাশ্চাত্যের সর্ব্বজাতিসভায় অহিংসা, মৈত্রী ও সখ্যের মন্ত্র প্রচার করিয়া বলিবেন, জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতিবন্ধনে ও পরস্পরের কল্যাণসাধনে সেই অনন্তদেবের জগদ্বিবাসের প্রীতিসাধন।

রোমীয় সভ্যতার বিষয়ের মোহ, যাহা অতীতের কত শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে বিপথে প্রেরণ করিয়াছে, বর্ত্তমান সভ্যতার হিংস্র ও পরস্ত্রীকাতরতা, জাতীয়তা যাহা ভগবানের শান্তিরাজ্যে অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের আয়োজন করিয়াছে, তাহার এইকাল পরে একান্ত বিনাশ সাধন হইবে। হিন্দুর এই জগদ্বিজয়ের সেতা হইবে সীজার, নেপোলিয়ন নহে, তাহার উপকরণ হইবে সেনাবল নহে, তাহার সেতা ও উপকরণ হইবে পরিব্রাজক ও বৈরাগী এবং তাঁহাদের অলক্ষ্যে বুদ্ধ, অশোক, বিষ্ণু ও প্রমথগণের অশরীরী আত্মা চকিত হইয়া আপনাদের শান্তিনিবাস ত্যাগ করিয়া, বিশ্বজগতের অসংখ্য সৌহার্দ্য ও বাণিজ্য পথে পরিব্রাজকের অগ্রে অগ্রে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের বিপুল বিশ্বমন্ত্রের অভিবাচন করিবেন।

সেদিন বেলুড় মঠের নিভৃত কোঠায় ভীর্থযাত্রীর বিপুল সমারোহ, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতটে কুললক্ষ্মীগণ স্তবগান করিতে করিতে নিবিবেবদেহে প্রাতঃসূর্য্যকে বরণ করিবে, হরিনামগানরত বৈরাগী সেদিন গৃহে গৃহে অধিকতর সমর বাপন করিবে, আগন্তুকী পল্লীগ্রামের কৃষিশিল্পবিদ্যালয়ে, ব্রহ্মচারিগণের স্বচালিত কর্ম্মশালায়, আমাদের নৈশবিদ্যালয়-সমূহে সেদিন অনুরক্ত উৎসব। সেদিন মায়াবতী ও নৈনীতালের গিরিনিলয় নূতন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া অত্যন্ত পথিকের দৃষ্টি হরণ করিবে, হিমালয়ের তুষারসঙ্গে নক্ষত্রখচিত রাত্রি মনকে আরও উদাস ও ব্যাকুল করিবে, কাশীতলবাহিনী গঙ্গা আরও দ্রুতগতিতে সমুদ্রের দিকে ধাবমান হইবে, যাত্রাজ বন্দরে সমুদ্রতরঙ্গ নাচিতে নাচিতে তাহাদের স্বাগত জ্ঞাপন করিবে,—আর অনন্ত শস্যশ্যামলা, সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাংলাদেশের সে রূপের কথা কি বলিব! আপনারা কি সে রূপ দেখিতেছেন? সে জাগরণ কি আসিয়াছে? বিবেকানন্দ কি আসিয়াছেন? আপনারা অনুভব করিতেছেন, আপনারা বলুন।

সেই জীবনই ধন্য যাহা বর্ত্তমানে আবদ্ধ নহে, যাহা অতীত হয় না, এবং যাহা বর্ত্তমান ও অতীতের সমস্ত সঞ্চিত শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া নূতন ভাব ও রূপ গ্রহণ করিতে করিতে চির অগ্রসর।

সম্পাদক

রুক্মিণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৭)

সুদেবাচার্য্য বহুগ্রাম, প্রান্তর, নদনদী, অরণ্যানি ও শৈলশ্রেণী অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। পথিমধ্যে একদিন পর্ব্বতশীর্ষ হইতে দূরে বহু দূরস্থ সজ্জিত এক বিপুল বাহিনী নানাবাদ্যকোলাহলে দিগ্‌বিদিগন্ত কম্পিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতেছে দেখিতে পাইলেন। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে যুবরাজ রুক্মীর বিবাহযাত্রী কোন সুহৃদ্ তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করিতেছেন। বহুদূর দৃষ্টি প্রসারিত হয় ব্রাহ্মণ স্থির দাঁড়াইয়া ঐ শোভা-যাত্রার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইল তাহারা বিদর্ভযাত্রী বটে। দূরত্বনিবন্ধন ভাল দেখা যাইতেছে না, এক একবার সৈন্যগণের বার্দ্ধিত বর্ম্মে ও নিষ্কোসিত অসিফলকে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছিল। সুদেব ভীত হইলেন, 'হায় প্রভু, আমি ত এখনও পথে, দুঃখিনী রুক্মিণীর উপায় কি?' ব্রাহ্মণ ব্যাকুলচিত্তে আবার পথগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বহুদিবস অনবরত গমনে আচার্য্য একদিন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সুশিপাসায় পীড়িত হইয়া সন্ধ্যাগমে এক পর্ব্বত সানুদেশে বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। একে পথ চলায় অনভ্যস্ত, তাহাতে আবার নিত্য একরূপ পরিজাগ বলিলেই চলে, তদুপরি দুর্ভাবনায় মন আক্রান্ত; ব্রাহ্মণ নিতান্ত অবসন্নের ন্যায় সেই স্থানে শয়ন করিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ বিশ্রাম লাভের পর হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন সেই সানুপ্রদেশের এক পার্শ্ব দৌত করিয়া ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিণী রজতরেখার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। কত সুকণ্ঠ বনবিহঙ্গ কাকলিকলরবে নিশাগমের বার্ত্তা পান করিয়া পরম আনন্দে কলরব করিতেছে। তাহাদের সেই মধুর কাকলি শৈলমূলে প্রতিহত হইয়া অস্পষ্ট ও মধুরতর প্রতিধ্বনি তুলিতেছে। কোথাও উপলখণ্ড স্রোতোবেগ রোধ করিতে চেষ্টিত, নির্ঝরিণী জলোচ্ছ্বাসে চাঞ্চল্য জ্ঞাপন করিয়া বহুবিলম্বে যেন উপহাস করিতে করিতে প্রবলতর বেগে নিম্নাভিমুখে ছুটিয়াছে। সুদেব চাহিয়া দেখিলেন নিম্নে এক বিশাল জনপদ বিস্তৃত। সান্ধ্য রবির হেম-কিরণ সুদূর পল্লী-শিখরের বৃক্ষাবলীশীর্ষে শোভা পাইতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষিকুল মালার আকারে আপন আপন কুলায়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। মন্দ সমীরণ নিকটস্থিত বনভূমি হইতে বহুপুষ্প-গন্ধ আহরণ করিয়া সানুপ্রদেশ সুবাসিত করিয়া তুলিল। সেই নির্জ্জন স্থানে উপলখণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া সুদেবাচার্য্য বড় ভক্তিভরা কণ্ঠে প্রাণের সহিত ভগবানের কৃপাকণা ভিক্ষা করিলেন।

ব্রাহ্মণ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া দেখিলেন তামাঞ্চলে প্রান্তভূমি প্রচ্ছাদন করিতে করিতে সন্ধ্যাদেবী অগ্রসর হইলেন। ক্রমে ক্রমে বিহঙ্গকাকলি শান্ত হইয়া গেল। অগণিত নক্ষত্র আকাশপটে পরিদৃশ্যমান হইল, মৃদুমধুর-নাদিনী নির্ঝরিণী বক্ষে তাহাদের ছায়া কাঁপিতে লাগিল। হীরকমণিখচিত নীলবসনের ন্যায় উজ্জ্বল তারকারাজি-শোভিত নীলাম্বর শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মণ মোহিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়-সাগর মথিত করিয়া কত চিন্তার লহরী উঠিতেছে, পড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে আবার গড়িতেছে।

ব্রাহ্মণ দেখিতেছেন সুদূর নীল গগনপ্রান্তে, শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর নীলিমা চমৎকার মিশিয়া গিয়াছে; উপরে অনন্ত আকাশে অগণিত নক্ষত্র আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। কি বিশাল চিত্রপট আজি নয়নের সম্মুখে প্রসারিত! চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন; জনপ্রাণীর সাড়াশব্দও নাই, কচিৎ

শিল্পীগণ ও আহারান্বেষণনিরত খাপদবিশেষের চীৎকার কর্ণে আসিতেছিল মাত্র। ব্রাহ্মণ নির্জ্জন পার্শ্বস্থ প্রদেশে বসিয়া নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে যেন কেমন হইয়া গেলেন।

'এই অনন্ত আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্রপরিবেষ্টিত সৌরজগৎ, সাগরাম্বরা ধরণী, সকলই তাঁহার এক লোমকূপে অবস্থিত। সেই বিরাট্ পুরুষের বিশাল দেহে কত কোটি এইরূপ পৃথিবী রহিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? সর্ব্বকারণের আদিকারণীভূত পরমপুরুষ তিনি, সূর্য্য চন্দ্র তাঁহার নেত্রদ্বয়!' ব্রাহ্মণের চক্ষে অশ্রু দেখা দিল, 'হে প্রভো, হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, হে মহান্ অপেক্ষাও মহন্, এই বিশ্ব মাঝে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কীটবৎ, ভ্রান্তেরেণুবৎ আমি, আমার কি শক্তি যে তোমায় প্রযুদ্ধ করিব? আমার প্রার্থনা, আমার প্রাণের কাতর আর্ত্তনাদ, তোমার চরণে কেমন করিয়া পৌঁছিবে?' ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিলেন। মনশ্চক্ষু অবিচ্ছিন্নভাবে বসিয়া আচার্য্যের এতদিনের চিন্তাস্রোত যেন কোন পথে ছুটিল। তখন বড় কাতর, বড় ভক্তিভরা, ঐকান্তিক ব্যাকুলতাপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন, 'হে করুণাময়, হে দয়ার জলধি, তোমার সহিত কাহার তুলনা? কিন্তু প্রভো, আমি যেভাবে তোমাকে ডাকি, যে কল্পনা তোমাতে আরোপ করি এবং যে ভাষায় তোমার চরণতলে আমার প্রাণের আশা নিবেদন করিতে চেষ্টিত হই, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর ভাব, কল্পনা কিম্বা ভাষা যে আমার নাই। তোমার নিকট সকলই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমি যথাশক্তি তোমার আরাধনা করিতে প্রয়াস করি,—শতপ্রকার বিঘ্ন আমার পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। হে ভাবগ্রাহি, আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের ভাবের গতি দেখিয়া তুমি আমার সকল অসম্পূর্ণতা মার্জ্জনা কর।'

ব্রাহ্মণ যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন তখন দেখিলেন পূর্ব্বাকাশ অরুণরাগরঞ্জিত। সুখস্পর্শ প্রভাতবায়ু সদ্যঃপ্রস্ফুটিত অশোক, কুরুবক, চম্পক ও নাগেশ্বরের গন্ধে বনভূমি ভরিয়া ফেলিয়াছে। উষারাণী ধীরে ধীরে আপনার কক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন, শিশিরস্নাত বন্যলতা নবীনালোকরশ্মি সুবর্ণময় বেশভূষা পরিধান করিয়া হাসিয়া উঠিল। শীতল সমীরণ নির্ব্বরিণীর বক্ষ কম্পিত করিয়া লহরী তুলিল; উচ্চ রৈবতকুঞ্জ বীচিমালার মস্তকোপরি নৃত্য করিয়া সহস্র হীরকখণ্ডের সৃষ্টি করিতে লাগিল। নানাবিধ জলচর পক্ষী পরমানন্দে নানাপ্রকার রব করিতে করিতে জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। রজনী প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত ও তুষ্ট হইলেন। আর কিছুই মনে নাই, কেবল রুক্মিণীর সৌম্য বদনকে পীড়িত করিতে লাগিল। মেঘমুক্ত আকাশের ভিতর দিয়া দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দূরে বহুদূরে পশ্চিমদিকে সৌধশীর্ষসকল অবলোকন করিলেন। প্রাতঃসূর্য্যের কনকপ্রভায় তাহারা সুবর্ণখচিত বলিয়া বোধ হইল। আচার্য্য স্নান আহ্নিকাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিয়া যাত্রা করিলেন।

দ্বিপ্রহরে রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে দ্বারাবতী উপনীত হইলেন। প্রাকার এবং পরিখাবেষ্টিত পুরী বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত। সূর্য্যের পূর্ব্বদ্বার পথে নগরে প্রবেশ করিলেন, ব্রাহ্মণ দেখিয়া রক্ষিগণ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। দ্বারকায় ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার। তোরণ পার হইয়া ঠাকুর বড় বিপদে পড়িলেন, কোন্ পথে গমন করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই প্রশস্ত রাজবর্ত্ম ও মনোহর গৃহসমূহ; ফলপুষ্পশোভিত বৃক্ষশ্রেণী উভয় পার্শ্ব হইতে গমনপথ ছায়াময় করিয়াছে। ব্রাহ্মণ নগরের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সকল ঋতুজাত অসংখ্য রকমের ফুল চিত্রবিচিত্র বর্ণে উদ্যানসকল শোভিত করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ রাজপ্রাসাদ অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দুই-চারি পদ অগ্রসর হন, আর দ্বারকাবাসিগণ তাঁহাকে অভ্যাগত বুঝিয়া নানাপ্রকারে তাঁহার সেবা করিতে চেষ্টিত হয়। ব্রাহ্মণ যিনি যাহা বলায় তুষ্ট করিয়া, কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিয়া পথ চলিতে থাকেন। এক ব্যক্তির আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন, "মহাশয় আমি বিশেষ প্রয়োজনে বহুদূর হইতে আসিয়াছি। আমার যাহা সংবাদ তাহা দ্বারকানাথ ভিন্ন অন্যের নিকট প্রকাশ করিবার নহে। যদি আমার হিত কামনা আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে বলিয়া দিন কি উপায়ে আমার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। তদ্ব্যতীত আমি জলকণাও স্পর্শ করিব না।" দ্বারকাবাসী

ভাল করিয়া উপদেশ দিয়া, বলিয়া কহিয়া আপন কার্য্যে প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন। রাজপুরীর সমৃদ্ধি দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। বিদর্ভ হইতে দ্বারকা অধিকতর শ্রীসম্পন্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কত শত দেবমন্দির, ধর্ম্মাবলী, উদ্যান, বাপী, তড়াগ, বিপণিশ্রেণী, ক্রীড়াক্ষেত্র, বিদ্যামন্দির দেখিতে দেখিতে আচার্য্য অন্যমনস্কভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এমন সময় নগরীরক্ষিগণ কেহ বড় ব্যস্ত হইয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ করিতে বস্ত্র প্রসারণ করিলেন, ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন। চিনিতে বিলম্ব হইল না। ঘটিকা-সংক্ষুব্ধ সাগর-বক্ষের ন্যায় তাঁহার মন আলোড়িত করিয়া ভাবের তরঙ্গ উঠিল; কত কথা মনে আসিতে লাগিল। সুদেব বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিলেন। একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এমন মধুর, প্রশান্ত, স্নিগ্ধগম্ভীর ভাব যাঁর, তিনি কি কখনও পরের দ্রব্য দেখিয়া লুব্ধ করিতে পারেন? সুদেব কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাসুদেব বলিলেন, "দ্বিজবর, আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, স্নান-ভোজনাদি করুন, তারপর যাহা হয় বলিবেন।"

আচার্য্য সযত্ন রক্ষিত বস্ত্রপ্রান্ত হইতে পত্র বাহির করিয়া বাসুদেবের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "এই লিপি আমি বহন করিয়া বিদর্ভ হইতে এখানে আনিয়াছি, ইহার উত্তর লইয়া আমি এখনই যাত্রা করিব।"

আচার্য্য বাক্‌পটুতাসম্পন্ন পণ্ডিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বহু অনুচর তাঁহার পরিচর্য্যায় রত হইল। দুই চারিজন তাঁহার অঙ্গমার্জ্জনে ও সুগন্ধ তৈলমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইল, কেহ সুশীতল পানীয় আনয়ন করিল, কেহ বায়ুবীজন করিতে লাগিল। সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণের ক্লেশাপনোদনে যত্নবান্ হইল। বাসুদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণের পদসেবা করিয়া তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

সুদেবাচার্য্য স্নানান্তে স্নিগ্ধ হইলেন। অনন্তর থরে থরে সুবর্ণ থালায় রাজভোগ্য আহার্য্য আনীত হইল। ব্রাহ্মণ কিছুদিন পরে উদরপূর্ণ করিয়া ভোজন করিলেন। আহারান্তে দেখিলেন মণিরত্নাদিশোভিত গৃহে রত্নময় পালঙ্কে তাঁহার জন্য ধবলফেননিভ সুকোমল শয্যা, তদুপরি মহার্ঘ আস্তরণ বিস্তৃত। ব্রাহ্মণ নিকটস্থিত এক পরিচারকের কর্ণে বলিলেন, "দেখ বাপু, আমার এই পথশ্রমক্লান্ত শরীরখানি কত বিক্ষত পদযুগল, কত কর্দ্দমই ইহাতে লাগিয়া রহিয়াছে—আমার জন্য এত মহামূল্য শয্যা বা এই রাজযোগ্য ব্যবস্থা কেন?" সে কথা কে শোনে। বাসুদেবের ঐকান্তিক আগ্রহে ঠাকুরকে শেষে নমস্ত হইতে হইল।

সুদেবাচার্য্য কত কথা মনে করিয়া গিয়াছিলেন, প্রতিনিয়ত কত জল্পনা-কল্পনা করিতে করিতে পথাতিক্রম করিয়াছেন, আজি গোবিন্দ সম্মুখে সব বিস্মরণ হইয়া গেলেন। তাঁহার সর্ব্বকামনা শান্ত হইয়া গেল। ক্রীড়াপুত্তলির ন্যায় গোবিন্দ যাহা বলিতে লাগিলেন, তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন। দুঃখিনী রুক্মিণীর সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ কোন কথাই বলিবার অবকাশ পাইলেন না।

(৮)

এদিকে বিদর্ভপ্রান্তে সুদেবপত্নী সেদিন বড় উন্মনা হইয়া উঠিলেন। কি যেন মনে পড়িতে চাহে, ভাল করিয়া স্মরণ হয় না। সাংসারিক কাজকর্ম্ম ভাল লাগে না। সূনা প্রাণে গৃহে অবস্থান করিতে ইচ্ছা হয় না। পরমতাপসবত স্বামী গৃহে নাই, পর্য্যাকুল মন কে শান্ত করিবে? এমন মধুর তত্ত্বকথা কে কহিতে পারে? প্রকৃতি তিমিরাবগুণ্ঠন পরিধান করিলেন। আকাশ ছাইয়া তারকারাজি প্রকাশ পাইল। ব্রাহ্মণী কোন দিকে চাহিলেন না। নীরবে গৃহকোণে বসিয়া রহিলেন। অজ্ঞাতসারে অশ্রুজল পরিধেয়বসন সিক্ত করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণী অনাহারে দিন অতিবাহিত করিলেন, রজনীতেও জল গ্রহণ করিলেন না। একমনে একপ্রাণে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। কবে তিনি উপযুক্ত হইবেন, কবে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইবে? তবে বুঝি এজন্মে আর হইল না।

গভীর রজনীতে নিদ্রাবেশে ব্রাহ্মণী দেখিলেন, যেন আকাশের ভিতর দিয়া দিব্য দিব্যরথ প্রস্তুত হইল, আর সেই পথে শতসূর্য্য কিরণের ন্যায় জ্যোতিষ্মতী বিদর্ভ হইতে

লাগিল। এ কিরণ কি স্নিগ্ধ, কি প্রীতিকর; ইহা নেত্র-পীড়া উৎপাদন করে না। মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত জগৎ সেই দিব্যকিরণোদ্ভাসিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইল। ব্রাহ্মণী বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। অনমুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে হৃদয় যেন অতিষিক্ত হইল; তাঁহার প্রাণের জ্বালা জুড়াইল। ব্রাহ্মণী দেখিলেন যেন জ্যোতির্ম্ময় এক অপূর্ব্বমূর্ত্তি সেই ছিদ্রপথে ধরাতলে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী ভয়ে জড়সড় হইলেন; এ কি ব্যাপার! তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহের দিকেই সেই দিব্যালোকমণ্ডিত মূর্ত্তি অগ্রসর হইতেছেন।

মৃত্তিকা ও গোময়লিপ্ত গৃহের মেঝেতে স্বর্গীয় কিরণরশ্মি কি সুন্দর নৃত্য করিতে লাগিল। দিব্য সৌরভে ব্রাহ্মণাবাস ভরপুর হইয়া গেল। ব্রাহ্মণী চাহিয়া দেখিতেছেন,—যাহা কখনও দেখেন নাই, যাহা কখনও কল্পনাতেও আনেন নাই, এমন সুন্দর এক বালকমূর্ত্তি বলিতেছেন, "মা, তোমার আকুল আহ্বানে আমি আসিয়াছি। তুমি আর কাঁদিও না।"

ব্রাহ্মণীর জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল, তিনি কোন কথা বলিতে-সমর্থ হইলেন না। সহসা সেই উজ্জ্বল আলোক অন্তর্হিত হইল। ব্রাহ্মণী জাগরিত হইলেন, তখনও তাঁহার নাসারন্ধ্রে সেই দিব্যগন্ধ। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বামী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। প্রভাত রবি বড় সুন্দর সাজিয়া আকাশে উঠিতেছেন, তাঁহার লোহিত রশ্মি ক্ষুদ্র উটজের উপর পতিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণী পতিকে প্রণাম করিয়া সজলনয়নে তাঁহার নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন।

সুদেবাচার্য্য প্রীত হইলেন। কহিলেন, "প্রিয়ে, একবার চাহিয়া দেখ, আজ বিদর্ভ কিরূপ শস্যসাজে সাজিয়া দ্বারকানাথকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আকুল। দেখ, বৃক্ষে বৃক্ষে কত নব কিসলয়ের উদ্গম হইয়াছে। তরুকে তরুকে, গুল্মে গুল্মে, অশোক, কুরুবক ফুটিয়া উঠিয়াছে; কত পদ্মরাগ, মল্লিকা, যূথিকা, মালতী, চম্পক আপনাদের হইয়া সৌরভ ছড়াইতেছে।

"প্রিয়ে, আজ যেন পক্ষিকুল সুকণ্ঠ হইয়াছে। কেবল প্রাণমাতান সুরে গান করিয়া শস্যতরঙ্গে বিদর্ভ ভাসিয়া গেলিয়াছে। গৃহস্থ প্রসন্নমুখে ও প্রীতমনে ভগবৎ আরাধনায় মনঃপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছে। আবালবৃদ্ধ কি উল্লাসে মাতোয়ারা, কি মত্ততায় বিভোর, অকারণ-সঞ্জাত অকপটহাস্যে হৃদয়ের আনন্দ পরিব্যক্ত করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণাগমনে আজ রাজধানী পবিত্র হইল। জড়-জগতে ও প্রাণিজগতে কি সম্মোহন যন্ত্র কার্য্য করিতেছে।"

উভয়ে তখন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, "বিদর্ভে আর বাস করিবার প্রয়োজন নাই; রাজলক্ষ্মী চলিয়া যাইবেন। আমরাও দ্বারকায় যাইয়া শেষজীবন অতিবাহিত করিব।"

উভয়ে দ্রব্যজাত গুছাইয়া লইলেন। এত দিনের গৃহের দিকে একবার শেষদৃষ্টি করিলেন, তৎপর শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(৯)

আজ রুক্মিণীর স্বয়ম্বর। ভারতের বহু নরপতি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। শিশুপাল বরবেশে সাজিয়া আসিয়াছেন। নগরের বহির্ভাগে সারি সারি বিচিত্র পটমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে; প্রত্যেক নরপাল পৃথক্ বস্ত্রাবাসে অবস্থান করিতেছেন। যুবরাজ রুক্মী স্বয়ং সকলের সম্বর্দ্ধনা, পরিচর্য্যা ও তত্ত্বাবধানের ভারগ্রহণ করিয়াছেন।

বিদর্ভ মনোরম সাজে সজ্জিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে সুদৃশ্য তোরণ, কুসুমবাটিকা, লতাগৃহ, কৃত্রিম শৈলমালা ও প্রস্রবণ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতিবৃক্ষের পাদদেশ সুচারুরূপে সজ্জিত। ধ্বজ-পতাকায় নগর আবৃত।

যুবরাজ সমাগত নৃপালবৃন্দের সংকারের নিমিত্ত বহুবিধ আয়োজন করিয়াছেন। কোথাও কোন সুকণ্ঠ গায়ক সঙ্গীতসুধায় সকলকে প্লাবিত করিতেছে; কোন স্থানে কনকক্ষী কমলেক্ষণা নর্ত্তকীগণ বাদ্যের তালে তালে নূপুরনিক্কণিত পদবিন্যাস করিয়া দর্শকগণের প্রীতি উৎপাদন করিতেছে; কোথাও বা ঐন্দ্রজালিকের আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া জনমণ্ডলী বিস্ময়ে পূর্ণ হইতেছে। এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে নানাদিগ্‌দেশাগত সৈনিকগণ আপন আপন শিক্ষানৈপুণ্য ও যোগ্যতার পরিচয় দিতেছে।

যাহার যাহা ইচ্ছা আহার করিতেছে, পান করিতেছে। 'দানেতে দরিদ্র আর না রহিল দেশে।' সর্ব্বত্র আমোদ ও আনন্দধ্বনি। রুক্মীর উন্নত বর্ণিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত ললাট, দীপ্তিমান্ চক্ষু, দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট, কটিদেশে রত্নমুষ্টির অসি। রুক্মী বৃহৎকায় এক শ্বেত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক রাজগণের শিবিরে শিবিরে গমন করিয়া মধুর সম্ভাষণে প্রত্যেককে আপ্যায়িত করিতেছেন।

অপরাহ্ণে যুবরাজ প্রধান সেনাপতিকে সৈন্যসজ্জা করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন, "আমাদের কৌলিক প্রথা আছে বিবাহের দিবস পুত্র বা কন্যা পুরাপ্রান্তে জননী কাত্যায়নীর পূজা করিয়া আসিবে। তিনি আমাদের রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার পূজা ব্যতিরেকে কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সফল হয় না। তুমি সসৈন্যে রুক্মিণীর রক্ষার ভার গ্রহণ কর। তুমি অগ্রে গমন করিবে, আমি স্বয়ং তোমাদের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিব।"

সেনাপতি সসম্মানে উত্তর করিলেন, "যুবরাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একাকী ব্যূহের ভিতর প্রবেশ করিতে বৃহস্পতিও শঙ্কিত হইবেন। আমরা প্রাণপণে রাজকুমারীকে রক্ষা করিব।"

অন্তঃপুরে সখীগণপরিবৃতা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণদর্শনাশায় নিরাশ হইয়া প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সহচরীগণ বিবিধ অর্থযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছে। রুক্মিণীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আজ আমার শেষ দিন। তোমরা বৃথা আমাকে কি বুঝাইতেছ? শুনিয়াছি হিমাচলকুমারী পার্ব্বতী চন্দ্রশেখরকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি সুখসেব্য পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া এক দারুপ্রদেশে প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া অতি ঘোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। তবে চন্দ্রশেখর ধরা দেন। বাহিরকে লাভ করা কি সহজ? কিন্তু সখি, মানুষের মন কি না ধরিতে চাহে? আমি কি আশায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বগুণসম্পন্ন দ্বারাবতীচন্দ্রকে ধরিতে হস্তপ্রসারণ করি! হায়, মনঃপ্রাণ যাঁহার চরণে বিক্রীত, তাঁহার দর্শনে এজীবনে ফল কি!" রুক্মিণী কাঁদিতে লাগিলেন। শিশুপাল যে বরবেশে সাজিয়া বিবাহমণ্ডপের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন তাহা সকলেই জানিতেন। রুক্মিণী বক্ষঃস্থিত লুকাইত চিত্রপট বাহির করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "দেখ সখি, কি অপরূপ রূপ!

"নবীন নীরদবর্ণ, শিখিপুচ্ছ শিরে,
ত্রিভঙ্গ সুঠামদেহে বন্য গুঞ্জামালা;
মধুর অধরে বাঁশী, বাস পীতধড়া,
অঙ্গবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন রাজীব চরণে।"

কি ভুবনভুলান রূপরাশি। ইহার কাছে শিশুপাল! দেবতার কাছে চণ্ডাল! যেন শত ইন্দ্রধনু মন করিয়া হাসিয়া মস্তকের কেশ প্রবেশ করিয়াছে।"

রুক্মিণী বড় করুণ কণ্ঠে বড় মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় প্রাণসখা সখীগণের নিকট বিদায় লইলেন। প্রদেব ব্রাহ্মণ কেন ফিরিয়া আসিল না ভাবিয়া তাঁহারা আরও ভীত হইলেন। যাহার কেহ নাই, তাহার ভগবান্ গতি। মানুষ যখন বিপদের আবর্ত্তে পড়িয়া জ্ঞানহারা হইয়া যায়, যখন চতুর্দ্দিকে আশ্রয়মাত্র দৃষ্ট হয় না, যখন প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রম, দুর্ঘটনা, লাঞ্ছনা ও মৃত্যুভয়-বিভীষিকা উৎপাদন করে তখন বড় আগ্রহে বড় ভক্তিভরা প্রাণে, হৃদয়ের সমগ্র শক্তিতে 'কোথায় তুমি অগতির গতি' বলিয়া ডাকে। সেই ডাক প্রাণের ডাক, সেই ঐকান্তিকী প্রার্থনা দয়াময় কখনও উপেক্ষা করেন না। পুরাণ ইতিহাস ইহার প্রমাণ। রুক্মিণী ইহা শুনিয়াছিলেন; তাই আজ যখন কেহ তাঁহার অনুকূল হইল না, তিনি মানুষের সাহায্যের আশা ছাড়িয়া দিয়া, আপনার প্রাণের সমগ্র শক্তিতে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন ও তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিলেন।

অপরাহ্ণে সকল সখী মিলিয়া রুক্মিণীকে সাজাইতে বসিল। রাজকুমারী আপত্তি করিলেন না, তিনি জানিতেন পরদিনের লোহিত সূর্য্যকে আর তাঁহার অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে না। সখীগণ রুক্মিণীকে নিবিড় মেঘবর্ণ বিচিত্র বসন পরাইল; অঙ্গের শুভ্রকান্তিময় নীলবসনে সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত করিতে লাগিল। কনক কেশকলাপে মনোহর বেণী নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি এক বৃহৎ মণিখণ্ড নিবদ্ধ করিয়া

দিল। যাহার যেস্থানে যাহা ইচ্ছা আভরণ সন্নিবেশিত করিল। হীরক-মণিখচিত সুবর্ণভূষণে বরাঙ্গ যেন সৌন্দর্য্যের ছটা বিকীর্ণ করিতে লাগিল। সর্ব্বশোভাময়ী রুক্মিণীর দিকে তাকাইয়া কমলা বলিল, "সখীর রূপে আজ রাজপুরী আলোকিত হইয়াছে। ক্ষীরোদবাসিনী কমলা বা হরপ্রিয়া পার্ব্বতী কিম্বা সরস্বিনী শচী আজি এখানে আসিলে দেবতার রূপের গর্ব্ব খর্ব্ব হইত। সকলে দেখিত সখী আমার কিরূপ রূপবতী। এরূপের তুলনা নাই। দৃষ্টি মাত্রেই অন্তরে ভক্তির উদয় হয়, মস্তক অবনত হইয়া আইসে।" এই রূপে বিশ্রম্ভালাপে কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রত্নময় চতুর্দ্দোলা আনীত হইল। রুক্মিণীকে মধ্যে রাখিয়া বিপুলবাহিনী কাত্যায়নী-মন্দিরাভিমুখে চলিল। বোধ হইল যেন এক বিশালদেহ জীব ধীর-পদে অগ্রসর হইতেছে। সৈন্যগণ উল্লাসে উচ্চ রবে মহারাজ ভীষ্মক ও যুবরাজ রুক্মীর জয় ঘোষণা করিল।

সন্ধ্যাসমে অগণিত দীপমালাশোভিত বিস্তৃত নগরীর বড় শোভা হইল। দূর হইতে সখীগণ সমাগত নৃপালমণ্ডলীর আলোকোদ্ভাসিত শিবিরশ্রেণী নয়নগোচর করিয়া চমকিয়া উঠিল; শিবিকা মন্দিরের নিকট থামিল, রাজনন্দিনী সখী-সঙ্গে অবতরণ করিলেন। বিবিধ কুসুমমণ্ডিত দেবীপ্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ব্যাকুল প্রার্থনাময় দেবীর চরণতলে লুটিয়া পড়িতে লাগিল রুক্মিণী বুকফাটা প্রাণ খুলিয়া ডাকিলেন, "মা কাত্যায়নি, বড় প্রাণভরা নাম তোমার। আমি চিরদিন তোমার পূজা করিয়াছি। তুমি আমার মনের বাসনা ত' সব জান, অন্য জন্মে যেন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিতে পারি। এজন্মের সাধ আকাঙ্ক্ষা সব অপূর্ণ রহিয়া গেল। মা, অভাগী বরাভয়-দায়িনি,—" কণ্ঠরুদ্ধ হইল। রুক্মিণী বহুকষ্টে অশ্রুজল নিবারণ করিলেন ও দেবীমূর্ত্তিপানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। অকস্মাৎ মনে হইল পাষাণ মূর্ত্তি যেন সজীব, কুঞ্চিত অপাঙ্গে স্নিগ্ধহাস্যরেখা প্রকটিত হইল, বদনমণ্ডলে অপার করুণা প্রকাশ পাইল। রুক্মিণীকে সত্য সত্যই জননী অভয় দিতেছেন। রাজনন্দিনী গদগদীকৃতবচনে তুষ্টি হইয়া রাজকুলমঙ্গলকারিণী দেবীকে প্রণাম করিলেন। অনুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে সহসা হৃদয় যেন অতিষিক্ত হইল। নিরাশার ঘোর অন্ধকারে আশার বিজলী মোহন ছটায় বিশ্বময় অপরূপ সুষমা বিস্তার করিল।

রুক্মিণী দোলায় উঠিয়া বসিলেন। দেবী কাত্যায়নীর জয় ঘোষণা করিয়া সৈন্যগণ রাজধানী অভিমুখে চলিতে লাগিল। তুমুল কোলাহল আরম্ভ হইল। যুবরাজ সকলকে অতি সাবধানে গমন করিতে আদেশ প্রচার করিলেন। ক্রমে অদূরে উৎসববিহ্বল নগরবাসীর কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল; সকলে নিরাকুলিত চিত্তে বাদ্যের তালে তালে পদবিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

অকস্মাৎ পথিমধ্যে বাহকগণ মহাকলরব আরম্ভ করিল। শব্দ শুনিয়া অগ্রপশ্চাৎ হইতে সৈন্যাধ্যক্ষগণ ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। প্রকাণ্ডকায় শ্বেত অশ্বারোহণে মহাবীর রুক্মী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মন সংশয়ে পূর্ণ হইল, তিনি শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিবার আদেশ দিলেন। অনেকেই রাজাদেশপালনে ব্যগ্র হইল, দ্বারখোলা হইলে সকলে স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন শিবিকা শূন্য! "রুক্মিণী কোথায়", "রাজকুমারী" কোথায়, মুহূর্ত্তমধ্যে কণ্ঠে কণ্ঠে এই কথা প্রতিধ্বনিত হইল। শোভাযাত্রার শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া গেল, যে যেদিকে পারিল খুঁজিতে ছুটিল। দ্রুতগামী দূত বিদর্ভে সংবাদ লইয়া গেল। নরপতিগণ নৃত্যগীতের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, রুক্মিণীর অদর্শনসংবাদে বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া তৎমুহূর্ত্তে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। সকলদিকেই লোকজন চীৎকার করিতেছে, কে কোন্ দিকে গমন করিবেন ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

সহসা দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খের গভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইল। কৃষ্ণদেবী জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্ব প্রভৃতি পরিচিত শব্দ লক্ষ্য করিয়া রথসঞ্চালন করিলেন। কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না বাসুদেব রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছেন। ক্রোধে অভিমানে ও অপমানে রুক্মীর চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে লাগিল। সকলে ভীষণরবে ভীষণবেগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। শিশুপাল বসিয়া বসিয়া বিবাহলগ্নের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ও

সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তাঁহার সে কল্পনা বিফল হইল দেখিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া অস্ত্রশূন্যে বিবিধ কথাঘাত করিলেন, অশ্বগণ রথ লইয়া তীরবেগে ছুটিল। মগধরাজ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "আরে মূঢ়, তোমার এত অহঙ্কার, যে শিবিরে যদুবেন্দ্র জরাসন্ধ উপস্থিত, তুমি সেই স্থান হইতে কন্যা চুরি করিতে সাহসী হইয়াছ? তোমার অহঙ্কার আজি আমি চূর্ণ করিব। আজ স্বয়ং ইন্দ্রও তোমাকে আমার ক্রোধ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

"শৃগালের প্রায় কেন কর পলায়ন,
যুদ্ধ দিনি সহ কন্যা করি প্রাণপণ।"

কেশরী যেন গ্রীবাভঙ্গে পশ্চাদ্ধাবিত শৃগালের দিকে তাকাইলেন। বাসুদেব রথ ফিরাইলেন, অমনি যদুবল গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইল। গভীর তূর্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বলদেব, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি মহারথিবৃন্দ সিংহনাদ করিয়া যুযুৎসু নৃপতিগণকে আক্রমণ করিলেন। ঘোরযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্ষণকাল মধ্যেই বিমর্দ্দপ্রাপ্ত আহত সৈনিকগণের কাতর আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইল। মগধরাজ বলদেবকে আক্রমণ করিলেন ও তাঁহার অস্ত্রের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য নৃপালগণ জরাসন্ধকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু রুক্মী ফিরিলেন না। ভগিনীকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, বিশেষ যদুবংশের সমক্ষে; সহস্র বৃশ্চিক যেন সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল। রুক্মী ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া বিবিধ আয়ুধ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাবল বাসুদেব ক্ষণকাল মধ্যেই তাঁহাকে অস্ত্রশূন্য করিলেন ও তাঁহার শিরশ্ছেদন করিবার নিমিত্ত শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিলেন।

রুক্মিণী এতক্ষণ রথপ্রান্তে উপবিষ্টা ছিলেন। সহোদরের আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া যুক্তকরে সজলনয়নে শ্রীকৃষ্ণের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শাণিত কৃপাণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন, "আমি ক্ষমা করিলাম" বলিয়া চারুদর্শনাকে কমলেক্ষণা রুক্মিণীকে বক্ষে ধারণ করিলেন। নিবিড় জলধরাস্তিতে যেন সৌদামিনী শোভিল। সুখের আতিশয্যে তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্বশরীর পুলক-কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে পূর্ব্ব ক্লেশ বিস্মরণ হইলেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক, বি এ

পল্লীমাতা

(পল্লীমাতার নাগরিক সন্তানগণের প্রতি)

পল্লীমাতা বৃদ্ধা আজি ষোলচর্ম্মা ক্ষীণ দৃষ্টি তার
রোগে জীর্ণা শোকে শীর্ণা নিজ দেহ হইয়াছে ভার,
নগরবিলাসী পুত্র, তাই বলে ত্যজিবে তায় ?
তাইনী ভাবিবে তুমি বৃদ্ধা বলি আপন মাতায় ?
মাতা যদি জরাজীর্ণা সন্তানের তবে চায় সেবা
সন্তান বিমুখ হ'লে তারে আর দেখে বল কেবা ?
সমস্ত জীবন ধরি যে তোমারে পালিল নির্ব্বোধে
এ দুর্দ্দিনে তারি কি না হায় হায় এই প্রতিশোধ ?
রোগের শয্যায় পড়ি আজি সে যে করে ছট্ ফট্
তুমি তাই পলাইছ এড়াইতে স্পর্শের সঙ্কট।
কেমনে এড়াবে বল' বংশগত রোগপ্রবণতা ?
পলাইবে কোন দেশে কোথা সেগো ঘর নাহি ঘরা ?
অনিদ্রায় অনাহারে তব রোগশয্যার শিয়রে
জাগিল যে, কত ব্যাধি নিজ অঙ্গে নিল স্নেহ ভ'রে,
উপবাস ব্রত চরি' ধরা দিল যেউল সোপানে,
সবি আজি ভুলে যাবে ? চাহিবে না সে মায়ের পানে ?
পিপাসায় কাঁদে আজি জল জল করে অবিরল
শুষ্ক ওষ্ঠ স্মরি আজি দিবেনাক তার মুখে জল ?
আজি সে পারে না দিতে তব নব রীতি রুচি মত,
খাদ্য পেয় বেশ ভূষা দিন দিন চাহ তুমি যত।
আজিকে তাহার গৃহে লক্ষনাক সব সুখগুলি
তাই বলে অতীতের সব কথা যাবে কিগো ভুলি ?
আলো সে ভুলেনি তোমা শুভ্রতরে প্রভাতে সন্ধ্যায়
তোমার কল্যাণে যাচে গলবস্ত্রে দেবতার পায়।
বৃদ্ধা জননীর সেবা ভাব' তুমি ব্যর্থ বিড়ম্বনা,
একাকী আপনি বাঁচি আপনারে করিছ বঞ্চনা।
বিধাতা কি করিবেন ভাবিতেছ এ ভীষণ পাপে
পুঞ্জীভূত হইতেছে সব পাপ দেব-অভিশাপে।
জমিতেছে মত তার বিন্দু বিন্দু আকাশে বাতাসে,
কোপাগ্নি করিছে ঐ বাসবের অধীর নিশ্বাসে।
ভাঙ্গিয়া পড়িবে শীঘ্রে উপলবে বজ্রের মতন
চূর্ণ হবে বিলাসের লালসার সোনালী স্বপন।

শ্রীকালিদাস রায়

সাম্য

এক ছিলেন রাজা।

রাজার একবার উৎকট ব্যাধি হইল। রাজ-বৈদ্য আনীত হইল। বৈদ্যকে রাজা বলিলেন, তোমার চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি ভাল করিয়া দেখিয়া আমাকে ঔষধ দিয়া ভাল কর। যদি না পার, তবে আজ পর্য্যন্ত তোমাকে যে ধন-সম্পত্তি, মান-সম্মান দিয়াছি, সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিব।

শুনিয়া অমঙ্গল গণিয়া, অতিশয় চিন্তিত হইয়া রাজ-বৈদ্য গৃহে ফিরিল। কি করিবে? এখন রাজাকে বাঁচাইবে, না নিজে বাঁচিবে? স্থির করিল, এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে রাজা বাঁচুক, আর নাই বাঁচুক, নিজে বাঁচিতে পারে। রাজবৈদ্য রাজাকে বিলক্ষণ জানিত। অনেক চিন্তার পর, সুচতুর রাজবৈদ্য সমদর্শন হইয়া রাজ-সমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ, শাস্ত্র দেখিয়া বহু বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ আনিয়াছি, গ্রহণ করুন। কিন্তু একটী কথা। আপনার রাজ্যে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী রমণী, তিনিই এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইয়া দিবেন, নচেৎ শাস্ত্রে এই ঔষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা নাই।

রাজবৈদ্য ভাবিল, এখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী রমণী তোমরা যেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াও, ইতিমধ্যে যাহা হয়, একটা হইয়া যাইবে। আমি ত' বাঁচিয়া যাই।

বৈদ্য রাজাকে ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া গেল। রাজা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া, মন্ত্রী এবং অন্যান্য সকল রাজ-কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বৈদ্যের ঔষধ ও ব্যবস্থার কথা জানাইয়া বলিলেন, তোমরা আমার রাজ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণী, তাহাকে আনিয়া দাও। না হইলে সকলকে সমুচিত দণ্ড দিব।

ইহা শুনিয়া ভয়াকুল ও চিন্তাকুল হইয়া, অমাত্যমণ্ডলে সকলে বাহির হইল। কি প্রমাদ! কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী, কোথায় সে, কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? আমরা না আনিতে পারিলে সমুচিত দণ্ডের বিধান। এখন উপায় কি?

চারিদিকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চারিদিকে তুমুল সন্ধান পড়িয়া গেল। রাজ্যের অধিবাসীদিগের কাহারও বাড়ী অনুসন্ধান হইতে বাদ পড়িতে ছিলনা, এবং দেশবাসিগণের মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এদিকে আবার রাজার নিকট হইতে দৈনিক তাগাদা আসিতেছে। এক এক জন কর্ম্মচারী এক এক জন সুন্দরী ধরিয়া আনে কিন্তু বিবেচিত হয় যে, সেই সুন্দরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী নহে—তাহার অপেক্ষা সুন্দরী আছে, এবং আনয়নকারী কর্ম্মচারী রাজার নিকট দণ্ডিত হয়। চারিদিকে মহা ভয়, মহা সোরগোল—রাজ-কর্ম্মচারীদের আহার নাই, বিরাম নাই, নিদ্রা নাই। একজন কর্ম্মচারীর পর অন্যজন দণ্ডিত হইতেছে—কি উপায়? রাজপুরী ঘোর বিষাদে মগ্ন, কাহারও মুখে হাসি নাই, কথা নাই। সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী আনিতে হইবে, না হইলে রাজার ঔষধ ব্যবহার করা হইবে না, কিন্তু কোথায় সে, কে সে? এদিকে রাজার অসুখ বাড়িতেছে এবং জরুরী তাগিদ আসিতেছে।

রাজপুরীর যখন এইরূপ ঘোর বিষাদ ও ত্রাসের অবস্থা, তখন সেই রাজপুরীর ভিতর দিয়া এক ফকির যাইতেছিল। ফকির কখনও এই রাজপুরীতে এরূপ ঘোরতর বিষাদ ও নিরানন্দ দেখে নাই। সে একজন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল, রাজপুরীতে এরূপ ঘোর বিষাদ ও নিরানন্দের কারণ কি?

ঐ রাজকর্ম্মচারীর নিকট হইতে ফকির সমস্ত শুনিল, তাহার পর তাহাকে বলিল, আচ্ছা, আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী রমণী আনিয়া দিব।

ফকিরের এই কথা ক্রমে মন্ত্রীর নিকট, তাহার পর রাজার নিকট পৌঁছিল। মন্ত্রীর নিকট যখন রাজা শুনিলেন যে, এক ফকির আসিয়াছে, সে বলে যে, সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী রমণী আনিয়া দিতে পারে, তখন রাজা মন্ত্রীর সমক্ষে সেই ফকিরকে ডাকাইলেন। ফকির আসিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী রমণী আনিয়া দিতে পার?

ফকির উত্তর করিল, পারি।

রাজা। তুমি গৃহত্যাগী ফকির, সন্ন্যাসী। তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরীর খোঁজ কিপ্রকারে পাও?

ফকির। মহারাজ, আমরা সন্ন্যাসী, ফকির। আমাদের ভগবৎ-জ্ঞান আছে, ঐশ্বরিক-শক্তি আছে, দিব্য জ্ঞান আছে, দিব্য চক্ষু আছে। আমরা সমস্তই দেখিতে পাই, ও জানিতে পাই।

রাজা। ভাল। তবে আনিয়া দাও।

ফকির। মহারাজ, আনিয়া দিব, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আপনাকে কয়েকটী কথায় বাধ্য হইতে হইবে, না হইলে পারিব না। আপনি প্রতিশ্রুত হউন, অঙ্গীকার করুন।

রাজা। প্রতিশ্রুত হইলাম, বাধ্য হইলাম, অঙ্গীকার করিলাম—তুমি বল।

ফকির। (১) আপনি সেই রমণীর জন্য পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত রাখিবেন—সে যাইবার সময় উহা লইয়া যাইবে এবং আপনি আরোগ্য হউন বা না হউন ঐ মুদ্রা তাহার হইবে। (২) সেই দিন সূর্য্যোদয় হইতে আমার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনার চক্ষুর্দ্বয় এরূপ ভাবে বন্ধন করা থাকিবে যে, আপনি কিছুই না দেখিতে পান, এবং ঘরে আপনি একাকী থাকিবেন, ও যে রাস্তা দিয়া আমি আসিব সেই রাস্তায় এবং রাজবাটীর আপনার কক্ষ-পর্য্যন্ত কোন লোক থাকিতে পারিবে না, যাহাতে কাহারো দৃষ্টি তাহার উপর না পড়ে। (৩) তাহার জন্য একটী ডাল-রূপে পর্দ্দাযুক্ত শকট দিবেন এবং তাহাকে আবৃত করিয়া আনিবার জন্য একটী আবরণ প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। (৪) আপনি আরোগ্য লাভ করিলে, রাজবৈদ্যকে পুরস্কার না দিয়া দণ্ড দিবেন। (৫) আপনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত সেই রমণীকে দর্শন করিতে পারিবেন না, এবং তাহাকে সভাস্থলে দর্শন করিতে পারিবেন। (৬) যদি রাজবৈদ্যের ঔষধ সেই রমণীর দ্বারা প্রস্তুত ও প্রদত্ত হইয়াও সুফলপ্রদ না হয়, তবে জানিবেন, রাজবৈদ্যের ঔষধ খারাপ এবং রাজবৈদ্যকে দণ্ডিত করিবেন।

রাজা এই সমস্ত অঙ্গীকারই করিলেন, এবং তাঁহার অঙ্গীকারের সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। ফকিরের হুকুম মত সমস্ত কার্য্যের জন্য হুকুম প্রদত্ত হইল। তাহার পর ওই রমণীর আগমনের জন্য দিন ধার্য্য হইল, তাহার পর ফকির বিদায় লইল।

ফকিরের এরূপ কথার পর রাজ্যের সমস্ত লোকই অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। অধিক ভয়ের কারণ কাহারও রহিল না।

নির্দ্দিষ্ট দিন আসিলে পর, জনহীন পথ দিয়া পর্দ্দাযুক্ত শকটে আবৃত রমণীকে ফকির রাজার নিকট আনিয়া বৈদ্য-প্রদত্ত ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া এবং খাওয়াইয়া স্বর্ণমুদ্রা লইয়া চলিয়া গেল, এবং অনেকক্ষণ পরে সংবাদ আসিল যে, ফকিরের আদেশ অনুসারে রাজার চক্ষুর বন্ধন খোলা যাইতে পারে ও লোক-জনের গতায়াত প্রভৃতি নিয়মিতরূপে চলিতে পারে।

রাজা ঔষধ খাইয়া ক্রমে ক্রমে ভাল হইয়া উঠিলেন। নগরে মহানন্দ উপস্থিত হইল। অন্নদান, ধনদান, ধর্ম্মোৎসব, নৃত্য, গীত প্রভৃতি কিছু দিন ধরিয়া তুমুলরূপে চলিতে লাগিল।

ধুমধাম যখন ফুরাইয়া আসিতেছে, এমন সময় একদিন ফকির আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল।

রাজা তাহাকে আদর-অভ্যর্থনাদি প্রচুর রকম করিলেন। তাহার পর ফকির বলিল, আপনার অঙ্গীকার অনুসারে রাজবৈদ্যের প্রতি আপনার যে কর্ত্তব্য দণ্ডবিধান তাহা প্রতিপালন করুন।

রাজা তৎক্ষণাৎই রাজবৈদ্যের সমুচিত দণ্ডের আদেশ করিলেন। তাহার পর ফকিরকে বলিলেন, "আমার অঙ্গীকার অনুসারে, আমি একবার সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী রমণীর দর্শন লাভ করিতে পারি, যাহার দ্বারা আমার

সুমধুর জীবন লাভ হইয়াছে। তুমি সভাস্থলে একদিন তাহাকে আনিয়া দেখাও।

ফকির রাজি হইল। দিন ধার্য্য হইল।

যথাদিনে রাজসভা লোকজনে পরিপূর্ণ সকলেই রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী রমণীকে দেখিবে। সকলেই প্রতীক্ষায় আছে, সকলেই উৎকণ্ঠিত। ফকির ও সুন্দরীর আগমনে দেরী হইতেছে। সকলেই অধিকতর উৎকণ্ঠিত, অস্থির, অধীর হইয়া পড়িতেছে। ক্রমেই অধিক বিলম্ব হইতেছে, রাজসভা ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে। অবশেষে ফকির আবৃত রমণীকে সঙ্গে করিয়া শকট হইতে নামিয়া রাজসভা মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার পর রাজা বলিলেন, ফকির, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরীকে সভাস্থলে দেখাও। আবরণ উন্মোচন কর।

যে আজ্ঞা মহারাজ, এই বলিয়া সভামধ্যে ফকির রমণীর গাত্র হইতে আবরণ তুলিয়া লইল। কিন্তু একি! রমণী যে এক কদর্য্যা, বৃদ্ধা, বিশ্রী, ভিখারিণী!

রাজা মুখ বিকৃত করিয়া ফকিরকে বলিলেন, এই কি আমার রাজ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী রমণী?

ফকির বলিল, মহারাজ, চক্ষু বন্ধ থাকিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আর নিকৃষ্ট, দুইই সমান।

সভার লোক মস্তক অবনত করিয়া বলিল,—তাইত!

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি, এ,

নাম্বুর।

বঙ্গের বৈশালী তুমি, পুণ্য তপোবন,
গীতের গঙ্গোত্রী তুমি, বন্দি শ্রীচরণ।
প্রেমের পবিত্র নীরে করিবারে স্নান,
আসিয়াছি বহি হেথা তপ্ত দেহ প্রাণ,
কোথা সেই দুই ছেলে যে হেথায় বসি
অমুদরে নেহারিল নদীয়ার শশী।
রাধালের সাথে মিশে যেই ভাগ্যবান্
রাখাল রাজার আগে লভিল সম্মান।
গেলে যার পথ ছাড়ি প্রেমে ভরপুর
'রাখীর' ফাঁকণে রাই-মজীরের সুর।
ভোগবতী উচ্ছ্বসিত ভোগ পথে যার
বাধা হ'ল যদির হিয়ার বেগ হার।

ছেলেছিল বল দেখি স্বপ্নে কোন্ জন
রাখীর কঙ্কণ হবে রাধার অঞ্জন!
কোথা ওগো রজকিনী পরবিনী তুই
ফুটেছিলি বেলা সনে অর্দ্ধফোটা জুঁই।
বঁধুর মধুর প্রেমে হারাইলি নাম
নয়ন অনলে করি ভস্মীভূত কাম।
চন্দ্র হল তোর ক্ষুদ্র কপালের টিপ্
স্বরগ বল্লিকা হল বাসর প্রদীপ।
তুই মোহাগিনী বর পরবিনী বলি
নীলাম্বরী খুঁটে বাঁধা নীলকান্ত মণি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বঙ্গের বর্ত্তমান যুগের কবি ও কাব্য

দ্বিজেন্দ্রলালের গান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অমরকবি দ্বিজেন্দ্রলালের পরিপূর্ণ পরিচয় তাঁহার রচিত গীতাবলীর মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। গানের ভিতর দিয়াই দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা চিনিতে পারি; দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রধানতঃ এই গান রচনায়। গানের ভিতর দিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশের, সমাজের এবং সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন—গানের সহকারিতায় তিনি সমাজ হইতে দুর্নীতিসমূহ বহিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—গানের সাহায্যেই তিনি স্বদেশের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের বান বহাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। গানেতেই তিনি আমাদের দেশের অতীত গৌরবের চিত্র পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন—গানের ভিতরেই তিনি নিজেকেও ধরা দিয়াছিলেন—সুতরাং গানের ভিতরেই যে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণের পরিচয় পাইব সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রত্যেক কবিরই নিজের ব্যক্তিগত একটি মূলসুর থাকে—তাঁহার সমস্ত রাগিণী, সমস্ত সুর ঐ এক মূলসুর অনুসারেই চলিয়া থাকে। প্রত্যেক প্রতিভাবান্ কবিরই নিজের স্বকীয় একটি বিশেষত্ব রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূলসুর তাঁহার অভিসার যাত্রার সুরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর সমস্ত গানই যেমন তাঁহার ঐ এক মূলসুরের সহিত মিল রাখিয়া চলিয়াছে—দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত গানের ভিতর সেইরূপ তাঁহারও নিজের একটি মূলসুর দেখিতে পাওয়া যায়—সেটি তাঁহার স্বদেশপ্রীতি—তাঁহার স্বদেশ-সেবা। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতা তাঁহার সমস্ত গানগুলির ভিতরেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কোনও গানের এই স্বদেশাত্মার মূর্ত্তি খুব তীব্রভাবে, উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুটমান হইয়াছে—আমার কোনও গানে স্বদেশাত্মার মূর্ত্তি তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। তবে এটা ঠিক যে দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত গানই স্বদেশাত্মক। দ্বিজেন্দ্রলালের গুণযন্ত্রীবীণায় ঐ সুরই মূলসুর। ইহারই সঙ্গে সুর রাখিয়া তাঁহার অন্য তন্ত্রীগুলি বাজিয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের ভিতর তাঁহার ঐ স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশসেবারই পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশের চরমবাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন—তাই সাহিত্যের ভিতর দিয়া যত প্রকারে দেশের সেবা করিতে পারা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার কোনওটিতেই হস্তক্ষেপ করিতে বিরত ছিলেন না। সমাজের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য, সমাজের সেবা করিবার জন্য, সমাজকে উন্নত করিবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানের সাহায্য লইয়াছেন—হাসির গানের ভিতর দিয়া স্বদেশের তথা স্বজাতির ও স্বসমাজের উন্নতি করিবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল তীব্র কষাঘাত ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। আর ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, যে যাহার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করে, যাহাকে নিজের প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, যাহার সেবা করিয়া সে বড় হইবার বাসনা অন্তরের মধ্যে পোষণ করে, সে তাহার দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে দেখিতে চাহিবে—ইহার জন্য যদি তাহাকে তাহার প্রিয়জনের পৃষ্ঠদেশে কঠোর কষাঘাত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত

হয় তাহা হইলেও সে কখনই তাহা করিতে কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হইবে না। দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজের উন্নতির জন্যই তাহার পৃষ্ঠে কষাঘাত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাসির গানগুলির অধিকাংশের ভিতরেই কিছু কমবেশী মাত্রায় এই তীব্র বিদ্রূপের কষাঘাত রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। আমাদের জাতীয় জীবন, জাতীয় চরিত্র, জাতীয় মন যখন স্ফূর্তিশূন্য, অলস হইয়া উন্নতির পথে ধাবমান না হইয়া বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার বুক কাটিয়া তাহার ভিতর দিয়া প্রাণের তীব্র স্রোত প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—এই জন্য তাঁহার অস্ত্রের আঘাতে যে আমাদের জাতীয় শরীর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। অবশ্য আঘাত দিলে যে আঘাতিতের বেদনা লাগে একথা কাহারও অবিদিত নাই। যে ব্যক্তি মোহান্ধকারে অবস্থিত তাহাকে জ্ঞানালোকে আনিবার চেষ্টা করিলে সে ত' লাঠি হাতে তাড়া করিয়া আসিবেই—যে ব্যক্তি পীড়িত তাহাকে উঠিয়া চলিতে বলিলে সেও ত' বিরক্ত হইয়া বক্তাকে শত্রুভাবে গ্রহণ করিবে - তাহাকে ত' তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিতৈষী বন্ধুরূপে প্রথমে সে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

কিন্তু আমাদের সমাজ যে দ্বিজেন্দ্রলালকে বন্ধুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যে সরস হাসির গানগুলি লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তীব্র আলাময়ী ভাব থাকিলেও তাহার মধ্যে রস ছিল এবং প্রাণ ছিল। ইহাই প্রথম কারণ। দ্বিতীয়তঃ দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সরল, মুক্ত-উচ্চ হাস্যধ্বনি করিতে পারিতেন, সাহিত্যেও তিনি সেইরূপ উন্মুক্ত, শুভ্র হাস্যধ্বনি করিতে জানিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কপটতাকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন—এই জন্য তাঁহার সাহিত্যেও কপটতা পরিলক্ষিত হয় না। এই অকপটতা দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয়তঃ দ্বিজেন্দ্রলাল যাহাদিগকে কশাঘাত করিতেন বিবেকের তাহাদের দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেন। এরূপ সমবেদনা সাহিত্যে বড়ই দুর্লভ। এই সহানুভূতিই তৃতীয় কারণ। দ্বিজেন্দ্রলাল কেন যে হাস্য করেন তাহার উত্তরে তিনি নিজেই বলিতেছেন :—

"বলিত হাসব না, হাসি রাখতে চাইত চেপে,
কিন্তু, এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, ফেটে হয় প্রায় ফেপে ;
ঘরে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রিবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে ;
একটু গ্যালো পোড়ে কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে
করে একঘরের মস্ত বন্দোবস্ত বাস্ত কোন ভায়া
তখন আমি হাসি জোরে, শুদ্ধস্বরে, ছেড়ে প্রাণের মায়া।"

কোনও বিজ্ঞ সমালোচক এসম্বন্ধে সত্যসত্যই লিখিয়াছেন যে, "তাহা ছাড়া কবির বক্ষে এমন একটা বিপুল প্রহসন, যে কতকগুলি বুদ্ধিমান্ মানুষ, গম্ভীরভাবে বিচার করিতে বসিয়া গিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমা পার হইয়া সেদেশ মানুষের জাতিধর্ম্ম থাকে কিনা। কবি যদি ঐরূপ কাতর গবেষণার যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ উপস্থিত করিতেন, তবে সেটাও একটা প্রহসনে দাঁড়াইত।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যে কিরূপ সমাজসংস্কারক ছিলেন ও কিরূপভাবে হাসিতেন তাহা উদ্ধৃত অংশ হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কোনও সংস্কারক সমাজের ভণ্ডতা ও নীচতা দেখিয়া রাগে ছট্‌ফট্ করেন, কেহ গালি দিয়া প্রবন্ধ লিখেন, কেহ বক্তৃতায় গালাগালি দেন, কেহবা গম্ভীরভাবে উপদেশ দেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজের অধঃপতন দেখিয়া হৃদয়ে গভীর বেদনা বোধ করিতেন কিন্তু তাঁহার হৃদ্‌কন্দরের অন্তরস্থ বেদনা রক্তিম অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া সুবিমল হাসির আকারে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিত। দেশের ভণ্ডামি দেখিয়া নির্ভীক দ্বিজেন্দ্রলাল সহজ সরলভাবে তাহাদের মুখের উপরেই স্পষ্ট হাসি হাসিতেন—এহাসি যে দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়ের তপ্ত রক্ত সে কথা অনেকে জানিত না। তিনি যদিও সরলস্বভাব ও আমায়িক ছিলেন তথাপি কখনও দুই পক্ষেরই মন যোগানো কথা বলিতেন না। চণ্ডীচরণের দল যখন গীতা লইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল, গীতার দোহাই দিয়া তাহারা যখন যা খুসি তাই করিতে আরম্ভ করিল,.....লোকে কি করিবে তাহাই ভাবিতেছে, গীতার দোহাই দেওয়ার এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতেছে

না—তখন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার স্বাভাবিক মু-উচ্চ, সরল হাস্যধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই হাসে সমস্ত ভাসিয়া গেল—তিনি ৩৩৩ দলকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। আবার প্রকৃত স্বদেশসেবক দ্বিজেন্দ্রলাল দেশ-ভক্তির ভণ্ডামিও সহ্য করিতে পারিলেন না। তাই তিনি "নন্দলাল" লিখিলেন। কোনও সমালোচক বলেন, "দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে "পেয়েছে ৩৩, ৩৩৩ ৩৩, চণ্ডীমন্ত উত্যাদি"—কিন্তু স্বদেশপ্রেম তাঁহার কাছে উপহাসের বিষয় নহে। যাহারা আজকে উপহাসের হাসির আবরণে লুকাইয়া সহজে বিজ্ঞ নাম পাইতে চাহেন কবি সে শ্রেণীর লোক নহেন। বরং এই "হোতে পাত্তাম" দল তাঁহার কাছে উপহসিত। কবি স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন যে, আপনাদের অসারতা ঢাকিবার জন্য অকল্পনা অলসেরা—

"বোঝাতে চান হিন্দুধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম্ম—
ভীরুতাটা আধ্যাত্মিক ও কুড়েমিটা ধর্ম্ম।"

.....কবির যে সকল পরিহাস তীব্রতার জন্য প্রসিদ্ধ, তাহাতেও দাহের জ্বালা অপেক্ষা, জ্যোৎস্নার শীতলতার অধিক। যাঁহারা কবি যে, চণ্ডীচরণের বল পিতার আশীর্ব্বাদে অনেক ঘুসি ও কাবুটি ভোগ করিয়াছে এবং নন্দলাল বেচারাকে কবি বিলক্ষণ গলাটিপুনির চোটে নাকে খৎ দিয়া লওয়াইয়াছেন; কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, উহারা গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া "আর যেতো না" বলিয়া কবির সহিত ভাব করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। একেলে হিন্দুর টিকিটি গোপনে পিছনে ঝুলিয়াছিল এবং বিলাত ফেরত পরমানন্দে পা ফাঁক করিয়া সিগারেট টানিতেছিলেন, কবি সেই টিকিটি ধরিয়া টানিয়া এবং হুংকারে সিগারেটের ছাইটুকু উড়ে, যে ও মিটারের মুখে উড়াইয়া দিয়া যখন হাসিয়া বলিতেছেন :—

"শুধু লুটিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার
শুধু নাচিব একটু, গাহিব একটু—"

তখন কি কেহ রাগ করিতে পারে? রাগ করে না; বরং ভদ্রতা ভণ্ডামি ছাড়ে, বাঁদরেরা বাঁদরামি পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ কিনা "অমন অবস্থায় পড়লে সবারি মত বদলায়"। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজকে আঘাত করিলেও সমাজ যে তাহাকে বন্ধুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল তাহা আর বিচিত্র কি? আর দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি যে কত লোকপ্রিয় হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিবার কোনও আবশ্যক নাই—পথে ঘাটে নিত্যই আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

অনেকের মতে বঙ্গসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তাঁহার হাসির গানগুলি। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে এরূপ সুবিমল, সুরুচিসঙ্গত উচ্চ অঙ্গের হাসির গান কেহই রচনা করিতে পারেন নাই। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে হাসির গান রচনা করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্বিতীয়। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে হাসির গানে কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত হাসির গানেই যে একটু আলাদা ভাব রহিয়াছে তাহা বলা নহে। কতকগুলি হাসির গানে তাঁহার বিমল মু-উচ্চ প্রাণখোলা দাদা হাসির পরিচয় পাওয়া যায়—আবার কতকগুলি গানে তাঁহার সমবেদনা-কাতর হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়—আবার আরও কতকগুলি হাসির গান রহিয়াছে যেগুলি পড়িতে পড়িতে চক্ষু দিয়া নির্ম্মল অশ্রু বাহির হইয়া আসে। আর দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যে তাঁহার কাহারই রূপান্তরমাত্র একথাও এক তীক্ষ্ণদর্শী সমালোচক বলিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নির্ম্মলচ্ছিন্ন হাস্যরসযুক্ত গানগুলি যথা—'হাসনেন, কৃষ্ণরাধিকা, কালরূপ, প্রায়শ্চিত্ত, বিদ্যুৎবারের বারবেলা' প্রভৃতি গানগুলি ঐ শ্রেণীর নির্ম্মলচ্ছিন্ন জ্যোৎস্নার রচিত। একটা কিছুনা কথায় হাসি সৃষ্টি করা বড় শক্ত; কেবল অশ্লীল ও বিদ্রূপাত্মক কথার যোজনা করিলেই হয় না। শুধুই যদি এঁড়ে গরু পিঁজরা ভেঙে খেজুর গাছে ওঠে, তাহাতে হয় মাতলামি, না হয় গ্রাম্য রকমের তাড়াতাড়ির সৃষ্টি হয়। তানসেন-বিক্রমাদিত্য সংবাদের বিদ্রূপাত্মক কথা যোজনার মধ্যে কাব্যকৌশল আছে। উহার সহজ সমন্বয়বিভ্রাট টুকুতে বেশী আশ্চর্য্য কিছু নাই।

কিন্তু তানসেনের শ্রাদ্ধের কথা বলিয়াই কবি যখন লিখিলেন, "অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ, তাঁর তু' ঘরে গেছে কবে ; আর তানসেন মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন করেই হবে ;" তখন গানের ঝাপাগোড়া, এই কথাগুলি একটা হাসির মজলিস উড়িয়া গেল, আর কিছুই রহিল না। রহিল কেবল কোরাসের "তা দিন্ তাকি" টুকু। বিদ্যুৎবারের বারবেলার প্রতিচ্ছত্রে যে নূতনত্ব এবং পরিহাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি চমৎকার।.....এই কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের যে কত অধিক, তাহা তাঁহার কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতার দৃষ্টান্তে দেখাইতেছি। "আষাঢ়ে"র "কেরাণী" কবিতাটি পাঠকেরা প্রায়শঃ পরিহাস-কবিতা বলিয়া মনে করেন। ইহাতে কবিরও দোষ আছে ; তিনি এমন কবিতার গায়ে "আষাঢ়ে" ছাপ দিয়াছেন। এই অতি ক্ষুদ্র কবিতাটিতে একালকার বঙ্গদেশের চাকুরে পরিবারের চিত্র অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। বাবুর অনুপস্থিতিতে চাকর এক পা কাদা লইয়া বৈঠকে শুইয়া ঘুমাইতেছে এবং পরিশ্রান্ত বাবু কাছারি হইতে ঘরে আসিয়া দেখিলেন :—

"ধুতি গেছে উড়ে—
দিয়েছে কে ছুঁড়ে
এক পাটি চটি বিছানায়, আর এক পাটি আতাকুড়ে।
ঘিউ গেছে বাজারেতে, ঘুঘোয় চাবা কুঁড়ে ;
বাবুর ঘিয়েছে ঘির সঙ্গে মহাতর্ক জুড়ে।"

তাহার পর আবার বলিবার স্থানের দুর্দশা !

"কয়ালের সতরঞ্চে একটা কোদর মাটি।
পুত্রত্বয় গিয়ে
হুঁকো গাছটি নিয়ে
ঘুনসি পোরে তাকিয়েতে কচ্ছেন বসে নৃত্য ;
ঘুমোচ্ছেন তাঁর পার্শ্বে প্রিয় ঔরাবক্তাত ভৃত্য।"

"তারপরে বিদ্যুৎবাবুর বেলাজ খারাপ হইয়া গেল, এবং ঘরে চা, চা শব্দ উঠিল, তখন প্রবন্ধিনীও বাদ গেলেন না। কেন না "সকল সময়ে জ্ঞান থাকে না, তবলা কি অবলা—"। তুলির একটি টানে এত বড় একটা ছবি উজ্জ্বল করিয়া তোলা সহজ-ক্ষমতার কথা নয়।"

সহজ হাস্যরসের সহিত গভীর ভাবের ভাবপূর্ণ সংমিশ্রণ হইয়াছে "সুখসাধ্য" শীর্ষক কবিতাতে।

কবি প্রথমেই বলিতেছেন :—

"আমি কবে মরিব, আমার নিজের খাটে গো
এমনি সে মরিতে যেন পারি ;
চাকরীর জন্যে যেন, আমার নিকটে গো
কেহ নাই করে উমেদারী ;
পাচক ব্রাহ্মণে যেন, বসায় না করে গো
উচ্চ কণ্ঠে হুহুঙ্কার ঘোরে ;
শুনিতে না হয় যেন, কলহ করিয়া গো
খানসামা কি গিয়েছে চলে,
অনল উত্তাপ যদি বাতাস করিয়ো গো
বরফ-শীতল দিও বারি ;
মশা যদি হয় তবে, খাটাইয়া দিও গো,
শ্যামবর্ণ নেটের মশারি ;
নেপি চারু 'মাধাবলা' কবরী কুন্তলে গো
কাছে এসে বসে যেন প্রিয়া ;
একটি পেয়ালা পাই, সুবর্ণ সুরভি গো
চা খাইতে দুগ্ধ চিনি দিয়া ;
রূপসী তালিকা পড়ে একটি কবিতা গো
যার শীঘ্র অর্থ হয় বোধ
গাহিতে হাসির গান, কেহ সে সময় গো
কেহ নাহি করে অনুরোধ।"

কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিজেন্দ্রলাল যে কথাগুলি বলিয়াছেন—তাহা বাস্তবিকই কবির মতন—যে সাধ কবির আকাঙ্ক্ষণীয়।

খুলে দিও দ্বার !—ভেসে পড়ে যেন মুখে এসে
নির্মুক্ত বাতাস, আর আকাশের আলো ;
দেখি যেন তার পরে শস্যভরা পুষ্পভরা
এতদিন যাহাদিগে বাসিয়াছি ভালো ;
আসে যদি মৃদুমন্দ পবনে চামেলি গন্ধ
একবার বসন্তের পিকবর গাহে ;
হয় যদি জ্যোৎস্না রাত্রি ;— আমি ওপারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের আর এক শ্রেণীর হাসির গান রহিয়াছে

যেগুলি পড়িতে পড়িতে হাসের পরিবর্ত্তে নয়ন দিয়া অশ্রুধারা বাহির হইয়া আসে। যেমন—

"পাখি যেয়ে ওরে চাষী, বরং যে ভোর উচিত হাসা
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে তবু আমার মনে জাগে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যে তাঁহার কান্নারই রূপান্তর একথা খুবই সত্য।

হাসির গান ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলালের আর এক শ্রেণীর গানে তাঁহার শান্ত, সমাহিত সৌন্দর্য্যের উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই মহাসুন্দরের উপাসনা নানা কবি নানা বিভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্যসুষমা কবিদের সম্মুখে যেন উলঙ্গ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়—কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিকট প্রকৃতির সমস্ত আবরণ যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়—তাই কবি সাধারণ হইতে বিভিন্নভাবে এই সৌন্দর্য্যের উপাসনা করেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সৌন্দর্য্যোপাসনার বিশেষত্ব এই যে তিনি খাঁটি হিন্দুর প্রাণ, মন ও সংস্কার লইয়া সেই চিরসুন্দরের উপাসনা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই আমাদের হিন্দুর প্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর গানগুলির মধ্যে তাঁহার হিন্দুত্বের প্রকৃত পরিচয় পায়। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলির ভিতরই আমাদের জাতীয় ভাব, আমাদের জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা যেরূপ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে এরূপ আর কাহারও গানেই হয় নাই। শান্তির পরম মঙ্গলময় রূপ নানা কবি নানা বিভিন্নভাবে দেখাইয়াছেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মত হিন্দুত্বের ভিতর দিয়া, আমাদের জাতীয়তার ভিতর দিয়া শান্তির সৌন্দর্য্য কেহই এরূপ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। এই যে অনন্ত সুন্দরের উপাসনা ইহার ফল সেই অদ্বৈতানন্দ স্পৃহা। কিন্তু এই আনন্দ সম্ভোগই' মানবজীবনের চরম ফল নহে। হৃদয়ের পরমা শান্তিই সেই চরম ফল। এই শান্তি ভারতের চিরসাধনার ধন। "শান্তা বৈরুধা তং সুখং নান্যে সুখমস্তি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যে শান্তির বারতা বহন করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা হিন্দুর পাদপীঠে ভক্তকবির ধ্যান-প্রবণ সৌন্দর্য্যোপাসনার পরিচয় দেয়। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গাহিলেন :—

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে
হরশিরবিহারিণি তরঙ্গে
ত্রিপথগামিনি পুণ্যতোয়ে জননি ভক্তবৎসলে

তখন তাঁহার গানের তালে তালে আমাদের হিন্দুর হৃদয়ও আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। এই প্রার্থনার সৌন্দর্য্যানুভূতি ইহা 'ত' হিন্দুর ভারতেরই বাণী। এ আনন্দ যে আমাদেরই আপন আনন্দ ইহার সহিত সুর রাখিয়া আমাদের হৃদয়তন্ত্রী ত'ং স্বতই বাজিয়া উঠিবে। তাই শেষপ্রাণ হিন্দু শুনিয়া আনন্দ পায় যে :—

"কত নগরনগরী ধন্য হইল তব চুমি চরণযুগ যারি,
কত নরনারী ধন্য হইল যা তব পুণ্য সলিলে অবগাহি।
কবিছে ধ্বনি এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ ধরি
কবি সুস্তামল কত মরুপ্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে।"

হিন্দুর সংস্কার লইয়া হিন্দুর মন ও প্রাণ লইয়া এই শ্রেণীর গানগুলির আলোচনা করা কর্ত্তব্য—তাহা না হইলে ইহার অন্তর্নিহিত ধ্যান-প্রবণ শান্ত সৌন্দর্য্যটি অনুভব করিতে পারা যায় না। হিন্দুর সরল সহজ বিশ্বাসই এই শ্রেণীর গানগুলির প্রাণ। মূল কথা আমরা পূর্ব্বেই বহুবার ইহার বলিয়াছি যে দ্বিজেন্দ্রলালের তীব্র স্বাদেশিকতা তাঁহার সমস্ত গানগুলির ভিতরেই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার এই স্বাদেশিকতাই তাঁহার নানা গানের ভিতর দিয়া নানাভাবে বিকশিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে" গানটির ভিতর দিয়া তাঁহার ঐ স্বাদেশিকতাই হিন্দুত্বের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"নারদ-কীর্ত্তন-পুলকিত-মাধব-বিগলিত করুণা করিয়া
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু উছলি পূর্ণঘট অটল অটাপর ধরিয়া
অম্বর হইতে দম শতধার জ্যোতিঃ প্রপাত তিমিরে
নামি ধরায় হিমাচল মূলে বিশিল সাগর সঙ্গে"—

এ বর্ণনা এ বৃত্ত হিন্দু কবির চক্ষে বাস্তবিকই সুন্দর। দ্বিজেন্দ্রলাল যে শান্তিময় আশ্রমে বসিয়া স্বদেশমাতার বাণীপ্রতিমূর্ত্তির চরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন তাহার

অপূর্ব পবিত্র সৌন্দর্যে ও সৌরভে ভারতীয় পাদপীঠ চিরদিনই আমোদিত হইয়া থাকিবে।

"পরিহরি তব সুখস্পর্শ যখন যা শারিত অতিথ শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব বুলিব সুখি মম নয়নে
বরিষ শান্তি মম পথিত প্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
যা ভারতরথি, ভারতি, সুরধুনি, কলকল্লোলিনি সঙ্গে—"

কবির এই সার্থক স্বীকারোক্তি পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এ আকাঙ্ক্ষা যে কেবল কবিরই আকাঙ্ক্ষণীয় তাহা নহে—হিন্দুর ভারতের প্রত্যেক নরনারীরই এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা। আমাদের জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা কবির বাণীতে অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর গানগুলি একেবারে আমাদের জাতীয় হৃদয়ের ভিতর স্থান পাইয়াছে। অসীম মুক্ত সৌন্দর্যের এরূপ ভক্তিপূর্ণ প্রকাশই এই জাতীয় গানগুলির বিশেষত্ব—ভক্তির চিরসুন্দর অমৃতনিস্যন্দিনী ধারাটিই এই শ্রেণীর গানগুলির প্রাণ।

প্রবল সৌন্দর্যানুভূতি যে দ্বিজেন্দ্রলালকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল তাহারও পরিচয় আমরা তাঁহার অনেক গানের ভিতর পাই। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার অমূল্য নাটকাবলীর মধ্যে যে সমস্ত গানগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবল সৌন্দর্যলিপ্সার পরিচয় প্রদান করে। নাটকীয় গীতনিচয় যে দ্বিজেন্দ্রলাল কেবল তাঁহার নাটকের জন্যই লিখিয়াছেন আমাদের তাহা মনে হয় না। ঠিক জানি না; তবে আমাদের মনে হয় যে দ্বিজেন্দ্রলালের মনে একটি সুর আসিত—তার পরে তাঁহার ভাব সেই সুরটিকে অনুসরণ করিত। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি এইরূপ বিক্ষিপ্তভাবে নিজে নিজেই এক একটি পরিপূর্ণভাবে রচিত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সেইজন্য দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় অধিকাংশ গানই নিজ নিজ পরিপূর্ণতায় সম্পূর্ণ। সুতরাং তাঁহার নাটকসমূহে সন্নিবেশিত গানগুলি আমরা কেবল নাটকীয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি না। দ্বিজেন্দ্রলালের অপরাপর গানগুলির ন্যায় সেগুলিও তাহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। এই জন্যই নাটকীয় গানগুলির ভিতরেও কবির সার্বভৌমিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে—কবির সৌন্দর্যানুভূতি, সৌন্দর্যোপাসনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হইতে কি সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে" তাহা শুনিবার জন্য কবির চিত্ত যে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় আমরা কবির নাটকীয় গানগুলির ভিতরেই পাই। এই যে বর্ণগন্ধগীতবিচিত্রা বাধাবন্ধবিহীনা বিশ্বপ্রকৃতি, ইহার কি অসীম সৌন্দর্য-সম্পদ্! আমার পদতলসুচ্চিত তৃণরোমাঞ্চিত ধরণী হইতে কোটি কোটি যোজন সুদূরবর্তী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে এই যে অনন্ত ব্যবধান ইহার প্রত্যেক বিন্দু কত না অসংখ্য বিবিধ শোভাতরঙ্গে নিত্য লীলায়িত হইতেছে। সুন্দর ফুলটি দেখিয়া, সান্ধ্য তারকার স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখিয়া, শিশুর সরল হাসি দেখিয়া, সঙ্গীতের সুর শুনিয়া মনে কতই আনন্দ হয়, কিন্তু এই সমগ্র সৌন্দর্য প্রাণে অনুভব করিতে পারিলে না জানি কি অনন্ত আনন্দের বিপুল আবেগে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিশিদিন যুগ যুগ ধরিয়া এই অশরীরী সৌন্দর্যরাশি নানাবর্ণে ঘনীভূত হইয়া, নানাসৌরভে আমোদিত হইয়া আমাদের হৃদয়কে তরঙ্গিত করিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু কয়জন আমরা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারিতেছি? কয়জন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হইতে কি সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে?" আমাদের কয়জনের কর্ণে ঐ চিরসুন্দর সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে? আমরা যে বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তনী সঙ্গীত বুঝিতে পারি না, শুনিতে পাই না বা কান পাতিয়া শুনিতে জানি না তাহার কারণ আমরা বিশ্বপ্রকৃতিকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে পারি নাই। বোধার ইঙ্গিত ভাষা আত্মীয়ের কাছে সর্বদা বোধগম্য। মূকপ্রকৃতি যে আমাদের নিতান্ত আত্মীয়া ইহা বুঝিলে তাহার ঐ নীরব ইঙ্গিত ভাষা বুঝিতাম। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবল সৌন্দর্যলিপ্সার ফলেই তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে আপন পরমাত্মীয়া বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি নীরবের ভিতরে অসীমের ডাক শুনিতে পাইয়াছেন।

কে ডাকে উদাস তানে, কাতর প্রাণে
আয় চলে আয় আমার পাশে

এই অসীমের ডাক যে দ্বিজেন্দ্রলাল কেবল শুনিতেই পাইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি উহাকে পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ের ভিতর অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সেই চিরন্তনী ডাকের সম্যক্ অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাই তিনিও সেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গীতের সহিত সুর রাখিয়া ডাকিতেছেন :—

"ওরে আয়রে ছুটে আয়রে তোরা
যেথা নাইক মৃত্যু, নাইক জরা
যেথায় বাতাস গীতি-গন্ধে ভরা
চির জোৎস্না মধুমাসে।"

এই যে অপরীরী আনন্দসিন্ধু যোগ পাথার ব্যাপিয়া নানাভাবে তরঙ্গিত লীলায়িত হইতেছে এই আনন্দ-সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া দিব্যদৃষ্টিবলে কবি অনুভব করিতেছেন :—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি

ইহারই ঘনীভূত বিকাশ এই বর্ণগন্ধগীতময়ী বিশ্বলক্ষ্মী। আমরা ভ্রান্ত, তাই অখণ্ড ছাড়িয়া খণ্ডের, অনন্ত ছাড়িয়া সান্তের উপাসনা করি। তাই বিশ্ববীণায় বিশ্বনাথের যে সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে তাহারই সহিত সুর রাখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ডাক, সেই অমরবাণী আমাদিগকে শুনাইতেছেন :—

"কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ ?
ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ
ওরে সেই সে পরমানন্দ
যে আমারে ভালবাসে।"

এই যে পরিবর্ত্তনশীল, লীলাচঞ্চলমুখর, কলাঙ্কুর বিশ্বজীবন, ইহার মধ্যে একমাত্র নিত্যসত্য শুধু ভালবাসার—প্রেমের। মধ্যাকর্ষণ যেমন সমস্ত বস্তুকে ভূকেন্দ্রে আকর্ষণ করিতেছে মানব জগতে সেইরূপ প্রেম সমস্ত মনকে অন্তরাত্মার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। সমস্ত জীবের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা, বাসনা সেইখানে যাইয়া চরম শান্তিলাভ করিতেছে। নারীর প্রতি পুরুষের ও পুরুষের প্রতি নারীর যে অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষা বা মিলন ব্যাকুলতা দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ভাষায় মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে সে অনুরাগ বা আকাঙ্ক্ষা পার্থিব ভোগস্পৃহাকলঙ্কিত নহে। ইহাও সেই মহাসৌন্দর্য্যের উপাসনা। প্রত্যেক খণ্ডবস্তুতে যেটুকু সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত দেখিতে পাই তাহা সেই অসীম সৌন্দর্য্যের অংশ মাত্র। আমার সমস্ত খণ্ডবস্তুতে ভিন্ন প্রকারের সৌন্দর্য্যই প্রতিফলিত হইয়াছে। গ্রে তটিনীর সৌন্দর্য্য সমুদ্রে নাই, ফুলের সৌন্দর্য্য পাতায় নাই, গানের সৌন্দর্য্য ভাষায় নাই, শিশুর সৌন্দর্য্য যুবায় নাই, নারীর সৌন্দর্য্য নরে নাই। ভিন্ন ভিন্ন সসীম সৌন্দর্য্য মিশিয়া এক হইয়া অসীম হইতে চাহে। অসীমেই তৃপ্তি। নর তাহার সৌন্দর্য্য নারীর সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিতে চাহে। এই যে অসীমের প্রতি সসীমের অনুরাগ, এই যে সুরে মিশিয়া পূর্ণ হইবার তৃপ্তি-কামনা, ইহাই ভালবাসা—ইহাই প্রেম। নরনারীর বিশুদ্ধপ্রেমে ও ভগবৎপ্রেমে কেবল মাত্রার তারতম্য। এই জন্যই রাধাকৃষ্ণের অতুল্য প্রেমলীলায় ভগবানের প্রেমের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। দাম্পত্যপ্রেম বিশ্বপ্রেমের প্রথম সোপান। এই যে ভালবাসা—এই যে প্রেম, ইহাই ত আনন্দ, তাই দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন :—

"ওরে সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে।"

এই আনন্দের প্রকাশ দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলির ভিতর নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। নরনারীর প্রেমের ভিতর দিয়া, প্রকৃতির প্রেমের ভিতর দিয়া, স্বদেশপ্রেমের ভিতর দিয়া নানাভাবে এই আনন্দের প্রকাশ দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলির ভিতর মূর্ত্তিমতী হইয়াছে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়া ছেন :—

"আজি আমার যা কিছু আছে
এনেছি তোমার কাছে
তোমায় করিতে সব দান"

এই আনন্দ-সাগরের তীরে দাঁড়াইয়াই দ্বিজেন্দ্রলালের সৌন্দর্য্যানুভব অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

"ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল কলরব
ভেসে আসে রাশি রাশি
জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি
ভেসে আসে পাপিয়ার তান।
আজি এমন চাঁদের আলো
যদি হয় সেও ভালো
সে মরণ সুরগ সমান"—

ক্রমশঃ কবির কণ্ঠ নীরব হইয়া আসিতেছে। পরিশেষে আবিষ্টের গুঞ্জরণের মত তিনি বলিতেছেন—

"আজি সব ভাষা, সব বাক্
নীরব হইয়া যাক্
প্রাণে শুধু মিশে থাক্ প্রাণ—"

এই খানেই পরিপূর্ণ আনন্দের বিকাশ। মহানন্দে মহাগীত গাহিতে গাহিতে জীবন-তরীকে এই আনন্দসাগরে ভাসাইয়া দিবার জন্যই দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেছেন :—

আজি গাও মহাগীত মহাআনন্দে
বাজে শুদ্ধ মধুর ছন্দে
পাল তুলে দাও ভেসে যাক্ সুখে
সাগরে জীবনতরণী।"

আমরা প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছি যে দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-হৃদয়ের পরিচয় তাঁহার রচিত গীতাবলীর ভিতরেই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার অপূর্ব্ব আলোক-সম্পাতে তাঁহার গানগুলি অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্যসম্পদে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এইবার আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের তীব্র স্বদেশপ্রীতিমূলক কয়েকটি গানের উল্লেখ করিব। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সমস্ত গানের ভিতরেই যে অল্পাধিক মাত্রায় তাঁহার স্বাদেশিকতা বর্ত্তমান সে কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সত্যসত্যই দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশের জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় দ্বিজেন্দ্রলালের মত অকৃত্রিম স্বদেশসেবক আমাদের দেশে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের 'জগজ্জননী ভারতবর্ষ'কে যেরূপ আকুল অকপটভাবে "আমার দেশ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এরূপ করিয়া আর কেহ ত' তাঁহাকে ডাকিতে পারে নাই। "আমার দেশ" এই দুটি সহজ সরল কথার ভিতর দ্বিজেন্দ্রলাল যে তাঁহার প্রাণের কত কথা ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। "আমার দেশ" এই দুটি ছোট কথার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রেমের পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। উপরে দ্বিজেন্দ্র-লালের হৃদয়তন্ত্রীর যে আনন্দের সুরটির আভাস আমরা দিলাম, সে সুরও দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়বীণার মূলসুরের সহিত ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই "আমার জন্মভূমির" প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই—

"ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

পূর্ব্বের সৌন্দর্য্যানুভূতিই কবিকে স্বদেশের অনুপম অবারিত সৌন্দর্য্য জ্যোৎস্নার ভিতর ছাড়িয়া দিয়াছে—এই সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিয়াই কবি দিব্যদৃষ্টিবলে স্বদেশের সৌন্দর্য্যের স্বরূপ দেখিতে পাইলেন—তাই পরক্ষণেই কবি বলিতেছেন—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি—"

এই তীব্র স্বাদেশিকতা দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক গানের পরিণতি। বিশ্বসৌন্দর্য্যকে দ্বিজেন্দ্রলাল অস্বীকার করেন নাই কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল সমস্ত সৌন্দর্য্যের অধিকারভূতা জগজ্জননী ভারতলক্ষ্মী জন্মভূমির সৌন্দর্য্যকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। তাই ভারতবর্ষের কোনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট আর আত্মগোপন করিয়া রহিল না। সমস্ত সৌন্দর্য্যই অপূর্ব্ব শোভাসম্পদে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের বক্ষের সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। স্বদেশ প্রেমিকের নিকট স্বদেশের মূর্ত্তি আরও উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিল। একেই ত শীমাদের সুজলা, সুফলা শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির সুচারু সৌন্দর্য্য মানুষের মন মুগ্ধ করে—তাহার উপর স্বদেশপ্রেমিকের চক্ষে সে সৌন্দর্য্য ত সত্য-সত্যই "সকল দেশের সেরা"-রূপেই প্রতিভাত হইবে।

"দেশের কুকুর পুষি, বিদেশের ঠাকুর কেলিয়া" একখানির প্রতি বর্ণে বর্ণে সফলতা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে ঘটিয়াছিল। "সকল দেশের রাণী"র বর্ণনায় দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যই বলিয়াছেন :—

"এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে—"

পরিশেষে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেছেন—

"ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি—"

এ বাণী যে আমাদের জাতীয় জীবনেরই বাণী তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশকে যেরূপভাবে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছেন এরূপ ভক্তিপূর্ণ প্রকাশ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। আমাদের জননী জন্মভূমি যে সমস্ত বিশ্বেরই চিরারাধ্যা, সে কথা তিনি তাঁহার "ভারতবর্ষ" শীর্ষক বন্দনাগীতিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

"যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ
সে দিন তোমার প্রভাত রবির উদিত হইল গভীর রাত্রি
বন্দিল সবে—"জয় মা জননি জগত্তারিণি জগদ্ধাত্রি।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ
গাইল জয় মা জগমোহিনী জগজ্জননি ভারতবর্ষ—"

এই বন্দনাগীতিতে দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষের যে অপরূপ সৌন্দর্য্যকে মহিমান্বিত করিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক ব্যতীত আর কাহারও নিকট এরূপ ধরা পড়ে না।

"সদ্যঃ স্নানসিক্তবসনা চিকুরনিদ্ধ শীকর স্নিগ্ধ
ললাটে পরিয়া বিমল হাস্যে অমল কমল আনন দীপ্ত
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র
মন্দ্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে অনন্ত মন্ত্র"

"শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট সাগর ঊর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পরিপূর্ণ যমুনা গঙ্গা
কখন বা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে

"উপরে পবন প্রবল স্বননে সূক্ষ্মে গরজি অবিশ্রান্ত
লুটায়ে পড়িছে শিখ কলরবে চুমি তোমার চরণ প্রান্ত
উপরে জলদ হাসিয়া বক্ষ করিয়া প্রলয় সলিল বৃষ্টি
চরণে তোমার কুসুমকানন কুসুম গন্ধ করিছে সৃষ্টি"

"জননি তোমার বক্ষে শান্তি কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি
হস্তে তোমার বিতর অন্ন চরণে তোমার বিতর মুক্তি
জননি তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না ব্যথা
জগৎপালিনী জগত্তারিণী জগজ্জননী ভারতবর্ষ—"

প্রকৃত সাধক ব্যতীত এরূপভাবে কেহ ভারতমাতার বন্দনাগীতি রচনা করিতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃত পক্ষেই সাধক ছিলেন—স্বদেশ-সেবা তাঁহার সাধনার বস্তু ছিল। তিনি যে আজীবন তাঁহার এই সাধনাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া এই কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁহার "ভারতবর্ষ" শীর্ষক বন্দনা গীত দুইটি যে অন্তরবিশেষ তাহা ভাবের গভীরতা ও তেজস্বিতা এবং শব্দের লালিত্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। একটি আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি অপরটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই দুটি গানে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের সাধনার পবিত্র কমলাচরণ দেখিতে পাই—এই দুইটি গান দ্বিজেন্দ্রলালের সাধনার সর্ব্বপ্রথম স্তর।

ভারত আমার ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র
মহিমায় তুমি জন্মভূমি মা
এশিয়ার তুমি তীর্থ ক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগৎ-জননী
দর্শনে উপনিষদে দীক্ষা

দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প
ধর্ম্মভক্তি কর্ম্ম শিক্ষা।

• • •

ভগবৎ-ইচ্ছা পাইল স্বরং
বলবান্ সেই জাতির সঙ্গে
ভগবৎপ্রেমে মাতিল গৌর
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র
প্রচার করিল নীতির ধর্ম্ম
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস
প্রচার করিল সোঽহং ধর্ম্ম।

• •

আর্য্য ঋষির অমর্ত্য সতীর
উঠিল যেখানে স্নেহের ডাকে
নহ কি মা তুমি সে ভারত ভূমি
নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র
তাঁদের গরিমা স্মরিয়া মর্ম্মে
চলে যাব শির করিয়া উচ্চ
যাদের গরিমায় এ অতীত
তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।

• • •

ভারত আমার ভারত আমার
সকল মহিমা হৌক খর্ব্ব
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ
লুপ্ত হয় এ মানুষ বংশ
যাদের মহিমায় এ অতীত
তাদের কখনো হবেনা ধ্বংস।

• • •

চ'খের সামনে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ
আসিব নূতন ভাবের রাজ্যে
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ

এ দেব ভূমির প্রতি তৃণ পরে
আছে বিধাতার করুণাদৃষ্টি
এ মহাজাতির মাথার উপরে
করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।

•

ভারত আমার ভারত আমার
কেবলে মা তুমি কর্ম্মের ধাত্রী
ধর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী
ধর্ম্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

উদ্ধৃত "ভারতবর্ষ" শীর্ষক বঙ্গনারীটির কোনওরূপ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যায় না; শুধু পড়িয়া উহার মর্ম্মকথাটি হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশকে যে চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন সেরূপ দিব্যদৃষ্টি লোকে সহজে লাভ করিতে পারে না—অনেক সাধনার, অনেক আরাধনার প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলাল একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন এবং তিনি তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন; স্বদেশমাতার বাণীমূর্ত্তি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাণে প্রাণে পরিপূর্ণভাবে অনুভব করিয়াছিলেন।

যাহা হউক এইবার আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীতগুলির দ্বিতীয় স্তরের বিষয় আলোচনা করিব। পবিত্র জগন্মাতৃচরণের ধারা জননী জন্মভূমির বন্দনা গাহিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল প্রশ্ন করিলেন :—

"বল আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ
কেন গো মা তোর শুষ্ক বয়ান, কেন গো মা তোর মলিন বেশ
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ
শতকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ—"

উত্তরে কবি নিজেই শুনাইতেছেন :—

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ—"

সন্তানই ত শতকোটি মিলিত কণ্ঠে যখন উচ্চৈঃস্বরে "আমার দেশ" গাহে তখন প্রকৃত পক্ষেই মনে হয় :—

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ—"

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্য মনোমোহিনী কল্পনার তুলিকা-স্পর্শে যে আশার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন

তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব—বাস্তবিকই সুন্দর। কিন্তু এ দৃশ্য আরও সুন্দর যে কবি যখন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন :—

"আমরা ডুবাব না তোর কালিমা
মানুষ আমরা—নহি ত মেষ
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার-
আমার দেশ"

জাতীয়তার এরূপ পরিপূর্ণ সুন্দর প্রকাশ দ্বিজেন্দ্রলালের গান ব্যতীত বঙ্গসাহিত্যে আর কিছুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় এই স্বদেশপ্রেমের তীব্র পরশোত্ত নিত্য অবিরত প্রবহমান ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় গানগুলি বঙ্গদেশে জাতীয়তার নবযুগের সূচনা করিয়া দিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার এই গানগুলি রচনা করিয়া দেশকে আত্মচেতনা দিয়া গিয়াছেন। আমাদের জাতীয় চিন্তার ধারা, ভাবের উৎস, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, আশার কল্পনা দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলির ভিতর তাহাদের বাণীর সন্ধান পাইয়াছে। স্বদেশকে উন্নত করিবার জন্য সাহিত্যের যে শক্তি দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা পরিপূর্ণভাবে দান করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যসেবার মূল উদ্দেশ্য দেশের সেবা। দ্বিজেন্দ্রলাল দেশের সেবা করিবার জন্যই, দেশের উন্নতি বিধানের জন্যই, দেশকে উদ্বোধিত করিবার জন্যই সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন—তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অতি মহৎ—তিনি ছিলেন আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী—যশ, মান ও যশঃ পাইবার জন্য সাহিত্যের সাধনা তিনি করেন নাই। "আমার ভাষা" গানে দ্বিজেন্দ্রলাল এই কথাই বলিয়াছেন :—

"জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহিনা অর্থ, চাহিনা মান,
যদি তুমি দাও, তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান।"

অথচ তাই বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ভাষাজননীকে যে উপেক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে—তিনি ভাষাজননীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন আর ভক্তি গদগদকণ্ঠে গাহিতেছেন :—

"আজি গো তোমার চরণে জননী আনিয়া অর্ঘ্য করি যে দান
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত-শতেক-ভক্ত-বীণের গান।
মন্দির রচি যা তোমার লাগি
পরসা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি
তোমারে পূজিতে গিয়েছি জননী দেবের
দ্বারে ভিখারিণী হয়ে।"

পরিশেষে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেছেন :—

"চাহি না ক কিছু তুমি মা আমার
এই জানি শুধু নাহি জানি আর
তুমি গো জননি হৃদয় আমার
তুমি গো জননি আমার প্রাণ।"

ইহার অধিক আর কোনও বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক বলিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। দেশের অতীতের আর্য্য বীরত্বে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেখাইয়াছেন :—

"যেথায় পাহাড়, উড়িছে যাহার
রক্ত পতাকা উচ্চ শির"

দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভাবে, যে ভাষায় অতীতের বীরত্বকাহিনী গাহিয়াছেন, যে গভীর টঙ্কারে তিনি নিনাদ করিয়া উঠিয়াছেন তাহাতে আমাদের জাতীয় হৃদয় সত্যসত্যই উৎসাহে, আনন্দে, উদ্দীপনায় প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গাহিয়া উঠিয়াছেন :—

"———রঞ্জিত করি কাপায় তীব্র
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্ত বীর।"

তখন গানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্তও ধমনীর ভিতর প্রতও উন্নত নর্ত্তনে নাচিয়া উঠে—সমস্ত দেহ, মন ও শরীর লইয়া আত্মহারা সচেতনে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করি। দ্বিজেন্দ্রলালের তেজোনিনাদে আমরা সত্যসত্যই চকল হইয়া উঠি। যে কথায়, যে শব্দে, যে ভাষায়, যে ছন্দে, যে সঙ্গীত দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন তাহা একেবারেই অপূর্ব্ব।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতির চরমবাণী "আমার তোরা মানুষ কর।" ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বশেষ কথা। তিনি পূজার দুইটি কথাতে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। ঘোটের উপর যদি দেশকে উন্নত এবং জাগ্রত করিতে চাহ

তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে শরীরে, মনে এবং চরিত্রে 'মানুষ' হইতে হইবে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে। ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বশেষ কথা।

পরিশেষে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নিজের গানের সম্বন্ধে, নিজের ছন্দ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন আমরাও তাহাই বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি :—

"যাও এ ছন্দ তবে পড় মহত্বের ঐ
চরণারবিন্দ জড়ায়ে ;
ওরে উর্দ্ধে উঠি,—আরও উর্দ্ধে উঠে পড়
সমগ্র এ বঙ্গ ছড়ায়ে।"

উপসংহারে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরসম্বন্ধে আমরা দুই একটি কথা বলিব। দ্বিজেন্দ্রলালের সুর লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক এবং বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে—দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতের জাতিপাত করিয়াছেন কি না—এসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে—ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের সুরসম্বন্ধে বলিবার সমস্ত কথাগুলিই আলোচনাকারিগণ বেশ সুন্দর এবং সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের কথাই উদ্ধৃত করিয়া নিজ আমাদের মত প্রকাশ করিব।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি যে কত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রমাণ আমরা নিত্যই পথে ঘাটে দেখিতে পাইতেছি। আর গানের ভিতর হইতে সুর বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা না থাকারই সামিল। কথা এবং সুর এই দুই লইয়াই গান। কবিত্বের প্রাণ যদি ধ্বনির উপর নির্ভর করে তা'হলে গানের প্রাণ যে সম্পূর্ণ সুরের উপর নির্ভর করবে সে বিষয় কোনও দ্বিমত হতে পারে না। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুর যদি গুণিসমাজে অনাদৃত এবং অগ্রাহ্য হয় তা'হলে তাঁর গানও বাঙ্গালীর নিকট অনাদৃত এবং অগ্রাহ্য হত। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, সে গান বঙ্গদেশে অতি আবালবৃদ্ধবনিতা—যাবতীয় লোক—এমন কি যিনি গানের 'গা'ও জানেন না তিনিও ঘরে নিতে পারেন যে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীতসম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ এবং মূর্খ ছিলেন না ..... ৺দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের হাস্যরস কতকটা তাঁর কথার আর কতকটা তাঁর সুরের উপর নির্ভর করে বলা কঠিন।.....সঙ্গীতে কোনও বিশেষ রস ফুটিয়ে তুলতে হলে, সেই রসের অনুরূপ সুরের আবশ্যক। করুণ রসের প্রকাশের জন্য সুরও করুণ হওয়া চাই—এবং বীর রসের প্রকাশের জন্য সুরও রুদ্র হওয়া চাই। কিন্তু এ বিষয়ে হাস্যরসের একটু বিশেষত্ব আছে। অনুরূপ কি বিরূপ সকল রস সুরেই গুণিব্যক্তির হাতে হাস্যরস সহজে ফুটে ওঠে। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গানের সুর সম্বন্ধে যে এই উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন তা' দুচারটি উদাহরণের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। সুরের এবং কথার স্পষ্ট এবং ঘোর অসামঞ্জস্য যে সহজেই হাসির উদ্রেক করে তার প্রমাণ ৺দ্বিজেন্দ্রলালের

"এক যে ছিল শেয়াল, তার বাপ ছিল্‌ল শেয়াল"
"বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্‌টাপ্"
"পুরাকালে ছিল গুনি, দুর্জ্জনা নামেতে মুনি"
"মন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ—"

প্রভৃতি গান। এ সকল গানের কথা যেমন হাল্‌কা সুরও তেমনি ভারি। হিন্দু সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর উপর ৺দ্বিজেন্দ্রলালের কতটা অধিকার ছিল, এই সকল গানের সুরই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সকল সুর যে খাঁটি দরবারি শুধু তাই নয়, চং ও খাঁটি কালোয়াতি।

"এক যে ছিল শেয়াল" হচ্ছে পূরবীর মামুলি শেয়াল।

"বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্‌টাপ্" কানাড়া ও খাম্বাজের মিশ্রণে যে সুর হয় তাই—অর্থাৎ মেঘমল্লার।

"পুরাকালে ছিল গুনি, দুর্জ্জনা নামেতে মুনি"—দরবারি কানাড়া। এবং "মন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ"—বিশুদ্ধ পরজ। এ সকল সুর অবলীলাক্রমে গাওয়ার ভিতর যে কত শিক্ষা এবং কত সাধনা আছে তা' যিনি সঙ্গীতের যত্ন চর্চ্চা করেছেন তিনিই জানেন। এবং ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু-মাত্রেই জানেন যে তিনি তাঁর স্বরচিত এই গানগুলি কতদূর নির্ভুল তালে মানে লয়ে সুরে গাইতেন।

"৺দ্বিজেন্দ্রলাল যে তাঁর সকল গানেই ওস্তাদি সুর দেন নি, তার কারণ তাঁর এজ্ঞান ছিল যে হাস্যরসের অনুরূপ সুরের সৃষ্টি করতে হলে আমাদের তৈরী রাগ-রাগিণীকে একটু বাঁকিয়ে চুরিয়ে নূতন করে গড়ে নেওয়া আবশ্যক।

তিনি তাই প্রচলিত সুরের পরিচিত আকার পরিবর্ত্তন করে তার নূতন আকার দিয়াছেন, তার বিকারসাধন করেন নি। "বিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন—নবরত্ন ন ভাই"—এই গানটিতে কথার অনুরূপ সুরেরও আগাগোড়া একটা বে-পরোয়া ভাব আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এগানটি শুনলে স্বয়ং তানসেনও মুখভার করা দূরে থাক্ হাস্য সম্বরণ করতে পারতেন না। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত এধরণের সুরের আর কোনও উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—কেননা তাঁর অধিকাংশ গান এই ধরণের।

৺ দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য একটি নূতন ঢঙের সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তাতে করে হিন্দুসঙ্গীতের ধর্ম্ম নষ্ট হয়নি—কেন না ওস্তাদি চঙ্ তারতবর্ষীয় সঙ্গীতের একমাত্র চঙ্ নয়। দেশভেদে যুগভেদে এদেশে নানাচঙের উৎপত্তি হয়েচে। যাঁদের সঙ্গীতের দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত রীতির সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে দক্ষিণী চঙ্ এবং হিন্দুস্থানী চঙ্ এত বিভিন্ন যে দুই একজাতীয় সঙ্গীত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। অথচ এ দুই যে মূলতঃ একজাতীয় বিশেষজ্ঞ মাত্রেই তা' জানেন। তার পর এই হিন্দুস্থানী গানেরও প্রদেশভেদে সুরের চেহারা বদ্‌লে যায়। আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে বিষ্ণুপুরে একটি নূতন ঢঙের সৃষ্টি হয়েছে যা দেশে বিদেশে বিষ্ণুপুরী চঙ্ বলে পরিচিত। এ সকল চঙে অবশ্য সনাতন সুরতাল রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালীর যা' নিজস্ব বস্তু কীর্ত্তন—তাতে রাগরাগিণীকে এতটা রূপান্তরিত করা হয়েছে যে সে গান শুনে অনেক ওস্তাদে কানে হাত দেন। কিন্তু ওস্তাদেরা স্বীকার না করলেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বাঙ্গালার কীর্ত্তন হিন্দু-সঙ্গীত। সুতরাং ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের রাগরাগিণীর উপর হস্তক্ষেপ করায় তাঁর অহিন্দুত্বের পরিচয় দেননি—পরিচয় দিয়েছেন শুধু তাঁর বাঙ্গালীত্বের।

৺ দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের বিশেষত্ব এবং নূতনত্ব এই যে, সে সুরের ভিতর অতি সহজে একটি বিলেতি চাল এসে পড়েছে। আমার মতে সঙ্গীতসম্বন্ধে ৺ দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তাঁর প্রতিভার বলে আমাদের রাগ-রাগিণী বিলেতি চাল এত সহজে অঙ্গীকার করেছে যে, তাঁর সুরের এই বিলেতি ভঙ্গী আমাদের কানে মোটেই বেখাপ্পা লাগে না। আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে দেশী গান-বাজনাকে বিলেতি ছাঁচে ঢালবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিলেতি Concertএর অনুকরণে আমাদের দেশে যে সব "ঐকতান-বাদ্যের" রচনা করা হয়েছে তা' শুনে যুগপৎ হাসি ও কান্না পায়। কারণ, এ সকল তানে ও গানে আর যাই করা হয়ে থাক দেশী ও বিলেতি সঙ্গীতের ঐক্যসাধন করা হয়নি। তার কারণ কেবলমাত্র mechanical উপায়ে এইরূপ ঐক্যসাধনের চেষ্টা বৃথা। mechanical পদ্ধতি হচ্ছে যোড়াতাড়া দিয়ে গড়্‌বার পদ্ধতি। যোড়াতাড়ার সাহায্যে পৃথিবীতে আর যাই হোক আর্ট হয় না। আর্টের সৃষ্টির পদ্ধতি হচ্ছে organic. ৺ দ্বিজেন্দ্রলালের হিন্দুসঙ্গীতের ন্যায় ইউরোপীয় সঙ্গীতেরও পরিচয় ছিল। তাঁর অন্তরে এই দুয়ের অলক্ষিত মিলনের ফলে তাঁর সুরের সৃষ্টি।..... "আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে "ঐ দেখা যায় আমার বাড়ী চারিদিকে বাদলের বেড়া" এই গানের সঙ্গে কথায় এবং সুরে, "আমার দেশ" এর যে প্রভেদ বাঙ্গালার সেকেলে গানরচয়িতাদের সঙ্গে ৺ দ্বিজেন্দ্রলালের সেই প্রভেদ। তিনি বলেন যে, বহুত কারও কারও মতে "আমার বাড়ী" "আমার দেশ" অপেক্ষা অধিক মধুর। কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে "আমার দেশ"এ যে ওজস্বিতা আছে "আমার বাড়ী"তে তার বিন্দুমাত্রও নেই। তাঁর মতে এই ওজোগুণের সমাবেশই ৺ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার বিশেষত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব। ইংরাজি কাব্য এবং ইংরাজি সঙ্গীতের শিক্ষার প্রসাদেই ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল এই ওজোগুণ লাভ করেছিলেন। "আমার দেশ"এর সুর খিঁচি। কিন্তু এ খিঁচি এবং বাঙ্গলা খিঁচি তে তফাৎ এত বেশী যে প্রচলিত চঙে গান গাইতে গেলে এর সুর একেবারে এলিয়ে পড়বে। অথচ "আমার দেশ"এর খিঁচির সকল লক্ষণ বজায় আছে এবং তার তালও পুরাদস্তুর একতালা। অতএব একথা সাহস করে বলা যেতে পারে যে আমাদের রাগরাগিণী ৺ দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে বেবেচুরে গেলেও তেজেচুরে যায়নি। রাগরাগিণীর উপর অসাধারণ অধিকার

না থাকলে তাহাকে নিয়ে যা খুসি তাই করা যায় না। অধিকাংশ গায়ক এবং বাদক অত্যন্ত বিদ্যাতেই পুনরাবৃত্তি করেন—কেননা সঙ্গীতে নূতন সুরের কিম্বা নূতন ছন্দের সৃষ্টি করবার জন্য প্রতিভা চাই। ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু-সঙ্গীতকে যে একটি নূতন পথে চালিতে সক্ষম হয়েছেন তা'তে করে তিনি সঙ্গীতবিষয়ে অনভিজ্ঞতার নয়, প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের সুরসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের মত তাঁহার "৺ দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় কথিত" প্রবন্ধ হইতে আমরা উপরে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। আশা করি ইহাতে আমাদের বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অমরবন্ধু ঘোষ মহাশয়ও এই শ্রেণীর সুরের আলোচনাতেই বলিয়াছেন, "বাঙ্গলার সুরকে যে তাঁহার নিজের পথে চালনা করিয়াছেন ও তাহার স্রোত জোরে বহাইয়াছেন—তাহার কারণ তিনি বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গলার হিন্দুসঙ্গীতের ধারা প্রবহমান রাখিতে হইলে, তাহাকে বাঙ্গলার মাটি দিয়াই বহিতে দিতে হইবে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত আমরা তাহার পরিচয় ধ্রুপদে ভজনে, খেয়ালে লাউনিতে সমান পাই—ও সকলেরই মূলতঃ চং এক, ঢাল এক। হিন্দি ভাষার সহিত বাঙ্গলা ভাষার যে প্রভেদ—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ও আমাদের গানের সঙ্গে সেই প্রভেদ—অর্থাৎ উভয়ে এক জাতীয় হইলেও এক দেশের নয়, এক গোত্রের হইলেও এক বংশের নয়। সংস্কৃত ভাষা চর্চ্চা করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বাঙ্গলা ভাষার সেবা যেমন আমাদের পক্ষে অকর্ত্তব্য নহে তেমনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চ্চা করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য হইলেও বাঙ্গলা সুরে বাঙ্গলা গান রচনা করা আমাদের পক্ষে অকর্ত্তব্য নহে। বাঙ্গলা গান রচনা করায় হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট হয় না—কিন্তু তাহা না করিলে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব নষ্ট হয়।"

পূজনীয়া শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী বলেন, "দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর হাসির গানে যে ইংরিজি কায়দা মিশিয়েছেন তা' বিষয়ের উপযোগী ও ভাবের সহায় বলেই আমার বিশ্বাস। স্বদেশী গানে যে ধুয়া, বা গানের প্রত্যেক কলির শেষভাগ হাজারসুরে একসঙ্গে গাওয়ার ইংরাজী রীতি প্রচলিত হয়েছে, তার সূত্রপাত আগে হলেও দ্বিজেন্দ্রলালই তার বহুল প্রচার করেছেন। তাঁর স্বদেশী গান অনেকে একসঙ্গে গাইতে পারবে বলে বোধ হয় তিনি ইচ্ছা করেই তাতে তাল ইংরাজী ঢঙের সুর বসিয়েছেন কিন্তু শুনতে পাই যে তা' সত্ত্বেও আমাদের দেশী রাগিণী ঠিক বজায় আছে। এবং তিনি যে দেশী রাগরাগিণী বিলক্ষণ বুঝতেন ও নিজে বিশুদ্ধ ভাবে গাইতে পারতেন তাঁর ও তাঁর গানের ভক্তমাত্রেই জানেন।"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন, "শুনিতে পাই যে মদ ছাড়িবার জন্য আফিম ধরিলে দুই নেশাই পরমানন্দে এবং শরীরে বিরাজ করে। তবে যদি আমাদের দ্বিজু রায় স্বীয় প্রতিভাবলে বিলাতী সুরের কিছু কিছু রস আমাদের নিকট উপাদেয় করিয়া তুলিয়া থাকেন, তাহাতে কালোয়াতী সুরের রস খর্ব্ব হইবার ভয় কেমন করিয়া আসিতে পারে? বরং আমি দেখিয়াছি গানবাজনার উৎসবে যে ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া পালাইত, সেও দ্বিজু রায়ের মোহন হাসির রসে রস মানিয়া সঙ্গীতের রাস নামে কান পাতিতে শিখিয়াছে।"

যাহা হউক আমাদের প্রবন্ধ ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে আর একটা কথার উত্থাপন করিয়া আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

পূজনীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বলিয়াছেন, "আজকাল ষড়দিপি হওয়াতে গানকে বেঁধে রাখবার উপায় পাওয়া গেছে। এখন আর ফাঁকি দিয়ে গানের পাখী উড়ে যাবার জো নেই। তার ডানা কেটে তাকে মেপেজুখে খাঁচায় পোড়বার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তাতে একটু শ্রীভ্রষ্ট হলেও, সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার চেয়ে ভাল।"

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় যাহা বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধের সমাপন করিয়াছেন আমরাও তাহা বলিয়াই প্রবন্ধের শেষ করি। তিনি বলিয়াছেন, "আমার শেষ কথা এই যে ৺ দ্বিজেন্দ্রলালের সুরগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে

পারলেই তাঁর যথার্থ স্মৃতি রক্ষা করা হবে। এ সকল সুরের বি শব্দের লোপ পাবার সম্ভাবনা খুব বেশি, কেননা সুর মুখে মুখে কথার চাইতেও বেশি বদলে যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি যদি আমরা অতি সত্বর স্বরলিপিতে আবদ্ধ না করি, তা'হলে অদূর ভবিষ্যতে সে সব সুর আমাদের চলতি সুরেতে পরিণত হবে।"

শ্রীরাধাচরণ নাগ

দাশরথি

(১)

কোর্ত্তা পোলাও নয়কো তোমার কাবা-গো,
টোষ্ট রোষ্ট নয় কাটলেট্ কারী,
নয় পোলাপী রেউরী কিম্বা রাবড়ি ও
সে আমাদের ডাল, ভাত, তরকারী।

(২)

তোমার কাব্য নয় চাপকান্ পেণ্ট কোট্
ইজি, চিজি, সিল্ক নয় নাই আদর
সে আমাদের সূক্ষ্ম নহে ক্ষুদ্র জোট্
তাতে বোনী সাদা ধুতি চাদর।

(৩)

কচু ক্রোটন নয় কো তোমার কাব্য হায়
নয় কো প্যান্সি নয় কো তাহা প্যান্সি গো
সে আমাদের গোবর নেয়া আঙ্গিনায়
গৃহস্থেরি কল্পতরু তুলসী গো।

(৪)

সংকীর্ত্তনের ধুলায় সে যে পুণ্য স্নান,
অন্তে তাহে আমরা তাতে বড় বই,
সে আমাদের নির্ম্মালেরি-পুষ্প ম্লান
সকল ছেড়ে তাতেই শিবে রক্ষে নই।

(৫)

সে আমাদের পল্লীগ্রামের সব্‌জে মাঠ
সে আমাদের মাঠের দধির হাওয়া
সে আমাদের বঙ্গ ঘরের গুপ্ত বাট
লুপ্ত রীতি নূতন করে গাওয়া।

(৬)

সে আমাদের নিদাঘ দিনে অশথ তল
পৌষ প্রভাতে হর্ষ্যি মামার আলো
সে আমাদের দারুণ তৃষায় গঙ্গাজল
সে আমাদের সবার চেয়ে ভালো।

(৭)

কারুশাপেতে পড়েই ছিল পাষাণ হয়ে তাহা
পরাণ দিয়ে করলে তুমি ত্রাণ
গুহকগৃহে আনলে তুমি সখিলনের আশা
দাশরথি তুমিই মোদের রাজা।

শ্রীসুধীরঞ্জন মল্লিক

যুক্তিকল্পতরু

(৮৬—১৫৪ শ্লোক)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আসন *

অরি এবং বিজিগীষুর) পরস্পর আক্রমণের নাম 'বিগৃহাসন' (১)। শত্রুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া (কোনও কারণে) যুদ্ধে বিরত হইলে তাহার নামও 'বিগৃহাসন।'

বিজিগীষু (২) এবং অরি (৩) উভয়েই যুদ্ধশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলে, পরস্পর সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক অবস্থিতির নাম—'সন্ধায়াসন'।

যদি উদাসীন (৪) অথবা মধ্যমকে (৫) পরাক্রমে সমান বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে, অরি ও বিজিগীষুর মিলিত-ভাবে অবস্থানই "সমুদাসন।"

সকলের প্রীতিজনক নিজরাজ্যের কল্যাণকর (নিজরাষ্ট্র সুলক্ষণম্) সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই আসনকে 'প্রীত্যাসন' বলে।

দ্বৈধ — †

দুই জন বলবান্ শত্রু উপস্থিত হইলে রাজা (উভয়ের নিকটই) আত্মসমর্পণ করিবে, এবং তাহাদিগের পরস্পরের অজ্ঞাতসারে কাকচক্ষুর ন্যায় (৬) উভয় দিকই রক্ষা করিবে।

তাহাদিগের মধ্যে যে শত্রু অতিনিকটবর্ত্তী তাহার নিকট কৃত্রিম বন্ধুভাব প্রদর্শন করিবে। উভয় শত্রুই আক্রমণ করিলে, তাহাদিগের মধ্যে যে অধিক বলবান্ তাহার শরণাপন্ন হইবে।

আশ্রয় ‡

যদি শরণাগত হইলে সুবিধা হয়, তাহা হইলে, আশ্রয় গ্রহণই রাজার বিধেয়; ইহার অন্যথা হয় না।

বলবান্ শত্রু আক্রমণ করিলে, তদপেক্ষা অধিক শক্তিশালীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং তাহার নিকট বিনীতভাবে কালযাপন করিবে। ইহাই উত্তম পরামর্শ।

আশ্রিতবৎসল আক্রমণকারীকে সৈন্য, ধন অথবা সমৃদ্ধিশালী দেশ প্রদান করিয়া তাহার শরণাগত হইবে।

যেমন নদী সকল সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ

---

* যে ভাবে অবস্থান করিলে, রাজার আত্মরক্ষা হয়।

(১) অন্যোন্যাভ্যাক্রান্তিকরণং বিগৃহাসনমুচ্যতে।..... বিগৃহাসনমুচ্যতে॥

(২) যাত্রা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক কেন্দ্রী রাজা।

(৩) বিজিগীষুর প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য রাজা।

(৪) যে রাজা অরি ও বিজিগীষুর রাজ্যের সীমার বাহিরে বাস করে।

(৫) অরি ও বিজিগীষুর রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী রাজ্যের অধিপতি।

† মুখে একরূপ, মনে অন্যরূপ; দুই শত্রুর নিকট দুই প্রকার ভাব প্রকাশ। অর্থশাস্ত্র বলে—একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত যুদ্ধের নাম দ্বৈধ।

(৬) প্রসিদ্ধ আছে যে, কাকের একটীমাত্র অক্ষি-গোলক প্রয়োজনানুসারে উভয় চক্ষুতেই কার্য্য করে।

‡ অন্য উপায় না থাকিলে প্রবল শত্রুর শরণাপন্নতার নাম 'আশ্রয়'।

(ক্ষুদ্র রাজগণ) নিরাপদ ভ্রান্তিহীন উৎসাহসম্পন্ন ও যথা-বুদ্ধিমান্ প্রবল নৃপতির সহিত মিলিত হইবে।

তরুণী যেমন বৃদ্ধ পতি ইচ্ছা করে না, সেইরূপ ঐশ্বর্য্য নিশ্চেষ্ট, অলস, ভাগ্যবাদী ও সাহসহীন ব্যক্তির নিকট গমন করে না।

উৎসাহ ঐশ্বর্য্যের কারণ, উৎসাহে বিপুল খ্যাতিলাভ হয়, অতএব নানা উপায়ে (অন্যান্য প্রকৃতিকে) পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে উৎসাহসম্পন্ন হইবে।

বিবেচনাশক্তি (১), বিক্রম, কর্ম্মে ক্ষিপ্রকারিত্ব ও নৈপুণ্য এইগুলি উৎসাহের গুণ।

উৎসাহের অভাব বিপদের উৎপত্তির কারণ

সাম (অর্থাৎ প্রিয়ব্যবহার) দান, দণ্ড ও ভেদ এই চারিপ্রকার শত্রুবশীকরণের উপায়।

পণ্ডিতগণ সকল স্থলেই সামনীতি অবলম্বনকারীকে প্রশংসা করেন। বাক্যে অমৃত বর্ষণ করিয়া সাম উপায় অবলম্বন করিবে।

লোভী এবং দরিদ্রকে দানে সন্তুষ্ট করিয়া বশীভূত করিবে।

মন্ত্র, অমাত্য ও পুরোহিতদিগের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিবে।

আত্মবল অনুসারে দুষ্টদিগকে দণ্ডবিধান করিবে।

দণ্ড

দণ্ড ধর্ম্ম রক্ষা করে, দণ্ড নানা উপায়ে ধন রক্ষা করে এবং দণ্ডই বাসনাপূরণ করে; অতএব দণ্ড ত্রিবর্গ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম) বলিয়া কথিত হয়।

পাপিগণ রাজদণ্ডভয়ে পাপাচরণ করে না, কেহ কেহ যমশাসনভয়ে, কেহ বা পরলোকভয়ে পাপ করে না।

যদি সৎ ও অসৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দণ্ডের বিধান না থাকিত, তাহা হইলে মৎস্যকে যেমন শূলে (বিদ্ধ করিয়া) ভক্ষণ করা হয়, প্রবল ব্যক্তি সেইরূপ দুর্ব্বলকে পীড়ন করিত।

রাজা নিয়মানুসারে অপরাধীর দণ্ডবিধান করিবে, না করিলে স্বয়ং পাপী হইবে।

পুত্রগণ উচ্চৈঃ বাক্য প্রয়োগ করিলেও রাজা তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিবে না; মৃতবাক্তী ব্যক্তি পারিষদবর্গের সহিত নরকে গমন করে।

শত্রুর কথায় (বিশ্বাস) করিয়া কোন ভৃত্যের দণ্ডবিধান উচিত নহে, বিপক্ষের কথায় দণ্ড করিলে, তাহা প্রভুর নরকের কারণ হয়।

মন্ত্রণা

মন্ত্রণাই রাজ্যের মূল; অতএব রাজা কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিয়া মন্ত্রণা রক্ষা করিবেন।

যাহাতে কার্য্যের ফল শুভ কি অশুভ এবং কার্য্যসিদ্ধি-সম্বন্ধে আশঙ্কা আছে কি না সে বিষয়ের বিচার করা হয় তাহাই মন্ত্রণা, অন্য সকল ভ্রান্তিমাত্র।

বিষে একজনের মৃত্যু ঘটিতে পারে, শস্ত্র দ্বারা একজনের হত্যা সম্ভব হইতে পারে, মন্ত্রণাবিপ্লবে রাজ্যের সহিত সমস্ত সম্পদ্ বিনষ্ট হয়।

যাহা ভবিষ্যতে করিতে হইবে, তাহা প্রকাশ করিবে না, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গবিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাহার পর প্রকাশ করিবে। পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বা নির্জ্জন প্রাসাদে গমন করিয়া মন্ত্রণা করিলে, তাহার প্রকাশ হয় না।

মন্ত্রণা প্রকাশ হইলে রাজ্যের সহিত রাজা সত্বর নিধন প্রাপ্ত হয়। অরণ্যে (১) এবং নিতান্ত নির্জ্জন স্থানেও মন্ত্রণা হইতে পারে।

সাধুব্যক্তিগণের কার্য্যসম্বন্ধে সাম-উপায় প্রয়োগ করিবে, লোভীদিগের সম্বন্ধে দান ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভেদনীতি অবলম্বন করিবে, ইহাই সিদ্ধান্ত।

মন্ত্রণাকালে মূর্খ, মূক, অন্ধ, বধির, বৃদ্ধ, স্ত্রী, ব্রহ্মচারী, রোগী ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদিগকে এবং পশু-পক্ষ্যাদিকে নিকটে অবস্থান করিতে দিবে না।

* আমি সংক্ষেপে রাজনীতি বলিলাম। যদি ত্রিবর্গের (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) বিরুদ্ধ না হয়, তবেই তাহাকে রাজনীতি বলা যায়।

নীতিযুক্তি সম্পূর্ণ।

(১) বিক্রম।

(১) অরণ্যে।

দুর্গমুক্তি

সেনা রাজার বল নহে, দুর্গই রাজার প্রধান বল। সৈন্য অল্প থাকিলেও দুর্গের বলেই ভূপতি অপরাজেয় হইয়া থাকেন।

'তাহাই কথিত হইয়াছে, দুর্গপ্রাচীরে আরোহণ করিয়া একজন যোদ্ধা শত জনের সহিত এবং শতজন দশ সহস্রের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

সেই দুর্গ আবার স্বাভাবিক ও কৃত্রিম এই দুই প্রকার।

পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতির দ্বারা সুরক্ষিত স্বভাবোৎপন্ন দুর্গের নাম অকৃত্রিম বা স্বাভাবিক দুর্গ; ইহা শত্রুরাজগণের দুর্লঙ্ঘ্য।

প্রাচীর, পরিখা ও বন দ্বারা যে দুর্গ রচিত করা হয়, তাহার নাম কৃত্রিম দুর্গ; ইহা শত্রুগণের পক্ষে লঙ্ঘন-যোগ্য এবং অলঙ্ঘ্যও হইতে পারে।

স্বাভাবিক দুর্গ

যাহার চূড়া অতি উন্নত ও প্রশস্ত, যাহাতে আরোহণ বিশেষ কষ্টকর, যাহা হইতে অনায়াসে বহির্গমন করা যায়, বন-বেষ্টিত এবং জলাশয় ও যাতায়ত সমন্বিত সেই পর্ব্বতকে 'পর্ব্বত-দুর্গ' বলে।

চারিদিকে গভীর ও বিস্তীর্ণ নদী থাকিলে মধ্যস্থিত ভূমি-খণ্ডকে 'নদীদুর্গ' বলে।

চির সহনবনের মধ্যে নির্ম্মিত নিবাসকেও দুর্গ বলে।

নরদুর্গ (১) নামে একপ্রকার দুর্গ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়।

কৃত্রিম দুর্গ

যে দেশে পর্ব্বত বা বহুজলা নদী নাই, সে দেশের রাজা কৃত্রিমদুর্গনির্ম্মাণ করিবে।

হস্তীর পক্ষেও অলঙ্ঘ্য, বিস্তীর্ণ, গভীর এবং জল ও বহুজলজন্তুপূর্ণ পরিখাও দুর্গের কার্য্য করে।

বৃহৎ শালবৃক্ষ ও বহু কণ্টকবৃক্ষে পূর্ণ-বনসন্নিবিষ্ট বিস্তৃত এবং বহুল বনকেও দুর্গ বলা হয়।

নিম্ন প্রবেশ বন্ধন করিলেও যাহাতে অল্প জল থাকে, এরূপ গুহাও দুর্গ বলিয়া কথিত হয়, ইহা শত্রুরাজগণের পক্ষে দুরন্বয়।

চতুর্দ্দিকে পরিখা করিয়া ওধার উচ্চভাগবন্ধন করিলে, সেই স্থান জলপ্লাবিত হয় বলিয়া তাহার নাম "জলদুর্গ"।

এই গুলির অভাবেও নিম্নভূমি বন্ধন করিলে, বর্ষাকালে জল স্থানটী জলপূর্ণ হয়, তখন ইহাকে "জলদুর্গ" বলে।

এই দুই প্রকারের মিশ্রণ হইলে, সংমিশ্রদুর্গ হইবে। যেদিকে বলবান্ শত্রু থাকে, সেই দিকে কৃত্রিম দুর্গ করিবে এবং অন্যত্র কৃত্রিম দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাজা স্বয়ং বাস করিবে।

শত্রুর যদি রথ থাকে তাহা হইলে, জলে দুর্গনির্ম্মাণ করিবে, আর শত্রু যদি হস্তী ও অশ্বের অধিপতি হয়, তাহা হইলেও জলদুর্গ করিবে, এবং যাহার দুই প্রকার শত্রুই থাকে, সে গিরিদুর্গের আশ্রয় লইবে।

সকল দুর্গই সংক্ষেপে তিন প্রকার বলিয়া কথিত হইতেছে। প্রত্যেক রাজারই সীমান্তদুর্গ, প্রকাশ্যদুর্গ এবং গুপ্তদুর্গ থাকিবে।

সীমান্তে সৈনিকগণ থাকিবে স্বয়ং রাজা প্রকাশ্য দুর্গে বাস করিবে এবং গুপ্ত দুর্গে স্ত্রীজন ও ধনধান্যাদি রক্ষা করিবে।

দুর্গের সাধারণ গুণ

নীতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—যে দুর্গে প্রবেশ ও বহির্গমনের সুবিধা থাকে, তাহাই উত্তম দুর্গ, অন্যগুলি বন্দি-শালার মত, সেরূপ দুর্গ আশ্রয় করিবে না।

ধন্বদুর্গ (জলহীন প্রান্তর দুর্গ) মহীদুর্গ (ইষ্টক বা পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ) গিরিদুর্গ, নরদুর্গ, জলদুর্গ [অম্বুদুর্গ] ও বনদুর্গ এই ছয় প্রকার দুর্গ।

কেহ কেহ বলেন—মৃৎদুর্গ দুর্গই (দুর্গবিষয়) নহে, সৈন্যই প্রকৃত দুর্গ; সৈন্যহীন দুর্গ প্রাণহীন দেহের মত।

---

(১) নরদুর্গম্। বহুসংহিতায় শুক্রনীতির পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্ততিতম শ্লোকের টীকায় কুল্লুক ভট্ট বলিয়াছেন—চতুর্দ্দিকে স্থিত হস্ত্যশ্বরথপদাতিযুক্ত বহুপদাতিকর্ত্তৃক রক্ষিত দুর্গ নরদুর্গ। অন্যেতু ব্যূহবিদ্বীরধার্য্যাপ্তং তৎ সৈন্যদুর্গমিত্যু। শুক্রনীতি। ৪।৭।৭৩

গর্গ বলিয়াছেন—নৃপতিদিগের সম্বন্ধে যে নানাপ্রকার দুর্গের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মন্ত্র-দুর্গই (মন্ত্রণারূপ দুর্গ) বিশেষভাবে সকলগুলিকে অতিক্রম করিয়া থাকে।

দৈবক্রমে অন্য দুর্গগুলি নষ্ট হইলেও রাজা মন্ত্রণাবলে জয়লাভ করেন, কিন্তু মন্ত্রণাভেদ হইলে আর কিছুই কার্য্যকারী হয় না।

ভোজ বলেন—যাহা শত্রুগণ সহজে লঙ্ঘন করিতে পারে না। যাহা বিস্তৃত ও উচ্চনীচ এবং যাহাতে প্রবেশ ও নির্গমের সুবিধা আছে, তাহাই উত্তম দুর্গ।

দুর্গ-যুক্তি শেষ।

নগরী যুক্তি

নগরীনির্ম্মাণকালে

সূর্য্য স্থিররাশিতে (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক বা কুম্ভে) উদিত হইলে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ বা ফাল্গুনমাসে এবং চন্দ্র স্থিরনক্ষত্রে উদিত হইলে, শুভ দিনে এবং শুভ সময়ে রাজা নগরনির্ম্মাণ আরম্ভ করাইবেন।

নগরীলক্ষণ

শুক্রিশোত্তরে—দীর্ঘ বা চতুরস্রাকারে নগরনির্ম্মাণ করিবে; ত্র্যস্র (১) বা বর্ত্তুলাকৃতি (২)ও করিতে পারে।

একবাহু অধিক দীর্ঘ হইলে তাহার নাম দীর্ঘ, চারিবাহুই সমান হইলে চতুরস্র (বর্গক্ষেত্রাকৃতি), তিনবাহু সমান হইলে ত্র্যস্র (সমত্রিভুজ) এবং বলয়ের মত (গোল) হইলে বর্ত্তুল (বৃত্ত) বলে।

'দীর্ঘ'—দীর্ঘকাল সুখ-সম্পত্তির কারণ হয়, 'চতুরস্র' রাজাকে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করে, 'ত্র্যস্র' ত্রিশক্তি (প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্র) নাশ করে, এবং বর্ত্তুল বহুরোগ উৎপাদন করে।

রাজার দশ হস্তে এক 'রাজবস্তু', দশ রাজহস্তে এক 'রাজদণ্ড', দশ রাজদণ্ডে এক 'রাজচ্ছত্র', দশ রাজচ্ছত্রে এক 'রাজকাণ্ড', দশ রাজকাণ্ডে এক রাজপুরুষ, দশ রাজপুরুষে এক 'রাজধানী', এবং দশ রাজধানীতে এক 'রাজক্ষেত্র' হয়।

নগরনির্ম্মাণে এই সাতপ্রকার পরিমাণ জয়, ঐশ্বর্য্য, ভোগ, সম্পত্তি, মৃত্যু, যশ ও সুখ প্রদান করে।

রাজা রাজক্ষেত্র পরিমাণ দ্বারা পুরী ও পত্তন আরম্ভ করিবে।

বিশ্ব মুনি—লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্য), জয়, ক্ষমা, সৌম্য, পক্ষয় (মৃত্যু), ভঙ্গ, একতা, (৩), সমৃদ্ধি, বিত্ত নাশ, মঙ্গল, বল, ক্ষয়, সাম্রাজ্য, ভোগ এবং সম্পত্তি এই ষোড়শবিধ নগরের গুণানুসারে নাম করিয়াছেন।

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য সাংখ্যকাব্যপুরাণতীর্থ

---

(১) (২) 'ত্র্যস্রং' স্থলে 'ত্র্যস্রক' 'বহুলবাপি' স্থলে 'বর্ত্তুলবাপি' পাঠ গৃহীত হইল।

(৩) 'একত্ব' স্থলে 'একতা'।

গণিতপাদ

এই প্রবন্ধে আমরা আর্য্যভটের "গণিতপাদ" সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রতিজ্ঞা—১০

ব্রহ্মভূশশিবুধগুরবিকুজশুক্রকোলেভগণাব্রয়ঙ্কতা
আর্য্যভটদ্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানম্ ॥ ১

অনুবাদ—ব্রহ্মা, ভূমি, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং তারাগণকে প্রণিপাত করিয়া আর্য্যভট গণিত পাদে কুসুমপুরে (পাটলিপুত্রে) অভ্যর্চ্চিত জ্ঞান (১) বিবৃত করিতেছেন।

দ্রষ্টব্যঃ—এখানেও আর্য্যভট প্রথমেই ব্রহ্মকে নমস্কার করিতেছেন। আর একটী বিষয় লক্ষ্য করা উচিত - ভূমি চন্দ্র, বুধ, শুক্র, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে যথাক্রমে স্থাপনা করা হইয়াছে। পরে গোলাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে ইহাই ইহাদের অবস্থান ক্রম। গোলাধ্যায়ে এসম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। তবে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যদি সূ-চন্দ্র ভূমি রবির সহিত স্থান পরিবর্ত্তন করে, তাহা হইলে আধুনিক সিদ্ধান্তের সহিত মিল হয়। আর একটী কথা—"কুসুমপুরে অভ্যর্চ্চিত জ্ঞান" হইতে ইহাই বোধ হইতেছে যে আর্য্যভটের বাসস্থান কুসুমপুরে বা পাটলিপুত্রেই ছিল, এবং সেখানে জ্যোতিষের বিশেষতঃ গণিত জ্যোতিষের বিশেষ চর্চ্চা ছিল।

দশস্থান সংখ্যা সংজ্ঞা—

একং দশ চ শতং সহস্রমযুতনিযুতে তথা প্রযুতম্।
কোটার্ব্বুদঞ্চ বৃন্দং স্থানাৎ স্থানং দশ গুণং স্যাৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদঃ—এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত, কোটি, অর্ব্বুদ, বৃন্দ—এক স্থান হইতে স্থানান্তরে দশগুণ হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ - এই শ্লোকের দ্বারা আর্য্যভট দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছেন—সংখ্যা বর্ণনা (Nomation) এবং সংখ্যা লিখন (Notation)। এই শ্লোকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় দশের খেলা মাত্র। দশটী সংখ্যার বিষয় বলা হইয়াছে, (এক হইতে বৃন্দ পর্য্যন্ত) যে কোন সংখ্যা পূর্ব্ব সংখ্যার দশগুণ, এবং স্থানীয় মূল্য (Local value বা place value) পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানীয় মূল্যের দশগুণ। ইহাকেই দাশমিক প্রণালী বলা হয়। সংখ্যাগুলিকে দশের মাত্রায় (Scale এ) প্রকাশ করা হইয়াছে। শুধু বর্ণনায় নহে, লিখনসম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। "স্থানাৎ স্থানম্" এই বাক্যের প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে চাই। যে সংখ্যাগুলির আর্য্যভট এখানে উল্লেখ করিয়াছেন "তাহার মধ্যে যে কোনটী পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যার দশগুণ" একথা বুঝাইতে হইলে আর্য্যভট আরও নানা উপায়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু "স্থানাৎ স্থানম্" এই বাক্য দ্বারা তিনি লিখিবার প্রণালীর দিকে ও মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন; লিখিবার জন্য এই দশটী সংখ্যার দশটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে—"একক" (একক জ্ঞাপক সংখ্যা) কখনও সহস্রের স্থানে আসিতে পারে না, সহস্রজ্ঞাপক সংখ্যা কখনও শত বা অন্য কোন সংখ্যার স্থানে আসিতে পারে না। স্থানগুলি নির্দ্দিষ্ট করিবার উপায় কি? আর্য্যভট সেই উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন—নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলির যে কোনটীর মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানের মূল্যের দশগুণ। ইহাকেই দাশমিকসংখ্যালিখন-প্রণালী (Decimal) System of Notation) বলে

(১) পরমাদীশ্বরটীঃ অভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানং কুসুমপুরবাসিভিঃ পুষ্পিতং গ্রহগতিজ্ঞানসাধনকৃতঃ তন্ত্রম্।

* এখানে আর্য্যাপূর্ব্বার্দ্ধে বৃত্তভঙ্গ উপলব্ধি হইতেছে। এবং দশাগুণ সহস্রমিতি পাঠ প্রায় শুদ্ধ হইবে।— Dr. Kern.

উহার সুবিধা এই যে মাত্র দশটী চিহ্নের অঙ্ক (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) হইতে যে কোন সংখ্যা অনায়াসে লিখিতে পারা যায়। "দশের মাত্রার লেখা বা বলা হইল কেন" এখানে সে প্রশ্নের মীমাংসা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাকালে পৃথিবীর প্রায় সকল অধিবাসীর মধ্যেই এই দাশমিক গণনার ভাব অল্পাধিক বিদ্যমান ছিল। দুই হাতের দশটী অঙ্গুলি হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে। বিজ্ঞানহিসাবে এই "বিবৃত্তির" অধিক মূল্য নাই। "শূন্যের" এই সংখ্যার অঙ্ক কোন নাম থাকিলে সাহিত্যের বা গণিত-শাস্ত্রের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না। তবে 'শূন্য'কে পাঁচটী দশ এবং পাঁচটী এককরূপে ধারণা করিবার ক্ষমতা গণিতের পরবর্ত্তী উন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়াছে সেই হিসাবে দাশমিক সংখ্যা "শূন্যের" যা কিছু মূল্য। কিন্তু যাহার দ্বারা গণিতের পরবর্ত্তী উন্নতি সম্ভব হইয়াছে—তাহা এই দাশমিক সংখ্যা লিখনপ্রণালী, গণনাপ্রণালী নহে। (অর্থাৎ Notation, Numeration নহে)। এই প্রণালী মতে সংখ্যা লিখিত হইলে গণিতের মৌলিক ক্রিয়াগুলি (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ) প্রয়োগ করিবার বিশেষ সুবিধা হয় বলিয়াই ইহার এত আদর। এই লিখনপ্রণালী জগতে যিনি উদ্ভাবন করিয়াছেন, তিনিই চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। আর্য্যভট যদিও কোন উদাহরণ দেন নাই, তথাপি "লিখনপ্রণালীর" মূল সূত্রটী এই আর্য্যার নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে আর কেহ দাশমিক সংখ্যানুসারে সংখ্যা লিখিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। এবং ঠিক পরবর্ত্তী সময় হইতেই এপ্রণালীটীর বিশেষ প্রচলন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় আর্য্যভট এই প্রণালীর উদ্ভাবয়িতা ছিলেন।* যদি আমাদের এসিদ্ধান্ত ঠিক হয়, তাহা হইলে আর্য্যভটের বিপুল খ্যাতির একটী প্রধান কারণ পাওয়া যেন। আমার মনে হয়, আর্য্যভট আর কিছুই না লিখিলেও কেবল এই প্রণালীর প্রবর্ত্তনই তাঁহাকে অমরত্ব করিবার যথেষ্ট কারণ হইতে পারিত। তবে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে আর্য্যভট "কুসুমপুরে অভ্যর্চ্চিত জ্ঞানের" কথাই বলিতেছেন। মূলতঃ "কুসুমপুরে অভ্যর্চ্চিত জ্ঞানের" কথা থাকিলেও ইহাতে যে তাঁহার নিজস্ব কিছুই থাকিতে পারে না তাহা মনে করা যায় না। আজ কাল লিখিত প্রমাণ না পাইলে কোন কথা বিশ্বাসই করা হয় না; কাহারও লিখিত প্রমাণ পাইলেও যদি মনে করি যে বিষয়টী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাহারও দ্বারা প্রচলিত, তিনি মাত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে প্রমাণের কোন তাৎপর্য্য থাকে না। আর যদি তাহাই হয়, আমাদের দেশের একথাও মনে করাইয়া দিতে হইবে না যে বেদব্যাসের অপেক্ষা গণেশের সম্মান বেশী। তবে আশ্চর্য্য এই যে এখানে আমরা গণেশকে পাইতেছি, বেদব্যাসের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। সে যাহাই হউক, এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে অতি প্রাচীন সময়ে, সিদ্ধান্ত রচনার প্রারম্ভকালে, ভারতবর্ষে এপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রচলন হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে অন্য কোনও দেশে এপ্রথার প্রচলন ছিল না প্রায় খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে আরবদেশে এ প্রথার প্রচলন হয়, পরে আরবদেশ হইতে ইউরোপ প্রচলন করিয়াছে।

বর্গসমচতুরস্রঃ ফলঞ্চ সদৃশদ্বয়স্য সংবর্গঃ।
সদৃশত্রয়সংবর্গো ঘনস্তথা দ্বাদশাগ্রস্যাৎ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—সমচতুরস্র (=square) বর্গ (অর্থাৎ তাহার ক্ষেত্রকে বর্গক্ষেত্র বলা হয়), ক্ষেত্রফলও বর্গসংজ্ঞিত হয়, এবং দুইটী সমান বাহুর সংবর্গের (অর্থাৎ গুণিত ফলের) সমান। ঘন (=cube) তিনটী সমান বাহুর সংবর্গ, এবং দ্বাদশাগ্রবিশিষ্ট।

তাৎপর্য্য—যাহার চারিটী বাহু (=side) সমান এবং কর্ণ (diagonal) দ্বয়ও সমান এইরূপ ক্ষেত্রকে সমচতুরস্র বলে। ক্ষেত্রফল সমান বাহু দুইটীর গুণফলের সমান, এবং বর্গসংজ্ঞিত। উক্ত বাহুই যদি ১ অঙ্গুলি হয়, তবে ক্ষেত্রফলও ১×১=১ ই হইবে, তবে ১ বর্গ-অঙ্গুলি। প্রত্যেক বাহু যদি ২ হাত হয়, ক্ষেত্রফল ৪ বর্গ-হাত

* এই প্রসঙ্গে Dr. D. E. Smith প্রণীত Hindu Arabic Numerals গ্রন্থখানি পাঠককে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

হইবে। কোন ঘরের যদি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা সমান হয়, এবং চারিটী কর্ণও যদি সমান হয়, তাহা হইলে ইহাকেই "ঘনের" বিশিষ্ট উদাহরণ বলা যাইতে পারে। এইরূপ ঘরের বারটী বাহু আছে, সকল গুলিই সমান। তিনটী সমান বাহুর গুণফলও এই ঘনান্তর্গত স্থানের (space) ফল, এবং তাহাকে ঘনফল বলা হয়।

বর্গমূল বাহির করিবার নিয়ম—

ভাগং হরেদবর্গান্বিতাং দ্বিগুণেন বর্গমূলেন।
বর্গাদ্বর্গে শুদ্ধে লব্ধং স্থানান্তরে মূলম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :—পূর্ব্বের "অবর্গস্থানীয় সংখ্যা"কে বর্গমূলের দ্বিগুণের দ্বারা ভাগ করিবে; যাহা লব্ধ হইবে তাহার বর্গ যদি বর্গস্থানীয় সংখ্যা হইতে বিয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঐ লব্ধ রাশিই স্থানান্তরে মূল হইবে (অর্থাৎ পূর্ব্ব-প্রাপ্ত মূলের পরবর্ত্তী স্থানের রাশি হইবে)।

পরিষ্কার :—আমি প্রথমে একটী উদাহরণ দিয়া ইহার অর্থ পরিষ্কার করিতে চাই। ৩১,৯৪,৫৬ এই সংখ্যাটীর বর্গমূল বাহির করিতে হইবে। এখানে ৬, ৫, ৭ বর্গ-স্থানীয় রাশি (digit), এবং ১, ৯, ৩ অবর্গস্থানীয় রাশি (digit); এবং ৩ অবর্গস্থানীয়, ৩১ বর্গস্থানীয়, ৩১৯ অবর্গস্থানীয়, ৩১৯৪ বর্গস্থানীয়, ৩১৯৪৫ অবর্গস্থানীয় ও ৩১৯৪৫৬ বর্গস্থানীয় সংখ্যা। এখন উপরোক্ত নিয়ম প্রয়োগ করা হউক্—

```
৩১, ৯৪, ৫৬ ( ৬১৬ বর্গমূল
৩৬
---
১২)১৯(১   ( =দ্বিতীয় স্থানের মূল )
১২
---
৭৪
১ ( =১² )
---
১২২)৩৯৫( ৬ ( =তৃতীয়স্থানের মূল )
৭৩২
---
৩৬
৩৬ (=৬²)
---
```

এখানে প্রথম অবর্গস্থানীয় সংখ্যা "৩", কিন্তু ইহার কোন মূল পাওয়া যায় নাই বলিয়া আমরা "৩১" কে ভাগ করিতে পারি। অতএব প্রথমে একটী বর্গমূল বাহির করিতে হইবে যাহার বর্গ "বর্গস্থানীয় সংখ্যা" ৩১এর অধিক না হয়। সে মূল এখানে ৫; সূত্রের দ্বিতীয় চরণ অনুসারে ৩১ হইতে "৫" এর বর্গ বিয়োগ করিতে পারি বলিয়াই ৫ প্রথম বর্গমূল (অর্থাৎ বর্গমূলের প্রথম স্থানীয় রাশি)। বিয়োগ করিয়া পরবর্ত্তী অবর্গস্থানীয় "রাশি" ৯এর সহিত "১৯" এই অবর্গস্থানীয় সংখ্যা পাই। ১৯কে ৫এর দ্বিগুণ ১০ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল "১" হয়, এবং পরবর্ত্তী বর্গস্থানীয় সংখ্যা ৭৪ হয়। ৭৪ হইতে "১" এর বর্গ ১ বিয়োগ করা যায় বলিয়াই "১" "স্থানান্তরে মূল" অর্থাৎ মূলের পরবর্ত্তী রাশি। তাহার পর ৭৩৫ অবর্গস্থানীয় সংখ্যা; ৬১×২=১২২ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হয় "৬"; পরবর্ত্তী বর্গস্থানীয় সংখ্যা ৫৬ হইতে ৬এর বর্গ ৩৬ বিয়োগ করিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; অতএব "৬" মূলের পরবর্ত্তী এবং তৃতীয় রাশি। অতএব বর্গমূল = ৬১৬। আর একটী উদাহরণ লওয়া যাউক্—

```
২১, ৯৯, ৬১ (৪          ২১, ৯৯, ৬১ ( ৪৬৯
১৬                       ১৬
---                      ---
৮)৫৯(৭ (?)              ৮) ৫৯ (৬
৫৬                       ৪৮
---                      ---
৩৯                       ১১৯
৩৯                       ৩৬  (=৬²)
---                      ---
?                        ৯২)৮৩৬(৯
                           ৮২৮
                           ---
                           ৮১
                           ৮১ (=৯²)
                           ---
```

এখানে অবর্গস্থানীয় সংখ্যা "৫৯"কে ৪×২=৮ দিয়া ভাগ করিলে, ভাগফল হয় "৭"; কিন্তু পরবর্ত্তী বর্গস্থানীয় সংখ্যা "৩৯" হইতে ৭ এর বর্গ ৪৯ বিয়োগ করা যায় না বলিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যা "৬" ধরিতে হইবে। দক্ষিণভাগে সম্পূর্ণ ক্রিয়াটী পরিদর্শিত হইয়াছে। মূল = ৪৬৯।

অতএব আমরা দেখিতেছি কোন একটী রাশি, "স্থানান্তরে মূল" হইতে হইলে দুইটী "শর্ত্ত" পালন করিতে

হইবে। "অবর্গস্থানীয় সংখ্যাকে" পূর্ব্ববর্ত্তী মূলের দ্বিগুণ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হয়, তাহার অপেক্ষা বড় হইতে পারিবে না; এবং ইহার বর্গ পরবর্ত্তী বর্গস্থানীয় সংখ্যা অপেক্ষা কম হওয়া চাই।

দ্রষ্টব্য :—এই শ্লোক হইতে দাশমিক মাত্রার সংখ্যা লিখনপ্রণালীর আর একটী প্রমাণ পাই। কেহ কেহ বলেন যে এখানে আর্য্যভট বীজগণিতের একটী সাধারণ নিয়ম দান দিয়াছেন—ইহা যে কোন মাত্রার (scale) লিখিত সংখ্যার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে আমার মত এই যে এই নিয়মটীর উপপত্তি বীজগণিতের

$$(ক+খ)^২ = ক^২ + ২কখ + খ^২$$

এই নিয়মানুসারে সিদ্ধ হইয়া থাকিলেও, এই সূত্রে আর্য্যভট কেবল মাত্র এই বীজগণিতের নিয়মটীই প্রয়োগ করিতেছেন না। এই শ্লোকে "বর্গ" এবং "অবর্গ" অর্থে বর্গসংখ্যা এবং অবর্গসংখ্যা হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে কোন অর্থ বোধ হয় না; উহাদের অর্থ "বর্গস্থান" এবং "অবর্গস্থান" ছাড়া আর কিছুই নহে। "স্থানান্তরে মূলং" একথাও ব্যবহার করিয়াছেন। "স্থান" সম্বন্ধে এতগুলি নির্দ্দেশ হইতে আমাদের নিঃসন্দেহ ধারণা হয় যে আর্য্যভট কোন একটী মাত্রায় (scale এ) লিখিত সংখ্যার প্রতি এই নিয়ম প্রয়োগ করিতেছেন। এই পর্য্যন্ত বোধ হয় আমার সহিত কাহারও মতভেদ হইবে না। এখন দেখিতে হইবে এই মাত্রা (scale) দশ কিনা? আর্য্যভট গণিতপাদের ২য় শ্লোকে অন্ততঃ সংখ্যার দাশমিক "গণনা" প্রদান করিয়াছেন; দশগীতিকাপাদের সর্ব্বত্রই, (যদিও তিনি বিভিন্ন সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন) তিনি এই দাশমিক "গণনানুসারেই" সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন; কোন "অক্ষরে" "ই" যোগ করিলে তাহার মূল্য শতগুণ বৃদ্ধি পায় "উ" যোগ করিলে দশসহস্র-গুণ বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। সর্ব্বত্রই দাশমিক গণনামতে সংখ্যা প্রকাশ করিয়া, লিখিবার সময় দশের মাত্রাটী (scale) ছাড়িয়া দিয়া, ১ কিম্বা ৫ কিম্বা অন্য কোন মাত্রার সংখ্যা লেখা কাহারও পক্ষে স্বাভাবিক কিনা তাহা সুধীগণই বিচার করিবেন।

ঘনমূল বাহির করিবার নিয়ম—

অঘনাদ্যন্তেদ্বিতীয়াৎ ত্রিগুণেন ঘনস্য মূলবর্গেণ।
বর্গত্রিপূর্ব্বগুণিতশ্ শোধ্যঃ প্রথমাদ্ঘনশ্চ ঘনাৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :—ঘনমূলের বর্গের তিন গুণের দ্বারা (ত্রিগুণিত ঘনমূলবর্গের দ্বারা) "দ্বিতীয়" অঘন স্থানীয় সংখ্যাকে ভাগ করিতে হইবে। যাহা ভাগফল হইবে তাহার বর্গকে তিন এবং পূর্ব্বমূল দ্বারা গুণ করিয়া "প্রথম" অঘন স্থানীয়-সংখ্যা হইতে বিয়োগ করিতে হইবে। পরবর্ত্তী "ঘন"-স্থানীয় সংখ্যা হইতে ভাগফলের ঘন বিয়োগ করিতে হইবে (অর্থাৎ যদি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঐ "ভাগফল"ই "স্থানান্তরের মূল" হইবে)।

স্পষ্টার্থ :—এখানে একটী উদাহরণ দিলেই বিষয়টী বেশ পরিস্ফুট হইবে। ৩ ৩, ০ ৭ ৬, ১ ৬ ১—এই
† ০ † ০ † ০
সংখ্যার ঘনমূল বাহির করিতে হইবে। এখানে ০ চিহ্নিত রাশিগুলি ঘনস্থানীয় রাশি, † চিহ্নিত রাশিগুলি "প্রথম-অঘন"-স্থানীয় রাশি, এবং অচিহ্নিত রাশিগুলি "দ্বিতীয়-অঘন"-স্থানীয় রাশি।

৩৩, ৭৬, ১৬১ (৩২১
২৭ ।০
—
৩^২ × ৩ = ২৭) ৬০ (২
৫৪ ।
—
৬৭
৩ × ৩ × ২^২ = ৩৬
—
৩১৬
২^৩ = ৮
—
৩২^২ × ৩ = ৩০১২) ৩০৮১ (১
৩০১২ ০
—
৯৬
৩ × ৩২ × ১^২ = ৯৬
—
১
১
—

এখানে ৩৩ হইতে "৩" এর বর্গ ২৭ বিয়োগ করিবার পর, ৬০ এই দ্বিতীয় অঘনস্থানীয় সংখ্যা পাই। ৬০কে

"৩" এর বর্গের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৮ দিয়া ভাগ করিয়া "২" ভাগফল পাই। পরবর্তী দুইটী ক্রিয়ার কোনটীতে যদি ব্যাঘাত না ঘটে, তাহা হইলে এই "২"ই "স্থানান্তরে মূল", অর্থাৎ মূলের দ্বিতীয় রাশি। সে দুইটী ক্রিয়া এই—ভাগফলটী এরূপ হওয়া চাই যে (১) পরবর্তী "প্রথম-অঙ্ক"-স্থানীয়-সংখ্যা হইতে ইহার বর্গের এবং পূর্ব্ববর্তী মূলের গুণফলের দ্বিগুণ যেন বাদ দেওয়া যায়, (২) পরবর্তী "ঘন"-স্থানীয়-সংখ্যা হইতে এই ভাগফলের "ঘন" যেন বিয়োগ করা যায়। এখানে ভাগফলটী এই নিয়ম দুইটী পালন করিয়াছে—অতএব ইহাই মূলের দ্বিতীয় রাশি।

এইরূপে পরবর্তী রাশিও বাহির করিতে হইবে। পরবর্তী "দ্বিতীয়-অঙ্ক-স্থানীয়" সংখ্যাকে ৩২ এর বর্গের দ্বিগুণফলদ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল হয় "১"; পরবর্তী "প্রথম-অঙ্ক-স্থানীয়"-সংখ্যা হইতে ১২ × ৩২ × ৩ বিয়োগ করিবার পরে ঘনস্থানীয় সংখ্যা থাকে ১; তাহা হইতে ১ এর ঘন (=১৩) বিয়োগ করিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অতএব ঘনমূল হইল ৩২১।

দ্রষ্টব্য:—পূর্ব্ববর্তী শ্লোকের সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, এখানেও তাহার সবই প্রযোজ্য। সেখানে যেমন দুইরূপ, এখানে প্রয়োজনভেদে সেইরূপ ত্রিবিধ "স্থানে"র বিচার (discrimination) করা হইয়াছে। কোনস্থান ঘনস্থানীয় হইলে তাহার ঠিক পরবর্তী উচ্চস্থানকে "প্রথম-অঙ্ক-স্থান", এবং তাহার পরবর্তী উচ্চস্থানকে "দ্বিতীয়-অঙ্ক-স্থান", রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই "দ্বিতীয়-অঙ্ক-স্থানে"র পরবর্তী উচ্চস্থান আবার "ঘন-স্থান" হইবে, এইরূপ পর পর হইবে। এই বিষয়টির প্রতি আমি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। কারণ ইহাতে সংখ্যা লিখিবার একটী ক্রম স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আর একটী বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে "দ্বিতীয়-অঙ্ক-স্থানের" কথা পূর্ব্বে এবং "প্রথম-অঙ্ক-স্থানে"র কথা পরে বলা হইয়াছে। ইহা হইতে ঐ "ক্রমে"র উপরও জোর দেওয়া হইয়াছে, আর একটী বিষয়ও নির্দ্দেশিত হইতেছে—তাহা এই যে এক, দশ, শত, সহস্র ইত্যাদি যেদিক হইতে লিখিত হইত, ঘনমূলের (এবং বর্গমূলের) ক্রিয়া তাহার বিপরীত দিক হইতে আরম্ভ হইত। "অঙ্কত বামা গতিঃ" এই নিয়ম কখন হইয়াছে জানি না, তবে অঙ্ক যেদিকেই (অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামদিকে, অথবা বামদিক হইতে দক্ষিণে) লিখিত হউক, এই ক্রিয়াগুলি সংখ্যার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানের রাশি হইতেই আরম্ভ হইত। এখনও কি কেহ "স্থানীয় মূল্য" সম্বন্ধে বা "দাশমিক সংখ্যা লিখন-প্রণালী" সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবেন?

ত্রিভুজক্ষেত্রের ফল এবং ঘনীভূত ক্ষেত্রের ফলের কথা বলা হইতেছে—

ত্রিভুজস্য ফলং শরীরং সমদলকোটীভুজার্ধসংবর্গঃ।
ঊর্দ্ধভুজাতৎসংবর্গার্ধং স ঘনষড়শ্রিরিতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়:—কোন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল লম্ব (১) (perpendicular) এবং ভূজের (২) (বা ভূমির = base) অর্দ্ধের গুণফল। ছয় বাহু বিশিষ্ট (৩) অর্থাৎ সর্ব্বতঃ ত্রিকোণ ঘনের (triangular pyramid) ফল (volume) ঐ ত্রিভুজ ভূমির (triangular base) ক্ষেত্রফল এবং ঊর্দ্ধভুজার (৪) গুণফলের অর্দ্ধেকের সমান।

(১) পরবর্ত্তীদীধরটীঃ—সমদলকোটী লম্ব ইত্যর্থঃ; ঊর্দ্ধ-কোণাভুজাতৎসংবর্গার্ধং ঘনষড়শ্রং স লম্ব ইত্যুচ্যতে।

(২) পঃ টীঃ—ভুজো ভূমিরিত্যর্থঃ।

(৩) পঃ টীঃ—সর্ব্বতশ্চিকোণং ক্ষেত্রং।

(৪) পঃ টীঃ—ঊর্দ্ধভুজা ক্ষেত্রমধ্যোচ্চ্রায়ঃ (অর্থাৎ উচ্চ কোণ হইতে ত্রিভুজ ভূমি পর্য্যন্ত দূরত্ব)।

দ্রষ্টব্য:—প্রথমভাগে আর্য্যভট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল প্রমাণ করিতেছেন। ক্ষেত্রফল = $\frac{\text{লম্ব} \times \text{ভূজ}}{২}$

দ্বিতীয়ার্দ্ধে তিনি ছয়বাহুবিশিষ্ট ঘনের ফলফল (volume of a triangular pyramid) নির্দ্দেশ করিতেছেন। যথা, ঘনফল = $\frac{\text{লম্ব} \times \text{ত্রিভুজভূমি}}{২}$।

কিন্তু এ নিয়মটী অশুদ্ধ। হওয়া উচিত,

ঘনফল = $\frac{\text{লম্ব} \times \text{ত্রিভুজভূমি}}{৩}$।

বৃত্তক্ষেত্রফল এবং ঘন গোলফল কথিত হইতেছে—

সমপরিণাহস্তার্ধং বিষ্কম্ভার্ধহতেন বৃত্তফলম্।
তন্নিজ মূলেন হতং ঘনগোলফলং নিরবশেষম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :—সমবৃত্তক্ষেত্রের পরিধির অর্দ্ধ ব্যাসার্দ্ধ দ্বারা গুণিত হইলে বৃত্তক্ষেত্রফল প্রদান করে। এই ক্ষেত্রফলকে নিজ বর্গমূল দ্বারা গুণিত করিলে পূর্ণ ঘনগোল ফল হয়।

দ্রষ্টব্য :—বৃত্তক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}$ পরিধি × ব্যাসার্দ্ধ

$= \frac{1}{2} \times ২অ র \times র = অ র^২$,

অ = পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত, র = ব্যাসার্দ্ধ।

ঘনগোলফল = $অ র^২ \sqrt{অ র^২}$

$= \sqrt{অ} \times অ র^৩$;

কিন্তু এই ঘনগোলফল বাহির করিবার নিয়মটী অশুদ্ধ, কারণ ঘনগোলফল = $\frac{1}{2}$ অ র^৩;

এবং $\frac{1}{2} = ১.৩৩৩...$, কিন্তু $\sqrt{অ} = ১.৭...$।

অতএব $\frac{1}{2}$ কখনও "অ" এর বর্গমূলের সমান হইতে পারে না।

বিষমচতুর্ভ্রাদির (trapezium) ক্ষেত্রফল—

আয়াম গুণে পার্শ্বে তদ্যোগার্দ্ধগুণে ক্ষপাত্তরেখে চ।
বিস্তরযোগার্ধগুণে জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রফলমায়ামে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :—[একটী বিষমচতুর্ভ্রের (trapezium)] কোন পার্শ্বকে (lit. side ; এখানে one of the parallel sides) আয়াম (অর্থাৎ লম্ব = perpendicular distance between the parallel sides) দ্বারা গুণ করিলে এবং পার্শ্বদ্বয়ের যোগফল দ্বারা ভাগ করিলে কর্ণদ্বয়সংপাত বিন্দু হইতে ঐ পার্শ্ব পর্য্যন্ত (লম্ব) রেখা পাওয়া যায়। পার্শ্বদ্বয়ের যোগফলকে আয়াম (বা লম্ব) দ্বারা গুণ করিলে যাহা হয় তাহাই ক্ষেত্রফল জানিবে।

ব্যাখ্যার্থ :—মনে করা যাউক, ক্ষখগঘ একটী বিষম চতুর্ভ্রম (trapezium) ; ক্ষগ এবং খঘ এই কর্ণদ্বয়ের (diagonals) সংপাত ঙ ; ঙ হইতে চ ঙ এই আয়াম (বা লম্ব = perpendicular) অঙ্কিত করা হইয়াছে।

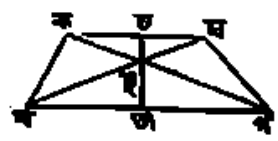

(১ ঙ চ : ছঙ চ : গছ,
: : কখ : গখ,

অতএব চঙ : (চছ + ছঙ) : : কখ : (কখ + গখ),
অতএব চছ : চঙ : : কখ : (কখ + গখ

অতএব চ ছ = $\frac{চ ঙ \times ক খ}{(ক খ + গ খ)}$;

এখানে চ ঙ = আয়াম,
ক খ ও গ খ = পার্শ্বদ্বয়,
ক খ পার্শ্বের উপর সংপাতরেখা = চ ছ।

এইরূপে ছঙ = $\frac{চ ঙ \times গ খ}{(ক খ + গ খ)}$।

(২) ক খ ঘ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}$ ক খ × চ ঙ,
(৬ সূত্র দ্রষ্টব্য),
এবং খ গ ঘ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}$ গ খ × চ ঙ ;
অতএব বিষম চতুর্ভ্রের ক্ষেত্রফল ক খ ঘ ও খ গ ঘ ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমান,
অতএব = $\frac{1}{2}$ (ক খ + গ খ) × চ ঙ।

দ্রষ্টব্য :—আমরা আপস্তম্বশুল্বসূত্রে ৫ম অধ্যায়ে সৌত্রিকী বেদি নির্ম্মাণ করিবার নিয়ম পাই। বিষমচতুর্ভ্রের বিভিন্ন অংশের উপরোক্ত সম্বন্ধের বিষয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে অবগত ছিলেন এই বেদিনির্ম্মাণকৌশল হইতেই আমরা সে বিষয় জানিতে পারি। আর্য্যভট এই প্রক্রিয়ার উদ্ভাবিকা নহেন বা তিনি যে গ্রীক গণিতজ্ঞ হইতে এই বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহাও নহে। কারণ আমাদের শাস্ত্রমধ্যে যে বিষয় উল্লিখিত রহিয়াছে তাহা যে আর্য্যভট বিদেশীয় কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা সম্ভব মনে হয় না। আমি এস্থ অধ্যায় হইতে দুইটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

ত্রিংশৎ পদানি প্রক্রম্য বা পশ্চাত্তিরশ্চী তৃতীয়া,
ষট্‌ত্রিংশৎ প্রাচী, চতুর্বিংশতিঃ পুরস্তাৎ তিরশ্চীতি
সৌত্রিকা বেদের্বিজ্ঞায়তে। ৫ অ, ১ম সূত্র।

সৌধিকী বেদি সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে :—পশ্চিম "পার্শ্ব" ৩০ পদ বা প্রক্রম হইবে, "প্রাচী" (=আয়াম) ৩৬, এবং পূর্ব্ব "পার্শ্ব" ২৪। (অবশ্য এখানে সমদ্বিবাহু বিষমচতুরস্রের [isosceles trapezium] কথাই বলা হইয়াছে)।

ত্রিক চতুষ্করোঃ পক্ষিকাঽস্যারজ্জুস্তাভি স্ত্রিরস্তী স্তৃতীয়ি-
র্লৌ চতুরশ্রাস্তাভিঃ শ্রোণী।
৫ অ, ৩য় সূত্র।

ইহা হইতে আমরা সৌধিকীবেদির বিষমচতুরস্রের বিভিন্ন অংশের নিম্নলিখিত মানগুলি পাই—

ক খ=২৪, চ ছ=২৬, খ গ=৩০ ;

ক চ=৩+৩×১=১২=চ গ,

চ ছ=৪+৪×৩=১৬, ক ছ=৫+৫×৩=২০।

এইরূপে খ জ=৩+৩×১=১৪=জ গ,

ছ জ=৪+৪×৪=২০,

খ ছ=৫+৫×৪=২৫।

এখানে ক ও খকে অংশধর, এবং খ ও গকে শ্রোণিধর বলা হইয়াছে।

[আপস্তম্ব-শুল্বসূত্র সম্বন্ধে "III. F. 150" ও "II. B. 39" এই দুইটী পাণ্ডুলিপি এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে আছে; Zeitschrift der deutschen morgenlaendischen Gesellschaft (Journal of the German Oriental Society), Vols. 55 & 56, এ Dr. A. Buerk এর এই সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ আছে,—তবে ইহা জর্ম্মাণ ভাষায় লিখিত]

সর্ব্বপ্রকার ক্ষেত্রফলানয়নের উপায়, এবং পরিধির ছয় ভাগের ভা কথিত হইতেছে—

সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রাণাং প্রসাধ্য পার্শ্বে ফলং তদভ্যাসঃ।
পরিধেঃ ষড়্ভাগজ্যা বিষ্কম্ভার্দ্ধেন সা তুল্যা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :—পার্শ্বয় (অর্থাৎ আয়ার্দ্ধ বিস্তারার্দ্ধক বাহুদ্বয়) প্রসাধন করিয়া (উপপত্তি দ্বারা স্থির করিয়া) গুণ করিলে সকল ক্ষেত্রেরই ফল পাওয়া যাইবে (১)। কোন বৃত্তের পরিধির ষড়্ভাগের ভা (=chord) ব্যাসার্দ্ধের তুল্য।

(১) পঃ টীঃ—ত্রিভুজের দলই "আয়ার্দ্ধ", ত্রিভুজভূমির (base) অর্দ্ধই "বিস্তারার্দ্ধ"; বিষমচতুরস্রের পক্ষে দলগুলি "আয়ার্দ্ধ" এবং "ভূ" ও "মুখে"র যোগার্দ্ধই (অর্থাৎ সমান্তরালবর্ত্তী পার্শ্বদ্বয়ের যোগার্দ্ধ) "বিস্তারার্দ্ধ"; ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য :—আর্য্যভটের অভিপ্রায় এই যে—যে কোন ক্ষেত্রের ফল বাহির করিতে হইলে তাহাকে একটী দীর্ঘচতুরস্রে পরিণত করিতে হইবে। আমরা তথসূত্রের ২য় অধ্যায়ে ৭ম সূত্রে একটী দীর্ঘচতুরস্রকে সমচতুরস্রে পরিণত করিবার, এবং ৫ম অধ্যায়ের ১ম সূত্রে একটী সমচতুরস্রকে দীর্ঘচতুরস্রে পরিণত করিবার নিয়ম পাই। আর্য্যভট যে কোন ক্ষেত্রকে দীর্ঘচতুরস্রক্ষেত্রে পরিণত করিতেছেন।

আর্য্যার দ্বিতীয়চরণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে ইহা বৃত্তের একটী অতি প্রয়োজনীয় গুণ (=property); আর একটী কথা, ইহা যেন পরবর্ত্তী শ্লোকের বক্তব্য বিষয়ের উপপত্তির সূচনা করিতেছে।

বৃত্তপরিধিপ্রমাণ—

চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রাণাং।
অযুতদ্বয় বিষ্কম্ভস্যাসন্নো বৃত্তপরিণাহ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :—যাহার ব্যাসের পরিমাণ ২০,০০০, এইরূপ বৃত্তের আসন্ন পরিধি=(৪+১০০)×৮+৬২,০০০=৬২৮৩২।

দ্রষ্টব্য :—"আসন্ন" শব্দের দ্বারা আর্য্যভট প্রকাশ করিতেছেন যে পরিধির পরিমাণ প্রায় ৩.১৪১৬, বিশেষ নহে। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে

"অ"=$\frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}}=\frac{৬২৮৩২}{২০,০০০}$ প্রায় (approx),

=৩.১৪১৬

আমরা এই অনুপাতের জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে "অ" ব্যবহার করিব।

ইতিহাস :—এই বিষয়ের সামান্য সংক্ষেপ ইতিহাস বোধ হয় পাঠকের অরুচিকর হইবে না। একটী বৃত্তকে সমচতুরস্র করিতে হইলে, কিম্বা একটী সমচতুরস্রকে বৃত্তে পরিণত করিতে হইলে, এই অনুপাতটী না জানা থাকিলে চলে না। এই দুইটী বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে; এমন কি এই দুইটী বিষয়কে একটী বলিয়াই উল্লেখ করা হয়। কারণ আমরা ৭ম সূত্রে পাইয়াছি যে বৃত্তফল বাহির করিতে হইলে অর্দ্ধ পরিধিকে ব্যাসার্দ্ধ দিয়া গুণ করিতে হইবে। অর্থাৎ বৃত্তের সমান করিয়া একটী দীর্ঘ চতুরস্র অঙ্কিত করিতে হইবে, যাহার "বিস্তার" অর্দ্ধ পরিধি, এবং "আয়াম" ব্যাসার্দ্ধ। এই দীর্ঘ চতুরস্রকে পরে সমচতুরস্রে পরিণত করিতে পারা যায়। ব্যাসার্দ্ধ জানা আছে, এখন এই "বিস্তার" অর্দ্ধ পরিধির দৈর্ঘ্য পাইলেই হয়। অতএব পরিধি জানা দরকার। পরিধি = ব্যাস × "অ"। অতএব "অ" বাহির করিতে পারিলে পরিধি এবং বৃত্তক্ষেত্রফল পাওয়া যাইবে, এবং বৃত্তটীকে চতুরস্রে পরিণত করিতেও পারা যাইবে।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যজ্ঞের জন্য বেদি নির্ম্মাণ সময়ে একটী বৃত্তকে সমচতুরস্রে অথবা একটী সমচতুরস্রকে বৃত্তাকারে পরিণত করিবার প্রথা ছিল। বলা বাহুল্য যে উভয়েরই ক্ষেত্রফল সমান হওয়া চাই। অতএব ভারতবর্ষে বৈদিক যজ্ঞ যতদিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে, এ বিষয়টীও ততদিনের। পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্প্রতি (University Extension Lecture এ) অতি সরল ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে যজ্ঞই বেদের অঙ্গ। অতএব বেদ যতদিনের এই প্রথাও ততদিনের। অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসর হইতে ভারতবর্ষীয় ঋষিরা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। যজ্ঞবেদি প্রস্তুত করিতে যে জ্যামিতিক অঙ্কন ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, শ্রৌতসূত্র-গ্রন্থাদির মধ্যে তাহা বিক্ষিপ্তভাবে থাকিলেও, পরবর্ত্তীকালে (৮০০—৫০০ খ্রীঃ পূঃ) তদ্বিষয়ে ঐ জ্যামিতিক অঙ্কনের নিয়মাদি সূত্রাকারে একত্রিত করা হইয়াছে। আপস্তম্ব-শুল্ব সূত্রের ৩য় অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় সূত্র হইতে আমরা পাইতেছি যে—

(১) "অ" × ব^২ = $\left(\frac{২}{১+\frac{\sqrt{২}-১}{৩}}ব\right)^২$

$\therefore$ অ = $\frac{৩৭}{(৪+\sqrt{২})^২}$ = ৩·১৪১

(২) বৃত্ত × ব^২ = ($\frac{১}{২}$ব্যাস)^২ = $\frac{১}{৪}$ব^২,

অর্থাৎ "অ" = ৪^২ = ৩·০০০৪

যদিও এ গণনা সূক্ষ্ম নহে, তথাপি সেই বৈদিক যুগেও যে এ প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা হইয়াছিল আমার তাহাই জানাইবার উদ্দেশ্য। Z. D. M. G., Vol. 55, এ Dr. A. Bürk এর পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

খ্রীষ্টের সহস্রাব্দী পূর্ব্বে আমেস্ (Ahmes) নামক জনৈক মিসরবাসীর গণনামতে অ = ৩$\frac{১}{৭}$^{২}।

গ্রীকদের মধ্যে (Archimedes, ২৫০ খ্রীঃ পূঃ) আর্কিমিডিস্ বৃত্তের মধ্যে এবং বাহিরে ৯৬ বাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া প্রমাণ করেন যে "অ" ৩$\frac{১০}{৭১}$ হইতে ছোট এবং ৩$\frac{১}{৭}$ হইতে বড়। স্থূল গণনায় অদ্য সাধারণতঃ এখনও আর্কিমিডিসের ৩$\frac{১}{৭}$ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এপলনিয়সের (Apollonius, ২০০ খ্রীঃ পূঃ) গণনামতে, "অ" = ৩$\frac{১৭}{১২০}$।

হিরণের (Heron, ১২০ খ্রীঃ পূঃ) গণনামতে, "অ" = ৩। আর এক স্থানে তিনি ৩$\frac{১}{৭}$ এই আর্কিমিডিসের গণনাও দিয়াছেন।

টলমায় (Ptolemy, ১৫০ খ্রীঃ) মতে অ = ৩$\frac{৮}{৬০}$।

চীন গ্রন্থ চুংচি (৪৫০ খ্রীঃ মতে অ = ৩$\frac{১}{৭}$।

উপরে আর্য্যভটের পূর্ব্ববর্ত্তী সকলের মত লিপিবদ্ধ হইল। এই ২৫০০ বৎসরের মধ্যে কেহই আর্য্যভটের ন্যায় সূক্ষ্ম গণনা প্রদান করিতে পারেন নাই।

আর্য্যভটের পরবর্ত্তী গণিতজ্ঞদের * বিষয় একবার আলোচনা করা যাউক।

* Ball এর Mathematical Essays & Recreations দ্রষ্টব্য।

৬৯৮ খ্রীঃ ব্রহ্মগুপ্ত $\pi = 3$

$\pi = \sqrt{10}$

$\pi = 3$

$\pi = \frac{92}{29}$

৮০০ খ্রীঃ খারজম ইবন্ মুসা (আরব) $\pi = \sqrt{10}$

৮০০—৯০০ খ্রীঃ (?) মহাবীর $\pi = 3$

$\pi = \sqrt{10}$

১০২০ খ্রীঃ শ্রীধর $\pi = 3$

$\pi = 3\frac{1}{7}$

১১৫০ খ্রীঃ ভাস্করাচার্য $\pi = 3$

$\pi = 3\frac{1}{7}$

$\pi = 3\frac{17}{120}$

$\pi = 3\frac{177}{1250}$

আধুনিক সূক্ষ্ম গণনা মতে $\pi = 3.14159265\ldots$।

আর্য্যভটের পরে ১০০০ বৎসরের মধ্যেও আর্য্যভট অপেক্ষা সূক্ষ্মগণনা আর কেহ করিতে পারেন নাই।

১৫৭৯ খ্রীঃ ভিয়েটা (Vieta) প্রমাণ করেন যে $\pi = 3.1416$।

১৫৮৫ খ্রীঃ এ. মেটিয়াসের পিতা নিম্নলিখিত অনুপাতটী প্রদান করেন—$\frac{355}{113}$; কিন্তু ইহা আধুনিক নিয়মানুসারে তিনি প্রাপ্ত হন নাই; তিনি যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাকে lucky guess বলা হইয়াছে। তবে ইহা আর্য্যভটের গণনা অপেক্ষা সূক্ষ্ম।

ইহার পরে এই অনুপাতের জন্য নানাবিধ গণনা করা হইয়াছে; এবং তাহার বিস্তৃত ইতিহাসও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।*

আর্য্যভটের অনুপাত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি পাঠকবর্গের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি—

(১) আর্য্যভটের পূর্ব্বে জগতের কেহই এইরূপ সূক্ষ্মগণনা করিতে পারেন নাই।

(২) আর্য্যভটের পূর্ব্বে গ্রীক আর্কিমিডিসই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম গণনা প্রদান করেন।

(৩) খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মেটিয়াস্ এবং ভিয়েটার পূর্ব্বে ইউরোপে আর্কিমিডিস অপেক্ষা সূক্ষ্ম গণনা কেহ করেন নাই।

(৪) সুতরাং মেটিয়াস্ এবং ভিয়েটার পূর্ব্বে জগতের কোথাও আর্য্যভটের অপেক্ষা সূক্ষ্মগণনা হয় নাই।

(৫) আর্য্যভটের গণনা সাধারণ প্রয়োজনের পক্ষে অতিসূক্ষ্ম, এবং মেটিয়াসের গণনার সহিত খুব বেশী পার্থক্য নাই।

আরবেরা এই অনুপাতের গণনা ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। †

গণিতপাদে এই সূত্র থাকা সত্ত্বেও কেহ কেহ বলেন যে এগণনা সম্ভবতঃ আর্য্যভটের নহে। কারণ—(১) গণনাটী অতিসূক্ষ্ম, আর্য্যভট কিরূপে করিলেন? (২) ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বে কেহ, বিশেষতঃ ব্রহ্মগুপ্ত, এই গণনার উল্লেখ করেন নাই।

একটু পরেই দেখাইব আর্য্যভট কিরূপে এই সূক্ষ্ম গণনা করিলেন এবং এই গণনা করিবার উপযোগী জ্যামিতির এবং পাটীগণিতের জ্ঞান এই গণিতপাদে আছে কিনা। ২য় কারণটী সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে ভাস্কর তাঁহার শিষ্যধী-বৃদ্ধিদ তন্ত্রে বলিয়াছেন যে পরিধিকে ৬২৪ দিয়া গুণ করিয়া ৩৯২৭ দিয়া ভাগ করিলে ব্যাসার্দ্ধ পাওয়া যাইবে। আর্য্যভটের গণনাও ঠিক তাই। গ্রন্থ আরম্ভ করিবার সময় নাম স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আর্য্যভটের সিদ্ধান্তকেই মূল করিয়া তিনি এই করণগ্রন্থ রচনা করিতেছেন। অতএব এখানে নাম যে আর্য্যভটেরই গণনার উল্লেখ করিয়াছেন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মগুপ্ত যে উল্লেখ করেন নাই তাহার অন্য কারণ ছিল। তিনি আর্য্যভটকে চিরদিনই করিয়াছেন, কখনও তাঁহার প্রশংসা করেন নাই।

* Ball এর Mathematical Essays & Recreations, এবং Hobson এর Squaring the Circle দ্রষ্টব্য।

† Albiruni's India, Vol. II, p. 67.

এখন আর্য্যভট্ট সম্ভবতঃ কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই স্থূলগণনা করিয়াছিলেন, তাহারই সামান্য আলোচনা করা যাউক। কোন বৃত্তের মধ্যে যদি ষড়্-সম-বাহু-বিশিষ্ট একটী ক্ষেত্র (=regular hexagon) অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে ইহার প্রত্যেকটী বাহু পরিধির ষড়্ভাগের জ্যা হইবে। আমরা পূর্ব্ব শ্লোকে দেখিয়াছি যে পরিধির ষড়্ভাগের জ্যা ব্যাসার্দ্ধের তুল্য। অতএব এই ক্ষেত্রের ছয়টী বাহুর সমষ্টি ব্যাসের তিনগুণের সমান। কোন ক্ষেত্র বৃত্তমধ্যে অঙ্কিত হইলে, তাহার বাহুসমষ্টি (perimeter) বৃত্তপরিধি অপেক্ষা কম হইবে; এবং কোন ক্ষেত্র বৃত্তের চতুর্দ্দিকে অঙ্কিত (circumscribed) হইলে তাহার বাহুসমষ্টি বৃত্তপরিধি হইতে অধিক হইবে। কিন্তু যদি মনে করা যায় যে বৃত্তমধ্যে অঙ্কিত ষড়্-সম-বাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্রের বাহুসমষ্টি প্রায় বৃত্তপরিধির সমান, তাহা হইলে বৃত্তপরিধি তিন ব্যাসের সমান হয়। অতএব অ=৩। ইহাই ব্রহ্মগুপ্তের * উপরি লিখিত প্রথমগণনা। কিন্তু ইহা অতি স্থূল।

উপরোক্ত ক্ষেত্রের প্রত্যেকটী বাহুদ্বারা খণ্ডিত ধনু (arc) যদি সমান দুইভাগে বিভক্ত হয়, এবং এই বিন্দুগুলি যদি পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রের কোণান্তর্গত বিন্দুগুলির সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে বারটী সমবাহুবিশিষ্ট একটী ক্ষেত্র পাওয়া যায়। এইরূপে ২৪, ৪৮, ৯৬, ১৯২, ৩৮৪, ৭৬৮ প্রভৃতি সমবাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র বৃত্তমধ্যে অঙ্কিত করা যায়। আর যে কোন একটী ক্ষেত্রের বাহু গণনাদ্বারা স্থির করা যায়। যে কোন ক্ষেত্রের বাহু যদি "ক" হয়, পরবর্ত্তী ক্ষেত্রের বাহু যদি "খ" হয়, এবং "ব" যদি ব্যাসার্দ্ধ হয়, তাহা হইলে

$$খ^২ = \left(\frac{ক}{২}\right)^২ + \left\{ব - \sqrt{ব^২ - \left(\frac{ক}{২}\right)^২}\right\}^২$$

আমরা উপরোক্ত সূত্রটী হইতে দেখিতেছি যে "খ" "$\left(\frac{ক}{২}\right)$" হইতে বড়, অর্থাৎ "২ খ" "ক" হইতে বড়, অতএব ইহা সহজেই অনুমেয় যে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলির যে কোন ক্ষেত্রের বাহুসমষ্টি পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষেত্রের বাহুসমষ্টি অপেক্ষা বড়। কিন্তু বৃত্তমধ্যে অঙ্কিত কোন ক্ষেত্রের বাহু-সমষ্টি পরিধি অপেক্ষা বড় হইতে পারে না, অতএব আমরা ক্ষেত্রের বাহু সংখ্যা যতই বাড়াইব, পরিধি হইতে বাহুসমষ্টির পার্থক্য ততই কম হইবে। যদি ৭৬৮ সম বাহু

* প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্মগুপ্ত কিরূপে $\sqrt{১০}$ এই গণনা করিয়াছিলেন তাহার সামান্য কারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কথিত আছে তিনি ব্যাসকে একক ধরিয়া যথাক্রমে ১২, ২৪, ৪৮ ও ৯৬ সমবাহুক্ষেত্র বৃত্তমধ্যে অঙ্কিত করিয়া তাহাদের বাহু সমষ্টি যথাক্রমে $\sqrt{১০৫৫}$, $\sqrt{৯৮১}$, $\sqrt{৯৮৬}$ ও $\sqrt{৯৮৭}$ নির্ণয় করেন। এই সংখ্যাগুলি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে এবং "১০" এর নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া তিনি স্থির করেন যে পরিধির আসন্ন পরিমাণ $\sqrt{১০}$ হইবে।

যদিও কোন পুস্তকে উল্লিখিত নাই, তথাপি আর একটী প্রণালীও স্বতঃই মনে উদিত হয়। বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত ষড়্-সম-বাহু ক্ষেত্রের বাহু সমষ্টি যদি "স" হয়, এবং বৃত্তের বহির্ভাগে অঙ্কিত ঐরূপ একটী ক্ষেত্রের বাহু-সমষ্টি যদি "ম" হয়, তাহা হইলে "ম" পরিধি হইতে বড়, এবং পরিধি "স" হইতে বড় হইবে।

কিন্তু সহজেই গণনা দ্বারা স্থির করা যায় যে

ম = ৪$\sqrt{৩}$ ব ; স = ৬ ব ;

আর আমরা জানি যে, পরিধি = ২অ ব ; ব = ব্যাসার্দ্ধ।

অতএব ২$\sqrt{৩}$ "অ" অপেক্ষা বড়, এবং "অ" ৩ অপেক্ষা বড়। যদি মনে করি অ = $\sqrt{৩ \times ২\sqrt{৩}}$ (geometric mean), তাহা হইলে অ = $\sqrt{৬\sqrt{৩}}$। কিন্তু $\sqrt{৩}$ $\sqrt{(৪)}$ = প্রায় $\sqrt{৪}$ = ৪; অতএব অ = $\sqrt{৬ \times ৪}$ = $\sqrt{১০}$।

ইহাকেও যেমিয়াসের গণনার ন্যায় lucky guess বলা যাইতে পারে, কারণ গণনাটী বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত নহে। তবে ব্রহ্মগুপ্তের $\sqrt{১০}$ অতি স্থূল গণনা, ইহার জন্য কোন সূক্ষ্ম উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

বিশিষ্ট একটী ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে তাহার বাহুসমষ্টি, ব্যাস ২০,০০০ হইলে, প্রায় ৬২৮৩২ হয়। আর্য্যভট্ট ইহাকেই পরিধির পরিমাণ ধরিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা পাই, $\pi = \frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}} = ৩\cdot১৪১৬$; ইহাতে যে অশুদ্ধতা থাকে তাহা লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও কম। বাহুর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিলে, আরও সূক্ষ্ম গণনা পাওয়া যায়।

আর্য্যভট্ট যে এই নিয়মেই গণনা করিয়াছিলেন তাহার কোন লিখিত প্রমাণ নাই। তবে ইহা বিজ্ঞানসম্মত উপায়—আর্য্যভট্টের ন্যায় জ্যোতিষী অন্ধকারে ঢিল না মারিয়া এই রূপ কোন উপায়ই যে অবলম্বন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর্কিমিডিসও এই উপায়েই গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে "ক" $\frac{২২}{৭}$ অপেক্ষা ছোট এবং $\frac{২২}{৭}$ অপেক্ষা বড়।

এখন দেখা যাউক এই গণনা করিতে হইলে যে জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন এবং পাটীগণিতের যে নিয়মগুলি জানা দরকার তাহা আর্য্যভটের গণিত পাদে আছে কিনা?

পূর্ব্বোক্ত সূত্রটীর জন্য নিম্নলিখিত জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন—"কোন ত্রাত্য ত্রিভুজের (right-angled triangle) কর্ণের (hypoteneuse) উপর অঙ্কিত সমচতুরস্রের (square) ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের অপর বাহু-দুইটীর উপর অঙ্কিত সমচতুরস্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান।" সাধারণতঃ ইহাকে Pythagorean Theorem বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা ইহাকে "শুল্ব-প্রতিজ্ঞা" নামে অভিহিত করিব। কারণ [Dr. A. Buerk এর পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য] Pythagoras এর জন্মের বহুপূর্ব্বে, ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে যজ্ঞার্থে বেদি নির্ম্মাণ সময়ে এবং শুল্বের (রজ্জুর) সাহায্যে বেদির বিভিন্ন অংশ পরিমাণ করিবার জন্য এই প্রতিজ্ঞার একাধিকবার প্রয়োজন হইত। ভারতীয় ঋষিরা সেই বৈদিকযুগে এই প্রতিজ্ঞার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী-যুগে "শুল্বসূত্রে" ইহা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর্য্যভট্ট পরে ১৭ শ্লোকে এই সূত্র দিয়াছেন—"কর্ণবর্গ ভুজাবর্গ এবং কোটীবর্গের যোগফলের সমান"। ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য আর্য্যভটকে ভারতীয় শাস্ত্র ব্যতীত কোন বিদেশীয়ের শরণ লইতে হয় নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্রানুসারে 'ক' হইতে "খ" বাহির করিতে হইলে, কয়েকটী সংখ্যার বর্গ এবং দুইটী সংখ্যার বর্গমূল বাহির করিতে হয় এবং এই সূক্ষ্মগণনা করিতে আর্য্যভটকে ১০ কি ১২ রাশিযুক্ত সংখ্যা ব্যবহার করিতে হইয়াছে, তা না হইলে ফল অশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এগুলি করা যতই কষ্টসাধ্য হউক্, ইহার জন্য পাটীগণিতের যে উপকরণের দরকার তাহা এই গণিতপাদের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্লোকেই আছে।

"পরিধির ষষ্ঠভাগের জ্যা ব্যাসার্দ্ধের তুল্য"—অব্যবহিত পূর্ব্বশ্লোকের এই সূত্রটী যেন নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে যে বৃত্তমধ্যে অঙ্কিত ছয়-সম-বাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে এই সূক্ষ্মগণনার উপযোগী সমস্ত উপকরণই আর্য্যভটের গণিতপাদে রহিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, আর্য্যভট বোধ হয় এই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার।

কমলার কৃপা

রাজরোগা দুষ্মতি নিশীথে
ডাকে তোমা প্রাসাদের পরে,
ঢাক তবে চপলা দেবতা
যাও তথা রত্নসিংহাসন তরে।
বণিকেরা করি তূর্যনাদ
চাটুবাণী মধুর গাহিয়া,
যাও তথা তুমি তাড়াতাড়ি
পণ্যভরা তরণী বাহিয়া।
দস্যুভাকে চেরী-পরজনে
রক্তমাখা কৃপাণ খুলিয়া
তার গৃহে প্রবেশ বন্দিনী
রহ তথা সকলে ভুলিয়া।

কৃষকের কিছু নাহি পুঁজি
শঙ্খস্বরে দীন আবাহন
পশেনাক' শ্রবণে তোমার
তার সেই করুণ রোদন।
ছিলে যবে বালিকাটি তুমি
ছিলে যবে সাগরের স্নেহে
খেলেছিলে শঙ্খ শুক্তি নিয়ে
চুমি' তারে' দুলালের স্নেহে
আজি বুঝি হয়েছ তরুণী
তূরীভেরী ধরিয়াছে মন
আজিকে পশে না কর্ণমূলে
সে শঙ্খের দীন নিবেদন।

শ্রীকালিদাস রায়।

দুইদেশী

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যোগেশচন্দ্র তাহার মামাকে মুরুব্বি করিয়া কলিকাতায় যে সদাগরী অফিসে তাহার পিতা চাকরী করিতেন তাহারই বড় বাবুকে গিয়া ধরিলে তিনি বলিলেন, "তাইত—তাইত" তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বালক যোগেশ ঘাবড়িয়া গেল। তাহার মামুলও মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। তিনি ইতি পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যোগেশের নিকট নানাপ্রকার আস্ফালন করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার সেই প্রবল শক্তি একেবারে লোপ পাইল। তিনিও বলিলেন, "তাইত"—। যোগেশ কাঁদকাঁদ মুখে বলিল, "একবার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় না।" বড়বাবু বিস্ফারিত নেত্রে একবার তাঁহার পার্শ্বদেশের দিকে চাহিয়া শেষে বলিলেন, "তুমছ' যে উপেন? —ঘোড়াডিঙ্গিয়ে ঘাস! এঁ—এহোকয়া বলে কি? দিবে দিবে এ সব কি হতে চায়!"

তাঁহার রকমসকম দেখিয়া মামুল হরিনাথ মনে ভয় দিবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু যোগেশচন্দ্র সাহসে ভর

করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বড়বাবুর নবিশ হরু উপেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ও সব আজকালকার ধরণ, নইলে কালকের ছোঁড়ারা—যারা আপনার দয়ায় এখানে জায়গা পেলে তারাই আজ আপনাকে মানে না।" এই কথাগুলি যাহাদের উদ্দেশ করিয়া বলা হইল তাহারা ঐ অফিসের "টাইপিষ্টের দল।" এই দল সাহেবদের, বিশেষতঃ বড় সাহেবের সদ্য-সর্ব্বদা সংস্পর্শে আসিয়া বড়বাবুকে ভিঙাইয়া 'যান যাইত'। উপেন্দ্রবাবুর কথাগুলা 'টাইপ বাবুদের' মধ্যে যে প্রধান তাহার কর্ণগোচর হইতেই সে চট্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস না খেলে কি আর আজকাল কেউ আছে! একেত গাধার মত পিঠে বোঝা করে বেড়াইতেই হবে, তা'ছাড়া আবার সময় অসময় চাট খাওয়া। যে গরু দুধ দেয় তার চাট খেতে সবাই রাজি, কিন্তু বাজা গরুর চাট কেউ খাবে না। কে মশায় আপনারা সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন? বলুন, আমি নিজে গিয়ে খবর দিয়ে আসছি সাহেবকে।"

যোগেশ লজ্জিতভাবে সেই যুবকটির নিকট অগ্রসর হইল। কিন্তু সেই টাইপ বাবুটির কথায় বড়বাবু একেবারে আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি এই ঘরের অফিস মাষ্টার, আউট্-সাইডারকে অফিসে থাকতে দেব না। বেরিয়ে যাও তোমরা এঘর থেকে। চাপরাশি—"

হরিনাথ তাড়াতাড়ি যোগেশের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "চল্ বাইরে যাই।" 'টাইপ বাবুটি'ও হটিবার পাত্র নহে,—সে বলিল, "আপনারা বাইরে একটু দাঁড়ান, আমি সাহেবকে বলে আসছি।"

যোগেশ ও হরিনাথ বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপরে 'টাইপ বাবুটি' পুনরায় বাহিরে আসিয়া বলিল, "আসুন আপনারা।" যোগেশ ভীতভাবে বড় সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিল। সাহেব তাহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া যোগেশ তাহার মাতুলের দিকে বারম্বার চাহিতে লাগিল। সেই টাইপ বাবুটিও দাঁড়াইয়াছিল। সে ইঙ্গিতে বুঝিয়া সব কথা বুঝাইয়া দিল। যোগেশ যথাসম্ভব আপনার অবস্থা ও পরিচয় জ্ঞাপন করিলে, অবশ্য বুঝিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলায় সাহেব বলিলেন, "তুমি যে অমরনাথ বাবের পুত্র তাহার প্রমাণ কি? আর তুমি কিছুই ইংরাজী শেখ নাই, এই অল্প বয়সে চাকরী না করিয়া কিছুদিন আরও পড়াশুনা করিয়া তার পর আসিও।" যোগেশ পুনরায় আপনার অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিল, বলিল "চাকরী না করিলে তাহারা অ-হোরে মারা যাইবে।" সাহেব পাকা লোক, তিনি যে সহসা সব কথা বিশ্বাস করিয়া লইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া টাইপ বাবু বলিলেন, "মশায় আপনাকে কোন জানিত ভদ্রলোক রেকমেণ্ড্ করতে পারে কি?" হরিনাথ এইবার গুরুগম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "এমন লোকের রেকমেণ্ড সেটার আনতে পারি যা' আপনারা সাত জন্মেও পাবেন না?" টাইপ বাবু বলিলেন, "তবে তাই নিয়ে আর একদিন আসবেন। আজ যান।" সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার চিঠি আনিবে?" হরিনাথ বলিলেন, "শ্রীরামপুরের রাজা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের।" সাহেব বলিলেন, "বটে! তবে পারত তাহাই আনিও। কিন্তু শুনিয়াছি তিনি খুব দয়ালু লোক, তাঁহার নিকটে পড়াশুনার জন্য সাহায্য চাহ না কেন? আমি তাহার জন্যই বলিতেছি। অমরনাথের জন্য আমরা সকলেই দুঃখিত, কিন্তু কি করিব বাবু, আমরা তোমাদের সাহায্য করিব —এরূপ ক্ষমতা নাই।"

যোগেশ আর কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার মাতুল মহাশয় একটী বিড়ি ধরাইয়া টানিতে টানিতে বলিলেন, "তাইত, তুই যে কিছু ইংরিজি শিখিস্নি তাত' জানতাম না!"

যোগেশ। এখন উপায়?

হরিনাথ। উপায় সুরেনের কাছ থেকে চিঠি আনতে যাওয়া, না হয়—

যোগেশ। না হয় কি?

হরিনাথ। সে তুই পারবিনে।

যোগেশ। পারব, আপনি বলুন।

হরিনাথ। আমার সঙ্গে ব্যবসা করা—

যোগেশ। কি নিয়ে ব্যবসা করব?

হরিনাথ। তোর মাকে বলে যা'কিছু আছে বেচে

কিনে নগদ কিছু হাতে করে লেগে পড়, আমি দু'দিনে তোকে আলিম করে নেব।

যোগেশ। যার কাছে আমি একথা বলতে পারব না।

হরিনাথ। তবে আর উপায় কি?

যোগেশ। আপনি যে বল্লেন অনেক লোকের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে—চলুন না তা'দের কাছে?

হরিনাথ। আজ কি বার?

যোগেশ। শুক্রবার।

হরিনাথ। তাহ'লে কাল যাব।

পরদিন আহারাদি সারিয়া হরিনাথ তাঁহার ভাগিনাকে বলিলেন, "তোর কাছে ক'টা টাকা আছে।" যোগেশ বলিল, "দশ টাকা ছ' আনা।" হরিনাথ বলিলেন, "আচ্ছা —এতেই হবে।"

হরিনাথ ও যোগেশ Race-course অভিমুখে চলিয়া গেল। Race-course-এ লোকারণ্য দেখিয়া যোগেশ তাহার মাতুলকে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করিল। হরিনাথ বলিলেন, "ঐখানেই আমরা যাব, চল না যজ্ঞা দেখি।" যোগেশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "যজ্ঞা দেখবার সময় নয়, আপনার বন্ধুদের কাছে যাবেন কখন? সেইখানে আগে চলুন।"

হরিনাথ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "সে কাজ ঐখানেই হবে।"

কিন্তু কলিকাতার এই আইনসঙ্গত জুয়ার আড্ডায় যোগেশ কি যে দেখিল তাহা বর্ণনা করা কঠিন। এই এত বড় একটা জনতা কিসের উত্তেজনায় যে এত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহার মাতুলের সঙ্গগুণে এবং প্রয়োচনায় বালক যোগেশও ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে দেখিল ১৩।১৪ বৎসরের বালক হইতে অতি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত 'বুকি'র দিগের নিকট হইতে কোর্সের বসিবার স্থান পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছে। টাকা দিয়া প্রবেশ করিবার অধিকার ক্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘোড়ার দর দেখা, লোকের নিকট টিপ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি ব্যাপারে ও নানালোকের সঙ্গে ঐ বিষয়ে যোগদান আলাপে তাহার মাতুলের অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করিয়া সে প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার মাতুল যখন হঠাৎ বলিলেন, "দেখ ভোড়া তোর ভাগ্নেটাই কি রকম, কোন্ ঘোড়াটা ধরব বলুক?" তখন সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মাতুল বলিলেন, "বলনা যে তোর কোন্‌টা পছন্দ হয়?"

যোগেশ। কি পছন্দ হবে?

হরিনাথ। ঐ যে বোর্ডে নাম দেখছিস্—ঐ ছোকাগুলোর মধ্যে কোন্‌টা তোর পছন্দ হয়।

যোগেশ। তা'তে কি হবে?

হরিনাথ। তা'তে এই হবে যে যদি ঐ ঘোড়াটা জেতে তা'হলে আমরা অনেক টাকা পাব। কোন্‌টা ধরব?

যোগেশ। তা' আমি কি জানি?

হরিনাথ। না না অনেক সময় আনাড়ির ভাগ্যে লেগে জেতেও ত' পায়ে; বল না।

যোগেশ কিছু না বুঝিয়া যে সে একটা পছন্দ করিল। হরিনাথ নিজের পছন্দমত একটা ধরিয়া তার পর যোগেশের পছন্দ ঘোড়াটার উপরও একটা টাকা ধরিল। তার পর যোগেশকে লইয়া গিয়া ছোট Enclosure-এর বসিবার বেঞ্চিতে বসাইয়া কোন্ কোন্ ঘোড়ার উপর টাকা ধরা হইয়াছে তাহা তাহাকে চিনাইয়া দিল।

যোগেশও ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার ঘোড়া যদি জেতে—তাহা হইলে ১ টাকায় ১০ টাকা পাওয়া যাইবে। কি আনন্দ! কি ফূর্ত্তি! এতও এক অদ্ভুত উপায়।

ঘোড়া ছুটিয়াছে। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, অনেকে বাইনকুলার লাগাইয়া নিজের নিজের ঘোড়া দেখিতেছে। ঐ আসিতেছে। ঐ অমুক বাহির হইয়াছে। ঐ যোগেশদের ঘোড়াটা আসিতেছে। Goon অমুক, easy—easy—In a Canter এই সব অবোধ্য শব্দ চতুর্দ্দিক উত্থিত হইয়া যোগেশকে বিহ্বল করিয়া দিল। যোগেশ চাহিয়া দেখিল, তাহার মাতুল চিৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিবার যোগাড় করিয়াছেন। তার পর হঠাৎ সব চুপ চাপ কেবল গম্ভীর গুঞ্জন—৭ কি সের যেন অপেক্ষার ভাব সেই প্রকাণ্ড জনতাকে স্তব্ধের পূর্ব্বে সাগরের মত করিয়া ফেলিল। তার পর ছুট্ ছুট্—হরিনাথ

আগিসের হাজিরা টাইমে টেলিতে টেলিতে চিৎকার করিয়া বলিলেন, "ওঃ যোগা No ; চল চল, কি অন্যায় Upset! আঃ কেন আর ২ টাকা বলিনি।"

তাহাদের 'বুক বেকারের' নিকট হইতে টাকা গণিয়া লইয়া হরিনাথ বলিলেন, "বেশ্‌লি হতভাগা! কি মজা করে টাকা পাওয়া গেল?"

ইহার পর যাহা হইল তাহা আর বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। মোটামুটি কথা এই যে যোগেশ যখন বাসায় ফিরিল তখন তাহার পকেটে দশ টাকার দু' আনার পরিবর্তে কয়েকখানি নোট ও নগদও কিছু খুন্ খুন্ করিতেছিল, এবং তাহার মামুল মাঝে মাঝে তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিতেছিলেন, "ছোঁড়া তোর ভাগ্যি খুব ভাল, আজ প্রায় সবগুলোই upset হ'ল! কি আশ্চর্য্য!"

যোগেশ অত কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক অকস্মাৎ এতগুলা টাকা তাহার পকেট পূর্ণ করাতে সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত সারাদিনটা চুপ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু বাটীতে ফিরিয়াই সে মাকে একখানা পত্র লিখিয়া দিল। তাহাকে সমস্ত কথা বর্ণনা করিয়া শেষে লিখিল, "মা, কি ফূর্ত্তি? বাবা যদি এত জানেন, তা' আমাদের সে টাকাগুলো ফেলে দেন না কেন?" তার পর দু'দিন নানা স্থান ঘুরিয়া সময় কাটাইয়া শেষে আবার কবে ঐস্থানে যাওয়া হইবে এই বিষয়ে সে তাহার বাবাকে প্রশ্ন করিল। বাবা হাসিয়া বলিলেন, "দাঁড়া ব্যাপা! শনিবার আসুক।" কিন্তু শনিবারের পূর্ব্বে তাহার মাতার যে পত্র আসিল তাহা অতি ভয়ানক। মাতা লিখিয়াছেন।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পড়িয়া আমার মরণাধিক যন্ত্রণা হইয়াছে। তোমার বাবা যে তোমার এত বড় শত্রুতা করিবেন, তাহা জানিতাম না। যাহাই হউক, যে টাকা পাইয়াছ তাহার পাইপয়সাটি তোমার মামাকে ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া আসিবে। স্থির জানিও যে ঐ টাকার প্রত্যেক পয়সাটা তোমার বাবার এক এক ফোঁটা রক্ত। তোমার পিতা ঐ ভাবের ঘোরে ঝুঁকিয়া শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দুশ্চিন্তায় মরিয়াছেন। তুমি সংসারে প্রবেশ না করিতেই পিতৃরোগে আক্রান্ত হইলে! ইংরেজ সরকার এত আইনকানুন করিতেছেন আর গরীবদের সর্ব্বনাশের জন্য ঐ জাকাতদের কেন এখনো ছাড়িয়া রাখিয়াছেন জানি না। যাহাই হউক তুমি আর ওখানে থাকিও না পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। কিন্তু সাবধান ঐ জুয়ার এক আধলাও যদি ঘরে আনো তাহা হইলে তোমার মুখ দেখিব না।

ইতি—তোমার মা।

পত্র পড়িয়া যোগেশের মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। কি অন্যায়! ইহারই নাম জুয়াখেলা? সে ক্রুদ্ধভাবে মামুলকে জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, সে দিন আপনি আমায় জুয়োর আড্ডায় নিয়ে গিয়েছিলেন?"

হরিনাথ। সে কিরে? জুয়োর আড্ডায় আবার কবে তোকে নিয়ে গেলাম?

যোগেশ। মার পত্র পড়ে দেখুন।

হরিনাথ পত্র পড়িয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "মেয়ে বুদ্ধি আর কত হবে! জুয়ো নয়, জুয়ো নয়—রেস্, রেস্।"

যোগেশ। থোক্ রেস্—মা যখন বল্‌ছেন জুয়ো তখন জুয়ো। বাবা নাকি এতে সব টাকা খুইয়েছিলেন। না মামা, আর আমি ওখানে যাব না। আপনি সব টাকা নিয়ে যেন। আমি ও টাকা নেব না।

হরিনাথ। ঐ সব পাকামি করেই তোমার মা মেলেন। এ টাকা নেব না, ও টাকা নেব না, ওঁর জন্যে স্বর্গ থেকে টাকা আস্‌বে! তুই কেন এ সব কথা লিখ্‌তে গেলি?

যোগেশ। মাকে লিখ্‌ব না?

হরিনাথ। মেয়ে মানুষে কি বোঝে?

যোগেশ। তবে এপত্রের কি উত্তর দেব?

হরিনাথ। লিখে যে জুয়ো নয়—রেস্। যোগেশ তাহাই লিখিল। কিন্তু পত্রোত্তরে তাহার মাতা লিখিলেন, "তোমার এরই মধ্যে অধঃপতন হইতেছে যোগেশ! অত বড় দিব্য দিলাম তবু তুমি শুনিলে না? যদি ভাল চাও পত্র পাঠ চলিয়া আসিবে।" যোগেশ ভয়ে ভয়ে সমস্ত টাকা মামুলকে দিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া গেল।

কিন্তু ধর্ম্মের পথে সর্ব্বদাই বিঘ্ন। অজয় বহুই সন্তোষে ঐ পথে যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন—তাই নানা বিঘ্নে

কম্পিত হইয়া পড়িতেছিলেন। কেশবপুর গ্রামে বন্দের অন্যান্য গ্রামের ন্যায়, কারণে অকারণে গোলযোগের অন্ত ছিল না। তাঁহারই পাড়ায় একটী দরিদ্র পরিবারের একটী বিধবা অনাথা বালিকাকে লইয়া একটা মস্ত দলাদলি পাকিয়া উঠিয়াছিল। অভয়া সেই অনাথা বালিকার পক্ষসমর্থন করাতে তাঁহার উপরও নির্য্যাতন চলিতেছিল। তিনি এই নির্য্যাতন গ্রাহ্য না করিলেও হুকা-নাপিত বন্ধ করার অপেক্ষাও যখন অধিকতর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, তখন তিনি বাধ্য হইয়া যোগেশকে বলিলেন, "যেমন করিয়াই হউক অনিলাদের বাঁচাতেই হবে।"

যোগেশ। কি করব?

অভয়া। তুমি সুরেনকে পত্র লেখ।

যোগেশ তাহাই করিল, কিন্তু সে পত্রের যে উত্তর আসিল, তাহাতে মাতা-পুত্রে অবাক্ হইয়া গেল। একজন কর্ম্মচারী লিখিতেছেন, যে রাজা সাহেব বাড়ীতে নাই, কোথায় যে গিয়াছেন; তাঁহারও কোন খোঁজ কেহ দিতে পারে না। সকলেই তাঁহার জন্য চিন্তিত। অভয়া দেবী পুনরায় তাঁহার দা'য়ের নামে পত্র দিলেন। কিছুদিন পরে তাহারও উত্তর আসিল, কিন্তু সেই কথা, সুরেন সেখানে নাই, বাড়ীতে কান্নাকাটী পড়িয়াছে। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, রাজাসাহেবের বারণ আছে? তবে তাঁহার নামে কেহ পত্র দিলে তিনি রাজা সাহেবের কাছে পাঠাইয়া দিতে পারেন। অভয়ার পত্র ম্যানেজারের জিম্মা লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অভয়া হতাশ হইয়া বলিলেন, "এখানকার বাস তুলে দিতে হবে দেখ্‌ছি, আরত' সহ্য হয় না।" কুদ্ধ যোগেশ বলিল, "কেন মা, সুরেন দাদাত' আমাদের এই গ্রামের জমিদার করে দিয়েছেন। আমরা কেন সেই জোরে কাজ করি না?"

অভয়া। ছি বাবা, তা' কেন করতে যাব? কথা-বার্ত্তার সেই বাঘের চামড়া গায়ে দিয়ে গায়ের কি হয়েছিল তা' জানত?

যোগেশ। তাহ'লে কি করব? আমাদেরই দিন চল্‌ছে না, ওদের কি করব? অনিলা-আর তার মার কষ্ট দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়। কাল সারাদিন তারা খেতে পায়নি তা' জান? আমি সন্ধ্যা বেলায় গিয়ে দেখি, অনিলা বসে কাঁদ্‌ছে আর তার মা তাকে বক্‌ছে? আমি গিয়ে সব খোঁজ নিয়ে তাদের বাড়ীর থেকে চাল আন্‌তে গেলাম, পাড়ী দোকানী তা' দিলে না। তখন বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়ে দিই, তবে তারা খেতে পায়।

অভয়া। সে কিরে, কৈ একথা ত' আমায় বলিস্ নি? তা'তেই রাতে চাল ছিল না?

যোগেশ। কি করব, আমরাত' দিনে খেয়ে ছিলাম। না হয় রাতে নাই হল, তাই ভেবে একটা ওদের দিয়ে এসে ভোরে উঠেই লাক্ষলাপুরের হাটে যাই।

অভয়া দেবী কি করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না, উপরন্তু বিপদের উপর বিপদ ঘনাইয়া আসিল। তাঁহারা যখন নিজের মুখের গ্রাস ত্যাগ করিয়া সেই অনাথা পরিবারের সাহায্য আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাদের একজন উত্তমর্ণ তাঁহাদের ব্রহ্মোত্তর জমিগুলি ডিক্রি করিয়া ক্রোক দিল। গ্রামের বাবুরাও যোগেশের নামে কেশবপুরের জমিদারীটা হওয়ার পর হইতে তাহাদিগকে তেমন শ্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। তাই এই নির্য্যাতন ব্যাপার প্রবল হইয়া উঠিল। এমন কি সুবলসরকার, যিনি কেবল ভয় দেখাইবার জন্য যোগেশদের বাড়ীটার উপর ডিক্রি করিয়া রাখিয়া এত দিন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, তিনিও বাধ্য হইয়া এই দলে যোগ দিলেন এবং অভয়া দাসীকে গৃহহীন করিতে উদ্যত হইলেন।

বালক হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "মা চল সব বেচে কিনে এখান থেকে পালাই।" অভয়া সরুচক্ষে বলিলেন, "কিছুতেই নয়, আমাদের লাঠি মেরে যতক্ষণ না বার করছে ততক্ষণ ঘরের ভিটে ছাড়্‌ব না।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ব্যালজ্যাকের Pnyde Chagrin এর নায় কয় পক্ষে গায়ের চামড়াটা যে কার্য্য করিয়াছিল, রঘুলালের পক্ষে সুরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত অর্থ কতকটা সেই কার্য্যই করিল। এই অর্থের জন্য স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া রঘুলালের পক্ষে সাপে ছুচা-গেলার মতই হইল, সে যেন ইহা ছাড়িতেও

পারে না, অথচ না ছাড়িলেও উপায় নাই, কারণ ঐ গাধার চামড়ার মত ঐ অর্থ সর্ব্বপ্রকার বাহ্য সুখের ব্যবস্থা করিল বটে, কিন্তু প্রধান সুখ আত্মপ্রসাদ হইতে তাহাকে জন্মের মত বিচ্যুত করিল। উহার বিপুল আয়োজনের-চাপে পড়িয়া রঘুলালের চিত্ত দিনে দিনে বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইহা ফেলিয়াও কোন উপায় নাই। সুরেন্দ্রনাথ যে সূক্ষ্ম অথচ ভীষণ শাস্তির মধ্যে তাহাকে ফেলিয়াছিল, অন্যের পক্ষে তাহা তত গুরুতর না হইতে পারিত, কিন্তু রঘুলালের পক্ষে তাহা প্রাণান্তকর হইয়া উঠিয়াছে। রঘুলাল মাঝে মাঝে মোটরে করিয়া শ্রী নগর ঘুরিয়া আইসে, তাহার পিতামাতার অবস্থা দেখিয়া আইসে, অথচ কোন উপায় নাই। তাহার পিতা কতদিন তাহারই গাড়ীকে পথ দিবার জন্য পথপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার ভ্রাতা কতদিন কার্য্য হইতে মুখ তুলিয়া তাহার সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করিয়াছে। তাহার মাতা কতদিন বাগের খুঁটিতে বেলিয়া তাহাকে বাড়ী তৈয়ারীর তত্ত্বাবধারণ করিতে দেখিয়াছেন। অথচ একটী দিনের জন্যও তাহাকে ডাকিয়া কেহ একটী কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই। এ যে কত বড় অত্যাচার, কত বড় পরাধীনতা, তাহা কেবল রঘুলালই অনুভব করিত।

প্রথম প্রথম রঘুলাল মনে করিয়াছিল যে, চিরদিন এমন যাইবে না; তাহার স্নেহশীল পিতা অন্ততঃ একটী দিনের জন্যও তাহাকে ডাকিয়া দু'একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন সে কি করিবে, তাহারই জল্পনা করিতে করিতেই সময় কাটিত। মনে করিত বাবাকে যেন দু'কথা শুনাইয়া দিয়া তার পর পাকেপ্রকারে লুকাইয়া লুকাইয়া তাহাদের সাহায্য করিবে। কিন্তু তাঁহারা কেহই রঘুলালকে ডাকিলেন না। তখন সে লুকাইয়া কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার উত্তরে তাহার পিতা সেই লোকের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "ভিক্ষুকের অন্ন তিনি মুখে করেন না, তবু ভিক্ষুক হইলেও হইত, ইহা চোরের টাকা। রাজাসাহেব যে কাজটী বাদ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকটে রঘুলাল যে সর্ত্তে এই টাকা পাইয়াছিল, সে সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া এই টাকা পাঠান রঘুর পক্ষে চুরি করার সমান। অতএব চোরের টাকা কোন সাধুব্যক্তিই লইতে পারে না।"

রঘুলাল এই উত্তর পাওয়ার পর হইতে যেন মরিয়া হইয়া উঠিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, সুরেনের এই অত্যাচারের এমন প্রতিশোধ লইবে যাহাতে ধনীদের ধনবত্তার মুখে চুণ-কালী পড়ে। সুরেন যখন তাহাকে আত্মীয়স্বজন হইতে এমন ভাবে বিচ্যুত করিয়া, তাঁহাদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়া, কেবল ধনভোগ করিবার চাবি তাহার হাতে চাপাইয়া দিল, তখন তাহাকেও রঘুলাল দেখাইবে যে, অধিকাংশ ধনী কি ভাবে অর্থের সদ্ব্যবহার করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই রাজাসাহেবই কি ভাবে এই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার চখের উপর ধরিয়া দিবে। আত্মীয়-স্বজন থাকিতেও যাঁহারা আপনার অতি সামান্য সুবিধার জন্য সংসারের সমাজের ও নিজের আত্মীয়স্বজনের কত দুঃখ উপেক্ষা করেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন হঠাৎ আজ নিজের দুর্মতি হওয়াতে যে দরিদ্রসন্তান রঘুলালের উপর এতটা গুরুগিরির অত্যাচার করিবেন, ইহা অসহ্য! এইরূপে সুরেনের উপর অভিমানটা ক্রমশঃ ক্রোধে পরিণত হইয়া এখন সমস্ত ধনী শিক্ষিত ও উচ্চ জাতীয়দিগের উপর পড়িল। তাই রঘুলাল মনে মনে দুইটী প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—প্রথমতঃ সে স্বার্থপর ধনীদিগের যতগুলি দোষ থাকা সম্ভব, সবগুলিই প্রকাশ করিবে, দ্বিতীয়তঃ সে অভিজাত্য গৌরবের মাথায় পদাঘাতের জন্য উচ্চ সমাজের মধ্যে বিবাহ করিবে। কার্য্যেও ক্রমশঃ তাহাই করিল। তাহার উচ্চ শিক্ষার দোহাই দিয়া বিলাতফেরতা ও নব্যশিক্ষিতসমাজের বহু যোগাযোগ তাহার জুটিল। এবং সেই সঙ্গে সুরা ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারেরও অসদ্ভাববহার হইল না। সুরেনের এবিষয়ে কোনই বাধা না থাকাতে অর্থও স্রোতের মত আসিয়া স্রোতের মতই বহিয়া যাইতেছিল। এমন কি এই অর্থব্যয়ে তাহার উচ্চ শিক্ষিত বন্ধুগণের মধ্যে রঘুলালের মন পাইবার জন্য নানাপ্রকার উপচারে আয়োজনে উপাসনার রেষারেষী লাগিয়া গেল। দেখিয়া শুনিয়া রঘুলাল তাহার পিতার তৈলচিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "দেখ্‌ছ বাবা! তুমি উপহাস করে কি করবে?

তোমার ছেলে তোমাকে উপেক্ষা করেও সুখী হ'তে জানে। যার, রাজাসাহেব নেই, শুকদেব থাকলে দেখ্‌তে পেতেন যে, তাঁর দাঁতারীর বেতমাত্রা কি রকম পুষ্পবৃষ্টি হয়ে আমার গায়ে এসে পড়্‌ছে। তিনি আস্‌বার আগে আমি এমন বাবুসাহেব হয়ে উঠ্‌ব যে, তিনিও আর আমায় চিন্‌তে পারবেন না।"

কিন্তু তবু সুখ কোথায়? এ যে বিষ খাইয়া বলিতে হইতেছে অমৃত পান করিতেছি। এ যে গেটের Faust এর মত নরকের দূতের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া বলিতে হইতেছে যে, আমি স্বর্গরাজ্য পাইয়াছি। রঘুলাল মদ খাইতেছে, কিন্তু তাহাতে বলা আরও বাকিতে চায়—সে সুরার অপেক্ষাও যাহা ভয়ানক সেই অর্থক্রীত রমণী-সঙ্গের মধ্যে আপনাকে ডুবাইতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহার যাহা হইতেছে, তাহা ভগবানই জানেন। রঘুলাল দিনে দিনে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে, অনুভব করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া আরও ভয়ঙ্কর পরলোৎসব আরম্ভ করিল।

তাহার আন্তরিক নির্মমতায় লজ্জা করিয়া তাহার কোন উচ্চ শিক্ষিত বিলাতফেরত এক অদ্ভুত চলে চালিলেন। এতদূর একটা ধনীকে এমনভাবে নষ্ট হইতে দেখিয়া তিনি নিস্বার্থ পরোপকারার্থ বলিলেন, "মিষ্টার দাস, আর কতদিন এমন একলা কাটাবে একটা বিয়ে-থাওয়া কর।"

রঘু। বিয়ে?—তা' করতে পারি কিন্তু Willing bride পাচ্ছি কোথায়?

বন্ধু। Oh, Brides there are many and to spare.

রঘু। বল কি হে? কোথায়!

বন্ধু। কেন? তুমি Mr. Sircar. এর daughter কে woo কর না?

রঘু। Mr. Sircar! আরে তিনি যে কায়স্থ?

বন্ধু। Oh damn that old effete cast fad, we have only one religion and that is money making; we have only one caste and that is 'The cultured class; we fear only one sin and that is poverty.

রঘু। কি ভয়ঙ্কর! এই কথা আমার মুখফুটে বলছ? লজ্জা করছে না?

বন্ধু। লজ্জা? কেন? In these days of light and culture এসব মত ত' সকলেই openly profess করছে। The days of hypocresy are gone—

রঘু। And those of sophisthers economics, calculators and, I may add, of open rascals have succeeded.

বন্ধু। Rascalism বা এতে কি পেলে? এখনকার দিনে Law of necessity, doctrine of 'make hay when the sun shines', এই মত অনুসারেই ত' জগৎ চলছে। সেই অনুসারে না চললে আর রক্ষে আছে? Your morality of rags won't take bread.

রঘু। যাই হক ভাই তুমি তা' হলে জোগাড় কর, আমি বিয়ে করতে রাজী। তোমাদের মত খাঁটা neo-culturist আমায় শীগ্‌গির জুটেই হবে।

বন্ধু। আমি করব কিহে, Here in you must minister to your own needs.

রঘু। কি করতে হবে?

বন্ধু তখন সেই সব বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধুমহলে প্রচার হইয়া গেল যে, Miss Sircar এর সঙ্গে মিষ্টার R. Dasa engaged হইয়াছেন।

বন্ধুমহলে একটা মহাভোজের আয়োজন চলিতে লাগিল। অনেক সাহেব ও বাঙ্গালী মিষ্টার ও মিসেস ঘন ঘন রঘুলালের প্রাসাদে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার উপহারের দ্রব্যে রঘুলালের গৃহ পুরিয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু তবু ইহাতে আনন্দ নাই। রঘুলাল তবুও মুখ অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকে। কয়েক জন বন্ধু মোট তুলিয়া একদিন অগ্ন-বিহারের বন্দোবস্ত করিল। পক্ষকালের পূর্ণ আয়োজন করিয়া রঘুলাল একদিন প্রকাণ্ড একখানা ষ্টীমার ও বজরা সঙ্গে লইয়া শ্রীরামপুর রিসড়া প্রভৃতি বেড়াইয়া আসিল। তাহার নবনির্মিত গৃহে একদিন

পানভোজনের বিরাট আয়োজন করিয়া তাহার দরিদ্র পিতার বুকের উপর তাহার নবলব্ধ ধনমত্ততার প্রত্যাঘাত করিয়া আসিল। কিন্তু হায় সেই সন্ধ্যার সমস্ত আলা তাহাকেই ফিরিয়া আসিয়া দগ্ধ করিল।

কোথায় সুখ! কোথায় শান্তি!! ক্রীতদাসের সমস্ত দম্ভই ফাঁকা আওয়াজ! পরের চাক ঘাড়ে করিয়া যাহার বেড়াইলেও যে বাজাইতেছে সে পিছনে, লাগিয়াই থাকে, যতই শব্দ হয়, ততই তাহার তাহার প্রচার হয়। রঘুলাল পাগলের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রীরামপুরে তাহার পিতার দরজা হইতে তাহার কলিকাতা-প্রাসাদ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা প্রতি পদে ভরিয়া ফেলিল। কিন্তু চর্মকার পিতার ক্ষুদ্র খোলার ঘরখানা তেমনি উপহাসে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ মাটির ক্ষুদ্র দাওয়াটায় পবিত্রভাবলম্বন করিবার সাহস তাহার একদিনও হইল না। সে কেবল প্রার্থিত স্বর্গের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইতে লাগিল।

এই অবস্থায় একদিন সে দেখিল, তাহার পিতা মাথায় হাত দিয়া দাওয়ায় বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখে এমন গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, পথ হইতে তাহা দেখিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাকে গেটের বাহিরে আসিতে দেখিয়াই রামস্বরূপ উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই রঘুলাল থমকিয়া দাঁড়াইল। রঘুলাল দেখিল, তাহার পিতার চক্ষে কি ঘৃণা! অথচ একদিন এই পিতাই তাহার জন্য সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও দুঃখ সহ্য করিয়া তাহাকে সুরেন্দ্রনাথের হস্তে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। এই পিতাই তাহার জন্য অনাহার অনিদ্রা শোক সমস্তই একদিন অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন। আর আজ সেই পিতাই তাহাকে ত্যাগ করিলেন। কিন্তু সে যে এইরূপ হইয়াছে, ইহা কি তাহার একার দোষে? তাহার পিতার কি ইহাতে কোন হাত ছিল না? তিনি কেন তাহাকে এই ঘোর আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আজ সরিয়া দাঁড়াইলেন? কেন সে একা এযন্ত্রণা সহ্য করিবে?

রঘুলাল কর্মকাল স্তম্ভিতের ন্যায় পিতার দিকে চাহিয়া রহিল, শেষে কি ভাবিয়া তাহার পিতৃদেবের পার্শ্বস্থিত একজন পরিচিত মুচিকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে শুনে যাও।" তাহার স্বর শুনিয়া রামস্বরূপ ক্রুদ্ধভাবে চট্ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বোধ হয় সে মনে করিয়াছিল যে, রঘুলাল তাহাকেই ঐ ভাবে আহ্বান করিতেছে। ফিরিয়া দেখিল, তাহার প্রতিবাসী জগদীপ রঘুলালের নিকটে গিয়া সসম্মানে দাঁড়াইয়াছে। রঘুলাল বলিল, "তুমি আমার এই জুতো জোড়া বুরুষ করে এনে দাও, তোমায় আমি দশ টাকা দেব।" জগদীপ অভিবাদন করিয়া রঘুলালের পরিত্যক্ত জুতাজোড়া উঠাইয়া লইল। রঘুলাল একবার সস্মিত চক্ষে পিতার দিকে চাহিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। রামস্বরূপ তখন জগদীপকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি জুতোজোড়া ফিরিয়ে দিয়ে এস, তোমায় আমি দুটিটাকা এখনি দিচ্ছি।" জগদীপ হাসিয়া বলিল, "বাপে বেটায় তোমাদের এমনতরা কতদিন থাকবে, বাবু থেকে আমি যারা পড়ব। না ভাই আমি তা' পারব না।" জগদীপ নিজ দোকানে প্রবেশ করিল।

রঘুলাল টলিতে টলিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, সমস্ত সংসার হইতে একটা ভয়ানক উষ্ণ বায়ু তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। যেন কক্ষের দেওয়ালগুলা ক্রমশঃ ক্রমশঃ সরিয়া আসিয়া তাহাকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে। এ কি হইল? সে একি করিয়া বসিল? সে পিতার পদতলে পড়িবার প্রবল ইচ্ছায় ছুটিয়া গিয়া একি করিয়া বসিল? সে কেমন করিয়া তাহার পিতাকে এমন ভাবে, জগতের সহস্র চক্ষুর সম্মুখে অপমান করিল, আঘাত করিল! রঘুলাল যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইল, চতুর্দিক হইতে ধিক্কারধ্বনি তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাহার কর্ণে ঘোরবেগে বাজিতেছে।

বহুক্ষণ সেই ভাবে বসিয়া থাকিয়া শেষে একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহার হাতে দশটাকা দিয়া বলিল, "ঐ সাহেবের মুচি জগদীপকে এই টাকা কটা দিয়ে এস, আর ও যে জুতো জোড়া দিবে তা' ঐ আলমারির মাথায় রেখে দিও। আমি একবার বেড়াতে চল্লাম, দুপুরবেলায় কিছু খাব না।"

রঘুলাল শুধু পায়ে শুধু মাথায় রাস্তায় বাহির হইয়া

চলিতে লাগিল। কোথায় যাইবে তাহার ঠিক নাই—কেবল চলিবার জন্যই চলিল। এই ভাবে সমস্ত দ্বিপ্রহর ঘুরিয়া সে গঙ্গার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর রৌদ্র-করোজ্জ্বল স্রোতের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "মা, তুই আমার এই জ্বালা জুড়িয়ে দিবি?" জলের স্রোত কল কল স্বরে তাহার বিকৃত কর্ণে কি বলিল কে জানে, কিন্তু সে ক্ষণপরে জলে নামিয়া গোটা পাঁচ সাত ডুব দিল এবং এক পেট জল খাইয়া ভিজা কাপড়ে উপরে উঠিয়া আসিয়া আবার চলিতে লাগিল। অন্যমনে চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা নাতিবৃহৎ উদ্যানের গেটের সম্মুখে একটা ট্যাবলেটের উপর দৃষ্টি পড়াতে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পাঠ করিল, "অনাথা-আশ্রম।" অনাথাদের আশ্রম! অনাথের আশ্রম নয়? অনাথদিগের কি এখানে স্থান নাই? জগতের কোথাও নাই—কেবল আছে মৃত্যুতে?

রঘুলাল কি ভাবিয়া সেই উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল। তার পর চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিল, শ্রীরামপুরের কাছে এরকম আশ্রম কে খুলিল? উদ্যানটা অবশ্য তাহার অল্প অল্প পরিচিত কিন্তু ইহা অনাথা-আশ্রমে পরিণত হইল কাহার দয়ায়। রাজাসাহেবের কি? হইতেও পারে। রঘুলাল ক্রমশঃ উদ্যানপথে অগ্রসর হইয়া দেখিল, সম্মুখেই তাহার পরিচিত একটা বাঙ্গলা; কিন্তু উক্ত বাঙ্গলা হইতে তফাতে তফাতে আরও কয়েকটা বাঙ্গলা প্রস্তুত হইতেছে। বহুলোক উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত। রঘুলাল অগ্রসর হইয়া একব্যক্তিকে প্রশ্ন করিল, "এই আশ্রম কে তৈরী করছে?" লোকটী উত্তর দিল, "কলকাতার কাজল বাবু।"

রঘু। কলকাতার কোথায় তার বাড়ী?

লোক। কলকাতার কোথায় বাড়ী তা' বল্‌তে পারিনে, তবে এখন তিনি এইখানেই আছেন, ঐ পুরোণো বাঙ্গলায় আছেন। তাঁর কাছে কি তোমার কোন দরকার আছে।

রঘু। দরকার? হাঁ তা' আছে বৈকি, এখানে কি তাঁর কোন লোকজন নেই?

লোকটী বলিল, "লোকজন আমরাই; কি বল্‌বে বল আমিই বলে পাঠাচ্ছি।"

রঘুলাল ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি ভিক্ষুক যদি কিছু ভিক্ষা পেতাম।—"

লোকটী হাসিয়া বলিল, "তা' আগেই বুঝিছি, তা' এত ভনিতা কেন? যাও ঐ বাঙ্গলার বারান্দায় যাও, সেলেই বাবুকের সঙ্গে দেখা হবে।" লোকটী রাজমজুরদের কার্য্য দেখিতে চলিয়া গেল।

রঘুলাল কিন্তু লোকটার কথায় অবাক হইয়া ভাবিতেছিল, তাই কি? তাহার চেহারার উপর ভিক্ষুকের ছাপ পড়িয়া গিয়াছে? সে অন্তরে বাহিরে ভিক্ষুক হইয়া গিয়াছে? এই সামান্য লোকটাও তাহাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছে যে সে ভিক্ষুক? ভগবান্! এতদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়া করিয়া সে ইহাই হইয়াছে?

রঘুলাল সেই বাঙ্গলাটার বারান্দায় উঠিয়া কোন দিকে না চাহিয়া সম্মুখেই যে বেঞ্চিখানা ছিল তাহার উপর শুইয়া পড়িল। স্থানটী বেশ শান্ত, বারান্দাটী কি একটা লতার দ্বারা ঢাকা। বাঙ্গলার দরজাটাও দ্বিপ্রহরের উত্তাপের জন্য বন্ধ করা রহিয়াছে, কিন্তু কক্ষের ভিতর হইতে যন্ত্র-গুঞ্জন ধ্বনি আসিতেছে, সর্ব্বোপরি মৃদু মৃদু বাতাস বহিয়া রঘুলালের শ্রান্ত ও অবসন্ন দেহকে নিস্পন্দ করিয়া দিল। রঘুলাল ক্ষণকাল মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

এইভাবে সে যে কতক্ষণ ছিল তাহার ঠিক নাই, কিন্তু যখন সে জাগিল তখন শুনিল অপরিচিত বামা-কণ্ঠে তাহাকে বলিতেছে, "মশায় কে আপনি?" রঘুলাল চমকিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি রঘুলাল—এঁ্যা! আমি পথিক?" যিনি কথা বলিলেন তিনি ফিরিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ পুরুষটীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে বল্লে, ভিক্ষুক?" পুরুষটী হাসিয়া বলিল, "সে কিহে তুমি কেমন তর লোক? এই তুমি বল্লে ভিখিরী এই বল্‌ছ পথিক?" রঘুলাল লজ্জিত হইয়া বলিল, "ক্ষমা করুন আমারই ভুল হয়েছে। আমি ওঁকে ঐ কথাই বলে ছিলাম বটে।"

স্ত্রীলোক। তবে এখন তা' বল্‌ছেন না কেন?

রঘু। যা' চেয়েছিলাম তা' পেয়েছি।

স্ত্রীলোকটী অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর বলিল, "কি পেয়েছেন?"

রঘু। কিছুক্ষণের জন্ত আশ্রয় আর খাদ্য, তা' পেয়েছি। দেবি! আপনিই বোধ হয় অনাথাদের জন্ত এই আশ্রম তৈরি করছেন। একজন অনাথও এতে কিছুক্ষণ আশ্রয় নিয়েছিল, এই আর কিছু নয়। এখন আসি, প্রণাম।

স্ত্রীলোক। কোথায় যাবেন?

রঘু। যাব? যাব নিশ্চয়ই কোথাও।

স্ত্রীলোক। আপনার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে আপনার কোন অসুখ করেছে। কোথায় যাবেন না বলে আপনাকে এখন ছেড়ে দিতে পারি না।

রঘুদাস এইবার ভাল করিয়া স্ত্রীলোকটীর দিকে চাহিল। পূর্ণদৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ এইবার বুঝিছি, আপনিই অনাথাদের আশ্রয় দিতে পারবেন, কিন্তু আমি অনাথা নই।"

স্ত্রীলোক। আপনি কি পাগলের মত বকছেন? কি হয়েছে আপনার বলুন, আমাদের এখানে সব বন্দোবস্তই আছে, আমরা হয়তো আপনার কোন না কোন উপকার করতে পারি।

রঘু। উপকার আমার কেউ করতে পারবে না, যা আপনি আমার প্রণাম নেন—

স্ত্রীলোক। থামুন, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ আমায় প্রণাম করবেন না, বিশেষতঃ আমি প্রণম্য নই।

রঘু। আপনিই একমাত্র প্রণম্য, যে অনাথাদের জন্ত আশ্রয় তৈরি করতে পারে সে জগদ্গুরু। না, এজগতে অনাথ আর অনাথাদের কেউ নেই। ঈশ্বরও আছেন কিনা তার ঠিক নেই—আপনি যখন—

স্ত্রীলোকটী তাহার সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "সরকার তুমি বাবুন ঠাকুরকে এঁর আজকের রাত্তের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে দিতে বলগে আর মাকে ডেকে দিও। আসুন আপনি ঘরে আসুন।" সরকার চলিয়া গেলে রঘুদাস হাসিয়া বলিল, "আমায় আজ ছেড়ে দেবেন না? কিন্তু শাস্ত্রে বলেছে অজ্ঞাতকুলশীলস্য—"

স্ত্রীলোক। শাস্ত্র আমার মাথায় থাকুন, আপনি নির্ভয়ে ঘরে আসুন।

রঘু। আমার পরিচয় না নিয়েই আপনি আমায় আশ্রয় দেবেন? আপনি ছেলে মানুষ—

স্ত্রীলোক। এই যে আপনি আমায় মা বল্লেন, মায়ের আবার কেউ বয়স ধরে নাকি?

রঘু। মা—মাই বটে? এমন ভগবতীর মত মূর্ত্তি মার নাত কার হবে? চলুন আজ আপনার প্রসাদ খেয়ে দেহ মন পবিত্র করব। রঘুদাস কক্ষে প্রবেশ করিয়া অবাক হইয়া গেল। কক্ষটির চতুর্দ্দিকে আলমারি, আর তার মধ্যে চক্ষুকে ধাঁধান পুস্তকশ্রেণী। মাঝখানে একটা বড় টেবিল। টেবিলের চারিদিকেই চেয়ার ও বেঞ্চী। ঘরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিকেই নিপুণ-হস্তের চিহ্ন পরিলক্ষমান। দেয়ালের ছবিগুলিও সুন্দর ও সুরুচির পরিচায়ক। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বস্তু, সম্মুখের দেয়ালে একটী প্রকাণ্ড তৈলচিত্র। চিত্র খানির দিকে চাহিয়াই রঘুদাসের চলৎ-শক্তি রহিত হইয়া গেল। এ যে রাজা সুরেন্দ্রনাথের চিত্র—চিত্রে সুরেন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব-বেশে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এচিত্র এখানে কি করিয়া আসিল? চিত্রটীর নিম্নে যে what notটি ছিল তাহাতে রাশীকৃত নানাজাতীয় ফুল সাজান রহিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় কে যেন ঐ ছবিকে উদ্দেশ করিয়া এই পুষ্পরাশির অঞ্জলি দিয়াছে। রঘুদাস চাহিয়া চাহিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "মা, এছবি আপনি কোথায় পেলেন?"

স্ত্রী। কেন, আপনি কি এঁকে চেনেন?

রঘু। এঁকে এখনও আমি ঠিক চিন্‌তে পেরেছি যদি বলি তা' হলে মস্ত একটা মিথ্যে কথা বলা হবে, তবে এঁর আমি আবাল্যপরিচিত।

স্ত্রী। কি আশ্চর্য্য! আর আপনি এমনিভাবে বিদায় নিচ্ছিলেন?

রঘু। মা, আপনি এঁকে কি করে চিন্‌লেন?

স্ত্রীলোকটী এইবার লজ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রঘুদাস তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মা, আপনাকে যখন মা বলিছি তখন ছেলের কাছে লজ্জা কি? তবে আগে আপনাকে হতভাগা আমার নিজের পরিচয়টা

দিই। আমি এই মহাপুরুষের একটা কুপোষ্য! আমি মুচির ছেলে,—এঁর ই দয়ায় এঁরই খেয়ে এখন এখন একটা অদ্ভুত জানোয়ার হয়ে উঠেছি যে এখন এঁর সেই অন্নের মুখে আগুন ভাল করে পর্ণ শোধ করবার জোগাড়ে আছি। এই আমার সংক্ষেপ পরিচয়, এর পর যদি কোন দিন ভাল করে পরিচয় দেবার অবসর ঘটে তখন তা' দেব। এখন আপনার সব কথা বলুন।

স্ত্রীলোকটী মুহূর্তখানেক কি চিন্তা করিল, তার পর বলিল, "আমার নাম কাঞ্চনমালা, আমার মার নাম মনোরমাদাসী। আমার অন্য পরিচয় নেই—"

রঘু। আপনি আমার মা—আমার পক্ষে ঐ পরিচয়ের চেয়ে আর কিছুর দরকার নেই। তার পর কি বলুন?

কাঞ্চন তখন ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমার অন্য পরিচয় দিতে ভয় করছে, যদি আপনি তা' শুনে—"

রঘু। আমি আপনাকে মা বলিছি তখন অন্য ভয় কেন করছেন? আর অন্য পরিচয়েই বা কাজ কি, এখন বলুন রাজাসাহেবের সঙ্গে কি করে আপনার পরিচয় হল? দাঁড়ান-দাঁড়ান রাজাসাহেব যার জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে বেড়াচ্ছেন আপনি সেই কাঞ্চন নন ত'?

কাঞ্চন। তিনি কি করছেন বল্লেন?

রঘু। তিনি একজনের জন্য পাগলের মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—আজ ছ'মাস তিনি নিরুদ্দেশ। তাঁর এক বন্ধু তাঁর পিছনে পিছনে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

কাঞ্চন হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। রঘুলাল তাহার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া কণপরে বলিল, "আর বলতে হবে না মা আর পরিচয় চাইনে! মা তোমার পায়ের ধুলো নেব?" রঘুলাল হাঁটু-গাড়িয়া বসিতেই কাঞ্চন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ছিছি আমি যে অস্পৃশ্যা। আমি যে কুলত্যাগিনীর কন্যা! কি করেন আপনারা? আপনারা যদি একটা সামান্যা স্ত্রীলোকের জন্য এমন হন তাহ'লে অনাথাদের আশ্রয় কে দেবে? কোন্ দেবতার জন্য এই তীর্থে আমি এলাম? দেবতা যদি এমনি করে আপনাকে মাটীতে লুটিয়ে দেন—"

কাঞ্চন আর কিছু বলিতে পারিল না, অনতিপূর্ব-পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাতে এই প্রগল্‌ভতা করিয়া ফেলিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। অন্যদিক মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "আপনি বসুন, মা কেন আসছেন না দেখে-আসি।" রঘুলাল বলিল, "পাগলের সুমুখে পাগলামি করছেন এতে আর লজ্জা কি মা? যান, তবে আমি আর পালাব না।"

কাঞ্চন সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল, রঘুলাল ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রনাথের ছবিখানার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। তার পর চাহিয়া চাহিয়া অনুচ্চ স্বরে হাসিয়া বলিল, "পাগলের খাপ্পান! এই ফুলচন্দনও পাগলামির চিহ্ন! কিন্তু হায়! সংসারের এ-রকম পাগলামী যে দেখতেই পাইবে। যে পাগলামী দেখি তা' যে নরকের জীবদের তাণ্ডবনৃত্য।" রঘুলাল সেই পুষ্পরাশি হইতে একটা ফুল তুলিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া আবার যথায় সে রাখিয়া দিল। তার পর মনে মনে বলিল, "ওহে তুমি এমনি পূজারই যোগ্য, কিন্তু আমার ওপর তুমি এত নির্দয় কেন? আমার মনটাকে তুমি এমন তেতো করে তুললে কেন? সারা সংসারের প্রতি এমন করে আমার মনে হিংসার ভাব জাগিয়ে দিলে কেন? কেন তুমি তোমার পায়ের কাছে এই ভক্তিমতীর মত আমার মনটাকেও টেনে নিলে না?"

রঘুলাল চিন্তা করিতেছে এমন সময় কাঞ্চন ও তাহার মাতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মনোরমা সানন্দে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রঘুলালকে লইয়া গিয়া তাহাদের আশ্রমের সমস্ত স্থান দেখাইতে আরম্ভ করিল। রঘুলাল সুধাকণ্ঠা তুলিয়া বিভোর হইয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল। এমন সময় কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করিল, "মা জলখাবার দিলে না এঁকে?"

মনোরমা। তোর ছেলে তুই সে কথা মনে না করলে সে কথা কি আমি মনে করব? এস রঘুবাবু—"

রঘুলাল পরমানন্দে সেইস্থানে রাত্রিযাপন করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে জাগিয়া রঘুলালের মনে হইল তাহার নবজন্ম লাভ হইয়াছে। ঐ যে সূর্য্যোদয় হইতেছে উহা তাহার নব-

প্রভাতের নূতন সূর্য্যোদয়। শয্যা হইতে উঠিয়াই প্রভাত-সূর্য্যের আলোক মস্তকে ধারণ করিয়া তাহার মনে হইল সংসার এত সুন্দর! আলোক এত পবিত্র! ঐ গঙ্গা যাহাকে সে নদীমাত্র মনে করিত তাহা এত পুণ্যতোয়া! ঐ যাহারা প্রাতঃস্নান করিতেছে তাহারা এত আনন্দিত! রঘুলাল তাড়াতাড়ি উঠিয়াই ডাকিল, "মা উঠেছ কি?" কাঞ্চন অন্য কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল, "আপনার ঘুম হয়েছিল ত?"

"এমন ঘুম আমি কখনও ঘুমুইনি। মা, তুমি যদি আমার একটা অনুরোধ রাখ তাহ'লে আমি তোমাদের এখানে মালিসিরী করে না হয় বাগান ঝাঁট দিয়েও খাকতে পারি।"

কাঞ্চন। কি অনুরোধ?

রঘু। রাজাসাহেব আমার মাথায় ওপর একটা মস্ত অভিশাপ চাপিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য সেটা বয়ে বেড়াতে দিয়ে গিয়েছেন। তুমি যদি আমায় সত্যি সত্যিই মা হও তাহ'লে সেই অভিশাপের বোঝা নামিয়ে নাও।"

কাঞ্চন। রাজা যা' দিয়েছেন তা' অভিশাপ নয়, আশীর্ব্বাদ। তবু তুমি কি অভিশাপ?

রঘু। তিনি আমার লক্ষটাকার অধিপতি করে দিয়ে সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে সেই টাকা ভোগ করবার নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য করেছেন। সে যে কি যন্ত্রণা তা' তুমি বুঝ্‌বে না মা। কেবল ছেলের এইটুকু উপকার কর সেই টাকাগুলো তোমার এই কাজে লাগিয়ে আমায় তোমার আশ্রয়ে রাখ তাহ'লে আমি বাঁচব নইলে যে নরকে ডুবে যাচ্ছি তা'থেকে উদ্ধারের আর উপায় নেই।

কাঞ্চন। আমি আপনার কথা বুঝ্‌তে পারলাম না। রাজা যা' করেন তা' ভালর জন্য, আপনি তাঁকে বুঝ্‌তে পারেননি তাই হয়তো তাঁর কাজকে অভিশাপ বলে মনে করছেন।

রঘু। না মা অভিশাপ—ভয়ানক শাস্তি—মরণাধিক যন্ত্রণা। আমার ওপর বড় নিষ্ঠুর বড় নির্দ্দয়—

কাঞ্চন। কখনও নয়—তিনি যা' বিধান করেছেন নিশ্চয়ই তা' আপনার পক্ষে উচিত বিধান হয়েছে। আপনাকে তা'ই মাথা নিচু করে সহ্য করতে হবে।

রঘু। তুমি জান না—

কাঞ্চন। নাইবা জানলাম; তবু তাঁকে বিশ্বাস করেই আমি বেঁচে আছি। আপনি যান, গিয়ে তাঁর হাত থেকে যা' পান নির্ব্বিচারে গ্রহণ করুন গিয়ে।

রঘু। আমি পারছিনে—সবকথা তো'মায় খুলে বলতে পারিনি। খুলে বলে তুমিও হয়তো আমায় ঘৃণা করবে, সেই ভয়ে কিছু বলতে পারছিনে। মা সন্তা কে ঘৃণা করে।

কাঞ্চন। কিছুতেই নয়। আপনি বিশ্বাস করুন আপনার যে শাস্তিই তিনি দেন, তাঁর ভেতরকার মানুষটা আপনার পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। যে আমার মত স্ত্রীলোককেও এত দয়া করতে পারে সে কি মানুষ।

রঘু। মানুষ নয় দেবতা; কিন্তু দেবতারই মত নির্ম্মম পাষাণ! অতিসূক্ষ্ম তাঁর বিচার অতিসূক্ষ্ম তাঁর শাস্তি—অতি তীব্র সেই শাস্তির যন্ত্রণা—

কাঞ্চন। তবু পরিণামে তাই আপনার পক্ষে অমৃতের কাজ করবে এ আমার ধ্রুববিশ্বাস।

রঘু। আমি সারারাত্রি এই শেষ আশায় নিজেকে শান্ত করিছি, আমায় আশায় এ নিরাশ কর না, এ আশায় নিরাশ করলে আমি মরব।

কাঞ্চন। তাহ'লে আপনার মরণই মঙ্গল।

রঘুলাল উত্তেজিত ভাবে কিছুক্ষণ পদচারণ করিল। তার পর তীব্র দৃষ্টিতে কাঞ্চনের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ দিখি মা কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার, মায়ের কাছে ছেলে আস্‌বে এটুকু ইচ্ছার স্বাধীনতাও আমার নেই, তাতেও তিনি দূরে থেকে বাধা দিচ্ছেন। আচ্ছা আমিও দেখ্‌ব। চল্লাম মা, কিছু মনে করনা। তোমার এই বিদ্রোহী ছেলেকে মাঝে মাঝে মনে কর।" রঘুলাল শ্রীরামপুরে গিয়া সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। কলিকাতার বাটীতে একখানা পত্র তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রঘুলাল অন্যমনস্কে সে খানা খুলিয়া ফেলিয়া কম্পিতহস্তে পড়িল।

রঘুলালবাবু, আপনি দিনে দিনে অধঃপাতের দিকেই গড়াইয়া যাইতেছেন। কিন্তু সে দিন কাগজে যাহা

দেখিলাম এবং অনুসন্ধান লইয়া যাহা জানিলাম তাহা ঘৃণ্য নীচতর কার্য্য আর কি হইতে পারে আমি তাহা জানি না। স্বয়ং যদি করিতেন আমার তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একজনেরও নরক বাসের কেন ব্যবস্থা করিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না। একজন মূঢ় বালিকাকে কেন আপনার সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া ডুবাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, সে কি অপরাধ করিয়াছে? আপনি ত' নিজেকে বেশ চেনেন, জানিয়া শুনিয়া একার্য্য কেন করিতেছেন? আপনি কি এই উপায়ে উচ্চ সমাজের উচ্চ মস্তক হেঁট করিয়া দিতে চান? সে তো ইতিপূর্ব্বেই পারিতেন, যখন আমি আপনাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম।

কিন্তু তখন ত' তাহা পারেন নাই। তবে এখন আবার তাহা কেন? আমি কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছি না যে আপনি এরই মধ্যে এতদূর অধঃপতিত হইয়াছেন, যে কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য নীচতম চরিত্রহীনতা আর কদাচার-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও আপনি সন্তুষ্ট নন, একটী জ্ঞানহীনা বালিকাকেও আপনার হিংসার বহ্নিতে ইন্ধনস্বরূপে দান করিতে চান।

যাহাই হউক আশা করি এই পত্রের উত্তর দিয়া আমায় নিশ্চিন্ত করিবেন। আপনার বিষয়ে সমস্ত শুনিয়াও আমার এই শেষ দুর্ব্বলতাটুকু যাইতে চাহিতেছে না এখনও আমার মনে হইতেছে যে আপনার এই সমস্তই ভাণ এই সমস্তই মিথ্যা। আপনি এই যাহা দেখাইতেছেন ইহার কিছুই আপনার অন্তরের মানুষটীর আভাষ নয়। সেইজন্য আশা করি আপনি পত্রোত্তরে স্বয়ং আসিয়াই হউক বা পত্র দিয়াই হউক আমায় নিশ্চিন্ত করিবেন।

ইতি—তোমার শুভার্থিনী
সত্যবতী।

পত্র পড়িয়া রঘুনাথ প্রথমে একটা ক্রূরহাসি হাসিল। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে গুরু ভাবার ভাবে হইয়া সে বামহস্তে চক্ষু ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া "কখন যাইব?" এইকয়টী কথা লিখিয়া দরোয়ান মারফতে পাঠাইয়া দিল।

উত্তর আসিল "বৈকালে"।

বৈকালে রঘুনাথ সত্যবতীর নিকটে পৌঁছিলেই বিরূপাক্ষ রুদ্রভাবে তাহার দিকে চাহিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথও তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া সত্যবতীকে অভিবাদন করিয়া বসিল। সত্যবতী গম্ভীরভাবে বলিল, "আপনি শ্রীরামপুর হতে কখন এলেন?"

রঘু। আজই দুপুরে। পত্রখানা পড়েই লোক পাঠিয়েছিলাম।

সত্যবতী কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "এখন কি বল্‌বেন বলুন?"

রঘু। আপনি এপত্র লিখেছেন কেন?

সত্য। যদি আপনার বিরুদ্ধে যে সব কথা শুন্‌ছি তা' সত্য হয় তাহ'লে ঐ হতভাগিনীকে বাঁচান।

রঘু। একথার কোন অর্থ নেই, কারণ আমি কাউকে জোর করে বিয়ে করতে যাচ্ছিনে; যাঁর সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে তাঁর পিতামাতা আত্মীয় বন্ধু সকলেই এপ্রসঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করেছেন, এমন কি সত্যি কথা বল্‌তে গেলে তাঁরাই আমায় প্রলোভিত করেছেন। আর যাঁকে বিয়ে করব মনে করেছি তিনিও কোন রকম অমত বা দুঃখপ্রকাশ করেন নি। তিনি আমার সমস্ত জেনে শুনেই বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন। কেন রাজী হয়েছেন সেকথা বলার দরকার নেই, যার যা' ইচ্ছা অনুমান করে নিতে পারেন, কিন্তু এটা স্থির যে আমি কারও ওপর জোরপ্রকাশ করিনি, বিয়ের দরকার যা তাঁর কন্যারও আমার থাকতে পারে। তাই বল্‌ছিলাম আপনি বাঁচাতে চাচ্ছেন কাকে? তাঁকে না আমাকে? যদি বাঁচাতে হয় তাহ'লে এই loveless বিবাহ হতে আমাকেই বাঁচান উচিত। কিন্তু সে সহানুভূতিটুকু হতে আমি বঞ্চিত। আমার চরিত্রসম্বন্ধে যা' শুনেছেন তার একটী কথাও মিথ্যা নয়—আমি মদ খাই, বেশ্যাসক্তও হয়েছি, কুসঙ্গও আমার আছে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যে আপনাদের উচ্চ সমাজের উচ্চ শিক্ষিতগণের যে কতখানি সংযোগ আছে তা' বোধ হয় আপনি জানেন না—বা জানলেও তার দিকে দেখ্‌তে

চান না। যাক্ সে কথা কিন্তু যদি মিস্ সরকারকে বাঁচানরই দরকার বোধ করে থাকেন, তা'হ'লে তাঁকেই সব কথাই বলুন; এখনও আমি তাঁকে বিবাহ করিনি। তিনি ইচ্ছা কর্‌লেই এবিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারেন। অতএব আপনার প্রথম কারণটার বিষয়ে আমার পক্ষ হতে বোধ হয় আর কোন কথা বলবার নেই।

সত্য। আছে বৈকি? আমি তাকে বারণ করিছি, তার বাপ্‌মাকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু মানুষ যখন লোভী হয়ে ওঠে তখন ন্যায়াস্যায় বিচার থাকে না। এখন কি তাঁরা আমায় এমন কথা বলেছেন, সে কথা শুনে পর্য্যন্ত আমার যে কষ্ট হয়েছে তা' আপনাকে কি বলব?

রঘু। কি বলেছেন? যদি কোন বাধা না থাকে—

সত্য। কিছু না—আমি যখন নিঃস্বার্থভাবেই কর্ত্তব্য-বোধেই কাজ করিছি তখন কিছুই গোপন করার দরকার নেই। তাঁরা আমায় বল্লেন, যে আমি আপনার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে হিংসায় পড়ে আর যদি কখনও আবার আপনার সঙ্গে গিয়ে হয় এই আশায় এই বিয়েতে বাধা দিচ্ছি।

রঘুলাল রক্তবর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল, "এই কথা তাঁরা বল্লেন? উঃ আর আপনি এই লোকদের উপকার কর্‌তে চাচ্ছেন? এরা যদি শাস্তি না পাবে ত' জগতে শাস্তি পাবে কে? আপনি আর আমায় অনুরোধ করবেন না। আমি এদের শাস্তি দেবই।

সত্য। না—না তা করবেন না। এ ইচ্ছা ছেড়ে দেন।

রঘু। না তা' কিছুতেই হবে না। আমি এই কদিন ধরে যতগুলা ভাল কাজ করবার ইচ্ছা করিছিলাম সবগুলোই বিফল হয়েছে, সবগুলোতেই তারপর বাধা পেয়েছি। এমন কি যে টুকু হলে আমার নরকযন্ত্রণা এতটুকু লাঘব হয় আমার সে ইচ্ছাটুকুও বিফল হয়েছে, তখন ভাল ইচ্ছে ছেড়ে মন্দ ইচ্ছেতেই আপনাকে ছেড়ে দেব, কারণ ইচ্ছে করতে না পারা মরণের চেয়েও ভয়ানক। হাতপা বেঁধে আগুনের মধ্যে ফেলে রাখ্‌লেও যে কষ্ট না হয়, সেই কষ্ট হয় ইচ্ছেটাকে বন্দী করে রাখ্‌লে। আমি যে সচেতন তাই বুঝ্‌বার জন্য আমার এই সব মন্দকাজ করবার ইচ্ছেকেই সজাগ রাখ্‌ব—আর তাই রেখেও আস্‌ছি, কিন্তু আপনি তা' বুঝবেনও না বিশ্বাসও করবেন না। কারণ আমিই অপরাধী আর আপনারাই আমার বিচারক। সহানুভূতি বা বল এসব আর আপনাদের কাছ থেকে আশা করবার উপায় আমার নেই। যে বিচার করবে সে সহানুভূতি করবে কি করে? কিন্তু এই আপনাদের মত বিদ্যাগর্ব্বিত উচ্চ সমাজের নরনারীদের ছেড়ে, কালকে একবার আমি কোন পতিতা অথবার দরজায় গিয়েছিলাম। সেখানে যা' দেখিছি যা' পেয়েছি তা' আমার জীবনের শ্রেষ্ঠলাভ। কারণ সেখানে দেখিছি দেবত্ব, সেখানে যা' লাভ করিছিলাম তাই সংসারে অমৃত। মানুষকে কি চোখে দেখ্‌তে হয়, তা' যদি দেখ্‌তে চান তাহ'লে একবার আপনাদের এই রত্নসিংহাসন হতে নেবে ধূলোয় মধ্যে গিয়ে বসুন, পাবেন কি রত্ন সেখানে আছে। আপনি আপনারই একজন আত্মীয়াকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু কৈ একবারও তা' আমার কথাটা ভেবে দেখেন নি?

সত্য। যে আপনার দোষে মর্‌বে তাকে কে বাঁচাবে?

রঘু। তবে কেন মিস্ সরকারকে বাঁচাতে চেষ্টা কর্‌ছেন? সেও মানুষ আমিও মানুষ—

সত্য। আপনাকে এখনও সম্মান করি এখনও বিশ্বাস করি তাই এই পত্র লিখেছিলাম।

রঘু। যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছিলেন! আমাকে একটু খোলাখুলি করে যদি আপনার বন্ধুকে বাঁচাতে পারেন এইটেই যখন আপনার প্রধান ইচ্ছা, তখন ঐটুকু সম্মানের টোপ আমি গিল্‌ব এ যদি মনে করে থাকেন তাহ'লে আপনার ভুল হয়েছে। আমি সত্যিকার সম্মান কি দেখিছি—মানুষকে কি দিয়ে সম্মান কর্‌তে হয় তা' যে আমি কাল স্পষ্ট দেখিছি। বড় বড় যন্ত্র দিয়ে নয়—Science দিয়ে নয়, খোসামুদি করে নয়, টাকা দিয়ে নয়—এমন কি ফুল দিয়ে পূজা করে নয়—মানুষের পূজা ভালবেসে প্রাণঢালা স্নেহ দিয়ে তা' যে দেখে এসিছি। আর তাই বুঝে ছিল সেই আর একজন, যে আজ ছ'মাস থেকে এরই জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। আমি কাকলিকে দেখে এসিছি। দু স্থানে এমন কাকলি থাকে তা আপনার Cultured চ'খে

ঠেকবেই না। এই uncultured এবং lowborn নারী আমার মনুষ্যত্বের যে সম্মান করেছেন তার শতাংশের একাংশ সম্মানও যদি আপনি করতেন, যদি আমার একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের সম্বন্ধেই মনে না করে, মানুষ বলে মনে করে, মানুষের যা' আসল প্রাপ্য তারই কণামাত্র আমায় দিতে পারতেন তাহ'লে হয়তো এদশা আমার হত না। কিন্তু আপনিও কেবল আপনার মতটাকেই বড় করে দেখে, সেটাকে কত জোরে ধরে থাকতে পারেন তারই ক্ষমতা সেখানেতেই ব্যস্ত হয়ে রইলেন। আজ এসেছেন আপনি পরকে বাঁচাতে, কিন্তু ভেবে দেখুন দিখি আপনার এই রকম মনের ভাবের সময় যদি আমি আপনাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হতাম, তার পর কি হত। আমাদের উভয়েরই বহুভাগ্য যে আপনাকে আমি যথার্থ শ্রদ্ধা করি। যদি অশ্রদ্ধা করতাম তাহ'লে ঐ সময়েই আপনাকে বিয়ে করে আপনাদের Higher class-এর ওপর প্রতিশোধ নিতে পারতাম। ভগবান্‌কে মনে মনে সহস্র ধন্যবাদ দেন যে ভগবান্ সে দুর্মতি আমার তখন দেন নি, নৈলে কি বিপদ হত? আপনাকে সানুনয় অনুরোধ, আর আপনি আমার পথে দাঁড়াবেন না। আমি আপন দোষে যতটা খারাপ হয়েছি তার চাইতে বেশী দোষ আমার গুরুর। আমি মূর্খ আমি কাঙালের সন্তান, আমায় কেন এমন পরীক্ষাতে ফেলা? আর পাশ হতে পারলাম না বলে কেন এমন শাস্তি করা? একি নিষ্ঠুরতা নয়? ভেবে দেখুন, এদের আমি ভক্তি করি তাদের ওপরেই আমার বেশী রাগ, আর যাদের ভালবাসি তাদের দ্বারা আমি নির্য্যাতিত। এ-রকম অন্তর দ্বৈতের মধ্যে পড়ে এখনও যে আমি বেঁচে আছি এই আশ্চর্য্য! আপনাকে আমার করজোড়ে নিবেদন, মানুষ হয়ে মানুষের মন বুঝুন, মানুষকে শুধু Science দিয়ে মেপে নেবেন না। মানুষের মনস্তত্ত্ব কেবল মধ্যাকর্ষণ আণুবিক আকর্ষণ রাসায়নিক সংযোগের নিয়ম মেনেই চলে এটা মনে করা মনুষ্যত্বের অপমান করা। সে যে কখন কি মানে তা' কেউ অঙ্ক কষে Statistics দেখে বলে দিতে পারে না। সে যে নিয়ম মানে তা' আকাশের মতই উদার উন্মুক্ত বাধা-বন্ধহীন। আকাশের মতই—তা' ক্ষণে রক্ত ক্ষণে পীত ক্ষণে নীল। কেউ তা'কে ধরা বাঁধা নিয়মের মধ্যে পুরে 'লিমিটেড হোলে' সাজিয়ে রাখতে পারে না। অনেক অবথা কথা হয়ত বলাম—ক্ষমা করবেন।

সত্যবতী এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া বহুক্ষণ নীরবে রহিল। শেষে মৃদুস্বরে বলিল, "এত বুঝেও আপনি এমন হলেন কেন?"

রঘুনাথও মৃদুস্বরে বলিল, "সে কথা আজ বলব না। যদি এমন দিন আসে—যে দিন শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথা শুনতে আপনি প্রস্তুত হয়েছেন বুঝতে পারব, আর যেদিন আমিও সে কথা বুঝিয়ে বলবার উপযুক্ত হব, সেদিন আপনাকে সে কথা বলব। আর হয় ত' আমায় নাও বলতে হতে পারে, যদি আমায় Social animal ছাড়া আর কিছু কোন দিন মনে করতে পারেন সেদিন আপনিই বুঝে নেবেন। আজ তবে আসি। নমস্কার।

গাড়ী চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সত্যবতীর ললাটে চিন্তারাশি ঘনাইয়া আসিল। সত্যবতী ভাবিতে লাগিল, মানুষ কেমন করিয়া উন্মীলিত নেত্রে সকলদিক দেখিতে দেখিতে এমনভাবে মরণের দিকে যাইতে পারে? কি করিয়া রঘুর মত এত বড় তেজস্বী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এমন করিয়া আপনাকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতে পারে? কিসের অভাবে সে এমন হইল? কি সে পায় নাই? সত্যবতী কি তাহাকে দিতে পারে নাই বলিয়া সে আজ সেই অভিমান জ্ঞাপন করিয়া গেল। কি সে?

পূর্ব্বে হইলে হয় ত' সে যে কি তাহা না বুঝিলেও চলিত, কিন্তু আজ ত' তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। সে যে প্রতিদিন নানা আকারে আপনাকে সত্যবতীর নিকটে প্রকাশ করিতেছে। জীবনের প্রতিদিনকার ঘটনার মধ্যে তাহার যে গোপন শক্তি কার্য্য করিতেছে সে বিষয়ে জোর করিয়া অন্ধ থাকা যাইতে পারে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত অভিমান হইতে আরম্ভ করিয়া দিনে দিনে যে কয়েকটা প্রবল ঘটনা সত্যবতীর মনকে আঘাত করিতেছে তাহাতে আর সেই মহাশক্তির সহিত মুখামুখী না করিয়া সত্যবতী থাকিতে পারিতেছে না। এখন সে সত্যবতীর নিকটে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশিত করিবেই। এখন

বুঝিতেই হইবে, যে সে এমন বস্তু যাহা নহিলে সংসার অরণ্য। তাহাই মানুষকে মানুষ করিয়াছে—করিতেছে এবং করিবে। বিনীত হৃদয়ে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই স্নেহ এই আন্তরিক শ্রদ্ধাই নরনারায়ণের পূজার একমাত্র উপকরণ। এই ভালবাসার অভাব কোন সমাজ-নৈতিক রাজনৈতিক বিজ্ঞাননৈতিক আইনের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না। ইহার অভাব হইলেই মানুষ পশু হইয়া যায় ইহা পূর্ণভাবে থাকিলেই মানুষই দেবতা হয়। সত্যবতীর ক্রমশঃ বুঝিতেই হইল যে ইহারই অভাবে সে এতদিন শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করিতে ছিল। ইহার পূজা না করিয়া ইহার সাধনা না করিয়া যে যাহার সাধনা করিতেছে তাহারই মানুষের মধ্যে রাক্ষস তাহার দাসত্ব। সে, দেবতা ছাড়িয়া দৈত্যের পূজার জন্যই এতদিন ব্যস্ত হইয়াছিল,—এবং সেই দৈত্যের পূজার জন্য বিশ্বের সরকার ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ নরকের দিকে যাইতেছেন। রঘুলাল যাহাকে কোন গতীর পঙ্ক হইতে বাঁচাইয়াছে অনুভব করিয়া সে মনে রঘুলালকে শত শতবার নমস্কার করিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অভয়ার শ্বশুরবংশের কুলদেবতা শালগ্রামশিলার পূজারী ব্রাহ্মণ যেদিন আসিয়া বলিলেন, "মা, আরত' পারি না, তোমার জন্য কি শেষে জাত হারাব? আমার বাপের কাজে যে কেউ এল না"—সেইদিন তিনি প্রমাদ গণিলেন। মানুষকে ছাড়াইয়া এইবার দেবতার উপরেও নির্যাতন আরম্ভ হইল। দেবপূজা না হইলে যে তাঁহাকে সপরিবারে অনাহারে মরিতে হইবে, এটাও তত ভয়ঙ্কর নয়, যত ভয়ঙ্কর দেবাবমাননা। যাঁহারা ব্রাহ্মণেতর জাতির নারায়ণপূজার অধিকার হরণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ আজ অনায়াসেই সেই দেবতার অমঙ্গল বহন করিতে উদ্যত! অভয়া স্ত্রীলোক; তাহার উপর তিনি ব্রাহ্মণকন্যাও নন। যে ব্রাহ্মণকন্যা আছেন, তিনিও শাস্ত্রশাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া নারায়ণপূজা করিতে অক্ষম। পাড়াতেও এমন কেহ নাই যে, এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করে। তিনি ভীতভাবে যোগেশকে বলিলেন, "উপায়?" যোগেশ বলিল, "আমি একবার জগেশপুরে গিয়ে আমার বন্ধুদের কাউকে ডেকে আনি।"

অভয়া। সে না হয় এক আধ দিন চল্ল। রোজ ত' চল্‌বে না?

যোগেশ। তাদের কেউ কি ঠাকুর নিয়ে গিয়ে কিছুদিন রাখ্‌বে না?

অভয়া। ধার যায়!—শেষে কুলদেবতাকে ভিটেছাড়া করতে হবে যোগেশ!

যোগেশ। উপায় কি মা?

যোগেশ চাদর লইয়া দুই কোশ দূরস্থ জগেশপুরাভিমুখে চলিয়া গেল। দেবেশ তাহার মাতার পাণ্ডুবর্ণ মুখ দেখিয়া বলিল, "মা, আমি পুজো করব, পাপ হয় আমার হবে, তুমি ভেব না।"

অভয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ছি বাবা, ও কথা বল্‌তে নেই, পাপ হবে,—আমরা যে শূদ্দুর!"

অমলা রাগিয়া বলিল, "গায়ে এত বামুন থাক্‌তে যদি আমাদের ঠাকুর উপোস পড়েন তাহ'লে তাদের পাপ হবে না?"

অভয়া। তাদের কথা তাঁরা ভাবুন গে। তাঁরা কি আর মানুষ আছেন? বইলে একটা বিধবা বালিকাকে আশ্রয় দিয়েছি বলে কি তাঁরা আমাদের ওপর এত অত্যাচার করতে পারেন?

দেবেশ। তাঁরা যদি পাপের ভয় কর্‌ছেন না তাহ'লে আমাদেরই বা এত ভয় কি! আমি পুজো করব মা, দেখি কি হয়। যদি দেবতা সত্যি থাকেন, তাহ'লে তিনি কি আর আমাদের কথা বুঝ্‌তে পারবেন না? আমাদের আগে, তাঁর রাগ ওদের ওপর পড়া উচিত।

অভয়া। ছি বাবা, এসব কথা বল্‌তে নেই। দেবতার কাজ দেবতা কর্‌বেন, আমাদের কাজ আমরা করব।

অমলা। কিন্তু যদি কেউ আমাদের ঠাকুর পুজো করে না দেয়?

অভয়া। তাহ'লে এদেশ ছাড়তে হবে। যদি যম

থেকে ঠাকুরকে বিদায় দিতে হয়, তাহ'লে সে ঘরে আমরাও একদণ্ড থাকব না।

কার্য্যতঃও তাহাই হইল, অভয়াদাসীকে তাঁহার স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া পিত্রালয় যাত্রা করিতে হইল। যোগেশের কোন ব্রাহ্মণবন্ধুর পিতা দয়া করিয়া শালগ্রামশিলা লইয়া গেলেন, এবং সেই সঙ্গে যোগেশের পৈতৃক জমা-জমি ও দেড়োত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণেরও ভার লইলেন।

যোগেশের মাতা যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার মা'কে সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিয়া দিলেন, কারণ ঠাকুর তাঁহার একার নয়। অভয়ার মা যদি কোন উপায়ে আবার গৃহদেবতা গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন এই আশা।

যোগেশের মাতা যখন পিত্রালয়ে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাড়ীতে ছিলেন না। ভ্রাতৃজায়া তাঁহার পুত্রকন্যাদের লইয়া অচিন্তিতপূর্ব্ব উপায়ে দিনযাপন করিতেছিলেন। অভয়ার পিতৃপিতামহগণের নির্ম্মিত দালানকোঠার চিহ্নপর্য্যন্ত ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছিল,—সেই সব গৃহের ইষ্টকগুলি পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। অভয়া যেদিন পৌঁছিলেন, সেদিনও কয়েকখানা গরুরগাড়ী শেষ ইষ্টকগুলি বোঝাই করিতেছিল। হরিনাথ এক পয়সাও বাড়ীতে দেন না এবং তাঁহার স্ত্রীও সেবিষয়ে কোন অনুযোগ না করিয়া অম্লানবদনে শ্বশুরের বহুযত্ন-নির্ম্মিত বাসগৃহের ইট কাট বিক্রয় করিয়া হরিনাথের সন্তানদিগের আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি এখন যে ঘরে বাস করিতেছেন, তাহা তাঁহার শ্বশুরের নির্ম্মিত বহির্ব্বাকার গুহ। ইহা নাকি তিনি তাঁহার গৃহদেবতা কাত্যায়নী দেবীর জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কাত্যায়নীদেবী নাকি আজকাল কোন এক পুষ্করিণীর তটস্থ ভগ্নমন্দিরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এবং চামচিকা, বাদুড় ও ইঁদুরে তাঁহার নৈমিত্তিকপূজার উপকরণ যোগাইয়া থাকে।

হরিনাথের স্ত্রী মালতীদাসী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তিনি যখন বুঝিলেন যে, স্বামীর নিকট পুত্রকন্যার জন্য ছাড়া অন্য কিছুরই আশা নাই, এবং যখন সংসারে বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে, তখন নিজের ও সন্তানগণের উপর মায়া সেখান ছাড়া অন্য কিছুরই উপর মায়াদয়া দেখান বৃথা। তাই তিনি হরিনাথের বিক্রয়াবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বিক্রয় করিয়া হাতে কিছু নগদ টাকা জমাইয়া ফেলিলেন। এহেন সময়ে প্রায় চারি পাঁচটি মুখ ও উদর লইয়া অভয়া গিয়া ভ্রাতৃজায়ার দ্বারে দাঁড়াইলেন।

তাঁহারা পৌঁছিতেই মালতী বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এমা, ওমা কি ভাগ্যি! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। ঠাকুরঝি! তুমি যে আজ এই গরীবের বাড়ীতে?"

অভয়া হাসিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভাগ্যিটা যে ঠিক কার তা' এখনও ঠিক হয় নি বৌ! আগে একটু ঠাণ্ডা হই তার পর সব বল্‌ছি, দাদা কৈ?"

মালতী। তা' তোমার দাদাই জানেন, তাঁর খবর আমি বল্‌তে পারব এত বড় ভাগ্যি আমার হতেই পারে না। আমিই যে তোমার সেই কথা জিজ্ঞাসা করব ভাব্‌ছিলাম।

অভয়া। দাদা এখানে নেই?

মালতী। থাকতেও পারেন নাও থাকতে পারেন। বিদেশে থাকলেও তাঁর যে রকম খবর পাই, এখানে থাকলেও সেই রকমই খবর পাই,—তা' ঠাকুরঝি, কি মনে করে এতদিন পরে এলে?

অভয়া। যা' মনে করে এসেছি, তা' মনে করে অতিবড় শত্রুও যেন কোথায় বেরোয় না। কিন্তু বৌ সে কথা থাক, বাড়ীঘরদোরের একি অবস্থা? তুমি থাক কোথায়?

মালতী। যেখানে ভগবান্ রেখেছেন।

অভয়া। এতো দেখ্‌ছি শ্মশান—

মালতী। আর এখানে যাঁদের দেখ্‌ছ তারা সেই শ্মশানের ভূতপ্রেত।

অভয়া চারিদিকে চাহিয়া সমস্তই বুঝিয়া লইলেন। বুঝিলেন যেখানে আশ্রয়ের আশায় আসিয়াছেন, সেখানে আশ্রয় লওয়াও যা, বৃক্ষতলে আশ্রয় লওয়াও

তাই। অভয়ার চক্ষু জলে পুরিয়া আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুঁটী, বাবু, গোপাল কোথায়?" মালতী হাসিয়া বলিলেন, "গোপাল গরু নিয়ে মাঠে গিয়েছে, বাবুকে একটা দোকানে খাতা লেখার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি, পুঁটী জল আনতে গিয়েছে। যা'ক এদের খবর পরে নিও এস যোগেশ, দেখ অভয়া এত বড় হয়েছিস্?"

মিলনের প্রথম আবেগ কমিয়া আসিলে, মালতী যখন অভয়ার অবস্থার কথা সমস্তই শুনিলেন, তখন তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরঝি টাকাকড়ি লইয়া কিছুদিনের জন্য তাঁহার বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন। অভয়ার বিষয়ে তাঁহার স্বামীপ্রমুখাৎ এতদিন যাহা শুনিয়া আসিয়াছিলেন, হঠাৎ আজ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সংবাদ শুনিয়া তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আমি যে 'আপনি শুতে ঠাঁই পাচ্ছি না, শঙ্করাকে' কোথায় জায়গা দেব? আমার অবস্থাও' দেখ্‌ছ?"

অভয়া। তোমার তবু মাথা গুঁজবার জায়গা আছে, আমার তাও নেই।

মালতী। বাড়ীটা ছেড়ে আসবার দরকার কি ছিল, বিক্রী করে টাকাকড়ি যা' পাও নিয়ে এসে এইখানে বস না কেন?

অভয়া। বাড়ীও' বিক্রী হয়েই আছে, ওর ওপর জমীজিরেত যা যায়—তোমার ঠাকুর জামাইও' চুল পর্য্যন্ত বন্ধক রেখে তার পর গিয়েছেন?

মালতী। পুরুষ মানুষ সবাই সমান। যাকগে, এখন কি করবে—আমার এখানে থাকা মানে একসঙ্গে উপোষপাকা। তোমার ছেলেমেয়ে কি পরের গরু চরাতে পারবে, না মুনিষ খাটতে পারবে? তুমি কি সুতো কেটে হাটে বেচ্‌তে পাঠাতে পারবে? পরনা কখানাওতো তাদের বুদ্ধিতে কুলিয়েছে, এখন কি করবে?

অভয়া। তাইত' ভাই কি যে করব কিছুই ঠিক করতে পারছিনে, তার ওপর রোজই জ্বর হয়।

মালতী। তা' তোমার চেহারাতেই বোঝা যাচ্ছে, যাইহোক্ কি করবে ঠিক করে ফেল, আমার এখানে তোমার এত বড় সংসার যে আঁটবে না তা' বেশ বুঝ্‌তে পারছ বোধ হয়।

অভয়া এই ভাবনাসাগরের কূল পাইলেন না। উপরন্তু যোগেশ দুই একদিন কলিকাতা হাঁটাহাঁটী করিয়া প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল। স্থানাভাব, লোকাভাব, আহার্য্যাভাব, সর্ব্বোপরি অর্থাভাব! অভয়া কয়েকদিনের মধ্যে হাতের টাকা ক'টা খরচ করিয়া পাগলের মত হইয়া গেলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অমলা একদিন তাহার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মাকে না জানাইয়া তাহার জ্যাঠাইমাকে পত্রে সমস্ত কথা লিখিয়া দিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি, এল্

মাসিক কাব্য-সমালোচনা

আলক্ত, চৈত্র, বর্ষবিদায়

৮ লাইনের কবিতা। একটী লাইনেও সৌন্দর্য্য নাই। নিতান্ত বালকের রচনার মত। ?

"পুরাতনের আজ্ঞ ভেদি নবীন মাঝে উঁকি
আসল ছেড়ে পাগল হাওয়া আস্‌ছে দেখায় ঝুঁকি"

ইত্যাদি নেহাৎ অক্ষমতা।

"দোল।" শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী। দোল অপদার্থ রচনা। বর্ষবিদায় যদি বালকের হাতের উপযুক্ত হয় 'দোল'কে তাহা হইলে বালিকার হাতের রচনা বলিতে হয়। না আছে ছন্দ—না আছে ভাষা—না আছে ভাব। সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয়—বালক-সম্পাদক এই দু'টী অপদার্থ রচনাকে প্রথম পাতে পাইকা টাইপে ছাপিয়াছেন। এক বৎসর চৈত্র সংখ্যায় 'বর্ষবিদায়' না দিলে দোষ কি হয়? একবৎসর দোলের উপর 'দোলের' কবিতা না ছাপিলে মাসিকপত্রের কি ক্ষতি হয়? এই সকল মামুলী উপলক্ষে যদি ভাল কবিতা নাই পাওয়া যায় তাহা হইলে মাসিকপত্রসম্পাদকেরা অপদার্থ কবিতার দ্বারা কেন যে তাহার স্থল পূরণ করেন তাহা বুঝা যায় না। এযেন ঠিক নিত্যরক্ষা মাসে মাসে পূজাপর্ব্ব বা ঋতুবর্ণনার কবিতা ছাপার প্রথা সভ্যতাপ্রগতিকতাবাতীত অন্য কিছুই নহে। সাময়িক উৎসব পর্ব্ব বা ঋতু-পরিবর্ত্তন উপলক্ষ করিয়া লিখিত বলিয়াই শুধু Heading দেখিয়াই সম্পাদকগণ মাসিকপত্রে এই সকল আবর্জ্জনা জমা করেন - উৎসব ছেড়ে আমাদিগকেও সেজন্য মাসে মাসে সমার্জ্জনী ধারণ করিতে হয়—জননী ভারতীর মন্দিরকে অপরিষ্কৃত হইতে দেওয়া উচিত নহে। সাময়িক কবিতা পাইলে অনেক সম্পাদক নির্ব্বিচারে গ্রহণ করেন এই দুর্ব্বলতাটুকু লক্ষ্য করিয়া অনেক নবীন কবি (যাহাদের কবিতা সচরাচর মাসিক পত্রে স্থানের উপযুক্ত হয় না)। সেটা চিন্তা করিয়া সাময়িক উপলক্ষ অবলম্বনে আপনাদের কবিত্বের পরীক্ষা করিতে থাকেন এবং সহজেই মাসিকপত্রে প্রকাশ করাইয়া থাকেন। এই সকল ঔষাহ কবিত্বপ্রার্থী নবীন লেখকগণের সহিত প্রবীন সম্পাদকেরাও যে উপহাস্যতা-লাভ করেন তাহাই আরো ক্ষোভের বিষয়।

বালক-সম্পাদক মহোদয় চৈত্র সংখ্যায় মামুলীপ্রথা রক্ষার জন্য প্রথম পাতে পাইকা অক্ষরে উপরি উক্ত অপকৃষ্ট ছড়া দু'টীকে স্থান দিয়াছেন। এজন্য দু'কথা বলার প্রয়োজন বোধ করিলাম। প্রথম পাতের প্রকাশিত রচনা এত নিকৃষ্ট হওয়া উচিত নহে—ইহাতে সমস্ত সংখ্যাখানির উপর অশ্রদ্ধা জন্মে। ভারতীমন্দিরের তোরণের দু'ধারে পূর্ণকুম্ভ ও কদলী তরু স্থাপন করা উচিত scare crow স্থাপন করা উচিত নহে।

"নদনীর ইতিহাস।" শ্রীবনবিহারী মিত্র। কবিতাটির রচনাচাতুর্য্য আছে একটু কারুকার্য্যের মাধুর্য্যও আছে। তবে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছুই নাই। শুধু কবির নৈরাশ্যের কারণ নাই।

"অনন্ত"—অবনীকুমার দে। কবিতার স্থলে স্থলে সৌন্দর্য্য আছে—তবে অনাবশ্যক পংক্তিও অনেক আছে। ভাবটিকে আরো সংযত ও রসঘন করা যাইতে পারিত। ভাবটি নিম্নলিখিত Stanzaয় একপ্রকার প্রকাশিত হইয়াছে—

"আমারে লইয়া তব বিশ্ব বঞ্চনা (?)
পূর্ণ অবয়ব
আমারি আত্মায় তব সৃষ্টি সূত্র খোঁজা
অক্ষয় বিভব"

"হৃদয়ের তালে তোর বিশ্বসুর বাজে
মহাধ্বনিঝঙ্কার"...কি

বুঝিলাম না। অবনীবাবুর ভাবিবার ক্ষমতা আছে—কিন্তু এখনো প্রকাশচাতুর্য্য আয়ত্ত হয় নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রের—'বিকাশের' ধন বোধ করিতে পারিলাম না।

"রক্তগণ্ডে গণ্ড রাখি, পড়লো ধরণীটী"

কিরূপ বুঝিলাম না।

"মুহরিল অলি" বোধ হয়—"গুঞ্জরিল অলি" হবে—মুহুরিতদ্বারবারকের অনুগ্রহ।

'সকল বাঁধন ঘুচি।'—ঘুচি'টা 'ছিঁড়ি'ই হইত—অলির সঙ্গে মিলের জন্য 'ঘুচি'ই থাকিয়া গেল।

শ্রীপ্রমথনাথ দে বি. এল্ মহোদয় বঙ্কিমবাবুর হর্ষোৎফুল্লনন্দিনী পড়িয়া আসিবার উপর এক সনেট লিখিয়াছেন।—

সাগর মন্থন করিয়া সুধা পাওয়া গিয়াছিল আর সাগরে ডুব দিয়া ধন পাওয়া যায়। প্রমথবাবু সুধার জন্য বঙ্কিমবাবুকে সাগরে ডুবাইয়াছেন। এই সুধাই বোধ হয় আসেবা। এই আসেবা-অমৃত পান করিয়া হলো বঙ্গবাসী পুলকে মাতিয়া আসেবা শুধু সুধা নহে। "সাহিত্যের বালারুণশোভিত আকাশে বহুমূল্য ধনে অঙ্কিত ছবি"ও এই আসেবা। কবি আরো বলিতেছেন—যতদিন ইহা মহীমণ্ডলে ফুটিয়া রহিবে ততদিন ইতিহাসে তাহার গৌরবগাথা রহিবে। কবি সবশেষে বলিয়াছেন—"কি অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, আত্মবলিদানে নীরবে কি সাধনার মহাসমাধান?" আমরা বলি উকীল মহাশয়-অবসরকালে নীরবে কিছুকাল সাধনা করুন তাহা না হইলে এসমস্যার সমাধান হয় না।

"যুগযাত্রী"। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখটী মহোদয়ের। ভাষা ছন্দ মিলের কিছু কিছু দোষ থাকিলেও কবিতাটি বর্ত্তমান সময়ের প্রয়োজন হিসাবে মন্দ হয় নাই।

ভাষার ভাস্কর। কবিতাটির স্থলে স্থলে বেশ সৌন্দর্য্য আছে।

ভক্ত সঙ্গীত শিক্ষ ইঙ্গিত
শ্রীত বড়ক্ত প্রের
তুল তোমার ধনি ধনির
কবিয়াছে ভরপুর।

বেশ সুন্দর। 'যাহা' 'তাহা' ও 'আঁকি' 'আঁখি' মিলগুলি ভাল হয় নাই।

বিদায়। কবি বলেন—

"দাও চুম বিদায় বিদায়
সকলের উষা এলো সই
আমার এ নহেক প্রভাত
একেবারে সন্ধ্যা আসে ঐ।"
"তব কেশ তমঃ সিক্ত করি
যাবারণ তোমার বদন
ক্ষীণালোকে অরুণের সম" ইত্যাদি

বিদ্যাপতির প্রতিধ্বনি।

শ্রীমণিমোহন মল্লের—"কৃষকের ব্যথা।" অপরের কবিতার চর্ব্বিতচর্ব্বণ। কৃষকের ব্যথার কথা আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। মণিমোহনবাবু ছন্দটির পর্য্যন্ত লোভ সামলাইতে পারেন নাই।

"শুনলে পরে সেই কথাটি কত শান্তি পাই"
"সেই সে মুখের মধুর হাসি
পড়িছে মনে রাশি রাশি (?)"
"মরণ যেন এগিয়ে আসে
আজকে কিম্বা কাল।"
"আগুন লেগে প্রাণটা যেন
বন্ধ করে ধুধু"
"সোনাটা দিয়ে আমায় যেথে
কত নূতন ঠাটে।"
"এমনি করে' মিশবে এপ্রাণ
হাটে কিংবা মাঠে।"

এ সকল পংক্তি নেহাৎ অপরিপক্ক হস্তের নিদর্শন।

কবিতায় বার বার ছন্দঃ পতন। কবির এখনো মাত্রিকছন্দ রচনার ক্ষমতা জন্মে নাই।

"ফুলের প্রতি।" শ্রীযোগেশচন্দ্র লালা এম্, এ, বি, এল্। ফুলপাঠ্য পুস্তকের উপযুক্ত হইতে পারিত যদি কবি তাহার প্রতি আর একটু মনোযোগী হইতেন।

অনাবশ্যক এক 'কে তুমি' দিয়া কবিতাটি কেন যে আরম্ভ তাহা বুঝা কঠিন। বোধ হয় কবি ভাবিয়াছেন—"কে তুমি" দিয়াই কবিতা আরম্ভ করার রীতি। 'সুরভি'র বিতরণ করা চলে না 'সৌরভ' বিতরণ করিতে হয়।

"ধন্য কীটে চাখ নিজ কোমল অন্তরে
যদ্যপি অনেকে তারা উহল বিদরে।"

ইহাও কবিতা?

আর একটু নমুনা—

মৃদুল সমীরে তব পরিচয় পেয়ে
দূর হতে অলিকুল আসে ছুটে ধেয়ে
বালক আদর করি তুলে নেয় কানে
পালিছা বসায় তার অলক আসনে
সার্থক জনম তব, বটে অয় প্রাণ
মরতে আসিয়া তবু কর সুধাদান

ইত্যাদি অনেক কবিত্ব (?) ইহাতে বর্ত্তমান।

"টাকাতোড়া"। শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ। মাসিকপত্র অপেক্ষা 'কবির' আখড়ায় ইহার অধিক সম্মান হইতে পারে। যাহাদের রসবোধের আদর্শ উন্নত হইয়াছে তাহারা এসকল কবিতার আদর দূরে থাক শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া উঠিতেও পারিবে না।

'ছোটো-খাটো'। শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসুর চতুষ্পদীরচনা সমালোচনার অনুপযুক্ত।

শ্রীঅজিতকুমার সেনের। "বিদায়ের কথা।" 'কৃষকের ব্যথা' সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে 'বিদায়ের কথা' সম্বন্ধেও প্রায় তাহাই প্রযোজ্য।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "কোকিলের প্রতি।" কবি কোকিলকে ভারতের অতীত গৌরবের কথা গাহিতে বলিতেছেন—

"কোথায় মহাকবি শ্লোক বিধুনের কাব্যকার
কৈমিনী-কণাদেসাখ্য (?) পণ্ডগুলি বেদভাষ্যকার"

ইত্যাদি অনেক কথা কবিতায় আছে। কোকিলকে দিয়ে ভারতের অতীতকীর্ত্তি গাওয়াতে কবিই পারেন কবি ভাবের উত্তেজনায় অনেক স্থলে তাহার সার্থকতা রক্ষা করেন নাই। কবিতাটী—পরিচারিকা পত্রিকায় কিছুদিন আগে প্রকাশিত "বহু বহু ওগো পর্যটক" প্রভৃতি কবিতার বার্থ অনুকরণ।

জীবনকৃষ্ণ বাবুর ক্ষমতা আছে অনুকরণ ত্যাগ করিয়া এবং তাহার প্রতি অবহিত হইয়া কাব্যানুশীলন করুন কবি হইতে পারিবেন।

ভারতী। "বসন্তবিলাস" কবিতা শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

করুণাবাবু আজকাল বড় একটা লেখেন না। যাহা দু'একটা বাহির হয় তাহাতে আমরা করুণাবাবুকে ঠিক খুঁজিয়া পাই না। হয় তাহা পূর্ব্বের চর্ব্বিত চর্ব্বণ—নয় প্রাণহীন শিল্পচাতুর্য্য। করুণাবাবুর ভাষা ছন্দ ও কাব্যকলা-কৌশলের উপর প্রভূত আছে সেজন্য ঐ ২।১টী কবিতা পড়িতে সুখিই লাগে কিন্তু কবি যে কি বলিতে চাহেন তাহা ধরা যায় না।

কবির 'বসন্তবিলাস' নামক কবিতাটিতে ছন্দোবদ্ধ অতিসুন্দর। সুমধুর ও সুনির্ব্বাচিত শব্দ সমাবেশে কবিতাটি বেশ শ্রোত্রাভিরাম। কিন্তু ভিতরে এমন একটি ভাবসূত্র নাই যাহার সাহায্যে ইহা কিছুকাল টিকিয়া থাকিতে পারে। বিনিসুতের মালার ন্যায় একটুকু দুলিয়াই ইহা ধূলায় লুটাইয়া পড়িবে বলিয়া ভয় হয়।

কবি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কাঞ্চনবন পরছায় কোন্ কোন্ রঙে ফুটল?" তার পরই জিজ্ঞাসা—"কিংশুকফুল চীনবাস গায় কেন চঞ্চল হয়ে উঠল?" তার পরই "বোমটায় ঢেকে টুটিয়া যাওয়ার কথা।"

কবিতার অনেকগুলি পংক্তিতে ২টী করিয়া বাক্যের শেষ। এই বাক্য দুইটীর মধ্যে আন্তরিক মিলনের অভাব। পংক্তিতে পংক্তিতে আন্তরিক মিলন খুব কম আবার মোটে মোটেও একটা ঘনিষ্ঠ সঙ্গীত মিলন নাই। মোটের উপর কবিতায় একটা organic growth ধরা যায় না।

স্থলে স্থলে চিহ্নিত করিয়া আমরা কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

হাসে—সুন্দরমুখ খঞ্জনচোখ (১)
ভাঙ্‌লাগ ঘর অঙ্গন (২)
নাহি—নৃত্যের শেষ সঙ্গীতরেশ (?) (১)
ফুলবাস সব চঞ্চল (২)

(সঙ্গীতরেশ কি ফুলবাসের বিশেষণ ? না সঙ্গীতরেশও ফুলবাসের মত চঞ্চল ?)

আই—আনমন (?) চম্পার
যান (?)—স্বপ্নের আবছায়
হাসে—যৌবন-লোল হাসের রোল
রূপরশি ঝলমল।

(চম্পার আনমন বিশেষণের সার্থকতা বুঝা কঠিন—চম্পার হাস বুঝা যায়, রূপও বুঝা যায়। হাসের রোল ও রূপরশি, চম্পার কল্পনা একটু কষ্টসাধ্য। 'স্বপ্নের আবছায়' আবার গোলমালটাকে আরো ঘনীভূত করিয়াছে)

এলো—জ্যোৎস্নার রাত, (১) বন্ধুর সাথ
নন্দন ফুলশয্যা (২)
পেলো—রঙ্গের ফাগ (১), চুম্বন রাগ
লজ্জায় পাও লজ্জা।
? —মনীর সৌরভ
চুমে—কুন্তল সৌরভ
ওরে চায় প্রাণ মন আপনার জন, (১)
বনময় কুলসজ্জা ;

জ্যোৎস্নার রাত ও নন্দনফুলশয্যা বন্ধুর সাথ (সাথে) এলো—অর্থাৎ রঙ্গের ফাগ পেল' ও চুম্বনরাগ লজ্জাকে লজ্জা পাও। "চুম্বনরাগ লজ্জাকে লজ্জা দান" ব্যাপারটা অনেকেরই চর্ব্বোধ্য হইবে—বলিয়া শঙ্কা করি। তার পর—মনীর সৌরভের কুন্তলসৌরব চুম্বনের কথা—তাহা আরো কঠিন সমস্যা। মনীর সৌরভ একটা abstraction কুন্তল-সৌরব আর একটা। abstraction abstractionএ চুম্বন কল্পনা বড়ই চর্ব্বোধ্য।

ওরে—স্বপন সুর ঝঙ্কার ঘোর (১)
আর ফুলরেণু গান ভর
জাগে—বংশীর তান, হর্ষের বাণ
রাঙ ভোর গীত নির্ঝর।

ঘোর—কাকীর বন্ধন,
ঘোর—উন্মন ঘূর্ণন
ঘরে'—থাক ওড়নার কাজল পাড়
কুঞ্জের ফুলনার পর।

কখন সুর (?) ঝঙ্কার ঘোরার সহিত ফুলমধু পানের বিশেষ কোনো সম্পর্ক না থাকিলেও কবি দু'টীকেই এক পংক্তিতেই স্থান দিয়াছেন। কিন্তু সব থেকে এক নিমেষে তিন পাখী মারিয়া যে কবিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা লক্ষ্যের বস্তু। ২য় পংক্তিতে বংশীর তান জাগে, হর্ষের বাণ জাগে আর রাঙ-ভোর গীত নির্ঝর জাগে।

তার পর কাকীর বন্ধন খুলিয়া উন্মন ঘূর্ণন—ইহাতে অবশ্য আমাদের আপত্তি নাই—কিন্তু কুঞ্জের ফুলনার পর ওড়নার কাজল পাড় খসিয়া যাওয়াটা সম্ভবে বটে কি ?

ওরে—খোল অর্দ্ধেক উন্মীল চোখ
অঞ্জন আর কাজ নেই
ওলো—আলতার লাল পায় তল যায়
মঞ্জীর তার বাজবেই।
ছাজে—উৎসব নয়
ভুজ—পাশব নয়
জাগে—বল্লভ তোর চক্ষের ঠাঁই
তন্দ্রার ঘোর ছুটবেই।

অঞ্জনের সহিত নিমোন্মীলনের কি সম্পর্ক আছে জানি না—তবে আলতার যার পায় তল লাল তার মঞ্জীর নিশ্চয়ই যে কেন বাজবে তাহা বুঝিনা—আর বুঝিনা ১ম পংক্তির সহিত ২য় পংক্তির কি সম্বন্ধ ?

কবি 'ভুজবল্লরী' ব্যবহার করিতেন—আজ 'ভুজপাশ' কেন লিখিলেন তিনিই জানেন কণ্ঠপাশ ও পদপাশের দীর্ঘতায় বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভুজপাশের নম্রতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। "তন্দ্রার ঘোর ছুটবেই" এর সহিত চক্ষুরুন্মীলনের সম্বন্ধ আছে স্বীকার করি—কিন্তু তন্দ্রার ঘোর যখন ছুটবেই তখন অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষুকে উন্মীলনের জন্য সাধাসাধি কেন ?

"কাজনেই। বাজবেই। ছুটবেই" এর মধ্যে ১ম দু'টী বেশ সুন্দর মিল হইয়াছে শেষ দু'টীতে বড়ই দুর্ব্বলতা

বুকে—তাল দেয় ওই রঙের ঘায়
দুর দেয় সব অন্তর।
আঁখি—চন্দন রস আলাপন আজ
ধ্যান করে প্রেম মন্তর।
সুর—মন্দার গন্ধি
প্রিয়—স্পর্শনবন্ধী
ওই—সুন্দর মুখ যৌতুক দিক্
উদ্বেল প্রাণ মন তোর।

রঙের ঘায় তাল দেয়—আর অন্তর দুর দেয়—অর্থাৎ অন্তর তলে তালে দুর দেয়। অতএব চন্দনরস আলপন আঁকিয়া প্রেম মন্তর (মন্ত্র) ধ্যান (মা—তপ) কর। ইহার সৌন্দর্য্য বোধ করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। অন্তর বা মন শুধু দুর দিয়াই ক্ষান্ত হইল না। উদ্বেল হইয়া সুর মন্দার গন্ধি প্রিয় পর্শনবন্ধী সুন্দর মুক যৌতুক দিতে আসিই হইল।

আমরা কবিতাটির সমালোচনা করিতে যাইয়া বাহুল্য করিয়া বসিলাম। হয়ত কবির প্রতি অবিচারই হইল। নেহাৎ বন্ধুমতী হিতবাদীর ন্যায় কবিতার বলিদান করিলাম বলিয়া কেহ কেহ আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের উপায় কি? শুধু একটু শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না—মনেরও তৃপ্তি চাই। শুধু শব্দেই তুষ্ট না হইয়া আমরা মধুর সন্ধান করিতে গিয়াছিলাম। শুধু ছন্দোমাধুর্য্যে পরিতুষ্ট না হইয়া অর্থের সন্ধানে কবিতাটির পংক্তিতে পংক্তিতে বিচরণ করিয়া হতাশ হইলাম।

ব্যতিক্রম করিয়া সৌন্দর্য্য মিলে না তাহা আমরা জানি এবং সেজন্য অধিকাংশ কবিতায় সৌন্দর্য্য আমরা বাহিরে না খুঁজিয়া সবই ভাবেই খুঁজিয়া থাকি। কিন্তু করুণাবাবুর 'একবিন্দুতে' সে শ্রেণীর নয়—যাহাতে সং লই সৌন্দর্য্য বলে-হরণ করিতে পারে। করুণাবাবুর একবিন্দুর সমষ্টিগত কোনো সৌন্দর্য্যই নাই। ছন্দের ঝঙ্কার ছাড়া অন্য কোনো একটি ভাবসৌন্দর্য্য কবিতাটিকে বেষ্টন করিয়া সমবায়ের গৌরবদান করিতেছে না। কোনো একটি মাধুর্য্যের সূত্র অবলম্বন করিয়া রসসৌন্দর্য্যে ইহা ফুটিয়া উঠে নাই। তাহা যদি হইত' তাহা হইলে কবিতাটি পড়িয়া আমরা বুঝিতে না পারিলেও বার বার ভাবিতাম ধ্যান করিতাম এবং তদ্দ্বারা শুদ্ধসৌন্দর্য্যের ও শুদ্ধভাবের উদ্বোধন করিতাম।

একবিন্দুর যাহা কিছু সৌন্দর্য্য তাহা ইহার অংশগুলির সমবায়ে নহে—পরস্ত পরস্পরের সহিত আন্তরিক মিলন সম্পর্কশূন্য পংক্তিগুলির আপন আপন নিজস্ব মাধুর্য্যে বা সৌন্দর্য্যে সেইজন্যই আমরা বাধ্য হইয়া—প্রত্যেক পংক্তির অঙ্গে অঙ্গে সৌন্দর্য্যের সন্ধান করিলাম কিন্তু হায় তাহাতেও 'মন না ভিজিল তেল'। কবিতার মধ্যে কতকগুলি পংক্তি বেশ সুরুচিত ও মধুর—তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছি বলিয়াই তাহাও ধরিতে পারিয়াছি। ছন্দোবদ্ধ অবশ্য অনিন্দ্য—পরিপক্ক হস্তের নিদর্শন।

এশ্রেণীর কবিতা বঙ্গসাহিত্যে সমাদর লাভ করিবে বলিয়া ভরসা হয় না। কবি বিদ্যাপতির গান ছাড়িয়া—উর্দ্দিনাভজালসঙ্কাশ তাঁহার সেই পুরাতন বীণাটিকে গৃহ কোণ হইতে টানিয়া বাহির করুন এবং ছিন্ন তার বাঁধিয়া লইয়া তাঁহার বাংলা দেশের সেই অন্তরের তানটি তুলিতে থাকুন।

জলতরঙ্গের টুং টাং টুং টাং কাণের উপর মায়াজাল বিস্তার করে বটে কিন্তু অন্তরের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না। তাহার চেয়ে আমাদের বাংলার বাঁশী ঢের ভাল—তাহার তান কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে।

"অভিজ্ঞান।" শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী। কবিতাটি সুন্দর। প্রতিবর্ণে বুঝা যায়—ঘোটের উপর ও একটী সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইয়াছে।

"প্রভাতে ডুবিল চাঁদ; সুনীল আকাশ
রাঙা হয়ে বেদনারে করিল প্রকাশ।
কামিনীর সারা অঙ্গ ভরি'
পুলকের ফুলসাজ কাঁপে থর থরি।
চিরিয়া পেলব প্রাণ, বিলায়ে সৌরভ
অমল ফুলের দল ঝরে' গেল সব।"

দেবীর সকল কবিতার একটী অশ্রুময় করুণা মাখা।

সন্দেশ, চৈত্র—"স্বদেশ।" শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। সন্দেশের প্রায় শত কবিতাগুলি এ মাসের প্রায়ই ভাল লাগে। দুঃখের বিষয় এবারকার স্বদেশ কবিতাটির বিষয় গৌরব থাকা সত্ত্বেও কবিতাটি সুরুচিত হয় নাই। প্রথম ত্রুটী—কবিতার মিলের বড়ই বৈষম্য। দ্বিতীয়—কবিতার ভাষা তেমন ললিত হয় নাই—সন্দেশের উপযুক্ত একেবারেই হয় নাই। তৃতীয়তঃ—ইহা কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের ও অন্যান্য কবিগণের স্বদেশ কবিতার ক্ষীণ অনুকরণ মাত্র।

"চোর ধরা"—কবিতাটী অতি সুন্দর হইয়াছে। শব্দ-নির্ব্বাচন অতি সুচারু। মিলগুলির চারুত্বেই কবিতার মাধুর্য্য বাড়িয়াছে।

বাবু হও বাবু হও ও পাড়ার ঘোষ বোস
যেই হও এইবারে খেয়ে যাবে কোঁস কোঁস।
খাটবে না জারিজুরি খাটবে না মার-প্যাঁচ
ধরে পাবো ঘাড়ে ধরে কেটে দেব প্যাঁচ প্যাঁচ।

এই দেখ ঢাল নিয়ে খাড়া আছি আড়াল
এইবারে টের পাবে বুকটা ধাকালে।
রোজ যদি সাবধান কানে তবু যাইনা
ঠেলাখানা বুঝিবিত এইবারে আর না।

প্রবাসী, চৈত্র—"বিজয়ী।" কবিবর রবীন্দ্রনাথের।

"সূত্রে নবীন সূর্য জাগে।
ঐ যে তাহার বিশ্বচেতন কেতন আগে
জ্বলছে নূতন বীর্যিরতন নিখিল মথন উত্তরাগে।
মশাল্ডলস লুপ্তি দূরে নিদ্রা দিনের মুপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলেছে আকাশ পুলকময়
জয় ভূলোকের জয় দ্যুলোকের
জয় আলোকের জয়।"

জাতীয় নবজীবনের গান। অনিত্যের আলেয়া ও খদ্যোতিকার আলোক ক্ষণস্থায়ী, তাহার প্রদীপ্ত মশালও ভস্মশেষ হইবে—নিত্যের ধ্রুবজ্যোতির আবির্ভাবে সব ম্লান হইয়া যাইবে। অজিতবাবু বৈশাখের ভারতী পত্রিকায় একবিতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলে পাঠককেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

"লীলা।" শ্রীপতিবাবুর ক্ষুদ্র কবিতা। মন্দ নহে।

"ক্ষুদ্র যোগে ব্যর্থ নহে জানিবে দিতে তাই
বিশ্বপতি ক্ষুদ্র করে মুকুল পড়ে তাই।"

"ধাত্রি প্রকৃতি" ঐ প্রকারের। শ্রীপরিমলকুমারের—"নূপুর" চলন সই।

"অভ্যাসসাধারণ"—বিমানবিহারীবাবুর। 'কণিকার' অনুকরণে নৈতিক কবিতা।

'বসন্তে'—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস রচিত কবিতাটী নিম্নে তুলিয়া দিলাম—আর একটী কবিতা ঠিক এ-সকলেরই কিছুকাল আগে অন্য কবির রচিত ও প্রকাশিত তাহাও নিম্নে তুলিয়া দিলাম। পাঠকগণের বিচার্য্য।

এলো আজি ঋতুরাণী কুঞ্জে,
তাই বুঝি ধরণীর বিপুল পুলক ব্যথা (?)
জাগিলরে মঞ্জরীপুঞ্জে।
এলো আজি ঋতুরাণী কুঞ্জে।
ছুটিল মধুর মৃদু সমীরণ চঞ্চল
স্পর্শি মোহন তার কাঞ্চন অঞ্চল
চরণ পরশ লভি ফুটিল কুসুমদল
অলিকুল তারি বাণী গুঞ্জে,
এলো আজি ঋতুরাণী কুঞ্জে।
যৌবন বেদিনী তলে সঙ্গীতে তরঙ্গিত,
নবীন আবেশে ভরে দিগন্ত কম্পিত
শুধু মঞ্জীরধ্বনি উঠে আজি অপূরবি (?)
রুণু রুণু রুণু রুণু রণ রে।
এলো আজি ঋতুরাণী কুঞ্জে।
আসিয়াছে ঋতুপতি (?) যদি কল কলার
ছেড়ে দেন তাঁরি হাতে শুভ বেদনার তার
ওই দেখ দেখ চেয়ে রসের সায়রে নেয়ে
নিখিল প্রমোদ মধু কুঞ্জে।
এলো আজি ঋতুরাণী কুঞ্জে।

পূর্ব্বে প্রকাশিত অন্য কবির এই ধরণের কবিতা।

"কে এলো মম স্নেহ কুঞ্জে?
শুকানো তরুর গায়ে জাগে পুলকাকুল
মধুময় মঞ্জরী পুঞ্জে।
কে এলো মম স্নেহ কুঞ্জে?
অশোক রঙীন হলো চরণ পরশ পেয়ে
বকুল আকুল তার মুখমধু রসে নেয়ে
অলক পবন গতি অলিকুল এল ধেয়ে
নয়নরোচক যেন গুঞ্জে?
কে এলো মম স্নেহ কুঞ্জে?
হাতে তাহার মরি অমিয়ার ধারা ক্ষরে
কমলার করে যেন লাবণীর করণা ঝরে
মরালকণ্ঠে বাজে পরম মরমের
মঞ্জীর রুণু রুণু রুণ রে।"
কে এলো মম স্নেহ কুঞ্জে?
জানিয়া অধির বাণী বিহগ চেতনা পায়
বেহাগ পুরবী তুলি প্রভাতী সানাই গায়
অকূল ধারে টঙ্গি চকল ঘুরি ঘুরি
প্রজাপতি কুলবধূ ভুলে
কে এলো মম স্নেহ কুঞ্জে?"

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থের "প্রথম পত্র" কবিতার ভাবটী অন্যান্য কবিরা মানসী ইত্যাদি পত্রিকার আগেই সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তবু অল্পের মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের কবিতা মন্দ হয় নাই—

ক্রমশঃ

পঙ্কজ

UNIVERSITY OF CALCUTTA
LIBRARY
THE ADVANCEMENT OF LEARN

উপাসনা

১৪শ বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ—১৩২৫ { ২য় সংখ্যা।

আলোচনী

কলিকাতার সামাজিক ব্যাধি ও সামাজিক স্বাস্থ্য-সমস্যা

সামাজিক কদাচারের পরিমাণ

কলিকাতা-সমাজ-সেবা-প্রদর্শনীর দ্বারা সমাজ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান ও ঔৎসুক্য জাগিয়াছে দেখিয়া এবং ধন-বিজ্ঞান ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির প্রদর্শকরূপে আমাকে যে অসংখ্য প্রশ্নাবলী প্রত্যহ দর্শকবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিতেন তাহার উত্তর দিবার ইচ্ছায় আপনার সৈনিকে (The Bengalee) একটু স্থান ভিক্ষা করিতে সাহসী হইতেছি। কলিকাতার কতকগুলি বিশেষ সামাজিক কুপ্রথা যাহার আশু নিরাকরণ অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং যাহা আমার কতিপয় চিত্র ও আদর্শ দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে প্রদর্শিত করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু বলিব। সর্ব্বোপরি সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে কলিকাতার বেশ্যাবৃত্তি। কলিকাতায় পতিতা নারীর সংখ্যা দেখিলে সত্যই ভয় হয়। এই মহানগরী ও তাহার সন্নিকটস্থ স্থান সমূহে ভ্রষ্টানারীর সংখ্যা সর্ব্বসাকল্যে ১২৮৩৮ এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চাত্তর গণনায় ১৬০০০। বিংশতি হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের প্রত্যেক হাজার নারীর মধ্যে একজন ভ্রষ্টা। এতদ্ব্যতীত পতিতাগণের দ্বারা প্রতিপালিত দশ বৎসরের নিম্নবয়স্কা বালিকার সংখ্যাও ১০৯৬ এর কম নহে। তাহারা সকলেই যে ঐ ঘৃণিত জীবনযাত্রার জন্য লালিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন ভয়ানক কথা এই যে উক্ত বালিকাগণের অধিকাংশই তাহাদের জনয়িত্রীদিগের সন্তান নহে। অনেকেই ক্রীত অথবা পতিতাগণের দ্বারা প্রত্যর্পিত। বোম্বাই নগরে এই পাপের পরিমাণ কম। উপরন্তু কলিকাতার ন্যায় বোম্বাইবাসী এ বিষয়ে দায়হীনও নহে। কলিকাতায় মৃতজাত সন্তানের সংখ্যা ১১০১ অর্থাৎ প্রত্যেক ১৭টী সন্তানের মধ্যে ১টী মৃতজাত। পাশ্চাত্যদেশে একই অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহকারী ও বিবাহ সম্বন্ধে একই নিয়মানুবর্ত্তী ব্যক্তিগণের মধ্যে এতাদৃশ মৃতজাতের সংখ্যা দেখিলে সহজেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অস্বাভাবিক উপদংশ রোগের প্রাদুর্ভাব অনুমিত হইয়া

থাকে। কিন্তু বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় ও সন্তানকে স্তন্য প্রদানের সময় নীচে নীচে উপস্থিত হওয়ায় এবং উৎপাদিকাশক্তির অপেক্ষাকৃত পূর্ণতার পূর্বেই সন্তান প্রসব করায় (ভারতবর্ষে) হাসপাতাল ও ডাক্তারদিগের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা ভারতবর্ষে মৃতজাত সন্তানের আধিক্য হইতে উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব স্বীকার করিতে পারি না। সৈনিকদিগের চিকিৎসাগারে ভারতীয় ও ব্রিটীশ-সৈন্যগণের মধ্যে উপদংশ রোগের চিকিৎসার্থীর সংখ্যা দেখিলে এ বিষয় অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

অবিবাহিত ব্যক্তির সংখ্যা :—

উপরি-উক্ত দোষ সমূহের নির্ম্মূল করিতে অথবা উহার সংস্কার-সাধন করিতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য তাহা প্রাজ্ঞ আমাদের প্রদর্শনীয় দর্শকবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিতেন। কিরূপে সংস্কার-সাধিত হইতে পারে তাহা স্থির করিতে হইলে পূর্ব্বে কি কারণে কলিকাতার বেশ্যাবৃত্তির এত আধিক্য তাহা এক একটী করিয়া দেখা আবশ্যক। পতিতাদিগের দোষ তত অধিক নহে। দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থাই ইহাদিগের অধঃপতনের প্রধান সহায় ও কারণ। এবং এইরূপ সামাজিক ও আর্থিক অবনতি কলিকাতায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। কলিকাতায় অনেক লোক আছে যাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। মফঃস্বল হইতে আগত প্রবাসী ব্যক্তিগণই এই লোকসংখ্যা স্থায়ী এবং বর্দ্ধিত করে। ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের অত্যন্ত আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার লোকসংখ্যায় ১০০ শত জন পুরুষের প্রতি ৪৭ জন মাত্র স্ত্রীলোক আছে। নগরীর মধ্যভাগে বিবাহিত ব্যক্তি অতীব বিরল। লোকসংখ্যা প্রায় স্ত্রীবিহীন দাঁড়াইয়াছে। বিদেশ প্রত্যাগত-ব্যক্তিগণের মধ্যে ¾ ভাগ পুরুষ ও ¼ ভাগ স্ত্রীলোক পূর্ণবয়স অর্থাৎ ১৫ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে। এই বয়সের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা তিন গুণ বেশী। বিলাতের নগর সমূহে ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কদিগের মধ্যে ২০৭ জন স্ত্রীলোক প্রতি ১০০ জন পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া সেখানে গৃহকর্ম্মের দাসীভাবে থাকে। ২০ হইতে ৪৫ বৎসরের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে উভয়ের সংখ্যা তথায় প্রায়ই সমান।

গৃহাভাব :—

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে গার্হস্থ্য-জীবনের ইচ্ছা অতীব বলবতী। গার্হস্থ্যপ্রেম ও বাল্যবিবাহ এখানে তাহার প্রধান উপাদান। কিন্তু দারিদ্র্য ও গৃহাভাব কলিকাতার শ্রমজীবিগণকে এবং মধ্যবিত্তদিগকে ভয়ানক অন্নোদ্বেগ ও মনুষ্যত্ববিহীন করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতার কৃত্রিমতার কুৎসিত আমোদের মোহজাল মধ্যে অনেককেই অবিবাহিতজীবন অতিবাহিত করিতে হইতেছে। স্বভাবের সহিত সংস্পর্শ ও গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রনীতি তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে না। এবং বেশ্যাসক্তিই এই অস্বাভাবিকতার দারুণ পরিণাম ও প্রতিক্রিয়ায় দাঁড়াইতেছে।

পৃথিবীর সর্ব্বনিকৃষ্টকুটীর পূর্ণ মহানগরী :—

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া গৃহাভাবে মনুষ্যের চরিত্রও নষ্ট হইয়া থাকে। প্রাসাদপূর্ণ মহানগরী বলিয়া যে কলিকাতা খ্যাত প্রকৃতপক্ষে তাহা কিন্তু অতি নিকৃষ্ট বাসস্থানের আগার। গ্রাম হইতে শ্রমজীবিগণ কলিকাতায় আসিয়া পরিবারবর্গ বিরহিত হইয়া বহুজনপূর্ণ "বস্তি" অথবা "চালায়" অন্ধকার এবং অপরিষ্কার গৃহে সুখহীন শুষ্কজীবন অতিবাহিত করে। এইরূপ অবস্থায় কার্য্যতৎপরতা চলিয়া যায়, বুদ্ধিলোপ পায় ও অস্বাভাবিক আমোদপ্রিয়তা আসিয়া উঠে এবং অস্বাভাবিক উত্তেজনা লাভের জন্য মত্ততা আসিয়া পড়ে। মদ্য ও নারী তখন আশ্রয় হয়। মদ্যের দোকান ও বেশ্যালয়ে লোকে আলোক ও আমোদ দেখিতে পায়, সঙ্গীপায় ও কথোপকথন জন্য জীবনের চিরস্থায়ী দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া অন্য বিষয়ে মন করিতে পায়। গৃহহীন বিরহক্লিষ্ট দুঃখপূর্ণ জীবনের পথিকের সম্মুখে যখন বহুজনসমাকীর্ণনগরীর পাপসমূহ যখন তাহাদের মোহজাল বিস্তার করে তখন পারিবারিক পবিত্রতা, প্রাণ্য আদর্শ ও ধর্ম্ম কোথায় বাতাসে মিলাইয়া যায়, এবং অপরিচ্ছন্ন নগরীর

জনতাকীর্ণ বেস্তাগুলিসমূহে জনহীন প্রাণ্যগৃহগুলির বিপরীত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

মীমাংসার উপায় :—

পল্লীগ্রাম ও তাহার দারিদ্র্য পল্লীর পুনরুন্নতি, শিল্প ও সামাজিক নীতি সমূহের পুনর্গঠন ও নারীদিগের উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ এই সকলের সহিত আমাদের সামাজিক স্বাস্থ্য সবতা অঙ্গাঙ্গি-বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের শ্রমজীবি-গণের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে অথচ সংসার পালনে তাহারা অক্ষম। পয়ঃপ্রণালীপূর্ণ, ক্ষুদ্র, জীর্ণ বাসস্থানে তাহাদের আহার নিদ্রা ও প্রজনন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে তাহারা বাধ্য। বাসস্থানের মূল্য অত্যধিক হওয়ায় নগর সমূহে আমাদের স্বল্প বেতনভোগী মধ্যবিত্তগণের মেস্ (mess) অথবা নীচের তলায় বাস ভিন্ন উপায় নাই। পারিবারিক ও সামাজিক পবিত্রতা তাহাদের পালের পথে বাধা দেওয়ার জন্য উপস্থিত থাকে না। আমাদের স্ত্রী-লোকেরা জীবন-যাত্রার জন্য সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপর নির্ভরশীল, গৃহের ও সমাজের আধুনিক অবস্থায় তাহাদের স্বাধীন উপজীবিকা গ্রহণ একরূপ অসম্ভব। অসহায় বিধবাগণ আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা স্বজীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন না। সমাজের বন্ধন শিথিল হওয়ায় তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ একাকী জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। দারিদ্র্য ও দুঃখের সময় আশ্রয়-স্থলে চিরপ্রচলিত গ্রীবন রক্ষার প্রথা লোপ পাইয়াছে। পারিপার্শ্বিক কদাচার ও কুব্যবহার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা পাট ও তুলার কলে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। দেশের আধুনিক আর্থিক অবস্থার সহিত সমাজনীতির পরিবর্ত্তন না হওয়ায় দিনে দিনে দারিদ্র্য ও কষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের নূতন অবস্থায় শিল্পক্ষেত্রে শ্রমজীবিগণ একস্থানে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও সংসর্গ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত হইতেছে না এবং মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে আধুনিক সামাজিক পরিবর্ত্তন বশতঃ স্ত্রী পুরুষের অধিকতর সংমিশ্রণ জন্মিয়া উঠিতেছে। সামাজিক স্বাস্থ্য ও পবিত্রতার বিষয় চিন্তা করিবার পূর্ব্বে দেশের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করা একান্ত আবশ্যক।

শ্রীনলীনাক্ষ সান্যাল

প'ড়ো বাড়ীর কথা

আমি একটা প'ড়ো বাড়ী—এই জনপূর্ণ বৃহৎ বস্তুরাজির এক নির্জ্জন প্রদেশে দীর্ঘ কলেবরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার ঘিরে আর যে সব বাড়ী ঘর ছিল, কালের দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে একে একে সকলই ভূমিসাৎ হয়েছে। কিন্তু আমি বার্দ্ধক্য-প্রপীড়িত, নমিত মেরুদণ্ড, কুব্জদেহ বাস্তুর ভার কি ঝড়, কি বর্ষা সকলকে তুচ্ছ ক'রে, এখনও দাঁড়িয়ে আছি,—কেন জান? আমি আজ কেবল বছর নিশিদিন ধ'রে একটী অমূল্য রত্নের প্রহরা দিচ্ছি। পৃথিবীতে এ রত্নের উপমা নেই—নন্দন-কাননে এরূপ মুকুল দুর্লভ নয়—বিশ্ব বন্দোপিত কৌস্তুভমণিও এর কাছে ম্লান মানে। ওগো, এখনও তার সেই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর সেই চঞ্চল চরণোত্থিত অলঙ্কার শিঞ্জন আমার কর্ণে ধ্বনিত হ'চ্ছে। ওগো, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই রূপ এখনও আমার মনে প'ড়ছে। তোমরা হাস্ছ? প্রাণহীন বাস্তু! নির্জ্জীবের মুখে কথা শোভা পায় না মনে ক'চ্ছ? কেন? আমি নির্জ্জীব কিসে? মূর্খ মানব! ত্রিভুবনে তোমার কেউ নেই অথচ পৈতৃক ভিটে—ক্ষুদ্র কুঁড়েটী ছেড়ে দেশান্তরে যেতে প্রাণ কাঁদে কেন? ফিরে ফিরে তার পানে কেঁদে কেঁদে চাও কেন? শোন মূর্খ! তুমি যেমন তোমার হৃদয় ভরা স্নেহ দিয়ে তোমার গৃহ—বৃক্ষলতা ক্ষুদ্র-পিপীলিকাটিকেও আবৃত ক'রে রেখেছ,—তেমনি তারাও তোমায় তার প্রতিদান দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। তুমি যখন তোমার বাড়ী ছেড়ে কেঁদে কেঁদে দেশান্তরে চলে যাও তখন তোমার সুস্থ আকাশ-সুস্থগৃহ-সুস্থ বাতাস হাহাকার ক'রে কেঁদে ওঠে—তাদের প্রাণ, ফেটে চৌচির হয়ে যায়। পরন্তু এই পৃথিবীটা দান প্রতিদানেরই লীলাক্ষেত্র। পৃথিবীতে চিরদিনই এরূপ চেতনে-চেতনে, চেতনে-জড়ে, ও জড়ে জড়ে দানের বিনিময় চ'লে আস্ছে। কি জড়ে, কি চেতনে, এ নিয়মটাই স্বাভাবিক। আমি তোমায় ভালবাসি তুমি আমায় ভালবাস।

ওহো, সেদিন সেরূপ কেমন ক'রে ভুলব? সে রাত্রির অন্ধকারে ফিরে এসে ডাকলে "মা"। অট্টালিকায় অট্টালিকায় প্রতিধ্বনিত হ'ল 'মা' আকাশ বাতাসে ভাস্তে লাগ্ল 'মা' সমগ্র পৃথিবী যেন "মা মা" রবে পূর্ণ হ'য়ে গেল। কিন্তু তার মায়ের আর ঘুম ভাঙ্গল না। বাছা আমার 'মা' 'মা' ব'লে তার চিরনিদ্রিতা জননীর কোলে লুটিয়ে প'ড়ল—পৃথিবী চিরদিনের মত একটা অমূল্য রত্ন হ'তে বঞ্চিত হ'ল—একটা সাধ গান সুরে ছড়িয়ে প'ড়ে বিলীন হ'য়ে গেল। সেই দিন হ'তে প্রতি প্রভাত সন্ধ্যার পাখীর গানে—নদীর কলতানে—বৃক্ষের প্রতি পত্র মর্ম্মরে—সেই "মা" "মা" রব শুন্ছি। আর কণে কণে শিউরে উঠ্ছি। হায়রে! বাদশ বর্ষীয়া বালিকা—সংসার অনভিজ্ঞা—ভাল মন্দ জ্ঞান নেই—কি পাপে তার এ দশা! পৃথিবি! দীর্ঘ দিবস ধ'রে তোমায় দেখে আস্ছি,—তোমায় হাড়ে হাড়ে চিনেছি—তুমি পুণ্যের—নও, পাপের লীলা ক্ষেত্র।*

সে অনেক দিনের কথা। সংসারে তার মা বই—আর কেউ ছিল না। শৈশবেই সে পিতৃহীনা—জননীর পূর্ণ আদরে প্রতিপালিতা। তার নাম পুষ্প। সে ফুলের মতই সুন্দর ছিল, ফুলের মতই ক'রে গেছে। পুষ্প-লতার একটী খেলার সাথী ছিল, তার নাম যতীন। তারা পরস্পরকে বড় ভালবাস্ত গো-বড় ভালবাস্ত। এমন ভালবাসা বোধ হয় জগতে আর কেউ কাকে বাসেনি—বাস্তে পারে নি। পুষ্পের চেয়ে যতীন দু বছরের ছোট। পুষ্পের বয়স সাত। যতীন পুষ্পকে দিদি ব'লে ডাকৃত—পুষ্প আদর ক'রে তাকে কত কি ব'লত। এইরূপে অনেক দিন চ'লে গেল। পুষ্প যতীন-ময় ও যতীন পুষ্প ময় প্রাণ হ'য়ে উঠ্ল।

* Whom gods love die young.

আহা-হা! এখনও তাদের সেই অপূর্ব্ব ভালবাসার কথা আমার মনে প'ড়ছে; যেন তা সেদিনের ব'লে বোধ হচ্ছে। তারা দুজনে মিলে আমাতে ব'সে খেলা ক'রত, আমি একদৃষ্টে তাদের পানে চেয়ে থাকতেম, আর আমার সকল চক্ষু জুড়িয়ে যেত। তারা শিশুসুলভ সারল্যের কলহাস্যে অট্টালিকা পূর্ণ ক'রত, আমি আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে যেতাম। ভগবান্! তেমন আনন্দ কি আর পাব না? আমার বেশ মনে প'ড়ছে—একদিন যতীনের আস্‌তে একটু দেরী হ'য়েছিল, পুষ্প ছুটে তাদের বাড়ী চ'লে গেল। যখন সে বিষণ্ণবদনে ফিরে এল, তখন তাকে দেখে বুঝ্‌তে বাকি রইল না যে সে যতীনের দেখা পায়নি।

সে আমার এককোণে ব'সে মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ পরে যতীন যখন পাণ্ডুরমুখে পুষ্পের সম্মুখে এসে দাঁড়াল' তখন তার সে অভিমানের রোদন পদ্মপলাশস্থ জলের মত নিমেষে অন্তর্ধান হ'ল'। সে তাড়াতাড়ি উঠে ব'ল্‌লে, "যতীন, তোর কি হ'য়েছে ভাই!" যতীন ভাঙ্গাগলায় ব'ল্‌লে,"না দিদি কিছু হয় নি, মাষ্টার মশায় বেঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন তাই আমার আস্‌তে এত দেরী হ'ল—তা আর কখনও আস্‌তে দেরী হবে না, দিদি!" এই ব'লে সে অনুতপ্ত অপরাধীর মত কাঁদতে লাগ্‌ল'। পুষ্প তাকে বহু যত্নে সান্ত্বনা দিল। এবার তাদের গল্পের পালা সুরু হ'ল,—সে কত কথা—সেকি ফুরোয়? যতীন বল্লে, "দেখ দিদি, আমি বড় হ'য়ে একটা ঘোড়া কিন্‌বো তাতে কিন্তু তোমায় চড়তে হবে।" পুষ্প ব'ললে, "দূর পাগল! মেয়েতে কি কখনও ঘোড়ায় চড়ে?" যতীন ব'ললে,—"কেন, আমি শুনেছি সত্যিকালের মেয়েরা নাকি ঘোড়ায় চ'ড়ে যুদ্ধ ক'রত।" পুষ্প ব'ললে, "তা হবে, কিন্তু এটাত আর সত্যিকাল নয়?" যতীন ব'ললে, "না দিদি তোমায় চড়তেই হবে; বল তুমি চ'ড়বে।" পুষ্প হেসে ব'ল্‌লে, "আচ্ছা, তুই যখন কিন্‌বি তখন দেখা যাবে।"

না—আর বল্‌তে পাচ্ছি না, তাদের কথা শুনই আমার মনে হ'চ্ছে আমার বক্ষঃ-পঞ্জর ভেঙ্গে যেতে চাচ্ছে। বে বজ্র! কোথায় তুমি? আমার মাথায় পড়'—আমার মাথায় পড়'। পৃথিবী হ'তে চিরদিনের মত আমার অস্তিত্ব লোপ হ'য়ে যাক। না—না, তা হ'ক না—তা হ'ক না তাহ'লে পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কোহিনুর অমীমের অজানা রাজ্যে হারিয়ে যাবে—আমার যুগযুগান্তের সাধনা নিষ্ফল হবে। এই যে তার নিশ্বাস পরিমল মৃদু বাতাসে ভেসে আস্‌ছে; সিদ্ধ 'পরশ' প্রাণে 'হরষ' বর্ষণ ক'রছে। কে ব'লবে যে মরেছে, না—না সে মরেনি সে মরতে পারে না। সে যে আমার আঁধার ছবি আলো ক'রে আছে।

কিন্তু কি বল্‌ছিলাম—তাদের ভালবাসার কথা। তারা পরস্পর যে কত ভালবাস্‌ত তা কি করে বুঝাব? যদি আমার সহস্র সহস্র রসনা থাক্‌ত—এক নিশ্বাসে অনর্গল বলে যেতাম—ভাষার অভাব না হোত, তবে সে ত্রাতা তাদের ভালবাসার কথা প্রকাশ কর্‌তে পার্‌তাম। হে ভগবন্! আমার বাসনাকে এত প্রবল শক্তিকে এত হীন কেন কর্‌লে।

সে বৎসর বড় দুর্ব্বৎসর। এখনও তার ছবি মনে হ'লে প্রাণ কেঁদে উঠে। ইংরাজ সবেমাত্র বঙ্গের রাজা হয়েছে—দেশ শাসনে এখনও অক্ষম। বঙ্গবাসীর দুর্দ্দশার আর সীমা নাই। সমস্ত বঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল—দেশময় হাহাকার পড়ল। পুষ্পদের ক্ষুদ্র গ্রামটীও এর করাল কবল হ'তে রক্ষা পেলে না। গ্রামবাসিগণ অধিকাংশই দেশান্তরে পালিয়ে গেল। যারা গ্রামে রইল তাদের কতক না খেয়ে কতক অখাদ্য খেয়ে, কতক বা রোগে শোকে মারা যেতে লাগল। উঃ! সে কি ভীষণ দৃশ্য! পুরাণে দেবী-যুদ্ধের কথা পড়েছি—রণক্ষেত্রে অসংখ্য ভীষণ সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কৃত প্রেতের আবির্ভাব দেখেছি কিন্তু এমনটী আর কখনও দেখিনি। উঃ! কি ভীষণ! কি পৈশাচিক! মাতা পুত্রের গলা টিপে মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে—পুত্র মাতার শিরে লগুড়াঘাত করছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে ক্ষিপ্ত হয়ে তাথৈ তাথৈ নৃত্য করছে—লক্ষ লক্ষ নরনারী শৃগাল কুকুরের খাদ্য হ'য়ে পড়ে আছে। উঃ কি দুর্গন্ধ। পুষ্প ও যতীন তাদের গ্রামবাসীর জন্য "মোতে পিশীলিকার মত" যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু বালির বাঁধে কি নদীর মুখ ফিরানো যায়? এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। দশম বর্ষীয় বালক ও দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা

গ্রামময় ঘুরে ঘুরে পীড়িতের শুশ্রূষা, পিপাসিতকে জলদান, অনাহারীকে নিজেদের আহার্য্য অংশ দিতে লাগ্‌ল।

আর কতদিন? গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছে; পুষ্প ও ষতীন দুদিন সম্পূর্ণ অনাহারে। গৃহে পুষ্পের বৃদ্ধা জননী মৃতপ্রায়। সূর্য্য অস্ত গিয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্ষুদ্র গ্রামখানি আবৃত। মরণাংসাহারী শৃগাল আনন্দে-আরব করছে। গৃহপালিত অনশন-পীড়িত কুক্কুর নীরব—ভগ্নস্বরে শান্তিত। পুষ্প অতি কষ্টে মুমূর্ষু জননীর জন্য গ্রামান্তর হ'তে খানিকটা দুধ সংগ্রহ করে ফিরছিল। সে জনহীন পল্লীপথ সত্বর অতিক্রম করে গৃহ-চত্বরে উপস্থিত হল। কম্পিত হৃদয়ে গৃহ-প্রবেশ করে ক্ষীণালোকে দেখ্‌লে ক্ষুধার্ত্ত ষতীন ধূলায় পড়ে বিছানায় ঘুমুচ্ছে। সে তার জননীর বরফ-শীতল দেহে হস্তার্পণ করে শিউরে উঠ্‌ল; একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে ধূলায় বসে পড়ল। তার মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল—সে জোর করে নিজের চৈতন্য রক্ষায় যত্নবতী হ'ল। এইরূপে অনেকক্ষণ চলে গেল। শোকের প্রথম আবেগ কতকটা উপশমিত হ'লে সে উঠে ষতীনের গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে লাগ্‌ল। ক্ষুধার্ত্ত বালক ঘুমের ঘোরে বলে উঠ্‌ল দিদি—বড় খিদে। পুষ্প স্নেহ-গদগদ স্বরে বল্‌লে "উঠ ভাই! তোমার জন্য আমি খাবার এনেছি।" ষতীন এবার উঠে বসে চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে বল্‌লে "দিদি তুই কখন এলি? বড় মা আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন; আমার মাথাটা ঘুরতে লাগ্‌ল। যেমন এখানটায় একটু শুয়েছি অমনি ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু অন্যায় করেছি কি দিদি? পুষ্প—স্নেহে "লক্ষ্মী ভাই আমার! এজন্যে কি কিছু অন্যায় হ'তে পারে?" এই বলে তার মায়ের জন্য যে আধবাটী দুধ এনেছিল তা ষতীনের সাম্মুখে ধরে বল্‌লে "এইবার এই দুধটুকু খাও দেখি ভাই!" ষতীন বল্‌লে "তুই খেয়েছিস্ বড় মা খেয়েছেন?" পুষ্প মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে ষতীন এক নিশ্বাসে আধেকটা দুধ খেয়ে ফেলে বল্‌লে—"আমি আর খাব না—তুই খা দিদি! পুষ্প বল্‌লে না ভাই, আমি আগে অনেকটা খেয়েছি, তুমি এটুকু খেয়ে ফেল। এবার ষতীন পেয়ালা দুধটা খেয়ে ফেল্‌লে। ষতীনের দুধ খাবার কিছুক্ষণ পর পুষ্প বল্‌লে,—ষতীন, এখন তুমি আমার সঙ্গে বাইরে যেতে পারবে? বালক একদিন অনাথের সেবা ক'রে অনেকটা কষ্ট-সহিষ্ণু হয়েছিল সে অনায়াসেই বল্‌লে,—পারব না কেন?—কিন্তু ধড়দার কাছে কে থাকবে? এই বলে সে পুষ্পের বাহুর শঙ্কাস্পদে চেয়ে বল্‌লে;—ওই দিদি, বড় মাত' কথা বল্‌ছেন না; আবার ঘুমিয়েছেন নাকি? পুষ্প অন্তর্দ্বিত দুখ নিবারণ করে রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে,—হাঁ ভাই! তারপর ষতীনের দিকে চেয়ে তার অজ্ঞাতসারে আঁচলে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লে,—চল ভাই, আমরা ঘোর আনাদা গুলো বন্ধ ক'রে যাই। তা হলেই হবে। এই বলে পুষ্প গাত্রোত্থান কর্‌লে—সঙ্গে সঙ্গে ষতীন ও উঠ্‌ল। তারপর দুজনে পথে বেরিয়ে পড়্‌ল।

রজনী এক প্রহর অতীত হ'য়ে গিয়েছে—ঘোর অন্ধকার। ষতীন আগে ও পুষ্প তার পেছু পেছু পথ অতিক্রম ক'রতে লাগ্‌ল। উভয়েই নীরব। কিছুক্ষণ পরে পুষ্প প্রথম নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বল্‌লে, "ষতীন, একটা কথা ব'লব বিচলিত হবে না ত' ভাই?" বুঝতে পা পেরে ষতীন বল্‌লে, "তুই যতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকিস্, আমি কাকেও ভয় করিনে দিদি! পুষ্প আর্দ্রস্বরে বল্‌লে, চিরকাল কি আমরা একসঙ্গে থাকতে পারব ভাই! সংসারে কে কার মা-বাপ - কে কার ভাই-বোন? এইমাত্র আমরা এক সঙ্গে আছি; এইমাত্র হয় আমি—নয় তুমি মরে যেতে পার ভাই!" ষতীন কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে; "দিদি, এমন কথা ত' তুই কখন বলিস্‌নি—আজ এমন কথা বল্‌ছিস্ কেন? তুই মরলে, আমিও মরব।" পুষ্প বল্‌লে, "ছি! অমন কথা বলতে নেই। পৃথিবীতে সকলেই আমরা কাজ কর্‌তে জন্মেছি; একের অভাবে তার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। এই দেখ, আজ মা ম'রে গেলেন, কাল হয়ত' আমিও মরে যেতে পারি ভাই!" ষতীন চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল, কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে, "বড় মা কখন মরলেন দিদি?" পুষ্প চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লে,—"তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে; তার জন্য ভাবতে পারনি ভাই। এখন চল, আমরা যদি খুঁজে দু' একজন গ্রামবাসীকে পাই—

যার অন্তিম কাজ শেষ ক'রতে হবে। আমি বেঁচে থাকতে তাঁকে কখন এ অবস্থায় রাখতে পারব না। কএক বিন্দু অশ্রু পুষ্পের গণ্ডস্থল বেয়ে পড়ল। যতীন বুঝতে পেরে বল্লে, "দিদি, তুই কাঁদিস নে—তুই কাঁদলে আমার বড় কষ্ট হয়।" পুষ্প বল্লে, "না ভাই, আর কাঁদব না; চল!"

এইবার তারা একটা বাড়ীর সাম্নে এসে পড়ল। একটী কায়স্থ পরিবার এতে বাস ক'র্ত্তেন। ছদিন পূর্ব্বে পুষ্প এঁদের তত্ত্ব নিয়ে গিয়েছিল। আজ এতে জনমানবের সাড়া শব্দ নেই। বাড়ীর একস্থানে কটা শৃগাল কোলাহল ক'রছিল। একটা দুর্গন্ধ এসে তাদের নাকে পৌঁছল। পুষ্প বল্লে, "এস ভাই! এখানে আর বেরে কাজ নেই।" এরূপে তারা কত শবদেহ পদদলিত ক'রে, কত নরকঙ্কাল জীবের বিস্ময়োৎপাদন পূর্ব্বক গৃহ-গৃহান্তরে ভ্রমণ ক'রলে, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। অধিকাংশ গৃহই জনশূন্য। যে দু' এক ঘর লোক ছিল তাদের কেহ কেহ বল্লে, "আমরা দু'তিন দিন ধরে উপবাসী, এ অবস্থায় কি ক'রে তোমাদের সাহায্য কর্ত্তে পারি? কোন কোন উপবাসী আট্টহাসি হেসে বল্লে, "দুঁড়ীর রকম দেখ, আজ যাবে কাল নিজে হ'বুবেন—তার ঠিকানা নেই; উনি যাচ্ছেন অন্যকে সোরাতে! যা—যা, শ্মশানে গিয়ে তোদের নিজের চুলো তৈরী ক'রে রাখ্‌গে।" পুষ্প ও যতীন মর্ম্মাহত হ'য়ে সে বাড়ী হ'তে ফিরে এল। আর চলব চলে না। হায় রে! সুখপোষ্য বালকবালিকা, চিরদিন সুখের কোলে পালিত—দুঃখ কাকে ব'লে জানত না। ভগবান্! আজ তাদের একি পরীক্ষা, পুষ্প বল্লে, "এস ভাই,, এই গাছতলায় একটু বিশ্রাম করি।" তারা দুজনে একটা আমগাছের তলায় বস্‌ল। চারিদিক্ ঘোর অন্ধকার—বালকবালিকার হৃদয়ের অবস্থাও তাই। দু'দিন সম্পূর্ণ অনাহারে পুষ্পের মাথা ঘুরতে লাগল—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। যতীন জল খেয়েই আছে—আর কত জল খাবে? পুষ্প আত্মসংবরণ ক'রে বল্‌ল, "যতীন আমি আর চল্‌তে পারছি নে—তুমি যদি এক কাজ কর ভাই!" যতীন বল্লে, "বল দিদি, কি কর্ত্তে হবে? পুষ্প বল্‌তে লাগল, "তুমি একবার আনন্দবাগানে—সেই সাধুর আশ্রমে যাও; সেই পরম যিনি আমাদের কুটীরে নিয়ে গিয়ে ফলমূল খেতে দিয়েছিলেন। পথ ত' তুমি জানই। এখান থেকে মাইলটেক হবে; বরাবর সোজা গিয়ে তান হাতে উত্তরদিকে যে রাস্তাটা বেঁকেছে তাতেই যেতে হবে। তাঁকে সব কথা খুলে ব'লো, যাতে মার অন্তিম কাজটা হয়—তা তাঁকে কর্ত্তেই হবে। যতীন উৎসাহের সহিত বল্লে, "তবে চ দিদি, তোকে বাড়ী রেখে আসি।" পুষ্প তার মুখ চুম্বন ক'রে বল্লে, "আমি এখান থেকে একাই যেতে পারব। বাড়ী ত' আর বেশী দূর নয়। তুমি যেন একটু তাড়াতাড়ি যাবে; যাতে মাকে রেতেই শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যায়। শব বাসি হ'তে দিতে পারব না। যতীন উঠে বল্লে, "তবে আমি যাই দিদি।" পুষ্প জড়িয়ে ধরে তার মুখ চুম্বন করে বল্লে, "যাও ভাই, ভগবান্ তোমার সহায় হবেন। বিপদে পড়লে সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু হরিকে ডেকো। তিনিই তোমায় সকল বিপদে রক্ষা কর্ত্তবেন।" পুষ্প যতীনকে বিদায় দিল।

যতীন নয়নান্তরাল হ'লে পুষ্পের রুদ্ধ শোক উথ্‌লে উঠ্‌ল। সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর পানে এগুতে লাগ্‌ল। সম্মুখে তাদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা অন্ধকারে প্রকাণ্ডকায় দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ীর পানে চাহিতেই পুষ্প মা মা বলে উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকল,—'মা' 'মা' রবে অট্টালিকা প্রতিধ্বনিত করে মৃতা জননীর কোলে লুটিয়ে প'ড়ল।

এগো, সেই দিন হ'তে আজ এই সেদিন' বৎসর কাল—তাকে বুকে ক'রে, আমি তেম্‌নি দাঁড়িয়ে রয়েছি। কত ঝঞ্ঝাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, কত বর্ষার অজস্রবারি মাথা পেতে নিয়েছি; কিন্তু তৃণশয্যায় শয়ন করিনি। কেন না আমি জানি আমার পতনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হতে একটা অমূল্য রত্ন অন্তর্হিত হবে; একটা গীত, একটা গন্ধ, একটা আনন্দ মরে যাবে। যাক দিন, যাক বর্ষ, যাক যুগ, আমি অনন্তকাল ধরে এম্‌নি ভাবে সাধনা করব,—সাধনা করে আমার গৃহ-জন্ম সার্থক করে তুল্‌ব'।

শ্রীকাঙ্কিশোর রায়।

বৈরাগী

সত্যভাষি যায় যা'য় না,
তোমরা নাসা নাংটী হে,
আচ্লা খোলা, বিষম জ্বালা
গাঙ পাঁজা ভাঙ-টা যে!
দিন যে জোগায় দিনের আহার,
আত্মা নাহি সবলে,
ভাসা-অন্ন ভাগ্যবন্ত,
কৌপীন এবং কম্বলে।
নাইক তোমার নালিশ সালিস,
ডিক্রি, নিলাম, নাদ্জারি,
নাইক বেসাৎ, দাদা কাসাদ্
নাইক কোনই লেনদারই।
যোদ্ধা যারা যুদ্ধ করুক,
মরুক বকে' বন্দুকারা,
হরির কথা ভিন্ন কিছু,
গায় না তোমার একতারা।

সর্ব্বহারা সর্ব্বহারা,
লক্ষ্মীছাড়া তোমরা যে,
রাই কানুরে সার করেছ
তম্ব কর না যমরাজে।
সকল কাজে সকাল-সাঁজে
নাম কর হে প্রাণপণে,
হাটের গাছের কোকিল যেন
আচ্কা ডাকো আনমনে।
কথার কাজে বৃথার বাজে
দিনটী যবে যায় বয়ে,
উদাসীনের সুরটী তুলি
সার কথাটী যাও ক'য়ে।
কেউ তোমারে দেখ্তে নারে
কেউ বা করে খুব ভারী,
তোমরা বেড়াও নাম বিলায়ে
বৃন্দাবনের শুক-সারী।

শ্রীসুন্দরঞ্জন মল্লিক

যুক্তি কল্পতরু

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(১৫৫—২৪৫ শ্লোক)

বসতি লক্ষণ

নগরের মধ্যস্থল বিস্তীর্ণ ও চতুষ্পথযুক্ত সমতল (১) হইবে, উহাতে ক্ষুদ্র জলাশয়, সাধারণের বিশ্রামগৃহ, বৃহৎ সরোবর ও উদ্যানাদি শোভিত থাকিবে এবং উহার ঈশান ও পূর্ব্বদিকের ভূমি নিম্ন (ঢালু) যথাক্রমে ভূমি উন্নত হইবে।

গ্রামের (২) দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমদিক্ নীচ হইলে যথাক্রমে রোগ হয়, ধন লাভ হয় এবং সুখ সম্পত্তি নাশ হয়, আর মধ্যভাগ নিম্ন হইলে দারিদ্র্য, এবং প্রান্তভাগ নিম্ন হইলে সুখ হয়।

ত্রিপথ, চতুষ্পথ, বণিক্, পণ্যস্থান (হাট) এবং মঠ (৩) নির্ম্মাণের জন্য যথাক্রমে 'রাজদণ্ড,' 'রাজচ্ছত্র', 'রাজভাণ্ড', 'রাজপুরুষ', 'রাজধানী' এবং 'রাজক্ষেত্র' [পরিমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিবে।]

নগরের মধ্যভাগে সাধু, কোমল হৃদয় ব্যক্তি, চিকিৎসক ও দৈবজ্ঞদিগকে, প্রান্তভাগে বিধর্ম্মী, নীচ জাতি, ক্রূর, বীর সৈনিক এবং নিষ্ঠুরদিগকে, প্রবেশ দ্বারে সৈনিক বীরপুরুষদিগকে এবং স্বভবনের নিকটে মন্ত্রিদিগকে বাস করিতে দিবে।

দুইজন মন্ত্রিকে (৪) একত্র বাস করিতে দিবে না; দুইজন একত্র বাস করিলে দুর্ম্মন্ত্রণার আশঙ্কা আছে।

নগরের মধ্যে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে কর্ম্ম-সচিবদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিবে। কর্ম্ম-সচিব ও মন্ত্রির একস্থানবাস কার্য্যনাশের কারণ হয়।

মন্ত্রী দূরে বাস করিলে (৫) নগর কার্য্য করে না।

['নরকং নরকদ্বারং' ইত্যাদি শ্লোকটীর প্রকৃত পাঠ সংগৃহীত না হওয়ায় অনুবাদ হইল না। আমাদের মনে হয়—'নরকং নরকদ্বারং' স্থলে 'নগরং ন বহদ্বারং' হইবে; কিন্তু কেবল স্বকল্পনার উপর নির্ভর করিতে সাহস হইল না।)

[নগরের] মধ্যভাগে হস্তীর ও প্রান্তভাগে অশ্বের বাসস্থান করিবে না এবং নিকটে সেনানিবাস ও দূরে সাধু ও মন্ত্রীর আবাস নির্ম্মাণ করিবে না।

রাজা নিজ কল্যাণ কামনা করিলে, সন্ন্যাসী, অধিকাঙ্গ, নীচ, দরিদ্র, (৬) বিদেশীয়, অত্যুচ্চ এবং কুষ্ঠ-পীড়িত ব্যক্তিদিগকে নিজ পুরী মধ্যে রাখিবে না।

পুরী মধ্যে ভস্ত্রাশালা বা বিদ্যালয় করিবে না, কারণ সেখানে শত্রুর চর থাকিয়া নিজের বলাবল অবগত হইতে পারে।

ভোজ অন্যপ্রকার নগরযুক্তি বলিয়াছেন—

রাজার কোটি (১০০,০০০০) হস্তে এক 'রাজক্ষেত্র' হয়; এই পরিমাণ দ্বারাই রাজা পুরী নির্ম্মাণ করিবে।

রাজা যে নগরে ভূক্তি হইবে, সেই নগরের দণ্ড সংখ্যা লইয়া তাবৎ সংখ্যক 'রাজক্ষেত্র' পরিমাণে পুরী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবে।

---

(১) সমবৃত্তা চতুষ্পথঃ।

(২) গ্রামঃ।

(৩) বৃদ্ধকম্।

(৪) মন্ত্রিণোঃ।

(৫) মন্ত্রী চ দূরবসতিঃ।

(৬) দুর্গতান্।

ইহাতে ভোজের অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, রাজা যেকোনি রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে, যেহেতু একলগ্ন হয় চারিলগ্ন প্রভৃতি উক্ত রাশির পরিমাণ, অতএব চারিটী 'রাজক্ষেত্র' পরিমাণ পুরপত্তন হইতে পারে। আর সকলই সমান।

পরাশর সংহিতার পরিমাণ তাহাই উক্ত হইয়াছে কিন্তু সংখ্যা অন্যরূপ যথা—

গ্রহের যে দশায় রাজা ভূমিষ্ঠ হইবে, সেই দশার ভোগকাল যত বৎসর, তাবৎ সংখ্যক 'রাজক্ষেত্রে' নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবে।

দোষ ও গুণ

অন্যের লগ্ন ও দশার পরিমাণ অনুসারে নির্ম্মিত বা অন্য কর্ত্তৃক কৃত নগরে বাস করিলে রাজা অচিরে নিধন প্রাপ্ত হয়।

পরস্ত্রীতে যে দোষ পরপুরীতেও সেই দোষ, স্থির ঐশ্বর্য্য লাভের ইচ্ছা থাকিলে এই উক্ত বস্তুই ত্যাগ করিবে।

যে রাজা নিজ লগ্ন ও দশার মান (১) অনুসারে স্বয়ং নূতন (২) নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, তাহারই স্থির ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।

ভোজরাজকৃত নগরীযুক্তি শেষ।

বাস্তুযুক্তি *

স্থান-নির্ণয়

নদী, শ্মশান, পর্ব্বত ও বনের নিকটে এবং দুর্গ ও নগরের প্রাগুদেশে বাসভূমি নির্ম্মাণ করিবে না।

দিক্ নির্ণয়

নৈঋতকোণ, বায়ুকোণ, অগ্নিকোণ এবং দক্ষিণ দিকে গৃহারম্ভ করিবে না, তাহাতে যথাক্রমে ভয়, রোগ, দাহ ও ক্ষয় হইয়া থাকে।

(১) নিজ লগ্নদশানবাংশে।

(২) নবে।

* বাস্তু—গৃহনির্ম্মাণযোগ্য ভূমি।

কথিত আছে

যথানির্দ্দিষ্ট দিক্‌গুলিতে গৃহনির্ম্মাণের ফল যথাক্রমে ভোগ, ধন, ধন, রোগ, স্থিরতা, ভয়, ক্ষয় (৩) এবং দাহ।

ভোজ [বলিয়াছেন]

রাজা যে লগ্নে জন্মগ্রহণ করেন, সেই লগ্নের অধিপতি আবার যেদিকের অধিপতি * সেই দিকে গৃহারম্ভ করিবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, রাজা যেন লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিলে, মঙ্গল যেন রাশির অধিপতি (৪) এবং দক্ষিণ দিকের অধিপতি হওয়ায় দক্ষিণ দিকে বাসভূমি করিলেও দোষ হইবে না।

পরাশর [বলিয়াছেন]

রাজা যে দশায় জন্মগ্রহণ করিবে, সেই দিকেই বাসস্থান করিবে।

ইহাতে স্থির হইল—রাজা সূর্য্য প্রভৃতির দশার অন্তিমে পূর্ব্ব প্রভৃতি দিকে গৃহ করিতে হইবে, অতএব যে গুরুর দশায় জন্মগ্রহণ করে, তাহার পক্ষে অগ্নিকোণে গৃহ করিলেও দোষ হয় না।

লক্ষণ

যে সমতল ভূমির মৃত্তিকা স্নিগ্ধ ও পূর্ব্ব বা উত্তর দিক্ নিম্ন, রমণীয় বৃক্ষ শোভিত—সেই সুন্দর স্থানে রাজা বাস ভূমি নিরূপণ করিবে।

(৩) ভয় ক্ষয়।

* রবি, শুক্র, মঙ্গল, রাহু, শনি, চন্দ্র, বুধ ও বৃহস্পতি যথাক্রমে পূর্ব্বদিক্, অগ্নিকোণ, দক্ষিণদিক্, নৈঋতকোণ, পশ্চিমদিক্, বায়ুকোণ, উত্তরদিক্ এবং ঈশানকোণের অধিপতি। মেষ ও বৃশ্চিক রাশির অধিপতি মঙ্গল, বৃষ ও তুলার অধিপতি শুক্র, মিথুন ও কন্যার অধিপতি বুধ, কর্কটের অধিপতি চন্দ্র, ধনু ও মীনের অধিপতি বৃহস্পতি, মকর ও কুম্ভের অধিপতি শনি এবং রবি সিংহ রাশির অধিপতি।

(৪) কুজাধিপতিকে।

পূর্ব্বাদি দিক্‌গুলির (১) ফল যথাক্রমে ঐশ্বর্য্য, নাশ, ভয়, ধনলাভ, অর্থাভাব, সম্পত্তি ও সমৃদ্ধি।

বাসভূমির নিম্নতা

অন্য লগ্নের [অধিপতির] যেদিক্ তাহার বিপরীতদিকে রাজার বাসভূমির নিম্নতা (২) হইবে।

ইহাতে স্থির হইল যে, রাজা তুলা লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিলে; সেই লগ্নের অধিপতি সূর্য্যের যেদিক্ তাহার বিপরীত দিক্ অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের বিপরীত পশ্চিমদিক্ নিম্ন (চাপু) হইলেও দোষ হইবে না।

কেহ কেহ বলেন

রাজা যে লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিবে সেই দিকের সম্মুখের দিক্ নিম্ন হইবে।

ইহাতে যে রাজা বৃহস্পতির লগ্নে জন্ম গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে দক্ষিণদিক্ নিম্ন হইলেও দোষ হয় না।

অন্যত্র আছে

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ আয়-সমৃদ্ধিহেতু যথাক্রমে পূর্ব্বাদি দিকে বাসভূমি নিম্ন করিবে।

নীতিশাস্ত্রে আছে

রাজা প্রবল শত্রুদিকে বাসভূমি স্থির করিবে, নৃপতিগণের বাসভূমি দীর্ঘ বা চতুষ্কোণ হইবে (৩) দীর্ঘ ও চতুরস্রের লক্ষণ ও ফল নগর প্রকরণে যেমন উক্ত হইয়াছে সেইরূপ।

পরিমাণ

রাজা 'রাজকাণ্ড' দ্বারা বাসভূমির পরিমাণ করিবে।

রাজকাণ্ডের [সংখ্যা] অনুসারে বাসভূমির 'ধ্বজ,' 'ধূম' 'সুখ', 'দুঃখ', 'প্রীতি' 'ভয়' 'চল' ও 'স্থির' এই আট প্রকার নাম।

অন্যত্র আছে

রাজা তাহার জন্মলগ্নের স্থিতিকাল যত দণ্ড (৪) তাবৎ সংখ্যক 'রাজকাণ্ড' প্রমাণ বাসভূমি করিবে।

রাজা তাহার জন্মদণ্ডের যত বৎসর ভোগ কাল (৫) তাবৎ সংখ্যক 'রাজদণ্ড' পরিমাণে বাসভূমি নির্ম্মাণ করিলে ধন, ধান্য ও জয়লাভ হইয়া থাকে।

এই দুই প্রকার পরিমাণের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

'রাজচক্র' দ্বারাও কোন কোন স্থানে বাস্তু আরম্ভ হইয়া থাকে। তাহার পরিমাণও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

দোষ ও গুণ

রাজা অন্য নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে অধিকদিন বাস করিবে না; উহাতে এ জগতে তাহার সুখ বা ধর্ম্ম কিছুই হয় না।

অন্যত্রও এইরূপ কথিত আছে

যেমন মানুষের কোনও গ্রহ অন্য গৃহে থাকিলে সুফল প্রদান করে না, সেইরূপ অন্যের বলের আশায় থাকিলে বা অন্য নির্দ্দিষ্ট বাসভূমিতে অবস্থান করিলে তাহা রাজার পক্ষে সুখের কারণ হয় না।

নিজ লগ্নাদি অনুসারে বিচার পূর্ব্বক বাসভূমি নির্ম্মাণ করিয়া যে বাস করে, সে দীর্ঘকাল সুখভোগ করে।

অন্যত্রও আছে

যেমন কোনও গ্রহ স্বগৃহে থাকিলে তাহা সুখের কারণ হয়; সেইরূপ রাজা নিজ বাহুবলে পরাক্রান্ত হইলে এবং নিজ নির্দ্দিষ্ট বাস্তুতে বাস করিলে, তাহা সুখ প্রদান করে।

বাস্তু আরম্ভের কাল

বর্ষাতে শুক্র উদিত হইলে, বৃহস্পতি কেন্দ্র স্থানে থাকিলে, শুক্র, চন্দ্র, রবি ও বলবান গ্রহের লগ্নে, শুভ সময়ে বাস্তু কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। আদ্য অর্থাৎ জন্মলগ্ন এবং লগ্ন হইতে চতুর্থ সপ্তম ও দশম স্থানের নাম কেন্দ্র।]

সুখ সম্পত্তি লাভে ইচ্ছুক রাজা বাস্তু আরম্ভ করিবে।

বাস্তুযুক্তির বাসভূমি নিরূপণ শেষ

কেহ কেহ বলিয়াছেন,—বাস্তু কুণ্ডলীতেও আছে—

---

(১) ক্রমশঃ। (২) বাস্তুরূপে।

(৩) দীর্ঘা বা চতুরস্রা বা বাস্তুভূমির্বীক্ষিতাম্।

(৪) দণ্ডা যাবন্ত।

(৫) ভুক্ত দণ্ডের সংখ্যান

কর্ত্তার চারি হস্তে এক 'দণ্ড' (১) হয়; এই পরিমাণ দ্বারাই বাস্তু মাপিবে।

ক্ষেম, অমৃত, ভয়, শোকক্ষয়, বিজয়, শুচি, ধনপ্রদ, পাপকারী, বিকারী, শোভন, শিব, কুলপ, কাঞ্চন, পুষ্প, ধৌম্য, ধনহর, ধনদ এবং মুখদ এই অষ্টাদশ প্রকার বাসভূমি।

যথা

ভূমির দৈর্ঘ্য এবং বিস্তারের যোগে যে সংখ্যাটী হইবে, তাহাকে উনবিংশ দ্বারা ভাগ করিলে, [১ হইতে ১৮ পর্য্যন্ত] যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা যথাক্রমে এই অষ্টাদশ প্রকার ভেদ হইবে।

'ক্ষেমে' সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি হয়, 'অমৃতে' ধনের কারণ হয়, 'ভয়ে' ভোগ হয়, 'শোকক্ষয়ে' বন্ধু নাশ করে, 'বিজয়ে' বৃদ্ধি ও শুচিতে মাঙ্গল্য হয়, 'ধনপ্রদে' ধনবৃদ্ধি ও 'পাপকারী' ধননাশ করে, 'বিকারী' দুঃখ ও 'শোভন' কল্যাণ আনয়ন করে, 'শিবে' সর্ব্বার্থ সিদ্ধি, 'কুলপে' সর্ব্বার্থনাশ এবং 'কাঞ্চনে' অতীষ্ট লাভ হয়, 'পুষ্পে' সকল বস্তু লাভ করে, 'ধৌম্যে' বুদ্ধিবৃদ্ধি ও সুখ লাভ হয়, 'ধনহরে' ধননাশ ও 'ধনদে' ধনলাভ হয় এবং 'মুখদে' সুখ উৎপাদন করে। অতি সংক্ষেপে এই বাস্তু লক্ষণ কথিত হইল।

ভোজের মতে—'দণ্ডের' পরিমাণ সেইরূপই, কিন্তু 'দণ্ড' সংখ্যা অন্যরূপ।

নিজের জন্মমাসে ভোগকাল যত বৎসর, তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক 'দণ্ড' পরিমাণে, চতুরস্র, মঙ্গলপ্রদ, নূতন বাস্তু নির্ম্মাণ করিতে হইবে বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু জন্ম লগ্নের ভোগকাল যত দণ্ড তাবৎ সংখ্যক 'দণ্ড' পরিমাণে (১) নির্ম্মিত বাস্তু প্রীতি, সুখ ও সম্পত্তি প্রদান করে।

উত্তর অর্থাৎ শবসম, (লোষ্ট্র), বালুপূর্ণ এবং কর্দ্দমময় (২) এই তিন প্রকার স্থান বাসভূমির পক্ষে নিন্দিত।

ত্রিকোণ, সোলাকার ও দীর্ঘ ভূখণ্ড এবং ধনুর ন্যায় যাহার প্রান্তদ্বয় অতি সঙ্কীর্ণ ও মধ্যস্থল বিস্তীর্ণ বা যাহার একপ্রান্ত অতি বিস্তীর্ণ, অথবা ভগ্নকর ন্যায় যাহার প্রান্তদ্বয় বিস্তীর্ণ ও মধ্যস্থল সঙ্কীর্ণ এবং যাহা সর্পের ন্যায় দীর্ঘ ও বক্র এইরূপ ভূমি, ও যে ভূমি ত্রিস্তরিত (উচ্চ নীচ) এবং মধ্যস্থলে নিম্ন এবং যে ভূমি বাদনের (পাখার) মত ও যাহার চতুর্দ্দিকে বা তিনদিকেই পথ এবং যাহাতে দুইলোক বা দুই। বিবাহ) বৃক্ষ আছে এবং যে ভূমি দেখিতে গজ-দন্তের মত এইরূপ ভূমি বাস্তু খণ্ডের পক্ষে মহাদোষযুক্ত বিজ্ঞ ৩) বলিয়া কথিত হয়, অতএব সুধীগণ ইহা ত্যাগ করিবেন।

চতুষ্কোণ, সুন্দর ও দীর্ঘ এবং যাহার প্রান্তদ্বয় সমান (৪) ঈদৃশ দোষহীন বাস্তুখণ্ডই সুখের কারণ হয়।

বাস্তু মুক্ত শেষ

গৃহারম্ভে কাল নির্ণয়

বৈশাখ, শ্রাবণ, আষাঢ়, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, এবং কার্ত্তিক মাস গৃহারম্ভে সুপ্রশস্ত এবং পত্নী, পুত্র ও সম্পত্তির পক্ষে হিতকর।

শুক্লপক্ষে গৃহারম্ভ করিলে সুখ এবং কৃষ্ণপক্ষে চৌরভয় হয়; রবি ও মঙ্গলবার ভিন্ন সকলবারই গৃহারম্ভে শুভপ্রদ।

অন্যত্র আছে

পূর্ণিমা হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত তিথিতে পূর্ব্বমুখ গৃহ, কৃষ্ণ নবমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত উত্তরমুখগৃহ, অমাবস্যা হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত পশ্চিমমুখ গৃহ এবং শুক্লনবমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত তিথিতে দক্ষিণমুখ গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না।

বজ্র, ব্যাঘাত, শূল, বাতীপাত, ব্যতিপাত, বিষ্কম্ভ এবং গণ্ড যোগে গৃহারম্ভ করিবে না।

মুনিগণ বলেন যে ভরণী, চিত্রা, রোহিণী, মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, ধনিষ্ঠা, উত্তরা ত্রয়, রেবতী, মঘা বা স্বাতীনক্ষত্র শুদ্ধ স্বভাব হইলে, বুধবারে, পাপ যোগ প্রভৃতি দুষ্ট যোগ না থাকিলে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে, বিষ্টি দোষহীন দিনে গৃহারম্ভ মঙ্গল জনক।

(১) লক্ষণোক্তমিত দণ্ডসম্মিতঃ। (২) ক্লিন্না।

(৩) দৈবোপঘাতাঃ।

(৪) তুল্যাগ্রভ।

মৎস্য পুরাণেও আছে

"চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহ অনুকূল হইলে শুভ লগ্নে গৃহারোপণ করিবে (১) অন্য সময়ে করিবে না।

অশ্বিনী, রোহিণী, মূলা, উত্তর ফল্গুনী, উত্তর ভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া, মৃগশিরা, স্বাতি, হস্তা এবং অনুরাধা নক্ষত্র বাসভূমি নির্ম্মাণকার্য্যে প্রশস্ত।'

কৃত্তিকাদি নক্ষত্রকে তিনভাগে বিভক্ত করিলে, প্রতি-ভাগে নয়টী করিয়া নক্ষত্র পড়ে' তাহার প্রতিভাগের প্রথম দ্বিতীয়াদি নক্ষত্রে গৃহারম্ভ করিলে যথাক্রমে অশেষ বস্ত্র লাভ, পুত্রলাভ, ধনলাভ, শোক, শত্রুভয়, রাজভয়, মৃত্যু, সুখ এবং প্রবাস এই নয় প্রকার ফল হইয়া থাকে।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন যে, বৃশ্চিক ও কর্কট লগ্নে গৃহারম্ভ করিলে নষ্ট হইয়া যায়। মেষ, তুলা ও মকর লগ্নে করিলে দীর্ঘকালে কার্য্য সম্পন্ন হয়। কন্যা, মীন ও মিথুনলগ্নে করিলে নিশ্চিত অর্থলাভ হয় এবং কুম্ভ সিংহ ও বৃষলগ্নে উন্নতি হইয়া থাকে।

লগ্ন স্থানে রবি থাকিলে বজ্রপাত, চন্দ্রে ধন হানি, মঙ্গলে মৃত্যু, বুধে সুখ সম্পত্তি, বৃহস্পতিতে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম; শুক্রে পুত্র লাভ, শনৈশ্চরে দারিদ্র্য এবং রাহুতে বস্তুলাভ (?) হইয়া থাকে।

প্রবেশ কাল

শুভ গ্রহ [লগ্ন স্থানের] স্বামিস্থান কেন্দ্র স্থান এবং নিধনস্থানে থাকিলে পাপগ্রহ তৃতীয়, ষষ্ঠ ও আয় স্থানে থাকিলে এবং বৃহস্পতি ও শুক্র লগ্ন বা কেন্দ্রস্থানে থাকিলে এবং গৃহস্বামির শুভ রাশিতে গ্রহের উদয় হইলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়, গ্রাম্য ও স্থির রাশির (৩) উদয়ে গৃহারম্ভ এবং গৃহ প্রবেশ করিবে।

শুভগ্রহ চন্দ্র বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র (বিশেষতঃ বৃহস্পতি ও শুক্র) কেন্দ্র স্থান—আদ্য অর্থাৎ অঙ্গলগ্ন এবং লগ্ন হইতে চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থান। নিধনস্থান অঙ্গলগ্নের অষ্টমস্থান। পাপগ্রহ—ক্ষীণ চন্দ্র এবং শনি, রবি, রাহু, কেতু, মঙ্গল ও এই সকল গ্রহের অন্যতম গ্রহযুক্ত বুধ, (বিশেষতঃ শনি ও মঙ্গল)। আয়স্থান—একাদশ স্থান।

গ্রাম্যরাশি—মিথুন, তুলা, কন্যা, ধনু, বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশি; স্থির রাশি—বৃষ, সিংহ ও কুম্ভ রাশি।

রেবতী, ধনিষ্ঠা (১) শতভিষা রোহিণী, হস্তা, উত্তর-ফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে চন্দ্রের পূর্ণতা কালে অর্থাৎ পূর্ণিমাদি শুক্লপক্ষীয় তিথিতে এবং রিক্তা-তিথিহীন (২) শুভদিনে গৃহপ্রবেশ করিবে।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন যে (৩) গৃহের আরম্ভ বিষয়ে তিথি বার ও লগ্ন প্রভৃতি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রবেশ বিষয়েও সেইরূপই প্রশস্ত।

দ্বার

বাটীতে একটী মাত্র দ্বার বা চারিটী দ্বার রাখিবে না। দ্বার একটী থাকিলে প্রবেশ নির্গমেই অসুবিধা ঘটে, আর চারিটী থাকিলে বাটীর আবরণ রক্ষাই দুষ্কর হইয়া উঠে।

নৃপতির দ্বারত্রয় যুক্ত বাসই প্রশংসিত হইয়া থাকে। তাহার দুইটী দ্বার মুখ্য এবং একটী অন্য প্রয়োজনীয়।

তন্মধ্যে একটী 'রাজদ্বার', অপরটী 'ধনদ্বার' এবং অন্যটী 'অপদ্বার' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের যথাক্রমে পূর্ব্ব উত্তর ও পশ্চিমদিকে 'মুখ্যদ্বার' হইবে এবং অন্য দ্বারটী দক্ষিণ দিকে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে তাহারও দক্ষিণে 'বৈরিমুখ্য' নামক একটী প্রধান দ্বার রাখিতে হইবে।

'রাজদ্বার' দ্বারা অন্যান্য নৃপতিদিগকে ও স্বামীর ব্যক্তি-দিগকে প্রবেশ করাইবে। অভিমান, অনুগ্রহ প্রকাশ (অর্থাৎ অধিকার প্রদান বা পুরস্কার প্রদান প্রভৃতি) এবং উৎসবানুষ্ঠানও রাজদ্বারেই করিবে।

---

(১) শুভোদ্বাহাদি কর্ত্তব্যম্।

(২) ধনু প্রবর্জিতে।

(৩) স্বগ্রাম্যাদির ভোদয়ে।

---

(১) ধনিষ্ঠাসুখ। (২) রিক্তাকে। (৩) গৃহারাহভণা।

'ধনদ্বারে' [পশ্চিম] প্রাকার করিবে, [বলি] শস্ত্রদিগকে প্রবেশ করাইবে, শব বাহির করিবে এবং দুষ্টদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিবে।

'অপদ্বার' দ্বারা অন্তঃপুরিকাগণ গমনাগমন করিবেন, রাজা বিলাসোৎসব দ্বারা করিবেন এবং গুপ্তচরগণ প্রবেশ করিবে।

প্রাচীর নির্ণয়

রাজার প্রাচীর এইরূপ হইবে যে তাহাও হস্তিগণ ভঙ্গ করিতে পারিবে না এবং মানুষে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে না।

রাজার বিশটী প্রাচীর হইবে, এবং সকল গুলিই 'রাজদণ্ড পরিমাণে উচ্চ হইবে; তাহার পাঁচটী সম্মুখে, পাঁচটী করিয়া দশটী দুই পার্শ্বে এবং পাঁচটী পশ্চাদ্ভাগে থাকিবে। সকলের শেষে একটী প্রাচীর থাকিবে, তাহার নাম 'আবরণ' প্রাচীর।

প্রতি প্রাচীরস্থিত দ্বারগুলি পরস্পর অভিমুখী হইবে না।

'জয়' নামক দীর্ঘ বাস্তুভূমির নির্ণয়

রাজার 'রাজদ্বারের' দিকের প্রাচীর পাঁচটী এক দ্বাদশাংশের অর্থাৎ কোটি-হস্ত স্থানের মধ্যে হইবে, 'ধনদ্বারের' দিকের প্রাচীর সার্দ্ধত্রয় 'রাজদণ্ড' পরিমাণ ভূমির মধ্যে হইবে এবং অপদ্বারের প্রাচীর অর্দ্ধ 'রাজদণ্ডের' মধ্যে হইবে। এইরূপ স্থান ব্যবস্থা করিলে তাহার মধ্যস্থান বাসভূমি হইবে।

'জয়গণ্ড' দৈর্ঘ্যের পরিমাণ সার্দ্ধ 'রাজদণ্ডত্রয়' এবং বিস্তারের পরিমাণ পাঁচ 'রাজদণ্ড', এই ভূখণ্ডকে 'রাজপট্ট' বলে; রাজা এইস্থানে গৃহ করিলে চিরকাল সুখভোগ করে।

অজ্ঞানবশতঃ বা গর্ব্ব করিয়া যে রাজা অন্যস্থানে গৃহারম্ভ করে, সে অচিরেই নিধন প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ক্ষোভ, শোক ও ভয় হইয়া থাকে।

যেমন সর্প গরুড়কে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ বজ্রদণ্ড, উল্কাদণ্ড, কোন (শনি ও মঙ্গল-প্রভৃতির) ইতি (অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি) ও প্রদ্যোৎপাত প্রভৃতি এবং অন্যান্য বাস্তুদোষ বা স্থানদোষ 'রাজপট্ট' নামক ভূখণ্ডের কিছুই করিতে পারে না।

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য।

নব্যহিন্দুত্ব

বর্তমান যুগে যখন বাস্তব ইউরোপীয় সভ্যতার শাসনদণ্ড হাতে লইয়া আমাদিগকে শঙ্কিত ও ত্রস্ত করিয়াছে, ইউরোপীয় তুলাদণ্ড লইয়া যখন আমাদের সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতেছে, যখন ইউরোপীয় বিজ্ঞান বাস্তবকে আমাদের বিদ্যামন্দিরে পূজার আসনে বসাইয়াছে, তখন আমরা যে বাস্তবকে পরম সত্য বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা বিচিত্র নহে ; কিন্তু হিন্দুত্ব সজীব রহিয়াছে বলিয়া এই লীলাত্মক বাস্তবের সহিত লীলাময় নিত্য পুরুষের আবার নূতন সম্বন্ধ খুঁজিতেছে। ইহাই উদীয়মান হিন্দুত্বের বিশেষত্ব,—শক্তিপূজার দ্বারা বা বৈষ্ণবীয় সাধনার দ্বারা দেশে যে বাস্তব এখন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতেছে, তাহার সহিত নিত্যবস্তুর নূতন সম্বন্ধস্থাপন করা। পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহা শেষ কথা বার্গসঁর দর্শনে প্রচারিত হইয়াছে, অনিত্য চঞ্চল বাস্তবই সার সত্য,—উদীয়মান হিন্দুত্ব এই তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। উদীয়মান হিন্দুত্বের মূল-ভিত্তি হইতেছে—পাশ্চাত্য সভ্যতা, এই যুগে যে বাস্তবকে আমাদের দ্বারে আসিয়া পরমবস্তু বলিয়া উপঢৌকন দিয়া গেল, তাহাকে আপনার ভাণ্ডারে যেখানে হিন্দু নিত্য বস্তুকে বহু সাধনার ফলে যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেওয়া। ভাণ্ডার খালি করিয়া দিয়া নহে, ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া লইয়া।

উদীয়মান হিন্দুত্ব তান্ত্রিক বা বৈষ্ণবীয় সাধনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবে,—বাস্তব সত্য, কারণ সে যে নিত্যপুরুষের বা নিত্য-লীলাশক্তির প্রকাশ। সদাচঞ্চল বাস্তব—কিন্তু বার্গসঁ যেমন বলিয়াছেন, বাস্তবের চাঞ্চল্যের ভিতর আপনাকে ভাসাইয়া দিলে মুক্তি ও আনন্দ পাইবে, তাহা নহে,—সদাচঞ্চল বাস্তবের অন্তরে নিত্যপুরুষ বা নিত্য-লীলাময়ীকে অনুভব করিতে পারিলেই পরম শান্তি ও পরম আনন্দ। বার্গসঁ যেমন বলিয়াছেন, বিশ্বের লীলার মধ্যে ডুবাইয়া দিলে পরম আনন্দ পাইবে, তাহা নহে। আমি যদি বিশ্বের লীলা-স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, তবে আমার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? উদীয়মান হিন্দুত্ব বিশ্ব ও আমির সম্বন্ধনির্ণয় করিয়া বলিবে, বিশ্বের অন্তরে আমি, আমাতে বিশ্ব রহিয়াছে। বিশ্ব লীলাময়, কিন্তু সেটা বিশ্বের লীলা নহে, সে যে আমারই লীলা। আমিই লীলা করিয়া আমার শক্তি অনুভব করিতেছি, আনন্দভোগ করিতেছি।

বিশ্ব ও আমার মধ্যে এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমি স্বাধীন রহিলাম, বিশ্বধর্ম্মেরও মর্য্যাদা হানি হইল না। স্বধর্ম্মও রহিল, বিশ্বধর্ম্মও রহিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা যে যুগে যুগে হয় স্বধর্ম্মকেই প্রভু দিয়া বিশ্বধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিয়াছে, অথবা বিশ্বধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া তাহার নিকট স্বধর্ম্মকে বলিপ্রদান করিয়াছে, এই অনন্ত বিরোধের মীমাংসা উদীয়মান হিন্দুত্বে পাওয়া যাইবে।

নিজ স্বার্থ ও বিশ্বরাজ্যের অর্থের বিরোধ-নিবারণ যে শুধু অর্থশাস্ত্রজগতে একটা শান্তি ও আনন্দের সূচনা করিবে, তাহা নহে। সমাজ-জীবনেও স্বধর্ম্ম ও বিশ্বধর্ম্মের একত্বানুভূতি সমস্ত অসামঞ্জস্য, সমস্ত বিরোধ, সমস্ত অশান্তি দূর করিবে। সামাজিক সাম্যতন্ত্র ও ব্যক্তির বিকাশ, সাম্যভাব ও অধিকারভেদ, রাষ্ট্রের মহিমা ও ব্যক্তিত্বের গৌরব, বৈষয়িক উন্নতি ও অধ্যাত্মসাধনা সকলেরই সমন্বয়বিধান সকলকে আশ্রয় করিয়া সকলেরই সুবিধাবিধান করিয়া নব্য-হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা। অধ্যাত্মক্ষেত্রে যেমন নব্য হিন্দুত্ব পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম-দর্শনের আভ্যন্তরীণ বিরোধনিবারণ করিয়া যেমন মুক্তির পথপ্রদর্শন করিবে, সমাজ-জীবনেও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরাট ব্যর্থতাকে তাহার ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া তাহাকে আশ্বাস দিবারই জন্য ইহার বিকাশ। আর এই নব্য হিন্দুত্বে হিন্দুর যাহা কিছু পুরাতন, তাহা আশ্রয়লাভ করিবে এবং যুগ-শক্তি যাহা কিছু নূতনের

সৃষ্টি করিতেছে, তাহার পূর্ণমহিমা ইহাতে বিরাজিত থাকিবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশ্বগ্রাসী প্রয়াসের ব্যর্থতাকে সান্ত্বনা দিয়া, ভারতীয় সভ্যতার বিপুল সাধনার সাফল্যকে আশ্রয় করিয়া নব্য হিন্দুর বিশ্বমানবের এই প্রলয়ের দুর্দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে নবপ্রসূত শিশু প্রলয়ের ঘনঘোর মহাষ্টমীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,সেই শিশুই এই শক্তিমদমত্ত, অতিমানুষের অহঙ্কারে স্ফীত বর্ত্তমান ইউরোপকর্ত্তৃক অপমানিত বিশ্বমানবকল্পনার বক্ষ হইতে পাষাণ সরাইয়া দিবে, তাঁহাদিগকে মৃত্যুর হইতে মুক্ত করিবে,—তাঁহার জন্মতিথিতে আমরা মহোৎসবে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াছিলাম, এখন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি, কবে সে কংসকারাগারের দ্বার খুলিবে, কবে সে গুরুভার পাষাণ সরিয়া যাইবে, কবে সে ভীষণ মৃত্যুর খুলিয়া যাইবে।

বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দু-সভ্যতার অন্তস্তলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অটল অচল বিশ্বাসের শক্তিতে তুমি অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের মোহমুগ্ধল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাষাণের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমারি জন্মের অন্ধকার মথুরা, তোমারি কৈশোরের মধুবন, তোমারি কংসদের কারাগার, তোমারি ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ-শয়নের সাগর-সৈকত, বিশ্বের অচল নিগড়, তোমারি কংস-কারাগার। আর তুমিই সেই কারাগারের দ্বার মোচন করিয়া বিশ্বমানবকল্পনাকে উদ্ধার করিবে। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য তপস্যাই তোমার ব্রত, বিশ্বমঙ্গলার্থ নিখিল বিদ্যা তোমার অনুশাসন তন্ত্র, নিখিল সানুষ্ঠান তোমার অগ্নিপ্রস্তাব, বিশ্বের কল্যাণধ্যান তোমার আকৃতি। বিশ্বের কল্যাণের জন্য যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিবেন তাঁহারা তোমার প্রাণস্বরূপ। হিন্দু তুমি কি ইহা অনুভব করিতে পারিবে যে,—বিশ্বের কল্যাণ-ধর্ম্ম তোমার আত্ম-স্বরূপ। যদি তুমি তাহা অনুভব করিতে পার, তাহা হইলে জানিও, বর্ত্তমান ভীষণ দুর্যোগ, অন্ধকারের মধ্যে বিশ্ব-বাসুকী অনন্ত-মুখে অনন্ত নিশ্বাস ছাড়িয়া তোমাকে সেই কালচক্র হাতে লইয়া মোহ ও মত্ততার ধ্বংস করিবার জন্য তোমার শরণ লইয়াছেন।

সম্পাদক

দুইদেশী

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিপ্রহরে সত্যবতী বিরূপাক্ষের রবিবারের বৈজ্ঞানিক-সঙ্ঘের বক্তৃতার জন্য কতকগুলা নোট করিতে করিতে মাথে মাথে কলম রাখিয়া উদাসভাবে বাহিরের দিকে চাহিতেছিল, কিছুতেই হাতের কাজে তাহার মন বসিতেছিল না। এমন সময় শিশুকন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মৈত্রেয়ী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া সত্যবতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দিদি আমি রাণুকে খানিক ক্ষণের জন্য নিয়েছি; তুমি এই নোটগুলো শেষ কর না?" মৈত্রেয়ী বলিলেন, "কেন বল ত?" সত্যবতী লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল, "একঘেয়ে এক কাজ ভাল লাগে?" মৈত্রেয়ীর ক্রোড় হইতে শিশুকে লইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া সত্যবতী বলিল, "আচ্ছা দিদি, রাতে রাণুকে আমার কাছে দিয়ে তুমি ঘুমুতে পার?" দিদি, ভগিনীর চেয়ার অধিকার করিয়া বলিলেন, "আমি পারব না কেন, তুইই পারবিনে, দু'মিনিট যেতে না যেতে ফিরিয়ে দিবি।

সত্য। মনে কর যদিই আমি পারি, তুমি কি সারা রাত ওকে আমার কাছে রেখে ঘুমুতে পার?"

মৈত্রেয়ী। কেমন এর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, কোলের গোড়ায় ওকে না পেলে ঘুমুকে চম্‌কে ঘুম ভেঙ্গে যায়,—ও ঘুমের ঘোরে, একটু দূরে সরে গেলেই, আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

সত্য। আচ্ছা দিদি, তুমি এম, এ পাশ করেছ, কত বই পড়েছ, কত কাজ আগে আগে করতে, কিন্তু এখন সে সব একদম বিসর্জ্জন দিলে কেন? যোগমায়ার কত দুঃখ করেন, বলেন।

মৈত্রেয়ী। ওঁর কথা ছেড়ে দাও, আমার যত ছেলা সাম্‌লাতে হয়, তার অর্দ্ধেক যদি ওঁর ঘাড়ে পড়ত তাহ'লে বই লেখা, বক্তৃতা করা, সভাসমিতি করা কোথায় ঘুচে যেতো।

সত্য। তাত' জানি, কিন্তু উনিই একা সভাসমিতি করবেন, নিজের উন্নতি করবেন, আর তুমি সংসার নিয়ে পেটে থাকবে তাই বা কেন হবে?

মৈত্রেয়ী। এসব কথা আবার নূতন করে আমার সঙ্গে উঠ্‌ছে কেন? আমারত' তোমার যোগমায়া fallen angel বলে তোমাদের ঐ স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তুমিত' আজ কতদিন ঐ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছ তবে আমার মত কেরাতে না পেরে আমার বৈজ্ঞানিকসংঘের presidentship টুকুও কেড়ে নিয়েছ, আবার ওকথা কেন? কিছু নূতন মতলব আছে নাকি?

সত্যবতী কিছু বলিল না, শিশুকে খেলা দিতে দিতে তাহাকে লইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৈত্রেয়ী আপন মনে নোট করিয়া যাইতে লাগিলেন, এবং কণকাল মধ্যে সত্যবতী সমস্ত দিনে যতখানি করিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়া বলিলেন, "এইমে ভাই তোর কাজ, এ আবার আল লাগ্‌ছে না।"

মৈত্রেয়ী উঠিয়া দেখিলেন, সত্যবতী শিশুকে লইয়া কখন যে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। মৈত্রেয়ী তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ ওকে নিয়ে কি হচ্ছে?" সত্যবতী বলিল, "দেখ্‌ছিলাম, তোমার মত পারি কিনা, তুমি সারা দিন ওকে নিয়েই ব্যস্ত থাক তার কারণ খুঁজ্‌ছিলাম।"

মৈত্রেয়ী। পেলে খুঁজে?

সত্যবতী। একটু একটু পেয়েছি বৈকি।

মৈত্রেয়ী। পুরো পেলে বলে নিজের একটা আবদার মেয়ে চাই। তাই'লেই বুঝ্‌তে পারবি যে, আমাদের যা কেন যাত দিন চা ওঁর মধ্যে থাকতেই ভালবাসতেন। বাবা তাকে Changeএর জন্য দূরে পাঠালে কেন তিনি

পালিয়ে আস্‌তেন। নিজে একজন ঘোর রকম নাস্তিক হয়ে সেটা তার কি হবে!

সত্যবতী। নাস্তিকের সঙ্গে একথার যোগ কোন্‌খানে?

মৈত্রেয়ী। ঐ হল ভাই হল; কথা অত ধরিস্ কেন? সব সময় কি মনে থাকে, আমি এম্‌,এ পাশ করা বড় একটা মানুষ? সময়ে সময়ে বোকা হয়ে যেতে হয়। কি জানি ভাই, কি রকম করে যে এ সব হয়ে যাচ্ছে, তা' ঠিক্ বুঝ্‌তেই পারিনে। বিয়ের আগে কত লেক্চে বেড়িয়েছি, কত বক্তৃতা করেছি, ঐ অতবড় সভাটার সমস্ত কাজই আমি একা করে কেল্‌তাম, তোমার যোগতা ত' আমার ওঁরেই ওর একজন বেয়ার হয়ে চুকে—

সত্য। শেষে 'ঘর থেকে বেরুল টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে।'

মৈত্রেয়ীর মুখখানি মুখ মেঘগর্জনে আর লজ্জায় সুন্দরতর হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার কন্যাকে কোলে লইয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তা' তাই কি কর্‌ব, তোরা ঠাট্টাই কর, আর যাই কর, আমি আর এ কেলে তোদের সঙ্গে যোগ দিতে পার্‌ব না।"

সত্যবতী মুখে যাহাই বলুক, অন্তরে আর তাহার বিদ্রূপের ভাব ছিল না। সেও যে এখন ক্রমশঃ মৈত্রেয়ীর মতই পরিবর্ত্তনের দিকে চলিয়াছে সে কথা ত' কেহ জানিত না, তাই তাহাকে সারা দ্বিপ্রহর খুকীকে লইয়া খেলা করিতে দেখিয়া মৈত্রেয়ী মনে করিয়াছিলেন যে, সত্যবতী তাহাকে খুসী করিবার জন্যই উক্ত কার্য্য করিতেছিল। তথাপি সত্যবতীও যে এই খেলাতে রসানুভব করিতেছিল, একথা সে গোপন করিতে পারে নাই। তাহাকে এতক্ষণ অলসভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মৈত্রেয়ীও যেন মনে মনে তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই তিনি বলিলেন, "বেশীক্ষণ ওকে নিয়ে থাকিস্‌নে সত্য, দেখে তুইও আমার মত হয়ে যাবি।"

"সত্য। এক একবার তোমার মত হয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে কি দিয়ে তুমি থাক।

মৈত্রেয়ী। তোমার "টিয়ে" যে কবে ঘর থেকে বেরুবে, তাত' বুঝ্‌তে পারছিনে।

সত্য। "টিয়ে" বেরুলেই ত' হল না, তাকে সোণার টোপর পরিয়ে ত' আমাকেই দিতে হবে?

মৈত্রেয়ী। যে দিন টিয়ে বেরুবে সে দিন সোণার টোপর পরেই বেরুবে, তোমায় পরাতে হবে না ভাই। চিরদিন তাই হয়ে আস্‌ছে, চিরদিন হবেও তাই।

মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামীর আগমনের সময় হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহার বৈকালিক আহারাদির উদ্যোগ করিতে চলিয়া গেলেন। সত্যবতী তাহার টেবিলে বসিয়া রঘুপালকে পত্র লিখিল—

"আপনি আমার ক্ষমা করবেন। আর আপনাকে আমি কোন কাজে বাধা দেব না। মানুষ আপনার নিয়মেই মানুষ হয়ে ওঠে, তা' আমি বুঝ্‌তে পারছি। আজ যদি দয়া করে সন্ধ্যের পর একবার আসেন ত' খুবই আনন্দিত হব। যদি আস্‌তে না পারেন, তাহ'লে সুরেন্দ্রবাবুর ঠিকানাটা যদি জানা থাকে ত' লিখে দেবেন, আজ কত দিন তাঁর দেখা নেই;—মনে হচ্ছে তাঁর কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে। আর সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সঙ্গে মধুবাবুও কোথায় গেলেন? এঁদের বিষয়ে যদি কিছু এপর্য্যন্ত কোন সংবাদ পেয়ে থাকেন ত' দেবেন। আর একটা কথা,—যদিও আগে বলে একথা লিখ্‌তে পার্‌তাম না, কিন্তু এখন আর দ্বিধা কর্‌তে পারছি না,—আপনি সেই কাঞ্চনবালার ঠিকানাটা আর কি কর্‌লে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তা' যদি লিখে দেন তাহ'লে উপকৃত হব।"

পত্রখানা পাঠাইয়া দিয়া কতকটা উৎকণ্ঠিত ভাবে সময় কাটাইয়া সত্যবতী তাহার তপিনীপতির গৃহাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বিরলাক্ষ কল পরেই সত্যবতীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সত্যবতীর কি জানি কেন আজ তাঁহার সহিত দেখা করিতে লজ্জা বোধ হইতেছিল, তথাপি সবলে সে ভাবটা দূর করিয়া তাঁহাকে গিয়া বলিল, "আজ মধুবাবু আস্‌বেন, তুমি সে দিনকার মত অভদ্র ব্যবহার কর্‌তে পাবে না।"

বিরু। সর্ব্বনাশ! আবার তাকে কেন?

সত্য। আমার দরকার আছে।

বিরু। দরকার ত' তাকে আজকাল সকলেরই,

তোমার দাদার মুখে ত' তার প্রশংসা ধরে না, অথচ এই বিষ্টার কাউণ্ড্রিই এক দিন একে Blacky Nigger প্রভৃতি সুমধুর সম্বোধনে সম্ভাষিত করেছিলেন,—এমন কি এখানে তাকে বসতে পর্য্যন্ত দেননি। কিন্তু সে তখন যথার্থই সম্মানের পাত্র ছিল। আজ সে হতভাগী মাই সন্তীহারা চরিত্রহীন বাঁদর হয়েছে, আর অমনি সকলের তাকে দরকার পড়ে গেল? দিনে দিনে এ সব কি হচ্ছে?

সত্য। মানুষকে চেনা বড় শক্ত বোসজা, বাইরে যা' দেখ্‌ছ, রঘুবাবু হয়তো তা' নন।

বিজ। সমাজে যা'রেটা নিয়েই কারবার—

সত্য। ভুল, ভয়ঙ্কর ভুল, সমাজের ঠিক অন্তঃস্থলে যা' চিরসত্য তারই কারবার। যাক, এ নিয়ে তর্ক করে কি হবে, তুমি আমার অনুরোধে আজ একটু সংযত হয়ে চ'ল।

বিজপাক অগত্যা স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রঘুলাল আসিল না, তৎপরিবর্ত্তে একখানা পত্র আসিল। তাহাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল।

"আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, কিন্তু ক্ষমা করাত' আমার স্বভাব নয়। তাই ক্ষমা করতে পারলাম না;—কিন্তু আপনার নিজের জন্য বেশী ব্যস্ত হবেন না, আপনি আমার নমস্কারের পাত্রী। আপনাদের মধ্যে আপনিই প্রথম হতে আমাকে আমার প্রাপ্যের অধিক সম্মান দেখিয়েছেন। অতএব আপনার নিজের বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। যেদিন আপনাকে দেখিছি, সেই দিন থেকেই আপনাকে আমি যে কি চক্ষে দেখি তা' জানিয়ে আপনাকে ব্যস্ত করতে চাইনে। আমার জীবনের যেটা গুরুতর কথা, সেটা সংসারকে কিছুতেই জানতে দেব না। আপনি যেদিন বোকার মত আমার কাছে সেই ভয়ঙ্কর প্রস্তাবটা করেছিলেন, সেদিন যে আমি নিজেকে সাম্‌লাতে পেরেছিলাম, তা'র জন্য ভগবান্‌কে যে কতবার প্রণাম করেছি তা' আপনি জানেন না। আমার দরকার ছিল না; কিন্তু আপনার এই ক্ষুদ্র পত্রখানা পেয়ে আমার মনে হচ্ছে যে, আপনার মধ্যেও একটা যুদ্ধ চল্‌ছে, একটা কিসের আয়োজন চল্‌ছে। যদি তা' সত্য হয়, তাহ'লে সেই শুভমুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করব।

আপনি যাঁদের ঠিকানা চেয়েছেন তাঁরা আমার সঙ্গে পত্রব্যবহার করেন না—আমাকে হয়তো তাঁরা দূরদেশের মত এড়িয়ে চলেছেন। তবে আপনি আমার মায়ের ঠিকানা জানতে চেয়েছেন দেখে তাঁরা আনন্দ হয়েছে। মার কাছে যেদিন যাবেন, আমি যেন খবর পাই, আমিও যাব। তিনি শ্রীরামপুরেই থাকেন; শ্রীরামপুরের উত্তরাংশে গঙ্গার ধারে একটা পুরাণ বাগানে তিনি আর তাঁর মা তাঁদেরই মত হতভাগিনীদের জন্য অবাধাদের জন্য একটা আশ্রম তৈরি করছেন। প্রাণপণে ভালবাসলে যে মানুষ কি হতে পারে, তা' সেখানে যে একবার যাবে, সেই বুঝতে পারবে। মানুষকে কিসে ওপরের দিকে টেনে তোলে তা' ঐখানে গেলেই স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। মেয়ে মানুষের অন্তরের মানুষটী ছড়িয়ে যাবার জন্যই তৈরি হয়েছে—তার রূপ, তার দেহ, তার মন সমস্তই যে আপনাকে ছাড়িয়ে পরের মধ্যে ব্যাপ্ত হবার জন্যই জন্মেছে, এই বিশ্বাস আমি লাভ করেছি। যাঁরা পিতার কন্যা, ভ্রাতার ভগিনী, স্বামীর পত্নী, পুত্রের মাতা, আর সর্ব্বশেষে যাঁদের নামই হচ্ছে সংসার, তাঁদের অন্তর্যামীর একমাত্র সত্তাই হচ্ছে ব্যাপ্ত হওয়া। যার জীবনে তা' হ'ল না, সে স্ত্রীলোকের জীবন অসার্থক।

আপনার কাছে সেদিন বক্তৃতা দিয়ে এসে আমার মন ক্রমাগতই ছট্‌ফট্ করছিল। আজ আপনার পত্রখানা পেয়ে আমি শান্ত হয়েছি। তাই একখানা লিখতে পারলাম।

আপনার সঙ্গে দেখা করা এখন অসম্ভব, কারণ কি জানি যদি আপনার বিষয়ে এই পত্রে আমার যে ধারণা হয়েছে, সে আশা ভেঙ্গে যায়। তাই একটা বড় আশায় আশান্বিত হয়ে আমি এলোক সম্বরণ করলাম।"

সত্য পড়িয়া সত্যবতী দুঃবিতমনে পত্রখানা মুড়িয়া রাখিল। বিজপাক বলিলেন, "কি হ'ল? রঘুলাল কি লিখ্‌লে?"

সত্য। তিনি আস্‌বেন না।

বিরূ। আর সে আদ্‌বে কি করে? বিশ্ সরণ সরকারের পুজো ছুতেই তার সমস্ত দিন কেটে যাচ্ছে, তা' ছাড়া রাত্‌দিনই তার বাড়ীতে নরক গুল্‌জার।

সত্য। তুমি অমন করে না জেনে শুনে যা'তা বল না।

বিরূ। কেন গো এখনও তার আশা রাখ নাকি? তোমার বন্ধু যে তোমায়—

সত্য। আঃ যোগজা, তুমি ক্রমশঃ কি হয়ে যাচ্ছ? একজন ভদ্রলোককে নিয়ে এরকম ঠাট্টা শুধু অভদ্রতা নয়, নিষ্ঠুরতা।

বিরূ। সাধ্যান্ দাদু, তুমিও ক্রমশঃ Scientist থেকে Moralist হয়ে যাচ্ছ Physics Chemistry থেকে একেবারে Psychology Ethicsএ লাফ্ মেরো না, মানুষের মনের বিশ্লেষণ কারুর উচ্ছেদের অনুসন্ধান এসব করতে যাওয়া এখন তোমার পক্ষে বিপজ্জনক বলেই আমার মনে হচ্ছে।

সত্য। কিসে মনে হ'ল?

বিরূ। যা' থেকেই হ'ক, হয়েছে। আমার মনে হয়—

সত্য। তোমার মনের কথা শুন্‌বার মত অবস্থা এখন আমার নেই। আমি—

বিরূ। সর্ব্বনাশ করেছে। পাপি তোমাকে এরকম অন্তর দগ্ধ দগ্ধ কে করলে তুমি? যে পাপিষ্ঠ আমার মুক্তবনে আগুন লাগাতে সাহস করে—

সত্য। তার মুখে আগুন। এখন শোনো, কাল রবিবার আমি এক জায়গায় যাব। তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে। যাবে?

বিরূ। সখি, রাধা যে অভিসারে যেতেন, তাতে রাজার যেয়ে হলেও, যে তিনি ভৌজপুরী দারোয়ান সঙ্গে করে যেতেন, এরকম কোন কথাও কোন শাস্ত্রেই নেই, কোন কবিই এ কথা লেখেন নি।

সত্য। কিন্তু উমা যখন কৈলাস হতে কোথাও বেড়াতে বেরুতেন, তখন মহাদেব তাঁর সঙ্গে অনেক অভিগার্ড দিতেন, একথাও শাস্ত্রে আছে। তা' বলেই হল। বাজে কথা ব'ল না, যা' জিজ্ঞাসা কর্‌ছ উত্তর দাও, নইলে অন্য ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

বিরূ। কোথায় যেতে হবে?

সত্য তখন সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়া বলিল, "চল একবার দেখে আসি। আর তুমি না গেলে আমায় একটু মুস্কিলে পড়্‌তে হবে। কিন্তু ঠিক্ জেনো আমি যাবই।"

বিরূ। সেটা ঠিক্ জানি বলেই ভাবনায় পড়েছি। তুমি যা' কর্‌বে বলে মনে কর তা' যে স্বয়ং বিধাতাও আট্‌কাতে পারেন না সেটা যে বরাবরই দেখে আস্‌ছি ভাই! কিন্তু তাঁদের বিষয় জেনে শুনে গেলে আমরা যে একটা জবাবদিহিতে পড়ে যাব?

সত্য। কার কাছে জবাবদিহি কর্‌বে? শ্রীরামপুরে অনাথাশ্রম দেখ্‌তে যাচ্ছ, এতে কেই বা কি বল্‌বে?

বিরূ। তাহ'লে সব কথা আমায় খুলে না বল্‌লেই পার্‌তে। অনাথাশ্রম দেখ্‌তে যাচ্ছি, বাস এইটুকু জান্‌লেই ঢের হত। এখন জেনে শুনে—

সত্য। কি যা'তা বল যোগজা মশায়, তাই বলে তোমার কাছে কিছু লুকুব নাকি? শেষে যদি তুমি রাগ কর। না শুনব হবে না, তোমায় যেতেই হবে।

বিরূ। হবেত' হবে। তাহাই হইল। রবিবার খাওয়া দাওয়ার পর নৌকাযোগে সত্যবতী ও বিরূপাক্ষ শ্রীরামপুর যাত্রা করিলেন, রঘুলালকেও সঙ্গে লইলেন। রঘুলালের আনন্দ ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে বিরূপাক্ষের সমস্ত মনও গলিয়া গেল; তিনিও মনে মনে তাহাকে ক্ষমা করিয়া সানন্দে তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। নৌকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে বেলা পড়িয়া আসিল।

তার পর তাঁহারা যাহা দেখিলেন, যাহা অনুভব করিলেন, তাহার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল কাঞ্চন আর সত্যবতী নিভৃতে বসিয়া যে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল তাহাই উদ্ধৃত করা গেল।

সত্যবতী কাঞ্চনের হাতখানি নিজের করতলগত করিয়া বলিল, "ভাই তোমার যা যে তোমার নাম কাঞ্চন রেখেছিলেন, সেটা বোধ হয় ঠিক্ হয়নি—"

কাঞ্চন। সে কথা ঠিক্ আমার নাম খুলে যা আরও কিছু ঐ রকম একটা রাখা উচিত ছিল।

সত্য। তোমার নাম রাখা উচিত ছিল মাণিক। তুমি রাজার মুকুটেরই যোগ্য! তোমার জন্মের আগে মনে মনে যে সব অন্যায় কথা বলে অপরাধ করেছি, তার জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি।

কাকন। আচ্ছা দিদি আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনে যে কি করে আমি তোমাদের কাছে পরিচিত হ'লাম।

সত্য। সোনা কাউকে খোঁজে না, সোনাকেই সবাই খুঁজে নেয়। যাক্ এতদিনে বুঝতে পারলাম কেন রাজা-সাহেব এমন পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অন্তরের আকর্ষণ যে মাধ্যাকর্ষণের চাইতেও কত জোরে আকর্ষণ করতে পারে তা' তুমি আমার চক্ষে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

কাকন। ছি দিদি ও কথা বলে আমায় অকল্যাণ ক'র না। আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, এই মা গঙ্গার তীরে বসে বলছি, আমি কিছু চাইনে, কাউকে চাইনে। কাউকে আকর্ষণ করব এত বড় অহঙ্কার আমার নেই, সে অহঙ্কার যদি থাকত তাহ'লে এই তীর্থে এসে বসতে পারতাম না। আমি সবারই পায়ের ধুলো চাই, আর যাঁর কৃপায় আমি আমার অন্তরের মানুষটীকে চিনতে পেরেছি, তাঁর প্রতিদিনকার আশীর্ব্বাদ চাই। প্রতিদিন প্রভাতে উঠে বুঝতে চাই যে আমি তীর্থে আছি, আর সেই তীর্থের দেবতা আমার কাছেই আছেন। তাই এখানে এসে কুটীর বেঁধেছি। একটীবের যিনি দেবতা তাঁকে মানুষের মত করে ছোট করে হাতের তেলোর মধ্যে যদি চাইতাম, তাহ'লে আজ আমায় এখানে দেখতে পেতে না। পেতে নরকের মধ্যে, পেতে দুঃখের মধ্যে, পেতে বেড়া আগুনের মধ্যে। দিদি, আশীর্ব্বাদ কর যেন কিছু না চেয়ে যা' পেয়েছি, তারই উপযুক্ত হয়ে থাকতে পারি।

সত্য। যা' পেয়েছ তার চাইতে যে তুমি কত বড় তা' তুমি জান না, জান না তাই তুমি দেবী হয়েছ। আর যারা যত বেশী পায়, তার চাইতে নিজেকে বড় মনে করে, কতবড় রাক্ষসী হতে পারে তা' বোধ হয় তুমি জান না। ভগবানের এটা যে কতবড় দয়া তা' আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করছি। আজ তাই তোমায় গুরু মনে করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, আজ যা' শিখলাম, এই শিক্ষাই যেন আমার শেষ শিক্ষা হয়; আর যা' পেয়েছি তাকেই যেন শ্রেষ্ঠ দান বলে মনে করি, তাই যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলে স্বীকার করি। তোমার কাছে কিছু গোপন করলে আমার পাপ হবে, তাই আমার একটা পাপ—মহাপাপ—তোমার কাছে স্বীকার করছি। আমাকেও একজন একদিন একটু ভাল বেসেছিলেন, তিনি এমন কি আমার তখনকার অদ্ভুত খেয়ালেরও সোৎসুকতা করে সমাজ আর ধর্ম্মের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তবু তাঁকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কেউ যে প্রজ্ঞান না পেয়েও ভালবাসতে পারে তা' আমার ধারণাই ছিল না। তখন মনে করেছিলাম, তিনি আমার চাচ্ছেন আমার স্বাধীনতা হরণ করবার জন্য। কিন্তু ক্রমশঃ বুঝেছি, মেয়েকে মধ্যে যে স্বাধীনতাকে টেনে আনতে চায়, ভালবাসতে সে কেবল আপনার কথাই ভাবতে থাকে, সে যে পশু-পক্ষীর চাইতেও অধম। ভালবাসার নামই শৃঙ্খল, মেয়ের আসল মূর্ত্তি বন্ধন, যে এর মধ্যে মুক্তিকে চায় সে স্বেচ্ছাচারী। সংসারে থাকব, সংসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব অথচ মুক্ত থাকব, এ হতেই পারে না। তা' যে চায়, সে হয় দেবতা, না হয় দৈত্য, সে মানুষ নয়। তাই আমি হতভাগিনী তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আজ প্রার্থনা করছি আবার করজোড়ে তাঁরই কাছ থেকে ভাই ভিক্ষে করে নিতে হবে, নৈলে আমার এপাপের যে ভয়ঙ্কর শাস্তি আছে, তাই আজীবন ভোগ করতে হবে। তিনি যদি আজ তা' নাও যেন, তবু আমাকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

কাকন। ঐ টেই আমি নিজেকে শেখাবার চেষ্টা করছি। আমি সবারই চাইতে ছোট, সবার পায়ের ধুলো আমার মাথায় যাতে পড়ে, তাই আমার সাধনা। তুমি আমার দিদি, তুমিও যে তাই করবে তা' আর আশ্চর্য্য কি? তোমাদের দেখেইত' শিখব।

সত্য। আচ্ছা ভাই, তুমি রাজাবাহাদুরকে এর মধ্যে কোন পত্র দিয়েছ?

কাকন। তিনি যে এখানে নেই তাত' আমি জানতাম না, সেদিন বসুবাবুর কাছ থেকে শুনেছি মাত্র।

সত্য। রঘুবাবু তোমায় যা বলেন, আমি ওঁকেও একদিন অপমান করেছিলাম। সেই এক অদ্ভুত ব্যাপার! অহঙ্কার যে মানুষকে কবে কবে কত রকম করে ঘুরপাক খাইয়ে তার কত উদাহরণ। যে আমি একদিন রঘুবাবুকে অবিশ্বাস করে উপহাস করে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, সেই আমি আর একদিন এই রঘুলালকে দয়া করে বিবাহ করতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার ভালবাসা না পেয়েও শুধু বিয়ে করার কৃপা দেখালেই বুঝি রঘুলাল কৃতার্থ হয়ে বেঁচে যাবেন। মনে করতাম, আমি বুঝি খুব সত্যবাদী, কিন্তু এখন বুঝছি রঘুলালকে ভালবাসাহীন বিবাহ করতে গিয়ে কতবড় অপরাধ করতে গিয়েছিলাম। রঘুলাল আমায় প্রত্যাখ্যান করে যে উপকার করেছেন তা' জীবনেও ভুলব না।

কাজল। তার জন্য দুঃখ করে কি হবে? রঘুলালকে যখন চিনতে পেরেছেন, তখনই ওঁর সে অপমান ধুয়ে মুছে গিয়েছে। আহা ওঁর যে কি কষ্ট তা' আপনি জানেন না, দেবতার শাস্তি এই রকম অযোঘ, এই রকম ভীষণ হয়—শুধু ঐ শাস্তি যে দেবতার হাতের স্পর্শ এনে দেয়। আমি কিন্তু ঐ জন্য রঘুলালের হিংসা করি। আমি এমনি হতভাগিনী—

সত্য। যে, দেবতা মানুষের মত ঘরে তোমার পায়ে এসে পড়বার জন্য কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে! আর তুমি ঠিক তার মন্দিরের পাশে এসে লুকিয়ে বসে আছ! কিন্তু ভাই, মানুষকে যে তুমি কি করে দেবতা করে তুললে, এ বোঝা স্বয়ং দেবতারও অসাধ্য।

কাজল। বোধ হয় মানুষের মধ্যে দেবতাকে কেউ খোঁজে না, তাই পায় না। পুরাণের মধ্যেও ঠিক এই কথাই আছে। কুষ্ঠরোগী স্বামী ব্রাহ্মণ হয়ে, বেদবেদান্ত পারগ হয়েও একটা বেশ্যার জন্য মূর্খের মত উন্মত্ত হ'ল। স্ত্রী তখন তার জন্য সেই বেশ্যার মন পাবার বন্দোবস্ত করলে। নিশ্চয়ই এটা আপনার চোখে খুব অন্যায় হয়েছিল বলে মনে হইবে। কিন্তু সেই দেবময়ী পত্নীর দেবের দিক থেকে দেখুন, তার অন্যায়ের বিচার রেখে দিন। সেই পাপিষ্ঠ স্বামীর মধ্যে সেই ব্রাহ্মণকে কাকে ভালবেসেছিল? সেই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত দেহটাকেও' সে ভালবাসতে পারে না, এমন কি সেই দেহের ভিতরকার দুষ্ট মানুষটাকেও না,—সেই মানুষের মধ্যে যিনি ভালবাসা দেবার জন্য হাত পেতে বসে আছেন, সেই তাঁকেই সে ভালবেসেছিল। অধিকাংশ লোকে মানুষকেও চায় না, দেবতাত' দূরস্থান। সবাই প্রায় ধূলামাটী খোঁজে, তাই তাদের কপালে ইটপাথরই এসে পড়ে। লাভের মধ্যে কপাল কেটে রক্তপাতই সার হয়। দেবতাকে চাইলেই বোধ হয় পাওয়া যায়, তিনি যে একেবারে অপ্রাপ্য, একথাত' কেউ জোর করে বলে না। তবে পাওয়া শক্ত এই যা। তা' শক্ত না হলেই বা লোকে তার জন্য এত মাথা কোটাকুটী করবে কেন? যা' হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, তাত' দু'দিনেই আস্তাকুড়ের হয়।

সত্য। যাক ভাই রাত বেড়ে গেল, আর দেরী করলে দিদি রাগ করবেন। তুমি যে আনন্দ দিলে সে আনন্দ আমার চিরদিনের সম্পত্তি হল। অনেক রাত্রে কলিকাতায় ফিরিয়া সত্যবতী সে রাত্রি সুখস্বপ্নে কাটাইয়া প্রভাতে উঠিয়াই দেখিল, বিরূপাক্ষ একখানা পত্র হাতে করিয়া কি ভাবিতেছেন। সত্যবতী হাসিয়া বলিল, "কি হল বোনজামাইয়ের, কালকের অত স্ফূর্তির আজ একটুও অবশিষ্ট নেই কেন?

বিরূপাক্ষ পত্রখানা তাহার হাতে দিলেন। সত্যবতী দেখিল, সুকুমারের পত্র। পত্রখানার লেখা দেখিয়াই হঠাৎ তাহার হৃৎপিণ্ড অস্বাভাবিক গতি হইয়া তাহাকে পীড়িত করিল। তথাপি স্থিরভাবে পড়িয়া দেখিয়া লজ্জিত-ভাবে বলিল, "যাক্ তোমার উৎস শিগ্গিরই খবর পাওয়া গেল; বাঁচা গেল। এখন ওঁদের আসতে লিখে দাও।"

বিরূপাক্ষ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার লেখার চাইতে তোমার লেখাটাই ভাল হবে নাকি? সুকুমারের মনের ভাবটাত' বুঝতে পারছ?"

সত্যবতী লজ্জারুণ বদনে বলিল, "আমিই লিখব, কিন্তু তুমিও দু'কথা লিখে দাও যে, রাজাবাবাজীর জন্য তাকে ভাবতে হবে না। তিনি তাঁকে কাজলের সাথ করে এখানে এনে ফেলুন, তার পর যা' করতে হয় রাজাবাবাজীরই করবেন। তাঁরজন্য সুকুমারবাবুকে ব্যস্ত

হতে হবে না। ভগবান্ যার ভাগ্যে যা' নির্দ্দেশ করেছেন, তিনি তাই পাবেন।"

বিজু। ওঃ তুমি যে আজকাল একেবারে গীতা আওড়াতে সুরু করেছ। হরকুলি টিনস্তলের শিষ্যের মুখে ক্রমাগত ভগবান্ ভগবান্ শুনলে দশচক্রে তিনি যা' হন, তাই হয়ে যাবেন বলে বোধ হচ্ছে।

সত্যবতী তাড়াতাড়ি পত্রখানা লইয়া প্রস্থান করিল, এবং ঘণ্টাখানেক খাটিয়া একখানা পত্র সুকুমার ও সেই সঙ্গে দু'কথা সুরেন্দ্রনাথকেও লিখিয়া দিল। সুকুমারকে লিখিল, "আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনাকে গোটাকতক কথা লেখার দরকার, কারণ মুখোমুখী হইলে একথা বলিতে পারিব কিনা সন্দেহ। আপনাদের এখান হইতে যাওয়ার পর এখানে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে আর কাহারও কিছু না হউক আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। রঘুবাবুই প্রধানভাবে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি ক্রমশঃ তাঁহার জীবনটাকে এমন একদিকে টানিয়া লইয়া ফেলিয়াছেন, যাহা দেখিলে অতিবড় নিষ্ঠুরের চক্ষেও জল আইসে, রাজাবাহাদুর এরি করিলেন? মানুষ যে রাগের মাথায় নিজের ও পরের উপর এতখানি অত্যাচার করিতে পারে, আমি স্বয়ং না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না,—রঘুবাবু নিজেও মরিতেছেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের নিষ্টার সরকারের মেয়ে সরলাকেও টানিয়া সঙ্গে লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে রঘুলালবাবুর যত দোষ, তদপেক্ষা বেশী দোষ ঐ হতভাগিনী আর তাহার অভিভাবকগণের। টাকার লোভটা যে এত বড় তাত' জানিতাম না,—আর আমাদের আজকালকার মতিগতি যে কোন্ ভয়ানক পতনের দিকে চলিয়াছে এই বিবাহব্যাপারটাই তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

প্রথম যখন এই সংবাদ শুনি, তখন রঘুলালের উপরেই আমার বেশী রাগ হইয়াছিল। এই রাগের কারণ, এখন বুঝিতেছি, আর কিছুই না, আমারই নিজের অহংকার। আমি ভাবিতাম, আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিয়া বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছিলাম, সে কি করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইল? কিন্তু এখন আমার সে অহংকার আর নাই। এখন আমি বুঝিয়াছি যে, আমি আমার বিদ্যা আমার বড় বড় মত আমার বক্তৃতা এই সমস্ত লইয়া এখনও মাটি হইতে এক ইঞ্চিও উপরে উঠিতে পারি নাই। অথচ আর একজন একটীমাত্র অমূল্য বস্তুকে জীবনের মধ্যে পাইয়া পঙ্ক হইতে একেবারে উর্দ্ধলোকের দিকে চলিয়াছে। আমি সেদিন কাজলকে দেখিয়া আসিয়াছি, আপনি রাজাসাহেবকে আমার শত শত প্রণাম দিয়া বলিবেন, তিনি সংসারের অন্ধকার খনি হইতে বাহির করিয়াছেন তাহা খাঁটী সোনা, আর সেই কাজলে তাঁহার রাজমুকুট প্রস্তুত হইতে দেখিলে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইব।

এখন, যে কথা আপনাকে বলিতে চাই তাহা লিখিতেছি,—লিখিতে যে কেন এত লজ্জা বোধ হইতেছে জানি না, তথাপি লিখিতেই হইবে। একদিন আপনি এই মুখের সম্মুখে এমন একটা অমূল্য বস্তু ধরিয়াছিলেন, যাহার মূল্য আমার মত ব্যক্তির নিকট হইতে আশা করা আপনার ভুল হইয়াছিল;—আমি অতখানি সম্মানের পাত্রী নই। কিন্তু সেদিন যে অপমান আপনাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা আমার অজ্ঞানকৃত। মুক্তামালার দাম বাঁদরে বুঝিবে কেন? আজ আমি নতমস্তকে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন। এই কথাকয়টী আপনাকে জানাইয়া আমি বাঁচিলাম, সমস্ত দ্বিধা ঠেলিয়া আপনার নিকট হইতে যে ক্ষমা চাহিতে পারিলাম, ইহাই আমার পরম সান্ত্বনা। যে জ্ঞানহীনা আপনার সেদিনকার পুষ্পোপহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহার অজ্ঞানকৃত ক্ষমা করা খুব কি আপনার পক্ষে কঠিন হইবে? যদি না হয় তাহা হইলে আমায় ক্ষমা করিয়া একখানা পত্র দিবেন। কারণ মুখামুখী কোন কথা বলিবার বা শুনিবার শক্তি আর বোধ হয় আমার নাই। এলজ্জা কোথা হইতে আসিল, কেন যে আসিল তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনিও মানুষ আমিও মানুষ, অন্ততঃ ইহাইত' আমার চিরদিনকার ধারণা, তবু

কেন এ লজ্জা ? যাহাই হউক, আশা করি আপনি আমার শত দোষ আর চিরদিনকার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিয়া পত্র দিবেন।"

ইহার পর সুরেন্দ্রকে যে পত্র এই সঙ্গে লিখিল, তাহাতে কেবল এই কয়টী কথা লিখিল,—"রাজাসাহেব, আমি আপনার কাকনকে সেদিন দেখিয়া আসিয়াছি। আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন, আপনার অজ্ঞাতে এই কাকনের বিরুদ্ধে যে সব কথা আমি বলিয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম তাহা আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ। আপনার আর অজ্ঞাতবাসে থাকিবার প্রয়োজন নাই, যাহার জন্য এই দেশান্তর বনবাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার জন্য লজ্জিত হইবারি প্রয়োজন নাই। এতবড় গর্ব্বোঃ সামগ্রীকে কেহই অন্ধকারে লুকাইয়া নিজস্ব করিয়া রাখিতে পারিবে না—আপনিও এই কাকনকে কেবল নিজের জন্য রাখিতে পারেন নাই। এই কণিক কাকনের উজ্জ্বল প্রভায় আমরা সকলেই ধন্য হইয়াছি। আপনি ফিরিয়া আসুন। আপনি যাহাকে খুঁজিতেছেন, সে যে আপনার দ্বারে আসিয়া বসিয়া আছে; আর কেন ঘুরে তাহাকে বৃথা খুঁজিতেছেন? ফিরিয়া আসুন—সে আপনারই।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মিষ্টার সংকাদের গৃহে আজ মহাধুম। আজ তাঁহার কন্যা মিস্ সরকারের বিবাহ। সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার গেটের সম্মুখে 'অশ্বযান' 'দ্বিচক্রযান' 'ধনুরচল' যানের হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে। ব্যারিষ্টার, উকীল, প্রফেসরগণ একে একে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পুষ্পমালো সজ্জে আলোকে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সুবেশা শোভাময়ী মিস্ ও মিসেস্‌গণের ঝলোকলের চকল দীপ্তিতে বিবাহসভার ভিতরে বাহিরে বিদ্যুৎ খেলিতেছে।

মিষ্টার ও মিসেস্ সরকার হাসিমুখে সকলকেই অভ্যর্থনা করিতেছেন। সমবয়স্কা সখীগণ তাঁহার সাজসজ্জা লইয়া নানারূপ তর্ক জল্পনা করিবার ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর সকলেই বিবাহমণ্ডপে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। বিবাহের পুরোহিত আসিয়া বেদীতে উপবেশন করিয়া গম্ভীর স্বরে তাহার কার্য্যের গুরুত্ব সমবেত সকলকেই বুঝাইতে লাগিলেন। সম্মুখের হল হইতে Strings band এর মধুর মিশ্রসঙ্গীতের প্রেরকতার নিবেদন সকলেরই মনে গত ও ভবিষ্যতের এইরূপ একটা মধুর দিনের আভাষ আনিয়া দিতেছিল।

গেটের বাহিরেও শোভারই বহু পথিক চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া এই বিরাট সভার শোভা নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইতেছিল। কয়েক জন ভিখারীও ঐ ভিড়ের মধ্যে গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের সাদ্ধ্য আহার্য্যের জোগাড় করিয়া লইতেছিল। এমন কি একজন মুটী ঐ গেটের সম্মুখে, দাঁড়াইয়া ঘন-গম্ভীর স্বরে 'সেলাই বুরুষ,' 'বাবু জুতিঠো বুরুষ করিবে লেন' ইত্যাদি বাক্যে অভ্যাগতদিগকে বিরক্ত করিতেছিল। কেহ বা তাহাকে বলিল, "দূর বেটা মুটী। এখানে কি করতে বরতে এসেছিস্?" কেহ বলিল, "ওরে বেটা এখানে কি কেউ জুতো বুরুষ না করিয়ে এসেছে?" যাহারা বড় বড় জুড়ি হাঁকাইতে নামিতেছিলেন, ঐ ভক্তভাষা তাহাদের নিকট গিয়াও তাহার অযুৎ প্রার্থনা জানাইতে কুণ্ঠিত হইল না দেখিয়া একজন দ্বারবান্ তাহাকে ধাক্কা দিয়া রাস্তায় নামাইয়া দিল। মুটীজন তখন এক পার্শ্বে সরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় সত্যবতী, মেরেজী ও বিরূপাক্ষ একখানা গাড়ী হইতে নামিলেন, সেই মুটীমুখ হঠাৎ পুলকায় অগ্রসর হইয়া বলিল, "সেলাই বুরুষ।" কি জানি কেন হঠাৎ তাহার গলার স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, এবং সেই কারণেই হউক বা যে কারণেই হউক সত্যবতী হঠাৎ চমকিত হইয়া ফিরিয়া তাহার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় করিল। একি, একে? সত্যবতী তাহার ভগিনীপতির দিকে চাহিল, কিন্তু তিনি বলিলেন, "দাঁড়াসে কেন? এগিয়ে চল।" সত্যবতী ভীতভাবে আর একবার সেই মুটীর দিকে চাহিয়া গেটের ভিতর প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহার মন অজ্ঞাত কারণে এতই চকল হইয়া উঠিল যে, সে আর বিবাহসভায় গিয়া বসিতে পারিল না। বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে লাগিল।

তাহাদের এবিবাহে আসিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কেবল তাহার বন্ধু মিঃ সরকার ও রঘুলালের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাহারা, বিশেষতঃ সে আসিয়াছিল। কিন্তু বিবাহগৃহের দ্বারেই সে এমন একটা ধাক্কা খাইয়াছে, যাহা সাম্‌লাইতে তাহার অনেকক্ষণ সময় লাগিবে। সে একবার ভাবিল পাত্রীর নিকটে গিয়া বসে, কিন্তু দূর হইতে তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে যেন স্পষ্ট অনুভব করিল, এই হাস্যোজ্জ্বল মুখ এখনি কালিমাচ্ছন্ন হইবে, ঐ সৌভাগ্যোজ্জ্বল নয়ন দুইটী এখনি অশ্রুকাতর হইয়া আশ্রয়ের জন্য হতাশভাবে চারিদিকে চাহিবে।

এদিকে বিবাহসভায় কি একটা কারণে মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি উঠিল। সত্যবতী আর থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি স্ত্রীলোকদের দলে গিয়া মিশিল। স্ত্রীমহলেও তখন একটা ভীতিগুঞ্জন চলিতেছিল। সত্যবতী তাহার ভগিনীকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে বর তখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, অথচ সময় উপস্থিত। সত্যবতী হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "এ কি রকম কথা? তাকে ডাকতে পাঠান হয়নি কেন?"

"সেখান থেকে লোক ফিরেছে, সে বাড়ীতে নাই, কেউ তার খোঁজ দিতে পাচ্ছে না।"

সত্যবতী গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া হঠাৎ অধর দংশন করিয়া বলিল, "কি নির্দ্দয়, কি নিষ্ঠুর! কি পিশাচের মত ব্যবহার!" মৈত্রেয়ী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তবু কি সে নিশ্চয়ই আস্‌বে।"

"সে আস্‌বে কি? সে এসেছে, যদি ভাল চাওত' চল পালিয়ে যাই, নইলে এমন একটা ব্যাপার দেখ্‌বে যা' দেখে তোমাদের মধ্যে অনেকেরই ফিট্ হবে। আমি তাকে দেখেছি।"

"কোথায়? কেন? কি হয়েছে?"

"কি হয়েছে, এখনি টের পাবে—ভাল চাওত' চল মৈত্রে—"

এই সময় মিষ্টার সরকার ব্যস্তভাবে আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তার পর ক্ষণপরে সভা-মধ্যেও পাত্রীও বরদভায় চলিয়া গেল। সত্যবতী তাহার দিদিকে বলিল, "এই সময়, চল পালাই।"

"পালাবে কেন, কি হয়েছে বল?"

"চল বাড়ী গিয়ে বল্‌ব।"

"না—না সেকি হয়? এসেছি যখন, তখন বিয়ে না দেখে যাব না।"

সত্য। বিয়ে? এখনি যা' হবে তাতে সকলেরই চক্ষু স্থির হবে। আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি, কি ভয়ঙ্কর এর পরিণাম। উঃ—

মৈত্রেয়ী। অবাক্ করি, কি হয়েছে বল্‌ছিস্ না কেন? কোথায় রঘুলালকে দেখ্‌লি?

সত্য। গেটের সাম্‌নে? তোমরা কেউ তাকে চিন্‌তে পারনি এই আশ্চর্য্য।

মৈত্রেয়ী। গেটের সাম্‌নে? সেখানে সেকি কর্‌ছে? এতক্ষণ একথা বল্‌তে নেই? ছি ছি তোর যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে—

মৈত্রেয়ী আর দাঁড়াইলেন না, একেবারে বেদীর নিকটে গিয়া পাত্রীর মাতাকে কি বলিলেন। তৎক্ষণাৎ একজন লোককে নিঃশব্দে বাহিরে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু সে আসিয়া কোনই সংবাদ দিতে পারিল না। ইতিমধ্যে পুরোহিত উঠিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া বলিলেন, "বিবাহের অন্য পক্ষ অনুপস্থিত দেখিতেছি, এমন সময় কি করা উচিত উপস্থিত কন্যাসম্প্রদানগণ স্থির করুন।" তখন চতুর্দ্দিকে যে ক্ষুব্ধ রোষের চাপা ইংরাজি, বাঙ্গালা, ফরাশি, জার্ম্মাণ ভাষার শব্দ উত্থিত হইল, তাহা শুনিয়া পাত্রীপক্ষের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। পাত্রীর মুখ ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল।

সকলেরই মতে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাই সাব্যস্ত হইল। কিন্তু তথাপি পাত্র উপস্থিত হইল না। তখন পুরোহিত পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া পাত্রীপক্ষের একজন মাতব্বরের সহিত মৃদুস্বরে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "যেরূপ ব্যাপার দেখি তাহাতে যে অদ্য বিবাহ হয়, এ মতও' বোধ হয় না। অভ্যাগতমহোদয়গণের নিকট পাত্রীপক্ষ হইতে আমরা করযোড়ে নিবেদন যে, আজিকার এই অভাবনীয় ব্যাপারের জন্য তাঁহাদের আপনারা ক্ষমা করুন। আজ

আমার মতে সমস্ত কার্য্য স্থগিত রাখিয়া সভাভঙ্গ করা হউক—পাত্র যখন অনুপস্থিত—" পুরোহিত মহোদয় যখন এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, তখন বিবাহমণ্ডপের বহির্দ্দেশ হইতে কে পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "কে বলিল পাত্র অনুপস্থিত? সে সন্ধ্যা সন্ধ্যা হইতে দ্বারে উপস্থিত রহিয়াছে!" সকলে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, বহির্দ্বারের সেই মূর্ত্তী ধীরে ধীরে সগর্ব্বে মণ্ডপে প্রবেশ করিতেছে। সে একেবারে বেদীর নিকটে যাইয়া তাহার জুতাসুদ্ধের থলীটা বেদীর উপর রাখিয়া মাথার পাগড়ী খুলিয়া ফেলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই তখন দেখিল - রঘুলাল!

রঘুলাল তখন মিষ্টার সরকারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "কি অদ্ভুত ব্যাপার আপনার শ্বশুরমশায়, জামাই সমস্ত সন্ধ্যা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর কেউ তাকে আদর করে ডেকে নিলে না? কেউ তাকে recognize পর্য্যন্ত করলেন না? আসলে আপনাদের এত অনাস্থা? নকলটাই আপনাদের এত প্রিয়? বরবেশে আসল মানুষটা এসে সন্ধ্যা থেকে দরজায় dance attendance করছে—না ডাকলে জামাই কি গায়ে পড়া হয়ে বিয়ে করতে আসতে নাকি? অন্ততঃ আমাদের মুচীর ঘরেও তা' হয় না। নেন এখন সম্প্রদানের কাজটা সেরে ফেলুন—তার পর মধুচন্দ্রে যাবার জন্য আপনার মেয়ের জন্য এই যে সাড়ী এনেছি, তাই পরিয়ে এই রোলাটা ঘাড়ে দিয়ে কনেকে নিয়ে যাব।" একখানা বেঢ়ী লালরঙের ডুরে কাপড় কুক্ষিদেশ হইতে বাহির করিয়া রঘুলাল বেদীর উপর রাখিল।

সভার মধ্যে তখন সূচীপতনের শব্দ হইলে বোধ হয় শোনা যাইত। String band তখন বিবাহযন্ত্রাদির জন্য নীরব হইয়াছিল। তাই সেই নিস্তব্ধ সভায় রঘুলালের কথাগুলি একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত শোনা যাইতেছিল। রঘুলাল নীরব হইলে সভা হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইল। তার পর damned cobler! down with him! Rascal! Bloody nigger প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ উত্থিত হইয়া নীরব সভা সরব হইয়া উঠিল। কিন্তু রঘুলাল প্রশান্ত হাসি হাসিয়া বলিল, "এখন গাল দিলে কি হবে? আমিত নিজের জাত গোপন করে বিয়ে করতে আসিনি। বন্ধুগণ স্থির হন, আপনাদের পান-ভোজনের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না, কেবল সম্প্রদানটা বাকি।"

মিষ্টার সরকার আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁপিতে কাঁপিতে নিকটে আসিয়া বলিলেন, "বেরও তুমি বেরও বলছি এখান হতে। you shall feel the consequence—I will roast you in hell" রঘুলাল রক্তবর্ণ চক্ষুতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া মিষ্টার সরকারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনাদের মধ্যে যেদিন থেকে আছি সেই দিন থেকেই আমার নরকবাস হচ্ছে, আবার অন্য নরক বাস আছে নাকি? আপনি জেনে শুনেই ত' আমার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিলেন, এখন চোখ রাঙ্গালে শুনব কেন? এর মধ্যে যদি কারও 'কিছু বলবার থাকেত' সে আমারই আছে। আমি আমার যথার্থ বেশে উপস্থিত হয়েছি—এতে কার কি বলবার থাকতে পারে বুঝতে পারছি নে।"

ব্যাপার ক্রমশঃ এমন অবস্থায় উপস্থিত হইল, যখন সেই ক্ষুব্ধ জনমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ আস্তিন গুটাইতে আরম্ভ করিল। কেহ বা 'সাহসের ভেটাংশের' কার্য্য করিল, কেহ বা 'খাম খাম' করিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল, কেহ বা বুদ্ধিমানের মত ব্যাপারটা যাহাতে amicably settled' হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন, হঠাৎ লোকজন ঠেলিতে ঠেলিতে অন্য এক ব্যক্তি বেদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। রঘুলাল হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া তীব্রভাবে শিহরাইয়া গেল। আগন্তুক বজ্রনিনাদে বলিলেন, "রঘুলাল!—নীচ চামার, চামারের মত কাজ করলি, তবে ছাড়লি।"

রঘুলাল হঠাৎ হাটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, "গুরু, আপনার কাজের শেষ ফল আপনার পায়ে দিয়ে—মুচীর ছেলে বাড়ী চল! এইটেই আমি প্রাণপণে চাচ্ছিলাম, আপনি এসেছেন—আর আমার কোন খেদ নেই।" রঘুলাল তাহার থলীটা উঠাইয়া লইয়া একবার সহাস্যবদনে চারিদিকে চাহিয়া ধীরপদবিক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ তখন মিষ্টার সরকারের নিকটে গিয়া বলিল,

"মশায় এ কাজ কর্‌বার আগে একবার আমায় কেন জিজ্ঞাসা করেননি? আমার উচ্ছিষ্টপুষ্ট ঐ হতভাগা নীচ চামারকে আপনি মেয়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন? ছি ছি এখন আমায় সেই জন্য দুঃখ কর্‌ছেন! যান মেয়েটার কি হ'ল দেখুন গে। মেয়েটাকে গলায় কলসি বেঁধে দিয়ে গঙ্গায় ডুবিয়ে মার্‌তে পারেননি। ছি!—"

সুরেন্দ্রনাথ তার পর বিরূপাক্ষকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে গিয়া উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল, "আপনি একলা ত'?" বিরূপাক্ষের তখন বাক্‌রোধ হইয়াছিল। তিনি কেবল মাথা নাড়িলেন। সুরেন্দ্র বলিল, "কে কে এসেছেন?"

"সবাই।"

"কি ভয়ঙ্কর! যান ওঁদের ডেকে নিয়ে আসুন।"

বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর রোরুদ্যমানা মৈত্রেয়ী ও স্তম্ভিতাস্রমুখী সত্যবতীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সারারাত্রি পীড়িত স্বামীর শুশ্রূষা করিয়া রামরতনের স্ত্রী লখিয়া, প্রাতঃস্নান করিবার জন্য প্রত্যূষেই ঘর হইতে বাহির হইল। কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখিল, কে একজন দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া রহিয়াছে। উষার অস্পষ্ট আলোকে চিনিতে না পারিয়া বলিল, "কে?" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না, নিকটে গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল, রঘুলাল দেয়ালে হেলান দিয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে। প্রথমে সে চমকিত হইয়া পিছাইয়া আসিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মায়ের প্রাণ পুত্রের সহিত এই অভাবনীয় অবস্থায় মিলনে কাতর-পুলকে ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষমাপ্রার্থী পুত্র যে এই ভাবে সারারাত্রি তাহারই দ্বারে পড়িয়াছিল, এই কথা চিন্তা করিয়া লখিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া রঘুর গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, "রঘু, বাবা।" রঘুলাল চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিল। প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু পরক্ষণেই মায়ের পাদুখানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। লখিয়া তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িয়া পুত্রের মস্তক বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। সেই উষার নবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাতাপুত্রের মধ্যে গভীর মিলন সংঘটিত হইল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "চল, ওঁর কাছে যাই।" রঘুলাল তাহার মূর্ত্তিবেশে সম্পূর্ণ লজ্জিত হইয়া বলিল, "চল।" নিদ্রিত রামরতনের পায়ের নিকটে গিয়া রঘুলাল শুইয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মা সারারাত আমার ঘুম হয়নি, একটু ঘুমুই, তুমি এখন কাউকে জাগিও না, যে কাজে যাচ্ছিলে যাও।" লখিয়া নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া পরমানন্দে গঙ্গায় গিয়া স্নান করিল। মাতা জাহ্নবীর চিরস্নেহস্রোতে সেদিন আর একটী পবিত্র মাতৃহৃদয়ের স্নেহস্রোত মিশাইয়া দিয়া লখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, নিত্যকর্ম্মে মন দিল।

কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরের দরজায় আবার আঘাত হইল। লখিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিষণ্ণমুখে সুরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া আছে। সে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনি কবে এলেন?" সুরেন্দ্র বলিল, "কাল রাত্রে এসেছি, রঘুলালের কোন খবর জান—আমি তার জন্য বড় ভাবনায় পড়িছি, সেযে কোথায় গেল খুঁজে পাচ্ছি না।"

লখিয়া। সে ভালই আছে, ভয়নেই, এই ঘরেই সে ঘুমিয়ে আছে। কাল বোধ হয় সারারাত বাছা এই দরজায় পড়ে ছিল, ভোরে বাইরে এসে তাকে দেখ্‌তে পেয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে শুইয়েছি।

সুরেন্দ্রনাথ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক্ বাঁচলাম, সারারাত্রি কাল তাকে খুঁজেছি, পুলিশে খবর দিয়েছি, চারদিকে লোক ছুটিয়েছি।"

লখিয়া। কেন? কি করেছে ও?

সুরেন্দ্র। যা' করেছে তা' পরে শুনো, বেঁচে যখন আছে, তখন আর ভয় নেই।

লখিয়া 'ঘাট ঘাট' করিতে করিতে বলিল, "বাছা আমার, তাই অমনি করে এসে পড়েছিল। আজই আমি কালীঘাটে পূজো দিয়ে আস্‌ব।" সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "তুমি ওকে ক্ষমা করেছ রঘুর মা?"

লখিয়া হাসিয়া বলিল, "মায়ের ছেলের ওপর রাগ কতক্ষণ থাকে রাজাবাহাদুর ?"

সুরেন্দ্র। তা' ঠিক, আমার যে মা নেই, তাই মায়ের মর্ম্ম আমি ঠিক বুঝি নে। এখন একবার তোমার স্বামীকে ডেকে দাও। দেখি ওকি বলে ?

লখিয়া। উনিও যেন আজ প্রাণে প্রাণে রঘুর আসা টের পেয়েছিলেন, তাই শেষরাত্রির দিকে বেশ একটু ঘুমুচ্ছেন। আজ কয় দিন যে ঘুমোননি।

সুরেন্দ্র। কেন ? ওর কি হয়েছে ?

লখিয়া। উনি আজ ক'মাস ধরেই ভুগে ভুগে শয্যা নিয়েছেন। ডাক্তার বেচারীও সারারাত আমার সঙ্গে জেগে ছিল। ওকেও অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি।

সুরেন্দ্র। থাক্, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরেছে এই আমার সান্ত্বনা, রঘুলাল জাগ্‌লে ওকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

লখিয়া। এখন ও কি কর্‌বে ?

সুরেন্দ্র। সেই কথা ওকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তবে আমি নিজে কিছু বল্‌ব না বা অনুরোধ কর্‌ব না, নিজের বুদ্ধির ওপর আর আমার একটুও বিশ্বাস নেই। তুমি যে ওকে আমার কোলের মধ্যে টেনে নিয়েছ, এটা যে আমার কত আনন্দ দিয়েছে তা' তোমায় বোঝাতে পার্‌ব না। রঘুর জন্য ক'দিন থেকে আমার কি ভাবনাই না হয়েছিল। আমি তার জন্য অনেক দূর থেকে ছুটে আস্‌ছি। যাক্ আমি এখন চল্লাম, তুমি তাকে সময় মত পাঠিয়ে দিও।

সুরেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিয়া একটা ডেকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাঁহার আগমনসংবাদ পাইয়া ম্যানেজার কাগজপত্রের তাড়া লইয়া সেবা করিতে আসিল। সুরেন্দ্র বলিয়া পাঠাইল, "সে এখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।" বন্ধুবান্ধব সেবা করিতে আসিয়া ফিরিয়া গেল। অন্দর হইতেও বারম্বার পিসীমা ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ পাথর মত একাসনে বসিয়া রহিল।

আজ ছয় মাস কাল সে দেশে দেশে ঘুরিয়াছে। অনাহারে অনিদ্রায় বহু জনাকীর্ণ নগরের গলিতে গলিতে ঘুরিয়াছে। কত লোকের সহিত কত স্থানে বৃথা আশায় রাত্রি কাটাইতেছে। কত মিথ্যা সংবাদে ভ্রান্ত হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া কত গবাক্ষের দিকে চাহিয়া রৌদ্র বৃষ্টি মূল্য করিয়া প্রতীক্ষায় যাপন করিয়াছে। নিরাশ হইয়াছে, তবু আশা ছাড়িতে পারে নাই। কত লোকের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছে, তবু বান্ধবের আশায় কাহাকেও কিছু বলিতে পারে নাই, প্রিয়জনের মুখ মনে করিয়া যাহারা কষ্ট দিয়াছে, তাহাকে সে ভাল বাসিয়াছে। কত অনাথ আতুরের গৃহে ঘুরিয়া কত পথপ্রান্তর ভিক্ষুকের ঘরে প্রবেশ করিয়া, কত বুক ফাটা অশ্রুর সহিত অশ্রু মিলাইয়া সে এই কয় মাস ক্রমাগতই দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোকের সহিত পরিচিত হইয়াছে। অত্যাচার অবিচারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে তাহাদের অন্তরের মর্ম্মস্থানটীতে যে মর্ম্মান্তিক দুঃখ, তপ্ত মাথিয়া অগ্নি জ্বালিয়া শুষ্ক রুক্ষ বীভৎসতার মধ্যে অচলাসনে বসিয়া আছে, তাহার সহিত মুখামুখী পরিচিত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। যতই পরাজিত হইয়াছে, ততই আপনাকে অপরাজিত বোধ করিয়াছে, যত ক্লেশ পাইয়াছে, ততই সে প্রাণপণবলে বলিয়াছে, 'ইহাই আমার সুখ, তুমিই জগতের সর্ব্বদুঃখহরা, আমি এই দুঃখানুভব করিয়া তোমার সান্নিধ্য তোমার সাযুজ্য অনুভব করিতেছি। তুমি নিরপরাধে যত শাস্তি ভোগ করিতেছ, যত অপমান যত উপেক্ষা যত অনাদর লাভ করিয়াছ, সবই আমি আমার করিব। তোমার ত্যক্তা পতিতা বলিয়া যাহারা দূরে হতাদরে ঠেলিয়া দিয়াছে, আমি তাহাদের সেই পাপের শাস্তি একা ভোগ করিব, তোমায় না পাই নাই বা পাইলাম, তবু তোমার দুঃখকে অনুভব করাই আমার শ্রেষ্ঠ সাধনা হইবে।'

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গার দিকে উদাস ভাবে চাহিয়া এই সব কথাই স্মরণ করিতেছিল। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে এই চিন্তার সঙ্গে যে তীব্র উত্তেজনা, যে প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক গতিশীলতা ঘূর্ণি বায়ুর মত তাহাকে এক দণ্ডও স্থির হইতে দেয় নাই, আজ তাহা নাই। আজ কেবলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে হইতেছিল পাইয়াছি, সে আছে, কাছেই আছে।

এই 'কাছে আছে' এই কথাটা ঐকান্তিকতাকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত অসংখ্য প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে সুরেন্দ্রের

মন হইতে সমস্ত দেশ সমস্ত কালকে বেগে ঘূর্ণিবায়ু জগতের মত একাকার করিয়া ফেলিয়াছে। রহিয়াছে কেবল একটী কথা 'কাছে আছে' আর অন্য সমস্তই দূরে।" সুরেন্দ্রনাথ ক্লান্ত দেহে মুদিয়া এই 'আছির' মধ্যে ডুবিয়া গেল।

কতক্ষণ যে সে এইভাবে ছিল, সে জানে না, যখন জাগিল তখন দেখিল, রঘুলাল তাহার পায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছে, 'রাজাবাহাদুর আপনি আমায় ডেকেছেন?' সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ রঘুলালের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তার পর হঠাৎ উঠিয়া তাহাকে জোর করিয়া তুলিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল। রঘুলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তার পর আপনাকে সুরেন্দ্রের বাহু মুক্ত করিয়া পুনরায় মাটিতে বসিল। সুরেন্দ্র বলিল, "ওখানে কেন বসলে? ঐ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বস।"

রঘু। আমার? আমি এইখানেই বসব। সুরেন্দ্র তখন স্বয়ং রঘুলালের নিকটে কার্পেটের উপর বসিল। তার পর গম্ভীরমুখে বলিল, "রঘু, তোমায় যত কষ্ট দিয়েছি তার জন্য আমায় ক্ষমা কর ভাই।" রঘুলাল তাড়াতাড়ি সুরেন্দ্রের পদধূলি লইয়া বলিল, "ছিঃ আপনি আমার আজন্মের রাজা, আমায় আপনার জুতো বইবার জন্য রেখে দেবেন, তা হ'লেই কৃতার্থ হয়ে যাব—আর কিছু চাইব না।" সুরেন্দ্র রঘুলালের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া গভীর স্নেহে চাহিয়া বলিল, "সকলের ওপর যে খাটারী করতে যায়, নিজের বেলাতেই সে সব চাইতে অশিক্ষিত থেকে যায়।"

রঘু। কিন্তু আপনার পক্ষে তা' হয়নি, আপনি নিজেও যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছেন, আমি যে সে কথা স্পষ্ট বুঝ্‌ছি রাজা।

সুরেন্দ্র। তা' পেয়েছি রঘু, আমার ওপরে ভগবানের ঐটুকু দয়া অনুভব করে তাঁর পায়ে শত শত প্রণাম জানিয়েছি। কিন্তু এ সব কথা থাক্, তোমার কালকের কাজের গুটো কথা জিজ্ঞাসার দরকার আছে—

রঘু। কিন্তু প্রয়োজন নেই রাজা, আমি ভালই করিছি। ওদের জন্য এতটুকু সহানুভূতি দেখাবার দরকার নেই। কাল আপনি মিছি মিছি আমার ওপর রেগেছিলেন।

সুরেন্দ্র। মিছি মিছি নয় রঘু, কাল তুমি আমার এমন একটা আঘাত করেছ, যার ব্যথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। দোষ আমারি, আমিই তোমায় এতবড় হিংস্রক করে তুলেছি। কিন্তু দুঃখের শিক্ষায় কোথায় তুমি নরম হবে, তোমার মাথা সকলের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে, তা' নয় এ তুমি কি হয়েছ? ওদের দুঃখ কি তুমি তখন বেড়া আগুনের মধ্যে থেকে অনুভব করতে পারনি? ছি ছি এতদিন ধরে তাহ'লে কি করেছ?—যদি সব দুঃখকে সমভাবে ভক্তির সঙ্গে অনুভব করতে না শিখে থাক, তাহ'লে আমার যে নরক বাসের বন্দোবস্ত করেছ তা' কি বুঝতে পারছ না? দরীদেরই দুঃখ আছে ধনলোলুপ স্বার্থলুব্ধ ঐশ্বর্যলুব্ধ মর্ত্যের কি দুঃখ নাই? এই লোভই যে সব চাইতে বড় অভিশাপ। ঐ লোভের বেড়া আগুনেই যে ওরা সর্বস্বান্ত হচ্ছে, ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে! রঘু, যদি কিছু শিখবার থাকে তাহ'লে সংসারের সব রকম দুঃখকেই অনুভব করতে যাও করতে শেখ, ভক্তির চক্ষে দেখতে শেখ।

সুরেন্দ্রনাথ নীরব হইলে রঘুলাল কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিল, "এইবার বুঝেছি, দেবতা কোথায় ছিলেন—যা আমার এ দেবতাকে আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। ওরু, দেবতার বিকাশ দেখবার আশায় অনেক দিন ধরে ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে আছি, যার কাছে যাবেন না?

সুরেন্দ্র। সকালে এখানে এসেই তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম, তোমার মার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। মা বিয়া যে তোমায় বুকে টেনে নিয়েছেন, তা' তাঁর স্নেহগর্ব-ভরা মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি।

রঘুলাল হাসিল, তার পর অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, "আমি এখার কথা বলিনি, আমার আর একটী মাতৃলাভ ঘটেছে।" সুরেন্দ্র বুঝিতে না পারিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল। রঘুলাল বলিল, "এখানে একটী অনাথা-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই নূতন জননীটী আমার সেই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী।"

সুরেন্দ্র। অনাথা-আশ্রম? কে সেই জ্ঞানহীনা যে এতবড় অহঙ্কার রাখে? অনাথাদের জন্য আশ্রম! কি

ভয়ঙ্কর! বিশ্বনাথের মন্দিরে অনাথাকে আশ্রয় দেবার অহঙ্কার যাকে এতবড় সাহসী করে দেখ্‌তে হবে। চল এখনি যাই।

রঘু। এখন অনেক বেলা হয়েছে, আংরাবাড়ি করে বিকেলে গেলেই হবে।

সুরেন্দ্র। না রঘু তা' হবে না—

রঘু। যাদের প্রসাদ তাহ'লে আমার কপালে নাচ্ছে দেখ্‌ছি, চলুন।

সুরেন্দ্র ভৃত্যকে ডাকিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিল। রঘু বলিল, "তাহ'লে আপনি গাড়ীতে যান, আমি আর তা' পার্‌ব না।" সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "একই কথা রঘু, মন নিয়েই কথা। রাজাধিরাজের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকলেও দীনের দীন হতে পারা যায়—আবার আতাকুড় থেকে তাড় কুড়িয়ে খেয়েও রাজার রাজা হয়ে থাকতে পারা যায়। যাক্ চল হেঁটেই যাই।" রঘুলাল ও সুরেন্দ্র দীপ্ত রৌদ্রে বাহির হইয়া পড়িল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সরলা কলিকাতা হইতে যে কয়জন পীড়িতা পতিতাকে ধরিয়া আনিয়াছিল, তাহাদের আহার, শুশ্রূষা এবং তাহার পর ভগ্নস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিতে কাঞ্চন ও তাহার মাতা কয়েকদিন বিশেষ ব্যস্ত ছিল। সরলাও ক্রমাগত কলিকাতা যাওয়া আসা করিতে করিতে অন্য কোন কথা ভাবিবার অবসর পায় নাই। তাহার ব্যাধিও আপাততঃ অনেকটা সারিয়াছিল, তাই সে প্রাণপণে কাঞ্চনকে সাহায্য করিতেছিল। কলিকাতা হইতে মোমের কল, পেন্সিল কল, আলবুমিনের রঙ্গপাত্র বৈ কাগজ কলম শ্লেট পেন্সিল সমস্তই স্বয়ং দেখিয়া সরকারের সাহায্যে ক্রয় করিয়া আনিয়া আশ্রমের কাজ আরম্ভ করিতেছিল। তদুপরি প্রতিদিপ্রহরে কাঞ্চনের নিকটে বসিয়া লেখাপড়া শিখিবার উৎসাহও তাহার কম ছিল না। দেখিয়া শুনিয়া কাঞ্চন বলিল, "সরলা আমি যদি তোকে এই কাজের সব ভারটুকু দিয়ে মাঝে মাঝে ছুটী নিই তাহ'লে তুই বোধ হয় একাই সব কর্‌তে পার্‌বি?"

সরলা। তোমার ছুটি সেই করবার দিন হবে—

কাঞ্চন। করণও করিও হাত ধরা নয়, কোন দিন যে সে এসে পড়বে তার ত' ঠিক নেই, তাই বল্‌ছিলাম তুই বোধ হয় একাই সব পার্‌বি?

সরলা। কেন একথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ দিদি, এরই মধ্যেই কি তুমি হাঁপিয়ে উঠেছ?

কাঞ্চন। হাঁপিয়ে উঠিনি ভাই, এমনি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। সরলা আর কোন কথা বলিল না, কিন্তু হঠাৎ তাহার ললাটে চিন্তারাশি ঘনাইয়া আসিল। হঠাৎ সে পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল, কাঞ্চন সুরেন্দ্রনাথের ছবিখানার দিকে চাহিয়া আছে, সরলা তাহার দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিল, "দিদি সবত' হল, কেবল—"

কাঞ্চন। কেবল কি?

সরলা। আমার অনেক দিনের একটী আশা তুমি এখনও সফল কর্‌লে না।

কাঞ্চন। কি, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা। সরলা সুরেন্দ্রের ছবি খানাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ওঁর সঙ্গে দেখা।"

কাঞ্চন নতমস্তকে বলিল, "উনি এলেই দেখা হবে।" উনিত' এখানে নেই।

সরলা। তুমি না ডাক্‌লে হয়ত আস্‌বেন না। ওঁর বন্ধুবান্ধবত' তোমায় দেখে গিয়েছেন, তবু কি উনি তোমার খবর পান নি?

কাঞ্চনও সেই কথা কয়দিন হইতে ভাবিতেছিল। সময়ে সময়ে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে বহির্দ্বারের দিকে চাহিত,—গেট খোলার শব্দ হইলেই চমকিত হইয়া ভয়ে ভয়ে ঘরে গিয়া লুকাইত। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙ্গিয়া গেলে হতাশার নিঃশ্বাস ফেলিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিত। আর কেহ একথা বুঝুক আর নাই বুঝুক তাহার অন্তরজা সরলা সমস্তই বুঝিত, কিন্তু সাহস করিয়া কোন কথা বলিত না। কিন্তু অনেক দিন পরে আজ একটু অবসর পাইয়া, আজ কাঞ্চনের আন্তরীণ ক্লান্তি অনুভব করিয়া বলিল, "চল না দিদি, একবার সুবিধে ওঁর এখানকার বাড়ীটা দেখে আসি।"

কাঞ্চন। আস্তে হেতে কতবারত' ওঁর বাড়ী দেখেছ আবার কেন?

সরলা। যে সময় ওঁর ওখানে থাকবার সম্ভাবনা নেই সে রকম সময় চল না কেন একদিন বেড়িয়ে আসি, যদি দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

কাঞ্চন হাসিল, কিন্তু সেই হাসির মধ্যে যাহা ছিল তাহাতে ব্যথিত হইয়া সরলা বলিল, "কেন দিদি দূর থেকে দেখে আসব বৈত নয়? কাছে ত' যেতে চ'চ্ছি না।"

কাঞ্চন। কোন দরকার নেই সরলা, চাওয়া চাওয়ি পাওয়া পাওয়ি ছেড়ে দাও—যা' পেয়েছি তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে না পারি তা'হলে চিরদিন ছুটোছুটীর মধ্যে থাকতে হবে একটুও ঠাণ্ডা হতে পার না। ওসব ইচ্ছে ছেড়ে দাও।

সরলা চুপ্ করিয়া রহিল, কিন্তু সে কিছুতেই তাহার আবেদন ত্যাগ করিতে পারিল না। মাঝে মাঝে সে অবসর বুঝিয়া তাহার প্রার্থনা করিত এবং কাঞ্চনের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইত।

এমন সময় একদিন দ্বিপ্রহরে দুইটী অতিথি আসিয়া আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিল। রঘুলাল ইতিপূর্ব্বেই আশ্রমবাসীদের নিকট পরিচিত হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথই কিবল অপরিচিত, কারণ আশ্রমের অধিকাংশ লোকই বিদেশী।

রঘুলাল সুরেন্দ্রকে পুরাতন বাঙ্গালার বাহিরের বেঞ্চি খানায় বসাইয়া কাঞ্চনকে খুঁজিতে গেল। কাঞ্চন কিন্তু দূর হইতে তাহাদের উভয়কে দেখিয়া কোথায় লুকাইবে স্থির করিতে না পারিয়া চুপ্ করিয়া এককোণে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নিকট সমস্ত জগৎ তখন ঐ বেঞ্চিখানার উপর অধিষ্ঠিত অতিথির পায়ের তলায় গিয়া অধিয়াছিল। রঘুলাল যে বারবার বাহির হইতে যা—যা করিয়া ডাকিয়া শেষে আশ্রমের অন্যদিকে চলিয়া গেল, সেদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না; সে কেবল ঘরের কোণে কাঠের মত দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে গবাক্ষের সার্সি পথে সুরেন্দ্রের বিষণ্ণ বদনের দিকে চাহিয়াছিল। সুরেন্দ্রকে হঠাৎ কি ভাবিয়া সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র টেবিল খানার উপর মাথা রাখিতে দেখিয়া কাঞ্চনের যেন সংজ্ঞা ফিরিল। সে তাড়া তাড়ি বাহিরে আসিয়া সুরেন্দ্রের নিকট দাঁড়াইল। সুরেন্দ্র মুখ তুলিয়া কাঞ্চনের দিকে চাহিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একি। তুমি এখানে?"

কাঞ্চন কোন কথা না কহিয়া সলজ্জ হইয়া প্রণাম করিল। তার পর সসঙ্কোচে পদধূলি গ্রহণের জন্য হস্ত বাড়াইতে সুরেন্দ্র পিছাইয়া গেল। নতজানু কাঞ্চন ঊর্দ্ধ মুখে চাহিয়া বলিল, "পায়ের ধুলো নেবেন না?"

সুরেন্দ্র। না—না ওঠো ওঠো ওকি—আমার পায়ের ধুলো কেন?

কাঞ্চন। তবে কার নেব?

সুরেন্দ্র। আমি কারও নমস্য নই কাঞ্চন, ওঠো—

কাঞ্চন। আমি পা নাড়ুয়ে উঠ্‌ব না।

সুরেন্দ্রনাথ টেবিলের অপর পার্শ্বে সরিয়া গেল। কাঞ্চনের চক্ষু হঠাৎ জলে ভরিয়া উঠিল, সে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "জীবনে একটীবার মাত্র আপনার পা ছোঁবার অধিকার টুকু দেন, আর কিছু চাই নে।"

সুরেন্দ্র এইবার নিকটে আসিয়া বলিল, "তোমার অধিকার কতখানি তাত' জান কাঞ্চন, তবে কেন, মিছি মিছি ওকথা বলে আমায় কষ্ট দিচ্ছ; ঐ দেখ রঘু আসছে আরও কে আসছেন, তুমি ওঠো ছি!—ওঁরা কি মনে করবেন?" কাঞ্চন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুরেন্দ্র কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত টেবিলের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

রঘুলাল নিকটে আসিয়া বলিল, "বাঃ মা তুমিত' বেশ? আমি তোমায় এমন স্থান নেই যে খুঁজিনি শেষে এই এঁর কাছে শুনলাম তুমি এই ঘরেই আছ। রাজাসাহেব, আমার মাকে বাটিতে বসিয়ে রেখেছেন কেন?" সুরেন্দ্র লজ্জিত কণ্ঠস্বরে বলিল, "রঘু একথা আগে তোমার বলা উচিত ছিল।" সরলা ইত্যবসরে সুরেন্দ্রের পায়ের গোড়ায় নতজানু হইয়া প্রণাম করিল। সুরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি দেখ্‌ছি আগে হতেই এখানকার পরিচিত কিন্তু রঘুলাল হঠাৎ করে কোন কথাই আমায় বলে নি। আপনি কাঞ্চনকে উঠে বসতে বলুন।" সরলা হাসিয়া বলিল, "কেন? দিদি ত' বেশ বসে আছে।"

সুরেন্দ্র। সর্ব্বনাশ কল্লে আপনারা, ভক্তির এত ঘটা দেখ্‌লে আমার যে নিজের ওপর নিজের যে একটা মস্ত ভক্তির উপসর্গ ছুটবে। ওঠ কাঞ্চন, নৈলে আমাকেও মাটিতে বস্‌তে হবে।

কাঞ্চন অজ্ঞাতসারে ইতিমধ্যে সুরেনের পাদস্পর্শ করিয়াছিল। সুরেন্দ্রও তাহা টের পাইয়াছিল, কিন্তু সোদর্য্যের ভয়ে কোন কথা বলিতে পারে নাই, নীরবে এই ভক্তির অত্যাচার সহ্য ক'রল।

কাঞ্চন উঠিয়া বলিল, "সরলা, মা কোথায় ?"

সরলা। মা এই মাত্র পূজো কর্‌তে গেলেন।

কাঞ্চন। তাহ'লে চল ঐ পাশের ঘরটায় বসা যাক্ গিয়ে—তার পর মা এলে—

সরলা। দরকার কি এই ঘরটাতেই চল না।

কাঞ্চন ক্ষণকাল ইতস্ততঃ ক'রয়া শেষে বলিল, "চলুন এই ঘরটাতে যাই।"

রঘু। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা আমাদের এখনও আহারাদি হয়নি। আমি প্রসাদ পাবার আশায় এসিছি—রাজাবাহাদুরও বোধ হয়—

কাঞ্চনের মুখ ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল দেখিয়া রঘুলাল তাহার কথা শেষ করিতে পারিল না। সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, "আমার খেলেও হয় না খেলেও হয়, এই ছ'মাস বিদেশে বিদেশে ঘুরে ফিরে টাকে জল করে ফেলিছি। তোমাদের হয়তো অসুবিধে হবে, খাওয়া দাওয়া থাক্ না রঘু।"

রঘু। আপনার কিদে তৃষ্ণা না থাকতে পারে, কিন্তু আমার ওটা খুবই আছে। বাড়ীতে বলে এসিছি এখনি এসে যাব, কিন্তু এখানকার লোভ সাম্‌লাতে পারছি না।

সুরেন্দ্র। তাহ'লে তোমার যদি হয় আমারও চাট্টি ফুটবে না—এত লোকের মধ্যে আমার ভাতের অকুলান হবে ?

কাঞ্চন ও সরলা উভয়েই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আঃ কি ঠাণ্ডা ঘর! তোমরা যদি বিরক্ত না হও তাহ'লে এই দুপুরের বেলাটা এই চেয়ার খানায় কিম্বা একখানা পাটী পেড়ে দাওত' তাতেই শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারি। আজ কতদিন যে ভাল করে ঘুমুইনি তার ঠিক নেই।" কাঞ্চন তাড়াতাড়ি কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুরেন্দ্রের বৈলচিত্র খানার উপর যে ধোয়াটোপ ছিল তাহা টানিয়া ছিল। সুরেন্দ্রের দেদিকে লক্ষ্য ছিল না, কারণ সে আরামে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া গায়ের জামাটা খুলিয়া চাদর দিয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

রঘুলাল একখানা পাটী বিছাইয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। তাহাদের ভঙ্গী দেখিয়া সরলা, কাঞ্চনকে কাণে কাণে বলিল, "এখন আত্মীয়তের কেমনটি করে ঘুরে ফেলে রেখেছিলে দিদি ?" কাঞ্চন বলিল, "ওসব কথা রাখ্, এখন কি করি ?"

"তার কি ? সরকার মশায়কে ডাক্‌তে বলে দিচ্ছি।" রঘুলাল তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া বলিল, "আমার জন্যে তোমরা ভেব না, তোমাদের এখানকার লুচো সেলাই করতে মুরুব করতে আমার রোজই আস্‌তে হবে, আমার যা' দেবে তাই খাব। তবে রাজাবাহাদুরের কথাটা ভাব্‌বার বটে।

রাজাবাহাদুর কিন্তু সমস্ত ভাবনা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া নিদ্রার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কাঞ্চন তাহার ভাব দেখিয়া বলিল, "সরলাই নতুন যে খাটিয়া খানা এনেছিস্ তাই আনিয়ে দে, নতুন বালিস বিছানাও পাঠিয়ে দিস্।" সুরেন্দ্র ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "কেন তোমরা ব্যস্ত হচ্ছ ? আমি কিছু চাই না,—তোমরা ঘণ্টা খানেক আমায় এখানে চুপ্ করে বসে থাকতে দাও, তার পর বেলা পড়্‌লে আমি আপনিই চলে যাব। খেতে দিতে পার ভালই, নইলে কোন চিন্তা ক'র না—আমি আর কিছু চাই না, একটু চুপ্ করে ঠাণ্ডা হতে চাই।"

কাঞ্চন তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাগুলা বন্ধ করিয়া ঘরটাকে একটু অন্ধকার করিয়া দিয়া সরলার সহিত বাহির হইয়া গেল। রঘুলাল তখন চট্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তবে আপনি আরাম নেন, চুপ্ করে থাকা আমার অভ্যেস।" রঘুলালও বাহির হইয়া গেল।

যে ঘরে কাঞ্চনের মাতা পূজা করিতেছিলেন, সে খানা একখানা ক্ষুদ্র খড়ের ঘর। কিন্তু তথাপি উহা ঠিক ছবির মত করিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে।—সঙ্গার ঠিক উপরে তুলসী বেদ, জুঁই, গন্ধরাজ, জবা, করবী প্রভৃতির কেয়ারীর মধ্যে ঐ ঘরখানি। কাঞ্চন তাহার মাতার জন্য স্বীয় তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করাইয়াছে। তাহার মাতা মনোরমা ঐ ঘরটীর মধ্যে নিজের ইষ্টদেবতা একখানা যুগল-মূর্ত্তির পট—একখানা ক্ষুদ্র রৌপ্য সিংহাসনে বসাইয়া বেদীর উপর রাখিয়া দিয়াছেন। প্রত্যহ উঠিয়া স্নান করিয়া স্বয়ং ঐ পটের প্রসাধনক্রিয়া সমাপন করিতেন। তার পর অন্যান্য নিত্য কার্য্য সারিয়া দ্বিপ্রহরে পূজায় বসিতেন।

রঘুলাল ইতিপূর্ব্বে এই সমস্তই দেখিয়া গিয়াছিল। আজ ধীরে ধীরে গিয়া ঐ ঘরের মধ্যে গিয়া উঁকি মারিল। দেখিল মনোরমা, আসন পাতিয়া ধূপ ধূপা নৈবেদ্য সম্ভারাদি লইয়া বসিয়া আছেন; আজ দুইটী শিশু মনোরমার কাছে বসিয়া আছে। একটীত' পূজারতার পৃষ্ঠদেশে উঠিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে, অপর একটী ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখ দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। পূজারিণীর কিন্তু কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই, আপন মনে পুষ্প চন্দন নৈবেদ্য নিবেদন করিতেছেন। রঘুলাল হাসিয়া বলিল, "দিদিমার বেশ পূজো হচ্ছেত' ?"

মনোরমা চমকিত হইয়া একবার ফিরিয়া চাহিল, তার পর ইঙ্গিতে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পুনরায় পূজায় মন দিল। রঘুলাল বলিল, "আপনি পূজো সারুন আমি শীগ্‌গির যাচ্ছি না।" রঘুলাল মন্দির দ্বারে প্রণাম করিয়া যে ঘরে বোতা সেজি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছিল সেই দিকে চলিয়া গেল।

এদিকে সরলা, ঘণ্টা খানেক পরে সুরেন্দ্র ও রঘুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, রঘু সেই কক্ষে নাই, আর সুরেন্দ্রনাথ রঘুর পরিত্যক্ত সেই পাটীখানা টানিয়া লইয়া গিয়া গঙ্গার ধারের গবাক্ষের নিকট পাতিয়াছে। কাঞ্চনের মাথায় একটা বালিস্ তাহার শয্যা হইতে টানিয়া মাথায় দিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। সরলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সুষুপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর তাহাকে প্রণাম করিয়া, আবার বাহিরে চলিয়া গেল। কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ ওদের ডেকে আন্‌লে না ?"

সরলা। রঘুবাবু ওখানে নেই, আর উনি ঘুমুচ্ছেন।

কাঞ্চন। ঘুমুচ্ছেন ? সেকি ডাক্‌লেন্না কেন ?

সরলা। আমার যজ্ঞ যারা কর্‌তে লাগ্‌ল, তারা অমন করে ঘুমুচ্ছেন !

কাঞ্চন। এ সব ছুঁড়িয়ে যাবে যে,—

সরলা। তবে তুমি যাও আমি পারব না।

কাঞ্চন আর তর্ক বিতর্ক না করিয়া সশব্দে সুরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু সুরেনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। কাঞ্চন তখন মৃদুস্বরে বলিল, "উঠুন খাবার হয়েছে।" সুরেন্দ্র পূর্ব্ববৎ। কাঞ্চন তখন নিরুপায় হইয়া রঘুলালকে খুঁজিতে গেল। রঘুলাল আসিয়া সুরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "যা ওকে এখন জাগালে অত্যাচার করা হবে ? ছ'মাসের ঘুম ওর চোকে এসে ঢেকেছে। এখন উনি ঘুমান,—উনি উঠ্‌লে এক সঙ্গে খাওয়া যাবে।"

কাঞ্চন সেকথা শুনিল না, রঘুকে জোর করিয়া ডাকিতে বলিল। রঘুলাল সুরেন্দ্রের গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিয়া তাহাকে জাগাইল। সুরেন্দ্র চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। তার পর একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এ কি ঘুমই এসেছিল ! কি হয়েছে ঘুম ভাঙ্গালে কেন তোমরা ?"

কাঞ্চন। খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে।

সুরেন্দ্র আর বাক্যব্যয় না করিয়া আহারাদি সারিয়া লইয়া বলিল, "চল এইবার আশ্রমটা দেখে নিই।"

ইতি মধ্যে কাঞ্চনের মাতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "সে হবে অখন, এখন একটু জিরোন, ফিকেলে দেখ্‌লেই হবে।"

সুরেন্দ্র ও রঘু পুনরায় সেই কক্ষে গিয়া বসিল। কাঞ্চনের মাতা বলিলেন, "রাজাবাহাদুর আপনি যে কষ্ট করে এখানে আস্‌বেন, এ আমাদের আশার অতীত।" সুরেন্দ্র কিছু না বলিয়া মৃদু হাস্য করিল।

রঘুলাল বলিল, "দিদিমা আপনি খাওয়া দাওয়া করুনগে, আমরা দু'জনে এখনি যাচ্ছি না।"

মনোরমা। না—না ওরা আসুক তার পর যাচ্ছি।

রঘুলাল। কোন দরকার নেই আপনি যান।

মনোরমা চলিয়া গেলে, রঘুলাল বলিল, "রাজাবাহাদুর, আপনার হয়তো একটু একলা থাকার দরকার, আমারও বাড়ী যাওয়ার দরকার কারণ বাবার অসুখ। আপনি থাকুন আমি চলাম।" সুরেন্দ্র বলিল, "হাঁ, আমার গোটাকতক কথা কাঞ্চনের সঙ্গে আছে, আমি একটু পরে যাব, তুমি যাও।" রঘুলাল চলিয়া গেল।

সুরেন্দ্র এইবার উঠিয়া ঐ কক্ষের আদ্যোপান্ত দেখিতে লাগিল। আলমারিতে ছবি ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ঢাকা দেওয়া সেই বড় তৈলচিত্রখানার উপর তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। সমস্ত ছবিগুলিই খোলা,—কেবল ঐ খানাই ঢাকা কেন? সুরেন্দ্রনাথ পর্দার দড়ি টানিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। একি এ যে তাহারই তৈল-চিত্র! এ চিত্র কোথা হইতে আসিল? এ চিত্র তাহারই বটে তবু যেন তাহার নয়, কারণ ইহার পোষাকের অনুরূপ পরিচ্ছদ সে কখনও পরে নাই। ঐ পরিচ্ছদ যেন চিত্রকর কল্পনা করিয়া তাহাকে পড়াইয়াছিল—ছবিতে তাহার হস্তে ফুলের মালা, স্কন্ধে উত্তরীয়, কপালে চন্দনের ফোটা এবং কণ্ঠে প্রকাণ্ড এক ছড়া মালা। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে ঐ ছবির উপদেশের ষোলটি নটের উপর ফুলের রাশি। কে যেন তাহার ঐ ছবিকে পূজা করিয়াছে।

সুরেন্দ্র নিজের ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া নিঃশেষে মুগ্ধ হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে পর্দ্দাটা টানিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল কাঞ্চন দাঁড়াইয়া আছে। সুরেন্দ্রকে ফিরিতে দেখিয়া সে নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনি আমায় কি বলতে ডেকেছেন?"

সুরেন্দ্র। কৈ আমিত' তোমায় ডাকিনি!

কাঞ্চন। রঘুলাল যে বলে গেলেন!

সুরেন্দ্র। ওঃ—হাঁ ওকে বলিছি যে তোমার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে, কিন্তু তোমায় ডেকে দিতে বলিনি। যাক্ ভালই হয়েছে। তুমি ব'স।

কাঞ্চন পাটীখানার উপর নতমুখে বসিল।

সুরেন্দ্রনাথ চেয়ারখানা টানিয়া গবাক্ষের কাছে লইয়া তাহাতে বসিয়া কিছুক্ষণ গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিল। কাঞ্চন কণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কি বলবেন বলুন!" সুরেন্দ্র গভীর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বলব তাকি বুঝতে পারছ না?" কাঞ্চন নীরবে ঘাড় নাড়িল। "তবে তুমি বুঝতে চাও না।" কাঞ্চন তথাপি নীরব। "উত্তর দাও, বল আর কতদিন এমনভাবে আমরা বঞ্চিত থাকব? আর কতদিন আমরা পেয়েও পাব না? কাঞ্চন তাহার বিশাল অশ্রুপূর্ণ চক্ষু পূর্ণভাবে সুরেন্দ্রের মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "যা পাওয়া উচিত নয়, তা' চাওয়াই অন্যায়। যতটুকু আমি উপযুক্ত যতটুকু পেতে পারি ততটুকু চাইব, তার বেশী চাইলে নিজেই কষ্ট পাব।"

সুরেন্দ্র। তুমি কতটুকুর উপযুক্ত তুমি কি ঠিক জান?

কাঞ্চন। তা' না জানতে পারি, কিন্তু যা' আমি কিছুতেই পেতে পারি না, যা' আমার পক্ষে কখনই পাওয়ার জিনিষ নয় তা' আমি ঠিক চিনি, তাই সে দিকে আমি হাত বাড়াব না। সুরেন্দ্র আবার বাহিরের দিকে চাহিল, তার পর কাঞ্চনের দিকে ফিরিয়া বলিল, "কেন? এ কষ্ট আমরা মিছি মিছি সহ্য করব?"

কাঞ্চন। মিছি মিছি নয়, আপনি বুঝে দেখুন এই কষ্টই সইতে হবে, কারণ আমি যা' চাই তা' এ উপায় ছাড়া অন্য উপায়ে পাওয়া যাবে না।

সুরেন্দ্র। কি তুমি চাও?

কাঞ্চন। আমি চাই দেবতা—ঐ যা' এই মাত্র দেখছিলেন, আমি তাকেই চাই।

সুরেন্দ্র। কিন্তু কাঞ্চন আমিত' ও নই, ও তুমি কোন কাল্পনিক জীবকে ধরতে চলেছ? আমি মানুষ, আমার ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে; আমি দেহের জন্য একটা কাটকে বুকের কাছে অনুভব করবার জন্য, হাহাকার করে বেড়াচ্ছি কিন্তু কেউ আমায় দিচ্ছে না, তাই তোমার জন্য আজ ছ'মাস ধরে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি। অন্ধকারে অনিদ্রায় কষ্ট লোকের মধ্যে তোমায় খুঁজে বেড়িয়েছি। তুমি আনন্দিত হবে বলে কত অনাথ আতুরের জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিছি। কিন্তু নিষ্ঠুর তুমি তোমার লুকিয়েছিলে তা' কিছুতেই স্থির করতে পারি নি। তোমার জন্য

সমস্ত সংসারের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম, এত প্রাণ কাটা চোখের জল ফেল্লাম তবু সবই বিফল হবে।"

কাকন। ছি ছি!! আপনি কি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না যে আপনি কার জন্য এ সব কর্‌ছেন? আমার জন্য?—কখনই নয়, আপনার মধ্যে যিনি আছেন তিনি ছড়িয়ে পড়্‌তে চাচ্ছেন, তিনিই আপনার ভিতর হতে বেড়িয়ে সংসারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে চাচ্ছেন—আমি ত' উপলক্ষ মাত্র। তবে গঙ্গা আনার জন্য ভগীরথের যেটুকু সার্থকতা এখানে আমার সার্থকতা সেই টুকু। আপনি আমাকে খুঁজেছেন সবারই মধ্যে, আমার এই ছোট্টদেহটার মধ্যে আমায় খুঁজ্‌লে আপনি আমার কতটুকু পেতেন? যা' পেতেন তাতে কি আপনার অত বড় ক্ষুধার শান্তি হত? আপনার প্রাণ ঢালা দেহ তার প্রিয়বস্তুকে সবারই মধ্যে খুঁজেছে, সবাইই মধ্যে পেয়েছে। আপনি না বুঝ্‌লেও আপনার অন্তর্যামী তা' ঠিক জানেন। আপনি এই হাত-পাওলা কাকনকে চান্ নি। তবে আমি ধন্য যে আমার জন্য আপনার মধ্যে দেবতা জেগেছেন। আমি কি?—কে? সংসারের ঘৃণিত পাপের পঙ্কে আমার জন্ম, পাপের মধ্যে আমার বৃদ্ধি, কিন্তু দেব, একবার ভেবে দেখুন আপনার একবারকার স্পর্শে আমি আজ কত পবিত্র হইছি, কত ধন্য হইছি। আপনি দেবতা—আপনার মধ্যে সেই দেবতাকে দেখে আমি ধন্য হয়েছি, নইলে কে আমাদের বাঁচাতে পার্‌ত? কে অমন পরিতাপের মধ্যে অশরীরী ভাবে এদের শক্তি দিত? আমি যা' চাই তা' ঐ আজ সুমুখে যিনি বসে রয়েছেন তিনি নন—তিনি আমার অন্তরের, তিনি আপনার মধ্য হতে এসে কোন্ দিন আমার অন্তরে আসন পেতেছেন। তাই বল্‌ছিলাম যে, যাকে আমি চাই তাকে দেবার সাধ্য কারও নেই আপনারও না হয়তো ভগবানেরও নেই। কারণ তা' পাবারও নয় দেবারও নয়—হবার। আমি 'আপনি' হব, যে ভালবাসা সমাজের সর্বোচ্চ শিখর থেকে আর্থিক বাস্তবিকতার চক্রের স্পর্শ থেকে আপনাকে আমাদের মত জীবকেও এতখানি ভালবাসাতে পেরেছে—সেই ভালবাসাই আমি হব, সেই আপনাভোলা প্রাণঢালা স্নেহই আমার হতে হবে। আর কিছু চাই না।

সুরেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইয়া কাকনের এই কথাগুলি শুনিল। তার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দেবি, তুমি দেবতাকে চাও, আশীর্বাদ করি তাই যেন পাবার মত হয়, কিন্তু আমি মানুষ, মানুষকে চাই।"

কাকন সলজ্জ হইয়া প্রণাম করিয়া ঊর্দ্ধমুখে সুরেন্দ্রের দিকে সজল নয়নে চাহিয়া বলিল, "আপনিই দেবতা, দেবতাও মানুষকেই চাইবেন, নইলে তিনি দেবতাই নন। মানুষ যেমন দেবতাকে চাইবে, দেবতাও তেমনি মানুষকে চাইবেন। এই অনাদি কালের চাওয়ার মধ্যে দেব-মানবের মিলন হচ্ছে হয়েছে হবে।"

সুরেন্দ্রনাথ গভীরদৃষ্টিতে সেই ঊর্দ্ধমুখী চিরপূজারিণীকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি মানুষকে চাই—আমি ভালবাস্‌তে চাই, আমি প্রাণের কাছে প্রাণ চাই, কিন্তু তুমি তা' দেবে না—চল্লাম" সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে, হঠাৎ কাকন মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া সুরেন্দ্র যে উপাধানে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়াছিল সেইটাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্য, পরক্ষণেই সেটাকে মাথায় ঠেকাইয়া তুলিয়া রাখিল। তার পর সুরেন্দ্রের তৈলচিত্রখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অশ্রুসৌত মুখে হাসিয়া বলিল, "দেবতা, তোমারই জয় হয়েছে। মানুষকে এমনি ভাবে চিরদিন হারিও ঠাকুর।"

কাকন সেইখানে চুপ্ করিয়া হাত জোড় করিয়া বসিয়া রহিল। পূজারিণীর ধ্যান সেদিনের জন্য কেহ ভাঙ্গিতে সাহস করিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুহ বি, এল্

অনাবৃষ্টি

শ্রাবণের অবিরল তরু যারা নিরমল
এবার জীবনরাখী করেনি ধারণ,
আজিকে দেখতে পাই শোভা তুষা আশা নাই
প্রকৃতির অঙ্গে নাই আনন্দ-স্পর্শন।
না ফুলাতে শীষগুলি তুঁষেতে উঠিছে ধূলি
ধানার আনিছে কাটি গাভীদের তরে,
কৃষকেরা গৃহে শুধু নিরাশায় করে ধূ ধূ
নাহি হাস্য কলতান আঙিনার পরে।
জলে ভিজে রোদে পুড়ে খেটে খুটে ঘুরে ঘুরে
গাত্র হইয়াছে শুধু ম্যালেরিয়া তার,
মাহিক বৈদ্যের কড়ি ঔষধ-প্রাহি এক ভরি
বাঁধা দিয়ে করিবে যে পথ্যের যোগাড়।
কেহ নাহি দেয় ধার দেহে অস্থি চর্ম্ম সার
বাঁচিবে কি? বাঁচিলেও কেমনে শোধিবে?
আশ্বিনের কিস্তি বাকী মোদহা বলেছে ডাকি'
না দিলে বলদ জোড়া বেচিয়া লইবে।
হাতে পৈঁচা দুইখানি রেখেছিল যে ঘরণী
কতদিন অনশন সে আজি লুকায়
দিয়ে তাত দুই কাঁসি কেহ যদি রাখে দাসী
বাসন মাজিয়া তবে সন্তান বাঁচায়।
কত্তার আসিবে বর নূতন বাঁধিবে ঘর
চাষা করেছিল আশা প্রথম আষাঢ়ে
সেই ঘর খানি আছে তাহারি কেমনে বাঁচে
হাওলাদে রাখিবে হায় কি দেয়ে তাহারে?
প্রভুর অরেছে পাকে বাছ নাই, বাঘ ডাকে
আলি কাঁদে বাগ্‌দী বউ নিরাশায় ফিরে,
ছেলে গুলি কি যে খাবে, সারাদিন খাড়াভাবে
উঠানে শুকায়ে ভাসে নয়নের নীরে।
খড় কুটা নাহি যদু গরু চাল চেটে খায়
একগাছি ঘাস নাই তাহারে পশারে,
কাল জল পান করে' একে একে যায় মরে'
কারো ঘা গোয়াল হায় শূন্য একেবারে।
বন্ধ আজি গাই দোয়া দেয় নাক এক পোয়া
যে গাই চালিত দুধ ছবি তিন কেঁড়ে
গোয়ালা পাড়াটা গোটা খুঁজে নাহি এক ফোটা
যেথে দুধ, ফাটে বুক রোগী শিশু হেরে।
ঘাটে নাহি কলরব মাঠে নাই মহোৎসব
বাটে মাঠ যুবকের শীষ দিয়ে গান।
রোগ শোক ঘরে ঘরে কেবা দেখে কেবা ধরে
যারা যহকায় নাই হাত কল তান।
চাষা ভাবে কোন্ পাপে বুঝি ইহা দেব শাপে
ভাবে কবে করিয়াছে কার অপকার!
দুধে ধিপাইত জল গোপ ভাবি' ভারি ফল
মনে মনে বলে পাপ করিবে না আর।
মাসে ছয় আট দিন তাও জমে বড় ক্ষীণ
কিনিবার বেচিবার কিছু নাহি হায়
জলাভাবে কাঁদা কাঁদি আলু রবিশস্য-আদি
লাগাবার একতর নাহিক উপায়।
উঠানে বেগুন চারা সবগুলি গেছে মারা
উঠিতে পারেনি চালে আলো পুঁইলতা
লাউ কুমড়ার বীজ তাহিত যাচান যায়
আজিকে উঠানে তার চাই ভাসে বাথা।
নাহি গাছে ফুল ফল, এবার শিউলীতল
হয়নিক শীত শুভ্র ফুলে ফুলে ছাওা
নিতান্ত মরণ নাই মুকুরা ফুটেছে তাই
পূজা পুরুতেরে পুজে ভাবে পাষীবাসা।
পিপাসিত পাখী-অলি দেশ ছেড়ে গেছে চলি,
শুধু তালবাসড়ার শব্দ শুধু কানে।
হিরণ্যাগ লতাতরু এদেশ হয়েছে মরু
বর্ষাজননীর স্নেহ নাহি দেখি প্রাণে।

শ্রীকালিদাস রায়

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

বঙ্গবাণীর সেবকগণ, বন্ধুগণ!

মধু-অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা সঙ্গত না হইলেও শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু মধুর স্থলে নিম্ব—মিঠের স্থলে তিক্ত—এব্যবস্থায় কে অনুমোদন করিতে পারে? অথচ বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগকর্ত্রী ঢাকার অভ্যর্থনা-সমিতি সভাপতি-নির্ব্বাচনসম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। স্বনামধন্য সাহিত্যিক বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই সম্মিলনে সভাপতির সম্মানের আসন অলঙ্কৃত করিবেন—এইরূপ স্থির হইয়াছিল। যিনি বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বহুব্যাপী অক্লান্ত সেবার দ্বারা নিজের শরীরে অকাল-বার্দ্ধক্য আনয়ন করিয়াছেন, যিনি দর্শন-বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব তথ্যপূর্ণ বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে দর্শন-বিজ্ঞানের ব্যোমবিহারী সুপর্ণকে আমাদের পৃথিবীর মাটিতে নামাইয়া আনিয়াছেন, বঙ্গবাণীর সেই একনিষ্ঠ সেবক, সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি রামেন্দ্রসুন্দরকে এই আসনে সমাসীন দেখিতে আমরা সকলেই বড় ইচ্ছুক ছিলাম এবং বর্ত্তমান যজ্ঞের প্রজাপতি অভ্যর্থনা-সমিতির উদ্দেশে কালিদাসের ভাষায় বলিতে পারিতাম—

চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ।

কিন্তু 'নয় কারে আমা, পুরাণ জগদম্বা।' রামেন্দ্রবাবু এখন পীড়িত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার পক্ষে সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করা অসম্ভব হইল। তখন অভ্যর্থনা-সমিতির সানুগ্রহ দৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হইল—মধুর অভাবে নিম্বের ব্যবস্থা হইল। ইহাকেই বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। কিন্তু রামেন্দ্রবাবুর স্থলে আমি! এযে 'স্বর্গ হ'তে রসাতলে দারুণ পতন।' অভ্যর্থনা-সমিতি উদারতার যথেষ্ট পরিচয় দিলেন বটে, এবং Any port in storm (তুফানে বন্দরের বাছবিচার নাই) এই প্রাচীন নীতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। কিন্তু আমি প্রমাদ গণিলাম। প্রথম প্রথম নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া বিশেষ ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম এবং আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে সময়ের সংক্ষিপ্ততা প্রভৃতি নানা অজুহাত জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু বন্ধুবর আদ্যোপান্ত সুকবি—তিনি কবিতা-রস-মাধুর্য্য বর্ষন করিয়া মৈথিলী ভাষায় বলিলেন, 'অভিক্রুত যাও বীর!' অর্থাৎ যদিও এক অষ্টাহমাত্র সময় আছে, ইতিমধ্যেই তোমার অভিভাষণ লিখিত পঠিত মুদ্রিত করিয়া শীঘ্র ঢাকাভিমুখে অগ্রসর হও। বন্ধুবর ভুলিয়া গেলেন যে, আমি বীর নই—বীরবিলম্বিত পাদক্ষেপই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অবশেষে ভাবিলাম, আমি রন্ধ্র-পূরক মাত্র—যাহাকে stop-gap বলে—কি লাগে আমার। সেই ভাবেই আমি এখানে আসিয়াছি এবং সেই ভাবেই আপনারা আমাকে গ্রহণ করিবেন। আমার অক্ষমতা, আমার দোষ ত্রুটী, আমার এই অভিভাষণের ভ্রম প্রমাদ, চিন্তার তরলতা, নীরসতা, পরাবলম্বিতা, গাম্ভীর্য্যের মৌলিকতার অভাব ইত্যাদি যখনই আপনাদিগকে পীড়িত করিবে, তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিবেন যে, এই নিয়মের জগতে উৎকট কর্ম্মের ফল হাতে হাতে ভোগ করিতে হয়—তা' সে কর্ম্ম ব্রহ্মহত্যাই হ'ক অথবা অযোগ্য সভাপতির নির্ব্বাচনই হ'ক। আর পারেন যদি, তবে উপনিষদের প্রাচীন উপদেশ স্মরণ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের বাসে আমাকে আবৃত করিয়া আমার দায়িত্ব বিস্মৃত হইবেন—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

এই সাহিত্য-সম্মিলনের ভাব-জল্পনা সূচনা হইবার পর, সুকবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্রের শেষে

সাহিত্যসেবিগণ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রথম সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত করিবার জন্য বরিশাল নগরে সমবেত হন। কিন্তু রাজনীতির কল কোলাহলে, বিশেষতঃ পুলিশ-পুরুষদিগের সুদীর্ঘ 'রেওলেসান' পার্শ্বীর তরুসন্তীর নিনাদে, ঐ মিলিত-প্রায় সাহিত্য-সম্মিলনের বোধন না হইতেই বিসর্জন হইয়া গেল। পরে ১৭ই কার্ত্তিক ১৩১৪ সাল, বুধবারে কলিকাতার রাজধানীর ঐতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাঙ্গণে বলাস্তরস্থ বিদ্যোৎসাহী বঙ্গজননীর সুসন্তান শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বহোদয়ের উদ্যোগ আয়োজন ও আয়োজনে এই 'সাহিত্য-সম্মিলন' প্রথম সমবেত হইলেন। ঐদিন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐদিন প্রথম সর্ব্ব বঙ্গের সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী সুধীগণ এক বিরাট্ বঙ্গশালায় সমবেত হইয়া এক শুভ বাণী-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর বঙ্গ ও বিহারের নানা স্থানে এই সাহিত্য-সম্মিলনের পর পর নয়টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে—আজ আমরা ঢাকাবাসীর আহ্বানে সাহিত্য-সম্মিলনের এই একাদশ অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছি। প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনস্বরূপ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ ক'রয়াছিলেন, আজ তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহার একাংশ আপনাদের শুনাইতে চাই—"সাধকভেদে যেমন জননীর মূর্ত্তিভেদ হয়, সেইরূপ দেশভেদে ও কালভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন: 'বন্দে মাতরম্' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাশিনী জননীকে যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুরূপ মূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী মায়ের এই-মূর্ত্তি এমন স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই, এবং সেই মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতারূপে স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী সাধনার সময় পান নাই। • •

"অতঃপর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি? বঙ্গের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে যে লক্ষ্য করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, বঙ্গের সাহিত্যসেবিমাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে। প্রত্যেকের পক্ষে চলিবার পথ ভিন্ন হইতে পারে। সাহিত্যসেবীর মধ্যে কেহ কবি কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞানপ্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তিরসের উপদেষ্টা, কেহ সর্ব্বার্থের পথপ্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক হই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না, যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই ভাষাশিনী জননীর চরণে সেই কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুলই সেই রাঙ্গাচরণের রক্তকমল সহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়, যাহা আহরণ করিবেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে। "যজ্জুহোসি. যদশ্নাসি, যৎ করোষি, যদাসি যৎ"; - ভগবদ্গীতার আদেশ—সেই সমস্তই সেই এক চরণে অর্পণ করিতে হইবে।" আমিও রামেন্দ্রবাবুর এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—আজ নহে, কাল নহে, 'যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে নিত্য নিরন্তর' আমাদের সমস্ত সাধনার লক্ষ্য, সমস্ত উদ্বেজের বিষয়, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার গম্য ঐ ভাষাশিনী জননী, ঐ সুফলা সুফলা মলয়জশীতলা, ঐ কাননকুন্তলা, ঐ নদীমেখলা, ঐ সাগরসুন্তলা, ঐ সুধিতা ভূষিতা জননী। আসুন আজ প্রণাম করিয়া বলি—বন্দে মাতরম্।

শোকপ্রকাশ

১৩২৩ সালের পৌষ মাসে বাকীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনের পর সাহিত্য-সম্মিলনের দুই জন কৃতপূর্ব্ব সভাপতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সারদা-চরণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার। উভয়েই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন—তাঁহাদের অভাবে বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যের যে আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার পথপ্রদর্শক এই দুই মহাত্মা। তাঁহারাই প্রথমে সযত্নে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি মুকুন্দরাম প্রভৃতির কবিতা ও কাব্যের সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে আজ বহু বৎসরের কথা। তার পর সারদাচরণ মিত্র

ব্যবসায় ব্যবহারক্ষেত্রে বহু ধনাগম ও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ক্রমশঃ হাইকোর্টের জজিয়তী প্রাপ্ত হন; কিন্তু তথাপি কোন দিনই বঙ্গবাণীর সেবায় উদাসীন হয়েন নাই। তাঁহারই অধ্যবসায়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ উন্নতির পর উন্নতির সোপান অতিক্রম করিয়াছে এবং এই সাহিত্য-সম্মিলন সংগঠিত ও সুষ্ঠিত হইয়া সাহিত্যদেবীর গৌরবের বস্তু হইয়াছে।

সাহিত্যগুরু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বিষয় আমি কি বলিতে পারি? বঙ্গমাতার এমন একনিষ্ঠ সেবক আমরা আর কবে দেখিতে পাইব? প্রথম যৌবনের আরম্ভ হইতে স্থবিরত্বের শেষ দিবস পর্য্যন্ত সমান আদরে সমান গৌরবে সমান নিষ্ঠার সহিত কে এমন বঙ্গভাষার ও বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছে? কে এমন অবহিত সতর্ক প্রহরীর মত বঙ্গজননীর বসিবারে দিনের পর দিন রাত্রি পাহারা দিয়াছে? চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছিল, তাঁহারা এই প্রবীণ সাহিত্যিকের সাগ্রহ আন্তরিক অনুরোধ কখনই বিস্মৃত হইবেন না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের কথা

সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সম্মিলন-পরিচালনের জন্য কোন নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা হয় নাই; বরং সম্মিলনের শৈশব-দোলায় নিয়মের বন্ধনরজ্জু নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; এবং প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে ঘোষিত হইয়াছিল যে—"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টাদশ সংখ্যার সম্পাদিত হইলে, চূড়ান্তরূপকালে তাহার ভবিষ্য জীবনের অনাময় নিমিত্ত উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থার আস্থাপন করা যাইবে।" কিন্তু অচিরেই বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। তদনুসারে দ্বিতীয় অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণের নিমিত্ত পাঁচজন ব্যক্তির উপর ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা খসড়া নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া তাহাপুরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে উহা উপস্থিত করিলে, ঐ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়া উক্ত নিয়মাবলী তৎপরবর্ত্তী সম্মিলনে বিবেচিত হইবে, এইরূপ স্থির হয়। কিন্তু ঐ তৃতীয় অধিবেশনেই ভবিষ্যৎ সম্মিলনের কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান, এই তিন বিভাগের জন্য তিনটী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। জাতীয় সাহিত্যের গঠনে দর্শনের স্থান সংকীর্ণ বিবেচিত হওয়ায় বোধহয় ঐ অধিবেশনে দর্শনের জন্য কোন ভিন্ন শাখা-সমিতি-গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই! পরবর্ত্তী অধিবেশন, যাহা ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই অধিবেশনে নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি গৃহীত হয়। ঐ নিয়মাবলীতে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছিল,—

"বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা, প্রচার ও সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময় সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালীজাতিসম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্যনির্ণয় উক্ত উদ্দেশ্যের বিশিষ্ট অঙ্গরূপে গণ্য হইবে। তদ্ভিন্ন এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য ও স্থানীয় লোকদিগকে তৎসম্বন্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রতি বর্ষেই সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হইবে।"

পরে সংশোধিত হইয়া সম্মিলনের উদ্দেশ্য এখন এই ভাবে প্রকাশিত হইতেছে,—

"সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময়, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার, বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী-জাতিসম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্যনির্ণয় এবং জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

প্রথম প্রথম দর্শন সাহিত্যিক শাখার অঙ্গীভূত ছিল, কিন্তু পরে দর্শন স্বতন্ত্র শাখায় নিজের যোগ্য আসন লাভ করিয়াছে। এখনকার নিয়মে কার্য্যের সুবিধার জন্য সম্মিলনের কার্য্য নিম্নলিখিত চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন হইতে পারিবে। (ক) সাহিত্য শাখা (খ) দর্শন শাখা (গ) ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব শাখা (ঘ) গণিত ও বিজ্ঞান শাখা।

চুঁচুড়ায় সাহিত্য-সম্মিলনের যে সকল অধিবেশন হয়,

ঐ অধিবেশনে প্রথম বিজ্ঞান শাখার স্বতন্ত্র সভার অনুষ্ঠান হয়। তৎপরবর্ত্তী চট্টগ্রামের অধিবেশনেও ঐ প্রণালী অনুসৃত হইয়াছিল। কলিকাতা নগরীতে সাহিত্য-সম্মিলনের যে বিরাট্ অধিবেশন হইয়াছিল, ঐ অধিবেশনেই প্রথমতঃ সম্মিলনের কার্য্য উক্ত চারি শাখায় বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাখার স্বতন্ত্র সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তদবধি বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধারণ সভাপতি ব্যতীত চারি শাখার চারি জন বিভিন্ন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেছেন, এবং প্রত্যেক সভাপতি স্ব স্ব শাখার উপযোগী স্বতন্ত্র অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন। ইহার ফলে সমাগত সুধীবৃন্দ অনেক সময় ইচ্ছা সত্ত্বেও সকল শাখার রসাস্বাদে বঞ্চিত হইতেছেন। কারণ, সময়াভাবে প্রায়ই এক সময়েই চারি শাখার ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অধিবেশন করিতে হইতেছে। শ্রোতৃবৃন্দ যোগসিদ্ধির অভাবে কায়ব্যূহ-রচনায় অসমর্থ হইয়া, হয় এক শাখায় স্থগিত থাকেন অথবা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শাখা হইতে শাখান্তরে বিচরণ করিয়া মূলতঃ শ্রান্তি ও নির্ব্বেদ অনুভব করেন। ইহার একটা সদুপায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে সদুপায়ের প্রধান অন্তরায় পঠিতব্য প্রবন্ধের বাহুল্য।

সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রবন্ধ-সংগ্রহের জন্য নানা লেখক লেখিকার নিকট প্রবন্ধ প্রার্থনা করেন। তাহার ফলে প্রত্যেক শাখাতে পাঠের জন্য নানা বিষয়ে উত্তম মধ্যম বহুসংখ্যক প্রবন্ধ উপস্থিত হয়। সময়াভাবে অধিকাংশ প্রবন্ধই পঠিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এবং যদি বা দু'এক জন সৌভাগ্যবান্ লেখকের ভাগ্যে প্রবন্ধপাঠের সুবিধা ঘটে, তথাপি সেই সকল প্রবন্ধ চারি শাখার মূলতঃ অধিবেশনের হট্টগোলে যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না। এইরূপে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ মাঠে মারা যাইবার উপক্রম হয়। সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এই বিষয়ের প্রতিবিধান করিবার জন্য আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সাহিত্য-সম্মিলনকে সাহিত্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান—দুই চারি শাখায় বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা যে সঙ্গত সমীচীন, এবিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নাই। এই চারি শাখার পৃথক্ পৃথক্ অধিবেশনও যে বাঞ্ছনীয়, তাহাও বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই সকল বিশেষ অধিবেশন সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দের মিলন-স্থান না হইয়া বিশেষজ্ঞের চিন্তাবিনিময় ও গবেষণা-পরিচয়ের কেন্দ্র করিলে কিরূপ হয়? এবং প্রত্যেক শাখার নির্দ্দিষ্ট সভাপতির অভিভাষণ মূলতঃ পঠিত না হইয়া সাধারণ সভায় পর পর পঠিত হইবার ব্যবস্থা করিলে কেমন হয়? যেন সমবেত সুধীবৃন্দ ইচ্ছা থাকিলে কেহই ঐ সকল অভিভাষণের রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত না হন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ প্রবন্ধের বাহুল্য-ঘটা সঙ্কুচিত করিয়া প্রত্যেক শাখার আলোচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক বা দুই জন ব্যক্তিকে সাধারণ শ্রোতার উপযোগী করিয়া স্ব স্ব বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আহ্বান করিলে ভাল হয়। শুনিয়াছি, এখন এখন একটি প্রবন্ধ শুনাইবার জন্য ইংলণ্ডের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক সর্ব্বদাই এটল্যাণ্টিক সমুদ্র পার হইয়া আমেরিকায় যান, এবং আমেরিকার বিশিষ্ট লোক ইংলণ্ডে আসেন। আমাদের বিশিষ্ট মহোদয়েরা এক জেলা হইতে অন্য জেলায় আসিতে পারিবেন না কি?

এইরূপ করিলে প্রতিবর্ষে সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ ব্যতীত প্রত্যেক শাখায় সেই শাখার সভাপতির অভিভাষণ এবং একটী কিংবা দুইটী বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সম্মিলনের গৌরবের সামগ্রী হইতে পারিবে এবং ঐ সমস্ত প্রবন্ধই সাধারণ সভায় সমবেত সকল সুধীবৃন্দের বিনোদন ও শিক্ষণের উপায়স্বরূপ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের বৈঠকে তুচ্ছ প্রশ্ন ও সমস্যার আলোচনা চলিবে। তৎসঙ্গে প্রাচীন পুঁথি মুদ্রা লিপি আলেখ্য শাসন মূর্ত্তি প্রভৃতির প্রদর্শন, জ্ঞানালোকচিত্রের সাহায্যে সরল ও সরসভাবে জ্ঞান-বিস্তার এবং সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ ও ভাববিনিময় দ্বারা সাহিত্য-সম্মিলনের এই আনন্দের মেলা শুধু হাসিখেলা ও হট্টগোলে শেষ না হইয়া সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করিবে।

আপনাদের স্মরণ হইবে যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিগত দশম অধিবেশনে সম্মিলনকে ১৯৬১ খৃঃ অব্দের ২১ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী দ্বারা বিধিসিদ্ধ বৈধতা প্রদান করিবার জন্য সেই সম্মিলনের সভাপতি মাননীয় সার

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সিদ্দিকী এবং আমাকে লইয়া একটী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই সমিতি বর্ত্তমান নিয়মাবলীর আদর্শে কতকগুলি নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিয়া সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যকরী সমিতি প্রভৃতির নিকট বিবেচনার্থ পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের অভিমত প্রাপ্ত হইলে রেজেষ্টরীকারী সমিতি আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া বোধ হয় সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিতে পারিবেন।

বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ

দশম অধিবেশনের সভাপতিরূপে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী যে আশা ও উদ্দীপনাপূর্ণ-হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার ধ্বনি নিশ্চয়ই আপনাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে এখনও ঝঙ্কৃত হইতেছে। "দেশ-মাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব। আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব। আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশ জন অন্য মায়ের সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে।" এই প্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে আমাদিগকে অভিষিক্ত হইতে তিনি উপদেশ করিয়াছিলেন, বঙ্গসাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণকল্পে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া তিনি উদ্দীপনার ভাষায় বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালী জাতির ইতর ভদ্র সকলের মনে একবার কোন ক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমার মাতৃভাষার অনুশীলনের সহিত একসূত্রে আমার নিজের তথা মহীয়ান জাতির অভ্যুদয় গ্রথিত; বঙ্গদেশের অদৃষ্ট, বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট, বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর নিহিত। যতদিন বঙ্গের অতি প্রত্যন্ত পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীর বিজয়শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতর ভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের বিশ্বসাহিত্যে অন্তর্নিবেশ অসম্ভব। যখন বসন্তরাজ বসন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারা ব্রহ্মাণ্ডটা এক ভাবে, এক উদ্দীপনায় বিভোর হইয়া উঠে, এক মনে সকলে মধুর বাণীর মূর্ত্তির পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে এক ভাবে, একই উদ্দীপনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমার জননী বঙ্গভাষার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির বিমল প্রভায় বাঙ্গালী জনস-ধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, তোমার দ্বিভুজা বঙ্গভারতী, দশভুজার মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণা। দেখিবে, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে। 'বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।'

আমরা সমস্বরে দেবভাষায় বলি—বাঢ়ম্, বাইবেলের ভাষায় বলি, Amen—আরও বলি "সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।"

কিন্তু সরস্বতী মহাশয় যাননেত্রে ভাবরাজ্যে যে মহনীয় চিত্র দর্শন করিয়াছিলেন যদি তাহাকে আকার দান করিয়া বাস্তবে পরিণত করিতে হয় তবে প্রথমেই বঙ্গভাষাকে বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করিতে হইবে—তাহা না পারিলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে সমস্ত আশা ভস্ম হইবে।

কথাটা এত গুরুতর যে, একটু বিস্তার করিয়া বলি। বঙ্গসাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিতে অনেকগুলি নিপুণ কর্ম্মঠ স্থপতির দরকার—এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এখন প্রশ্ন এই যে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা ঐরূপ স্থপতির উদ্ভব হইতেছে কি না? আমার এক পরিহাসরসিক বন্ধু বলেন যে গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশোদিত শিক্ষার ফলে কেবল দুই শ্রেণীর জীব তৈয়ারী হইতেছে—এক গোলাম, অন্য গুণ্ডা। কথাটা যে একেবারে অমূলক তাহা নহে; কিন্তু বড় ত ইহাতে কিছু অত্যুক্তি আছে। অতএব যাঁহারা আমার বন্ধুর মত চটুল নহেন, যাঁহারা গম্ভীর ভাবুক দার্শনিক-জ্ঞানী লোক, তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাউক। প্রথমতঃ আমাদের সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইনি বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর উপর এমন বিরক্ত ছিলেন যে আমাদের শিক্ষিতদিগকে ভারবাহী গর্দ্দভের সহিত তুলনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—"খরো যথা চন্দনভারবাহী।"

তার পর যিনি বিদ্বিত অধিকারে বঙ্কিমবাবুর সাহিত্য-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বলেন? তিনি আমাদিগকে চলন্ত বোটবুক ও ঘূরন্ত কলোগ্রাফ বলিয়াছেন, এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বৌদ্ধিকতা ও সজীবতার অভাবকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মুখে এই কবিতাটী বসাইয়াছেন:—

"ভয়ে ভয়ে যাই ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে মুখে পুঁথি আওড়াই।"

পূর্ব্ব ও পশ্চিম—যুক্ত বঙ্গের গৌরব কবিবর নবীনচন্দ্র সেন আত্ম-জীবনচরিতে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীকে শিশুমুণ্ড-মালিনী মহাকালী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এবং ঐ শিক্ষার ফলে অকালে কত শিশুহত্যা হইতেছে, তাহার বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার ভাব অবলম্বন করিয়া আমার এক অভিন্নহৃদয়ের বন্ধু একটী ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা আপনাদিগকে শুনাইতে চাই—

নিজ শিব পদে বলে,
শিশু মুণ্ডমালা গলে,
সংহার-রূপিণী, ঘোরা, মুখে অট্টহাস।
লোল রসনা লকে,
রুধির কলসে ঝকে,
পূতনারূপিণী বামা বঙ্গে পরকাশ।

ইহা আপনাদের নিকট কবিতার অত্যুক্তি মনে হইতে পারে। অতএব এক জন ধীর স্থির প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি শুনুন। ইনি দেশপূজ্য মারাঠা জননায়ক গোখ্‌লে। তিনি এই শিশুহত্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"The chief of the causes leading to the premature deaths of our students is over-study and the strain caused by the stiff system of frequent competitive examination in subjects which have to be mastered in a foreign language and which tax the powers of students beyond their endurance.

• • • Attempting to secure thoroughness, as it is called, the University system directly produces the unhappy result of *Killing many of the brightest students* who come within its influence • • • • The true etiology of what I call nervous or vital exhaustion and atrophy of energies must be sought in the deeper recess of the educational system. The bow is too much bent, and when it is relaxed it refuses to unbend again except under pressure and enforced order." সেক্ষপীয়র অপেক্ষা এই যে মনের অপচয়—ইহা মানসিক পঙ্গুতা—ইহা আরও মারাত্মক।

আমাদের দেশমান্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি আজীবন শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন, এবং যিনি স্বভাবসুলভ ধীরতার সহিত প্রত্যেক শব্দ ওজন করিয়া উচ্চারণ করেন, তিনি এসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন,—

"The existing system of English Education in this country has failed to produce satisfactory results. • The time for change of method has certainly arrived." আমার স্মরণ আছে, একবার কলিকাতার সেণ্টজেভিয়ার কলেজের অধ্যক্ষ Father Lafont, যাঁহার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তিনি আমাদের শিক্ষা-প্রণালীকে huge sham বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জানত এমন কয়েকটী ছাত্র আছে, যাহারা ডক্টরেট-পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, অথচ সেই সেই বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এ কথায় বোধ হয় আমরা অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে সমর্থন করিতে পারি। আমি এক জন দর্শন শাস্ত্রের এম-এর কথা জানি, যিনি কেবল নোট পড়িয়া পাশ হইয়াছেন, একখানিও দার্শনিক গ্রন্থ উল্টাইয়া দেখেন নাই! সম্প্রতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, এক জন Astronomy-সংযুক্ত গণিত বিভাগে এম এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, অথচ কোন দিন গগনবিহারী গ্রহ-

নক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দূরবীক্ষণে চক্ষুঃ-সংযোগ করেন নাই। অনেকেই শিক্ষিতদিগের পঙ্গুতা ও শিক্ষার বন্ধ্যাত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশের ডাক্তার ভাণ্ডারকর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন—"the languid interest which our graduates feel in literary pursuits in after life"। দ্বিতীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই জ্ঞানস্পৃহার অভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিজ্ঞানসমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপনা ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আজো দেখিতে পাওয়া যায় না; ফ্রেঞ্চে না, ইংরাজীতে একটী কথা আছে, ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকটে আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। এডেনবার্গ, পাশ যেসকলকার ছাত্রদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা-প্রশাখাদির উন্নতি হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের দ্বারে কাতর ভাবায় উন্নতিবিধান কিংবা যে কোন প্রকার বৃহৎ ও অধ্যবসায়-মূলক কার্য্যের সাফল্যসম্পাদনের আশা নিতান্তই দুরাশা-পরাহত।"

ডাক্তার রায়ের বহু পূর্ব্বে মনস্বী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধে" আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দেশে বিজ্ঞানশালার প্রতিষ্ঠা করিলে কি হইবে, দেশের মধ্যে এখনও বৈজ্ঞানিকতার অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। এই সকল গুরুকল্প ব্যক্তিদিগের কথার পর আমি কি বলিতে পারি? আর যদিই বা বলিতে যাই, হয় ত' কিছু কটু কঠোর বলিয়া ফেলিব। তবে আমার যাহা বক্তব্য, এক জন আইরিস্ লেখক আয়ারল্যাণ্ডের শিক্ষা-বিভ্রাটের বর্ণনায় তাহা যথাযথ বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিই—আপনারা ঐ উক্তিতে আয়ারল্যাণ্ডের স্থানে ইংলিয়া বসাইয়া লইবেন।—

"Education in Ireland encumbers the intellect, checks the fancy, debases the soul and enervates the body. It cuts off the Irishman from his tradition and by denying him a country debases his soul; it stores his mind with lumber and nonsense; it destroys his fancy by cutting him off from his traditions and enervates his body by denying him physical culture."

যে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এত দোষ, তাহার আমূল সংস্কার না হইলে আমাদের জাতির কি ভরসা আছে? যদি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে তাহার জন্য অনেকগুলি মানুষ চাই—অনেক জন অতিমানুষও চাই—মেষের দ্বারা সে কার্য্য হইবে না, মহিষের দ্বারাও হইবে না। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যাহার ফলে স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বাধীন সামাজিক প্রজন্ম হইবে; যাহাদের দেহে বল থাকিবে, মনে রুচিতা থাকিবে, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকিবে, এক কথায়, যাহারা এই মৃতকল্প দেশকে সজীব সজাগ করিতে পারিবে, দেশে নূতন শিল্প নূতন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে, নূতন সাহিত্যের নবগঙ্গা আনয়ন করিবে; নূতন বিজ্ঞানের যজ্ঞশালা রচনা করিবে, নূতন দর্শনের স্বর্ণসৌধ গড়িয়া তুলিবে। কেন বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে এইরূপ মানুষ প্রস্তুত হইতেছে না? বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই, অধ্যবসায়ের অভাব নাই, তথাপি এইরূপ হইতেছে কেন? আমাদের দেশে শিক্ষা কেন বন্ধ্যা হইতেছে, শিক্ষিত কেন পঙ্গু হইতেছে? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ, বাঙ্গালাকে শিক্ষার ভাষা গ্রহণ না করিয়া বিদেশী ভাষার দ্বারা শিক্ষা-দান। এইরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর কোথাও কখনও ছিল কি না, তাহাও জানা যায় নাই। কেবল কিছুদিনের জন্য ছিল নরযান-বিজয়ের পর নির্ম্মীড়িত ইংলণ্ড দেশে। কিন্তু ইংরেজ জাতি প্রকৃতি-সুলভ প্রত্যুৎপন্নতার সহিত নরযানকে আত্মসাৎ করিয়া নিজের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিল। এদেশে কত দিনে এই শুভ ঘটনা সংঘটিত হইবে?

আমাদের শিক্ষার্থীদিগকে cram-কারী বলিয়া কিছুদিন

করা হয়। তারা মুখস্থ করিয়া পাশ করে; বস্তু শিখে না বোঝা শিখে, ভাল শিখে না তারা শিখে; তারা গতানুগতিক—তাহাদের মৌলিকতা নাই, স্বাধীন চিন্তা, আত্মনির্ভর নাই, গবেষণায় প্রবৃত্তি নাই। তাহারা কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে, বাস্তবিবেষন করে কিন্তু তাহারা নিজের পথ কাটিয়া লইতে পারে না, জাতীয়-জীবনের প্রদীপ্ত যোবানলে সাত্ত্বিকগত ক্ষুদ্রস্বার্থ ও সুবিধা আহুতি দিতে পারে না। সবতই স্বীকার করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ইহার জন্য তাহারা দায়ী, না তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী দায়ী? আমার স্মরণ আছে যখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য উপনীত হইবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলাম, তখন ইংরাজী ভাষার ইতিহাস প্রভৃতি আয়ত্ত করিবার জন্য কি পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং অবশেষে পরাভূত হইয়া কিরূপে key ও catechismএর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। অথচ যাদের 'ভাল ছেলে' বলে, মেধাবী, পরিশ্রমী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সচ্চরিত্র—আমি তাহাদের একজন ছিলাম। অবশ্য আমার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে আপনাদের একথা বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন আমার যে বর্ত্তমান আমি, সেটা পুরাতন আমির ধ্বংসাবশেষ মাত্র—এ আমি পরীক্ষা-যন্ত্রের ধর্ম্মনিষ্পিষ্ট নিঃসার জীব। কিন্তু চিরদিন এমন ছিলাম না। তবে জানেন ত'—পড়িলে কেড়ার মূলে ভাতে ধীরায় ধায়।

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—নিজেরা ছাত্রদশায় যে সকল যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম, এখন শিশু পুত্রদের মধ্যে তাহার পুনরাবৃত্তির দেখিতেছি। আমার একটী নয় বৎসরের পুত্র আছে। সে সখ করিয়া বিনা সাহায্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা ও সীতার বনবাস পড়ে। অধ্যায় পড়িয়া যায়, নিঃশেষ না করিয়া বিরত হয় না। কিন্তু দেখিতে পাই ইংরাজি পড়িতে হইলে তাহার হৃৎকম্প হয়। দুই বৎসরের বিস্তর চেষ্টাতেও সে এখনও Fifth book সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিল না। শিক্ষা এ দেশে কত সুধের কত জ্ঞানের প্রস্রবণ হইতে পারিত, যদি না বিদেশী ভাষা-শিক্ষার বিকট ছায়া শিক্ষাঙ্গনে নিপতিত হইয়া শিশুদের হৃদয়ে ভীতি ও আতঙ্কের সঞ্চার করিত। বাঙ্গালী জাতি নাকি অঙ্কের অধম জাতি, তাই এত শিক্ষা সঙ্কটের মধ্যেও বাঙ্গালীর প্রতিভা একেবারে ম্লান হইয়া যায় নাই; এবং তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একেবারে ভোতা হইয়া যায় নাই। এই প্রণালী সত্ত্বেও যে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মনস্বী পুরুষ (বিদেশে যাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে তাঁহাদের নাম ধরিলাম না) আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাতে আশা হয় যে বাঙ্গালীকে কেহ পরাভূত করিতে পারিবে না। সার্ আশুতোষও সভায় বলিয়াছিলেন—'সুফলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এখনই একটা সঞ্জীবনী-শক্তি আছে যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না, হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসে না।' তবে এ কথা আমি বলিতে বাধ্য যে, রবীন্দ্রনাথকে যদি আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিতে হইত, তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ হইতেন কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। কিন্তু যেহেতুকা পঞ্চলবাসিনী নাকি তাঁহার হৃৎপদ্মে আপনার রক্তচরণ চিহ্নিত করিবেন পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন, সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবেশিকা অবধি পহুঁছিতে পারিলেন না। ধরণী বস্ত্রবিস্তার মোচন করিলেন, দেবতারা দুন্দুভি নিনাদ করিলেন, কিন্নর-বালারা আনন্দ পারিজাত-মালা বক্ষে লইয়া কাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, বঙ্গদেশ আর একজন মহাকবির সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত হইল। বাস্তবিক ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতে যাহারা উপেক্ষিত, অনেক সময়ে তাহাদের মনীষাই দেশকে সুযশ বিতরণ করে। সকলেই জানেন ডব্লিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় এন্ট্রান্স পাশ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ ইংরাজীতে ফেল হইয়াছিলেন। সম্প্রতি যে ২৬ বর্ষীয় বাঙ্গালী যুবক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিষয়ে

অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রথম এক্, আর্, এস্, রূপ অর্থ-টীকা ললাটে ধারণ করিয়াছেন, তিনি বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়া প্রেসিডেন্সি আফিসে কেরাণীগিরি করিতে যান। কিন্তু ইষ্ট সরস্বতীর এমনই প্রেরণা এবং প্রতিভার এমনই অপ্রতিহত গতি যে, সেই কেরাণী-যুবক অপ্রত্যাশিত ভাবে কেম্ব্রিজে নীত হইল এবং অনুকূল অবস্থার গুণে তাহার মনীষাপুষ্প বিকসিত হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালাকে যে সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার বাহন করা উচিত এবিষয়ে মতভেদ হইতে পারে ইহা আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু দেখিতেছি যে সকলে এসম্বন্ধে এক মত নহেন। সেই জন্যই এবিষয়ে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে হয়। সে যুক্তি-তর্ক নিজের কথায় না দিয়া কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যাঁহাদের যোগ্যতাসম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে না তাঁহাদের কথাতেই দিব। প্রথমতঃ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,—তাঁহার মত যোগ্য কে? তাঁহার উক্তি শুনুন।

"Except in the lowest forms, the different subjects of study have at present, all to be learnt in our schools and colleges in English, and this throws no small burden on our students. English is a very difficult language for a foreigner, especially a Bengalee, to learn, because English and Bengali differ so widely, not only in their vocabularies but also in their grammatical structures and idioms. And this difficulty is really so great that it not only overtaxes the energy of our students, but also cramps their thought.

• • The ignorance of the middle ages was not dispelled and the Revival of learning was not complete until knowledge began to be disseminated through the modern languages. Nor can we expect any revival of learning here until it is imparted not merely in its primary stage, but in the higher stages as well, through the medium of the vernaculars."

অনেক বৎসর হইল বঙ্গদর্শনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—

"যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন, অতি দূরবর্ত্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। তবে সেই ভাষাটা মোটামুটী শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট দশ বৎসর লাগে। ভাষা শিক্ষাটী অথচ কিছুই নহে, ভাষা শিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিষ শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময় যায় ও এত পরিশ্রম? তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? আহার যো কি?

• • •

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজীতে আঁক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরেজী শিখ না কেন? ইংরেজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজী মুখে শিখিতে হয়।"

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-রচয়িতা Vincent Smith একজন সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার কি অভিমত শ্রবণ করুন:—'The Indian universities suffer from the want of root. They are merely cuttings,—struck down in an uncongenial soil, and kept alive with difficulty by the constant watering of a paternal Government.

As a consequence of their extraneous origin is the necessity that all instruction has to be given in the English language. Only Indian teachers can realise what an impediment to real culture is the system of making foreign language the medium of all

instruction." আর একজন সুযোগ্য ব্যক্তির অভিমত শুনুন। ইঁহারও শিক্ষাসম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ইঁহার নাম Sir Henry Craik.

"we might surely endeavour to link intellectual training which we give most closely to their life and their tradition, and to abandon the senseless attempt to turn an oriental into a bad imitation of a western mind why should we teach them that education is impossible without acquiring the English language? • • It is not a triumph for our education—it is on the contrary, a satire upon it—when we find the sons of leading natives expressly discouraged by their parents from acquiring any knowledge of their vernacular."

কিন্তু বিদেশীর নিকট ধার করা বাণী সংগ্রহ করিতে যাই কেন? আমাদের দেশের যত বাঁহারা ভাবেন, দেশকে যাঁহারা চিনেন, যাঁহারা দেশের অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাজন, তাঁহাদের মত ও অভিমত। যদি আরও অভিমত সংগ্রহ করিয়া পুস্তীকৃত পাহাড় রচনা করা দরকার হয়, তাহাও পারি। কিন্তু তাহাতে বিরত থাকিয়া কেবল আর একটীমাত্র অভিমত উদ্ধৃত করিব। কারণ আমার বিশ্বাস এ অভিমতের পর অন্ততঃ সাহিত্য-সম্মিলনে আর দ্বিমত হইবে না। এ অভিমত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের —"বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষা শিক্ষায় অপটু। ইংরেজী ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তারা কোনোমতে এণ্ট্রেন্সের সেউড়িটা তরিয়া যায়—উপরের সিঁড়ী ভাঙিবার বেলাতেই চিৎ হইয়া পড়ে।

এমনতর দুর্গতির অনেকগুলি কারণ আছে। একে তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাঙ্গালা তার পক্ষে ইংরেজী ভাষার মত বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভাল শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজী শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়।—গরীবের ছেলের ত' হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিদেশাক্ষরীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আজ গঙ্গাবাদন করিতে হয়;—তাহা আবার হয়, না বলিয়া গোটা ইংরেজী হই-এ মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানেরা এমনতর কিস্তিমাতও করিতে পারে, তারা শেষ পর্য্যন্ত উতরাইয়া যায়—কিন্তু যমের মেরা সাধারণ মানুষের বাঙ্গলা প্রবাদটাই তাদের কাছে একটা আশা ভরসাই রাখে না, তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য। • • ভালোমত ইংরেজী শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাঙ্গালা দেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?"

আপত্তি উঠিবে যে বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক কোথা যে আমরা বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিব? উত্তরে বলিতে চাই যে প্রবেশিকা ও আই, এ, পরীক্ষায় তোমরা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ইংরেজী কেতাব পড়াও তাহার সমকক্ষ গ্রন্থ বাঙ্গালাতে এখনই প্রচুর আছে। রবীন্দ্রবাবু 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে এই আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি শুনুন—

"আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চ-শিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগ্‌ানের গাছ নয় যে, সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারী করিবে,—কিম্বা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের প্রকৃতিকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার যোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হ'বে।

বাঙ্গালায় উক্ত অঙ্কের শিক্ষাপ্রথা নাই হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় উক্ত অঙ্কের শিক্ষা প্রচলন করা।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাঙ্গালার জন্য যোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় এবং প্রবেশিকা ও এফ, এ পরীক্ষায় যাহাতে ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান বাঙ্গালার মারফৎ নির্দ্দিষ্ট হয় তজ্জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা বোধ হয় আপনাদের অবিদিত নাই। আপনাদের স্মরণ হইতে পারে যে, ১৩০১ বঙ্গাব্দে যখন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন, সেই সময় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া এই বিষয়ের উপায়বিধানজন্য একটী কমিটী গঠিত হয়। ঐ কমিটীর আমিও একজন সভ্য ছিলাম। ঐ কমিটী অনেক আলোচনার পর নিম্নলিখিত মন্তব্যদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন :—

I. That the University be moved to adopt a regulation to the effect that at the F. A. Examination and in the A course of the B. A. Examination where a classical language is taken as the third subject, one paper should be set containing—(i) passages in English for translation into one of the vernaculars of India, recognised by the Senate, and—ii) a subject for original composition in one of the said vernaculars, text-books being recommended as models of style.

II. That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics at the Entrance Examination the answer may be given in any of the living languages recognised by the Senate."

কমিটীর মন্তব্য পরিষদ্‌কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার পর পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রে দত্ত মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছিলেন।

"In accordance with the resolution of the Parishad just referred to, I beg, under para. 12 of the Bye-laws relating to the Syndicate, to propose for the consideration of the Syndicate the following regulation :—

That at the F. A. Examination and at the B. A. Examination in the A course where a classical language is taken as the third subject, a paper be set containing (i) passages in English for translation into one of the vernaculars of India recognised by the Senate, (ii) a subject of original composition in one of the said vernaculars, text-books being recommended as models of style.

And I beg further to request that the Vice-Chancellor and the Syndicate will be pleased to consider how far under present circumstances the second recommendation referred to in the preceding paragraph may be given effect to."

বলা বাহুল্য যে এই প্রস্তাব সফল হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা ঐ সময়ে কর্ত্তা ছিলেন, দ্বিতীয় প্রস্তাব তাঁহারা বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রস্তাবসম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদের পর মহামান্য সেনেট-সভাগণ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী এইরূপ স্থির করেন যে, এফ এ ও বিএ পরীক্ষার্থীদিগকে বাঙ্গালা রচনাসম্বন্ধে বিকল্প দেওয়া হউক এবং সুযোগ্য পরীক্ষার্থীদিগকে একখানা করিয়া সার্টিফিকেট

দেওয়া হউক।* ইহার কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবর্জনা পরিষ্কার করিবার জন্য লর্ড কর্জন সম্মার্জনী হস্তে আসরে অবতীর্ণ হন। তিনি যে ইউনিভার্সিটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের ১৯০২ সালে প্রকাশিত রিপোর্টের ৯৪-৯৫, প্যারায় দেশীয় ভাষাসমূহের প্রতি কিছু কৃপা-কটাক্ষ দৃষ্ট হইয়াছিল। "The vernacular languages should be introduced in combination with English as a subject for the M. A. Examination. The M. A. Examination in the vernacular should be of such a character as to ensure a thorough scholarly study of the subject. The encouragement of such study by graduates who have completed their general course should be of great advantage for the cultivation and development of vernacular languages." পুনশ্চ :—We hope that the inclusion of vernacular languages in the M. A. course will give an impetus to their scholarly study, and • • • we consider that the establishment of professorships in the vernacular languages is an object to which university funds may properly be devoted. We also think that vernacular composition should be made compulsory in every stage of the B. A. course, although there need be no teaching on the subject. Further encouragement might be given by the offer of prizes for literary and scientific books of merit in the vernacular languages." ইহার পর ১৯০৪ সালের এক গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ১২ বৎসরের কমবয়স্ক শিক্ষার্থীদিগকে ইংরাজী দ্বারা শিক্ষা দেওয়া অনুচিত এবং ইহাও বলা হয় যে প্রবেশিকা স্কুলের ছাত্রদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষা হইতে কোনরূপে বঞ্চিত করা অনুচিত। বিস্ময়ের কথা নহে কি? এই স্বতঃসিদ্ধ কথাও গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যের দ্বারা প্রচারিত করিতে হইল। "আমাদের দেশের" অনেকই বিশেষত্ব, কিন্তু বোধ হয় সকলের চেয়ে বিশিষ্ট বিশেষত্ব ইহাই।

ইহার পর প্রধানতঃ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার একটু বিশিষ্ট স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীর এক কোণায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন প্রবেশিকা, এফ্-এ, বি-এ পরীক্ষার্থী সকল বাঙ্গালী ছাত্রকে বাঙ্গালা-রচনাবিষয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়। এবং রচনার রীতি শিখাইবার জন্য models of style রূপে কয়েকখানি পুস্তকের নাম নির্দ্দেশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বাঙ্গালা কবিতার কোনও বই পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে না। এমন কি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যও কোন পরীক্ষার বা অধ্যয়নের বিষয় হয় নাই। এসম্বন্ধে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। জানি লোহার বাসরঘরে ছুঁচ হইয়া ঢোকাও শক্ত; কিন্তু ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট নহি। এ যেন বড় মানুষের ভোজের টেবিলে দরিদ্র আত্মীয়ের বিস্তৃত কটাসন। সেইজন্য আপনাদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় 'বাঙ্গালার কথায়' দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"আমি শুনিয়াছি, উদ্দেশ্য—শুধু বাঙ্গালা লিখিবার রীতি শিখান হইবে, আর কিছু হইবে না। একথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষার যে অশেষ সম্পদ, তাহাতে কি বাঙ্গালী ছাত্রের কোন আবশ্যক নাই? বাঙ্গালা ভাষার যে অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যের যে একটা অতুল প্রাণ আছে, সে কথা ভুলিয়া

* An optional examination be held in original composition in Bengali and other vernaculars for the F. A. and B. A. candidates, proficiency in it entitling candidates to a special certificate. (Minutes of the Calcutta University 1895—96 p. p. 63—64 and 1896—97 p. p. 88—90 & p. 38—39.

শিক্ষা কি আমাদের শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে? আমার বাঙ্গালা ভাষা যে রাজরাণী, আপনার গৌরবে সে যে গরবিণী। এই যে তোমরা বল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রবেশ করিয়াছে, মনে রাখিয়ো, তাহার যে নিজস্ব গৌরব, সে গৌরবে তাহাকে প্রবেশ করিতে দাও নাই, সাম্রাজ্ঞী যেমন তোমাদের এই কারখানার মধ্যে একটা কোণায় তাহাকে বসিবার একটু ঠাঁই দিয়াছ মাত্র।"

আমি জানি কেহ কেহ অল্পেই সন্তুষ্ট। তাঁহারা বলেন "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল। অল্পেই তুষ্ট হও দেশীয় তৃষ্ণা ত্যাগ কর।" একথা কিন্তু এদেশের শিক্ষা দীক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা কখনই অল্পে সন্তুষ্ট নই, অল্পে সন্তুষ্ট হইব না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন—"তৃষৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" আমরা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া এখনও বলি "যাবিত বাঞ্ছা।" সেইজন্য দেখিতে পাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলন অল্পে তুষ্ট না হইয়া অধিক পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণীতে দেখিলাম প্রায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি গৃহীত হইয়াছিল। "বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রসারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ধন্যবাদ জানাইতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিশ্বাস,—বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের যথাসম্ভব আরও প্রসার বৃদ্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি আপাততঃ সত্বর অবলম্বন করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা-সাহিত্য পঠন-পাঠনের এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে।

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন।

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষাবিজ্ঞান এম এ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত-ভাষাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সুখের বিষয় এসম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের সকরুণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। বিগত আগষ্ট মাসে শিমলা শৈলে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষগণের যে সম্মিলন হয়, সেই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে আমাদের বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড মহোদয় বলিয়াছেন :—

Lastly I come to the subject of the media of instruction. As you all know the vernaculars and English are both the media of instruction in our schools and it is sometimes overlooked to what a large extent the vernacular figures at the present time as a medium of instruction. But it is certainly worth our while to examine from the educational stand-point what the relative position of these media should be to each other, having in view the one object viz, that the pupil should derive the greatest possible advantage from his schooling. . . . I recognise the value of large and generous ideals in the sphere of education, but we must never forget the need from time to time of examining and making sure of our foundations. And what more important, what more practical task in this connection could be laid upon you than

the duty of devising means whereby students may be enabled to obtain a better grasp of the subjects which they are taught and to complete their secondary course with more competent knowledge than at present ?

বক্তৃতাটের এই সকল বাণীতে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতিকে লইয়া একটী শাখা-সমিতি গঠিত করেন। আমিও ঐ শাখা-সমিতির একজন সভ্য আছি। শাখা-সমিতির আলোচ্য বিষয় এই ছিল যে "উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় অথচ বঙ্গভাষায় উচ্চ-শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা যাহাতে রীতিমত হয় এবং ক্রমে ক্রমে যাহাতে বঙ্গভাষা রীতিমত পুষ্টিলাভ করিয়া পরিণামে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা-প্রদানের উপযোগী হইতে পারে, ইহার জন্য আমাদের বর্ত্তমানে কি কর্ত্তব্য ?" শাখা-সমিতি এই আলোচনার পর যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম :—

(১) শিক্ষাবিষয়ে বঙ্গভাষার উন্নতি ইংরেজী শিক্ষার ব্যাঘাতজনক হইতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে উচ্চ-শিক্ষা ইংরাজীতে লাভ করা যাইতেছে ও যাইতে পারে, সে সকল শিক্ষাসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বাধা হইতে পারে—এ আশঙ্কা অমূলক।

(২) কি নিম্ন, কি উচ্চ সকল প্রকার শিক্ষাই যতদূর সাধ্য শিক্ষার্থীর মাতৃ-ভাষাতে দেওয়া উচিত। যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্দেশ করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরেজী সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গ্রন্থের কোন অভাব নাই এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর ভাষা-বিভ্রাটেরও আর কোন আশঙ্কা নাই। মধ্য (Intermediate) পরীক্ষাতেও অধিকাংশ বিষয়েরই আবশ্যক গ্রন্থের অভাব নাই। আর যে যে বিষয়ের গ্রন্থের অভাব আছে, তত্তদ্‌বিষয়ের গ্রন্থের অভাব অতি সহজেই পূরণ হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় এবং সে বাধা পূর্ণ হইবার কোনও বাধা দেখা যায় না যে, বি এ, এম্ এ পরীক্ষার বিষয়ও এক দিন বাঙ্গালা ভাষাতে বাঙ্গালী শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। দুই বৎসর পরে হউক, আর ৫ বৎসর পরে হউক, বাঙ্গালা ভাষাতেই সমস্ত উচ্চশিক্ষার বিষয় অধীত হইবে—এই ঘোষণা কর্ত্তৃপক্ষ-কর্ত্তৃক একবার প্রচারিত হইলে অল্প দিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্‌গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে রচিত হইবে।

৩। আর একটী বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা কেবল রচনা-শিক্ষার জন্য এক্ষণে পঠিত হয়। সে নিয়মের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য উভয় বিষয়ই পঠিত হয় ও উভয় বিষয়েই পরীক্ষা হয়, ইহা প্রয়োজনীয়।

৪। এম্ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গ-ভাষাতত্ত্ব এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা উচ্চ-শিক্ষাবিস্তারোপযোগী বক্তৃতা বঙ্গভাষায় প্রদানের প্রথা—যাহাতে আরও অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এসম্পর্কে এই সাহিত্য-সম্মিলনের কিছু কর্ত্তব্য আছে কি না, সমবেত সুধীবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত উপাধি-বিতরণ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস্ চ্যান্সলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত research বা অনুসন্ধান কার্য্য যে বাঙ্গালাতেই হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে কয়েকটী যুক্তিযুক্ত কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। সে কথাগুলি আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

With the field of research daily expanding, the question of its vehicle must come to the fore. No country has done real research work on a large scale and with lasting results that

has been handicapped by the language difficulty, as we have been. Though a knowledge of other languages, preferably modern, is essential for research, and though results of research in many subjects, may for the time being have to be published in English, the place of vernaculars regard to many other subjects, must be clearly and at once recognised. We have begun recognition of the vernacular at one end and have done well so far. Unless however, we recognise and encourage it at the other end, neither it nor research will really thrive. This is a larger bid, in some sense, on behalf of our vernaculars than has hitherto been made; but I hope it is not unreasonable, nor untimely.

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর আমাদের সগর্ব্ব গর্ব্ব যোগাড়ংসে মহোদয় বিশ্ব মুখে কয়েকটি আশার বাণী শুনাইয়াছেন।

"The first fundamental fact that stares one in the face is that in India all higher education is imparted in a language which is not the student's mother tongue. I am not going to enter into the well worn controversy as to whether University teaching should be in the vernacular or in English; so far as that goes, I take things as I find them; and, assuming that the medium for imparting Western learning must be the English language. I made early enquiries as to what steps were taken to give the Indian boy a sound working knowledge of the English tongue. The general tenour of the replies which I received to my enquiries was that English is the worst taught subject in our secondary schools. I have found, indeed, a disconcerting consensus of opinion to this effect and I also found this general view endorsed by the Dacca University Committee, from whose report I learned that though 'the young undergraduate must be treated as a University student, and not as a school boy, yet he is hardly ripe for a course of true University lectures, nor in many cases is his knowledge of English sufficient to enable him to profit by them."

শুনিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধন জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, আমাদের বিগত সম্মিলনের সভাপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যাহার একজন প্রতাপী সভ্য—সেই কমিশন বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কমিশনের সদস্যদিগের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তাঁহাদের শিরে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। আমরা তাঁহাদের আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। কালিদাসের সময়ে আশা-বন্ধ কুসুমসদৃশ সদাঃপাতী প্রণয়ী হৃদয়কে বিপ্রয়োগে নিরুদ্ধ রাখিত। এখন ইহা দুঃশিক্ষা-পীড়িত সাত কোটী নরনারীর অবসন্ন হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিবে।

শিক্ষালয় ও শিক্ষা-প্রণালী

কিন্তু শুধু বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিলেও চলিবে না—শিক্ষালয়গুলির আবহাওয়া বদলাইতে হইবে, শিক্ষা-প্রণালীর আমূল সংস্কার করিতে হইবে। এখনকার স্কুল-কলেজ-নামধেয় বিদ্যাবিপণিগুলিকে বিদ্যামন্দিরে—অন্ততঃ বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে, এবং তাহার অঙ্গনে প্রাচীন ভারতের গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধের বিষ্ণু ধারায় প্রবাহিত করিতে হইবে, এবং শান্ত-তপোবনের মুক্ত আকাশ বিলম্বিত করিতে হইবে। দেখুন, অশ্রদ্ধার দানে দাতা ও গৃহীতা—উভয়েই পতিত হয়। আমাদের ছাত্রেরা যে ইহাদের প্রদত্ত বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তাহার অন্যতম কারণ শিক্ষকের প্রতিকূল ভাব। পূর্ব্বকালে শিক্ষক সেবক ছিলেন—বিদ্যাকে সেবার ভাবে শ্রদ্ধার সহিত সম্ভ্রমের সহিত সংযমের সহিত ভয়ের সহিত দান করিতেন। 'শ্রদ্ধয়া দেয়ং - হ্রিয়া দেয়ং ভিয়া দেয়ং সংবিদা দেয়ং অশ্রদ্ধয়া ন দেয়ম্'। সেই জন্য বিদ্যা বিনিতা হইয়া ছাত্রকে গরীয়ান করিত।

আচার্য্যাদ্ধৈব বিদিতা বিদ্যা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি।

কিন্তু এখন? কর্ণধার যেমন অবজ্ঞার সহিত ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দেয়, অনেক স্থলে বিদেশী অধ্যাপক তেমনি অবজ্ঞায় ছাত্রদিগকে বিদ্যার ক্ষুদ বিতরণ করেন। আমরা একজন অধ্যাপকের নিকট পড়িতাম। তিনি প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন—কত বিদ্যা তাঁহার বিশোদরে নিহিত ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু তিনি কোন দিন আমাদের মুখের দিকে তাকান নাই—তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা স্বীয় বুটের উপর সংলগ্ন থাকিত—কদাচিৎ কেতাবের উপর পড়িত—কিন্তু কোন্ কারণে কোন দিন আমাদের উপর পড়ে নাই। আমরা সে সময়ে রঘুবংশে বাল্মীকির তপোবন হইতে আনীতা সীতার বর্ণনা পড়িতাম—কাষায়-পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা, এবং মনে মনে তাঁহার সহিত আমাদের অধ্যাপকের তুলনা করিতাম। ইনি যদিও 'কাষায়-পরিবীত' ছিলেন না, কিন্তু সর্ব্বদাই 'স্বপদার্পিতচক্ষু' থাকিতেন।

এই শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধার দান লইয়া একবার দেবলোকে তুমুল কলহ হইয়াছিল। শ্রোত্রিয়ের অশ্রদ্ধার দান বড়, না পতিতের শ্রদ্ধার দান বড়। উভয় পক্ষের বক্তৃতার পর ভোট লওয়া হইল। দেখা গেল, দুই দিকের ভোট সংখ্যা সমান। তখন দেবলোকের সভাপতি প্রজাপতি ঠাকুর উঠিয়া বলিলেন, "যা কুরুষে বিষয়ং সমম্" অসমান জিনিষকে সমান করিও না—কারণ, "শ্রদ্ধাপূতং যদাত্ত তত্তম-শ্রদ্ধেয়তরং।" পতিতের শ্রদ্ধাপূত দান শ্রোত্রিয়ের অশ্রদ্ধার দেওয়া হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। আমরাও এই কথা বলি। আমরা দিগ্‌গজ পণ্ডিতের অশ্রদ্ধার বিদ্যা-বিতরণ চাই না, অপণ্ডিতের শ্রদ্ধাপূত দানই আমাদের শিরোধার্য্য।

আরও দেখুন, প্রাচীনকালে গুরু চাহিতেন যে, যেমন দিক্ দিগন্ত হইতে নদনদী আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ দশ দিক্ হইতে ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহার আশ্রমে মিলিত হউক।

"যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরং
তথা মাং ব্রহ্মচারিণঃ ধাতরায় সর্ব্বতঃ"

আমরা কিন্তু বিদেশী ভাষার এবং বিকট বেতনের লোভের প্রাচীর রচনা করিয়া শত প্রাকার-বেষ্টনীর মধ্যে বিদ্যা-বধূকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি। যদি কোন দিগ্‌বিজয়ী বীর ঐ সকল আয়নী পুরী ভেদ করিয়া অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সে হয় ত বিদ্যার চর্কিত চর্ব্বণ কোন দিন প্রত্যক্ষ করিবে।

এ দেশে যদি বিদ্যার প্রকৃত আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হয়, এবং সেই সোনায় অলঙ্কার রচনা করিয়া বঙ্গবাণীর বর অঙ্গের শোভা-বর্দ্ধন করিতে হয়, তবে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর হাব-ভাব আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ইয়ুরোপের বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হীন অনুকৃতি না করিয়া ইহাকে ভারতীয় বিদ্যা, ভারতীয় ভাব, ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস দর্শন-চর্চ্চার কেন্দ্রস্থান করিতে হইবে। ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, আমরা পাশ্চাত্য culture হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত করিব। আমরা ইয়ুরোপের সাহিত্য, দর্শন, কলা-বিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভূতপরিমাণে শিক্ষা ও গ্রহণ করিব। কিন্তু পূর্ব্বকালে যেমন করিয়া গ্রীক্, হূণ, শক, পহ্লব প্রভৃতিকে আপনাদিগের মধ্যে হজম করিয়াছিলাম, সেইরূপ পাশ্চাত্য বিদ্যা ও জ্ঞানকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিব। তাহারা আমাদের 'ওদন' হইবে, 'উপসেচন' হইবে, তাহারা এখনকার মত আমাদিগকে অভিভূত পরাভূত করিতে পারিবে না। ঐ সকল বিদ্যা ও কলাকে আমাদের ভারতী-সরস্বতীর সপত্নী হইতে দিব না, গুরুদাসী করিয়া রাখিব।

এ সম্বন্ধে কয়েক জন অভিজ্ঞ ইংরাজের উক্তি ও উপদেশ আপনাদিগকে শুনাইতে চাই। আপনারা দেখিবেন যে, আমরা যাহা অবাধে উপেক্ষা করি, দূরদৃষ্টিশীল এই সকল বিদেশীরেরা তাহাকে কি চক্ষে দেখে। প্রথম সার জর্জ বার্ডউড্-এর কথা শুনুন। তিনি অনেক দিন বোম্বাই প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার সহিত সুপরিচিত ছিলেন।

"I hail with delight any symptom of the spontaneous revival of the indigenous and tra-

ditional, literary and artistic, and philosophical and religious life of India—India of the Hindus. The first thing to do is to take the whole of your higher education more into your own hands. • • Science is almost the exclusive creation of modern Europe. It is to modern Europe, therefore, that you must directly look for your scientific culture, and in the present economic condition of India you cannot have too much pure and applied (technical) scientific instruction in all your schools, primary, secondary and higher. But for your literary and artistic and your philosophical and religious, in a word, your spiritual culture, you already possess your own—the indigenous growth of 4000 years of Aryan supremacy in India; and you must never surrender it but to the utmost of your ability and power, strengthen it and extend its influence."

ভূতের মুখেও রামনাম শুনিতে পারা যায়, এই নীতি অবলম্বন করিয়া বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড সিডেনহাম—যিনি সম্প্রতি ইজ-ভারতীয় সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের বিদেহ-মুক্তির ব্যবস্থা করিতেছেন—তাঁহার একটা উক্তি আপনাদিগকে শুনাইব।—

"We cannot, by education transform the intellect of an ancient people or reconstruct their tastes and opinions in exact accordance with foreign models. Even if such proceedings were practicable, it would be eminently undesirable, because a process of artificial conversion, which takes no account of inherent genius and aptitude, is more likely to injure than to elevate a native population."

এই উক্তির মধ্যে দুইটী খুব দরকারী শব্দ আছে—"artificial conversion"। আমাদের ছাত্রসমাজের যেটা বিশিষ্ট ব্যাধি—বিদ্যা-অজীর্ণ (mental dyspepsia) তাহার নিদান ঐখানে। বহুসিদ্ধ ভোজন দ্বারা একটা সমগ্র জাতিকে কখনও পীন ও পুষ্ট দাঁড়া যায় না।

আর এক জন অভিজ্ঞ ইংরেজের কথা শুনাইব—ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ। অন্য প্রসঙ্গে যাঁহার কথা একবার বলিয়াছি, তাঁহার কথাগুলি অতি সারগর্ভ এবং আমাদের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কেন দেশের হৃদয়ে শিকড় পাতিয়া সজীব মহীরুহে পরিণত হইতেছে না, তাহার কারণ আমরা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মহোদয়ের কথার মধ্যে পাইয়াছি। গাছের ডাল কাটিয়া যদি উষর ভূমিতে প্রোথিত কর, তবে রাজকীয় কলমের দ্বারাও তাহার কিছু বিকাশ হইবে কি?

"When an Indian student is bidden to study Philosophy he should not be forced to try and accommodate his mind to the unfamiliar forms of European speculation, but should be encouraged to work on the lines laid down by the great thinkers of his own country, who may justly claim equality with Plato, Aristotle and Kant.

The lectures and examinations in Philosophy for the student of an Indian University should be primarily on Indian Ethics and Metaphysics, the European systems being taught only for the sake of contrast and illustration. So far as I know, the courses prescribed by the Indian Universities are not on these lines. • • • • • • History too, should be treated in the same way, and be approached from the Eastern, not the Western side. This change also would impose no small strain on the present staff, and require extensive alterations in the prescribed books and in the whole spirit of the teaching. It is useless to ask an Indian University to reform itself, because it does not possess the power. Some day perhaps, the man in power will arise, who is not hidebound by the University traditions of his youth, who will perceive that an Indian University deserving of the name must devote itself to the development of Indian thought and

learning, and who will care enough for true higher education to establish *a real University in India.*"

আমরা ঐরূপ শক্তিমান ব্যক্তিপুরুষের আগমন পথ চাহিয়া আছি—যাঁহার আগমনে ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং যিনি ভারতবাসীর স্মৃতিত ভাবধারা এবং শক্তিত চিন্তাস্রোতকে আবার গতিমান করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিগত উপাধি-বিতরণ উপলক্ষে রেক্টর মহোদয় লর্ড রোণাল্ডসে ইউনিভার্সিটী কর্তৃক ভারতীয় দর্শনের বয়কট্ প্রসঙ্গে এরূপ কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, যাহাতে আমাদের হৃদয়ে কিছু আশার সঞ্চার হইয়াছে।

"Now let me touch on only one other feature which caused the some surprise. I have made some attempt when visiting the colleges of Bengal to ascertain which subjects are the most popular with the students, The result of such limited enquiries as I have been able to make seem to show that philosophy takes a high place in general favour. I am not surprised at that, for the genius of India has always lain in the direction of abstract speculation. What did surprise me was to learn that up to the B. A. degree Indian philosophy finds no place in the curriculum. It is Western philosophy only that is taught. And it is only those who proceed with their studies beyond the B. A. degree who receive at the hands of their University a draught from those springs of profound philosophic thought which have welled up in such rich measure from the intellectual soil of their own country. Frankly, that strikes me as a stupendous anomaly . . . . .

For him the study of the systems would surely be a task of love and burning interest—a study of things congenial to his national genius. Yet he may leave his own University after taking a course of philosophy as one of his subjects (and indeed if he pursues his studies no further than the B. A. degree will do so, without so much as hearing of these things That an Indian student should pass through a course of philosophy at an Indian University without even hearing mention of shall I say Sankara the thinker who perhaps has carried idealism farther than any other thinker of any other age or country or of the subtleties of the Nyaya system which has been handed down through immemorial ages and is to-day the pride and glory of the Tols of Navadwip does indeed appear to be a profound anomaly. I should have expected to find the deep thought of India, which has sprung from the genius of the people themselves, being discussed and taught as the *normal course* in an Indian University; and the speculations and systems of other peoples from other lands introduced to the students at a later stage after he has obtained a comprehensive view of the philosophic wisdom of his own country."

লর্ড রোণাল্ডসে যাহাকে stupendous anomaly বলিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বিরাট বেখাপ্পাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপুরুষদের চক্ষে কস্মিন্ কালে পড়ে নাই। একেই বলে চক্ষু থাকিতে অন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর ও রেক্টর মহোদয়ের উক্তিতে উৎসাহিত হইয়া কেহ কেহ আশা করিতেছেন যে, হয় ত এবার একটা কিছু সদুপায় হইবে। এই সকল উক্তি লক্ষ্য করিয়া ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলর মহোদয় সেদিন কলিকাতায় এক সভায় বলিয়াছিলেন যে, ঐদিন বোধ হয় অনুপবর্ত্তী, যে দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ভাবে ভাবিত হইবে, এবং জাতীয় সৌরভে ভাসিত হইবে। বিধাতা সেই শুভ দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের কয়েকটী কর্ত্তব্য আছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিগত অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে—"বঙ্গের যে অশিক্ষিত জনরাশি, তাহাদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুণ্ঠোচ্চারে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, তাহা যতদিন না করিতে পারিব ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।" এরূপ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষার বিবাদ মিটাইতে হইবে। আমরা "কোকিলকলালাপবাচাল যে মলয়চূলানিল্ সে উল্লসল্লীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে" ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এরূপ বাঙ্গালা চাই না—"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিয়া বেনারসের জন্য বুক্ করিলাম, ফাষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ রেজার্ভ ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সর্টকাট দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল"—এইরূপ ইঙ্গ-বঙ্গীয় ভাষাও আমরা চাই না। এবং "মোরা হলাম পল্লিবাসী, সারাখণ্ড ঘাওয়া আসা করি লেদেচি, নুন না থাকল নুন চেয়ে আনচি, তেলপলাতা তেলপলাতাই আন্‌লাম,ছেলেডা কান্তি নাগ্‌লো গুড় চেয়ে দেলাম;—বসিলার বাড়ী সাত পুরুষ খেয়ে মোরা আর ওনাদের খবর খাকি নে।"—সাহিত্যের জন্য এইরূপ গ্রাম্যভাষাও চাই না। আমরা চাই এমন ভাষা, যাহা সাধু হইবে অথচ সরল হইবে, চলিত হইবে অথচ ইতর হইবে না। এই মধ্যপথ অবলম্বন করিলে কিরূপ হয়? এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমানে আমাদিগকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ রাখা ভাল। "দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে, অথচ সভা সভ্য ইতরে কথা নয়, যে সকল কথা ভদ্রলোকের কাছে বলিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে।" আর একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে এই ধরণের কথাই বলিয়াছিলেন। "সাহিত্যের ভাষা যেন কথোপকথনের ভাষা হইতে এমন দূরে সরিয়া না পড়ে যে সাহিত্যের সঙ্গে কথোপকথনের সম্পর্ক লোপ পায়। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে কথোপকথনের ভাষার যত নৈকট্য থাকে, যত ঘনিষ্ঠতা থাকে ততই ভাল, দুইএর অন্তর যত অধিক হয় ততই মন্দ। বিচ্ছেদ হইলে কেহ কাহারও উপকার করিতে পারে না। একই ভাষা ক্রমে দুইটি পৃথক্ ভাষা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহাতে কেবল যে ভাষার অনিষ্ট তাহা নহে, সমাজেরও বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কা হয়।" ইন্দ্রনাথ বাবুর শেষ কথাটা মনে রাখিবার কথা। শিক্ষা ও সাহিত্যকে যদি লোকায়ত্ত করিতে হয়, তবে লিখিত ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে একটা পরদার প্রাচীর সৃষ্টি করিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাকল্ সাহেব অনেক দিন হইল আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথার উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—"মহামতি বাকল্ ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণ দেশের শিক্ষাবিস্তার তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণদেশে সর্ব্ববিদ্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ এই যে জার্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া এমন এক "পণ্ডিতী" ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা কেবল সঙ্কীর্ণ 'গণ্ডীর' মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে সমস্ত উচ্চভাব সমাজের নিম্নতম স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে একরূপ একটি অনতিক্রম্য প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিষয়ক সাধারণের বোধগম্য অনেক সরল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও মূলমর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য আমাদের অত্যধিক প্রবল।"

সঙ্গে সঙ্গে টোলের প্রচলিত সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষার বিস্তার ও মিলন করিতে হইবে। সংস্কৃত-শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী যে নবীন জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিবেন এবং গরীয়সী বঙ্গবাণীকে তাঁহাদের বিদ্যাভ্যা ভাবিয়া বিমুখ ভাব অবলম্বন

করিবেন, ইহা নিতান্ত ছেলের কথা। আমরা জানি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সেদিনও বঙ্গভাষা যে ভাষাপদের বাচ্য নহে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য নব্য ন্যায়ের পাঁয়তারা করিয়াছেন। কিন্তু এখন পণ্ডিতও বিরল নহেন, যিনি সংস্কৃত-ভারতীর সহিত মাতৃভাষাও পূজা করেন। আমরা চাই যে, ছেলের সংস্কৃত-বিদ্যার সঙ্গে বাঙ্গালার সাহায্যে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছু কিছু পড়ান হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের গদ্য পদ্যের অনুশীলনায় অতিরিক্ত হন। সংস্কৃতই তাঁহাদের ভাষা নিধি থাকুক, কিন্তু তাঁহারা যেন মেশোমাতৃকার সেবা হইতে একবারে বঞ্চিত না হন।

পরিভাষা-সঙ্কলন

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদিগকে নূতন শব্দ গড়িতে হইবে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্মিলন হইতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে কতক চেষ্টা ও আয়োজন হইয়াছে। সেই আয়োজন এখন সম্পূর্ণ করিবার সময় আসিয়াছে। দর্শনের পরিভাষা-সঙ্কলন সম্বন্ধে আমি বর্দ্ধমান-সম্মিলনে যাহা বলিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে আপনাদের প্রণিধান প্রার্থনা করিতেছি। "যতদিন না বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য দর্শনের পঠন পাঠন সাধিত হইবে, ততদিন প্রকৃত দার্শনিক পরিভাষা-সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সজীব দর্শন-চর্চ্চা দেশমধ্যে প্রচলিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন পরিভাষার প্রয়োগ করিবেন। সেই সকলের মধ্যে যাহা যোগ্যতম, তাহাই টিঁকিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বহু আয়াস ও সময় ব্যয় করিয়া সংস্কৃত দর্শন সাহিত্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের সূচী সঙ্কলন করিতে হইবে। ইহা একের সাধ্য নহে, সমবেত চেষ্টা এবং যথেষ্ট সময়ব্যয় ভিন্ন এ কার্য্যে সফলতা হইবে না।"

দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও সেই কথা বক্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, ইংরাজী শিক্ষিতেরা যখন প্রথম বাঙ্গালা লিখিতে সুরু করিলেন তখন তাঁহারা সংস্কৃত দর্শনে বিজ্ঞানে, কাব্যে, অলঙ্কারে, নীতি শাস্ত্রে, কলা-শাস্ত্রে যে শব্দসম্পদ আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং তাহার সাহায্য না লইয়া মনগড়া কিম্ভূত কিমাকার অনেকগুলি শব্দ রচনা করিলেন। ঐ সকল শব্দ বাঙ্গালীর মুখেও নাই এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই। এবং ঐ সব শব্দ-কষ্ট-কল্পিত বাক্যই এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিয়া গিয়াছে। তবে টাকা থাকিতে ধার করা যেমন আহাম্মকী এও সেইরূপ আহাম্মকী—কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার উপায় নাই। এখন আমরা যে সকল পরিভাষা রচনা করিব তৎসম্বন্ধে যেন বাঙ্গালা ভাষার জাতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখি * এবং সংস্কৃত সাহিত্যের খনির মধ্যে যে সকল শব্দ-মণি প্রচ্ছন্ন আছে তাহার সন্ধান লই।

যশোলিপ্সা-সংযম

এখনও দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে নূতন আবিষ্কার নূতন গবেষণার ফল ইংরাজী ভাষার সাহায্যে বিবৃত ও প্রচারিত করিলে শীঘ্র যশস্বী হওয়া যায়। এই ইংরাজীর ধারে যশের লোভ আমাদের সংবরণ করিতে হইবে। দেখুন, আমাদের মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম জীবনে ইংরাজীতে রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল রচনা আজ কোথায়? কোন্ বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। আমাদের যে কিছু প্রতিভা, যাহা কিছু আলোচন, অন্বেষণ, আবিষ্কার সমস্তই বঙ্গবাণীর চরণ সরোজে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে। এ সম্বন্ধে গত অধিবেশনে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ বলিয়াছিলেন।—"কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশঃ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গালার সম্পত্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, দেশের ধন সমস্ত দেশকে বঞ্চিত করিয়া

* শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর রাজসাহীতে পঠিত অভিভাষণ।

বিদেশে বিলাইয়া দিব না, এমন করিয়া মনের উপচয় করিব, বৃদ্ধি করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃ-ভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত রত্নরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও কদাচ অল্পপ্রাপ্ত হইবে না।"

আমরা চাই ন. পীতাম্বরের মত, চিন্তার মত, বিষবৃক্ষের মত, আনন্দমঠের মত, কাব্য নাটক বাঙ্গালা হইতে ভাষান্তরিত হইবে। আমরা আরও চাই যে, আমাদের জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রভৃতি বিশ্ববিজয়ী মনীষিগণ তাঁহাদের মৌলিক চিন্তা মৌলিক গবেষণা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করিবেন, যেন বিদেশীয়েরা মণুলোলুপভৃঙ্গের মত ঐ সকল অমূল্য রত্নের আহরণের জন্য যাবা হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উপোবনে সবিংহতে উপস্থ হয়।

উপসংহার

বাঙ্গালী জাতির এখন দুর্দশার দিন গিয়াছে, যখন বাঙ্গালা দেশনায়কদিগকে যাবা হইয়া বঙ্গভাষার দ্রোহ করিতে হইত। আমি এক জনের কথা জানি, যিনি বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান ছিলেন অথচ ইংরেজসমাজে পসারের জন্য তাঁহাকে বলিতে হইত যে, তিনি বাঙ্গালা জানেন না। কি শোচনীয় অবস্থা! অবশ্য যে সকল পাপগ্রহ শ্বেতাঙ্গ বিধাতার ভৌগোলিক ভ্রান্তির ফলে আমাদের এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—

আমরা বাংলা লিখছি বুলি, আমরা লিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি বেয়ারা, আর মুটেদের ডাকি কুলি—

যাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সদবার একাদশীতে নিমচাঁদ অনেক দিন হইল বলিয়া গিয়াছেন—I read English, write English, talk in English, speechify in English, think in English, dream in English, —বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি সেই সকল অদ্ভুত জীব দেশ হইতে বিলুপ্ত না হইলেও বিরল হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে ভয় করা সম্বন্ধের অপব্যয়। কিন্তু আমরা—যাহারা বঙ্গবাণীর চিহ্নিত সেবক, আমরাও কি তাঁহার ভাবে মন্ত্রমুগ্ধ, বিভোর হইতে পারিয়াছি? আমরা কি তাঁহার সেবায় সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারিয়াছি? এক কথায়, আমরা কি তাঁহাকে পরাধীন করিতে পারিয়াছি? এখনও আমাদের সাহিত্য হইতে বিজাতীয় বোট্‌কা গন্ধ যায় না। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের এক জন লেখক তাঁহার সহযোগিদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত মনের মতো ভাব ইংরাজীতে উদয় হয়, ততদিন যেন কেহ বাঙ্গালা লিখিতে না বসেন। বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যেন বাঙ্গালার ভাষা শিক্ষা করা হয়। এই অনুরোধ কি আমরা পালন করিয়াছি? পালন না করার ফল কিরূপ হইয়াছে? অনেক স্থলে বাঙ্গালার অর্থ বুঝিতে হইলে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া তবে বুঝিতে হয়। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা মূকের মত মূক থাকিয়া অগত্যা অবশেষে লেখকের জয়জয়কার করেন। এইরূপ অঘটন-ঘটন সম্পাদন করিয়া আমরা কখনই একটা বিশ্ববিজয়ী সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিব না। অথচ ঐরূপ সাহিত্য আমাদের গড়িয়া তুলিতেই হইবে নতুবা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সমস্ত উদ্যম পণ্ড হইবে এবং আমাদের ভাষার নিয়তি ব্যর্থ হইবে। তাহা আমরা কখনই হইতে দিব না।

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আমরা ইংরাজি অথবা হিন্দী কিংবা দুয়ের উভয়েরই ব্যবহার করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও আমরা বাঙ্গালারই শরণাপন্ন হইব। ইংরাজি অথবা হিন্দী রাষ্ট্রীয় ভাষা হয় হউক, কিন্তু আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাব, অভাব, অনুসন্ধান, আবিষ্কার, আলোচনা, আন্দোলন, সমস্তই বাঙ্গালাতে প্রচার করিব। আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, উপকথা—সমস্তই বাঙ্গালাতে প্রকাশ করিব। যে ভাষার উৎপত্তি সরিদ্বরা গঙ্গার ন্যায় উদ্ভূত, যাহার প্রবাহ যমুনার ন্যায় নির্ম্মল, যে ভাষায় চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ-দাস পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, যে ভাষায় কৃত্তিবাস কাশীদাস রামায়ণ

* ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার।

মহাভারত রচনা করিয়াছেন, মুকুন্দরাম ঘনরাম যে ভাষায় পল্লীকবি, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, কাণ্ডকবি যাহার ধর্ম্ম-সঙ্গীত-রচয়িতা; যে ভাষায় অবসাদ-সময়েও ভারতচন্দ্রের মত কবি, দাশুরায়ের মত পাঁচালীকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যে ভাষায় মধুসূদন কপোতাক্ষে খেদনাদ শুনাইয়াছেন, হেমচন্দ্র ঊষাকণ্ঠে কুরুসংহার গাহিয়াছেন, নবীনচন্দ্র রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসে চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া কৃষ্ণলীলা গান করিয়াছেন; যে ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আছে, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' আছে, যে ভাষায় দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটককবি; যে ভাষায় রামমোহন বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার গদ্যকর্ত্তা; কালীপ্রসন্ন চন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্র গদ্যলেখক, যে ভাষায় হরপ্রসাদ রজনীকান্ত অক্ষয়কুমার নগেন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র ইতিহাস-রচয়িতা, যে ভাষায় কালীবর বিজেন্দ্রলাল চন্দ্রকান্ত বর্ণন রচনা করিয়াছেন, যে ভাষায় দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র শিশিরকুমার বিজয়কৃষ্ণ বিবেকানন্দ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অজেয় ও অমোঘ লেখনী চালনা করিয়াছেন—সেই ভাষা আমাদের মাতৃভাষা! এমন মায়ের গৌরবে আমরা কে না গৌরবিত, এমন মায়ের মহিমায় আমরা কে না মহীয়ান্? যারা এমন মায়ের সন্তান, তারা অজর অমর অক্ষয়, তারা মৃত্যুঞ্জয়, তারা বিশ্বজয়ী। এমন মায়ের সেবায় কে না আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারে?

আসুন, আমাদের আরাধ্যা, হৃদয়ের রাণী, বঙ্গবাণীর জয়ধ্বনি করিয়া জীবন সার্থক করি—জয় বঙ্গবাণীর জয়!!

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

গো-সেবা

জননী সুরভি তব কোথা আজি আশ্রম জীবন?
নীবার বিকীর্ণ দর্ভ-পুষ্পাপুষ্প-পুষ্টাঙ্গ শোভন?
কোথা রাজর্ষের সেবা? কোথা তাম্র ঘনঘণ্টাধ্বনি?
ঋষিবৎস পরামৃষ্ট তরঙ্গিত সুচিক্কণ কায়া?
হবির্গন্ধবাহী স্নিগ্ধ গন্ধবহ সুমন্দ বাজনে
কোথা আজি রোমন্থন নিমীলিত প্রসন্ন নয়নে?
ঋষিবালা হস্ত হ'তে নাহি লভ' নবীন পল্লব,
ললিত ললাট পরে চন্দনের তিলক গৌরব!
বৎসসঙ্গে তৃপ্ত করি অবশিষ্ট গোরস সম্ভার
কর স্পর্শ বিনা আহা ফিরে' দিত ঋষির দুয়ার।
সেদিন স্বপনসম-আজি তব কি দশা জননী?
আজিকে তোমার অঙ্গে একবিন্দু নাহিক ধমনী।
দীর্ঘবক্ষ দীর্ঘতনু অনাবৃত শীত-বরষায়,
গোময় পঙ্কিল গৃহে মরণের আছ যাতনায়;
শুষ্কতৃণপত্র তাও সবদিন জোটে বা না জোটে
পঙ্কিল সলিল তাও গ্রীষ্মদিনে নাহি পাও মোটে।
আশীনে গোময় লেপি' বৎসশিরে বেঁধে বেঁধে খুরে
শেষ বিন্দু রক্ত তব গোপালেরা লয় ঘুরে ঘুরে।
ক্ষুধার্ত্ত সন্ততিগণ দূর হ'তে হাম্বা হাম্বা ডাকে
দুগ্ধপান দূরে থাক দেখিতেও পায় নাক মাকে।
যতদিন দুগ্ধ দাও ততদিনই যাতনা অপার
দুগ্ধ বন্ধ হ'লে আরো কি দারুণ দুর্গতি তোমার!

শ্রীকালিদাস রায়

মহাকবি ভাস প্রণীত

চারুদত্ত

[নান্দীর পর সূত্রধার প্রবেশ করিল]

সূ। আজ কেন সকাল বেলাই বাড়ী থেকে বের হ'তেই পদ্মের পাতায় জলের ফোঁটার মত আমার চোখ দুটি খিদের চঞ্চল হয়ে উঠেছে। (পরিক্রমণ করিয়া) এই, বাড়ী গিয়ে দেখি, কিছু খাবার করেছে কি না। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে আমাদের বাড়ী। প্রবেশ করি। (পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) লোহার কড়াই ঘুরিয়ে মাজার জন্য বাটিতে কাদা মাখা দেখা যাচ্ছে! চাকরি বাকরেরা ঘুমে বেহুঁস হয়ে আছে। কি খাবার করলে? অথবা খিদের আমি সমস্ত পৃথিবীই অন্নময় দেখছি। গিন্নিকে ডাকি। গিন্নি, এই দিকে এস।

[নটী প্রবেশ করিল]

ন। ওগো, এই যে আমি। ওগো ভাগো তুমি এসে পড়েছ।

সূ। গিন্নি, আমাদের বাড়ীতে প্রাতরাশ কিছু আছে কি?

ন। আছে।

সূ। চিরজীবিনী হও। এই রকম ভাল খাবার দিতে থাক।

ন। ওগো তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম।

সূ। গিন্নি, কিছু পিঠা আছে নাকি?

ন। আছে।

সূ। দেবতারা তোমাকে এইরকম আশীর্বাদ করুন। গিন্নি, কি কি আছে?

ন। ঘি, দুধ, দই, চাল আছে।

সূ। এ সব আমাদের বাড়ীতে আছে?

ন। না, না। দোকানে আছে।

সূ। (সক্রোধে) আঃ—অনার্যে! তোর আশা এই রকম ক'রে ভঙ্গ হোক্। তোর দারিদ্র্য হোক্। দমকা হাওয়ায় উঁচুতে তোলা কুটোর মত আমার উঁচু পাহাড়ে তুলে ফেলে দিলি।

ন। ভয় নেই, ভয় নেই। ওগো একটুখানি অপেক্ষা কর। সব সাজান হয়ে যাবে। এ পেয়েছ মনে কর। ওগো, আজ আমার উপবাসের সহায় হও।

সূ। গিন্নির এ উপবাসটা কি ব্রতের?

ন। মনের মত পতি'র ব্রত।

সূ। কি আর জন্যে?

ন। হাঁ।

সূ। তবে সব হোক্। গিন্নিকে এ উপবাসের উপদেশ কে দিলে?

ন। এই পরিচারক চূর্ণগোষ্ঠ।

সূ। বাঃ রে চূর্ণগোষ্ঠ বাঃ।

ন। ওগো যদি অনুগ্রহ কর, তা হ'লে আমাদের মত লোকের নিমন্ত্রণ যোগ্য কোন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করতে চাই।

সূ। এটা গর্বের কথা বটে। তাতে আমার প্রাতরাশটাও হবে। তা যদি হয়, তাহ'লে গিন্নি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর। আমি আমাদের মত লোকের নিমন্ত্রণ যোগ্য কোন ব্রাহ্মণকে খুঁজে দেখি।

ন। ওগো, যাচ্ছি তাই করছি। (নিষ্ক্রান্ত হইল)

সূ। কোথায় এখন গরীব ব্রাহ্মণ পাই? (দেখিয়া) এই যে আর্য্য চারুদত্তের বয়স্য আর্য্য মৈত্রেয় নামক ব্রাহ্মণ এইদিকেই আসছে। একে নিমন্ত্রণ করি (পরিক্রমণ করিয়া) আর্য্য, আপনি নিমন্ত্রিত হলেন। আমি দরিদ্র ব'লে নিমন্ত্রণকে অবজ্ঞা করবেন না। ভাল ভাল খাবার

দেওয়া হবে। ঘি, গুড়, দই, চাল সব আছে। তা ছাড়া দক্ষিণায় মাষক* পাবেন।

[নেপথ্যে] "তুমি অন্ন, অন্ন কাউকে নিমন্ত্রণ কর। আমার সময় নেই।"

সূ।

পরম আদরে দত্ত সুগন্ধি সূপের সহ
ঘৃত, গুড়, আর দধি মিশ্রিত মোহন
অন্নরাশি আর্য্য আসি করুন ভোজন॥

(নিষ্ক্রান্ত হইল)

স্থাপনা

(বিদূষক প্রবেশ করিল)

বি। অন্ন, অন্ন কাউকে তুমি নিমন্ত্রণ কর। আমি ব্যস্ত আছি। ওহে, বলছি আমার সময় নেই। কি বলছ "ভাল ভাল খাবার খেতে পাব।" তা আমি জানি। বেশী মিষ্টি অম্বল খাওয়ার অযোগ্য, আমি খাব না। কি? আবার আমায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছ? বলছি আমি অন্য কাজে ব্যাপৃত। কি বলছ "দক্ষিণাও দেওয়া হবে।" কথায় তোমায় প্রত্যাখ্যান করছি বটে কিন্তু এ কথায় মনটি তোমার পিছনে পিছনে ছুটছে। হায় রে কপাল! আমাকেও পরে নিমন্ত্রণ করে। সেই চারুদত্তের বাড়ী ভ্রূক্ষেপ করলেই দিন রাত মুসিদ্ধি হিং দেওয়া সুগন্ধ উৎপাদনকারী নানা-প্রকার খাদ্য পানীয় দ্বারা, পটুয়া যেমন নানারকম রংয়ের ভাঁড়ে ঘেরা থাকে তেমনি বেষ্টিত হয়ে, গলা গলা খেয়ে চন্দনের ভাঁড়ের মত মোটাই ও খাদ্যরসের ভারে কাটতে কাটতে দিন কাটাচ্ছি। সেই আমি এখন চারুদত্তের দারিদ্র্যে পায়রার মত সাধারণের গৃহে জীবিকা সংগ্রহ করে অন্য জায়গায় চ'রে চ'রে তার বাড়ীতেই যাচ্ছি। আরও একটা আশ্চর্য্য। আমার পেটটিও অন্যরা বিশেষ বুঝতে পারে। অন্নেও তুষ্ট হয়, আবার দিলে রাশি রাশি ভাতও ভরে নেয়। না দিলে চায় না, চেষ্টা করেও বেড়াচ্ছে না। আমি যে এই রকম পেটের উপর অসন্তুষ্ট তা নয়। আজ বন্ধুতে দেব পূজা ক'রে চারুদত্তের জন্য মূল আর কাপড়

নিয়ে যাচ্ছি। যাই তার কাছে। (পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়া) এই যে চন্দ্রিলক প্রভাতের চন্দ্রের মত করুণ অথচ প্রিয় দর্শন। নিজের অবস্থানুসারে গৃহ দেবতার পূজা করে এইদিকেই আসছেন। এঁর কাছে যাই।

[নিষ্ক্রান্ত হইল]

[বলি লইয়া চারুদত্ত, বিদূষক ও অর্দ্ধেরিকাবধূর চেটী প্রবেশ করিল]

চা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ওঃ—ধনবী গুরুদের দারিদ্র্য লজ্জাতে মরণ। কেন না—

গৃহদ্বারে মোর যেই বলি ছড়াইলে,
রাজিবা কুসুম রাশি হংস ও সারস আসি
ভক্ষণ করিত তাহা, এবে সেই স্থলে,
পূর্ব্ব-বলি-বীজ-ত্যক্ত যবের অঙ্কুর থাকে
মুষিকের বীজ আমি করি নিক্ষেপণ,
ক্ষীট আসি সেইগুলি করিছে লেহন॥

বি। তুমি এখন বেশী খেদ করো না। পুরুষের যৌবনের ন্যায়, গৃহের যৌবনও নানা প্রকার দশাপ্রাপ্তহয়। সমুদ্রে জাহাজ নষ্ট হওয়াতে তোমার অর্থ ক্ষয় হয়েছে, কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্রের জ্যোৎস্নাক্ষয়ের ন্যায় তোমার এই দারিদ্র্যও ক্ষণিক।

চা। আমি নষ্ট শ্রীর জন্য অনুতাপ করছি না। যে নর ভাগ্যদোষে দারিদ্র্য আমার ধারণার বলে মনে হয়। কেন না—

দুঃখ ভোগ করি, পরে সুখ সে শোভন,
অন্ধকার পরে যথা দীপের দর্শন;
সুখ হ'তে যেই পড়ে দারিদ্র্য দশায়,
দেহ ধরি' সেই জন রহে মৃতপ্রায়।

বি। ওহে বয়স্য, সমুদ্র-বাণিজ্য-সঞ্চারকৃত তোমার সেই সঞ্চিত অর্থ কোথা গেল?

চা। (নিশ্বাস ফেলিয়া) বয়স্য, যেখানে আমার ভাগ্য গিয়াছে, সেই খানে। দেখ—

হীন অর্থ মোর, তবু বন্ধুর জিম্মায়
বিশ্বাসিত নহি, আরও করি ঋণদান

* মাষক—মুদ্রা বিশেষ।

বিশ্বাসে প্রসন্ন মুখ ধর্ম যে শোভন
এখনও ত সখে মোর কয় আছি পায়।

[চিন্তায় অভিনয় করিলেন]

বি। তুমি কি অর্থের চিন্তা কচ্ছ?

চা। সত্য কহি নাহি চিন্তা অর্থ নাশ-ভয়ে,
ভাগ্যবশে পুনরায় আসিবেক ধন;
এই শুধু দহিতেছে বিত্তহীন বোরে,
সুজনেও স্নেহহীন হয় বন্ধুগণ।

আরও—

দারিদ্র্যে ব্রাহ্মণ কথা না করে শ্রবণ
যৌবনে উপহাস করে শীলরূপ শশী ধরে
মুমূর্ষুকান্তি হয়, আঃ যত বন্ধুগণ
বিমুখ তাহার প্রতি, বিপদ বর্জ্জিত অতি
পরেও যে পাপ কর্ম্ম-ভয়ে আচরণ
তারই কৃত বলি ভাবে যত জনগণ।

বি। এখন দাসীর বেটা এই অর্থ মশায় ভয়ে গোয়ালিনি ঘর ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বার বার ঘন বিনাশ দুঃখ ভাবতে ভাবতে বসন্তে পাকা পরের গোছার মত খালি কেঁকড়ি উঠ্‌ছে। সুতরাং দুঃখ কচ্ছো না।

চা। বয়স্য, দুঃখ কি অল্প কচ্ছি? আমি কি দরিদ্র? যে আবার—

এ দশায়ও বশ পত্নী, সমদুঃখ সুখভাগী
বন্ধু তুমি; দরিদ্রের দুর্লভ যে ধন
ধর্ম্ম-পুঁজিতে পরিত্রাট হইনি এখন।

[বিট ও বসন্ত সেনা সন্ত্রাস্তভাবে শকার কর্তৃক অনুসৃতা হইয়া প্রবেশ করিল]

শ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, বসন্ত সেনা দাঁড়াও।
যাচ্ছ কোথা? ছুঁচ্ছ কোথা?
যৌড়ে অত যাও বা কোথা?
যাচ্ছ যেচিত, দাঁড়াও, দাঁড়াও
যাবেন্দ্রাক', যাওসো বাছা,
কাযে আমার শরীর এখন
এমনি ক'রে পুড়িয়ে ফেলে,
কয়লার উপর পড়্‌লে পরে
চামড়া যেমন যায়গো জ্ব'লে।

বিট। বসন্ত সেনা!
কেন তুমি ভাজি ভয়ে স্বভাব শোভন
ফেলি' নূপুর মুখরিত চরণ-যুগল,-
উদ্বিগ্ন চঞ্চল দৃষ্টি, করিছ যাপন
ব্যাধ-ভয়ে সচকিতা হরিণী যেমন।
মশাই, এই যে বসন্ত সেনা যাচ্ছে—
শৃগালীর পিছনেতে
কুকুর ছুটে যায় যেমতে
আমরা তখন যাচ্ছি যেমন তেড়ে,
যেখনা নূপুর বাজে
পাকেতে জড়িয়েছে যে
মনটা আমার নিচ্ছে মশাই কেড়ে।

বিট। বসন্ত সেনা!
কেন তুমি ত্রস্তপদ করি নিক্ষেপণ,
যাও, গন্তব্যের ভয়ে ভুলগা যেমন?
বেগে ধাবমান আমি পবনেও প্রায়,
আছি কি শকতি মোর ধরিতে তোমায়?

ব। চারিদিকে দেখিয়া) পল্লবক! পল্লবক! পল্লবভিকা পল্লবভিকা! বকুলবক! বকুলবক! শারিকা! শারিকা! হা ধিক্! আমার পরিজনদের হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমাকেই নিজেকে রক্ষা কর্‌তে হবে।

শ। ডাক, ডাক, পল্লবকেই ডাক, পল্লবভিকাকেই ডাক, বকুলবকেই ডাক, শারিকাকেই ডাক আর সবাস্তক বসন্ত বধূকেই ডাক। কে কে তোমায় পরিত্রাণ কর্‌বে?
কুন্তী দেবীর ছেলে কিবা
বায়ুদেবই আসুক ধেয়া,
অগ্নিদেবই আসুক কিবা
শ্মশান ঘাটের সেই দেবতা,
সীতায় যেমন দুঃশাসনে
ধরেছিল, তেমনি হাতে
চুলের মুঠি ধ'রে তোমায়
নিয়ে যাব আমার সাথে।

বিট। বসন্তসেনা, কেন' আমার হৃদয় সকল অবস্থাতেই নির্ভীক।

দেখ –

ব্যবসায় নেমেছে ঘোর, রজনীর অন্ধকার
প্রতিচিত ; বন্ধ পথ করেছি বরণ
ঘোর তিমিরেতে পূর্ণ ; যুবতীজনের কাছে
অবজ্ঞা, করিয়াছি সেই আচরণ
বিপণীতে যতক্ষণ সাক্ষী রক্ষীগণ।

ব। এ নিজের গুণ নিজেই জানাচ্ছে, এখনও এর হাতে বিপণে পড়্‌লুম। কি'ফন্দীতে এরা অকাজ না করে?

বিট। ওগো আমাদের অনুনয়টা রাখ। দেখ—

বিশ্বাস করিলে তব দোষ উপজয়
যদিও সে কষ্ট হয়, হৃদয় কি তায়?
অসি-সম তীব্র যের আকার যাহার
সমর্থ সে কর এই কথে অনুনয়
নারীবধ-পাপ হ'তে আমারে উদ্ধার
করহ, হইতে রক্ষা শরীর তোমার।

ব। এর অনুনয়ও তার উৎপাদন কচ্ছে।

শ। বসন্তসেনা! ঠাকুর যেন বলেছেন যাদের গায়ের জোর আছে তাদের অনুনয় চলে ভাল, অনুনয় বহুমানে নেওয়া উচিত। দেখ বণি!

বহুদের সমান যখন ভাবিল বরণ
আমায় অসি,
যাচাতে যাচ্ঞা তোমায়, কেন্‌ব দেহে
কিবা রবি!
আমাদের মতন জনে চরিয়োনাক;
জেনে রাখ'
চটিয়ে দিলে, দোষের যাতে মরা লোকও
বাঁচে নাক'।

ব। আর্য্য! কুলপুত্রগণের শিল পরিতোষ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারিণী আমি গণিকা।

বিট। সেই জন্যই তোমাকে প্রার্থনা কচ্ছি।

ব। আর্য্য! আমার কাছ থেকে কি চান, শরীর না অলঙ্কার?

বিট। সত্যি ভুল বোঝা উচিত নয়। অলঙ্কারে আমাদের দরকার নাই।

ব। আমি এখন নিজেকে সন্তাপিত কর্‌ব না।

শ। বসন্তসেনা, আমি ভর্তৃপুত্র। আমার ঠাট্টা কর?

ব। শান্ত হও।*

শ। শুনুন মশাই শুনুন। এই বসন্তসেনা আমায় বল্‌লে 'তুমি শ্রান্ত বটেছ'।

বিট। মূর্খকে যে গাল দিলে তাও বুঝ্‌তে পার্‌লে না। 'ঘাস' বল্‌লে, মূর্খ 'শ্রীঘ্র'। আরও—

সর্ব্ব অঙ্গ সকালনে
নিজ ঘাম্য করে অভিনয়,
না বুঝিয়া যাহা তাহা
বলে ফেলে মনে যাহা লয়,
অনুচিত গতি এর,
অপ্রগল্ভ বচন ইহার
পুরুষ আকৃতি ধরি
পশুর এ নব অবতার।

(প্রকাশ্যে) বসন্তসেনা, আমার নিকটে কি জন্য বারাঙ্গনাদের বিরুদ্ধ বচন বল্‌ছ?—দেখ—

দুষিক সহায় যুক' সে বেশবীথিকা,
পথে জাত পশু-সম তুমি যে গণিকা;
ধনে জের পশু-সম শরীর তোমার
প্রিয় বা অপ্রিয় কর সম-ব্যবহার।

ব। আমার এই অভিনিবেশ অভিধানে তুলনা করছে

শ। মশাই, এই অন্ধকার ভরা পথ দেখা যাচ্ছে।† দেখ্‌বেন এখানে যেন হারিয়ে ফেলবেন না। কামদেবের যাত্রার পর থেকেই চোখের দোষে দরিদ্র বণিক্‌পুত্র চারু-

---

* শান্ত=স্বস্থ। প্রাকৃতে 'শ্রান্ত' ও শান্তের মত উচ্চারিত হয় বলিয়া শকার ভুল বুঝিয়াছিল।

† ভাস এখানে অসঙ্গত বর্ণনা করিয়াছেন। স্থাপনার সূত্রধর সকালবেলায় কথা বলিয়াছে। তাহার নিষ্ক্রমণের পরই বিদূষক ও তৎপরে চারুদত্ত আসিয়াছেন। ইহার মধ্যে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া রাত্রি আসিতে পারে না।

হয় বটুক কে কামনা করছে। এই তার বাড়ীর খিড়কী দরজা।

ব। (সহর্ষে স্বগতঃ) এই তাঁর বসন্তী! ভাগ্যক্রমে এখন আমি শত্রুদের চীৎকার প্রিয়জনের সমীপে আনীত হয়েছি। আচ্ছা, তবে এইরকম করি। [অপসরণ করিতে লাগিল]

শ। (দেখিয়া) মশাই হারিয়ে গেল হারিয়ে গেল।

বিট। কি? হারিয়ে গেল? খোঁজ, খোঁজ।

শ। দেখ্‌তে পাচ্ছিনা মশাই।

বিট। হায় আমরা প্রতারিত হয়েছি। বসন্তসেনা এইবার ধরা পড়েছে।

সান্ধ্য অন্ধকারে তুমি অদৃশ্য এখন,
মেঘের গর্ভে রুদ্ধ বিদ্যুৎ যেমন,
সমীর-বাহিত গন্ধে বাজিছে ভূষণ
শব্দে তার এবে তব হতেছে সূচন।

[বসন্তসেনা মালা খুলিয়া অলঙ্কার সরাইয়া ফেলিল।]

বিট। ওঃ—কি ঘোর অন্ধকার। এখন

অদে যেন অন্ধকার লিপ্ত হয়,
যেন বা গগন
কজ্জল বরষে, দৃষ্টি ব্যর্থ অসীতের
সেবার মতন।

আরও :—

অরণ্য ও অন্ধকার উভয়ই সমান।
ভয় উৎপাদন করে, ভীতে করে ত্রাণ।

তাছাড়া—

আলোকে অভ্যস্ত চক্ষু সহসা প্রবেশ করি
তিমির আকারে,
উন্মীলিত-থাকিলেও নিমীলিত হইয়াছে
যেন অন্ধকারে।

ব। ওঃ এইযে দেওয়াল শেষ হয়ে গেল, এখানে খিড়কী দরজা বোলা আছে। এখানে কোন লোকজন না থাকায় অন্ধকার আরও বেশী। তা এইখানেই দাঁড়াই। [দাঁড়াইল]

চা। মৈত্রেয়, যাও, চৌরাস্তায় মাতৃগণকে বলি বিতরণ করে এস।

আমার কেউ যাক্।

চা। কেন?

বি। আয়নার প্রতিবিম্বের মত আমার বুদ্ধি বাঁদিকটা ডাইনে বয়ে যায়, আর ডানটা বাঁদিক হয়ে যায়।

চা। মূর্খ! যেমন পার পূজা ক'রে এস। দেবতারা ভক্তিতেই তুষ্ট হন। যাও।

বি। আমি একলা কি ক'রে যাব?

চা। রদনিকা, এঁর পিছু পিছু যাও।

র। যে আজ্ঞে।

বি। ওগো, আমি প্রদীপ নিয়ে যাব।

চা। তুমি যা চাও, তাই কর।

বি। (প্রদীপ লইয়া) ওগো রদনিকা, খিড়কী দরজা খোল।

র। আচ্ছা। [দ্বার খোলার অভিনয় করিল]

[বসন্তসেনা অলক্ষ্যে দ্বারা প্রদীপ নিভাইয়া দিল]

বি। এই যা:—

চা। বয়স্য! কি হ'ল?

বি। আমার বাতাসে জ্বলেছিল, খিড়কীর দরজা খুলতেই সেই বাতাস ঢুকে যেমনি আমি বেরিয়ে যাচ্ছি অমনি আমার হাতের প্রদীপ নিভিয়ে দিলে।

চা। মূর্খ, ফিরে এসো।

বি। আমার অপরাধ এখন বেশী কি? রদনিকা, যাও। চৌরাস্তায় আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমি বাড়ীর ভিতর থেকে প্রদীপ জেলে নিয়ে আসি।

[নিষ্ক্রান্ত হইল]

চে। আজ্ঞা ঠাকুর! [পরিক্রমণ করিতে লাগিল]

ব। ভালো আমার চোকবাঁধা অদৃষ্ট! খিড়কী দরজা খুলেছে, এখন আর বিশেষ চরিত্রের জন্য আপনার দরকার নাই। ঢুকে পড়ি। [ভিতরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল]

বিট। [দেখিয়া স্বগতঃ] বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এই যে কে আসছে। তা বোঝ, এর দ্বারাই হতভাগাকে

কাই। [প্রকাশ্যে] কুসুমের গন্ধ যেন পাচ্ছি।

শ। হাঁ মশাই, আমি কাণে গন্ধ শুঁকতে পাচ্ছি। অন্ধকারে নাক বুজে গেছে ব'লে ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বিট। দাঁড়াও, দাঁড়াও। যাও কোথা?

চেটীকে ধরিল]

[চেটী সভয়ে ভূমিতে পতিত হইল]

শ। ধরুন, মশাই, ধরুন।

বিট। ফুলপুরে করিয়াছে এ যে অপমান
যৌবনের দর্পে, তাই যেই কেশে ফুল দিয়া
সাজান উচিত, ধরি' সে কেশ খোঁপন,
নিশ্চয় ইহার আমি করিব এখন।

শ। ধরেছেন নাকি মশাই?

বিট। হাঁ, গন্ধ অনুসরণ করে ধরেছি।

শ। দাসীর বেটীর মাথাটা ছিঁড়ে তারপর মেরে ফেলব।

বিট। এখন ধর।

শ। (চেটীকে ধরিয়া)
এই যে এবার তোরে ধরিয়াছি চুলে,
মাথায়, খোঁপায়, কেশে ধরেছি সমূলে,
মহেশ্বর, শঙ্কর বা ঈশ্বরকে ডাক
চেঁচাও, বা কাঁদ তবু ছাড়িতেছি নাক,।

[বল পূর্ব্বক চেটীকে টানিতে লাগিল]

চে। আপনারা কি কর্‌তে চান?

শ। ও মশাই, গলায় আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে এ বসন্ত সেনা নয়।

বিট। ছেড় না। এ বসন্তসেনাই বটে।

শিখিয়াছে বহু কলা অতিশয়ে এইবালা
অন্য কণ্ঠস্বরে নক্ল কথা বলিবারে,
ছাড়িওনা অতএব কখনও ইহারে।

[বিদূষক প্রবেশ করিল]

বি। (দীপ লইয়া) রাজপথে অন্ধ ঠাণ্ডা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদে পদে দীপশিখাকে কাঁপাচ্ছে, প্রদীপের তেলও নষ্ট হচ্ছে, কোন রকমে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছি।

চে। মৈত্রেয় ঠাকুর! এই অপমান অথবা দণ্ডটা দেখ।

বি। অয়মহং ভোঃ [পড়িতে পড়িতে বিট ও শকারকে দেখিয়া ভীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল]

বিট। আরে, এযে আর্য্য চারুদত্তের বয়স্য মৈত্রেয়। এও ত বসন্ত সেনা নয়।* মহা ব্রাহ্মণ। আমরা অন্ধ লোক ভেবে এ রকম করেছি, দর্পে করি নাই। ক্ষমুন—

অকামা দেখি এক স্বাধীন যৌবনা,
করিতেছি সে হরণ, পলায়েছে সেই জন,
সেই ভাবি এরে বৃথা করেছি লাঞ্ছনা।

শ। হায়, হায়, এ বসন্ত সেনা নয়। দরিদ্র বণিকপুত্র চারুদত্ত বটুকের দাসী। বারে বসন্ত সেনা বা, অন্ধকার করে বাকবাদন থেকে মশাইকে ঠকিয়েছে। আচ্ছা চালাক, আমায়ও ঠকিয়েছে। সবরকমেই চতুর কার্য্য করেছে।

বি। এরকম বলো না। এ উচিত নয়।

বিট। তবে মহা ব্রাহ্মণ, এই আমার অনুনয়ের চরম যোড় হাত করছি।

বি। থাক্, থাক্। তুমি অপরাধী নও। যাকে অনুনয় করছ সেই আর্য্যই এখানে অপরাধী।

শ। মশাই, সেই দরিদ্র বণিক পুত্র চারুদত্ত বটুককে তারী ভক্ত করেন দেখ্‌ছি।

বিট। সত্য ভয় করি।

শ। কেন মশাই, কেন?

বিট। তাঁর গুণে ভয় করি। দেখ—
আমাদের মত জনে ভালবাসি যায়
হয়েছেন অর্থহীন, নায়িক এখন
যে না গণিয়াছে অর্থ যাচিয়া তাঁহার,
যত জনগণ তৃষ্ণা করিয়া পূরণ
সুবৃহৎ হ্রদ যথা নিদাঘে শুকায়
হয়েছেন শুষ্ক এবে এই মহাজন।
মহাব্রাহ্মণ, বণিকপুত্রকে একথা ব'লো না।

[বিট নিষ্ক্রান্ত হইল]

শ। মারিষ! বটুক! মারিষ! আমার এই কথা সেই

* বিটের এ উক্তি তাহার পূর্ব্ব কথার বিরুদ্ধ। কারণ সে নিজেই আগে বলিয়াছে যে অন্ধ রমণী হ'লেও একে দিয়ে শকারকে প্রতারণা করি।

দরিদ্র বণিকপুত্র চারুদত্ত বটুককে ব'লো "রাজার শালা সংস্থান পাগড়ী-বাঁধা মাথায় বন্দনা করে বল্‌ছে, সোনার মত রং নটী বসন্তসেনা নামে গণিকাকন্যাকে আমরা দুজনে জোর করে নিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় সে দাসী সোণার গহনা নিয়ে তোমার বাড়িতে ঢুকেছে। তাকে কাল পাঠিয়ে দেবে। যদি না দাও, তোমায় আমার বিশেষ ঝগড়া হবে।" বটুক! মারিষ! এও বলো "দাসীর বেটী যেন পীয়ঙ্গার গলার ভেতর চোকা মূল কচুর মত তোর মাথা ঘড়্ ঘড়্ করে না ভাঙি'। দরকার মধ্যে চোকান পাকা কল্ লেবুর মত তোর মাথা গুঁড়ো করে ঘড়্ ঘড়্ ক'রে না ভাঙি'।"

বি। ওহে, আচ্ছা। [প্রদীপ দিয়া শকারকে তাড়না করিতে লাগিল]

শ। [চারিদিক দেখিয়া] মহাশয় কোথা গেলে? মশাই চলে গেছে! বাঁচাও মশাই বাঁচাও।

[শকার নিষ্ক্রান্ত হইল]

বি। দেবকার্য্য করিয়াছি এইবার তাকে জানাই, গেলে মনের দুঃখ দূর কর। এই বৃত্তান্ত বাড়ীর ভিতরে বলো গে।

চে। যে আজ্ঞা, এই যাই রদনিকা।*

বি। এস, আমরা যাই।

[উভয়ে পরিক্রমণ করিতে লাগিল]

চা। ভদ্রে, দেব কার্য্য করা হয়ে গেছে?

ব। (স্বগত) দাসী মনে করে আমায় বল্‌লেন। তা হোক্, আমি রক্ষা ত পেয়ে গেছি।

চা। প্রদোষ কালে হাওয়া দিচ্ছে, নাও আমার গায়ের কাপড় খানা।

ব। (প্রাবারক লইয়া সহর্ষে) পটবাসের গন্ধে বুঝতে পারা যাচ্ছে এঁর যৌবন এখনও ভোগবাসনা হীন নয়।

চা। রদনিকে, বাড়ীর ভিতর যাও।

ব। (স্বগত) ভিতরে প্রবেশ করি এখন ভাগ্য আমার নাই।

চা। যাচ্ছ না কেন?

ব। এখন আমি কি বলি?

চা। রদনিকা! দেরী করছ কেন?

[রদনিকা ও বিদূষক অগ্রসর হইল]

চে। ভর্তৃদারক! এই যে আমি।

চা। এ তবে কে?

অনুমান করিয়াছি না জানিয়া মনে, শরতের মেঘে ঢাকা যেন শশাঙ্কের লেখা, শোভে আবরিতা হয়ে আমার বসনে।

ব। (স্বগত) দীপের আলোকে রূপ দেখা যাচ্ছে, যার জন্য আমি নিশ্বাস মাত্র-দ্বারা লক্ষিত শরীর ধারণ কচ্ছি এত সেই।

বি। ওহে চারু দত্ত! রাজার শালা সংস্থান পাগড়ীবাঁধা মাথায় বন্দনা করে জানাচ্ছে নটী বসন্তসেনা নামে গণিকাকন্যাকে আমরা জোর করে নিয়ে যাচ্ছিলাম, সে দাসী সোণার গহনা নিয়ে তোমার বাড়ী ঢুকেছে। তাকে কাল পাঠিয়ে দেবে'।

ব। হুঁ—'বল করে নিয়ে যাচ্ছিল' এ কথা বলেছে। আচ্ছা, এই সময় এসেছে। (প্রকাশ্যে) আর্য্য, আমি শরণাগতা।

চা। ভয় নাই, ভয় নাই,। এই কি বসন্ত সেনা?

বি। রক্ষা কর বসন্তসেনা [জনান্তিকে] ওহে চারু দত্ত, এ বসন্তসেনাই বটে। মদনোৎসব যাবার পর থেকে যাকে তুমি চোখের মাত্র পরিচয়ে সকাম হৃদয়ে ধারণ করছ। এখন দেখ একে।

চা। বয়স্য, দেখ্‌ছি।

কিন্তু নাশে যার প্রতি কাম মোর হায়,
কাপুরুষ ক্রোধ সম অঙ্গেই মিলায়।

ব। আপনার আজ্ঞা না নিয়ে প্রবেশ করে অপরাধ করেছি, এই মস্তকে আপনার ক্ষমা চাচ্ছি।

চা। তা যদি বল তাহ'লে আমিও না জেনে দাসীর মত কায কর্‌তে ব'লে তোমার কাছে অপরাধী হয়েছি। তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

বি। ওহে গাড়ীটানা দুই দুই যাঁড়ের মত তোমরা

* রদন অর্থে দন্ত আর্থি রদনিকা আমার কেবল দন্ত আছে, জিহ্বা নাই। সুতরাং আমি কথা কইতে পারবনা। এই প্রকার ইঙ্গিত এ বাক্যের অর্থ।

নিজেদের কষ্ট দিচ্ছ কেন? আমি এখন কার কাছে ক্ষমা চাই? আচ্ছা, আমি তবে রঙ্গিকার কাছে ক্ষমা চাই। রঙ্গিকা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

চা। আমি পরবশ, স্নেহে কি কয় বল।

ব। (স্বগত) বন্ধুর ইচ্ছা করা উচিত। কিন্তু প্রথম দর্শনে নিজে এসে এখানে থাকা ভাল দেখায় না। সুতরাং এই রকম করি। (প্রকাশ্যে) আর্য্য যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহ'লে আমার এই অলঙ্কার এইখানেই থাক। অলঙ্কারের জন্যই ছুটেরা আমার পিছু নিয়েছে। আমিও আর্য্যের দ্বারা রক্ষিত হয়ে সুখে যেতে ইচ্ছা করি।

চা। তাহাই বলছে। মৈত্রেয়। যাও।

বি। আমার ইচ্ছা করছে না।

চা। মূর্খ, যাও।

বি। যে আজ্ঞে। ওগো, যাও।

[বসন্তসেনা অলঙ্কার খুলিয়া দিল]

বি। (লইয়া) রঙ্গিকা, তুমি এই সোণার গয়নাটা নাও। বস্ত্র ও সপ্তদীতে রাখ। আমি অনধ্যায়ের দিন আইনীতে রাখ্‌ব।

চে। (হাসিয়া) পাত্র ব্যাখ্যাকারী আপনার ঐ দিন অবসর হবে বুঝি। দিন ঠাকুর।

[লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল]

চা। কে আছ? দীপ আন।

বি। ওহে, গণিকার ন্যায় দীপও এখন স্নেহ* শূন্য হয়ে পড়েছে।

চা। আর দীপের দরকার নাই। (দেখিয়া) সর্ব্বলোকের সাধারণ দীপ ভগবান্ চন্দ্র উদিত হয়েছেন। তাই—

ক্লিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় পাণ্ডুর বরণ,
যুবতী জনের সখা, রাজপথ দীপ সম
উঠিছে শশাঙ্ক, তব ঘাত্যার বিরুদ্ধ
তিমির রাশির মাঝে শোভে, শুভ্র পত্রে যেন
বিমল মুকের ধারা হতেছে বর্ষণ।

তবে রাজপথে নির্গত হও। পথে, এ দিকে যাওনা।

বি। যে আজ্ঞে। এস, ওগো এস।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল]

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

ক্রমশঃ—

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল

* স্নেহ = তৈল পক্ষে অনুরাগ।

আহত

আর কি আসিবে তুমি ফিরে ?
পুরাণ সে নদীবার
পুরাণ ফুলের হার
কাঁদে তোমা লাগি—
তুমি আসিবে কি ফিরে।

নিরালা কুটীর দ্বারে আসি
বাজিল রণের ভেরী
"আর বাছা ধরা করি"
"মা'রের যে অপমান—
ওগো বীর, থাকিবে কি বসি ?"
[বিদায়

বীর তুমি থাকিলে না বসি।—
"দেশেরে বলিবে যারা
মোদের পিশিবে যারা
তাদেরে বধিতে হবে—
কাঁদ কেন, দাও মোরে হাসি।"
*** *** ***
[গৌরব

"শুনেছ কি সেদিনের রণে,
ফুরায়েছে সব সাধ্যবল
বায়ুতে উড়িছে ধ্বজাঞ্চল
শত শত তবু পড়িয়াছে
একা সে,—কলের কামানে।"

"রাজা তারে বুকে তুলি ধরি,
রোগ শয্যাপরে,
নিজ হাতে করে
বিজয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান,
পরায়ে দিলেন বক্ষোপরি।"
*** *** ***
[প্রতীক্ষা

কত দিন গেল তবু আর শুনি নাই,
সকল কাজের মাঝে
তোমার বেদনা বাজে
'ওই তুমি আসিতেছ', ফিরে ফিরে চাই।

কেন ওরা আর বারে কিছু বলে না
আর কি আসিবে ফিরে,
আবার কি দেখা হবে ?
দেয়েছে কি কত তব,—
দেছে কি বেদনা ?

শ্রীঅজিতকুমার ঘোষাল।

গদ্যে কবিতা

(রুশীয় সাহিত্যিক আইভান টুর্গিনিভের "গদ্যে কবিতা" নামে একখানা পুস্তক আছে। তাহা হইতে নমুনা স্বরূপ নিম্নলিখিত কয়েকটী অনূদিত হইল।)

বৃদ্ধা

একটা প্রকাণ্ড মাঠে একা চলছিলাম হঠাৎ মনে হল পিছনে পদশব্দ—মৃদু, বড় সাবধানী ... কেউ আমার পিছনে আসছে।

চারদিকে চেয়ে দেখতেই দেখি একজন কুব্জকায় বৃদ্ধা—একেবারে সাদা ঘাগরা চোলচে আবৃত—কেবল মাত্র মুখখানা তার বেরিয়ে আছে; তীক্ষ্ণ নাসাযুক্ত, পাংশু বর্ণ, বলীপূর্ণ, রক্তশূন্য মুখ।

এর কাছে গেলাম। সে থেমে দাঁড়াল।

"কে তুমি? কি চাও? তুমি কি ভিক্ষুক? ভিক্ষা চাচ্ছ?" বৃদ্ধা কোন উত্তর দিল না। আমি মাথা নীচু করে তার দিকে চেয়ে ঠাওর করলাম—তার চোখ দুইটি একটা অর্দ্ধস্বচ্ছ পর্দা বা চামড়ার ঢাকা যেমন কোন কোন পাখীতে দেখা যায়—কড়া আলো হ'তে সেইগুলো তাদের চোখকে রক্ষা করে।

কিন্তু বুড়ীর সেই পর্দাটা নড়ছিল না এবং তাতে তার চোখ দুটোও আবৃত ছিল। এ হতে আমি বুঝে নিলাম সে অন্ধ।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম। "ভিক্ষে চাও? কেন আমার পিছন পিছন আসছ?" বুড়ীটা আগের মতই কোন উত্তর দিলে না। কেবল মাত্র একটুখানি কুঞ্চিত হয়ে গেল।

তার দিক্ হ'তে ফিরে আবার আমি আমার পথে চলতে আরম্ভ করলাম।

আবার আমার পিছনে সেই মৃদু—তালে তালে ফেলা—কেন চোরের মত পা শব্দ।

আবার সেই বুড়ী! কেন সে আমার পিছনে লেগে থাকছে? কিন্তু তখন আমার মনে হ'ল—হয়ত সে তার পথ হারিয়েছে—অন্ধ!—তাই এমনি আমার পায়ের শব্দ অনুসারে চলে আসছে যদি কোন রাস্তার দিশে এই ভরসা। এই ঠিক—এই ঠিক।

কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্তি আমার বেড়ে গেল। আমার মনে হতে লাগল বুড়ী সুধার আমার অনুসরণ করছে না—আমাকে সে টানছে—না, তাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একবার দক্ষিণে, একবার বামে, আর আমি যেন ক্রীতদাসের মত তার আদেশ পালন করছি।

তথাপি যাহোক আমার চলার বিরাম নেই—কিন্তু ওকি আমার সামনে? আমার পথেরই উপর ওটা কি কালো এবং চওড়া একটা গর্ত্তের মত! হঠাৎ আমার মাথায় খেলে গেল—ওটা "একটা কবর।" ঐখানেই সে আমায় টানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি তাড়াতাড়ি পিছন ফিরলাম। বৃদ্ধা আবার আমার সামনে দেখা দিল ... ওকি, বৃদ্ধা যে দেখতে পায়! তার প্রকাণ্ড নিষ্ঠুর, হিংসুক চোখের দৃষ্টি আমার উপর ন্যস্ত। একেবারে শিকারী পাখীর মত তার চোখ দুটো! আমি তার মুখের উপর—চোখের দিকে ঝুঁকে দেখলাম সেই স্বচ্ছ পর্দা—সেই অন্ধ চোখ, সেই নিরানন্দ মুখ? ...

ওহো—এই বৃদ্ধাই যে আমার অদৃষ্ট!—অদৃষ্ট, যার হাত হতে কোন মানুষেরই ত্রাণ নেই!

ত্রাণ নেই! ত্রাণ নেই! কি পাগলামি—তবু লোকে চেষ্টাই করবে। আমি অন্যদিকে দৌড় দিলাম।

খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছি—কিন্তু সেই মৃদু পদশব্দ আগের মতই আমার পিছনে যাচ্ছে—কাছে অতি কাছে—আর আমার সামনে আবার সেই কালো গর্ত্ত।

আবার অন্যদিকে ফিরলাম—আবার সেই শব্দ, আবার সেই ভয়ানক অন্ধকার।

যে পথেই যাই না কেন—দৌড়াই না কেন, শিকারী তাড়ান শংকের মত কেবল পাঁচের পর পাঁচ কেটে চলাই সার। সকল দিনই সেই এক—সেই এক!

বাঘ, বৃদ্ধকে ঠকাতে হবে! কোথাও যাব না! এবং তৎক্ষণাৎ আমি ঘাটির উপর বসে পড়লাম।

বুড়ী আমার পেছন পিছনে দাঁড়িয়ে। তার কোন শব্দ আমি শুনছি না বটে, কিন্তু আমি অনুভব করছি সে সেইখানে দাঁড়িয়েই আছে।

হঠাৎ দেখলাম সূর্যের সেই অন্ধকার জায়গাটা ভেসে আসছে একেবারে আমার দিকে।

হায় ভগবান্! আমার চৌদিকে চাইলাম—বুড়ী একেবারে সোজা আমার দিকে চেয়ে আছে—একটা বিদ্রূপের হাসিতে তার দন্তহীন মুখখানা ভীষণ।

ত্রাণ নেই!

ভিখারী

রাস্তা দিয়ে চলছিলাম। একটা বৃদ্ধা ভিখারী আমার পথরোধ করলে।

চকরাঙা চোখ জলে ভরা, নীলবেটেবেগুনী ঠোঁট, মোটা শতছিন্ন কাপড়, গায়ে ভরা গা—ওঃ দারিদ্র্য কি ভয়ানক ভাবে তাকে আক্রমণ করেছে!

লাল, কোলা, রুগ্না হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে দাঁড়াল। সাহায্যের জন্য স্পষ্ট ভাবে প্রার্থনা করল।

পকেট হাতড়াতে আরম্ভ করলাম—টাকা, ঘড়ি বা একখানা রুমালপর্যন্ত পাওয়া গেল না। কিন্তু নিয়ে ত আমি বের হইনি। ভিখারী তবু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তার বাড়ান হাতটি তার কাঁপতে সুরু করল।

হতবুদ্ধি হয়ে, লজ্জিত হয়ে আমি আগ্রহের সঙ্গে তার সেই রুগ্না কম্পমান হাতখানা চেপে ধরলাম। "রাগ করো না, ভাই, আমার যে কিছুই নেই, ভাই।"

রাঙা চোখ দিয়ে ভিখারী আমার দিকে চেয়ে রইল; তার নীল ঠোঁটে হাসি দেখা দিল; সেও আমার ঠাণ্ডা হাত চেপে ধরল।

অস্পষ্ট ভাবে সে বলল, "তাতে কি, ভাই? এর জন্যেও তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এও ত এক রকমের দান ভাই!"

আমি বুঝলাম এই বন্ধুটির কাছ থেকে আমিও একটা দান পেলাম।

ভগবানের ভোজ

একদিন ভগবানের মাথায় খেয়াল হল তাঁর আকাশ স্বর্গের প্রাসাদে বড় রকমের একটা ভোজ দিবেন।

সমস্ত রকম পুণ্যের নিমন্ত্রণ হ'ল। বড় ছোট সব রকম পুণ্যের মেলা। বড়র চেয়ে ছোটগুলাই বেশী প্রীতিপ্রদ—বেশী মিষ্টক। কিন্তু সবগুলার মেজাজই বেশ ঠাণ্ডা ছিল—সকলেই বেশ আলাপ করছিল—আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের মতন করে।

ভগবান দেখলেন তার মধ্যে দুজন বেশ সুন্দর—কিন্তু পরস্পরে জানা শুনা নাই। তাই একজনকে হাতে ধরে অন্যের কাছে নিয়ে গেলেন। প্রথমকে দেখিয়ে পরিচয় দিলেন "ধন্যবাদ" দ্বিতীয়কে "কৃতজ্ঞতা"।

একেবারে দুজনাই বর্ণনাতীত ভাবে আশ্চর্য্য হয়ে গেল; জগৎ সৃষ্টির পর হ'তে—এবং বহুদিনই তার সৃষ্টি হয়েছে—দুজনার এই প্রথম মিলন হ'ল।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

বিষাদ ছবি

(১)

তোমারে দেখেছি ওগো আকুলিত লোচনে
অশ্রুঘন শোচনে ও আঁখি জল মোচনে।
রাঙা রাঙা তাঙা বেশে, সর্ব্বহারা শ্মশানে
মুখখানি চিতা পাশে, বিজয়ার ভাসানে।

(২)

ফলশের উরুতলে, ফুলশের লতাতে,
আঁখি জলে ব্যথা পাওয়া আধা আধা কথাতে।
বুকে চাপা দুখে কাঁপা ধরিত্রীর অন্তরে
পোকামরা দুরে ঝরা ফুলকলি নগরে

(৩)

শিউরায়া ধরিত্রীর ছল ছল আঁখিতে
তোল নাই ভাবাকুল আঁখি তব রাখিতে।
বিহগের ধরধরে বেঁধে বেই নিবাসে,
বুকে তারে ধরি কাঁদো বিষাদিনী বিষাদে।

(৪)

রও ঢাকা ধূলা ঢাকা বিষবধে মুকুরে,
ফুলহরা কাঁচা বীণা, পদ্মহারা নূপুরে,
এসো কেঁদে কেঁদে ফোলা আঁখি কোলে বসিতে
বিশে রও নিশি শেষে চলে পড়া সঙ্গীতে।

(৫)

বল কোন উচাটন ভক্তে ছিলে লগনা,
ছিলে কোন ধূলাবতী ধ্যানে তুমি মগনা।
বলে তুমি বলকার রঞ্জিত সোহাগে
মরমের বীণা তার বাঁধিয়াছ বেহাগে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মাসিক কাব্য-সমালোচনা

ভারতবর্ষ বৈশাখ। এই সংখ্যায় ভারতবর্ষ সম্পাদক মহোদয় "সাময়িকী" তে আমাদের 'তীব্র সমালোচনা' লক্ষ করিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। জলধর বাবু প্রবীণ ও সুধী সাহিত্যিক—তিনি যে তাহার এবিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার ন্যায় ধীর স্থির শান্ত চরিত্র সাহিত্য সাময়িকীরই উপযুক্ত হইয়াছে। তাঁহাকে আমরা পরম শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। সমালোচনাচ্ছলে যদি কোন তীব্রতা তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিয়া থাকে এবং ব্যথা দিয়া থাকে তবে সেজন্য আমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁহার ন্যায় মনস্বী প্রবীণ সাহিত্যসেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আমাদের লজ্জা বা দ্বিধা নাই।

তবে এই উপলক্ষে দুইকথা আমাদেরও বলিবার আছে।

এক খানি সুবৃহৎ মাসিকপত্র সম্পাদন করিতে হইলে অনেক ত্রুটী হইবার কথা। বিশেষতঃ কবিতা নির্ব্বাচনে তাঁহার যে অনেক ত্রুটী হইত তাহা তিনিও অস্বীকার করিতে পারেন না। ত্রুটী চ্যুতি ও দোষাদির সমালোচনা হইবেই এবং সে জন্য অপ্রিয় কথা শুনিবার জন্য তাঁহার প্রস্তুত থাকা উচিত। বৈষ্ণবচূড়ামণি মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা ও তাঁহার বন্ধুবর রাধাকমল বাবুর সম্পাদিত পত্রিকা বলিয়াই অপ্রিয় কথা সমালোচনাচ্ছলে বলিতে বিরত হইব না। তবে তীব্র আক্রমণ সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য—তীব্রবাক্য ব্যতীত অনেক জিনিস অনেকের কর্ণে প্রবেশই করেনা—সে জন্য অনেক সময় "যা দিয়ে বাঁচাইতে বা আঘাত করিয়া জাগাইতে হয়। জলধর বাবু কবিতা নির্ব্বাচনে বড়ই উদাসীন ছিলেন, সে জন্য তাঁহাকে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছে—কিন্তু ইহা অনিবার্য্য! তিনি যে কারণেই হোক ভারতবর্ষে কবিতা প্রকাশ একেবারেই উঠাইয়া দিয়াছেন—এজন্য তিনি আরো অধিক অপরাধী। যে পত্রিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে কবিতায়, যে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা একজন মহাকবি, সে পত্রিকায় যদি একেবারে কবিতা প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে লোকে তীব্র সমালোচনা করিবে—তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আমরা কিছু না বলিলেও অপরেরা 'দশ কথা' বলিতে ছাড়িবে না। কাগজে কলমে ২।৪ জন বলে বটে মুখে যে কত লোক এবিষয়ে তীব্র সমালোচনা করে তাহাত তিনি শুনিতে পান না।

জলধর বাবু বঙ্গ সাহিত্যে সুসমালোচকের অভাবের কথা তুলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গ সাহিত্যে সুসমালোচকের অভাব তাহা আমরাও স্বীকার করি কিন্তু ভারতবর্ষে তিনি যে পুস্তকের সমালোচনা করেন তাহাকেও সুসমালোচনা বলিতে পারিনা। যতগুলি পুস্তকের সমালোচনা আমরা পড়িয়াছি—প্রায় সবগুলিতেই তিনি নির্ব্বিচারে প্রশংসা করিয়া ছাড়িয়াছেন। এইরূপ সমালোচনা সৌজন্যের দিক হইতে প্রশংসনীয় হইতে পারে—কিন্তু সমালোচনার দিক হইতে উচ্চদরের নহে।

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ পত্রে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ রায় যে প্রকার তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তীব্র আক্রমণ করিয়া থাকেন তাহাকেও সুসমালোচনা বলিতে পারি না। অমরেন্দ্রনাথ রায় যে ভাষায় দেশমান্য ব্যক্তিগণের প্রতি আক্রমণ করিয়া থাকেন তাহা হইতে তীব্রতর আর কি হইতে পারে?

কিছু দিন আগে ভারতবর্ষে "ভাব তান্ত্রিক সাহিত্য সেবী" নামে এক খানি চিত্র জগদ্বিখ্যাত রবীন্দ্র নাথকে ও ভারতী প্রবাসী নব্যভারত ও নবনূর পত্র পরিচালকগণকে যে ভাবে ব্যঙ্গ করা হইয়াছিল—তাহা অনেকেরই অসহ্য এবং তাহাতে আমরা বড়ই মর্ম্মপীড়া পাইয়াছিলাম—আমরা সে কথা আজো বিস্মৃত হইতে পারিনাই।

"তীব্র আক্রমণ" সকল পত্রিকাই কখনো কখনো করিয়া থাকেন। তীব্র মন্তব্য প্রকাশ দূষণীয় হইলে সকলের পক্ষেই তাহা দূষণীয়। এই প্রকারের ত্রুটী হইলে পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করাইয়া দেওয়া অথবা শৃধরীয় সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। লেখনী সংযম সকলেরই কিছু কিছু প্রয়োজন। বামনী বর্ষবাণী।

গান। কবি বলিতেছেন—

রাতের বাসা হয়নি বাঁধা দিনের কাজে ত্রুটী
বিনা কাজের সেবার মাঝে পাইনে আমি ছুটী
শান্তি কোথা মোর তরে হায়
বিশ্ব ভুবন মাঝে ?
অশান্তি যে আঘাত করে
তাইত বীণা বাজে।
ছিন্ন তবে প্রাণ পোড়ানো গানের আগুন জ্বালী
এইকি তোমার খুসী আমার তাই পরাণে কালী
সুরের গন্ধ ঢালা।"

কবি শুকদিন হাত মুখে বলিয়াছিলেন

গভীর দুঃখ ইত্যাদিদের হাসি মুখেই
বয় গো।

কাব্য লেখে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।"

কিন্তু সে একটা কথার কথা। কবির ঠিক মর্মকথা।

অশান্তি যে আঘাত করে তাইত বীণা বাজে।

এক দারিদ্র্য দুঃখই কবিকে ভোগ করিতে হয় নাই, নতুবা অদৃশ্য গভীর দুঃখের সহিত কবির নিত্য সাক্ষাৎ হইয়াছে। মহামানবের অন্তরের গভীর ব্যথা কবির নিত্যই মর্মস্পর্শ করিতেছে—হতভাগ্য দেশের গভীর অমূঢ় বেদনা কবির চক্ষুকে সততই সজল রাখিয়াছে—অধঃপতিত সমাজের শত শত লাঞ্ছনা ও পীড়ন কবির চিত্তকে পীড়িত করিতেছে—তাহা ছাড়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিত্য নৈমিত্তিক কত ব্যথা কবির চিত্তকে নিয়ত আঘাত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার উপর সাংসারিক ও পারিবারিক বেদনা কত তাহার যে হিসাব রাখে। জাতীয় কবির ভারির সর্বাপেক্ষা বেশী। যিনি সমগ্র মানব জাতির সুখ দুঃখের সহিত আপনার সুখ দুঃখ জড়াইয়া তুলিয়াছেন তাঁহার অশান্তির কি সীমা আছে ? তিনি যে জাতির মুখপাত্র—যে জাতির অগ্রণী—সে জাতি যদি বেদনায় নিয়ত ছট্‌ফট্ করে তবে নিবেদের জন্য কবির অন্তরে শান্তি থাকিতে পারে কি ? আপনার সুখ দুঃখই অপরের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে—স্বার্থান্বেষণ অপরের জীবনের ব্রত হইতে পারে, কবির নিজের সুখ দুঃখ তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ—দেশের ও জাতির সুখ দুঃখই কবির সুখ দুঃখ—মানব জীবনের উন্নতি সাধনই কবির জীবনের ব্রত।

হতভাগ্য দেশের কবি তাই বলিতেছেন—

শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্ব ভুবন মাঝে।
অশান্তি যে আঘাত করে তাইত বীণা বাজে।

তাই মানব-হৃদয়ের শত সহস্র ব্যথা কবির কাব্যে শত সহস্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—উহা "কান্ত মুখেই বহিতে পারে না" হৃদয়ের দুর্নিবিড় বেদনারয় বহন যা তাঁত তাহাদের জন্য হইতে পারে না উহা দেশাত্মবোধের সৌখীনতা নহে—উহা হৃদয় ভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস—উহা আঁখি কাটা অশ্রুজল। উহা হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিত। উহাতে 'প্রাণ পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা' বর্তমান।

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠকবি বেদনাসিন্ধুর তীরে সাধনা করিয়াছেন।

এমন করিয়া দুঃখকে কোনকবিই কাব্যে অমর করেন নাই—এমন করিয়া বেদনার গান কোনোকবিই গাহেন নাই—এমন করিয়া নিজে শতশতবার দুঃখের সহিত কেহই সাক্ষাৎ করেন নাই। দুঃখ তাঁহার দেশের নিত্যসঙ্গী—সে দুঃখকে তিনি বর্জন করিতে বা দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহেন নাই। দুঃখকে তিনি সানন্দে বরণ করিয়াছেন—দুঃখকে সহিবার ক্ষমতা তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন—হৃদয়ের দক্ষিণ দুয়ারখানি নির্ভীক হইয়া চাহিয়াছেন। দুঃখকে সঙ্গে করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছেন—

কবি বলিয়াছেন—

দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিবে।
যেমনতুমি ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড়তরে ধরিবে।

তিনি জীবনে যাহা অনুভব করিয়াছেন জাতীয় জীবনও তাহাই অনুভব করিতে শিখিতেছে—আজ মানবজাতি তাহার সঙ্গীতের উদ্দীপনায় দুঃখ দেবতাকে বরণ করিবার শক্তি আহরণ করিতেছে। দুঃখকে সহ্য করিতে না পারাই বেদনা, দুঃখ সহ্য করিতে পারায় ত অপূর্ব্ব আনন্দ। দুঃখের মধ্য দিয়াই ভগবানের সহিত ভক্তের মিলন—

ওগো রুদ্র দুঃখ মুখে
এই কথাটি বাজলো বুকে

তোমার প্রেমে আঘাত আছে সেইত অবহেলা। দুঃখ বহনের ও সহনের ফল জগতে কখনো ব্যর্থ হয় নাই। বিরাট মঙ্গল। কবিবর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়ের—

বিরাটত্বের অনুভূতি—আত্মার বিস্তার আত্মমহিমার উপলব্ধি এই কবিতায় সুন্দর ভাবে প্রকাশিত। এযেন ক্ষুদ্র ডিম্বের ঘন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া অনন্ত নীলিমার মাঝে আপনাকে প্রসারিত করা—রক্তমাংস শিরা নিষ্পিষ্ট আত্মশক্তির এ যেন মহামহিমায় আত্ম বিলয়।

মৃত্যুকের মত এ আঁধারে
কে রহিবে কূপের মাঝারে ?
কে রহিবে গর্ভের আবাসে ?
প্রাণময় নিরুদ্ধ নিশ্বাসে !
মহাবিষ্ণু নাভিমূল যাকে
যে মহান মহীরুহ রাজে
চির নব পল্লব পতাকা
আজি সে অক্ষয় বটশাখা। ৮

এই বিরাটত্বের অনুভূতি নানাদিক হইতে কবি যুক্তির সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন।

কি মোহে ছিলাম ভ্রান্ত শুনি শুনি অবিশ্রান্ত
গীতি কবিতার রসরসি
বিরাটের উঠিয়াছে বিরাটের উঠিয়াছে
আজি কি অপূর্ব্ব মহাধ্বনি।
ক্ষুদ্ররাগ ক্ষুদ্রদ্বেষ আজি নাই আজি নাই
শ্রীহীন এ মহা জাগরণে,
বিশ্বপ্রেম আলিঙ্গিছে কোটী কোটী নারী নরে
বিরাটের বিশাল প্রাঙ্গণে।
ক্ষুদ্রদেব দেবীপূজা মহাবিষ্ণু পূজা মাঝে
চিরতরে পাইল বিলয়
ছিন্নোদ্ভিন্ন দ্বৈত জ্ঞান অপূর্ব্ব অদ্বৈত জ্ঞান
আজি মম হৃদয়ে উদয়।

চারিদিকে বিরাটের নিত্যনবরূপ, আমরা ক্ষুদ্র শক্তির মধ্যে রহিয়া তাহার উপলব্ধি করিতে পারি না। বিরাট মহাসিন্ধু ঊর্দ্ধে বিরাট আকাশ নভোমণ্ডল—বিরাট সৌর জগৎ—বিরাট নক্ষত্র সঙ্ঘ বিরাট মহাদ্রি—বিরাট নদ নদীর গমগম নাদ—বিরাট মহীরুহ সমন্বিত বিরাট অরণ্যানী বিরাট মরুভূমি। বিরাট মেঘপুঞ্জ বিরাটের রুদ্ররূপে বজ্রাবজ্র—উত্তাল তরঙ্গময় প্লাবন - পৃথিবীর বিরাট কম্পন—মহামারী দুর্ভিক্ষ—বিশাল রণক্ষেত্র রক্তসিন্ধু—হস্তী অশ্ব রথাদির বিরাট সম্মিলন। বিরাট সভাসমিতি—বিরাট জনস্রোত—বিরাট কুম্ভমেলা—তীর্থের ভক্তযাত্রীর সম্মিলন—গঙ্গার ঘাটে মহাযোগে স্নানার্থীদের বিরাট ভার চারিদিকে বিরাটের নবনব প্রকাশ—তবু আপনার ক্ষুদ্র কুলায়কেই সর্ব্বস্ব করিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে কে চিরদিন সুপ্ত রহিবে ? আকাশে বাতাসে জলেস্থলে বিরাটের বিষাণ ধ্বনিতে আহ্বান চলিতেছে। যখন চারিদিকে বিরাটের খাণ্ডবদাহন তখনো অনেকে নিজ নিজ স্বার্থের কুলায় রক্ষায় ব্যস্ত। বিরাটের অট্টহাস্যে যখন দিগ্‌দিগন্ত কম্পমান—তখনো কি ক্ষুদ্রনীড়ে বসিয়া প্রণয় কূজন চলে ? বিরাটের তাণ্ডবনর্ত্তনে যক্ষ রক্ষ কিন্নর সিদ্ধ পিশাচ গন্ধর্ব্ব দেবদানব প্রেত পশু নাগ যখন সকলেই যোগ দিয়াছে, তখন মূষিক আর পেচক ছাড়া তাহাতে কেনা যোগ দিবে ?

বিরাট জ্ঞানসিন্ধু সম্মুখে উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত তীর কূলে বসিয়া শুধু উপল খণ্ড কুড়াইয়া কে সুখী রহিবে !

ঐ শোনো যুক্তি সঙ্গীতে বিরাটের স্তুতি গান—

কোটীচন্দ্র কোটীসূর্য্য মঙ্গল ও শনৈশ্চর
কোটীবুধ কোটী বৃহস্পতি

অন্তহীন লীলাবলী এ অপূর্ব্ব রেখাশীতে
করে তব মঙ্গল আরতি
আবার নিবেষে হারা নিবে নিবে যায় যায়
সূচিভেদ্য ঘন অন্ধকার
প্রলয়ের রাত্রি যেন এসেছে এলোকেশ
কেশে কেশে একি একাকার
নাহি চন্দ্র নাহি রবি একি স্বয়ম্প্রভা জ্যোতিঃ
চক্রে চক্রে মণ্ডলে মণ্ডলে
ডুবেছাই ডুবেছাই আপনা হারায় যাই
ও জ্যোতির গভীর অতলে।
শব্দস্পর্শ রূপরস গন্ধের অনাদিমূল,
নামরূপ লীলার আধার
সীমানাই রেখা নাই একাকার একাকার
একি মহা জ্যোতি পারাবার।

• • •

করুণানিধান বাবুর কবিতার খুঁটীনাটী ত্রুটী ধরিয়া যাঁহারা কবিকে সমালোচনা করিয়াছি—তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহা শুধু শব্দ-ঝঙ্কারের কীরকার্য্য তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সে জন্য মাধুর্য্যের সন্ধানে ভ্রমরের ন্যায় পাপড়িতে পাপড়িতে ভ্রমণ করিতে হইতেছে—কবিবরের এই "বিরাট মঙ্গল" কাব্যের পিরামিডের মত ইহার সৌন্দর্য্য (sublimity) ইহার বিরাটত্বে—ভৈরবতায়—ইহার শাখা প্রশাখার ন্যায় গাম্ভীর্য্যের সমবায়ে। এজন্য এ সকল কবিতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের খুঁটীনাটী বিচারের প্রবৃত্তি হয় না বা অবসর ঘটে না বা প্রয়োজনও নাই।

আত্মজগৎ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কাব্যে তত্ত্ব কথা হইলেও স্থলে স্থলে কবিত্ব আছে।

"স্বর্গে দেবতা তবগান গেয়ে
নরকেও তোর স্থান নাই।"
"তৃণ হতে পুনঃ অধিক ক্ষুদ্র
কুন্থিত (?) প্রাণে গন্ধ উদরে
আকাশেরো বেশী আছে ঠাঁই।"
"ফুটে সুরভিত (?) লালসা"
মানস সরসীবাসী অপ্সরী
বসিতোমি ঘুম শিয়রে"
"জাহ্নবী তীরে পুত করণায়
গোপন হিংসা খুঁজিছে শিকার"

ইত্যাদি অনেকস্থলই ভাল লাগে নাই—যথা যথা ভাষার দোষ আছে—প্রকাশ ভঙ্গি জটিলতাময়।

বসন্ত অভিসার। কবি করুণা নিধান।

ভারতীতে প্রকাশিত বসন্ত বিলাস যে শ্রেণীর বসন্ত অভিসারও সেই শ্রেণীর হইলেও ছুটীতে যেন প্রভেদ আছে। বসন্ত অভিসারে কুহেলিকার পর্দ্দা নাই—যথা যথা ইহাতে প্রহেলিকা নাই—আর এ কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে অংশে অংশে যেন মিল আছে। বসন্ত বিলাসের মত ছাড়াছাড়া এলোমেলো গোছের নহে।

বসন্ত অভিসারে কামনার উদ্বোধন। নব ভাবে কবি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। আর একদিন

"নাগকেশরের গন্ধে পাগল সাঙ্গ কাহন হাওয়া
কুণ্ঠিত কেন কণ্ঠ তুহার? কোন্ সুরে যায় গাওয়া।"

• • • •

যামার কি আজ শঙ্কাসরস নয়ন ঈষীবরে
লোলুপ আজকে অধর তুল গন্ধ মধুর তরে।
এমন মধু বসন্ত সাঁজ কিসীর কল গুঞ্জন
মিছে আজ এই যৌবিক লাজ লজ্জার অনুরঞ্জন
ইত্যাদিতে যে যৌবনের উদ্বোধনা—

প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহাতে তাহাই আরো ঘোরালো ভাবে গাহিয়াছেন। ইহার আরম্ভটাও ঐ প্রকারের

ওরে—ফুলকোটে আজ বসন্তর
• সাজে কি লাজ বসন তোর
ওই—অলক দাবে চিকণ কালো কুন্তলে?
আর—তুলসি কে কে পুষ্পাগেরি
শাখার বাঁধা বিদোদে?

কবি সত্যেন্দ্রনাথের—

"এস তুমি বাসন্ত বায়ে ফুলন ঝুলাবে"

এই শ্রেণীর কবিতা। কবি সত্যেন্দ্রনাথ—'বসন্ত' ও 'বরষায়' অভিসারের ও যৌবনের উদ্দাম উচ্ছ্বসনার বর্ণনার চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন। তাঁহার 'কাজরী পূর্ণাপং ও কুসুম পলাশং এই দুই বিশদশী কবিতায় যৌবনসঙ্গের অজস্র মদস্রাব।

কল্পনাবাবু যৌবনের লালসা লীলাকে এ কবিতায় নিষ্করুণ ও নগ্ন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

আবরণের মধ্যে—'বরস্ত ফোটা
ফুলের চিক্ চিক্ চাহনি' আর
নয় পরাণ চারুক সুরের পর্দাতে।
চৈত্র ফল্গুর রক্তি ফুলশরের
আকুলতা কবির মদিরাময়
ভাষায় বেশ সুন্দর ফুটিয়াছে।
বংশীধারী। শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

বিশ্বমণীর দু'টি রক্ত হরটী বধূ। বংশীধরের বাঁশীর নানা সুর বিশ্বপ্রকৃতির রূপ পরিবর্ত্তনে প্রকটিত। ইহাই কবিতার বক্তব্য। ভাবে একটু বৈচিত্র্য আছে এবং কবিতাটি সুরচিত।

ভিখারিণী। Engene Manual হইতে সুবাদিত। কবিতার ভাবটী অতি সুন্দর। অনুবাদ অনবদ্য। ভিখারিণী বালিকা রোগ-শয্যালীন পিতামাতার জন্য পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা করে কিন্তু বালিকা-সুলভ অকলঙ্ক হৃদয়ের সুপ্রসন্ন আনন্দোচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে ক্রীড়াকৌতুক করে, হাস্য করে ও গান গায়। বালিকার যুগপৎ হাসি অশ্রুর অভিনয় দেখিয়া পান্থ বালিকাকে প্রবঞ্চনাময়ী মনে করিয়া তিরস্কার করিতেছে। বালিকা উত্তরে বলিতেছে—

"আমি গান গাহি,
শুধুই আমার লাগি। অপরের তরে
অশ্রুধারা বহে।"

রমণীবাবুর ছন্দোবন্ধন অনিন্দ্য ভাবাচ্ছন্দ অতি সুচারু ও নিখুঁত—কবিতার কোনো স্থানে বিন্দু মাত্র জটিলতা নাই —আগা গোড়া স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। অনুবাদে রমণী বাবুর হাত বড় মিঠে—অনুবাদকে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। রচনা চারুর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের মধুর মিলন রমণী বাবুর কবিতার বিশেষত্ব।

শ্রী মনোরমা দেবীর "যমুনা দর্শনে" কবিতায় ছন্দের কোনো দোষ নাই।

পরিচারিকা, ফাল্গুন। "অঞ্জন"—সম্পাদিকার।

"ঋতুসংহার" শ্রীকৃষ্ণের দান সাধ্য। বসন্তে—কিশোরীর, গ্রীষ্মে—নবোদ্ভিন্ন যৌবনার, বর্ষায়—পূর্ণ যৌবনার, শরতে,—প্রৌঢ়ার, প্রণয়ের ক্রমবিকাশ দেখানি হইয়াছে। হেমন্তে—মাতৃমমতার ঐশ্বর্য্য ও শীতে—বৃদ্ধার মৃত্যু প্রতীক্ষার কথা আছে। এ সকল ভাব অতি পুরাতন। বহু কবিগণ এইসকল ভাব অবলম্বন করিয়া অনেক কবিতাই লিখিয়াছেন। মাসিক পত্রেও সে সব প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষত্ব বা বৈচিত্র্য কিছুই নাই। কবিতা অবশ্য দীর্ঘ হইয়াছে। সে জন্য রস ঘন হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরে মধ্যে সরল করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেও তাহার নূতনত্বের জন্য কবিতাটি চলিতে পারিত। তাহা ছাড়া ভাষার দুর্ব্বলতাও কম নহে। "অমৃত সুরভি প্রেম" "কেতকী আসবে সাজি (?)" "বনকুন্তলিনী" "বর্ষাস্বরূপিণী" "লালসা বিকোচ নাই অশান্তি চঞ্চল" "কবোষ্ণ (কবোষ্ণ নাকি?) উত্তাপ শুধু মৃদু স্পর্শ করে" "অনাদৃত অবসন্ন হিমানীসমান" "আসন্ন তামসী কুমার পতনে শুধু কাতরে নিশ্বসি" ইত্যাদি অনেক স্থলে ভাষা বিন্যাসের নানাবিধ দোষ আছে। সম্পাদক মহাশয়ের হাতে পড়িলে তিনি সহজে ছাড়িবেন না। কবিতা ক বিহারিছি বিশদশী করিয়া গাও কি? কবিবর দেবেন্দ্রনাথের 'বিরাট মঙ্গল' বিরাট কবিতা কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাস ও প্রবাহের প্রাচুর্য্য-বিকতা তাহাকে বিরাট করিয়াছে—পাঠ কালে কোথাও ক্লান্তি জন্মে না। কৃত্রিম ভাবে টানিয়া বুনিয়া লম্বা করিলে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন ছাড়া অন্য কি লাভ জন্মে? একাগ্রতা। চীনা কবি চুকুন্ হইতে অনূদিত অনুবাদক কবি কালিদাস রায়। কবিতায় এমন কিছু নাই যাহার অনুবাদ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন ছিল।

আপনই কবিতার অনুবাদ করিয়া অনেকে কেন যে শক্তির অপব্যয় করেন তাহা আমরা বুঝি না।

সমুদ্র মন্থন। 'লিপি' ২চরিতা।

'লিপি' কি কোনো গ্রন্থের নাম—না কোনো কবিতার নাম?

কবিতাটি সুরচিত। কবিয়ার সে দিনকার রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয় লক্ষ্য করিয়া লিখিত। শেষ Stanzaটী সুন্দর।

কে আসিবে? কে রক্ষিবে? জগতের জনতা মাঝে
এ সঙ্কটে কে হবে শরণ?
মুক্ত বেণী রাজসেনী দাঁড়ায়েছে অঘনতা পাকে
আশঙ্কায় ব্যাকুল নয়ন।
শেষ অংশলাভ লাগি' ঝাপুড়ঝুড়ি-সৈ মিশ্চল
তীব্র, ক্রোধ, গুরুতার মুদিয়াছে নয়ন যুগল
দুঃশাসন টানিতেছে বাস
বিকট কুটিল হাস্যে করিতেছে কত উপহাস
রক্ষিতে এ পাকালিয়ে কেহ নাই, এস নারায়ণ
জগৎ সভায় যাহে লজ্জা রাখ লজ্জা-নিবারণ।

স্বপ্ন। শ্রী কুমুদ রঞ্জন মল্লিক

কবিতাটিতে সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা ব্যষ্টিগত সৌন্দর্য্যের প্রাধান্য। কবিতার কোন কোন অংশ আমরা ভাল বুঝিতে পারিনাই—

যথা "হারায় সে যে কোমল কায়া
নিত্য আমার বিশ্ব সারা
নিত্য লভে নেত্র যারা
দুই জগতের অর্ঘ্য।"

এ অংশটি কি রীতিমত জটিল নহে?

"কিনু সুখের ইন্দ্র ধনু
শুষ্ক তরুর পুষ্প রেণু
হারা বাঁশীর সাড়া আমার
চেনা গলার স্বর গো"

* * *

"অশ্রুধারায় কাদা কূল ও
রক্তজবার থলা
*
পিছল পথের পায় পালা
কণ্টকেরি কণ্ঠমালা
আশার আমার আশামুখী
(শোভার সরোবর গো)

এ সকল অংশ বেশ সুন্দর। মিলগুলিও কুশলতার নিদর্শন। এ স্বপ্ন কি constructive—imagination যাহার সাহায্যে সাহিত্য শিল্প ইতিহাস, পুরাণ, বিজ্ঞান মানবের মানস ক্ষেত্রে গঠিত হইয়া উঠে? না এসব সেই স্বপ্ন যাহার কথা Shake-peare Prosperoর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন?

We are such stuff
As dreams are made of,
and our little life
Is rounded with a sleep.

খাঁচার পাখী। শ্রী পুলক চন্দ্র সিংহ।

কবিতাটিতে সব হতে আমার ভাল লাগিয়াছে আমার দুইটী পংক্তি।

জ্ঞান দিয়ে যে যায়না বোঝা
গানের সুরে হয় সে সোজা।

পুলক বাবুর রচনা চাতুর্য্য আছে ছন্দোবন্ধে বেশ হাত আছে। কিন্তু বিষয় বৈচিত্র্য ও বিষয় গুরুত্বের অভাব। কবি অবহিত হইয়া অনুশীলন করুন এবং বাস্তব জগতের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহার ও তাঁহার সমযোগিগণের সদা কবির কথা স্মরণে রাখা উচিত—

আমার প্রভুর চরণ তলে
শুধুই কিরে মাণিক জ্বলে
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটীর ঢেলারে

প্রভুর চরণ তলে যে লক্ষমাটীর ঢেলা লুটিয়ে কাঁদিতেছে কবি কি তাহাদের দিকে চাহিবেন না?

মুক্ত। সাবিত্রী প্রসন্নের।

ক্ষুদ্র কবিতা। ছয় লাইন কবিতার মধ্যে দুই লাইনে দুইটী শব্দকে চক্ষের বাহিরে রাখিয়াছেন—ঐ শব্দ দুইটিকে অনায়াসে পংক্তির মধ্যেই স্থান দিতে পারিতেন।

পরিচারিকা। ১৩২৪। চৈত্র প্রথমেই কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের বেচেরো" বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের পরই যে সকল কবির নাম করা চলিতে পারে তাঁহাদের মধ্যে প্রথমা শ্রীযুক্তা কামিনী রায় অন্যতমা। তাঁহার আলো ও ছায়ার কবিতাগুলি বঙ্গ সাহিত্যের দুর্লভ রত্নাবলী। বহুদিন তাঁহার কবিতা আমরা দেখি নাই। ইঁহার আলো ও ছায়ার কবিতা গুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল না। কিন্তু সমালোচ্য কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দৃষ্ট হয়। কবিতার বক্তব্যের মূল কথা।

"জীবনের কাজ, জীবন জাগায়ে রাখা।"

দুইটী উপমায় বক্তব্য সুস্পষ্ট হইয়াছে—

"প্রদীপ সার্থক হয় প্রদীপ্ত হইয়া
আপনারে প্রকাশিয়া আর আলো দিয়া।
নদী বহে যায় শুধু সাগরের পানে
যেতে যেতে দুইকূল ভরে ধনে ধানে।"

কবিতার বাকী অংশ উপক্রমণিকা মাত্র। রচনা ভঙ্গে অনিন্দ্য ও বর্ত্তমান কলানীতির অনুযায়ী।

চণ্ডীদাস। কবি কুমুদ রঞ্জনের। কবি কুমুদ রঞ্জন কবিবর দেবেন্দ্রনাথের মত উপমার মালা গাঁথিতে পটু। কবি ধর্ম্মভক্ত চণ্ডীদাসকে কয়েকটী উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন। একাধারে তাঁহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভক্তের ঐকান্তিকতা ছিল তাই কবি তাঁহাকে 'পানিফলের বনে রক্ত কমল' 'পারিজাতের পরাগভরা গন্ধরসে (শ্রোণপুষ্প বলিয়াছেন। কবিতার মিলগুলি সুন্দর পরিপক্ক হস্তের নিদর্শন। ভাষা সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলিতে চাই—আশা করি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না। ৩ পং। অজ্ঞ ও অজ্ঞ একই অর্থ। ৭ পং। 'কোল ঘেঁসে' একটু গ্রাম্য। ৯ পং। 'হে' ১০ পং। 'হায়'—নেহাৎ পাদপূরণে! ১১ পং। কবি 'ধূম্র' অর্থে 'ধূম' প্রয়োগ করিয়াছেন—ধূম্র অর্থে ধূম নহে—ধূম্রবর্ণ। ১৪ পং। 'পৈরাগের' প্রয়াগের বদলে ব্যবহৃত। ১৬ পং। সুসম্ভব হয় নাই। ১৮ পং। "ভারত এবং বঙ্গকে" ভাল লাগে নাই।

সিন্ধুদর্শনে (পুরী)। শ্রীকালিদাস রায়। সিন্ধু অফুরন্ত কবিতার ভাণ্ডার। সিন্ধুর উপর কবিতা লেখেন নাই এমন কবি দেখি নাই। ভারতের মহাকবি কালিদাস হইতে বাঙ্গালার নবীনতম কবিতা লেখক কালিদাস পর্য্যন্ত সিন্ধুদেবতার চরণে অর্ঘ্যদান করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সিন্ধু অপূর্ব্ব ও অনিন্দ্য। রবীন্দ্রনাথের পরিবে সকল কবি সিন্ধু বন্দনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সুকবি চিত্তরঞ্জন ও সুকবি প্রমথনাথের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। চিত্তরঞ্জনবাবু সাগর সঙ্গীত নামে ও প্রমথবাবু পাথার নামে কাব্য গ্রন্থে সিন্ধু কবিতার চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন। অন্যান্য কবিদের মধ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, দেবকুমার ও কবি ললিতচন্দ্র মিত্র সিন্ধু সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহাদের ২।১টীর সমালোচনা আমরা উপাসনা পত্রিকাতে করিয়াছি। কবি যতীন্দ্র মোহনের "সমুদ্র কেনার প্রতি" ও সত্যেন্দ্রনাথের "সিন্ধু তুমি বন্দনীয়" মন্দ নহে। কিন্তু কবি করুণা নিধানের—

"তো মহার্ণব নীল ভৈরব
গর্জ্জৎ জল তরঙ্গে"

যেমন করিয়া কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে তেমন আর কোনোটাই নহে। কবির এই কবিতার তুলনায় 'বসন্তবিলাস' নিতান্তই অবনতির লক্ষণ বলিতে হইবে।

সমালোচ্য কবিতার তৃতীয় stanzaর ১২ লাইন ও চতুর্থ stanzaর ১৪ লাইন বাকী সকল stanzaতে ১৬ লাইন। এই অনিয়মের কারণ কি? বিশেষতঃ চতুর্থ stanzaর।

সেই হতে নাহি তব নিদ্রা প্রান্তি নাহিক বিরাম
শক্তির বিরাট যন্ত্র বলে—

তারপর বাক্যের শেষও নাই—ইহার সহিত মিলের জন্য প্রয়োজনীয় পংক্তি দুটীও নাই। কবির লেখনী হইতে প্রুফ সংশোধনের মধ্য পথে কোথায় ইহা হারাইল খুঁজিতে পারিতেছি না।

যে গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্যের সহিত কবিতার আরম্ভ সর্ব্বত্র তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই।

শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষের 'আশা' ভাল বুঝিলাম না। কেমন যেন ভাষার জটিলতা। ভাষা পাণ্ডিত্যের পাথর চাপে ভাবের অঙ্কুর নিষ্পিষ্ট। মাঝে মাঝে বর্ণাশুদ্ধিও আছে।

'বিশ্ববীণা'—তৃতীয় শ্রেণীর রচনা—ভাবে বৈচিত্র্য নাই ভঙ্গিতে নূতনত্ব নাই সঙ্গীতের মাধুর্য্য নাই—ভাষা পঙ্গু। প্রত্যেক পংক্তিতেই প্রকাশ দৈন্য।

"আশাময়ী"—কবিতায় বক্তব্যের বিশেষ বৈচিত্র্য না থাকিলেও প্রকাশটী সুন্দর হইয়াছে। রচনাটি বেশ ঝরঝরে ঝরঝরে—বেশ সহজ প্রবাহ আছে ভাষা চলনও সুন্দর।

পঙ্কজ।

জয়দেব।

অমর তীরের অয়ী সুধীকুল-রবি
জয়দেব অপরাধী তুমি শতবার
অনধিকারীর মাঝে ওগো মহাকবি
স্বর্গের সঙ্গীত কেন শুনালে তোমার?
হরিণ পশুবধূ ভেকের সমাজে
কেন বা ঢালিলে কেন মুকুতা ছড়ালে
হায় হায় শত নর-বানরের মাঝে
কেন দিলে শালগ্রাম বীবরের জালে?
আজি তুমি গাহিতেছ স্বর্গের সভায়
মুগ্ধচিত্তে শুনে তারা তব দিব্য গান,
মানুষ তাহার বলো কি বুঝিবে হায়
নীতির দোহাই দিয়ে করে অপমান।
দেবতার চেয়ে বড় হয়েছে মানুষ
পুরুষোত্তমের ভাবে লম্পট পুরুষ।

বরুচি।

পল্লীসেবার ব্যবস্থাপত্র

দেশের গ্রামগুলির অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। গ্রামবাসিরা রোগে ও অন্নকষ্টে ক্রমশঃ শীর্ণ ও হীনবল হইয়া পড়িতেছে। কৃষির অবনতি হইয়াছে, শিল্পসমূদয়ও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এমন কি গ্রামবাসিগণের ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধেও অবনতি দেখা যাইতেছে।

পল্লীগ্রামের এইরূপ অবনতির জন্য আমরা ক্রমশঃ দীনহীন হইয়া পড়িতেছি।

বাস্তবিক পল্লীজীবনের উন্নতিসাধন আমাদের জাতীয়-উন্নতির একমাত্র উপায়।

এইরূপ উন্নতির জন্য সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক। দরিদ্র ও দুর্ব্বল কৃষক, শিল্পী ও শ্রমজীবী একত্র হইয়া কাজ না করিলে সফলতা লাভ করিতে পারিবে না

আমাদের দেশের পল্লীবাসিগণের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সহানুভূতির অভাব নাই। সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার প্রণালীও দেখা যায়। যাহাতে কার্য্য করিবার এই প্রণালী পল্লী-সমাজের সকল অনুষ্ঠানেই সম্যক্ ও সুচারুরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উপযুক্ত উপায় বিধান করিতে হইবে। এই মূল সূত্র মনে রাখিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

(ক) কৃষিবিষয়ক।

একে একে স্বতন্ত্রভাবে মহাজনের নিকট অধিক সুদে কর্জ্জ না লইয়া গ্রামের সকল কৃষক মিলিত হইবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্জ্জের দায়িত্ব লইয়া যৌথ-কৃষিদান-মণ্ডলী গঠন করিতে হইবে, এই উপায়ে তাহারা অল্প সুদেই মহাজনের নিকট কর্জ্জ পাইবে; সকল কৃষকগণের অর্থ-সাহায্যে পাইকারী দরে শস্যের বীজ, সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা, এবং গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতিসাধন, চিকিৎসা ও সুস্থ সবলকায় বৎস-সম্পাদনের উপায় বিধান [illegible]তে হইবে; সাধারণ গোশালা স্থাপন করিয়া গো-গণকে সমভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধের বিশুদ্ধিরক্ষা এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতে হইবে।

(খ) শিল্পবিষয়ক

শিল্পিগণ, ব্যক্তিগতভাবে পাইকারদিগের নিকট দাদন না লইয়া মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করিবে, এবং পরস্পরের কর্জ্জের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অল্প সুদে মহাজনের নিকট কর্জ্জ লইবার ব্যবস্থা করিবে; পরস্পরের অর্থ সহায়তায় তাহারা অধিক মূল্যের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও দ্রব্যপ্রস্তুত-করণের উপকরণ সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

(গ) বাণিজ্যবিষয়ক

কৃষকগণ ব্যক্তিগতভাবে দালাল ও পাইকারগণের নিকট শস্যাদি বিক্রয় করিয়া আপনাদের ন্যায্য লাভ হইতে প্রায়ই বঞ্চিত হয়, ইহার প্রতিকারস্বরূপ সকলে মিলিয়া পাইকারী দরে সমবেতপ্রণালীতে শস্যবিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; শস্যের অবাধ রপ্তানি সংযত করিতে হইবে; খাদ্য-শস্যের বিনিময়ে বাণিজ্যোপযোগী শস্যের আবাদ হ্রাস করিতে হইবে; সাধারণ শস্য গোলাস্থাপন করিয়া শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; সাধারণ ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া পল্লীবাসিগণের নিত্য আবশ্যক দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে সুবিধাদরে ক্রয় করিয়া আনিয়া লাভ না করিয়া পাইকারী-দরেই পল্লীগ্রামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; পল্লীগ্রাম-জাত শিল্পদ্রব্যাদি ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কগণকর্ত্তৃক বিদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাবৎকাল বিক্রয় না হয়, তাবৎকাল শিল্পিগণকে আহার্য্য ও বস্ত্র কর্জ্জ দিতে হইবে; মেলা ও হাটে গ্রাম্য কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার-বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) শিক্ষাবিষয়ক

গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ব্যবহারিক বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে ; প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে আপনার দৈনিক হিসাব লিখিতে এবং সংবাদপত্র পাঠ করিতে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য্য-প্রণালীসম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে ; কারখানায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কার্য্যপ্রণালী প্রচলন করিতে হইবে। ব্যয়সাপেক্ষ কৃষিযন্ত্র, সার ইত্যাদি অথবা শিল্পকার্য্যের যন্ত্রপাতী এবং উপকরণ-দ্রব্যসামগ্রী সমবেত-ভাবে ক্রয় করিবার সুযোগ বিধান করিতে হইবে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি লোকশিক্ষার অমূল্য গ্রন্থগুলির চিত্রশোভিত, সুখপাঠ্য আধুনিক সংস্করণ সমূহ বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে ; স্থানে স্থানে পাঠাগার-স্থাপন করিয়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রদ পুস্তক রাখিয়া জনসমাজে ঐ গুলির প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিকে আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে ; পল্লীগ্রামে ফকীর, ভিক্ষুক এবং বৈরাগীর গান ও ছড়াগুলি যাহাতে নূতন সমাজ এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের উপযোগী হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঙ) স্বাস্থ্যবিষয়ক

পল্লীবাসিগণের সমবেত উদ্যোগ-ও উদ্যমে গ্রামের বনজঙ্গল পরিষ্কার; নদী, খাল, পুষ্করিণী ইত্যাদির সংস্কার-সাধন, পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী, কূপাদিখনন ও সেইগুলির বিশুদ্ধতারক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মারিভয়ের সময়ে রোগিচর্য্যা এবং রোগ-প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; দেশের গাছগাছড়া ইত্যাদির গুণাভিজ্ঞ বৈদ্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া সহজ এবং সুলভ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; পল্লীগ্রামবাসি-গণের শ্রমময় জীবনকে কথঞ্চিৎ সুখী করিবার জন্য পল্লীক্রীড়া, আমোদ, ব্যায়াম প্রভৃতির উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

এই সমস্ত আয়োজন যাহাতে সমগ্র দেশে বিপুল বিস্তৃত হইয়া, আমাদের জাতীয় অবনতি প্রতিরোধ করিতে পারে, তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায়, একনিষ্ঠ কল্যাণকর্ম্মী পল্লীসেবকের প্রয়োজন। পল্লীসেবকগণের ভাবুকতা, উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের উপরেই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এই পল্লী-সেবকগণের কল্যাণকর্ম্মে সুবিধা ও সুযোগ বিধানের জন্য দেশের শিক্ষিত ধনী, এবং জমিদারবর্গকে মুক্তহস্ত ও সদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

UNIVERSITY OF CALCUTTA
LIBRARY
THE ADVANCEMENT OF LEARNING

উপাসনা

১৪শ বর্ষ। } আষাঢ়—১৩২৫ { ৩য় সংখ্যা।

আলোচনী

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত-শাসন

আধুনিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ শিক্ষার সহিত জীবনের ঘনিষ্ট সংযোগ স্থাপন করা। উহা অবলম্বন করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গুলার ব্যবহারিক উপযোগিতা সমধিক বৃদ্ধি করিতে হইবে। এতদ্বারা জাতীয় ভাব সম্পদের বৃদ্ধি এবং দেশ সম্প্রদায় বা জনপদের বিশেষ বিশেষ অভাব মোচনার্থে শিক্ষণীয় বিষয়কে উপযোগী করিয়া লওয়াই যুক্তায়।

পাঠ্য-বিষয় নিরূপণ সম্বন্ধে, প্রফেসার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর নিয়োগ সম্বন্ধে এবং শিক্ষা সংঘের সুব্যবস্থা ও শাসন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন কলেজের অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক।

আমাদের প্রস্তাবিত কার্য্য-তালিকা সংক্ষেপে এই :—

(ক) পৃথক পৃথক সম্প্রদায় বা জনপদের অভাব নিরূপণ।

(খ) কলেজের অধীত জ্ঞান বিজ্ঞান সম্প্রদায় বা জনপদের সেবায় নিয়োজিত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় অন্বেষণ।

(গ) নূতন শিক্ষিতব্য বিষয়ের (new studies) বিরুদ্ধে সুসংস্কার নাশ।

(ঘ) চিরকালের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের আদর্শ ও বিদ্যানুশীলন পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ; এমন একটি স্বদেশী ও স্বতঃপ্রবুদ্ধ শিক্ষা-পদ্ধতির গঠন যাহা জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক উভয় প্রকারই হইবে; এবং সম্প্রদায় বা জনপদের সাধনা সম্ভূত বিশেষ বিশেষ চিন্তাধারা ও আর্থিক অভাব ও সুযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জাতীয় সাধনা ও বৈষয়িক জীবনের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে।

বর্ত্তমান শিল্পজনিত ধনসম্পদ ও শিল্পের উন্নতি অবনতির সম্ভাবনা পরীক্ষা করিবার জন্য এবং কৃষিবিষয়ক, শিল্প-বিষয়ক ও ব্যবসায়িক অভাব ও সুযোগ জানিবার জন্য প্রত্যেক জনপদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করা আবশ্যক। তাহার পর কলেজে এমন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত করা কর্ত্তব্য যাহা শুধু জাতীয় ভাব-সম্পদ নহে, ধনসম্পদেরও পোষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হয়। শিল্পের শিক্ষিতব্য বিষয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে পরস্পর যোগ থাকা আবশ্যক। বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভাব ও সুযোগের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন শিক্ষা-পদ্ধতি যে বর্ত্তমানে প্রচলিত তাহা অবশ্য পরিত্যাজ্য। স্বাদীয় অভাব মোচন, দেশের মঙ্গল, দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান এবং জনগণীয় ও জাতীয় জীবনের কল্যাণ বিধান, গ্রাম্য এবং নাগরিক জীবনের সুসামঞ্জস্য ও সৌকুমার্য্য বিধানের লক্ষ্যে চালিত হইলেই ধন-বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ব্যবহারিক শাস্ত্র ও

কলাবিদ্যা কেবল (live studies) সজীব জ্ঞান বলিয়া অবধিত হইতে পারে।

যে কলেজ যে প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত সেই কলেজ নিজ পাঠ্য বিষয় সেই প্রদেশের সাধনা সম্ভূত বিশিষ্ট ভাব সম্পদ অথবা ধনসম্পদ, এবং তাহার বৃদ্ধির সম্ভাবনার উপযোগী করিয়া লইতে পারিলে প্রত্যেক কলেজের স্বতন্ত্র গতিতে দেশের গতি, এবং সকলের গতিতে দেশের পরম গতি। সমগ্র দেশ এইরূপ স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র সাধনায় ধনী হয় এবং বিশিষ্ট শিক্ষাকে বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প সম্বন্ধীয় অভাব ও সুযোগের অনুযায়ী করিয়া দিয়া জাতীয় বৈভবেরও বৃদ্ধি সাধন করে। এই সূত্রে শিক্ষার একই প্রকার অভাব পূরণ করিবার নিমিত্ত একাধিক বহু কলেজ বা শিক্ষা-ব্যবস্থার সমবায় করিলে অযথা ক্ষতি হয় এবং একই কার্য্য বহুবার করা হয়। বিজ্ঞানের দিকে বিশেষতঃ ব্যবহারিক বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বাণিজ্যশাস্ত্রের বিভাগ সমূহে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় নিজ শক্তি কেন্দ্রীভূত করুক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজ সমাজতন্ত্র সম্বন্ধীয় এবং সুকুমার সাহিত্য-কলা-বিষয়ক শিক্ষাকে বিশিষ্ট নাগরিক সভ্যতার বহুবিধ কর্ত্তব্য ও সমস্যার সমাধানে উপযোগী করিয়া লউক। তাহা করিলেই বর্ত্তমান শিক্ষার আদর্শের যাহা কিছু দোষ তাহার পূরণ হইবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ক্ষেত্রের যে বিশিষ্ট অভাব তাহার প্রতিবিধান হইবে। যেমন মফস্বলে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা বিশেষ বিশেষ জনপদ বা সম্প্রদায়ের অভাব ও সুযোগের উপযোগী শিক্ষা-যন্ত্র গড়িয়া তুলার উপর নির্ভর করে, সেরূপ কলিকাতা রাজনগরীতে যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইবে তাহা নিম্নলিখিত বিদ্যা সমূহে বিশেষ ভাবে অনুশীলনের ব্যবস্থা করুক।

শিক্ষা, কলা, ব্যবহার-বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, নৃতত্ত্ব, নগরবিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থ-বিজ্ঞান, আর্ট সাহিত্য ও ধর্ম্ম। প্রাচ্য ভারত খণ্ডে ভারতীয় সভ্যতার ও পাশ্চাত্য বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র বহু-বিধ জনাকীর্ণ কলিকাতা রাজনগরী কেবল তখনই তাহার ভাব সম্পদের পুষ্টিসাধন ও ক্রমবিকাশের গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে বহন করিতে সমর্থ হইবে।

একটা নূতন তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষাপরিষৎ গঠিত হউক—

শিক্ষাবিষয়ে এই জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা শুধু কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-কেন্দ্রে বিধৃত থাকিবে না, কলিকাতা ও সমগ্র প্রদেশে যত কলেজ আছে তাহাদের উপর, এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পদ্ধতির উপরও সেই ক্ষমতা প্রসারিত হইবে।

এই শিক্ষা-পরিষদের ক্ষমতা নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিষয়ে চালিত হইবে :—

(ক) অধ্যাপক ও শিক্ষকগণকে বিশিষ্ট সার্টিফিকেট দান।

(খ) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সংযোগ সাধন।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দানের জন্য পরীক্ষা সমূহের তত্ত্বাবধান।

(ঘ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মফঃস্বলের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার আদর্শ-স্থ প্রণালী নিরূপণ করিয়া তাহাদের কার্য্যব্যবস্থা, পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাদানের প্রণালী অবধারণ ও তাহাদের দায়িত্বগ্রহণ।

(ঙ) তত্ত্বাবধানের পর রিপোর্ট প্রকাশ।

(চ) শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় সংবাদ প্রকাশ।

শিক্ষা-পরিষদের পাঁচ জন সভ্য হইবে। রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটগণ তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচ বৎসরের জন্য মনোনীত করিবে। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন অন্ততঃ শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যের সঙ্গে লিপ্ত থাকিবে এবং কলেজ সমূহের অভাব ও অভিযোগ জ্ঞাপন করিবেন।

শিক্ষাপরিষদের যিনি কার্য্যকর কর্ম্মচারী হইবেন তাঁহার পদবী খুব যাচের হইবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও সমগ্র শিক্ষাবিভাগ পরিচালনের দায়িত্বগ্রহণ করিবেন। তাঁহারই কার্য্যকুশলতা ও তাবুকতার উপর শিক্ষার ভবিষ্যৎ ক্রমবিকাশ নির্ভর করিবে।

সম্পাদকের ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে—

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

উৎসব তিথি

নিদাঘের চাঁপা তুমি শরতের শেফালি,
দিবসের ছায়া তুমি রজনীর দীপালি।
সন্ধ্যার মেঘে তুমি তারা হেমবরণী
ফুলহীন তরুদের কল্পকের তরণী।

ভরা পাত্র ভরা বনে আনো তুমি রসালে
প'ড়ো বাড়ী ভ'রে দাও দীপ্তবাতি মশালে।
পাহাড়ের বুকে তুমি ঝরনার ফেন সো
একটানা সুর খেয়ে পুষ্পেরি গো।

ভাঙা বুকে এসো তুমি ফুলাইতে বাথাটী
দেবহীন দেউলের কাটা বুকে লতাটী
শান্তির ফোটা তুমি দাও দীন কপালে
'ভাঙার ঘরে' তুমি এনে দাও 'গোপালে'।

হে অতিথি নবনীতি দেখা দিতে ভুল না
ঘর ঘর বারি ঘরে ফুলাইও ফুল না
যাবে যবে প'ড়ে রবে জীবনের বেলাগো
তুমি তাহে ঘনাইও সুখের মেলাগো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

গণিতপাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নীচে পরিকল্পনার যুক্তিপ্রকার প্রদর্শিত হইতেছে—

সমবৃত্তপরিধিপাদং হিন্দ্যাত্রিভুজাচ্চভূর্ভুজাচ্চৈব।
সমচাপজ্যার্ধানি তু বিকল্পার্থে যথেষ্টানি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :—বৃত্তপরিধির চতুর্থাংশকে (যুক্তিপরিকল্পিত রেখাদির দ্বারা) ছির করিবে। ঐরূপে উৎপন্ন ত্রিভুজ হইতে কতকগুলি জ্যার্দ্ধ সিদ্ধ হইবে; এবং ঐরূপে উৎপন্ন চতুর্ভুজ হইতে অপর কতকগুলি জ্যার্দ্ধ সিদ্ধ হইবে। ব্যাসার্দ্ধ স্থিরীকৃত হইলে ইষ্টানুরূপ (অর্থাৎ প্রশ্নোক্ত যে কোন) জ্যার্দ্ধ সিদ্ধ হইবে।

পদার্থ :—আর্য্যভটমতে কোনও চাপের (arc) জ্যার্দ্ধ বিপক্ষচাপের জ্যার (=chord) অর্দ্ধেকের সমান (Jyardha $A=\frac{\text{Chord of } 2A}{2}=R \sin A$)। অতএব ইহাকে ব্যাসার্দ্ধ দ্বারা ভাগ করিলেই আমরা

আধুনিক সিদ্ধান্তের সংজ্ঞানুযায়ী ত্রিকোণমিতির অনুপাতটী (trigonometric ratio ; "sine") পাইব। "sine" একটী সংখ্যামাত্র (abstract number) ; ইহাকে ব্যাসার্ধ দিয়া গুণ করিলে তবে জ্যার্ধ হইবে। অতএব ব্যাসার্ধের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত জ্যার্ধেরও হ্রাসবৃদ্ধি হইবে ; ব্যাসার্ধের পরিমাণের উপর জ্যার্ধের পরিমাণ নির্ভর করিতেছে। সেইজন্যই আর্যভট পূর্বে ব্যাসার্ধ স্থির করিয়া লইতে বলিতেছেন।

ব্যাসার্ধ এবং কোন চাপের জ্যার্ধ জানা থাকিলে সেই "চাপের অর্ধেকে"র জ্যার্ধ নির্ণয় করা যায়। ভাস্করাচার্য ইহার একাধিক নিয়ম দিয়াছেন, এবং তাহাদের প্রমাণও দিয়াছেন। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত "প্রাচীন" সূর্যসিদ্ধান্তেও জ্যাসাধনপ্রণালী আছে (চতুর্থ করণাধ্যায়ের ১—৫ শ্লোক এবং ৬—১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে মনে হয় যে চাপের জ্যার্ধ হইতে চাপার্ধের জ্যার্ধ নির্ণয় করিবার প্রণালী ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন সময় হইতেই প্রচলিত আছে। আর্যভট প্রথাটীর সাধারণ নির্দেশমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া কোন নিয়ম প্রদান করেন নাই, বা উহার কোন প্রমাণ প্রয়োগেরও প্রয়োজন মনে করেন নাই। অবশ্য ইহাতে আশ্চর্য হইবারও কিছুই নাই। কারণ আর্যভট যেখানে কথায় প্রশ্নাদিদ্বারা কোন বিষয় বুঝাইতেছেন, আর্যভটীয়ের কোথাও আমরা এরূপ কিছুই পাই না। গুণসূত্রের মত "আর্যভটীয়" গ্রন্থখানি কতকগুলি সূত্রের সমষ্টিমাত্র, তবে গুণসূত্রের এই বা পার্থক্য। ইহাতে বিষয়গুলি মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, কোন বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া হওয়া হয় নাই—সূত্র হিসাবে ইহা একটি বিশেষত্ব।

যদি ব=ব্যাসার্ধ, ক=চাপের জ্যার্ধ, খ=কোটিজ্যা, গ=উৎক্রমজ্যা, এবং ঘ=চাপের জ্যার্ধ হয়, তাহা হইলে

(১ম) $খ = \sqrt{ব^২ - ক^২}$,

(২য়) গ=ব−খ,

(৩য়) ব্যাস × গ=চাপার্ধের জ্যা-(=chord) র বর্গ =ঘ^২, অতএব

(৪র্থ) $ঘ^২ = \frac{ব \times গ}{২}$।

উপরি উক্ত প্রথম সূত্রের জ্যামিতিক জ্ঞান আমরা পরে ৭ শ্লোক হইতে পাই—"কর্ণবর্গ ভুজাবর্গ এবং কোটিবর্গের সমষ্টির সমান"।—৩য় সূত্রে কোটিজ্যার সংজ্ঞা মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ৩য় সূত্র ও ৪র্থ সূত্র একই। এই সূত্রই এখানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

মনে করা যাউক অলাভাভ একটী বৃত্ত। কেন্দ্র ইহার কেন্দ্র। লম কেন্দ্র অ একটী ব্যাস ; কেন্দ্র ল কেন্দ্র হইতে ব্যাসের উপর লব। অ ল কোন ইষ্ট চাপ। ল ম "ব ল" এই চাপের জ্যার্ধ। কেন্দ্র ম তাহা হইলে "ব ল" চাপের কোটিজ্যা, এবং ম অ উৎক্রমজ্যা। গণিতপাদের ১৭ শ্লোক হইতে আমরা আর একটী সূত্র পাইতেছি—

"বৃত্তে শরসংবর্গোঽর্ধজ্যাবর্গাদ্ স যদু দ্বয়োঃ।"

অতএব (ল ম)^২ = ম অ × ম ব ; অতএব (ল ব)^২ = (ল ম)^২ + (ম ব)^২ = ম অ × ম অ + (ম ব)^২ = ম অ × ম ব ("গুণসূত্র" দ্রষ্টব্য)। ইহাই আমাদের উপরোক্ত ৩য় সূত্র—

চাপার্ধের জ্যা বর্গ = ব্যাস × গ।

এখন "ল ব" চাপের জ্যা ল অ হওয়াতে, ল ব চাপের অর্ধেকের জ্যার্ধ = $\frac{ল ব}{২}$

অতএব ঘ^২ = ব্যাস × গ,

$\therefore ঘ^২ = \frac{ব্যাস \times গ}{৪} = \frac{ব \times গ}{২}$। (৪র্থ সূ।

প্রথমোক্ত সূত্র হইতে আমরা আর একটী বিষয় পাইতেছি—চাপোন ত্রিরাশির জ্যার্ধ, কারণ কোন চাপের কোটিজ্যা সেই চাপোন ত্রিরাশির জ্যার্ধের সমান [R cos A = Rsin (90° − A)]

যদি পরিধির চতুর্থাংশকে একটী সমচিহ্নিত ধারা দ্বারা ভিন্ন করা যায়, তাহা হইলে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে ৩০° অংশের (=৮ × ৩½ অংশের) জ্যার্ধ ব্যাসার্ধের সমান। আর ৩০ অংশের কোটিজ্যা (১ম সূ) ৬০° অংশের (=১৬ × ৩½ অংশের) জ্যার্ধের সমান।

এখন ৩০ অংশের জ্যার্ধ হইতে আমরা ১৫ (=৩° × ৫) অংশের জ্যার্ধ নির্ণয় করিতে পারিব। ১৫ অংশের কোটিজ্যা = ৭৫ (=৩° × ২৫) অংশের জ্যার্ধ। অতএব ৭৫ অংশের জ্যার্ধও নির্ণীত হইল। এইরূপে ১৫ অংশের জ্যার্ধ হইতে ৭½ অংশের জ্যার্ধ এবং ৭৫ অংশের জ্যার্ধ হইতে ৩৭½ অংশের জ্যার্ধ পাওয়া যাইবে। তাহাদের কোটি জ্যা হইতে আবার কতকগুলি জ্যার্ধ নির্ণয় হইবে। এইরূপে আমরা নিম্নলিখিত চাপের জ্যার্ধগুলি পাইব। (কোন চাপ ৩° অংশের কতগুণ সেই সংখ্যা দ্বারা সেই চাপ নির্দ্দেশিত হইতেছে)—

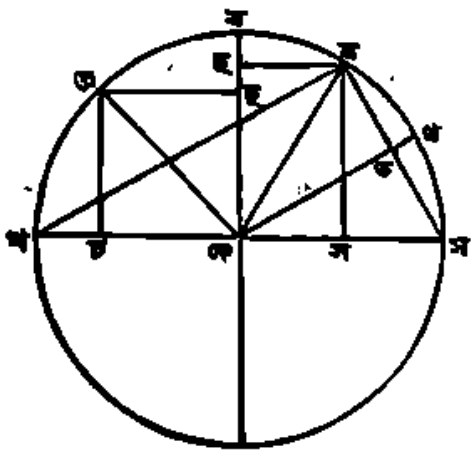

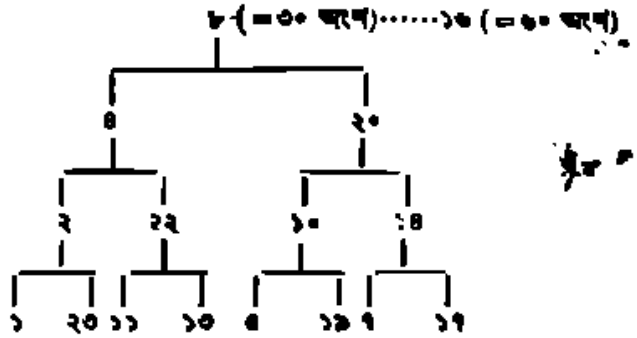

এইরূপে পরিধির চতুর্থাংশকে একটী সমচতুর্ভুজ দ্বারা ছিন্ন করিলে ৪৫ (=৩° × ১২) অংশের জ্যার্ধ পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আমরা নিম্নলিখিত জ্যার্ধগুলি প্রাপ্ত হইব—

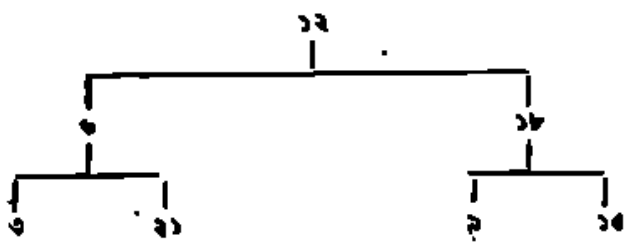

এইরূপে আমরা ২৩টী জ্যার্ধ প্রাপ্ত হইলাম। আর পূর্ব্বেই ব্যাসার্দ্ধ দ্বিখণ্ডীকৃত হইয়াছে, এবং ব্যাসার্দ্ধই ২৪ (=৩° × ২৪) অংশের জ্যার্ধ। অতএব ৩° × ১, ৩° × ২, ……৩° × ২৩, ৩° × ২৪ এই চতুর্ব্বিংশতি চাপের জ্যার্ধ পরিধির চতুর্থাংশ হইতে সিদ্ধ হইল।

ইহাই হইল সিদ্ধান্তপ্রণালী সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সর্ব্বদা এই নিয়ম প্রয়োগ করা কোন চাপের জ্যার্ধ বাহির করিতে হইলে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও সময়ের ব্যয় হয়। সেইজন্যই ধর্ম্মশীতিকায় আর্য্যভট এই জ্যার্ধগুলি বাহির করিবার একটী ব্যবহারিক সরল নিয়ম প্রদান করিয়াছেন। এই দুইটী উপায়ের সহিত বর্ত্তমান কালের logarithm এর table প্রস্তুত করিবার উপায়ের তুলনা করা যাইতে পারে। বীজগণিতের সাধারণ নিয়মানুসারে যে কোন সংখ্যার logarithm যথেচ্ছ সূক্ষ্মভাবে গণনা করা যাইতে পারে—তবে পরিশ্রম অধিক হয়। প্রথমে logarithm table এইরূপেই প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু এখন যদি কাহাকেও logarithm table প্রস্তুত করিতে দেওয়া যায়, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া **অন্তরক-গণিত** (Calculus of Finite Differences) এর প্রণালীমতে logarithm গুলির "প্রথম অন্তর" (First Differences) বা "দ্বিতীয় অন্তরের" (Second Differences) একটী সারণী (Table) প্রস্তুত করিবেন। কারণ গণনার পূর্ব্বানুরূপ সূক্ষ্মতা ঠিক রাখিবার (to the same degree of approximation) logarithm এর সারণী অপেক্ষা "প্রথম অন্তর" বা "দ্বিতীয় অন্তরের" সারণী প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম অনেক কম হইবে। পরে এই অন্তরের সারণী হইতে কেবল যোগ করিয়া করিয়া logarithm এর সারণী প্রস্তুত হইবে। ইহাই বর্ত্তমান কালের ব্যবহারিক নিয়ম। আজকাল যে কোন সারণীই এই উপায়ে প্রস্তুত হয়। আর্য্যভট ধর্ম্মশীতিকাতে উপরোক্ত চতুর্ব্বিংশতি চাপের জ্যার্ধের সারণী না দিয়া, ঐ সকল জ্যার্ধের "প্রথম অন্তরের" সারণী প্রদান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী লোকে আর্য্যভট ইহার উপপত্তি প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে

ইহা "প্রথম অক্ষর" গুলির "প্রথম অক্ষর" বা ব্যাপার্দ্ধগুলির "দ্বিতীয় অক্ষর" নির্ণয় করিবার উপায় যায়।

বৃত্তাদি পরিকল্পনাপ্রকার কথিত হইতেছে—

বৃত্তং ভ্রমেণ সাধ্যং ত্রিভুজঞ্চ চতুর্ভুজঞ্চ কর্ণাভ্যাং।
সাধ্যা জলেন সমভূরধউর্দ্ধং লম্বকেনৈব ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ :—ভ্রমের (১) দ্বারা বৃত্ত সাধন করিবে। ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ কর্ণের দ্বারা সাধন করিবে। সমভূ জলের দ্বারা এবং অধঊর্দ্ধ লম্বকের (২) দ্বারা স্থির করিবে।

(১) পঃ টীঃ—ভ্রমেণ কর্কটাখ্য যন্ত্রেণ ইতি। অর্থাৎ কাষ্ঠখণ্ডং সংগৃহ্য তস্য ঊর্দ্ধভাগে কণ্ঠপ্রদেশে পাশেন দৃঢ়ং বদ্ধ্বা অধোগতাগ্রাদপি কণ্ঠাৎ ছিত্বা শলাকাদ্বয়ং কৃত্বা তয়োরগ্রং তীক্ষ্ণাগ্রং কুর্য্যাৎ। এবম্বিধোমুখং কর্কট-যন্ত্রং ভবতি। পুনশ্চ শলাকয়োরন্তরালে শলাকাং নিধায় কর্কটকং বিবৃতাস্যং কুর্য্যাৎ। অন্তরালস্থশলাকায়া ঊর্দ্ধাধশ্চলনাৎ কর্কটাস্যস্থিতবৃত্তব্যাসার্দ্ধসমং কৃত্বা এক-শলাকাগ্রং সাধ্যবৃত্তমধ্যপ্রদেশে সংস্থাপ্যাপরমগ্রং বৃত্ত-নেমি প্রদেশে সংস্থাপ্য কর্কটং ভ্রময়েৎ। তদা তীব্রবৃত্তং ভবতি। ইতি।

(২) পঃ টীঃ—ওরত্রব্যাবস্থাগ্রবলম্বিতং সূত্রং অবলম্বক ইত্যুচ্যতে।

শব্দার্থ :—পরমেশ্বরের বর্ণনা হইতে "কর্কটযন্ত্র" সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ ধারণা হয়। দুইটী সরল যষ্টিকে ঊর্দ্ধভাগে কণ্ঠপ্রদেশে রজ্জুদ্বারা দৃঢ় বদ্ধ করিতে হইবে। যষ্টিদ্বয়কে সমান করিয়া তাহাদের অগ্রদ্বয়কে তীক্ষ্ণ করিলে অধোমুখ কর্কটযন্ত্র হইবে। এই শলাকাযষ্টিদ্বয়ের মধ্যে আর একটী শলাকা স্থাপন করিয়া যন্ত্রকে অপেক্ষাকৃতভাবে বিবৃতাস্য করা যায়, অর্থাৎ এই শলাকাটীকে ঊর্দ্ধে বা নিম্নে চালন করিয়া যন্ত্রের মুখ বড় বা ছোট করা যায়। যখন শলাকাদ্বয়ের অগ্রের অন্তরাল ইষ্ট বৃত্ত ব্যাসার্দ্ধের সমান হইবে, তখন একটী শলাকাগ্রকে কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া অপর শলাকাগ্রটীকে নেমিতে স্থাপন করিয়া ঘুরাইলে ইষ্ট বৃত্ত হইবে। "কর্কটাখ্য যন্ত্র"টী আধুনিক compass ব্যতীত কিছুই নয়। বৈদিক যুগে বোধহয় এইরূপ যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না। যজ্ঞ নির্মাণ সময়ে প্রায়ই বৃত্ত অঙ্কিত করিবার দরকার হইত। কিন্তু তখন ইহা অন্য উপায়ে সিদ্ধ হইত। কেন্দ্রে একটী শলাকা প্রোথিত করিয়া তাহার মূলদেশে একটী পাশ বদ্ধ করিয়া পাশাগ্রকে ঘুরাইয়া বৃত্ত অঙ্কিত হইত। যদিও শুল্বসূত্রে শঙ্কু (=পাশ) সাহায্যেই সমস্ত অঙ্কন কৌশল প্রদত্ত হইয়াছে—ইহাতে কর্কট যন্ত্রের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই যন্ত্রের প্রচলন থাকিলে সূত্রকার বোধহয় তাহার উল্লেখ করিতেন।

ত্রিভুজের একটী বাহুকে কর্ণ কল্পনা করা হয়। দুইটী ত্রিভুজকে পাশাপাশি স্থাপন করিয়া যে চতুর্ভুজ হয় এই বাহুটী তাহার কর্ণ (=diagonal) হয় বলিয়া বোধ হয় ত্রিভুজের পক্ষেও বাহুটীকে কর্ণ বলা হইত। অপর বাহু দুইটীর সমান দুইটী শলাকা এই কর্ণটীর দুই প্রান্তে স্থাপন করিয়া তাহাদের সন্ধি করিলে ইষ্ট ত্রিভুজ হইবে। এই শলাকা দুইটীকে ব্যাসার্দ্ধ করিয়া কর্ণ প্রান্তদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত করিলে তাহাদের ছেদবিন্দুদ্বয় পাওয়া যাইবে। একটী ছেদবিন্দু হইতে কর্ণ প্রান্তদ্বয় পর্য্যন্ত দুইটি সরল রেখা অঙ্কিত করিলে (বা দুইটী শলাকা স্থাপন করিলে) ইষ্ট ত্রিভুজ হইবে।

চতুর্ভুজের কর্ণ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে কর্ণটীর একদিকে দুইটী বাহু এবং অপরদিকে দুইটী বাহু অঙ্কিত করিলে ইষ্ট চতুর্ভুজ হইবে। যেমন দুইটী বাহু মাত্র জানা থাকিলে একটী ত্রিভুজ অঙ্কিত করা যায় না, সেইরূপ কেবলমাত্র চারিটী বাহু জানা থাকিলেই নিঃসন্দেহে (unambiguously) একটী চতুর্ভুজ অঙ্কিত করা যায় না। এই জন্যই কোন বিশিষ্ট ত্রিভুজ অথবা চতুর্ভুজ অঙ্কিত করিতে হইলে "কর্ণের" প্রয়োজন।

পরমেশ্বর বলিতেছেন—ভূমির সমবিষমতার পরিজ্ঞান জলের দ্বারাই হয়। জলসূত্রের দ্বারা ভূমি সমতল করিয়া একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। দুই বা তিন অঙ্গুলি ব্যবধানে সমকেন্দ্র (concentric) করিয়া আর একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। উক্ত পরিধির অন্তরাল প্রদেশ চতুর্দ্দিকে

খনন করিয়া কুলা সম্পাদন করিয়া জলের দ্বারা পূরণ করিবে। যদি চতুর্দ্দিকের জল তুল্যসম হয়, তাহা হইলে ভূমির সমতা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জলের নীচত্ব হইলে ভূমির উন্নতি এবং জলের উন্নতি হইলে ভূমির নীচত্ব প্রতীয়মান হইবে। দ্বারা ঐরূপ শঙ্কু (horizontal plane) জলের দ্বারা সাধন করিতে হয়। ইহাকেই water level বলে। spirit-level ও এইরূপ। কোন প্রদেশে তরল পদার্থের (liquid) তলই (surface) যে ক্ষিতিজ সমতল (=গোলপাদের "সমপার্শ্বস্থ" সমতল; horizontal plane) হইবে, তরল পদার্থ বিজ্ঞানের (Hydrostatics) এই মূলসূত্রের সম্যক্ উপলব্ধি হইতেই আর্য্যভটের এই সূত্র উদ্ভূত।

কোন গুরুদ্রব্য যদ্ধ একটী সূত্র অবলম্বিত হইলে তাহাকে "অবলম্বক" বলে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এখানে বোধ হয় "ঊর্দ্ধাধরেখার" সংজ্ঞামাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় তদতিরিক্ত একটী সত্য এই সূত্রটীর মধ্যে নিহিত আছে। ক্ষিতিজ সমতল প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত। তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায়ও পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। কোন প্রদেশের ক্ষিতিজতলের উপর অবস্থিত "লম্বই" সেই প্রদেশের "ঊর্দ্ধাধরেখা"। এই রেখা যে বিন্দুদ্বয়ে খগোলকে ছেদ করে তাহাই "ঊর্দ্ধবিন্দু" ও "অধোবিন্দু"। গোলপাদের ১৮—২১ শ্লোক হইতেও এইরূপ ভাবই প্রকাশ পায়। এই ঊর্দ্ধাধরেখা "ভূমধ্য" ভেদ করিয়া অতিক্রম করে। আমার বক্তব্য এই যে জ্যোতিষ সিদ্ধান্তে ইহাই "ঊর্দ্ধাধরেখার" নির্দ্দোষ সংজ্ঞা হওয়া উচিত। ইহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় মাত্র এই সূত্রে আর্য্যভট প্রকাশ করিয়াছেন। কোন সূত্রের প্রান্তে একটী গুরু দ্রব্য আবদ্ধ করিয়া সেই সূত্রটী অবলম্বিত করিলে সেই সূত্রটী যে ঊর্দ্ধাধরেখার সহিত মিলিয়া যাইবে, অর্থাৎ গুরুত্বার বিশিষ্ট প্রান্তটী যে "কেন্দ্রাভিমুখী" হইবে, এই সত্যটীর উপলব্ধি হইতেই এই সূত্রটীর অবতারণা। কিন্তু ইহা হইতে পৃথিবীর আকর্ষণ সম্বন্ধে আমি কোন সিদ্ধান্ত করিতে বলি না।

ইষ্টবৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ আনয়নের উপায়—

শঙ্কোঃ প্রমাণবর্গং ছায়াবর্গেণ সংযুতং কৃত্বা।
যত্তস্য বর্গমূলং বিষ্কম্ভার্দ্ধং স্ববৃত্তস্য * ॥১৪॥

অন্বয় :—কোন ইষ্ট শঙ্কু (প্রমাণ রাশির) বর্গের সহিত শঙ্কুর ছায়ার বর্গ যোগ করিয়া বর্গমূল গ্রহণ করিলে তাহাই "স্ববৃত্তের" (১) ব্যাসার্দ্ধ হয়।

(১) পঃ টীঃ—ছায়াগ্রেষ্যং শঙ্কুশিরঃপ্রোদ্ভি যদ্বৃত্তং মূর্দ্ধাবস্থ স্থিরং তৎ স্ববৃত্তমিত্যুচ্যতে।

দ্রষ্টব্য :—সাধারণতঃ ৩৪৩৮ ব্যাসার্দ্ধ ধরিয়া জ্যোতির্বিদ্ গণনা করা হয়। তবে অগ্রাদি আনয়নের জন্য এইরূপ "স্ববৃত্ত" কল্পনা বিশেষ উপযোগী। স্ববৃত্তে কোন গণনা সাধিত হইলে ত্রৈরাশিকের দ্বারা সহজেই ৩৪৩৮ ব্যাসার্দ্ধবৃত্তে সাধিত গণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩৪৩৮ ব্যাসার্দ্ধ বৃত্তে যেরূপ মহাশঙ্কু, সেইরূপ যে কোন ইষ্টশঙ্কু ছায়াকর্ণব্যাসার্দ্ধমণ্ডলে অবস্থিত।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের ত্রিপ্রশ্নাধিকারে ৭—৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

গ্রহগোলযন্ত্রাদিতে শঙ্কুছায়া আনয়নের উপায়—

শঙ্কুগুণং শঙ্কুভুজা বিবরং শঙ্কুভুজয়োর্বিশেষহৃতং।
যল্লব্ধং সা ছায়া জ্ঞেয়া শঙ্কোস্ত্বমূলাদ্ধি ॥১৫॥

অন্বয় :—শঙ্কু এবং কুলার অন্তরাল ভূমিকে শঙ্কু দ্বারা গুণিত (multiply) করিয়া, শঙ্কু এবং কুলার বিশেষের দ্বারা (অর্থাৎ শঙ্কুহীন কুলার দ্বারা) ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হয় তাহাই ঐ শঙ্কুর মূল দেশ হইতে ছায়া হইবে।

তাৎপর্য্য :—একটী দীপ কোন একটী শঙ্কু হইতে সামান্য অন্তরে এবং উচ্চে অবস্থিত। এখন ঐ শঙ্কুর ছায়ার প্রমাণ কি হইবে। এই প্রশ্নের সমাধান আর্য্যভট সূত্রটীর দ্বারা করিতেছেন। এখানে কুলা = ভূমি হইতে দীপোন্নতি (বা দীপশিখোচ্চ)। যদি "ক" দীপ এবং "কখ" দীপোন্নতি বা কুলা হয়, এবং "চছ" শঙ্কু হয়, আর

* ভা: কার্পের সংস্করণে "স্ববৃত্তক" আছে। তবে পরমেশ্বরের টীকায় "স্ববৃত্তক" থাকায় এখানে "স্ববৃত্তস্য" পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। শ্লোকের উদ্দেশ্যও তাহাই।

যদি "ক চ ঙ" রেখা ভূমিকে "ঙ" বিন্দুতে ছেদ করে তাহা হইলে "ছ ঙ" শঙ্কুচ্ছায়া হইবে। যদি "গ চ" ভূমির সমরেখা হয়, তাহা হইলে "ক গ চ" এবং চ ছ ঙ, ত্রিভুজ দুইটী সমজাতি হইবে। অতএব ক গ : গ চ = চ ছ : ছ ঙ—

অতএব $$= \frac{\text{চ ছ} \times \text{গ চ}}{\text{ক গ}}$$;

এখানে ছ ঙ = শঙ্কুচ্ছায়া,

চ ছ = শঙ্কু,

গ চ = শঙ্কু ভূমিবিন্দুর,

ক গ = শঙ্কু এবং ভূমির বিশেষ।

ব্রহ্মগুপ্তের গণিতাধ্যায়ের ছায়া ব্যবহারে ৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

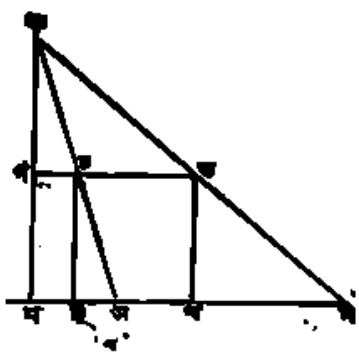

(উদাহরণ—

ত্রাত্রিংশদঙ্গুলা দীপোন্নতিঃ শঙ্কুর্বিনাঙ্গুলঃ।
দশাঙ্গুলা তদ্বিবরে ভূমিচ্ছায়াত্র কীর্ত্যতাং॥

দীপোন্নতি = ৩২,
শঙ্কুন্নতি = ১২,
অন্তরাল ভূমি = ১০,
শঙ্কু ভূমিবিশেষ = ৩২—১২ = ২০,

} লব্ধ ছায়ামান = $\frac{১২ \times ১০}{২০} = ৬$

বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত দুইটী সমশঙ্কুচ্ছায়া হইতে দীপ-ভূমানয়ন এবং দীপমূল ও ছায়াগ্রের অন্তরাল নির্ণয়ের উপায় কথিত হইতেছে—

ছায়া গুণিতং ছায়াগ্রবিবরমূলেন ভাজিতা কোটি।
শঙ্কুগুণং কোটী সা ছায়াভক্তা ভূজা ভবতি॥১৬॥

অনুবাদ :—ছায়াগ্রের অন্তরালকে ছায়াদ্বারা গুণিত করিয়া ছায়া দুইটীর বিশেষ দ্বারা ভাগ করিলে কোটী হয়, এই "কোটী"কে শঙ্কু দ্বারা গুণ করিয়া ছায়াদ্বারা ভাগ করিলে (দীপ) ভূজা হয়।

পদার্থ :—পূর্ব্বোল্লিখিত সঙ্কেত অনুসারে—

ক খ = দীপযষ্টি,

চ ছ = শঙ্কু,

ছ ঙ = ছায়া ; এবং

ক খ ঙ = একটী জাত্য ত্রিভুজ (right-angled triangle)।

সেইজন্যই এখানে "ক খ" ভূজা perpendicular) এবং "খ ঙ" কোটী (base) কল্পিত হইয়াছে।

শ্লোকটীর উদ্দেশ্য এই যে শঙ্কু এবং শঙ্কুছায়া হইতে দীপযষ্টি এবং "কোটী" (অর্থাৎ দীপযষ্টি মূল হইতে ছায়াগ্রের অন্তরাল) নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা হইলে দীপযষ্টি হইতে শঙ্কুর অন্তরও পাওয়া যাইবে।

শঙ্কুটীকে একস্থলে একটু সরাইয়া লওয়া হইতেছে। নূতন অবস্থান যদি "ত থ" হয় এবং ইহার ছায়া যদি "থ দ" হয়, তাহা হইলে—

ক খ : চ ছ = খ ঙ : ছ ঙ, (১)

ক খ : ত থ = খ দ : থ দ, (২)

কিন্তু ত থ = চ ছ, অতএব—

ক খ : চ ছ = খ দ : থ দ, (৩)

(১) এবং (৩) হইতে আমরা পাইতেছি যে—

ক খ : চ ছ = (খ দ—খ ঙ) : (খ দ—ছ ঙ) (৪)

অর্থাৎ খ ঙ : ছ ঙ = অ দ : (খ দ—ছ ঙ—),

অতএব খ ঙ = $\frac{\text{ছ ঙ} \times \text{অ দ}}{\text{খ দ} - \text{ছ ঙ}}$;

এখানে খ ঙ = "কোটী",

ছ ঙ = ছায়া,

অ দ = ছায়াগ্র বিবর, এবং

ক খ—ছ জ=দ্বারা দুইটীর বিশেষ।

এইরূপে ক খ ও নির্ণয় করা যায়।

পুনরায় (১) হইতে আমরা পাইতেছি -

$$\text{ক খ} = \frac{\text{ক জ} \times \text{চ ছ}}{\text{ছ জ}}।$$

এইরূপে দীপোন্নতি (বা ভুজা=ক খ) এবং "কোটী" (=খ জ) পাওয়া যাইতেছে।

দীপটী এমন স্থানে থাকিতে পারে যে দীপোন্নতি ও দীপযষ্টি হইতে শঙ্কুর অন্তর পরিমাপ করিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব হইতে পারে। তখন এই উপায় অবলম্বন করিয়া ঐ গুলি প্রমাণ গণনার দ্বারা সাধন করা যাইতে পারে। সূত্রটীর ইহাই বক্তব্য বিষয়।

ব্রহ্ম গুপ্তের গণিতাধ্যায়ের ছায়াব্যবহারে ৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

[উদাহরণ—

দিন্ত্রিষ্ট্যোড়শভিস্তুল্যো ছায়ে চাগ্রান্তরং তয়োঃ।

অর্কভূল্যাং দীপকৃতী তৎকোটী চ নিগদ্যতাং॥

প্রথমছায়া=১০, দ্বিতীয়ছায়া=১৬,

ছায়াগ্রের অন্তরাল ভূমি=১২, অতএব

প্রথমছায়া লম্ব দীপকোটী=২০,

দীপভুজা=২৫;

দ্বিতীয়ছায়া লম্ব দীপকোটী=৩২,

দীপভুজা=২৫।]

কর্ণ ও জীবা আনয়নের উপায়— ৩৯

যশ্চৈব ভুজাবর্গঃ কোটী বর্গশ্চ কর্ণ বর্গসমঃ।

বৃত্তে শরসংবর্গো হর্ধজ্যাবর্গসম খলু ধনুষোঃ॥১৭॥

অনুবাদ:—কর্ণ বর্গ ভুজা বর্গ এবং কোটী বর্গের সমান। বৃত্তে (দুইটী) শরের সংবর্গ (গুণফল) চাপের অর্ধজ্যার বর্গের সমান।

শব্দার্থ:—কোন ঋজু ত্রিভুজের (right angle triangle) সমকোণাভর্গস্থ বাহুদুইটীর একটীকে "কোটী" (=base) এবং অপরটীকে "ভুজা" (=perpendicular) বলা হয়। ত্রিভুজটীর তৃতীয় ভুজের নাম "কর্ণ"। এখানে বলা হইতেছে এই যে কর্ণের উপর একটী সমচতুরস্র অঙ্কিত করিলে তাহার ক্ষেত্র ফল "কোটী"র উপর এবং "ভুজা"র উপর দুইটী সমচতুরস্র অঙ্কিত করিলে যে যে ক্ষেত্র ফল হয় তদুভয়ের সমান। ইহাই ইউক্লিডের অয়োদশ প্রথম খণ্ডের ৪৭ "প্রতিজ্ঞা"; ইহাকেই ইউরোপে (Pythagorean Theorem) "পিথাগোরাসের প্রতিজ্ঞা" বলা হয়। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতবর্ষে পণ্ডিত Pythagoras এর জন্মের বহু পূর্ব্বে বৈদিক যুগে এই "প্রতিজ্ঞা" সম্যক্ অবগত ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে শুল্বসূত্রে এই প্রতিজ্ঞার জ্ঞান সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞাটী দুই ভাগে প্রদত্ত হইয়াছে—

দীর্ঘচতুরস্রস্যাক্ষয়ারজ্জুঃ পার্শ্বমানী তির্য্যঙ্মানী চ যৎ পৃথগ্ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতি।

—আপ শু-সূ, ১ম পটল, ১ম অ,

(অর্থাৎ কোন দীর্ঘচতুরস্রের আর্শ্বমানী ও তির্য্যঙ্মানী বাহু দুইটী পৃথক্ পৃথক্ যে সমচতুরস্র উৎপাদন করে, অক্ষয়ারজ্জু (বা কর্ণরজ্জু) সেই উভয় চতুরস্রই উৎপাদন করে।

চতুরস্রস্য অক্ষয়ারজ্জুর্বিভাবতীং ভূমিং করোতি। সমস্ত দ্বিকরণী।

—আপ শু-সূ, ১ম পটল, ১ম অ; ৪।

অর্থাৎ সমচতুরস্রের অক্ষয়ারজ্জু এই চতুরস্রের দ্বিগুণ সমচতুরস্র উৎপাদন করে। ইহাকে (=অক্ষয়ারজ্জুকে) সমচতুরস্রের "দ্বিকরণী" বলে।

বৌধায়ন শুল্বসূত্রেও আমরা ঠিক ইহাই পাই—

সমচতুরস্রস্যাক্ষয়ারজ্জুর্দ্বিভাবতীং ভূমিং করোতি।

—বৌ-শু-সূ, ১ম অ, ৪৫।

দীর্ঘচতুরস্রস্যাক্ষয়ারজ্জুঃ পার্শ্বমানী তির্য্যঙ্মানী চ যৎ পৃথগ্ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতি।

—বৌ শু-সূ, ১ম অ, ৪৮।

এইরূপ কাত্যায়নের শুল্বপরিশিষ্টেও—

দীর্ঘচতুরস্রস্যাক্ষয়ারজ্জুর্তির্য্যঙ্মানী পার্শ্বমানীচ যৎ পৃথগ্ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতীতি ক্ষেত্রজ্ঞানম্।

—কা শু-সূ, ২য় অ, ১১।

সমচতুর্ভুজক্ষেত্রাকারা ভূমিকরণী।

—কা শু-প, ২য় অ, ১২।

কাত্যায়ন শুল্বপরিশিষ্টের ২য় অধ্যায়ের ৮ ও ৯ সূত্রে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

উপরি উদ্ধৃত সূত্র গুলি হইতেই সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এই প্রতিজ্ঞাটীকে "পিথাগরাসের প্রতিজ্ঞা" নামে অভিহিত করিবার যে কারণ আছে, ইহাকে তাহার "শুল্ব-প্রতিজ্ঞা" বলিয়া অভিহিত করিবার তাহা অপেক্ষা বিশিষ্টতর প্রমাণ বিদ্যমান। আর পিথাগরাসই বা এই প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে এমন বিশেষ কি উল্লেখ করিয়াছেন? তিনি মাত্র বলিয়াছেন,

৯+১৬=২৫;

এমন কি "$৩^২+৪^২=৫^২$" এইরূপভাবেও প্রতিজ্ঞাটীর উল্লেখ করেন নাই।* যাহা হউক্, যদি কখন সুবিধা হয় শুল্ব-সূত্র সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধে এসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিব। তবে এই প্রবন্ধে যেখানে এই প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন হইবে, আমরা "শুল্ব-প্রতিজ্ঞা" বলিয়াই উল্লেখ করিব।

আর্য্যভটের শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধ সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য। এখন দ্বিতীয়ার্দ্ধ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

কোন বৃত্তকে একটী জ্যা দ্বারা দুইটী চাপে (বা ধনুতে = arc) বিভক্ত করা যায়। চাপ দুইটীর মধ্য বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক ব্যাসটী উক্ত জ্যার সহিত সমকোণ উৎপন্ন করে এবং জ্যাটীকে সমভাবে বিভক্ত করে। ব্যাসটী উক্ত জ্যার দ্বারা যে দুই ভাগে বিভক্ত হয় তাহাদিগকে "শর" বলে, কারণ তাহাদের অবস্থান "ধনুর" "শরের" ন্যায়। আর্য্যভট বলিতেছেন যে একটী দীর্ঘচতুরস্রের দুইটী বাহু যদি "শর" দুইটীর সমান হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রফল উক্ত জ্যার্দ্ধের উপর অঙ্কিত সমচতুস্রের ক্ষেত্রফলের সমান। ইউক্লিড এই প্রতিজ্ঞাও তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। সমজাতি ত্রিভুজ সাহায্যেও সহজেই প্রমাণ করা যায়। পরমেশ্বরের টীকা অনুসারে—

প্রথমশর = ইষ্টোৎক্রমজ্যা = কর্ণ − কোটী (=উনশর),

দ্বিতীয় শর = প্রথমশরহীন ব্যাস = কর্ণ + কোটী (=অধিকশর);

অতএব, প্রথমশর × দ্বিতীয় শর

= (কর্ণ − কোটী)(কর্ণ + কোটী)

= কর্ণ বর্গ − কোটী বর্গ

= ভুজাবর্গ = জ্যার্দ্ধ-বর্গ।

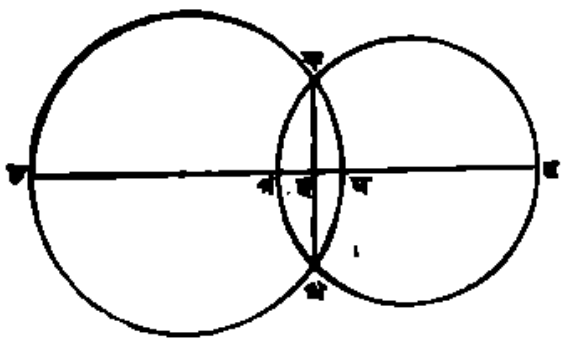

একটী বৃত্ত আর একটী বৃত্তকে ছেদ করিলে, ছেদাভ্যন্তর্গত সাধারণ জ্যা হইতে প্রত্যেক বৃত্ত পর্য্যন্ত শরানয়ন—

ছেদোনে যে বৃত্তে ছেদগুণে ভাজয়েৎ পৃথক্‌ফলে।
ছেদো ন যোগ উক্তে তু সংপাত শরৌ পরস্পরতঃ॥১৮

অনুবাদ :—ছেদহীন (১) বৃত্তদ্বয়কে পৃথক্ পৃথক্ ছেদ-মানের দ্বারা গুণিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাগ করিবে। (কিসের দ্বারা ভাগ করিতে হইবে তাহাই উল্লিখিত হইতেছে) ছেদহীন বৃত্তদ্বয়ের যোগফলের দ্বারা ভাগ করিলে পরস্পরের (২) সংপাতশর (৩) পাওয়া যাইবে।

১। পঃ টী :—অন্তোঽন্তর্গতয়োর্বৃত্তপরিধিভাগয়ো র্মধ্যগতমন্তরালং ছেদ ইত্যুচ্যতে।

২। পঃ টী :—শরৌ পরস্পরতঃ। অন্যবৃত্তান্তরস্থো যদিকবৃত্ত-শরঃ। অধিকারবৃত্তান্তরস্থো যন্যবৃত্তশর ইত্যর্থঃ।

৩। পঃ টীঃ—পরিধিযোগয়োরগতসমন্তজীবা। যথো উক্ত পার্শ্বগতৌ শরৌ ইতি সম্পাতশরৌ।

পাদটীকা :—ক খ চ ও ক খ ছ দুইটী বৃত্ত। ক খ হইতেছে সাধারণ জ্যা (পরিধিযোগয়োর গত সমন্ত জ্যা (পরিধিযোগয়োরগতসমন্তজীবা (=common chord of intersection of the two circles); চ গ ছ ও ঘ

* Dr. A Buerk এর পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

কেন্দ্র দুইটীর সংযোজক রেখা। এখানে গ অ = গ্রাস; ক গ = চ ঘ—গ ঘ = গ্রাসহীন একটী বৃত্ত অর্থাৎ গ্রাস-হীন বৃত্তব্যাস; অ ভ = গ ঙ—গ ঘ = গ্রাসহীন অপর বৃত্ত (অর্থাৎ গ্রাসহীন অপর বৃত্তটীর ব্যাস)। ক গ এবং ক অ সংপাতপরম্বর (অর্থাৎ সংপাত-জ্যা হইতে পরিধি পর্য্যন্ত শর)।

এখন সূত্রানুসারে আমরা পাইতেছি যে

$$\text{গত} = \frac{(\text{চ ঘ}-\text{গ ঘ})\times \text{গ ঘ}}{(\text{চ ঘ}-\text{গ ঘ})+\text{গ ঙ}-\text{গ ঘ}} = \frac{\text{চ গ}\times \text{গ ঘ}}{\text{চ গ}+\text{ঘ ঙ}}$$

এখানে "ক খ ঙ" বৃত্তের শর "গ ছ" নির্ণয় করিতে "ক খ চ" বৃত্তের গ্রাসহীন বৃত্তব্যাস "চগ" ব্যবহৃত হইয়াছে।

এইরূপে, $\text{ছ ঘ} = \frac{\text{ঘ ঙ}\times \text{গ ঘ}}{\text{চ গ}+\text{ঙ ঙ}}$; এবং

"কখগ" বৃত্তের শর "ছ ঘ" নির্ণয় করিতে "ক খ ঙ" বৃত্তের গ্রাসোনব্যাস "ঘ ঙ" ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাই আর্য্যভট "পরস্পরতঃ" এই শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

উপপত্তি :— পূর্ব্বশ্লোকানুসারে

$$\text{চ ছ}\times\text{ছ ঘ} = (\text{ক ছ})^2 = \text{গ ছ}\times\text{ছ ঙ},$$

অতএব $\frac{\text{গ ছ}}{\text{ছ ঘ}} = \frac{\text{চ ছ}}{\text{ছ ঙ}} = \frac{\text{গ ছ}+\text{চ গ}}{\text{ছ গ}\times\text{ঘ ঙ}} = \frac{\text{চ গ}}{\text{ঘ ঙ}}$,

অতএব $\frac{\text{গ ছ}}{\text{গ ঘ}} = \frac{\text{চ গ}}{\text{চ গ}\times\text{ঘ ঙ}}$

অতএব $\text{গ ছ} = \frac{\text{চ গ}\times\text{গ ঘ}}{\text{চ গ}\times\text{ঘ ঙ}}$

এইরূপে $\frac{\text{গ ঘ}}{\text{ছ ঘ}} = \frac{\text{চ গ}\times\text{ঘ ঙ}}{\text{ঘ ঙ}}$

অতএব $\text{ছ ঘ} = \frac{\text{গ ঘ}\times\text{ঘ ঙ}}{\text{চ গ}\times\text{ঘ ঙ}}$

টীকা :—গ্রহণ সময়ে একটী বৃত্তাকার পদার্থ অপর একটী বৃত্তাকার পদার্থকে গ্রাস করে দেখা যায় বলিয়া, জ্যামিতিতে একটী বৃত্ত অপর একটী বৃত্তকে কর্ত্তিত করিলে বৃত্তদ্বয়ের সংযোজক ব্যাসরেখার সাধারণ অংশকে "গ্রাস" বলা হয়।

[উদাহরণ :—

চত্বারিংশদ্বিহতং বৃত্তমন্ধং ষোড়শ-সন্মিতং।

গ্রস্তভাসশ্চতুর্ দ্বাভ্যাং সংখ্যাভ্যাং বর্জিতৌ শরৌ পৃথক্।

এক বৃত্ত = ৪০, অন্য বৃত্ত = ১৬, গ্রাস = ৪; অতএব লঘুবৃত্তশর = ৩, বৃহদ্বৃত্তশর = ১।]

ক্রমশঃ—

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসুমদার এম্ এ।

সম্রাট্ শা-জাহানের প্রতি

বিলালেন আকবর উদারচিত্তায়
গুণীজনে রত্নমালা, জ্ঞানীজনে ধন
বীরজনে জায়গীর সম্মান খেতাব
প্রজাগণ নানা সুখ শিক্ষায় মগন।

যার যার আপনার দেহ তার সনে,
স্বর্ণ মুক্তা বস্ত্র শস্ত করিয়া ওজন।
বিলালেন জাহাঙ্গীর দীনদুঃখিজনে,
আজো তাঁর দান দেশ করিছে স্মরণ।

দিলেন ঔরঙ্গজীব ধর্মপরায়ণ
ইসলামী ধর্ম নিচে নানা অধিকার,
ধর্ম গুরুদের সৈন্য করিতে যোচন
মস্‌জিদের সংবৃত্তি তুমি ভাগ আর।

এলাহ সম্রাট্ যাকে হে বরেণ্য তুমি
শা-জাহান! তব দানে নাহি বিশ্বে তুলা,
সন্ত এতাবত তুমি তব দান চুমি'
অন্ত সকলের দান যার কাছে ধূলা।

মহারাজ, তব গন্ত, সৌন্দর্য্য আতার
গভীর প্রেমের তত্ত্ব অমর চিত্রায়
গড়িয়াছে পুঞ্জীভূত শুভ্র শিলাকায়
মহা'মিলনের যেন মন্ত্র দেবালয়।

সমধর্মী হে সম্রাট্! ধর্ম নির্ব্বিশেষে
খুলে দেছ দানসত্র চিরসুষমার,
অমৃতত্ত্ব সুধা যারা বিতরিত দেশে
আঁখির পিয়াসা যার চিত্তের সুধায়।

দেশ মাতৃকার তত্ত্ব করিয়া মন্থন,
দেখেছ নবনী শুভ্র ভ্রুব অনুরাগী,
অবধারিত যার দেখা, ধার্ম্মিক দুর্জ্জন
ধনী দীন জ্ঞানী মূঢ় সকলের লাগি'।

পাষাণ শোকের এবে শীতল সান্ত্বনা,
ধরায় স্বর্গের শোভা প্রেমের নয়নে
মৃত্যুর কপালে এবে অমর-বন্দনা
পরশ মাণিক্য যেন মলিন বসনে।

শ্রীকালিদাস রায়

কুমারিল ভট্ট

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুমারিল ভট্টের গৃহ

কুমারিল ভট্ট ও বানভট্ট

কুমারিল। দেশের দশা এ' হলো কি! ধর্ম নেই, কর্ম নেই, বেদবিধির প্রতিপালন নেই, যথেচ্ছাচারের তরঙ্গে মানুষগুলো যেন নিজেদের হাত পা ছেড়ে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। এর নাম সদ্ধর্ম! এর ফল নির্বাণ লাভ!

বানভট্ট। হাঁা, তা' এমনি করে মনের সংবৃত্তিগুলা শরীরের উত্তম অংশে সকলকে একেবারে নির্বাণলাভই করাবে, তাতে আর কোন সংশয়ই নেই।

কুমা। করাবে না' কেন ভাই, এ নির্বাণ লাভের জন্য আজকাল আরতো ধ্যান, ধারণা, সমাধির প্রয়োজন করে না; চিত্তবৃত্তির নিরোধের চেয়ে চিত্তবৃত্তির উৎক্ষেপই এখন যে প্রাধান্য লাভ করেছে। সুগত শিষ্যগণ দলাদলির স্রোতে পড়ে তলিয়ে যেতে বসেছেন। এখন মার্গাধিক, যোগাচার্য, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, সৌগত প্রভৃতি বহু শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের কার্য্যের সঙ্গে আর বুদ্ধোপদেশের সহিত নিকট সম্বন্ধ কিছুই দেখা যায় না। নাম যাই হোক, আসলে হচ্ছে, তারা সকলেই স্বেচ্ছাপন্থী।

বান। তা সত্যি! বুদ্ধোপদেশের নশ্বরবাদ আর এদের এই মহাশূন্যবাদ এদুইয়ে যেন স্বর্গ মর্ত্য ভেদ।

কুমা। পূর্ব্বের সেই, ধ্যান ধারণা সমাধির কথা গেল, অন্তর্বিকারের কলম্বারোপ মনে স্থান নিলে না, মহাশূন্যে মহাশূন্যে নির্বাণ প্রাপ্ত হলো, দেশের মনোরাজ্য অধিকার করে দেশ জুড়ে বসলো যে শূন্যবাদ, তাকে কি একটা ধর্ম বলা যায়? শম নেই, দম নেই, উপরতি নেই, তিতিক্ষা নেই, বিবেক-বৈরাগ্য কিছুই নেই, এক কথায় শরীর বা মনের কোনপ্রকার শুদ্ধি সাধনেরই আর আবশ্যক করে না, শুধু কাষোপভোগে স্বভাবতঃ কামাভিলাষি-মানব-চিত্তে বাসনাবহ্নি প্রজ্বলিত করে সেই অনলের হবনরূপে তাদের দহন করাই এখনকার সর্ব্বপ্রধান ধর্মসাধনা! তা'কি কালালিক মতের, আর কি বৌদ্ধসম্প্রদায়ের! কামোপভোগে কামনা ক্ষয়ের মত কঠোর সাধনারও, ধর্ম আর জগতে নেই, এসাধনার জন্য যতের মত গুরু চাই, শিষ্যকে তার কুলীশাপেক্ষাও কঠোর হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু সে রকম গুরু-শিষ্য এসংসারে ক'জন আছে? সাধারণতঃ মানুষের মনকে সংযমের আল দিয়ে না বেঁধে রাখলে সে যে সর্ব্বনাশের বেগে দুকূল ছাপিয়ে উঠে! সাধে কি অনর্থকই বলেছে যে,—

"নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি,
হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে।"

হবিঃপ্রাপ্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত না হ'য়ে ঊর্দ্ধশিখই হয়।

বান। তা যা বলেছেন দাদা! এই স্বেচ্ছাতন্ত্রতা হচ্ছে এরূপে সিদ্ধৈশ্বর্য্যে তীব্রকামী, ক্রূরকর্ম্মা, কাপালিক মতের সৃষ্টি হ'চ্ছে, দেশের পরে ধর্ম্মের পরে কি'না অত্যাচারতার করছে! শাক্যবুদ্ধের অহিংসা ধর্ম্মকে ইদানীং ছাগ মহিষকে ত্যাগ করে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষকের আক্রমণোদ্যত! বৈদিকযজ্ঞে মেষোক্ষেতে পশুঘাত হতো, এখন কাপালিকের অষ্টাই সাধনোক্ষেতে বলি হয় মানুষ! নরনারীর নবীন জীবনসৃষ্টিই এই নরমেধযজ্ঞের মেধ্য তা' আর এরজন্য আপশোষ করে কি কর্ব্বেন বলুন? এখন এই রকমই চলবে। এই বসে বসে দেখ্‌তে হবে, সংহতও হবে। দেশের নরপতিরাই যখন এই স্বেচ্ছাচার ধর্ম্মের পরিপোষক, তখন আর এর প্রতিবিধান কোথায়? এখন জিনায়, ধর্ম্মাহুরুত্যের কাল উপস্থিত প্রায়, নদী তীরে গমন কর্‌তে হবে। [প্রস্থান]

কুমা। বেশ নিশ্চিন্তভাবে বলে গেল—"প্রতিবিধান কোথায়?" জানি কথাও সত্য! কিন্তু মন আমার মানে কই? উঃ, এই যে শঙ্খনাদের ধারা আজ আর্য্যাবর্ত্তে প্রবাহিত হ'তে হ'তে তার বুকের রক্তকে শোণিতে পরিণত করে দিচ্ছে, এই শোণিত পিপাসাতুরা রাক্ষসীকে কে নিহত ক'রে এই দেবভূমিতে আবার দেবতার আশীর্ব্বাদ ফিরিয়ে আনবে? বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম লোপোন্মুখ ঋষি-মস্তিষ্ক আজ অর্দ্ধ-দানব অনার্য্য জাতির সহিত সম্মিলিত! সেই মন্ত্রদ্রষ্টা মহামহর্ষিগণ, যাঁরা অপৌরুষের অনাদি-বেদের প্রচারক, আজ তাঁদের বংশধরগণ কোথায়? যাঁরা মন্ত্রশক্তিদ্বারা নূতন জগৎ পর্য্যন্ত সৃজন করতে সমর্থ, যাঁদের ইচ্ছা বলে বিশ্বচরাচরের অলঙ্ঘ্য নিয়মও প্রতিহত, মৃতজীবনীযুক্ত হ'য়েছে। যাঁদের কটাক্ষ ঈক্ষণে অন্ধ চক্ষুষ্মান্, পঙ্গু গতিশীল, অগাধ জলধিরাশি শোষিত, উন্নত গিরিরাজ বিনত এবং পাষাণ তন্মীভূত হয়েছিল, তাঁদের নির্ম্মল বিশুদ্ধ শোণিত, আজ কি পবিত্র আর্য্যদেশে আর খুঁজে বার করা যায়? স্বীকার করি এমিশ্রণে এক পক্ষ আজ মহত্তুপকৃত, আর সেই পক্ষই সঙ্ঘের পক্ষ। কিন্তু এ উন্নতি এত ক্ষতিতে শোণিত মিশ্রণে না হয়ে শিক্ষা দীক্ষা আচার পরিবর্ত্তনে মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়ে ক্রমশঃ সভ্যালোকের মধ্যে আনয়ন করে, প্রাকৃতিক মিশ্রণসারেও যখন হওয়া অসম্ভব নয়, তখন দেশের গৌরবচূড়া, জগতের এক প্রধানতম ঐশ্বর্য্যকে বিচূর্ণ করে ফেলে এদের ক্রত ওঠ্বার সোপান রচনা করে, না দিলেই বা এখন ক্ষতি কি? যে পঙ্কে নিমজ্জিত তাকে টেনে তুলতে হবে বৈকি, কিন্তু তার সঙ্গে পঙ্কলিপ্ত হয়েতো কোন লাভ নেই। অসংখ্য অর্দ্ধশিক্ষিতের চেয়ে উচ্চশিক্ষিত একজনের শক্তি অনেক বেশি। আর তার দৃষ্টান্তেরও কোথাও অভাব নেই।

[পুঁথি হস্তে বিশ্ববারার প্রবেশ]

বিশ্ব। এই দেখুন প্রভু! আপনার বার্ত্তিকের যে অংশটুকু আপনি আমায় রচনা করে দিতে আদেশ করেছিলেন, সে টুকু আমিতো এই রকম করে দিয়েছি। একবার দেখুন দেখি ঠিক হয়েছে কি না? [পুঁথি প্রদান]

কুমা। (মনে মনে পাঠ করিয়া) অতি সুন্দর হয়েছে! এখন কি এর মাধুর্য্যটুকু রেখে আমার রচনার কঠোরতার মধ্যে কণ্টক-কমলের বৈসাদৃশ্য রেখে দিচ্ছে।

বিশ্ব। (সলজ্জায়) দাসীকে অত্যধিক স্নেহ করেন বলেই তার সকল অক্ষমতার অপরাধ সেই বিপুল স্নেহের অমৃতে সিক্ত হয়েই মধু হয়ে যায়। তা নৈলে আপনার ওই ভাবগলধির সহিত এ অকিঞ্চিৎকর অজ্ঞান পল্বলের পঙ্কিল সলিলটুকু কি "সমুদ্রে নদী সঙ্গিবও যেমনি, খানা ডোবারও তেমনি মিশিয়ে যাবার" সমান অধিকার আছে, তাই কোন মতে ডুবে থাকতে পারবো বলেই নিজের অক্ষম চেষ্টাটুকুকে শুধু অপরাধ মনে করিনে।

কুমা। বিশ্ববারা! বিনয় নম্রতাই নর-নারীর জ্ঞানালঙ্কারের সমান। তোমরা মাথার মুকুট সে মণি-হারা নয় তা আমি জানি সতি! শুধু সেইজন্যই কুমারিলের সাধ্বী পত্নী বিশ্বকে নিজের সত্তা, কোন পরিচয় না জানিয়ে তার স্বামীর মধ্যেই সমবেত নদীর মত মিশিয়ে রইলেন। বলো দেবি, তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ পরামর্শ আছে।—রাজাদের মন্ত্রী থাকেন, ব্রাহ্মণ আমাদের সেই মত সচীব তুল্যা সহধর্ম্মিণী তোমরাই আছ।

বিশ্ব। আদেশ করুন।

কুমা। দেখ বিশ্ববারা! আমাদের এই আর্য্যভূমি পুণ্য ভূমি, ধর্ম্মই এর মুখ্যপ্রাণ, সে ধর্ম্ম সনাতন। মানুষের হাতে সে ধর্ম্ম গঠিত হয়নি, মানুষের হাতে সে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হতেও পারে না, তার অনন্ত উৎস হচ্ছে অপৌরুষের বেদ! সেই বেদ মানব-কল্পনা-প্রসূত গল্প-লহরী নহে, তাহা নিত্য সত্য অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্মবাক্যের মহাভাণ্ডার। তথা সঙ্ঘের নব ধর্ম্ম যথার্থতঃ বিচার করে দেখলে এই বেদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল না। কারণ বেদে যা নেই বিশ্বেও তা নেই। কিন্তু শাক্যবুদ্ধের সেই অহিংসা ধর্ম্ম ইরানীয় বহুশতাব্দি হতে বিভিন্ন রুচি প্রবৃত্তিশালী গুরু উপদেষ্টার হাতে পড়ে শাখা প্রশাখায় পত্রে, পুষ্পে এবং ফলে মূলকাণ্ড হ'তে অনেক দূরেই চলে গেছে। এখন সে ধর্ম্মে আর ধর্ম্মের সুধা প্রবল নেই, দুগ্ধ যেমন বিকৃত মূর্ত্তিতে অপেয় হয়, মদ্য মদ্যে পরিণত হয়ে যায়, তেমনি এও এখন গরলে পরিণত হ'য়ে দেশের

প্রাণসংহার কর্ত্তার জন্য তার দেহরক্তের মধ্যে মিশে যেতে বসেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের উপর একটা প্রলয়ের ঝড় উঠেছে, সে ঝড়ে তার প্রাচীন কালের বটবৃক্ষ ভেঙ্গে পড়েছে, সে ঝড়ের নিষ্ঠুর আক্রমণ হতে তার বাগানের এই চারা গাছটি শুদ্ধ মুক্তি পাচ্ছে না। এই প্রলয়ের ঝড়ের তমরু তার সর্ব্বনাশের তালে তাল দিচ্ছে। এ তমরু তার চিরন্তন শিবের তমরু নয়; তাই এই প্রলয়ান্ধকারের পাশে নূতন সৃষ্টির নবীন নবআশালোক জ্বেলে নিয়ে প্রতীক্ষা করেনি। এ তার। প্রলয়ের মহাগর্জ্জন গান! এ গান যখন থামবে তখন সপ্ত সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গের প্রলয় গর্জ্জনের মধ্যেই একেবারে মিলিয়ে গিয়ে থাকবে,—এর শেষে শান্তি নয়, মৃত্যু!

বিশ্ব। এ কি ভবিষ্যৎ বাণী না অভিসম্পাত?

কুমা। এ কিছুই না বিশ্ববারা! শুধু অক্ষমের কাতর ক্রন্দনমাত্র।

বিশ্ব। কেন প্রভু, একে কাতর ক্রন্দন বলে, এই মহাপ্রাণের মহাভিব্যক্তিকে হেলোহীন কর্তে চাইছেন? এ যদি ক্রন্দনও হয়, তবে এ ক্রন্দনের ধ্বনি যে সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণের মোহের নেশা কাটিয়ে দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুলতে সমর্থ! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ! আপনার তো কাঁদবার অবসর নেই। কর্ম্মী আপনি. কর্ম্মের আশ্রয়ে ধর্ম্মকে তাঁর অচল-আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন।

কুমা। মহাশক্তি! শবরকে এই মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিতা হয়েই কি তুমি তাকে শিবত্ব দান করেছিলে? আমিও এই পরামর্শই তোমার কাছে আশা করেছিলাম। তবে শোন, এখনও প্লাবনে এই মহা মহামহিমগণের তপঃক্ষেত্র, পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তকে আর্য্য ঋষি-সন্তান, পুরাতন ব্রাহ্মণবংশীয় আমরা একেবারেই মগ্ন হয়ে যেতে দিতে পার্ব্বোনা। তার চারিপাশে মৃত্যুর বিষাণ বেজে বেজে উঠ্‌ছে, তারি আহ্বানে তার হাত পা বিষ হয়েও এসেছে, কিন্তু বক্ষের স্পন্দন এখনও থেমে যায়নি, হয়ত বিশেষ চেষ্টায় এখনও তার বিলুপ্ত চেতন ফিরিয়ে আনা গেলেও যেতে পারে, আমি সেই চিকিৎসা তার একবার গ্রহণ করে দেখতে চাই। কিন্তু এরজন্য তোমাকেও কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তপস্যা ব্যতীত ফললাভতো হয় না!

বিশ্ব। আপনিই তো শিখিয়েছেন প্রভু, ত্যাগেই যথার্থ প্রাপ্তি।

কুমা। তোমার কাছেই কুমারিল যথার্থ পূর্ণ। বিশ্ববারা! তোমার মত নারীর পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। এই অধর্ম্ম প্রাপ্তি হ'তে দেশ ধর্ম্মার্থ এবার তোমায় আমায় সব পরিত্যাগ করতে হবে সতি!

বিশ্ব। আপনার প্রত্যেক উচ্ছ্বাসটুকুই যে আপনার বিশ্ববারার দেহের রক্ত! যে কার্য্যে আপনার গৌরব, আপনার আনন্দ, আপনার কর্ত্তব্য বুঝি যে কর্ম্ম আপনাকে আদিষ্ট করছে; এ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিশ্ববারা তার সাধনপথের কতটুকু বাধা? আপনার সঙ্গ হতে বিচ্যুত হয়েও আপনা-গত-প্রাণা-বিশ্ববারা এক নিমেষের জন্যও আপনাকে হারাবেনা, ও আপনি নিশ্চিন্ত জেনে নিশ্চিন্ত থাকবেন। আপনার পুঁথিগুলির ঐ অরুণ লেখা অক্ষরগুলি তার বক্ষ-শোণিত হবে, সেও সেই তার বুকের রক্ত কলমে কলমে ঢেলেদিবে তার স্বামীর ধর্ম্ম, স্বামীর মত তার ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী, চারিদিকের এই অধর্ম্ম দগ্ধ নরনারীদের ব্যথাসাধ্য শীতল করবার জন্য সচেষ্ট থাকবে। আপনি অনায়াসেই আপনার অভীষ্টলাভোদ্দেশ্যে গমন করবেন, সামর্থ থাকতে এ না করলে আমরা দুজনেই যে ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হবো, ধর্ম্ম যে এখানে এখন নিতাই অবমানিত হচ্ছেন!

কুমা। সহধর্ম্মিণি! তোমার এই মহা বেগবতী উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে আমার হৃদয় আজ অধিকতর আশাদীপ্ত হয়ে উঠ্‌ছে। তোমার ঐ নিষ্কাম তপস্যার তেজ আমাকে নিশ্চিতই প্রবল প্রতিপক্ষের দ্বারখানে নিঃসঙ্কোচ বল প্রদান পূর্ব্বক মিথ্যাকে পরাভব ও সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পূর্ণ সহায় হবে। তবে আর বিলম্ব কিসের? বৌদ্ধশক্তীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে প্রথমতঃ কিছুদিন আমায় ছদ্মবেশে কোন বৌদ্ধাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ওদের শাস্ত্রাচারাদি শিক্ষা করতে হবে, বিরুদ্ধ পক্ষের বল উত্তমরূপে না জেনে সমর কোথায় জয় সুনিশ্চিত নয়, মানুষের জীবন নশ্বর। মৃত্যুর আক্রমণ আকস্মিক এবং অতর্কিত, তবে জিয়ে যাও

বিশ্বধারা! ক্ষণস্থায়ী তনুর মানবজন্ম চিরস্থায়ী কর্ম্মেরও এ ভবযোগ!

বিশ্ব। বিলয় দিবি! এইরূপে, অনাহারে, অকস্মাৎ? —না—না, প্রভু! এতদূ ক্ষণিকের বোধ স্বপ্ন! অন্তরের নারীত্বের ক্ষণপ্রকাশ চেষ্টা! এ চেষ্টাকে ব্যর্থ করতে হবে। আমি, নিবেদের ভবেও ভুল ভেঙে অধিকারিণী নই, যে আমি ব্রাহ্মণ-দুহিতা, আমি আর্য্যাবর্ত্তের পুরাতন ব্রাহ্মণগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে দৃঢ়ব্রত কুমারিলপত্নী, মোক্ষ অনাবার! হোক অকস্মাৎ! যখন প্রলয় আসে তখনই তা ভবে ভবে দেখা যায়, কিন্তু সৃষ্টি,—সে পরম পুরুষের আকস্মিক, অহেতুক আনন্দের শুভ প্রকাশ! বিলয় শত ধারা হইতে পারে।

কুমা। আমার অনুপস্থিতি কালের জন্ত তোমায় উপদেশ প্রদান করবার প্রয়োজন দেখি না, ভবিষ্যৎ মানবের যথেচ্ছা প্রভুত্ব নয়, সময়োচিত যথা কর্ত্তব্য সম্পাদনে কুমারিলের পত্নী অক্ষমা নয়। মঙ্গল দেবতা তোমার পার্শ্বচারিণী হোন্।

বিশ্ব। শুধু একটি প্রার্থনা, যদি কখন সনাতন ধর্ম্মপতাকা তলে, সম্মিলিত-শক্তি-ধর্ম্মসঙ্ঘের মধ্যকেন্দ্ররূপে কখন এইদিকে অভ্যুদয় ঘটে, তবে যেন এ চির সেবিকা এক নিবেদের জন্ত শুশ্রূষণ সেবার অধিকার লাভ ক'রে ধন্যা হতে পারে। আর যদি তা নাও ঘটে, কোন খেদ নাই; অনন্ত দিবসে আবার এক অবিনশ্বর লোকে আমরা একত্র মিলিত হতে পারবো, সেই আশাদীপ্ত প্রাণ নিয়ে আপনার গৌরবপূর্ণ বিজয় বাণীর প্রতীক্ষায় আপনার গৃহীত ধর্ম্মের সাধনায়, আপনার এই দাসানুদাসী অবধান। জীবন যাপন করতে পারবে। শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন।

[প্রণতা]

কুমা। যেমনর তোমার সকল বাসনা পূর্ণ করুন!

[উত্তরের উত্তর দিকে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুশী নগর, সন্ধ্যারাম

সঙ্ঘ-শিষ্যাসন পাঠরত,

১ম। বাদ্ হয়ে গ্যাছে পড়া হয়ে গ্যাছে, গুরু বলে-ছেন, শরীরকে ক্লেশ না দিয়ে যতটুকু হয় ততটুকুই পাঠনাদি উচিত, তার বেশি নয়। শরীর এইবার ক্লেশ পাবো পাবো করছিল আর অমনি ছুপ, আমাদের গুরুর আদেশই সত্য! গুরুর আদেশ তা সে যত কঠিনই হোক আর যেমন সহজই হোক্ ছাড়তে তো আর পারিনি। তবে তোমরা এখনও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্লান্তি বোধ করছোনা। যদি করে থাকো তো গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করছো সেটা যেন হঁস থাকে। বিদ্যের তলায় একেবারে তলিয়ে যেওনা, হিসেব রেখো বিদ্যের বোঝা।

২য় ও ৩য়। ঠিক বলেছে শতানীক, ক্লান্ততো হয়েইছি এই, সব চুপ্।

[পাঠরতগণ একসঙ্গে নীরব]

একজন। কেন, কেন, ব্যাপারটা কি?

পড়া। উপদ্রষ্টা! কলাপি! আশ্চর্য্য কথা শোন। ওরা সবাই পড়ায় পড়ায় নিজেদের ক্লান্ত করে ফেলেছে কিন্তু পাছে গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘনের দোষ বর্শায় সেই ভয়ে অজ্ঞতার ভাণ করে বলা হচ্ছে ব্যাপারটা কি?

একব্যক্তি। ওরোরো! ঠিক্ ঠিক্ ঠিক বলেছ হে কলাপী! শরীর মনকে পরিশ্রান্ত কর্ত্তার হুকুম আমাদের গুরুই দেওয়া নেই, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, বই ফেলে সব বেরিয়ে পড়ো, একটু হাসি খুশী আমোদ-আহ্লাদ করে নেওয়া যাক্। কি বলো হে ছন্দক?

ছন্দক। আতে আর কথাকি? তবে কিনা, তবে কিনা, আমোদটা শুরুনোই হবে?

অনেকে। হাঁ, হাঁ, হাঁ তাইতো তাইতো শুরুনো হবে? শুরুনো হবে?

ছন্দক। আনন্দ তত্ত্বই সকল তত্ত্বের সার তত্ত্ব। এই ব্রহ্মানুভূতার মধ্যে আত্মানন্দ ব্যতীত মানুষের আর কি সত্য আছে? আমাদের গুরুই এ কথা সেদিন আমাদের নিজে ডেকে বলে দিয়েছেন। তা আত্ম-পূজা দেবার জন্ত পঞ্চকোষের সাধনা ব্যতীত আর কোন্ সাধনায় আনন্দ লাভ করা যায়?

শতানীক। কিন্তু এর সঙ্গে কেউ আসল কথাটা ভুলে যেওনা, মন যেন ঠিক থাকে। ঘুমের মতন পেড়া হবেনা তোমার মতন জেগে উঠে মন মন করো—শক্তি বাহুবে-

পুড়তে হয় অন্তে তাকে স্পর্শ করে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্ কিন্তু নিজে পুড়বেনা ঠিক থাকবে।

অন্য সকলে। ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ই আছি।

শতানীক। বেশো সব ভাল ক'রে আত্মপরীক্ষা করে দেখো, মনে কোন বিকার আসবে আসবে করচেনাতো? তা যদি এলো তাহ'লেই সর্ব্বনাশ।

[কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া]

কলাপী। ওঁহুঁ মনে কোন বিকার নেই। ঠিক এক খানা পদ্মপাতা জলের উপর ভাসচে।

শতানীক। ঠিক্! পদ্মপাতা জলের উপরে ভাসচে। তবে আর বিলম্ব কি?

[দুন্দুক, নন্দক, প্রভৃতির ও তম্বুরা, খোল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য ও সুরাপাত্র-পাত্র ইত্যাদি আনয়ন]

শতানীক। যাও দাও গুরুর নামে প্রথমে সবটাই ভক্তি-ভরে উৎসর্গ করে যাও। এমন গুরুকে যদি না দেবে তবে দেবে কাকে?

কলাপী। আমরা তাঁর প্রসাদ সুরায় পরিতৃপ্ত হবো। ঢালো ঢাল, পাত্র সব ভোরে ভোরে ঢেলে রাখ। [শতানীক উৎসর্গ করিয়া দিলে সকলের পান]

শতা। ওহে কলাপী, তুমি এই মৃদঙ্গ নাও—উপমন্যু তম্বুরা তোমার—নন্দক, দুন্দুক, খোল তোমাদের—আমার এই করতালটাই সহজ। আমরা সহজ ছেড়েতো কঠিনে যাইনে। আচ্ছা লাগিয়ে দাও।

কলাপী। লাগবে ভাই, কিন্তু আমোদটা বড় বেসুরো লাগ্‌বে। এ যেন মতাহীন নৈবেদ্য, আলুনো খিচুড়ি!

দুন্দুক। আমারও ওই কথা মনে হচ্ছিল! ও দিন রাজবাড়ীতে খাসা খাসা নাচুনিগুলি দেখে এসেছিলাম, তাদের একদিন এখানে আনিয়ে নাচ্ দেখলে হয় না?

কলাপী। সেত এক দিন, আজ এখন কি হয়? এখুনি গাওনা বাজনায় সব সুরই যে বদ্‌লে যাবে!

শতা। তবে এক কাজ করো, দুজোড়া মৃদঙ্গ আছেতো নন্দক জোড়াও দিব্যি যেয়েদি খাঁজের। এক জোড়া পায় পরে নাচুক। ওই আজ এ আনন্দ-আসরকে তাজা রাখুক। তবু একেবারে নিরামিষের চেয়ে একটু খানি আমিষ হবে।

অনেকে। সাবাস্ সাবাস্! ওহে নন্দক তৈয়ার যে!

নন্দক। [মৃদঙ্গ পরিতে পরিতে] আরম্ভ করে যাও, নন্দক কোন কাজেই পিছপা নয়। দাও গলাটা আগে আর একটু ভিজিয়ে নিই।

শতা। নাও, নাও এখি যে সে পানীয়। এযে গুরুর প্রসাদ সুধা!

[সকলের সুরা পান এবং আদি প্রহণ ও গীত, নন্দকের নৃত্য]

গীত

হেসেনেনে ভাই, হেসেনে।
এমন মানব জন্ম কেন পেলি সুখ যদি তুই করবিনে?
এ বোদের গুরুর বচন ভাই, তাঁর ভক্ত হলেই মুক্তি
পাবো আর তো কিছুই নাই,
মিছে উর্দ্ধবাহু ঋষির মতন উর্দ্ধে চেয়ে ভাবিস্‌নে
এ যদি তুই করিস্ তবে গুরুর বচন মানিস্‌নে।

শতা। দেখ ভাই মন ঠিক আছে কি না দেখে নাও। মন টল্‌লেই সব টল্‌লো? মন খাটি রেখে আহার বিহার সব করে যাও কোন ক্ষতিই নাই। মানুষ পৃথিবীতে ফুর্ত্তি ক'রে খেতেই এসেছেরে ভাই; কাঁদতে আসেনি।

দুন্দুক। মন ঠিক করে যুবতী কোলে নিলেও পাপ হয় না। সেইজন্যেইতো মনকে পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য এ সব নিত্য নব নব আয়োজন। এযুগ ঠাকুরের উপোসী ধর্ম্ম নয় বাবা, আমাদের মহাগুরুর নিজের তৈরি করা, নূতন সৃষ্টি করা বড় সহজ ধর্ম্ম! শুনতে বড় সহজ কিন্তু—

শতা। কেন, কাজেও বেশ সহজতো। মনটাকে টলতে না দিলেই ব্যস চুকে গেল। আর কোন ঝাঁঝাইতো নেই। নাক টিপে প্রাণায়াম করে সমাধি নেই, অন্নজলের ভয়ানক ভয়ানক শাস্তি গ্রহণ করতে হয় না, আচার্য্য ডেকে পাপ স্বীকার করতে হয় না, শুকিয়ে আমসী হয়ে থাকতে হয় না, বলিস্ কি? এ আমাদের খুব সহজ ধর্ম্ম নয়। মনটা টল্লেই যা মুস্কিল। তা মনও আর আমাদের টলে না।

অনেকে। না, টলে নাই তো। কেন টলবে ওরু যে আমাদের মনকে উপদেশ দিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন।

গীত।

সহজ পথের পথিক মোরা সহজ পথেই চলিরে ভাই,
সহজ সুরে গানটী গেয়ে সহজ কথাই বলিরে ভাই।
মোরা করবো সুখ ভোগ, সেই আমাদের ধর্ম্মরে ভাই
সেই আমাদের বেদী,
মনটি শুধু থাকলে তাতে আর কি মোরা টলিরে ভাই।

উপবর্ষ। যাঃ যাঃ মন্মক! নাচের তালে সর্ব্বশরীরটি শুদ্ধ যেন তোমার তাল দিচ্ছে এমন নাচুনি গাধা নাচুনিয়েও পারে না। চমৎকার!

সকলে মিলিয়া। (কোলাহলে) চমৎকার। চমৎকার।

[অদূরে কুমারিল ভট্টের প্রবেশ]

কলাপী। ও কে আসে! সর্ব্বনাশ করেছে! এবে কোন্ বিদেশী!

[সকলে শশব্যস্তে যথাযথি লুক্কায়িত করণ]

শঙ্খ। মন্মক, তোমার ঘুঙুর পরা পা'নিয়ে তুমি ছুটে পালাও। বিদেশীকে এসব দেখান হবে না, ও হয়তো মাকটৈণা বৌদ্ধদের মধ্যেরই বা কেউ হবে, তারই বা ঠিকানা কি! সব পড়তে বসে যাও।

[কথাবৎকার্য্য ও সকলের পুস্তক লইয়া পাঠ!

[কুমারিলের প্রবেশ]

কুমা। (স্বগতঃ) এই মাত্র এই দিক হতেই না গীত বাদ্যের ধ্বনি আসছিল? নাঃ এই যে এখানে সব পাঠরত ছাত্রেরা রয়েছে। আমার ভ্রান্তিই হবে। কিন্তু এ কিরূপ হলো! যেন কোন দৈবী মায়া! (প্রকাশ্যে) নমস্কার বন্ধুগণ।

শঙ্খ।.....নমস্কার, কে আপনি?

কুমা। আমি বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগের নিকট শিক্ষার্থী। তিনি কি এখানে উপস্থিত?

শঙ্খ। না বিদ্যার্থী! আমাদের পরমগুরু এখন বিশ্রাম-ভবনে। এমুহূর্ত্তে সাক্ষাৎ সম্ভাবনা নেই। তুমিও আমাদের মধ্যে একটু বিশ্রাম করে পথের ক্লান্তি দূর করে নাও। তারপর সমস্ত ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। তোমার নাম কি বন্ধু?

কুমা। কল্যাণ ভট্ট।

সকলে। আমাদের মহাগুরু তোমার কল্যাণ সাধন করুন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান সঙ্ঘারামের অভ্যন্তরস্থ কক্ষ

সঙ্ঘমিত্র ও মহাকাশ্যপ

সঙ্ঘ। আপনার শিষ্যরা দিন দিন বড়ই অশান্ত হয়ে উঠছে, পড়াশোনা নেই, দিনরাত কেবল গানবাজনা আর হল্লা নিয়েই আছে। এ আবার ভাল মনে হয় না।

সঙ্ঘা। (হাসিয়া) কেনরে, ওরাতো পড়ে। খুব বেশি পড়া কি ভাল! ওতে শরীর মনকে শীঘ্রই ক্লান্ত করে ফেলে, অকালে জরার সৃষ্টি করে। শরীর মনকে প্রফুল্ল রেখে যদি অল্পও পড়া যায়, তাতে কাজ অনেক বেশি হয়।

সঙ্ঘ। আচ্ছা বেশিই না হয় না পড়লে একটুওত পড়বে? আমি আড়াল থেকে ওদের কাণ্ড সব দেখেছি বাবা, ওরা কিছু করে না। আপনি যদি একটি দিন পরীক্ষা নিয়ে দেখেন তা'হলেই ওদের সব বিদ্যে ধরা পড়ে যায়। তারপর ওদের জ্বালায় আমার কিন্তুরীদের বাইরের দিকে যাবার উপায় নেই, ওরা তাদের তাড়াবার বিরূপ সর্ব্বনাই করে। এসব কি?

সঙ্ঘা। দেখ বা, ওতে কিছু দোষ নেই। আত্ম-পরীক্ষার জন্য আমার ছাত্রবৃন্দকে মধ্যে মধ্যে নারী-সঙ্গ করতেই হয়। সে শুধু চিত্ত স্থির কর্ম্মারই জন্য বা, অপর কোন হীন উদ্দেশ্যে নয়।

সঙ্ঘ। (স্বগতঃ) চিত্ত স্থির ওদের যত, সে আমার আর অজানিত কিছু নেই।

সজ্ঞ। মা সত্যকামা! রাগ করে কি মা? আচ্ছা আমি ওদের মানা করে দেবো, তোমার কিঙ্করীদের কিছু না বলে।

সত্য। আর এক কথা বাবা, ওরা—সর্ব্বদা অত সুরাপান করে কেন? আপনি নিজেত অমন করেন না।

সজ্ঞ। ঐ দেখ পাগলা মেয়ের পাগলামি! ওরে ওরা যে সব শিক্ষার্থী আর আমি যে ওদের শিক্ষক! আমার সঙ্গে কি ওরা সমান? দেখ মা, তোমার আমার একটি অনুরোধ আছে। বলবো কি?

সত্য। একি কথা বাবা! আমায় আবার আপনি অনুরোধ কি বল্‌বেন? আপনি কর্ব্বেন আমার আদেশ, আমি তা পালন কর্ব্বো এইত জানি।

সজ্ঞ। আর কি এখন তোমায় সেদিন আছে। এখন তুমিও যে দশের মধ্যে একজন হয়েছ। আর দেখ মা আমি যে আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে নূতন এক সংস্কার করেছি, তাতে অনেক ভ্রান্তির নিরসন করা হয়েছে। আমার 'মাধ্যমিকের কর্ম্মবিধিসূত্রে' আমি দেখিয়েছি যে বৌদ্ধ দার্শনিকগণও একেবারেই অভ্রান্ত ন'ন। আমার সংস্কৃত ধর্ম্মের বিধিই এ নয় যে মানুষ মানুষের দাসত্ব কর্‌বে, এ ধর্ম্মে ছোট বড় উঁচু নিচু নেই, সবাই সবাইকার সমকক্ষ। তাছাড়াও আমি তোমার পিতা, তুমি আমার কন্যা! তুমি বয়স্থা হয়েছ, নিজের মন যা চেতে চায় তা কেনইবা কর্‌তে পাবে না? যথার্থ মানুষকে আমরা যা ভাবি সে তা নয়, সে আপনার নিজের। অন্যের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ! সে কার সঙ্গে আসে না, কার সঙ্গেও যায় না। সে সম্পূর্ণই স্বাধীন, স্বতন্ত্র!

সত্য। তা আপনি আমায় কি বল্‌বেন বল্‌ছিলেন?

সজ্ঞ। দেখ মা, এখন তুমি বড় হয়েছ, আর আমারও বয়েস হয়েছে। তুমি আমার একমাত্র অপত্য, আমি ব্যতীত সংসারে তোমার অপর কেউ নেই, তা বলেতো কাল নিজের কর্ত্তব্য ভুলে থাক্‌বে না, তার যেদিন অভিরুচি হবে, সেই দিনই সে আমাদের দুজনকে স্বতন্ত্র করে দেবে, তাই বলি কি তোমায় কোন ঈপ্সিতপাত্রে আত্ম-সমর্পণ কর্‌তে দেখলে আমি নিশ্চিন্ত হই। তা প্রথম হ'লেও শতানীক তোমায় ভালবাসে সে আমায় কাছে সেদিন বলেছে তোমায় পেলে সে সজ্ঞ হ'তে চিরবিদায় নিয়ে গার্হস্থধর্ম্ম পালনে ইচ্ছুক আছে। আবার পরে সজ্ঞমিত্রের পদ তারই প্রাপ্য তা সেই মহাসম্মান পর্য্যন্ত সে তোমার জন্য ত্যাগ কর্‌তে কুণ্ঠিত নয়।

সত্য। পিতা! নারীর জন্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন আপনি সমর্থন কর্ব্বেন! সে যে আপনারই শিক্ষা!

সজ্ঞ। কি করি মা! যখন সংসার ত্যাগ করে এসেছি তোমায় মমতা ভুল্‌তে পারিনি। তোমার জননীর মৃত্যুকালে তাঁর কাছে, তোমার প'রে পিতৃ কর্ত্তব্য পালন কর্ব্বো বলে স্বীকার করেছি, তখন তোমায় ভবাদৃশ তো না দেখে পারিনে, সতি।

সত্য। কিন্তু পিতা! শতানীক প্রথম ধর্ম্মত্যাগ কর্‌লে তার পক্ষে তাতে মহাপাতক হবে, এ পাপ আমরা তাকেই বা কেন করাতে যাবো, আর নিজেরাইবা তাতে অংশ নেবো কেন? না পিতা! আমি যেমন আপনার কন্যা, সেও তেমনি আপনারই পুত্র!

সজ্ঞ। ঐ সব তোর এক একটা পাগলামি! ওরে বাছা, মন যদি ভিতর থেকে ত্যাগী না হয় তা হ'লে অনর্থক তাকে পীড়ন কর্‌লেই কি সে অমনি তখনেতে ত্যাগী হয়ে ওঠে? তা নয়রে, তা নয়! ত্যাগ ত বরং উল্টে আর একটা প্রবঞ্চনার পাপ বাড়ে। তার চেয়ে মন যা চায়, তাকে তা দেওয়াই ভাল। মন স্বভাবতঃই ভোগী, স্বভাবকে রোধ করা বড় কঠিন! বরং স্বভাবের অনুকূল যা সেটাই মানুষের পক্ষে সহজ! তাই মনকে বঞ্চনা কর্‌তে গেলেই বরং সে ভিতর থেকে বিদ্রোহী হয়ে উৎপাত ঘটিয়ে তোলে, তার চেয়ে তাকে ভোগ কর্‌তে দিয়ে তার ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্তি হ'তে দেওয়া ভাল। বিশেষ পাপ পুণ্য যথার্থ কোন বস্তু নয়, ও মানুষেরই মনের এক প্রকার ক্ষণিক বিকার মাত্র! যাতে মনে অশান্তি আনে তাই পাপ, আর মন যাতে প্রফুল্ল রাখে সেই পুণ্য!

সত্য। কি জানি পিতা, আমার কিন্তু চিত্ত শতানীকের প্রতি আকৃষ্ট হয় না।

আমি বিবাহ কর্‌তে চাইনে, আপনার কাছেই চিরদিন

থাকতে চাই। শতানীকের প্রকৃতির সঙ্গে আমার মিল হয় না।

সন্ধ। আচ্ছা বা, আমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিতে ইচ্ছুক নই, তা তোমায় ইতঃপূর্ব্বেই বলেছি তো। শতানীক তোমায় বড় ভালবাসে, তাই বলেছিলেম, তা এখন থাক্, এখন এই রকমই থাক্ [শতানীকের প্রবেশ] কি সংবাদ ?

শতা। এক নূতন বিদ্যার্থী এসেছে, তাকে এখানে আনতে পারি কি ?

সন্ধ। বিদ্যার্থী! তা' তাকে এখানে আনবার বাধা নেই।

[শতানীক ও প্রস্থান ও কুমারিলকে সঙ্গে লইয়া পুনঃ প্রবেশ] তুমই নূতন বিদ্যার্থী ?

কুমারিল। [নমস্কার করিয়া] আমিই আপনার নিকট শিক্ষার্থ এসেছি।

সন্ধ। উত্তম! তুমি কোন্ সাম্প্রদায়িক যুবক ?

কুমারিল। [নীরব]

সন্ধ। এ মধ্যাহ্ন কালের খরতাপে আপনার পথ পর্য্যটনে ক্লেশ বোধ করেন না ?

কুমারিল। আমি মাধ্যমিক।

সন্ধ। আমার কোন আপত্তি নেই। শতানীক! একে নিয়ে যাও। [শতানীক ও কুমারিলের আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া নিষ্ক্রমন]

সন্ধ। [আত্মগত] একি দেখ্লেম্! এ কাকে দেখলেম্? চোখের দৃষ্টি যেন ঝল্সিয়ে গেল। যেমনি সৌম্য শান্তমূর্ত্তি। তেমনি বিনয় বিনম্র চাউনি! কে এ? নিশ্চয় মানুষ কেউ নয়। মূর্ত্তিই ওর বলে দিচ্ছে এ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি; মেঘমণ্ডলাবৃত সূর্য্য! আজ ঢাকা আছে চিরদিন থাকবে না!

সন্ধ। এসো মা আমরাও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান উজ্জয়িনী রাজপ্রাসাদাভ্যন্তরস্থ কুমুদার পূজাগৃহ।

পূজাপরায়ণা কুমুদা ইন্দিরার বীণাযন্ত্রে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কুমুদা। [প্রণামান্তে] বিশ্বনাথ! এ দীনজনের দীন পূজা গ্রহণ করো! জানিনে তোমার কোন্ কর্ম্মের জন্যই ক্ষুদ্র কুমুদা অমূর সৃষ্টি করেছ! মন তার নিয়তই তাকে আশ্বাস দিয়ে দিয়ে বলে; আছে তোর ওই তুচ্ছ ব্যর্থ জীবনেরও প্রয়োজন আছে! জগতে একটি ক্ষুদ্র তৃণ-তন্তুর সৃজনও একান্ত ব্যর্থ নয়, তোরও জীবন সার্থক হবে। লীলাময়! বাঞ্ছা কল্পতরু! আমার এ অসার জীবনকে সত্য সত্যই কি তুমি সার করে তুলবে, যে সারাৎসার তোমার প্রেমে ময় করে দিয়ে, তোমার কার্য্যে তন্ময় করে ফেলে একে ধন্য করবে কি! একি মা ইন্দিরা! এই মহোৎসবের দিনেও তুমি সেই সুখবিলাসের আনন্দোৎসব পরিত্যাগ করে এখানে বসে কেন 'মা? [দেবনির্ম্মাল্য মস্তকে প্রদান] যাও মা পুরী মধ্যে গমন করো!

ইন্দিরা। আপনাকে গান শোনাবার জন্য বসে আছি, পিসিমা, গানশোনান বলেই আমি চলে যাবো।

কুমুদা। আজ আর না হয় আমায় গান নাই শোনান মতো মা, গৃহে আজ কত সমারোহ, কত আনন্দ, দেশ বিদেশ হতে আজ এখানে কত লোক এসেছেন, কত রাজা মহারাজার ধ্বজ ছত্র পতাকায় রাজমার্গ ও মার্গাকাশ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আজ সেই সবের মধ্যে নিজেকে আনন্দ ময় না করে দিয়ে এই নির্জ্জন পূজাগৃহে নিজেকে বন্দিনী করে রাখা কি তোমার মত বালিকার পক্ষে শোভা পায়! যাও মা আজ আর আমি নাথ গান না হয়—নাই শুনলাম, তুমি নূতন ভূমিপতির নিকট যাও, তিনিই বা এতে কি মনে কর্ব্বেন।

ইন্দিরা। তিনি এখন রাজসভায় গেছেন পিসিমা, আমি এই আপনাকে একটি গান শুনিয়েই চলে যাচ্ছি। বীণায় সুর বাঁধিতে লাগিল)

কুমুদা। পাগ্‌লা মেয়ে! মেয়ের আমার পিসিমা অন্ত-প্রাণ, সমস্ত সংসার একদিকে আর ওর এই সন্ন্যাসিনী পিসিমা একদিকে, নে' তবে একটা সেরে নিয়ে চলে যা, রাণী মহত এখনই তোর খোঁজ কর্ব্বেন।

ইন্দিরার গীত

শান্তি চাহো যদি মন,
তবে, শান্তি সুধা বৃথা করোনাক অন্বেষণ
নিজহৃদি পদ্মোপরে চেয়ে দেখ আঁখি ভরে,
হেরিবে রচিত সেথা শান্তি-নিকেতন।
শুধু ধ্যান ধারণায়, তাঁরে ফিরে ধরা যায়
বিশ্বাস ভকতি প্রেম-সহ সে রতন!

অন্ধ আকুল চিত্ত-মধুপ,
ঘুরিয়া ফিরিছে রাতি।
ওগো দেখ চেয়ে, নয়ন মেলিয়ে,
পোহাল আঁধার রাতি।
আঁধার ভেদিয়া উদিল তপন
আশারে করিয়া সাথী।

(পটক্ষেপণ)।

শুভ্রার প্রবেশ

শুভ্রা। অবাক্ করেছ! তুমি এখানে বসে আজও গান গাইচো, দেখসে ওদিকে তোমার মা কি রকম রেগেছেন। মহারাজ-কুমারি! আপনি কি বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করতে যাবেন না?

কুম। হাঁ যাবো বৈকি; আশীর্ব্বাদ করবোনা আমার সুহৃদকে সুহৃদ বরকে আশীর্ব্বাদ করবো না? তা বরকন্যা বিদায়ের সময় হয়েছি কি?

শুভ্রা। তা প্রায় হল বৈকি। আমায় আবার সব মাঙ্গলিক দ্রব্যাদির বন্দোবস্ত করতে হবে, তা'হলে যাই,—আপনারা যাবেন। একেইতো মহারাণী রেগে আছেন, অধিক বিলম্ব কর্ব্বেন না।

[প্রস্থান]

চলো মা ইন্দিরা, আমরাও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চমদৃশ্য

অবন্তী রাজান্তঃপুর

সুজাতা নরস্ত ও সখীগণ

সখীগণ—

গীত।

তব বদন কমল, অমল অতুল ভাতি।
হেরিয়া আজি পোহাইল, অন্ধ তামস রাতি।
স্নেহ, প্রেম সলিল করে চলচল,
তাহে ফুটিয়াউঠিল প্রীতি শতদল,

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সন্ন্যাসাশ্রম কুমারিল ভট্টের গৃহ

কুমারিল ও সত্যকাম

সত্য। একি! ঘরে আমাদের নিত্য রাজভোগ প্রস্তুত হচ্চে, আর তোমার জন্য এই সামান্য আহার্য্য! ভৃত্যদের এ অনবধানতা তো অমার্জ্জনীয়।

কুমারিল। মহাভাগ! রুষ্ট হবেন না, আমি স্বেচ্ছায় এই ব্রতবিধান গ্রহণ করে থাকি, এতে অন্যের কোন অপরাধ নেই।

সত্য। এযে দেখছি রন্ধনের সমস্তই আয়োজন রয়েছে! তাহলে কি এই ঘরেই তোমার রন্ধন হয়? কল্যাণ ভট্ট! আমার অনুমানই তাহলে কি ঠিক? তুমি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধ নও?

কুমারিল [নীরব]

সত্য। দুঃসাহসিক! তুমি জানোনা এ কাদের সঙ্গে এ খেলা খেলতে এসেছ! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপরায়ণ তোমার পক্ষে ব্যাঘ্রগহ্বরাপেক্ষাও এ সন্ন্যাসাশ্রমকে বিপদসঙ্কুল বলে মনে করো! সাবধান কল্যাণভট্ট! এই মঠবাসী একটি প্রাণীও যদি তোমার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে তবে জেনো তোমার আর নিস্তার নাই।

কুমা। দেবি! আমার বুথাই ভয় প্রদর্শন কর্চ্চেন, অভীষ্টলাভের জন্য এ সাহসিক কার্য্যে যিনি আমায় ব্রতী করেছেন তিনিই সর্ব্বাপদ হতে আমাকে রক্ষা কর্ব্বেন।

সত্য। কে সে ভট্ট?

কৃষ্ণা। তাঁকে আপনি চিন্‌বেন না দেবি! তিনি সকলেরই পরমাত্মীয় কিন্তু সবারতো তিনি পরিচিত নন। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী,—কিন্তু যে তাঁকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করে, জননীর মত স্নেহ সহকারে তাকেই নিজের কোলে সর্ব্বদা রক্ষা করে থাকেন।

সত্য। বুঝেছি তুমি কার কথা বল্‌ছো। কিন্তু আমার কাছে যাবলো, যেমো সত্যকামার দেহে প্রাণ থাকতে তা কখনই প্রকাশ পাবে না, অন্যের নিকট এসকল কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রচার করে ফেলোনা! যাদুল! তাহলে তোমার ত্রৈত্রিশকোটি ছাড়িয়া ত্রৈত্রিশ হাজার কোটি দেবতাও তোমায় নৃশংস মৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে পার্ব্বেন না।

কৃষ্ণা। আমি বিশ্বারাধ্য বেদের শরণাশ্রয়ী দেবি! কোন কিছুতেই ভীত নই।

সত্য। এত বড় আশ্চর্য্য ব্রাহ্মণ! কিন্তু ওকথা থাক্—ঐ না কে আসছে! শতানীক না!—ভট্ট! তুমি এই তোড়া-পাত্র ঘরিতে লুকিয়ে ফেলো,—ওঠো কথা শোন। শুন্‌লে না,—তুমি জানোনা শতানীক যদি এ সব দেখিতে পায়, এখনই সে সন্দিগ্ধ হইবে। আচ্ছা আমি অন্তরাল করিতেছি।

[তথা করণ]

শতানীকের প্রবেশ

শতা। কল্যাণ! তুমি একদিনও আমাদের আমোদ-প্রমোদে যোগ দাওনা, এমন বৈরাগিক কেন তুমি?—একি তুমি এখানে?

সত্য। তা তুমিও তো এখানে এসেছ।

শতা। [আত্মগত] আমার এ সন্দেহ গোড়া থেকেই কিন্তু এই কঠোর অধ্যয়নশীল শাস্ত্রবৃদ্ধের মত তপস্যা-পরায়ণ ভিক্ষু যে এই বিলাসগৃহ মালতীমালা কণ্ঠে বরণ করতে উৎসুক হয়নি তাও দেখ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু মানুষের তো মন! এ ভাবতে কতক্ষণ? তা হবে না। ভিক্ষুর তুমি তথাগতের মত বোধিদ্রুমের তলায় মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করোগে যাও, তাতে আমার কিছুমাত্র ঈর্ষা হবে না। কিন্তু এ অমৃতবিন্দু তোমার জন্য নয়! দেবি যদি ঠেলা দিলে সরে যাও ভালই—নইলে গুঁড়িয়ে পড়্‌বে। থাকবে না—সেটা ঠিক! [প্রকাশ্যে] হ্যাঁ এসেছি, সবাইকে জানাতে এসেছি যে, আমি এখন সঙ্ঘবিজেতার সহকারী—যদি কোথাও সঙ্ঘনিয়মের ব্যতিক্রম দেখি তা'হলে পায়ের তলায় কুশাঙ্কুরের মতই আমায় তা উৎপাটন করে ফেল্‌তে হবে।

সত্য। তা তোমার পায়ের কাঁটা তুমি তুলেই ফেলো, আমাদের তাতে কি!

শতা। জেনে রাখা ভাল, জেনে রাখা ভাল, আকস্মিক বজ্রাঘাতের চেয়ে বেদ জেগে ওঠে সে ভাল না?

সত্য। সে একি কথা কি বলো কল্যাণ ভট্ট?

কৃষ্ণা। কি আদেশ কর্‌ছেন দেবি?

শতা। (স্বগতঃ) উস্ দেবী! কিন্তু!—একি! এ যে বেদ কল্পনাকারী ব্রাহ্মণ ধর্ম্মীর ভাষা! এ তবে কে।

সত্য [সভয়ে স্বগত] শুন্‌তে পেয়েছে কি? [প্রকাশ্যে] এই আকস্মিক বজ্রাঘাত ভাল না,জেগে শুনে বাজ পড়া ভাল?

কৃষ্ণা। যা আমাদের জন্য আসে সবই ভাল।

শতা। এখন বিদায়, আশা করি তুমিও শীঘ্র বিদায় নিয়ে নিজ কার্য্যে গমন কর্ব্বে। [স্বগতঃ] ঐনা ওর পিছনে কি একটা গোপন রেখেছে! বুঝেছি কল্যাণ ভট্টের জন্য উপহার দ্রব্য আনা হয়েছিল। সত্যকামা! সাপের লাজে পা দিয়েছ, সামলাতে পার্‌লে হয়!

প্রস্থান

সত্য। বুঝতে পার্‌লে কল্যাণ! ওই কুরচিত্ত হৃদয়হীন ব্যক্তি সব বুঝতে পেরেছে। মনে ওর করুণার বিন্দুমাত্র স্থান নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি মনে ওর নরকাগ্নি জ্বলে উঠেছে, সেই আগুনে সে তোমায় ভস্ম করতে চায়। তুমি পালাও কল্যাণ ভট্ট! অবিলম্বে এ স্থান হতে প্রস্থান করো। বিলম্বে বিপদকে নিশ্চিত বলে জান্‌বে।

কৃষ্ণা। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আপনি গ্রহণ কর্ব্বেন দেবি। আমার জন্য বৃথা নিজেকে উৎকণ্ঠিত কর্ব্বেন না। বিপদ সম্পদ আমার নিকট বিভিন্ন নয়। এ দুইই এক মঙ্গল হস্তেই উদ্ভূত। বেদ বলেছেন—তিনি 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' তিনি কেমন করে অ-শিবের অন্তরাত্মা হবেন, নিজে যিনি শিব।

সত্য। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! একি ধর্ম! এর মর্ম কি? আমায় শেখাও! এই হিমগিরি তুল্য অটলতা যে আমাদের স্বপ্নেরও অতীত! তোমার এই বজ্রের মত কঠিন বিশ্বাসের বর্ম পরে এই সংশয় তিমিরাচ্ছন্ন গহন হ'তে দূরে চলে যেতে যে আমারও সাধ হচ্ছে। তোমার এই জলধিতুল্য অসীম বিশ্বাসের এতটুকু কণালাভ করতে পারলেও আমার পক্ষে তা প্রচুর। যাও ব্রাহ্মণ! নিজেকে রক্ষা করো, এখান হতে এখনই চলে যাও।

কুমা। না দেবি! আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ। বেদ্ধায় আমি এখন কোথাও যাবার অধিকারী নই।

সত্য। আমার সকল অনুরোধই তুমি কাটিয়ে দিলে কল্যাণ! কিন্তু শতানীক যে আমায় এমন তুচ্ছ ভাবতে পাচ্ছে না এই আমার শুধু ভাবনা! এখন চল্লেম। তুমি আহার করো। [প্রস্থান]

কুমা। এসব আহার্য্য ব্রাহ্মণের গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সন্ধ্যারাগের সংলগ্ন উপবন
সত্যকামা

সত্য। গীত

বিসর্জ্জনের বাজনা আজ উঠ্‌ছে বেজে সকল কাজে,
বিধাদের বিলাপবাণী বইছে কে যে প্রাণের মাঝে।
ছিলাম,—গৃহকোণে আপন মনে আপনা ভোলা,
নিজের মাঝে কি সুখে যে কাটতো বেলা।
আজ, কোথা হ'তে দুইয়ে ওঠে দহন-জ্বালা,
নয়নের শতধারায় নিবলোনা সে আকুল লাজে।
বেদনার কি রাগিণী বাজছে সদাই হৃদয়-মাঝে॥

প্রাণে আমার কখনও এমন অশান্তি তো ছিল না, একি হলো? কেন এমন হলো? কে কি আমায় করে দিলে? চিরদিন যে আশ্রম নীড়ের পাখী আমি, সেখানের বাতাসে অবধি এ রকম গুরুভার নেই। সেখাকার সবই যে যাওয়ায় ভেসে যাওয়া পাখীর পালকের মতই লঘু! সেখানের শান্তালাপ প্রেমালাপেরই মত সহজ রুচিকর, সেখানের জ্ঞান পরীক্ষা হাস্যরোদে যাত্র, সেখানের সঙ্গীতে ভাবোত্তেজনা উদ্দীপক দীপক, মেঘমল্লার, কানাড়া নাই, আছে মলয়ার মত মৃদু মৃদু পুলকসঞ্চারী রাগিণী বিঁঝিট। আজ আমার প্রাণে তবে কোথা হতে এই মহারাগ ভৈরবের উৎপত্তি হলো! কোন্ বিশ্বকর্ম্মা এমন অলক্ষিতে আমায় মধ্যে এই নবীন সৃষ্টির নূতন সৌন্দর্য্যে ভরিয়ে দিলেগো! এমন করে কে আমায় নবীন করে দিলে? আচ্ছা মনে আমার এই যে সম্পূর্ণ অজানা এই যে বিদ্রোহটা উঠেছে এটা কি ঝড়ের যাওয়ার? না বসন্তের বাতাসের? প্রাণ আমার এই যে শান্তিহীনতায় ব্যাকুল হয়ে উঠছে একি তার আগতপ্রায় কোন সর্ব্বনাশের আতঙ্কে, না অলৌকিক কিছু একটা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়? কিছু যে ঠিক করে বুঝতে পারছিনে। একদিকে যেন একটা নূতন পাওয়ার নেশায় লোভ চঞ্চলও করে তুলছে আর একদিকে কে যেন ওকে বলছে, তোর সব যাবে—তুই সর্ব্বস্বান্ত হবি! একি সত্যতা? আচ্ছা কল্যাণ ভট্ট, কল্যাণ ভট্ট আমার কে? কে? কেউ না। আমি বৌদ্ধাচার্য্যের কন্যা, ভিন্ন ধর্ম্মী, ভিন্ন জাতি, অথবা সত্য কথা বলতে গেলে আমাদের জাতিই বা কোথায়? কিন্তু কল্যাণ! ওযে চিরকুমার সমাচ্ছন্ন হিমাচলের তুল্য শুভ্রবৎ চিরনির্ম্মল, তেমনি সৌরবোজ্জ্বল! না আমরা কেউ কারুর কেউ নই। আমি স্বচক্ষে দেখছি আমরা ওর ঘরে প্রবেশ করেছিলেম বলে ও সেদিন আহার্য্য সব ফেলে দিয়েছিল, ওর কাছে আমার এই তো মর্য্যাদা! না আমিও সত্য সত্য অত দুর্ব্বল নয় যে যা আকাশ পুষ্পের মতই অলীক, তারই জন্য আমার ধ্যানের আসন পাতবো—

শতানীকের প্রবেশ

শত। [আত্মগত] আশা! শুষ্ক মুখে তার লোভরি লুটত লুটত কাঁদত রাই। সত্যকামার আজকাল নিকুঞ্জ-কানন যেন একদণ্ড চলে না। এত তন্ময় যে এত কাছেও মানুষটার সাড়া পেলেনা! [প্রকাশ্যে] পরম-প্রবুদ্ধা সত্য-কামাকে অভিবাদন!

সত্য। [চমকিয়া] আঁ! কে কে'—পরম প্রবুদ্ধ শতানীক! সঙ্ঘ তে'মার কল্যাণ সাধন করুন।

শতা। গুরুর আশীর্ব্বাদ সকলের রক্ষা কর্ত্তা হোক! আজকাল তোমার সাক্ষাৎ পাওয়াই কঠিন। মনও তোমার সর্ব্বদা উতলা দেখ্‌তে পাই না বৃদ্ধসেবিকে?

সত্য। প্রমদা প্রধান! নারীর মানসিক সংবাদ কি প্রমদের উল্লেখযোগ্য?

শতা। ভুল সত্যকামা! প্রমদের বর্ম্ম লোকে যা বলে বলুক সে ভুল! মানুষ তবু নিয়মের দাস নয়। আচারের চেয়ে মানুষের দাম অনেক বেশি। আমরা মানবচিত্তকে জটিল শাস্ত্রাচারে অথবা মুসভ্য-চারে আবদ্ধ রাখ্‌তে চাইনে—বাঘের মত, জলের স্রোতের মত তাকে প্রকৃত স্বাধীন থাকতে দিই।

সত্য। সেই কি উচিত? বাঘের রক্তরুচিকা, জলের বন্যাস্রোত, তাদেরই ঐ স্বাধীন স্বেচ্ছাতন্ত্রতা কিরূপ ভীষণ মনে ভাব দেখি? সে যে সর্ব্বনাশী!

শতা। হা হা হা! সত্যকামা, ঐ সর্ব্বনাশেই তো যথার্থ আনন্দ! অগ্নি যখন ঊর্দ্ধশিখে জ্বলে ওঠে। তখনই না সে অপরূপ! ঝড়ের গর্জ্জন, শ্রাবনের কলকল্লোল, বজ্রের হুঙ্কার এদের কি তুলনা আছে।

সত্য। উঃ তুমি কি শতানীক?

শতা। হা হা হা! তুমি যে সত্যই কেঁপে উঠ্‌লে! আচ্ছা তবে অন্য কথাই কই! কল্যাণভট্ট কোন্ শ্রেণীর, কোন্ গোত্রীয়, কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বৃদ্ধসেবিকে?

সত্য। আমার সঙ্গে পরিহাস করচো শতানীক? কল্যাণভট্ট, যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীই নয় তার সম্বন্ধে এসকল মিথ্যা তত্ত্ব তুমি আমায় নিকট কি হিসাবে জান্‌তে চাইছো?

শতা। তাহলে তুমি রহস্য ভেদ করতে চাও না? একজন বিধর্ম্মী বিশ্বাসহন্তার সৌমকতা করে আত্মজনের উচ্ছেদই তোমার কাম্য?

সত্য। শতানীক! শতানীক! আমায় এরূপ তিরস্কার করোনা। কেন তুমি সুযোগ পেলেই আমায় কষ্ট দাও? আমি তোমার কি করেছি?

শতা। কি করেছ জানতে কি? আমি তোমার জন্য চিরশোণিত উচ্চাভিলাষ সমস্তই বিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত। এই সন্ন্যাচার্য্যের কাঙ্ক্ষিত পরত্যাগ করে তোমায় বিবাহ পর্য্যন্ত করতে চাইছি—সেই আমায় তুচ্ছ করে তুমি কার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাচ্ছো? না যে আমাদের ভবিষ্যৎটাকে দীপাশিখার ন্যায় ফুৎকারে নিবিয়ে দেবার জন্য আমাদের প্রতারণা করে বল সঙ্গে করতে এসেছে—সেই বেদের উপাসক ব্রাহ্মণকে।

সত্য। মিথ্যা কথা। আমি ভিক্ষু কন্যা ভিক্ষুণী, পিতৃস্নেহে মুগ্ধা! নতুবা এতদিন প্রব্রজ্যাবলম্বন করতেম! ভবিষ্যতে এইরূপই কর্ব্বো আমার এই মত স্থির।

শতা। অসম্ভব, তা যদি করো কল্যাণভট্টের সর্ব্বনাশ করবে।

সত্য। শতানীক! তোমার বুদ্ধির সীমা নাই! কে বলেছে কল্যাণভট্ট বৈদিক?

শতা। আচ্ছা তুমি শপথ করে বল্‌তে পারো যে কল্যাণভট্ট বৈদিক নয়? [স্বগতঃ] এইবার দেখা যাবে, সত্যকামা মিথ্যা বলেনা আমি জানি।

সত্য। হাঁ পারি, কল্যাণভট্ট বৌদ্ধ—বৈদিক নয়। [স্বগতঃ] যদি সত্যই বিশ্বের কেউ প্রাণতম থাক, আমার এ মিথ্যা তোমার মার্জ্জনীয় হবে।

শতা। তবে কি আমারই ভ্রম! আচ্ছা সে তোমার স্পৃষ্ট খাদ্য কোনদিন গ্রহণ করেছে দেখছ?

সত্য। কতদিন।

শতা। [স্বগতঃ] সত্যকামা কখন মিথ্যা বলে না, কিন্তু আরও পরীক্ষা চাই—হয়ত নিজেও প্রতারিত। [প্রকাশ্যে] শুনে সুখী হলেম। এখন বিদায়।

প্রস্থান।

সত্য। আঃ বাঁচালেন! কল্যাণভট্ট! আমি তোমার কেউ নই বলেছিলুম তা নয়, আমি তোমার পরম হিতৈষিণী। যখন তুমি কাছে তখনও আর যখন দূরে তখনও সমভাবেই আমি তোমার মঙ্গল কামনা কর্ব্বো। এদেহ আমার পিতৃদত্ত; তাই এদেহে তাঁর ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম! কিন্তু যদি মৃত্যুর পরও কিছু থাকে তবে সেখানে আমি তোমার ধর্ম্মের,

তোমার মতের, তোমারই ইষ্টদেবের শরণাপন্নী আমি কারু নয়।

[প্রস্থান ও অপর দিক হইতে সন্ধ্যমিত্র ও শতানীকের প্রবেশ]

শতা। কল্যাণভট্ট নিশ্চিত আমাদের শাস্ত্রাদি শিক্ষার্থ ওইরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করে এসেছে, সে যে বৌদ্ধ নয় তা আমি অশেষ প্রকারেই প্রমাণ করতে প্রস্তুত।

সন্ধ্য। আমার এ কথা বিশ্বাস হয় না শতানীক, কল্যাণভট্ট অতিশয় বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান্ শিষ্য। তাকে শিক্ষাদান করে এতদিনে আমার আচার্যপদ যথার্থ গৌরবান্বিত হয়েছে। সে কখনই বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না।

শতা। আপনি প্রতারিত হয়েছেন আচার্য!

সন্ধ্য। ভাল, কেবলমাত্র সন্দেহের উপর কা'কেও দণ্ডিত করা সঙ্ঘাচার্যের কর্তব্য নয়,—যেমন তুমি, কল্যাণভট্টও আমার সেইরূপ শিষ্য, বিশেষ প্রমাণ ব্যতিরেকে আমি তার বিচার করতে পারিনা। বিশেষতঃ আমার বিশ্বাস তোমার এ দোষারোপের মধ্যে একটু ঈর্ষা ও তোমার তার 'পরে কিছু কঠোর করে তুলেছে, তাল সে যে ব্রাহ্মণ্যচারী তার প্রমাণ কি?

শতা। সে কোনদিন কাহীরও সাক্ষাতে সঙ্ঘের অন্ন গ্রহণ করে না, আমি এইমাত্র দেখে এলাম; সে নিজের ভবিষ্যৎ নিজে প্রস্তুত করছে, তার লোকাবৃত্তি—লক্ষ্য করলেই দেখবেন তার উচ্চারণ ভঙ্গী বৈদিকের ন্যায়।

সন্ধ্য। উত্তম, পরীক্ষায় তার আমি যদিতেই গ্রহণ করলেম, যদি বুঝতে পারি যথার্থই একটা অযুক্ত সমূল ব্রাহ্মণ আমাদের প্রবঞ্চিত করে রেখেছে, তাহলে তার সমুচিত ফল পেতে আর বিলম্ব হবে না, কিন্তু যদি তোমার ভ্রান্তি হয়—

শতা। আমি সানন্দে গুরুদণ্ড গ্রহণ করবো! কিন্তু নিশ্চিত জানবেন, কল্যাণভট্টের বৌদ্ধাচার তাপসাত্র, উদ্দেশ্য তার আমাদের ধর্মের নিগূঢ়ার্থ সকল সংগ্রহ করে শেষে আমাদেরই পরাভব করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্বিজয়-কেতন উড্ডীয়মান করা।

সন্ধ্য। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বৌদ্ধসঙ্ঘের পদতলে এইরূপেই দলিত হয়েছে, আর চিরদিনই তাই হবে। [ভূমে পদাঘাত করিয়া প্রস্থান]

শতা। আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি, আর ফুঁটিও দিতে হবেনা। রূপসী সত্যকামা! রূপের পূজা করতে গে'লে গুণের মর্যাদা বুঝবে না! আচ্ছা আগুনেও একপ্রকার বড়ভীষণ বড় সুন্দর রূপ আছে, সুন্দরি! এ তেজিয়ানের তেজোগ্নি প্রতিহিংসার আগুন! শতানীক তোমার কাছে বড় তুচ্ছ হয়েছিল, না? তাকে প্রতারিত করে মনে করে মিথ্যা তোক দিয়েছিলে, মনে করেছিলে এতেই সে সব ভুলে যাবে! না তত মূর্খ সে নয়। এইবার সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দিতে পার্বে, দেখে নিও।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান উজ্জয়িনী—রাজসভা

রাজা, যুবরাজ, মন্ত্রী ও সভাসদগণ

নেপথ্যে বৈতালিকগণের গীত

জয় জয়তে রাজাধিরাজ সকল জন বন্দিত
বজ্রশক্তির অনলানিল রাজ্যে যাঁর শঙ্কিত।
সূর্যালোক প্রতাপ যাঁর, চন্দ্রসম করুণাতার,
ইন্দ্রসম মহিমা তাঁর মানব দেবনন্দিত।
পৃথিবী যাঁর শত্রুহীন, বিত্ত যাঁর নৃপতিহীন,
লক্ষ্মী যাঁর বক্ষলীন ধর্ম অর্থ সঙ্কিত।
সবার যিনি শরণ ঠাঁই, শরেণ্য যাঁর ত্রিলোকে নাই,
বীণা যাঁর মুকুটমণি ইন্দ্রধনি লাঞ্ছিত।
রাজেন্দ্র যিনি রাজার পর, রাজরাজশ্রী ভূবনীশ্বর,
তাঁহার কৃপা হইতে দূর, করো না নিজেরে বঞ্চিত।

রাজা। হিন্দু-মন্দির সংস্কার শঙ্করীর পক্ষে অনুচিত-বটে, কিন্তু দেশের প্রাচীন কীর্তি রক্ষা করা তেমনি রাজধর্ম।

যুবরাজ। যে কীর্তি সুকীর্তি নয় তা লোপ পেলেই বা ক্ষতি কি? মহাকালের মন্দির কালের স্পর্শে আপনা হতে জীর্ণ হয়েছে, কালের স্রোতে ভাসা দেবার প্রয়োজনই বা কি? কেউতো ইচ্ছা করে নষ্ট করেনি।

রাজা। কিন্তু রাজধর্ম —

দূত। না মহারাজ! স্বধর্ম্মের রক্ষাই রাজধর্ম, পরধর্ম্মের রক্ষণ রাজধর্ম্মের অঙ্গ নয়। বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি রক্ষা করার আপনার বাধ্য-বাধকতা কিসের? এতে সঙ্কর প্রজা শ্রীবৃদ্ধি হবে। মহাস্থবির ও ভিক্ষু প্রবণগণ ব্যথিত হতে পারেন।

রাজা। মহামন্ত্রী আপনার কিরূপ অভিপ্রায়?

মন্ত্রী। মহারাজাধিরাজ স্বধর্ম্মের রক্ষণই রাজকর্ত্তব্য; এ যাবৎ এই প্রকারই শিক্ষা করেছে, এখন রাজবিচার যেরূপ হয়, অধিক বলা দাসের পক্ষে ধৃষ্টতা।

রাজা। তবে কি পরধর্ম্মে বিদ্বিষ্ট হওয়াও উচিত?

মন্ত্রী। প্রভু! এরূপ আজ্ঞা করেন না। আমরা কোন ধর্ম্ম মতেই বিদ্বিষ্ট নই, মাত্র উদাসীন থাকতে ইচ্ছুক।

রাজা। হাঁ। অবশ্য আমাদের বলবার যুক্তি আছে, যুক্তি আছে, তবে কি নব-প্রাচীন কীর্ত্তি! প্রাচীন কীর্ত্তি!

দূত। রাজাধিরাজ! অপরাধ ক্ষমা করেন! আপনিই আমায় আপনার প্রতিভূস্বরূপ রাজকার্য্যে অধিকার দান করেছেন বলেই বলতে সাহসী হচ্ছি, আপনি রাজকুমারী দুহিতার পরামর্শেই এই মহাকাল মন্দির সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হয়েছেন। কন্যা-স্নেহের বশে আপনি প্রজার মর্ম্মাঘাত লক্ষ করবেন না। দুহিতা বৌদ্ধধর্ম্মে হলেও হিন্দু-দেবদেবীর উপাসিকা, হিন্দু আচার-পরায়ণা, তার পরামর্শে রাজ্য ও রাজ্যের মঙ্গল সম্ভাবনা অল্পই আছে।

রাজা। দুহিতা আমায় কখন কিছু বলে না, এবার বড় কাতর হয়েই এ অনুরোধটি সে করেছিল, সে বলে রাজার অপক্ষপাতী হওয়াই উচিত। তা তা মন্ত্রির কি মত।

মন্ত্রী। দাস রাজচরণে পূর্ব্বেই তা নিবেদন করেছে। পরধর্ম্মে দ্বেষ অনুচিত মনে করি, কিন্তু তাতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে স্বধর্ম্মের প্রতি কিছু দৃঢ়তার হ্রাস হয় কি?

রাজা। তা, হাঁ তা মিথ্যা কি! দুহিতা যা বলেছে! দুহিতা হিন্দু, তার পরামর্শ রাজকার্য্যে কিছুমাত্র প্রহি নয়। আচ্ছা যাক্ আর কোন রাজকার্য্য সম্বন্ধে কোন পরামর্শ আছে?

মন্ত্রী। মালবরাজের দূত রাজ-সম্বর্শনের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

রাজা। কেন তাকে আনতে পারো।

[মন্ত্রীর ইঙ্গিতে প্রতিহারের প্রস্থান ও দূত সহ পুনঃ প্রবেশ]

দূত। পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী আশ্রিত পালক অবন্তীশ্বর সমীপে মহারাজা যশোবর্দ্মদিত্য এই উপঢৌকন প্রেরণ করেছেন।

রাজা। দূত! মহারাজকে বলো আমরা তাঁর প্রেরিত উপহার প্রীতির সহিত গ্রহণ করলেম।

দূত। মহারাজাধিরাজ! আমাদের মহারাজ রাজ-চরণে অশেষ বিনতিপূর্ব্বক নিবেদন করেছেন যে কাশ্মীর-রাজ প্রবল হয়ে আর্য্যস্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার চেষ্টা করছেন। শীঘ্রই তিনি মালব আক্রমণ করতে মনস্থ করেছেন এবং তারপর ক্রমে ক্রমে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তেই তাঁর শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শিত হবে। সময়ে যাতা প্রদান একযোগে এখন সকলকার কর্ত্তব্য।

রাজা। তোমার কি অভিপ্রায় দূতবর?

দূত। কাশ্মীর হ'তে অবন্তীর পক্ষে ভয়ের সম্ভাবনা অল্পই, তবে মালবরাজ যখন আমাদের সাহায্য চেয়েছেন তখন অবশ্যই তা পাবেন। বিশেষতঃ তিনি যখন আমাদেরই মত সঙ্কর্ষণের উপাসক। তিনি রক্ষিত হ'লে সঙ্কর্ষ রক্ষিত হবে।

রাজা। তা বলেতো কথাই নাই, দূত! মালবরাজকে আমাদের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন কর্ব্বে। মহামন্ত্রী! রাজদূতের পরিচর্য্যাভার উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত করবার ব্যবস্থা করুন।

[মন্ত্রির ইঙ্গিতে জনৈক ব্যক্তির মালবদূত সহ প্রস্থান]

মন্ত্রী। রুদ্রপুর হতে অপর এক রাজদূত উপস্থিত হয়েছে।

দূত। [উপঢৌকন রক্ষা পূর্ব্বক] পরম ভট্টারক পরম মহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ চরণে মহারাজ উগ্রসেনের এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে,—পার্ব্বত্য খস-জাতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও ভীষণ অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা করতে একান্ত

অসমর্থ হলে তিনি তাঁর রাজ্যের সমস্তই জবরীচরণে-সমর্পণ করে আপনারই আশ্রিত হবেন ; এক্ষণে শরণাগতকে রক্ষা করা সম্বন্ধে যেরূপ আপনার অভিরুচি।

রাজা। আশ্রিত জন অবশ্যই আমাদের রক্ষণীয়, অবশ্যই রক্ষণীয়—

দূত। রাজা উগ্রসেন শৈব। শৈব রাজার জন্য বৌদ্ধ-প্রজার অপক্ষপাত আমাদের ধর্ম নয়, তিনি অপর কোন হিন্দু রাজার আশ্রয় নিতে পারেন।

দূত। মহারাজ! ধর্মবিদের সহিত রাজনীতির—

রাজা। খুব যথেষ্টই সংস্রব আছে। আমরা এ ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারিনে ইহা স্থির।

মন্ত্রী। হাঁ তাইতো বটেই তাতো বটেই—দেখ দূতবর! তুমি রাজাকে আমাদের এমন কষ্টের কথা জানাবে। আমাদের এতে কোনই অপরাধ নেই।

দূত। না মহারাজ! আপনার অপরাধ নয়, অপরাধ এ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যারা মানুষকে শিক্ষা দেয় সেই তাদের। হিন্দু হোক, বৌদ্ধ হোক, জৈন হোক, সে যে মানুষ, সে যে স্বদেশবাসী এদের পরস্পরের শুভাশুভে যে পরস্পরেই শুভাশুভ নির্ভর করছে এ শিক্ষা তো কেউ কাউকে দেয় না, মানুষের কাছ হতে মানুষকে ঘুরে সরিয়ে দেয়। তাতে দোষ কার।

মন্ত্রী। দূত! এ রাজসভা এ বন্ধ তুমি নয়, এসো আমার সঙ্গে এসো।

রাজা। অদ্য সভা ভঙ্গ হোক। [একদিক দিয়া মন্ত্রী ও দূত এবং অপর দিক দিয়া অপর সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান কাশী বরণাতীরবর্তী রাজান্তঃপুর

সুজাতা।

সুজাতা। মহারাজাধিরাজকন্যা আমি রাজার মহিষীও হয়েছি তবু ও মনে সুখ পাইনে! স্বামী আমায় ভালবাসায় ভরিয়ে রেখেছেন, লোকে আমার সৌভাগ্যের ঈর্ষা করে; এমন অ-স্বপ্ন আধিপত্য নাকি কোন রাজ-মহিষীর ভাগ্যে ঘটে না! তা অন্যের ঘটে না বলে যে আমার ঘটবে না তার মানে কি? পিতা আমার অবন্তীশ্বর মহারাজচক্রবর্তী রাজা, আমাদের একটা রূপা কটাক্ষের জন্যই কতলোক লালায়িত, তা সেই আমাকে নিজের ঘরে যে আনতে পেরেছে সে যে সেই গৌরবটুকু নিজের রক্ষা কর্মে এ আর এমন বিচিত্র কি? ওঁর সব ভাল, কিন্তু কেমন একটা ভাবের উচ্ছ্বাসে যেন কবির মত তন্ময়তায় ডুবে থাকেন—আমার সেটা ভাল লাগে না। মানুষ জাগ্রৎ বাস্তবতায় যেখা অমন স্বপ্নের ঘোর থাকবে কেন? ভালবাসেন, কিন্তু সে যেন ভালবাসার উপদ্রব! আমি ওরকম বুঝিনে, যাকে ভালবাসি তার মনটাকে আমি ভালবাসিনে, ভালবাসি তার ভালটুকুকে। সেই ভালয় যদি কোথাও বাধাত যেখি আমার প্রাণে তাতে আগুন জ্বলে উঠে, উপস্থিত সংসারকেই তার ভাল মন্দ সবশুদ্ধ জড়িয়ে ভালবেসে পাগল! মন্দ কিছুই ওঁর চোখে পড়েনা, পড়লেও তা চেয়ে দেখতে জানেন না, একেই বলি কবির! এ একটা ভাবের উচ্ছ্বাস মাত্র, সত্য বস্তু এ নয়—

[কিঙ্করীর প্রবেশ]

কিঙ্করী। হিমাদ্রি বিহারীবিহারের সঙ্ঘাচার্য্য, মশাই একবার যুবরাজ্ঞীর দর্শন কামনা করেন।

সুজা। এখনি সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

[কিঙ্করীর প্রবেশ ও সঙ্ঘাচার্য্য সহ পুনঃ প্রবেশ]

আসন গ্রহণ করুন। কি প্রয়োজন আচার্য্য?

সঙ্ঘাচার্য্য। [স্বগত] নারী হয়েও আচার্য্যকে প্রণাম করে না। একেই গর্ব্বিতা!

[প্রকাশ্যে] মূর্ত্তিমতী বুদ্ধপ্রেম স্বরূপা মহাদেবীর নিকট সুবিচার প্রার্থনা করতে এসেছি।

সুজা। আদেশ করুন।

সঙ্ঘাচার্য্য। সম্প্রতি মণিকর্ণিকার চক্রতীর্থ নিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী ও বৌদ্ধসম্প্রদায় মধ্যে এক ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় সংবাদ সম্ভবতঃ অন্তঃপুর মধ্যেও প্রবেশ করে থাকবে? উভয় সম্প্রদায়ের এই বিসম্বাদের ফলে দুএকজন হতাহতও হয়, অদ্য সেই বিবাদসম্বন্ধি বিচারে মহারাজ এক বিশেষ সম্মানিত প্রবলের প্রতি কঠোর দণ্ড বিধান করে সমগ্র বৌদ্ধ-জগতের ভীষণ মনোবেদনার কারণ হয়েছেন।

দণ্ড রহিত করার জন্য অনেক নিবেদন করা হয়েছিল কোন ফল হয়নি, তাই সঙ্ঘের বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রতিনিধিরে আপনার নিকট এসেছি। বৌদ্ধধর্ম রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হতে পারে না। রাজার তার 'পরে কোনই অধিকার নেই। তিনি এতে হস্তক্ষেপ করলে বৌদ্ধসঙ্ঘ মনব্যথায় অধীর হবে। অধিক আর আপনাকে কি বলবো, আপনি পরম বুদ্ধিমতী সবই বুঝতে পাচ্ছেন।

সুজা। রাজা কি বলেন?

রাজা। চিরদিন তাঁর যা মত। তিনি বলেন যে, গুপ্তী সে যতাই, যে আমার প্রজা সে আমার বিচারের অধীন, এখানে বৌদ্ধ হিন্দুপ্রভেদ গৃহীর কোন প্রভেদ নেই।

সুজা। কি বৌদ্ধে হিন্দুতে কোন প্রভেদ নেই!

সঙ্ঘাচার্য্য। এইরূপই তাঁর অভিমত।

সুজা। সঙ্ঘস্থবির! আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে গৃহে গমন করুন, তিনি নিজের ধর্ম ত্যাগ করলেও আমি তা করতে দেবো না। বৌদ্ধ হিন্দু তফাৎ তাঁকে রাখতেই হবে।

সঙ্ঘাচার্য্য। আপনার অভয়বাক্যে আমাদের মর্মপীড়িত চিত্ত শীতল হোল। (স্বগতঃ আপনার মঙ্গল করুন)। [প্রস্থান]

সুজা। রাজার এই বিদ্বেষের মত যায়তে না পারলে আর আমার স্বস্তি নেই—এতো বিদ্বেষ নয়, এর নাম নাস্তিকতা। ধর্মের প্রতি অনাস্থা আমি বৌদ্ধ সম্রাট-দুহিতা—আমার এ সহ্য হবে না।

[অরন্তের প্রবেশ]

অরন্ত। কি শান্ত মৌন সন্ধ্যারাণি! পবিত্রতার ভারে অবনত, সাধুচিত্তের ন্যায় নির্মল এই দিবারাত্রির সঙ্গম ক্ষণটি মানবচিত্তে স্বতঃই কেন কি একটি অনির্বচনীয় শান্তির সুর জাগিয়ে দিয়ে, তাকে যেন আরও নম্র আরও সৌম্য অধিকতর প্রশান্ত করে তোলে। এই অস্তমন আলোকের বিলীয়মান প্রায় ছায়াতলে নিজেকে বিলয় করে দিয়ে আমি যখন তোমার মুখের দিকে চাই তখন যেন সমস্ত হৃদয় আমারও অজ্ঞাতে নির্বাসনের একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে হয় বুদ্ধিমতী সন্ধ্যারাণী তুমি, আমার এই আলোছায়া ভরা জীবনকে চির সমুজ্জ্বল করবার জন্যই এর মাঝখানে উদিত হয়েছ—আর—

সুজা। মহারাজ! এখন এসব কাব্য-কবিতা বন্ধ রাখুন—আমার কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে।

অরন্ত। কি প্রয়োজন বলো প্রিয়ে!

সুজা। অনুরোধ রক্ষিত হবে জেনেই বলছি; দেখ যেন অন্যথা করবেন না!

অরন্ত। কবে তোমার আদেশ অমান্য হয়েছে প্রাণাধিকে? তুমি যে অরন্তর সর্বস্ব!

সুজা। তা জানি বলেই বলতে পারি,—নতুবা আপনি একজন প্রমত্তকে দণ্ডিত করে সমস্ত বৌদ্ধসমাজের মনব্যথার কারণ হয়েছেন, দণ্ডরহিত করে বৌদ্ধসঙ্ঘের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন, এই অনুরোধ।

অরন্ত। [ম্লান হইয়া] এ যে রাজকার্য্য রাণি!

সুজা। তবে কোন্ কার্য্যে আমি মহারাজের সর্বস্ব মহারাজ?

অরন্ত। রাজকার্য্য ব্যতীত সকল কার্য্যে, সকল সময়েই তুমি আমার জীবনসর্বস্ব, রাজকার্য্যে তোমার তো ব্যক্তিত্ব নেই রহিবি, সেখানে আমিই কি আমার অধীন তাতো নয়। রাজনীতিই যে প্রকৃত রাজা তারই ক্রীতদাস মাত্র। তুমি অরন্তের প্রাণতমা। রাজা—

সুজা। আর স্পষ্ট অপমানটা করবেন না মহারাজ! বুঝেছি আমি আপনার ক্রীতদাসীর অবসরের ক্রীড়া-সঙ্গী—অপর কিছু নই।

অরন্ত। সে কি সুজাতা! ছি ছি না না ও কথা তুমি মনে আনি মর্মে বড়ই ব্যথা পাবো, তুমি সখী, সঙ্গিনী সহধর্মিণী আমার সব। তুমি বই আমার নিজের বলতে আর কে আছে? আমি অরন্তরাজ্যে বাস্তবিকই তোমার।

সুজা। কাজে বোঝা যাচ্ছেনা রাজন্! সেই জন্যই আমার সামান্য একটা আবেদনও গ্রাহ্য হয় না! একটা সামান্য প্রজারও অধম আমি।

অরন্ত। রাজা প্রজার ইচ্ছার দাস, কিন্তু তুমি তো আমার প্রজা নও মহিষী, তুমি বন্ধু—তুমি—

সুজা। থাক্ মহারাজ! প্রেমের প্রলাপ আমি এ' কয়দিনে অনেক শুনেছি। কেন আমার কথা থাকবে না? তুমি যেমন এ রাজ্যের রাজা—আমিও তেমনি

এ রাজ্যের রাণী। আমার আদেশ বৌদ্ধপ্রধানের-মতরহিত হবেই হবে।

জয়ন্ত। না মহিষি, তা হবে না। অনেক বিচার করে সেই মতপ্রবর্তনের জন্য এই নগরীও স্থিরীকৃত হয়েছে। এর আর পরিবর্ত্তন হয় না। এ রহিত করবার ক্ষমতা কাশীশ্বরের নেই।

সুধা। কাশীশ্বর! তবে এখন উপবেশিত রাজসিংহাসনে অবন্তীশ্বর দুহিতা ধন্য বোধ করে,—তুমি রাজা নিয়ে সুখে থাক, পিতৃগৃহেই আমার স্থান হোক।—

[বেগে প্রস্থান]

জয়ন্ত। রাণি! রাণি, সুধাতা, [পশ্চাতে প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

কুমারিল ভট্টের গৃহ

বিশ্ববারা

বিশ্ব। কতদিন গত হল প্রভুর কোন তত্ত্ব পাইনি, এক এক সময় নিজের এই ধৈর্য্য লক্ষ্য করে নিজেই বিস্মিতা হই। দিবারাত্রির প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত যাঁর জন্য উৎসর্গিত ছিল, আজ এই দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ সহ্য করে এ কঠিন প্রাণ কেমন করে ধারণ করছি! নারীকে কোমলা বলে কিন্তু আমিতো দেখছি সে একটা ভ্রান্তিমাত্র! নারীর হৃদয় বিধাতা পাষাণ দিয়ে তৈরি করেছেন।—কি পাগলের মত আবোল তাবোল ভাবছি দেখ। বিচ্ছেদ কোথায়? পার্থিব ভাবেই আমরা দুজনে দুজনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি বটে, কিন্তু আমাদের অন্তরের যোগতো এক মুহূর্ত্তের তরেও ছিন্ন হয়নি! তবে আমার এবিচ্ছেদকে মনে করি কেন? এ'তো স্থূল প্রত্যক্ষ দেহের বিচ্ছেদমাত্র, সূক্ষ্ম ভাবতো আমরা লোক লোকান্তরেও কখন বিচ্ছিন্ন হয় নাই! অনাদি কাল ধরেইতো এই প্রকার ঘরে এসেছে, এ আর ক'টা মুহূর্ত্ত! এ'বে সেই বিশ্বমূর্ত্তি—আকি সেইরূপ সুস্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। প্রভু সেইরূপ পদ্মাসনে বসে অধ্যাপনা করছেন, সেই প্রসন্ন হাস্য, সেই জ্ঞানদীপ্তি উদার দৃষ্টি। নাঃ মনকে বৃথা উতলা করবো না; তাঁর প্রীতিকাম হয়ে তাঁর উদ্দিষ্ট কার্য্য যত্নের সাধ্য সম্পন্ন করে যাই; তাতেইতো তাঁকে পাওয়া, নৈলে মনের দুর্ব্বার দুরন্ত নিকটতমকেও যে দূরে ঠেলে দেয়। ঐ যে আমার শিষ্যাগুলি আসছে!—অহো আমি শিশা সমী বালিকা সব,—ওরা যেন সংসারে পবিত্রতার এক একটি প্রতিমূর্ত্তি! এই সব বালিকারা যখন গৃহিণী ও জননী হবে তখন গৃহ আবার পুণ্য উদ্যোগন, এবং সন্তানগণ বাস্তবিকই হবে আবার এ অবনত আর্য্য-ভূমিতে গত গৌরব পুনরানয়ন-কর্ত্তা।

[বিদ্যার্থিনী বালিকাগণের প্রবেশ ও গীত]

গীত

—ধীরে ধীরে—
গত-গৌরব আসিবে ফিরে।
বোরা,—আর্য্য নারী।
দুহিতা ভগিনী, গৃহিণী জননী,
হবো, লক্ষ্মী রূপিণী, জানে যারা,—
নির্ম্মলা শীতলা স্নেহেরি বারি।
গৌরব-ভানু উদিবে অচিরে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান রাজাধিরাজ, প্রাসাদ-শিখর।

সন্ন্যাসিত্র, কুমারিল, শঙ্করাচার্য্য ও শিষ্যবর্গ, সভাকবি ও নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ গীত।

নশ্বর এই বিশ্ব ভূবনে বিদ্যা সবই সত্য ওই,
পুণ্য পাপ সব কথার কথা নেইকো কিছুই সত্য বই।
কোথাও নেইক ভগবান্, ও সব বুজরুকেরই বুজরুকি ভাই
হিসেবে ওতে কান,
দেবতা টাবতা মিছে কথা, কোথায় তারা প্রমাণ কই?
জেনো, পুণ্য পাপ সব কথার কথা নেইকো কিছুই সত্য বই।
—ছিলেন বুদ্ধ মহাজন, নির্ব্বাণেতে এখন তিনি শূন্যে নিমগন
কেবল শুকসত্য জগৎ মিথ্যা, এই পরমতত্ত্ব গোনুরে কই,
আর, পুণ্য পাপ সব কথার কথা নেইকো কিছুই সত্য বই।

সকলে। গুরুসত্য জগৎ মিথ্যা, গুরুসত্য জগৎ মিথ্যা, গুরুসত্য জগৎ মিথ্যা।

সজ্ঞ। উত্তম! তোমাদের সঙ্গীতে আমি তুষ্ট হয়েছি। 'গুরুসত্য' ইহাই এজগতে একমাত্র সারসত্য, গুরুভক্তিতে মহাপাপীও ঈশ্বর লাভ করতে সমর্থ। এখন তোমরা যেতে পারো।

সকলীকরণ। (প্রণাম ও প্রস্থান)

কল্যাণী। (জনান্তিকে) ওরা ভুলে যাবে নাতো?

শতা। (জনান্তিকে) নীচ বিহারের মধ্যে কাল ভাল ক'রে মঙ্গলিস হবে সে ওরা জানে।

সজ্ঞ। শতানীক, কল্যাণী, উপমন্যু, কল্যাণ তোমাদের সঙ্গে আজ একটু শাস্ত্রালোচনা করতে ইচ্ছুক হয়েছি, তোমরা একটু অপেক্ষা কর্ব্বে।

সকলে। প্রভুর যে আদেশ।

সত্য। (স্বগতঃ) আমার মন কল্যাণ ছুটের অমঙ্গলাশঙ্কায় নিয়তই ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছে। আহা! তরুণতপন রঞ্জন তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রাহ্মণ! কেন অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিতে তুমি এই আত্মজ্ঞান-রহিত স্বার্থান্ধ বৌদ্ধসঙ্ঘের মাঝখানে এসেছিলে? তোমার ওই যে হৃদয়ের পর্ব্বতের মত অবিচল বিশ্বাসভক্তি ওরে সাধারণ হৃদয়ের পরিচয় কেউ না তা আমার মত একটা সামান্য নারীকেও কাছে বলে দিতে হয় না। এই সমুজ্জ্বল রশ্মিজাল বিকীর্ণকারী মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড কি বাস্তবিকই এমন করে চির-মেঘাবৃত হয়ে যাবে? কি করি? কি হবে! কোন উপায় কি হবে না? কেউ কি কোথাও এমন নেই যে ওকে এদের নির্দ্দয় প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা করতে পারে? আমার মনে হচ্ছে আজই কিছু একটা ঘটবে। ওই শতানীক হিংস্র লক্ষ্য চাঁদ মধ্যে মধ্যে ওই সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণের পানে যে কটাক্ষপাত করছে ওর মধ্যে যে কতখানি রক্তলোলুপতা বিদ্যমান ওই অহিংসক সরলপ্রাণ কি বুঝবে! আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ছে!

সজ্ঞ। মানবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় কিসে শতানীক?

শতা। গুরুভক্তিতে।

সজ্ঞ। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত কল্যাণি?

কল্যা। পরমগুরুর প্রসন্নতা লাভ।

সজ্ঞ। এজগতে নিরয়গামী কে উপমন্যু?

উপ। প্রভো! আমরাই! যেহেতু আমরা প্রকৃত গুরুভক্তির মর্ম্ম জেনেও যথার্থ ভক্ত হতে পারিনে।

সজ্ঞ। আনন্দলাভ করলেম! ত্রিভুবনের সারসত্য কি কল্যাণ?

কৃষ্ণা। ত্রিভুবনের সারসত্য একমাত্র সত্তাস্বরূপ পরমা (সত্যকামার অঙ্গুলী ইঙ্গিতে সজ্ঞমিত্রকে প্রদর্শন) পরমগুরুই (স্বগতঃ) যাঁর শক্তি গুরুশক্তিরূপে মানবে বিদ্যমান, তিনিই যথার্থ গুরু এবং তিনিই এজগতের একমাত্র সত্য।

সজ্ঞ। (স্বগতঃ) 'পরমা' বলে যেন কি গোপন করে নিলে বাক্ ও কিছু না। কল্যাণি তুই আমার প্রকৃত ভক্ত! শতানীক আমার সর্ব্ব পুরাতন শিষ্য হ'লে কি হয়, তার চিত্ত একটু কুটিল ও ঈর্ষাপরতন্ত্র। (প্রকাশ্যে) শ্রবণ ও অন্তেবাসী নবকর্ণিকগণ! আজ আমি তোমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা বলতে ইচ্ছা করি, সুরক্ষিত মানব-জীবের জরামরণাদিদুঃখ নিবৃত্তি জন্য যে ধর্ম্ম প্রচার করে গেছেন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অপৌরুষেয় বেদবৎ তা যদিচ আকাশ-কুসুম মাত্রই নয়,—তথাপি তার সাধনপথ বহু বিঘ্নসঙ্কুল এবং অত্যন্ত কঠোর।

কৃষ্ণা। (স্বগতঃ) পরমপুরুষের নিঃশ্বাসোৎপন্ন অপৌরুষেয় বেদসম্বন্ধে এই নাস্তিকগুলা কিরূপ তীব্রভাষোক্তি করছে? অথচ নিজেরাই স্বীকার করেছে যে, বুদ্ধদেব সমস্তই মানবকল্পিত। শব্দের অনিত্যতাও এরা নিজেরাই অস্বীকার করে; সেইজন্যে বর্ত্তমান পুরুষ কর্ত্তৃক প্রণীত মানবশাস্ত্র কখনই বেদের ন্যায় নিত্য হতে পারে না। এর অপ্রমাণ্য তো প্রতিপন্নই হয়ে রয়েছে।

সজ্ঞ। আমি তোমাদের সুরক্ষিত, কঠোর আয়াসসম্পূর্ণ শরীরশোষণশীল ত্রিভুবর্ণের পরিবর্ত্তে তাহারই সমফলোপধায়ক এক নব ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করেছি। যেহেতু দুঃখাদি দ্বারা চিত্ত উৎক্ষিপ্তই হয়, স্থির হয় না

এই গুরুপরম্পরাগত ধর্ম্মের আশ্রয়ে তোমরা ত্রিভুবনের সমান ফললাভ করবে ইহা নিশ্চিত, কিন্তু বাস্তবিকই যদি তোমাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে গুরুভক্তিতে তন্ময় হয়ে থাকে তবেই।

সকলে। গুরুং বিপদানামগ্র্যং, ধর্ম্মং বিদ্যানামগ্র্যং, সজ্ঘংগণানামগ্র্যং।

সঙ্ঘ। 'বুদ্ধং বিপদানামগ্র্যং' এর স্থলে 'গুরুং বিপদানা—' এই পরিবর্ত্তনের জন্য মহাবাক্য প্রত্যাহারজনিত পাপ স্পর্শিত হয়নি। বুদ্ধের স্থলে এখন তোমাদের গুরুই সর্ব্বপ্রত্যক্ষ উপদেষ্টা! বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করায় গুরুই এখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত। বৈদিকগণের পক্ষে উহাদের প্রলাপ বচনবৎ; বেদ যেরূপ পূজ্য, তোমাদের নিকট গুরুবচনও সেই প্রকার। যদি বল ইহা কিরূপ? তবে উত্তর এই যে, যদি কোন বুদ্ধিমান্ মানবের বুদ্ধি-প্রসূত না হয়েও বেদ কতকগুলা বর্ব্বর শ্রেণীর মানবের নিকট বাস্তব-সম্বন্ধশূন্য কোন কল্পনা-প্রসূত আপ্তবাক্য পুরুষের বাক্যরূপে পূজিত হ'তে পারে, তবে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধ গুরুবাক্য কেনই বা না পূজিত হতে পারে?

কুমা। (স্বগতঃ) গুরুর নিকট বেদের যেমনই আদর প্রাপ্ত হই, সেইজন্যই গুরুবাক্য সম্মানিত ও পূজা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

সত্য। (স্বগতঃ) আমি বুঝতে পারছি বিপদ ক্রমে ঘন ঘনীভূত হয়ে আসছে কি করি? কার শরণাপন্ন হই! আচ্ছা—সেই তাঁকেই কেন ডাকি না?—সেই যিনি 'মেষলক্ষলোচনে মায়ের মতই অনিমেষে চেয়ে আছেন'? আবা কি সে দৃষ্টি! কত করুণাই না জানি সে দৃষ্টি হ'তে ঝরে পড়ছে। যা কখন দেখিনি জানিনি মায়ের চোখে কি আছে! কিন্তু ব্রাহ্মণ! তুমি কি যাদুমন্ত্র জানো? তোমার সেই 'সদাজাগ্রৎ সর্ব্ব প্রিয়তমের' কথা আমার শয়নে স্বপনে কেন নিয়তই মনে পড়ছে! আহা! তাঁর কথা মনে করতে মনে হয় যে কতই ভরসা জেগে ওঠে। না জানি তোমরি গুরু তাঁকে আরও কতই সর্ব্বত্যাগী প্রেম দিতে পারলে আমরা কতই ধন্য হই।

সঙ্ঘ। মানুষ স্বভাবই নিত্যমুক্ত! মায়াকে মিথ্যা দোষারোপ করা, মায়া জীবকে বদ্ধ রাখতে পারে না। বিশেষতঃ গুরুপদিষ্ট জীব মায়ার অধিকৃত হ'তে পারে না, এবং তার জন্য স্বর্গ নরকাদি কিছুই নাই যে নির্ব্বাণ পরমধন লাভ কর্ত্তার অধিকারী। অতএব চিত্তকে কদাপি দুঃখযুক্ত না করে সর্ব্বদা আনন্দরসপানে আত্মসুখ রেখে গুরুসেবা করে যাও, অপর কোন কঠোর সাধনার প্রয়োজন হবে না। দুঃখহীন সর্ব্ব-বঞ্চিত চিত্ত অপরকেও বঞ্চনা করে যে কখনই দারুণ পরিতাপ করতে পারে না। বৈদিকগণের বিশ্বাস তাদের যজ্ঞশক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে যজ্ঞ-পুরুষরূপ দেবতারা এসে তাদের ভোগ মোক্ষাদির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, বেদ ঋত্বিগাচার্য্যের গল্প-রচনা, পুরোহিতগণের দক্ষিণা সংগ্রহের উপলক্ষ আর কিছুই না।

কুমা। (স্বগতঃ) হা বেদ! তোমার এই অবমাননা এখনও এই পাপী জীবিত শরীরে সহ্য করছি! আমার মস্তকে তথাপি এখনও বজ্রপাত হচ্ছে না? ধিক্ আমাকে!

শক্তা। (অগ্রসর হইয়া) আচার্য্য! স্বচক্ষে দর্শন করুন, এই অন্তেবাসী কল্যাণ ভট্টের নেত্রে বেদ নিন্দা শ্রবণে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

সঙ্ঘ। কল্যাণ ভট্ট! যথার্থই কি তুমি বেদবাদীর ব্রাহ্মণ?

শক্তা। আমি জানি কল্যাণ ভট্ট চক্ষু পীড়ায় পীড়িত।

কুমা। আপনার অনুমান অযথার্থ নয় আচার্য্য! আমি বেদদ্রোহীর হতভাগ্য ব্রাহ্মণ, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পুনরুদ্ধার চেষ্টা আমার একমাত্র জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

সঙ্ঘ। বাতুল, বাতুল! নীরব হও!—

সঙ্ঘ। এই প্রত্যাবক ব্রাহ্মণকে এই উচ্চ প্রাসাদ-শিখর হ'তে নিক্ষিপ্ত করা হোক, এর প্রতি এই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করলেম।

সত্য। পিতা! পিতা! তোমাদের মূলমন্ত্র 'অহিংসা পরমধর্ম্ম'।

শক্তা। মেধি! তোমার অস্ত্রোপরোধ যেন আমাদের পৌরুষকে পরাভূত করে তোমার রক্ষা করতে পারে কি না (কুমারিলকে ঠেলিয়া দিল)।

কুমা। যদি মোক্ষ সত্য হয় তবে এই পতনে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। [নিম্নে পতন]

সঙ্ঘ। শতানীক! শতানীক! নিষ্ঠুর, নরপিশাচ! [মূর্চ্ছা]

পটক্ষেপণ। ক্রমশঃ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

দেবী

সংসারের শত দুঃখে হাত মুখে তুমি নিলে তার
রূপে গুণে সুন্দর যদি প্রাণ ভরি' করিলে সোহাগ।
তারপর মরমনন্দে চাকে যথা শাস্তবক দিয়া
তেমতি সহস্র দুঃখ হাস্য-মুখে লুকায়েছ প্রিয়া।
ঘরিত্রের শাক আর তুলে নেছ বলিয়া অমৃত
তোমার অকল যারে অসন্তোষ চির অসম্মত।
ভোগে তুমি পরতলে, রোগে তুমি শিয়রের' পরি'
পুণ্যকর্মে অনুষ্ঠাত্রী, নর্মসচিব চির সহচরী।
বিন্দু বিন্দু করি তুমি রচিলাছ তৃপের কুলায়ে
পালকের আবরণে বক্ষঃ কত রেখেছ লুকায়ে।
সম্পদে যে অন্নপূর্ণা, বৈদেহী যে দুঃখ বনবাসে
ফুরাবার সমাবারি এ হৃদয় মেউলের পাশে।
এত দয়া বক্ষে তুমি রাখিয়াছ পূর্ণকুম্ভ ভরি,
পূর্ণতার শব্দ কোথা? তাই তুমি নির্বাক সুন্দরি!
ছাওনা পুজিতে মোরে, পূজা দিলে বলো হবে পাপ,
না পুজিলে আমার যে আরো পাপ আরো অনুতাপ
তুমি যদি দেবী নহ কোন্ স্বর্গে খুঁজিব দেবীরে?
স্বর্গেরে এনেছ সঙ্গে যে দেবতা মর্ত্যের কুটীরে।
পতিরো বরেণ্যা তুমি অর্চনীয়া হৃদয় দেউলে
শঙ্কর পূজিল যথা ভবানীরে ধুতুরার ফুলে
কোথা অর্ঘ্য? কিছু নাই যাহা আছে তব পুণ্য যারা
গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজি যোর নাহি আত্মবল ছাড়া।

শ্রীকালিদাস রায়

দুইদেশী

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

(পূর্বানুবৃত্তি)

সন্ধ্যার পর সুরেন্দ্রনাথকে নিকটে পাইয়া পিসীমা বলিলেন, "বাবা এতদিন পরে দেশ বিদেশ ঘুরে এলি তা একবার সমস্ত দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে হয় না?" সুরেন্দ্রনাথ পিসীমার পদধূলি লইয়া পায়ের কাছে বসিল, "আমার ছুটোছুটির শেষ হ'ল পিসীমা, এইবার থেকে এইখানেই পড়ে থাকব। আর না বেরে তাড়ালে নড়ছি না। এখন থেকে তোমরা যা বলবে তাই করব, তার বেশী কিছু করব না।" পিসীমা হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, তা যা করি তা' আমার খুব জানা আছে।

আর যা ইচ্ছে কর বাবা কিন্তু দীন দুঃখীদের আজ ভিটে ছাড়া ক'র না।" সুরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "সে কি পিসীমা আমি আবার কাকে ভিটে ছাড়া করলাম? আদিইত সবারই আগার ভিটে ছাড়া হয়ে বেড়াচ্ছি।"

পিসীমা! তোমার কি সব কথা মনে পড়ছে বাবা, তা হ'লে আর দুঃখ কি?

সুরেন্দ্র। কি বলছ তুমি পিসীমা, আমি তোমার ছাড়া অপরাধের কথা মনেই আনি না, কিন্তু আমার ভাগ্যের

দোষেই বল বা পুরুষের দোষেই বল, ভাল করতে গিয়ে যদি মন্দ হয়ে যায় তা হ'লে আমারই সব অপরাধ? কিন্তু ও কথা যাক্, কাকে মিটে ছাড়া করলাম?

পিসীমা। তুমি কি কখনও কারও উপকার করতে গিয়ে, সে সেই উপকার নিতে অস্বীকার করাতে, তার ওপর রাগ করে তাকে জব্দ করার চেষ্টা করনি? আমার সেই দেওরপোদের কথা, আমার বা'দের কথাটা কি তুমি ভুলে গেলে?

সুরেন্দ্র। না মা ভুলব কেন? কি হয়েছে তাঁদের?

পিসীমা। একখানা পত্র সুরেন্দ্রের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এইখানা পড়ে দেখ।"

সুরেন্দ্র পাঠ করিল। পত্রখানায় অমলা তাহার স্বামীর আবার বহু কথা লিখিয়াছে, এবং তাঁহার মনো আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই বিবৃত ছিল। অমলার মাকুলানী পাকা গৃহিণী, তিনি কি করিয়া পরের কথা আকর্ষণ করিতে হয় তাহা দুঃখে পড়িয়া পূর্ণভাবে, এমন কি কলা হিসাবেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার বিনাইয়া বিনাইয়া বুলার কথাতে সুরেন্দ্রের উত্তেজিত চিত্ত আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে পত্রখানা পড়িয়া যায় হস্তে নূতন আবৃত করিয়া কণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "তা আমি কি করব, আমার ত কিছু করবার জন্য কেউ ডাকছে না। আমি যে কারও কেউ নই পিসীমা।"

পিসীমা। সে কি সুরেন, তুমি দেশশুদ্ধ লোকের আপনার, আর আপনার লোকের তুমি পর হয়ে থাকবে?

সুরেন্দ্র। মিত্র যে হ'তে দেবে না তার ত' একটা কিছু আপনার হতে হবে? তাই আমি তাদের পর হয়েছি।"

পিসীমা। সুরেন, এই অনাথাদের বাড়ী ঘর দুয়ার হতে তাড়িয়ে, তাদের দুবেলা দু'টী অন্নের পথ পর্য্যন্ত বন্ধ করে, তুমি চুপ করে থাকবে?

সুরেন্দ্র হঠাৎ সরিয়া পড়িয়া উপাধানে মুখ লুকাইল। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত শরীরে, বক্ষ জঠরের কম্পন-চঞ্চলতার লক্ষণ দেখিতে লাগিল। পিসীমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সুরেন, কি হল বাবা?—অমন করছ কেন?"

সুরেন কোন উত্তর দিল না। পিসীমা তখন একখানা পাখা লইয়া তাহার মাথায় বাতাস দিতে লাগিলেন।

কণ পরে সুরেন মুখ তুলিলে পিসীমা বলিলেন, "কি হয়েছে সুরেন, অমন করছ কেন?"

সুরেন্দ্র। কিছু না পিসীমা, কবে যাবে তুমি?

পিসীমা। কোথায়?

সুরেন্দ্র। কোথায় আবার, এই এদের কাছে?

পিসীমা। যেদিন তুমি নিয়ে যাবে।

সুরেন্দ্র। আমি—আমি কি এঁদের কাছে যেতে পারব? এঁরা ত আমায় ডাকেন নি?

পিসীমা। সে কি সুরেন? তবে এ পত্র আমায় লেখার মানে কি? আমায় লেখার মানে তোমাকেই লেখা।

সুরেন্দ্র। আমায় ত তাঁরা দুর দুর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। জগতে ভালবাসতে পারা যে এত শক্ত তা'ত জানতাম না;—আমি ত কিছু চাইনি, কেবল বলেছিলাম যে আমায় একটু স্নেহের চক্ষে দেখবেন। কিন্তু সেটুকুও তাঁরা দিতে কৃপণতা করলেন।

পিসীমা। তুমি এত বোকা বাবা, আর এইটুকু বুঝতে পার না যে সংসারের লোক সবাই ঠিক এক রকমের লোক নয়। কেউ বা দয়া করলে বেঁচে যায়, কেউ বা দয়া দেখাতে গেলে অপমান বোধ করে। তুমি তাদের দয়া দেখাতে গিয়েছিলে তারা তা নেয়নি, এতে তাদের কি অপরাধ হয়েছে? যদি তাদের ভালবেসে কিছু দিতে যেতে তা'হলে কি তারা তা নিতে অস্বীকার করতে পারত? ভেবে দেখ যে, তুমি তাদের গরীব দেখে একরকম অপমানই করতে গিয়েছিলে। যদি তাদের দুঃখের অবস্থাকে বাদ দেওয়া, তুমি হ'লে তারা যা দিয়ে তোমার কিনে নিতে চাচ্ছিল, তা তুমি নিতে পেতে নিতে। অমন্ত্রণ কিনিষকে তুমি অবজ্ঞা করলে, তারাই বা তোমার দয়া নেবে কেন? আরও দেখ ভালবাসলে কি কেউ কার অপকার করবার কথা মনে করতে পারে? তোমায় সাহায্য নিলে না বলে রাগ করে তুমি আমার অন্য নানা রকম নির্য্যাতনের বন্দোবস্ত করলে; এতে তাদের ওপর অভিমান করছ। এ তোমার কি রকম

বুঝি? পিসীমা নীরব হইলে, সুরেন্দ্র ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল। ঘরে বীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আজ রাত্রে সেখানে যাওয়া যায় না?" ৬ষ্ঠ পিসীমা যাবে?"

পিসীমা। তাড়াতাড়িতে দরকার নাই, আমি এক রকম বন্দোবস্ত করিয়াছি।

সুরেন্দ্র। কি করেছ?

পিসীমা। কিছু টাকা তাদের নামে পাঠিয়ে দিয়েছি।

সুরেন্দ্র। ছি ছি তা কেউ করতে সেলে?

পিসীমা আমার যা ছিল তাই আশীর্ব্বাদ বলে পাঠিয়েছি বৈ সে কি তারা নিত? সরকারকে সব কথা বুঝিয়ে দিয়ে কত কাকুতি মিনতি করে পত্র লিখে দিয়েছি, তবে তারা নিয়েছে। একটা সুবিধে হয়েছিল, ছোট বৌর অসুখ তাকে না জানিয়ে ছোট বৌর তাজ টাকাটা নিয়েছে।

সুরেন্দ্র। না পিসীমা, এ কাজ ভাল হয় নি, মাধব—পুরের জমিদারীটত আমি বোগেশের নামে কিনে দিয়েছি, কিন্তু তার টাকা কিস্তি কিস্তি এখানেই পৌঁচেছে ওঁরা টাকা নেবেন কেন? ওঁরা যা চান তাই দিতে হবে,—তা না দিলে হবে না। পিসীমা অভিমানের আতিশয্যে সুরেন্দ্রের চিবুক ধরিয়া একটি চুম্বন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বাচালি সুরেন, আমার যে কি ভাবনা গেল তা আর কি বলব? ছোট বৌর কষ্ট মনে করে আমার কি কষ্ট যে হচ্ছিল তা কি বলব। আচ্ছা ওদিক যদি ফিরিয়ে আবার শ্বশুরের ভিটের বসাতে পারিস তা হলে তোর বড় পুণ্য হবে এত কিছুতেই হবে না।"

সুরেন্দ্র। সে কি পিসীমা, সংসারে কত দীন দরিদ্র আছে তাদের কত কাজ কত উপকার করতে পারি, সে সবে পুণ্য হবে না, আর এইটেই এত বড় কাজ হ'ল!

পিসীমা। দীন দরিদ্র থাকতে পারে, কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে লোক লজ্জা, ভয় ভয়, আর সব চাইতে যেটা গরীবের সঙ্গে যায় না, সেই খান অপমানজ্ঞান যার আছে সেই সব চাইতে গরীব।

সুরেন্দ্র। না পিসীমা; আজ আমি তোমার উপকার করতে চাইনে, এখন চাই আমার কেউ উপকার করুক। আমি নেও নেও বলে সারা পৃথিবীময় ছুরে কেবল পরকে আঘাত করিছি। এখন ভাবছি উল্টোভাব ধরব—দেখি তাতে কিছু হয় কিনা। এখন বলব, আমিই সব চেয়ে দরিদ্র আমায় কিছু দাও। যা পাচ্ছি তাই চেয়ে নেব, তাকেই খুব সেলাম বলে মনে করব, কারণ একটা কথা আছে ভিক্ষের চাল কাঁড়া কি আকাড়া' তা দেখতে যাওয়া মূর্খতা। যা চেয়ে নেওয়া হবে তার মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করব না।

পিসীমা আর কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু সুরেন্দ্র নাথ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে হাতের কাজ গুলা সারিয়া লইয়া সে পিসীমাকে লইয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সুকুমার আসিয়া বলিল, "একি আবার কোথায়!" সুরেন বলিল "তয় নেই, ভাই এবার বেশী দূরে নয়, কাছেই বটে।"

সুকুমার। না সে হবে না, আমি আজ তোমায় ছাড়ছি না, আজ আমার ওখানে সারাদিন তোমায় কাটাতে হবে।

সুরেন্দ্র। কেন বল দেখি, কি হয়েছে?

সুকুমার। হবে আবার কি, কাল সারাদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করে করে শেষে বাটার বলায় আমার তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কলকাতায় পৌঁছেই কখন যে সরে পড়লে কেউ জানতেই পারলে না—যাই হ'ক আজ আর কোথাও নড়তে পাচ্ছ না।

সুরেন্দ্র তখন সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল, "আর দেরী করা চলে না।" সুকুমার বলিল, "একদিনে আর কিছু যায় আসবে না, কাল যেখানে হয় যেও। আজ তোমায় কলকাতায় থাকতেই হবে, তোমার বন্ধুরা তোমার জন্য যে তাঁরা পাঠিয়েছেন।" সুরেন্দ্র কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না, —কি, তোমাদের মতলবটা কি শুনি?"

সুকুমার। মতলব আর কিছুই নয়, তোমায় হাত পা বেঁধে বন্দি করার মতলব।

সুরেন্দ্র। আমারও তাই ইচ্ছে—

সুকুমার। তা হলে চলে এস, তোমার জন্য উপযুক্ত কারাগার ঠিক করা হয়েছে।

সুরেন্দ্র। কোথায় ওনি?

সুকুমার সঙ্কোচে বলিল, "বলি আমায় নাকি সেই কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে?"

সুরেন্দ্র। Metaphor ছাড়, বল, কে সে, যার এতবড় দুর্মতি হয়েছে?

সুকুমার। দুর্মতি! সে কি হে?

সুরেন্দ্র। আমাদের মত লোককে হঠাৎ কে বিয়ে করতে চাইবে বুঝতে পারছি না। সুকুমার জোর করিয়া হাসিতে চাহিল। সুরেন্দ্র তাহার এই কাষ্ঠ হাসিতে বিরক্ত হইয়া বলিল, "অমন করে মিথ্যে হাসিতে আমায় ভোলাবার চেষ্টা করছ কেন? আমি আর নাবালকটিতে নেই। এখন আমায় দু'দিন ঠাণ্ডা হতে দাও। আমায় নিয়ে আর নাচিও না—সোহাই সুকুমার—আর আমি পারছিনা।"

সুকুমার। সত্যি বলছি সুরেন, আমি ঠাট্টা করছি না, আমি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে সব ঠিক করে এসিছি, এখন কেবল তোমায় নিয়ে গিয়ে তাঁহার কাছে ফেলতে পারলেই হয়।

সুরেন্দ্র। অর্থাৎ?

সুকুমার। অর্থাৎ শ্রীমতী সত্যবতী চৌধুরীকে আমরা তোমার জন্য—

সুরেন্দ্র। থাম, সত্যবতীর এতে মত আছে? সুকুমার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "মা তাঁর মতটা ঠিক নেওয়া হয় নি তবে—"

সুরেন্দ্র। আমি 'তবে' 'টবে' শুনতে চাইনে। উনি তোমায় যে পত্র লিখেছিলেন তা পড়ে যা বুঝেছি তাতে এ বিবাহে তিনি কখনই মত দেবেন না। তিনি যাকে চাইছেন সে অন্য তাই সে আমার ঘাড়েই এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। আমি তাকে বলছি তাঁর আমার জন্য আর কাউকে চিন্তা করতে হবে না। আমি এমন এক জনের কাছে কাল দিয়েছিলাম যে আমার সমস্ত চাঞ্চল্য থামিয়ে দিয়েছে। আর নয় ভাই, এখন আমি যা করব তাতে আমার নিজের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। আমি নিজেকে কারও ওপর চাপিয়ে দিতে চাহিনে, এখন চাই কেউ আমায় তার নেবে। সত্যবতী যে সমাজে আছেন তাতে আমার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়া সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব, কারণ আমি আমার সমাজকে ছেড়ে কেবল তাঁদের নিয়ে থাকতে পারব না। আমায় তোমরা মুক্তি দাও—মনে কর যে আমি তোমাদের পক্ষে নেই। বড় বড় ঘর সংসার আপনার নিয়ে থাকবার মত অহংকার আর আমার নেই। আমি যত ছোট তত ছোট হয়েই থাকব। বড় আশায় বড় নৈরাশ্য,—আমি আর সে কষ্ট সহ্য করতে চাইনে। তুমি আমার জন্য যে স্বার্থত্যাগ দেখাতে চাচ্ছ তাতে তোমায় আমার চেয়ে অনেক বড়ই করেছে। কিন্তু বড়লোকের সঙ্গ আর আমার সহ্য হচ্ছে না—হবেনা। তুমি এখন নিজের পথ ঠিক করে নাওগে ভাই। তার নেই এতে আমার একটুকুও কষ্ট হচ্ছে না, কারণ আমি এ কাজে এতটুকুও ত্যাগ দেখাচ্ছি না। সত্যবতীকে তুমিও চাও, তিনিও বোধহয় আর তোমায় প্রত্যাখ্যান করবেন না। অতএব খোলসা মনে তাঁকে লাভ করগে, আমার জন্য আর ভেব না। আমিও বোধ হয় শীঘ্রই বিয়ে করে ভাল মানুষের মত ঘর-সংসার করব।

সুকুমার। এই এত বড় বড় plan এত বড় বড় project সব ভাসিয়ে দিয়ে একটা ছোট মেয়েকে ঘরে এনে সেই পুতুল খেলার মত কাটাতে পারবেন না তাই তা তুমি পারবে না, তোমার মত মেয়েকের উপযুক্ত সঙ্গিনী চাই।

সুরেন্দ্র। ঐ ভাবেই যদি নেও তা হলে, বন্ধু, ঘরটা যত ছোট হবে বাইরটা ততই বড় হবে। আমি যদি বোধটা দেওয়া নোলক নাকে একটা ছোট মেয়েকেবিয়ে আমি তা'হলে আমার ভেতর কার হয়তো ছোট হয়ে আসবে তখন বাইরের কাজে আমার হাত খুলে থাকবে। ছোটমানুষের আশাও ছোট, তাই তাকে সহজেই সন্তুষ্ট করা যাবে; আর তুমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হয়তো এত বড় field এর দরকার হবে যা আমি কিছুতেই traverse করতে পারব না। আরি অত কথায় যা কেন, আমি Herbert Spenser এর মত বলছি যে অতবড় একটা মাথা নিয়ে আমার ছোট প্রয়োজনের জন্য বেঁধে রেখে সংসারের ক্ষতি করবার সাহস আমার নেই। তোমার সে দুঃসাহস আছে তুমি করগে। সুকুমার মুখে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেও মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া

বলিল, "তা হ'লে ওঁদের কি বলব?" সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল "বলবে সুরেন তার সমস্ত সত্ব আমায় favour এ ত্যাগ করলে।" সুকুমার দুঃখ বিষাদে ফিরিয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাহার বিষাদটাও হর্ষে পরিণত হইল, কারণ সে অতি শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে তাহার বিষয়ে শ্রীমতী সত্যবতীর মনোভাব ইতিমধ্যে এমন একটা পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, যাহাতে সুরেন্দ্রনাথের বিষয় চিন্তা করিবার আর তত্তটা অবসর নাই। সে তখন মনে মনে সুরেন্দ্রকে তাহার শেষ সঙ্কল্পের জন্য বহু ধন্যবাদ দিল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মাতাকে স্থায়ীভাবে শয্যাগ্রহণ করিতে দেখিয়া যোগেশকে চট্ পট্ লাফিয়া উঠিতে হইল। তারপর গ্রামের লোকের নিকট হইতে সংবাদ পাইল যে হাওড়ার সমরে আদমসুমারী আফিসে 'সরটার' (Sorter) না কি একটা কাজে অনেক লোক নিযুক্ত হইতেছে। সে কাজে বেশী বিদ্যার দরকার নাই—কেবল নাম ও নম্বর পড়িতে পারিলেই চলে। যোগেশ এই সংবাদে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সদরে চলিয়া গেল এবং দু' একদিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "যা কাজ হয়েছে, এখন বস্ত খাটতে পারব তবেই পয়সা,—আমার ইচ্ছা ছেলেবেলাকে নিয়ে যাই, যে কাজ যেমনায় তা দেখেশুনে পারবে।" মাতা বাস্তভাবে বলিলেন "ও যে বড্ড ছেলে মানুষ।"

যোগেশ। আমিত হইলাম না, পারে পাড়িয়ে দেবে এখানে পড়ুচরান আর বুড়িওড়ানর চেয়েত' তা ভাল হবে?

মাতা কাঁদিয়া বলিলেন "আমি কাকে নিয়ে থাকব?"

যোগেশ রুক্ষস্বরে বলিল, "মা তুমিত এমন ছিলে না, চোখে পড়ে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে দেখছি। এখানে যখন বসে থাকলে চলবে না, তখন বিছে মায়া ধা করে কি হবে?"

অভয়া আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না; যৌতুকের কথাই রহিল। অভয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তবে আমাকেও নিয়ে চল। ছোটদা যদি পারে ত' আমিও পারব।" যোগেশ বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাড়া দিয়া আরও কাঁদাইয়া দিয়া রোরুদ্যমান ছেলেকে একরকম টানিতে টানিতে লইয়া গেল। অভয়া পাশফিরিয়া শুইয়া রহিলেন; সমস্ত দিন কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। অমলা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মাকুলানীকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হবে মামি?" মামী গম্ভীরভাবে বলিলেন "ভালই হবে, তুমি কি?"

অনেক সান্ধ্য-সাধনার পর সন্ধ্যাবধূসুন্দরী অভয়া উঠিয়া জপাদি কোন গতিকে সারিয়া একটু রাত্ত খাইলেন। কিন্তু খাইবার সময় বারম্বার উহা গলায় বাধিয়া যাইতেছিল। এমন সময় বাহিরে পুনরায় কাহারও গলার আওয়াজ পাইয়া তিনি অর্দ্ধকৃত সাগুদানার বাটীটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন "বৌ দেখ ত,

দেবুবুদি আবার এল—দেবু—!" কিন্তু যে প্রবেশ করিল সে দেবু নহে একজন প্রাচীনা স্ত্রীলোক। অমলা ব্যস্ত হইয়া বলিল "ওমা, এ যে জেঠাই মা।" অভয়ার আর খাওয়া হইল না। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া শুইয়া পড়িলেন। "জ্ঞানদি প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি ওঠ ওঠ, কে এল দেখ।" অভয়া তখন সংজ্ঞাহীনা। সুরেন্দ্রের পিসীমা তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, "কি করছ তোমরা? মুখে চোখে জল দাও, দেখছো না মূর্চ্ছা গিয়েছে। অভয়া, বোন ওঠ—কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর অভয়া উঠিয়া বসিয়া তাহার জা'র জ্ঞানদি গ্রহণ করিয়া ম্লানহাস্যে বলিলেন, "দিদি তুমি এখানে এলে?" পিসীমা বলিলেন, "আমি ওকা আসিনি বৌমা, যে পাপিষ্ঠের জন্য আজ তোমাদের এই দশা তাকেও ঘরে এনিছি,—সুরেনও এসেছে!"

অভয়া। সে কি? কোথায় সে?

পিসীমা। বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে বোধহয়।

অভয়া। ছি ছি তাকে ডেকে আন—আমি যে উঠতে পারছিনে, বৌ—বালতি তাঁহার পুত্রবধূকে পাঠাইয়া দিলেন। ক্ষণপরে সুরেন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। অভয়া ঈষৎ ঘোমটা টানিতেই পিসীমা বলিলেন, ওকে আবার লজ্জা, আয় সুরেন এদের প্রণাম কর।"

সুরেন্দ্র বাহির হইতেই অভয়া ও বালতিকে প্রণাম

করিয়া বলিল, "আমায় প্রণাম করতে তর করছিল, কি জানি যদি প্রণাম না নেন।" অভয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বৌ, একটা বসবার জায়গা দাও।"

সুরেন্দ্র বলিল, "আগে ক্ষমা না পেলে আমি বসব না, যে মুখে এসেছি সে মুখে ফিরে যাব।"

অভয়া। ক্ষমা কিসের জন্য! দিদি, তুমি ওকে বসাও—

দিদীমা। আমারও সেই কথা, তুমি আগে ওকে ক্ষমা কর তারপর বসব।

অভয়া। আমি কি ক্ষমা করব? কি এমন দোষ করেছ যে তোমাদের ক্ষমা করব? ওসব কথা থাকুক দিদি—এখন ঠাণ্ডা হও, তারপর কথা বার্ত্তা হবে।

সুরেন্দ্র। না সে হবে না, আপনি আমায় মা—আমায় যদি ছেলেকে না ক্ষমা করতে পারেন তা হলে সংসার উল্টে যাবে। মা আজ যদি আপনি এই মুখে আমায় ফেরান তা হলে আমি মরব।

দিদীমা ঘাট ঘাট করিয়া উঠিলেন, অভয়া জীব কাটিয়া চৌকী ধরিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। অবলা নিকটেই ছিল, হাত ধরিয়া বলিল "উঠছ কেন?"

অভয়া। আমার মাথা ঘুরছে আমায় বিছানায় শুইয়ে দে।

দাসদাসী আসিয়া সাহায্য করিলেন, অভয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। দিদীমা গিয়া তাহার শিয়রে বসিলেন। সুরেন্দ্র সেই দৃশ্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না, তাহার পদতলে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল "মা আমায় আর শাস্তি ক'রনা, তোমার পা ছোঁবার অধিকার দাও" অভয়া পা টানিয়া লইয়া বলিলেন, "কি করছ দিদি? বারণ করনা, ছি এ সব কি! আমিত' কিছুই বুঝতে পারছি না।"

দিদীমা। সুরেন থাম, আর ওকে ব্যস্ত করিস্ না।

সুরেন্দ্র। আমিও উঠব না—

অভয়া তখন বলিলেন "ক্ষমা করেছি বলেই যদি সব চুকে যায় তা হলে বলছি আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু ক্ষমা চাইবার মত দোষ তোমরা কিছুই ক'র নিত আমার কপাল দোষে এই কষ্টে পড়েছি, নইলে সুরেনের এতে দোষ কি? গ্রামের সবাই যে আমাদের অসহায় দেখে বিরুদ্ধ হবে, দাঁড়াল—নইলে আমরাত' বেশ ছিলাম।"

সুরেন্দ্র। সেও যে কতকটা আমারই দোষে, তুমি জাননা মা, আমিই তোমার গৃহত্যাগের জন্য অনেকটা দায়ী। তাই ক্ষমা চাচ্ছি—তুমি ছেলে বলে, অন্ধ বুদ্ধি বলে, ক্ষমা কর—নইলে—

অভয়া। আমার কারও উপর কোন ক্রোধ নেই বাবা। গরীব আমি, ভগবান্ কষ্ট দিলে কার ওপর রাগ করব।

সুরেন্দ্র। তবু বল যে তোমার কর্ম্মফলের সুরেন, দাদাত্তি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন "আহা অমন করে ক্ষমা চাচ্ছে, তুমি মন খুলে বল ক্ষমা করলাম।"

অভয়া। ক্ষমা করিছি বাবা, আর আমার কোন ক্রোধ নেই! দিদীমা এইবার কথা কহিলেন; বলিলেন, "শুধু ক্ষমা করলে হবে না—ওর উপযুক্ত শাস্তিরও ব্যবস্থা করতে হবে"। অভয়া বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার দিকে চাহিলে তিনি বলিলেন, "তোমার এই লক্ষ্মীটীকে আমায় দিতে হবে, অমন এদিকে আয়"। অবলা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অভয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার ঐ টুকুই আছে, আর সব আমি সন্ন্যাসে বিলিয়ে দিয়েছি"। দিদীমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সেকি ছেলেপুলে নেবু নেই?" অভয়া ঘাট ঘাট করিয়া বলিলেন, "না দিদি তা নয়, তাদের একশ বছর পরমায়ু ক'রে কিন্তু বাছারা আমার সুখে কোথায় মজুর খুটে খাবে বলে একটা খাটতে গিয়েছে"।

সুরেন্দ্র। কোথায়?

অভয়া। ধাবড়ার সমরে, আদমসুমারীর কি একটা কাজে গিয়েছে, সেখানে নাকি ১০।১২ বছরের ছেলেরাও হাঁড়িভোর খেটে পয়সা পায়। "দিদি কি হবে?"

সুরেন্দ্র। মা আমার আবেদন গ্রাহ্য করুন, তারপর তাদের ফিরিয়ে এনে সব বন্দোবস্ত করি, না করি তা হলে আর কি নিয়ে থাকব? কিন্তু যাতে আমার কাছ থেকে কিছু নিতে আর আপনার না যায়ে তাই করতে হবে, তারপর অন্য কথা।

অভয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিলেন, তারপর কঙ্কার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এই নাও বাবা গরীবের ধন তোমায় দিলাম, কিন্তু মায়ের কথা বলে যদি অবিশ্বাস না কর, তা হ'লে বলছি, গরীবের ঘরের ধনেও এখন তুমি তোমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়েও আনতে পারতে না"।

পিসীমা উঠিয়া অভয়ার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি যা দিচ্ছ তা ওর পক্ষে দেবতার আশীর্ব্বাদ"।

সুরেন্দ্র অভয়াকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যা এ আশীর্ব্বাদের আমি উপযুক্ত নই, তবু প্রতিজ্ঞা করছি তোমার আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত হব। আর কিছু চাই না, কেবল এই টুকু চাই এই হতভাগা ছেলেকে তুমি আশ্রয় দাও। আর এ ঘুরতে পারছে না"।

পিসীমা আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার বোঝাপড়ার আজ যতে শেষ হ'ল সুরেন, তোমায় আমরা এই গোনার শিকলে বাঁধলাম। বৌ তুমি শাঁখটা বাজাও"।

সুরেন্দ্র ভক্তিভরে পিসীমার প্রসন্ন অভয়ার হস্ত তাহার দুই হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিল। সেই সঙ্গে মিলন শঙ্খও বাজিয়া উঠিল।

সুরেন্দ্রনাথের বিবাহের সংবাদ পঁহুছিবামাত্র সত্যবতী চমকিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি হইল? সুরেন্দ্রনাথ একি করিয়া বসিয়াছে? এত বড় একটা বৃহৎ জীবনের এইরূপ পরিসমাপ্তি হইল? সে আশা করিয়াছিল যে কাঞ্চনের সহিত একবার দেখা হইলেই সুরেন্দ্রনাথ মনে প্রাণে আর একটা অন্য মানুষ হইয়া যাইবে। সে ভাবিয়াছিল, সুরেন এমন একটা কার্য্য করিবে, যাহা ইতিপূর্ব্বে কেহই করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হইল না—সুরেন্দ্রনাথ নাকি কোথা হইতে একটা ১০।১২ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন। তবু তাই নয় সমস্ত বিষয় আশয় নাকি তাঁহার প্রজাদের উপকারার্থে দান করিয়া স্বয়ং সামান্য কিছু জোতজমা লইয়া এগ্রামে গিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার অর্দ্ধে তাঁহার জমিদারীর মধ্যে স্কুল, লাইব্রেরী পানীয় জল, চাষ বাসের সুবন্দোবস্ত হইতেছে। কিন্তু তাহার চিন্তার জালবোনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুকুমার একখানা পত্র হস্তে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। সত্যবতী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "একি সত্য?" সুকুমার কোন কথা না বলিয়া সেই পত্রখানা তাহার হাতে দিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সুরেন্দ্র লিখিয়াছে, "ভাই সুকুমার, তোমরা হয়তো এই বিবাহের সংবাদ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি সেই কথা গুলা স্মরণ করিয়া আমার বিচার করিও। অবশ্য এই পত্র যে কেবল তোমাকেই উদ্দেশ করিয়া লিখিতেছি তাহা নয়,—তুমি ছাড়াও আরও অনেকে আমার জীবনের সঙ্গে নিজ করিয়া নিজেদের জড়িত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলই হয়তো মূলতঃ লিখিত হইল। তাঁহাদের সকলে আমি জীবনের একটী বিশেষ দুর্ঘটনা বলিয়া গণ্য করি, তাই তাঁহাদের নিকটে এই কৈফিয়ৎ দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই।

এই বিবাহ ব্যাপারে আমি যে একটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপার করিলাম, যদি মনে কর, তাহা হইলে ভুল বুঝা হইবে। যাহা অত্যন্ত সাধারণ—যাহা প্রতিদিন আমাদের বাঙ্গালাদেশে ঘটিতেছে, আমি ঠিক তাহাই করিলাম। আমরা সহজ হইতে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার এতদূরে গিয়া পড়িয়াছি যে, যাহা অত্যন্ত সহজ তাহাই আমাদের পক্ষে কঠিন এবং অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। নিজের মিথ্যা অসাধারণত্ব ত্যাগ করিয়া প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে তাহাই ঘটাইয়া এই বিবাহ করিলাম। ইহাতে দেনা পাওনা কিছু নাই, সোজাসুজি ইহা বিবাহ যজ্ঞ। যাহাকে চাই তাহাকে পাইলে আমার লাভের দিকটা এতই বুঝিয়া পড়িত যে, তাহাতে হয়তো আমার সেই অহঙ্কার-স্ফীত মনটার আর কিছু ভাবিবার বা দেখিবার অবসর থাকিত না। এইবার জীবনটাকে নূতন করিয়া আরম্ভ করিলাম। আমার এতদিনকার সমস্ত ধারণা শিক্ষাদীক্ষা সবগুলি ত্যাগ করিয়া জীবনটাকে যেন আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলাম। 'আমি বড়লোক', 'আমি শিক্ষিত অভিজাতীয় লোক', 'আমার এই রকম চাই, ঐ রকম চাই'

ইত্যাদি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া সামান্য সাধারণস্ত্রীর মতো নির্বিচারে জীবন আরম্ভ করিলাম। এতদিন যাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া তাহাদেরই উপর নিজের প্রভুত্ব জাহির করিতাম, সে প্রভুত্ব মায়া—বিদ্যা—তাহাতে আমার কোনো অধিকার নাই—তাই তাহা ত্যাগ করিলাম। এখন, ভগবান যেদিকে লইয়া যাইবেন সেইদিকে নির্বিচারে চলিবার খুব অবসর পাইব। ক্রমাগত আমার নিজের ইচ্ছাটাকে শাস্ত অভ্যাসটাকে বড় করিয়া দেখিয়া এমন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, যখন কোন কিছু ইচ্ছা করিতেই আমার ভয় করিত। পূর্বে এমন দিন ছিল—যখন বহুবাহুলোর চাপে,—অনেক বাহুলো লোকের বাহুলো—আমি ইচ্ছা করিতেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেই আদত সেই মনুষ্যত্বের অধিক জড় হইতে হঠাৎ একদিন এই ইচ্ছা শক্তির আঘাতেই জাগিয়াছিলাম। কিছু চাহিবার নাই পাইবার নাই শুধু ওইয়া আরাম কাটার অবস্থা হইতে হঠাৎ একদিন আমি সজোরে নিজেকে অনুভব করিবার ইচ্ছায় ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলাম। সেই সময় তোমরা আমার সঙ্গী হইয়াছিলে।

তারপর সেই ইচ্ছাশক্তির তাড়নায়, ইহা করিব, উহা দেখিব, ইহাকে পাইতে হইবে এই সব প্রবল বাসনা আমায় ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল। এই ইচ্ছাটার প্রভাব এতই আমায় পাইয়া বসিয়াছিল যে তাহারই জন্য সকলের উপরই আমি আমাকে জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম,—যাহা আমার বাধা দিত। যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইত, তাহাকেই দলিত করিয়া আমার শক্তিকে প্রকাশিত করিবার উন্মত্ত চেষ্টা আমায় পাইয়া বসিয়াছিল। ইহার ফলে রক্তপাতের নির্যাতন, ইহার ফলে সতাবতীর সহিত ঘাতপ্রতিঘাত, ইহারই ফলে আজ যাহাদের নিকট আপনাকে ধরা দিয়াছি তাঁহাদের উপর অভ্যাচার এবং যন্ত্রণা ইহারই ফলে একজনের আপনার আত্মীয় বন্ধুর অবহেলন এবং সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তবৎ পরিভ্রমণ।

কিন্তু যাহা স্বর্গের বস্তু তাহা কখনও মানুষকে পতনের দিকে লইয়া যায় না। কাঞ্চনের জন্য যাহা আমার মনো জাগিয়াছে তাহা আমাকে ঊর্ধ্বের দিকেই লইয়া গিয়াছে। আমি এই সমাজ পরিত্যক্ত নির্যাতিত প্রিয় বস্তুর মুখ মনে করিতে করিতে জগতের সমস্ত নির্যাতিত সমস্ত পরিত্যক্ত সমস্ত দীন দুঃখীর জন্য কাঁদিতে শিখিয়াছি। আমি না এই কাঞ্চনের হাতে কোথাকার সোনার কাঠি ছিল, কিন্তু সে আমার সমস্ত প্রাণটার মধ্যে এমন একটা জিনিষ জাগাইয়া দিয়াছে, যাহাতে আর আমি কিছুতেই আমার নিজের লাভ লোকসানটাকে বড় করিয়া দেখিতে পারিতেছি না। তাই নিজেকে একদম্ [illegible] 'ন যযৌ ন তস্থৌ,' অবস্থায় আনিয়া ফেলিলাম। ত্যাগ করার মত যে অহংকার আছে তাহারই জোরে বিবাহ করিয়া, স্নেহ লাভের সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করিলাম—আমার বেশী লাভ করিয়া যাহাকে ভালবাসি তাহাকে বিবাহ করিয়া অতি সুখী হইবার চেষ্টারও নিবৃত্তি করিলাম। যতটুকুর আমি উপযুক্ত যতটুকু আমার প্রাপ্য, তাহা লইয়া শান্ত ভাবে জীবন আরম্ভ করিলাম। আর যশোগান কিছুই চাহিব না, অখ্যাত অজ্ঞাত রহিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেখিতে চাই ইহাতেও আমার অন্তর্যামির ক্রন্দন নিবৃত্ত হয় কি না। বিষয় ত্যাগের যাহা কিছু আছে, তাহা বাস্তবিক আমার নয়, পরের নিকট হইতে জোর করিয়া কেবল আমার মনের মাঝিতে কিছু রাখিতে চাহি না। বিশেষতঃ এই অর্থই আমাকে মানুষের নিকট হইতে দূরে রাখিয়াছিল। যাহারা এতদিন আমার আত্মীয় বলিয়া নিকটে ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই আমার ত্যাগ করিয়াছে—ভালই করিয়াছে—বিদ্যার বন্ধন থাকার অপেক্ষা না থাকাই ভাল। এখন যাহাদের পাইলাম তাহারা নিতান্তই আপনার—তাহারা আমার অর্থলব্ধ আত্মীয় নয়। যাহাদের নিকট হইতে এই অর্থাগম তাহাদের জন্যই ইহা ব্যয়িত হউক। আমি নিজের চেষ্টায় আপন মূল্যানুসারে যাহা পাইব তাহাই আমার প্রাপ্য মনে করিয়া সংসারে কেবল হাত পা আর মন লইয়া প্রবেশ করিলাম। দেখি নারায়ণ এখন আমায় কোন দিকে লইয়া যান। আমার যথার্থ মূল্য কতটুকু আমায় দেখিতেই হইবে, পরের দেওয়া মূল্য আমার অসহ্য হইয়াছে। সংসারে আমি এত বড়

অতএব আমার ইহা চাই, উহা চাই, ইহা করিতে হইবে, উহা করাইতে হইবে, এই সবগুই আন্তরিক বৈরাগ্যের লক্ষণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। যাহা পাইলাম তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হইব তবেই এখন আমার একমাত্র সাধনা, তোমরা আমায় আশীর্বাদ কর যেন আমি সফলকাম হই। তোমাদের আমার বলিতেছি, এই যাহা করিতেছি ইহা যে আমার পক্ষে খুব বড় একটা কাজ তাহা মনে করিও না। যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখ, দেখিবে, আমার কখনও কিছু ছিল না, তাই কোন বস্তুতেই আমার বন্ধন নাই। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, যৌবনে আত্মীয় বন্ধুহীন, আর চিরদিন অর্থ এবং তাহার আনুষঙ্গিক স্নেহহীন জনসমাগমের মধ্যে থাকিয়া আমি জগতের উপর ভেলের মত ভাসিতেছিলাম। তাই আজ এক সঙ্গে পুরাতন সমস্ত বন্ধনই কাটিয়া গেল,—যাহা মিথ্যা তাহা আর কতদিন টিকিবে? এইবার সত্যকার বন্ধনে আপনাকে বাঁধিয়া দেখিব কি হয়? আর অসিতে চাহি না, স্রোতোবেগে উদ্দেশ্য-হীনগতি আর আমি সহিতে পারিতেছিনা। তাই আমি তীর-অবলম্বন করিলাম—দেখি ভগবান্ আমার জন্য কোনো শান্তির নীড় বাঁধিয়া রেখেছেন কিনা?"

সত্যবতী পত্রখানা সমাপ্ত করিয়া অশ্রুসজল চক্ষে সুকুমারের দিকে চাহিল, সুকুমার উঠিয়া আসিয়া সত্যবতীর মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "কি উত্তর দেব এ কে?" সত্যবতী-ম্লান অবনত করিয়া বলিল "তোমার যা ইচ্ছা।" সুকুমার চমকিত ও পুলকিত হইয়া সত্যবতীর হাতখানা তুলিয়া ধরিল।

"ঠিক বলছ তুমি? আমার যা ইচ্ছে তাই লিখে দেব! যদি আমি লিখি সুরেন তুমি ভালই করছ, সংসারে বন্ধন হীন বাধাবিহীন অশান্ত জীবের মত ঘুরে বেড়ানর চাইতে এই যে আপন নীড় তুমি খুঁজে নিয়েছ এ ভালই করেছ, তা বলে কি তোমার মতে ঠিক কথা লেখা হবে?"

সত্যবতী আর একবার সুকুমারের দিকে প্রীতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "হবে।"

সুকুমার। তুমি কোনো কথা বলবে না?

সত্য। আমি? আমি আর কিছু বলতে চাই না।

সুকুমার। কিন্তু আমি যে চাই? আমি যে তোমার কথা শুনেই লিখে দেব মনে করে এসেছি। যা হয় কিছু বল। আর কতদিন এই একটা কথার জন্য আমায় বসিয়ে রাখবে? সুরেনের পত্রের উত্তরে আমার চির জীবনের-প্রশ্নের উত্তরটা না পেলে আমিও যে থামতে পারছিনা। লজ্জাবতী অবনত বদনে মৃদুস্বরে বলিল তোমার উত্তর আমি দিয়েছি, কিন্তু তুমি যদি বুঝতে না পার সে কি আমার দোষ?"

সুকুমার। আমি সাহস করে বুঝতে পারিনি। তুমি যে চিরদিন সব কথা স্পষ্ট করেই বলে আসছ! স্পষ্ট করে না বলে তোমার কথা বুঝতে যে আমার সাহস হয় না, সত্য!

সত্যবতী উঠিয়া দাঁড়াইল তারপর তাহার সজল নয়ন প্রীতির হাসে ভাসাইয়া বলিল, "তোমার এই ভীরুতা দূর করাই আমার জীবনের একটা মস্ত কাজ হবে দেখছি।"

সুকুমার হঠাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া সত্যবতী তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ছি ছি কি কর? ও ইংরেজি ধরণ আর নয়—তার চাইতে আমাদের সনাতন ধরণটাই আমার ভাল লাগবে ওঠ ওঠ" কলের পুতুলের মত—সুকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যবতী তখন হাঁটু গাড়িয়া নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, আজ থেকে তোমায় প্রণাম করে-করেই সকলকেই প্রণাম করতে পারি—এই আশীর্বাদ কর।" সুকুমার তাহাকে উঠাইয়া বলিল "আমি তোমার প্রণাম চাই না-আমি প্রণামের পাত্র নই।"

সত্য। তুমিই আমার সব চাইতে প্রণামের পাত্র।

সুকুমার কেন?

সত্য। সে কথা না হয় নাই শুনলে।

সুকুমার। না তা কিছুতেই হবে না, আমি শুনব—

সত্যবতী হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহার মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এখন থেকেই জোর জুলুম আরম্ভ করলে?" সুকুমার লজ্জিত হইয়া বলিল "না—না জোর কেন?" সত্যবতী বলিল, "ভীরু মানুষের সব তাতেই ভয়। ভয় নেই, আমি বলছি, তুমিই আমার

সব চাইতে প্রণামের পাত্র, কারণ আমি লিখিছি, ভালবাসার পাত্র সেই প্রণম্য।',

সুকুমার। তা হলে আমার পক্ষেও তাই।

সত্য। তা তুমি জান; কিন্তু তাই বলে বাইরে যেন তুমি আমায় প্রণাম করে ব'স না। মনে মনে যা হয় ক'র। বাইরে তুমি বড়—আমি ছোট, এইটেই আমি রাখতে চাই—আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর সেই ভাবটা অন্ততঃ বাইরে তুমি বাঁচিয়ে চলবে, নইলে—

সুকুমার। আর তা দেখিও না—তুমি যা বলবে তাই আমার বেদবাক্য।

সত্য। আচ্ছা তাই সই, যাও এখন তোমার যেমন ইচ্ছে তেমনি করে এই পত্রের উত্তর দাওগে। আমার যা কিছু বলবার ছিল শেষ হয়েছে।

সুকুমার। কিন্তু আমার হয়নি।

সত্য। ভগবান্ করুন যেন তোমার শেষ না হয়—আমি যে আমাকে নিঃশেষ করে তোমার কাছে দিতে পেরিছি, এতেই আমি সব চেয়ে সুখী। সুকুমার পরমানন্দে চলিয়া গেল। সত্যবতী চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মনে মনে বলিল, "এত আনন্দ—এত সুখ কোথায় ছিল এতদিন? আপনাকে দিয়ে ফেলায় এত জীবন্ত।"

কণ পরে সে যখন মুখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিল, তখন সংসার তাহার চক্ষে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! তখন সে ভক্তিভরে বিশ্বের প্রেমস্বরূপের পদে প্রণাম করিয়া, বলিল, "আমি তৃপ্ত হ'লাম—তোমায় নমস্কার! আমি শান্ত হ'লাম—তোমায় নমস্কার। আমি যা পেলাম তার জন্ত তোমায় নমস্কার! আর—যা পেলাম না তার জন্তও তোমায় নমস্কার আর আমাখানে যা আছে সেই আনন্দের জন্ত—অনন্ত নমস্কার।"

সমাপ্ত

শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্ট বি, এল।

বুঝা পড়া

তুমি মোরে ভাল বাসিয়াছ—
লোকে বলে।
আমি তোমা ভাল বাসিয়াছি—
লোকে বলে।
খোলা মাঠে মুক্ত নভতলে
দাঁড়াইয়ে।
তুমি কি হৃদয়ে পরশিলে
হাত দিয়ে—
হয়েছে কি ভালবাসা পূর্ণ
এত দিন?
—মুখ পানে চাহি, বোঝে সব
বাকাহীন।
হয়েছি কি কেহ কভু মোর
উভয়ের?
পেয়েছি কি চিত্ত যাহে সুধা
তন্ময়ের?
সাধনায় হয়েছে কি লব্ধ
পরিচয়?—
দূর হতে উঁকি ঝুঁকি! শ্রান্ত
অতিশয়।
ভোগ—ভোগ। মিলনের ঘন
উঠে যায়।
ভোগ—ভোগ! বিরহের প্রাণ
হুহুকায়!
পূর্ণ নহে—সত্য নহে এই
ভালবাসা।
মিথ্যা—মিথ্যা যত কিছু রটে
লোক-ভাষা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

যুক্তিকল্পতরু

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(২৪৪—৩২৬ শ্লোক)

'জয়' নামক চতুষ্কোণ বাস্তুভূমির নির্ণয়

ইহার 'রাজদ্বারে'র দিকের প্রাচীরগুলি এক 'রাজহস্তে'র অর্থাৎ সপ্ত যবের মধ্যে হইবে; এবং 'গৃহদ্বারে'র দিকে 'সেই রাজহস্তে'র মধ্যে ও অন্যদ্বারে এক রাজদণ্ডের অর্থাৎ নয় যবেরই মধ্যে, আর যেদিকে দ্বার নাই সেইদিকে তিন 'রাজদণ্ড' পরিমিত ভূমির মধ্যে সকলগুলি প্রাচীর উত্তোলন করিবে।

এইরূপ সন্নিবেশ করিলে, মধ্যস্থানে চারি 'রাজহস্ত' পরিমিত দৈর্ঘ্য ও এক 'রাজহস্ত' পরিমিত বিস্তারযুক্ত ভূমি থাকে; এই ভূখণ্ডের নাম 'রাজদণ্ড'।

ইহাই বাস্তুর দ্বাদশীয় সপ্তম ভাগ, ইহাতে গৃহ করিলে রাজা দীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করে এবং বিজয়বৃদ্ধি ও সুখলাভ হইয়া থাকে।

যে রাজা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অন্যায় গৃহারম্ভ করে…

এই 'রাজদণ্ড' নামক ভূমির 'গজ', 'ব্যাঘ্র', 'সিংহ', 'বৃষ' এবং 'ভৃঙ্গ' নামক পাঁচটী গৃহও আছে।

'সিংহে' সিংহাসন, 'ব্যাঘ্রে' দ্বারবন্ধির, 'গজে' উৎসবাদির, 'বৃষে' প্রাসাদ গৃহ এবং 'ভৃঙ্গে' অন্তঃপুর প্রস্তুত করিবে।

ভবিষ্যোত্তরে

যেন প্রবৃত্ত যাদশ রাশির যে রাশির চক্রে যে রাজা অস্ত্রগ্রহণ করে, তদনুসারে নিম্নলিখিত লক্ষণানুরূপ যাদশ প্রকার গৃহ হইয়া থাকে।

সুনন্দ, সর্ব্বতোভদ্র, ভব্য, নান্দীমুখ, বিনোদ, বিলাস, বিজয়, বিমল, বজ্র, কেলি, জয় এবং বীর এই যাদশ প্রকার গৃহ।

যাদশবিধ গৃহের লক্ষণ

যেস্থলে যেমন পরিমাণ উক্ত হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিবে কিন্তু দৈর্ঘ্য পরিমাণের সময় সর্ব্বত্রই রাজার নিজ হস্তে মাপিয়া (নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা) এক হস্ত অধিক লইবে।

১। সুনন্দ—(দৈর্ঘ্য ৫১ হস্ত প্রস্থ ৪০ হস্ত) 'সুনন্দ' (১) নামক গৃহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ পাঁচ 'রাজহস্ত' এবং বিস্তার চারি 'রাজহস্ত' হইবে।

ইহার অধিদেবতা এবং পৃথিবী ইহার (২) রক্ষয়িত্রী; ইহাতে রক্তবর্ণে চিত্রশোভিত কুড়িটী দ্বার থাকে।

সকল কার্য্যসিদ্ধিকারী এই গৃহ রক্তবস্ত্রে আবৃত করিবে।

রাজা ইহাতে বাস করিয়া দীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করেন।

২। সর্ব্বতোভদ্র—(দৈর্ঘ্য ২১, প্রস্থ ২০) যাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার উভয়ই পাঁচ 'রাজহস্ত' পরিমিত সেই গৃহের নাম 'সর্ব্বতোভদ্র'। ইহার অধিদেবতা শুক্র এবং রক্ষক দানবগণ; এই গৃহে দানবদিগকে যত্নের সহিত পূজা করিতে হয়।

ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ চিত্রশোভিত চব্বিশটী দ্বার হইবে। পীতবস্ত্রে আবৃত এই গৃহ সকল অমঙ্গল নাশ করে।

রাজা ইহাতে বাস করিয়া সকল শত্রু ধ্বংস করেন।

৩। ভব্য—(দৈর্ঘ্য ৩৬, প্রস্থ ৩২, উচ্চতা ১০) চারি হস্তে একহাত হয়, 'ভব্য' নামক গৃহ অষ্টকোণ পরিমিত হইবে এবং এক 'রাজহস্ত' পরিমাণ উচ্চ হইবে, ইহার অধিদেবতা বুধ এবং রক্ষক যক্ষগণ, সুতরাং যত্নের সহিত তাহাদিগকে পূজা করিবে; পীতবর্ণ চিত্রশোভিত আটটী দ্বার থাকিবে এবং পীতবস্ত্রেই আবৃত করিবে, এই গৃহ সকল অনিষ্ট নাশ করে, এই স্থানে অবস্থান করিলে রাজার কোন বিঘ্ন হয় না।

---

(১) 'সুন্দর' স্থলে 'সুনন্দ' হইবে।

(২) রক্ষয়িত্রী।

৪। **নান্দীমুখ**—(দৈর্ঘ্য ৯০১, প্রস্থ ১০) ইহার দৈর্ঘ্য এক 'রাজদণ্ড' ও প্রসর এক 'রাজহস্ত' পরিমাণ হইবে এবং প্রতি 'রাজহস্তে' এক একখানি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিবে ; এই গৃহের নাম 'নান্দীমুখ', ইহার অধিদেবতা চন্দ্র এবং নক্ষত্রলোক রক্ষক, সুতরাং এই স্থানে তাহার পূজা করিবে। বাইশটী দ্বার হইবে, তাহার দশটী দৈর্ঘ্যের একদিকে এবং গৃহের মধ্যে (প্রতি প্রকোষ্ঠে এক একটী করিয়া) দশটী, আর দৈর্ঘ্যের অন্যদিকে একটী ও প্রসরের এক্দিকে একটী। অথবা দুইদিকের দৈর্ঘ্যে দশটী করিয়া কুড়টী এবং প্রসরে একটী করিয়া দুইটী (১) এই বাইশটী দ্বার।

শুক্লচিত্র ও শুক্লবস্ত্রশোভিত এই গৃহসকল কার্য্য সাধন করে এবং রাজার ঐশ্বর্য্যও বিজয় বর্দ্ধন করে।

৫। **বিনোদ**—(দৈর্ঘ্য ৩১, প্রসর ২০) 'বিনোদ' নামক গৃহ দৈর্ঘ্যে তিন 'রাজহস্ত' ও প্রস্থে দুই 'রাজহস্ত' পরিমাণ হইবে ; ইহার ত্রিশটী দ্বার ও দুইটী প্রকোষ্ঠ থাকিবে এবং শুক্লচিত্রে ও রক্তবস্ত্রে শোভিত হইবে। এইস্থানে বাস করিয়া রাজা যশস্বী ও প্রতাপী হইয়া থাকেন ; সূর্য্য ইহার অধিদেবতা এবং সকল গ্রহ ইহার রক্ষক।

৬। **বিলাস**—(দৈর্ঘ্য ৫১ প্রসর ২০ 'বিলাস' নামক গৃহের দৈর্ঘ্য সাড়ে 'রাজহস্ত' এবং প্রসর দুই 'রাজহস্ত' পরিমাণ হইবে ; ইহার চল্লিশটী দ্বার থাকিবে। গন্ধর্ব্বগণ ইহার রক্ষক ; ইহাতে তিনটী প্রকোষ্ঠ থাকিবে এবং তাহা নানাবর্ণবিচিত্র পদ্ম, শঙ্খ ও বস্ত্রশোভিত হইবে। এইরূপ গৃহ করিলে দুর্ভিক্ষ দূর হয় এবং শস্যবৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়, এইস্থানে বাস করিয়া রাজা প্রচুর সুখলাভ করেন।

৭। **বিজয়**—(দৈর্ঘ্য ২১ প্রস্থ ১২) 'বিজয়' নামক গৃহের দৈর্ঘ্য 'রাজহস্ত'দ্বয় এবং প্রসর দ্বাদশ হস্ত পরিমিত হইবে এবং অগ্রভাগে দ্বাদশটী দ্বার থাকিবে। ইহার অধিদেবতা সূর্য্য এবং রক্ষক গরুড়। এই গৃহ রক্তবর্ণ পদ্মচিত্রিত ও রক্তবস্ত্রভূষিত হইবে। এইস্থানে থাকিয়া নরপতি সমগ্র পৃথিবী শাসন করেন।

(১) দ্বিতীয়বেধের।

৮। **বিমল**—(দৈর্ঘ্য ২০১ প্রস্থ ১০০) বিমল নামক গৃহ] দৈর্ঘ্যে দুই 'রাজদণ্ড' ও প্রসরে এক 'রাজহস্ত' পরিমিত এবং শতদ্বার ও দশ প্রকোষ্ঠযুক্ত হইবে। ইহার রক্ষক দিক্‌পালগণ এবং অধিদেবতা মঙ্গল। যে গৃহ নানাবর্ণ চিত্র ও বস্ত্রে ভূষিত করিবে, এইস্থানে বাস করিলে রাজা দীর্ঘকাল সুখভোগ করেন। যে হর্ম্ম্যে 'বিমল' নামক শ্রেষ্ঠ গৃহ নির্ম্মিত হয়, তাহাতে দুর্ভিক্ষ হয় না এবং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি, কোনরূপ বিপ্লব, রোগ, শোক বা উৎপাত ভয় ইহার কিছুই থাকে না। পণ্ডিতগণ বলেন, অন্যত্র 'ঈতি' প্রভৃতির বাহুল্য থাকে।

৯। **রঙ্গ**—২) (দৈর্ঘ্য ১৭, প্রস্থ ১৬) 'রঙ্গ' নামক গৃহের দৈর্ঘ্য ও প্রসর উভয়ই ষোড়শ হস্ত পরিমিত হইবে এবং দ্বারও ষোলটী থাকিবে। ইহার অধিদেবতা ও রক্ষক বৃহস্পতি, শুক্লবস্ত্র ইহার ভূষণ। রাজা এইস্থানে বাস করিয়া পৃথিবীর সকল কার্য্য সাধন করেন।

১০। **কেলি**—(দৈর্ঘ্য ১০১, প্রস্থ ৫০) দৈর্ঘ্যে এক 'রাজদণ্ড' প্রসরে অর্দ্ধ 'রাজদণ্ড' পরিমিত হইবে, দশটী প্রকোষ্ঠ এবং দশটী দ্বার থাকিবে ; অধিদেবতা শনি, রক্ষক পিশাচগণ এবং ভূষণ নীলবর্ণ বস্ত্র প্রভৃতি ; ভয় ও রোগ-নাশক ঈদৃশ গৃহের নাম 'কেলি'। রাজা এইস্থানে থাকিয়া অনায়াসে শত্রু জয় করেন।

১১। **ভদ্র**—(দৈর্ঘ্য ১৪১, প্রস্থ ১০০) এক রাজহস্তে এক কোণ হয়, ভদ্র নামক গৃহ এইরূপ চতুষ্কোণ পরিমিত হইবে এবং দ্বারও চতুষ্কোণটী থাকিবে। ইহার অধিদেবতা বায়ু, রক্ষক রাক্ষসগণ এবং নানাবর্ণের বস্ত্রাদি ভূষণ। এই গৃহ সকল কার্য্যে জয়প্রদ হইয়া থাকে।

১২। **বীর**—(দৈর্ঘ্য ১১, প্রস্থ ৮) অষ্টদল 'বীর' নামক গৃহ দৈর্ঘ্যে এক 'রাজহস্ত' ও প্রসরে অষ্টহস্ত পরিমিত বিভিন্নরূপ কুটীরাকৃতি হইবে। ইহার দেবতা বৃহস্পতি এবং রক্ষক খেচরগণ। বিচিত্রবস্ত্রশোভিত, এই গৃহ বাসনা সকল করিয়া থাকে।

(১) রঙ্গঃ স্থলে রঙ্গঃ।

(২) রাজ্ঞঃ স্থলে রঙ্গাণ্ড

যে দুর্গের যেরূপ বর্ণ কথিত হইয়াছে, চাবরও সেইরূপই হইবে। এক এক রাজবর্ত্ম ব্যবধানে পাঁচটী চাবর থাকিবে। চক্র ও দর্পণ এক এক হস্ত উপরে বিন্যাস করিবে।

সকলের গৃহই পতাকা ও ধ্বজযুক্ত হইবে; চক্রবর্ত্তী নৃপতিদিগের গৃহ ধ্বজযুক্ত হইলে বিজয়প্রদ হয়।

এই দশটী প্রকার গৃহ লক্ষণ কথিত হইল, রাজা এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া গৃহারম্ভ করিবেন।

এই সিংহাসন স্থান রাজ্যের মোহান; ইহা ব্যতীত রাজার অন্যান্য গৃহ প্রয়োজন-মত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। জলময় প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের কোন নিয়ম নাই।

যে নৃপতি শুভতি শিল্পশাস্ত্রমতে বাস করেন, তিনি দীর্ঘকাল রাজ্যপালন করেন এবং সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

যে রাজা অন্যায়পূর্ব্বক পরগৃহে বাস করেন তিনি দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পারেন না, তাঁহাকে রোগ ও শোকে কষ্ট পাইয়া থাকেন।

বিজয়রাধিপতি সহায় থাকিলে তাহার গৃহনির্ম্মাণে এসকল অন্যায়ের দোষ হয় না।

যাহা হইতে সূর্য্যকিরণ স্পর্শমাত্র দীপ্তশিখা নির্গত হয়, ঈদৃশ বিশুদ্ধ রত্নজাতি, মহাতেজঃসম্পন্ন হীরক লইয়া রাজা তাঁহার গৃহের উপরে স্থাপন করিবেন। ইহা বজ্র ধারণ করিয়া থাকে।

বাস্তু বলিয়াছেন;—

গৃহের উপরিভাগে যদি স্থাপন করিবে, তাহাতে রাজগণের সকল বিঘ্ন নষ্ট হয়।

ভোজ বলিয়াছেন;—

বাস্তুও পদ্মের আকৃতি হইবে। 'ধনধান্য' হইতে 'অন্যায়' পর্য্যন্ত ভূমির যশে অর্থানুরূপ নামযুক্ত কতকগুলি ভাগ হইবে। যথা;—

যথাক্রমে মৃত্যু, ভয়, স্থির, চণ্ড, ধন, বিজয়, বীর এবং রাজন এই আটটী বাস্তুভাগ।

ধন, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ইন্দ্র এবং অগ্নি কোণ বিভাগগুলির অধিষ্ঠাতা।

'মৃত্যু' নামক ভাগে কাষ্ঠাগৃহ 'ভয়ে' পদাতি নিবাস 'স্থিরে' সর্পচরাদির নিবাস এবং 'চণ্ডে' অশ্ব ও গজ প্রভৃতির আবাসস্থান করিবে; 'ধনে' ধান্যাদি সম্পত্তি, 'বিজয়ে' কোষাগার এবং 'বীরে' রাজপট্ট (সিংহাসন স্থান) স্থাপন করিবে এবং 'রাজনে' ও প্রাচীরের প্রান্তে কাহাকেও বাস করিতে দিবে না। ইহাই ভোজমতে বাস্তুভাগ নির্ণয়।

বাস্তুপ্রব লক্ষণ

বাস্তুস্থান ও গৃহস্থান অবলম্বনে তুণ্ডনির্ণয় করিবে।

বাস্তুভূমি পূর্ব্বদিকে নিম্ন হইলে বৃদ্ধি, উত্তরে ধন, দক্ষিণে মৃত্যু হয় এবং পশ্চিমদিক নিম্ন হইলে ধনহানি হইয়া থাকে।

কোণে দুই রেখা, মধ্যে দুই রেখা করিবে। রেখা ঈশান কোণ হইতে হইবে এবং দক্ষিণদিক্ হইতে ধ্বজ রোপণ করিবে।

চাবর যদি পতাকা ধ্বজ এবং কুম্ভাদি বর্জ্জিত গৃহ করিবে না, চিত্রহীন বা ভীষণ চিত্রযুক্ত, অশুভ বা অতিনীচ বা ধান্যহীন বা পর্য্যঙ্কহীন কিম্বা একটীমাত্র দ্বারযুক্ত বা অনেক দ্বারযুক্ত গৃহও করিবে না। নৃপতিদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের জন্য এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইতি রাজগৃহ যুক্তি

অন্য গৃহেরও বাস্তুস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার বাস্তুভূমির নাম—ধ্বজ, ধূম, সিংহ, শ্বা, বৃষ, গর্দ্দভ, গজ এবং কাক। ইহার অগ্র অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম ভূমিতে সুখসম্পত্তি এবং মূল অর্থাৎ দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম স্থানে গৃহ করিলে বিনাশ হয়।

এইরূপ অন্যত্রও আছে—ধ্বজে ঐশ্বর্য্য, ধূমে বিপদ, সিংহে সুখভোগ, শ্বাতে সর্ব্বনাশ, বৃষে সুখ, গর্দ্দভে বিনাশ, গজে ধন এবং কাকস্থানে মৃত্যু হয়।

কোণাকৃতি গৃহ করিলে সুখসম্পত্তি নাশ হয়। পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রোথিত দণ্ডের নাম 'উদয়' ইহা সুখাবহ হয়; দক্ষিণ উত্তরের দণ্ডের নাম 'যমদণ্ড', ইহা

বংশনাশ করে। সুবুদ্ধি ব্যক্তি এই সকলাদির মধ্যে গৃহ করিবে।

একখানি গৃহ করিতে হইলে দক্ষিণে, দুইখানি হইলে দক্ষিণ ও পশ্চিমে, তিনখানি হইলে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে গৃহ করিবে; চারিদিকে গৃহ করাই সর্ব্বোত্তম।

অজে, সিংহে, বৃষে ও গজে যথাক্রমে পশ্চিমমুখ, উত্তরমুখ, পূর্ব্বমুখ ও দক্ষিণমুখ গৃহ করিবে।

পদাঘাত, পরঘাত, পথাঘাত, জলদোষ এবং বৃক্ষঘাত এই কয়টী গৃহের দোষ। গৃহে চলনের সময় যদি অতিরিক্ত পদশব্দ হয় তাহারই নাম পদাঘাতদোষ; ইহা পুত্র, পৌত্র ও ধনের অনিষ্টকর।

দুইটী প্রতিবেশিগৃহের পরিখা ও গণ্ডের যে অত্যন্ত নিকটবর্ত্তিতা তাহার নাম 'পরঘাত', ইহা বংশ, বীর্য্য ও ধননাশ করে।

বাস্তুখণ্ডের পথে দোষ থাকিলে তাহারও নাম 'পথাঘাত', ইহা রোগ ও মৃত্যুপ্রদ করে; ইহার ভেদ কথিত হইতেছে।

বাস্তুভূমির একটীমাত্র পথ থাকিলে কিঞ্চিৎ সুখ হয়, দুইটীপথ কুলবৃদ্ধিকর, ত্রিপথ কুলনাশ করে, চারিটীপথ থাকিলে সর্ব্বনাশ হয়!

নিজ বাটীতে বা পর বাটীতে যে জলাশয় থাকে, তাহার দোষের নাম জলদোষ; ইহাতে বংশ ও সম্পত্তি নাশ হয়।

পূর্ব্বাদিদিক্‌স্থিত জলাশয়ের যথাক্রমে সন্ততি, সুখ ও ঐশ্বর্য্যের হানি, মৃত্যু, ক্লেশ, ভয় ও রোগ এই কয়টী দোষ।

বাস্তুস্থিত বৃক্ষের দোষেও বংশ ও সম্পত্তিনাশ হয়। পূর্ব্বদিকে অশ্বত্থ, দক্ষিণে পাকুড়, ঈশানকোণে রক্তপুষ্প এবং অগ্নিকোণে ডুমুরবৃক্ষ রাখিবে না।

বিল্ব, দাড়িম, কেশর, পনস এবং নারিকেল বৃক্ষ চারিদিকে থাকুক, সকল দিকেই শুভফল দান করে।

নিম্ব, শমী, পলাশ, চিঞ্চা, অশ্বত্থ, অপরাজিতা এবং কোবিদার বৃক্ষ সকল প্রকার মঙ্গলপ্রদায়ী বটে।

নাগের (বাসুকির) শয়নক্রম অনুসারে গৃহারম্ভে দিক্‌নির্ণয় করিবে। মেষ ভাদ্রাদি মাসের তিন তিন মাস করিয়া যথাক্রমে পূর্ব্বাদি চারিদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করে। নাগের বামজোড় যে মাসে যেদিকে পড়ে, সেইদিকে গৃহ করিলে শুভ হয়।

শ্রীস্বর্গমোহন ভট্টাচার্য্য।

বরষার আবাহন

এস বিরহ-মিলন-সঙ্গীত-ঘন-বর্ষণে ঘন-বরষে,
এস নিত্য-ভুবন-লক্ষিত-প্রাণ বসুধা-উর-করষে ;
এস শান্ত-শীতল-সজল-জল-উজ্জ্বল-কল-ছলছল,
এস নয়ন-লোক-পুলক তরল অমৃত-ধারা অবিরল।
শ্রাবণে ভরি' তারব-সাথী-মধুগান ;
মুরলীরবে চালো প্রাণ ওগো চালো প্রাণ।

এস লোকে লোকে লোক সকল প্লাবন করি' পুলকে,
এস নয়নানন্দ-হৃদ মধুর বাহিরা ত্রালোকে ভূলোকে ;
এস বায়ু-কলরোলে ছুটি' হিল্লোল হোলি উৎসব ধরণীর,
এস ক্লান্ত-বিরহ শান্ত করিতে ত্রান্ত-হৃদয় ধরণীর ;
মধুময় তব আজি ব্যথাময় দুটী প্রা' ;
মানবের ঘরে মিলনের বর কর দান।

এস সর্ব্ব-তাপ-শোক-হরণ, অমরোদ্ভব শরণি,
এস গীত-মুখর অম্বর-তীরে নয়ন-তৃপ্ত তরণী ;
এস নীল-নব-ঘন-নীরদ-পুঞ্জে রঞ্জিত করি' নদী-নীর,
এস বিটপী-পুঞ্জ-আষাঢ়-মুঞ্জে মুঞ্জরিত বীথি ধরণীর।
স্বাগত ওহে মনোহর-হৃদি-তরী-প্রাণ ;
গাহ গান বঁধু চির-মিলনের গাহ গান।

এস ধূসর-গিরি-শিখর চারি' উষর-মরু-প্রান্তিতে,
এস ভবন-শিখি নাচত মাতি' নীরব-তরু-পাঁতিতে ;
এস বিদ্যুত-ভাতি-চপল-হাতে আলোকে গাঁথি স্নেহ-হার,
এস ইন্দ্রধনুর মায়ারি রঙ্গে বহি' কবি-জন-মন-ভার।
নব জলধর, তুমি যে তরল ঘন-প্রাণ ;
মানব-বিরহী করুণামৃত কর দান।

এস রিমঝিম-ঝরা-ঝরি-ঝরঝর স্বনে ধরণী মগন,
এস মিলনানন্দ-মুখর-বাসর মধু-মঙ্গল-লগন ;
এস ঘন-ঘোর-রবে মন্ত্রিত করি' স্নেহ-মন্দির-খরখর,
এস নব-প্রগতি-হিয়া-দুরুদুরু বিরহী-চিত্ত অন্তর।
বন্ধু-হিয়ার করুণ বেদনে গাহি' গান ;
মিলন-মন্ত্রে চালো প্রাণ ওগো চালো প্রাণ।

এস স্নেহ-প্রেম-প্রীতি ভক্তি-প্রণয়-গলিত-ধারারি করুণা,
এস বৃদ্ধ-তরুণ-যুবক-শিশু বক্ষে বারি-বরিষণা ;
এস রুদ্র-নিদাঘ-রৌদ্র-দহন-তাপিত-বসুধা-প্রাণ-ধার,
এস গীত-গন্ধ-রূপ-হৃদ-প্রেমানন্দ প্রাণধার।
স্বাগত শত প্রগতি আজি লহ দান ;
মিলন-মন্ত্রে চালো প্রাণ ওগো চালো প্রাণ।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

জাপানে

শুরু চেরীফুল ফোটার সময়। প্রকৃতি তখন বসন্তের উন্মাদনা চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। জাপানের সকল পথে তখন কেবল সৌন্দর্য্য পিপাসু পথিকের জনতা। সকলের সৌন্দর্য্য উপভোগের বাসনা একটা না একটা দিকে বেরিয়ে পড়েছে।

আমি তখন Toshino তে থাকতাম। সেখানকার পাহাড়ে জায়গাগুলো হাজার হাজার গাছে ভরা। চুধারে কালো কালো পাইন গাছের সারি। তারি মধ্য দিয়ে চেরী গাছ গুলো তাদের নধর (Delicate) ফুলের থোপ মাথায় করে স্বর্গের দিকে একটা যেন মস্ত উঁচু রাস্তা তৈরী করছে। সেদিন Toshinoএই রাস্তায় বৃদ্ধ যুবা প্রভৃতি নানা রকমের দর্শকে জনাকীর্ণ, তারা যে মুক্ত দেখতে এসেছে তারই শোভা দেখে যেন কত সুখী।

আমি দিন কয়েক আগে সংবাদ পত্রে দুটী জাপানী ছাত্রের কথা পড়েছিলাম। আমি তাদেরই কথা সেদিন ভাবছিলাম। তাদের দুজনের বয়স এই ষোলর কাছাকাছি। খুব উৎসাহী, তারা সেই জায়গায় একটা উঁচু পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করে। মাঝ পথ থেকে তারা হারিয়ে গেলে গ্রাম থেকে তাদের খুঁজতেও লোক পাঠান হয়েছিল।

সেদিন যখন Toshino থেকে ফিরে পরে সকাল বেলাকার আলোকে ফুলের সৌন্দর্য্য দেখতে বেরিয়েছিলাম তখন আমি এই খবরটী শুনি।

কদিন পরে কিছুদূরে একটা উপত্যকার ধারে যে পাহাড়ে তারা উঠতে গিয়েছিল ঠিক তারই নীচে তাদের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তারা রাস্তা হারিয়ে ফেলে বাড়ীফিরে আসতে পাহাড় থেকে নামতে আরম্ভ করে সেই সময় শীতেও পরিশ্রমে তারা একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তবু ও তারা কতক গুলো শুকনো পাতা কুড়িয়ে আগুন করে একটু গরম হওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সবই বৃথা। মৃত্যুর আগে তারা কতকগুলো কাগজ চিঠি লিখেছিল—সেগুলো তাদের অন্তিম মুহূর্ত্তের করুণ নিদর্শন স্বরূপ তাদের পাশেই পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। তারা তাদের যাত্রা আরম্ভ করবার সময় পাহাড়ে তলীতে একজন বৃদ্ধ তাদের অনেক করে এই দুঃসাহসিক [illegible] সেই পাহাড়ে উঠতে বারণ করেছিল। কিন্তু তারা কোন কথাই শুনলে না, বিপদের কথায় যেন তাদের সাহস আরও বেড়ে উঠল।

বসন্তের সেই সকাল বেলায় আনন্দের সঙ্গে তাদের সম্মুখের বিপদকে পরাস্ত করতে যেয়ে মরণ পথের যাত্রী হয়েউঠে গেল। আমি মুহূর্ত্তের যেন হৃদয়ের এই সৌন্দর্য্য পিপাসা ও সাহস থেকে শিখবার অনেক আছে।

বহু শৈল শিখরের মধ্যে অবস্থিত koyasan হচ্ছে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্র কেন্দ্রস্থল। তার মন্দির ও সমাধি স্তম্ভ গুলোকে উঁচু উঁচু—

Cryptomeria গাছের গম্ভীর নিস্তব্ধতা বেড়ে রয়েছে সেগুলো হিমালয়েরই মত মুক্ত বৈচিত্র নিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে।

দেখলাম পাহাড়ের তলায় koyaguchi কাছে একটা নদীর কূলে স্রোতের উপর একটা ঝোলা দাঁড়িয়ে আছে। তার দুই পাশ অল্প প্রভেদের—উষ্ণ সূর্য্যের কিরণ খেলা করছে।

রিকেলে যাওয়ার ঘোড়াতে একটু পরেই বেরিয়ে পড়লুম নিস্তব্ধ বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দিনের আলো ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসতে লাগল। রাস্তায় তখন কচিৎ দু' একটা লোক

আছে। সদ্য লম্বা গাছের ছায়ার তলায় বসে কতকগুলো কাঠবিড়াল আমাদের পোষা ছিল—যাকে যাকে আগুনের আশা উঠে তাদের মুখ উজ্জ্বল ক'রে দিচ্ছিল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে মন্দির দর্শন করতে চলেছি। সেটা নিশ্চয় বিজন বনের মধ্যে একটা বেশ নির্জ্জন জায়গাতেই হবে। তাইতে অন্ধকারের পর যখন আমি একটা সহরের মত স্থানেই প্রবেশ করলাম তখন আমার বেশ একটু আশ্চর্য্য বোধ হল। কারণ koyasan এ অসংখ্য মন্দির একটা বৌদ্ধ কলেজ এবং একটা স্কুল আছে। প্রত্যেক দিনই শত শত তীর্থযাত্রী এই পাহাড়ে উঠে। এই অগণিত মন্দির গেরিয়ে জাপানের বৌদ্ধ সাধু kobo Daishi

সন্ধ্যায় মন্দিরের কাছে উপস্থিত হয়। বড় বড় সদ্য অদ্ভুত ধরণের কতকগুলো বড় বড় গাছের একেবারে শেষে সেটা রয়েছে। চারিধার কেবল বন আর বন। সেখান থেকে কেবল পাখীর গান ছাড়া আর কিছু বড় একটা শোনা যায় না। দু একটা সরু পথ বহু ঘুরে কোন কোন পাড়া গাঁয়ের দিকে চ'লে গিয়েছে।

পরদিন সকাল বেলা রাস্তায় বেরিয়েই দেখি কতকগুলো যাত্রী বৌদ্ধ পুরোহিত ও ছাত্রের দল কালো রংএর পোষাক পরে মন্দিরের দিকে চলেছে। তাদের দেখে মধ্য যুগের সন্ন্যাসী বলে মনে হল।

তিন দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আমি যেদিন সকাল বেলা koyasan ছেড়ে চলে এলাম সেদিন রাস্তায় কাদা কাদা হয়ে গিয়েছে। অসংখ্য যাত্রী সেই কাদা ভেঙে চলেছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু তাদের মুখে একটা বেশ স্ফূর্তি ও আনন্দের ভাব দেখতে পাই। অর্দ্ধেক পথ চলে আসার পর একটী বৃদ্ধা যাত্রীকে দেখতে পেলাম। একে বুড়ো তাতে ঘাড়ে আরও দুইবার পড়েছে। পাহাড়ে উঠে আসতে দেখে বোঝা গেল যেন তার দেহের উপরকার অংশটা রাস্তার সঙ্গে একেবারে সমাপ্তরাল হয়ে রয়েছে। সে যাচ্ছে kobo-Daishi পূজো দিতে। বৃদ্ধা আজ যেন সোনা কেলেছে। তবুও তার মুখ কেমন শান্তি ও আনন্দের আভাসে উজ্জ্বল।

এই দুদিন ধারে রাস্তা বড় খট খটে শুকনো ছিল, তখন আমাকে দুই জন লোকে বয়ে নিয়ে এসেছে মনে করে আমার লজ্জা বোধ হল। কিন্তু সেই বৃদ্ধাই শুধু একা নয় আরও অনেকেই সেই কাদা ভেঙে পাহাড়ে উঠছে।

জাপ যুবতীর ভক্তির গভীরতা দেখে আমি চমৎকৃত হইলাম।

তখন আমি Kyoto তে আছি Plum গাছের ফুলগুলো কেবল ফুটব ফুটব হয়েছে। বসন্তের সেদিনটী বেশ একটু গরম বোধ হচ্ছিল। লোকে পার্ক (Park) বা Temple-Garden এ হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। আমি ঠিক দুপুরের সময় একটা মন্দিরের কাছে বসে আছি এমন সময় তিনটী স্কুলের ছেলে সেই বাগানে এসে একেবারে আমার উপর ভর পড়ল। তাদের কাছেই তিন বৎসরের একটী শিশুকে তার ভাই খেলা দিতে সেখানে এনেছে। হঠাৎ সেই তিনটে ছেলের মধ্যে একটী উঠে সেই শিশুটীর কাছে গেল। তাদের গল্প ও খেলায় মুগ্ধ দেখে কে। একটু বাদেই আর দুটী ছেলেও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। আর কটা ঠিক এমনি খেলা ধুলো করার পর তারা শিশুটীকে আদর করে চলে গেল।

এই দৃশ্য দেখে আমার তখন জাপানেরই কোন কলেজের একটী ছাত্রের কথা মনে পড়ল। তিনি Lawn Tennis এ খুব নামজাদা খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি বলেছিলেন একদিন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে যখন তিনি Tennis খেলছিলেন এমন সময় দেখতে পেলেন Lawn এর একধারে দুটী ছেলে, বয়স বারো, আর একটীর বয়স বছর বেশী হবে না। তিনি ছেলে দিলেকে এত ভাল বাসতেন যে খেলায় নেশা ভাঙ্গ করে সেই দুটী ছেলের সঙ্গে খেলতে গেলেন। খেলবেন আর কি, Tennis এর বল ছোড়া ছুড়ি খেলা আরম্ভেই তিনি বেশ আমোদ উপভোগ করতে লাগলেন। বড়টী যাবার সময় তাঁকে অভিবাদন করে বলে গেল—কাল আবার আসব।

ছোট ছেলে মেয়েদের উপর জাপানীদের বড় টান। শিশুদের প্রতি ভালবাসা যেন জাপ জীবনের একটা বিশেষত্ব।

যারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করে শিশুদের প্রাণ ভেরে ভালবাসে, বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ও কৃত্রিমকে

হাসি মুখে আলিঙ্গন করার সাহস যাদের আছে, যাদের নারী-গণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এত গভীর তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য কি? তাদের জীবনের লক্ষ্য হৃদয়ের উদ্বেল্য যে বহুৎ তাতে আর সন্দেহ কি? ভাগ্য দেবী তাদের যুগযুগের প্রতীক্ষার ধনো তাদের জীবনকে সেই লক্ষ্যের দিকেই ধীরে ধীরে গড়ে তুলছেন।

(মর্ডার্ন রিভিউ, ১৯১৭, In Japan প্রবন্ধ হইতে)

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

বিচিত্রা

হে অন্তরবাসিনী দেবি, তুমি এতকাল
অপূর্ব্ব রহস্য ঘেরা রচিয়া আড়াল
অন্তরে ধরিয়াছিলে যে অজ্ঞাত বাণ
আজ বাহিরিয়া এলে; বিচিত্র প্রকাশ
হেরিয়া বিমুগ্ধ আঁখি, চাহি মুখ পানে
ভরিয়া উঠিল প্রাণ অভিনব গানে।

হে কল্যাণি বিজয়িনি, অরুণা-নয়না,
আমারে উতলা করি করে আনমনা—
তোমার আনন্দ মূর্ত্তি!

কোথা ছিলে তুমি,
কোথা ছিল এ সুন্দর বিশ্বভূমি!

কর্ম্মপথে পুণ্যব্রতে কি ভয় রচিনি
তুমি যার সহচরী জীবন-সঙ্গিনী!

সুস্থ জীবনের এই মধ্য সন্ধিক্ষণে,
তোমার আমার এই শুভ সম্মিলনে,
বিচিত্র প্রেমের স্পর্শে বক্ষ দোলা দুলি
অসহ্য পুলক ভরে উঠিছে আকুলি
বেদনা নূতনতর: আছে সাথে তার
আবার আমার যদি হয় পরাভব!

যুগ যুগান্তর হতে ওগো দেবী!
আজিকে যেমন তুমি আসিয়াছ এবি
তখন মূর্চ্ছা আবর্ত্তনে কবে কোন্ বাঁকে
এসেছিলে আরো কাছে, কেহ নাহি জানে!
সম্পূর্ণ কখনো ধরা দাওনি আমায়,
এ লীলার শেষ যদি হয় ছলনায়!

আমি চেয়েছিনু শুধু মনের মতন
ভরে নিতে এক হতে একখানি মন!

আজ তুমি ওগো দেবি, এলে বাহিরিয়া,
এ মোর সঙ্গীত শুধু উঠ গুঞ্জরিয়া!

আমি আরো বেশী চাই, এস প্রতি পলে
নূতন হাসিরূপে এস নয়নের জলে!
হৃদয়ে আনন্দরূপে এস প্রতি কাজে
সীমা হতে এস তুমি অসীমের মাঝে
আমার আশ্রয়রূপে: শিরায় শিরায়
এস প্রতি অঙ্গে মোর শোণিত ধারায়!
তা' না হলে এই তব বিচিত্র প্রকাশ,
মনে হবে অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

কোন অপরাধে ?

"তুমি ব্যথার যত দাগ দিয়েছ প্রাণে
প্রাণের ক্ষত কত গভীর
প্রাণই-তাহা জানে !"

তুমি ত করুণার আদর্শ দেবতা, সমবেদনায় যে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ, অনুকম্পাতে যে তুমি প্রণময়, তবে আমার দীন প্রাণে এমন ব্যথা দিলে কেন ?—

—কি দোষ করেছি আমি, যে আমার এত আয়াস-লব্ধ সুখের নিশ্চয়তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আজ তোমার অশ্রু প্রবাহ হৃদয়-নদীর দুই কূল ভাসিয়ে দিল ? সেত হৃদয়-পরীক্ষার জন্য সন্দেহের অশ্রুপাত নয়, ভালবাসার গুরুত্ব বাড়াবার জন্য, স্নেহের আতিশয্য সাধনের জন্য, একটা ছল-গড়া অভিমান নয় ; এ যে তোমার হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণা, প্রাণের গভীর ব্যথা, উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে অবিরাম অশ্রুধারায় পরিণত !—এ কি প্রিয়, এ কি ?

আমি হৃদয় হীন, এ যে আমারও অসহ্য ! আমি কি তোমার সব বেদনাতুর কোমল প্রাণে অকারণ ব্যথা, দিয়েছি ?—আমার জীবন মরুপীড়া, আমার বিষম যন্ত্রণা, আমার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে বুঝি তুমিও আত্মহারা ?

বাহিরের দুঃখ ও অশান্তি দেখে নিজেকে অপরাধী মনে করা স্বাভাবিক !—তাই বুঝি তুমি আমার দুঃখ দেখে ভেবেছ, এই দুঃখের কারণ তুমি ?—কিন্তু হে প্রিয়তম চির-বাঞ্ছিত, যে দিন বিনা দ্বন্দ্বে আমরা সমপ্রভাবে লাভ করিতে পারিব, প্রেমকে আমরা একান্ত করিয়া প্রাপ্ত করিতে পারিব, আমরাকে প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে পারিব, সেইদিন,—সেইদিন, যে আমার প্রীতি সন্দিগ্ধের বন্ধু, সেই দিন বুঝিতে পারিবে, আমার সব হৃদয়ে এ অশ্রুধারা কেন, শুষ্ক নয়নে বেদনার অশ্রু কেন, ভগ্ন-বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া এ উষ্ণ-দীর্ঘশ্বাস কেন ! বলিবার হইলে, যে আমার গোপন হৃদয়ের নিভৃত সাধনা, তোমায় এখনই বলিতাম ;—কিন্তু এ যে বলিবার নয়, আমি যে তাহার কারণ জানিয়াও জানিনা !—

যদি জানতেম্ আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম,
কে যে আমার কাঁদায় আমি
কি জানি তার নাম !

কোথায় যে হাত বাড়াই দিতে
ফিরি আমি কাহার পিছে
সব যেন মোর বিকিয়েছে
পাইনি তাহার দাম !
এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি অনম ঘরে।
ভুবন ভরে আছে কেন
পীড়নে জীবন ভরে' !"

তবে শুধু এখন একটা কথা বলি,—আমার উন্মুখ হৃদয়ের মধ্যে আমার আশা পরিপূর্ণ প্রাণের মধ্যে অপ্রত্যাশিত বিকলতা আমাকে সময় সময় একেবারে পাগল করিয়া ফেলে।—এবুদ্ধি তারই প্রতিক্রিয়া, এ বোধ হয় তারই পরিণাম !

যাক্ সে সব কথা ! আজ সে সব কথা আমার ধারণার বাহিরে ! আজ আমি তোমার চিন্তায় অশান্ত, তোমার এই ব্যাকুল ক্রন্দনে উন্মাদ !—

বলিবে কিহে আমার বাঞ্ছিত বন্ধু, তোমার এ অবিরাম অশ্রুপাতের কারণ কি ? অপরাধী কি আমি ? কি সে অপরাধ ?

এক অপরাধ আছে আমার, আমি তোমায় ভালবাসি ! শুধু ভালবাসি নয়, খুব ভালবাসি, মানুষে বুঝি এত ভালবাসিতে পারে না !—কিন্তু তাই যদি আমার অপরাধ হয়, তবে তুমি এত সুন্দর কেন ?

ওগো, সুন্দর মোর
সুন্দর তুমি রূপেতে তোমার
প্রাণ হ'রে আছে তোর

তুমি, নয়নের আগে নয়নাভিরাম
হৃদয়ের কাছে নব-ঘনশ্যাম
দরশনে তব অন্তর নাচে
কেটে যায় ঘোর ঘোর
ওগো সুন্দর ঘোর !

তবে তোমার মুখে ওই স্নেহপূর্ণ মাধুর্য্য কেন ? তোমার নয়নে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ কেন ? তোমার অঙ্গ-ভঙ্গীতে অমন তড়িৎ-তরঙ্গ কেন ?—তোমার কণ্ঠস্বরে অমরার সঙ্গীত কেন ?—তোমার নয়নানন্দদায়ক সরলতাতে অমন মনোমোহন তৃপ্তি কেন ?

বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সব কমনীয়তা, সরল পবিত্রতা, এক ক'রে বিধাতা তোমায় গড়িয়েছেন অথচ আমার অপরাধ—আমি তোমায় ভালবাসি !

এইত সে দিনের কথা ; যে দিন প্রাত্যহিক জীবনের একটু অভিনব ঘটনার মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ !

প্রথম দর্শনে তুমি দেখা দিয়েছিলে কত পরিচিতের মত কথা কয়েছিলে কত আত্মীয়ের মত !

তার পর যে দিন তোমার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের মধ্যে আমার স্থান যে আছে তা' কত লীলা কৌশলের সঙ্গে আমাকে জানবার অবকাশ দিলে ? সে দিন আমার কত সুখ কত আনন্দ !

সেই একদিন আর এই এক দিন ! সুখস্মৃতি বিজড়িত সেই যে স্নেহের লীলা তাহা আমার নিকট যেন আজ আরও মধুর বোধ হইতেছে ; কিন্তু জীবনযাপনের মাপকাটিতে সে দিনের বিচার করিতে গেলে আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাণ কাটিয়া যায়, দীর্ঘশ্বাসে পাঁজর ভাঙ্গিয়া যায়, চক্ষে জল আসে, তাই আজ অন্তর্যাতনার সঙ্গে মনে হয় সেই এক দিন আর এই এক দিন !

আমার তোমার সকল অধিকার দিয়ে, অজানিতভাবে তোমার স্নেহ-সম্পদে আমার সৌভাগ্য বাড়িয়ে শেষে তোমার মাত্র এই একদিনের ক্ষুদ্র ভ্রমের অন্তরালের মধ্যে আমার সমস্ত জীবনের অবিরাম অশ্রু সম্পাতের আয়োজন করিয়া দিলে ! কেন প্রিয়তম, কি দোষ আমার ? কেন এ শাস্তি ? আমি তোমায় ভালবাসি, এই আমার অপরাধ ? যদি তাই দোষ হয়—তবে সে দোষ কি শুধু আমারি ?

আমি যখন আমার সযত্নবর্দ্ধিত-হৃদয়-কাননের স্ফুটনোন্মুখ-কুসুমসম্ভারে প্রীতির অর্ঘ্য সাজিয়ে তোমার পবিত্রমন্দিরে পূজারী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম,—প্রাণে একটা বিপুল আশা অথচ তুমি আমার প্রাণের অর্ঘ্য গ্রহণ করিবে কি না এই ভয়, তখন তুমি আমার সে অর্ঘ্য সাদরে গ্রহণ করিলে কেন ?

আজ তোমার সে করুণাস্নিগ্ধনয়নে অশ্রু কেন ? স্নেহাবেগপূর্ণ সে সজল সম্ভাষণ আজ নিস্তব্ধ কেন ?

বিপুল পরিপূর্ণ-শান্তির পরিবর্ত্তে একটা প্রবল অশান্তি, বিধাতার কোন অভিশাপে, একদিনের এক মুহূর্ত্তের কি একটু অনর্থের জন্য আজ সে সুখ নাই, সে শান্তি নাই, সে আনন্দ নাই, সে উল্লাস নাই !

যদি অপরাধ আমারি হয়—তবে করুণার আধার তুমি, তুমি কি আমার সে অপরাধ ভুলিতে পার না ? আর সে দোষ কি এত গুরুতর যে তোমারও ক্ষমার সীমার বাহিরে ?

হাঁ, আমার আরও একটা গুরুতর অপরাধ আছে ! তবে তাহাকে অপরাধ না বলিয়া অক্ষমতা বলিলেও বেশ ভাল হয় ! সে অক্ষমতা কি শুনিবে ?

—আমি তোমাকে ভালবাসার মত ভালবাসিতে পারি না ! তোমার উপযুক্ত ভালবাসা, হৃদয়হীন আমি, আমার হৃদয়ে নাই !

যখন বুঝিতাম

"নিয়া প্রেম বিনিময়ে আশা"

তোমাকে ভগ্ন উজাড় করিয়া ভালবাসিয়া ও আপনাকে দিতে না পারা ব্যথা বুকে বাজিয়াও মনে যেন তৃপ্তি পাই না, তখন ভেবি—

"তুমি আমার ভালবাসার বাড়া" তখন মনে হয়—তোমায় দিবার মত প্রেম বুঝি, আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে নাই।

তখন মন আমার ডেকে বলে—

"তুমি যারে বাঁধিবারে চাও
সে কখনও বন্ধন জানেনি—
সে যে মেঘের সুবর্ণচ্ছটা
গন্ধ কুসুমের, কণিকের হাসি—"

তখন আমার দীনপ্রেমের অক্ষমতায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠে কিন্তু প্রাণাধিক!

তাবি যখন তোমায় ভালবাসি
গর্ব্বে আমার ভরে উঠে বুক—

"তুমি আমার কাঁদাও তা'তে আমার কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি নিজে কাঁদিয়া আমায় কাঁদাইও না! তুমি আমার হৃদয়ে ব্যথা দাও, আমি কোনও কথা বলিব না, কিন্তু পায়ে ধরি তোমার, তোমার প্রাণে ব্যথা দিবার সুযোগ আমায় দিও না।

তুমি যদি আমার প্রাণে ব্যথা দিয়ে আমার সন্তুষ্টমনে বেদনার অশ্রু দেখে সুখী হও, তবে আমার তাতেই সুখ, তাতেই শান্তি, তাতেই তৃপ্তি।—কারণ আমি নিজে স্বার্থপর হ'লেও—তোমার স্বার্থ—তোমার সুখ—আমি একটু একটু বুঝি। জান কি, বিশ্বাস করিবে কি যে তোমার একটী মধুর কথাতে, তোমার একটু মিষ্টি হাসিতে আমার প্রাণে সুখ ধরে না, আনন্দ উথলিয়া উঠে?

কিন্তু আমি জানি আমার মর্ম্মপীড়া তোমাকেও ব্যথিত করে, আমার উষ্ণশ্বাস তোমাকেও দগ্ধ করে, আমার অশ্রুজল তোমাকেও পাগল করে—তবুও জিজ্ঞাসা করি—আমায় এ শাস্তি দিলে কেন?

আজ আমরা এই অসহায় অসহায় ওপারটুকু ব্যর্থতার মধ্যে, দারুণ ক্লেশ ও আকুল ক্রন্দনের মধ্যে, শুধু এই সুর কাণে বাজিতেছে—

"সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর
বড় কঠিন সাধনা যা'র
বড় সহজ সুর!"

হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া, আজ এ কার রোদন-ধ্বনি আমার মর্ম্মদ্বারে শত বেদনার আঘাত ক'রে? আজ মনে হয় যে আমার প্রিয়, যে আমার দুর্দ্দিনের বন্ধু, সুদিনের পরমাত্মীয়, যে আমার অভিনবের সখী, কবে তোমার আমার মিলনের মধ্যে শুধু এই কথা কাহের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ ক'রবে—

"আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা।
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার প্রভাতে
বাতাস যাতে পুলকিত
তোমার আমার যাওয়া আসায়
কাটে সকল বেলা।"

এমন দিন কি আসিবে? এমন শুভদিনের দেখা কি পাইব?

শাস্তি ত যথেষ্ট পেলাম; এখন জানতে পারি কি শাস্তিদাতা, আমার কোন অপরাধে এই শাস্তি?

যদি আমি অপরাধীই হই, তবে আমায় আরও শাস্তি দাও, আমি মাথা পেতে নেব;—কিন্তু হে আমার জীবন-দেবতা, বিচারপতি, জানিতে পারি কি আমার এমনতর দণ্ড কোন অপরাধে?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

অমৃত-প্রয়াণ

ওরে উন্মনা, ওরে উন্মনা, ওরে উদাসীন উদাসী,
তুই, কোন সাগরের অজানা অমৃত-প্রয়াসী ?
ঘুরিয়া বেড়িস সাগর-বেলায়,
মনের মানিকে হারালি হেলায়
বসে বসে সেল সারা দিনমান
ওরে-চঞ্চল প্রবাসী,
তুই, কোন সাগরের অজানা অমৃত-প্রয়াসী ?

তীরে বসে তুই একেলা কাঁদিস,
কত দিন ঢেউ শুনিবি
লহরীর তালে সাগরেরই গান
শুধু আর কত শুনিবি ?
বটিকা-ক্ষুব্ধ লহরী-লীলায়
মেঘগর্জ্জনে, বিজলি-খেলায়,
বর্ষা-দাহনে জাগে না চিত্ত
ওরে-উন্মনা প্রবাসী,
তুই, কোন সাগরের অজানা অমৃত-প্রয়াসী ?

কত না পূর্ণ চন্দ্র-প্রকাশ
দেখিলি শান্ত-সাগরে,
কত যে সূর্য্য বাজায়ে তূর্য্য
কহিল স্বপ্নে "জাগরে" !
বিশ্বের শত বধূ-সঙ্গীত
তোর কাণে কাণে করে ঝঙ্কিত
আকাশে বাতাসে [illegible]
ওরে উন্মনা-উদাসী,
তুই, কোন সাগরের অজানা অমৃত-প্রয়াসী ?

তোরই পাশে দেখ কম-কিশলয়
সবুজ পাতায় ছাইনি,
বীর সমীরের পুলক পরশ
নহেরে বরষ-দাহনী,—
কলি হ'তে ফুল, ফুল হ'তে ফলে,
কত রহস্য লেখা কত ছলে
বিশ্ব কুঞ্জায় গিরি গুহা জাগে
ওরে উদাসীন-উদাস,
তুই কোন সাগরের অজানা অমৃত-প্রয়াসী ?

অমৃত-নিঝর উছলিয়া পড়ে
নিখিল বিশ্বে নিয়ত,
রে অবাধ্য তুই কেন র'লি
তৃষ্ণা-জ্বরেতে বিরত ?
তোমারি চিত্ত বিশ্বের মাঝে
নিঃশেষ হ'বে লীনতার লাজে
কণিকা-করুণা-কাঙাল হইবে
তুমি অমৃতের-প্রয়াসী ?
ওরে উদাসী, ওরে উন্মনা, ওরে উদাসীন উদাসী !

ওরে উন্মনা, উন্মনা হয়ে
থাক চিরদিন নিখিলে
উন্মনারে আবাহন করে
কুষিত পরাণে কি দিলে ?
তাই হয় তুমি ওঠো জাগো বেগে,
চঞ্চলতার কটিকার বেগে,
বজ্র বাহনে উদাসী আসাও,
উদাসীন কেন প্রবাসী !

ওরে উদ্‌খী, ওরে উন্মনা, ওরে উদাসীন উদাসী !
অমৃত সাগর মথন তরে
অসীমের পথ চাহিয়া,
তৃষা-কাতর আকুল কণ্ঠে
সাগরের গান গাহিয়া,
চল চল আজ শুধু পথে চল
কাছে ডেকে নাও যা'রা ঘুরে ম'ল
নিখিলের সাথে বিশ্বের পথে
চলরে অমৃত-প্রয়াসী,—
ওরে উদ্‌খী, ওরে উন্মনা, ওরে উদাসীন উদাসী !

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

সেনকো

(গল্প)

বহুদিনের কথা নয়। ফুলালপুর গাঁয়ে নিবাইচাঁদ মণ্ডল বাস করিত। তাহার স্ত্রী ও একটি মাত্র কন্যাই তাহার সংসারের লোক। গাঁয়ের একটি প্রান্তে তাহার ঘর। ঘরের পাশ দিয়া ফুলালপুর হইতে বাঁধা রাস্তা সহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। নিকটেই রাস্তার পার্শ্বেই প্রকাণ্ড দীঘিখান—ফুলালপুরের জমিদার বাবুদের খেলিবার গ্রন্থ। জমিদার বাবুরা অনেকগুলি ভাই—পৃথক্ পৃথক্ প্রকাণ্ড বাড়ীতে তাঁহাদের বাস—এমনকি গাঁয়ের একদিকের সবটাই তাঁহাদের দ্বারা অধ্যুষিত। গ্রামের চতুর্দিক পার্শ্বে তাঁহাদের অনেকেরই বাগানবাটী।

গাঁয়ের একটি টেরে নিবাইচাঁদের এক জোয়াল গরু, হাল বলদ, কয়েক বিঘা জমি ও সামান্য একটুকরা সবজী-বাগ লইয়া কৃষিকর্ম্মে কোন রকমে দিনপাত করিত। যে চাষীর পরিবারে পুত্র সন্তানের অধিকা তাহার প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হয়। ছেলে নিবাই সে কথা বলিত। তবে ছয় এগার বৎসরের বালিকা কন্যা বুদ্ধি ও পরিশ্রম শক্তিতে পুত্রাভাব অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পিতাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যহই যেনকা ব্যস্ত থাকিত। শরীর বিশেষ অসুস্থ না হইলে তাহার এই প্রাত্যহিক কার্য্যের বিরাম ছিল না। হাসিরা মুখে অতি সাধারণই কথা। অথচ ঘরে ও বাহিরে কর্ম্মের জন্য কি চঞ্চল ব্যস্ততা ! সমস্তদিন তাহার যেন বড় অথচ তাহা প্রকৃতিক স্ফূর্ত্তিময়। জগৎ তাহার চঞ্চল অথচ কি সরল !

সকালে উঠিয়া গরুগুলির তত্ত্বাবধান তাহার একটা প্রধান কাজ। গোয়াল ঘরে ঢুকিয়া যদি দেখিতে পাইত কোন একটা গরু তাহার গোবরের উপরে শুইয়া গায়ে গোবর মাখিয়াছে তবে আর তাহার রক্ষা থাকিত না। তাহাকে কাণ ধরিয়া উঠাইয়া, বলিত "কি অঘোর ! এম্‌নি করে' কি লোকে শুয়ে থাকতে হয় ? দেখি, গাটা পুঁছে দি"—বলিয়া খড় দিয়া তাহার গা ঘষিয়া দিত। কাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, "কিরে তোর রাত্রে ঘুম হয়নি ? অমন্ করে' দাঁড়িয়ে আছিস্ যে ? বলিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিত। কোন বাছুরকে চুমা খাইয়া বলিত "আহা, বাছার আমার মুখ শুকিয়ে গেছে, সারা রাত দুধ খেতে পাওনি।" এম্‌নি করিয়া ঘরে দেরে সে গরুগুলিকে বাহির করিয়া যথাযোগ্য স্থানে বাঁধিয়া তাহাদিগকে আহার দিত।

তাহার পর তাহার রন্ধনাগারে প্রবেশ। সেখানে রক্ষ-তলে পাড়ে হইতে কুড়াইয়া আনা শুষ্ক পাতাগুলির পর্য্যবেক্ষণ, কোথাও কচা ডাঁটা, কোথাও শাক ও পালং এর বীজ গুলিতে জলদান, বিড়ালগুলিকে কোন কোন গাছের তলা

হইতে আগাছা উপোলন প্রভৃতি কার্য্যে তাহার অনেকটা সময় যায়। সে সব ঝোরাগের ফল, ফুল ডাঁটা প্রভৃতি দেখে, তাহাদের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, তাহাদের সঙ্গে কি কথা বার্ত্তা কহে, তাহা সেই জানে। কিন্তু কোনদিন কোন ফুল ফল পাতা বা ডাঁটা ছিঁড়িতে পারে না। একদিন তাহার মা শালুকের ডগা ও অনেকটা কচুর পাতা তুলিতে বলিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বলিয়াছিল, "না মা, তা পারব না। লাগবে যে।" মা ত অবাক "লাগবে কিরে? কার লাগবে? কিসে লাগবে?" সে বলিয়াছিল, "হাঁ ওদের বুঝি ব্যথা লাগেনা? অমন ক'রে ছিঁড়তে পারা যায়? ইস্।"

পিতার খাবার লইয়া মধ্যাহ্নে সে মাঠে যাইত। গামছা ঢাকা দিয়া থালায় করিয়া মোটা চাউলের ভাত, তাহার এক প্রান্তে দাল, কোন কোন দিন বা বড়ি, ছাঁচির চচ্চড়ি, একটু নুন—এই-ই ত খাবার। একটি জল এক হাতে, অন্য হাতে থালা, দূর হইতে দেখিতে পাইলেই নিমাই একগাল হাসিয়া "আই যে আমার অন্নপূর্ণা আসছেন" বলিয়া কাজ রাখিত—লাঙ্গল ছাড়িয়া দিত। তার পর আইলের উপর যাইয়া একটু বিশ্রাম করিবার সময় মেনকা ঝুলিকায় তাহাকে দাঁড়াইয়া অনন্ত খড়ের ঝুড়োর মুখে টিকে ধরাইত আর বলিত "বাবা, এইবার ঐ বাটিটা হতে ছেলটা মেখে নাও তাহাক খেয়ে দুব দিয়ে এসো আমি ততক্ষণ তোমার ভাতটা আগলে বসে থাকি।" নিমাই তাহার আদেশ পালন করিতে কোনদিন দ্বিধা বোধ করিত না। তারপর স্নান করিয়া আসিয়া ভাত খাইবার সময় তাহার আদেশ মত একটি তাতও পাতে রাখিয়া উঠিতে পারিত না।

বৈকালে ঘর ঝাঁট দেওয়া, গরুগুলিকে গোয়ালে তোলা, সন্ধ্যার প্রদীপ লাগান, ঘরে ঘরে তাহা দেখান, তুলসী তলার প্রদীপ দিয়া প্রণাম করা এসব কাজ মাকে সে কিছুতেই করিতে দিত না। সন্ধ্যার পরে খাইয়া বাবার কাছে গল্প শুনিতে শুনিতে সে নিদ্রা যাইত।

এমনি করিয়া সে পিতা ও মাতার স্নেহ ছায়ায় যখন বসিয়াছিল যে তাহার যে বিবাহ দিতে হইবে একথা তাঁহাদের মনেই হইত না। যদি কেহ মনে করাইয়া দিত, তাহা হইলেও তাঁহারা শিহরিয়া উঠিতেন।

(২)

একদিন শীতকালে জমিদার প্রাণবল্লভ বাবু তাঁহার কতিকয়েক বন্ধুবান্ধব লইয়া নিমাই এর বাড়ীর নিকটের রাস্তা দিয়া খেলার মাঠে যাইতেছিলেন। প্রাণবল্লভ বাবুর বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর হইবে। তিনি স্বয়ংচারী ও একটু কবিপ্রিয়। সেদিন বন্ধুবর্গ অনুযোগ দিতেছিলেন যে তাঁহার অজস্র প্রায় সকল গৃহিকেরই বাগানবাড়ী আছে, কিন্তু তাঁহারই নাই কেন? উত্তরে তিনি বলিতেছিলেন—মনোমত জায়গা পাওয়া যায় না যে! এইকথা যখন হয় তখন তাঁহারা নিমাইয়ের বাড়ীর নিকটে পৌঁছিয়াছেন। একজন ঐ বাড়ী দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐ জায়গাটা কার?"

প্রাণবল্লভ—আমার।

বন্ধু—তবে আর আপনার জায়গার ভাবনা কেন? ঐখানেই বাগানবাড়ী করুন না?

প্রাণবল্লভ—সে কি হয়? ও লোকটা যাবে কোথায়?

বন্ধু—আরে রাখুন। আপনার মূল্যবান্ জমিটা পেলে ও খুসী হয়ে অন্যত্র উঠে যাবে।

প্রাণবল্লভ—অনেককেছে গরজ—জোত জমিও কিছু করেছে, হঠাৎ ওকে ওরকম ক'রে কি তাড়ান যায়?

বন্ধু—তাড়ান নয়। কাউকে দিয়ে মিষ্টি করে প্রস্তাবটা ওর কাণে তুলুন না কেন? আপনার এলাকায় অন্য কোনখানে ওকে জায়গা দিলে ওর কোন আপত্তি হ'বারত সম্ভাবনা দেখিনা। আর গরীব বলে' না হয় কিছু টাকাও ওকে ধরে' দিতে পারেন।

কাজের কিছু পাকা কথা বুঝি প্রাণবল্লভ বাবুর মনেও উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন—আচ্ছা, দেখা যাবে।

পরদিন নিমাইকে ডাকাইয়া আনিয়া জমিদার বাবুর ইচ্ছাটা প্রকাশ করিয়া তাহাকে জানাইল—তুমাইল ইউনিয়নের এই ভাগ হইতে—অন্যখানে গিয়া বাড়ী করিবার জায়গা পাইবে, ছয়টি বৎসরের খাজানাও সেখানে মাপ পাইতে পারিবে, অধিকন্তু নগদ দুইশত টাকা

না। এখানকার জমিতে আমিতে বন্দোবস্ত করিয়া দিলে তাহার লোকসানও বেশী কিছু হইবে না। যদি নিমাই ধনিবের কথা অনুসারে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে ধনিব যে তাহার উপর চিরদিনের জন্য সন্তুষ্ট থাকিবেন—এবিষয় বলাই বাহুল্য। এমন করিয়া প্রস্তাব করাতে নিমাই তাহার দারিদ্র্যের বিষয় ভাবিয়া, নগদ টাকার লোভ ও জমিদারের চির অনুগ্রহ লাভের আশায় হঠাৎ সম্মতি দিয়া ফেলিল। বলিল, "তবে আপনারা দেখুন, কোন্ গাঁয়ে আমায় জমিজমা দিতে পারবেন। তা ঠিক হ'লেই আমি উঠে যাব"। ধনিব তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় দিলেন। কিন্তু পথে ফিরিতে ফিরিতে নিমাই এর বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। কতকালকার পৈতৃক ভিটা—কত সুখদুঃখের কাহিনী জড়ান—কত স্নেহমমতার স্মৃতিমাখান—কত মায়ার! তাহাকে সহসা ছাড়িয়া—কোন্ দূর দেশে কোন্ অপরিচিত প্রতিবেশীর মধ্যে আবার নূতন করিয়া ঘর বাঁধিতে হইবে?—সে কি বিষম!—উঃ! তাহার চোখে দুই এক ফোঁটা জল দেখা দিল। তারপর মেনকা—দূরের তৃণগাছি পর্য্যন্তকে যে স্নেহের পাত্র করিয়া তুলিয়াছে—সে এসংবাদে কেমন করিয়া উঠিবে? এইবার নিমাই এর যথার্থই ভয় হইতে লাগিল। না—একথা তাহাকে কিছুতেই আগে হইতে বলা হইবে না। বলিলে সে কাঁদিয়া কাটিয়া ঘরত খাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবে! তাহার মেয়েকে রক্ষা করিতে গিয়ে শেষে কি ধনিবের কোপানলে তাহাকে ভস্মীভূত হইতে হইবে? না—এখন তাহাকে কিছুতেই বলা চলে না। তবে যাইবার দিন—হাঁ—সেই ভয়ঙ্কর দিন—তা যা হয় একটা হইবে। নিমাই আর ভাবিতে পারিল না। ভবিষ্যতের দিক দিয়া তাহার ভয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না—কারণ টাকার বন্দোবস্তে তাহার কোন আপত্তি হইবে না। কিন্তু মেনকা বুঝে না—দারিদ্র্য বুঝে না—বুঝে কেবল জমির অঙ্ক অবিচ্ছেদ—তাহাকে নিমাই যত বিপদ।

(৩)

হুলাশপুর হইতে প্রায় এক প্রহরের পথ শোলকুপা পরগণার শিবদাসপুর গ্রামে নিমাই এর নূতন বাটী নির্ম্মাণ হইয়াছে। গ্রামবাসিত বাবু কথিতমত সকল রকম অনুগ্রহ তাহাকে করিয়াছেন।

শুভদিনে প্রাতঃকালে দুইখানা গরুর গাড়ী নিমাই এর বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। জমিদারের সোমত্তা, দুই একজন পাইক ও প্রতিবেশী তিন চারিজন নিমাইকে সাহায্য করিবার জন্য বাড়ীতে উপস্থিত। জিনিষপত্র বেশী কিছু ছিল না। থালা, ঘটি, বাটী, বাটি, জাঁতি, কুড়ুল, ছেঁড়া মাদুর, মশলা বালিশ, তালি দেওয়া কাঁথা, ভাঙ্গা তৈজসপত্র, টিনের দুটো তোরঙ্গ, তাহার একটি ভাঙ্গা, কয়গুলা মাটির হাঁড়ি, জালা, কলসী, সরা, আর নিমাই এর স্ত্রীর পুরান পাঁচ ছয়খানি সিকা, কয়েক বস্তা ধান, কয়েক বস্তা চাউল, কিছু চিড়া মুড়ি, কিছু খই, দুই একজন গ্রাম ইত্যাদি জিনিষপত্র গরুর গাড়ীতে বোঝাই হইতেছিল। মেনকা একবার পিতাকে একবার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা? ওগো বল না কোথায় যাচ্ছ?" কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিতেছে না। সকলেই মুখ ফিরাইয়া কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। নিমাই এর ত কথা কহিবারই অবসর নাই। সে লাঙ্গল, মই প্রভৃতি এক একখানি গাড়ীতে কায়দা করিয়া তুলিয়া তাহার উপর জিনিষপত্র চাপাইতে লাগিল—গরুগুলাকে জোড়ায় জোড়ায় বাঁধিয়াছিল। অবশেষে দুইতিন ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক ঠাক করিয়া পাড়ার বৃদ্ধদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, "মেনকা আর তুমি ঐ গাড়ীতে গিয়া উঠ। বাসনগুলা নিয়ে হেঁটে যাচ্ছি"। স্ত্রী-মেনকাকে ডাকিল। কিন্তু মেনকা সব জীবনের ভিতরে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। উত্তর দিল না। নিমাই ভাবিল, "ওরে দেরী হয়ে যাচ্ছে, চলে আয়।" মেনকা নিরুত্তর নিষ্পন্দ। তাহাকে উঠাইয়া আনিতে নিমাই তাহার কাছে গেল। দেখে তাহার চোখ দিয়া প্রবল ধারে জল পড়িতেছে। বলিল, "আর কেঁদে কি হবে? চল মা দেরী হচ্ছে যে।" মেনকা পিতার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না—মাতৃ মুখের দিকে তাকাইয়া মুখ পাইয়া মুখ পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে মা আসিলেন কন্যার

কান্নায় তাঁহার চোখেও জল আসিয়াছিল। তবু তিনি নিজকে সাম্‌লাইয়া মেনকাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—কিন্তু সে বাড়িল না, চড়িল না। এইবার তিনি ধমক দিয়া বলিলেন—"কিলা যাবি কিনা বল্? না এখলা এখানে পড়ে থাকবি? এমন ধারা মেয়ে ত কখন দেখিনি বাপু, এত সাধাসাধি—তবু একটু নড়ন হওয়া নেই!" মেনকা হঠাৎ কান্না থামাইয়া তাঁহাদের দিকে স্থিরভাবে তাকাইল—বলিল "তোমরা যেতে পার যাও, আমি যাব না।" শেষে সোমত্তা পাড়ার প্রতিবেশীরা বাস্তবানে আসিয়া উপস্থিত। ব্যাপার খানা কি জানিতে পারিয়া তাঁহারা সকলেই মেনকাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মেনকা আর কাঁদিল না—কেবল কাঠ হইয়া সেখানে বসিয়া থাকিল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ত্রিলাই ব্রহ্মিল, যে ভয় পূর্ব্বে করা হইয়াছিল, আজ তাহাই ঘটিল। হইয়া গেছে, তাহারও সাধ্য নাই যে মেনকাকে টলায়। অবশ্য অতটুকু মেয়ের উপর জোর করাও চলে কিন্তু নিমাই ত আর পাষাণ নহে—ভিতরে তাহার প্রাণও ত কাঁদিতেছিল! সে সোমত্তা মহাশয়কে একান্তে ডাকিয়া বলিল, "না মশাই, আমার দ্বারা হবে না—আপনি হুজুরকে সব জানাবেন!" "সে কি গো? সব ঠিক ঠাক করে' ধনিবের টাকা গণিয়ে দেবে কিনা সামান্য একটী মেয়ের জন্যে বেয়াদবী করবে? তোমাদের প্রাণে ভয় নেই?" সোমত্তা চোখ রাঙ্গাইলেন। নিমাই বলিল, 'আমার ধনিব ছেলে মেয়ের বাপ, তাঁকে সব খুলে বল্লে তিনি অবিশ্যি রাজি হবেন। আপনি না পারেন আমি গিয়ে বল্‌ব।' সোমত্তা তবু নরম হইলেন না, শাসাইতে লাগিলেন। নিমাই তাঁহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গাড়ী হইতে ধনিবের পত্র নামাইতে আরম্ভ করিল।

শ্রীসুধাংশুনাথ লাহিড়ী।

ক্ষণভঙ্গুর

যখন বাঁধ্‌লি চুলে বেণী
পুবে হাওয়ায় পড়ল ধরে,
আকুল-করা ফুলের রাশি
কাঁদিস্ বসে তাহার তরে!
গেছে যাহা ফিরবে না আর,
পাগল ওরে পাগল আমার,
বাতাস তাহার গন্ধ নিল
হাসি গেল ধূলায় ভরে,
স্মৃতির বাধা জড়িয়ে বুকে
বেড়াস্‌নেক হাহা করে!
ফুরায় যাহা ফুরিয়ে যাবার
থাকতে তারে দিবি নাই,
কান্না হাসি চুকিয়ে নেবার
সময় এল দেখিস্ নি যে!

ফুলে ভরা গন্ধে ভরা,
চিরদিবস বাস্‌বে ধরা

আকাশ পানে তাকায় সে যে
পাতাল পানে চায় না নীচে—
ঘুরিয়ে যাবে তাই বলেও
কারা মুছে দেয়নি মিছে!
আগুন বসে থাকড়ে ঘর
যাবার বেগো যাবেই চলে,
ফুটল হাসে, টুটবে যারে
হারায় কাঁদ নয়ন জলে!

যেটুক্ যখন আস্‌বে ভেসে,
হাত পেতে তুই নিস্‌রে হেসে,
ক্ষীণ হয়ে এক নিমেষে
ছিনের আলোয় আয় না জ্বলে—
ছিঁড়ি আঁধার চাক্‌বে তারে
দিন ফুরালে সন্ধ্যা হলে!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

মহাকবি ভাস-প্রণীত

চারুদত্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[বসন্তসেনা ও চেটী প্রবেশ করিল]

ব। তার পর ? তার পর ?

চে। ওমা, আমি ত কিছু বলিনি। 'তারপর তার পর' কি বল্‌ছেন ?

ব। ওলো, আমি কি বল্‌লুম ?

চে। ঠাকরুণ, ভালবাসি বলে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোন দোষ ধরবার জন্য নয়—কি ভাবছেন ?

ব। ওলো, তুই কি মনে করিস্ ?

চে। বারাঙ্গনা ভাবের বিরুদ্ধ ব'লে ঠাকরুণ কাউকে ভালবেসেছেন এই আমার মনে হচ্ছে।

ব। বেশ ভেবেছিস্। ঠিক ধরেছিস্। তাই বটে।

চে। গয়না না পর্‌লেও ঠাকরুণকে অলঙ্কারের মতই দেখাচ্ছে। ভগবান্ কামদেব যুবকজনের মানসিক উৎসব-স্বরূপ।

ব। হতভাগী আমার উৎকণ্ঠায় তোর কি আহ্লাদ হচ্ছে ?

চে। ঠাকরুণ, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি, বহু-সম্মানোচিত সুন্দর কোন রাজকুমারকে কি কামনা করেছ ?

ব। আমি উপভোগ করতে চাই, সেবা করতে চাই না।

চে। তবে কি বিদ্যাবিশেষের রমণীয় কোনও ব্রাহ্মণপুত্র ?

ব। ব্রাহ্মণের প্রতি অতি- বহুমাননিত্ত বিশ্বাস আছে, সেরূপ জন আমার পূজনীয়।

চে। তবে কি আপনার কোন বণিক্‌পুত্র ?

ব। পাগ্‌লী, উৎকণ্ঠিতা কে আশাভঙ্গের দুঃখ সহ্য করতে পারে ?

চে। কে তা শুনতেও পারি না কি ? কোন ঠাকুরটি আমাদের অভিলষিত ?

ব। তুই কি কামদেবের যাত্রার সময় যাস্ নি ?

চে। গিছলুম বই কি।

ব। তবে কেন কিছু জানিস্ না এ রকম বল্‌ছিস্ ?

চে। বলুন, বলুন ঠাকরুণ বলুন।

ব। ওলো, তবে শোন। চারুদত্ত নামে একজন বণিক্‌পুত্র আছেন—

চে। শরণাগত হ'লে যিনি তোমাকে রক্ষা করেছিলেন ?

ব। সে-ই।

চে। ধিক্—সে যে দরিদ্র।

ব। সেই জন্যই ত তাকে কামনা করছি। বারাঙ্গনা অতি দরিদ্র পুরুষে আসক্ত হ'লে নিন্দিত হয় না।

চে। ঠাকরুণ, মধুকরেরা ফুল ফোটা আমগাছেরই উপাসনা করে।

ব। ওলো, তা করে বটে। কিন্তু তারা যে মধুকর।

চে। যদি অর্থ ক্ষীণ হয়েছে ব'লে বারাঙ্গনাদের ব্যবহার জেনে কাতর হ'য়ে দুঃখ পাবেন ব'লে তিনি না আসেন ?

ব। আমিই তাঁকে কামনা করি।

চে। যদি এতই তোমার অনুরাগ, অভিসারে যাও না কেন ?

ব। যাব না যে তা নয়। কিন্তু হঠাৎ গেলে

প্রত্যুপকার করতে পারবেন না বলে হয়ত আমাকে দুর্লভ হয়ে উঠবেন, এই জন্য দেরী করছি।

চে। হুঁ। এই জন্যই কি সেইখানে গহনা রেখে এসেছেন নাকি?

ব। এই জন্যই।

[যবনিকা সরাইয়া সংবাহক প্রবেশ করিল]

সং। ঠাকরুণ, আমি শরণাগত।

ব। আর্য্য উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নাই।

চে। হুঁ—এ আবার কে?

ব। পাগ্‌লি—শরণাগতকে কি পরিচয় জিজ্ঞাসা করে?

চে। যদি সাহসিক কেউ হয়?

ব। পাগ্‌লি, গুণবানকে রক্ষা করা উচিত।

সং। ঠাকরুণ, ভয়ে আমি মর্য্যাদা রক্ষা করতে ভুলে গিয়েছি। অপমান করতে আসিনি। দেখুন ঠাকরুণ, ভীত, নিপীড়িত বিপন্নব্রত, বঞ্চিতচরিত্র লোকেরা অপরাধ করতে পারে।

ব। থাক্, থাক্। আপনি আশ্বস্ত হ'ন। আমি পরিচয়।

সং। বংশে বটে—আচারে নয়।

ব। (চেটীর প্রতি) ওলো, এই এই রকম।

চে। ঠাকরুণ আপনাকে জিজ্ঞাসা করছেন, আপনার কিসের ভয়?

সং। ঠাকরুণ, বণিক্ হ'তে আমার ভয়।

ব। তা যদি হয়, ঠাকুরকে আসন দাও।

চে। আচ্ছা। (আসন দিল)

ব। বসুন ঠাকুর।

সং। সেবা বিশেষের দ্বারা ইহা কর্ত্তব্য বলে জানি।

(বসিল)

ব। (চেটীর প্রতি) ওলো, এই রকম।

চে। (বসন্তসেনার প্রতি) যে আজ্ঞে, ঠাকরুণ। (সংবাহকের প্রতি) ঠাকুর, আপনি যাতে রাজপথে বিশ্বস্তভাবে যাতায়াত করতে পারেন ঠাকরুণ তাই করতে চান। কাকে কি করতে হবে বলুন।

সং। শুনুন ঠাকরুণ।

ব। আমি মনোযোগী হয়েছি।

সং। পাটলিপুত্র আমার জন্মভূমি। জাতিতে আমি বণিক্। এখন ভাগ্য পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান দশায় লোকের পা টিপে জীবন ধারণ করি।

ব। আপনি সংবাহক। আপনি তা'হলে সুকুমার কলা শিক্ষা করেছেন।

সং। কলা বলে শিখেছিলুম। এখন ইহা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় দাঁড়িয়েছে!

ব। আপনার কথা মনের গ্লানির পরিচয় দিচ্ছে। তারপর? তারপর?

সং। ঠাকরুণ, আগন্তুকের মুখে শুনে পুরুষের কৌতূহলে এই উজ্জয়িনীতে এসেছিলুম।

ব। তারপর? তারপর?

সং। তারপর এখানে আসামাত্রই কোন বণিক্‌পুত্রকে পেয়েছিলুম।

ব। কিরূপ?

সং। সুন্দর, মোহহীন, অশঙ্কিত, কোমল, ললিত বলিয়া বিস্ময়হীন, চতুর, মধুর, নিপুণ, দানশীল, প্রিয়, পূর্ণ, ও সন্তুষ্ট। দান ক'রে শ্লাঘা করেন না। সামান্য উপকারও স্মরণ রাখেন। বহু অপকারও ভুলে যান। ঠাকরুণ, বেশী কি বলব? সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের দিনেও সেই কুলপুত্রের গুণের চারভাগও বলতে পারব না। বেশী আর কি বলব? এত উদার তিনি, যে পরের মনে ক'রে নিজের শরীর ধারণ করেন।

ব। (চেটীর প্রতি) ওলো, কে এ আর্য্য চারুদত্তের গুণের অনুকরণ করছে?

চে। (বসন্তসেনার প্রতি) আমারও জানতে কৌতূহল হচ্ছে। কে নিজগুণে উজ্জয়িনীকে অলঙ্কৃত করছে?

ব। তারপর? তারপর?

সং। তারপর তাঁর গুণে শরীর বিক্রয় করে, কলঙ্ক ভুলে গিয়ে, তাঁর সেবক ধরেছিলুম।

ব। তিনি কি দরিদ্র?

সং। না বল্‌তেই ঠাকরুণ কি করে জান্‌লেন ?

ব। একজনে সবরূপ দুর্লভ তাই অনুমান করেছি। তারপর ?

চে। সেই মহাশয়ের নাম কি ?

সং। আর্য্য চারুদত্ত।

ব। উচিত বটে। তারপর ? তারপর ?

সং। তারপর তার অর্থ ক্ষীণ হ'লে তিনি সেবক পরাধীন হয়ে, কুটুম্বজনকে বিদায় দিয়ে কেবল চরিত্রমাত্র অবলম্বন ক'রে বণিককুলে বাস করতে লাগ্‌লেন। আমায় আজ্ঞা দিলেন 'অন্য কারও সেবা কর।' কোথায় আর এইরূপ পুরুষ-রত্ন পাব ? তাঁর কোমল-সুন্দর, মধুর শরীর স্পর্শে কৃতার্থ আমার হস্ত সাধারণের শরীর মর্দ্দনে কিরূপে শোচনীয় কর্ম্ম এই গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় পোড়া দেহ ধারণের জন্য ঘৃণাবী বলুন।

[বসন্তসেনা সহর্ষ বাষ্পাকুল নয়নে চেটীকে দেখিতে লাগিল]

চে। তারপর ? তারপর ?

সং। তারপর বহুদিন আমি যাকে হারিয়েছি, একদিন এমন এক পুরুষের কাছে আমি দশ সুবর্ণ হেরে গেলুম।

ব। তারপর ! তারপর !

সং। তারপর আজ প্রদোষকালের পথে যদৃচ্ছায় আস্‌তে আস্‌তে সে আবার দেখ্‌তে পেয়েছে। তার ভয়ে এখানে ঢুকে পড়েছি। ঠাকরুণ এই ধরুন।

ব। (স্বগত) হায় ! হায় ! বাসকের বিনাশে এই প্রকারে পক্ষীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। (প্রকাশ্যে) এই অবস্থাগত আর্য্য আমার আমীর। ওলো, যা সেই লোককে বিদায় করে দিয়ে আয়।

চে। যে আজ্ঞে। (নিষ্ক্রান্ত হইল)

ব। ঠাকুর অর্থের জন্য চিন্তা করবেন না। আর্য্য চারুদত্তই বিবেচনা করবেন।

চে। (প্রবেশ করিয়া) ঠাকরুণ, সেই লোককে বিদায় করে দিয়েছি। পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সং। অনুগৃহীত হলুম।

ব। তবে আসুন আর্য্য, বন্ধুজনকে দর্শন করে প্রীতি লাভ করুন গে।

সং। আজই আমি নির্ব্বেদে পরিব্রাজক হ'ব। যদি এই দাসীকে কলাবিদ্যা শেখাতে দেন অনুগৃহীত হই।

ব। যার জন্য এ কলা শিখেছেন আপনার ত তারই সেবা করা উচিত।

সং। (স্বগত) নিপুণভাবে সন্ধ্যাখ্যান করলেন। নিজ কৃত কার্য্য কে প্রত্যুপকারের দ্বারা বিনষ্ট করে ? ঠাকরুণ তবে আসি।

ব। আসুন আর্য্য আবার যেন দেখা হয়।

সং। আচ্ছা, ঠাকরুণ। (নিষ্ক্রান্ত হইল)

ব। হুঁ, যেন শব্দ শোনা যাচ্ছে।

[চেটী প্রবেশ করিল]

চেটী। বিজ্জিতিকে। বিজ্জিতিকে ! কই, ঠাকরুণ কোথায় ?

ব। ওলো, কি এ ?

চেটী। হুঁ ঠকে গেছি। জানালা দিয়ে আধ খানা দেহ বাড়িয়ে অবনতপয়োধরা ঠাকরুণ কর্ণপুরের বিক্রমটা দেখ্‌লেন না।

ব। সাধারণ লোকের সহজেই বিস্ময় হয়। কি তোর গর্ব্বের কারণটা কি ?

চেটী। শুনুন ঠাকরুণ, অভ্রকপোতক নামক মঙ্গলহস্তী স্নান করে বেগে ফিরে আস্‌ছে, যে মদধারা বইছে তাতে সমস্ত রাজ পথ পঙ্কময় হয়ে উঠেছে, এমন সময় চেটী অনেক লোক ভরা রাজপথে উত্তরীয়ের রক্তবর্ণ বিশেষ দেখা যাচ্ছে এমন এক পরিব্রাজককে তাড়া করে নিয়ে।

ব। হুঁ তারপর ! তারপর !

তারপর হাতী শুঁড় নেড়ে তাকে তাড়া দিতে লাগ্‌ল, হাতির দাঁতের ঘায়ে সে ঘুরতে লাগ্‌ল, তার পায়ে হাতীর শুঁড় পড়ল—তখন "ধাও ধাও, সেলরে, ধায় ধায় মেরে ফেল্‌লেরে" এইরকম লোকের চীৎকার উঠ্‌ল। তখন কর-প্রহারে আমি হাতীকে ঘুরিয়ে দিয়ে সেই পরিব্রাজককে মুক্ত করলুম।

ব। খুসী হলুম। তার পর ? তারপর ?

চেট। তার পর সব লোক বল্‌তে লাগ্‌ল "যাঃ-রে চেটের কাজ।"

কিন্তু কেউ কিছু দিতে চায় না। তার পর ঠাকরুণ কোন কুলপুত্র আভরণ পরার উপযুক্ত অঙ্গের স্থানগুলির দিকে চেয়ে কিছু নাই দেখে অদৃষ্টকে নিন্দা ক'রে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে "এইমাত্র আমার সম্বল" এই ব'লে পরিজনের হাতে এই উত্তরীয় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ব। কে এ আর্য্য চারুদত্তের গুণের অনুকরণ করছে।

চে। ঠাকরুণ, আমারও কৌতূহল হচ্ছে। একে?

ব। কোন সাধুপুরুষ হবেন।

চে। ঠিক বলেছেন। জিজ্ঞাসা করুন না।

ব। ওলো একজনের প্রতি পক্ষপাত সকলের গুণনাশ করে।

চে। তবু, তুমি এর নাম জান।

চেট। না, জানি না।

ব। তুমি অত্যন্ত ভুল করেছ।

চে। তাই যদি, তাহ'লে সে কে তুমি বিবেচনা কর?

চেট। আমি এই পর্য্যন্ত কেবল বল্‌তে পারি যে তিনি অবিস্মিত।

ব। আয়, তাঁকে দেখি।

চেট। দেখুন দেখুন ঠাকরুণ, এই যাচ্ছেন।

ব। (প্রাসাদ হইতে দেখিয়া) ওলো, এ যে সেই আর্য্য চারুদত্ত যাচ্ছেন। যজ্ঞোপবীত মাত্র এখন তাঁর উত্তরীয়। যতক্ষণ ইনি দূরে চ'লে না যান, ততক্ষণ এঁকে দেখিগে আয়। (সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

[চারুদত্ত ও বিদূষক প্রবেশ করিল]

চা। বয়স্য, বীণা অনমুশ্রোষিত যন্ত্র-বিশেষ। কেননা,

হৃদয়ের অনুগতা সখীর মতন,
ব্যাকুল জনের ক্লিষ্ট করে বিনোদন।
নাহি সঙ্কীর্ণতা দোষ, সতত উদার;
ক্রীড়াচ্ছলে বন্ধুসম; বিরহে আবার
বনিতার সম; কিন্তু প্রতিবিম্ব যার
হরে, তার নারীদের সপত্নী-সমান।

বি। ওহে বয়স্য, কোন কালে ঘোষণা হয়ে গেছে ব'লে রাজপথ জনশূন্য। কুকুর গুলো পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাদেরই কেবল নিদ্রা নাই। আরও এইটে আশ্চর্য্য, এই হতভাগা বীণায় আমি আনন্দ পাই না। খুব যেখানে কস্‌বে সেখানে তার ছিঁড়ে যাক্।

চা। বয়স্য মিশ্রিত নানাতানে আজ মধুর গান করেছে তুমি আনন্দ পাও নাই?

বি। এইজন্যই ত এতে তৃপ্তি পাই নি। মধুর হ'লেও বেশী খেলেই অজীর্ণ হয়।

চা। সকল রকমেই সুস্পষ্ট গেয়েছে। কেননা—

রাগযুক্ত উচ্চকণ্ঠ অথচ মধুর,
পরিস্ফুট, সমতান তার সেই সুর।
ভাবপূর্ণ, নাহি তাতে কোন অভিনয়,
কিবা প্রয়োজন নানা প্রশংসানিচয়!
দেওয়ালের অন্তরালে থাকিলে সে জন
নারী বলে অনুমিত করিত যে মন।

বি। আপনি খুব প্রশংসা করুন। আমার কিন্তু পুরুষের গান আর স্ত্রীলোকের পড়া ভাল লাগে না। লালফুলের মালা গলায় পুরোহিতের মত পুরুষ গান গাইলেই আমরেই শোভা পায় না। ছিলাসা বেসুর মত স্ত্রীলোকের পড়াও অতি কুৎসিত হয়।

চা। সখে, অর্দ্ধরাত্র হয়ে গেছে! রাজপথ অন্ধকার পূর্ণ। জনসঞ্চারশূন্য বলে উজ্জয়িনী যেন সুপ্ত বলে মনে হচ্ছে। কেন না—

এই অষ্টমীর চন্দ্র অস্ত গেল, অবকাশ
দিয়া অন্ধকারে;

---

* এই বর্ণনা হইতে মনে হয় তাদের সময় রাত্রিতে এক নির্দ্দিষ্ট কালে ঘোষণা দ্বারা রাজপথে চলাচল বন্ধ করা হইত।

অলঘর বন্ধকরী মত যেন ডুবে গেল
সলিল-আঁধারে।

বি। বেশ বলেছ। চন্দ্র অস্তমিত হলে সুবিধা পেয়ে প্রাসাদ থেকে যেন অন্ধকার নেমে আসছে।

চা। (পরিক্রমণ করিয়া) এই আমাদের বাড়ী। বর্দ্ধমানক! বর্দ্ধমানক!

বি। বর্দ্ধমানক! বর্দ্ধমানক! দরজা খোল।

[চেটী প্রবেশ করিল]

চেট। ওমা, মৈত্রেয় ঠাকুর!

চা। বর্দ্ধমানক!

চেট। ওমা, ভর্তৃদারক! ভর্তৃদারক! বন্দনা করি।

চা। পা ধোবার জল আন।

চেট। (পরিক্রমণ করিয়া) এই পা ধোবার জল। (চারুদত্তের পা ধুইয়া দিল)

বি। বর্দ্ধমানক! আমারও পা ধুয়ে দে।

চেট। ভাল করে পা ধুইয়ে দিলেও ত মাটিতে লোটাবেন। থালি জল নাই। আচ্ছা, দিন্, ধুয়ে দিই।

(অভিনয়ের দ্বারা বিদূষকের পা ধুইয়া দিল)

বি। দাসীর বেটা থালি পা ধুয়ে দিল না, মুখও ধুয়ে দিলে।

চা। বয়স্ত

ললাট হইতে ধীরে নামিতেছে নিদ্রা এই
নয়নে আমার;
অমৃত চন্দন ভরা সব জিনি নব বল
লভয়ে প্রদার।

মৈত্রেয়। ঘুমাও।

[চেটী নিষ্ক্রান্ত হইল]

[অলঙ্কারের পেটিকা হস্তে চেটী প্রবেশ করিল]

চেটী। মৈত্রেয় ঠাকুর! উঠুন, উঠুন,।

বি। ওগো, কি আবার?

চেটী। এই যে সুবর্ণের ভাণ্ড আমি বন্ধী, সপত্নীতে রেখেছি। আজ অষ্টমী।

চা। এ সেই বসন্ত সেনার নিজের।

চেটী। হাঁ। ভর্তৃদারক! বলুন, বলুন, নেব নেব।

চা। নাও, মৈত্রেয়।

বি। এ অলঙ্কার ভিতর বাড়ীতে পাঠাও না কেন?

চা। মূর্খ, বাহিরের লোকের পরা গহনা ভিতরের পরিবারেরা দেখে না।

বি। তবে আর উপায় কি? আন। চোরে নেবে বলে দিচ্ছি।

[চেটী অলঙ্কার দিয়া চলিয়া গেল]

বি। ওহে, কি জন্ত সে গাধের চাদরখানা গণিকার চাকরটাকে দিলে?

চা। কৃপাবশে।

বি। এখানেও তোমার কৃপা!

চা। ছি বয়স্ত, এ রকম ব'ল না।

বি। আমি তবে পেট গাধার মত মাটিতে লোটাচ্ছি।

চা। আমার ঘুম আসছে। চুপ কর।

বি। ঘুমোও, যেন সুখে জাগরণ হয়। আমিও ঘুমিয়ে পড়ি।

[উভয়ে নিদ্রা গেল]

[সঞ্চালক প্রবেশ করিল]

সঞ্চালক। ওহে এই যে আমি—

করিয়াছি পথ শিকারের আর বনে,
করিবে প্রবেশ যাতে সহজেতে কায়
দীর্ঘরক্ত ত্যাগকালে সর্প যথা চলে
যাইতেছি ভূমিতলে যবি নিজ গায়।

ওহে বাগানের খিড়কী কপাটে সিঁধ কেটে ঢুকে পড়েছি। এখন বাড়ীর কাছে যাই। নির্ব্বেদের সহিত চিন্তা করিয়া) ওহে।

বসুক পণ্ডিতগণ "নীচ আচরণ,
সুপ্তজনে ক্রিয়া এর বিশ্বস্তে বঞ্চন;
বীরত্বের কাজ নহে, নিষ্ঠুর আবার"
যাবীন এ কাজ তবু, হউক নিন্দার
যোড়হাতে করি না ত' সেবা কোন জনে,
পূর্ব্বে অন্নখানা এই পঞ্চাঙ্গসরণে

বিনাশ করিয়া সুপ্ত যত রাজগণে
দেখায়েছে এই পথ জগৎ-সদনে ॥

(চিন্তা করিয়া)

লোভী, ধনশালী, আর যেই সাধুজনে
অবধান করে, নিজ ব্যবসায়ে আর
অতীব কর্কশ, হেন বণিক-ভবনে
পাই যদি, মনে খেদ না থাকে আমার।

যা হবার তা হোক্। কাম কি না করাতে পারে? কাজ আরম্ভ করি। ওহে—

জনসেবে আর্দ্রভূমি কোথা শস্য নাহি হবে
কোথা সুপ্রবেশ ভিত্তি? হইবে ভীষণ
সিঁধ কোথা? লোণা-ধরা ইট নড়ে কোন খানে
কোথা বা প্রাসাদ জীর্ণ? না হবে দর্শন
নারী কোথা? সিদ্ধ হবে মোর প্রয়োজন?

(পরিক্রমণ করিয়া) এই ধান্য বিভাগের কাজ। উপরের থাকাতে গৃহ-বিশিষ্ট করে এই ভবন বিন্যাস করেছে। এই খানেই ভিতরে ঢোকার পথ করি। ওহে, এখন কি রকম সিঁধ কাটি?

সিংহাক্রান্ত, পূর্ণশশী, মীনের বদন,
অর্দ্ধচন্দ্র, ব্যাঘ্রমুখ, অথবা ত্রিকোণ;
গজমুখ, পীঠিকা বা সিঁধটি কেমন,
করিব? হইলে যাহে সুবিস্তৃত জন

আচ্ছা, সিংহাক্রান্তের মতই কাটি।

বি। ওহে, জেগে আছ? না?

চা। কেন?

বি। কর্ত্তব্যব্যাকুলীকৃত সঙ্কেত পাকা প্রবণের মত আমার নিদ্রা আসছে না। আমার বাঁ চোখ নাচ্‌ছে। চোরে যেন সিঁধ কাটছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। অর্থ থাক্‌লে যদি এই অবস্থা হয়, তাহ'লে আমি জীবিতে দরিদ্রই হ'ব।

চা। মূর্খ, তোমার ধিক্। দারিদ্র্য ইচ্ছা কর্‌ছ।

স। এখন সিঁধ মাপি কি দিয়ে? এই যে দিনের বেলায় ব্রহ্মসূত্র • রাত্রিতে কর্ম্মসূত্র হ'বে।

আজ আমি এই ভিত্তি ভেদিয়া নিপুণ
সন্ধান করিয়া সিঁধ কাকলী তাহাতে দিব
প্রতিবেশীগণ কাল আসিয়া হেথায়,
বিস্ময় বদনে মোর কহিবেক দোষ ঘোর
কার্য্যেতে কৌশল কিন্তু বাখানিবে তায় ॥

গর্দ্দভ যাবার জন্য সেই দেখতে পেয়েছে। রাত্রিগোচর দেবতাকে নমস্কার। (সেইরূপ করিল) ব্যস্, কাজ শেষ। এইবার ঢুকি। (প্রবেশ করিয়া) আরে, দীপ জ্বল্‌ছে। সরে যাই। বিধি, আমি সজ্জনক।

মার্জ্জারের সম ধীর নিঃশব্দ গমন,
বৃকসম করি আমি দ্রুত পলায়ন,
শ্যেন-সম করি যত গৃহের দর্শন,
সুপ্তজনবল গণি' নিদ্রার মতন,
আকাবাকা গতি মোর ভুজগ যেমন,
মায়াসম নানা বর্ণ বেশের ধারণ,
সরস্বতী সম বলি' বহু ভাষা আমি,
নিশার প্রদীপ, বিপদেতে অন্ধকার,
বায়ুসম স্থলে, নৌকা সলিলে যেমন
তেমনি সর্ব্বত্র মোর অবাধ গমন ॥

(চারিদিক দেখিয়া) আমি নূতন এসেছি কিনা তাই অর্থ আছে কি না, না জেনে খালি বাড়ী দেখেই এখানে ঢুকেছি। এখনও কোন আসবাবই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। একি দরিদ্র নাকি? অথবা সংযমননিরর্থক ভূষ্ম ধারণ করছে। কিন্তু এই বাড়ীর গড়ন মনের পরিচয় দেয়। বোধ হয় ভোগের পর এর অর্থনাশ হয়েছে।

অর্থ ক্ষীণ হইলেও নিজ কুলবল বলি'
বিক্রমের কাল হবে করে আগমন,
নীল রং বসনেতে মৃদুলম ঢেকে যতে
মৃদুদেহে রক্ষা করে আপন ভবন ॥

আচ্ছা, দেখি তবে। অথবা আমারই মতন অবস্থাপন্ন কুলপুত্রকে বিপত্তিগ্রস্ত করা উচিত নয়। তবে ফিরে যাই।

বি। ওহে, এই সুবর্ণভাণ্ড নাও।

স। কি বল্‌লে? সুবর্ণভাণ্ড? আমাকে দেখে

• যজ্ঞোপবীত।

বদলে? না বলের দস্যুতা বেহুঁ স্বপ্ন দেখ্‌ছে। আচ্ছা, দেখি। (দেখিয়া) বাস্তবিকই এ নিশ্চিত বটে। কেননা,—

শঙ্কিত নিশ্বাস নহে, পড়িছে সঘন,
শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধে দমবাবধান;
অলসদ্ধি স্থলে গাত্র শিথিল এখন,
শয্যা ছাড়ি সুবিস্তৃত দীর্ঘ অঙ্গখন,
গাঢ়-নিমীলিত আঁখি, নয়ন-পল্লব
কাঁপে না, দীপের আলো করি অনুভব;
জ্বলেতে নিদ্রিত যদি হইত এখন
সহিত না কদাপি এ দীপ-সঞ্চালন॥

কোথায় সেটা? আরে, বেঁকা কাপড়ের এককোণে প্রদীপের আলোয় এর রূপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এ বেশ নিয়েছে। এই সময় উপস্থিত। আমি পোকা এনেছি, প্রদীপ নেভাবার জন্য একটা ছেড়ে দিই। (ভ্রমরের কৌটা হইতে একটা ছাড়িয়া দিল) আরে, এই যে দীপ নিভিয়ে দিয়ে পড়ে গেল।

বি। হায়, হায়। এখন দীপ নিভে গেছে দেখছি। সেলুম যে। ওহে চারুদত্ত, এই নোগার অলঙ্কার নাও। কুপথে গত বণিকের মত তবে আমার দুঃখ হচ্ছে না। আমার ব্রহ্মণ্যের শপথ যদি না নাও।

চ। শপথের দরকার কি? এই নিচ্ছি। (গ্রহণ করিল)

বি। (দিয়া) এখন যদি বিক্রী হ'তে পেলে বণিকের মত সুখে ঘুমাই।

চ। মহাব্রাহ্মণ, সুখে ঘুমাও। (চিন্তা করিয়া) ওঃ, ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করে দিলে, তাই আমি চুরি করলুম।

ধিক্ সে দারিদ্র্যে আর
ধিক্ সেই অশান্ত যৌবনে
যারে নিন্দা করি, ওই
মত শুধু সেই আচরণে।
[নেপথ্যে পটহ-শব্দ]

চ। (কাণ পাতিয়া) আরে, প্রভাত হয়েছে। ঘরে যাই।

(নিষ্ক্রান্ত হইল)

[চেটী প্রবেশ করিল]

চে। (ক্রন্দনের সুরে) মৈত্রেয় ঠাকুর, আমাদের বাগানের খিড়কী দরজায় সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছে।

বি। (সাহসা উঠিয়া) কি বল্‌ছ গা?

চে। আমাদের বাগানের খিড়কী দরজায় সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছে।

বি। চোর কেটে সিঁদ ঢুকেছে।

চে। হতাশ, সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছে।

বি। এস, কই দেখাও।

চে। (পরিক্রমণ করিয়া) এই

বি। হায়, হায়, দাসীর বেটা কুকুর ঢুকেছে। ওগো, এস, চারুদত্তকে সু-খবর জানাই। (উত্তরে অগ্রসর হইল) ওহে চারুদত্ত, তোমায় সু-খবর জানাই।

চা। (আসিয়া) কি? আমার প্রিয় সংবাদ? বসন্তসেনা এসেছে নাকি?

বি। বসন্তসেনা নয়, বসন্তসেন এসেছে।

চা। রদনিকা, ব্যাপার কি?

চে। ভর্তৃদারক, আমাদের বাগানের খিড়কী দরজায় সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছে।

চা। কি? চোর ঢুকেছে?

বি। ওহে যাও তুমি সব সময় বল, মৈত্রেয় মূর্খ, মৈত্রেয় বোকা। তোমার হাতে সুবর্ণভাণ্ড দিয়ে আমি ভালই করেছি।

চা। কি? তুমি দিয়েছ?

বি। হাঁ।

চা। কখন?

বি। অর্দ্ধেক রাত্রিতে।

চা। কি? অর্দ্ধেক রাত্রিতে। হাঁ, দিয়েছ বটে।

বি। ওহে চারুদত্ত, যখন যেমেছিলে তখনই দিয়েছি।

চা। হায়, সুবর্ণভাণ্ড চুরি গেছে।

বি। এখন আমার হাতে দাও।

চা। (স্বগত)

সত্য কথা বিশ্বাস করিবে কোন্ জন?
অবজ্ঞা করিবে মোরে সকলে এখন,

প্রভাববিহীন সদা দরিদ্র্য ঘটিলে যোর
উপজয় আপনার বিবিধ কারণ।

[ব্রাহ্মণী প্রবেশ করিলেন]

ব্রা। রদনিকা! রদনিকা! এদিকে এস। শুনতে পাচ্ছ না। কপাটের শব্দ করি। (সেইরূপ করিলেন)

চে। কপাটের শব্দ নয়? ভর্তৃদারিকা আমায় ডাকছেন। (পরিক্রমণ করিয়া) ভর্তৃদারিকা! এই যে আমি।

ব্রা। আর্য্যপুত্র বা মৈত্রেয়ঠাকুর এস বা আসত হন নাই ত?

চে। ভর্তৃদারক ও মৈত্রেয় ঠাকুরের কুশল। সেই তার অলঙ্কার চোরে নিয়ে গেছে।

ব্রা। কি বল্‌লি, চোরে নিয়ে গেছে?

চে। হাঁ।

ব্রা। তাকে তবে এখন কি দেওয়া যায়? আচ্ছা, এই দিই। (কাণে হাত দিয়া) হা ধিক্, এ যে তাল পত্র। আগেকার অলঙ্কারের পরিচয় আমায় প্রতারণা করছে] এখন কি করি? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, ঠিক্ করেছি। আমার জাতিকুল থেকে লক্ষমুদ্রা মূল্যের মুক্তার মালা পেয়েছি। তাও ত আর্য্যপুত্র উদারতায় ফিরিয়ে দেবেন। আচ্ছা, এই রকম করি।

(নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

বি। অন্ধকারে এই যে অপরাধ করেছি তারজন্য মাথা হেঁট করে তোমাকে প্রসন্ন করছি। এখন আমার হাতে দাও।

চা। কেন তুমি আমায় এখন কষ্ট দিচ্ছ?

তুমি না বিশ্বাস কর,
নিত্য জানি স্বভাব আমার,
বঞ্চনায় শঙ্কা নেই,
কলা যত জীবিকা যাহার।
কিরূপে হইবে বল
মোর পরে বিশ্বাস তাহার?

বি। মোর এর হতভাগা আমি চোরের হাতেই দিয়েছি। (বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিল)

[ব্রাহ্মণী প্রবেশ করিলেন]

ব্রা। রদনিকা, মৈত্রেয় ঠাকুরকে ডাক।

চে। মৈত্রেয় ঠাকুর! ভর্তৃদারিকা তোমায় ডাকছেন।

বি। কি গা? আমায়?

চে। হাঁ।

বি। এই যে যাই। (নিকটে গেল)

ব্রা। মৈত্রেয় ঠাকুর! এই দান গ্রহণ করুন।

বি। এ দানের মূল্য যে অবস্থা বিরুদ্ধ। এ কোথা থেকে এল?

ব্রা। বহুদিন উপবাস করেছিলুম। সকলের সাথে মিলে ব্রাহ্মণদের পারণ করা'ব। এই জন্য এটি এনেছি।

বি। আজ ত অষ্টমী।

ব্রা। ভুলে তিথি লঙ্ঘন করে ফেলেছি। আজ পূজা করব।

বি। দান যেন দেয় ব'লে মনে হচ্ছে। (জনান্তিকে) রদনিকা! কি করব?

চে। (জনান্তিকে) বোধ হয়, তাকে দিতে হবে এই জন্য ভর্তৃদারক পাছে ব্যাকুল হন, তাই ভর্তৃদারিকা আপনার হাতে দিয়ে 'আর্য্যপুত্রকে ঋণমুক্ত করব' এই মনে করে এই রকম করছেন। সুতরাং নিন্ এটা।

ব্রা। মুক্তাগুলির সলিলে জন্ম, আপনিও চলন্ত, তাই মর্য্যাদা ভুলে গেছি। নিন্ এটা। (দান করিলেন)

বি। (লইয়া) তবে সব থাক্। আপনার চোখ ছল ছল করছে কেন?

ব্রা। দেবমন্দিরের ধূপ লেগে চোখে জল পড়েছে।

বি। যদি মিথ্যা বল, সেই চারুদত্তের দিব্যি।

ব্রা। হা ধিক্! (নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

বি। ইনি কথায় দুঃখ চেপে চোখের জলে তা জানিয়ে চলে গেলেন। (অগ্রসর হইয়া) ওরে, এই।

চা। কি এ?

বি। উপযুক্ত বংশে পত্নী-সংগ্রহের ফল।

চা। কি? ব্রাহ্মণী আমায় দয়া করছে?

বি। হাঁ।

চা। ধিক্ আমায়। আজ আমি মৃত।

অর্থকরে দীন আমি
পত্নীধনে ধনীর ভাজন,
পুরুষ রমণী এবে
নারী যে, সে পুরুষ এখন।

বি। তিনি মনে মনে আপনাকে বিয়ে যাচনা কচ্ছেন, আমি যাথা হেঁট করে তোমায় বিয়ে যাচনা কর্‌ছি। এ টী নাও।

চা। আচ্ছা (লইয়া) বয়স্য, এই মুক্তার মালা নিয়ে বসন্তসেনার কাছে যাও!

অর্থে তার লাভ করি বাসনা আমার,
অনুচিত অনুরাগ করে পত্নীধনে
বিলম্ব যে করে মানে, কার্য্যের সাধনে
ধিক্ সেই কূলে, নর-দারিদ্র্যেরে আর।

বি। আশ্চর্য্য, অমূল্য সুবর্ণভাণ্ডের জন্য লক্ষমুদ্রার মুক্তার মালা দিতে হবে।

চা। বয়স্য, ওকথা বলো না—

যে বিশ্বাসে সে আমায়
করিয়াছে গচ্ছিত প্রধান,
সেই মহাবিশ্বাসের
মূল্য এই কর গিয়ে দান।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

[উৎকণ্ঠিতা বসন্তসেনা, তুলি ও রংয়ের পাত্র হস্তে চেটী চিত্রফলক লইয়া প্রবেশ করিল]

ব। ওলো, তার মত দেখ্‌ছিস্ কি?

চে। ঠাকরুণ, সেই দাতী খেপার গোলমালে দূর থেকে বিশেষ আদর করে চোখ মেলে যাকে দেখেছিলুম সেই ভর্ত্তারক এই রকমই বটেন।

ব। 'বারাঙ্গনারা' পরের মন যুগিয়ে চ'লে তুই এ জনরবটিকে সত্য ক'রে আমায় মিথ্যা বল্‌ছিস্।

চে। সকল বারাঙ্গনাই কি পরের মন যুগিয়ে চলে? দেখুন ঠাকরুণ, তাদের বাগানেও নিম গাছ রয়েছে। ছবিখানি ঠিক তার মত হয়েছে ব'লে আমার মনে আনন্দ হচ্ছে। সত্যই প্রশংসা কর্‌ছি—যেন কামদেব।

ব। ওলো, সখীরা যাতে আমায় ঠাট্টা না কর্‌তে পারে তাই কর্‌ব।

চে। তাই করাই উচিত। সখীরাই বারাঙ্গনাদের সম্পত্তি।

[আভরণ হস্তে অপর চেটী প্রবেশ করিল]

চে। ঠাকরুণ সুখী হোন্।

ব। ওলো, তোর শুভাগমন হোক্।

চে। ঠাকরুণ, মা আজ্ঞা করলেন "এই আগন্তু পৌরধান দরজার ভিতর এই প্রবেশ করেছে। তাই, তাড়াতাড়ি সাজগোজ করে ফেলটা দিয়ে এস।" এই গয়না, ঠাকরুণ পরুন।

ব। আর্য্য চারুদত্ত কি আমাকে অলঙ্কৃতা কর্‌বেন?

চে। না, যে গয়না পাঠিয়েছে, রাজার শালা সেই সংস্থান।

ব। ধুরহ, অবিনীতে!

চে। ঠাকরুণ, প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন। আমার যা বল্‌তে বলেছেন তাই আমি বল্‌ছি। (পদতলে পতিত হইল)।

ব। ওঠ্, ওঠ্। মন্দ কথার উপর রাগ করেছি তোর উপর নয়।

চে। আমি তাহ'লে যাকে কি বল্‌ব?

ব। যাকে বল্ "যখন আর্য্য চারুদত্তের কাছে অভিসারে পাঠাবে, তখন সাজগোজ কর্‌ব।

চে। যে আজ্ঞে। (নিষ্ক্রান্ত হইল)

[সজ্জনক প্রবেশ করিল]

স। তাজি নিদ্রা, দূর করিয়াছি অন্ধকার,
নিশায় যে করিয়াছি ঘোষের সন্ধান,
সেই আমি ক্লীবরূপ এবে সূর্য্যোদয়ে
দিবসেতে চক্র সম কাঁপিতেছি ডরে।

ভাগ্যবশে কার্য্য শেষে প্রত্যাগত হয়েছে। বসন্তসেনার পরিচারিকা মদনিকার হাতে ফুলাবার জন্য আমি এই

কাজ করেছি। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে বসন্তসেনার বাড়ী, ভিতরে ঢুকি। (প্রবেশ করিয়া) মদনিকা কি ভিতরে আছে? সকালবেলা গণিকারা বাড়ীর ভিতরেই থাকে! সুতরাং সেইখানেই সে আছে, ডাকি। মদনিকা—মদনিকা।

চে। (শুনিয়া) সজ্জনকের মত আওয়াজ, ঠাকরুণ ব্যাপৃত হয়েছেন। এই সময় যাই। (যাইয়া) এই যে আমি।

স। এদিকে এস।

চে। তুমি ভীতের মত বিবর্ণ কেন?

স। না, না। কিন্তু বলতে চাই।

ব। ওলো, এই ছবিখানা বিছানার উপর রাখ্। (দেখিয়া) হতভাগী গেল কোথা? এই খানেই আছে বোধ হয়। দেখি একে। (পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) ওমা, এই যে অতিথির দৃষ্টিতে একে যেন পান করছে এমন এক পুরুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কি কথা কচ্ছে। বোধ হচ্ছে, মদনিকাকে কিন্‌বে বলে আমার কাছে প্রার্থনা যে করবে এ সেই।

স। গোপন কথাটা শোন।

ব। পরের গোপন কথা শোনা উচিত নয়। আমি যাই।

স। বসন্তসেনা কি—

ব। আমার বিষয়ই আলাপ করছে। তবে কি বলে শুনি। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

স। মূল্য পেলে কি তোমায় দেবে?

ব। এ সেই। তা হোক্, শুনি।

চে। সজ্জনক, ঠাকরুণ আগেই বলেছেন যে আমাকে সমর্পণ করবেন।

স। তবে এইটে ওঁকে দিও, আর বোলো—

যেন তব শরীরের মাঝে ইহা
রয়েছে নিষ্পাপ,
গোপনে এ অলঙ্কার মোর দেহে
ক'রো পরিধান॥

চে। দেখি।

স। নাও। (দেখাইল)

চে। এ গয়না যেন আগে দেখেছি।

ব। এ যে আমার গয়নারই মতন।

চে। বল বল, এ কোথা থেকে পেলে?

স। তোমার ভালবাসায় পড়ে সাহসিক কাজ করেছি।

বসে ও চে। এঁ্যা? সাহসিক কাজ?

চে। (স্বগতঃ) হায়, নিদারুণ কর্ণের জন্য এর আকৃতি ঠাকরুণের কাছে উদ্বিগ্নকর হয়ে উঠ্‌ল। (প্রকাশ্যে) হা ধিক্, আমার জন্য তোমার শরীর ও চরিত্র দুই-ই সংশয়িত হয়ে উঠ্‌ল।

স। পাগ্‌লী, সাহসেই লক্ষ্মীর বাস।

চে। তুমি মূর্খ। প্রাণ দিয়ে কে শরীর বিক্রয় করে? কার বাড়ীতে এ বিশ্বাসের ঘটনা ঘটেছে?

স। শকারে শুনেছিলুম—শ্রেষ্ঠিচত্বরে বণিকপুত্র চারুদত্ত বাস করেন।

উভয়ে। হুঁ।

স। বিষাদে শিথিল সকল অঙ্গ
সন্ত্রমে তব বিশাল আঁখি,
রাগে রেঙা রতিশীর মত এবে
কাঁপিতেছ, দয়া কর যে দেখি॥

চে। সত্য বল। বণিককুলে সাহসিক কার্য্য করতে গিয়ে কি তুমি কোন কুলপুত্রকে অস্ত্রাঘাতে বিকল বা হত্যা করেছ?

ব। বেশ, আমার যা জিজ্ঞাসার দরকার, তাই জিজ্ঞাসা করেছে।

স। মদনিকা, এই কি যথেষ্ট নয়, আবার একটা অকাজ করব? শস্ত্রাঘাতে কাকেও বিকলও করিনি, কাকেও হত্যাও করিনি।

চে। সজ্জনক! সত্য?

স। সত্য।

চে সাধু সজ্জনক! আমার প্রিয় কাজ করেছ।

স। কি? কি বললে? প্রিয়? মদনিকা! তুমি এমন?

উত্তম কুলেতে জন্ম লভিয়াছি
তথা না যে হায়
মনেরে অধিকৃত এ শরীরে
রক্ষার আশায়,
তব প্রেমে বদ্ধ হিয়া এ অকার্য্য
করেছি সাধন
বলিতেছে মিত্র মোরে, অপরেতে তব্
যাইতেছে মন ?

চে। সজ্জনক! শোন। এ ঠাকুরুণের গয়না (কাণে কাণে) এই এই রকম।

স। এই রকম ?

না জানিয়া পত্রহীন
করিয়াছি আগে যে পাখায়,
তাহারই আশ্রয়ে যাই
প্রীতে তাপি ; হায়রে আশায়।

ব। অনুতাপ করছে তার বোধ হচ্ছে বুঝতে পেরেছে এ অকাজ করেছে।

স। মদনিকা! এই যদি হ'ল তাহ'লে এখন কর্ত্তব্য কি?

চে। সেইখানেই আবার রেখে এস। ঠাকরুণ এ পায়বেন না।

স। এখন যদি তিনি রাগ ক'রে চোর ব'লে আবার রক্ষীদের হাতে ধরিয়ে দেন, তাহ'লে আমি কি করব ?

চে। তয় ক'রোনা ক'রোনা। তিনি কুলপুত্র, গুণ দেখলে সন্তুষ্ট হবেন।

ব। সাধু ভদ্রে! এই কথায় অবরুদ্ধা অলঙ্কারে ভূষিত হ'লে।

স। আমি কিছুতেই সেখানে যেতে পারব না।

চে। আর একটা উপায় এই—

ব। এটা গণিকালয়ের গুণ।

স। আর কি উপায় ?

চে। ঠাকরুণ আর বণিকপুত্র উভয়েই তোমাকে চেনেন।

স। না, না।

চে। সুতরাং; এই অলঙ্কার যেন সেই বণিকপুত্রের কথাতেই ঠাকরুণকে ফিরিয়ে দিয়ে যাও। এ রকম করলে, তুমি রক্ষা পাবে ও পীড়িত হবেন না। আমিও পীড়িত হব না। না হ'লে ঠাকরুণকে আবার বঞ্চনা ক'রে পুনর্ব্বার আনতে হবে।

স। মদনিকা, শুনে খুসী হলুম।

ব। যাই, ভিতরে গিয়ে বসি।

(সেইরূপ করিল)

চে। সজ্জনক, এখন এস। কামদেব মন্দিরে আমার জন্য অপেক্ষা করগে'। অবসর বুঝে আমি ঠাকরুণকে জানাব।

স। আচ্ছা। (নিষ্ক্রান্ত হইল)

[অপর চেটী প্রবেশ করিল]

চে। ঠাকরুণ সুখী হোন্। বণিকপুত্রের কাছ থেকে এই একজন ব্রাহ্মণ ঠাকরুণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

ব। (সাদরে) যাও, শীঘ্র এঁকে আন।

চে। যে আজ্ঞে (গিয়া) আসুন ঠাকুর, আসুন।

[বিদূষকের প্রবেশ]

বি। (চারিদিক দেখিয়া) বাঃ. গণিকার বাড়ী কি সুন্দর। নানাস্থান হ'তে আগত পণ্ডিতেরা পুস্তক পড়ছে। নানারকম আহার প্রস্তুত হচ্ছে। বীণা বাজছে। সুবর্ণকারেরা আদরের সহিত অলঙ্কার গড়ছে।

চে। এই যে ঠাকরুণ। ঠাকুর এগিয়ে যান।

বি। (অগ্রসর হইয়া) তোমার কল্যাণ হোক্।

ব। (দাঁড়াইয়া) স্বাগত আর্য্য! ওলো, আর্য্যকে আসন দে, পা ধোবার জল আন।

বি। (স্বগত সব হুকুম হচ্ছে—শুধু খাবারটি বাদ।

চে। যে আজ্ঞে ঠাকরুণ। (আসন ও পাদোদক দিল) ঠাকুর, বসুন।

বি। (বসিয়া) তুমিও আসন গ্রহণ কর। আমি কিছু বলতে এসেছি।

ব। (বসিয়া) আমি অবহিত হলুম।

বি। সেই অলঙ্কারের মূল্য কত ?

ব। আর্য্য সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন ?

বি। শোন। সেই চারুদত্তের গুণের প্রতি বিশ্বাস করে তুমি তাঁর কাছে অলঙ্কার গচ্ছিত রেখেছিলে। তিনি তা জুয়া খেলায় হারিয়েছেন।

ব। জুয়া খেলায় ? উপযুক্ত বটে। তার পর ? তার পর ?

বি। তার পর সেই অলঙ্কারের মূল্যস্বরূপ এই মুক্তার মালা নাও।

ব। (স্বগত) গণিকার দশাকে ধিক্। আমাকে মূঢ় মনে কর্‌ছেন। যদি না নিই, তাও দোষ হবে। (প্রকাশ্যে) আর্য্য, আসুন।

বি। এই নাও।

ব। (লইয়া) আর্য্য, জানাবেন "সে নিয়েছে" ?

বি। (স্বগত) কোন কথাও বল্‌লে না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা। [দিয়া চলিয়া গেল]

ব। সাধু, চারুদত্ত, সাধু ! অদৃষ্টের পরিবর্ত্তিত দশার অবসান হ'তে নিজেকে রক্ষা কর্‌লে।

মদনিকা। (প্রবেশ করিয়া) ঠাকরুণ, বণিকপুত্রের কাছ থেকে একজন লোক এসেছে, ঠাকরুণের সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।

ব। একে কি আগে কখনও দেখেছি ? না নূতন লোক ?

ম। না ঠাকরুণ। তাঁর লোক বলেই মনে হচ্ছে।

ব। যাও, নিয়ে এস।

ম। যে আজ্ঞে

(নিষ্ক্রান্ত হইল)

ব। আহা, আজকের দিনটি কি রমণীয়।

[সজ্জনকের সহিত মদনিকা প্রবেশ করিল]

স। নিজের আশঙ্কা অতি কষ্টকর।

যে কেহ চকিতগতি নেহারে আমায়।
দাঁড়ায় সন্ত্রাস-ধ'রে, ত্রস্ত পিছে যায়,
দোষী মন এ সবার অন্ত ভাবি লয়,
নিজদোষে মানবেরা শঙ্কিত হয়॥
এই যে ঠাকরুণ। আর্য্য, এগিয়ে যান।

স। (অগ্রসর হইয়া) আপনার সুখ হউক।

ব। আর্য্য, স্বাগত ! ওলো, আর্য্যকে আসন দে'।

স। থাক্, থাক্। আমি বলেছি। শীঘ্র করতে হবে এমন একটি কাজ আছে।

ব। তাই নাকি ? বলুন।

স। আর্য্য চারুদত্ত আমায় পাঠিয়েছেন।

"যে অলঙ্কার আমার হাতে দিয়ে গেছেন, তা ব্যবহার না হওয়াতে মলিন হয়ে যাচ্ছে, আর গৃহে এখন কুটুম্ব পুরুষের অভাবে ইহা রক্ষা করাও কঠিন। সুতরাং ফিরে নিন্।"

(মুক্তার মালা দিতে দিতা)

স। আর্য্য, এইটে চারুদত্তকে দেবেন।

স। আমি যাব না।

ব। আমি জানি, তার বাড়ী থেকে চুরি করে আপনি এই অলঙ্কার এনেছেন। তাঁর গুণের প্রতি দয়া করুন।

স। (স্বগত) কি ! আমায় চিনেছে !

ব। কে আছ ? আর্য্যের জন্য শকট আন।

ম। চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় গাড়ী এল।

ব। (নিজের অলঙ্কার দ্বারা মদনিকাকে সাজাইয়া) আর্য্য আর্য্যার সঙ্গে শকটে আরোহণ করুন।

ম। ঠাকরুণ, একি ?

ব। না, না। এ রকম বোলো না। এখন তুমি 'আর্য্যাই' হ'লে। আর্য্য, গ্রহণ করুন। (মদনিকাকে লইয়া সজ্জনককে সমর্পণ করিল।)

স। (স্বগত) ওঃ কবে এঁর প্রত্যুপকার করতে পারব ? আ, না—বালাই, বালাই।

বিপদ না হ'লে কভু কৃতার্থ না হয়,
প্রত্যুপকারের আশা হৃদয়ে যাহার,
মম শত্রুদের হোক্ সেই কালোদয়
অথবা যে এঁর শত্রু হউক তাহার॥

[সজ্জনক মদনিকার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইল]

ব। চতুরিকা !

[চতুরিকাপ্রবেশ করিল]

ঠাকরুণ, এই যে আমি।

ব। ওলো দেখ্, কেমন কেমন আমি স্বপ্ন দেখছি। এই রকম।

চ। এ আমার প্রিয়। ঐ যে অমৃতাহ্বনাটক হয়েছে।

ব। আয়, এই অলঙ্কার নিয়ে আর্য্যা চারুদত্তের অভিসারে যাই।

চ। যে আজ্ঞে, ঠাকরুণ। এই যে আমার অভিসারিকাদের সহায় চর্দ্দিনও উপস্থিত হয়েছে।

ব। হতভাগী তোর ভাল হবে না।

চ। আসুন ঠাকরুণ, আসুন।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।]

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

চারুদত্ত সম্পূর্ণ। *

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল

---

* শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া যে মূল চারুদত্ত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা দুইখানি পুঁথি হইতে সঙ্কলিত। ভূমিকায় সম্পাদক বলিয়াছেন, তালপত্রে লিখিত এই দুইখানি পুঁথি ভিন্ন চারুদত্ত সংস্করণের পুরাতন। একখানি দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরে পদ্মনাভপুরের নিকট বলিকর-মঠে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আর একখানি কোট্টায়মের নিকটবর্ত্তী মানগানমের নীলকণ্ঠন্ চাক্কিয়ার মহাশয়ের সম্পত্তি। প্রথম পুঁথির শেষে 'চারুদত্ত সম্পূর্ণ' ("চারুদত্তমবসিতম্") এই লেখা আছে। দ্বিতীয় খানিতে তাহা নাই। আমাদের বিবেচনায়, নাট্যশেষে ভরতবাক্য না থাকাতে ও নাটকোক্ত ঘটনা সমাপ্তি না হওয়াতে এইস্থলে যে নাটকটি শেষ হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। অবশিষ্ট অংশ বিলুপ্ত হওয়ায়, লিপিকারক ঐখানেই 'চারুদত্ত সম্পূর্ণ' লিখিয়া রাখিয়া থাকিবেন। দ্বিতীয় পুঁথিতে এ লেখা না থাকায় আমাদের এ অনুমান সমর্থিত হইতেছে। আভ্যন্তরিক প্রমাণও এখানে নাট্য সমাপ্তির বিরুদ্ধে। 'মৃচ্ছকটিকে'র সহিত 'চারুদত্তে'র অসাধারণ সাদৃশ্য পাঠক লক্ষ্য করিবেন। বিস্তৃত প্রবন্ধে ইহার বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অনুবাদক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ

দেশের জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী দেশের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মানবধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনে এক অভিনব আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিবে, ইহাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য দেশের তথাকথিত উৎপত্তিমূলক এবং তুলনামূলক জ্ঞানচর্চ্চায় এসিয়াবাসীর সমাজ-জীবনের ধারা ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। ইংলণ্ডের পূর্ব্বকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংযত অনুকরণের ফলে আমাদের দেশের ছাত্রগণ ও অধ্যাপকগণ তদ্দেশীয় সমাজ, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধীয় সেই তথ্যগুলি "বিজ্ঞানসম্মত", সার্ব্বজনীন ও সর্ব্ব যুগের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান এবং আমাদের দেশে তাহার অনুকরণে গঠিত যে সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা হইতে কোন সার্ব্বভৌমিক চরম তথ্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে—তাহা হইতে কেবল কতকগুলি আংশিক সত্য ও নিতান্ত অসম্পূর্ণ বা একদেশদর্শী তথ্যই পাওয়া যায় মাত্র। কেননা, পাশ্চাত্য জগতের সেই সব বিজ্ঞানগুলি সমগ্র মানবজীবনের অসম্পূর্ণ পরীক্ষা ও আংশিক পরিচয় ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গঠিত। ভারতবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র জগতের সমাজ, ব্যবসায় ও শিল্পের ক্রমোন্নতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমাজ-জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া ইতিহাসে ভারতের আদর্শ ও অনুষ্ঠানের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে তৎপর হইবে। কেবলমাত্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সমাজ-জীবনের ধারা ও অবস্থাদির তুলনা করিয়া যে অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্য তথাগুলি আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলির সংশোধন ও ব্যাপক বিধানের একমাত্র উপায় আরোহ-পদ্ধতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার সমাজ-জীবনের অনুষ্ঠান ও আদর্শগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহাদিগকে উৎপত্তিমূলক ও তুলনামূলক বিচারের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লওয়া। ইহার ফলে মানবধর্ম্ম, সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, তাহা সার্ব্বভৌমিক হইবে, তাহা যে কেবলমাত্র কোন একটী বিশেষ সমাজ বা সভ্যতার পক্ষেই সত্য ও জীবন্ত হইবে, তাহা নহে। তাহা সর্ব্বসভ্যতার ও সর্ব্বযুগে প্রযোজ্য হইবে, পরে এই সকল সার্ব্বভৌমিক তথ্য হইতে কোন একটী বিশেষ সমাজের বা দেশের পক্ষে প্রযোজ্য তথ্য অবরোহ-প্রণালী অবলম্বনে সহজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

তখন মানবধর্ম্ম ও সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন সভ্যতার আদর্শের ও ক্রমবিকাশের বৈচিত্র্যের অনুযায়ী হইয়া সত্য সত্যই তাহাদের উন্নতির পথ ইঙ্গিত করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্বন্ধে মেকলে সাহেব যে সকল নিতান্ত ভ্রম সঙ্কুল একদেশদর্শী মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের অনুযায়ী আদর্শে এখনও যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করা আবশ্যক। তাহা না হইলে বিশ্বজনীনে পূর্ব্ব কথিত সার্ব্বজনীন তথ্যসমূহের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। পরন্তু মেকলে সাহেবের মতের পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে পারিলে এসিয়াবাসী ও তাহাদের শিল্পকলা, সামাজিক আদর্শ-অনুষ্ঠান প্রভৃতি যে এতদিন মানববিজ্ঞানের উপেক্ষা পাইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতিবিধান হইবে এবং পাশ্চাত্য মানবসমাজবিজ্ঞান যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নীরস বস্তুতন্ত্রহীন 'abstraction'এ পরিণত হইয়াছে ও ভারতের জীবনধারার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াছে, তাহারও প্রতিবিধান হইবে। ইহার ফলে ভারতসভ্যতার অন্তর্নিহিত ঐক্যবিধান ও গঠনশক্তি

পাশ্চাত্য জগতে অবশ্যম্ভাবী নব্য সমাজতন্ত্রগঠনের সহায়তা করিবে। যুদ্ধের পর এবং মধ্যেই যে পাশ্চাত্য সমাজের আমূল পরিবর্তন দেখা যাইবে, অথবা যাইতেছে, সেই পরিবর্তনবিধানে যদি ভারতের আদর্শ কিছু সহায়তা দান না করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতের সভ্যতা ব্যর্থ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুভার

কিন্তু ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যানুশীলনকার্যের অংশ মাত্র। আমাদের জাতির পথপ্রদর্শক ও ভবিষ্যৎ গঠনকারী বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনের সকল সমস্যার প্রতিবিধান করিবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসকারী শক্তি হইতে সমাজকে রক্ষাকল্পে দেশে আদর্শ গ্রাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবার প্রভৃতি সুগঠনের জন্য যথাসাধ্য উপায়নিরূপণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিবে। দেশবাসীর শারীরিক অবনতি, তাহাদের কর্মাভাব, মধ্যবিত্তদের মধ্যে অসন্তোষের হ্রাস প্রাপ্তি, কৃষির অধঃপতন, শিল্প-কলা প্রভৃতির দুরবস্থা, অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় গ্রাম ও রোগাক্রান্ত নগর, গ্রামবাসীদিগের আর্থিক অসচ্ছলতা ইত্যাদির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিতব্য বিষয় ও জীবনের কর্মরাশির মধ্যে আধুনিক যুগে যে একটা বিরাট ব্যবধান থাকিয়া যাইতেছে তাহার উপলব্ধি হইবে। বিদ্যার্থিগণ যাহা শিক্ষা করে, তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারে না। বিদ্যার শিক্ষণীয় বিষয় ও জীবনের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাহা নিরাকরণ করিবে এবং অর্জিত বিদ্যা যাহাতে জাতীয় জীবনযাত্রার কার্যে পরিণত হয়, তাহার উপায় করিয়া শিক্ষার সার্থকতাসম্পাদন করিবে।

জাতীয় শিক্ষা ভারতের জীবনধারার এবং সার্থকতার সম্যক প্রতিষ্ঠা করিবেন ভারতের দুরূহ সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার ও সাধনার সম্মীলনপূর্বক আমাদের দেশের সনাতন সভ্যতাকে সজীব করিয়া তুলিবে। দেড়শত বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষাদান করিয়াছে, তাহা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এবং তাহা ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি নিতান্ত উদাসীন। ভবিষ্যতে যে শিক্ষা দান করা হইবে, তাহা দেশের, সমাজের ও জাতির জন্য হওয়া উচিত এবং তাহার কর্তব্য সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতিসাধনের উপায় নির্ধারণ। এখন হইতে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ, জাতি ও সভ্যতার কল্যাণকল্পে নিজের শিক্ষাপ্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করুক।

সম্পাদক

সাময়িক কাব্য সমালোচনা

সান্ধ্যাকুল—বৈশাখী। নারায়ণ-সম্পাদক কবি। কিন্তু নারায়ণে কবিতার আদর নাই—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। ২।৩টী সাধারণ কবিতা মাঝে মাঝে বাহির হয়। সম্পাদকের কবিতাও পত্রিকায় দেখিতে পাইনা। গীতিকাব্য সম্বন্ধে নারায়ণ-সম্পাদকের প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় এযুগে তিনি প্রকৃত কবিতা দেখিতে পান না। পরানুবাদ পরানুকরণের যুগে গীতিকাব্যেও পাশ্চাত্য অনুকরণ খুবই হইয়াছে। এ জগতে যুগধর্ম্মের অনুশাসক সকলি। স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণও যুগধর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই জগতে আবির্ভূত হন। কাব্য-সাহিত্যেও যুগধর্ম্মের প্রভাব বাড়িবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। বর্ত্তমান যুগের কবিরা বর্ত্তমান যুগের অনুসরণ করিয়াই লিখিয়াই থাকেন। কবিদের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক কবিরা তাহাই প্রতিপালন করিতেছেন। তাঁহার 'সাগরসঙ্গীত' ও 'মালঞ্চ' বর্ত্তমানযুগের কাব্যধারার অনুযায়ী। কিন্তু তিনি কাব্যসম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে মনে হয় তাঁহার কবিচিত্ত যুগাতীত ভাবে চিন্তা করিয়া থাকে। কাব্য-সাহিত্যের যে যুগ অতীত হইয়াছে তাহাকে কি আর ফিরাইয়া আনা যাইবে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংসর্গে ও সংঘর্ষে দেশের সবই রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে এবং রূপান্তর গ্রহণের অপরাধে কিছুই বর্জ্জন করিতেছেন না—বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যকেই বা তবে কেন তিনি বর্জ্জন করিতেছেন? সাহিত্যের ধারা জাতীয় জীবনেরই ধারা। জাতীয় জীবন ধারার প্রবাহে ব্যক্তিবিশেষের হাত নাই—যদি ব্যক্তি-বিশেষকে ঐ ধারার পরিবর্ত্তনকারী বলিয়া মনেও হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে ঐ ব্যক্তিবিশেষেরও নিজের উপর প্রভুত্ব নাই, ঐ ব্যক্তিবিশেষও জাতীয় জীবনেরই বহুদিনের আয়োজনের ও সাধনারই ফল। আর যে ব্যক্তিবিশেষ সাহিত্যের জীবনধারার প্রবাহপথের পরিবর্ত্তনের উপলক্ষ-স্বরূপ সে শুধু বিচারক ও সমালোচক ভাবেই বা নিজে প্রথা রীতি বা কতকগুলি dogma প্রবর্ত্তন করিয়া বা ব্যাখ্যা করিয়াই যুগান্তর আনিতে পারে না—তাহাকে খুব বড় সাধক বা কর্ম্মী হইতে হইবে—কাব্যের যুগান্তর প্রবর্ত্তন হিসাবে তাহাকে একজন যুগোচ্ছল মহাকবি হইতে হইবে। একজন মহাকবির দ্বারাই কাব্য-জগতে যুগান্তর আসিতে পারে। জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক গতি ও বিকাশের নিয়মানুসারেই বঙ্গসাহিত্যে একজন মহাকবির (যিনি জাতীয় জীবনেরই বহুদিনব্যাপী নিগূঢ় সাধনার মূর্ত্তিমান ফলস্বরূপ) দ্বারা যুগান্তর আসিয়াছে—এই নবযুগকে বরণ করিয়া লইতে আমরা বাধ্য। শুধু হিমাদ্রি হইতে জন্মলাভ করিয়াছে এবং সোমুখীর মধ্য দিয়া নির্গত হইতেছে বলিয়াই ঐ স্রোতকে জাহ্নবী-ধারা মনে করিয়া আমরা মস্তক নত করিতেছি না—বঙ্গবাসীর চিত্তকে প্লাবিত করিয়া স্বর্গীয়তা, পবিত্রতা স্নিগ্ধতা ইত্যাদি শুভ-সম্পদে আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে মুগ্ধ করিয়াছে বলিয়াই ঐ ধারা বন্দনীয়। এখন যদি এইযুগের পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে উহা একজন মহাকবির দ্বারাই সম্ভব হইবে—কোন বক্তা সমালোচক—বিচারক বা সম্পাদকের দ্বারা নহে। অভিনব সুস্থ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা যদি দেশে জাগ্রৎ হয়—তবে তাহাও জাতীয় জীবনসত্তির স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই জন্মিবে বা জন্মিতেছে—চিত্তরঞ্জনবাবুর ন্যায় সাহিত্যরথীর মনে যদি ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রৎ হইয়া থাকে তবে উহা হয়ত যুগধর্ম্মের নিয়মানুসারেই জন্মিতেছে এবং এই আকাঙ্ক্ষা যদি বঙ্গসাহিত্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়, তবে জানিব নূতন যুগের উষার আর বেশী দেরী নাই। সে আকাঙ্ক্ষা দেশমধ্যেও জাগ্রৎ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, এমন একটা নূতন কাব্য শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করিবে যাহা পাশ্চাত্য অনুকরণের মোহ জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া, অতীতের সকল ভাবসম্পদকে বরণ করিয়া তাহাকে আরো

পরীক্ষান করিয়া নূতন যুগধর্ম্মের নির্দ্দেশ ও নূতন যুগ গঠনের সহায়তা করিবে।

চিত্তরঞ্জনবাবু যদি কাব্য-জগতের যুগান্তর প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নবযুগপ্রভাতের রবির না হোক্—অন্ততঃ শুকতারার কাজ করিয়া যাইতে হইবে। তিনি নিজে একজন প্রতিভাবান্ কবি বলিয়াই এই কথা বলিতেছি—শুধু সমালোচক হইলে বলিতাম না—কারণ দেশ যে কাব্য হিসাবে যুগান্তর প্রার্থনা করে, এ কথা কবিরই বলিবার অধিকার আছে।

তবে এ কথা চিত্তরঞ্জনবাবুর মনে রাখা উচিত—জীবনের গতি ও পুষ্টি বর্ত্তমানকে বর্জ্জন করিয়া নহে—তাহাকে গ্রহণ করিয়া—শুধু গ্রহণ করিয়া নহে—তাহাকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া। নবযুগ যাহা ভবিষ্যতের গর্ভে তাহা বর্ত্তমানেরই প্রসব। চিত্তরঞ্জনবাবু যদি যুগান্তরের জন্য সাধনা করেন তাহা হইলে বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্য তাঁহাকে বর্জ্জন করিলে চলিবে না—তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। যুগান্তর অর্থে রূপান্তর ছাড়া অন্য কিছুই নহে—রূপান্তরে একের স্থলে অসম্পূর্ণ একটী অপরিচিত অভিনবত্বের আগমন ঘটে না মূল উপাদান বেশীর ভাগ থাকিয়াই যায়। বঙ্গসাহিত্যের যাহা অবশ্যম্ভাবী অদূর ভবিষ্যৎ তাহার সহিত ৪০০ বৎসরের আগেকার কাব্যসাহিত্যের সাদৃশ্যের অভাব ঘটিবেই কিন্তু বর্ত্তমান কাব্যসাহিত্যের সহিত বৈষম্য তাহার খুব বেশী থাকিবে না। জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যদি চিত্তরঞ্জন বাবু এ বিষয়ে চিন্তা করেন, তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই—নতুবা তাঁহার চিন্তাপ্রণালীকে ও প্রয়াসকে আমরা অস্বাভাবিক বিদ্রোহ বলিব। চণ্ডীদাসের যুগ এখন সেভাবে আর ফিরিতে পারে না। কাব্যের বর্ত্তমান যুগ হইতে তাহা যে কত দূরে তাহা কে বলিতে পারে? তবে নিকটে যে নহে তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া সসাহসেই বলা যাইতে পারে। মানবজীবনে পুনর্জ্জন্ম লাভ না করিলে বিগতশৈশব আর ফিরে না—পৃথিবীরও পুনর্জ্জন্ম না হলে—আর সত্যযুগ ঠিক ফিরিয়া আসিতে পারে না। মানুষ বৃদ্ধ হইলে তাহার Second childishness ফিরিয়া আসে—Meri oblivion Sans teeth, Sans eyes, sans taste, sans everything এ সকল বিষয়ে শৈশবের সহিত মিলে বটে কিন্তু কিছুতেই তাহাকে শৈশব প্রত্যাগত বলা যায় না। শুনিয়াছি চ্যবনমুনি চ্যবনপ্রাশ সেবন করিয়া পুনরায় যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। মহারাজ যযাতি পুত্রের যৌবন গ্রহণ করিয়া পুনরায় তরুণ হয়েছিলেন কিন্তু জাতীয় জীবনের পুনর্যৌবন লাভের কথা বৈদ্যকশাস্ত্রেও নাই মহাভারতেও নাই।

শৈশব ফিরিবে না বলিয়া যৌবনকে উপভোগ, যৌবন ফিরিবে না বলিয়া প্রৌঢ়ত্বের কর্ত্তব্য সম্পাদন না করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। যুবক চেষ্টা করিলে যৌবনের সদ্ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্যময় নৈষ্কর্ম্ম্য প্রৌঢ়ত্বের অধিকারী হইতে পারেন, প্রৌঢ় চেষ্টা করিলে প্রৌঢ়ত্বের সদ্ব্যবহার করিয়া বার্দ্ধক্যে বার্দ্ধক্য অর্জ্জন করিতে পারেন—কিন্তু কেহই চেষ্টা করিয়া মধুময়-শৈশব ফিরিয়া পাইতে পারেন না।

অতীত যুগের সাহিত্য বিচারকালে আমরা সাধারণতঃ তৎ তৎ যুগের যুগধর্ম্ম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথাও চিন্তা করি—তাহা না করিলে অনেক সাহিত্যই লুপ্ত হইয়া যাইত। যুগধর্ম্মের সহিত মিলাইয়া বিচার করি বলিয়াই অনেক প্রাচীন সাহিত্য আমরা উপভোগ করিয়া থাকি। মহাকালের যুগোত্তর নিরপেক্ষ নির্ব্বিকার ও স্বাধীনবিচারে অনেক জিনিসই লুপ্ত হইত, যদি আমরা কালের সহিত লড়াই করিয়া যুগধর্ম্মানুযায়ী সুবিচারের দ্বারা তাহা রক্ষা না করিতাম। অতীত যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে যে সুবিবেচিত বিচার করা হয়—বর্ত্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক সাহিত্য রসিকেরা সে বিবেচনা করেন না—অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগধর্ম্মটিকে চিনিয়া লইয়া তাহার সহিত মিলাইয়া বিচার করেন না। সকল যুগেই বর্ত্তমান সাহিত্যসম্বন্ধে এই প্রকার বিবেচনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ঐ বর্ত্তমান সাহিত্য যখন প্রাচীন হইয়া উঠে তখন আবার সুবিচার প্রাপ্ত হয়। এমন কি প্রথম যৌবনে অতীত সাহিত্য বার্দ্ধক্যে একই লোকের জীবনে পুনর্ব্বিচারিত হয় এবং তাহা প্রাচীনতার গৌরবে এবং যুগধর্ম্মের প্রভাবের

কথা পাঠকের মনে জাগরিত করিয়া প্রশংসা লাভ করে। বর্ত্তমান সাহিত্যকে আমরা যদি বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সহিত মিলাইয়া পড়ি তাহা হইলে বর্ত্তমান সাহিত্যকে কেবলমাত্র একটা বিজাতীয় উপদ্রব বলিয়া মনে হইবে না। বর্ত্তমান যুগকে অতীত যুগের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এ কথা মনে রাখিলে বর্ত্তমান-সাহিত্যকে শুধু একটা আকস্মিক বিদ্রোহ বলিয়া মনে হইবে না।

অতীত যুগের সাহিত্যকে বর্ত্তমানের মাপকাটীতে মাপিলে যেমন তাহার প্রতি অবিচার করা হয়—বর্ত্তমান-সাহিত্যকেও তেমনি অতীত যুগের মাপকাটীতে মাপিলে অবিচার করা হইবে। শ্লেষালঙ্কারের যুগ অতীত হইয়াছে—এখন শ্লেষালঙ্কারের ফল প্রাচুর্য্যকে বা সরস্বতীর দুষ্করচর্য্যা বলিয়া মনে করা হয়। এখনকার মাপকাটীতে শ্লেষের কবি মাঘের বিচার করিলে মাঘের প্রতি অবিচার করা হইবে। পক্ষান্তরে চণ্ডীদাসের যুগের আন্তরিক সরলতার মাপকাটীতে এই সরলতা-জটিল-সভ্যতাবহুল অনুকরণপ্রিয় বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে বর্ত্তমান সাহিত্যের গৌরবের প্রতি উদাসীন থাকিব।

অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি কালের অতীত বিচার লঙ্ঘন করিয়া কালের হাতের ঐ নিরপেক্ষ নির্ব্বিকার মানদণ্ডটী লইয়া ভূতাতীত বিচারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন—কালের পরীক্ষায় কোন কোন সাহিত্য সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছে আর কোন কোন সাহিত্য আমাদের কৃত্রিম চেষ্টায় বাঁচিয়া আছে কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্য মহাকালের ভূতোত্তর বিচারে টিকিবে কিনা তাহা বলিতে হইলে উপরোক্ত বিষয় গুলিতে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

আলোচ্য। ১৩২৩ "নববর্ষ"—সেই বাঙ্গলা বর্ষবরণ—গত সংখ্যায় বর্ষবিদায়ে যে কথা বলিয়াছি "নববর্ষ সম্বন্ধেও সেই কথা।" কবিত্বের নাম গন্ধ নাই—কবিতার পংক্তিগুলি সাজাইবার বাহাদুরী আছে।

"নিদাঘে"—শ্রীযুক্ত রসময় লাহা। কবির যে ঋতুলীলা নামে পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে এই প্রসঙ্গে তাহারও বিজ্ঞাপন হইয়াছে। সে দিন্ এক ঋতুসঙ্গল বাহির হইল আবার ঋতুলীলা। নিদাঘ বর্ণনায় মদনমহোৎসব, ঈশানের রোষ, উষার কঠোর তপস্যা ইত্যাদির উগ্রতার সহিত নিদাঘের উগ্রতার উপমা এখন বাংলা-সাহিত্যে রীতিমত পুরাতন হইয়া গিয়াছে রসময় বাবু বোধ হয় তাহার খোঁজও রাখেন না। অপরিসর্জ্জনে পিনাকেটারের কেন্দ্র দাহে পাণ্ডব দাহন, কাল বৈশাখীতে তাণ্ডব নৃত্য ইত্যাদিতে আর নবীনতা কিছুই নাই।

কবিতাটির মধ্যে নূতন ভাব কিছুই নাই। একমাত্র বরাবাইবটীর কথাটি বেশ সুন্দর রূপে ইহাতে প্রথিত হইয়াছে বলা হয়ার কথাটিও মন্দ নয়।

বর্ষমঙ্গল। শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্তের। বিশেষত্ব বর্জ্জিত মামুলী বরাতী কবিতা। দেবতাও মানব। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কবিতার তৃতীয় Stanza টী মন্দ হয় নাই। 'সাহস'। মল্লিক কবির উপমার মালা

ঋতুগৃহে সোহাগ ঘোরে লাগল গোঁফ তাল,
দুর্ব্বাসা সম্বিধে আহুন দিতেই অভিশাপ,—
কেবল হরি নামের বলে
বৃত্তী আমার বামনা ছলে,
নিবেদন বিষ আমার হয়রে মধুময়।

মল্লিক কবি তাঁহার কবিতাগুলির আরো একটু প্রসাধন করিলে ভাল হয়। তু বৈ ৫ দ্বিরদসংখ্যা কবিতাতে একটু যেন বাড়াবাড়ি। শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ সিংহের "প্রিয়তমে" কোনো বিশেষত্ব নাই।

শরদিন্দু বাবুর "ছেলেমানুষী" মন্দ নয়। তবে "সৃষ্টি বিফলতা" শ্রীবৈদ্যনাথ বাবুর চতুষ্পদী কবিতার কোনো বৈশিষ্ট্য নাই। গোবিন্দলালের—"মেঘছায়া" মন্দ নহে। "বেতনদাস ভাণা"র সার্থকতা কি?

ব্রহ্মবিদ্যা। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। 'রূপের দেহ' কবিতাটির ভাবটী মন্দ নহে। কবি ক্ষুদ্রবয়সের রচনা। কবি দেহের রূপের অনিত্যতা ও রূপের দেহের সনাতনত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। স্থানে স্থানে মাধুর্য্যও আছে।

দুইয় দুই দেহের রূপে চোখের দেখা আঁক করে,
চিহ্ন সেই রূপের দেহে ধ্যানের মকরন্দ ঝরে।

শ্রীকেদারনাথ সরকারের, কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদ একটুও ভাল হইতেছে না। ভাষা ছন্দ সবই দোষযুক্ত। যদি কবিতাপূর্ণ ও মধুর না হয় তাহা হইলে কাব্যানুবাদের প্রয়োজন বা কি?

"আবাহন গীত" একটী গান। শেষ লাইন "হাঁড়িয়ে আছে কানাই ভাই" আমরা গান করি "কাব্যরসের বালাই নাই"। গোবিন্দলাল রচিত—"মাধবের মাধবী লীলাময়ী" শীর্ষক কবিতার নামই সর্ব্বস্ব। কবির ভক্তি থাকিতে পারে শক্তির বড়ই অভাব। 'নববর্ষে' নামক কবিতা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র একটী বাক্যে সমাধা করিয়াছেন।

বক্তব্য বিষয়—
যদি অন্তরের রঞ্জিত রথের চূড়াতে পতাকা তব
প্রত্যক্ষ অক্ষরে ব্যক্ত নাহি করে আশা থাকা অভিনব।

* * *

প্রথম পত্তর এ দ্বিধাংসা ক্রূর যদি নাহি কান্ত হয়
বিশ্বহিতৈষীর সকল সুকৃতি যদি নাহি পায় জয়;
যদি প্রবলের দুষ্ট প্রতাপের নাহি হয় প্রশমন
যদি বিজ্ঞানের এ কুপ্রয়োগের নাহি হয় নিবারণ।
তবে—হরি কি কল নব বরষে?

উদ্ধৃত অংশ হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন কবিতার ভাষা কত ঘট ঘট ও গদ্যাত্মক, নীরস ও কবিত্বশূন্য—এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীযুক্তবরদা রায়চৌধুরী মহোদয় মহাভারতের লীলাতত্ত্ব বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর প্রণীত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থের বঙ্গকাব্যানুবাদ করিতেছেন। কৃষ্ণ কর্ণামৃতের শ্লোকগুলি শ্রবণাভিরাম পদ বিন্যাসে প্রযুক্তরা। অনুবাদে মূলের ছন্দোমাধুর্য্য রক্ষা করা বড়ই কঠিন—অনুবাদক স্থলে স্থলে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, অনেক স্থলেই পারেন নাই।

তাঁহার কৃতিত্বের উদাহরণ স্বরূপ একটী শ্লোক সাধুবাদ সহকারে উদ্ধৃত করিতেছি—

অহি মকর কর নিকর মুহু মুদিত নয়নী
সংসতর সরসিরুহ সদৃশ দৃশি যেবে।
ব্রজযুবতিরতি কলহ বিরচি নিজ লীলা
মদমুদিত বদন শশি মধুরিমণি লীনে॥

অনুবাদ—

নব তপন মণি কিরণ নিকর মৃদু পরশে
সদ্য সতত যোবন ভর বিকশে সদ্য পদ্ম
নবানুরতি চপল গতি তরল তনু সরসে
ঈষৎ ফুটি রয়েছে দুটী নয়ন লীলা পদ্ম।
ব্রজ যুবতি কলহ রতি বিজয় কেলি হরষে
পরম সুখে বিরাজ করে মধুর মুখ চন্দ
যখন সেই সে মুখ শোভা অমিয় ধারা বরষে
তাহাতে ডুবি চিত্ত লোভী গিইবে মকরন্দ।

৫২।৫৩ শ্লোকের অনুবাদও এইরূপ সুন্দর হইয়াছে।

'জীবন' শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের কবিতায় একটু তত্ত্ব কথা ও উপদেশ।

ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগী।

কথক শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্নের "নাস্তিক" কবিতায় ভাবটী মন্দ নহে—প্রকাশ ভঙ্গিতে কবির নাই—একটী লাইন বেশ লাগিয়াছে—

'বুঝাতে না পেরে কাঁদি, তুমি মর হাসি'

"প্রেয়ঃ ও প্রেয়"—শ্রীমোহিনীমোহন বসু সমালোচনার যোগ্য নহে।

"প্রাণ কান্তের পদ প্রান্তে" নামে সঙ্গীতটী গায়কের কণ্ঠে মন্দ শুনাইবে না—গায়কের কণ্ঠে গীত হইলে ভক্তির উদ্রেক করিবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরাধা প্রণীত—'বৈশাখী পূর্ণিমা' কবিতার এক একটী পংক্তি মন্দ হয় নাই - যথা—

"দিয়াছেন তাঁরা যাহিল তাঁদের
তাঁহারি সো দেয়া ভকতি বল"

ব্রহ্মবিদ্যার কবিতার মধ্যে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ব্যাকরণ ভ্রান্তি দৃষ্ট হয়—মনোমুখে, শিরোপরি, প্রেম, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পঞ্চিকারিকা, বৈশাখ—শ্রীভবতারণ গুহ ঠাকুরতা রচিত কাব্য ও কবি প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য—

"কাব্যের প্রথম সৃষ্টি হইল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ব্যথা বা উল্লাসের নীরব পরিস্ফুটন অন্তরে। সুতরাং অন্তরই কাব্যের প্রাণ এবং উহা প্রকাশের যে ভাষা তাহাই হইল কাব্যের দেহ।"

লেখকের প্রবন্ধে অনেকস্থলে সঙ্গতি রক্ষা হয় নাই। প্রবন্ধে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলির অধিকাংশেরই উদ্ধরণের সার্থকতা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ "আমি ভিক্ষারোমাক চলুক তথী" ইত্যাদি ও "তার সীঁথার ধারা সিঁদুর দেখে" ইত্যাদি অংশদ্বয়ের প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধ হইল না। লেখকের হৃদয় আছে—পড়াশুনাও আছে—পরের রচনা উদ্ধরণের লোভ সম্বরণ করিয়া নিজে আরো ভাবিয়া চিন্তিয়া রচনা করিতে পারিলে সুলেখক হইতে পারিবেন।

"পল্লীস্রষ্টা" শ্রীকুমুদরঞ্জনমল্লিক বিরচিত। চাকরীসূত্রে যাহারা পল্লীভূমির পিতৃপিতামহের গৃহ ত্যাগ করিয়া নগরে বাস করিতে বাধ্য হ'ন—অথবা পল্লীবাসের অনুপযুক্ত মনে করিয়া ইচ্ছা করিয়া নগরে বাস করেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পল্লীর কবি এই কবিতা লিখিয়াছেন।

গ্রামের বাড়ীতে ফুলপাচারী লাগাইয়া চাকুরে বাবু পেটের দায়ে নগরে পরের বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করেন আর তাঁহার নিজের বাড়ীতে উই ইঁদুরে—শুধু উই ইঁদুর কেন?—চামচিকা, ছুঁচা, সাপ, ব্যাঙ, তেলাপোকা, বন-বিড়াল, শেয়াল ইত্যাদি অনেক জন্তু পরমানন্দে কেহ বা গর্ত্ত করিয়া, কেহ বা চালে, কেহ বা খোলায় কোলাহল করিয়া বাস করে। নগরের বাসাবাড়ীর পায়রার খোপের মধ্যে কোনোরূপে হাত পা গুটাইয়া আলোক ও বায়ুস্পর্শ-শূন্য হইয়া তাহাদিগকে বাস করিতে হয়—আর গ্রামের বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান খামকরে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ার উপযুক্ত হইয়া উঠে—বাড়ীর যত সব ঘরগুলি ভূতের আড্ডা হইয়া পড়িয়া থাকে।

লক্ষ্মীপূজার আর কি রেখা
পড়বে কভু আলপনা,
জন্মভূমি স্বর্গ সমা
নয় না হয় কল্পনা।

অনেকেই দেশের বাড়ীর মায়া কাটাইয়া বিদেশে বাড়ী করেন যাহাদের সামর্থ্য কুলায় না যা—

সময় যারা বছর পরে
দুদিন আসি যায় চলে
গ্রামের গভীর দুখীর পানে
কজন চাহে তাই বলে'।

দুদিনের জন্য দেশে আসিয়া বাস করিলে কি গ্রাম-বাসিগণের সহিত কোনো স্নেহ ভালবাসা বা সহানুভূতির সম্বন্ধ থাকে? না—অন্তরে অন্তরে প্রতিবেশিদের মিলন সম্ভব হয়?

গ্রামের প্রাণে মিশ্‌তে নারি
নাইক দাবী আর তাতে
সহর ভিতর সহর বাহির
সহর কথাবার্ত্তাতে। ইত্যাদি

যাহারা বিনা প্রয়োজনে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যাহারা পেটের দায়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস করিতে বাধ্য—তাহাদেরই বা দোষ দেই কেন? পল্লীমাতা ত তাহাদের অন্নবস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয়েন—অন্নাহরণের জন্য তাহাদিগকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পল্লীমাতার স্নেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া বিদেশে ছুটিতে হয়। তাহারা দুর্ভাগ্য—তাহাদের প্রতি কবির সহানুভূতি থাকা উচিত। যাঁহারা ধনবৃদ্ধি বা জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বিদেশ গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ইচ্ছা করিয়া পল্লীজননীকে ভুলিয়াছেন—ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা। ধনী হইয়া যাঁহারা বিলাস লালসার মোহে জন্মভূমিকে ভুলিয়াছেন বা বিদ্বান্ হইয়া যাঁহারা পল্লী-অজ্ঞানান্ধকারময় বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহারা হৃদয়হীন ও আত্মসর্ব্বস্ব। তাঁহাদিগকে দেশনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যের বা দেশের পরিচালনা করিতে দেখিলে

কবিতাটী রূপক। যে অসীমের আহ্বান, যে অচিন্ দেশের বাঁশীর ডাক যে অজানার প্রেমের কথা রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় ফুটে উঠে, ইহাতেও তাহারি কথা। কবি কল্পলোকে কাহারও সহিত যেন তার মিলন হইল—আজ সে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তার কাছ হইতে দূরে সংসারের পিঞ্জরে দেহের গণ্ডীর মধ্যে বাস করিতেছে—কিন্তু মনের গুপ্ত গুহার মধ্যে কল্পলোকের স্মৃতিটি যেন সুপ্ত হইয়া আছে—কিন্তু যখন—

ফাল্গুন মাসে ফাগুন পাগল হাওয়া
দিগন্তে উঠি আকাশ বেয়ে কোন প্রেমিকের
রঙীন চিঠি পাওয়া
পাতার ফুলে-ফলের স্বপন ছন্দে ভরু
পাতায় পাতায় মনে প্রাণে লাগলো কাঁপন সুরু সুরু

তখন "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্"—তার চিত্ত পূর্ব্বস্মৃতি হইয়া উঠিল। তখন—

বুকে যে তার বাজলো বাঁশী
বহু যুগের ফাগুন দিনের সুরে
কোথায় অনেক দূরে—
রয়েছে তার আপন চেয়ে আরো আপন জন
তারেই অন্বেষণ
জন্ম হতে আছে যেন মর্ম্মে তারি লেগে
আছে যেন ছুটে চলার বেগে
আছে যেন চল চপল চোখের কোণে জেগে।"

পল্লীসেবার ব্যবস্থাপত্র

দেশের গ্রামগুলির অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। গ্রামবাসিরা রোগে ও অন্নকষ্টে ক্রমশঃ শীর্ণ ও হীনবল হইয়া পড়িতেছে। কৃষির অবনতি হইয়াছে, শিল্পসমৃদ্ধও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এমন কি গ্রামবাসিগণের ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধেও অবনতি দেখা যাইতেছে।

পল্লীগ্রামের এইরূপ অবনতির জন্য আমরা ক্রমশঃ হীনহীন হইয়া পড়িতেছি।

বাস্তবিক পল্লীজীবনের উন্নতিসাধন আমাদের জাতীয়-উন্নতির একমাত্র উপায়।

এইরূপ উন্নতির জন্য সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক। দরিদ্র ও দুর্ব্বল কৃষক, শিল্পী ও শ্রমজীবী একত্র হইয়া কাজ না করিলে সফলতা লাভ করিতে পারিবে না

আমাদের দেশের পল্লীবাসিগণের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সহানুভূতির অভাব নাই। সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার প্রণালীও দেখা যায়। যাহাতে কার্য্য করিবার এই প্রণালী পল্লী-সমাজের সকল অনুষ্ঠানেই সম্যক্ ও সুচারুরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উপযুক্ত উপায় বিধান করিতে হইবে। এই মূল সূত্র মনে রাখিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

(ক) কৃষিবিষয়ক।

একে একে স্বতন্ত্রভাবে মহাজনের নিকট অধিক সুদে কর্জ্জ না লইয়া গ্রামের সকল কৃষক মিলিত হইবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্জ্জের দায়িত্ব লইয়া যৌথ-ঋণদান-মণ্ডলী গঠন করিতে হইবে, এই উপায়ে তাহারা অল্প সুদেই মহাজনের নিকট কর্জ্জ পাইবে; সকল কৃষকগণের অর্থ-সাহায্যে পাইকারী দরে শস্যের বীজ, সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা, এবং গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতিসাধন, চিকিৎসা ও দুগ্ধ সরবরাহ বৎস-সম্পাদনের উপায় বিধান করিতে হইবে; সাধারণ গোশালা স্থাপন করিয়া গোপ-গণকে সমভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধের বিশুদ্ধিরক্ষা এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতে হইবে।

(খ) শিল্পবিষয়ক

শিল্পিগণ, ব্যক্তিগতভাবে পাইকারদিগের নিকট যাচন না লইয়া মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করিবে, এবং পরস্পরের কর্জ্জের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অল্প সুদে মহাজনের নিকট কর্জ্জ লইবার ব্যবস্থা করিবে; পরস্পরের অর্থ সহায়তায় তাহারা অধিক মূল্যের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও দ্রব্যপ্রস্তুত-করণের উপকরণ সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

(গ) বাণিজ্যবিষয়ক

কৃষকগণ ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারী ও পাইকারগণের নিকট শস্যাদি বিক্রয় করিয়া আপনাদের ন্যায্য লাভ হইতে প্রায়ই বঞ্চিত হয়, ইহার প্রতিকারস্বরূপ সকলে মিলিয়া পাইকারী দরে সমবেতপ্রণালীতে শস্যবিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; শস্যের অবাধ রপ্তানি সঙ্কুচিত করিতে হইবে; খাদ্য-শস্যের বিনিময়ে বাণিজ্যোপযোগী শস্যের আবাদ হ্রাস করিতে হইবে; সাধারণ শস্য গোলাস্থাপন করিয়া শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; সাধারণ ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া পল্লীবাসিগণের নিত্য আবশ্যক দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে সুবিধাদরে ক্রয় করিয়া আনিয়া লাভ না করিয়া পাইকারী-দরেই পল্লীগ্রামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; পল্লীগ্রাম-জাত শিল্পদ্রব্যাদি ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কগণকর্ত্তৃক বিদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাবৎকাল বিক্রয় না হয়, তাবৎকাল শিল্পিগণকে আহার্য্য ও বস্ত্র কর্জ্জ দিতে হইবে; মেলা ও হাটে গ্রাম্য কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার-বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) শিক্ষাবিষয়ক

গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ব্যবহারিক বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে ; প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে আপনার দৈনিক হিসাব লিখিতে এবং সংবাদপত্র পাঠ করিতে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য্য-প্রণালীসম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে ; কারখানায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কার্য্যপ্রণালী প্রচার করিতে হইবে। ব্যয়সাপেক্ষ কৃষিযন্ত্র, সার ইত্যাদি অথবা শিল্পকার্য্যের যন্ত্রপাতী এবং উপকরণ-দ্রব্যসামগ্রী সমবেতভাবে ক্রয় করিবার সুযোগ বিধান করিতে হইবে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি লোকশিক্ষার অমূল্য গ্রন্থগুলির চিত্রশোভিত, সুখপাঠ্য আধুনিক সংস্করণ সমূহ বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে ; স্থানে স্থানে পাঠাগার-স্থাপন করিয়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রদ পুস্তক রাখিয়া জনসমাজে ঐ গুলির প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিকে আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে ; পল্লীগ্রামে ফকীর, ভিক্ষুক এবং বৈরাগীর গান ও ছড়াগুলি যাহাতে নূতন সমাজ এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের উপযোগী হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঙ) স্বাস্থ্যবিষয়ক

পল্লীবাসিগণের সমবেত উদ্যোগ ও উদ্যমে গ্রামের বনজঙ্গল পরিষ্কার; নদী, খাল, পুষ্করিণী ইত্যাদির সংস্কার-সাধন, পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী, কূপাদিখনন ও সেইগুলির বিশুদ্ধতারক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; ম্যালেরিয়া, কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মারিভয়ের সময়ে রোগিচর্য্যা এবং রোগ-প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; দেশের গাছগাছড়া ইত্যাদির গুণাভিজ্ঞ বৈদ্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া সহজ এবং সুলভ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; পল্লীগ্রামবাসিগণের অলস জীবনকে কথঞ্চিৎ সুখী করিবার জন্য পল্লীক্রীড়া, আমোদ, ব্যায়াম প্রভৃতির উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

এই সমস্ত আয়োজন যাহাতে সমগ্র দেশে বিপুল বিস্তৃত হইয়া, আমাদের জাতীয় অবনতি প্রতিরোধ করিতে পারে, তাহার জন্য গ্রামে-গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায়, একনিষ্ঠ কল্যাণকর্ম্মী পল্লীসেবকের প্রয়োজন। পল্লীসেবকগণের ভাবুকতা, উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের উপরেই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এই পল্লী-সেবকগণের কল্যাণকর্ম্মে সুবিধা ও সুযোগ বিধানের জন্য দেশের শিক্ষিত ধনী, এবং জমিদারবর্গকে মুক্তহস্ত ও সদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

উপাসনা

১৪ বর্ষ। } শ্রাবণ—১৩২৫ { ৪র্থ সংখ্যা।

আলোচনী

সাহিত্যে জাতীয় অন্তর্দৃষ্টি

সাহিত্যে নূতন রূপ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টিতে নানা প্রকাশ রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যে ও নানা রূপকের আশ্রয় করিয়াছেন। অভিসার, খেয়া, সোণার তরী, এই রকম কয়েকটি বিশিষ্ট রূপক তাঁহার কাব্যের প্রাণ। ইদানীং অনায়াসে কবিতায় কাহিনী লিখিবার এক নূতন রীতির তিনি সূত্রপাত করিয়াছেন। এই রীতিটী কতদূর সফল হইয়াছে তাহা এখনও বলিবার সময় আসে নাই। আমাদের এসম্বন্ধে বক্তব্য আমরা পরে বলিব; শুধু এই কথাটা বলিয়া রাখি। (ক) সবুজ-পত্রের রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও সাহিত্যের যে খাপকাটি গড়িয়াছিলেন তাহা তিনি একবারেই ছাড়িয়া দিলেন দেখিতেছি। কাব্য শুধু সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিবে—সমাজের ভালমন্দ সৎ অসতের দিকে দৃক্‌পাত করা তাহার নিয়ম নহে—রবীন্দ্রনাথ এসকল কথাই বলিয়া আসিতেছিলেন—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একথার টীকা করিয়া উপাসনার সঙ্গে কত না যুক্তিতর্ক করিয়াছেন। আজ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বরচিত খাপকাটি ত্যাগ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবার সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে মত কি পরিবর্ত্তন করিবেন? রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার এই কৃত্রিম খাপকাটি ত্যাগ করিয়াছেন তাহা ভালই হইল। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের যে নাড়ীর যোগ, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শুধু একটা বস্তুতন্ত্রহীন সৃষ্টিতে আসল রস ফুটে না, সৌন্দর্য্যও ফুটে না। তাই রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে-বাহিরে' ও নূতন ধরণের কাহিনীগুলাতে সমাজের এক একটি সমস্যা রসে ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া সৃষ্ট হইতে দেখি। রবীন্দ্রনাথ

নিজের সৃষ্টিতে যে তাঁহার নিজের বাহিরে গিয়াছেন একথা আমরা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। কিন্তু এই কাহিনীগুলাতে দেখি রবিবাবুকে একবারে পুরোদস্ত ইস্কুল মাষ্টার—সাহিত্যের ইস্কুল মাষ্টারিকে অথচ তিনি বাঁধপ্রতিবাদে কত না বিদ্রূপ করিয়াছেন। সাহিত্য ইস্কুল মাষ্টার বলিয়া সাহিত্যের যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুদায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথ যে এই গুরুদায়িত্ব বরণ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ।

(খ) রবীন্দ্রনাথ যে ভঙ্গীতে কাহিনী লিখিয়াছেন তাহা নূতন হইলেও অত্যন্ত বৈচিত্র্যবিহীন। অনুভূতির বৈচিত্র্য, অথবা মন্দ ও অধিক ঢেউয়ের সঙ্গে ছন্দের গতি কবে বা উঠে নাই—গরুর গাড়ীর মত সমভাবে তাহা চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সবুজ পত্রে প্রকাশিত বলাকা প্রভৃতি কবিতায় কিন্তু এই সমতা লক্ষিত হয় না।

সাহিত্য ও প্রচলিত সমাজ-নীতি

(গ) সবুজপত্রের রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান সমাজ-নীতি রীতির বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। বিলাতের অনেক কবি ঔপন্যাসিকের fashionই হইয়াছে সমাজের রীতি নীতিকে বিদ্রূপ করা এবং এই ফ্যাসানের ঢেউ বাংলা সাহিত্যের জলকে একবারে ঘোলা ও পঙ্কিল করিয়া দিয়াছে। শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় গল্প উপন্যাস-গুলি মাত্রেই আমরা দেখি চলিত নীতি রীতির বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ। শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী, বরাজ-বৌ, চন্দ্রনাথ, চরিত্রহীন প্রভৃতিতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে একটা psychoneurotic মানুষের, স্নায়বিকার গ্রস্ত মনুষ্য জীবনের চিত্র সমুজ্জলভাবে অঙ্কিত করিয়া একই সঙ্গে চলিত সমাজরীতি ও সার্ব্বজনীন নীতিকে অবজ্ঞা করিতেছেন।

শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য

তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক চরিত্র যেগুলি অনন্যভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছে, সে গুলিরই ভিতর দেখি একটা অস্বাভাবিক স্নায়বিক উত্তেজনা, একটা বিসদৃশ ভাব-প্রবণতা, যাহা আমাদের মনকে আপাততঃ উত্তেজিত এমন কি মত্ত করিতে পারে সত্য, কিন্তু পাঠান্তে জীবনের সহজ সরল গতির অবসাদের অবকাশের পর মনে হয় আমরা যেন একটা ঘোর একটা বিকারের মধ্যে পড়িয়া যাহা সহজ, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের তাহা হইতে বিচ্যুত হইলাম। তখন সত্য সত্যই ঘোর ও অবসাদের পর একটা তীব্র বিদ্রোহ জাগে। আর সেই সঙ্গে যে ঝাপসাটিতে আবার গল্প উপন্যাসগুলির বিচার করিতে বসি তাহাই টিকিয়া যায়।

উত্তেজনার মধ্যে লেখকের অপরূপ লিখনভঙ্গী ও সংযম অনুকূলিতে যাহার সঙ্গে সমবেদনায় ও যাহার প্রকৃতিতে হৃদয় বিলাইয়া আনন্দ পাইতেছিলাম তখন মনে হয় সে আনন্দ কতটা ক্ষণিকের, যে ইন্দ্রিয় ভোগ কল্পনা ও সহানুভূতির দ্বারা রূপান্তরিত হইতেছিল তাহা ইন্দ্রিয় ভোগই থাকিয়া যায়। প্রচলিত সমাজ নীতি ও রীতির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ আমাদের মনে জাগিতেছিল তাহা জীবন গঠনের সহায় হয় না—শুধু একটা বিপ্লবের ক্ষোভ ও উত্তেজনা রাখিয়া ক্ষান্ত হয়।

সমাজনীতির বিশিষ্টতা

আমরা প্রচলিত সমাজ-নীতি-রীতি মাত্রেরই জন্য ওকালতী করিতেছি না—আমরা শুধু এই বলিতে চাই সমাজের প্রথা, অনুষ্ঠান ও আদর্শ জাতির ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। ভৌগলিক অথবা প্রাকৃতিক শক্তির বৈচিত্র্য, কোন বিশেষ জাতি বা লোক সমূহের প্রধান ও

প্রবল মানসিক ও চরিত্র বৃত্তি ও মনের গতির বিভিন্নতা, ইতিহাসের বিচিত্র ধারা প্রভৃতির জন্য সমাজের গঠন ও আদর্শ বিচিত্ররূপ ধারণ করে। বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের পর সমাজের গঠন ও রীতি একটা বিশিষ্টরূপ ধারণ করে—আর জাতির চিন্তা ও সাহিত্য সেই বিশিষ্ট রূপকেই আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলে। পরিবার গঠন, সমূহ গঠন, সমাজের বিচিত্র সমূহের সম্বন্ধ নির্ণয়, ব্যক্তির সহিত তাহার সমূহ ও সমাজের, ধর্ম্ম ও আচারের সম্বন্ধ এইরূপে বিশেষ বিশেষ ছাপ গ্রহণ করিয়া বিশ্ব সভ্যতা ও বিশ্ব সাহিত্যের বৈচিত্র্য রক্ষা করিতেছে।

আত্মঘাতী সাহিত্য

বর্ত্তমান যুগে আমাদের সমাজে যে বৃত্তিবিপ্লব ও আদর্শের সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহা যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হইতেছে ইহা সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের পক্ষে সুমঙ্গলের সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিরোধের মধ্যে সমাজের প্রথাকে বিরূপ করিবার জন্য সমাজের যে প্রাথমিক গ্রন্থি সেই পরিবার বন্ধনকে অবজ্ঞা করিবার জন্য যদি সাহিত্য শুধু বিকৃত জীবনের উদ্ভট চিত্র অঙ্কিত করিতে থাকে—তাহা হইলে সাহিত্য জীবনের বিরোধী, জীবনের বিকাশের বিরোধী এবং সে সাহিত্য ভুয়া, অন্তঃসারী। জীবন হইতে সাহিত্যের যে প্রাণরস সঞ্চারিত হয়, সেই জীবন-রস যদি সাহিত্য নষ্ট করে সাহিত্য যে আত্মঘাতী হয়। সমাজ জিনিষটা একটা কারাগার ও ব্যক্তির জীবন একটা অবাধ উচ্ছৃঙ্খল ছুটি ও খেলা নয়। সমাজের ইতিহাসের স্রোতে জঞ্জাল ভাসিতে পারে সত্য কিন্তু জিনিষটা স্রোত,—অনন্ত মানব জীবনের সাগরে পৌঁছাইয়া দিবার প্রবাহ, বদ্ধ সংকীর্ণ কূপ নহে।

ব্যক্তির সহিত সমাজ ও সমাজের প্রত্যেক সমূহের সম্বন্ধ বিচারে, পরিবার, সমূহ, আচার, ধর্ম্ম ও ভগবান সম্বন্ধে বাঙ্গালী পূর্ব্বে যাহা ভাবিয়াছে, সাধন করিয়াছে যাহা বাঙ্গালীর সমাজ-গঠন ও সমাজের আদর্শে প্রতিফলিত—তাহাকে ত্যাগ করিয়া ছুটি লইলে ইতিহাসকে ফাঁকি দেওয়া হয়, নিজেকেও ফাঁকি পড়িতে হয়। বাঙ্গালীর সাহিত্যে বাঙ্গালীর অন্তর্দৃষ্টি চাই। এই বিরোধের দিনে শুধু পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্রোতে আপনাকে একবারে ভাসাইয়া দিয়া সাহিত্য যদি সমাজ ও পারিবার জীবনে শুধু বিপ্লব আনিতেই থাকে, তবে সাহিত্যের কর্ত্তব্য সম্পাদন হয় না। তাছাড়া জীবনের পরম প্রয়োজন, জীবন ও ক্রমাগত দুই কূল ভাঙিয়া চুরিয়া পদ্মার ন্যায় চির-প্রবহমান। কিন্তু পদ্মার মত জীবনের একটা নির্দ্দিষ্টধারা আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ভৌগোলিক বিশিষ্টতার ছাঁদে নিজের বিশিষ্ট মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ও বাহিরের জগৎকে নিজের ছাঁদে গড়িয়া তুলিয়া সে সাগরের দিকে আনন্দ ও মঙ্গলের গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর। জীবনে বিপ্লব আনয়ন নয়, গঠনই সাহিত্যের চরম লক্ষ্য, আর সেই গঠন কখনই ইতিহাসকে বাদ দিয়া হয় না। সমাজের পরিবর্ত্তন চাই, সাহিত্য সেই ক্রমবিকাশ প্রকাশিত করে, আনয়নও করে। কিন্তু এই ক্রমবিকাশ পূর্ব্বকে বাদ দিয়া নহে, আশ্রয় করিয়াই—নূতন ভাব ও নূতন ঘটনাপুঞ্জ আসিলে যে সকল নব উদ্ভাব নব প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় তাহা পুরাতনকে অপসারিত করিয়া সমাজে ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সত্য, কিন্তু তাহা যেন জাতির আত্মার ও তাহার ক্রমিক অভিব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ না করে, বিদ্রোহী না হয়। বরং তাহার সহিত সমন্বয় রাখিয়া তাহার পূর্ণতা ও পরিসর বৃদ্ধি করিতে করিতে চির-অগ্রসর হয়। বাঙ্গালীর সাহিত্য যদি বাঙ্গালীর জীবন

গঠনক্ষম হয় তাহা হইলে পাশ্চাত্যের অন্তর্দৃষ্টি নহে, বাঙালীরই অন্তর্দৃষ্টি তাহার কাজে লাগিবে।

বাঙালীর অন্তর্দৃষ্টি

অসংখ্য বিরোধপূর্ণ মানব জীবনের দুরূহ সমস্যাগুলি সাহিত্যকে প্রণিধান ও পূরণ করিতে হইবে। বাংলার গার্হস্থ্য ও জাতীয় জীবনের দ্বারে বিশ্বজগতের সার্বজনীন সমস্যাগুলি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাংলার লেখকের আজ বাঙালীর সমস্যার আলোচনা করিলে ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, সাহিত্য রচনা করিবার ভয় নাই। ব্যক্তির সহিত সমাজের, নীতির সহিত আচারের সর্বজাতীয় ও চিরন্তন বিরোধের সঙ্গে প্রবজীবি সমস্যা, যৌন সমস্যা, অর্থের ভারতম্য, শিক্ষার নিষ্ফলতা, মনুষ্য তন্ত্রের সহিত ব্যক্তিত্বের, চুক্তির সহিত অনুভূতির বিরোধ প্রভৃতি যে সকল মূল সমস্যা পাশ্চাত্যজগতের সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে সেগুলি আজ বাংলার জাতীয় জীবনেরও উপকরণ হইয়াছে। বাংলার লেখককে আজ এসকল জীবন-সমস্যার আলোচনা করিতে হইবে।

রুশসাহিত্যে যে হঠাৎ এই কয় বৎসরের মধ্যে বিশ্ব-সাহিত্যে এত বরেণ্য হইল তাহার প্রধান কারণ রুশলেখকগণ তাঁহাদের সমাজের বিবিধ সমস্যাগুলিকে বেদনা ক্লিষ্ট হৃদয়ে ও অকৃত্রিম অনুভূতিতে, সরল ও অকৃত্রিম-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি ইউরোপনিবদ্ধ ছিল না, দেশের যুগপরম্পরাসঞ্চিত সাধনার ফলে যে রুশ-দৃষ্টি ফুটিয়াছিল, তাহারি দ্বারা ঐ সকল সমস্যাগুলিকে দেখিতে যাইয়া বিশ্বসমস্যাগুলির প্রণিধানে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। Tolstoi, Dostoivesky, Chekov, Nickoloveich যে বিশ্বসাহিত্যে এত প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার প্রধান কারণ তাঁহারা জাতীয়জীবনের বিরোধ মীমাংসা করিতে যাইয়া মূল-সমস্যাগুলিকে এক নূতন দিক হইতে দেখিয়াছেন।

প্রকৃতি ও ভগবান, ধর্ম ও সমাজ, শিক্ষা ও জীবনসম্বন্ধে বাঙালী যুগের পর যুগ যাহা ভাবিয়া আসিয়াছে, সেই সাধনা, সেই অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এখন বহির্জগৎ ও অন্তর্জীবনের, জাতীয় ও যুগসমস্যাগুলির আলোচনা চাই। জাতির অন্তঃস্থল হইতে না দেখিলে আমাদের মঙ্গল নাই, বিশ্বেরও মঙ্গল নাই।

বিশ্বসাহিত্য বিশ্বসমাজের দেহে একটি সুন্দর আবরণ। এক একটি জাতির ভাবসাধনা ঐ সুন্দর বস্ত্রের এক একটি সূতা বুনিয়াছে। জীবনের যাহা কিছু কুৎসিত ও শ্রীহীন তাহাই ঢাকিবার জন্য সাহিত্য, কিন্তু সাহিত্যের একাজ তখনই সফল হয় যখন প্রত্যেক জাতিই তাহার চিন্তার দ্বারা আপনার দেয় সূতাটি বুনিয়া ঠিক স্থানে গাঁথিয়া রাখে। বিভিন্ন জাতির বিচিত্র সাধনার ফলে ঐ অপরূপ মণিমুক্তা বস্ত্রটি বিশ্বের মনোহরণ করিয়াছে—এবং কোথাও একটি সূতা ছিঁড়িয়া গেলে বা স্থানভ্রষ্ট হইলে অথবা তাহার রং মলিন হইলে সমগ্র বস্ত্রটিরও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। তাই বাংলাসাহিত্যে জাতীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত না হইলে বিশ্বসাহিত্যের অসম্পূর্ণতা ও জাতীয় সাহিত্যেরও ক্ষতি।

বিদেশীর সভ্যতার আঘাতে যে জাতীয় প্রাণ সাড়া পাইয়া জাগিয়াছে তাহা বিদেশী সাহিত্যের ভাব ও প্রকাশের রূপ একবারে ত্যাগ করিয়া নিজের ভাব প্রকাশিত করিবার নূতন নূতন রূপ গড়িয়া তুলুক।

সমাজ একটা বদ্ধ কারাগার ও জীবন একটা ঘোলা আকাশ বাতাসে অবাধছুটি, আদর্শ মানুষটি যে সহজ সরল

জ্ঞান ও কর্ম্মের আনন্দে সকল বন্ধনের বাহির হইয়া সকলের গুরু, সকলকে আপনার মুক্তির গানে মাতাইয়াছে। অচলায়তন, ছুটি ও ঠাকুর্দ্দা এই তিনটি রূপ বর্ত্তমান রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধার। আরও অনেক প্রকাশের রূপ চাই, অনেক form চাই। রবীন্দ্রনাথ সেই একই form বার বার সৃষ্টি করিতেছেন কেন? শারদোৎসব, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুনী ও প্রাবণের প্রবাসীর নূতন গাথাতে সেই একই form ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া দেখা দিয়াছে। আরও নূতন অনেক form চাই!

প্রকাশের formটি এমন হওয়া চাই যে জাতীয়বিশিষ্ট-ভাব তাহাতে সহজে আসিতে পারে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত হইতে পারে। তাহা ছাড়া জীবনের যে সাহসতা, যে তত্ত্ব জীবনকে নূতন করিয়া গঠনের সহায় হয় তাহারও ওজনে সাহিত্য বড় কি ছোট তাহা নির্দ্ধারিত হইবে। একদিকে সাহিত্যের তত্ত্ব জীবনপ্রদ আর একদিকে প্রকাশের রূপ সহজ, অকৃত্রিম ও আনন্দদায়ক হওয়া চাই এই দুইটি মাত্র মাপকাঠি সাহিত্যের বিচারে লাগে।

সম্পাদক

শঙ্কিতা *

রেলের গাড়ী !—
আমরা সবাই যাত্রী নানান দেশের, কেও ভ্রমণে, কেও চলেছি বাড়ী ;
মহিলা এক পাশে বসে বুনেই যাচ্ছে, আমি ভাবছি অনেক কথা, হঠাৎ এল কানে,—
"ছেলেটা মোর যুদ্ধে যাবে, 'ফ্রান্সে' কোথাও মরেই যাবে, কেই বা সঠিক জানে।"
কোথায় যাবে ছিল নাক জানা,
তবু আহা, মায়ের পরাণ থেকে থেকে বুকের মাঝে দিচ্ছিল কি হানা,
যুদ্ধে যাবে, মরে গেলেও যেতে পারে, 'ফ্রান্সেরি' কোনখানে ;
সান্ত্বনা কি ছিল কিছু প্রবোধ দিতে মায়ের অবুঝ প্রাণে ?
অতি করুণ স্বরে
বল্‌লে ক'টি ছোট্ট কথা তাতেই চক্ষু জলে এল ভ'রে।
গাড়ীখানা সমান্ চল্‌ছে, আরী সমান বুনেই যাচ্ছে যেন ভাগ্য গোনা ;
পাশের যাত্রী কথার সঙ্গী তারি সঙ্গে ছিল যেন আগের জানা শোনা
একটী মাত্র কথা !—
মনে হ'ল,—বিশ্বে বুঝি উঠ্‌ল জেগে লক্ষ মায়ের লক্ষ বুকের ব্যথা।
কাঁপ্‌ছে ওরে ঠোঁট দু'খানি চোখ দিয়ে তার বইছে ধারা জল,
দীর্ঘশ্বাসে কাঁপ্‌ছে ধরা, শঙ্কা ভরা হৃদয় দুরবল !
প্রাণটা আমার ধড়াস্ করে উঠে,
সমান ব্যথার আর্ত্তনাদে চরণে তার পড়ল যেন লুটে।
বৃদ্ধা মায়ের হাত দু'খানি বস্ত্র করে আমার হাতে ধরে,
বুঝিয়ে তারে বলেছিলাম, "ছেলে তোমার যাবেই কেন মরে ?
"অমর হয়ে আস্‌তে পারে ফিরে
যুদ্ধ জয়ের বিজয়-মাল্য গলায় পরে, কীর্ত্তি কিরীট শীরে !
যুদ্ধে মরা যেমন সহজ বেঁচে থাকাও তেমনি সত্য ঠিক",
বৃদ্ধা তখন অবাক হ'য়ে রইল চেয়ে আমার পানে নয়ন নির্নিমিখ্।

* ফিলাডেল্‌ফিয়ার "দি কন্‌জারভেটর" (The conservator) নামক পত্রিকায় "Somewhere in France May be dying"এর দ্বারা অবলম্বনে।

সময় তখন অল্প,

নয়ত আরো বুঝিয়ে দিতাম আউড়ে দিয়ে ইতিহাসের দু'টো একটা গল্প !

ফিরে যে ফের আস্‌তে পারে মায়ের কোলে মায়ের বুকের ধন ;

এ সান্ত্বনা মায়ের কাণে লাগল ভাল তুষ্ট যেন হ'ল তখন মন !

একটী আশার বাণী

নিরাশার সেই অন্ধকারে মনের সাথে চুপে চুপে জুড়্‌ল কানাকানি !

আমায় বল্‌লে—"ঠিক বলেছ, বেঁচেও সেত আস্‌তে পারে ফিরে !"

আমার কথার মূল্য স্বরূপ কৃতজ্ঞতার একটা দৃষ্টি মায়ের চোখে উঠ্‌ল ফুটে ধীরে।

—কিন্তু মায়ের প্রাণ !—

পরক্ষণেই দেখ্‌তে পেলাম ঠোঁট দুখানি শুকিয়ে এল ভয়ে কম্পমান !

হাজার মায়ের বুকের মধ্যে আজকে বুঝি গুমরে মরে একটা বিরাট দুখ ;

বিশ্ব-মায়ের সকল ব্যথা জমাট ব'রে জাঁতার মত পিষে ফেল্‌ছে একটা মায়ের বুক !

আমার বুকের মাঝে,

একটা যেন ধড়পড়ানি, কাটা ঘায়ের ব্যথার মত, শিউরে উঠে রইল চুপে লাজে !

রেলের গাড়ী সমান চল্‌ছে ভ্রুক্ষেপেও নাই কোনও দিকে তার,

হাতের কাঁটা সমান বুনছে চোখ দিয়ে জল ঝরছে অনিবার !

একটা,—দু'টো,—তিন্‌টে,—

সময় চল্‌ছে আপন মনে, চাকা সমান ঘুরেই চল্‌ছে 'মিন্‌টে'।

যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তারক্তি, কেও বা কাটা, কেও বা আছেন সটান পড়ে হ'য়ে অর্দ্ধমৃত ;

বিজয়গর্ব্বে পালালেন কেও, কেও বা হ'লেন রাতারাতি অর্দ্ধ পথে হৃত।

সৈন্যগণের দাপে

সসাগরা ধরাও বুঝি স্থির থাকে না, থমে থনে কাঁপে,

আকাশ জুড়ে উড়িয়ে পাইল দর্প ভরে চল্‌ছে রণতরী,

এক নিমেষে কি যে হল, কোথায় গেল, কে তাহারে রাখ্‌ল অতল করি ?

নিখিল বিশ্ব তখন

আঁখির আগে উঠ্‌ল ভেসে বিরাট একটা চিত্রপটের মতন !

লক্ষ লক্ষ মায়ের ছবি, বুনেই যাচ্ছে অবশ আঙুল দিয়ে,

তাদের ছেলে কেও বা মরছে, কেও বা যুদ্ধে উঠ্‌ছে পুনঃ জিয়ে।

শুধু—এই দেশেরি নয়,

অনেক দেশের অনেক মায়ের পরাণ মাঝে উঠ্‌ছে জেগে ভয় !

মা ও ছেলের সম্বন্ধটা চিরমধুর, সকল ছেলে সকল মায়ের কাছে ;

শত্রু মিত্র সবারই মার বুকের ভিতর, সমান স্নেহ জমা করা আছে !

তাতেই সবাই ভাবে,—

বাঁচা মরা দুইই সত্য ছেলে আমার যুদ্ধে যখন যাবে !

আমার চোখে উঠ্‌ল ফুটে আরো একটা দৃশ্য মনোরম,

সবাই যেন সবার কাছে আজকে প্রাণের অধিক প্রিয়তম !

দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই

বিশ্বমাতা সবার মাতা, বিশ্বভ্রাতা আজকে সবার ভাই !

বিশ্বমাতা স্নেহের চুমায় সকল ছেলের ললাট পরশ করি,

বিজয় তিলক পরিয়ে দিল বুকের মাঝে রাখ্‌ল সবায় ধরি।

আজকে সকল ছেলে

বিশ্বমাতার স্নেহের কোলে মায়ের স্নেহ আদর সোহাগ-পেলে।

শত্রু মিত্র বিপর্য্যয়ের মাঝে দেখি, সবার তরে সবার হৃদয় দান,

মায়ের তরে ছেলের এবং ছেলের তরে মায়ের প্রাণের টান।

আমার আঁখির আগে,

অশ্রুময়ী একটী মায়ের ব্যথায় মলিন বিরস আনন জাগে।

লক্ষ মায়ের শুষ্ক মুখের ছায়ায় ঢাকা তাহার মূর্ত্তিখানি

একটা বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে প্রকাশ হ'ল বিশ্বজোড়া মায়ের সতয় বাণী।

এমনি মায়ের মত

ছেলের ভালমন্দ নিয়ে আকাশ পাতাল এমনিতর ভাব্‌ছে সবাই কত।

আমার হৃদয়-তন্ত্রী ধরে টান্‌লে যেমন মাতৃরূপা নারী,—

তেমনি একটা বিপুল টানে টান্‌ছে বুঝি সবাই সবে, যাহোক বলিহারি।

কোথায় কেবা জানে,—

'মর্‌তে পারে, বাঁচ্‌তে পারে,'—এই কথাটা অহরহ জাগ্‌ছে শুধু প্রাণে।

না,—না,—মরা মিথ্যা কথা, বেঁচে থাকাই সত্য রেখো মনে,

বাঁচ্‌বে শুধু মর্‌বে নাক বাস্‌বে ভাল নিখিল আপন জনে।

তা, সে যেমন ক'রেই হোক্,—
বিজয় ক'রবে, বিপুল গর্ব্বে, মরণ-বিহীন সকল অমর লোক।
কিন্তু ;—সে ত মরতে পারে 'ফ্রান্সে' কিম্বা অন্য কোনও দেশে,
তোমার ছেলে, আমার ছেলে, দুঃখময়ের দুলাল-ছেলের বেশে।

কাঁদো নারী, কাঁদো,—
বিশ্বমায়ের সকল কণ্ঠ তোমার সুরে এক ক'রে আজ বাঁধো ;
তুমি যে গো বিশ্বমাতার বিরাট ছায়া, কাঁদছ তুমি নিখিল বিশ্বভরে,
তোমার সাথে ব্যথার ব্যথিত আমিও আজ কাঁদব পরাণ ভরে।

নিখিল বিশ্বময়,—
"মরণ" "বাঁচন" দু'টী কথার ঢেউ উঠেছে পাহাড় প্রমাণ, প্রলয় বুঝি হয় ;
স্বপ্ন-কলরোল ছাপিয়ে বিশ্বমানব বুক চিরে আজ ডাকে,
গভীর ঘুমের অসাড় মায়া সেথায় চুপে বল্‌ছে কি যে কাকে।

"মরণই ত ঠিক"—
"না না বাঁচা নিজের হাতে," এই অভয়ে শান্ত সকল দিক্ ;
তোমার আমার প্রাণের মাঝে বইছে যে এক ভাবের মন্দাকিনী,
"আমার যে ভাই মানুষ সবাই" তাতেই বুঝি "আপন" তাতেই চিনি।

হঠাৎ চেয়ে দেখি,—
রেলের গাড়ী থাম্‌ল যেথায় নাম্‌তে হবে মোদের সবাই,—একি !
রমণীটি বন্ধ করে বোনাবুনি, গুছিয়ে রেখে কাঁটা সুতোর রাশি,
আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, একটুখানি মৃদু মধুর হাসি,

"বেঁচেও সে-ত থাক্‌তে পারে,—বটে,—
যুদ্ধে গেলেই সত্য সবার মৃত্যু কি আর সব সময়েই ঘটে" ;
পথের ভিড়ে যায় না দেখা, দুঃখিনী মা ধীরে ধীরে দৃষ্টিছাড়া হ'ল,
আবার কিন্তু মনের মাঝে সেই কথাটি সজাগ হয়ে র'ল,—

"কেই বা সঠিক জানে,"—
"ছেলেটী মোর যুদ্ধে গিয়ে মরতে পারে, ফ্রান্সেরি কোনখানে।"

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

গণিতপাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রেঢ়ীফলানয়নের উপায় •—

ইষ্টং ব্যেকং দলিতং সপূর্ব্বমুত্তরগুণিতং সমুখমধ্যং।
ইষ্টগুণিতমিষ্টধনং স্বথবাদ্যন্তং পদার্দ্ধহতং ॥১৯

• ১৯শ এবং ২০শ শ্লোক দুইটী বুঝিবার সুবিধার জন্য গণিতে ব্যবহৃত নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিশেষ অর্থ এই স্থানে প্রদত্ত হইল—

শ্রেঢ়ী (progression)—একটীর পর আর একটি সজ্জিত কতকগুলি পৃথক পদার্থের নাম "শ্রেঢ়ী" ; "শ্রেঢ়ী" শব্দটীতে পর্য্যায়ের ভাব উহ্য আছে। গণিতে শ্রেঢ়ীর পৃথক্ পদার্থগুলি সংখ্যা মাত্র।

ধন (term)—শ্রেঢ়ীর অন্তর্গত যে কোন সংখ্যা।

আদি (initial term), এবং মুখ, বদন, বক্ত্র, (এবং অন্যান্য তুল্যার্থ শব্দ)—শ্রেঢ়ীর অন্তর্গত প্রথম সংখ্যা।

অন্ত্য বা **অন্ত** (last term)—শ্রেঢ়ীর অন্তর্গত শেষ সংখ্যা।

চয়, প্রচয়, উত্তর (the *common increase* or *difference* of the terms of an Arithmetic progression)—অধিক বা বৃদ্ধি ; একটী "ধন" হইতে পরবর্ত্তী "ধনের" অন্তর।

পদ, গচ্ছ (the period or the number of terms)—শ্রেঢ়ীর অন্তর্গত "ধনে" গুলির সংখ্যা।

মধ্য (the middle term, or the mean, of the *Arithmetic* progression)—[গচ্ছ বিষমরাশি (odd) হইলে] মধ্যধন, এবং [গচ্ছ সমরাশি (even) হইলে] শ্রেঢ়ীর মধ্যে অবস্থিত সংখ্যাদ্বয়ের সমষ্টির অর্দ্ধেক।

সর্ব্বধন, শ্রেঢ়ীফল, বা গণিত (the sum of the progression)—শ্রেঢ়ীর অন্তর্গত সংখ্যাগুলির যোগফল।

অনুবাদ :—ইষ্ট পদ হইতে এক বিয়োগ করিয়া বিয়োগফলকে (অর্থাৎ একহীন ইষ্টপদকে) ২ দ্বারা ভাগ করিয়া, পূর্ব্বপদের সহিত যোগ করিয়া, উত্তরের (= চয়ের) দ্বারা গুণিত করিয়া, "মুখের" (বা আদি সংখ্যার) সহিত যোগ করিলে "মধ্যধন" হয় ; "মধ্যধনকে" "ইষ্টপদ" দ্বারা গুণিত করিলে "ইষ্টধন" (সর্ব্বধন বা শ্রেঢ়ীফল) হয়। আদি এবং অন্ত সংখ্যার সমষ্টিকে "পদার্দ্ধ" দ্বারা গুণিত করিলেও "ইষ্টধন" হয়।

স্পষ্টার্থ :—এই শ্লোকে আর্য্যভট্ট একটী শ্রেঢ়ীর যে কোন "ধন" (term) হইতে অপর যে কোন "ধন" (term) পর্য্যন্ত যোগফল (অর্থাৎ একটী খণ্ড শ্রেঢ়ীর শ্রেঢ়ীফল) নির্ণয় করিবার দুইটী সাধারণ নিয়ম প্রদান করিতেছেন। যদি—

ইষ্ট পদ বা গচ্ছ = "গ"
পূর্ব্বপদ • = "পূ"
উত্তর = "উ"
আদিধন = "আ"
অন্ত্যধন = "অ"
মধ্যধন = "ম"
সর্ব্বধন = "স",

হয়, তাহা হইলে

$$স = ম \times গ$$

$$= \left\{\left(\frac{গ-১}{২} + পূ\right)উ + আ\right\} গ \ldots\ldots\ldots\ldots(১)$$

$$স = (আ + অ)\frac{গ}{২} \ldots\ldots\ldots\ldots(২)$$

"মধ্যকে ইষ্টপদ (বা গচ্ছ) দ্বারা গুণিত করিলে সর্ব্বধন (বা শ্রেঢ়ীফল) পাওয়া যায়"—এই সূত্রটীই

• পূর্ব্বপদ = শ্রেঢ়ীর প্রথম হইতে খণ্ডশ্রেঢ়ীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "ধন-সংখ্যা"।

উপরোক্ত সূত্রদ্বয়টীর প্রাণস্বরূপ। গণিতপাদে আর্য্যভটের কার্য্যপ্রণালী (Method of Aryyabhata) সম্বন্ধে একটী বিষয় সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা এই যে—যদিও আর্য্যভট বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপায় প্রদান করিয়াছেন, তথাপি এই সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্য একটী নয়ন সাধারণ মৌলিক সূত্রেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, কোন ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল (area) জানিতে হইলে আর্য্যভট ক্ষেত্রটীকে একটী দীর্ঘচতুরস্রে (rectangle) পরিণত করিয়া তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করিতে বলিতেছেন। এখানেও সেইরূপ যে কোন শ্রেড়ী বা খণ্ডশ্রেড়ীর শ্রেড়ীফল (sum of progression) নির্ণয় করিতে হইলে, "মধ্য" নির্ণয় করিয়া তাহাকে "গচ্ছ" দিয়া গুণিত করিতে বলিতেছেন।

এখন দেখিতে হইবে—(১) এই সূত্রটীর উপপত্তি কি? এবং (২) "মধ্য" কিরূপে নির্ণীত হইবে?

আর্য্যভটের উপপত্তির কোন বিবরণ আমরা পাই না। তবে পরবর্ত্তীকালে রঙ্গনাথ কমলাকরের একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি (আধুনিক প্রণালীর ন্যায়) শ্রেড়ীর ধনগুলিকে (terms) বিপরীতভাবে (অর্থাৎ প্রথমটীর নীচে অন্তধন, দ্বিতীয়ের নীচে উপান্তধন, ..., এই ভাবে) সাজাইয়া দেখাইতেছেন যে এইরূপে সজ্জিত প্রতি ধনযুগের (pair of terms) যোগফল সমান, কারণ প্রথম ধন হইতে দ্বিতীয় ধন যত বড়, উপান্ত ধন অন্তধন হইতে তত ছোট, অতএব

প্রথম ধন + অন্তধন = দ্বিতীয়ধন + উপান্তধন = ... ;

অতএব যদি "মধ্যধন" (middle term) থাকে (অর্থাৎ গচ্ছ বিষমরাশি হইলে), এই যোগফল মধ্য ধনের দ্বিগুণ হইবে; আর যদি "মধ্যধন" না থাকে (অর্থাৎ গচ্ছ সমরাশি হইলে), এই যোগফল শ্রেড়ীর মধ্যে অবস্থিত দুইটী সংখ্যার (two middle terms) যোগ ফলের সমান হইবে। যাহাই হউক এই যোগফলকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে আমরা "মধ্য" পাইব। আর আমরা দেখিতেছি যে যোগফলগুলির সংখ্যা "গচ্ছে"র সমান, অতএব শ্রেড়ীফল :—

= এই ধনযুগগুলির সমষ্টি

= যে কোন ধনযুগ এবং গচ্ছের গুণফল।

অতএব শ্রেড়ীফল = ½ ধনযুগ × গচ্ছ = মধ্য × গচ্ছ।

দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে পুরাকালে প্রায় সকল জ্যোতির্ব্বিদ বা গণিতজ্ঞই কতকটা একই চিন্তাসূত্র অবলম্বন করিয়াছেন। আর্য্যভটও উপরে নির্দ্দেশিত প্রণালীর অনুরূপ কোন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

আর্য্যভটের সূত্রানুসারে শ্রেড়ীফল = মধ্য × গচ্ছ = ২ মধ্য × ½ গচ্ছ; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে আদিধন + অন্তধন = ২ মধ্য; অতএব

$$\text{শ্রেড়ীফল} = (\text{আ} + \text{অ}) \times \frac{\text{গ}}{২}$$

ইহাই আর্য্যভটের ২য় সূত্র। এই সূত্রটী যে সম্পূর্ণ শ্রেড়ীর পক্ষেই প্রযোজ্য তাহা নহে, যে কোন খণ্ডশ্রেড়ীর পক্ষেও সত্য; তবে তখন আদি, অন্ত, মধ্য এবং গচ্ছ অর্থে খণ্ড শ্রেড়ীরই আদি, অন্ত, মধ্য এবং গচ্ছ বুঝিতে হইবে। এই সূত্রটীও প্রথম সূত্রটীর ন্যায় একটী সাধারণ সূত্র মাত্র। কোন বিশেষ অবস্থার জন্য এই সূত্রটী প্রদত্ত হয় নাই।

আর্য্যভটের প্রথম সূত্রের উপপত্তি :—(পূ + ১)-সংখ্যক "ধন" হইতে (পূ + গ)-সংখ্যক "ধন" পর্য্যন্ত খণ্ডশ্রেড়ীর সঙ্কলন = এই খণ্ডশ্রেড়ীর অন্তর্গত আদি ও অন্তধনের সমষ্টি এবং পদার্থের গুণফল।

এখন এই খণ্ডশ্রেড়ীর আদি ধন = আ + পূ × উ,

এবং এই খণ্ডশ্রেড়ীর অন্ত ধন = আ + (পূ + গ — ১) উ।

অতএব এই খণ্ডশ্রেড়ীর সঙ্কলন (sum)

$$= [\{\text{আ} + \text{পূ} \times \text{উ}\} + \{\text{আ} + (\text{পূ} + \text{গ} - ১)\,\text{উ}\}] \times \frac{\text{গ}}{২}$$

$$= \left\{\left(\frac{\text{গ} - ১}{২} + \text{পূ}\right)\text{উ} + \text{আ}\right\}\text{গ}।$$

এখানে $\left\{\left(\frac{\text{গ} - ১}{২} + \text{পূ}\right)\text{উ} + \text{আ}\right\}$

= ½ [{আ + পূ × উ} + {আ + (পূ + গ — ১) উ}]

= খণ্ডশ্রেড়ীর "মধ্য"।

এই সূত্রটী অন্যরূপেও প্রমাণ করা যায়। যথা,

$$\text{স} = (\text{পূ}+\text{গ})\left[\text{আ}+(\text{পূ}+\text{গ}-\cdot)\frac{\text{উ}}{২}\right]$$

$$-\text{পূ}\left[\text{আ}+(\text{পূ}-১)\frac{\text{উ}}{২}\right]$$

$$= \left[\left(\frac{\text{গ}-১}{২}+\text{পূ}\right)\text{উ}+\text{আ}\right]\text{গ}।$$

আর্য্যভট্ট কোনও উদাহরণ প্রদান করেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ শ্রেড়ীর জন্য এই সূত্রটী প্রদান করিয়াছেন। তিনি আদিপদ (initial term) বা উত্তর (common difference) সম্বন্ধে কোন বিশেষ সংখ্যা গ্রহণ করেন নাই। আর একটী কথা—তিনি শ্রেড়ীর "আদি" হইতেই শ্রেড়ীফল নির্ণয় করিবার নিয়ম প্রদান করেন নাই, শ্রেড়ীর যে কোন ধনকে "আদি" করিয়া শ্রেড়ীফল আনয়নের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বাংশে আর্য্যভটেরই অনুরূপ। আবার দুইটী সাধারণ সূত্রও একই শ্লোকে গ্রথিত করিয়াছেন।

আর্য্যভটের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর কেহ "শ্রেড়ী" সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিয়াছিলেন, অথবা শ্রেড়ীফল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এরূপ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আর্য্যভটের পূর্ব্বে অন্যান্য দেশের গণিতজ্ঞেরাও (Hypsicles, 2nd century B. C.; Diophantus, 360 A. D., etc.) কেহই শ্রেড়ী সম্বন্ধে এরূপ সাধারণসূত্র প্রদান করেন নাই।

আর্য্যভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্ত Arithmetical Series সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু ভাস্করাচার্য্য Arithmetical Series এবং Geometrical Series উভয়বিধ বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। আমরা পরমেশ্বরের ভট্টদীপিকা হইতে একটী উদাহরণ প্রদান করিয়া এই আলোচনা শেষ করিব।

আদি পঞ্চ চয়স্ সপ্ত গচ্ছস্ সপ্তদশোচ্যতাং।
মধ্যোপান্ত্যাষ্টমাদিত্রিপদ সর্ব্বধনং পৃথক্ ॥

এখানে আদি = ৫, চয় বা উত্তর = ৭;

গচ্ছ = ১৭ পূ = ৩;

মধ্যধন = $\left[\left(\frac{১৭-১}{২}+৩\right)৭+৫\right]=৬১$,

সর্ব্বধন = ৬১ × ১৭ = ১০৩৭;

উপান্ত্যধন = ১৬শ "ধন" = (১৬—১) ৭ × ৫ = ১১০।

(ব্রহ্মগুপ্তের শ্রেড়ীব্যবহারে "পদমেকহীনমুত্তরগুণিতং সংযুক্তমাদিনাঽন্ত্যধনং" দ্রষ্টব্য)

(২) গচ্ছ = ৩, পূ = ৭;

মধ্যধন = $\left(\frac{৩-১}{২}+৭\right)৭+৫=৬১$,

সর্ব্বধন = ৬১ × ৩ = ১৮৩।

ক্রমশঃ

শ্রীনগেন্দ্রকুমার বসুমদার এম,এ

দুভাই

(চুর্ভবের Dream Poems হইতে)

সে একটা স্বপ্ন……

দুজন দেবদূত আমার কাছে এসেছিলেন। দেবদূত বললাম—কারণ তাঁদের পরিধানে কোন কাপড় ছিল না—আর তাঁদের কাঁধের পিছনদিক দিয়ে লম্বা শক্ত এক এক জোড়া পাখা ছিল। দুজনেই যুবক। একজন একটু মোটা - বেশ কোমল বয়স গায়ের চামড়া তাঁর। মাথার চুল কোঁকড়ান। তাঁর চোখ দুটা 'ভায়োলেট'—কটা আর চোখের পাতার লোম ঘননিবিষ্ট। দৃষ্টি—চতুর, প্রচুর এবং উৎসুক। মুখখানা সুন্দর গোলকার—একটুখানি পর্ণিত—একটুখানি দুষ্টামিভরা। কোমল রাঙ্গুল অধর-পল্লব ঈষৎ ঈষৎ কম্পমান। যুবক হাসছিলেন - ক্ষমতাবানের হাসি—আত্মবিশ্বাসীর হাসি—অলসের হাসি। মাথার চক্‌চকে চুলে তাঁর একটা শোভন ফুলের মালা একেবারে তাঁর মধ্যললাট স্পর্শ করে বিরাজ করছিল। তাঁর বক্ষ কাঁধ হ'তে একটা বর্ণজ্জ্বল চিত্রাবাঘের চামড়া ঝুলছিল, তাতে একটা সোণার তীর বাঁধা। তাঁর পাখা দুইটির পালক গোলাপী রঙের—তাদের প্রান্তভাগ খুব উজ্জ্বল রাঙ্গা যেন এইমাত্র উদ্গারিত লালরক্তে ছোপান হ'য়েছে। মাঝে মাঝে পাখা দুইটি বেগে কাঁপছিল—আর তাহ'তে একটা মিঠে আওয়াজ বেরুচ্ছিল—বলতে দুটিপাতের শব্দের মত।

অন্যজন কৃশ, আর তাঁর গায়ের চামড়া পীত। প্রত্যেক নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে তাঁর বুকের পাঁজর ওঠানামা করছিল। মাথার চুল তাঁর সুন্দর, পাতলা এবং খাড়া……চোখ দুইটা বড়, গোল, বিবর্ণ, সাদা……দৃষ্টি অসহিষ্ণু আর অদ্ভুতভাবে উজ্জ্বল। মুখের প্রত্যেকটি অঙ্গ বেশ সুস্পষ্ট; আবলুসের মত ছুঁচলো দাঁত; ঈগল পাখীর মত নাক, বেরিয়ে আসা গণ্ডস্থল তাতে সাদা সাদা ফুসকুড়ি। আবলুসটা ঠোঁটে হাসি ছিল না!

মুখখানার গঠন ছিল ভাল—কিন্তু কি ভয়ানক—ঠিক নির্দ্দয় মুখ! (পূর্ব্বোক্তের মুখ যদিও সুন্দর ও মধুর—তাতেও দয়ার কোন চিহ্ন নাই)। দ্বিতীয় যুবকটির মাথার কাছে কয়েকটা ভারী শস্যের শীষ ঝোলান ছিল—সেগুলো শুকনো ঘাসের ডাঁটা দিয়ে ঝুলান। পশ্চাতের পাখার রং একটু কালো—কেকাসে ধরণের। সেগুলো ধীরে ধীরে নড়ছিল যেন ভয় দেখাচ্ছে।

দুই যুবক যেন অতিশয় সহচর—একজন আর একজনের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথমটির কোমল হাত আঙ্গুরগুচ্ছের মত দ্বিতীয়টির বক্ষালঙ্কার ঘাড়ের উপর ন্যস্ত। দ্বিতীয়টির বাম হাত—তাতে লম্বা লম্বা শুকনো আঙ্গুল—প্রথমটির বালিকোপম বুকটিকে সাপের মত জড়িয়েছিল।

একটা স্বর শোনা গেল। স্বর বললে—"প্রেম এবং ক্ষুধা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে—মনে রেখো ভাই, এরাই সমস্ত জীবন্ত জিনিষের ভিত্তি-প্রস্তর।"

"যে কেহ বাঁচে—খাবার জন্যে বাঁচিত হয়—আর খেয়ে সন্তানসন্ততির জন্ম দেয়।"

"প্রেম ও ক্ষুধা—দুজনেরই এক লক্ষ্য; জীবনটাকে চালাতে হবে, ব্যক্তির ও সমাজের জীবন—বিশ্বের জীবন।"

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

চিতোর

জীবনের বড় সাধ ছিল, একবার চিতোর দেখিয়া জীবন সার্থক করিব—একবার তাহার মাটিতে মাথা ঠুকিয়া দেখিয়া আসিব, সে মাটির একবার কত কঠিন, যাহার কণা ভীমসিংহ, যাহার কণা জয়মল্ল, যাহার কণা ভীমসিংহাধিক, জয়মল্লাধিক চিতোর লক্ষীটির অস্তিনির্বিত আবার মানসীপ্রতিমা; যাহার করণায় জলে পারুল চল চল, নির্মল পবিত্র, মধুপরিপূরিত মর্মর প্রস্তরের পদ্মিনী ফুটিয়াছিল;—আর জানিত, সে মাটির অপরদিক্ সত্যের আলোকে উজ্জ্বল, বিশ্বাসের মহিমায় মহীয়ান, ধর্ম্মের সৌরভে ভরপুর।

দেবমূর্ত্তির চারিদিকে আলোকজ্জটা থাকে—গভীর সমুদ্রের তলদেশ পাইতে হইলে জলে নিম্ন, পরে নিম্নতর প্রদেশে নামিতে হয়—তমোময়ী বিরাট্ নিস্তব্ধতায় নিশীথিনীর আগমন স্বচ্ছ অন্ধকার এবং ঘনীভূত কোলাহলের মধ্য দিয়া—উদ্দাম যৌবনের পূর্ব্বে মধুময় কৈশোর—কোন নিপুণ শিল্পী কমনীয় কানন অঙ্কিত করিলে, তাহার আশে পাশে কুসুমক শাখায় শুঞ্জিত ভ্রমর থাকে, নবেরুরুচে নৃত্যশীল মযূর বসায়, চৈত্য বৃক্ষশাখায় কুহরিত কোকিলাকে ঘুম পাড়ায়, চিতোর-দুর্গের অবস্থানও এইরূপ তৎসদৃশ দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া। আরাবলীর দুর্গ পর্ব্বতমালা ইহাকে শ্রেষ্ঠস্থান করিবার জন্য চারিপাশে গা ঢালিয়া পড়িয়া আছে। যেখানে পাহাড় নাই, সেখানকার মৃত্তিকাও বহুল পরিমাণে প্রস্তরময়—তাহারই বুকের উপর অযত্ন-সম্ভবে অগ্নি বিকীর্ণ হইত! তখনকার মৃত্তিকা রক্তাক্ত। কে জানে চিতোরের কাহার হৃদয়শোণিতে আজিও তাহারা রাঙ্গা হইয়া রহিয়াছে। লিখিতে বসিয়া মনে ছিল না, নচেৎ দেখিয়া আসিতাম, তখনকার কটা কটা শুষ্কনা শুষ্কনা মোটা মোটা তৃণরাজিতে রাজপুত হৃদয়ের কমনীয়তা লক্ষ্য করা যায় কিনা? সে প্রদেশ বিরল-পাদপ, প্রকাণ্ড মহীরুহ ক্বচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়; তাহা হইলেই বা, তখনকার নর-নারীগণ ত আর বালার্কিরণে গলিয়া যাইবার ছিল না!

চিতোরের সমতল ভূমি হইতে ন্যূনাধিক ৪০০ ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর চিতোরদুর্গ প্রতিষ্ঠিত। দুর্গ প্রকাণ্ড, তাহার মধ্যে তিন চারিখানি গ্রাম বসিতে পারে। "চিতোর গড়" রেল ষ্টেশনে দাঁড়াইলেই ঐ দুর্গ চক্ষে পড়ে, এবং যে দিকটা চক্ষে পড়ে, সেই দিকটাই প্রাকারবেষ্টিত। চারি শ্রেণী প্রস্তর-প্রাকার দ্বারা ইহা সংরক্ষিত। পর্ব্বত গাত্রে এক প্রকার অনুচ্চ বৃক্ষ জন্মিয়াছে, গায়ে পাতা নাই—বৃহদাকার বরাবরগাত্রে রুক্ষ রোমাবলীর ন্যায় সেই শুষ্ক বৃক্ষগুলি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গড়ের বাহিরে গ্রাম বা নগর, তাহাও প্রাচীরবেষ্টিত। গড়ের মধ্যে বসতি নাই, দুই একটী কুটীর আছে মাত্র; আর আছে মন্দিরের সেবাইত ব্রাহ্মণগণের বাস। বসতি না থাকুক, গড়ে মনুষ্য সমাগমের অভাব নাই, গড়ের আজিও যাহা অবশিষ্ট আছে, সেইগুলিও প্রাকার-শ্রেণী রক্ষা করিবার নিমিত্ত বহু রাজমিস্ত্রি ও মজুর খাটিতেছে দেখিলাম—তাহারাই এখন সেই পদ্মিনী ভীমসিংহের পথের উপর চলা-ফেরা করিয়া বেড়ায়। গড়ের সকলই ভগ্নাবশেষ—সেই বেশ, তাহাদের অভ্যন্তরে সেই বিরাট কাহিনী পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের উপরিভাগে দর্শকের হৃদয়গাথা লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। আছে জয়মল্লের মহাল—ভগ্ন; আছে মীরার মন্দির—অখণ্ড; আছে পদ্মিনীর মহাল—পরিষ্কৃত, অটুট। কোন্ ঘরে মা পদ্মিনী বাস করিতেন, কোথায় দাঁড়াইতেন, কোথায় বসিতেন, তাহা কেহ বলিয়া দিল না; কোথায় কোন্ গৃহে "পক্ষবৎ বহ্নিদুখং বিবিক্ষুঃ" আলাউদ্দিন পদ্মিনীর সৌরভে ভুবন ভরিয়া দিবার জন্য

বাদলের সোরাব অস্ত্রঝনৎকার শব্দে ভারতের বায়ুস্তর আজিও কম্পিত রাখিবার জন্য সবিলাস পাদক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা কেহ বলিয়া দিল না—না দিক,

"নাইক আলাপ তোমার সনে
তবু দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি।"

আমার মানসচক্ষুর সম্মুখে মায়ের আমার ছায়াময়ী—লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিকে কোথাও কোন গৃহে শায়িত দেখিলাম, কোথাও আমার অগ্রে অগ্রে হাঁটিতে দেখিলাম। এই মহালে উদয়পুরের মহারাণা চিতোরগড়ে অবস্থিতিকালে মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের জন্য বসতি করেন। তাঁহার বাস করিবার জন্য তথায় অন্য মহালও দেখিলাম। আর আছে দেখিলাম—লিখিতেও ভয় করিতেছে—চিতোরেশ্বরীর মন্দির, সেই মন্দিরে সেই দেবী; যাঁহার তুষ্টি বিধানের জন্য কত কত রাজপুত রাজপুত্র হৃদয়রক্ত দান করিয়াছেন। "ম্যা ভূঁকা হুঁ"—এ কেমন ক্ষুধা? যখন এই ক্ষুধার তৃপ্তি হাঁকিয়া বেড়াইতে যা, তখন তোমার সন্তানগণের মুখপানে চাহিয়া দেখিতে কি? সে মুখে যুদ্ধ-জয়ের আনন্দ রক্তিমা দেখিতে—না আসন্ন ধ্বংসের নিবিড় আশঙ্কার মুখখানি বেদনা-বিধুর দেখিতে? এ যে মংস্য-জননীর ক্ষুধা মা! এ মন্দিরে কালের ছাপ পড়ে নাই—ঠিক আছে। দণ্ডায়মান দেবীর চোক পানে চাহিতে হৃদয় কম্পিত হয়, কি তীক্ষ্ণ! কি উজ্জ্বল! আজিও সেই সন্তানমুক্তকা ঠিকরাইয়া আসিতেছে। জয়স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভের বিশালবপু দণ্ডায়মান আছে। গড়ের মধ্যে সর্ব্বত্র গমনাগমনের জন্য সুরকির রাস্তা সব রহিয়াছে। ভীম সিংহের সমাধিমন্দির রহিয়াছে। দুর্গ প্রবেশ পথে জয়মল্লের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—এ মূর্ত্তি ত পিত্তলের আওরাজ-ভিন্ন মূর্ত্তি নয়, ইহা পরিণত বয়স্ক, গুণগ্রাহী আকবরের হৃদয়স্থিত জয়মল্লের নিখুঁত মূর্ত্তি! আর দেখিবার বড় সাধ ছিল—জৌহর ব্রতের কুণ্ড! তাহার অনল-শিখা আজও যে আমার কপালে লাগে! ঠিক জানিতে পারিলাম না, কোথায় সেই কুণ্ড। যাহার আলোকচ্ছটায় ভারতের রমণীমুখের 'সতীত্ব' অক্ষয় কবচ জগতের লোক দেখিতে পাইয়াছিল, যাহার ভস্মরাশি এই পুণ্যভূমিময় ছড়াইয়া দিয়া ইহার নারীগণের মুখে দেবতার শুভ্রতা মাখাইয়া দিয়াছে। ব্যাকুল হইয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই ঠিক বলিতে পারিল না। একজন বলিল এই ভীম সিংহের সমাধিস্থানে জৌহর হইয়াছিল, ইহাকে সতী বলে। হইতে পারে, ইহারই নিম্নে জলে ভরা এক বৃহৎ কূপ দেখিলাম। আর একজন বলিল পদ্মিনী-মহালের সম্মুখে যে পুষ্করিণী রহিয়াছে—উহাই; কিন্তু ওটী বৃহৎ পুষ্করিণী। আমাদের পথ প্রদর্শক একটী তৃণাচ্ছাদিত সুরঙ্গ দেখাইল, বলিল এই সুরঙ্গের অন্য মুখ যথায় প্রকাশ হইয়াছে, তথায়। দেখিলাম সেই সুরঙ্গ যে প্রাসাদের উঠানে রহিয়াছে, সে প্রাসাদটীকে সম্ভবতঃ অন্তঃপুর প্রাসাদ বলিয়া মনে হয় বটে।

মণির কৌস্তুভ, বৃক্ষের পুষ্পাগ, পর্ব্বতের কৈলাস, নদীর ভাগীরথী, ধামের বৃন্দাবন, রাজপুতের প্রতাপ ও এই চিতোরের জন্য "সোণার চিতোর আবার হল না," "সোণার চিতোর আবার হল না" বলিয়া দেহ ত্যাগে মহীয়ান্ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

এই দুর্গও জয় হইয়াছিল। সেই জয়ের সিঁড়ি দেখিলাম—আকবর বাদসাহ গড়ের পাহাড় তুরারোহ দেখিয়া গড়ের ঠিক পার্শ্বে এক কৃত্রিম পাহাড় রচিয়া তাহাতে উঠিয়া পরে দুর্গের পাহাড় অতিক্রম করিয়াছিলেন—ধন্য অধ্যবসায়!

জগৎ-নিয়ন্তার বিধানে কি এমন কোনও নিয়ম নাই যে, সংস্কার না করিলেও জিনিষগুলি ঠিক থাকে? চিতোর-গড়ের মধ্যে আমাদেরই মত বাঙ্গালি সব চলা ফেরা করিতেছে দেখিয়া বড় দুঃখ হইলাম—ইহা আমার সহ্য হইতেছিল না। ওসব জিনিষ দূর পড়িয়া থাকিয়া ধ্বংস হউক, তবে ত বাঙ্গালাও বাঙ্গালির, যাত্রী পাণ্ডার আবর্জ্জনা তাহার ঘরে দেখিতে পাইব—নচেৎ কোকিল যে পাখী হইয়া যায়!

পথের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, একটু বলি—কলিকাতা হইতে প্রথমে তুণ্ডলা জংশনে পরে আগ্রার ফোর্ট জংশনে গাড়ী বদল করিতে হয়। কলিকাতা হইতে মধ্যশ্রেণীর ভাড়া আগ্রা ফোর্ট পর্য্যন্ত ১৮৶০ আনা। পরে B. B. & C. I. রেলে জয়পুর, আজমীর পার হইয়া চিতোর যাইতে হয়। আগ্রা ফোর্ট হইতে তৃতীয় শ্রেণীর

ভাড়া ৪।৶০ আনা। ইহাদের মধ্যশ্রেণীর গাড়ী নাই। এই পথটুকু বড় ঠিক হয়, যাইতে কষ্ট হয়, তা হউক। রাজপুতনার মরুভূমিতে দলে দলে মযূর ও মৃগ-শাবক দেখিয়া সে কষ্ট ভুলিতে পারা যায়। দীর্ঘ পথ, সুতরাং পথে দুইবার বিশ্রাম করিলে ভাল হয়, একবার শ্রীবিশ্বেশ্বরের চরণতলে, দ্বিতীয়বার সাজাহানের শ্বেতের বিরাট নিদর্শনের দ্বারে।

শ্রীএককড়ি দে

সৃষ্টি-বিফলতা

স্বর্ণ কুসুমে গন্ধ বিহীন, নাহি চন্দন তরুতে ফুল,
ইক্ষুদণ্ডে ফলের অভাব, নিঃস্ব লেখক, বিধির ভুল।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

পরিণাম *

(১)

কয়েকদিন হইল সবজজ আদালতে হরেকিষণ নিউ গোদামের মোকর্দ্দমার শুনানি হইতেছে। বড় জেলা-জেলীর মামলা, হাকিম উকিল সকলেই সদাব্যস্ত। আজ টিফিনের সময় সবজজ বাবুর কামরায় প্রথম ও দ্বিতীয় মুন্সেফ আসিয়াছেন, সরকারী উকিল বিশ্বনাথ বাবুও উপস্থিত আছেন। মুচির যেমন চামে ভিন্ন চিন্তা নাই, হাকিম উকিলদিগেরও তেমনি মোকর্দ্দমা ভিন্ন কথা নাই। আজ বংশীধর দ্বিবেদীর আপিল লইয়া তর্ক চলিতেছিল। উপস্থিত হাকিমদের মধ্যে কেহ বাদীর কেহ বা করিয়াদীর পক্ষ সমর্থন করিয়া হাইকোর্টের বিচার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন।

বিশ্বনাথবাবু এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় বড় যোগ দেন নাই। টিফিন হইতেই আর্দ্দালী ডাক আনিয়াছে, তিনি খবরের কাগজখানি লইয়া উল্টা পাল্টা করিতেছিলেন—হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"শুনেছেন রামপ্রসন্নবাবু মারা গেছেন।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "বলেন কি!" "বিশ্বাস না হয় প'ড়ে দেখুন"—এই বলিয়া বিশ্বনাথবাবু খবরের কাগজখানি তাঁহাদের দিকে সরাইয়া দিলেন।

কাগজখানি একবারে টাট্‌কা তখনও ছাপা কালীর সোঁদাগন্ধ ভালরূপ যায় নাই। সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে "জন্ম বিবাহ ও মৃত্যু" শীর্ষক সংবাদ স্তম্ভের এক অংশে ছাপা রহিয়াছে "শ্রীমতী হিমানী মিত্র পরম শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছেন যে, তাঁহার প্রিয়তম স্বামী ছোট আদালতের জজ মিঃ রামপ্রসন্ন মিত্র গতকল্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে রাত্রি ১১৷৩০ টার সময় যীশুর ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন। অন্ত্য বেলা ৪টার সময় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। সমাধিস্থানে বন্ধুবান্ধবগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

মিঃ মিত্র।

মিঃ মিত্র উপস্থিত হজুরদিগের অনেকের সঙ্গেই একত্র কাজ করিয়াছেন। গত কয়েক সপ্তাহ হইতে কানাঘুষা চলিতেছিল যে, এ যাত্রা তাঁহার রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। তিনি আরোগ্য লাভ করিলে যে নিজ কর্ম্ম স্থলেই বাহাল থাকিবেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না বটে; কিন্তু তিনি গত হইলে তাঁহার স্থানে নীলকণ্ঠ বাবু এবং নীলকণ্ঠ বাবুর স্থানে রাইচরণ রাহা বা শ্যামাপদ বাবু প্রভৃতির প্রমোশন পাইবেন এ সম্বন্ধেও অল্প বিস্তর জল্পনা চলিতেছিল। যাহা হউক এখন আর ছোট আদালতের জজিয়তি খালি হওয়া সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না; সুতরাং অপর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিত হাকিমান এই বন্ধুটির দেহত্যাগ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ পদোন্নতি বা বদলীর কিরূপ সুবিধা অসুবিধা ঘটিবে তাহা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

প্রথম মুন্সেফ তারকনাথ সাহা বহুদিন যাবৎ প্রথম শ্রেণীতে কার্য্য করিতেছেন। তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিতে লাগিলেন "রাইচরণ বাবু বা শ্যামাবাবুর পদোন্নতি হলে, এবার আর আমার অস্থায়ী সবজজ হওয়া কোন মতেই ফস্কাতে পারে না। এ সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রার সাহেব অনেক দিন হতেই ভরসা দিয়ে আস্‌ছেন।" সবজজ মনোহর বাবু বলিলেন—"এই সুযোগে আমার সদরষ্টীট থেকে হাট বাজারী থেকে বদলী হয়, তাই নিয়ে একবার উঠে পড়ে লাগ্‌তে হবে। আমার স্ত্রী অনেকদিন থেকে ভাইটিকে কলিকাতায় আন্‌বার জন্তে ব্যস্ত আছেন; এবার হয়েত্র আলীপুর বদলী হলে তাঁর আর সে মনকষ্ট থাকবে না। আমিও শ্বশুর বাড়ীর খোঁটার দায় থেকে রক্ষা পাব। আজকাল তালিকা মহাশয়রা সুবিধা পেলেই বলে থাকেন যে, উঁহাদের আত্মীয়গণের প্রতি আমার দৃষ্টি একটুও দৃষ্টি নাই।"

* টলষ্টয় প্রণীত "Death of Ivan Ilyitch" নামক উপন্যাস অবলম্বনে।

বিশ্বনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "মিঃ মিত্রের হয়েছিল কি ?" সরজবাবু বলিলেন—"ব্যারামটা যে কি তা কেউই ঠিক কর্‌তে পারে নি। এক রকম বিশ্ব পচ্ছট উপস্থিত হয়েছিল বল্লেও হয়। শেষবার যখন আমার সঙ্গে দেখা হয়, তখন যেন একটু সেরে উঠ্‌ছিলেন বলে মনে হয়েছিল।" প্রথম মুন্সেফবাবু বলিলেন "গত ইষ্টারের পর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। দেখা কর্‌তে যাব মনে করে ছিলাম, এমন সময় এই—"

প্রথম মুন্সেফবাবুর কথা শেষ না হইতেই দ্বিতীয় মুন্সেফ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন—"বিষয় সম্পত্তি কি রকম রেখে গ্যাছেন জানেন কি ?"

মনোহরবাবু বলিলেন "তাঁর স্ত্রীর হাতে কিছু আছে শুনেছি, তাবে বোধ হয় বড় বেশী নয়। এ সময় একবার মিসেস্ মিত্রের সঙ্গে দেখা না করাটা বড় ভাল দেখায় না। তাঁদের বাড়ী আবার যে দূরে কোথায় সেই বালীগঞ্জ ছটাকার কমে একখানা গার্ডস্লাস গাড়ীও পাওয়া যায় না।

বিশ্বনাথবাবু বলিলেন—"আপনি যে সস্তিছাড়া জায়গায় বাসা নিয়েছেন, সেখান থেকে কোন জায়গাটাই বা কাছে হয় ?" সরজবাবু বলিলেন—"আমি খাল পারে বাড়ী ভাড়া করেছি বলে আপনারা আমাকে যেন একঘরে করিতে পারিলে বাঁচেন।" এই বলিয়া হাসিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বলা বাহুল্য সরজ মহাশয় অবশ্য অর্থ ব্যয়ের বড়ই বিরোধী। সেই জন্য কলিকাতার ধোঁয়া ও ট্রামের ঝনঝনানির অল্প হাতে নারিকেল ডাঙ্গার নিকট কোনও নিরালা পল্লীতে সুবিধায় একখানি দ্বিতল বাটী ভাড়া লইয়াছেন। সেখান হইতেই কষ্টে সৃষ্টে কাছারী করেন এবং কোনও দিন সকাল সকাল কাজ সারিতে পারিলে, প্রথম বা দ্বিতীয় মুন্সেফের বাসায় "ব্রীজ" খেলিয়া যান। এই অল্প দিনের মধ্যেই "ব্রিজ" খেলা হোকটা বহুল অভিনিবেশ করিয়া তাস-বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধদিগের মধ্যেও যে কিরূপ একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা বোধ হয় অন্য সমাজে অবিদিত নহে।

এদিকে মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে বন্দী ও পলায়িত আসামীর সংবাদ লইয়া সহকর্ম্মিগণের মধ্যে যেরূপ একটা হৈ চৈ লাগিয়া গেল তাঁহার বেসরকারী বন্ধুগণের মধ্যে ঠিক সেরূপ না ঘটিলেও, কতক হাঁফ ছাড়ার ভাব যেন বেশ স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছিল। তাঁহাদের অনেকেরই ভাবটা যেন "মরতে হয় সেই মরেছে, আমাদের ত আর মরতে হয়নি। এখন অন্ততঃ রোজ সন্ধ্যায় হাজিরা দেওয়ার দায় থেকেত নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।"

মনোহর বাবুর সহিত মিত্র সাহেবের বড়ই বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারা উভয়ে বাল্য বন্ধু, স্কুল কলেজ অবধি সহপাঠী ছিলেন এবং সরকারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়াও মনোহরবাবু অনেকবার জটিল আইনের তর্কসঙ্কুল মোকদ্দমার সুবিচার সম্বন্ধে তাঁহার নিকট যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছেন। সরজবাবু বাসায় ফিরিয়া গিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন; এবং সেই হত্যা ব্যাপারের বন্দীর চেষ্টা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া তাড়াতাড়ি জলযোগ সারিয়া লইলেন। সে দিন আর তাঁহার বিশ্রাম করা হইল না। অনেক রাত্র কলা কাসির পর নিতান্ত লজ্জাছাড়া গোছ একখানা ছকড়া ভাড়া করিয়া, "মন একা আনা একা যাওয়া একার কম ভাড়া" পরমার্থতিক্তসঙ্কলিত এই পদটি গুণ গুণ স্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে সরজবাবু মহাশয় একাই মৃত সহযোগীর গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পঁহুছিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। গাড়ী গেটের নিকট আসিতেই সরজবাবু দেখিতে পাইলেন, আরও তিনখান ভাড়াটিয়া গাড়ী বাড়ীর বাহিরে সারিবদ্ধী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার তখনও বিলম্ব আছে বুঝিয়া তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, কারণ নগদ দেড়মুদ্রা খরচের পরও সময় মত উপস্থিত না হইতে পারিলে যথেষ্ট পরিতাপের বিষয় হইত সন্দেহ নাই। সম্মুখের ঘরে মূল্যবান গৃহ সজ্জাদির মধ্যেই মহাশয়ের জামাটি ফ্রেম্ দিয়া রাখা হইয়াছে। উহার চারিধার কালো রেশমী ফিতায় মোড়া—গায়ে লতাপাতা কাটা একখানি চতুষ্কোণ পিত্তলফলক লাগান। তাহাতে মিত্র সাহেবের নাম ও তাঁহার মৃত্যুর তারিখ খোদাই করা রহিয়াছে।

...দর দরজার পার্শ্বে দুইজন বর্ষীয়সী মহিলা দাঁড়াইয়াছিলেন। একজনের আকৃতিগত সাদৃশ্যে মনোহরবাবু তাঁহাকে তাঁহার মৃত বন্ধুর ভগ্নী বলিয়া সহজেই চিনিয়া লইতে পারিলেন। আগন্তুকের পরিচয় পাইয়া মহিলারা তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মৃতদেহ উপরের একটি ঘরে রক্ষিত হইয়াছে জানাইয়া তাঁহাকে একবার শেষ দেখার জন্য উপরে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ির নিকট দ্বিতীয় মুহূর্তে রমণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বোধ হইল যেন তিনি পাশ কাটাইয়া নীচে পলাইবার চেষ্টায় আছেন। ইঙ্গিত ইসারায় উভয়ের মনোভাবের কতক আদান-প্রদান হইয়া গেল।

রমণবাবুর কিছু রোগাকৃতির চেহারা, মুখে পাকাপাকা গোছ চাপদাড়ী। হঠাৎ দেখিলে বড় গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া মনে হয়। লোকটি কিন্তু বড়ই আমোদপ্রিয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তাস না খেলিলে তাঁহার অন্ন পরিপাক হয় না। সহরতলীবাসী মনোহর বাবুকেও তিনি তাসের নেশায় মশ্‌গুল করিয়া তুলিয়াছেন। মিঃ মিত্রের ভগ্নিনী ও তাঁহার রত্নিনীর সহিত রমণবাবু সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রমণবাবু তখনও দাঁড়াইয়া; মনোহরবাবু বুঝিতে পারিলেন, আজ রাত্রির বাসায় তাহাদের আজ্ঞা রহিবে তাহাই স্থির করিবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন।

মেয়েরা মিসেস্ মিত্রকে রমণ বাবুর আগমন সংবাদ জানাইবার জন্য চলিয়া গেলেন। মনোহরবাবু রমণবাবুর ইঙ্গিত অনুসারে পার্শ্বের একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শুভ্রকুশনে মিত্র সাহেবের মৃতদেহ শয্যায় রক্ষিত হইয়াছে। ঘরে আরও কয়েকজন স্ত্রীপুরুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন যুবক। একজন মৃতব্যক্তির ব্রাহ্মপুত্র অপরটি কোনও প্রতিবেশী। ইঁহারা উভয়েই তাড়াতাড়ি খৃষ্টিয়ান প্রথার ক্রুশ চিহ্নের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। দুইজন বৃদ্ধ মৃতের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের নির্নিমেষচিত্ত মুখের ভাবেই প্রকাশ পাইতেছিল। তাহারা মধ্যে মধ্যে পরস্পরের কাণে কাণে মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। একজন মোটা মোটা পাদরী সাহেব বড় গলায় প্রার্থনা করিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। তাঁহার হারাধন কার্ত্তিকের পাউডারের ন্যায় কি একপ্রকার গঙ্গাসহারী গুঁড়া মেজের উপরে ছড়াইতেছিল। মনোহরবাবু চাকরটিকে চিনিতে পারিলেন। সন্ধ্যার যখন তিনি মিত্র মহাশয়কে রোগশয্যায় দেখিতে আসেন, তখন এই বারাণসীই তাঁহার পরিচর্য্যায় রত ছিল। মিঃ মিত্র এই চাকরটির প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হইল। কিয়ৎক্ষণ তথায় নতমস্তকে দাঁড়াইয়া মনোহরবাবু তাঁহার বন্ধুর শবদেহের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। মৃত্যুকাঠিন্যে হাতপাগুলি আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে, শবাধারে ভালরূপ বিস্তৃত হয় নাই। মাথাটি যেন নীচু হইয়া বালিশের ভিতর বসিয়া গিয়াছে। মৃতব্যক্তি স্বাভাবিক গৌরবর্ণ পীত ও পাংশুর সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত বর্ণে রূপান্তরিত হইয়াছে। দীর্ঘ নাসা ঝুঁকিয়া আসিয়া ওষ্ঠ স্পর্শ করিতেছে। গোঁফ জোড়াটি পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। মুখের ভাবে স্পষ্টই বোধ হইতেছিল তাহাতে ক্লেশ আর কপটতার লেশমাত্র নাই। শেষ মুহূর্ত্তের সেই মুখভঙ্গী যেন স্পষ্টই জানাইতেছিল "আমার যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহাত আমরণই করিয়াছিলাম, কোন বিষয়েই ত্রুটি করি নাই, তবুও শেষ আঘাত এই দশা; এখন কেহই আমার আপনার নহে, সাধু সাবধান!"

বন্ধুগণের ব্যবহারে যে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার শৈথিল্য বা ঔদাসীনতা প্রকাশ পাইয়াছিল, একথা মনোহরবাবু স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হয়ত হীনতার এই নীরব অভিযোগ তাঁহার নিকট মোটেই শোভন বলিয়া বোধ হইতেছিল না। রোগশয্যায় কতজনকে কতবার ইঁহার তত্ত্ব লইয়াছে, কতবার ইঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, তবে আজ এ 'মরামুখে' অভিমানের পালা কেন? 'শেষের সেদিন' স্মরণ করিবার

এই মৌন উপদেশ তাঁহার নিকট বড়ই তিক্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সরজুবাবু তাড়াতাড়ি সেস্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়া দেখিলেন বাহিরেই বন্ধুবর রমণবাবু মুরুব্বির ন্যায় দাঁড়াইয়া পরম গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতেছেন। এই গুরুগিরি স্বভাব বন্ধুটিকে দেখিয়া তাঁহার মনে অনেকটা শান্তি ফিরিয়া আসিল। রমণবাবুকে দেখিবামাত্র বাস্তবিকই মনে হইতেছিল যে এখানার ঘটনার সহিত তাঁহার কোনও প্রকার সংস্রব নাই। যাহাতে হয় রামপ্রসাদই করিয়াছে, সেজন্য তাঁহার জীবনের গৈরিকিবারা একচুল এদিক ওদিক হইবে কেন? "গজস্য শোচনা নাস্তি।" পূর্ব্বে তিনি যেরূপে সময় অতিবাহিত করিতেন, আজও ঠিক সেই ভাবেই করিবেন।

মনোহর বাবু বাহির হইয়া আসিতেই তিনি তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন "আজ তা'হলে তারক বাবুর ওখানেই বলা যাবে এখন"।

সরজুবাবুর কিন্তু তখন-তখনই খেলায় এরূপ পরাবর্তটা বড় ভাল লাগিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল সে দিন যেন খেলাটা বন্ধ রাখিলেই ভাল হয়।

এই সময়েই মিসেস্ মিত্র আসিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রার্থনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন।

রমণবাবু সে আমন্ত্রণ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের কোনও ভাবই প্রকাশ করিলেন না।

সপ্রতিভভাবে মিত্র গৃহীণীকে নমস্কার করিয়া যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই খানেই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। মিসেস্ মিত্র সরজু বাবুকে দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং কাতরভাবে কহিলেন "আপনি যে আমার স্বামীর অকৃত্রিম বন্ধু—তা' তাঁহার জীবিত অবস্থাতেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম"। সহানুভূতির আশায় তিনি পুনরায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। মনোহরবাবু চতুর লোক; বুঝিলেন, মৃতের কক্ষে প্রবেশ করিতে হইলে শোক চিহ্ন ধারণ করার যেরূপ প্রথা আছে, এইরূপ মৌখিক সহানুভূতি জ্ঞাপনও আধুনিক শিষ্টাচারের অবিশেষ—সুতরাং তিনিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিলেন—"আমি যে তাঁর সতীর্থ। শিশুকাল থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব ছিল, সে ও আর আজকাল কার মত শুধু লোক দেখান শিষ্টাচার নয়।"

মনোহরবাবুর মনে হইল, এতক্ষণ পরে সময়োপযোগী একটা কিছু বলা হইয়াছে। ভাবাবেগে উভয়েই অল্পাধিক মাত্রায় বিচলিত হইলেন। মিসেস্ মিত্র বলিলেন—"উপরের এই হল ঘরে একবার আসুন, প্রার্থনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আপনার সহিত কয়েকটি বিষয়ে পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করি।" তাঁহাদিগকে হলের দিকে যাইতে দেখিয়া রমণবাবু সরজু মহাশয়ের প্রতি নিতান্ত অনুকম্পার সহিত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চোখের চাহনি যেন স্পষ্টই বাক্ত করিতেছিল. "আপন বুদ্ধির দোষে যদি কাহারও কর্ম্মভোগ ঘটে, তাহা হইলে অন্যে কি করিবে? আর যদি তাল খেলায় হাত না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জানিবেন সে শুধু আপনার জন্যই হইল।"

হল ঘরটি নানারূপ সৌখীন সামগ্রী ও আসবাবে পরিপূর্ণ। ছোট ছোট সবুজ পাতা আঁকা লাল ক্রেটন কাপড়ে চেয়ার সোফা প্রভৃতি আবৃত। মনোহর বাবুর মনে পড়িল—মিত্র মহাশয় স্বয়ং পছন্দ করিয়া এই কাপড় আনাইয়াছিলেন। মিত্র গৃহিণী সরজু বাবুর জন্য একটি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া নিজে নিকটস্থ একটি সোফায় উপবেশন করিলেন। আসনের স্প্রিং গুলি পূর্ব্ব হইতেই কিছু খারাপ হইয়া গিয়াছিল, একটু নড়া চড়া করিতেই ক্যাচ্ কোচ্ শব্দ হইতে লাগিল। সরজুবাবু ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন এবং তাঁহার বন্ধু পত্নীও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার প্রতি নিজ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছিলেন। মিসেস্ মিত্রের মনে হইতে লাগিল যে তিনি মনোহর বাবুকে সেই ভাঙ্গা স্প্রিং ওয়ালা কেদারাটি ছাড়িয়া দিয়া আর একটি আসনে উঠিয়া বসিতে বলেন কিন্তু সে সময় কথা কহিলে পাছে জমাট বাঁধা সহানুভূতিটা নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে আর উচ্চ বাচ্য করিলেন না। কিন্তু অধিকক্ষণ নির্ব্বাক নিশ্চলভাবে

বলিয়া থাকাও ত বড় সহজ নহে ; হঠাৎ মিত্র গৃহিণীর মূল্যবান সেল সংযুক্ত শাড়ীর পাড়টি একটি খোলাই কাজ করা টেবিলের প্রান্তে আটকাইয়া গেল। মনোহরবাবু আচলটি ছাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিতে না উঠিতেই তার লাঘব পাইয়া গভীর স্প্রিং গুলি তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। সেই সময়ে মিসেস্ মিত্র সেল্‌টি প্রায় ছাড়াইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া সহজবাবু পুনরায় সশব্দে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াও অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। মিসেস্ মিত্রও শত চেষ্টা করিয়া নিজ অঞ্চলটি সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত করিতে পারিলেন না সুতরাং সহজকে পুনরায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া আবদ্ধ অংশটি সযত্নে ছাড়াইয়া দিতে হইল।

এই পর্ব্ব শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিত্রী গৃহিণী চোখে রুমাল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। মনোহরবাবুর মুখে ক্রমশঃ বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মধ্য-পল্লীর শাড়ীর সেল রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার যেটুকু অতিরিক্ত উদ্যমের আবশ্যক হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার সহানুভূতি অনেকাংশে উঠিয়া গিয়াছিল।

সে সময় অপর একব্যক্তি কার্য্যব্যপদেশে তথায় উপস্থিত হওয়ায় মিত্র-গৃহিণীকে বাধ্য হইয়া শোক সামলাইয়া লইতে হইল, সহজও মহাপ্রাণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। লোকটি ঐ বাটীরই একজন ভৃত্য। গোরস্থানে মৃতদেহের সমাধির জন্য জমি ক্রয় করিতে গিয়াছিল। সে আর অধিক ভূমিকা না করিয়াই বলিল "বেশ সাহেব,আপনি যে-অংশের কথা বলিতেছেন, তাহাতে দুইশত টাকার কমে হইবে না।" মিসেস্ মিত্র মৃতকান্ত নিবদ্ধ সন্তোৎসৃষ্ট ছাগশিশুর ন্যায় নিতান্ত অসহায় ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া মনোহরবাবুকে ইংরাজী ভাষায় বলিলেন—"আমি বড়ই মন্দ ভাগিনী।" মনোহরবাবু এ কথার জবাব না দিয়া শুধু সম্মতিজ্ঞাপক মস্ত মস্ত শির সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ; যেন বলিতেছেন, "তাহাত বটেই তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এরূপ অবস্থায় আর কি হওয়াই বা সম্ভব।" মিত্র-গৃহিণী টেবিলের উপরস্থিত চুরুট কেসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "কই আপনিত চুরুট খাইতেছেন না ?" এই বলিয়া ভৃত্যের নিকট গোর-স্থানের ভগ্ন ভিন্ন অংশের জমির দরদাম সম্বন্ধে আবশ্যকীয় সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মনোহরবাবু চুরুট টানিতে টানিতে উভয়ের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলেন। অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মনোনীত অংশেই জমি খরিদ সাব্যস্ত হইয়া গেল। শবাধার সমাহিত করার সময় লোকজনের কিরূপ আবশ্যক হইবে, মিত্রগৃহিণী সে সম্বন্ধে ভৃত্যকে উপদেশ দিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত বন্দোবস্ত সারিয়া ফেলিতে বলিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল। মিত্রগৃহিণী সহজ বাবুর দিকে কয়েকখানি ছবির আলবাম বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"দেখছেন তো এ অবস্থায়ও আমাকে সংসারের খুঁটি নাটি সব দেখ্‌তে হচ্ছে।" ইতিমধ্যে সহজ বাবুর চুরুটের ছাই টেবিলের আস্তরণের উপর পড়িবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া তিনি ছাই ফেলা ক্ষুদ্র 'ট্রে' টি তাঁহার দিকে আগাইয়া দিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—দেখুন—অনেকেই বলে শোকের সময় কোন কাজেই মন লাগেনা। আমি কিন্তু দেখ্‌ছি কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই বরং কিছু সান্ত্বনা পাওয়া যায়। প্রিয়জনের আত্মার কল্যাণে নিজ কর্ত্তব্যে মন দিলে দুশ্চিন্তার ভার যেন আপনা থেকেই কমে আসে।"

কথা কয়টি বলিতে বলিতে মিসেস্ মিত্র বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলেন কিন্তু রুমাল বাহির করিয়াও এবার আর চোখে দিলেন না, শুধু কিঞ্চিৎ মুখ বিকৃত করিয়াই যেন দৃঢ় ভাবে চোখের জল আটকাইয়া লইলেন।

অল্পক্ষণ পরে মিসেস্ মিত্র কহিলেন,—"শেষের ক'দিন তিনি কি কষ্টই না পেয়েছিলেন।

সহজ বাবু। তাঁর যন্ত্রণা কি বড় বেশী হয়েছিল ?

মিসেস্ মিত্র। সে যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা তা আর বল্‌বার নয়। মৃত্যুর তিন দিন আগে থেকে শুধু যন্ত্রণা চীৎকার করেছিলেন। ক্রমাগত এত যন্ত্রণা কি করে যে তিনি বরদাস্ত করেছিলেন, তা বল্‌তে পারিনে। তাঁর চীৎকার তিন বাড়ী তফাৎ থেকেও শোনা যেত। আমাকে যে কি ভোগটা ভুগ্‌তে হয়েছে ; একবার ভেবে দেখুন।

সবজজ। সে অবস্থাতেও তাঁর জ্ঞান ছিল কি?

মিসেস্ মিত্র। হাঁ জ্ঞান শেষ পর্য্যন্তই ছিল। মৃত্যুর প্রায় মিনিট ১৫ আগে তিনি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আর বড় খোকা সুধীরকে বাইরে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

যাহার অধিক বাল্যকালের স্মরণশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শৈশবের বিলাসাগারে এবং প্রৌঢ় বয়সে কর্ম্মক্ষেত্রের সহযোগিত্বে অনেক সময় কাটাইতে হইয়াছে, তাঁহার শেষ সময়ের মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া কাহার না মনে আঘাত লাগে? সবজজ বাবু স্বচক্ষে মৃত্যুর সেই শেষ দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন; সেই বিবর্ণ দেহ সেই শেষ সংশয়ী নাড়ী সমস্তই তাহার নিকট যেন প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতেছিল। নিজ পরমায়ুর অনিশ্চয়তার কথা মনে করিয়া হঠাৎ তিনিও নিতান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন তিন চারি দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যু যে আমার ভবিষ্যতেই লেখা নাই; তাহাই বা কে বলিল, সে সাংঘাতিক পীড়া যে কোনও মুহূর্ত্তে আমারও ত হইতে পারে। এ চিন্তায় তাঁহার দুই নয়নও কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু এ চিত্তবিপ্লব ক্ষণকালমাত্র। পরমুহূর্ত্তে আপনা হইতেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল "রামপ্রসন্নের অদৃষ্টে এরূপ হইয়াছে বলিয়া আমারও যে হইবে তাহার মানে কি? আমার কোষ্ঠীতে ত এরূপ যোগ-ভোগের কথা লেখা নাই, তবে মিছামিছি মন খারাপ করি কেন? আমাকেও দেখিতেছি যথাসময়ে যত হইতে হইবে। তাহার এ সব বালাই নাই—সর্ব্বদাই ফূর্ত্তি। কৈ ব্যাপারেতো কখনও বিষণ্ণ হইতে দেখি না।" কুলনাশক স্থির বুদ্ধি যে কিরূপে তাঁহার মনে এত সত্বর শান্তি আনিয়া দিল, তাহা সবজজ বাবু নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মনোহর বাবু এখন স্থির চিত্তে বন্ধুর মৃত্যুকালীন অবস্থার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সবজজ বন্ধুকে যাহার মৃত্যু সম্বন্ধে বৃত্তান্ত বলিতেছেন হইলে মিসেস্ বিশ্বাসী মিত্র মনে করিলেন আর বৃথা শুনান সময় নষ্ট না করিয়া কাজের কথা পাড়া উচিত। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রুদ্ধ বলাঙ্কার ভূমিকা না হইলেও এ সব মাটী! সুতরাং পুনরায় নিজের দুঃখ জ্ঞাপন করিতে করিতে তিনি অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন, বেগে অশ্রু মোচন, ও সেই সঙ্গে রুমাল সহযোগে ঘন ঘন নাসিকা ঘর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

মনোহর বাবু একবার সুগভীর সহানুভূতি জ্ঞাপক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিকিৎ অপেক্ষা করিতেই মিসেস্ মিত্র নিজ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কথাটা আর কিছুই নয়, সরকারী প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ও মৃত কর্ম্মচারিগণের পারিবারিক সাহায্য ফণ্ডের টাকা যাহাতে, বিশপ সাহেবের নিকট সুপারিশ লইয়া আবেদন করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাঁহার কিছু টাকা পাওয়া হইতে পারে কিনা, এবং এ সম্বন্ধে কিরূপ তোড়জোড় করা আবশ্যক; ইহাই তাঁহার জিজ্ঞাস্য।

মনোহর বাবু কথার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিলেন যে, এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে তাহা মিসেস্ মিত্র ভালরূপই জানিয়া লইয়াছেন—এখন তাঁহার নিকট শুধু একবার "পাস্ তোলা" দিয়া লওয়া হইতেছে মাত্র। এখন হিঁ গবর্ণমেণ্ট হইতে কিরূপ সাহায্য পাওয়া সম্ভব, ইহাও তাঁহার অবিদিত নাই। মনোহর বাবু ভাবিয়া দেখিলেন, এ মুহূর্ত্তের বৎসরে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হওয়া খুবই দুঃসাধ্য সুতরাং তিনি কোনরূপ বৃথা আশা না দিয়া কেবল উপস্থিত কর্ম্মচারীদিগের দৃষ্টি কার্পণ্য ও অবিচার উল্লেখে যথাবিধি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মিসেস্ মিত্র যেন নেপথ্যের ভাব দেখাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি অবসর প্রবণের সুযোগ খুঁজিতেছেন বুঝিতে পারিয়া সবজজ বাবু চুরুটের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বন্ধু পত্নীকে নমস্কার করিয়া দ্বিরাগমনের আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।

পার্শ্বের বড় ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন খাবার টেবিল পূর্ব্বের ন্যায় সাজান রহিয়াছে এবং সেই স্থূল দেহ পাদরী সাহেবটি সেখানে দাঁড়াইয়া কয়েক জন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। মিত্র সাহেব একবার নিশাসে সত্তার একটী সুন্দর ঘড়ি পরিষ্কার করিয়াছিলেন। মনোহর বাবু দেখিলেন ঘড়িটি পূর্ব্বেরই মত টিক্ টিক্ শব্দে চলিতেছে। মিত্র সাহেবের একটি

বয়স্কা কন্যা, তাঁহার ভাবী স্বামীর সহিত প্রার্থনায় যোগদান করিলেন। সুন্দরী ও তরুণী মেয়েটির আপাদ পানা মুখের রুক্ষ কঠোরতার ভাব দেখিয়া সহজেই মনে হইতেছিল যে পিতার মৃত্যুতে শোকের চেয়ে যেন তাঁহার রাগের ভাগটাই অধিক হইয়াছে। তাহার হবু স্বামী একজন নবীন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তখনও "প্রবেশনারী" শিবর ভেঙ্গে করিয়া "সব্ প্রোটেম্" রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন নাই। সরজজ বাবুকে দেখিয়া তাঁহার অপ্রসন্ন মুখ যেন আরও অপ্রসন্ন হইল। কুমারী মিত্র একটি নমস্কার করিয়া দিয়া দৃষ্টিতে বসিবার পিতৃ বন্ধুর অনুমতি চাহিয়া লইলেন। সরজজবাবু উভয়ের নিকট এরূপ অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা পাইয়া যেন হতভম্ব হইয়া গেলেন এবং হতাশভাবে উভয়কে প্রত্যভিবাদন করিয়া মৃতের ঘরের দিকে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার বন্ধুর একমাত্র পুত্র একটি চতুর্দশ বর্ষীয় বালক একাকী সেই ঘরে প্রবেশ করিতেছে। ছেলেটিকে দেখিয়া রামপ্রসন্নের বাল্যকালের মূর্ত্তি তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হইল। সেই রূপই আকার অবয়ব ঠিক সেইরূপ চাহনি। এ বয়সে রামপ্রসন্ন ও তিনি একত্রেই স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। আদিয়া ছেলেটির চক্ষু খুলিয়া উঠিয়াছিল। সরজজবাবু নির্নিমেষ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সরজজবাবু দেখিলেন বালকের মুখেও যেন ক্ষোভ ও বিরক্তির চিহ্ন বিদ্যমান। তিনি আর তাহার সহিত কথা না কহিয়া সাহস করিয়া মৃতদেহের নিকট চলিয়া গেলেন।

ক্রমে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ হইল। চারিদিকে রোষবাড়ির আলো, ধূপ ধুনার গন্ধ ও সেই সঙ্গে নিরন্তর অশ্রুপাত ও অস্ফুট ক্রন্দন। মিত্র মহাশয় রোমান কাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন বলিয়া যথাযোগ্য আড়ম্বরের অভাব ছিল না।

সরজজ বাবু অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই কান্নাকাটির ভিতর পাছে তাঁহার মন খারাপ হয়, সেই ভয়ে মৃত দেহের দিকে তিনি আর ফিরিয়াও দেখিলেন না।

অল্পক্ষণ মাথা নীচু করিয়া নিজের জুতার ডগার দিকে তাকাইয়া, সর্ব্বাগ্রেই সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তরু—তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার ছড়ি ও টুপি আনিয়া দিল। সরজজবাবু বলিলেন—"কি হারাধন, তুইও যে বড় শোক পেয়েছ দেখ্‌ছি"।

কথা কয়টি বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না কিন্তু নিঃশব্দে চলিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না বলিয়া এরূপ "আলিঙ্গেক্তা" করিতে হইল। হারাধন নেহাৎ পল্লীগ্রামের চাষা শ্রেণীর লোক, সভ্যতার মারপেঁচ সে বড় বেশী জানিত না; তাই নেহাৎ সরলভাবে বলিল—"কর্ত্তা, মোদের শ্যামতা কি যে আট্‌কে রাখি, আর কাঁদাকাটি কর্‌লেই বা করি কি, সবারইত সেই এক রাস্তা। এই নবীন বয়স্ক ছেলেটিকে এইরূপ বীরত্বের সহিত উত্তর দিতে দেখিয়া সরজজ মহাশয় কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কথা কহিবার সময় ওষ্ঠের ফাঁক দিয়া হারাধনের দন্তরূপ হাতের সারি মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইতেছিল। দাঁতগুলি বেশ সুদৃঢ়। দেখিয়াই মনে হয় এইত দিব্য নারিকেল চানিয়া ছাড়াইলেও কোনও ক্ষতি হইবে না।

হারাধন কোচম্যানকে ডাকিয়া দিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল এবং পরে সরজজবাবু কুর্ণকর্মে কোনও জিনিস ফেলিয়া যান, সেইজন্য তাড়াতাড়ি হলঘরটি পুনরায় দেখিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে সরজজ মহাশয় গাড়ীতে আরোহণ করিয়া বাহিরের সিমলা ব্যাঙ্কসেবনে কিঞ্চিৎ সুখ বোধ করিলেন—গাড়োয়ানকে হাঁকিয়া বলিলেন—"ভবানীপুর কাসারীপাড়া চল্"! আহলাদে গাড়োয়ানের পার্শ্বে বসিয়াছিল, তাহাকে বলিয়াদিলেন—"বুঝ্‌লি রে তবে—প্রথম মুখুজ্জে বাবুর বাসায়।" সরজজ বাবুকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া পাওয়াইতেই হইল না; তিনি প্রথম ক্ষেপ শেষ না হইতেই খেলায় যোগ দিতে পারিলেন।*

ক্রমশঃ

শ্রীগুরুদাস সরকার এম্, এ।

* গল্পের এই প্রথম অধ্যায় "বাল্যবন্ধু" নামে "মানসী" পত্রিকায় ১৩১৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

জননী বঙ্গ

সুখ-শোভা-সম্পদ-নন্দন-দেশ-রাণী ভারত ঝলমল অঙ্গ
জ্ঞান-কর্ম্ম চির প্রেম-ধর্ম্মভূমি নমামি জননী বঙ্গ।

মেঘাল-চঞ্চল-ঘন-ওরু-শিরোপরে চঞ্চল কেশভার দোলে,
শান্ত-শীতল ছায়া-মণ্ডিত-বন-বীথি শোভিত বক্ষ-নিচোলে,
সূর্য্য-প্রথর-তেজ চন্দ্র-কিরণঢালা ভারত ঝলমল অঙ্গ
জ্ঞান-কর্ম্ম চির প্রেম-ধর্ম্মভূমি নমামি জননী বঙ্গ।

জগদ্ধাত্রী কোলে পালিত মহীতল তব নেহারে যেলি আঁখি
রাজব্যাঘ্র তব গর্জ্জিছে অধিরত রক্ত-চরণ-তলে থাকি'
কোটিকণ্ঠ ঢালা কীর্ত্তনে নিশিদিন মন্ত্রিত তব পূতঃ অঙ্গ,
জ্ঞান-কর্ম্ম চির প্রেম-ধর্ম্মভূমি নমামি জননী বঙ্গ।

শিল্প-শালিত-কলা-গীত-ছন্দ-সুরে কণ্ঠ ভূষিত মণি-হারে
আকুল অলিকুল-বকুল-স্নেহকোল রঞ্জিত বনফুল-তারে
চুম্বিত-ললাটট ভাগীরথী-বেষ্টনা অমৃত জননী-হৃদ
জ্ঞান-কর্ম্ম চির প্রেম-ধর্ম্মভূমি নমামি জননী বঙ্গ।

অন্নপূর্ণা আজি ক্ষুধা-জীর্ণ জনে স্নেহ-অন্ন দিলে ঢালি'
পতিতোদ্ধারিণী আত্মা-আলোক-ওরে চিত্তে বিরাজ দীপ জ্বালি
অমিত ভাগবত-পুরাণোপনিষদ-বিজ্ঞান-ঝলকিত-অঙ্গ,
জ্ঞান-কর্ম্ম চির প্রেম-ধর্ম্মভূমি নমামি জননী বঙ্গ।

নাচিছে অতনু প্রাঙ্গন-লতাতলে গীতরত বিহগ পাখী,
মন্দ-মলয়ানিল-চামর দোলিত অমৃত-প্রাণ-সুধা মাখি
অম্বর মণ্ডিত নীল চন্দ্রাতপ-তারকা-ঝলমল-অঙ্গ,
জ্ঞান-কর্ম্ম চির প্রেম-ধর্ম্মভূমি নমামি জননী বঙ্গ।

ভুবন-জন-প্রাণ-মোহন-ঘন অদ্রি, সিন্ধুর সুরভি মাতা,
মাতৃমূর্ত্তি অলে রাজরাজেশ্বরী সিন্ধু গাহিছে জয় গাথা,
বৈষ্ণব-কবি-শত শ্লোক-শ্লোকাবলী রবি-দীপ্তি-মুখরিত-অঙ্গ,
জ্ঞান-কর্ম্ম চির প্রেম-ধর্ম্মভূমি নমামি জননী বঙ্গ।

দেশ দেশ ভরি পণ্যভার তব অন্ন ধন দিল দীনে
যুগ যুগ ধরি' প্রেম-মন্ত্র-ধ্বনি, অর্পিলে প্রেম-দয়া হীনে
স্বামী-স্বার্থ-পদে নারী-স্বার্থ বলি বন্ধ করিল পতি-সঙ্গ,
জ্ঞান-কর্ম্ম চির প্রেম-ধর্ম্মভূমি নমামি জননী বঙ্গ।

অতুল-শান্তি-গুণ্ডা, সত্য-জ্ঞান-ধ্রুব-মন্ত্র-দান কর দাসে
যাত্রা-সরণী-ধূলি মধুর করি' দেহ মণ্ডিত করি' শত ত্রাসে,
সুখ-শোভা-সম্পদ-নন্দন-দেশরাণী, ভারত ঝলমল অঙ্গ,
জ্ঞান-কর্ম্ম চির প্রেম-ধর্ম্মভূমি, নমামি জননী বঙ্গ।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

অবসান

ওগো, সেদিন আমার বেশ মনে আছে যেদিন ছেলে-পিলেরা ভাল ভাল পোষাক প'রে সেজে-গুজে বেড়াচ্ছিল। সেদিন—সেদিন ওগো, যেদিন প্রতিবেশিনীগণের সব ছেলেপিলেরই গায়ে একটা ক'রে যথাসময়ের প্যাণ্ট্‌লান আঁটা। আমার সোহাগের—বড় সোহাগের ছেলে সেদিন তা'র প্রতিবেশী ভায়ের সঙ্গে খেলা করবার জন্য খিড়্‌কি খ'ুলতে দু'পা না ডিঙাতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে, তার ছোট ছোট মোলায়েম হাত দু'খানি দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে,—মা গো, দেখ্‌, দাদা কেমন একটা চক্‌চকে খুব ভাল পোষাক প'ড়ে, তোকে দেখাতে আস্‌ছে। মা—মা—সে কেমন আমার সঙ্গে লাগানো কেমন—কেমন একটা এই পা পর্য্যন্ত—। শিশুর আর আর অস্পষ্ট কথা আমার বুঝ্‌তে বাকী রইল না। আমি তা'র কচি কচি গাল দু'খানিতে চুমো খেয়ে কাজরদুরে ব'লে উঠ্‌লাম,—বাছা আমার! সে সিল্কের 'নেকার-বোকার'।—সে যে বড় লোকের ছেলের 'নেকার-বোকার'। সোহাগের ছেলে আমার আরো সোহাগ বাড়ায়ে বল্‌লে,—মা, তুই-তুই আমিস্ সে কি! অত বড় নাম আমার মনে থাক্‌বে না। মা—মা—আমি যে তোর ছোট ছেলে—আমার যে মা ছোট বুদ্ধি!

আমার স্বামী বড় সোহাগ ক'রে আমার খোকার নাম রেখেছিলেন—বুল্‌বুল্। ওগো, সে রাত্তিরের কথা আমার বেশ মনে আছে। ওগো, সে কথা বুঝি মা ব'লে গেলেও থাক্‌বে!—ঘরে খোকা, আমি আর আমার স্বামী ছিল। খোকা তা'র ভুবন ভোলান মুখখানি দিয়ে ঘর আলো ক'রে ঘুমুচ্ছিল। স্বামী আমার তা'র মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন। ওগো, অতটা স্নেহ দিয়ে চাহনি বুঝি বা তিনি আর কোন দিন চা'ন নি। চেয়ে চেয়ে চেয়ে তিনি বল্‌লেন,—কুসুম! আমি ওকে বুল্‌বুল্ ব'লে ডাকি কেন জান? যখন আফিসে বাবুদের অপমানসূচক তিরস্কার বাক্য আর সহ্য করতে না পেরে, হুল ক'রে চোখে পোকা গাছে ব'লে দু'হাত দিয়ে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে একবার এ্যাপ্রেন্টিশ্ কেরাণীর আসন খানি মুহূর্ত্তের জন্য ছেড়ে দিয়ে, হৃদয়ের জ্বালা একটু উপশমের আশায় বাইরে এসে উদার আকাশে মুক্ত বাতাসের দিকে চাই—যখন সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ আফিস-ঘর হইতে বাইরে এসে অসীম রাজ্যের দিকে তাকাই—তখন—তখন কুসুম! অসীম রাজ্যের রাজা আমাকে সুখ দিতে ভোলে না। দেখি, উপরে নীলাকাশ করুণার শতধারা নিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে। দেখি, বাসুদের শত শীতলের ব্যথা প্রলেপ স্বরূপ—বাতাস ধীরে ধীরে বহাইয়া দিয়া চলিয়াছে! আর দেখি—সুখের উপর সুখ—স্বর্গশ্রেষ্ঠ বিশাল সেই সহস্রখানা বিশাল সেই নারিকেল বৃক্ষের উপর!—সেই বুল্‌বুলি—সেই প্রাণের বুল্‌বুলি—সেই সব তা'দের প্রাণের আবেগে সেরে চলেছে!—সেখানে নৈরাশ্য নাই—কেবল সহানুভূতি! তা'রি মধ্যে আমি যে কি আনন্দ পাই বল্‌বার নয়। আর—আর—কুসুম! সেই আনন্দ, সেই বুকভরা আশা, সেই সহানুভূতির প্রতিচ্ছবি আমি এই—এই—খোকার সুন্দর মনোমোহন মুখখানিতে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। তাই—তাই—কুসুম! আমি খোকাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ডাকি, বুল্‌বুল্। সে রাত্তিরে আরো কত কথা তিনি বলেছিলেন। একটার পর একটা, তারপর একটা, তারপর আর একটা।—কেবলি দুঃখের কাহিনী, কেবলি দরিদ্র জীবনের বুকভরা দীর্ঘশ্বাস! শৈশবে মুখের ক্রোড়ে তিনি কিরূপে পালিত হ'য়েছিলেন—অত্যধিক আদরে-সোহাগে পিতার কনিষ্ঠ পুত্র তিনি কিরূপে তাল

পড়াশুনা করিতে পারেন নাই—কিরূপে পড়াশুনার অভ্যাসই তাঁহার কাল হইল। বৃদ্ধ পিতা মাতার মৃত্যুর পরই কিরূপে দেশে বিদেশে বিস্তৃত তাঁহার বিদ্বান্ বড় ভাই সমস্ত সম্পত্তির একা মালিক হইব বলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে নিঃসহায় অবস্থায় ২৪।২৬ বছরের সময় তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—তাঁহার সহিত আমার বিবাহের কথা। তাঁহার তখন বয়স ২০ বৎসর। তিনি তখন পূর্ণ মাত্রায় পৈতৃক বিষয়ে ভোগী। সেই সুখের দিন—সেই আনন্দের দিন। আমি বড় লোকের মেয়ে, তিনিও বড় লোকের ছেলে। তিনি আমাকে উপযুক্তভাবেই সুখে রেখেছিলেন। তারপর—তারপর—সব ফুরাইল। তিনি ব্যারিষ্ট্রেট আফিসে ১০ টাকার এ্যাপ্রেন্টিস্ হইলেন। কপাল আমার! আমার বাপের বাড়ীরও সব গেল! তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আমি রাজরাণী হইতে পারিতাম—তিনিই আমাকে বিবাহ করিয়া ভিখারিণী করিয়াছেন! তিনি তারপর সাগ্রহে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন,—ফুল্লু! তোমার সমাধাস্তময়ী মুখ আমাদের দুঃখের আঘাতে প্রথম প্রথম আমাকে খুব শান্তি দিত। আমি সব আশা ভুলে যেতাম্—কিন্তু—কিন্তু ও মুখ আর আমাকে সান্ত্বনা দেয় না! আমি বুঝ্‌তে পারি—ওগো, আমি বুঝ্‌তে পারি, তুমি তোমার অমলনিষ্কলঙ্ক মুখখানি হাসি দিয়া ঢাকিয়া আমাকে দেখাইতে চাও। তুমি নিজে না খেয়ে আমাকে খোকাকে পেট ভরে খেতে দাও। তা' দেখে আমার মন একেবারে ভেঙ্গে যায়!

এতগুলি কথা এক তারে বেহাগসুরে বাজিয়া যাইতেছিল। একটি করুণ সুরের ধারা নদী, পাহাড়ের গা দিয়া বহিয়া বহিয়া বহিয়া যেমন দূরে গিয়া পড়ে, আবার দূর হইতে সাগরে মিলিত হইয়া যতই সমুখ পথে অগ্রসর হয়, ততই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া পড়ে—তাহার সীমা দেখা যায় না—তদ্রূপ তাঁহার কথাগুলি প্রথমে ধীর—ধীর হইয়া ক্রমেই অনুরণন্ হইয়া উঠিতেছিল—বোধ হইতেছিল ইহার সীমা নাই—ইহা যেন ছাপাইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। আমি ইহার প্রতিবন্ধকের আর কোন উপায়ই না দেখে খোকাকে টিপিয়া দিলাম। খোকা ঘ্যাং করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। খোকার কান্নাই তাঁহার বাক্য-স্রোতের বাঁধ হইল। স্বামী আমার খোকাকে কোলে করিয়া আর আমার পাশে বসিয়া সকল কষ্ট তখনকার মত ভুলিলেন।

এইরূপে সে আমাদের জীবনটা একটা দারুণ নৈরাশ্যের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল! প্যাণ্ট লাল-পরা রামার পাশে পাশে পাশে বুল্‌বুল্ নাচিতে লাগিল। সে মাচ আমার মনে বড়—ওগো, বড় বাধা দিল—আমার স্বামীর মনেও দিল। আমি আমার স্বামীর মনের ভাষা বুঝ্‌তাম—তিনি আবার আমার প্রাণের ভাষা বুঝ্‌তেন। ওগো, আমাদের অভ্যাস হ'য়ে গিয়াছিল যে!

আমার স্বামী বলিলেন,—ওগো! আমাদের বুল্‌বুলের পোষাক না দেয়েই এত আনন্দ! তা'কে যে একটা পোষাক দিতে হ'বে গো! ওগো! আমি বোসেদের বাড়ী থেকে ৫৲ ৬৲ ধার ক'রে নে' এসে আমি যে তা'র একটা প্যাণ্ট লাল কিনে দেবো। পাঁচ টাকা আমি পাঁচ মাসে শোধ কর্‌ব। তাঁ'রা কিছু বল্‌বেন না। আমি বুল্‌বুলকে পোষাক দেবো—দেবো—দেবো। না দিয়ে কিছুতেই থাকতে পার্‌ব না।

না পেয়ে যে আনন্দ করে সে, সে পেয়ে কি রকম আনন্দ করে গা! বুল্‌বুল্ তার সাঁচ্চা জরি ঝোড়া 'মেকাও-বোকারটি' পরে সেই যে সকালে পাড়ার বাসী-দিদিদের দেখাতে গিয়েছিল, তারপর যাহা যখন বাড়ী এল; তখন বেলা বারোটা। সে এসেই বল্‌লে,—মা, আমি ঠাকুর—কত ঠাকুর দেখ্‌ছিলাম। মা, দেখে আবার আমি এখনি যাব ঠাকুর দেখ্‌তে। আমার স্বামীর মুখ সেদিন যেমন প্রসন্ন দেখাচ্ছিল, ওগো, তেমনটি যে আমি আর দেখিনি! ওগো, সে যে গ্রীষ্মের প্রাতঃ খোলা হাসি!

ওগো! পূজার ছুটির সেদিন বাইরে কতক সুখ ছিলের উঠেছিল গো! আমাদের মত সুখী আরো কেউ ছিল নাকি গো? ওগো, সেদিন যে আমরাও রাজার চেয়ে সুখী! আমাদের বুল্‌বুল্ যে রাজা-রাজাদের মতই

সেজে-গুজে সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গেল · ঠাকুর দেখেই বেড়াচ্ছিল !

বুলবুল্ বড় আনন্দে নাচ্‌তে নাচ্‌তে রান্নাঘরে এসে বল্‌লে,- মা গো, দেখ্ দেখ্ আমাকে কেমন সোণার মত দেখাচ্ছে। বোসেদের ঠাকুর দালানে যেমন আলো জ্বলে উঠ্‌ল, আমার পোষাকও অমনি ঝক্‌মকি সোনা হ'য়ে উঠ্‌ল। মা, বাবা আমার পোষাক সকালে কি দেখেছে ! রাত্তিরে যে এ পোষাক এমন ঝক্‌মকি সোনা হয় বাবা তা' কখ্‌খন জানে না। আমি তা'কে ও ঘরে নিয়ে এখুনি দেখা'ব।

গরীবের বলই যে কম গো ! গরীবের ঘরের মিটমিটে আলোর সে বল কই ? বোসেদের বাড়ীর চোখ ঝল্‌সান আলোর শক্তি গরীবের ঘরের আলো ধর্‌বে কেন গা ?

বুলবুল্ বল্‌লে,—বাবা, দেখ না, আলো বেশী ক'রে উস্কে দিই, তা'হলে ঠিক বোসেদের বাড়ীর মত পোষাক ঝল্‌মল্ কর্‌বে।

ও কি গো ! বুলবুলের পোষাক দেখে আমার স্বামী অত চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌লেন কেন গো ! ও কি অলক্ষণ গা ! আমি তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হ'তে উঠে গিয়ে দেখি, আমার সোনার বুলবুল্ তার সোনার পোষাকের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে পুড়্‌ছে। স্বামী আমার প্রাণপণে তার পোষাক খুল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছেন। পরে তিনি আমার বুলবুল্‌কে আঁকড়ে ধ'রে পোষাক খুলে ফেল্‌লেন। 'ওহো ! বুলবুল্ যে আমার বড্ড পুড়ে গিয়েছে গো !' — আমি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম !

ওহো ! প্রদীপ উস্কোতে গিয়ে আমা ঘরে এমন হ'ল গো—বলিয়াই আমার স্বামী ডাক্তার আন্‌তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলেন। প্রতিবেশিনীগণ ও আমি বুলবুল্‌কে লইয়া থাকিলাম।

'ওগো একি হ'ল গো ! সব গেল- সব গেল ! যেটুকু আলো প্রাণে জ্বল্‌ছিল সেটুকুও নিভে আসে যে ! বাবা আমার—প্রাণের বুলবুল্ আমার ! এখনই তিনি গাড়ী ক'রে ডাক্তার নিয়ে আস্‌ছেন। না—না—উঃ নিভ্‌ল—নিভ্‌ল—ঘাঃ সব শেষ হ'য়ে গেল !' আমার হা-হুতাশ ক্রন্দন দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া গেল ! আমার সর্ব্বনাশের পরই গাড়ী আস্‌তে দেখা গেল। আমি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লাম,—ওগো, আর ডাক্তার এনো না।—এনো না—এনো না ! বুলবুল্ বেশ আছে ! কোমল কুমার—কঠোর ঘরে থাক্‌বে কেন সে ! যাহা আমার বেশ আছে, ওগো স্বামিন্ ! সে বেশ আছে ! আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলাম।

উঠে যা দেখ্‌লাম, সে কি ভীষণ,—উঃ সে কি ভয়ঙ্কর ! সে দৃশ্য আমি আর জীবনে দেখিনি ! জগতের কেহ দেখিয়াছে কি না জানি না ! দেখিলাম—আমার সম্মুখে আমার প্রাণের বুলবুলের মৃতদেহ, আর তা'রই পার্শ্বে আমার স্বামীর রক্তাক্ত মৃতদেহ ! স্বামী আমার যাতনায় ছট্‌ফট্ কর্‌তে কর্‌তে পাগলের ন্যায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ডাক্তারের উদ্দেশে ছুটিছিলেন। পথে গাড়ীতে তিনি কাটা পড়েছেন ! ওগো ! যা'কে আমি ডাক্তারের গাড়ী মনে করেছিলাম সে গাড়ী আমার—আমার স্বামীর মৃতদেহ ব'য়ে আন্‌ছিল গো !

এখন আমি পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াই গো ! সব স্ত্রীলোকদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, তা'দের স্বামী, তা'দের পুত্র কবে মর্‌বে গো ! কি জানি, কেন তা'রা আমাকে ওই কথা বল্‌তেই মার্‌তে আসে ! আমি পালিয়ে যাই—আর খুব হাঁসি ! ওগো, ভাগ্যি আমার বুলবুল্, ভাগ্যি আমার স্বামী মরেছিল, ওগো তাইত গো—তাইত গো, আজ আমার এত সুখ ! এখন আমার হাসা নাচাই কাজ গো ! ওগো, এখন আমার কেমন ভাল পোষাক ! আগে সাদা সাদা কাপড় পর্‌তাম—এখন—এখন কেমন রঙ্ বেরঙ্গের লাল—সেরিয়াখা লাল, কাল, বেগুনে কাপড় পরি। ওগো, আগে কি ছাই কেবল সরু সরু ছ'গাছি শাঁখের শাঁখা পর্‌তাম। ওগো, এখন দেখ দেখি,—হাতে, গলায়, পায়ে সব জায়গাতেই কেমন মোটা মোটা মানুষ-গড়ন হাতের গয়না ! আগে কি ছাই বাড়ীতে পড়ে থাকৃতাম ! এখন দেখ, কেমন শ্মশানে শ্মশানে, বনে বনে, কেমন নেচে হেসে বেড়াই গো ! ওগো ! আমি একবার চুপি চুপি আমার বুলবুলের, আমার স্বামীর বাড়ী

দিয়ে বিশ্বটা হাসি হেসেছিলাম। প্রতিবেশিনীগণ বলেছিল,—ওরে দেখ্ দেখ্। স্বামী-পুত্রহারা হতভাগিনীর আবার হাসি শোন্‌রে! ওগো! তা'রা বোঝে না— ওগো; তা'রা বোঝে না গো! যা'রা শুধু শুধু শোক পায় তা'রাই কাঁদে!—বড় দাগা যা'রা একবারে পেয়েছে কাঁদাই তা'দের জীবনের একমাত্র কাজ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চরণ-আশ্রিত

আমি তোমারি কারণে
মরণে বাঁধিনু সব গো।
তবু তোমারে ব'ব না ছাড়া
ঘরে ঘরুক এ-আঁখি
সাধনা রহিবে আমি গো
মম জনম জীবন ভরা॥
বক্ষ রেখাটী নিঠুর আঘাতে
ছুটিয়া যদিও উঠে গো।
মরম বন্ধ অশনির ঘায়
যদিও আমার টুটে গো।
তুমি সহাস আননে চেয়ো মোর পানে সখা হে।
সকলি যাবে গো ভুলায়ে।
ব্যথাভরা বুকে চরণ সুখে
অকূল আমি ভাসিব
মরমে আমার তব পদতার
আদরে ধরিয়া রাখিব।
তবু শেষ দিনে বঁধু হে
দিও জীবনে আমার মধু হে॥

যদি গো দেবতা দারুণ দহনে
ফেলায় করেগো শুকায়ে
জেনোরি হৃদয় অমৃত পুরের
এক কোণে রেখো লুকায়ে॥
শুধু সেই দিন দয়িত
যেন ভুলায় না হই দলিত।
ভীম কল্লোল ভীষণ তুফান
ঘন বর ঘটি ঝড় গো।
ঝিলিক হানায় গভীর নিশায়
বাজ্ বাজে কড়্ কড়্ গো—
মরণ দোলায় দুলিব
তবু তোমারে কভু না ভুলিব॥
নিখিল ধরায় সব কালো হ'য়ে
নয়নে আমার লাগিবে।
সংসের গায় রক্ত ছুটাইতে
পরাণে আমার লাগিবে।
রঙীন করিব জগতে
দিও ঠাঁই তুমি চরণে॥

শ্রীঅতুলকুমার ভাদুড়ী।

বহুরূপী

(১)

ভগবান্ মরীচিমালী নীয় মযূখমালা একত্র করিয়া তখনও অস্তাচলচূড়াবলম্বী হন নাই, পক্ষীকুল তখনও আহারান্বেষণে নিযুক্ত হইয়া কুলায়াভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করে নাই, গোষ্ঠ হইতে গাভীদল বৎসসহ কেবল যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছে,—এমন সময় একদিন সান্ধ্য-সমীরণ সেবন মানসে পদ্মাতীরে বীর মন্দগতিক্ষেপে ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে উপবেশন করিয়া প্রকৃতির-বিচিত্রতা, প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। উজান ভাটি উভয় দিকেই তরণীগুলি যাইতেছে, দেখিতে দেখিতে মনে হইল এই "উজান ভাটি" ভাব-জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সংসারে, কর্ম্মক্ষেত্রে, ধর্ম্মসাধনে, এমন কি নিজের দেহমধ্যেও সর্ব্বদা 'উজান ভাটি' বর্ত্তমান। উজান পথ কত কষ্টসাধ্য ও তাহার গতি কত ধীর; ভাটির পথ কত সুগম ও গতি কি উদ্দাম। উজান নৌকাগুলি কখন একটু মৃদু-বাতাস পাইবে এই আশায় পাইলগুলিকে প্রস্তুত রাখিয়াছে, মৃদু-বাতাস পাইলেই পাইল উঠাইবে, তখন আর 'গুণ' টানার প্রয়োজন হইবে না, কিন্তু আমার ভাগ্যে যদি কখনও সুবাতাস আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার জন্য আমি কৈ প্রস্তুত হইতেছি? এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছি, সহসা নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ হইতে একটি 'বহুরূপী' (সরীসৃপ বিশেষ) আসিয়া আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া আমার সম্মুখবর্ত্তী হইল। দেখিতে দেখিতে বহুরূপীর বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। আমি অবজ্ঞাসহকারে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলাম "বহুরূপী"। বহুরূপীও তীব্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বারেক চীৎকার করিয়া চরিত্রের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইল। বহুরূপীর অর্থহীন চীৎকার অনন্তে মিশিয়া গেল, কিন্তু তাহার ঐ চীৎকার আমার হৃদয়ের প্রতি স্তরী কাঁপাইয়া প্রাণের ভিতর বাজিতে লাগিল। আমার বোধ হইল বহুরূপী যেন আমার কথার প্রত্যুত্তরে আমাকে উপহাস করিয়া বিকটহাস্য সহকারে বলিল, "তুমি কি?"। "তুমি কি" শব্দ আমার মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া যেন প্রতিধ্বনিরূপ ধরিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। পুণ্যতোয়া পদ্মাবতী 'কুল' 'কুল' শব্দে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "তুমি কি?" পক্ষীগণ—"তুমি কি" "তুমি কি" শব্দ করিতে করিতে কুলায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। চন্দ্রমা ক্রমে সহাস্যে উদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি?" নক্ষত্রগুলি একটি একটি করিয়া মিটি মিটি চাহিতে চাহিতে বহুরূপীর সঙ্গে যোগ দিয়া দূর হইতে ব্যঙ্গস্বরে বলিতে লাগিল "তুমি কি"? শঙ্খ ঘণ্টা "তুমি কি?" শব্দে দেবালয় প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল, নদীগর্ভ প্রতিধ্বনি ছলে সেই "তুমি কি" শব্দে যোগদান করিল। সমস্ত প্রকৃতি সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি?"।

(২)

বাস্তবিক আমি কি? আমি ত বহুপদাদিবিশিষ্ট বিদ্যা বুদ্ধি কুলশীল সম্মান নামধারী ব্যক্তি বিশেষ। বহুরূপী অপেক্ষা অনেক উন্নত জীব। তবে সে কেন আমাকে উপহাস করিবে? চিন্তা করিয়া দেখিলাম, বুঝিলাম আমি নিজেও বহুরূপী; তাই বহুরূপী আমাকে বলিয়াছে "তুমি কি?" অর্থাৎ তুমি নিজে বহুরূপী হইয়া বহুরূপীকে অবজ্ঞা কর, তোমার ন্যায় স্বার্থান্ধ বিশ্বাসী জগতে আর কে?—ইহাই বহুরূপীর চীৎকারের অর্থ।

(৩)

"আমি কি?" তাহা ত কখনও চিন্তা করি নাই। আমার স্বরূপ? আমার ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তনকেই বুঝি। বহুরূপীর পরিবর্ত্তন ত কয়েকটী বর্ণ পরিবর্ত্তনে সীমাবদ্ধ; আমার পরিবর্ত্তন যে অনন্ত, অসীম। আমি ত বহুরূপে

বহুভাবে অবস্থান করিতেছি ; কৈ আমাকে ত বহুরূপী বলিয়া এতদিন ধারণা হয় নাই। শিশুকালে যখন মাতৃক্রোড়ে অবস্থান করিতাম, মাতার স্পর্শ ব্যতীত অন্য স্পর্শ যখন আমার দুঃখকর ছিল, তখন আমার যেরূপ ছিল, তাহা ত এখন কল্পনায়ও আনিতে পারি না ; কৈশোরে যখন কামাদির গন্ধমাত্র ছিল না, কেবলমাত্র সঙ্গিনিসের সহিত অকৃত্রিম ভালবাসায় বদ্ধ ছিলাম, যৌবনের উন্নত অবস্থায় সে পূর্ব্বাবস্থার জ্ঞান ত আমার ছিল না। প্রৌঢ়ে পুত্রকন্যাগণসহ যেরূপে ছিলাম, বার্দ্ধক্যে এখন পৌত্র-প্রপৌত্রাদির সহিত আমার যে সেরূপ নাই, তাহা আমি এখন কেমন করিয়া বুঝি। আমি পিতার পক্ষে পুত্র, পুত্রের পক্ষে পিতা ; স্ত্রীর পক্ষে স্বামী ; প্রভুর পক্ষে ভৃত্য, ভৃত্যের পক্ষে প্রভু ; গুরুর পক্ষে শিষ্য, শিষ্যের পক্ষে গুরু — ইত্যাদি নানারূপে বর্ত্তমান। সম্বন্ধভেদে এক এক জন আমার এক এক রূপ দেখে। তবে আমার স্বরূপ কি ? বাস্তবিকই ত আমি একটী বহুরূপী, — ঠিক বহুরূপী। যখনই যেরূপ অবস্থা ও যে ব্যাপারের সহিত আমার সংযোগ হয়, তখনই আমি ঠিক তাহাই। আমার ত কোন নির্দ্দিষ্ট স্বরূপ অবস্থা দেখিতে পাই না। আমার অনন্ত অবস্থা ; অনন্ত অবস্থার সংযোগ-বিয়োগে আমার অনন্ত অবস্থা আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। দেশ কাল পাত্র ভেদে সংযোগের ভেদ হইয়া আমি বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছি ; আবার এক আমিই আমার হর্ষ-বিষাদ-লোভ-মোহাদি-সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি। তবে আমি কি ? আমার প্রকৃত স্বরূপ কি ? আমার দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিলেও ত আমার স্বরূপ দেখিতে পাইব না। দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিলে রক্ত, মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অস্থি মাংসাদি ত "আমি" নয়, কারণ আমি তাহাদের দ্রষ্টা, তাহারা দৃশ্য। এই দেহও ত আমি দেখি, অতএব দেহও "আমি" নয়! তবে "আমি কে ?" এতদিন যে আমাকে আমি না জানিয়া কেবল "আমার আমার" করিয়াছি, এই বা কি অদ্ভুত ভ্রান্তি ! চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ পাগল হইয়া উঠিল। আমি বর্ত্তমান, আমার আমিত্ব আমি অনুভব করিতেছি, অথচ আমি কে জানি না। জগৎব্রহ্মাণ্ড সমস্তই আমার জ্ঞানের বিষয়, কেবল "আমি"ই আমার জ্ঞানের বিষয় নয়, কি আশ্চর্য্য ! এ চিন্তায় সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। তখন গুরুদেব সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আকুল হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতঃ ! "আমি কে" আমাকে বলিয়া দেন ও বুঝাইয়া দেন।

(৪)

গুরুদেব সস্নেহে, আমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—বৎস। "আমি"র স্বরূপ অবস্থা বুঝিতে হইলে, প্রথমে "আমি"র বিরূপ অবস্থা বুঝিতে হইবে। বিরূপ অবস্থা বিশেষরূপে না বুঝা পর্য্যন্ত স্বরূপ অবস্থা বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা, আকাশে গন্ধর্ব্বনগর স্থাপনের ন্যায় অলীক কল্পনামাত্র। আমার উপস্থিত অবস্থাই আমার বিচার ও জ্ঞানের বিষয়। আমার এই বিরূপ অবস্থায় স্বরূপের উপদেশ আমার নিকট বিরূপ বলিয়াই বোধ হইবে, কাজেই এই উপস্থিত অবস্থার বিচার দ্বারা আমার বিরূপ অবস্থার জ্ঞান সংস্কারে দৃঢ় হইলে, অর্থাৎ আমার বিরূপ অবস্থাকে বিরূপ বলিয়া বুঝিলে, স্বরূপ অবস্থা স্বতঃই প্রকাশ পাইবে। স্বরূপ অবস্থা স্বপ্রকাশ ; উপদেশ দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করা যায় না। উপদেশ দ্বারা বিরূপ অবস্থার জ্ঞান জন্মান যায় মাত্র। অতএব তুমি সাবহিত্তচিত্তে আমার উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজে বিচার করিতে থাক, ক্রমে তোমার ধী নির্ম্মল হইলে সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপ (অবস্থা) স্বতঃই তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে।

(৫)

"বৎস। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, আমাতে দুইটী অবস্থা বর্ত্তমান। একটী দেহ-যুক্ত অবস্থা ও অপরটী দেহাতীত অবস্থা। দেহাতীত অবস্থার অর্থ মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা মনে করিও না। এই দেহ বর্ত্তমানেই একটী দেহাতীত অবস্থা আমাদের জ্ঞানে উপলব্ধ হয়। সুষুপ্তাবস্থায় যখন কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য থাকে না, যখন লোভ-মোহাদির কোন কার্য্যই জ্ঞান-গোচরে আইসে না,

তখনও আমি থাকি, শ্বাস-প্রশ্বাসই তাহার 'প্রমাণ। "আমির" অভাবে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না ও শ্বাস-প্রশ্বাস অভাবে দেহ থাকে না ইহা প্রতিনিয়তই দেখিতেছি। এই সুষুপ্তি অবস্থায় 'আমার' সহিত দেহের সম্পর্ক থাকে না বলিয়াই, দেহ-ধর্ম্মের দ্বারা আমি আক্রান্ত হই না। এই অবস্থা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকল জীবেই এক। এ "আমি" বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় না, দেশ কালাদি দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন হয় না, এ "আমি"—নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"। আমার জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানেও এ "আমি"র পার্থক্য দেখিতে পাই না, কালে সুষুপ্তি অবস্থা সকলেরই এক দেখিতে পাই। আমির দ্বিতীয়াবস্থা দেহ-সংযোগে। দেহ পরিবর্ত্তনশীল, দেহ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান জন্মায়, কাজেই আমার জ্ঞান ও পরস্পর ভিন্ন। সেইজন্যই দেহযুক্ত আমি, যে অবস্থা বা বিষয়কে এক সময় ঠিক বলিয়া ধারণা করিয়া থাকি, কালে দেখি, তাহা বেঠিক। কারণ দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার বুদ্ধিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন শীল অবস্থায় জ্ঞান যে অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, ইহা উন্মাদেও কল্পনা করে না। কাজেই এই দেহ জ্ঞান লইয়া "আমি" বুঝিতে গেলে আমার স্বরূপ দেহাত্মরূপই হইবে, অতএব "আমির" পরিবর্ত্তন হইবে, স্বরূপ অবস্থা কখনই জ্ঞানের বিষয় হইবে না। সমগতিবিশিষ্ট তরণী-যুগল পরস্পরকে গতিহীন বলিয়া বিবেচনা করিলেও স্বরূপতঃ উভয়েই যেমন গতিশীল, সেইরূপ এই দেহজ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাকে স্থির বলিয়া ধারণা করিলেও সে অবস্থার পরিবর্ত্তনে কোন বাধা জন্মিবে না; তীরবর্ত্তী প্রত্যেক স্থির ব্যক্তি ঐ উভয় নৌকাকে যেমন গতিশীল দেখে, সেইরূপ দেহ বিযুক্ত অবস্থায় আমির স্বরূপ জ্ঞানশালী মহাত্মারাই দেহীর এই কল্পিত স্থির জ্ঞানকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া মনে করেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে—এই দেহবিযুক্ত "আমির" স্বরূপ অবস্থা কি? এবং কোন্ প্রয়োজনে তিনি দেহযুক্ত হইয়াছেন এবং এই দেহদ্বারাই সেই 'স্বরূপ' আমির জ্ঞান লাভ সম্ভব কি না?

বৎস! একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে, আব্রহ্মস্তম্ব সমস্ত জীব একমাত্র সুখের আশাতেই ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। এই সুখলিপ্সা দেশকালপাত্র অপেক্ষা করে না। আহার, নিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি স্বাভাবিক কার্য্যগুলি চিন্তা করিলেও দেখা যায়, উদ্দেশ্য—একমাত্র সুখই। বৎস! একবার কল্পনা বলে জগৎ হইতে সুখের আশা লোপ করিয়া দিয়া জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ—জগৎ সচল কি অচল। সুখের অভিলাষ ভিন্ন কোন কার্য্যে আসক্তিই সম্ভব নয়। ইহা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে সকলেই সুখ চায়। কিন্তু অপরদিকে দেখিতে পাই সুখের আকাঙ্ক্ষা কাহারও কোনও অবস্থাতেই নিবৃত্ত হয় না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কোনও সুখের বস্তু লাভ করিয়া কাহারও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়াছে, এ-ঘটনা কোনও ইতিহাসে সাক্ষ্য দেয় না। এই উভয় অবস্থা চিন্তা করিলে ইহাই অনুমিত হয়, যে সুখ আমার আকাঙ্ক্ষার বিষয় বটে, কিন্তু যাহাকে সুখের আধার কল্পনা করিয়া ধাবিত হইতেছি, তাহা আমার সুখের বা আকাঙ্ক্ষার বিষয় নহে, নতুবা তাহাতে আমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইত। এখন আমার সুখের বা আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত বিষয় কি ইহাই বিচারের বিষয়।

আত্মার আত্মস্বরূপেরই অভাব। এই অভাববোধ আত্মার ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট হইবার পূর্ব্বে। আত্মা ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট দেহ ধারণ করার পর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ যোনি হইতে যোন্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংস্কারে দৃঢ় বদ্ধ হইয়া সেই আত্মাই তোমার উপস্থিত দেহে বর্ত্তমান। এই দৃঢ় দেহ সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার পক্ষে তাহার আদিম আকাঙ্ক্ষার বিষয় অনুধাবন এখন কল্পনারও অতীত। কারণ এখন দেহের বা ইন্দ্রিয়ের অভাবকেই আত্মা নিজের অভাব বলিয়া মনে করে ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় দ্বারাই সেই অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে, ফলতঃ তাহাতে ইন্দ্রিয়ের সুখ হইলেও আত্মার অভাব দূরীভূত হয় না, আকাঙ্ক্ষা থাকিয়াই যায়। সেই জন্য বলি, যদি তোমার প্রকৃত অভাবের বিষয় কি তাহা জানিতে চাও, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-সংস্কারবিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা তাহার বিচার

না করিয়া, আত্মা প্রথমতঃ যে অবস্থায় অভাব বোধ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় অবস্থান কর, তাহা হইলেই তোমার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার বিষয় কি তাহা বুঝিতে পারিবে ও সেই অবস্থাতে আকাঙ্ক্ষার বিষয় পুনঃ প্রাপ্ত হইলে তোমার সব অভাবের অভাব হইবে। বৎস! মনে করিও না—আত্মার স্বরূপ অবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থা এক। উভয় অবস্থাতেই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অভাব থাকে বলিয়া উহাদের একাংশে তুলনা করা হয় মাত্র। স্বরূপতঃ উভয় অবস্থা বিপরীত—একটি "জ্ঞেয়"র গাঢ় অবস্থা, অপরটি "সত্ত্বের" প্রকাশ অবস্থা। একটি "অহং"র প্রবল অবস্থা, অন্যটী "অহং"র অভাব অবস্থা। এই বিষয় তোমাকে পরে বলিব।

আমরা সাধারণতঃ যাহাকে সুখ বলিয়া বুঝি তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, পরিবর্ত্তনশীল; পরিবর্ত্তনশীল দেহ দ্বারা তাহার অনুভূতি হয় এবং দুঃখকে অপেক্ষা করিয়াই সুখ বুঝি, সুতরাং আমাদের মতে যাহা সুখ তাহার সঙ্গে দুঃখসংসর্গ অলক্ষিতভাবে রহিয়াছেই। কিন্তু স্বরূপ আত্মার যা আত্মার অভিলষিত যে সুখ, তাহা অপেক্ষা-রহিত সুখ; সে সুখ পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় সম্ভব নয়। সে সুখ হইতে আত্মা কখনও বিচ্যুত হইতে চান না; সেই সুখই তাঁহার স্বরূপ, তাহাকেই "আনন্দম্" অবস্থা বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছে। আমার এই দেহ বর্ত্তমানেও দেখিতে পাই, আমার ইচ্ছা, অনিচ্ছা অপেক্ষা না করিয়াই সুখ দুঃখ উপস্থিত হয়, অথচ চিরকাল কেবল সুখেরই কল্পনা করি। দুঃখ কখনও চাহি না। কাজেই দুঃখের কল্পনাও করিতে পারি না। যদি সুখ ও দুঃখ উভয়ই আত্মার স্বভাব হইত, তাহা হইলে দুঃখকে কষ্টকর বলিয়া আমার জ্ঞান হইত না, সুখ ও দুঃখ সমভাবেই গ্রহণীয় হইত; কিন্তু তাহা কখনও হয় না। আত্মা সুখই চায়—অবিনশ্বর সুখ চায়; যে সুখের আর বিরাম নাই, সে সুখ পাইলে আর আকাঙ্ক্ষার বিষয় থাকে না, আত্মা সেই সুখ চায়। সেই "আনন্দম্"-অবস্থাই তোমার স্বরূপ। সেই আনন্দ চিরকাল ভোগ করাই তোমার ইচ্ছা, এই জন্য সেই "আনন্দ" অবস্থা "সৎ" স্বরূপও বটে, এবং সেই "আনন্দ" অবস্থাই জ্ঞানের স্বরূপ অবস্থা বলিয়া তুমি "চিৎ"স্বরূপও বটে, অতএব তোমার স্বরূপ অবস্থা "সচ্চিদানন্দ"।

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন—আত্মা এই দেহ গ্রহণ করিলেন কেন? আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানের স্বরূপই জানিতে চাওয়া। যখন ভ্রান্তিবশে আত্মার আপনাকে জানিবার প্রবৃত্তি জন্মিল, তখনই আত্মার বিষয়বোধ প্রথমে আসিল। আত্মা আপনাকে যখনই যুগপৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপে চিন্তা করিলেন, তখনই জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য বশতঃ আত্মা আপনাকে আপনা হইতে পৃথক্ মনে করিলেন। এ অবস্থায় "সচ্চিদানন্দ" অবস্থার অতিরিক্ত একটি অবস্থার জ্ঞান আত্মাতে জন্মিল, তদ্বিষয়ে তিনি পূর্ণাবস্থার অভাব বোধ করিলেন এবং সেই পূর্ণাবস্থা লাভের জন্য তিনি যতই নূতন অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই পূর্ণাবস্থা হইতে দূরে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই সচ্চিদানন্দ অবস্থা লাভ করিবার জন্য শ্রবণ-দর্শনাদি জ্ঞানেরও কল্পনা করিলেন। ক্রমে বিষয়জ্ঞানানুরূপ ত্বগাদি অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি সৃষ্টি করিয়া হস্তপদাদি বিশিষ্ট দেহবান্ হইয়া পড়িলেন।

দেহ গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য অভাব-পূরণ, কিন্তু দেহ ইন্দ্রিয়াদি সংযোগে বাহ্য বস্তুকেই অভাব নিবৃত্তির কারণ-জ্ঞানে বিষয় হইতে বিষয়ান্তর অবলম্বন করিতে লাগিল এবং তত্তৎ বিষয়ানুরূপ সংস্কারে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ বিভিন্নরূপ আকার গ্রহণ করিতে করিতে উপস্থিত অবস্থায় নানাবিধ জীবাকারে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। তোমার উপস্থিত দেহও সেই আত্মার দেহ। এই দেহ লইবার উদ্দেশ্য অভাব-পূরণ; কিন্তু তোমার বুদ্ধিদোষে ও প্রকৃষ্ট দর্শনাভাবে তোমার দেহদ্বারা অভাবের অভাব না হইয়া বরং অভাবের বৃদ্ধিই হইতেছে।

এ দেহ যদি আত্মা নিজ প্রয়োজনে ইচ্ছা পূর্ব্বক না লইতেন, তাহা হইলে এই দেহ আত্মার জ্বালার কারণ হইত ও ইহার সংসর্গে আত্মার কোনরূপ সুখের কারণ হইত না। কিন্তু দেখিতে পাই—কোন প্রাণীই মৃত্যুকে চায় না। ইহা দ্বারা ইহাই অনুমিত হয়, আত্মার এ দেহ প্রয়োজনীয় এবং এই দেহ দ্বারাই তাহার অভাব পূরণ

হইবে। এক্ষণে কিরূপে এ দেহ দ্বারা আত্মার অভাব পূরণ হইতে পারে তাহা শ্রবণ কর।

বৎস! ইন্দ্রিয় সংযোগেই আমাদের উপস্থিত জ্ঞান। এই ইন্দ্রিয় পাঁচটি। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হয়, কিন্তু বোদ্ধা একজন। চক্ষু দ্বারা দর্শন জ্ঞান, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ জ্ঞান সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু জ্ঞাতা এক। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়-যোগে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বোধ করেন। এই সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট হইবার পর বাহ্য বস্তু সংসর্গে হয়। ইহা ছাড়া একটি সংস্কারজ জ্ঞান আছে; যাহা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, যথা—ক্ষুৎ পিপাসা ইত্যাদি। ক্ষুধা পাইলে খাইবার প্রয়োজন—ইহা সর্ব্বপ্রাণীতে সমভাবে বর্ত্তমান বটে কিন্তু পলাণ্ডু, ফলমূল, কি জল দ্বারা সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে হইবে—ইহা আমার সংস্কারের ফল। বস্তুর কোন বাস্তবিক সত্তা নাই, আমার সংস্কারের পার্থক্যেই এক বস্তুর বিভিন্নস্বরূপ হইয়াছে। এই ভাবে ইন্দ্রিয় চালনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই—বাস্তবিক বস্তুর একটা স্বতন্ত্র সত্তা নাই। বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা না থাকিলে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের আসক্তি বিরক্তি কিছুই সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়ের আসক্তি বিরক্তি না থাকিলে, ইন্দ্রিয়ের সংস্কারস্বরূপ মনের অস্তিত্ব কোথায়? মনের অস্তিত্ব না থাকিলেই সেই আত্মা স্বপ্রকাশ হইবেন, কারণ তখন দ্বিতীয়াদির দ্বিতীয় অস্তিত্বই থাকিবে না।

আরও দেখ, এই ইন্দ্রিয়গুলি একদিকে তোমাকে যেমন বিষয় সুখ দেখাইতেছে, অপর দিকে তেমনই বিষয়ের অসারতা ও ক্ষণভঙ্গুরতাও প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু তুমি এমনই অন্ধ যে, তোমার নিজ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের অর্দ্ধাংশে বিশ্বাস করিতেছ, অপরার্দ্ধে বিশ্বাস করিতে তোমার প্রাণ চায় না। যে পুত্র কালে তোমার কত সুখের নিদান হইবে বলিয়া কল্পনা করিতেছ, সেই পুত্র তোমার সমক্ষে কোথায় অদৃশ্য হইতেছে—তাহা বুঝিতে পারিতেছ না, তথাপি পুনরায় অন্ধ আশা ধরিয়া পুত্রে গন্ধর্ব্বনগর সৃষ্টি করিতেছ। যে ভবিষ্যৎ তোমার পক্ষে অন্ধকারময়, যে ভবিষ্যতের এক মুহূর্ত্তও তোমার জ্ঞানের বিষয় নয়, সেই ভবিষ্যতের জন্য তোমার অনন্ত কল্পনা। যে দেহের জন্য তুমি উন্মত্ত, সেই দেহ ব্যাধি ও মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে, ইহা স্বচক্ষে দেখিতেছ; কিন্তু তোমার সে বিষয়ে চিন্তা কৈ? এ সকল অবস্থাই ত প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই তোমাকে বুঝাইয়া দেয় কিন্তু তুমি বুঝ কৈ?

এই দেহ প্রতি মুহূর্ত্তেই বুঝাইতেছে—পরিবর্ত্তন কখনও স্থির নয়। অতএব পরিবর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া যদি কখনও স্থিরাবস্থার দিকে যাইতে পার, তবেই তুমি সেই অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবে। এবং সেই স্থিরাবস্থায় পৌঁছিবার যে উপায়; তাহাও গুরুমুখে এই দেহজ ইন্দ্রিয় দ্বারাই শুনিতে হইবে ও যে সাধন; তাহাও এই দেহ দ্বারাই করিতে হইবে। কাজেই বৎস! এ দেহ তুমি সেই স্বরূপ সাধনেই নিযুক্ত কর, কালে স্বরূপ জ্ঞান হইলে, তখন বুঝিবে - দেহ দ্বারা আত্মার কি প্রয়োজন। দেহ থাকিতেও সাধন বলেই দেহজ্ঞান লুপ্ত হওয়া যায়, এই অবস্থারই নাম জীবন্মুক্ত অবস্থা। তুমি সর্ব্বদাই সেই অবস্থায় বর্ত্তমানে রহিয়াছ, কেবল ভ্রান্তিবশে বুঝিতে পারিতেছ না। সাধন বলে, গুরুর কৃপায়—একদিন না একদিন বুঝিবেই বুঝিবে এবং সেই নামরূপবর্জ্জিত তোমার চিরপরিচিত স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলেই তোমার বহুরূপিত্বের লোপ হইবে।

ওঁ তৎসৎ

শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়

কবি

(১)

রঘুবার রাজপাট, কারাগার কংসের,
চিতোরের চিতা তুমি, সোমনাথ ধ্বংসের,
বঙ্গের অলকা হে, বারাণসী বঙ্গের,
চিত্রিত চির 'চেরাপুঞ্জি' যে বঙ্গের।

(২)

অকূলের কূল তুমি, বিপদের সম্বল,
যেওয়ার 'কাবুল' তুমি, গোলাপের 'বসরা',
মনোহর মরুরুহ তুমি মরুবাসিদের
খোস্‌লাস্ তুমি ওগো হারুণ আল্ রসিদের।

(৩)

তুমি চাও ভক্তির শকতির তর্পণ,
কীর্ত্তির কিরীটিতে কর কর অর্পণ।
নর-নারায়ণ তুমি, গাণ্ডিবী পাণ্ডব,
'পাশুপত' জিনি লও' দাও কর খাণ্ডব।

(৪)

তব প্রেম সলিলেতে ফোটে যেন অম্বুজ
ধর্ম্মের মন্দিরে গেথে তোল গম্বুজ,
ছষ্টার ছষ্টা হে কারিগর অদ্ভুত
জিনারের চেয়ে তব বীণা চের মজবুত।

শ্রীসুধীরঞ্জন মল্লিক

কুমারিল ভট্ট

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উজ্জয়িনীর রাজবর্ত্ম

কুমারিল ভট্টের প্রবেশ।

কুমা। সমগ্র উত্তর পশ্চিম ভারতের দেখে দেখে সমগ্রে সমগ্রে ভ্রমণ করে'ও একজন মাত্র বৈদিক-ধর্ম্মাবলম্বীর সাক্ষাৎ ঘটলো না। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত আজ মোহনিদ্রায় সমাচ্ছন্ন। এমন দর্শনে চোখে জল আসে না! কীর্ণ বক্ষ হইতে শোণিত ক্ষরিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় আর্য্যজাতি আজি অন্ধকুসংস্কারের অধীনতায় অন্ধতমসাচ্ছন্ন এই অর্দ্ধমৃতপ্রায় অবস্থাপন্ন, তা হবেইতো! মানবকল্পিত ধর্ম্মের উপাসনায় মানুষ কেমন ক'রে দেবতাবাপন্ন থাকতে পারবে? পুরুষের জ্ঞান কখনই অপরিণীত হ'তে পারে না, তবেই হোক, তাকে সীমাবদ্ধিত

হ'তেই হবে। কিন্তু অপৌরুষেয় বেদবাক্যে ঐ আশঙ্কা না থাকায় ধর্ম্মবিষয়ে তা স্বতঃসিদ্ধ ও আদি প্রমাণ। মানুষ আত্মাহঙ্কারবশে এই বেদের অবমাননা করে; এর চেয়ে আর পরিতাপ কি আছে! যখন কুশীনগরীর সন্ন্যাসীর হ'তে নিষ্কিপ্ত হই, তখন 'যদি বেদ সত্য হয়' এই ব'লে স্বতঃপ্রমাণ বেদসম্বন্ধে ঈষৎ সংশয় প্রকাশ ক'রে ফেলেছিলেম, তাই সেই মহাপ্তনে আমার দেহ চূর্ণিত না হয়েও ঐ 'যদি'-রূপ সন্দেহ প্রকাশ জন্য একটি নেত্রগোলক আহত ও শক্তিহীন হ'য়ে যায়! এই থেকে মূর্খগণ বিশ্বাস করতে চায় না!

[পথে দু-একজন নাগরিকের প্রবেশ]

(অগ্রসর হইয়া) আমি বেদের দাস কুমারিল ভট্ট,—কে কোথায় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আছ, অস্তমিতপ্রায় সনাতন ধর্ম্মগৌরব পুনরুদ্দীপ্তকরণে সহায় হও।

নাগরিকগণ। সর্ব্বনাশ! এ পাগ্‌লাটা বলে কিরে! বেদ-প্রচারকারীর সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌লেও আমাদের যুবরাজ আমাদিগকে নির্ব্বাসিত কর্ব্বেন।

জনৈক নাগ। ওতো বেদের দাস, আমরা যে এদিকে রাজাজার দাস, রাজা শুন্‌তে পেলেই সর্ব্বনাশ! পালাই চল্।

[সকলের প্রস্থান]

কুমা। আজ এই সনাতন ধর্ম্মভূমিতে একজনমাত্রও সনাতনধর্ম্মী জীবিত নহে,—পাষাণলে সমস্তই ভস্মীভূত হ'য়ে গ্যাছে! একটি বীজও কি রক্ষা পায়নি! [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—উজ্জয়িনী, মহাকালের মন্দিরের পার্শ্বভাগ,

ইন্দিরা ও শুভ্রা।

ইন্দিরা। এই মূর্খ দেবতার পূজায় যে আনন্দ; সর্ব্ব শূন্যের চিন্তায় তা কেমন করে পেতে পারা যাবে? আমার ওতে মন ওঠে না।

শুভ্রা। কে জানে ভাই, তোমাদের পিসি ভাইঝির এ কেমন ধারাই ধর্ম! তোমার এই কচি বয়েস, এই বয়সে পিসিমার দেখাদেখি তুমি এই যে কি এক খেয়াল শিখেছ, এর জন্যে তোমার মা বাপ কত রাগ করছেন—দুঃখ করছেন, তবু এ না হ'লে থাকতে পারো না! কি এতই সুখ পাও?

ইন্দিরা। কি সুখ পাই, তা কেমন করে বোঝাবো? আচ্ছা এজীবনের পরপারে কোথাও এক পরম আনন্দ-লোকে অসীম আনন্দের ক্ষীরোদসমুদ্র মধ্যে কেউ একজন আমাদের পাপ-তাপ সমস্ত ধুয়ে-মুছে নেবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন—না মনে না ক'রে, কেউ কোথাও নেই ভাবাতেই বা কি এমন সুখ? যদি আনন্দই না পেলাম, তবে নির্ব্বাণ পাওয়াতে বা কি সুখ? আর তারজন্য তপস্যাই বা কিসের? তার চেয়ে মাটি কাঠ হয়ে জন্মালেই বা ক্ষতি কি? নিষ্ক্রিয় তো এ'তেও হওয়া যায়।

শুভ্রা: তুমি ভাই পিসিমার ক'ছে অনেক ব্যাখ্যান শিখেছ, আমি কথায় তোমার সঙ্গে পারবো কেন? তবে বড় বড় অর্হৎ প্রমণরা সবাই বলেছেন যে—ঈশ্বর নেই, এমন কি তথাগতও নাকি নিজে মুখে এই কথা বলে গ্যাছেন।

ইন্দিরা। ঈশ্বর আছেন, একথা তাঁরও চেয়ে অনেক বড় বড় ঋষি মুনিরা প্রমাণ করে রেখে গ্যাছেন, শুনেছি—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ং বলে গ্যাছেন।

শুভ্রা। শ্রীকৃষ্ণও আমাদের মত মানুষ ছিলেন। মথুরার রাজার বেটা।

ইন্দি। শাক্যসিংহও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন, কপিলবাস্তুর রাজকুমার।

শুভ্রা। তা'হোক তাঁকে অতিমানুষ বলে ভ্রম নিজে এসে স্বীকার করে যান, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মত ভোগী নন, যোগী। মহারাজকুমারী আসছেন—

[যুবরাজ মন্দির হইতে বহির্গমন]

যুবরা। শুভ্রা! ভগবান্ কখন ভোগ কখনও ত্যাগ দ্বারা মানুষের মনুষ্যত্ব উদ্রিক্ত করে থাকেন—তাঁরা কেউ কারুর চেয়ে ছোট নন্। ছোট আমাদের এই সঙ্কীর্ণ মন—যে, তাঁর এই সর্ব্বপ্রকাশকে নিজের মধ্যে অনুভব

করতে পারে না। ঐ দেখ হাস্যময়ী প্রকৃতিদেবী তাঁরই স্পর্শগৌরবে এমন সুপ্রসন্না! চারিদিকে তাঁরই ওই বিমলগন্ধ, তাঁরই হাতের মধুর স্পর্শ, তাঁরই সুরভিশ্বাস ভেসে উঠ্‌ছে, আর দশদিক্ আনন্দে শিউরোচ্ছে! এ আমরা দেখতে চাইনে বলেই শুধু আমাদের দেখা সার্থক হয় না। তা না'হলে দেখতে আমরা সবাই-ই এক স্থান পাচ্ছি। সেই গানটা গা'তো যা ইন্দিরা।—

ইন্দিরা কোন্‌টা দিদিমা, সেই আকাশের রাঙা মেঘের? গাইছি—

গীত

আকাশের রাঙা মেঘের রাঙা ছায়ায়।
বাতাসের লোভন দোদুল, মৃদুল হাওয়ায়।
ফুলের ঐ রূপের রাশিতে।
নদীর ঐ কলতানে, পাখীদের মধুর গানে,
ঢেউ এ'দের চলন হাসিতে।
আমি যে গো দেখি তোমারে, তুমি নওতো দূরে,
কেবল পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকো,—
আপনাকে যে লুকিয়ে রাখো;
ওই, ধরা না ধরা,— লাও না ধরিতে।

(নেপথ্যে) এইতো তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার আর্য্যভূমে কে সনাতন ধর্ম্মদেবী আছ, আমি বেদের দাস কুমারিল ভট্ট, আমার সহিত বোঝাপড়া করবে—এসো।

সুরমা। একি! একি! কার এ আহ্বান? শয়নে স্বপনে এই দীর্ঘ দিন যাঁর আশাপথ চেয়ে বসে আছি, এতদিনে সেই আমার ইষ্টদেব কি সুপ্রসন্ন হয়ে আমায় দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করতে এসেছেন! এই স্বর, এই কণ্ঠ—যে অযোধ্যায় আমায় বলে আসছেন—"তোমার এ ব্যর্থ-জীবন সার্থক হবে সুরমা, সেদিন আমি নিজে তোমাকে ডেকে নেবো," তাই কি এসেছেন? শুভ্রা, চল চল—এ আহ্বান যেন আমার ব্যর্থ না হয়।

শুভ্রা। আপনি কি উন্মত্তা হলেন রাজকুমারি! কে কোথায় কোন উন্মাদ রাজপথে ধর্ম্মদ্রোহ প্রচার করছে, আপনি তার কাছে যেতে চান? যুবরাজ জানতে পারলে কি হ'বে—মনে করে দেখুন দেখি?

সুরমা। কি হবে? কিছু না! প্রভু আমায় নিজে ডেকে দেখা দিতে এসেছেন, এক্ষণে আমি উপেক্ষা করতে পার্ব্বো না।

শুভ্রা! এর পরিবর্ত্তে সকল কষ্ট, সকল অপমান, আমার পুরস্কার বোধ হবে।

[প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইন্দিরা ও শুভ্রার তদনুসরণ]

পট পরিবর্ত্তন

মহাকাল মন্দিরোদ্যানের অপরাংশ

কুমারিল ভট্ট, সুরমা, ইন্দিরা ও শুভ্রা।

সুরমা। এই মহাছন্দোদ্ভাসনে এ দীনা নারীর শক্তি কতটুকু! কিন্তু তথাপি ইচ্ছা শক্তির বশীভূত নহে, বামনও চন্দ্র-গ্রহণের নিমিত্ত উদ্যত হয়। জ্ঞানিরাজ! জ্ঞানদ্বারা এর সকল অভাব আপনিই পূর্ণ করতে সক্ষম—তা আপনাকে দর্শনমাত্রেই আমি জানতে পেরেছি, এই সামান্য মনদ্বারা যদি একার্য্যের একবিন্দু সহায়তা হয়, সেই ভরসায় এই সামান্য অলঙ্কারগুলি চরণে পাদপদ্মে অর্পণ করতে এসেছি,—তাহা কি পূর্ণ হবে না?

[অলঙ্কার-পেটিকা স্থাপন]

কুমা। (পেটিকা উন্মোচনপূর্ব্বক) এই অমূল্য মণিরত্ন সকলের মূল্য রাজৈশ্বর্য্যের সমতুল্য! এসকল অপরিচিত ভিক্ষুক হস্তে অর্পণ করতে দ্বিধা করছোনা! দেবি?

সুরমা। দেব! পদাশ্রিতকে ছলনা করছেন কেন? এসমস্ত আমার স্বর্গীয় পতি মধুরারাজ এবং স্বর্গীয়া জননীর প্রদত্ত। বালবিধবা সুরমা চিরদিন এদের স্নেহের রক্ষা

ক'রে এসেছে,—আজকে এদের সেই রত্নলাভ সার্থক হবার অবসর প্রদান করে, এদের সহিত আমাকেও কৃতার্থ করুন।

কুমা। স্বস্তি! দেবি! তোমার এই সাত্ত্বিক দান এ অধঃপতিত আর্য্যাবর্ত্তে উন্নতির দীপশিখা প্রজ্বলনের প্রধানতম সহায় হ'বে।

মুরারা। [নতজানু। গুরুদেব! এই নগণ্যা ছহিতাকেও আজ হ'তে চরণাশ্রয়ী করুন!

কুমা। স্বস্তি! মহীচির অস্থি বজ্র দেবকুলকে যেরূপ মহাভয় হ'তে পরিত্রাণ করেছিল, তোমার এই নিষ্ঠাপূর্ণ সেবাও তোমার স্বজাতিকে তেমনি অধর্ম্মপ্রাসন হ'তে রক্ষা করুক! তোমার এ মহাদান আমার ব্রতপালনে প্রধান সহায় হবে। আজ আবার আমার মনের আশা বিগুণিত হয়ে উঠ্‌ছে। আজ আমি দেখতে পেয়েছি; এই শ্মশানতুল্য আর্য্যাবর্ত্তের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে সকল বীজই ধ্বংস হয়নি। আর এই দৈবরক্ষিত ক্ষুদ্র বীজ হ'তেই কালে মহাদ্রুমের উৎপত্তি হ'তে পারবে।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মাহিষ্মতী নগরী, মধ্যবিত্তালয়,

কুমারিল ভট্ট, মণ্ডন মিশ্র ও বিদ্যার্থিগণ

কুমা। বেদধর্ম্মের প্রসারকল্পে অবন্তীরাজ যে বিপুল ধনরত্ন প্রদান করেছিলেন, তারই সদ্ব্যবহার এবং এই সুদীর্ঘকালের চেষ্টার এখন আমাদের হাত দিয়ে দ্বাবিংশ সহস্র বেদ ধার্ম্মী তৈরী হ'য়েছে, এখন আর বিলম্বে না থেকে, অধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের নিরাকরণ ক'রে বৈদিকধর্ম্ম প্রচার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

মণ্ডন। প্রভো! বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধির জন্য আপনার এতাদৃশ জীবন সমর্পণ করতেও কুণ্ঠিত নহে। তবে আজ্ঞা দিন এবং পথনির্দ্দেশ ক'রেই কার্য্যারম্ভ করা যায়।

কুমা। সাধু মণ্ডন, সাধু! তবে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে এবিষয়ে কিছু বিচার প্রয়োজন। দেখ, অখিল শব্দরাশি কলাকুশলতাপ্রকাশে বেদপ্রসূতই, কিন্তু লক্ষ্যপ্রযুক্ত পিতৃমাতৃদ্বেষী পুত্রের ন্যায় এরা তার বেদমূলত্ব অস্বীকার করে-নি। আরও-বলি—বেদ-বিরুদ্ধাচারী বুদ্ধাদি প্রণীত শাস্ত্রকলাপ নিকৃষ্ট মূঢ়তম ব্যক্তিগণে সমর্পিত হওয়ায়, সে সব শাস্ত্রের বেদমূলত্ব সম্ভাবনাও নাই। এতদ্ভিন্ন শাক্য ও জৈনাগম প্রভৃতিতে অনেক অপভ্রংশ শব্দ আছে এবং সমস্তই বিপরীত অতএব সর্ব্বপ্রকার বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করায় বেদলক্ষণ পাপস্পর্শ কর্‌তেই পারে না।

মণ্ডন। যে আজ্ঞা, বুদ্ধ শাক্যের মধ্যে দয়া প্রভৃতি কতিপয় ভিন্ন সকল বাক্যই চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানের বিরুদ্ধ।

কুমা। শুধু তাই নয়, যদি মন্বাদি প্রণীত কোন স্মৃতি বেদবিরোধী হয়; তা'হলে তার মতও পরিত্যাগ ক'রে, যা বেদবিহিত—তাহাই অবলম্বন করবে। প্রসিদ্ধ বৈদিক মতের বিরুদ্ধ যে সমস্ত ধর্ম্ম, তা পরিত্যাগ না কর্‌লে ধর্ম্মশুদ্ধি হয় না। বেদবিরুদ্ধ শ্রুতির প্রামাণ্য আছে বলেই তা শ্রুতিমূলক হ'তে পারে না। একমাত্র বেদই নিত্য অপৌরুষেয়, বেদমূলক শাস্ত্রই প্রকৃত শাস্ত্রপদবাচ্য—অন্যথা আর সব অশাস্ত্র!

মণ্ডন। অখিল ধর্ম্মমূলক বেদ সর্ব্বজগতের কল্যাণ সাধন করুন!

কুমা। বৎসগণ! মনুষ্য-হৃদয়ে অজ্ঞতাকেই সর্ব্ব প্রকার বিদ্বেষের মূল ব'লে জান্‌বে। যে পর্য্যন্ত না অখিল কায়বেদ বেদের সহিত পরিচয় লাভ ঘটে, সেই পর্য্যন্তই এই অজ্ঞানান্ধকার প্রবল হয় না। বেদের অপ্রচারই এর প্রকৃত কারণ। অর্থ সহিত ঋক্ সাম প্রভৃতি বেদের প্রকৃতরূপ অবলোকন কর্‌তে পেলে, নিশ্চয়ই এ রোগের প্রতিবিধান হ'তে পারবে। অতএব সাবহিতচিত্তে বেদজ্ঞ-প্রাণ হ'য়ে তোমরা এই মহাপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হও।

জনৈক বিদ্যার্থী। প্রভো, আমরা সকলেই তো ঋক্ সাম প্রভৃতি সকল বেদই অধ্যয়ন করি-নি, যে যে-শাখাবলম্বী সে শুধু সেই শাখাই অধ্যয়ন করেছি।

কুমা। ব্রীহি-যবমিশ্রিত করে যজ্ঞ না কর্‌লে কি অন্ত শস্যাদির পরিচয় দেওয়া হয় না?

জনৈক বিদ্যার্থী। জ্ঞান লাভ করলেম।

কুমা। যওন! ক্ষুদ্র একটি বীজাক্ষর ক'রে আজ এই যে দ্বাবিংশ সহস্রের উৎপত্তি হ'য়েছে; এই দ্বাবিংশ সহস্র হ'তে দ্বাবিংশ কোটীর সৃজন করতে হবে! ক্ষুদ্র ব'লে এ জগতে কাহ্নকে তুচ্ছ করবে না। একটি ক্ষুদ্র বীজ অসংখ্য বিশাল বনস্পতির, একটি ক্ষুদ্র মানব সহস্র মানবের প্রতিষ্ঠাতা। আমি যেন দিব্যনেত্রে দেখতে পাচ্ছি—এই বেদ-জীবন ব্রাহ্মণগণের সুমঙ্গল বেদধ্বনে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের বিশাল আকাশ প্রপূরিত, হোমার্চ্চিত ঘৃতগন্ধে তাকে আমোদিত এবং 'কারিরি' প্রভৃতি যজ্ঞাদি দ্বারা সুবৃষ্টি সুভিক্ষ প্রভৃতিতে পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি এবং নিজেদের ধর্ম্মবার অপায়ত করছে। [যবনিকা পতন]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান বুদ্ধগয়া (গয়াধাম) বিশাল বৌদ্ধ-স্তূপ, চৈত্যবন্দির, বৌদ্ধ, শ্রমণ, ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, ও নর-নারীগণ।

গীত

ত্রিবিধ দুঃখ তারিতে নরের, নির্ম্মল শুচি শুদ্ধ,
জন্ম লইলে ধরণীর তলে, শাক্যকুমার বুদ্ধ।
করুণাসিন্ধু ব্যথিত চিত্ত, রাজ্য ভবন ধনিতা বিত্ত,
পরিহার করি চীরবাস ধরি, কঠোর সাধনে সিদ্ধ,
করি নমস্কার করুণাবতার, শাক্যকুমার বুদ্ধ,
নির্ব্বাণ-পথ দেখায়ে মানবে, করিতে অপাপ বিদ্ধ,
জন্ম লইলে শাক্যের কুলে, নৃপনন্দন বুদ্ধ,
ব্যাধি মৃত্যু জরা জর্জ্জর মানবে, জীবেরে হেরি নশ্বর,
চির-শাশ্বত অবিনশ্বর, জীবন লাগিতে শুদ্ধ,
ভিক্ষুর বেশে ফির দেশে দেশে, নৃপতিকুমার বুদ্ধ,
বোধিলাভ তরে করো অকাতরে, মারের সহিত যুদ্ধ,
নির্ভীক চিত্ত শান্ত আনন, শাক্যকুমার বুদ্ধ,
মহাধন লভি চির সন্ন্যাসী, ধনী নির্ধনে বিলাইলে আসি,
মুছিয়া হিংসা কামনার রাশি, জগৎ হইল শুদ্ধ,
বুদ্ধ জগত হইল প্রণত, চরণে তোমার বুদ্ধ।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান কাশী—রাজসভা।

জয়ন্ত মন্ত্রী সভাসদ্‌গণ, কুমারিল, তৎশিষ্যবর্গ
বৌদ্ধাচার্য্য ও বৌদ্ধগণ।

বৌদ্ধাচার্য্য। ভাল ব্রাহ্মণ! তুমি যে বড় গলা ক'রে বৈদিক ধর্ম্মের গুণ কীর্ত্তন করছো, তা বৈদিক ও পৌরাণিক দেব-দেবী এবং যাদের বাক্যে বিশ্বাস ক'রে তোমার সনাতন ধর্ম্ম চলছে, সেই সমস্ত মুনি মহাজন প্রভৃতি সকলের চরিত্র-গত নির্ম্মলতা সম্বন্ধে ক'রে তাঁদের শিক্ষাদাতা বেদের প্রতি সন্দিহানই প্রদর্শিত হ'য়ে উঠ্‌তে হয়। তোমার ধর্ম্মের সদাচারিগণ উক্ত ধর্ম্মের অতি নিন্দিত আচরণীল, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত; এই দেখনা—দু'একটামাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি; যেমন প্রজাপতি আত্মজাগামী, ইন্দ্র গুরুপত্নীহারী, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির গুরুঘাত জন্য মিথ্যাভাষী। তারপর আরও দেখ—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী গ্রহণে বিধাগ্রস্ত হয়েন নাই! অধুনা যে কর্ম্মবীর তোমাদের ভগবানের প্রিয়সখা—অর্জ্জুনটি, সেটিও ঘাতুলকন্যা বিবাহ মদ্যপান প্রভৃতি কোন কুক্রিয়াতেই বিরত হয় নি!

কুমা। প্রজাপালনের অধিকারহেতু প্রজাপতি শব্দের অর্থ—আদিত্য। তাঁর আগমনে বর্দ্ধিত হয় ব'লে, বেলাকে তাঁর দুহিতা বলা হয়। বেলাতে অঙ্কুরোদ্গম-স্বরূপ বীজ নিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে, বস্তুতঃ 'প্রজাপতি কন্যাগামী' এর ইহাই অর্থ, অপর কিছু না। এদিকে ইন্দ্র শব্দের অর্থও তেজঃপুঞ্জ বা সূর্য্য, অহঃ অর্থাৎ দিবাতে লীন হয় ব'লে অহল্যা শব্দের অর্থ—রাত্রি। ইন্দ্র (সূর্য্য) অহল্যার (রাত্রির) জারণের (অন্ধকারণের) কারণ ব'লে ইন্দ্র 'অহল্যা-জার' নামে অভিহিত হ'য়ে থাকেন। ঐরূপ ঐ সকলবাক্যেরই কোন না কোন তাৎপর্য্য বা রূপক আছে জানবেন।

বৌদ্ধ। আচ্ছা বাপু, সকল না হয় রূপকই স্বীকার করলেম, কিন্তু যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতি আদর্শচরিত্র মানব-

সম্বন্ধেও কি ঐ কথা খাটবে? তাহ'লে এ'ও আজ স্বীকার্য্য যে, নরনারায়ণ পরম পবিত্রচরিত্র শ্রীকৃষ্ণটও শাস্ত্রকারগণের কল্পোলকল্পিত! তাঁর বাস্তবসত্তা কিছুই নাই?

কুমা। না শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণমানব। তিনি কল্পিত নন। যুধিষ্ঠির, যে কূটরাজ-নীতির অনুরোধে দ্রোণবধ অসত্য ব্যবহার করেন, অশ্বমেধাদি অনুষ্ঠানে প্রায় যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তও করেছিলেন। সুভদ্রা বলরামের ভগিনী, শ্রীকৃষ্ণের সহোদরা নন, সেই হেতু ভদ্রা বিবাহে অর্জ্জুনের দোষ স্পর্শ করে নাই। রুক্মিণীপরিণয়ের অশাস্ত্রীয়তাও এইরূপে নিরাকরণ করা হ'লো। আর অর্জ্জুনের মদ্যপান? তা মহাশয়ের অবশ্য একথা শোনা আছে যে, সুরা—গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী ভেদে তিন প্রকার। ইহার মধ্যে পৈষ্টীপান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির নিষিদ্ধ হ'লেও অপর দুই প্রকারে এঁদের পক্ষে নিষেধ নাই।

বৌদ্ধ। ভাল ভাল! পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীদেবীর অতিপাতিব্রত্য ও যোষকরি আপনার সমাজের একটি মহদ্দৃষ্টান্ত! নহুষরাজার ব্যভিচার;—কতই আর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর্ব্বো?—এসকলের অভাবতো আপনার ধর্ম্মসমাজে আদৌ নেই। [হাস্য]

বৌদ্ধমণ্ডলী। হা হা হা! সাধু সদাচারীর সঙ্ঘ, হা হা হা!

কুমা। পঞ্চপাণ্ডবের একপত্নীত্বের বিরোধ স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজেই ভঞ্জন করে গাছেন। পূর্ণযৌবনা কৃষ্ণা যজ্ঞবেদী মধ্য হ'তে উত্থিতা হয়েছিলেন। মানুষীর এরূপ সম্ভবে না; তিনি মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী! লক্ষ্মী বহু উপভোগ্যা হ'লে, দোষ হ'তে পারে না আর নহুষরাজা সম্বন্ধে তর্ক এস্থলে উঠ্‌তেই পারে না;—যেহেতু তাঁর স্বকৃত পাপের ফলে বহুকালাবধি যখন অজগরযোনি প্রাপ্তিই ঘটেছিল, তখন আর কথা কি?

বৌদ্ধ। (সক্রোধে) তা'হোক, শাক্যমুনির ন্যায় যথার্থ শাস্তা, ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিজ্ঞাতা আর কেউ কখনই এভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেনি!

কুমা। যিনি ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে পরধর্ম্ম ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্ব ও পরের প্রতিগ্রহ স্বীকার করেছেন, তিনি যে অভ্রান্ত ধর্ম্মোপদেশ দান করেন; এর প্রমাণ কি? যিনি নিজেরই অনিষ্টাচরণ করতে পারেন, তিনি আবার পরের মঙ্গল কি করতে সক্ষম? গীতাকার বলেছেন—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' কিন্তু এই বুদ্ধ প্রভৃতি—এঁরা এইরূপ পরলোকবিরুদ্ধ কার্য্যকেই অহঙ্কার ব'লে মনে কর্তেন। অতএব যিনি এরূপ অশাস্ত্রীয় কার্য্য করেন, তাঁকে দূর হ'তে নমস্কার ক'রে স'রে যাওয়াই উচিত।

বৌদ্ধ। করুণাময় সুগত বলতেন—'কলিতে যে সমস্ত ধর্ম্ম কলুষিত হ'য়েছে, সে সমস্ত আমাতে উপস্থিত হোক্। সংসারে অন্য সকলে তা পরিত্যাগ করুক।' তিনি লোকহিতের জন্যই আপনার প্রশংসিত ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে ব্রাহ্মণবৃত্তি ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্ব অবলম্বনে প্রতিষেধ অতিক্রম করতে অসমর্থ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অপ্রকাশিত ধর্ম্ম সাধারণকে উপদেশ দিয়েছেন।

কুমা। তিনি স্বীয়ধর্ম্মের উৎপীড়ন ক'রেও পরের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন বটে, কিন্তু যে নিজ-প্রকৃতির অধিকারকে অবজ্ঞা করে, আর সে অনুগ্রহ কর্ত্তার অধিকারই বা কি, এবং যোগ্যতারই বা কি প্রমাণ? 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ অনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" ইহা শাস্ত্র প্রমাণ, আপনি বিরুদ্ধ প্রমাণ দেখান।

আচার্য্য। (নীরব)

কুমা। প্রমাণ নাই? মহারাজ! আপনি স্বয়ং এ বিচারের সাক্ষী, এই আচার্য্যরাজ প্রমাণ দিতে অসমর্থ, কিন্তু বিচারে নিজেকে পরাজিত স্বীকার করতে বোধ করি অসমর্থ হবেন না?

আচার্য্য। হাঁ, আমি পরাজয় স্বীকার কর্‌লেম্।

কুমা। তবে পূর্ব্ব পণানুসারে সশিষ্যমণ্ডলী বেদমার্গানুসরণ করতেও প্রস্তুত হয়েছেন তো?

বৌদ্ধ। অগত্যা—আমি পরাজিত!

কুমা। অস্তি।

রাজা। তবে এই সঙ্গে আমাকেও আপনি গ্রহণ করুন, আমি আপনার বিদ্যা, জ্ঞান, ধৈর্য্য ও যুদ্ধপ্রস্তুতায় একান্ত মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ কর্‌লেম্।

কুমা।—

শ্রীমন্ রাজসুরক্রতুবরণঃ পূর্ণোঽসকৌ চন্দ্রমা
দানং কর্ণসমং কুবেরসদৃশং রূপং বলং ভীষ্মবৎ।
আমূলে শিখরং মতিবিহিতবৎ ভেজোঽস্তু তে তাদৃশম্
মুঞ্চ বীর! মদেন্দ্রমুক্তমনৃপং দত্তা মহাশৈরিণম্॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—কাশী রাজান্তঃপুর

সুজাতা ও প্রবীর

সুজাতা। তারপর কি বলো? সেই শিখাধারী ভণ্ড ব্রাহ্মণটার চরণে সত্য সত্যই তোমার পিতা মহারাজ তাঁর মুকুটখচিত মস্তক লুণ্ঠিত করতে লজ্জা বোধ করলেন না? হাঁা প্রবীর; সত্য এ'কথা?

প্রবীর। হাঁা মা সত্যি বই কি, আমি কি খারাপ ছেলের মতন মিথ্যা কথা বলি? তারপর—তারপর বাবা আমায় তাঁর পায়ে মাথা রাখতে বল্লেন, আর তিনি আমার মাথায়—

সুজাতা। কি! তুই তাই রাখলি?

প্রবীর। হাঁা মা, রাখলুম। ওমা তুমি অমন করে আমার দিকে চেওনা মা, আমার বড় ভয় করে! বাবা যে আমায় বল্লেন, আমি কি করবো?

সুজাতা। তিনি উন্মাদ হয়েছেন—তাই বল্লেন, তুই শুনলি কেন?

প্রবীর। বাবা যে বল্লেন, বাবা যে আমায় বল্লেন, আমি কি করবো! [ক্রন্দন]

সুজাতা। পিতাই তোর সব, আমি কেউ নই? এই জন্যই তোকে আমি দশমাস গর্ভে বহন করেছিলাম! কুসন্তান।

প্রবীর। ওমা আমায় ব'কো না মা, ওমা আমায় সরিয়ে দিও না, কোলে নাও, আর আমি বাবার কথা শুনবো না, তুমি যা বলবে; তাই শুনবো মা, শুনবো।

সুজাতা। তাকি তুমি পারবে! তোমার পিতৃগতপ্রাণ! মা তোমার কে? কিন্তু কেনো প্রবীর! তোমার মাও খুব সাধারণ নারী নয়, রাজাধিরাজ-জননী! সে,—

[জয়ন্তের প্রবেশ]

জয়ন্ত। তোমাদের মাতাপুত্রে কি হচ্ছে? একি! প্রবীর তুমি কাঁদছিলে?—কেন? কেন? ওকি মহিষি! ওকে তুমি কোলে নিয়ে আদর করছো না কেন? ওতো কখন কোন অন্যায় কার্য্য করে না, ওরে আমাদের বড় সুসন্তান; ওকে ভাল ক'রে আদর ক'রো রাণি!

সুজাতা। মায়ের চেয়ে যে সতী; তারে কি বলে জানো? আমার ছেলে আমি আদর করি, শাসন করি—তাতে অন্যের কি? কুশিক্ষা দিয়ে তার ইহ-পর-কালতো সবার মত আমি নষ্ট করতে পারিনে!

প্রবীর। ওমা! এবার থেকে মত কথা করো, আর কখন অমন কর্ব্বো না।

জয়ন্ত। তাতো বটেই, তুমি ওকে শিক্ষা দেবে বই কি, তোমার ছেলে, তুমি ওর ভাল দেখবে নাতো কে' দেখবে? কিন্তু ঐ দেখ না, ছেলেটা কি রকম কাঁদছে! আহা! কচি মুখখানি রাঙ্গা হয়ে উঠেছে যে! [কাছে গিয়া] চুপ কর প্রবীর, বাপ আমার, ধন আমার, অমন করে কাঁদিস্‌নে; আমার ওতে বুক ফেটে যায়।

প্রবীর। (পিতার বক্ষে মুখ গুঁজিয়া রোদন)

জয়ন্ত। কেন, কেন, কান্না কেন? কি হয়েছে? কি চাই? বল—আমায় বল! মুখ তোল, কথা ক'ও।

সুজাতা। মহারাজ! এমন করেই তুমি ওকে নষ্ট করবে! দেশশুদ্ধ সকলকার ভালমন্দর ভার তোমার উপর আর নিজের সন্তানের তুমি এই সর্ব্বনাশটা করতে বসেছ? ধিক্ তোমায়! এতটুকু দূরতা তোমার মধ্যে কোনদিনই দেখলেম না। ক্ষুদ্র প্রজা হ'তে প্রতারক ব্রাহ্মণ, এমন কি নিজের সন্তানের নিকটও তোমার ছোটহাত। যাকে দেখবে, তারই পায়ের কাছে মাথানত! কেন তুমি মুকুটধারণ করেছিলে?

জয়ন্ত। তাতে ক্ষতি কি রাণি? আমি যে নিজেকে ক্রমাগত ক্ষুদ্র নীচ মনে করি।

সুজাতা। সেই লজ্জায় চিরদিন আমি ঘরে আছি! ছি ছি! ওকথা ব'লে আর পাপ ক'রো না! তুমি না দেশের রাজা!

জয়ন্ত। সকলের রাজা ব'লেইতো আমি সবার অপেক্ষা ছোট, মহিষি! সাম্রাজ্যের গুরুভারে এ মস্তক যে সদাই ভারাক্রান্ত! আর সেই ভারই যে তাকে চাপ দিয়ে দিয়ে মাটির উপর নিয়ত অবনত করে দিচ্ছে, এইতো স্বাভাবিক রাণি! এতে ক্ষতি কি?

সুজাতা। বিধাতা মানুষের মাথাটাকে যে উর্দ্ধে সৃষ্টি করেছিলেন; সে কি তাঁরই বিড়ম্বনা? যদি পায়ের উপর নেমে আসাতেই তার সার্থকতা হয়!

জয়ন্ত। ঐ দেখ মহিষি, প্রবীর এইবার মুখ খুলেছে, এইবার নিশ্চয়ই—ও বেরে ফেল্‌বে।—প্রবীর, বাপ—

প্রবীর। (গলা জড়াইয়া) বাবা! বেখুন বাবা! উপাধ্যায় মশাই—

সুজাতা। প্রবীর!

প্রবীর। (সভয়ে) না মা, না মা, আর আমি বাবার কাছে যাবো না। (সরিয়া আসিল)

সুজাতা। ভিখারী ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে ধারণ ক'রে—তুমি আমায় স্পর্শ করো না, স'রে যাও।

প্রবীর। মা,—(ক্রন্দন)

জয়ন্ত। ওর প'রে অত কঠিন হয়ো না মহিষি, ওর কি অপরাধ? ওকে কেন অনাদর করছো!

সুজাতা। ও' আমার গর্ভের সন্তান, ওর প'রে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

জয়। হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো আছেই, তাতো আছেই,—কিন্তু ওরতো কোন দোষ নেই! তাই বল্‌ছি—আমার আজ্ঞাপালন মাত্র করেছে, ও'তো নিজ হ'তে কিছু করেনি!

সুজাতা। ওর শুভাশুভ দেখ্‌তে আমি বাধ্য, আমি ওকে ওসব ইতর সঙ্গ হ'তে রক্ষা কর্‌বো।

জয়ন্ত। ওকথা ব'লো না, ওকথা ব'লো না—,কা'কে কি বলছো! মূর্ত্তিমান্ তপস্যা যে আজ ব্রাহ্মণের রূপ ধ'রে এরাজ্যে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। তিনিতো মানুষ নন্,—অতিমানুষ! বেদবিৎপ্রাণ, জ্ঞানের বারিধি—স্বয়ং বেদব্যাস! তাঁর চরণস্পর্শে আজ এরাজদণ্ড, রাজমুকুট ও রাজকুমার ধন্য হ'য়েছে রাণি!

প্রবীর। না বাবা, মা রাগ করেন—খুব রাগ করেন।

সুজা। নিজের যা খুশী তাই ক'রো, আমার সন্তানকে আমাদের বংশের মত হ'তে দাও; ওর সর্ব্বনাশ তুমি ক'রো না।

জয়। তুমি যাতে প্রসন্ন থাক, আমি তাতে কখনও কি না ব'লেছি?

সুজা। সে আমি জানি,—'না' বল্‌বার ক্ষমতাই যদি কারুকে তোমার থাকবে, তবে তোমার যে-সে এসে এমন করে কিনে ফেল্‌বে কেন? রাজার ঘরে ভিখারীর জন্ম হয়েছিল—আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্য! প্রবীর, যাও—পড়্‌তে যাও, আর কখনও যেন তোমায় তোমার বাতাবহ-কুলের অবমাননাজনক কার্য্যে লিপ্ত না দেখি!

জয়। আমায় একটা চুমো দিয়ে যাও প্রবীর!—

প্রবীর। না, মা রাগ করেন। [প্রস্থান]

জয়। আচ্ছা থাক্ থাক্, গুরুদেব তোমার মঙ্গল করুন!

সুজা। কে তোমার গুরু? সেই ভিক্ষুক বৈদিক?

জয়। কেন, ভিক্ষুক তিনি কেন? তিনি তো কারু কাছে কিছুই গ্রহণ করেন না! দিগ্‌বিজয়ী রাজার মত তিনি পৃথিবীকে নিজের প্রভাবলে জয় করে নিচ্ছেন! ভিক্ষুক এই আমিই সুজাতা,—ভিক্ষুক এই আমিই, আমিই তাঁর করুণা ভিক্ষা নিয়েছি! আঃ! সে কি শান্তি, কি সুখ সে—তোমায় কেমন করে বল্‌বো! তোমার আদর, আমার প্রবীরের স্পর্শ আমার যেমন মিষ্ট; তাঁর উপদেশ যেন তদপেক্ষাও মধুরতর!

সুজা। তোমার লজ্জা করে না! ধিক্ তোমায়! বৌদ্ধ তুমি—একেবারে সেই বৈদিকের দাসানুদাস হ'য়ে গ্যাছ!

জয়। যথার্থ বলেছ সুজাতা, তাঁর দাসানুদাসই আমি—থাক্, এখন ওসব আলোচনায় আর মন খারাপ ক'রো না, প্রিয়তমে! এসো আমাদের এই বিশ্রাম

অবসরটুকু আমরা প্রিয়প্রসঙ্গে অতিবাহিত করি। [হাত ধরিয়া] সুজাতা !—

সুজা। তুমি আমায় স্পর্শ ক'রো না।—ধর্মত্যাগী বৈদিকের দাসের সঙ্গে বৌদ্ধ-সম্রাট-দুহিতার কোনই সম্বন্ধ নেই।

জয়। সেকি! না—না তুমি অভিমান করে একথা বল্‌চো, বাস্তবিক তুমি কি এমন নিষ্ঠুর হ'তে পার্ব্বে? তুমি কি জানো না, আমার প্রাণাপেক্ষাও তুমি আমার প্রিয়তমা! তোমার হাসিমুখই আমার এ পৃথিবীর আলো!

সুজা। মহারাজ! চাটুকারের স্তুতি শুনে শুনে নিজেও বেশ চাটুকারবৃত্তি অভ্যাস করেছেন দেখছি! কিন্তু সুজাতা এত মূর্খ নয় যে, তোমার ওই ছলনা-বাক্যেই পূর্ব্বাপর সমস্ত বিস্মৃত হবে। তোমার সমস্ত আদর বড়ই যে মৌখিক তা' শুধু আজ নয়; অনেক বারই এর প্রমাণ হ'য়ে গেছে। আমিও আর এ অপমান সহ্য কর্ব্বো না। যদি তুমি তোমার নূতন ধর্ম্ম, নূতন গুরু চাও,—আমায় চেও না।—ধর্মত্যাগীর নিকট আমি আপনাকে স'পে রাখবো না, ইহা স্থির!

জয়। সুজাতা!—প্রাণাধিকে!

সুজা। হাঁ, এই আমার শেষ কথা! যা' দেবে সুরাসুরি দাও,—যা' আছে তাই থাকো, যা' আছে তাও যাক্। আর যদি ভাঙতে চাও,—তা'হলে আমূলই ভেঙে ফেলে দাও। আমায় বিদায় দাও, আমার গর্ভস্থ সন্তানকে ত্যাগ করো। নূতন হ'য়েছে, আরও হবে; তোমার দুঃখ কি?

জয়। সুজাতা! সুজাতা! এ কি বল্‌চো? স্বামীহত্যা করতে চাও?

সুজা। কিসের স্বামী! স্বামী যদি স্ত্রীর ধর্ম্মাদা না রক্ষা করলেন, তবে তিনি স্বামী কিসের! ধর্ম্ম স্বামীর উপরে, যিনি সেই ধর্ম্মকে অবমাননা করেন, তিনি স্বামী হ'লেও কেউ না, আমিও তাঁর কেউ নই।

[বেগে প্রস্থান]

জয়। অনেক ভেঙে পড়ে তবে একটা সৌধ গ'ড়ে ওঠে। 'অনেক পেতে চাইলে তারও বেশি দিতে হয়। তা' যা' দিতে হয় দেবো,—এর জন্য কাতর হ'লে চল্‌বে কেন? কেবল, নিজের থেকে যেন দিতে পারি, পরের দিয়ে যেন দিতে হয় না।

[প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—কাশী-রাজপুর-কক্ষ।

কুবারিল ভট্ট ও জয়ন্ত।

জয়ন্ত। আমি আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় করেছি, এক্ষণে আপনি আমার পথ নির্দ্দেশ করুন। অধিক আর কি বল্‌বো।

কুমা। বলার চেয়ে যা অনেক বড়, তুমি সেই প্রণামদ্বারা নিজের বলাকে প্রমাণিত করেছ। বলার তো কিছু প্রয়োজন নেই বৎস! অতি সাত্ত্বিকী বুদ্ধি তোমার, ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন বৌদ্ধজ্ঞান তোমার ন্যায় ভক্তিমানের জন্য নয়। বেদের কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় ক'রে তুমি কর্ম্মনাশা কু ধর্ম্মী দাম্ভিকতাপূর্ণ মূর্খত্ব দূরীভূত করো—এই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ! রাজাই প্রজার আদর্শ! রাজা যদি ধার্ম্মিক বেদবাদী যজ্ঞ-পরায়ণ হ'ন, তা'হলে প্রজাগণ কখনই উন্মার্গগামী হ'তে পারে না।

জয়ন্ত। আপনার আশীর্ব্বাদ আমার জীবনে সার্থক হোক।

কুমা। বেদজ্ঞ ইহ-পরলোকে অমৃতত্বই হ'য়ে থাকেন। জেনো বৎস! এই বেদোক্ত ক্রিয়াসকল সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। যথাযথরূপে নিষ্পন্ন হ'লে ইনি অভীষ্ট ফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রদান ক'রে থাকেন। এই বেদ ভিন্ন অপর কা'র এ শক্তি আছে? কে আর মৃতকে জীবন, অপুত্রককে পুত্র, রাজারাষ্ট্রকে বৈরাজ্যে অভিষিক্ত কর্‌তে সমর্থ? দেবগণও এই বেদের দাস, কেহেতু তাঁরা এই বেদমন্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞ যে ইন্দ্র মিত্রাবরুণ প্রভৃতিকে

আহ্বান করা হয়, বাস্তবিক যদি তাঁরা যজ্ঞ-কুণ্ডিলধারী হ'তেন ; তা'হলে ঐরাবতারূঢ় বজ্রপাণি ইন্দ্রের ভার কি মৃণ্ময় ঘট বহন করতে সক্ষম হ'তো ? তবেই দেখ, দেবতাগণও বেদমন্ত্রের ভিন্ন অপর কিছুই নন। এই বেদমন্ত্রের বিভিন্ন তালে ও ছন্দে, ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাস্পর্শানুসারে যেমন চরাচরের, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন দেবতারও সৃষ্টি হ'য়েছে। যে যে দেবতার যে যে ছন্দ, তাল, গতি,—সেই সেই ঋষির আরাধনা করে, সেই সেই তালে ছন্দে আহ্বান করতে পারলেই—সেই সেই দেবতা আবির্ভূত হয়ে থাকেন। জগতে তাই একমাত্র এই বেদই বরেণ্য এবং শরণ্যও একমাত্র এই বেদই—

(নেপথ্যে) আমার গৃহে দাঁড়িয়ে যে দুই চোরদের অসার সঙ্গীত থেকে এরূপ সম্মান দেখাবার স্পর্দ্ধা রাখে, তার পক্ষে মৃত্যুদণ্ডই উপযুক্ত !

[সুজাতার প্রবেশ]

জয়ন্ত। মহিষি ! পূজনীয় অতিথি—

সুজাতা। আমার পূজনীয় এবং আমার অতিথিও এখানে কেউ উপস্থিত নেই। এই বৈদিকই বুঝি তোমার বশীকরণমন্ত্রে বশীভূত ক'রেছে ! ভাল ব্রাহ্মণ ! তোমার কি প্রাণে ভয় নাই ? রাজা বাতুল হলেও রাজ্যের প্রজা-সাধারণ তো সকলেই বাতুল হয়নি ?

কুমা। দেবি ! আপনি বৃথা কোপ প্রকাশ করছেন। আমি যে ধর্ম্মের উপদেষ্টা তা'তে মানুষকে 'ইহ পর',—কোন লোক হ'তেই বঞ্চনা করে না ! এতে তাকে—আদর্শ গৃহী, আদর্শ রাজা এবং শ্রেষ্ঠ মানবত্বেই উন্নীত করে এবং সেই সঙ্গে স্বর্গভোগাদিরও অশেষবিধ উপায় ক'রে দেয়। এতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত, আশ্রমধর্ম্ম সংরক্ষিত এবং অগ্নি-যজ্ঞাদিদ্বারা দৈব-কোপাদি প্রশমন-পূর্ব্বক সুবৃষ্টি, সুতিক্ষ ইত্যাদিতে রাজধর্ম্মও পূর্ণমাত্রায় প্রতিপালিত হ'য়ে, রাজা প্রজা—উভয়েরই মঙ্গলবিধান করে। নিরীশ্বর অক্রিয় বৌদ্ধমত হ'তে—এই বেদমার্গ শ্রেষ্ঠ পন্থা।

সুজা। প্রবৃত্তিমার্গীর কামনা-কার্য্য নিবৃত্তি পথাদি যদি—এইতো তোমার বেদোক্ত যজ্ঞ ? শঠ ! অধর্ম্মের যে উপাসক, সে নিজেই পতিত।

জয়। সুজাতা ! সুজাতা ! —

সুজা। কেন, কিসের ভয় ! সত্যে গোপন নাই ! আমি সত্য কথাই বলতে আর শুনতে এসেছি। তা'হলে যথার্থই কি তুমি এই বৈদিকের চরণপূজা ইহ-জীবনের সার করলে ?

জয়। যদি চরণে স্থান দেন,—তাহ'লে,—হাঁ।

সুজা। তবে আমাদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধের এই শেষ ?—

জয়। তোমাদের ?—

সুজা। হাঁ, আমাদের। আমার—আর আমার পুত্র প্রবীরের। প্রবীর তার কুলধর্ম্ম ত্যাগ করে না। আমি এরাজ্যের রাণী,—আমি এদেশের প্রজার ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় রাখবার ভার নিয়েছি ; এসিংহাসনে বৌদ্ধের কোন ব্যক্তির দাবী নেই।

জয়। এ অতি উত্তম প্রস্তাব হ'য়েছে মহিষি ! তবে প্রবীরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে দিই ; আমার আর এ জাল-জঞ্জালজড়িত সিংহাসনে প্রয়োজনই বা কিসের ? প্রভুর চরণপ্রান্তেই এখন আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'লো। আমি তোমাদের অসুখী করতে চাইনে, সতি !

কুমা। সৌরভশীল জয়ন্ত ! এরাজ্যের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বৃহত্তর সাম্রাজ্যের সাম্রাট্‌পদবি হ'বার যোগ্যতা তোমাতে বর্ত্তমান ! তার কাছে আপাতিক এ ক্ষুদ্র রাজত্ব কোন ছার ? সেই অক্ষয় রাজ্যের রাজরাজেশ্বর হ'য়ে তুমি অনন্তকাল পূর্ণানন্দ উপভোগ কর্ব্বে, জেনো—ব্রাহ্মণের এ আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ !

জয়। (পদধূলি লইয়া) আপনার আশীর্ব্বাদ আমার নবজীবন দান ক'রছে। আমার চিত্ত হ'তে সমস্ত আসক্তির বীজ যেন ভস্ম হ'য়ে যাচ্ছে। আমি আপনার অনুগামী হবো।

সুজা। ব্রাহ্মণ ! আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি, যেমন তুমি আমার সুখের সংসার ভস্ম করে দিলে,

তেমনি তোমার সকল কর্ম্ম অকলঙ্ক হ'য়ে তোমার কাঙ্ক্ষিত স্বর্গদ্বার অবারিত করুক।

কুমা। দেবি! আমি আশীর্ব্বাদ করচি, আপনি আপনার এই মহাপ্রাণ স্বামীকে চিন্‌তে পেরে তাঁর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী পদলাভে ইহলোকে পুণ্য-গৌরব ও পরলোকে অক্ষয় স্বর্গলাভে ধন্যা হবেন।

জয়। বিদায় সুভদ্রা! আমার অবিদ্যমানে প্রবীরের সমস্ত ভার নিজের হস্তে গ্রহণ ক'রো। গুরুদেব! একবার আমার নয়নানন্দ প্রবীরের কাছে বিদায় নিয়ে, তাকে এই রাজমুকুট স্বহস্তে পরিয়ে দিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

সুভ। যাও! স্বধর্ম্মত্যাগী, আত্মপ্রত্যয়হীন এ দুর্ব্বল চিত্ততা যুদ্ধান্তে প্রবীরের সর্ব্বনাশ হবে, প্রজাদের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটবে। যে রাজার মর্য্যাদা রক্ষায় অসমর্থ, তার রাজপ্রাপ্তই অবাঞ্ছনীয়।

[প্রস্থান]

কুমা। সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষাকল্পে যে রাজ্যসম্পদ মেরুপ্রেম সমুদয় জাগতিক শ্রেষ্ঠ পদার্থ অনায়াসেই বিসর্জ্জন দিতে পারে, এ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গাদিলোকেও তার সমান বা অধিক নাই।

[প্রস্থান]

পট ক্ষেপণ

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নগর

সত্যব্রত, সত্যমিত্র, কল্যাণী ও শতানীক।

সত্যমিত্র। সেই কল্যাণ ভট্টই এই দিগ্বিজয়ী মীমাংসক—কুমারিল ভট্ট, এও কি সম্ভব! উচ্চ প্রাসাদ-চূড় হ'তে নিক্ষিপ্ত হ'য়েও এই সুদীর্ঘকাল সে জীবিত রয়েছে, এ কখনই সম্ভব নয় শতানীক!

শতানীক। কল্যাণ ভট্টের মৃতদেহ খাদের মধ্যে দুই হয়নি, একথা বোধ করি আপনার স্মরণ আছে? [জনৈক প্রতীহারের প্রবেশ] কি সংবাদ?

প্রতীহার। ওরু ইক্ষা করুন! বৌদ্ধসঙ্ঘের অকলাধি-স্বরূপ ব্রাহ্মণবেশধারী দ্বারে দণ্ডায়মান। পরিচয় জিজ্ঞাসায় তাদের অন্যতম এই পরিচয় প্রদান করছে যে তাদের প্রধান যিনি, তিনিই দিগ্বিজয়ী মীমাংসক প্রধান কুমারিল ভট্ট।

শত। ঐ শুনুন! এখনি চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হ'তে পার্কে।

সত্য মিত্র। যদি তা-ই হয়, তাহ'লে সম্ভবতঃ কল্যাণ ভট্ট আমাদের নিকট বন্ধুভাবে উপস্থিত হয়নি!

শত। তাতে কোন সন্দেহ আছে! সে আমাদের চিরশত্রু!

সত্য মিত্র। তাতেও আমি ভীত নই। আমি জানি তর্কযুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীকে আমি পরাভব করতে সমর্থ। সেদিন যদি তার মৃত্যু না হয়ে থাকে, আজ আর জীবন্ত ফিরতে হ'বে না! শতানীক! পরাজিতের পক্ষে মৃত্যুদণ্ড বিহিত হোক।

শত। উত্তম! উভয়ভৈলে নিমজ্জন—নেহাৎ মন্দ হ'বে না।

কল্যাণী! কিন্তু যদি—

শত। 'কিন্তু যদি' কি?—আমাদের গুরুকে তুমি কি এমনই ভুচ্ছ মনে করো কল্যাণি! ছি ছি! এই তোমার গুরুভক্তি! (জনান্তে) আমার হৃদিকেই দাও! যুদ্ধের ফল হ'লে আমিই সত্যমিত্র হবো, তখন সত্যকাম কেমন ক'রে আর আমায় প্রত্যাখ্যান করবে? এই যুদ্ধের ভরেই কেবল তাকে বধপ্রয়োগে বাধ্য করতে পারি নাই।

সত্য মিত্র। (প্রতীহারের প্রতি) যাও ব্রাহ্মণগণকে ল'য়ে এসো। [প্রতীহারের প্রস্থান] কিন্তুমার ভীত হয়ো না কল্যাণি! তর্কে শিবনাগাচার্য্যকে পরাভব

করতে পারে এমন কেহ এক্ষণে এবরিণী-বক্ষে জীবিত নাই!

[অগ্রে প্রতীহার ও তৎপশ্চাৎ কুমারিল, মণ্ডন ও কতিপয় কুমারিল-শিষ্যের বেদধ্বনিসহকারে প্রবেশ]

সন্ধ্য মিশ্র। কে—কল্যাণ ভট্ট?

কুমা। (অভিবাদন করিয়া) সন্ধ্যাচার্য্য! আমার প্রকৃত স্বরূপ এই কুমারিল ভট্টই জানবেন।

সন্ধ্য মিশ্র। চৌর্য্যাদি হীন-কর্ম্মকারকগণই নীয় স্বরূপ গোপনার্থ ছদ্ম নামাশ্রিত হ'য়ে থাকে, এপন্থা সাধুজনের নয়, এরূপ ব্যক্তিকে স্বগৃহে আসন প্রদান করতে তাই কুণ্ঠানুভব করছি।

কুমা। সন্ধ্যাচার্য্য! আপনি শাস্ত্রদর্শী ব'লে প্রচার ক'রে থাকেন, অথচ একথাও কি জানেন না যে, দেবতাগণও কখনও কখন কার্য্যসিদ্ধি ব্যপদেশে নিজরূপ পরিবর্ত্তন ক'রে ছদ্মরূপধারণ ক'রে থাকেন। আমি আপনার আতিথ্য-সম্মান লাভার্থ আগমন করিনি, কেবল কয়েক দণ্ডের জন্য কিছু শাস্ত্রালাপে চরিতার্থ হ'তে এসেছি।

সন্ধ্য মিশ্র। উত্তম, উত্তম, আমি এপ্রস্তাবের অনুমোদন কর্লেম। তর্কপাত্রে অদ্যিতীয় পণ্ডিতবর্গ অনেকেই যে সম্মান লাভ ক'রে গ্যাছেন, তা'থেকে তোমাকেও আমি ক্ষুণ্ণ করতে চাইনে। এখন কোন্ বিষয় তুমি প্রতিপাদন করতে চাও, শুনি?

কুমা। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব।

সন্ধ্য মিশ্র। ভাল, ভাল, তুই হলেম! যা পুরুষকর্ত্তৃক রচিত হয়, তা'কে তোমরা কর্ত্তৃদোষে দূষিত ব'লে জ্ঞান করো। যা অ-পৌরুষেয়,—অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় যে বস্তু বাস্তব-সত্তাহীন;—তাকেই প্রামাণ্য বলে প্রমাণ করবে! তা'করো, কিন্তু আমারও এক প্রস্তাব আছে। পণ রেখে বিচারে প্রবৃত্ত হ'তে হবে। মীমাংসক! এতে তোমার অসম্মতি নাই?

কুমা। না। বিজিত দিগ্বিজয়ীর দণ্ডগ্রহণ কর্ত্তেন, এই আমার বিচারের চিরসর্ত্ত।

সন্ধ্য মিশ্র। এসর্ত্ত রয়, আমি অপর সর্ত্ত রাখতে চাই।

কুমা। আমার সকল সর্ত্তেই সম্মতি জানবেন।

সন্ধ্য মিশ্র। পরাজিত উত্তপ্ততৈলে নিমজ্জিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ করবে, এই আমার সর্ত্ত।

কুমা। এরূপ কঠোর সর্ত্তরক্ষা ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য নয়।

সন্ধ্য মি। দিগ্বিজয়ী ধৈর্য্যহীন! তোমার বক্ষের ভগ্নে সুদৃঢ় স্বর্গাদি-ভোগসম্বন্ধে বিশ্বাস বড়ই তরল দেখ্‌ছি যে! যে গার্হস্থ্য অগ্ন্যাদি সেবা পৌর্ণমাস্যাদি যাগ ও বৈদিক আচার সমস্ত যথাযথ পালন ক'রে থাকে, তার ভয় কিসের?

কুমা। ভয়ের নয় সন্ধ্যাচার্য্য! প্রত্যবায়ের আশঙ্কা-মাত্র। যে উদ্দেশ্যেই হোক্, একদিন আপনাকে গুরু অস্বীকার করেছিলেম। যদিও বেদ-বিরুদ্ধ বিদ্যা আমার নিকট অ-বিদ্যামাত্র, তথাপি যাঁর নিকট যতটুকু লাভ করা যায়, তিনি সেই পরিমাণেই গুরুপদবাচ্য। কিন্তু যদপি ইহাই আপনার একান্ত অভিপ্রেত হয়, তবে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

সন্ধ্য মিশ্র। আমার জন্য চিন্তিত হয়ো না বালক; নিজের ইষ্ট চিন্তায় মনোনিবেশ করো। এখন এসো বিচারারম্ভ করা যাক্।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সন্ধ্যারামের বহির্দ্বার প্রাঙ্গন,

অগ্নির উপর তৈলপূর্ণ বৃহৎ কটাহ,

সন্ধ্যমিশ্র, শতানীক, কল্যাণী প্রভৃতি ও কুমারিল,

মণ্ডন, ও শিষ্যবর্গ।

সন্ধ্য মিশ্র। (আত্মগত) পরাজয়! একটা নগণ্য বৈদিক বালকের নিকট দিঙ্‌নাগাচার্য্যের পরাজয়! ধিক্, ধিক্—এজীবনে! প্রায়শ্চিত্ত প্রবণে আর কালবিলম্ব

অবিশ্বের ! না জানি আমার শিষ্যমণ্ডলী আমার এ হীনতায় কি মনে করছে !

কুমা। সঙ্ঘাচার্য্য ! বিচারে জয়-পরাজয় স্বভাবতঃই অনিশ্চিত। আজ আপনি আমার নিকট তর্কে পরাভূত হয়েছেন বলে —আপনার তর্কশক্তি ও বিচার-পদ্ধতির অপ্রশংসা কেউ করতে পারবে না। আপনি বিদ্বান্, সুবক্তা, চিন্তাশীল,—এক্ষণে বেদবাণী অবলম্বন ক'রে জগতে কীর্ত্তিমান হোন।

সঙ্ঘ মিত্র। (স্বগতঃ) কুমারিল ভট্ট পদ রাখা সত্ত্বেও আমায় জীবনগ্রহণ করতে ইঙ্গিত করে। ব্রাহ্মণে চিত্ত কষায়িত বটে ! এখন কি করি ?

কুমা। আচার্য্য ! এবিষয়ে কেন আপনি দ্বিধা করছেন ? সত্যের আশ্রিত হ'তে যাচ্ছেন, এ'তে কুণ্ঠিত হ'বার কি আছে ?

সঙ্ঘ মি। না, তাই—

শক্তা। আচার্য্য ! এই দুষ্ট ধূর্ত্ত শুধু আপনাকে না, সমস্ত বৌদ্ধসঙ্ঘকেই অবমানিত করবার জন্যই এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এরকম কল্যাণভাষী ! তুই কি কল্পনা করেছিস যে, নশ্বর জীবনের মমতায় আমাদের জন-পূজ্য গুরুদেব নিজের উপাসিত এই মহোচ্চ ধর্মসঙ্ঘের অবলম্বনসাধনপূর্ব্বক তোর ধাপ্পায় আত্ম-নিয়োগ করে অবসরক্ষেত্রে হাস্যাস্পদ হ'তে যাবেন ?

কুমা। শতানীক ! তুমি চিরদিনই কুচক্রী এবং শঠ ! যদি তোমার গুরুভক্তি প্রকৃত হ'তো, তাহ'লে কখনই তুমি তাঁকে এরূপ শোচনীয় মৃত্যুর হস্তে নিক্ষিপ্ত হ'তে উৎসাহিত করতে না। যাই হোক্, তাঁর শুভাশুভ তিনি নিজেই বিবেচনা কর্ব্বেন, তুমি নীরব হও।

শক্তা। বহুরূপী ভণ্ড বৈদিক ! আমার গুরুর ধর্ম্মাধ্যক্ষান, ধর্ম্মানুরক্তি—তোর চেয়ে আমার বহুগুণে সুবিদিত। কখনই তিনি তোর মত বেদজীবন ধারণ ক'রে লোক-সমাজে নিন্দিত হ'তে জীবিত থাকবেন না। এখনি তুই, তার প্রমাণ পাবি। আচার্য্য ! আপনি প্রতীক্ষা করছেন কেন ? আমাদের প্রতি কি আপনার কোন শেষ আদেশ দেবার আছে ?

সঙ্ঘ মিত্র। (আত্মগত) শক্তানীক সত্যসত্যই আমার মৃত্যু চায় ! হ'তে পারে যথার্থই সঙ্ঘের সম্মান রক্ষার জন্য, হ'তে পারে নিজের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে, কিন্তু মৃত্যু আমার চায়। জীবন রক্ষার কোন উপায়ই নেই। (প্রকাশ্যে) আদেশ উপদেশ আমি চিরদিনই যা দিয়ে এসেছি, তা ভিন্ন নূতন কিছুই দেবার নাই। আমি সত্যাভেষে যাকে আশ্রয় করেছিলেম, অপরকেও তারই অংশ দান করেছি, যদি ভুল করে থাকি, সত্যাভেষেই করেছি। তারই আশ্রয়ী থেকে চ'লে যাবো। সংসার স্বপ্নবৎ, জীবন নশ্বর, মৃত্যুতেই নিত্য জীবের সমাপ্তি। শুধুই মানবজীবনের অভিপ্রায়, গুরু-আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ সাংসারিক জীবের পক্ষে তপ, জপ, তীর্থ, ধর্ম্ম,—অপর কোন মহত্বকেই এর তুলা নয়। এখন আমি মরতে প্রস্তুত। তোমাদের সকলকেই আশীর্ব্বাদ করলেম। (অগ্রসর হওন)

কুমা। শতানীক ! গুরুহত্যা মহাপাতকাংশে তোমায় স্পর্শ করবে জেনো।

শক্তা। শতানীক কোন মহাপাতকের ভয়ে ভীত নয়। তুমি সাবধান থেকো বৈদিক ! আচার্য্য ! শত্রু-পক্ষীয়গণ হয়ত বৌদ্ধাচার্য্যের মানসিক সাবধ্যসম্বন্ধে সন্দিহান হচ্ছে। (স্বগতঃ) এখনি হয়তো শক্তাকাষা এসে পড়ে কি একটা বিঘ্ন উৎপাদন করে বসবে। আঃ এবার নিশ্চিন্তচিত্তে সঙ্ঘ এবং সত্যকাষা উভয়েরই শত্রু হ'তে পারবো !

সঙ্ঘ মিত্র। (স্বগতঃ) উঃ ! এই পাষণ্ড শতানীক আমার মরণের আর মুহূর্ত্তকা। বিলম্ব সহ্য করতে পারছে না ! চিরদিন যা শিখিয়েছি ; তাতে তো মানুষ এইরূপ পিশাচে পরিণত হয় ! তবে কি কুমারিলের মতই ঠিক ? কোথায় কল্যাণ, আর শতানীক কোথায় ?—নাঃ, এখন আর এসন্দেহেরও অবসর নেই। যাকে আজীবন পূজা দিয়ে এসেছি, আজ এই শেষের মুহূর্ত্তে একমাত্র সেই আমার পূজ্য ! কিন্তু কে সে ? পূজা করবো কার ? বুদ্ধ ! বুদ্ধ ! তাঁর কি পূজা করা যায় ? তাঁর উপাসনাই বা কিসের ?—না না,—যায় বই কি। সর্ব্বশূন্যেরই এই

সর্ব্বশূন্য-চিত্তাসনে বসিয়ে সেই ধ্যানেই মগ্ন হই! (কটাহের নিকটস্থ হইয়া)

"খড়্গাক্ষো নাভি-মধ্যো মহ কর-চরণো নাস্তি চক্ষুর্নিমাসো
আকারো নৈব বর্ণো মহ ভয়-মরণে নাস্তি জন্মাদি যস্য।
যোগীন্দ্রৈর্জ্ঞানগম্যং সকলজলময়ং সর্ব্বলোকৈকনাথং
ভক্তানাং কামপূরং সুর-নরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিম্।"

আঃ! এই শূন্যমূর্ত্তি ভাবতে গিয়ে যেন এক অপরূপ পূর্ণমূর্ত্তি আমার হৃদয় মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখছি যে! একি কুমারিলেরই বেদমন্ত্রে আকর্ষিত দেবতার রূপ! কুমারিল! কুমারিল! তুমি আমার শত্রু বটে, কিন্তু তোমারই কল্যাণে আজ এই আসন্ন সময়ে আমি এই অপূর্ব্বদর্শন দর্শন ক'রে চরিতার্থ হ'য়ে গেলেম। তোমাকেও আশীর্ব্বাদ করি।

(কটাহ মধ্যে পতন)

[বেগে সত্যকামার প্রবেশ]

সত্য। পিতা! পিতা! স্নেহময় জনক আমার! এ অনাথা অভাগিনী সত্যকামাকে তুমি কার আশ্রয়ে রেখে গেলে?

শঙ্খ। সত্যকামা, সত্যকামা, কেন তুমি অধীরা হচ্ছো! তুমি অনাথা কিসে? জানো না কি, শঙ্খানীকের হৃদয়রাজ্যে তুমি রাজেন্দ্ররাণীরও অধিক! পিতা কার চিরদিন থাকে না।

সত্য। কুলঘ্ন! গুরুদ্রোহী! প্রভু-হত্যা, গুরু-হত্যা করেও তোর তৃপ্তি হলোনা! আমায় অবমানিত করতে চাস্—তোর এ বাসনা কখনই পূর্ণ হবে না।

কুমা। দেবি! যদি অনুমতি হয়, আমার বিশুদ্ধ শিষ্যধর্ম্ম আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে রক্ষা করতে সমর্থ।

সত্য। কল্যাণ ভট্ট! না—কুমারিল ভট্ট! তুমি যেই হও—যাই হও, তুমি আমার পিতৃহন্তা! এ পৃথিবী আমার পিতার দেওয়া—এ পৃথিবীতে তোমার নিকট হতে আর আমি কোন কিছুই গ্রহণ করবার অধিকারিণী নই। যিনি আমার এ পৃথিবীর একমাত্র অবলম্বন ছিলেন, তাঁর বিরহে এ জগৎ আমার শূন্য হয়ে গেছে। আমিও তাঁর অনুবর্ত্তিনী হবো। কিন্তু ঘৃণীশ্বর! আপনাকে বলে যাই—যে উদ্দেশ্যেই হোক, আপনি আমার পিতার শিষ্যত্ব একদিন অঙ্গীকার করেছিলেন, আপনাকেও গুরুদ্রোহ-পাপ স্পর্শ করেছে। পারেন, যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করে এখন পাপ হতে সত্বরে মুক্ত হবেন। আমি পিতার নিকট চল্লেম।

[কটাহ মধ্যে পতন]

শঙ্খ। সত্যকামা! সত্যকামা! কি করলে! আমার চিরপোষিত আশা এক মুহূর্ত্তে উৎপাটিত করে দিলে!—এ আমি কিছুতেই সইতে পার্ব্বোনা! কোথা যাবে? এই এখনি আমি তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

[কটাহ মধ্যে ঝম্প প্রদান]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান, উজ্জয়িনী, শিপ্রা-বক্ষে তরণী

ইন্দিরা ও ওত্রা

ইন্দিরা। কতদিনই গত হ'য়ে গেল, আর দেখা পেলাম না। আমার ভাগ্যে তো সে সাক্ষাৎ ঘটেনি ওত্রা, সে শুধু আমার পুণ্যবতী পিসিমার পুণ্যফলেই সেদিনের সেই অপ্রত্যাশিত দর্শনলাভ ঘ'টেছিল; তিনি তাঁর সেই কার্য্য সমাপ্ত ক'রে এ জগৎ হ'তে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন আর কিসের বলে তাঁর দেখা আমি পাবো? পিসিমা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তিনি আমায় একবার আস্তেন।

ওত্রা। তুমি তাঁকে দেখ্‌বার জন্য এমন অধীরা হচ্ছো রাজকুমারি, শুনে আমার গায়ের মধ্যে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে; কে জানে ভাই, তোমাদের রাজা-রাজড়ার রক্ত গায়ে,—তোমাদের ভরসা খুব! সেই চেহারা, সেই চোখের দৃষ্টি মনে পড়লে, আজও এত বছর পরে আমার গায়ে যেন কাঁটা দেয়। উঃ! গলারই বা কি জোর! যেন কাঁসর ঘণ্টা বেজে বেজে উঠছে, চোখ্‌তো নয়—যেন দুটো আরতি-প্রদীপ!—

ইন্দিরা। সেই চোখের জ্যোতিতে যে বিশ্বজ্যোতিঃ উঁকি দিচ্ছে তুই দেখিস্‌নি ওত্রা? সে দেখে আনন্দে বিস্ময়ে মন নির্ব্বাক হ'য়ে চরণে লুটিয়ে পড়ে; তারকার ভয় কোথায়!

সে কণ্ঠের সেই উদাত্ত স্বর, যা মৃতকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে, সুধি। সে আহ্বান এই এখনও যে আমি আমার কাণের কাছে শুনতে পাচ্ছি! তুই পাচ্ছিস্‌নে? ওই যে কোন্ সুদূর হ'তে আজও তাঁর সে জলদ-নিঃসৃত কণ্ঠ আকাশের দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে!

গীত

কে আছে জেগে আজি এ ঘোর তমসায়!
আঁধারে ভরা নিশি ঘুমি নাহি যায়।
সঘন ধারা ঝরে, বাতাস হা হা করে, বজ্র কড় কড়ে,
বক্ষ কাঁপে হায়।
বিজলী চমকিয়া আঁধারে মিশে যায়।
কে, কোথা আছ জেগে, ভেঙেছে ঘুমঘোর!
কাহার জীবনেতে হ'য়েছে নিশিভোর,
কাহার পূর্ব্বাকাশে তরুণ আলো ভাসে,
স্বপন টুটে আসে প্রাণে কার?
কার সে জীবনেতে ঘুচেছে যোয়ার।
সঙ্গে বলে কেবল প্রাণে পেলে,
শান্তি শতদলে, কেবা চায়?
কাহার আছে ক্ষুধা, কে নিবি প্রেমসুধা,
তবে, না জানি কোন বাধা, আয়রে,—ছুটে আয়।
[গাহিতে গাহিতে তরণী অদৃশ্য হওন]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কাশী-রাজান্তঃপুর

সুধাতা

সুধা। যদি সাধারণ নারীজন্ম নিয়ে জন্মতে আসতেম, তবে আজ আমার বুদ্ধি গুটিয়ে কেঁদে ভাসবার কথা। স্বামী সত্ত্বেও আজ আমি স্বামিহীনা! কিন্তু এই নারী-দেহের মধ্যে যে রাজবন্দিনী,রাজমহিষীর কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চিরসিংহাসন পেতে ব'সে আছে, মাথায় তার রাজমুকুট, হাতে তার রাজদণ্ড। সে স্বামীর সহধর্ম্মিণী এবং রাজেন্দ্রের রাজেন্দ্রাণী! শুধু সোহাগিনী পত্নী নয়, স্বামী আজ আমার স্বধর্ম-ত্যাগের, স্বজনদ্রোহের মহাপাপপঙ্কিল হয়েছেন, রাজা তাঁর রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে ভিখারীর ব্রতাবলম্বন ক'রেছেন—তাঁর সে কলঙ্ক হ'তে আমাকেই এ রাজ্য এবং এর প্রজাবর্গকে মুক্ত রাখ্‌তে হবে। রাজার পরিবর্ত্তে রাণী—আমি তাদের পালন কর্ব্বো, তবেই মাতৃত্বই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। আমার সন্তানকে কুমুষ্টাত্ত হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পার্‌লে সেই মাতৃত্ব আমার কি ক্ষুণ্ণ হবে না? সংসারের পালনশক্তি এই প্রজা-জননী আমি, আমার কি স্বামীসোহাগে আত্মবিস্মৃতা হ'য়ে নিজের সেই প্রধান কর্ত্তব্য বিস্মৃত হওয়া শোভা পায় যে, আমি স্বামীর জন্য শোক কর্‌বো?—প্রবীর! প্রবীর! একি! কোথা যাচ্ছো? [প্রবীরের প্রবেশ] এ সময় তোমার প্রবেশ কেন?

প্রবীর। কেন মা, আমি তো এখন রাজা হয়েছি, সকল সময়েই তো দ'রবার বসান থাকবো। মুকুটখানা মা বড্ড বড় হ'তো ব'লে, মন্ত্রি মশাই সেটা ভেঙে এই ছোট মুকুটটা করিয়ে দিয়েছেন, তলোয়ারটাও মা বড্ড বড়, এটাও বদ্‌লাতে হবে।

সুধা। প্রবীর! তোমার পিতৃ-পিতামহের রাজমুকুট তুমি ভেঙে ফেলেছ! আমার অজ্ঞাতে এসব কর্ম্মার অধিকার তোমাদের কে দিলে?

প্রবীর। কেন মা, মন্ত্রিমশাই বল্লেন—এখন আমি রাজা, আমার হুকুমেই এখন সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হবে, কেউ আমায় কিছুই বল্‌তে পার্ব্বে না।

সুধা। বটে! আচ্ছা যেতে দাও আমি, কত বড় তোমার সেই মন্ত্রিমশাই! যাও, মুকুট অসি খুলে রেখে—এখনি পড়্‌তে যাও।

প্রবীর। আমি আর পড়তে পারিনে,—আমার ভাল লাগে না।

সুধা। কি এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার। পড়্‌তে তোমার ভাল লাগে না! কেন?

প্রবীর। আচার্যমশাই বলেন—এখন আমি রাজা, রাজার বিদ্যা-শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। অনর্থক শ্রম না করে তিনি আমায় আমোদ আহ্লাদ করতে বলেছেন। আজ রাজ-সভায় পাখীর লড়াই হবে—তাই আমি সেখানে যাচ্ছি।

সুভা। না, যাওয়া হবে না, [হস্ত ধারণ] প্রবীর! তোমার পিতা বর্ত্তমানে তুমি কি এই রকম ছিলে?

প্রবীর। [বিরক্তিভরে] আঃ ছেড়ে দাও না, লড়াই যে সুরু হয়ে গ্যাছে! না তখন ত আমি রাজা ছিলাম না।

[হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান)।

সুভা। এ কি হ'লো! তাহার সেই মাতৃগতপ্রাণ শান্ত সুধীর প্রবীর আজ একি হ'য়ে উঠ্‌লো! এই ক'টি দিনে এই পরিবর্ত্তন,—পরে না জানি আরও কত হবে!—ওরলিকা!

[দাসীর প্রবেশ]।

ওরলিকা, মন্ত্রিমশাইকে আমার আহ্বান জানিয়ে এসো, এই মুহূর্ত্তেই যেন একবার এসে সাক্ষাৎ করেন, বলবে বিশেষ প্রয়োজন। [দাসীর প্রস্থান] মহারাজ গৃহে থাকতে এ গৃহ যেন আর এক রকম ছিল, অথচ তিনিতো কই কিছুই দেখতেন না! তখনও আমি, এখনও আমি এ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী, কিন্তু তখন সমস্তই কি সুশৃঙ্খলা, আর এখন সবই যেন ক্রমে ক্রমে বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়ছে! কেন? এর অর্থ কি? এ' কার জন্য এরূপ হচ্ছে?

(রাণী ও তৎপশ্চাৎ মন্ত্রির প্রবেশ)।

মন্ত্রি। (অভিবাদনপূর্ব্বক) কি আদেশ মহারাণি!

সুভা। এ পুরাতন রাজবংশের সম্মানমুকুট আপনি কার আদেশে নষ্ট হ'তে দিচ্ছেন মন্ত্রিবর?

মন্ত্রি। মহারাজ্ঞি! রাজাজ্ঞাতেই এ দাস এ কার্য্য ঘটতে দিয়েছে।

সুভা। সে কি! কোথায় রাজা? তিনি তো কই এ কথা বলে যাননি!

মন্ত্রি। আজ্ঞা তিনি নন, বর্ত্তমান মহারাজের।

সুভা। কে, প্রবীর! তার আজ্ঞায়? সে অষ্টমবর্ষীয় বালক, এ মুকুটের সম্মান সে কি জানে? কিন্তু আপনিও কি শিশুর সঙ্গে শিশু হলেন মন্ত্রিবর! কোথায় তাকে আপনারা সৎশিক্ষা দেবেন, তা' না হয়ে তাকে উৎসন্ন যাবার পথে অগ্রসর করে দিচ্ছেন!

মন্ত্রি। অনর্থক এ তিরস্কার করে আমাকে আপনি অপমানিত করছেন মহারাণি! মহারাজ প্রবীরসেন এখন এ রাজ্যের রাজা—আমরা রাজার দাসানুদাস, সেইহেতু ভাল হ'ক মন্দ হ'ক নির্ব্বিচারে তাঁরই আজ্ঞা পালন কর্ত্তে আমরা বাধ্য, আর কারও নয়।—এতে আপনি বিরক্ত হ'লে আমরা নিরুপায় যে জননি!

সুভা। আমি এ রাজ্যের রাণী—আমার আদেশ ভিন্ন কোন কার্য্য হ'তে পার্ব্বে না।

মন্ত্রি। না মা, আপনি এখন রাজমাতা, রাজমাতার শাসনকার্য্যে কোনই অধিকার নাই। আপনার অধিকারের সীমানা এই রাজান্তঃপুর, এক্ষণে এ দাস বিদায় গ্রহণ করছে,—কর্ত্তব্যের অনুরোধে অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করতে হ'লো, দোষক্ত সন্তানবোধে ক্ষমা কর্ব্বেন।

(অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

সুভা। মহারাজ! স্বামিন্! প্রিয়তম! তোমার আদরের মোহে অন্ধ হ'য়ে তোমায় বুঝতে পারিনি, তাই কি দূরে গিয়ে আজ আমায় তা' ভাল করেই তুমি বুঝিয়ে দিলে? আজ কোথা তুমি রাজরাজেশ্বর! চন্দ্রহীনা যামিনীর ন্যায় একমাত্র তোমাবিহনে আমার আজ যে সমস্তই ব্যর্থ,—সব অন্ধকার!

(মূর্চ্ছিতা হইয়া রোদন)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মাহিষ্মতী, মহাবিদ্যালয়-সংলগ্ন কক্ষ

জয়ন্ত ও কুমারিল

জয়ন্ত। এই সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীর পাঠধ্বনি-প্রতিধ্বনিত বিদ্যালয় জগতের এক অতুলনীয় গৌরবের বস্তু। ইতঃপূর্ব্বে আর কখন এরূপ ঘটে নাই।

কুমা। মা বৎস! এ আর্য্যভূমি চিরযুগ-যুগান্তর হ'তেই জননী শারদার বিদ্যাপীঠস্বরূপা। ঋষিযুগের তো কথাই নেই, এই সেদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের কাল হ'তে নালন্দা তক্ষশিলা প্রভৃতিতে এইরূপ মহাবিদ্যালয়সকল মহাসৌরবের সিংহাসন পেতে রেখেছিল। ইদানীং এখনও বৌদ্ধাবনতির সহিত বহুলাংশে অধঃপতিত হ'য়ে গেলেও তারা একেবারে অস্তমিত হয়নি, কিছু অবশেষ এখনও আছে।

জয়ন্ত। কিন্তু এই কোটি কোটি অজ্ঞানান্ধকারাবৃত মানবের লীলাভূমে এই একটি বিদ্যাপীঠের আলোক তো পর্য্যাপ্ত হবে না, দিকে দিকে এইরূপ প্রতিষ্ঠান আরও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

কুমা। বৎস! এক জনের দ্বারা অথবা এক দিনে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয় না। আমরা যে বৃক্ষ রোপণ করলেম, আমাদের পরে অপর কোন মহাজন সলিলাদি সেচন দ্বারা এই ক্ষুদ্র বৃক্ষকে বনস্পতিরূপে পরিবর্ত্তিত করতে পারেন। এই কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা কালে দিকে দিকে প্রসারিত হ'য়ে যাবে। নিশ্চয় সে দিন সুদূরাগত।—কে দীনা নারী!—

[সুজাতার প্রবেশ]

জয়ন্ত। একি সুজাতা এবেশে!—এখানে!

সুজা। রাজেশ্বর! এই ক্ষুদ্র কুটীর, দীনবেশ যদি কাশীপতির উপযুক্ত হয়, তবে তাঁর সেবিকার অপর আর কোন্ বেশ উপযোগী হবে প্রভু?

জয়ন্ত। গুরুদেব! আমার সুজাতা কি উন্মাদিনী হ'য়ে গেল? প্রভো! এ ঘৃণা যে আমার সহ্য হ'চ্ছে না।

সুজা। উন্মাদিনী! না উন্মাদিনীই আমি হ'য়েছিলেম প্রভু, সম্প্রতি সেই ঘোর গর্ব্বোন্মাদ হ'তে আরোগ্য লাভ করে নিজেকে চিন্‌তে পেরেছি। নিজের প্রকৃত রূপ দেখ্‌তে পেয়ে তাই আজকে অস্থির হ'য়ে ওই শরণাশ্রয়ী-পাদপদ্মে আশ্রয় নিতে ব্যাকুলচিত্তে ছুটে এসেছি। নাথ! মহারাজ! এ পাপিনী সুজাতাকে কি আবার চরণে স্থান দিতে পারবে? (চরণ ধারণপূর্ব্বক রোদন)।

জয়ন্ত। গুরুদেব! গুরুদেব! একি?

কুমা। কিছু না বৎস! তোমার পুণ্যে তোমার সহ-ধর্ম্মিণী দিব্য দৃষ্টি লাভ করেছেন মাত্র।

সুজা। ভট্টপাদ! শুধু তাই নয়, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার জীবনে এতই শীঘ্র সফল হ'লো, আপনি আমার জ্ঞানদাতা, আমার মহাগুরু স্বামীর গুরু—আজ হ'তে আমারও গুরু আপনি। আমার স্বামীর ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম, আমারও যে তিনি ব্যতীত আর স্বতন্ত্র কোন ধর্ম্মও নাই, আমি তা বেশ বুঝেছি!

কুমা। সাধ্বি! সীতা সাবিত্রীসমা ইহ-পরলোক জয়-যুক্তা হও।

সুজা। প্রভো, প্রভুর আমার চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত। রাজাবিহনে সাম্রাজ্য ধ্বংস হ'তে বসেছে।

কুমা। রাজর্ষি! সহধর্ম্মিণীসহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক বালক রাজার পালন ভার গ্রহণ করো। তোমার কর্ম্মভূমি এখন তোমায় আহ্বান কর্‌ছে। সনাতন পুণ্য-ক্ষেত্রে এক্ষণে তোমার কার্য্যের সীমা নেই।

জয়ন্ত। প্রভো, রাজ্যে আর কি প্রয়োজন? আমরা আপনার পদপ্রান্তে আশ্রয় নিয়ে শান্তিময় জীবন অতিবাহিত কর্ব্বো।

কুমা। বৎস জয়ন্ত! শান্তি স্থানে নয়—মনে, প্রশান্ত-করণ ব্যক্তির কোথাও অশান্তির আশঙ্কা নাই। তোমার আশ্রমধর্ম্ম এখনও সম্পন্ন হয়নি, রাজ-কর্ত্তব্য, পিতৃ-কর্ত্তব্য সম্পাদিত হ'লে কালপূর্ণে বানপ্রস্থ গ্রহণ কর্ব্বে। এক্ষণে প্রজাপালনই তোমার ধর্ম্ম। যাও, জনকের ন্যায় রাজ-যোগীর আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজ-সম্পত্তি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করো।

জয়ন্ত ও সুজাতা। প্রভু-পাদপদ্মেই ভরসা (প্রণাম)।

কুমা। কোলাহলময় সংসার-বিপণী মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম্মাবলম্বী থেকো।

[একদিকে জয়ন্ত সুজাতা এবং অপর দিক দিয়া কুমারিল ভট্টের প্রস্থান)।

পট ক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অবন্তী—রাজোদ্যান।

সাজি হস্তে ইন্দিরা।

গীত

ইন্দিরা।—

আমার ডাক এসেছে, (আমায়) ডেকে গ্যাছে,
ঘরের বাহিরে।
আমি কেমন করে. এমন করে, রইব যে ঘরে।
আজ বিশ্ব আমার ঘর,
দেখা নেইকো কোনই পর,
আজ, টান্‌ছে প্রাণের' সবার পানে,'
পুলকের ভরে।
আজ, নেইকো কারেও ভয়,
কোথাও নেইকো পরাজয়,
আজ, বিশ্বরাজের কর্ব্বো পূজা বিশ্ব-মন্দিরে।
ভক্তি প্রীতির বিল্বদলে,
বিশ্বপ্রেমের গঙ্গাজলে,
আর আদায়ে তাঁর পূজার প্রদীপ প্রাণের ভিতরে॥

সে কি শুভদিন! কোন্ শুভ মুহূর্ত্তের অপরীরী দেবতারা সেই মঙ্গলময় নিমেষকে আমার জীবনে প্রেরণ করেছিলেন জানিনে। সেই হ'তে আমার চারিদিকে যেন একটা বিপুল আনন্দের অপরিসীম করুণার মৈত্রী প্রেম ভালবাসার স্রোত প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে, আমি এ প্রত্যক্ষ অনুভব কর্‌ছি। মনে কত বল, কার্য্যে কত সুখ—বিশ্রামে কেমন মধুর শান্তি। হাত যেন সেই হ'তে মনকে আমার স্পর্শ করতে পারে না। এমন কি পিপাসার অভাবকেও আর অভাব বলে বোধ হয় না। তিনি নিজ কণ্ঠস্বরে মহত্ত্বোক লাভ করেছেন,—স্বামী-সম্মিলিতা হ'য়েছেন, সে আমার কত আনন্দ!

[মহাদেবীর প্রবেশ]

মহাদেবী। একি ইন্দিরা! এখনও তুমি এখানে! জালন্ধরপতি যে এখনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে আসবেন! এসো এসো,—ভাল করে বেশ-ভূষা করে নাও। সম্রাট্-গৃহিতার উপযুক্ত বেশে তাঁর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করা উচিত।

ইন্দিরা। কেন মা?—এইতো আমার অঙ্গে উত্তম বেশই রয়েছে!

মহাদেবী। এই তোমার উত্তম! ইন্দিরা! সম্রাট্-নন্দিনী হ'য়েও তোমার আত্মমর্য্যাদার পরে যে রকম অন্ধদৃষ্টি, কেমন করে যে তুমি স্বামীগৃহে গিয়ে নিজের মান-মর্য্যাদা বজায় রাখবে,—আমার সেই ভাবনা। সুজাতা আমার অমন ছিল না। যা' হ'ক জালন্ধরপতি তোমার পাণি-প্রার্থনা কর্‌তে এসেছেন, আমরা তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করেছি, তুমি তাঁকে সেইমত সম্বর্দ্ধনা করবে।

ইন্দিরা। মা!

মহাদেবী। আবার কি?

ইন্দিরা। শুনেছি জালন্ধর-রাজ অত্যন্ত নিষ্ঠুরস্বভাব, ব্রাহ্মণাদরের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ অতিশয় প্রবল।

মহা। ওমা, তা হবেনা! তিনি সম্রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত গুণবান্ না হলে আমরা তাঁকে মেয়ে দেবো কেন? সে যেমন আমার সুজাতা চিরদিন জলে পুড়ে খুন হ'চ্ছে।

ইন্দিরা। মা, তবুও মহাপ্রভব! তাঁর মধ্যে কোনরূপ পক্ষপাতিতা নেই।

মহা। হবে বাছা, তা' বলেতো আর অন্যায়ের হাতে তোমাকেও দিতে পারিনে। রাজাধিরাজকে গিয়ে আমি বল্‌ছি, তিনি যা ভাল বোধ করেন তাই করুন।—ভাল মেয়ে হ'য়েছে!

(প্রস্থান)

ইন্দিরা। মা—মা, পিতাকে কিছু বল্‌বেন না।—চলে গালেন! পিসিমা! এই পরীক্ষা-ক্ষেত্রে আমার পাশে তুমি নেই, কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদ আমায় ঘিরে আছে,—আমি ভীত হবো না।

[মহারাজা, সুষমা ও রাণীর প্রবেশ]

সুষমা। ইন্দিরা! তুমি নাকি সবিতাদিত্যকে বিবাহ কর্‌তে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছ?

ইন্দিরা। (নীরব)।

সুষমা। কন্যা হ'য়ে তুমি আমার অবমাননা কর্‌তে চাও? এইজন্যই কি এতদিন তোমায় পালন ক'রে এসেছিলেম?

ইন্দিরা। পিতা! আমি আপনার চির আজ্ঞাবীনা।

সুষমা। এই তো মহাদেবি! কে তোমায় বলে যে ইন্দিরা আমার আদেশ পালন কর্ব্বে না? ওর কয়েকটা অন্যায় জেদ আছে বটে, কিন্তু আমাদের তো ও কখনই লঙ্ঘন করেনি। বড় খুসী হ'লেম মা, আমি রাজাকে এখানে পাঠিয়ে দিইগে।—

(প্রস্থান ও সবিতাদিত্যের প্রবেশ)

সবিতা। (প্রথমে মহাদেবীকে ও পরে ইন্দিরাকে অভিবাদন) আপনারা আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন।

মহাদেবী। এসো বৎস! দীর্ঘজীবি হও। ইন্দিরা! তুমি তোমার বাগ্‌দত্ত পতি মহারাজকে সমুচিত অভ্যর্থনায় অভ্যর্থিত কর্‌বে, আমি এখনি সখীদের এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

সবিতা। ইন্দিরা! সম্রাট্ ও মহাদেবীর অনুকম্পায় আজ তোমায় এমন আত্মীয়বৎ নামে অভিহিত কর্‌তে সাহসী হ'চ্ছি।—

ইন্দিরা। রাজন্! জনক-জননীকর্ত্তৃক আমি যখন আপনাতে সমর্পিতা হ'য়েছি, তখন আপনারই আশ্রিতা আমি। (লজ্জাবনতমুখী)

সবিতা। (ইন্দিরার হস্তধারণপূর্ব্বক) ইন্দিরা! এতদিনে আমার আশা-স্বপ্ন সফল হ'লো। যেদিন তোমায় আমার পট্টমহিষীরূপে ভারতের সিংহাসনে স্থাপিত কর্ব্বো—সেদিন আমার জীবন সার্থক হবে।

ইন্দিরা। না রাজেন্দ্র! আমি আপনার পট্ট-মহিষী হ'তে পারবো না, সামান্যা রাণীরূপেই থাকবো।

সবিতা। সেকি? কেন? কেন? একথা কেন?

ইন্দিরা। সহধর্ম্মিণীই প্রধানা মহিষীর উপযুক্তা, কিন্তু আমি আপনার সহধর্ম্মিণী ব'লে নিজেকে মনে কর্‌তে অসমর্থা।

সবিতা। (হস্ত ত্যাগ করিয়া) আমি কিছু বুঝতে পারছিনে!

ইন্দিরা। মহারাজ! আমি সনাতন-ধর্ম্মের উপাসিকা, যে বিবাহ বেদমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত হবে না, আমার মতে সে বিবাহ অপবিত্র!

সবিতা। তবে কি বৌদ্ধ জগতের সকল উদ্বাহবন্ধনই তোমার মতে অশুচি?

ইন্দিরা। তা নয়। আমি ধর্ম্মতঃ বৌদ্ধ নই।—

সবিতা। তুমি আমায় অপমানিত কর্‌তে চাও! এরূপ-ভাবে আমি তোমায় বিবাহ কর্‌তে পারিনে। (গমনোদ্যত)

ইন্দিরা। রাজেন্দ্র! পিতাকর্ত্তৃক আমি আপনাতে উৎসর্গিতা, তখন আপনি আমায় গ্রহণ করুন আর নাই করুন,—আপনি ব্যতীত আমি অপর কোথাও হ'তে পার্ব্বো না,—একথা স্মরণ রাখবেন।

সবিতা। (স্বগতঃ) একি বিস্ময়কর চরিত্র! আমার প্রত্যাখ্যানও কর্‌তে চায় না, অথচ নিজের বিশ্বাসের দৃঢ়তাও ত্যাগ কর্‌তে অনিচ্ছুক! অপূর্ব্ব! সুন্দর এ নারীহৃদয়! এর অমর্য্যাদা করলে নিতান্তই তা বর্ব্বরতা হবে। বিশেষ যখন আমাতেই আত্মসমর্পণ কর্‌ছে। (প্রকাশ্যে) রাজনন্দিনী!—ইন্দিরা! তুমি আজ সবিতাদিত্যকে পরাভব করেছ! তোমার জন্য সকল অভিমান আমি ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত! তোমার ইচ্ছিত বৈদিক মতেই আমার ধর্ম্মপত্নীরূপে আমি তোমায় গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য বোধ কর্ব্বো!

ইন্দিরা। আমিও চরিতার্থ হ'লেম।

[সখীগণের প্রবেশ ও গীত]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অবন্তী, রাজপুরীর বহির্ভাগ

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

প্র-না। বলি এত ছুটোছুটি চলেছ কোথায়? দাঁড়িয়ে না হয় দুটো কথাই কয়ে গেলে,—কোথাও যুদ্ধ উপস্থিত নাকি?

দ্বি-না। আরে ভাই, যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে আর এদিকে ছুটি! তাহলে যে ঠিক এর উল্টো দিক পানেই ছুটতাম! কেন, তুমি কি কিছুই শোননি? কচ্ছিলে কি?—ছিলে কোথা?

প্র-না। কই না, কি হয়েছে? ব্যাপারখানা কি বলো দেখি?

দ্বি-না। ওরে বাস্‌রে! ব্যাপার কি সোজা যে এক কথায় অম্‌নি বলে দোব? তুমি এক কুনো মানুষ। রাজা শুদ্ধ যা নিয়ে হুলুস্থুল পড়ে গ্যাছে তার খবরই রাখো না! বলো কি—অ্যাঁ!

প্র-না। কি, কি,—কি হয়েছে বল্‌না ভাই? মাথা খাস্, বলে যা।

দ্বি-না। রাজসভায় কুমারিল না কুমারলিল্ বলে কে এক মস্ত বড় পণ্ডিত এসেছিল, বিচারে তার কাছে এরাজ্যের সমস্ত বৌদ্ধাচার্য্য, মহাস্থবির, মহাশ্রমণ একে একে সব্বাই হার মেনে মাথা হেঁট করেছে। এখন পণ-রক্ষা হিসাবে তাঁদের সকলকেই ঐ কুমারিল না কুমারলিলের শিষ্য হ'তে হয়। তাই আমাদের মহারাজ তাদের রক্ষা করার জন্য এক কন্সী করেছেন। তিনি ব'লেছেন যে,—তর্কে যারজিৎও ঠিক বোঝা যায় না, ওতে হবে না, তিনি যদি বেদমন্ত্রের অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ দেখাতে পারেন তবেই তাঁর জয় স্বীকৃত হবে। আজ তাঁর মন্ত্র-শক্তির পরীক্ষা হ'চ্ছে তাই রাজ্যশুদ্ধ লোক দেখতে ছুটেছে। ও ভাই, আর না—অনেক দেরি হ'য়ে গ্যালো,—এতক্ষণ হয়ত সেখানে আরম্ভ হ'য়ে গ্যাছে।

(প্রস্থান)

প্র-না। বাঃ বাঃ, একটা বেশ মজা! তবে আমিই বা পড়ে থাকি কেন?

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর

(রাজা সুবন্ধা, মন্ত্রিভাদিত্য, কুমারিল, মণ্ডন, কুমারিলের শিষ্যবর্গ, বৌদ্ধগণ, রাজপারিষদবৃন্দ, দর্শকগণ ইত্যাদি।)

সুবন্ধা। এই নির্ম্মেঘ আকাশ হ'তে আপনার কোনরূপ এই মুহূর্ত্তে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হ'তে পারে?

কুমারিল। অতি সামান্য আয়াসে (সম্মুখস্থ অগ্নিকুণ্ডে হবির্নিক্ষেপ ও সহসা ঘন মেঘান্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত হওন এবং মুহুর্মুহুঃ বজ্রনাদসহকারে বারিপাত)

সুবন্ধা। বিস্ময়কর বটে! মহাস্থবির কাশ্যপিক! আপনারা এরূপ কার্য্যে সক্ষম হ'ন?

মহাস্থবির। না মহারাজ! ইন্দ্রজালবিদ্যা আমাদের শিক্ষা করা হয় না।

সুবন্ধা। ওহো! এটা তা'হলে ইন্দ্রজাল, বটে! শুনুন মীমাংসক! আপনার এ মন্ত্র-পরীক্ষা সর্ব্বজনস্বীকৃত নয়—অপর পরীক্ষা প্রয়োজন।

কুমারিল। কি দেখতে চান জ্ঞাপন কর্ব্বেন।—

সুবন্ধা। মহাস্থবির! আপনিই ইহা নির্দ্দেশ করুন।

মহা। (স্বগতঃ) এই বৌদ্ধ শত্রু বৈদিকটার যাতে নাশ হয় তাহাই আমার একমাত্র প্রার্থিত। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ও বৃষ্টি-টিষ্টির কর্ম্ম নয়, উনি যদি ঐ অগ্নি-উপরে অদ্যাবাধারায় বিচরণ করতে সক্ষম হন, তবেই ওঁর বেদমন্ত্রকে সম্মান করতে পারি।

কুমা। তথাস্তু। (প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে হবির্নিক্ষেপ ও কুণ্ড মধ্যে কুমারিল ভট্টের অবতরণপূর্ব্বক বিচরণ)

দর্শকগণ। জয় কুমারিল ভট্টের জয়!

সুবন্ধা। ধন্য, ধন্য!

মহা। মহারাজাধিরাজ! এই ধূর্ত্ত বৈদিকগণ স্বীয় শরীরে কোন প্রকার আঘাত্য পদার্থ লেপন করে রেখে এইরূপ প্রচারিত করে থাকে। এ হতেও আর এক উত্তম পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হতে পারেন, তা'হলে আর কা'রও কোন সন্দেহই থাকে না।

সুধন্বা। বৈদিকরাজ! আপনার যেরূপ অভিরুচি!

কুমারিল। সঙ্কীর্ণচিত্ত মহাত্মবির! গৃহমধ্যকূপাপেক্ষা কূপমধ্যুকের জগৎ-পরিচয়ে সঙ্কীর্ণাধিকা হ'য়েই থাকে। তোমার ইচ্ছা জ্ঞাপন কর।—

মহা। শুনেছি বেদমন্ত্রে তোমরা দেবতাগণকেও আকর্ষণ ক'রে আন্‌তে পারো—তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দেখ্‌তে চাই।—

কুমারিল। সম্রাট্! আপনারও কি এইরূপ অভিপ্রায়?

সুধন্বা। আমারও এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ জান্‌বেন।

কুমারিল। তথাস্তু! (অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান ও কুণ্ড মধ্য হইতে একে একে ইন্দ্র, বিত্তাবরুণ, রুদ্রাদিত্যাদি দেবগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব। পরিশেষে হুতাশনের কুণ্ড হইতে উত্থানপূর্ব্বক মহাত্মবিরের বক্ষ বিদীরণ ও কুমারিলের শরীর মধ্যে অন্তর্দ্ধান। অগ্নিকুণ্ডের সহসা নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি)

দর্শকগণ। জয় কুমারাবতার কুমারিল ভট্টের জয়! জয় সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয়!

সুধন্বা। দেব! অদ্যাবধি আমিও আপনার শরণাগত হ'লেম।

চতুর্থ দৃশ্য

মাধবিগতী

[বালকগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।]

গীত

গাহ বেদগান, যাহে মহাপাপী পায় ত্রাণ,
গাহ সে বেদগান!
যাহে, অন্ধ আঁখি পায়, বেদ মন্ত্রে নবীন সৃষ্টি
দেবতা আসে ধরায়।
যাহে, মৃত জনা পায় প্রাণ,—গাহ সে বেদগান।
গাহ সে বেদের জয়,—বেদ কর্ম্মময়।
এই কর্ম্মের বলে, এ মর ভূতলে অমর এ নর হয়,
বেদ মঙ্গলময়, গাহ সে বেদের জয়।
বেদমন্ত্রে দেবতার বাস, দেবতা বেদমন্ত্রের দাস,
বেদমন্ত্রে সৃষ্টি স্থিতি, বেদমন্ত্রে লয়।
বেদ পুণ্য, বেদ পুণ্য, বিশ্ব কোলয়, গাহ বেদ জয়।
জয় বেদ জয়।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

মাধবিগতী

কুমারিল ভট্টের গৃহ

কুমারিল ও বিশ্ববারা

কুমা। আমার কার্য্য সমাপ্ত হ'য়েছে। আসমুদ্র হিমাচলে আজ বৌদ্ধাচারের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ্যাচার প্রবর্ত্তিত হয়েছে। দেশ হ'তে অনাচার দূরীভূত। যাগ-যজ্ঞাদি পুনরপি সুপ্রচারিত হ'য়ে দেশের অশেষবিধ উপকারসাধন করছে,—এইবার আমার বিশ্রামের পালা।

বিশ্ব। প্রভো! অধিনীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন, বেদমার্গ—বিশেষ কর্ম্মকাণ্ড অনুবর্ত্তন-সাপেক্ষ ক্লেশসাধ্য, এই সবেমাত্র এর প্রচার হ'চ্ছে, আপনি যদি এত শীঘ্র অপসৃত হন তা হ'লে কি এই অনুষ্ঠানবহুল যজ্ঞাদি আর কেউ তেমন করে সুসম্পন্ন কর্ব্বে? অথচ সম্যসিদ্ধি না হ'লে কর্ম্মেরও অপফল ঘোষণা হ'তে বিলম্ব হবে না। হয় ত এইরূপে আপনার এতদিনকার সকল শ্রমই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'য়ে যেতে পারে।

কুমা। তোমার এ উচিত সংশয় বিশ্ববারা। আমিও ইতঃপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে মনে মনে বিচার করে দেখেছি। এখনকার মানবের আয়ুষ্কাল অল্প, শক্তি উত্তরোত্তরই ক্ষীণ হ'য়ে আসছে, এই যাগাদিবহুল বৈদিক ধর্ম্ম ঠিক এ যুগের

সকলকার উপযোগী নয়। যাই হোক এখনে সে সম্বন্ধে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি। সম্প্রতি……হ'তে শঙ্করাবতার শঙ্করের আবির্ভাব হ'য়েছে। সেই সুকুমার মূর্ত্তি বালযোগী ইতঃমধ্যেই অতি কঠিন কঠিন শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করে 'ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যাদি' রচনা করেছেন। তিনিই আমার অবশিষ্ট কার্য্য—জ্ঞানকাণ্ডের প্রচারাদি সম্পন্ন করবেন। আমাকে আর এখানে এক্ষণে প্রয়োজন হবে না। সেই হেতু ইত্যবসরে প্রয়াগধামের নিকটস্থ হ'য়ে, সন্ন্যাচার্য্যের নিধনহেতু স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ এক্ষণে আমার অভিপ্রায়।

বিশ্ববারা। এ দাসী জন্ম-জন্মান্তরে আপনারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। যদি যথার্থই এখানের কার্য্য হ'তে অবসর-গ্রহণ অভিপ্রেত হ'য়ে থাকে, তবে আমাকেও এই মরদেহ ত্যাগ করে আপনার পূর্ব্বেই গমন কর্ব্বার অনুমতি দান করুন। আর সেই সময়াবধি আপনি এ স্থান পরিত্যাগ কর্ব্বেন না,—এই অভয়দান করুন।

কুমারিল। দেবি! তাই হ'ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—প্রয়াগোপকণ্ঠস্থিত রুদ্রপুর

হুতাশন মধ্যে কুমারিল ভট্ট ও চতুর্দ্দিকে স্মিতমুখ শিষ্যবর্গ।

কুমারিল। কই, শঙ্কর এখনও এলেন না কেন?

(নেপথ্যে) দিনমপি রজনী সায়ংপ্রাতঃ,
শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-বায়ুঃ॥

[শঙ্করাচার্য্য ও পদ্মপাদ প্রভৃতি শঙ্কর-শিষ্যগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও গীত]

ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ গোবিন্দম্ ভজ মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে।
অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চিবুকসমর্পিতজানুঃ।
করতলভিক্ষা তরুতলবাসস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-পাশঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে।
যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনসক্তস্তাবন্নিজ পরিবারো রক্তঃ।
পশ্চাদ্ ধাবতি জর্জ্জর দেহে বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে,
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে।

শঙ্কর। আর্য্য! শঙ্করের প্রণাম গ্রহণ করুন।

কুমা। শঙ্করাবতার গোবিন্দ-শিষ্য শঙ্কর সবাকারই প্রণম্য!

শঙ্কর। ভট্টপাদ! আপনার দর্শনার্থ আমি যত শীঘ্র সম্ভব এই স্থানাভিমুখে যাত্রা করেছিলেম, তথাপি সময়ে উপস্থিত হ'তে পারলেম না, এই নিমিত্তের দুঃখ রইলো।

কুমা। সময়েই তো তোমার আগমন হ'য়েছে শঙ্কর! আমি তোমার সহিত সাক্ষাতাভিলাষী হ'য়ে মাত্র অদ্য তৃতীয় দিবসাবধি এই হুতাশনমধ্যে অবস্থিতি করছি।

শঙ্কর। সেকি তাত! আপনি এ পাপীজনোচিত ব্যবস্থা ও পুণ্যদেহের জন্য কিহেতু করেছেন? এতে আমাদের ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত করেছে।

কুমা। শঙ্কর! ইহাই আমার যথার্থ উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত! কুশীনগরীর সন্ন্যারামে আমি প্রথম জীবনে ছদ্মবেশে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করি, সে সময় সন্ন্যাচার্য্যকে প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যে আমার গুরু অস্বীকার কর্তে হ'য়েছিল। পরে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে সেই সঙ্ঘ-গুরুকে বিচারে পরাভব এবং পূর্ব্বরক্ষিত পণানুসারে তাঁর উত্তপ্ত তৈল-নিমজ্জনে দেহত্যাগ আমার অনুমোদন কর্তে হয়। ইহাতে গুরুঘাত-পাপ আমায় স্পর্শ করেছে, সেইজন্য এই হুতাশনে প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করতে সঙ্কল্প করেছি, জানবে।

শঙ্কর। আপনার ন্যায় কর্ম্মীতে পাপ স্পর্শিত হয় না, বিশেষ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা আপনার পুণ্য-পাপাদি সর্ব্বকর্ম্মই ভস্মীভূত হ'য়েছে। আমি এই শারীরিক-ভাষ্য রচনা

করে আপনাকে দেখাতে এসেছি, আপনি এর একটি 'বার্ত্তিক' রচনা করুন।

কুমা। শঙ্কর! এই দেখ আমার অর্দ্ধাঙ্গ ইতোমধ্যেই দগ্ধ হ'য়ে গ্যাছে, কেবল তোমার সহিত আলাপ-মানস থাকায় অগ্নিদেব আমার উত্তমাঙ্গ এখনও স্পর্শ করতে পারেন নি।

শঙ্কর। এজন্য চিন্তা কি? (কমণ্ডলু জল লইয়া মন্ত্র অন্তে প্রদান) ঐ দেখুন, দগ্ধচিহ্ন অপগত হইয়া পূর্ব্ব বদনের প্রকাশিত হ'চ্ছে! আর্য্যা! আর বিলম্ব কর্ব্বেন না, অগ্নিকুণ্ড হতে উত্থিত হোন।

কুমা। শঙ্কর! তোমার তপঃশক্তি দর্শন ক'রে আমার সঙ্কল্প বরং সর্ব্বথা দৃঢ়তরই হ'লো। আমার আরব্ধ কর্ম্ম আমি বহু পূর্ব্বেই তোমাকে উৎসর্গিত ক'রে নৈষ্কর্ম্মাবলম্বন করেছি। তোমা হ'তেই আসমুদ্র হিমাচলে এক অপূর্ব্ব জ্ঞানরাজ্য সংস্থাপিত হবে। মাহিষ্মতী নগরে আমার প্রধানতম ছাত্র ও শিষ্য পণ্ডিতপ্রবর মণ্ডন-মিশ্র বাস করেন, তাঁকে তর্কে পরাজিত ও তোমার অদ্বৈতমতাবলম্বী ক'রে, তাঁরই দ্বারা তোমার ভাষ্যের 'বার্ত্তিক' রচনা করতে পারিবে, তাহা আমারই রচিত মনে করিবে। মণ্ডনমিশ্রের পাণ্ডিত্যের তুলনা নাই, তিনি সুরেশ্বর নামেও খ্যাত। এক্ষণে সময়াগত হ'য়ে এসেছে, এইবার তোমার···আমার ভ্রমণ করাও, আমিও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হই।

শঙ্কর। (সাশ্রুনেত্রে) তাত! হবে আর কি বলিব

[শঙ্করাচার্য্য ও উভয় পক্ষীয় শিষ্যগণের গীত]

দিনমপি রাত্রিনী সায়ং প্রাতঃ, শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ,
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-বায়ুঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে।
অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু, রাত্রৌ চিবুকসমর্পিতজানুঃ
করতলভিক্ষা তরুতল বাসস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-পাশঃ।
ভজ গোবিন্দং·····
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে·····

শ্রীমতি অনুরূপা দেবী।

"উৎসব শেষে"

কোথায় আলো কোথায় মালা
কোথায় বাঁশীর তান
কোন্ বাতাসে মিলিয়ে গেল
এখন হাসির গান

মিলন-বাসর শূন্য পড়ে
ঝরা ফুলের রাশি
শয্যা যেন এলোমেলো
গায়ের মালা বাসি

সন্ধ-দীপের ম্লান-দশায়
ঠেক্‌ছে যত ঝাঁকা
তোরণ-দ্বারের ধূলায় ছাড়ায়
চরণ-চিহ্ন আঁকা

মিলন-রাতে সবার সাথে
সেই যে কানাকানি
কথার ছাঁদে মনকে বেঁধে
সেই যে জানাজানি

কোথায় গেল সব সাজ-সজ্জা
কোথায় হাসির রোল
আজকে এমন নীরব নিথর
এমন গণ্ডগোল ?

দেবদারু আর বেতের গাছের
পাতার বাহার কত
ঘুমুকো লতার মোহন ঘোর।
পলাশলাশ শত

সিংদরজার বিজয়-নিশান
কোথায় গেল নেমে
নহবতের মঞ্চ খালি
সানাই গেছে থেমে

ঘরের মাঝে বাহির নিয়ে
সেই যে মাতামাতি
পরকে নিয়ে আপন করার
চেষ্টা সকল রাতি

কেবল হাসি কেবল কথা
প্রেমের আলাপন
কেবল বুকে জড়িয়ে ধরা
সবাই প্রিয় জন !

শুধুই কেবল মিষ্টি কথা
যাওয়ার পথে বাধা
দু'হাত দিয়ে আগ্‌লে ধরে
শুধুই কেবল সাধা

'অনাহুত' সেও ত সেদিন
ঘরের প্রিয়জন
সবার অধিক তারই তরে
সেদিন আয়োজন

মনের সাথে 'অনাগত'
খেল্‌লে লুকোচুরি
শক্ত তারে সরিয়ে দেয়া
যতই কাছে ঘুরি,

বিরাম বিহীন সেই যে চলা
সেই যে ছুটোছুটি
রাত্রি শেষেই সকল কাজের
আজ কি হ'ল ছুটি ?—

ইন্দ্রধনুর রাঙাসড়া
হরীর ছোটাখেলা
পরীর পাখার স্বপ্ন-পথে
উধাও হওয়ার-মেলা

স্বর্গটারে মর্ত্তে এনে
চিত্র করে রাখা
স্বর্গ-কমল ফুটিয়ে তুলে
মধুর গন্ধ মাখা

হ'জার রঙে জীবনটারে
রঙিয়ে নেবার বেলা
দু'হাত দিয়ে বিলিয়ে দেওা
বিলিয়ে নিয়ে খেলা

মনের ভুলায় চোখের ভুলায়
পাগল হয়ে নাচা
সে-দিন রাতের সবাই আমার
এই ভাবনায় বাঁচা

একটি ছোট্ট মিষ্টি কথা
একটুখানি হাসি
মনের ভুলেই বল না গো
একটু ভালবাসি

অবাক হয়ে সেই যে চাওয়া
বকুল-মালা গলে
শুধুই নৃত্য জীবন মৃত্যু
কৃত্য চরণ-তলে !—

—এ সব আজি স্বপ্নসম
পড়্‌ছে যেন মনে
ঘুমের ঘোরেই দেখেছি কি
আমার প্রিয়জনে ?

চোখে আমার লেগে আছে
আলোর আলো খানি
সত্য এখন নাইত আলো
তাও ত মনে জানি

বাঁশীর সাথা সুরটুকু সব
লেগেই আছে কানে
সত্যকারের বাঁশী যে নাই
তাও ত ছলে মানে

সব কলরোল সকল কথা
সকল মধুর হাসি
জাগ্‌ছে মনে খনে খনে
'সবার' ভালবাসি !—

সব আয়োজন ফুরিয়ে গেছে
বিসর্জ্জনের সাথে
তবু—বন্ধু আমার এসেছিল
আকিঞ্চনের রাতে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

পল্লীশিল্প অভাব

কার্পাস-চাষ

(১)

পল্লীগ্রামের বহু লোকে আজকাল তুলার চাষের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু অনেকে ইহার চাষের প্রক্রিয়া অবগত নহেন। এই কারণে অদ্য আমরা এতৎসম্বন্ধীয় বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত করিলাম। প্রত্যেক গৃহস্থের এই চাষের প্রতি মনোযোগ করা আবশ্যক। যাঁহার যতটুকু জমি আবাদীনে আছে, তাঁহার তাহাতে তুলার চাষ করা উচিত। ইহাতে লাভও আছে, উপকারও আছে। সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে তুলার চাষ সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম।

(১) বারবার তুলা, ইহা মার্কিণ জাতীয় এক প্রকার তুলা, এদেশে উৎপন্ন হইতেছে।

(২) ব্রোচ তুলা; ভারতবর্ষজাত তুলার মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার উৎকৃষ্ট আঁশকে দশবারি বলে, ব্যবসায়িরা ইহাকে 'থুরাটি' নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

(৩) হিঙ্গলঘাটি; মধ্যপ্রদেশের কাড়ি ও বাণি নামক দুইপ্রকার কার্পাস ইহারই অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটীর ফলন অধিক হয় এবং সহজে মরে না; কিন্তু অপরটীর তুলাই উত্তম।

(৪) ধুড়ি কাপাস; ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় এই তুলা খুব বেশী জন্মায় এবং বারমাস থাকে। পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর তুলা হইতে এ তুলা স্বতন্ত্র নহে।

(৫) গাছ কার্পাস; ইহা ১০ হইতে ১৫ ফিট উচ্চ হয় এবং বার মাস জন্মায়। দেবকাপাস, রাজকাপাস, রাজকাপাস প্রভৃতি নামে ইহা বিখ্যাত। কোন কোন গাছ-কাপাসের বীজ বপন হয়। তাহা হইতে তুলা অতি সহজেই পৃথক্ করা যায়। আবার কোন কোনও গাছ-কাপাসের বীজ বপন নহে, কাজেই তুলা পৃথক করা কঠিন হইয়া থাকে। তৃতীয় এক প্রকার তুলা আছে, তাহাতে বীজগুলি একত্র জমিয়া থাকে। হিন্দু দেবালয় ও ব্রাহ্মণগণের গৃহের আশেপাশে কাপাসের গাছ জন্মাইতে দেখা যায়। হিন্দুগণ এই কাপাস ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের পবিত্র যজ্ঞোপবীত ইহার সূত্র হইতে প্রস্তুত হয়। সমলপুরে এক মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে এই তুলার একটী গাছ ছিল। এতৎজাতীয় তুলার মধ্যে তাহাই উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায়, তাহার বীজ বম্বেতে প্রেরিত হয়। সাধারণ জেলার এক সাধুর বাগানে আর একটী বৃক্ষ ছিল, তাহা হইতে লাবী ও উৎকৃষ্ট কাপাস উৎপন্ন হইত। ইহার বীজ সাধারণে বিতরিত হইয়াছে। এইরূপ কতিপয় গাছ কাপাস হইতে ওজন প্রাপ্তির আশা করা যাইতেছে—যাহা সর্ব্বপ্রথম ক্ষেত্র কাপাসরূপে উৎপন্ন হইতেছে। গাছ-কাপাসের ফলনসম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই।

(৬) বিশর-দেশীয় তুলা; এই তুলা অত্যুৎকৃষ্ট। নিম্নদেশে উহার আবাদ সফল হইয়াছে। শুষ্ক এবং বেলে-মাটীতেও ফলনেচ্ছা দ্বারা এই তুলা উৎপাদন করা যায়।

(৭) মার্কিণ তুলা; যথা—বহু জাতীয় অধিক ফলনের কাপাস। বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশে এই বিভিন্ন প্রকার কাপাস আবাদের অবস্থা কিরূপ, তাহা জানা যায় নাই। তেরেণ্ডা, অড়হর প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া আবাদ করিলে কাপাস চারাগুলি একটু ছায়া পায় এবং তাহাও দরকার। কিন্তু এরূপ বিভিন্নভাবে আবাদ ভাল হয়, কি খোলা ময়দানে পৃথকভাবে বপনেই ফলন ভাল হয়, তাহা এখনও পরীক্ষাধীন। মিশরীয় এবং আমেরিকার বিভিন্ন কার্পাস-বীজ ভারতীয় অধিকাংশ কাপাসের ন্যায় সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে বপন করা যাইবে কি যে বা জুন মাসে

বপন করা হইবে এ সম্বন্ধে আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষা প্রয়োজনীয়।

২। প্রথম কার্য্য। তুলার জমি অনেক দিন ধরিয়া তৈয়ার করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বপনের পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি জমি তৈয়ার করিলে গাছ ছোট হয় এবং ফসল কম হয়। ডিসেম্বর হইতে যে মাস পর্য্যন্ত বরাদির সময় যাবে তার বার করিয়া ক্ষেতের লম্বা ও প্রস্থ উভয় দিকেই লাঙ্গল ও পরে মই দিলে জমি এত উর্ব্বরা হয় যে, সার না দিলেও গাছগুলি সবল হইয়া থাকে। বৃদ্ধি কাপাস যেন উর্ব্বরা জমিতেই বোনা কর্ত্তব্য।

৩। সার দেওয়া। জমি অনুর্ব্বর হইলে প্রতি একরে ১৬০ মণ গোবর ফেলিয়া লাঙ্গল দেওয়া উচিত। যে প্রকার জমিই হউক বপনের পূর্ব্বে বীজগুলিকে গোবর ছাই এবং চুণ দিয়া মাখিয়া লওয়া উচিত। ইহাতে বীজগুলির উপর সারের একটী প্রলেপ পড়ে এবং বীজগুলি খুব তাজারূপ জন্মায়। বায়মেসে তুলার গাছ প্রতি বৎসর নিড়াইয়া দিয়া সার দেওয়া উচিত। নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে নিড়াইতে হয় এবং মার্চ্চ মাসে সার দিতে হয়। বায়সেরির শ্রীযুক্ত থাসের ডো জাবানা মহাশয় (ইনি সাময়িক বা বাৎসরিক তুলা অর্থাৎ বৎসরে যে তুলা একবার মাত্র হইয়া থাকে, তাহা বায়মেসে তুলার মত চাষ করিতেছেন), তুলায় সার দেওয়ার কোনও ফল হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তিনি দেখাইতেছেন যে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে ফসল প্রথম বৎসর অপেক্ষা অধিক সবল হয় এবং অধিক ফল ধরে। তাঁহার বিশ্বাস, যেসকল গাছ ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিস্তর হইতে রস গ্রহণ করে, তাহাদের সার দেওয়া অনাবশ্যক, কেবল প্রয়োজন মত নিড়াইয়া জল দিলেই চলে।

৪। জমি সংস্কার। এই ফসলের জন্য উচ্চ জমি ও জল-নিকাশের উত্তম ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কারণ ক্ষেতে জল জমিয়া থাকা বড়ই অপকারী। যে স্থানে জল-নিষ্কাশন সুবিধা নহে, সে স্থানে জমিতে আইল বাঁধিয়া দেওয়া উচিত এবং তুলার প্রকার ভেদে এক ফুট উচ্চ আইলে ২, ৩, ও বা ৮ ফুট দূরে দূরে বীজ বপন করিতে হয়। বাৎসরিক তুলা যাহা বৎসরে একবার জন্মিয়া হয়, তাহাদিগে ভাবে দুই ফুট হইতে তিন ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। আর গাছ ঝোপালো ৬ ফুট বা ৮ফুট অন্তর দাড়ি করিয়া লাগাইবে। সাধারণতঃ তুলা ৬ ইঞ্চি হইতে ৯ ইঞ্চি ব্যবধান লাগান হইয়া থাকে এবং একর প্রতি কুড়ি পাউণ্ড বীজ ছড়ান হয়। কিন্তু তাহা বড়ই ঘন হইয়া থাকে। যদি আইল করিতে হয় তবে পয়ঃপ্রণালীর অবস্থান অনুসারে সাধ্য হইলে আইলগুলি উত্তর দক্ষিণ লম্বা করা উচিত। মিশর ও ও মার্কিন তুলাই সাধারণতঃ জল সেচন আবশ্যক হয়, তাহাতে আইলগুলি জলাধার বা পয়ঃপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়।

৫। জল-সেচন। প্রায়ই তুলা পাটের মত লাভজনক ব্যবসায় নহে এবং যদি উহাতে জল-সেচন করিতে হয়, তবে জল-সেচনের বিশেষ সুবিধা না থাকিলে উহা অতি অল্প লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে। জল দিতেই হয়, তবে হয় বা নয় ফুট অন্তর নালা দিয়া জল আনিতে হয় এবং আবশ্যক জমিতে জল শুষিতে দিতে হয়। জল দিয়া জমি শুকাইয়া দিলে উপরের মাটী জমিয়া যায়, তাহাতে গাছ ভাল হয় না। অবশ্য প্রত্যেকবার জল-সেচনের পর জমি নিড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু যে ফসলে বিশেষ লাভের আশা থাকে না, তাহাতে প্রত্যেক অতিরিক্ত কাজ অতি সাবধানে করা উচিত। এ দেশে সাধারণতঃ বিনা জল-সেচনে পাথারে জমিতে রস কম—এইরূপ জমিতে তুলা বপন করা হয়; কিন্তু খারিফ (যাহার বর্ষার সময় যে শস্য হয়) মত চাষ করা হয় বলিয়া বৃষ্টির জলই বাৎসরিক তুলার পক্ষে যথেষ্ট হয়। বায়মেসে তুলার গাছ যে কয়মাস বৃষ্টি হয় না। সে কয়মাসও বাঁচিয়া থাকে বলিয়া জল দেওয়ার বিশেষ সুবিধা না থাকিলে খুব শুষ্ক জমিতে উহা বোনা উচিত নহে। এগুলি অপেক্ষাকৃত সরেস জমিতে কিন্তু উচ্চ এবং উত্তমরূপ জলনিকাশ হয় যে স্থানে, সেই স্থানেই ভাল হয়। বায়মেসে তুলা লাগাইয়া দুই বৎসর জমির বেশ সদ্ব্যবহার চলে। যে সকল জমি ধান বা পাটের পক্ষে অত্যন্ত উচ্চ সে সব জমিতে তুলা লাগান যাইতে পারে।

৬। বপন। পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে বীজগুলিতে সার মাখাইয়া নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে (অর্থাৎ সাধারণতঃ সরেস বাৎ-

সারিক তুলাই ২—২॥ ফুট অন্তরে) একসঙ্গে ২।৩টী করিয়া বীজ লাগাইলেই বপন-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। প্রতি একর জমিতে এই সকল তুলার বীজ পাঁচ হইতে দশ পাউণ্ড অর্থাৎ বাকী আড়াই হইতে পাঁচ সের লাগে। গাছতুলার বপন কাঠের বাক্স বা ঝুড়িতে করা হয়; তাহার পর চারাগুলি নয় ইঞ্চি হইতে এক ফুট লম্বা হইলে বাক্স বা ঝুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চারার মূলগুলি নষ্ট না হয় এমন ভাবে মাঠে আট ফুট পর পর সারি করিয়া রোপন করিতে হয়। এইরূপ প্রথমে চারা করিয়া তাহা পুনরায় রোপন করিলে প্রতি একরে দুই বা তিন পাউণ্ড বীজই যথেষ্ট। গাছতুলার ক্ষেতে ব্যবস্থিত স্থানে (অর্থাৎ দুই গাছের যথাস্থিত ভূভাগ) প্রথম এক বা দুই বৎসর চিনাবাদাম লাগান যায়। চিনাবাদাম লাভজনক এবং উহাতে জমির উর্ব্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। চিনাবাদামের খোসাগুলি ভাঙ্গিয়া উহার বীজগুলি ৯ ইঞ্চি ব্যবধানে বপন করিতে হয়। চারাগুলি এক ফুট উচ্চ হইলে সে গুলিকে আলু বা ভুট্টার মত মাটি চাপা দিতে হয়। যেখানে ২।৩টি বীজ বোনা হয়, সেখানে চারাগুলি হইতে ৯ ইঞ্চি লম্বা হইলে একটিমাত্র সবল চারা রাখিয়া অপরগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয় চাষের জমি খুব বড় হইলে বাক্সে বা ঝুড়িতে চারা দেওয়া চলে না। তখন ৬ ইঞ্চি উঁচু করিয়া মাটী তৈয়ারী করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হয়।

৭। পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য। সচরাচর, বর্ষাকালে একবার নিড়াইয়া দেওয়া এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আর একবার মিলেই চাষের কাজ শেষ হইল। বপনের সময় অনুসারে এবং তুলার প্রকারভেদে নভেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত যে কোন সময়েই কাপাস তোলা যাইতে পারে। যে সকল তুলা বিলম্বে হয়, সেগুলি বঙ্গদেশে আগাই (অগ্রে) বোনাই ভাল, অর্থাৎ এপ্রেল মাসে বুনিতে হয়। যে তুলা শীঘ্র হয়, সেগুলি আগে বুনিলে বর্ষার সময় ফল ধরিতে থাকে, কিন্তু পোকাতে যথেষ্ট অনিষ্ট করে। পোকা যাহা অপেক্ষা পোকা না হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। বহুদিন ধরিয়া জমি তৈয়ারী করিলে এবং যথাসময়ে বপন করিলে পোকার উপদ্রব যথাসম্ভব এড়ান যায়। যে সকল গাছতুলায়, বিদেশীয় বাৎসরিক তুলার মত পোকা হয় না। গাছতুলার চারা খুব বড় হইতে দিতে নাই। তুলা কাটার পর চারা ছাঁটিয়া দিলে গাছগুলি ৬ ফুট পরিমাণে উচ্চ রাখা যায় এবং দেখিতেও বাঁকড়া হয়। এইরূপ ছোট করিয়া রাখিলে গাছতুলারও ফল বেশী হইয়া থাকে। চারাগুলি যতদিন বাড়িতে থাকে, ততদিন সেগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রায়ই একটা না একটা গাছে পোকা লাগে। প্রথম অবস্থায় হাতে খুঁটিয়া তুলিয়া এই সব পোকা মারা যায়। অবহেলা করিলে এগুলি প্রজাপতি হইয়া যায় এবং নিকটস্থ গাছে ডিম পাড়ে ও এক প্রকারে বংশ বৃদ্ধি করে। প্রথম হইতে লক্ষ্য রাখিলে পরে সমূহ কষ্ট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

৮। তোলা। ফলগুলি ছিঁড়িয়া লওয়া উচিত নহে; ফল সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হইলে এবং ফাটিলে বীজের সহিত তুলাটুকু তুলিয়া লইতে হয়। প্রথমকার ফলগুলি ভাল করিয়া শুষ্ক করিয়া বীজের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। পরের তোলা তুলাগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া জমা করিবে। সব তোলা শেষ হইলে দেশী বীজ ছাড়ানর কল দিয়া বীজ ছাড়াইতে হয়। কাষ বেশী হইলে ম্যাকার্থির কল দিয়া বীজ ছাড়াইতে হয়। আবাদের সময় তুলার প্রকার বা জাত, বপনের সময়, তোলার সময় জমির আয়তন, চারার সংখ্যা, কিম্বা কত দূরে দূরে চারা রোপন করা হইয়াছিল এবং বীজ ও তুলার ওজন এই সকল বিষয়ের একটী বিবরণ লিখিয়া কৃষি-বিভাগে জানান উচিত ইহাতে কোন্ প্রদেশে কোন্ জাতীয় তুলার চাষ ভাল হয় তাহা ঠিক করা যায়। বাঙ্গালা দেশে নূতন রকম তুলার চাষ পরীক্ষাধীন বা পরীক্ষা-সাপেক্ষ মনে করিতে হইবে এবং যত্নপূর্ব্বক এই পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া তাহার ফলাফল প্রকাশিত হইলে তদ্দ্বারা প্রকৃত উপকারের আশা করা যায়।

৯। বুড়ি-কাপাসের বীজ বঙ্গদেশের কৃষিবিভাগে পাওয়া যায়। মিশর দেশীয় তুলার বীজ বোম্বায়ের কৃষি-বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টারের নিকট পাওয়া যায়: তুলা হইতে বীজ ছাড়ানের কল বোম্বায়ের—বেসার্ল স্পেয়ার এণ্ড সন্সের দোকানে পাওয়া যায়। (মেদিনীপুর হিতৈষী)

(২)

১। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কার্পাস আবাদ হয়। আমেরিকা, মিশর ও ভারতবর্ষ এই তিন দেশে অধিক কার্পাস জন্মে। কার্পাসের পক্ষে মধ্যে মধ্যে রৌদ্র ও মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি ভাল। বৃষ্টি না হইলে ক্ষেতে জল দিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রচুর কার্পাস জন্মিত। বিলাতী কলের কাপড় ও সুতা আমদানী হওয়ায় বঙ্গদেশ হইতে কার্পাস আবাদ উঠিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক স্থানে এখনও কার্পাস আবাদ হয়। পৃথিবীর মধ্যে কেবল বঙ্গদেশেই পাট জন্মে। পাটের আবাদ সর্ব্বাধিক লাভজনক বিধায় কৃষকেরা কার্পাস আবাদ করে না। যাহা হউক, বঙ্গদেশে কার্পাস আবাদ না থাকায় চরকাও ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়াছে। চরকায় সুতা কাটিয়া অনেক লোক বস্ত্রের সংস্থান করিত, কিন্তু এক্ষণে কার্পাস আবাদ ও চরকার প্রচলন না থাকায় কুটীর শিল্পের অবনতিহেতু অনেক স্ত্রীলোক নিষ্কর্ম্মা হইয়া আলস্যে ও দুঃখ-কষ্টে জীবনভার বহন করিতেছে। বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা ৪ কোটী ধরিলে তাহার মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধ কোটী স্ত্রীলোক চরকায় সুতা কাটিয়া ন্যূনকল্পে বার্ষিক ৩ কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। এককালীন ৪।৫টী সুতা হয় এরূপ উন্নত প্রণালীর চরকা উদ্ভাবিত হইলে পুরুষেরাও অনেকে তাহা ব্যবহার করিবে; তাহা হইলে কেবল এক বঙ্গদেশেই চরকায় সুতা কাটায় বার্ষিক ১৫।১৬ কোটী টাকা আয় হইতে পারে এবং ঐ আয় কেবল কার্পাস আবাদের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক কৃষক গড়ে দুই কাঠা জমিতে কার্পাস আবাদ করিলেও ঐ উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সাধিত হইতে পারে।

২। পাট ও ধান ভাল জন্মে না এরূপ উচ্চ ভূমিতে কার্পাস আবাদ করিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যে জমিতে বর্ষাকালে জল জমে না কি বন্যার জল উঠে না, এইরূপ পলি মাটী কি দোআঁশ মাটীই কার্পাসের পক্ষে ভাল। মিশর দেশীয় কার্পাস শুষ্ক ও বালুকা প্রদেশে জন্মে এবং তাহাতে জল দিতে হয়।

৩। যে জমিতে সার দিলে ফসল ৩।৪ গুণেরও অধিক হয় সে জমিতে সার দেওয়াই কর্ত্তব্য। কার্পাসের ক্ষেতেও যত সার দেওয়া যায় ততই ভাল। পুরাতন গোবর সার ও সুপার ফস্ফেট সার কার্পাসের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক বিঘায় ২ গাড়ী গোবর সার ও ১॥ সের হিসাবে "সুপার ফস্ফেট" সার দিতে হয়। যে যে লাইনে গাছ লাগান হইবে সেই সেই লাইনে সুপার ফস্ফেট ছড়াইয়া কোদালী দিয়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হইবে। যে জমিতে কার্পাস বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, সেই জমিতে সুপার ফস্ফেট সার ছিটাইয়া দিতে হয়। বুনিবার পূর্ব্বে বীজগুলিতে এরূপভাবে গোবর, ছাই ও চূণ মিশাইতে হইবে যেন সকলগুলি বীজের গায়েই তাহা লাগে। কার্পাস বীজের খইলও কার্পাসের পক্ষে ভাল সার; কিন্তু ঐ বীজ গো-মহিষকে খাইতে দিয়া তাহাদের গোবর সার করিয়া ক্ষেতে দিলে, পশুখাদ্য ও ক্ষেতের সার এই দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। কার্পাস আবাদে ফস্ফরিক্ এ্যাসিডের সার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে, নাইট্রজেন্ তদপেক্ষা কম পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। নাইট্রজেনে পাতা, ও ফস্ফরিক্ এ্যাসিডে গুটী বৃদ্ধি করে। কার্পাসের পক্ষে গোবর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। গোবর সারের সঙ্গে নাইট্রেট অব সোডা ব্যবহার করিলে ফসল বৃদ্ধি হয়, অথচ জমি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না। গাছ উপড়াইয়া পাতলা করিয়া দিবার সময় প্রথমে গোবরের সার দিয়া পরে তাহার উপর, গাছের গোড়ার চারি পাশে নাইট্রেট অব সোডা ছড়াইয়া দিতে হয়। প্রতি বিঘায় ১০ মণ গোবর সার এবং ১৫ সের নাইট্রেট অব সোডা ব্যবহার করিতে হয়। সার সাল্‌ফেট অব এ্যামোনিয়া ও সল্টপিটারও উত্তম সার। সাল্‌ফেট অব এ্যামোনিয়া বীজের সঙ্গে মিশাইয়া বুনিতে হয়; ইহা সোডিয়াম্ নাইট্রেট অপেক্ষা অধিক সবরে গলে। নাইট্রেট অব সোডিয়াম্ সুলভ ও তাহাতে অধিক নাইট্রজেন আছে। রিফাইন্ করা সল্টপিটারই (সোরা) ভাল। হাড়চূর্ণে ফস্ফরিক এ্যাসিড, ছাইয়ে পোটাশ, পুকুরিণীর তলার পাঁক মাটীতে নাইট্রজেন এবং গোবর সারে ঐ সমস্তই কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে।

৪। অঙ্কুরিত ৩।৪ বার ছাই ও ২।৩ বার এই দিয়া রাখিতে হয়; তাহা হইলে, রৌদ্র, বাতাস ও হিমে তারা ভাল হয় এবং ঘাস মরিয়া যায়।

৫। বঙ্গদেশে, যে সময়ে পাটের বীজ বোনে অর্থাৎ চৈত্র কি বৈশাখ মাসে যখন প্রথম বৃষ্টি হয় সেই সময়ে কার্পাস বীজ লাগান ভাল। বেহার ও ছোটনাগপুরে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে কার্পাস বীজ লাগায়। কার্পাস গুঁটী ফুটিবার সময়, বৃষ্টি পাইলে দাগ ধরে ও অনেক নষ্ট হয়।

৬। কার্পাস দুই প্রকার, (১) গাছ কার্পাস ও (২) বাৎসরিক কার্পাস। গাছ কার্পাস একবার লাগাইলে অনেক দিন তাহার গাছ থাকে এবং তাহার বীজ পুঁতিতে হয়, কিন্তু বার্ষিক কার্পাসের বীজ ছিটাইয়াও বুনিতে পারা যায় এবং তাহা একবার মাত্র ফসল দিয়া এক বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায় আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের সী-আইলাণ্ড (Sea-Island) 'মার্কিণ' কার্পাস ও আমাদের দেশী কার্পাস এই জাতীয়। সী-আইলাণ্ড কার্পাস পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহার ফসল কম। 'মার্কিণ' ও "দেশী কার্পাস" গুণে নিকৃষ্ট কিন্তু তাহাদের ফসল অধিক। ভারতবর্ষে সকল জাতীয় কার্পাস হইতে পারে এবং অনেক জাতীয় কার্পাস জন্মে। "দেশী কার্পাস" বলিলে, ভারতবর্ষজাত কোনও এক বিশেষ জাতীয় কার্পাস বুঝায়। ভারতবর্ষে অনেক প্রকার গাছ কার্পাস জন্মে; তাহার কতকগুলি ফুল লাল। 'ব্রাজিল' ও 'পেরু' গাছ কার্পাস। সী-আইলাণ্ড ও ব্রাজিল কার্পাসের বীজের গায় কোনও আঁশ নাই; ব্রাজিল কার্পাসের বীজগুলি একসঙ্গে গায় গায় লাগিয়া থোবা ধরিয়া থাকে। স্পেন সাহেব বোম্বাই অঞ্চলের এক প্রকার গাছ কার্পাস আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা গুণে মধ্যম শ্রেণীর। এই গাছ রৌদ্র ও বৃষ্টি দুইটাই সহ্য করিতে পারে। ইহার ডাল কাটিয়াও অন্যত্র লাগান যায় এবং চারা স্থানান্তর করিয়া লাগান যায়। স্পেন সাহেব বলেন, তিনি ৩/ বিঘা জমিতে ৫ হাজার গাছ লাইনবন্দী করিয়া লাগান এবং প্রথম ফসলের পর সকলগুলি গাছের আগা ছাঁটিয়া ও হাত পরিমাণ কাট করেন, তৎপর বর্ষাকালে এক লাইন রাখিয়া তাহার পরের লাইন এবং প্রত্যেক লাইনে এক গাছের পর এক গাছ উঠাইয়া অন্য স্থানে রোপণ করেন এবং এইরূপে ক্ষেত পাতলা করেন ও দ্বিতীয় বৎসরেই ক্ষেত দ্বিগুণ হয় এবং ফসলও চারিগুণ বৃদ্ধি পায়। আমেরিকা ও মিশর দেশীয় কার্পাসে জল দেওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশে এরূপ কয়েক জাতীয় গাছ কার্পাস আছে তাহা বন্যার জলে নষ্ট হয় না।

৭। ভাল কার্পাসের আঁশ লম্বা, (১॥ ইঞ্চি হইতে ২ ইঞ্চি) নরম, কোমল, শক্ত, ও বর্ণ শুভ্র উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস আবাদ না করিলে কোনও লাভ নাই; কারণ অধিক ফসল কম, তথাপি তাহার সূতা অধিক এবং সূতার কলে সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয় বলিয়া বিশেষ আদর। এই ভাল জাতীয় কার্পাসের আবাদ না থাকায় দেশীয় কাপড়ের কলের জন্য বিদেশী সরু সূতা আমদানী করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় সিন্ধুদেশে, মিশর দেশীয় কার্পাসের আবাদ হওয়ায়, বোম্বাই প্রদেশের অনেক কলের সরু সূতা প্রস্তুত করার উপায় হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশের ধারওয়ারে যে মার্কিণ কার্পাস হয় তাহাকে ধারওয়ার মার্কিণ বলে; তাহাও উত্তম কার্পাস। সী-আইলাণ্ড, মিশর, ধারওয়ার মার্কিণ, কুইন্সল্যাণ্ডের 'ক্যারাভনিকা' এবং বোম্বাইর 'স্পেন-কটন' আবাদ করিলে বিশেষ লাভজনক হইতে পারে।

৮। যে কার্পাসের গুঁটী সর্ব্বপ্রথমে ফুটিবে সেই বীজই ভাল বিবেচন। এজন্য সেই কার্পাসের তুলা বাহির না করিয়া বীজ সমেত তাহা বিবেচন করে রাখিয়া দিবে, কারণ জলীয় বাতাস লাগিলে, কি আর্দ্র স্থানে থাকিলে, বীজ নষ্ট হইয়া যায়। পুরাতন বীজ তজ্জন্য নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া নূতন বীজ লাগান ভাল। পূর্ব্বে তৈল রাখা হইয়াছে এরূপ মাটীর পাত্রে, চীনে মাটীর পাত্রে, কি কাচ পাত্রে বীজ রাখিয়া ঐ পাত্রের মুখ এরূপভাবে বন্ধ করিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে।

৯। কার্পাস আবাদের পূর্ব্বে, নানা জাতীয় ভাল কার্পাসের বীজ পৃথক করিয়া কিছু কিছু বুনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত কোন্ জাতীয় কার্পাস ভাল হয়।

যে সকল চারা সর্ব্ব প্রথমে গজায় সেই সকলগুলি কাঠি পুঁতিয়া চিহ্নিত করিবে এবং এক কি দেড় হাত বড় হইলে তালগুলি রাখিয়া দুর্ব্বল কি খারাপ চারা গুলি উঠাইয়া ফেলিবে। ভালগুলির মধ্যে সতেজ ও বলিষ্ঠ-গুলি কাল নেকড়া দ্বারা যেগুলির সর্ব্ব প্রথমে ফুল ধরে তাহা লাল নেকড়া দ্বারা এবং যেগুলিতে সর্ব্ব প্রথমে বড় সতেজ ও সুডোল গুঁটী ধরে তাহা হরিদ্রা বর্ণের নেকড়া দ্বারা এবং যেগুলির গুটী সর্ব্বাগ্রে ফোটে এবং তাহার মধ্যে যেগুলির রং ভাল, আঁশ লম্বা সরু, সরু রেশমের মত ফিল ফেল, তাহা এবং বীজের তুলনায় তুলার পরিমাণ অধিক তাহাও দেখিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টটীকে শাদা নেকড়া দ্বারা চিহ্নিত করিবে। একখানা খাতায়, ক্রমিক নম্বর অনুসারে প্রত্যেক গাছের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া রাখিবে,—গাছ কত মোটা কত লম্বা, ডালপালা কিরূপ, ও কত নিম্নে ও কত উচ্চে, ও বহুসংখ্যক কি অল্প, প্রথম ফুল দেখা দেওয়ার সময়—প্রথম ফুঁকের গুটী পাকার সময় অংশের গুণ ইত্যাদি। গুটী পাকিলে বীজ পৃথক পৃথক রাখিয়া নম্বর দিতে হইবে এবং পরের বৎসর ভাল বীজ লাগাইতে এবং তাহার পর বৎসর এক এক নম্বরের বীজ এক এক ক্ষেতে লাগাইতে হইবে। এইরূপে ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই এই দেশের উপযোগী ভাল কার্পাসের আবাদ হইবে।

১০। কার্পাস বীজ ছিটাইয়া না বুনিয়া, লাইন করিয়া রোপণ করা ভাল; তাহা হইলে নিড়ানের ও মাটী খুঁড়িয়া দিবার সুবিধা হয় এবং আবশ্যক মত জল দিবার ও জল বাহির করিবার উপায় করা যায়। জমির চারু বরাবর লম্বা করিয়া, দুই হাত দূরে দূরে আইল করিবে, দুই আইলের মধ্যে যে নালী থাকিবে তাহা দিয়া বৃষ্টির জল সরিয়া পড়িবে, আইলের উপর দেড় হাত দূরে দূরে বীজ পুঁতিবে। জমি সার ও বীজের গুণে গাছ যত বড় হওয়া আশা করা যায়, তাহা বুঝিয়া দুই আইলের মধ্যে কতটা স্থান ফাঁক রাখা ও আইলের উপর কত ফাঁকে বীজ বোনা উচিত তাহা স্থির করিতে হইবে অর্থাৎ গাছগুলি সম্পূর্ণ বড় হইলে একটার ডালপালা অন্যটার ডালপালার মধ্যে প্রবেশ না করে তৎ-প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই বিবেচনায় কার্পাস গাছ লাগাইলে, আইলের উপর ৫।৬ হাত দূরে দূরে বীজ রোপণ করিতে হইবে।

মাটীর চাপায় পড়িয়া গাছে বীজ না গজায় তজ্জন্য ২।৩ আঙ্গুল মাটীর নীচে এক একটী গর্ত্তে ৩।৪টী বীজ পোতা আবশ্যক। বীজের সঙ্গে কিছু সার দিতে পারিলে খুব ভাল হয়। একটীধার চারা রাখিয়া অপরগুলি স্থানান্তরে রোপণ করা ভাল। ভাল বীজ এক বিঘায় একসের মাত্র লাগে। কিন্তু গাছ কার্পাসের একপোয়া বীজে দেড়বিঘা জমি লাগান যাইতে পারে। গাছ কার্পাসে প্রথম ১।১ বৎসর অন্যান্য ফসলও দেওয়া যায়। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে গাছ কার্পাসের গোড়ার মাটী কোপাইয়া দিয়া, বৈশাখ মাসে সার দিতে হয়। চারা লাগাইবার ১০।১৫ দিন পর, ভাল গাছগুলি রাখিয়া খারাপগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয়। এক স্থানে একটি গাছের অধিক থাকিবে না। ২।৩ বার নিড়া-ইতে হইবে। আইলের মাটী মধ্যে মধ্যে কোপাইয়া দিতে হইবে। গাছ ছোট থাকার সময়ে ধুঁও-পোকা লাগিবার আশঙ্কা। পোকার উপদ্রব দেখে গাছগুলি বাছনি করতঃ পাতলা করিয়া দেওয়া ভাল। পোকায় কার্পাসের ক্ষতি করে; কোন প্রকার পোকা দেখিলেই তাহা একত্র করিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। গাছ কার্পাসের চারা ২।৪ হাত উচ্চ হইলেই তাহার আগা কাটিয়া দিবে, তাহা ঝাঁকড়া হওয়ার ফলন অধিক হয় এবং হাত দিয়া কার্পাস তুলিবার সুবিধা হয়।

১১। কার্পাস তুলিবার সময় কেবল কার্পাসই তুলিবে, খোলা গাছে থাকিবে। লাল রঙ্গের কার্পাস ভিন্ন করিয়া রাখিবে; এতদ্ব্যতীত ভাল কার্পাস বাছাই করিয়া ভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া রাখিবে। ফসল উঠিয়া গেলে গাছ কার্পাসের গাছ ৪ হাত পরিমাণ রাখিয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ছাটিয়া দিবে। তাহাতে নূতন ডালপালা হইয়া কার্পাস ভাল হইবে।

১২। খারাব কি লাল তুলার লেপ, বালাপোষ, বালিশ তোষক প্রভৃতি হয়। কার্পাসের বীজে তৈল হয়; ঐ তৈলে গ্লীসারিন্ প্রস্তুত হয় এবং ঐ তৈলে অলিভ অয়েলের

পরিবর্ত্তেও পাকের কার্য্যে ব্যবহার করা যায়। কার্পাস বীজ কি তাহার খইল গো-মহিষের উত্তম খাদ্য এবং খইল জমির উত্তম সার। কার্পাস বীজের শাঁস মনুষ্যেরও বলকারক খাদ্য; ভাজু বা চাপটী করিয়া খাওয়া যায়।

আড়াই সের জলে এক সের সোহাগা মিশাইয়া এক মণ কার্পাস বীজে তাহার সাত সের জল ছিটাইয়া দিলে সহজে তৈল বাহির হয়।

১৩। কার্পাস গাছের শত্রু।—কখন কখন মুঁও পোকার ন্যায় এক প্রকার কীট গাছের পাতা খাইয়া ফেলে ও গুটী ছিদ্র করে। ন'টে শাকের বীজের ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটও পাতা নষ্ট করে। সর্ব্বপ্রথমে ঐরূপ কীট লাগা দেখিবামাত্র তাহা উঠাইয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। পাতার উপর ছাই ছড়াইয়া দিলেও ঐ উপদ্রব নিবারণ হয়। কোনও কোনও পোকা দিবাভাগে মাটীর নীচে গর্ত্তে থাকে রাত্রিতে বাহির হইয়া ফসলের উপর চড়াও করে। ঐ সকল পোকার গর্ত্তে ফুটের জল দেওয়া ও সকল পোকা ধরিয়া সংগ্রহ করতঃ পোড়াইয়া ফেলা আবশ্যক। বাগানের শাকসব্জীতে জল দেওন জন্য বাজারে যে বাজরা পিচকারী (Spray-pump, স্প্রে-পাম্প) পাওয়া যায় তাহার দ্বারা নিম্নলিখিত বিষ জলটী গাছের পাতায় ও গুটীতে দিলেও পোকার উপদ্রব নিবারণ হয়।

(১) এ্যাসিটেট অব লেড অথবা সুগার অব লেড ।/১০ ছটাক।

(২) আর্সেনেট অব সোডা ৵ ছটাক।

(৩) জল ৬।০ মণ।

প্রথমে /৩॥ সের জলে (১) সুগার অব লেড ও /২ সের জলে (২) আর্সেনেট অব সোডা গুলিয়া ঐ দুইটী মিশ্রণ একত্র মিশাইতে হইবে। তৎপর ঐ মিশ্রিত দ্রবো অবশিষ্ট জল মিশাইলেই তাহা ব্যবহারযোগ্য হইবে। (১) ও (২) দ্রব্য দুইটী ডাক্তারী ঔষধ বিক্রেতাদের দোকানে পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টার, বি-এস্, পাবনা।

ঢাকা প্রকাশ।

(৩)

চরকা

"চরকা আমার পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমি দুয়ারে বাঁধব হাতী।"

এখন যেমন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মেয়েরা পশমের সৌখীন দ্রব্য—জুতা, মোজা, গলাবন্ধ, আসন, থলিপোস, ছবি প্রভৃতি প্রস্তুত করে, পূর্ব্বে এইরূপ লোকের ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন ছিল। চরকার দ্বারা অনেক গৃহস্থ-কুল-ললনা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এখনও অনেক পতিপুত্রবিহীনা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মুখে আমরা উপরি উদ্ধৃত কবিতাটী শুনিতে পাইয়া থাকি। চরকায় সুতা প্রস্তুত অর্থাগমের উপায় না হইলে কখনই ঐ কবিতার প্রচার হইত না। চরকায় সুতায় পৈতা হইতে অতি সূক্ষ্ম ঢাকাই মস্‌লিন নামক সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের পাঠকবর্গ অবগত আছেন, ইতিপূর্ব্বে এক প্রদর্শনীতে এক খান ঢাকাই মস্‌লিন এক হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। সুতরাং চরকার দৌলতে যে দুয়ারে হাতী বাঁধিতে পারা যায়, ইহা কবি-কল্পনা বা অলীক উপকথা নহে।

আজকাল অনেক ভদ্রঘরের ছোট ছোট মেয়েরা উৎকৃষ্ট সূচীকার্য্যে পারদর্শিনী হইয়া থাকে। রেসমের এমন সুন্দর সুন্দর সেমিজ, জুতা, ফুল, ছবি প্রভৃতি উহারা প্রস্তুত করে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাদিগকে চরকার সুতা প্রস্তুত কার্য্য অতি সহজেই শিখান যাইতে পারে। যদপি প্রত্যেক গৃহস্থ আপন ঘরের মেয়েদের দ্বারা চরকায় সুতা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এদেশে প্রভূত পরিমাণে সুতা প্রস্তুত হইতে পারিবে। এখন এদেশে তাঁতের বস্ত্রশিল্পের সম্পূর্ণ বিলোপ হয় নাই, এখনও এদেশে ঢাকা, শিমলা, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের বস্ত্রাদি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রভূত পরিমাণে সুতা উৎপন্ন করিতে পারিলেই ঐ সকল বস্ত্র সুলভ হইবে। কিন্তু সুতা প্রস্তুত করে কে? সকলেই

ভাবে অপরে প্রস্তুত করিবে, আমি বস্ত্র অর্থ দ্বারা কিনিব। ফলে কেহই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে জনকতক লোকের পথপ্রদর্শক হওয়া আবশ্যক; যখন লোকে দেখিবে, তুলা কিনিয়া বাড়ীর মেয়েদের দ্বারা সুতা প্রস্তুত করাইয়া এক ব্যক্তি বেশ অর্থলাভ করিতেছে, অমনি দলে দলে লোকসকল ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। দৃষ্টান্ত না দেখাইলে অনুকরণের আশা বিড়ম্বনামাত্র।

মিল্লির মন্ত্রণা-সভায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, বিদেশাগত দ্রব্যাদি যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া স্বদেশে উহা উৎপাদন ও ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং বিলাতী বস্ত্র ব্যবহারের আশা এখন কিছু কালের জন্য পরিত্যাগ করা অবশ্যম্ভাবী। এখন প্রত্যেক গৃহস্থেরই চরকার প্রতি মনোযোগ প্রদান করা অত্যন্ত আবশ্যক। আমাদের ঘরের মেয়েরা শিল্পকার্য্যে এমন পারদর্শিনী যে, সামান্যরূপ শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিলে তাহারা চরকায় সুতা প্রস্তুত, এমন কি, বস্ত্র বয়নও করিতে পারিবে। ইহাতে চাই কেবল উৎসাহ—চাই কেবল একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা।

(মেদিনীপুর-হিতৈষী।)

---

(৪)

হস্ত-শিল্প

বৈদেশিক বস্ত্রশিল্পের অত্যুদয়ে, আমাদের বহু হস্তশিল্প লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমরা বিদেশজাত সুলভ ও আশু প্রীতিকর দ্রব্যের প্রলোভনে এতদিন দেশজাত দ্রব্য অবহেলা করিয়াছি, তাই এ দুর্দ্দিনে বহু সমস্যা আমাদের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভাবই লোকের শিক্ষক। দেশীয় হস্তশিল্পের অনাদরের ফলস এক্ষণে আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি। যতদিন বিলাতী বস্ত্র আমাদের দেশে না আসিয়াছিল, ততদিন বস্ত্রের জন্য আমরা কাহারও মুখাপেক্ষী হই নাই। আমাদের প্রস্তুত বস্ত্রাদিতে আমাদের লজ্জা নিবারণ হইয়াও তখন বিদেশীয় লজ্জা নিবারণ হইত। লৌহ, তাম্র, পিত্তল, কাংস্য-নির্ম্মিত বহু দ্রব্য তখন গৃহে নির্ম্মিত হইত। সামান্য সূচ-সুতার জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী হইতাম না। এক্ষণে আমরা পরের দাসত্বই জীবনের সারব্রত করিয়াছি, সভ্যতার মোহে পতিত হইয়া দেশীয় পণ্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছি, তাই এ ঘোর দুর্দ্দিনে বহু সমস্যা আমাদের প্রতি অট্টহাস করিতেছে।

আমাদের বহু শিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে; যাহা কিছু আছে, তাহাও যায় যায় হইয়াছে। এক্ষণে উৎসাহ দিয়া রক্ষা করিতে পারিলে ভবিষ্যতে অনেক উপকারে আসিবে। পাবনাতে কি কি হস্তশিল্প এখনও বিদ্যমান আছে, তাহার একটী তালিকা বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছি। অদ্য তাহার কিয়দংশ বাহির হইল। আশা করি 'সুপ্রভাতে'র পাঠকবর্গ আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

১। পাবনাতে তাঁতি ও জোলা উভয় জাতির বাস। বহুদিন হইতেই এই জেলা বস্ত্রশিল্পের জন্য সুনাম অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। বিলাতী 'পাবনা পেড়ে' কাপড় বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। পাবনার জোগাড়ী হইতে যে জোলার ধুতি কলিকাতার একজিবিসনে প্রেরিত হয়, ঐ বস্ত্রের পাড়ের অনুকরণেই পাবনা-পেড়ে কাপড় হয়। এই জেলার জোগাড়ী সাহাজাদপুর, গুরুদয়ালনগর, চলনা, নিশ্চিন্তপুরের জোলারা অতি সুন্দর পরিধেয় বস্ত্র, বিছানার চাদর, জামার ছিট, গামছা, তসরপ্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সিরাজগঞ্জ সবডিভিসনেও অনেক জোলা কারিকরের বাস। যদি ইহাদিগকে সুলভে উপযুক্ত পরিমাণে সুতা সরবরাহ করা যায় তাহা হইলে ইহারা ব্যবসায় উন্নতি করিতে পারে। আজকাল সুতার অভাবেই ইহারা দেশের অভাব পূরণ করিতে পারিতেছে না এবং কার্য্যেও লাভবান্ হইতেছে না। পেটের দায়ে ইহাদের অনেকেই এখন কৃষিকার্য্য করিতেছে।

২। তাঁতিবন্দের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের তাঁতির চাদর এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। লোকে আদর করিয়া ব্যবহার

করিত। উৎসাহের অভাবে এবং স্বল্প লাভের জন্য এ কার্য্যে এখন আর তাহাদের সেরূপ আগ্রহ নাই। সিরাজগঞ্জের নিকটস্থ ছোট ঘুঙ্গের চাদর এখনও প্রসিদ্ধ। বাজারে অতি চড়া দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

৩। পাবনার পূর্ব্বাঞ্চলে নাড়ুয়িয়া হইতে মথুরা পর্য্যন্ত স্থানের ধরাতিরা সুন্দর সুন্দর কাঠের বৈঠক, সিন্দুরের কৌটা, লক্ষ্মীর কৌটা, নোলা, চুড়িকাঠি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে; এই সমুদয় জিনিষে লাল কালো ইত্যাদি রং ফলানও উল্লেখযোগ্য। ঐ রং যেরূপ সুদৃশ্য, সেইরূপই স্থায়ী। জিনিষগুলিও চিত্তাকর্ষক।

৪। সিরাজগঞ্জ টাউনের এক মাইল দক্ষিণে কাঁদিহা কান্দাপাড়ানামক স্থানে মহাজনদিগের খাতার জন্য খুব ভাল কাগজ প্রস্তুত হয়। উহা বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই কাগজের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে লিখিবার সময় ব্লটিং কাগজের আবশ্যক হয় না। লিখিবা-মাত্র শুকাইয়া যায়। মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীগণ ইহা খুব পছন্দ করেন। এই কাগজ-সমস্যার দিনে এই সমস্ত কাগজের গুণাগুণ পরীক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য।

৫। এই জেলার উত্তর পশ্চিমে কলম গ্রাম পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে কাঁসারীদিগের বাস। তাহারা সুন্দর সুন্দর পিতল ও কাংস নির্ম্মিত থালা, ঘটী, বাটী, কলস ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সমস্ত জিনিষ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হয়।

৬। এই জেলার বহু স্থানের বৈরাগীরা কাঠের মালা প্রস্তুত করে। এই সমস্ত মালা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চালান হইয়া থাকে। নদীয়া জেলাতেই বেশীর ভাগ যায়। পাবনার পূর্ব্ব-দক্ষিণে হরিতলা গ্রামে বৈরাগীদের বাটীতে বেলের মালা প্রস্তুত হয়। এই মালা প্রস্তুত-করণ দেখিবার বিষয়। সামান্য যন্ত্র সাহায্যে এই মালা প্রস্তুত হয়, কাজও অতি দ্রুত হইয়া থাকে।

৭। স্বর্ণ ও রৌপ্যের গহনানির্ম্মাণে পাবনার কর্ম্মকারেরা বহুদিন হইতেই বিখ্যাত। যাহার হাতের কাছে ঢাকা, সে স্থান এ শিল্পে অগ্রসর থাকিতে পারে না। এখনও এই জেলার কর্ম্মকারেরা উত্তর বঙ্গের বহু জেলাতে এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

৮। এখন পর্য্যন্তও এই জেলার স্বর্ণকার, কুম্ভকার ও কর্ম্মকারেরা আমাদের সাধারণ অভাবগুলি পূরণ করিয়া আসিতেছে। উৎসাহ পাইলে পাশ্চাত্য জাতির বহু জিনিষের অনুকরণ ইহারা করিতে পারে। এই সমস্ত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, একটু চেষ্টা করিলেই আবার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরিতে পারে। যে সব শিল্প নষ্ট হইয়াছে, তাহাও উদ্ধার পাইতে পারে। চরকায় সুতা কাটা আরম্ভ হইতে পারে,—এখন বৃদ্ধা এই জেলাতে বিরল নহে। তাহাদের নিকট শিক্ষা করিলে আবার চরকায় সুতাকাটা আরম্ভ হইতে পারে। ইতিমধ্যেই পাবনা জেলার রাইপুর কেন্দুপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার বি, এল মহোদয়ের যত্নে এ শিল্প আবার দেখা দিয়াছে। (সুরাজ)

শ্রীরামচন্দ্র রায়

ম্যালেরিয়া

[বড়ল নদী]

বড়ল নদী রাজসাহী জেলার সরদহ নামক স্থানে পদ্মা হইতে নির্গত হইয়া রাজসাহী জেলার দক্ষিণাংশ ও পাবনা জেলার উত্তরাংশের মধ্য দিয়া বেড়ার নিকটে হরাসাগরে পতিত হইয়াছে। রাজসাহী ও পাবনা জেলার অনেক প্রধান ও প্রসিদ্ধ গ্রাম এই বড়ল নদীর উভয় তীরে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে উহাদের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—কোন কোনটী বা ধিক্ ধিক্ করিয়া কোন প্রকারে জীবিতেছে। মুলইল, দয়ারামপুর, ওমাদিয়া, জোয়াড়ী, তিলইল, বড়াইগ্রাম, বরদা, জোনাইল, হরিপুর, শিনাইল, চাটমহর, বোথর, পাবিখা, সাঁড়িয়া, ভাবীগাছা, আপেখর, হুরনগর, গোপালনগর, ভেবরা প্রভৃতি গ্রামগুলি ইহারই তীরে অবস্থিত। যাহারা এতদঞ্চলের

প্রাচীন ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের অধিকাংশ 'সমাজ' স্থানই বড়লের উত্তর তীরে বর্ত্তমান ছিল। এতদ্ভীত ছোট বড় আরও কত গ্রামই যে এখানে ছিল, তাহার সীমা সংখ্যাই নাই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ "তাতুড়িয়া" ও 'পাঁতৈইল' গ্রাম ইহারই উত্তর ও দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ঘোষাড়ী নামক স্থানে বড়লের এক শাখা উত্তরবাহিনী "বিল চলনের" মধ্য দিয়া তুবলন্দর নামক স্থানে পুনরায় বড়লের সহিত মিলিত হইয়াছে। গলাই, আত্রাই, নাগর প্রভৃতি আরও অনেক নদী চারিদিক হইতে আসিয়া এই 'চলনবিলে' পতিত হইয়াছে। ইহার ফলে মুসলমান আমলে ও ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগে উত্তর ও মধ্যবঙ্গের প্রায় যাবতীয় পণ্যই এই পথে যাতায়াত করিত। এই চাটমোহর প্রভৃতি স্থান এককালে এতদঞ্চলের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইতে পারিয়াছিল।

কিন্তু বড়ল নদীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এতদঞ্চলের সৌভাগ্য রবিও আজ অস্তমিত হইয়াছে। বর্ষাকালের দুই তিন মাস ব্যতীত এখন আর বড়ল নদীতে বড় একটা জলই থাকে না। স্রোতস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী গ্রামের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সেখানে পুকুর-পুষ্করিণী বড় একটা থাকে না—নদীর বিমল জল পাইলে কে পয়সা খরচ করিয়া পুকুর কাটাইতে যায়? এই নদীর তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। সুতরাং নদী মরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট ও তাহার সঙ্গের ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতির আবির্ভাব হইল। যদি কেহ একবার এই নদীটীর আগাগোড়া বেড়াইয়া দেখেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন, এ সকল স্থান কি ছিল আর কি হইয়াছে। নদীর উভয় তীরবর্ত্তী ঘন বসতি গ্রামসমূহ একণে হিংস্র পশু সমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে—কদাচিৎ বা দুই একখানি গ্রামে ১৫ ঘর লোক বহু কষ্টে শ্বাপদ ও ম্যালেরিয়া কলেরার সহিত নিয়ত যুদ্ধ করিয়া কোনরকমে আজ পর্য্যন্তও আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছে। শুধু তাহাই নহে—অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত লোকের অধিকাংশই সম্প্রতি এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে—প্রাচীন বংশগুলি প্রায় এককালীন লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু ত যো নাই বলিলেই হয়—ঘোষ, মল্লিক, কামার, কুমার, গোয়ালা প্রভৃতি একেবারে নির্ব্বংশ হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে তাহাদের অধ্যুষিত বাস্তুভিটায় ভিন্ন স্থানাগত মুসলমান ও ছোট নাগপুরের মুণ্ডা বাগ্দী প্রভৃতি আসিয়া কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিতেছে। কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে, এখানকার লোকেরা হয়তো অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমার ঘরের মধ্যে বোধ হয় ৯৯৯ ঘরই পিতৃপিতামহের অধ্যুষিত বাস্তুভিটাতেই 'হাড় মাটী' করিয়াছে এবং গত ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যেই এই অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

ম্যালেরিয়া ও কলেরাই যে, এই অস্বাভাবিক লোকক্ষয়ের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং বড়ল নদী মরিয়া যাওয়াতেই যে এতদঞ্চলে ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাও সর্ব্ববাদীসম্মত। প্রাচীন লোকের কাছে শুনিয়াছি যে, বড়ল নদী যখন চিরকাল চল্‌তি ছিল, তখন এতদঞ্চলের জ্বর-জ্বালার নাম-গন্ধও ছিল না। এখনও এতদঞ্চলে এই দুইটীই প্রধান ব্যাধি। বস্তুতঃ এই দুইটী ব্যারামে বড়ল নদীর উভয় তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহের যেরূপ ভীষণ লোকক্ষয় হইয়াছে ও এখনও হইতেছে, রাজসাহী পাবনা জেলার আর কোন স্থানেই সেরূপ হয় নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বড়ল নদী হঠাৎ এরূপ ভাবে মরিয়া গেল কেন?—মোটামুটি ভাবে ইহার দুইটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, নগরদহের নিকট উৎপত্তি স্থলে বালি জমিয়া উহা এত উচ্চ হইয়া গিয়াছে যে, পদ্মাতে খুব বেশী জল না হইলে বড়লে জল প্রবেশ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে পদ্মার জল সামান্য কমিলেই বড়লের সহিত উহার সংযোগমুখ ছিন্ন হইয়া যায়। যে যে কারণে পদ্মার অপরাপর শাখার মুখে বালি জমিয়া চড়ার সৃষ্টি হইয়াছে, এখানেও সেই সেই কারণই দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মায় জলের পরিমাণ ও স্রোতের বেগের হ্রাসই—নদী

মুখে চড়া পড়িবার প্রধান কারণ। কি কারণে পদ্মার স্রোত কমিয়া গিয়াছে, সকলেই তাহা জানেন, সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, ইহাতেও নদীর যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, মালঞ্চী নামক স্থানে উত্তরবঙ্গ রেলপথের একটী সেতু নির্ম্মিত হওয়াতে, তাহারও রক্ষা রহে নাই। রেল লাইনের দ্বারা নদী নালা প্রভৃতির কিরূপ সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে বা হইতেছে এই স্থানটী দেখিলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নদীগর্ভ হইতে শুধু যে কয়েকটী স্তম্ভ তুলিয়াই তদুপরি এই সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা নহে। পরন্তু স্রোতোবেগে যাহাতে এই সমস্ত স্তম্ভের কোনও ক্ষতি না হয় তজ্জন্য উহাদের চারি পার্শ্বে ও নদীর উভয় তীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। ইহার ফলে স্রোতের বেগের দ্রুততার সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানে বাঁধ জমিয়া চড়ার সৃষ্টি করিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, সেতু নির্ম্মাণের সময় এইখানে অনেকগুলি নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা সত্য কি না জানি না। তবে ইহাও ঠিক যে উত্তর কালে অনেক নৌকা স্রোতের বেগে এই সমস্ত স্তম্ভের সহিত ধাক্কা খাইয়া এই চড়া সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে।

বড়ল নদী মরিয়া যাওয়ার এই দুইটি প্রধান কারণ। সম্প্রতি "মরার উপরেও খাঁড়ার ঘা"-রও ব্যবস্থা হইয়াছে। নবনির্ম্মিত সাড়া সিরাজগঞ্জ লাইনের তাম্বুড়িয়া ষ্টেসনে এই নদীর উপরেই আবার আর একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

রেল লাইনের দ্বারা দেশের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে শুনিতে পাই কিন্তু এই 'শ্রী' কাহার—আমাদের, না ইষ্টইণ্ডিয়ান রিংক সম্প্রদায়ের—তাহা আমরা আজ পর্য্যন্তও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এক বৎসর ফসল না জন্মিলে বা পাট দশ টাকা দরে বিক্রীত না হইলে যে দেশের হাজার হাজার লোককে অনাহারে চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতে হয়, ম্যালেরিয়া-কলেরা প্রভৃতি প্রতিকারযোগ্য ব্যাধিরাজে যে দেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায় এবং আরও অধিক সংখ্যক লোক শ্রীহীন ও ষণ্ডত্বং লইয়া জীবনেই মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিয়া গেলেও যে দেশের পল্লীবাসীদের এক বিন্দু পানীয় জল পাইবার উপায় নাই, যে দেশের গরু মহিষ শৃগাল কুক্কুরে পর্য্যন্ত জলের অভাব বোধ করে, তাহারও যদি 'শ্রী' বৃদ্ধি না হইবে, তবে আর কাহার হইবে?

শুনিতে পাই দেশের স্বাস্থ্যের প্রতি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলার নদী-নালা সংস্কারের নানারকম জল্পনা-কল্পনাও হইতেছে। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে ঐ ঐ স্থানের অনেক সুবিধা হইবে বটে—কি? গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে; নদীয়া যশোহরের মুখের দিকে তাকাইয়া আমাদিগকে কি নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে হইবে? লাট সাহেব বলিয়াছেন যে এক সঙ্গে সব জেলায় কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর নহে। ব্যাপারটীর গুরুত্ব যে না বুঝি তাহা নহে—কিন্তু আমরা অপেক্ষা করিতে চাহিলে কি হইবে?—ম্যালেরিয়া-কলেরা প্রভৃতি তো আর অপেক্ষা করে না। গবর্ণমেণ্টের এই সব কাজ যেরূপ ধরণ গতিতে সম্পন্ন হয়, তাহাতে বোধ হয় যে, যশোহর খুলনা প্রভৃতি স্থানের কাজ সারিয়া রাজসাহী বিভাগে হাত দিতে না দিতেই রাজসাহী ও পাবনা জেলা বোধ হয় ম্যালেরিয়া-কলেরার একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইবে। তখন নদী-নালার সংস্কার করিলে ফলভোগ করিবে কে? আমরা তাই এই বড়ল নদীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহার উৎপত্তি স্থলের চড়াটা যদি কাটাইয়া দেওয়া যায় এবং মালঞ্চী ও তাম্বুড়িয়ার সেতুর দ্বারা নদীর স্রোতোবেগের কোনও ক্ষতি না হইতে পারে এমন কোনও ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে বড়লের উভয় তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ আবার স্বাস্থ্য সম্পদশালী হইয়া উঠিতে পারে। আমরা আশা করি লাট সরকারের কোনও মাতব্বর লোক এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিবেন।

—প্রবাস

যুক্তিকল্পতরু

পূজাদ্বয়বৃত্তি

(৩২৭—৩৯১ শ্লোক)

গৃহস্বামীর হস্ত বা তাহার জ্যেষ্ঠপত্নীর হস্তদ্বারা (১) গৃহাভ্যন্তরের (২) পরিমাণ লইবে।

গৃহের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের গুণ করিয়া যে অঙ্কসমষ্টি হইবে, তাহা আবার পৃথক্ পৃথক্ আট, তিন, আট এবং আট দ্বারা গুণ করিয়া যায়, দাস, ত্রিশ এবং সাতাইশ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারাই করণীয় গৃহের আয়, ব্যয়, স্থিতি এবং নক্ষত্রাঙ্ক বুঝিতে হইবে (৩)।

দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে সার্দ্ধদ্বাদশহস্তপরিমিত গৃহের নাম 'ধবল'; ইহা (৪) সুখবর্দ্ধক।

দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে সার্দ্ধচতুর্দ্দশহস্তপরিমিত গৃহের নাম 'কমলক'; ইহাতে গৃহসম্পত্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে।

দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে সার্দ্ধষোড়শহস্তপরিমিত গৃহের নাম 'সর্ব্বতোভদ্র' ইহা স্বামীর সুখকারক হয়।

দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে সার্দ্ধঅষ্টাদশহস্তপরিমিত গৃহের নাম 'কল্যাণ', ইহা—ধন, সম্পত্তি ও সুখ প্রদান করে।

দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে সার্দ্ধবিংশতিহস্তপরিমিত গৃহের নাম 'সুখদ'—ইহাও স্বামিসুখবর্দ্ধক।

এই যে পাঁচ প্রকার গৃহের বিষয় কথিত হইল, ইহার কোনরূপ স্থান-নিয়ম নাই, ইহা সকল স্থানেই করা যাইতে পারে।

স্থান, পরিমাণ এবং দোষের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, তদনুসারে বিচার করিয়া গৃহ করিলে গৃহস্থ সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

অজ্ঞান বা দম্ভপ্রযুক্ত যে অন্যরূপে গৃহ করে, সে কষ্ট পায় এবং তাহার ধন, কুল ও বল (১) নষ্ট হইয়া থাকে।

গৃহস্থাদিগের সম্বন্ধে প্রাচীরের কোন নিয়ম নাই। গৃহী যথাশক্তি প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবে। যাহাতে কেহ গৃহমধ্যে দৃষ্টি করিতে পারে, এইরূপে প্রাচীর-কল্পনা করিবে।

ইতি গৃহ-যুক্তি।

আসন যুক্তি

বিশেষ এবং সামান্যভেদে আসন দুই প্রকার; সিংহাসন 'বিশেষ' এবং খট্টা প্রভৃতি 'সামান্য'।

রাজার শ্রেষ্ঠ আসন (২) সিংহাসনের বিষয় কথিত হইতেছে।

---

(১) বলম্।

(২) গৃহাভ্যন্তরং।

(৩) এই শ্লোকটীর সম্পূর্ণ ভিন্ন পাঠ গ্রহণ করিতে হইল। এই পাঠ শব্দকল্পদ্রুমের বাস্তুশব্দে এবং জ্যোতিস্তত্ত্বদীপিকার ৭ম অধ্যায়ের ৭৭ শ্লোকের গোবিন্দ ভট্টকৃত টীকায় পাইয়াছি।

"গৃহভূমিসমাহৃত্তপিণ্ডলবং
বসুলোচনরন্ধ্রগজৈর্ভক্তিম্।
রবিভূধরত্রিংশদযোগহৃতং
ভবনায় ধ্রুবস্থিতিধ্রুবপদম্॥"

ইহার পর কয়েকটী শ্লোক অসংলগ্ন আছে। দুই একটী শ্লোক পতিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, আরও সংগৃহীত হইলে অনুবাদের ইচ্ছা রহিল।

(৪) এতত্।

যখন ঈতি প্রভৃতি কোনরূপ উপদ্রব না থাকে, সেই সময়ে মুহূর্ত্ত, মাস, বৎসর, বার, (১) নক্ষত্র, তিথি, চন্দ্র এবং যোগ শুভ হইলে সিংহাসন নির্ম্মাণ করিবে।

গৃহারম্ভের মত সিংহাসনারম্ভেও যখন সূর্য্য স্থির রাশিতে ও চন্দ্র স্থির নক্ষত্রে থাকেন, তখনই নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে যথাক্রমে পাঁচ, চারি, তিন ও দুইটী সোপান (২) করিবে। যুগ অনুসারেই যথাক্রমে চল্লিশ, ত্রিশ, কুড়ি ও ষোলটী চরণ করিবে এবং তাহাতে সিংহমূর্ত্তি থাকিবে।

নীতিশাস্ত্রকারগণ রবি প্রভৃতির দশায় জাত নৃপতিদিগের জন্য, যথাক্রমে, পদ্ম, শঙ্খ, হংস, সিংহ, ভৃঙ্গ, মৃগ এবং হয়—এই আট প্রকার সিংহাসনের উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজার হস্তের আট হস্ত দৈর্ঘ্যে ও আট হস্ত প্রস্থে এবং উচ্চতায় একটী মানুষের সমান হইবে; ইহার নাম 'রাজপাত্র'।

ইহার উপরে—দৈর্ঘ্যে চারি হস্ত, প্রস্থে চারি হস্ত এবং উচ্চতায় অর্দ্ধমানুষপরিমিত আসন করিবে; ইহার নাম 'রাজাসন'; ইহা কলির নৃপতিদিগের হিতকর। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের যথাক্রমে দশ, আট ও সাত কোণযুক্ত আসন হইবে।

আট প্রকার আসনের লক্ষণ

১। পদ্ম

পদ্মকাষ্ঠী কাষ্ঠে (পূর্ব্বোক্তপ্রকার আসন নির্ম্মাণের পর) পদ্মমালা অঙ্কন করিয়া পদ্মরাগ এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণ দ্বারা সজ্জিত করিবে। পাদদেশে পদ্মকোষ(৩) নির্ম্মাণ করিবে এবং আট দিকে আটটী 'রাজদাদশাঙ্গুলি' পরিমিত পদ্ম-রাগযুক্ত পুত্রিকা (পুতুল) নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এবং 'রাজাসনে' ঐরূপ চারিটী পুত্রিকা থাকিবে। এই বারটী পুত্রিকা থাকিবে। এই আসনের মধ্যে মধ্যে নবরত্ন প্রভৃতিও দিবে এবং রক্ত-বস্ত্র দ্বারা মুড়িয়া দিবে। ইহার নাম 'পদ্ম-সিংহাসন'; ইহাতে উপবেশন করিয়া রাজা অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া থাকেন।

২। শঙ্খ

ভদ্রশ্রী (২) কাষ্ঠে শঙ্খের মালা অঙ্কন করিয়া বিশুদ্ধ স্ফটিক ও গৌপ্য দ্বারা সজ্জিত করিবে, পাদদেশে শঙ্খনাভি এবং স্থানে স্থানে শুদ্ধ স্ফটিক দ্বারা সাতাইশটী পুত্রিকা নির্ম্মাণ করিবে এবং শুভ্রবস্ত্রে ভূষিত করিবে। ইহার নাম 'শঙ্খ-সিংহাসন'।

৩। গজ

পনস (কাঁঠাল) কাষ্ঠে গজমালা অঙ্কন করিয়া প্রবাল, বৈদূর্য্য, স্বর্ণ প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করিবে। পাদদেশে গজ-মস্তক করিবে ও মাণিক্য দ্বারা এক একটী পুত্রিকা নির্ম্মাণ করিবে। রক্ত-বস্ত্রাদি ইহার ভূষণ। এই 'গজ-সিংহাসন' সাম্রাজ্য ফলদায়ক হইয়া থাকে।

৪। হংস

শাল-কাষ্ঠে হংসমালা নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্পরাগ মণি (গোখ্রাজ), স্বর্ণ ও কুরুবিন্দ মণি দ্বারা সজ্জিত করিবে এবং পাদদেশে একুশটী গোমেদক-নির্ম্মিত হংসাকৃতি পুত্রিকা নির্ম্মাণ করিবে। পীতবস্ত্র ইহার ভূষণ। এই 'হংস-সিংহাসন' সকল অনিষ্ট নাশ করে।

৫। সিংহ

চন্দন-কাষ্ঠে সিংহমালা অঙ্কন করিয়া বিশুদ্ধ হীরক ও স্বর্ণাদি দ্বারা ভূষিত করিবে। পাদদেশে সিংহাকৃতি থাকিবে ও একুশটী পুত্রিকা হইবে। ঐন্দ্রল মুক্তা প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করিয়া শুভ্রবস্ত্রাবৃত করিবে। এই আসনে উপবেশন করিয়া রাজা সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে পারেন।

৬। ভৃঙ্গ

চম্পক-কাষ্ঠে ভৃঙ্গমালা অঙ্কন করিয়া তাহা মরকত-খচিত করিবে। পাদদেশে পদ্মকোষ এবং বাইশটী পুত্রিকা

(১) বর্ষে।
(২) সোপানাদি।
(৩) পদ্মকোষাঃ।

নির্ম্মাণ করিবে। নীল-বস্ত্রাদি ইহার ভূষণ। এই 'ভূত-সিংহাসনে' উপবেশন করিলে শত্রুক্ষয় এবং জয় হইয়া থাকে।

৭। মৃগ

বিল্ব-কাষ্ঠে বৃত্তমালা (১) অঙ্কন করিয়া ইন্দ্রনীল মহানীল মণি এবং স্বর্ণদ্বারা ভূষিত করিবে। পাদদেশে মৃগশির এবং চল্লিশটী পুত্রিকা নির্ম্মাণ করিবে। নীল-বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত এই 'মৃগ-সিংহাসন' ঐশ্বর্য্য, বিজয়, সম্পত্তি এবং আরোগ্য প্রদান করিয়া থাকে।

৮। হয়

কেশর-(বকুল) কাষ্ঠে ষোটকমালা অঙ্কন করিয়া নানারূপ অস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত করিবে। পঁচাত্তরটী পুত্রিকা এবং পাদদেশে হয়-মস্তক নির্ম্মাণ করিবে। বিচিত্র বস্ত্রাদি ইহার আসন। এই 'হয়-সিংহাসন' ঐশ্বর্য্য ও বিজয় বর্দ্ধন করে।

ভোজ এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ যেরূপ লিখিয়াছেন, তদনুসারে এই আটপ্রকার শ্রেষ্ঠ মহাসিংহাসনের বিষয় কথিত হইল।

যে রাজা অবজ্ঞায় প্রভুক ইহার অন্যথা করে, মৃত্যু তাহাকে অচিরেই গ্রহণ (২) করিয়া থাকে।*

মদমত্ত হস্তীকে যেমন সিংহ বধ করে, সেইরূপ যে রাজা পরের আসনে উপবেশন করে বা যাহার আসনই নাই,—শত্রুগণ তাহাকে বিনাশ করে।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, নিজ-লগ্নে যাহার জন্ম, তাহার আসনে উপবেশন করিলে দোষ হয় না।

ইতি বিশেষাসনোদ্দেশ।

সামান্য আসন

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের যথাক্রমে চারি, ছয় ও আট (৩) কোণযুক্ত এবং শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণবস্ত্র-শোভিত খট্টিকা (ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন) সুখপ্রদ হইয়া থাকে।

আটখানি কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা খট্টা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

(১) বৃত্তমালা। (২) অতিক্রমম্।
(৩) আট।

খট্টা লক্ষণ

খট্টা যে চারিখানি কাষ্ঠখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহার নাম 'চরণ'।

মস্তকের দিকে যে কাষ্ঠখানি থাকে তাহার নাম 'ব্যূপধান'। পায়ের দিকে যেখানি থাকে তাহার নাম 'নিরূপক'। উভয় পার্শ্বের দুইখানির নাম 'আলিঙ্গন'।

'আলিঙ্গন'-দুইটী চারিহাত করিয়া 'ব্যূপধান' এবং 'নিরূপক' দুইহাত করিয়া এবং 'চরণ' চারিটী একহাত করিয়া (মোট ষোলহাত) হইবে। এই সর্ব্বর্ষ ষোড়শিকা খট্টা সর্ব্বত্র অভয় প্রদান করে।

'আলিঙ্গন' সাড়ে চারিহাত 'ব্যূপধান' ও 'নিরূপক' আড়াই হাত এবং 'চরণ' একহাত করিয়া এই আঠার হাতের সর্ব্বর্ষাষ্টাদশিকা খট্টা সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করে।

'আলিঙ্গন' পাঁচ হাত, 'ব্যূপধান' ও 'নিরূপক' আড়াই হাত, চরণ সওয়া হাত করিয়া—এই কুড়িহাতের সর্ব্বর্ষবিংশতিকা খট্টা ধন, সম্পত্তি ও জয় প্রদান করিয়া থাকে।

'আলিঙ্গন' পাঁচহাত, 'ব্যূপধান' ও 'নিরূপক' তিন হাত এবং 'চরণ' এক হাত করিয়া হইলেও সর্ব্বর্ষবিংশতিকা† হইতে পারে।

['আলিঙ্গন' সাড়ে পাঁচ হাত, 'ব্যূপধান' ও 'নিরূপক' তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ এবং 'চরণ' তাহারও অর্দ্ধ পরিমাণ হইবে। এই সর্ব্বর্ষদ্বাবিংশিকা খট্টা সকল প্রকার সম্পত্তি প্রদান করে।]‡

---

* সর্ব্বষোড়শিকা খট্টা "সর্ব্বত্রাভয়দায়িকা"—এই অংশ বাচস্পত্য অভিধানের 'সিংহাসন' শব্দে উদ্ধৃত আছে; মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

† সর্ব্ববিংশতিকা।

‡ এই অংশ মুদ্রিত পুস্তকে নাই; শব্দকল্পদ্রুম সিংহাসন শব্দের যুক্তিকল্পতরুর উদ্ধৃতাংশ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

"আলিঙ্গনে সার্দ্ধপঞ্চে ব্যূপধাননিরূপকে।
তদর্দ্ধেন তদর্দ্ধেন চতুরশ্চরণা ইতি।
সর্ব্বদাবিংশিকা খট্টা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী॥

'আলিঙ্গন' ছয় হাত, 'ব্যাপযান' ও 'নিরূপক' তিন হাত এবং 'চরণ' দেড় হাত • করিয়া এই চব্বিশ হাতের **চতুর্বিংশতিকা** ঘট্টা সর্ব্বরোগ নাশ করে।

['আলিঙ্গন' সাত হাত, 'ব্যাপযান' ও 'নিরূপক' তিন হাত এবং 'চরণ' দেড়হাত করিয়া এই ছাব্বিশ হাতের **সার্দ্ধচতুর্বিংশিকা** ঘট্টা সকল প্রকার সৌভাগ্যের কারণ হয়।

'আলিঙ্গন' সাড়ে সাতহাত, 'ব্যাপযান' ও 'নিরূপক' সাড়ে তিনহাত এবং চরণ দেড়হাত করিয়া হইবে। এই **সার্দ্ধাষ্টাবিংশিকা** ঘট্টা সকল প্রকার ভোগ প্রদান করে।] ‡

'আলিঙ্গন' আটহাত 'ব্যাপযান' ও 'নিরূপক' চারি হাত এবং 'চরণ' দেড়হাত করিয়া এই ত্রিশহাতের '**সার্দ্ধদ্বাত্রিংশিকা**' ঘট্টা সকল প্রকার অভিলষিত বস্তু প্রদান করে।

এই আট প্রকার ঘট্টার লক্ষণ সংক্ষেপে (১) কথিত হইল, ইহা যথাক্রমে রবি প্রভৃতি দশাজাত ব্যক্তিদিগের ঐশ্বর্য্যের কারণ হয়।

শিল্পিগণ ঘট্টার উপর নানাবিধ মূর্ত্তি কল্পনা করিবে।

সর্ব্বষোড়শিকা ঘট্টা সকলের পক্ষেই উপযোগী (২) যে ঘট্টার চারিহস্ত প্রমাণ (৩) আটটী খণ্ড থাকে তাহার নাম শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা। ইহা নৃপতিদিগের উপযোগী। ইহাতেই আভরণ দিলে তাঁহার নাম 'সর্ব্বজয়ী', 'দাত্রাসিদ্ধি', 'সর্ব্বসিদ্ধি', 'বিজয়া' এবং 'অষ্টমঙ্গলা'।

একখাত করিয়া বৃদ্ধি করিলেই জয়, বজ্র, প্রেরান্, চিত্রক, অম্বঃ, পদ্ম, মহান্ এই নামগুলি হইবে।

তাহাই আবার আর একখাত করিয়া বৃদ্ধি করিলে উক্ত নামে অতিরিক্ত হইয়া থাকে। (তাহা চারিপ্রকার) যথা—তুলা, অতিতুলা, শিখরী এবং বিষমেক্ষণা। (৫)

দাত্রাসিদ্ধি প্রভৃতি ঘট্টার যে ষোড়শপ্রকার ভেদ কথিত হইল, ইহার আদ্য ও অন্ত দুইটী করিয়া যথাক্রমে রবি প্রভৃতি দশাজাত ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রশস্ত।—

'দূরদর্শী', 'দীর্ঘদর্শী', 'দুর্লঙ্ঘ্য', এবং 'দুরাসদ' নামে চারিপ্রকার উক্ত নাম হইয়া থাকে, ইহাদিগকে প্রাসাদ বলে। এইগুলি উচ্চতায় পর পর দশগুণ এবং বিস্তারে একপাদ অধিক। ইহা সকল রাজার পক্ষেই তুল্যরূপ হইয়া থাকে।

ভোজ মতেও—অতয়বোড়শী (†) (সর্ব্বষোড়শিকা) হইতে সর্ব্বত্রিংশতিকা পর্য্যন্ত ঘট্টার পর পর দুইহাত করিয়া বৃদ্ধি হওয়ায় (‡) আটপ্রকার নাম ভেদ।

যথা - মঙ্গলা, বিজয়া, পুষ্টি, ক্ষমা, তুষ্টি, সুখাসন, প্রচণ্ডা এবং সর্ব্বতোভদ্রা।

পরাশর সংহিতার মতে—আটখানি কাষ্ঠ খণ্ডের হস্তপরিমাণ লইয়া যে অঙ্ক (§) সমষ্টি হয়; তাহা সমান হইলেই সে ঘট্টা প্রশংসিত (৭) হইয়া থাকে, অন্যথা নহে।

সার্দ্ধা।

"আলিঙ্গনে সপ্তহস্তে ব্যাপযাননিরূপকে।
ত্রিহস্তে সার্দ্ধহস্তাশ্চ চত্বারশ্চরণা ইতি।
সর্ব্ব ষড়্বিংশিকা ঘট্টা সর্ব্বসৌভাগ্যকারিকা।"

"আলিঙ্গনে সার্দ্ধসপ্তে ব্যাপযাননিরূপকে।
সার্দ্ধত্রিহস্তে সার্দ্ধাশ্চ চত্বারশ্চরণা ইতি।
সর্ব্বাষ্টাবিংশিকা ঘট্টা সর্ব্বভোগপ্রদায়িকা।"

এই অংশও মুদ্রিত আদর্শ পুস্তকে নাই।

(১) সমাসেনোপদর্শিতাঃ।

(২) যুজ্যতে।

(৩) চতুর্হস্তমুতানি চ।

(৫) "সা তুলা হ্যতিতুলা চ শিখরী বিষমেক্ষণা।
এবৈকহস্তবৃদ্ধ্যা তু টঙ্ক ইত্যভিধীয়তে।"

এই শ্লোকটী শব্দকল্পদ্রুম হইতে সংগৃহীত; মুদ্রিত আদর্শে নাই।

(†) আরভ্যাতয়বোড়শীম্।

(‡) হস্তদ্বয়াধিক্যাৎ।

(§) যোগঃপিণ্ডো।

(৭) প্রশস্তা।

সম হইলে সকলপ্রকার ধন-ঐশ্বর্য্যলাভ, আর বিষমে বিপদ্, সুতরাং যাহাতে, ঘটার অঙ্ক সংখ্যা (১) সম হয়, পণ্ডিতগণ তদনুসারে (পরিমাণ গ্রহণ) করিবেন। ইহা সকলের পক্ষে সাধারণ নিয়ম। কাষ্ঠনির্ম্মিত পূর্ব্বের মতই হইবে।

ইতি ঘটা প্রকরণ।

পীঠপ্রকরণ

পীঠ (পিঁড়ি) তিন প্রকার—কাষ্ঠ, পাষাণ এবং ধাতু-নির্ম্মিত। নানারূপ কাষ্ঠ, নানাবিধ প্রস্তর (২) এবং বহুপ্রকার ধাতুর মধ্যে যাহা উপযোগী (৩) তাহা কথিত হইতেছে।

পরিমাণ—দুইহাত দীর্ঘ, একহাত প্রস্থ এবং আধহাত উচ্চ পীঠকে সুখপীঠ কহে।

পর পর দুইহাত করিয়া বৃদ্ধি করিলে সুমুখ, ভদ্রক, শুভ্র, সিদ্ধিদ এবং সম্পদ এই পাঁচপ্রকার পীঠ হইয়া থাকে। ইহাদিগের ফল—ধন, ভোগ, সুখ, ঐশ্বর্য্য এবং বাঞ্ছাসিদ্ধি। (অন্য সবটী) সম হইলে (৪) দীর্ঘকাল সুখভোগ এবং বিষম হইলে দারুণ বিপদ্ হইয়া থাকে।

দৈর্ঘ্য ও বিস্তার দুইহাত এবং উচ্চতা আধহাত হইলে তাহাকে 'ভদ্রকপীঠ' বলে।

দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতা সকলই চারিহাত করিয়া হইলে তাহাকে 'শুভ্রপীঠ' বলে; ইহা সকল কার্য্যের সাধক। প্রাচীনগণ বলেন, এই আসনেই রাজার অভিষেক করিবে।

---

(১) ঘটার।

(২) শিলাদৈর্ঘ্য।

(৩) অনুযোগানুসারে।

(৪) সমে।

* "অর্দ্ধহস্তোচ্ছ্রয়ঃ পীঠো দ্বারকো দ্বার বিস্তৃতঃ।" এই শ্লোক শেষার্দ্ধ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ—

"দৈর্ঘ্যোদ্বিগুণবীপাদৈশ্চতুর্হস্তমিতো ভবেৎ।" এই অংশও পতিত হইয়াছিল।

নৃপতিদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য কেলিপীঠের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতা দুইহাত করিয়া করিবে।

সকলের সুখজনক অঙ্গপীঠের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতা আটহাত করিয়া হইবে।

রাজপীঠ ও অঙ্গপীঠ স্বর্ণদ্বারা এবং সুখপীঠ রৌপ্যদ্বারা নির্ম্মাণ করিবে; এই গুলি নৃপতিদিগেরই উপযুক্ত। অন্য পীঠগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত।

'রাজপীঠে' উপবেশন করিলে দীর্ঘায়ু (১) হয়; 'অঙ্গে' পৃথিবীজয়ী হয়, 'দ্বারকে' (২) শত্রুবিনাশ করিতে পারে এবং 'সুখে' সুখলাভ করে।

রৌপ্যনির্ম্মিত পীঠে যশ ও ধনবৃদ্ধি এবং তাম্রে পরাক্রম বৃদ্ধি ও শত্রুক্ষয় হয়। লৌহ উচ্চাটন-কর্ম্মে উপযোগী। সীস, রঙ্গ প্রভৃতিতেও শত্রুবিনাশ হইয়া থাকে।

শিলাপীঠ

ইন্দ্র ভিন্ন অন্যের রাজপীঠ নাই। সূর্য্যের পদ্মরাগ, চন্দ্রের চন্দ্রকান্ত, রাহুর গরুড়, শনির নীলমণি, বুধের (১) সোমেরুক, বৃহস্পতির স্ফটিক, শুক্রের বৈদূর্য্য এবং মঙ্গলের প্রবালনির্ম্মিত পীঠ আছে—এইরূপ পুরাণ-প্রসিদ্ধি।

যাহার যে দশার জন্ম, তাহার পীঠও সেই গ্রহের পীঠ যে শিলায় নির্ম্মিত সেই শিলাদ্বারাই নির্ম্মাণ করিবে।

স্ফটিকনির্ম্মিত পীঠ সকল রাজার পক্ষেই উপযোগী।

অভিষেক, অভিযান, উৎসব, জয় এবং যুদ্ধে অরুণাভ শিলানির্ম্মিত পীঠ ব্যবহার করিবে।

রাজা বর্ষাকালে মরকতনির্ম্মিত পীঠে (১) এবং শরতে বিশুদ্ধ রত্নময় পীঠে উপবেশন করিবে।

সাধারণ প্রস্তরনির্ম্মিত পীঠ নৃপতিদিগের বিলাসের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

এই গুলির পরিমাণ এবং গুণ প্রভৃতি ধাতুপীঠেরই মত।

---

(১) রাজপীঠে চিরায়ুঃ।

(২) দ্বারকো দ্বারবেদ্যন্তু।

(৩) সৌমেরুক।

(৪) গরুড়োদ্ভবায় ঘটিতে।

কাষ্ঠপীঠ

(ইহার পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত মত)

গম্ভারী-কাষ্ঠে—'আসন' সুখ-সম্পত্তির জন্য, 'আয়ুক' রোগনাশের জন্য, 'যশ' শত্রুবিনাশার্থ, 'সিদ্ধি' সর্ব্বসিদ্ধ কার্য্যসাধন ও শত্রু-ক্ষয়ের জন্য, 'গুণ' অভিষেকার্থ এবং 'সম্পৎ' শত্রু-নাশের জন্য ব্যবহার করিবে।

পলাশ কাষ্ঠের আয়ুক-পীঠ সুখ-সম্পত্তিপ্রদায়ক। পলাশের —'জয়' অভিষেকে, 'গুণ' শত্রুবিনাশে, 'সুখ' রোগবিনাশে, 'সিদ্ধি' বাঞ্ছিতার্থ-প্রদানে এবং 'সম্পৎ' উচ্চাটন-কর্ম্মে প্রশস্ত।

চন্দন-কাষ্ঠে:—'সুখপীঠ' রাজার অভিষেকে এবং 'জয়' রোগনাশে ব্যবহৃত হয়, 'গুণ' সুখ প্রদান করে, 'আয়ুক' গ্রহগণের সন্তোষবিধান করে। অন্য কাষ্ঠ গ্রহের তুষ্টি-বিধানে সমর্থ নহে।

এই পীঠগুলি যজ্ঞকাষ্ঠে নির্ম্মিত হইলে সাম্রাজ্য-ফলদায়ী হয়।

কালস্কন্ধ-কাষ্ঠের 'আয়কাসন' রাজার অভিষেকে ব্যবহার করিবে।

নাগবৃক্ষ প্রভৃতি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পীঠের ফল চন্দন-কাষ্ঠের মত।

বকুলকাষ্ঠের 'গুণপীঠে' রাজার অভিষেক করিবে। বকুলের—'জয়ে' রোগবিনাশ, 'সুখে' সম্পত্তি, 'সিদ্ধিতে' সিদ্ধিলাভ, 'সম্পদে' যুদ্ধজয় এবং 'আয়কে' বিনাশ হইয়া থাকে, ইহাই ভোজের মত।

এইরূপ যে সকল বৃক্ষ সুগন্ধি পুষ্পশালী এবং সারবান্; তাহাদিগের কাষ্ঠের নিয়ম—বকুল-কাষ্ঠের মত।

যে বৃক্ষ শুষ্ক, কোমল এবং লঘু তাহার কাষ্ঠের নিয়ম এবং গুণ গম্ভারী-কাষ্ঠের মত।

ফলবান্, সারবান্, এবং বজ্রস্পর্শ সারযুক্ত বৃক্ষের কাষ্ঠ পলাশ-কাষ্ঠের (১) নিয়মে ব্যবহৃত হইবে এবং তদ্রূপই ফলও হইবে।

(১) পলাশবৎ।

নিষেধ

ধাতুনির্ম্মিত পীঠের মধ্যে লৌহময় পীঠই নিষিদ্ধ। শিলানির্ম্মিত পীঠের বালুকাময় শিলার, বিশেষতঃ কন্তরময় শিলার পীঠ বর্জ্জন করিবে। কাষ্ঠপীঠের মধ্যে অসারক অতিরিক্ত সারবান্ কাষ্ঠের পীঠ ব্যবহার করিবে না।

আম, জাম এবং কদম্বের আসন বংশনাশকারী।

ভোজ বলিয়াছেন—গুরু পীঠ গৌরব বৃদ্ধি করে, এবং লঘু পীঠ হীনতা সম্পাদন করে।

পরাশর বলিয়াছেন—একেবারে গ্রন্থিশূন্য, বহুগ্রন্থিযুক্ত, গুণহীন বা অসমান-আকৃতি পীঠ করিবে না। পীঠ অতি বড় বা অতি ছোট করিলেও—তাহা সুখ-সমৃদ্ধির কারণ হয় না।

শিল্পিগণ পীঠের যত অন্য কোন প্রকার সুন্দর আসন করিলে তাহার গুণ, দোষ এবং পরিমাণও পীঠেরই অনুরূপ জানিবে।

এই সকল বিধান বিচার করিয়া যে বিকৃত পীঠ প্রস্তুত করে, লক্ষ্মী (১) কখনও তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন না।

অজ্ঞান বা লুব্ধবশতঃ যে অন্যরূপে পীঠ প্রস্তুত করে, তাহার লক্ষ্মী, আয়ু এবং বল নষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি পীঠ প্রকরণ।

খট্টার দোষ, গুণ, পরিমাণ প্রভৃতি যেমন উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপই করিবে, ফলও তদ্রূপই হইবে। এইরূপে নানাবিধ আসন করিবে। নৌকাসন (২) ব্যতীত সকল আসনই গুরুভার হইবে।

ইতি আসন যুক্তি।

ছত্রযুক্তি

'বিশেষ' এবং 'সামান্য'ভেদে ছত্র দুই প্রকার। রাজ-ছত্রই 'বিশেষ', তদ্ভিন্ন অন্য সকল ছত্র 'সামান্য'।

(১) লক্ষ্মীঃ বরং।

(২) নৌকাসনং।

বিশেষ ছত্র প্রকরণ

বিশেষ ছত্র দুই প্রকার 'সদণ্ড' এবং 'দণ্ডরহিত'। দণ্ড-যুক্ত ছত্র প্রসারণ এবং আকুঞ্চন করা যায়।

দণ্ড, কন্দ, শলাকা, রজ্জু, বস্ত্র এবং কীলক এই ছয়টীর সংযোগে ছত্র হইয়া থাকে। (এই গুলির পরিমাণ চারিযুগে চারি প্রকার।)

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারিযুগ অনুসারে, দণ্ড (যথাক্রমে) দশ, আট, ছয় এবং চারি হস্ত দীর্ঘ হইবে।

কন্দ, যথাক্রমে, ছয়, পাঁচ, চারি এবং তিন বিতস্তি (বিতস্তি=গাদশাঙ্গুল) পরিমিত হইবে। ছয়, পাঁচ, চারি এবং তিন হস্ত পরিমিত, শত, অশীতি, ষষ্টি (১) এবং চত্বারিংশৎ সংখ্যক শলাকা যথাক্রমে চারিযুগে আবশ্যক।

নয়টী তন্তুতে সূত্র হয়, নয়টী সূত্রে গুণ হয়, নয়টী গুণে পাশ হয়, এবং নয়টী পাশে একটী রজ্জু হইয়া থাকে। এই রজ্জুর নয়, আট, সাত এবং ছয় গাছি যথাক্রমে চারি যুগের ছত্রে আবশ্যক। বস্ত্র—শলাকার ত্রিগুণ এবং কলীক যথাক্রমে বারণ, দশ, নয় এবং আট অঙ্গুলি হইবে।

এই ছয়টী বস্তুর যে পরিমাণ উক্ত হইল, তাহা রাজার মঙ্গলের কারণ হয়।

যুবরাজের ছত্রের পরিমাণ রাজার ছত্র অপেক্ষা এক পাদ অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ কম হইবে এবং অন্যের ছত্র ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ হইবে।

উক্ত কাষ্ঠের দণ্ড ও কন্দ এবং বিশুদ্ধ বংশের শলাকা হইবে, রজ্জু ও বস্ত্র, রক্তবর্ণ হইবে, রাজার এই ছত্রের নাম 'প্রসাদ'। (প্রসাদ=প্রীতিজনক।)

যুবরাজের 'প্রতাপ' নামক সুবর্ণছত্রের দণ্ড ও বস্ত্র-নীল এবং ছত্রের মস্তকস্থিত কুম্ভটী সুবর্ণময় হইবে।

চন্দন কাষ্ঠের দণ্ড ও কন্দ এবং শুক্লবর্ণের রজ্জু ও বস্ত্র যুক্ত 'মনোহর' ছত্রের মস্তকে স্বর্ণকুম্ভ শোভিত থাকিবে।

দণ্ড, কন্দ ও শলাকা স্বর্ণময়, রজ্জু ও বস্ত্র শুক্লবর্ণ এবং মস্তকের উপর স্বর্ণকুম্ভ থাকিলে, তাহাকে 'কনকদণ্ড' ছত্র বলে। ইহা সকল অভীষ্ট সাধন করে।

(১) ষষ্টি।

দণ্ড, কন্দ, শলাকা ও কীলক স্বর্ণনির্ম্মিত হইবে এবং রজ্জু ও বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ হইবে। ছত্রটী কুম্ভ, হংস এবং চামর দ্বারা সজ্জিত করিবে। কুম্ভ ও হংস নবরত্ন দ্বারা শোভিত করিয়া তাহাতে বত্রিশ প্রকার মুক্তার বত্রিশ ছড়া মালা দিবে। সকলের উপরে ব্রহ্মজাতি বিশুদ্ধ হীরক দিয়া দণ্ডের অগ্রভাগ কুরুবিন্দ ও পদ্মরাগখচিত করিবে। চামরটী রাজার হস্ত-পরিমাণ ও শুক্লবর্ণ হইবে। সকল ছত্রের মধ্যে এই 'নবদণ্ড' নামক ছত্র শ্রেষ্ঠ। রাজার অভিষেক ও বিবাহকালে এই ছত্র ধারণ হইলে প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

রাজার অষ্টাঙ্গুলিপরিমিত একটী পতাকা এই 'নবদণ্ড' ছত্রের অগ্রভাগে স্থাপন করিলে, ইহাকে 'দিগ্বিজয়ী' ছত্র বলে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের 'নবদণ্ড' যথাক্রমে কলস, দর্পণ, চন্দ্র এবং পদ্মকোষ দ্বারা সজ্জিত করিবে।

ঋষি প্রভৃতির দশায় জাত ব্যক্তিদিগের 'নবদণ্ডে' যথাক্রমে হংস, চাসপক্ষী, শুক, ময়ূর, ব্যাঘ্র, সিংহ, গজ এবং ঘোটক অঙ্কিত করিবে।

জাঙ্গল, অনূপ এবং সাধারণ এই তিন প্রকারে দেশের অধিপতিদিগের 'নবদণ্ড' যথাক্রমে চামর, চাস-পক্ষ এবং বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করিবে।

বস্ত্র—শুক্ল, রক্ত, পীত এবং নীলবর্ণের হইতে পারে; শুক্লবর্ণ বস্ত্রই প্রশস্ত। পতাকা এবং রজ্জু ও এই চারি বর্ণেরই হইতে পারে। চামরের বর্ণও এইরূপই জানিবে।

মিশ্রিত নানাবর্ণ সকলেই সর্ব্বত্র ব্যবহার করিতে পারে।

ব্রাহ্মণের 'অক' বর্ণ, ক্ষত্রিয়ের 'চট' বর্ণ, বৈশ্যের 'তপ' বর্ণ এবং শূদ্রের 'খপ' বর্ণ প্রশস্ত।

বিবিধ মূর্ত্তিযুক্ত অন্য যেসকল ছত্র হইয়া থাকে, তাহা চিত্তবিনোদনের জন্য। ভোজ বলেন—অভিষেকে

* "অহং দিগ্বিজয়ী নাম ছত্ররাজো মহীভুজাম্।" এই শ্লোকার্দ্ধ মুদ্রিত আদর্শে নাই।

'নকুণ্ড', বিবাহে 'কনকদণ্ড' এবং যাত্রায় 'মনোহর' ছত্র প্রশস্ত।

যতিগণ, রাজা এবং চক্রবর্ত্তী ;—এই তিন প্রকার ব্যক্তি যথাক্রমে 'মনোহর', 'কনকদণ্ড' এবং 'নবদণ্ড' ছত্র (১) ব্যবহার করিবে।

আনূপ (জলময় দেশ) জাঙ্গল এবং সাধারণ এই তিন (২) দেশের অধিপতিও যথাক্রমে উক্ত তিন প্রকার ছত্র ব্যবহার করিবে।

রবিপ্রকৃতির দশায় জাত ব্যক্তিদিগের ছত্রের দণ্ড যথাক্রমে চম্পক, পনস, শাল, বিল্ব, চন্দন, বকুল, নিম্ব, এবং বজ্রধারণ এই আট প্রকার কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইবে। চন্দন-কাষ্ঠের দণ্ড সকলেই ব্যবহার করিতে পারে।

ইতি সদণ্ড ছত্রলক্ষণ।

নির্দ্দণ্ড ছত্রলক্ষণ

এই ছত্রের দণ্ড থাকে না—এবং ইহা আকুঞ্চন করা যায় না। মণি এবং বস্ত্রের নিয়ম সদণ্ড ছত্রেরই মত।

এই ছত্র 'মুখ্য' ও 'অবন্ত' ভেদে দ্বিবিধ। 'মুখ্য' দীর্ঘ এবং 'অবন্ত' বলয়াকৃতি হইবে।

'দীর্ঘ' ছত্রের পরিমাণ হইবে বার, দশ এবং নয় 'মুষ্টি' এবং 'বলয়ের' পরিমাণ হইবে বার, দশ ও নয় 'বিতস্তি'।

ভোজরাজ (৩) ইহাই বিশেষ ছত্রের লক্ষণ বলিয়াছেন। যে রাজা এইরূপে বিচার করিয়া ছত্র ব্যবহার করে, সে ধনসম্পত্তিশালী হইয়া দীর্ঘকাল রাজ্য পালন করে। যে ব্যক্তি অজ্ঞানপ্রযুক্ত বা দম্ভবশতঃ অন্যরূপে ছত্রপ্রস্তুত করে, তাহার অচিরেই ভয়, রোগ, বংশনাশ ও মৃত্যু হইয়া থাকে।

যে দুর্ব্বুদ্ধি রাজা যথাবিধি অনুষ্ঠিত ছত্র মস্তকে ধারণ করে, তাহার ঐশ্বর্য্য, বংশ এবং বলক্ষয় হইয়া থাকে।

ইতি বিশেষ ছত্র।

সামান্য ছত্র

সামান্য ছত্রও 'নির্দ্দণ্ড' ও 'সদণ্ড' ভেদে দ্বিবিধ।

দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে নবমুষ্টিপরিমিত ছত্রের নাম 'সর্ব্বতোভদ্র'; ইহা সকলের পক্ষেই উপযোগী।

নবমুষ্টি হইতে এক এক মুষ্টি বৃদ্ধি করিয়া বিংশতিমুষ্টি পরিমাণ পর্য্যন্ত দ্বাদশপ্রকার ছত্র যথাক্রমে মেষাদি দ্বাদশ লগ্নে জাত ব্যক্তির পক্ষে শুভ।

দৈর্ঘ্য ও বিস্তার দুইহস্ত (১) এবং দণ্ড দুইহস্ত হইলে তাহাকে 'দণ্ডছত্র' বলে। ইহা ব্যবহারে সকলেরই সুখ-সম্পত্তি হয় এবং ইহা সকল কার্য্যেই ব্যবহৃত হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে ছত্রের পরিমাণ এক এক বিতস্তি করিয়া বৃদ্ধি করিবে।

শলাকা, বস্ত্র ও দণ্ড প্রভৃতির বর্ণ পূর্ব্বের মতই জানিবে।

ভোজ বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি এইরূপে লঘুতা, দৈর্ঘ্য, দণ্ড, বস্ত্র, রজ্জু প্রভৃতির বিচার করিয়া ছত্র প্রস্তুত করে; সে ঐশ্বর্য্য, বিজয়, খ্যাতি ও প্রতাপ লাভ করে।

যে অজ্ঞান বা দম্ভবশতঃ অন্যরূপ ছত্র করে, ভোজ বলেন,—সে নিশ্চিত কষ্ট পায়।

ইতি ছত্রমুক্তি।

ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য।

---

(১) হস্তের।

(২) সাধারণ ইতি ক্ষিতা।

(১) ভোজকুতুকা।

(১) হস্তমানিকং।

মাসিক কাব্য-সমালোচনা

সম্মুক্তা পত্র, বৈশাখ—"ছিন্নপত্র" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের Tennysonএর Doraর ধরণের আর একটী গাথা। কবিতাটী বড়ই হৃদয়স্পর্শী শেষাংশটি অতি রমণীয়—

সেই বন্ধু আজ এত কালের অজ্ঞাতবাস টুটে—
কোন্ কথাটি পাঠায় তার পত্রপুটে ?
কোন্ বেদনা দিল তারে নিঠুর সংসার
মৃত্যু সেকি - ক্ষতি সেকি ? সেকি অত্যাচার ?
কেবল কি তার বালাসখার কাছে
জনম ব্যথার সান্ত্বনা তার আছে ?
ছিন্ন চিঠির বাকী—
বিশ্বমাঝে কোথায় আছে খুঁজে পাব নাকি ?
'মধুরে কি সেছে ভুলে ?'
এ প্রশ্ন কি অনন্তকাল রইবে ঝুলে
মোর জগতের চোখের পাতায়
একটী ফোঁটা চোখের জলের মত।
কত চিঠির জবাব লিখবো কত
এই কথাটির জবাব শুধু নিত্য বুকে জ্বলবে
বহ্নি-শিখা
অক্ষরেতে হবে না আর লিখা।"

কবিতার স্থলে স্থলে রসময় প্রকাশটি সুন্দর। কাজ ঐকাজের মুখীপাকের মধ্যে বসন্তের বার্ত্তার কথা—

"কতুর পরে আসত তবু
শুধু কেবল পঞ্জিকারি পাতে
আমার আঙ্গনাতে
আসত না তার রঙ্গিন পাতায়
ফুলের নিমন্ত্রণ।"

বিজয়া দশমীর দিন ঠাকুর ভাসানের রাস্তা নিয়ে দুই পরিবারে লাঠালাঠি বাধা বাধা-সখা-সখীর চিরবিচ্ছেদের কথা কবি প্রকাশ করিয়াছেন, অতি সুন্দরভাবে—

"হঠাৎ মোদের বন্ধ হলো
আকাশ যেন কালো মেঘে অন্ধ হলো
হঠাৎ এলো কোন রমণী
সঙ্গে নিয়ে তাহার গর্জ্জন
মোর প্রতিমায় হলো বিসর্জ্জন।"

ভারতবর্ষ, আষাঢ়—নূতন বর্ষের ভারতবর্ষ পত্রিকায় আমার কবিতা প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ভারতবর্ষ পত্র হইতে কবিতা একেবারে নির্ব্বাসিত হয়, ইহা কাহারো অভিপ্রেত হইতে পারে না—এবং একজন মহাকবির প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় কবিতার সমাদরই প্রত্যাশা করা যায়। ভারতবর্ষের সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহকগণ আমাদিগকে ভুল বুঝিয়া কতই না অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ভারতবর্ষের শত্রু নহি—আমরা ভারতবর্ষের অকৃত্রিম সুহৃৎ। ভারতবর্ষে যাহাতে কবিতা সুনির্ব্বাচিত হয় এবং ভাল ভাল কবিতাই প্রকাশিত হয়, সেজন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ, পরে অনুযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষ পত্রিকা কবির প্রতিষ্ঠিত হইয়াও কবিতাকে অত্যন্ত অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কবিতা এতই কৃপার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রবন্ধের পাদপীঠ ব্যতীত তাহার স্থলই হইত না। আমাদের পরম প্রেমের পত্রিকায় কবিতার এই অপমান দেখিয়া আমরা আঘাত না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

কবিতাতেই খাঁটী বাংলার অন্তরের সাড়া—সমগ্র দেশের হৃৎস্পন্দন অনুভূত হয়। বঙ্গমাতার অন্তরকাহিনী প্রত্যক্ষভাবে কবিগণের মত কেহই ধরিতে পারিতেছেন না—কেহই এমন প্রকাশ দান করিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা বাংলার কবিতাকে অবহেলা করিতেছেন; তাঁহারা বাংলার খাঁটী দেশীয় ভাবকেই অবহেলা করিতেছেন—একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। পদ্য-সাহিত্য বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরের সামগ্রী—আদিম—চিরন্তন—সহজ ও চিরসত্য।

অনেক সম্পাদক কবিতা নির্ব্বাচন ও প্রকাশ সম্বন্ধে অবহেলা প্রকাশ করিয়া কবিতার অনাদর ত করেনই, তাহা

ছাড়া মুখের কথায় ও লেখায় কবিতাকে ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়েন না। প্রবন্ধ ও গল্পে অনেক সময় কবিতাকে বিশেষতঃ বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যকে ব্যঙ্গ করা হয়—তাহা তাঁহারা ছাপেন। পাঠক-সাধারণ ঐ সকল পড়িয়া কবিতাকে আরো অনাদর করিতে শিখেন। গল্পলেখক হয় ত বলিবেন,—"আমরা উহা গল্পচ্ছলে লিখি—উহা গল্পের আখ্যান বস্তুর অঙ্গ—উহা কবিগণকে বিদ্রূপ করিবার জন্য লিখিত নহে।" নাট্যকার হয় ত বলিবেন—"আমরা সকল কবিকেই ব্যঙ্গ করি না—কবির মধ্যে কি ব্যঙ্গের পাত্র নাই? যে শ্রেণীর কবি ব্যঙ্গের পাত্র—সেই শ্রেণীর কবিকেই আমরা ব্যঙ্গ করিয়া থাকি। সুকবিগণের তাহাতে রাগ করিবার কারণ কি আছে?" কিন্তু যাঁহারা "খাস-দখল" নাট্যাভিনয় দেখিয়াছেন, যাঁহারা প্রভাত বাবুর "মূলধন সাহিত্যিক" পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমান কবিগণকে ঐরূপ ব্যঙ্গের পাত্র মনে করিতে শিখিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাংলার কবিগণের মধ্যে কাহাকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে; ইহা অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ কৌতূহলও প্রকাশ করিয়াছেন। শুনা গিয়াছে—কোনো কোনো কবিও নাকি মনে করিয়াছিলেন যে—ঐ গল্পে তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তার পর সমালোচকেরা ত কবিগণের মস্তকে খড়্গ ধরিয়াই আছেন।

সাহিত্য-সম্মিলন হইতে কবিগণ একরূপ নির্ব্বাসিত। সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহাদের কোনো কর্ত্তব্য আছে বলিয়া অনেকস্থলে বিবেচিত হয় না। মাসিক পত্র সম্পাদক ৫০ পাতার প্রবন্ধ ছাপেন—৫০ পাতার গল্প ছাপেন—৪ খানি পাতাও কবিতার জন্য ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত।

কবিগণের অনাদরের যতই উদ্যোগ আয়োজন হোক—একথা বর্ত্তমান ও সজ্ঞান ব্যক্তিকে স্বীকার করিতেই হইবে—কবিতা সাহিত্যের একটী অপরিহার্য্য শ্রেষ্ঠ শাখা—এবং এই শাখা যদি শুষ্ক হইয়া যায়—তাহা হইলে সকলের সর্ব্বচেষ্টাতে উৎসাহ ও সহানুভূতির সাহায্যে তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে।

কবিতাতেই দেশের প্রকৃত মুখপাত্র পাওয়া যায়—কবিতার সাহায্যেই জাতীয় জীবনের উন্নতি সম্ভব—কবিতার সাহায্যেই দেশের প্রাণ উদ্দীপিত হয়—কবিতার সাহায্যেই প্রকৃত লোকশিক্ষা সম্ভব। কবিতার দ্বারা দিয়াই নীতিকে সবল করা যায়—কবিতার দ্বারা দিয়াই স্বদেশভক্তির প্রকাশ—কবিতার দ্বারা দিয়াই দেশবাসীর অন্তরের সহিত হর্ষ ও বেদনার যোগ-সাধন।

অবশ্য স্বীকার করি—রাশি রাশি অপদার্থ কবিতার বইয়ের দোকান—বিবাহ-সভা ও মাসিক পত্র আফিস করিয়া উঠিতেছে—তাই বলিয়া কি কাব্য-সাহিত্যকেই অবহেলা করিতে হইবে? রাশি রাশি গল্প উপন্যাসেও ত বাজার ভরিয়া উঠিতেছে—রাশি রাশি ভ্রান্তিসঙ্কুল মনগড়া ইতিহাসও বাহির হইতেছে—রাশি রাশি নীরস ও নিষ্প্রেম প্রবন্ধও ত মাসিক পত্রগুলিকে অবথা ভারাক্রান্ত করিতেছে—তাহাতে ত তেমন আপত্তি দেখি না। সবই সহ্য হয়—কেবল কবিতাই সহ্য হয় না?

কবিরা রাশি রাশি অপদার্থ কবিতা লিখিতেছেন—এ কথা মানি—সম্পাদকগণ নির্ব্বাচন করিয়া লউন না কেন—নির্ব্বাচন করিলে ত কবিতার প্রতি সমাদরই করা হইবে—নির্ব্বাচন করিয়া ছাপেন না বলিয়াই ত বলিতেছি—তাঁহারা কবিতাকে অবহেলা করেন—তাঁহারা কবিতার প্রতি উদাসীন। কবিতা কম প্রকাশিত হোক—তাহাতে আপত্তি নাই—যাহাতে কবিতার অসমাদর হয় না—কিন্তু নির্ব্বিচারে কতকগুলি ছাপান যে কবিতার বড়ই অবমাননা। অনেক কবিতা প্রকাশযোগ্য হইলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। সেই সকল কবিতাকে নির্ব্বিচারে ছাপানও দোষের। একেবারে না ছাপাইয়া ফেলিয়া দেওয়াও দোষের। কবিতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে সম্পাদকের উচিত—সে সকল কবিতা কবির দ্বারাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া লওয়া—কবিকে দোষগুলি দেখাইয়া—তাহার দ্বারা দোষগুলি সংশোধন করিয়া লওয়া। সম্পাদকগণ কি কবিগণকে এ অনুগ্রহটুকু করেন?

এই সংখ্যার ভার বহে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের "সাগর মেয়ে"-নামক গল্পের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"আজকাল পাড়াগাঁ বর্ণনা করা কবিদের ভারি ফেসান হয়েছে কিনা! যত ছেলে, কলু, হাড়ী, মুচির

ঘরকন্নার কথা, পানাপুকুর পচাডোবা শেওড়াবনের বর্ণনা করিয়া আদায়ন খেয়ে আরম্ভ করে দিয়েছেন! কালেবাদাত কখনো পাড়াগাঁ দেখেনি—চিরকাল কলকাতাতেই বাস্থ, ঐ সব বর্ণনা করতে না পেরে অন্ত কবিদের কাছে সে হেরে যাচ্ছে। তাই তার খেদ রয়েছে পাড়াগাঁ দেখবে!"

উপরিলিখিত এই অংশে হয়ত প্রভাতবাবুর উদ্দেশ্য নহে পল্লীসৌন্দর্য্য বর্ণনাপ্রিয় কবিদের ব্যঙ্গ করা,—হয়ত তিনি গল্পের রস জমাইবার জন্যই লিখিয়াছেন।

প্রভাতবাবু একটী শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রের সম্পাদক,—বিদ্বান্, জ্ঞানী, গুণী, রসিক, রসজ্ঞ, রসশিল্পী, সাহিত্যরথী। তিনিও এই উপন্যাস-করণে যোগ দিয়াছেন বলিয়া এই উপলক্ষে দু'একটী কথা বলার প্রয়োজন। কিন্তু প্রভাতবাবু 'বিমলবাবু' যাহাই বলুন—পল্লীবর্ণনা একটী দোষ নহে—উহা কবিদের একটী প্রধান গুণ। খাঁটী বাংলাদেশ কলিকাতা নহে—ঢাকা—লাহোর—দিল্লী সহরও নহে। খাঁটী বাংলাদেশ ট্রামগাড়ী, ইলেকট্রিক পাখা, আলো, জলের কল, পার্ক, গড়ের মাঠ, লেডল'র দোকান ইত্যাদি লইয়া নহে—উহা ঐ "ছেলে কন্যু হাড়ী মুচির ঘরকন্না পানাপুকুর পচাডোবা শেওড়াবন" লইয়াই। বাংলার কবি খাঁটী বাংলাদেশের কথাই লিখিবেন তাই স্বাভাবিক। কবি যত সহরে না হন ততই ভাল। কবি যত আকাশে না উড়েন ততই সুখের। বাংলাদেশের আপরের সুখ-দুঃখের কথা লিখিয়া বাংলার কবির লেখনী 'ধন্য' হোক্। বাংলার কবি জন্মে জন্মে বাংলার ঘরকন্না আর পানাপুকুরের কথা বর্ণনা করিয়া আমাদিগকেও ধন্য করুন। পল্লী যতই ঘৃণ্য হোক্ উহা বঙ্গমাতার গৃহসংসার। বাংলার পল্লীর কথা কখনো পুরাতন হইবে না। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে বাংলার কবিদের "পাড়াগাঁ বর্ণনা করা আজি ফেসান হইয়াছে"। আজ বাংলার "কবি শুধু অতীত লইয়া ব্যস্ত নহে সে বাংলার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি মনোযোগী হইয়াছে! এই সঙ্গে একথাও বলিয়া রাখা ভাল যে প্রভাতবাবুর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকাতেও পল্লীকবিতারই সমাদর বেশী।

এবার ভারতবর্ষের ১ম পাতে কবি যতীন্দ্রমোহনের "ভারতবর্ষ"। এই কবিতার ছন্দসম্বন্ধে রাধালরাজবাবুর মন্তব্য প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি।

এই মন্তব্য রাধালরাজ বাবু পাঠাইয়াছেন— "আপনারা মাসিকবাবা সমালোচনায় আষাঢ়ের "ভারতবর্ষ"-এর প্রথম কবিতা যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চির "ভারতবর্ষ"-এর ছন্দসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন।

"ভারতবর্ষে" কবিতার ছন্দের মাত্রাসম্বন্ধে অধুনা বাঙ্গলায় প্রচলিত তিনপ্রকার নিয়মের কোন নিয়মই অবলম্বিত হয় নাই! সংস্কৃতের দীর্ঘসমাসবহুলপদ আছে কিন্তু সংস্কৃতের ন্যায় সর্ব্বত্র হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ রক্ষিত হয় নাই! ইহার ছন্দ সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী কিন্তু মাত্রা গণনায় বিন্যাসপদ্ধতির হরিপদ ছন্দের ন্যায় রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। অর্থাৎ হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ স্থলে প্রয়োজন অনুযায়ী। যথা—

জয়দেব—

ধীর সমীরে, যমুনা তীরে, বসতি বনে বনমালী — "

এখানে ৮+৮+১২ মাত্রা। এখানে দীর্ঘস্বর সর্ব্বত্র দীর্ঘ।

বিদ্যাপতি—

সায়র সুন্দর, এ ঘাটে আএল, তে মোরি লাগল আ খী

এখানেও ৮+৮+১২ মাত্রা। কিন্তু চিহ্নিতস্থান ব্যতীত অন্যত্র দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হয় নাই। পাঠকের এই মাত্রাজ্ঞান না থাকিলে ছন্দঃপতন অনিবার্য্য। "ভারতবর্ষ" পৃষ্ঠার ১ম পংক্তি—

গঙ্গা গোদাবরী, সিন্ধু সরস্বতী, তরলধারা বলিহারা

ইহাতে ৮+৮+১২ মাত্রা হয়। কিন্তু অন্যরূপেও এই মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদীর মাত্রাভাগ হইতে পারে। যথা—

গঙ্গা গোদাবরী, সিন্ধু সরস্বতী, তরলধারা বলিহারা।

ভক্ত রবীন্দ্রনাথ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কালিদাস রায়

বৈদ্যনাথ পুরাণরত্নাবলীর্ঘ প্রভৃতি অনেক কবি বর্ত্তমান যুগে সংস্কৃতের দুরূহ উচ্চারণ অনুযায়ী বহু কবিতা লিখিতেছেন কিন্তু কেহই এরূপ ইচ্ছানুযায়ী দুরূহ উচ্চারণের প্রথা অবলম্বন করেন নাই। এরূপ মিশ্রপ্রথা অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাই নির্ণয় করা পাঠকের পক্ষে দুষ্কর।

শ্রীরাখালরাজ রায়

যতীন্দ্রবাবুর অবলম্বিত ছন্দে প্রধানতঃ যুক্তাক্ষরের আগের স্বরকেই দীর্ঘ ধরা হইয়াছে এবং সুবিধামত ও প্রয়োজনমত কোন কোন গুরুস্বরকে লঘু ধরা হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের—

"যেথা যেথা বন্দিত কবি মন্ত্রিত তব ভেরী" অথবা—

"জনগনমন অধিনায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা" সঙ্গীতে খাঁটি সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে। এইটী সঙ্গীতে শুধু যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরই গুরু নহে গুরুস্বরকেও গুরু ধরা হইয়াছে।

কবি যতীন্দ্রমোহন ও সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার গুরুস্বরের উচ্চারণ সাধারণতঃ ঠিকমত করা হয় না বলিয়া গুরুস্বরকে লঘুই ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু একবিতায় কবি যতীন্দ্র মোহন কোনো কোনো স্বরকে আবার গুরুই ধরিয়াছেন। ২। ১টী পংক্তি পড়াও দুরূহ হইয়াছে যথা—

"ধাবিত মানব যুগে যুগান্তরে অন্তরে সঙ্কট শঙ্কা"

কবিতাটিতে শব্দের ঘনঘটায় ও প্রযুক্তিত সমস্ত পদের সৌরবে একটা গাম্ভীর্য্য ও Solemnityর সৃষ্টি হইয়াছে।

"তব চরণে নত মাথা" "শাশ্বত-জন-মন-ঘন" রবীন্দ্রনাথ হইতে গৃহীত ও পরিবর্ত্তিত। মাঝে মাঝে সংস্কৃতপদ-বহুল সমাসের মধ্যে বাংলা শব্দ-প্রবেশন সুষ্ঠু হয় নাই।

ভাষার গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ভাবের মাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকিলে কবিতাটি অতি সুন্দর হইত।

মল্লিক কবির 'হরিনাম' দ্বিতীয় কবিতা। কবিতাটীতে ভক্তিরস চল চল করিতেছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের 'তাজ' তৃতীয় কবিতা। অতি সুন্দর কবিতা।

হেথা মাঝে শ্মশানবিভূতি জ্যোৎস্না দেয় বালুরের সাথ
হে শোকের চারু কারু কাজ
পাষাণের জড়ত্বখানি ঘুচাইয়া যায় উষারাণী
ভাতি ভাতি সোণার সবিতা সন্ধ্যাবর্ণে গড়ে স্বর্ণলতা
প্রিয়ার প্রতিচ্ছবি রাখে প্রণয়ের দান
বুকে নিতে যায়ার সে হেম যায় মেলি তাকে দীর্ঘ প্রেম
হো হো মেরা জান—মেরা জান।
অঙ্ক প্রীতি গন্ধগন্ধ প্রতি শিলায়ায়
ধবলের স্বপ্ন তুমি তাজ
অরসিকে করিছ রসিক অপ্রেমিকে করিছ প্রেমিক
যমির ফিরিছে হয়ে খুশী সাধু হয়ে ফিরে এসে খুশী
কি মধুর কি বিধুর বধূর আহ্বান।
ছবি, না এ কবির স্বপন
নেশা—না এ কুবার ক্রন্দন?
হো হো মেরা জান—মেরা জান।

তাজ ভারতের অনুপম সৌন্দর্য্য নির্ঝর—কবিত্বের উৎস।—তাজ প্রণয় দেবতার দেউল—নারী মহিমার অর্ঘ্য। বঙ্গ-সাহিত্যে তাজমহলের প্রভাব খুব বেশী।

জগতের মধ্যে প্রিয়ার প্রণয়ের এমন মর্য্যাদা আর কোথাও নাই। যথা সে প্রেম—

"সে প্রেম অমর করে ধরার ধূলায়
সে প্রেমের রূপ অপরূপ
সে প্রেম দেউল রচি আকাশ ছোঁয়ায়
জ্বালে তার চির পূজা-ধূপ
সম্রাট! সেই প্রেম প্রাণে তব ভায়
মরলোকে অমৃত স্ব-রূপ।
সে প্রেমের তাজ পেয়ে শিলা মর্ম্মর
মর্ম্মের ভাষা কয় আজ
কাহিনী পাপড়ি মেলে হয় প্রস্তর
হয় শিলা ফুলময় তাজ
চামেলি মালতী যুথীময় সুন্দর
বুকে বিরাজে ধ্রুব তাজ।"

পঙ্কজ।

একটী দিনের মেলা

বসিয়াছে নদীর বেঁকে
একটী দিনের মেলা,
উৎসব সব ফুরিয়ে যাবে
না ফুরাতে বেলা।
বেচা কেনা লেনা দেনা
চুকিয়ে যাবে সব
নীরবতায় নিভে যাবে
মেলার কলরব।
রাঙা কাগজ, ভাঙা চুড়ি
টুকরো কাঁচের ছবি
পট্‌কা পোড়া, রইবে পড়ে
দেখবে সাঁজের রবি।
এ যেনরে অভাগিনী
বালিকারি বিয়ে
মুখ না দেখে সুখ পলালো
সিঁথার সিঁদুর নিয়ে।
একটী রাতের কালীপূজা,
চতুর্দ্দশীর আলো—
ক্ষণেক তরে আদর করে
আঁধার রেখে গেল।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পল্লীসেবার ব্যবস্থাপত্র

দেশের গ্রামগুলির অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। গ্রামবাসিরা রোগে ও অন্নকষ্টে ক্রমশঃ শীর্ণ ও হীনবল হইয়া পড়িতেছে। কৃষির অবনতি হইয়াছে, শিল্পসমূহও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এমন কি গ্রামবাসিগণের ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধেও অবনতি দেখা যাইতেছে।

পল্লীগ্রামের এইরূপ অবনতির জন্য আমরা ক্রমশঃ দীনহীন হইয়া পড়িতেছি।

বাস্তবিক পল্লীজীবনের উন্নতিসাধন আমাদের জাতীয়-উন্নতির একমাত্র উপায়।

এইরূপ উন্নতির জন্য সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক। দরিদ্র ও দুর্ব্বল কৃষক, শিল্পী ও শ্রমজীবী একত্র হইয়া কাজ না করিলে সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।

আমাদের দেশের পল্লীবাসিগণের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সহানুভূতির অভাব নাই। সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার প্রণালীও দেখা যায়। যাহাতে কার্য্য করিবার এই প্রণালী পল্লী-সমাজের সকল অনুষ্ঠানেই সম্যক্ ও সুচারুরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উপযুক্ত উপায় বিধান করিতে হইবে। এই মূল সূত্র মনে রাখিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

(ক) কৃষিবিষয়ক

একে একে স্বতন্ত্রভাবে মহাজনের নিকট অধিক সুদে কর্জ্জ না লইয়া গ্রামের সকল কৃষক মিলিত হইবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্জ্জের দায়িত্ব লইয়া যৌথ-ঋণদান-মণ্ডলী গঠন করিতে হইবে, এই উপায়ে তাহারা অল্প সুদেই মহাজনের নিকট কর্জ্জ পাইবে; সকল কৃষকগণের অর্থ-সাহায্যে পাইকারী দরে শস্যের বীজ, সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা, এবং গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতিসাধন, চিকিৎসা ও দুগ্ধ সরবরাহ বৎস-সম্পাদনের উপায় বিধান করিতে হইবে; সাধারণ গোশালা স্থাপন করিয়া গোপগণকে সমভাবে বৈজ্ঞানিক-উপায়ে দুগ্ধের বিশুদ্ধিরক্ষা এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতে হইবে।

(খ) শিল্পবিষয়ক

শিল্পিগণ, ব্যক্তিগতভাবে পাইকারদিগের নিকট দাদন না লইয়া মিলিত হইয়া সমিতি গঠন-করিবে,এবং পরস্পরের কর্জ্জের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অল্প সুদে মহাজনের নিকট কর্জ্জ লইবার ব্যবস্থা করিবে; পরস্পরের অর্থ সহায়তায় তাহারা অধিক মূল্যের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও দ্রব্যপ্রস্তুত-করণের উপকরণ সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

(গ) বাণিজ্যবিষয়ক

কৃষকগণ ব্যক্তিগতভাবে দালাল ও পাইকারগণের নিকট শস্যাদি বিক্রয় করিয়া আপনাদের ন্যায্য লাভ হইতে প্রায়ই বঞ্চিত হয়, ইহার প্রতিকারস্বরূপ সকলে মিলিয়া পাইকারী দরে সমবেত প্রণালীতে শস্যবিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; শস্যের অবাধ রপ্তানি সংযত করিতে হইবে; খাদ্য-শস্যের বিনিময়ে বাণিজ্যোপযোগী শস্যের আবাদ হ্রাস করিতে হইবে; সাধারণ শস্য গোলাস্থাপন করিয়া শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; সাধারণ ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া পল্লীবাসিগণের নিত্য আবশ্যক দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে সুবিধাদরে ক্রয় করিয়া আনিয়া লাভ না করিয়া পাইকারী-দরেই পল্লীগ্রামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; পল্লীগ্রাম-জাত শিল্পদ্রব্যাদি ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কগণ কর্তৃক বিদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাবৎকাল বিক্রয় না হয়, তাবৎকাল শিল্পিগণকে আহার্য্য ও যন্ত্র কর্জ্জ দিতে হইবে; মেলা ও হাটে গ্রাম্য কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার-বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) শিক্ষাবিষয়ক

গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ব্যবহারিক বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে ; প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে আপনার দৈনিক হিসাব লিখিতে এবং সংবাদপত্র পাঠ করিতে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য্য-প্রণালীসম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে ; কারখানার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কার্য্যপ্রণালী প্রচার করিতে হইবে। ব্যয়সাপেক্ষ কৃষিযন্ত্র, সার ইত্যাদি অথবা শিল্পকার্য্যের যন্ত্রপাতী এবং উপকরণ-দ্রব্যসামগ্রী সমবেতভাবে ক্রয় করিবার সুযোগ বিধান করিতে হইবে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি লোকশিক্ষার অমূল্য গ্রন্থগুলির চিত্রশোভিত, সুখপাঠ্য আধুনিক সংস্করণ সমূহ বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে ; স্থানে স্থানে পাঠাগার-স্থাপন করিয়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রদ পুস্তক রাখিয়া জনসমাজে ঐ গুলির প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিকে আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে ; পল্লীগ্রামে কবীর, ভিক্ষুক এবং বৈরাগীর গান ও ছড়াগুলি যাহাতে নূতন সমাজ এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের উপযোগী হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঙ) স্বাস্থ্যবিষয়ক

পল্লীবাসিগণের সমবেত উদ্যোগ ও উদ্যমে গ্রামের বনজঙ্গল পরিষ্কার; নদী, খাল, পুষ্করিণী ইত্যাদির সংস্কার-সাধন, পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী, কূপাদিখনন ও সেইগুলির বিশুদ্ধতারক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; ম্যালেরিয়া, কলেরা বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধিসমূহের সময়ে রোগিচর্য্যা এবং রোগ-প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; দেশের গাছগাছড়া ইত্যাদির গুণাভিজ্ঞ বৈদ্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া সহজ এবং সুলভ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে; পল্লীগ্রামবাসিগণের শ্রমময় জীবনকে যথকিঞ্চিৎ সুখী করিবার জন্য পল্লীক্রীড়া, আমোদ, ব্যায়াম প্রভৃতির উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

এই সমস্ত আয়োজন যাহাতে সমগ্র দেশে বিপুল বিস্তৃত হইয়া, আমাদের জাতীয় অবনতি প্রতিরোধ করিতে পারে, তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায়, একনিষ্ঠ কল্যাণকর্ম্মী পল্লীসেবকের প্রয়োজন। পল্লীসেবকগণের ভাবুকতা, উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের উপরেই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এই পল্লী-সেবকগণের কল্যাণকর্ম্মে সুবিধা ও সুযোগ বিধানের জন্য দেশের শিক্ষিত ধনী, এবং জমিদারবর্গকে মুক্তহস্ত ও সদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

সম্পাদক

উপাসনা

১৪ বর্ষ। } ভাদ্র—১৩২৫ { ৩য় সংখ্যা।

আলোচনী

ছন্দঃ সরস্বতী

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত জীবনধর্ম্ম সম্বন্ধে দেশে নানারূপ আলোচনা হওয়ায় সবুজপত্রে কবি "আমার ধর্ম্ম" লিখিয়া তাঁহার নিজের প্রকৃত ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকে ভারতীয় শিল্পকলার সৌন্দর্য্য বোধ করিতে পারিতেছেন না জানিয়া শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ প্রবাসী পত্রিকায় দুই সংখ্যায় এবিষয়ে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আমরা ভারতীয় কাব্যের সহিত ভারতীয় শিল্পের সম্বন্ধের সার্থকতা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ যে সকল ছন্দ অবলম্বন করিয়াছেন ও প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহা অনেকের পক্ষে দুষ্পাঠ্য ও দুষ্পাচ্য। তিনি এই প্রবন্ধে ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এপ্রবন্ধ পাঠে আশা করি অনেকেই তাঁহার ছন্দের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাঙ্গালার ছন্দোবিজ্ঞান ছন্দের নানারূপ নানাভঙ্গি এবং ক্রমবিকাশ তিনি এই প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে তিনি ছন্দের নূতন নূতন রূপ ও ভঙ্গি দান করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা বা বিদ্রোহে কিছু করেন নাই—আমাদেরই পুরাতন ছন্দকে নবীকৃত করিয়াছেন—আমাদেরই ঘরাও ছন্দকে সাহিত্যের আসরে আনিয়াছেন—আমাদেরই গ্রাম্য ছন্দকে মার্জ্জিত করিয়াছেন—কবিতাকে তিনি সঙ্গীতের যাদুর্ব্যে মধুরতর করিয়াছেন—মন্থরকে দ্রুত ও চঞ্চল করিয়াছেন—একসুরোকে নানা সুরে ধ্বনিত করিয়াছেন—এক ঘেয়েকে সরস করিয়াছেন। সংস্কৃত ও ইংরাজীতে যে Rhythm আছে বাংলার প্রাচীন কাব্যে তাহা নাই—তাহাকেই বাংলা

ছন্দে আনিয়াছেন। এক কথায় নৃত্যগীতবাদ্য ও কবিতা এই চারিটী কলাকেই একাধারে ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথম প্রকাশ—আদ্যাত্মী মূর্ত্তি—মকরাক্ষী ভিন্নবাহন পাদ্মিনী ভাবণপদ্ধতি।

প্রথম পদ্ধতির আলোচনাকালে কবি মা সরস্বতীর মূর্ত্তি দিয়া বলাইয়াছেন—

"ভালো নাহি লাগে আর দশ অক্ষরণ
মকরাক্ষী ভিন্না চড়ি পাদ্মিনী তরণ।"

মুরারী ওরায় নাতির অবলম্বিত পয়ার বা শিশুবোধকের সমান্তোক্তের ত্রিপদী এবং পয়ার ত্রিপদীর মিশ্রণে নানা প্রকার সঙ্কর ছন্দ ক্রমে কবির আশ্রিত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকাশ—হস্তাত্মী-মূর্ত্তি—মধুমরাল-বাহন—গঙ্গাযমুনা-পদ্ধতি—এই পদ্ধতির ব্যাখ্যায় কবি বলিয়াছেন—"এই আমার মধুমরাল, এর কণ্ঠে কলধ্বনি, চরণে নৃত্য—গতিতে বৈচিত্র্য অথচ সুষমা। এতদিন বাঙ্গালী ছন্দোবিদ্যায় প্রায় উড়ে আর আসামীর সামিল ছিল," পয়ারে উড়ে ও আসামীরা সকল অকারান্ত শব্দের শেষেই হসন্ত বর্জ্জন করিয়া উচ্চারণ করে—তাহাদের ছন্দেও তাহাই থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙালীরা তাহা করে না—তবে ছন্দে তাহারা হসন্তকে বর্জ্জন করিবে কেন? "চলো চলো কাঁচা অন্ধেরারো লাবণি" এইরূপ উচ্চারণ ছন্দে চলিয়া আসিতেছিল। "মহাভারতেরো কথা অমৃত সমান, কাশীরামো দাসো কহে শুনে পুণ্যবান্।" এইরূপ উচ্চারণ করিতে প্রায়ই শুনা গিয়াছে। পয়ারে ও পয়ার জাতীয় ছন্দে ঐ প্রকার উচ্চারণের দিকে একটা প্রবলতার সৃষ্টি করে। উহা monotonous, উহাতে Rhythm নাই—বৈচিত্র্য নাই—উহাতে জোর নাই—তেজ নাই—বেগ নাই; উহা চিরকাল চলিতে পারে না ইহাই কবির বক্তব্য।

ষষ্ঠ তোলার সের, আশী তোলার সের আর একশত তোলার সের সব এক ওজনের হইতে পারে না। যুক্তাক্ষর, বরান্ত অক্ষর ও হসন্ত অক্ষর সব এক ওজনের হইতে পারে না। "কাজ সোজা করিবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী করিবার নিয়ম আছে। সাধুবাংলার ছন্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।" পয়ারাদিতে সকলেরই সমান মাপ। দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরেরও এক ওজন হইতে পারে না। বাংলার ঐকার ও ঔকার ব্যতীত অন্যান্য স্বরের মধ্যে কোন পৃথক ওজন মাত্রা নাই কিন্তু হসন্ত স্বরান্ত ও যুক্তাক্ষরের মধ্যে রীতিমত উচ্চারণের ওজনভেদ রক্ষা করা উচিত।

প্রাচীন ত্রিপদী ছন্দে এই ওজনের পার্থক্য রক্ষিত হইত না। লঘু ত্রিপদীতে ৬+৬+৮ অক্ষর হইলেই হইত—তাহা পড়িতে রীতিমত অসুবিধা ও অস্বস্তি বোধ হয়। যথা—

"কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটীশশী পরকাশ
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরোগণের বাস।"

এতে যুক্তাক্ষর গুলির দীর্ঘত্বের ওজন অস্বাভাবিক রকম কমাইয়া এবং বরান্ত অন্যান্য অক্ষরের ওজন একটু বাড়াইয়া তবে কোনো রূপে মিল খাওয়াইয়া পড়িতে হয়।

কবি হেমচন্দ্র ঐ ছন্দকে কতকটা মার্জ্জিত ও শ্রুতিপ্রদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা—

সন্ধ্যাগগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি
ভীতমনা পৃথিবী মেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি,
দুষ্ট করতালি করন্ধ তালিছে
ডাকিনী চলিছে তালে
বিশ্ববিটপে ব্রহ্মপিশাচ
হাসিছে বাজায়ে গালে।

কবিবর 'সন্ধ্যা' 'বিশ্ব' ও 'ব্রহ্ম' শব্দ গুলিতে দুই মাত্রার স্থলে তিন মাত্রাই ধরিয়াছেন কিন্তু "অরণ্যে" ও 'করন্ধে' সেই নিয়মানুসারে ৩ মাত্রা ও "অন্ধকারে ৪ মাত্রা ধরেন নাই। আবার ভীত শব্দের ঐকারের জন্য তিন মাত্রা ধরিয়াছেন। বাংলা ভাষার দীর্ঘস্বরের ও হ্রস্বস্বরের প্রভেদ উচ্চারণে বুঝা যায় না—সেজন্য উহার মাত্রা বৈষম্য না

রাখিলেও চলে কেবল ঐ নাসিক্য ঔকার—"হচ্ছে স্বর সঙ্গম অর্থাৎ একজোড়া ভিন্ন জাতের স্বরবর্ণে তৈরী ইংরাজীতে যাহাকে বলে Diphthong" এই দুটী স্বরকে দুমাত্রা বলিলেই সোল চুকিয়া যায়। "ঐ"কে পূর্ব্বে সুবিধামত দুই বা এক মাত্রা ধরা হইত একমাত্রা ধরিলে উচ্চারণ করা হইত 'ও'। অনুস্বার ও বিসর্গ যাহার সহিত যুক্ত থাকিবে তাহা দুই মাত্রাতে পরিণত হইবে। উচ্চারণের ওজনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রবীন্দ্রনাথের হাতে ঐ লঘুত্রিপদী নিম্নলিখিতরূপে দাঁড়াইল—

পৌষ প্রখর শীতে জর্জ্জর
ঝিল্লিমুখর রাতি—
নিদ্রিত পুরী নির্জ্জন ঘর
নির্বাণ দীপবাতি।—

ঔকারকে দুই মাত্রা ধরা হইয়াছে—ঐকারকে ধরা হয় নাই—ধরার প্রয়োজনও নাই। যুক্তাক্ষর গুলিকে দুইমাত্রা ধরা হইয়াছে। ইহাতে Rhythm আছে—বেগ আছে তেজ আছে—তরঙ্গ আছে—ইহা যেন জীবন্ত। "গাঙ্গিনী তরণের মকরাক্ষী ভঙ্গী" লোপায় তরীতে পরিণত হইল। ঐ ছন্দের অনুরূপ কিন্তু ৬ মাত্রার স্থলে ৫ মাত্রা—

ফলল ধানে উর্ব্বি টুটে
ফলল রাশি চূর্ণি উঠে
শান্ত বায়ু প্রান্তনীর চুমি যায় কম্বু।

এই ত্রৈমাত্রিক শব্দ পদ বহুল ত্রিপদীতে এক দুই তিন চারি পাঁচ মাত্রা বাড়াইয়াও ২।৪।৬।৮ মাত্রাকথাইয়া কবিগুরু কত যে বিচিত্র ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দুই চারিটীর উদাহরণ এখানে দেওয়া যাইতে পারে—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল সিঞ্চিতক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
নিখিল চিত্ত হরষা"

"কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া
এসেছি ভুলে
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে।"

"নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের
বাহিরে।"

"জননীর দ্বারে আজি ওই
শুনগো শঙ্খ বাজে।
খেকনা খেকনা ওরেভাই
মগন মিথ্যা কাজে।"

"আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে ওগো
ঝিম্ ঝিমস্ত চাকি'
আজিকে আমরা কাঁদাই শুধাই সঘনে ওগো
আমরা খাঁচার পাখী।"
হৃদয় বন্ধু শুনগো বন্ধু মোর
আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর
চির দিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া?
চির দিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া!
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকী?
তোরা পানে চাই কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখী।"
ইত্যাদি ইত্যাদি—

তৃতীয় প্রকার—অক্ষরবৃত্ত বাহন—বর্ণাক্ষরের পঙ্‌ক্তি চিত্রশ্রীমূর্ত্তি। এই পঙ্‌ক্তিতে যে ছন্দের কথা বলিয়াছেন তাহা অক্ষর গণনা হিসাবে নয়ই—মাত্রাবৃত্ত বাহিনীর গঙ্গাযমুনা পঙ্‌ক্তি অনুসারেও নহে। শব্দ পাপড়ি বা Syllable এর হিসাবে।

"এ ছন্দে হসন্ত বা ওকারটা অক্ষর ছাটাই ক'রে বলি স্বরান্ত বা গোটাঅক্ষর গণতে হয়।" এক একটী পংক্তিতে ৪টী করিয়া পর্ব্ব। প্রথম তিন পর্ব্বের শব্দ পাপড়ি ৪টী করিয়া শেষের পর্ব্বে ১টী কিংবা ২টী যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ১ ৪
ভো বাদ্ আ বাদ্। আব্ ধা রে তে। এক্ টী ধ বে।

১ ২
ন দী।

"হসন্তটী নতুন অথচ চিরপরিচিত—বাড়ীর মেয়েকে পুজো-বাড়ীতে দেখার মত" বা ছেলে ভোলানো গানে, মেয়েলি ছড়ায়, ব্রতকথায়, বা' সাপের ওঝা, ভূতের ওঝা, ডাইনের ওঝার ঝোলচালে—বা বাড়ী বদ্ধ, পরীর বদ্ধ জলপড়া, তেলপড়া, সরষেপড়ার ঘরে—এক কথায় বাংলার অথর্ব্ব-বেদে যা আত্মপ্রকাশ করেছে—অন্য দিকে যা পাঁচালী ওর্জ্জার, যা ঝুমুরে কবিতে, যা ভেটেলের সুরে, বাউলের গানে, বৈরাগী ফকীরের সাধন সঙ্গীতে, বা' রামপ্রসাদের গানে, এক কথায় বাংলার গীতিকাব্যে বাঙালার সামবেদে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তা একদিন বাংলার সত্যিকার ঋগ্বেদে অর্থাৎ কাব্যসাহিত্যেও সুব্যক্ত ছিল—সাক্ষী গোবিন্দচন্দ্রের গান—সাক্ষী প্রাচীন কৃত্তিবাস—সাক্ষী শূন্য পুরাণ ইত্যাদি।"

পয়ারের মাত্রা ও এই ছন্দের মাত্রাসংখ্যা একই ৮+৬। প্রাচীন পয়ারে বাঁধাবাঁধি অক্ষর গণতি নিয়ম ছিল না। শব্দ পয়ার বা syllable ধরিয়া মাত্রা ধরা হইত। হসন্ত ব্যঞ্জন বা স্বরকে পূর্ব্বাক্ষরের সহিত একত্র যোগ করিয়া একমাত্র ধরা হইত। যথা শূন্য পুরাণের—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
হু ধা ধই তে আই লেক্ কুর ম

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
কু ধা ভোজার ধ র।

ধানিকচন্দ্রের গান—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধ ধন আস্ বে ধন্ তা কু য়া

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
সৈ অ দা ন ব্ হ এ।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
তৈল পাটে বু ধাড়া দি এ।

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
কে লা বু কা টি এ।

এই syllableএর হিসাব অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন যুগের পয়ারে বর্জ্জিত হইয়াছিল—হসন্তব্যঞ্জনকেও তখন অনেক সময় এক মাত্রা ধরা হইত। অথচ যুক্তাক্ষরের মধ্যেও যে হসন্ত রহিয়াছে তাহাকে এক মাত্রা ধরা হইত না। কোন রূপ ওজনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া শুধু অক্ষর গুণিয়াই পয়ার ত্রিপদী লেখা হইত। হসন্তব্যঞ্জন কিন্তু পয়ারের অন্যান্য অক্ষরের সঙ্গে একভাবে উচ্চারিত হইতে নারাজ—উহার ওজন আধা—উহা পয়ারের মধ্যে যখন গোলযোগ উপস্থিত করিতে লাগিল, সেজন্য অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন পয়ারের হসন্তকে বর্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি জন্মিল। ফলে খাঁটী বাংলার প্রকৃত শব্দ যাহা হসন্তবহুল তাহা ক্রমে পয়ার হইতে নির্ব্বাসন লাভ করায় ক্রমে শুধু-বাংলারই ছন্দ হইয়া পড়িল। যে সকল পয়ারে হসন্তবহুল বাংলা শব্দ থাকিয়া গেল তাহা পড়িবার সময় হসন্তব্যঞ্জনকে স্বরান্ত করিয়া পড়িবার দিকে ঝোঁক হইল—নতুবা ১৪ মাত্রার ওজন ঠিক থাকে না। একটী যুক্তাক্ষরের ওজন একটী অযুক্ত অক্ষরের ওজনের দ্বিগুণ—একটী হসন্তব্যঞ্জন বা স্বরের* ওজন তাহার অর্দ্ধেক—অথচ তাহাদিগকে সমান ধরের মাত্রা ধরিয়া ১৪ মাত্রার পয়ার লিখিত হইত। সেইজন্য গুরু ওজনের মাত্রাকে একটু কমাইয়া এবং লঘু ওজনের মাত্রাকে একটু বাড়াইয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পড়িতে হয়—

গোত্রের প্রধান পিতা মুখ বংশজাত
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।

এই পংক্তিকে পড়িতে হইলে 'মুখ'কে 'মুখো' করিতেই হইবে—'গোত্রের,' 'প্রধান,' 'পরম,' 'কুলীন,' এই চারি শব্দকেও অকারান্ত করিয়া পড়িলে তবে পংক্তি দুটীর শেষাংশের সহিত ওজনের মিল হয়।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রবর্ত্তী কবিগণ অক্ষর গণতি পয়ার ত্রিপদীতেই লিখিয়া গিয়াছেন। এবং যতদূর সম্ভব তাঁহারা প্রাকৃত বাংলার শব্দ পরিহার করিয়া হসন্তের দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। সেজন্য বাংলার

* হসন্ত স্বর যেমন "খউ" "হইতে" "শেওড়া" ইত্যাদি শব্দে। অকারান্ত স্বর যেমন 'ছেউল' 'বাওরে' ইত্যাদি।

অনেক ঘরের কথাই তাঁহাদের লেখা হয় নাই। ছন্দের আভিজাত্য রক্ষার জন্য তাঁহারা ভারতের পুরাণ ইতিহাস হইতে আখ্যান বস্তু—উপকরণ ও উপাদান আহরণ করিয়াছেন। যখন-সেখানে কখনো বাংলার ঘরের কথা লিখিতে বাসনা হইয়াছে তখন বাংলার ছন্দ অবলম্বন করিয়াছেন। ৺ ঈশ্বর গুপ্ত, ৺রাজকৃষ্ণ রায় ও ৺ হেমচন্দ্রের মধ্যে ছড়ার ছন্দ দেখা যায়। ৺ ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে বাংলার গার্হস্থ্য ভাব বর্তমান থাকিলেও সর্বত্র বাংলার খাঁটী প্রাকৃত ছন্দে সে ভাব প্রকাশ না করার জন্য তাঁহার অনেক কবিতাই এখন-তখন দশায় পৌঁছিয়াছে, বাংলার ছড়ার ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ আবার নবভাবে ফিরাইয়া আনিয়াছেন এবং তাহা হইতে নানা প্রকার সঙ্গীত ছন্দো-ভঙ্গির সৃষ্টি করিয়াছেন, এখন খাঁটী বাংলার প্রাণের কথা বাংলার ছড়ার ছন্দেই আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে কবিবর রবীন্দ্রনাথের গত চৈত্রের সবুজ-পত্রের 'ছন্দ' প্রবন্ধ হইতে কয়েকটী উদ্ধরণ করিতেছি। "প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সমতল নহে সংস্কৃতের নিয়মে না হৌক্ নিজের নিয়মে তার একটা ঢেউ খেলা আছে। তার কথার অংশ সমান ওজনের নহে। বস্তুতঃ পদে পদেই তার শব্দ বহুর বদলিয়া উঠে। তার কারণ প্রাকৃত বাংলায় হসন্তের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। এই হসন্তের দ্বারা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে যে সংঘাত জন্মাতে থাকে সেই সংঘাতে ধ্বনি গুরু হয়ে উঠে। প্রাকৃত বাংলায় এই গুরু ধ্বনির প্রতি যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তা হলে ছন্দের সম্পদ বেড়ে যায়।

প্রাকৃত বাংলার দৃষ্টান্ত :—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এলো বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান।"

এই ছড়াটীতে ২টী জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। এক হচ্ছে বিসর্গের ঘটকালীতে ব্যঞ্জনের সহিত ব্যঞ্জনের সম্মিলন, আর এক হচ্ছে 'বৃষ্টি' এবং কন্যে কথায় যুক্তবর্ণকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া। এই ছড়া সাধু-বাংলায় ছন্দে বাঁধিলে পা'লশ করা আবলুশ কাঠের মত পিছল হইয়া উঠে।

বারি ঝরে ঝর ঝর নদীয়ায় বান
শিবঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান
এক মেয়ে রাঁধেছেন এক মেয়ে খান
এক মেয়ে ক্ষুণ্ণমনে পিতৃঘরে যান।

এতে যুক্তবর্ণের সংযোগ হলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না। যথা :—

মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে নবদ্বীপে বান
শিবঠাকুরের বিয়ে তিন কন্যা দান
এক কন্যা রান্ধিছেন এক কন্যা খান
এক কন্যা উর্দ্ধশ্বাসে পিতৃগেহে যান।

এই সব যুক্তবর্ণের যোগে এ ছন্দ বহুর হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তরঙ্গিত হয় নাই, কেন না যুক্তবর্ণ যথেচ্ছা ছড়ান হয়েছে মাত্র তাদের মর্যাদা অনুসারে জায়গা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ ঘাটের মধ্যে ছোটর বড়র যেমন গায়ে গায়ে ভিড় করে তেমনি। সভার মধ্যে যেমন তারা যথাযোগ্য আসন পায় তেমন নয়।"

পুনশ্চ—

"আমরা একটা কথা ভুলে যাই, প্রাকৃত বাংলার সম্পত্তি সেটুকুর সংস্কৃত, পারসী, ইংরেজী প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ লক্ষ হচ্ছে—সেইজন্য শব্দের মৈত্র প্রাকৃত বাংলায় স্বভাবগত বলে মনে করা উচিত নয়।

প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃত ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানী করতে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজনবশতঃ সংস্কৃত শব্দই সঙ্গত সেখানে প্রাকৃত বাংলায় বাধা নাই আবার ফারসী কথাও তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এক সারে বসাইয়া দিতে পারি। শুধু বাংলায় তার বিঘ্ন আছে কেন না সেখানে শ্রুতিরক্ষা করাকেই সাধুত্ব রক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য্য পদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যে একটী পরম সম্পদ এই কথা মনে রাখিতে হইবে।"

চতুর্থ প্রকাশ। যীশু-খ্রীষ্টের, গগন ভেদক বাহন, বিমান

বিহার পদ্ধতি। এই অংশে কবি ছন্দ শব্দের বা Rhythm এর কথা বলিয়াছেন। বাংলায় হ্রস্ব দীর্ঘের ভেদ স্পষ্ট প্রভেদ না থাকায় সংস্কৃতের মতন বিচিত্র ধ্বনির পর্য্যায় বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারছে না। বাংলায় হ্রস্ব দীর্ঘের ভেদ নাই তারপর যুক্তাক্ষর যুক্ত শব্দও বেশী লাগাইতে সেলেও অভিধান হতে সংস্কৃত শব্দ বাংলাই করিতে হয় তখন তা আর ঠিক বাংলা থাকে না। তাহা ভারতচন্দ্রের—

"হর বিষাক্ত কণ্ঠক কৃতান্ত বক্ষক
ত্রিশূল ধারক-হস্তাম্বর
জয়, শিবাক পণ্ডিত পিশাচ মণ্ডিত
বিভূতি ভূষিত কলেবর।"

এই শ্লোকের মতই দাঁড়াইবার কথা। বাংলায় যদিও যুক্তাক্ষরের বাহুল্য নাই এবং দীর্ঘ হ্রস্বের উচ্চারণ ভেদ নাই কিন্তু হসন্ত ও আছে। হসন্তযুক্ত শব্দ আর যুক্তাক্ষর উচ্চারণে কোনো তফাৎ নাই।

'করছে' ও 'কর্চ্ছে' 'রাখ্‌তো' ও 'রাক্‌তো'-তে কোনো প্রভেদ নাই। "অর্দ্ধোচ্চারিত বা আলগোছ অক্ষরের পর পূর্ণোচ্চারিত বা গোছালো অক্ষর বসলেই অক্ষর সংঘাত হয় সেই অক্ষর সংঘাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে অক্ষর তাকে পার্শী আরবী গ্রীক্ রোমক হ্রস্বঃ শাস্ত্রে দীর্ঘ বলেই ধরা হয় কেন না গায়ে গা ছুড়ে না দিলেও বস্তুত ও যুক্তাক্ষরের সামিল।" প্রাকৃত বাংলাতেও এই নিয়ম খাটে।

কবি ছন্দস্পন্দ দেখাইবার জন্য নানা ভাষার ছন্দস্পন্দের অনুসরণে ছন্দ রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। দুই একটীর উদাহরণ দেই। কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ। তারপর, অক্ষর গেনা তারাকুল; মোন কোন্ সুদূর বাজায় মন,। প্রথম চারিটী মাত্রা গুরু।—

১ ২ ৩ ৪
গুরু | পুরু | অম্ | রুদ্ | এই চারিটীও উচ্চারণে গুরু। তার পর পাঁচটী লঘু। বাংলায় স্বরের গুরু লঘু সমান সেজন্য আকার একারকে লঘুই ধরা হইয়াছে "বেদনা তার"। সংস্কৃতের পাঁচটী লঘু মাত্রার অনুযায়ী। তারপর একটী গুরু তাহা 'ভুর্' তারপর 'যা', 'কা', 'রপ্', 'অং', 'ওঃ' এর অনুরূপ মৌ, কোন্, সুদূ, রায়্, ও ঘন্ এবং 'নি' ও প্রমত্তের 'র' এর অনুরূপ 'ন' ও 'যা'।

এই গেল মন্দাক্রান্তা।—

মালিনীর একটী উদাহরণ।—সং। অসিত গিরি সমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে বাং। উড়ে চলে গেছে বুলবুল পুচ্ছময় স্বর্ণ পিঞ্জর। সংস্কৃতে অ, সি, ত, গি, রি, স, ম, ং—এর অনুরূপ বাংলায়,—

বাংলায় উ, ড়ে, চ, লে, গে, ছে, পুচ্ছের চ ও স্বর্ণের ণ। এবং মং, স্যাৎ, কজ্জ, লং, সিন্, পাং, ও'য়ে'—এর অনুরূপ মুল্, বুল্, পুন্, ময়, ঝর্, পিঞ্, ঝর্।

এইরূপে শার্দ্দূল বিক্রীড়িতছন্দের অনুরূপ ছন্দে একটী কবিতা অল্প দিন হইল প্রবন্ধ লেখকেরই মানসী ও মর্ম্মবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও ঠিক এই নিয়মই অবলম্বিত হইয়াছে।

তোটক—

সং। রণ নির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরম
বাং। ওকি—ফুটল সো ফুটল দিগন্ত ভরি

ইহাতে কবি অবশ্য শেষের দীর্ঘ বাংলা ছন্দে রাখেন নাই। তাহাতে হ্রস্বঃ শব্দের কোনো ক্ষতি হয় নাই। এই তোটকেরই একটু পরিবর্ত্তিত রূপ আর একটী ছন্দে এই কবিই দেখাইয়াছেন—তাহাতে যেমন ছন্দ স্পন্দ বর্ত্তমান তেমনি বিন্যাসের মৌলিকতা। যথা :—

এলো—উতল হাওয়া ফুল পুলক নিয়ে
কীর—সাদর জলে আলো ঝলক দিয়ে
এলো—মধুর হেসে
ধরি—বঁধুর বেশে
এলো—সুখের বেশে রাঙা আরক পিয়ে।

পঞ্চটিকা ও তোটকের ছন্দস্পন্দ রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই বর্ত্তমান যেমন :—

নিয়ে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল
উর্দ্ধে পাষাণস্তট ভাম শিলাতল
অথবা
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে

—ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রনাথের 'তুলির লিখন' নামক গ্রন্থে "বিচার-পর্ণা" নামক কবিতায় সংস্কৃতের অনুরূপ হ্রস্বঃ স্পন্দ বর্ত্তমান। চীনের mono-syllablic ছন্দের অনুসরণে বাংলার mono-syllablic শব্দ দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ যে ছন্দ রচনা করিয়াছেন তাহাতে ছন্দঃস্পন্দ খুব কৃতিত্বের সহিত দেখাইয়াছেন—

দিস্—কে যায় গো আজ
তার—কি তিন্ গাঁ ঘর
দুঃখ—সে তার কি পর
চাঁদ—সে তার কি তাজ?

ইত্যাদি আরবী পারসীর অনুসরণে বাংলার কবিতার ছন্দঃ স্পন্দের উদাহরণ—

তাকুতে মন যায় কিন্তু লজ্জায়
হয়না হায় হায় এম্‌নি দিন যায়
ওই হরিণ চোখ চাউনিটুক তোর
রহিল সকল কাঁকরা পাঁজরায়।

Homer-এর Greek Hexameter-এর অনুসরণ

হিংসা কি সংসারে চির কালই থাক্‌বে রে
থাক্‌বে রে সংগ্রাম
অন্তরে হীন ভেবে জান কর কোন্ দোষে
দাও তারে দুর্নাম?

কবি রবীন্দ্রনাথের Greek ধরণের ছন্দঃ স্পন্দ—

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই
নাম্‌ল
বক্ষের মরুমায় বন্ধুর রথ সেই
থাম্‌ল।

তার পর পঞ্চম প্রকার—

যন্ত্রীমূর্ত্তি বিদ্যুৎ তাহার বাহন বুলবুল গুলজার পঙ্‌ক্তি। বাঙ্গালার প্রাকৃত ছন্দে সংস্কৃত ও অন্য দেশীয় কাব্যের অনুসরণে কিরূপ ছন্দঃস্পন্দ দেখান যায়, তাহা তিনি বিমানবিহার পঙ্‌ক্তিতে বলিয়াছেন—

এ পঙ্‌ক্তিতে কবি প্রাকৃত ছন্দেই যত প্রকার মৌলিক ছন্দঃ স্পন্দের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারি কথা সাধারণ স্বরান্ত ব্যঞ্জনকে লঘু ধরিয়া হসন্ত ব্যঞ্জন বা স্বরের সহিত যোগ করিয়া ব্যঞ্জনকে গুরু ধরিয়া গুরু ও লঘু মাত্রার নানা প্রকার বিন্যাসে নূতন নূতন ছন্দ রচনা করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। আগাগোড়া সমস্তই গুরুমাত্রা যেমন :—

ঝিল্ মিল্ ঝিক্ মিক্
ঝিক্ মিক্ ঝিল্ মিল্
পদ্মের মঞ্জীল
তার তন্ তার দিল
তার তন্ তার মন্
কাল্‌গুণ্ কুলবন্
কৈশোর যৌবন
সঞ্জির পত্তন।

আগাগোড়া সব লঘু—

"ঝুরেরি মহলে নাগাতে মোতিটী
নিশাসে নড়ে
প্রেমী জেগে আছে মুখে চেয়ে, চোখে
পাতা না পড়ে।"

৩। ৬ লঘু—১ গুরু ১ লঘু ১ গুরু, ১ গুরু ১ লঘু ২ গুরু ১ লঘু—১ গুরু।

তরুণী আশারে লক্ষীকর
আজ আবার মনের মন
চির নূতনেরি নেই নিরন্তর
যাক্ আজ সেই গোপন।

৪। তারপর ১ গুরু, ২ লঘু, ১ গু, ২ ল, ১ গু, ২ল, ১ গু, ১ ল,

পান বিনা ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো তোম্‌রা
রূপশালি ধান ভানা
রূপ দাখো তোমরা।

প্রত্যেক পর্ব্বের শোভায় গুরু যাত্রা :—

জাগ্‌ছে আলো জাগ্‌ছে ছন্দ
জাগছে ভাষা জাগ্‌ছে আশা
বদ্ধ ঘরের ঘুল্ ঘুলিতে
বুল্ বুলিতে বাঁধছে বাসা।

৬। প্রথমে চারিটী লঘু পরে ২টী গুরু তৃই পর্ব্বে—তৃতীয় পর্ব্বে ৬টী গুরু শেষেরটী লঘু—

নিশাসে কি সৌরভ
কালো চুলে মেঘ্‌সব
পশ্‌লায় পশ্‌লায় রূপ ধরোগো
কালো চোখে বিদ্যুৎ
কোন খানে নেই খুঁৎ
অদ্ভুত্‌ অদ্ভুত্‌ তুই স্বর্গ।

৭। চারি মাত্রার চারি পর্ব্ব। প্রত্যেক পর্ব্বে প্রথম ৩টী লঘু শেষটী গুরু

'হর মুকুট হর মুকুট
তুরগে সুমেরু ছুট
গগনে গগন ভিত্তারে কার
করিতে যায় তারকা লুট।

৮। ১ গুরু ২ ল—২গু—তিন পর্ব্বে ৩গু—১ল—শেষ পর্ব্বে।

এক টুক্‌ উস্‌ খুস্‌
একটা কি কিস্‌ কাস্‌
কার মৃদু নিশ্বাস
কার নিদ টুটল
ভোর কবে আবলুস
ঘুট ঘুটে রাত্রির
শাল দেওয়া সাততীর
নিঃ সাড় ছুটল।

কবি উপসংহারে বলিয়াছেন "বিদ্যুৎ তাজাম নির্ম্মাণ করিতে বিদ্যুল্লতাকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধিতে আমার দুই চোখ জলসে গেছে—আমি আর তোমায় ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না"। তারপর আরো বলেছেন। বেঙ্গলার সৌড় বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কবিপরম্পরা এক ঝাঁক তন্ত্র সুন্দর বর্ণাকার যুক্তন সেই তাজাম ঘিরে আনন্দে কাকলী করতে করতে পাখার ভরে উড়ে চলেছে। "বাঙ্গালার ছন্দ শাস্ত্রের এই অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিতে কবিকে বহু আয়াস, বহু গবেষণা, বহু সাধনা করিতে হইয়াছে।—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং সেই অতিরিক্ত প্রয়াসাবস্থার ফলে যে তাঁহার চক্ষু কল্‌সাইয়া গিয়াছে তাহাও আমরা জানি। কিন্তু ভবিষ্যতের কবিপরম্পরা তাঁহার বড় সাধের বিদ্যুৎ তাজাবের চারিদিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া উড়িতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। তিনি যে সকল ছন্দের সৃষ্টি সে সকল ছন্দ বাংলার খাসমহলে স্থান পাইবে কিনা তাহাই ভাবিবার বিষয়। সাধারণে পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। কবি বলিতে পারেন এ সকল ছন্দের প্রবর্ত্তন করিতে তাঁহাকে যে প্রয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে, পরবর্ত্তী কবিদের এ সকল ছন্দে কবিতা লিখিতে এত প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। সহজেই তাহারা এ ছন্দকে আয়ত্ত করিতে পারিবে। যাঁহারা মধ্যেই সৌন্দর্য্য একথা স্বীকার করি—কিন্তু এত অধিক বাঁধনের মধ্যে সৌন্দর্য্য হাঁপাইয়া উঠিবে—বাঁধনের মধ্যে যে মুক্তি, সেই মুক্তিই সৌন্দর্য্য বিকাশের মূল কারণ। কিন্তু ইহাত, বাঁধনের মধ্যে মুক্তি নহে—এ যে বাঁধনের মধ্যে বাঁধন। একটী জীবন্ত জাতির অনন্ত চিন্তা ও কল্পনাপুঞ্জ কিছুতেই এত বাঁধনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে না।—ছন্দোজগতেও যদি স্বার্থ রঘুর আবির্ভাব হয় তাহা হইলে কবিত্বের বিকাশ হইবে না। এ সকল ছন্দে তরঙ্গ আছে মানি কিন্তু সে তরঙ্গ হাতের আঘাতে উত্তোলিত তরঙ্গ। আর তরঙ্গ থাকিলেও ইহাতে বেগ বা প্রবাহ নাই সেই জন্যই ইহা চলিবে না। মুক্তির বাধা হইলেও ইহা শৃঙ্খল,—যা সরস্বতীর চরণ এ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিলে তিনি চলিতেই পারিবেন না। শুধু ছন্দের মুক্তির নিক্কণে কি হইবে? বর্ত্তমান বাংলার শত শত ভাব বৈচিত্র্য নব জাগরণের উল্লাস—মানব জীবনের নানা জটীল সমস্যা মানব মনের নানাবিধ অভিব্যক্তিপুঞ্জ এবং কল্পনার নানা লীলা শুধু ছন্দঃ স্পন্দের লোভে এ সকল ছন্দকে আশ্রয় করিবে বলিয়া বোধ হয় না। যাহাতে মুক্তির পথ প্রায় চারিদিকেই রুদ্ধ কবি-প্রতিভা সে কারাগারে প্রবেশ করিবে না। সত্যেন্দ্রনাথেরই যে সমস্ত কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদস্বরূপ তাহা এরূপ ছন্দে লিখিত নহে। সত্যেন্দ্রনাথ কয়টী কবিতা তাঁহার আবিষ্কৃত ছন্দগুলিতে লিখিতে পারিয়াছেন? যে সকল

ভাব ও কল্পনা তাঁহার কবি-প্রতিভাকে অধিকার করিয়াছে তাহার একটীকেও তিনি এ সকল ছন্দে প্রকাশ করিতে পারেন নাই বা করিয়া নষ্ট করেন নাই। যে ভাব ও কল্পনা তাঁহার কবি-প্রতিভার বিলাস ও আনন্দের সহচর.....তাহাদিগকেই তিনি এই সকল ছন্দে—প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—চেষ্টা করিয়াছেন বলিতেছি এই জন্য যে ছন্দের শাসন ও অনুশাসনের অত্যাচারে তাহা ভাল করিয়া প্রকাশ লাভ করে নাই। সত্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন এই সকল ছন্দে অবলীলাক্রমে আপনার সর্ব্ববিধ চিন্তাপল্লবকে অকুণ্ঠ প্রকাশ দান করিতে পারেন না তখন বিদ্যাৎ তাঁহাদের চারিদিকে ভবিষ্যৎ কবিগরম্পরা বলাকাপংক্তির ন্যায় উড়িতে পারিবে না। এই সকল ছন্দ প্রচলিত হইবার আর একটী বাধা এই, প্রাকৃত বাংলার শব্দসম্পদ্ এতবেশী নহে যে তাহার সাহায্যে এ সকল ছন্দ অবলীলাক্রমে আদায় করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ শব্দ-সাগরের প্রচেতা তবু তাঁহাকে এক এক স্থলে এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে যে দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়। তাঁহার সেই শব্দসঙ্কটের উদাহরণ আমরা মাঝে মাঝে দিয়া থাকি। সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণে যে ছন্দগুলি রচিত তাহা বড়ই প্রাকৃত বোধ্ তাহার classical rigidity কিছুতেই যায় না এবং যাইবেও না। ছন্দ সুরের মত চিরন্তন ও অনন্তাভাষময়, উহা মুষ্টিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে স্বীকার করি, কিন্তু মানুষের ভাববৈচিত্র্য ও কল্পনার লীলা যুগে যুগে নানা-ভাব ধারণ করে এবং তাহা আপনার উপযোগী সুর ও ও ছন্দকেই বরণ করিবে। প্রাকৃত শব্দ হইলেই তাহা মনের শ্রবণের ও কণ্ঠের যে পরিচিত হইবে তাহার কোন কথা নাই। যোগেশবাবুর অভিধানে যথেষ্ট বাংলা প্রাকৃত শব্দ আহৃত হইয়াছে স্বীকার করি কিন্তু তাহার সব কি মনের জনসাধারণের পরিচিত? যে সকল পারসী, আরবী, হিন্দী ও বাংলা শব্দ কেবল কোন কোন স্থলে অধুনা প্রচলিত অথবা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এরূপ শব্দ সংযোগে সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের নমুনা দেখাইয়াছেন তাহার অনেক শব্দই বাংলার লোকের নিকট Greek, সে সকল শব্দ অপেক্ষা সংস্কৃত শব্দ অনেক অধিক পরিচিত। প্রচলিত হিন্দী, ফরাসী, বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে যে সকল ছন্দ সহজে আদায় হইবে সেই সকল ছন্দই চলিবে। তা'ছাড়া, বাংলার হলন্তবহুল শব্দ যত বেশীই হোক—স্বরান্ত শব্দ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী—এসকল ছন্দে স্বরান্ত শব্দের প্রয়োজনাধিক্যের অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়ায় ছন্দে ব্যবহার্য্য শব্দসংখ্যা বড়ই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে—ভাবের সহজ প্রকাশ সহায় অনেক শব্দ পরিহার করিতে হইবে তা'হাতে ভাবকে ঘুরাইয়া পেঁচাইয়া প্রকাশ করিতে হইবে। সেজন্য সত্যেন্দ্রনাথের এই সকল ছন্দে লিখিত কবিতা স্বচ্ছ সরল নহে, দুর্ব্বোধ জড়ত্ব ও নিস্তেজ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছন্দ বা সুর প্রথম যখন আবির্ভূত হয়, তখন সহসা তরুর কণ্ঠে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, বহু আয়াসে তাহাকে অর্জ্জন করিতে হয় নাই। অনুষ্টুপ্ ছন্দ মহর্ষি বাল্মীকির কণ্ঠে সহসা আবির্ভূত হইয়াছিল তাহাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ছন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কত শত শত ছন্দ তারপর প্রবুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অনুষ্টুভের সম্মান একটুও মলিন হয় নাই। বাংলার ছড়ার ছন্দ সেই অনুষ্টুভেরই রূপান্তর তাহা কবি সত্যেন্দ্রনাথই এ প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন। ভারতের বাল্মীকির কণ্ঠে যাহা সহসা প্রবুদ্ধ হইয়াছিল বাংলার কৃত্তিবাসের কণ্ঠে তাহার বঙ্গীয় স্বরূপটী সহসাই ভাসিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যেও ছন্দের অনেক কলরব আছে। তাহার অধিকাংশই ছন্দোমঞ্জরী, শ্রুতবোধ ও অন্যান্য ছন্দের পুস্তকেই চিরদিন থাকিয়া গিয়াছে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে তাহাদের সহিত কচিৎ কখনো সাক্ষাৎ হয়। যে ছন্দে বেগ, তেজ, প্রবাহ আছে সে ছন্দে বন্ধন অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাই কবিগণ আশ্রয় করিয়াছেন। অনুষ্টুভ উপজাতি মন্দাক্রান্তা মালিনী শিখরিণী শার্দ্দূলবিক্রীড়িত স্রগ্ধরা ইত্যাদি যেরূপ চলিয়াছে—চণ্ডবৃষ্টি প্রপাত, দোধক হংসী, অক্ষরপংক্তি, মদলেখা, মানবকাক্রীড় ইত্যাদি—ছন্দ সেরূপ চলে নাই। যে বিদ্যাশালা ছন্দের অনুসরণে বিদ্যুৎ তাজাবে পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—সে বিদ্যাশালা কি সংস্কৃতকাব্যে চলিয়াছে তাহা কি একরূপ ছন্দঃ শাস্ত্রেরই শোভা বর্দ্ধন করিতেছে না? সকল সাহিত্যেই নানাপ্রকার ছন্দ আছে কিন্তু

সহজে যাহাকে আয়ত্ত করা যায় কবিরা তাহাই অবলম্বন করেন। যাহা হুরহ এবং সর্ব্ববিধ ভাবপ্রকাশের উপযোগী নহে তাহা ছন্দ শাস্ত্রের মধ্যেই চিরদিন বিরাজ করিয়া থাকে। সত্যেন্দ্রবাবুর বিদ্যুৎ তাড়াস পদ্ধতি সম্বন্ধে আর এক কথা··· এ পদ্ধতির extremely lyrical; Lyrical এর মধ্যেই নানা শ্রেণীর কবিতা আছে। Lyric এর মধ্যে যাহা খুব বেশী তরল তাহাই বিদ্যুৎ তাড়াস পদ্ধতিতে চলিতে পারে···সেই জন্যেই সত্যেন্দ্রনাথের "টুক টুক ফুল ফুল" ও "ছিপখানা তিন দাঁড় তিন জন মাল্লা" যেরূপ তাঁহার অবলম্বিত ছন্দে উৎরাইয়াছে তেমন কোনটাই নহে। কোনো প্রকার গাম্ভীর্য্য কারুণ্য, উদ্দীপনা বা আধ্যাত্মিকতা ঐ সকল ছন্দে প্রকাশ করা যায় না।

শুধু তরল ও চটুল ভাবের দ্বারা দেশের অন্তরের ক্ষুধা মিটিবেনা শুধু flimsy ও unsubstantial জিনিস লইয়া সাহিত্যে স্থায়ী কবি-প্রতিষ্ঠার বিলাস বা আলস্য। শুধু ইন্দ্রধনুর রাঙ্গোর গানে কবিহৃদয় পিপাসাতুর তৃপ্তি হইতে পারে না। দেশ বরং স্বপ্নরাজ্য হইতে দিন দিন দূরেই চলিয়া যাইতেছে। কাব্যসাহিত্যসম্পদের মধ্যে ইহারও স্থান আছে স্বীকার করি কিন্তু ইহাই সর্ব্বস্ব হওয়া উচিত হইবে না। অমিয় পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ফুলের মধু চাই কিন্তু ফের ও ফুচরণের জন্যও ফুলের ফুরস, গোবর ও শস্য সম্পদও চাই। সত্যেন্দ্রবাবুর ছন্দে ফড়িংএর সুষমা আছে, কিন্তু উহাতে অনলের দীপ্তি ও উত্তাপ নাই—দীপশিখার জ্যোতিঃরেখা শক্তি নাই—মার্জ্জিতের জন্যজ্জ্বল মহীচ ও তেজ নাই। উহার সাহায্যে sustained effort এর কোনো সাহিত্যচেষ্টা চলিবে না। উহার দ্বারা দীর্ঘকবিতা রচনা অসম্ভব, ভাব ও চিন্তাপ্রবাহের অনাবৃত ও অবিরলধারা উহার সাহায্যে অভিব্যক্ত হইবে না এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই উহার একঘেয়ে একসুরো আওয়াজ বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে—ফুলফাঙ্গানির গানের কাজ করিবে।

বিদ্যুৎ তাড়াস পদ্ধতি না চলুক, বিদ্যাবিহার না চলুক, তাঁহার বর্ণাত্মক পদ্ধতি চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে, চলিতেছে এবং চিরকাল চলিবে সে বিষয় সন্দেহ নাই। বাংলার ছড়ার ছন্দ সম্বন্ধে কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। "ছড়ার ছন্দে Rhythm আছে, বেগ আছে, গতি আছে। উহা দ্বারা তেজোবান্ সাহিত্য রচিত হইতে পারে। উহা বাংলার নিজস্ব ছন্দ। বাংলার কণ্ঠ ও শ্রবণের সহিত উহা বড়ই পরিচিত। বাংলার মনের কথাটী ঐ ছন্দে যেরূপ প্রকাশিত হয় তেমনটী আর কিছুতেই না। রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান গল্প-কবিতাগুলি এই ছন্দে লিখিত হওয়ায় বড়ই চমৎকার হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ দুই প্রকার অমিত্রছন্দ ইদানীং প্রচলন করিয়াছেন, একপ্রকার পয়ার ভাঙ্গা আর একপ্রকার ছড়ার ছন্দভাঙ্গা। "বলাকা" "ঝাঁজমহল" পয়ার ভাঙ্গা ছন্দে রচিত। গল্প কবিতাগুলি ঐ ছন্দে লিখিত হইলে সুন্দর হইত না। ঐরূপ ছন্দে বা উহার স্বগোত্রীয় কোনো ছন্দে বঙ্গের সম্পূর্ণ গার্হস্থ্য কথা লেখাও যায় না। কবিবর বলিয়াছেন "এই প্রকৃত বাঙ্গালার ছন্দ মেয়েদের ছড়ায় বাউলের গানে রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধু সভায় তাহার গুণাদর হয়নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারেনি···এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হলো না। আজকের দিনে জ্যোৎস্নারাতীর যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা ক'রে চলছে···কোথায় সে তার সংকোচ এবং কোথায় লয় তা স্থির হয়নি। এই সংকোচে তার আত্মপরিচয়ের খর্ব্বতা ঘ'ট্ছে।" তার যে কতশক্তি তার যে কোথা গতি তাহা কবিবরই ত একরকম ঠিক করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে সকল ভাব চিন্তা ও কল্পনা প্রকাশে উহাকে নিয়োগ করিয়াছেন; সেই সকল ভাব চিন্তা ও কল্পনাকে মূর্ত্তিদানেই উহাতে চলিবে এবং এখনই যেন চলিতেছে।

আর একটী কথা বলিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করিব। সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "মাত্রাবিচার মূল অক্ষর গোপাছন্দ এখন উড়ে কবিরা যত্নে রক্ষা করেন। বাঙ্গালী কবির দ্বারা আর ও কাজ চলিবে না। কারণ উচ্চারণের ধারা তফাৎ হ'য়ে গিয়াছে। উচ্চারণের বিরিঞ্চি ক্রমাগতই বলছে যে পুরাণো ছন্দ পুরাণো কাপড়ের মত ভঙ্গুর হইয়াছে। ওতে আর লজ্জানিবারণ হবে না" এ বিষয়ে আমরা কবির সহিত একমত হইতে পারিলাম না, ছড়ার

ছন্দ অবশ্য চলিবে এবং তাহার চলাই উচিত। সেই বলিয়া পয়ারাদি দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে, তাহা হইতে পারে না।

সকল দেশের আদিম ছন্দই পয়ারের অনুরূপ। ছন্দের যা স্বাভাবিক রূপই পয়ার। পয়ার আট পর্ব্বের ছন্দ। "এই আট পদক্ষেপের আবর্ত্তন সকল ছন্দেই চলে - বস্তুতঃ এইটাই হচ্ছে অধিকাংশ ছন্দের চলিবার কায়দা। সংস্কৃতের অনুষ্টুভ উপজাতি—ইংরাজীর এই আট পদক্ষেপের ছন্দ। পার্শি, লাচার, ত্রাবিল, পাবনী, আসামী, লেচার সবই ঐ পয়ারেরই অনুরূপ। উহাই সব দেশে নানা আকারে আদিম ছন্দ। ঐ পয়ারই নানারূপে বাংলা কাব্যের সিংহাসন জুড়িয়া আছে—

দেখাও ত পদে সূর্য্যকর
মোর কটিকার ধাতে বারুণ অশনি পাতে
বিশ্বটরিল যে গিরি-শিখর।"

ইহা পয়ারের রূপান্তর—

"চিঠি কই দিন গেল বইগুলো ছুঁড়ে ফেল
আর ত লাগে না ভাল ছাই পাঁশ পড়া
ঝিটারে মনের খেদ গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ
পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে মিছে মনগড়া।"
"নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসি
হে নন্দন-বাসিনী উর্ব্বশী!

• • • •

নিজহাতে নাহি চলো সুসজ্জিত বাসর-শয্যাতে
শুভ্র অর্দ্ধরাতে
উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।"
"শুভ্র বাহুতের মত জড়ায়ে অযুত পাখা
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা"
"সে আসি কহিল—প্রিয়ে মুখতুলে চাও"
বুঝিয়া তাহারে কহিনু কাছিনু "যাও"
সখি ওলো সখি সত্য করিয়া বলি
তবু সে গেল না চলি।"

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।"
"অত—চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো—মরণ হে মোর মরণ
অতি—নীরবে এসে কেন চেয়ে রও
ওগো—একি প্রণয়েরি ধরণ।"
"মোরে কর সভাকবি শ্যামমৌন তোমার সভায়
হে শর্ব্বরী হে অবগুণ্ঠিতা।"
"আজি এই আকুল আশ্বিনে
মেঘে ঢাকা দুরন্ত দুর্দ্দিনে"

ইত্যাদি সবই এক পয়ার ভাঙ্গা ছন্দ—এবং অক্ষর গণতি হিসাবে ব্যবহৃত। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' 'তাজমহল' ইত্যাদি পয়ার ভাঙ্গা ছন্দেরই একরূপ। মাইকেল মধুসূদনের প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষরের পংক্তিগুলি পয়ারের। সনেট পয়ারেরই চতুর্দ্দশ লাইন। বাংলা দেশের অধিকাংশ কবিতাই পয়ার বা পয়ারের রূপান্তরিত ছন্দে রচিত। ছড়ার ছন্দের পুনঃ প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই পয়ার বা পয়ার ভাঙ্গা ছন্দে রচিত। সত্যেন্দ্রনাথেরও হোমশিখা পুস্তকের প্রায় সকল কবিতাই পয়ার ভাঙ্গা ছন্দে রচিত। অনেক চিন্তা অনেক ভাবই ছড়ার ছন্দে প্রকাশ করা কঠিন। বাংলা দেশের যাহা কিছু গৌরব-কাহিনী তাহা তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় নহে—ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান-গরিমাতেই বাংলার গৌরব। দেশের গৌরব-কাহিনী ছন্দে প্রকাশ করিতে গেলেই উহা প্রাকৃত বাংলায় প্রকাশ করা চলে না—সংস্কৃতবহুল ভাষায় প্রকাশ না করিলে প্রাচীনত্বের আবহের সৃষ্টি হয় না কাজেই ছড়ার ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া পয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ছড়ার ছন্দের মধ্যে এমন একটা চটুলতা তরলতা ও লঘুতা আছে যে যাহা কিছু গাম্ভীর্য্য কারুণ্য গুরুত্ব ও অপ্রমত্ততার দ্যোতক; তাহা ছড়ার ছন্দে তেমন প্রকাশিত হয় না—পয়ার ভিন্ন ঐ সকল ভাবের সুপ্রকাশ হয় না। হসন্তের নূপুর মুখরিত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ "বৈশাখ" "উর্ব্বশী" "সমুদ্রের প্রতি" "ভাষা ও ছন্দ" "ব্রহ্ম" "হিমালয়" "নৈবেদ্য" "স্বদেশ" "বেতসে" ইত্যাদি বিশ্ববিজয়ী কবিতা লিখিতে পারিতেন না—

লিখিলেও তাহা সুন্দর হইত না। দীর্ঘ পংক্তির ছন্দে যেমন বিশালতা বিরাটতা উদারতা ও গভীরতার প্রকাশ হয়—ছোট ছন্দের ছয় পংক্তিতে তেমনটী হয় না—যে ছন্দ 'এক নিশ্বাস হইতে আর এক নিশ্বাসে' উচ্চারিত না হয়, তাহাতে অনন্তের বার্ত্তা দেওয়া যায় না। সরস্বতীর আবাহনে সত্যেন্দ্রনাথ যে ছন্দই গ্রহণ করুন, মহাসরস্বতীর আবাহনে তিনি পয়ার ভাঙ্গা দীর্ঘায়তন ছন্দকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ব্রহ্মসঙ্গীত দীর্ঘ পংক্তির গম্ভীর ছন্দ ব্যতীত বিরাট পুরুষকে আহ্বান করা যায় না। যেমন—

Roll on, thou deep and dark blue
Ocean roll! (Byron)

কিংবা—

O wild West Wind!
Thou breath of Autumn's being—
Thou from whose unseen presence
The banes dead are driven —etc.
(Shelley)

আবার—

বাস্তবতা প্রকাশের ছন্দ—

'Neath our feet broke the
Brittle bright stubble like chaff.
(Browning.

করুণাপ্রকাশের ছন্দ—

You must wake and call me early
Call me early mother dear.
Tomorrow 'll be the happiest time
Of all the glad new year. (Tennyson)

অবসন্নতা প্রকাশের ছন্দ—

My heart aches and a drowsy
numbness pains. (Keats)

উদ্বোধনের ছন্দ—

Awake, Aeolian lyre,

And give to rapture all
Thy trembling string

কিংবা ব্যঞ্জনাময় ছন্দ—

Ruin seize thee ruthless King
Confusion on thy banners wait (Gray)

এইরূপ ইংরাজী সাহিত্যেও গভীর ও গম্ভীর ভাব প্রকাশের জন্য চটুল ছন্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ছন্দের প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে বটে—কিন্তু পয়ার এবং পয়ারের জাতি গোষ্ঠীর প্রয়োজন আরো বেশী। যেখানে ভক্তা গুম্ভুতি নিনাদ করিবার প্রয়োজন—যেখানে মুরজ মুরজ নিনাদ করিবার কথা সেখানে নূপুর নিক্কণে বা সংসী বাদনে চলিবে কেন?

পয়ার ও ত্রিপদীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গেছেন—"এটী ছন্দের বিশেষত্ব যে, এদের চলন খুব লঘু। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপে আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন রেখে পাঠক এর মাত্রাগুলিকে অনেকটা ইচ্ছামত চালাচালি করিতে পারেন।" এই যে ইচ্ছামত চালাচালি করিতে পারার সুবিধা ইহা কবিগণের পক্ষে কম সুবিধার বিষয় নহে—এই স্বাধীনতা কবির বিকাশের পক্ষে খুবই সহায়তা করে। এক পয়ারেরই অক্ষর-বিন্যাস গুণে কত ছন্দোবৈচিত্র্য যেখান হইতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। পয়ারের গম্ভীর ও মন্থর চলনের জন্য মন্থরতা ও গাম্ভীর্য্যকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। পয়ারের পর্ব্ব বাড়াইয়া কমাইয়া নানা প্রকার সুন্দর ছন্দের প্রবর্ত্তন ঘটিয়াছে—সে সকল ছন্দের নমুনা আগেই দিয়াছি—পয়ারের আরো সুবিধা আছে—"বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দই দুইমাত্রার এবং তিনমাত্রার এবং ঐ দ্বান্দ্বিক ছন্দের উপর বিভক্তিযোগে চারমাত্রার পয়ারের পর্ব্ববিভাগটী এমন যে ২।৩।৪ মাত্রার শব্দ তাতে সহজেই জায়গা পায় • • • এর থেকে জানা যায় পয়ারের আতিথেয়তা খুব বেশী আর এই জন্যই বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রথম থেকেই পয়ারের এত অধিক চলন।" পয়ারে সকল প্রকার ভাবই প্রকাশ করা যায়—তার প্রমাণ কৃত্তিবাস কাশীদাস, তার প্রমাণ সর্ব্বপ্রকার ভাবরসের আশ্রয় মেঘনাদবধ, পয়ারে সকল প্রকার

শব্দকেই সহজে ঢুকান যায়, তাহাতে শব্দসঙ্কট ঘটে না—প্রয়োজনীয় শব্দ লইয়া বিব্রত হইতে হয় না—ছন্দের অনুপযোগী বলিয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয় শব্দকে পরিহার করিতে হয় না—মিল দেওয়াও সেজন্য কঠিন হয় না—নানা কারণে পয়ার ও তাহার জাতিগোষ্ঠীরা কবির প্রকাশের পরম সহায়। যে Rhythm লইয়া এত মাতামাতি সে Rhythm বা ছন্দস্পন্দ পয়ারেও দেওয়া চলে—কবিরা তাহা পয়ারের নানাভঙ্গি প্রদর্শন ছলে দেখাইয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের সহিত তুলনায় কবিবর পয়ার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "তিনের ছন্দ চাঞ্চল্যপ্রকাশের পক্ষে ভাল কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য্য এবং প্রসারতা অল্প।" পয়ারে শেষোক্ত গুণ দুটী বর্ত্তমান আছে। কবিবর আরো বলিয়াছেন—পয়ার আট পায়ে চলে ব'লে তাকে যে কত রকমে চালান যায়; মেঘনাদবধকাব্যে তাহার প্রমাণ আছে; তার অবতরণিকাটী পড়ে দেখা যায়—এর প্রত্যেকভাগে কবি ইচ্ছামত ছোটবড় নানা ওজনের নানাসুর বাজিয়েছেন—কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডাতে এসে থামতে দেন নাই। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্য্যাদা সুগম্ভীর হ'য়ে দাঁড়লো—"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু" তার পরে তার অকাল মৃত্যুর সংবাদটী কেন তাড়া রণপতাকার মত তাড়া ছন্দে বেজে পড়ল—"চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে" তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে "কহ দেবি অমৃতভাষিণি" তার পরে আসল কথাটা, যেটা সব চেয়ে বড়কথা—সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘগর্জ্জনের মত একত্রিশক্ত হতে আর দিগন্তে উদ্ঘোষিত হল—"কোন বীরবরে বরি সেনাপতিপদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুল-নিধি রাঘবারি।" মহাকবির হাতে পড়িলে পয়ারেও যে ছোটবড় সব ওজনের সুর বাজে এই কয়টাই তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়াছিল।

সত্যেন্দ্রবাবু ছন্দের ঘুরপাক, ছন্দঃ পায়ে তিনি যে গভীর গবেষণা ও মৌলিক প্রতিভা দেখাইয়াছেন, তাহা খুবই প্রশংসার কথা। মৌলিকতার দিকে তাঁহার লক্ষ্য দৃষ্টি—সেই জন্যই চিরপ্রচলিত ছন্দকে বর্জ্জন করিতেছেন। ছন্দের নব নব ভঙ্গি আবিষ্কৃত হউক, সে ত সুখ ও সৌভাগ্যের কথা কিন্তু তাই বলিয়া পুরাতন ছন্দগুলিকে অনাদর করিলে চলিবে কেন? শুধু সমালোচ্য প্রবন্ধের বক্তব্য লক্ষ্য করিয়া নহে—তিনি আপন রচনার দিন দিন পয়ার ও তাহার জাতিগোষ্ঠীকে একেবারে বর্জ্জন করিতেছেন বলিয়া এতকথা বলিলাম।

শ্রীসুহৃৎ

কে বড় ?

(কবি বনাম কর্ম্মী।)

আমরা কর্ম্মী, আমরা কর্ত্তব্যকে তাল বেসে কাজ করি —তাই নাকি কবি আমাদের গাল দিয়ে বলেন যে, আমরা 'নির্জ্জীব' ! কবিরা প্রাণকে ভালবেসে কাজ করেন—এই জন্য আমরা নাকি ওঁদের গাল দিই, বলি "নিষ্কর্ম্মা !" ঠিক কথা ! তবে কি কবির কর্ম্মীর কাজের কোন ঐক্য নাই ? কবি ও কর্ম্মীর মিলন কি নাই ? না তা নয় মিলন আছে বৈকি ! তাইতো কথাটা উঠ্‌ছে -'বড় কে ?' কবি বলছেন যে, কবিরই জিৎ—কবিই বড়। কর্ম্মী স্বীকার করছে, "কবিই বড়; তবে কবি যেন ভুলে না যান তাঁকে 'বড়' করেছে এই কর্ম্মীরাই ! কর্ম্মীরাই তো দিন দিন নিষ্কর্ম্মা কবিকে মাথায় করে রেখেছে, তাঁকে কর্ম্ম থেকে ছুটী দিয়ে, স্নেহের সহস্র বাহু দিয়ে উঁচু করে তুলে ধরেছে ! প্রাণের অফুরন্ত রসে গন্ধে-সুরে ছলে ছলে কবি যখন হাওয়ায় যাবে গানের আগুন ছড়িয়ে দিলেন, তখন ঐ নীচের থেকে সহস্র বাহু আন্দোলিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালে; কর্ম্মীরা যেন একটী পুষ্পিত বৃক্ষ—কঠিন কাণ্ড আশ্রয় করে, সহস্র শাখা প্রশাখা বাহু-আন্দোলিত ফুলগুলি সযত্নে ধ'রে আছে আর কত অসংখ্য কর্ম্মী-শিকড়গুলি মাটীর-নিচে নেমে রস আহরণ করছে, যেন অন্ধকার খনিতে রত্ন সংগ্রহ করতে নেমেছে—সেই রস অথবা রত্ন দিয়ে সমাজ-কাণ্ডটীকে পুষ্ট করছে, সুসজ্জিত করছে। কবি কি প্রাণের নেশায় উন্মত্ত হয়ে তাও ছেন—নিচের ঐ সমাজের স্নেহের সহস্রবাহু ক্লান্ত, নির্জ্জীব, জড়, প্রাণশূন্য, প্রেমহীন ? কবির প্রাণের রস-উৎস যে কর্ম্মীরাই বহন করে এনে দেয় ! তারা প্রাণশূন্য নির্জ্জীব ?

আচ্ছা কর্ম্মীদের প্রাণের সাড়া কবিরা পায় না কেন ? তার উত্তর বুঝি, কবিরা সাড়া দেয় না কেন ? উহাদের প্রাণের সম্বন্ধে জ্ঞানীদের যেমন সন্দেহ ছিল কবিদের খানিকটা তাই, অর্থাৎ শুধু সন্দেহ নয় অবিশ্বাস ? তাঁরা মনে করেন সমাজ দেহ প্রাণহীন, কবিত্বে-গানে তাকে সঞ্জীবিত করবার ভার অধিকার কবিদেরই ! কবিদের কি কর্ম্মীদের প্রাণের সহিত সহানুভূতি, সমবেদনা নাই ? তা কেন ? সেটা যে স্বাভাবিক—তবে কবিরা 'স্বাভাবিক' ভাবেন না, তাঁরা ভাবেন এ যে 'তাঁদের দেওয়া প্রাণ !' কর্ম্মীদের যে অফুরন্ত প্রাণ কর্ম্মবলে উপার্জ্জন করা তা তাঁদের উপলব্ধি হয় না; যার-করা-প্রাণ নিয়ে তাঁরা ভাবেন তাঁরাই যার দিয়ে বেড়ান, না না যার নয়—প্রকৃত বেরাদীর মত ঐ অমৃত 'বিলিয়ে দেন !' আচ্ছা, কর্ম্মীদের 'বিলিয়ে দিতে' চান কেন ?—প্রাণের স্রোত যেদিক থেকে বয়ে এসেছে, সে কি উল্টো দিকে আর বয় ? বয় বৈকি, তবে কেমন করে বয় তা কর্ম্মীরা জানে, সে কথা পরে হচ্ছে, —এখন কথাটা হচ্ছে এই, কবিরা কেন তা ভাবেন ? প্রাণের নেশায় কবিরা কেন ভাবেন কর্ম্মীরা 'নির্জ্জীব ?' নেশাটা কি সত্য ? এ নেশা তাঁদের কোথা থেকে আসে—কুণ্ঠমনে, ব্যথিত হৃদয়ে কর্ম্মীরা তা জিজ্ঞাসা করতে পারে কিনা ? বিষাদের হাসি হেসে কর্ম্মীরা দু'একজন আজ এই বলতে চান, "প্রাণ কি 'দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া' এনে দেয় ?"—নইলে, "এস আমার শাখায় শাখায় প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।" এ আহ্বান কেন ? আমায় জেনে-শুনে এ আক্ষেপই বা কেন ?—

"আমি সদা অচল থাকি,
'গভীর চলা গোপন রাখি,'
আমার চলা নবীন পাতায়
আমার চলা ফুলের মাঝা।"—

কবির ভাষাতেই এর উত্তর 'অচল' পুস্পিত পুষ্প এই টুকু বলতে চায়—

"আমার চলা যায় না বলা,
'আলোর পানে প্রাণের চলা,'
আকাশ বোঝে আনন্দ তা'র,
বোঝে নিশার নীরব তারা !"

এই যে 'আলোর পানে প্রাণের চলা' এ সত্যই যে 'বলা যায় না'। তাই কর্ম্মীরা 'প্রাণের সাড়া দেয় না'! তা'রা যে কর্ম্ম নইয়াই ব্যস্ত, কর্ম্ম কোলাহলময় জীবন-তরঙ্গ বৈচিত্র্যময়, কিন্তু সে কি 'বেসুরো' ? এই ধারণাই কি কবিদের ভ্রান্ত করছে না যে, কর্ম্মীদের সুর-বাধা-জীবন 'নাই' এই কি তাঁ'রা ভেবে বলছেন না ?—তারা কলের পুতুল—প্রাণের সুর তা'দের ভিতর বইয়ে দেবার ভার কবিদেরই উপর ?

অসংখ্য কর্ম্মীদের নিয়ে যে সমাজ সে স্থিতিশীলই হোক্ আর গতিশীলই হোক্ সে নিশ্চয়ই 'নির্জ্জীব' কলের পুতুল নয় যে তা'র প্রাণপ্রতিষ্ঠার ভার একমাত্র কবিদের উপর তুলে দিয়ে কর্ম্মীরা নিশ্চিন্ত থাকবে ?

কবিরা পৃথিবীতে আসেন 'মানুষের' আসক্তি মোচন করবার জন্য—তাঁ'রা যে প্রকৃত বৈরাগী, বিষয়ে অনাসক্ত ; তাঁ'রা লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্য যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়ান ! সমাজ কি কারাগার আর 'মানুষ' কি বন্দী—উচ্ছৃঙ্খলতার মুক্ত জীবনই কি 'মানুষের' প্রাপ্য ? কবির ডাক—"তোরা প্রাণের সুরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়"। সংসারের পথের পথিকই কবি—বাউলের চেলা ? প্রাণের নেশায় বিভোর কবিকে যদি কেহ বলে "বুঝতে পারলুম না"। কবির উত্তর—"এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলে, তবু বুঝতে পারলে না ?" • • • কাব্য যে তা'হলে 'বোঝবারও' জিনিষ, জানতে পারলাম। তবু নাকি তাঁ'র রচনা—'এ সব জিনিষ বাঁশির মত, বোঝবার জন্যে নয়, 'বাজবার' জন্যে !' কোন্ কথাটা তবে সত্য—দুটোই কি ?

কর্ম্মীদের নির্জ্জীব ব'লে গাল দিয়ে কবিরা কথার প্যাঁচ দিয়ে প্রমাণ করছেন—কবিদেরই জিৎ, কবিরাই 'বড়' কেননা, "পৃথিবীতে যা কিছু সকলের বড় তার প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে যত কবি, যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়ে মুছে ফেলতে পার 'তাহলেও প্রমাণ হবে' এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের 'জোরটা' কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফলশস্যক্ষেত্রের মূলে রস জুগিয়ে এসেছে কা'রা !" কা'রা জুগিয়ে এসেছে, কর্ম্মীরা আজ তা বলছে—বলছে তাদের ফলশস্যক্ষেত্রের মূলে রস জুগিয়ে যা উদ্বৃত্ত ছিল, সেইটুকু তা'রা চুপে চুপে কবিকে পৌঁছে দিয়েছে,—কখন কবি তা জানতেও পারেননি ! কবির প্রাণের প্রাণে প্রেমের জলে তাদের ঘাঠ ভিজিয়ে দেয়নি, তাদের কোদাল-লাঙ্গলই মাঠ কর্ষণ ক'রে, নালা কেটে জল এনে অভিষিক্ত করেছে—তাইতে যে ফলের সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে কর্ম্মীরা, কবিরা কেউ বঞ্চিত হয়নি ; কর্ম্মীরা সেই রস থেকে সেই 'জোরই' পেয়েছে যার খানিকটা পেয়ে কবি গান্ধেন 'জোরটুকু' তাঁ'রাই এতদিন জুগিয়ে আসছেন! কর্ম্মীরা তো আর 'নিষ্কর্ম্মা' নয়, তা'রা যে কাজেতেই সব সময় ব্যস্ত, কাজেই তাদের দিক থেকে সচরাচর কোন সাড়া (response) নাই ; সুতরাং আগেকার উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মত কবিরা বলছেন "কর্ম্মীদের প্রাণ নেই, থাকলে সাড়া দিত"। অতএব প্রাণপ্রতিষ্ঠার ভার কবিরা নিয়েছেন ! !

পৃথিবীর কারা থাকার কারা ? কবিরা বলছেন—তাঁ'রাই থাকেন, কর্ম্মীরা বা আর কেউ নয় ! একথা সত্য "যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেছে তা'রা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে আছে তা'রা নয়—" এরা তো কর্ম্মীও নয়—কর্ম্মীরা কি বাঁচই অন্বেষণ করছে ? যে সংসার চায় না, চায় আত্মোন্নতি অথবা যে সংসারে থেকেও স্বার্থপর, সম্পূর্ণ বিষয়াসক্ত তা'রা তো 'নিষ্কর্ম্মা' তবে কারা দূর করে কা'রা ? যারা সংসারে থেকেও অনাসক্ত তা'রাই পারে,অর্থাৎ—"যারা অপর্য্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নাই, ঘর করে তারা, ত্যাগ করেও তা'রাই, বাঁচতে জানে তা'রা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তা'রা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে—সৃষ্টি করে তারাই—" তা'রা কি শুধু কবিরাই, কর্ম্মীরা নয় ?

কবি বল্‌ছেন—"কান্নার বাতখান দিয়ে ছুটতে হবে।" যদি বল—"এ সমস্ত 'কেজো লোকের কা'জ তোমরা কি করবে?" তার উত্তর কবি দিচ্ছেন—"কেজো লোকেরা কাজ 'বেসুরো' ক'রে ফেলে, তাই, সুর বাঁধবার জন্যে আমাদের ছুটে আস্‌তে হয়!" 'বেসুরো' হোক্ আর 'বিচিত্রসুরই' হোক্, দেখা গেল কবি স্বীকার করছেন—জগতের কান্না থামাতে 'কেজো লোকের কাজই' চাই; অতএব শুধু কবিরা যে কান্না থামান তা নয়, কর্ম্মীরাই প্রকৃত ঐ কান্না থামান। এ মিলনের সূত্র কবিই কর্ম্মীকে বলিয়ে দিলেন।

কবি বল্‌ছেন—কর্ম্মীরা কর্ত্তব্যকে ভালবাসে ব'লে 'কাজ করে'; কবিরা প্রাণকে ভালবাসে বলে 'কাজ করে'—"; যখন দুইজনেই 'কাজ করে', তখন কবিরাও যে 'কর্ম্মী'; আর কর্ম্মীরা যখন 'কর্ত্তব্যকে' ভালবেসে কাজ করে, তখন তা'রা প্রাণবান্ হ'য়ে 'প্রাণকে ভালবাসে' যে 'কর্ত্তব্য' তাও জানে, সুতরাং কর্ম্মীরাও যে 'কবি'! যখন কবিও কর্ম্মী, কর্ম্মীও কবি, তখন বিরোধ কোথায়? আমরা 'নিষ্কর্ম্মা' ও নই, 'নির্জ্জীব' ও নই; জীবনানন্দে পূর্ণ কর্ম্মী আমরা সকলেই! তবে মিলন-গানে আজ 'কর্ম্মের জয়' ধ্বনিত হোক্, আকাশ-বাতাসে 'প্রাণের জয়ের' ঝঙ্কার বেজে উঠুক!

এখনও কি কবিকে প্রশ্ন করবে "কে বড়?"

শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার, বি, এ

আত্ম-জ্ঞান

('পেটে' হইতে)

অকর্ম্মণ্য চিন্তা মাঝে ডুবে যাও যদি,
অজ্ঞান আঁধার মাঝে রবে নিরবধি।
কর্ত্তব্যের মাঝে লভ পরমার্থ জ্ঞান,
কর্ম্মের মাঝেরে পা'বে আপন সন্ধান।

নিজের পাইতে হ'লে এ ধরার মাঝে,
ভাবনায় মিলিবে না পাবে নিজ কাজে;
আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান
তা'র মাঝে পাবে তুমি আপন সন্ধান।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

বন্ধন ও মুক্তি

১

এযে রে বন্ধন !—
প্রজাপতি মন মোর সৃষ্টিমদে মাতি
পলে পলে করিছে রচনা
কত না কৌতুক-রাশি,
কত-কাব্য, কত গাথা,
কত না বাসনা-বিম্ব,
কে করে গণন ?
এই যে পরাণ-প্রিয় বন্ধু পরিজন
হরষ-বেদনা-দোলে
দোল দিয়ে দিয়ে
চলিতেছে দিবারাত ;
এই যে সংসার-চিত্র প্রখর ঘর্ষণে
তুলি ফেলি বার বার
চূর্ণ করে কায়,
ছুটায় শোণিত-ধারা
হলকে হলকে—
সৃষ্টি-খেলা এ সকলি তার !

২

প্রকৃতি আছিল মৌন প্রথম বয়সে,
নিরালায় এলকেশ পৃষ্ঠে দুলাইয়া
মানবের গৃহপাশে বসি রাত্রিদিন
খেলিত আপন রঙ্গে বালিকার খেলা !
কেশগুচ্ছ ধরি তার
সজোরে নির্দ্দয়
(কি প্রমত্ত মন মানবের !)
কহাইল কথা ;
চমকিত করি তায়
চাহিল কাড়িতে
খেলা তার ;
হাতে গড়া অযুত অভাব
চাহিল মিটাতে
সে খেলার।
মিটিল না তবুও অভাব !
শুধু পলে পলে
বেড়ে গেল লেলিহ রসনা,
শুধু পলে পলে
বেড়ে গেল রক্তবীজ রিপু—
কি ভীষণ কি তার মূরতি !
কি করিবে ?
সূক্ষ্ম হতে হল সূক্ষ্মতর
কৌশল-রচনা,
বেধে গেল দিকে দিকে
প্রচণ্ড আহব !
হায় !—হায় !
শান্তি কই ? শান্তি কই !
ঘৃত-দীপ্ত-বহ্নি-জ্বালা—ব্যাপ্ত হাহাকার !
এমনি করিয়া
ব্যর্থতার কেন্দ্র হতে ফেরে ব্যর্থতায়
অহর্নিশি মন !

আপনার ঊর্ণাজালে আপন-বন্ধন,
দুর্গতি বিষম।

৩

এ নহে বন্ধন!—
যদি একবার, কোন মতে,
অসাধ্য সাধনে,
মৃত্তি মাঝে ধরা তারে যায়,
যদি একবার
আনন্দের মহাপুথি-মাঝে
ডুবাইয়া মেরে ফেলা যায়
বাসনারে শ্বাসরুদ্ধ করি,
যদি একবার
চাঞ্চল্যের ঘূর্ণা হতে
বাঁচাইয়া তারে
স্থিরতার ধরে রাখা যায়,
যদি একবার
মনের নিন্দা-পঙ্ক হতে
উত্তোলিয়া তারে
শুচিশুভ্র করি দেখা যায়,—
সে কি রূপ—
অপূর্ব্ব-সুন্দর!
চল চল মুক্তা বিম্ব
ঠিকরিয়া পড়ে
দ্যুতি তার।
কি করে চিনিব তারে?—
সে কি মন?
কর্ম্ম তার আর ত বন্ধন নহে।
খুলে গেছে মমতার পাশ,
মুক্তি হাসে পদে পদে তার!
কোথা দুঃখ? কোথা তাপ?
কোথা শোক? কোথা ভয়?
শুষ্ক পাতা ঝরে পড়ে গেছে।
সুখ-বিলাস
নীরবে খসিছে শির
চিরসমু-মাসে

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

"জেয়াঘাট"—

আমি যোয়াঘাট। "তারপর?"—তারপর আমার কি তোমরা দেখছি একেবারে 'মাস্টার মশাই' করে নেবেছ! যদি আমার আবার 'তারপর' আছে কি? আমার কথা বলতে গেলে সে অনেক কথা! মাঝে মাঝে আমি কি ভাবি? আমি কেমন করে ঘুমতে পারি। কিন্তু তা' হয় বৈ?

নদী এখন তন্দ্রিয়ে উঠেছে তবু আমি ঠিক যেন শ্মশান-ঘাটে মড়া আগলে বসে আছি। কেন গো কেন? আমার উপরেই বা এত অত্যাচার কেন? মরেও যে আমায় বেঁচে থাকতে হবে এমন কোনও সর্তে কি তৈরী হইছিলাম? বিধাতা পুরুষ আমার মাথায় এমন কিছু একটা ঢাল মেরে গেল কি যে মরেও আমাকে বাঁচতে হ'বে।

"ওকি যাদে কথা? তুমি যোয়াঘাট। হাঁ। বেশ তারপর?"

আবার তারপর?—আচ্ছা তবে শোন—যখন এই নদীর যখন ছিল অর্থাৎ যখন ইনি এঁর পূর্ণ যৌবন নিয়ে যাযাবর উছলে পড়তেন! কুলে কুলে ভরা জল, মেয়েকে মাটিতে পা পড়ত না, কেবল হুস আর হুস—আপন রূপের কথা আপন ঐশ্বর্য্যের কথা কি যাতনিন কল্ কল্ করে, অনর্গল বলে যেত, আমার তা বলে যেত, আর আমার শুনেই বা থাকবে কি, আমি ছাই সে সব বুঝি কি? আমি ত আমি কতলোক যেখানে সেখানে থেকে এসে ওইখানটীতে গালে হাত দিয়ে বসে থাকত। তাদের ভাল ভ্যাবা করে তাকানি দেখে কেন যুবরাজ যুবরাজ ভাব আসত! মনে মনে আমার বড় ভাল হত—এত একদিন হাসে আমি কেউ দেখব, যাদুর গুণে এমন হবে? আছে ছি! যদি আমন মেয়েকে মরাকে মরা জ্ঞান করে, নিজের ভল যৌবন নিজের ঐশ্বর্য্যের কথা নিজে বলে যাচ্ছে তোমরা তার একটা কথার দাম, যে 'যৌবন দুদিন তোঁতা, ঘরে থাক? তা নয় হাঁ করে বসেই আছ!—বলি হাঁগো তোমাদের কি ভুলে যাওয়া নাকি? ও ধরি!

"তোমার ওই কেবল আমল সামল ব'কে নিজের গায়ের ছাল বিটান, বলনা তারপর? কি রাতদিন কল কল করে বলে যেত, তার পর?"

হাঁ, তারপর ঠিক এমনি সময় একদিন হঠাৎ দেখি আমার উপর একজন পায়ের লাগ পড়ল। আমি একটু খানি খানি ভারলা, ঠাকা হয়ে থাকাটা যেন কেমন আমার অভ্যাস। অতকগুলো বাড়ী ঘর দুয়ার এসে তাদের দেবের ভারে যে আমাকে যাত্ত করে ফেলবে এ আমি চাই না। বেশ ত আছি বাপু, আমার উপর তোমাদের এত নজর কেন? আমার ও কত জায়গা আছে,—তা নয় কেউ বললেন "হ্যাগো, এই সেই জায়গাটা" কেউ বললেন "এইখানেই ঠিক হবে।" কেউ বললেন, ওঃ আমি আগেই ছুটে দেখেছি এ আমার চেনা জায়গা!" "চেনা জায়গা" ? কি রকম?—শোন একবার যে সোয়াচ্চা। চেনা জায়গাটা তোমার কি রকম? মুখের দিকে চেয়ে দেখি সবাই মুখ যারা যেন চেনা চেনা!—মনে পড়ছে বটে লোকটা যাবে মাঝে এখানে আসত আমি তারতায় নদীর কথা শুনছে বুঝি! ওরা, তোমার পেটে পেটে এত? চেনা চেনি থাকলে বুঝি এই করতে হয়?

সে দিন সবাই চলে গেল—আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম,—কিন্তু দিন কতক পরে দেখি আবার সবাই এসেছে—তবু তাই না সঙ্গে তাদের অনেক লোকজন, ভিড়ির বোঝাই গাড়ীই বা কেন? জিনিসপত্র ও এই মুখের উপর স্তূপী করে নামিয়ে রাখলে—আচ্ছা উপদ্রব এসে জুটল যাহোক।

প্রায় একটী বছর পরে কেটে গিয়েছে। আমার

উপর দিয়ে একটা অসম্ভব রকমের পরিবর্ত্তন ঘটে গিয়েছে! আমি এখন আর নদীর ধারের সেই আগেকার ছোট্ট আমিটুকু নই। এখন আমি একটা খুব বড় রকমের খেয়াঘাট!

তাইত বলছিলাম "আমি খেয়াঘাট"! শুনলে ত এখন আমায় রেহাই দাও। "না না, তা হবে না, তার পর?"

তার পর আমার উপর এখন কত ঘর দুয়ার তৈরী হয়েছে! তখন হলে ওতক্ষন আড়ত থেকে বাপ আর ওজনের শব্দে দেখতে চারিদিক সব সর্ গরম করছে। আর দেখ, হাবাস পুরের হাটের মত সাত খানা হাট এক করলে যত লোক হয় এখানে প্রায় দিনরাতই তত লোকের ভিড় হ'ত। আর নদীর উপরটা বজরা নৌকাতে ছেয়ে থাকত। দেখতাম দিন দিন সরে সরে আমার এই ভিড়ই ভাল লাগতে লাগল! বাইরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও যে বেশ পরিবর্ত্তন হয়েছিল তা' আজ বেশ বুঝা যায়! আগে একা একা থাকতে ভাল লাগত এখন সারা দিন রাত লোকজনের ভিড়, গাড়ী গরুর হুড়োহুড়ি, খেয়া-নৌকার পারাপারি, হাটি বাজার বসর বসর, শব্দ এই সব নিয়ে বেশ আছি, শেষ রাত্রির দিকে যখন এখানকার সরগরমটা একটু নরম হয়ে আসত তখন মনে হ'ত কতক্ষনে সকাল হ'বে।

• • •

সকাল হয়ে আসছে—"যাবে না? সকাল কোথায়? তুমি পাগল হ'লে নাকি? এখন যে পুরো সন্ধ্যা বেলা?"

তোমরা ও বড় বেরসিক? আমি আমার কাহিনী বলে যাচ্ছি কেন আমি ঠিক সেই সময়ের খেয়াঘাট, তা' ভেবে না নিলে, বলি কি করে বল দেখি? এখন এই দু দু করছে আমার বুক, আমি তা'হলে তাই শুধু বলে যাই, তা'হলে আর সব বলা চলে না। আর সত্য কথা বলতে কি, এইটুকু বোঝার শক্তি যা'র নেই তা'র কাহিনী শুনতে আসতে নেই:—ভাল আপদেই পড়ছি যা'হোক!

"না, না, রাগ করো না—এবার বুঝেছি এবার শুধু 'হুঁ' আর 'তারপর' দিয়ে যাব", বল তুমি—তারপর?"

তারপর সকাল হয়ে আসছে! কারণ শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত বলে এসেছি!

"ওগো হয়েছে কারণ দেখাতে হবে না বুঝেছি! এখন যাও—"

সকাল হয়ে আসছে! আমার ঠিক মাথার উপরকার কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো থেকে সিঁদুর রঙা ফুল গুলো ঝরে ঝরে নদীর উপর ভাসছে! তোরের পাখীগুলো সব এক সঙ্গে জেগে কলরব জুড়ে দিয়েছে! নবীন মাঝির ছোট্ট ফুল বাগান থেকে বেশ একটা মধুর গন্ধ আসছে। সারা দিন হাড় ভাঙা খাটুনির পর ঐ ফুল গাছগুলো নিয়ে সে বেশ আরামে কাটায়!

দু'খানা ছিপ ছপ্ ছপ্ করে জাল ফেলতে ফেলতে উজান বয়ে চলেছে! এরা রোজই ঠিক এমনি সময় সুবর্ণপুরের ঘাটের দিকে যায়। পাশের বড় বজরা খানা থেকে একটী মেয়েমানুষ কি জানি সে কে, বেশ আস্তে আস্তে তৈরো ভাঁজছে!

নিমাই বিশ্বাসের আড়তে টহলের মহড়া জমে বেশ জমাটেত হয়ে উঠল!

ব্যাপারীরা সব জেগেছে! আপন আপন কাজ নিয়ে সবাই ব্যস্ত! দালালরা গৈবী চালে নৌকার কাছে এসে পৌঁছে গেলেন। কথা বলার ভঙ্গী দেখ না! আ মরি!

আমদানী, রপ্তানির আয় ব্যয়ের হিসাব, কিস্তির দাদ আদায়ের গড়পড়তা, দালালীর মুনফা, খুচরা পাইকিরির দর দস্তুর নিয়ে এরা সব সারাদিন ব্যস্ত থাকবে! —আমি যে একটা এতবড় লম্বা চওড়া দেহ নিয়ে পড়ে আছি, আমার বুকের তার যে তারা দিনকের দিন বাড়িয়ে চলেছে, একথা তারা ভুলেও কি একবার ভাববে?—তবু'ও কেন জানি না, এই লোক সমাগম, দ্রব্য সম্ভারের প্রাচুর্য্য, অর্থের ঐশ্বর্য্য সবই আমারি নিজের বলে মনে হয়! এই গৌরবের মধ্যে নিজকে আমি বেশ একটু সম্ভ্রম বলে মনে করি—ধরতে গেলে আমি বেশ আনন্দেই আছি!.....

"তারপর?"

—তালরে তাল! তোমরা যে একেবারে একটু হাঁপ নিতেও দাও না!

আমি মাঝে মাঝে ভাবিয়ে দেখি, আমার ওই পারটা

কেমন! নদীর ঠিক উপরে যেটুকু ঠিক আগেকার মত, সেটুকু দেখে আমার মনটা কেমন সময় সময় হাঁ হাঁ করে উঠে! মনে ভাবি আচ্ছা ঐ আমি ভাল না এই আমি ভাল?—বেশত ওর কিছু বড়াট নেই, কেমন ফাকা ঘরে পড়ে আছে! কিন্তু ওপারে ও একখানা নৌকাও ভিড়ে না, একজন লোকও ওর ওখানে সওদা করতে আসে না, এক পারের খেয়া, তার সঙ্গেও ও পারের চার খানা বাঁশ বাঁধা ডঙ্গার সঙ্গে সম্বন্ধ; খেয়া পারের লোক, খেয়া খেকে নেমে যে যার পথ ধরে চলে যায়, তার দিকে একবার কেও ফিরেও চায় না,—ইস্। ওই আমি আর এই আমি?

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে!

"তা' সে অনেকক্ষনই গিয়েছে, না, মা খুড়ি, ভুলে গিইছিলাম!"

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে; সন্ধ্যার ঘুমাট বাঁধা অন্ধকার ওই দূরের তাল বনের ওপাশে যেন 'ওৎ' পেতে লুকিয়ে বসে আছে, মনে ভাবছে, সূর্য্য একবার ডুবলে হয় তার'পর আস্তে আস্তে গিয়ে আমার এই প্রকাণ্ড ডানা দিয়ে সারা দেশটা ঢেকে ফেল্‌বে।

দিনু মণ্ডলের কলাবাগানের কলাগাছ গুলোর পাতা পরশুকার ঝড়ে একদম চিরুনীর মত চিরে গিয়েছে!

সূর্য্য ডুবছে, তা'র আলো, ঐ চেরা পাতা গুলোর উপর পড়ে ঝিলমিল করছে।

বাবাদপুরের ঘাটের ওই বড় বটগাছটার পিছনে সূর্য্য প্রায় ডুবল। সেখান থেকে সোনালিরঙের একটা বন্যা এসে যেন পাশের বাঁশগাছের পাতা গুলোকে নাইয়ে দিয়ে গেল।

আর সূর্য্য দেখা যাচ্ছে না—পশ্চিমের আকাশে এখন শুধু রঙের খেলা।

নানাদেশের নানা তরী এসে সে আমার এই ঘাটে লাগ্‌ল! সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে!

আমার কূলে কূলে তরা জল
তরা তরী টল মল্!

চারিদিকে দোকান পসারীতে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে উঠল।

কূলের আলো, নৌকার আলোয় মিলে নদীর জলের উপর নৃত্য করছে! একখানা খুব বড় বজরা আমার এই কূলের দিকে ভিড়ছে। কে একজন পুরবীতে তান ধরেছে—

দিনের আলো মিলিয়ে গেল
তোমার কূলে ভিড়াও তরী
আমারে পথ যায় না দেখা
কোথায় তুমি বনমালি হরি।

সব নৌকাতেই যাত্রার ধুম পড়ে গেল! আমি এখান থেকে হাঁড়ি কুঁড়ি শব্দ পেলেই বেশ বুঝতে পারি ওদের রান্না হচ্ছে!

চুপুর রাত পর্য্যন্ত ব্যাপারীদের সমান কাজ চল্‌বে—তারপর সব ঘুমিয়ে পড়বে।

সবাই ঘুমিয়েছে—আজ ভকত সিংয়ের বুঝি প্রিয়া বিরহ জেগে উঠেছে—তা'র চোখে ঘুম এল না—সে সমান গেয়ে চলেছে—

পরদেশী হামেরি দেঁইয়া
উন্‌দে ছুধা নেহি হায়!

আর প্রহর খানেক রাত আছে, ভকত সিংও নাক ডাকাচ্ছে—আচ্ছা আমি কেন সমান জেগে—ও আমি যে খেয়া ঘাট' আমার আবার ঘুম কি?.....ঘুমুতে পারলে ও হাড় জুড়িয়ে যেত কিন্তু.....!

তখনকার মত এরে আর আমি বলতে পারব না—না, কিছুতেই না, এখন যদি শুনতে চাও তবে এখনকার কথা শুন, 'সেই আমির' কথা ছেড়ে দিয়ে এখন এই আমির' কথা শোন!—কেমন রাজী ত?

"বেশ ত বলনা গো?"

"বেশ ত নয়—শুনে তোমরা চোখে জল রাখতে পারবে না! বল্‌ব কি, বলার আগে আমার যেন বুকে একটা ভারি পাথর চেপে পড়ছে—তবুও বলতে হ'বে!—দেখি বললে যদি বুকের বোঝা একটু কমে। আর যে পারি না, অসহ্য,—তখনকার স্মৃতি বুকে করে বাঁচা, না, আর যে পারি না গো।

আমি এখন একটা চির-রোগার মত আমার পাঁজরের

হাড়গুলো বের করে বসে বসে বাবি খাচ্ছি!—ধরছি না, কারণ আমা ভোগের কপাল!

আমার উপর যেন একটা ভীষণ মহামারী নিরাশার বুক ফুলিয়ে চোখ রাঙিয়ে শাসাচ্ছে! আমার মতো এত বড় একটা বিপুল শূন্যতা নিয়ে তবুও যেন অসংখ্য জৈব মানবের বেলায় আয়গাটা ছম্ ছম্ করছে! ছুঁচিক মড়ক দেখে যেমন ভয়ে মানুষ তা'র ত্রিসীমানায় আসে না তেমনি আমার ছায়াও কেউ বড় একটা মাড়াতে চায় না—! তাদ্য বিধাতার অভিশাপ বুকে করে যেন আমি একটা কিছুর অপেক্ষায় আছি!

নদীর জল এখন আমার কাছ থেকে সরে নদীর মধ্যে একটা যেন সুড়ঙ্গের মধ্যে পালিয়ে আছে—এদিক ওদিক যাওয়া আসা করে, অতি সন্তর্পনে, ধীরে,—ধীরে,—ধীরে! যেন সে আর চলতে পারে না, তার সে উছ্‌লে পড়া রূপও নাই. তার কল কথাও সব চুপ হয়ে গেছে! অতি কষ্টে সে বেঁকে বেঁকে চলেছে—ছোট একখানা তরীকেও সে আর বহন করতে পারে না—এমন তার অক্ষমতা। দুপুরে ঘু ঘু করছে বালি স্থার বালি, মনটাও মধ্যে আমারও যেমন তারও তেমনি কালি আর কালি!

নিরাই বিশ্বাসের অতবড় আড়তের চিহ্ন আজ নাই কেবল ভিটেটা শুধু পড়ে যেন বুক চাপড়াচ্ছে। ভাঁট গাছ গুলো ক্রমশঃ বাড়িয়ে উঠে ভিটে খানাকে যেন লুকিয়ে ফেলবে।

কোথায় নবীন বাবির ফুলের বাগান আর কোথায় বা সে কলা বাগান সব বনে জঙ্গল। বাকার মধ্যে আজও ঠিক বেঁচে আছে সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছ ক'টি। আমারও সকল ওরাই তারা এখনও আমার বুকের উপর ফুল ছড়িয়ে ভরা দুঃখ ও শূন্যতাকে রংচিয়ে দিতে চায়।

আমাদের এই দু'টী নিঃস্বের প্রাণের মধ্যে একটা সহানুভূতি একটা অনুকম্পাই এখন প্রধান সান্ত্বনা!

খেয়াঘাট এখন দূরে সরে গিয়েছে—নয়ত দিনের মধ্যে দু' একজনের দেখা পেতাম, এপার থেকে ওপারে যাবার বেলায় দু' একজনের কথা বার্ত্তা শুনে মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম। কিন্তু তাও হ'বার উপায় নাই এখন এপার ওপার সমান—

এখন এপার ওপার সমান হয়েছে
বিরাট মরুর মাঝে।

সূর্য্য এখনও তেমনি করে অস্ত যায় হাবাসপুরের সে বটগাছটী এখনও অক্ষয় হয়ে আছে—সূর্য্য তেমনি করে সোনালি রঙ ছড়িয়ে দেয়—কিন্তু আমার চোখে যেন আর তেমন করে সে রঙ ফোটে না, খোলে না,—নীতে জল নেই, বালির উপর সোনার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে—চারিদিকে বোধহয় যেন একটা ধন-দৌলতের মহল বসে যায়। কিন্তু আমি দেখি আর বুকটা কেঁপে ওঠে—আমার সেদিন কোথায় গেল!

এখন আমার দেখা শুনার মানুষ ক'জন রাখাল বালক—তারাই এখন আমার রিক্ততা আমার দীনতাকে ভাল বাসে, তারাই এখন আমার বুকে নাচে, গায় হাসে, হাসায়! আমার আনন্দের সাথী এখন তারাই তারা দুপুরে গরুর পাল নিয়ে এখানে জল খাওয়াতে আসে,—জলে গরু ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় বসে গান গায়—

ওরে তোর লেগে আমি পাগল হ'লাম
তবু তোর মনের পাগল পালায় না।

—আবার মাঠে ফিরে যায়; সন্ধ্যা বেলা কেও ওপারে চলে যায় কেও গরুকে জল দিয়ে এপারের ওই দুধের প্রাণে ফেরে।

কাল সন্ধ্যায় আমার প্রাণটাকে তোলপাড় করে নিবারণ ছোঁড়া কি গানই গাইলে—

ও মন কি ছিলি আর হয়েছিস কি
ভেবে দেখ্‌না বিচার করে
শুধু সোণা বলে কিন্‌লি রে কাঁচ
ধুলি ধুলো আঁচল ভরে—

—তাই ত। ঠিকই বলেছে নিবারণ, কি ছিলাম আর কি হয়েছি। কিন্তু সোণা বলে কাঁচ কেনা, ধুলায় আঁচল ভরে তোলা,—এ সব কি? এতদিন ধরে' কি তাই করেছি—তাই কি, এখন? আমার এখনও কানে লেগে আছে—

শুধু সোণা বলে কিন্‌লিরে কাঁচ
ভুল্‌লি ধুলো আঁচল ভরে।

* * *

মাঝে-মাঝে সমস্ত দেহটা গরম হয়ে ওঠে, শীতল বাতাস ও চারিদিককে আগুন ছড়িয়ে দেয়; পাঁজরের হাড় নড়িয়ে এই যে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠ্‌ছে একি অতীতকে ফিরে পেয়েছি বলে তারই মুক্তির দীর্ঘশ্বাস, না বর্ত্তমানকে হারিয়ে ফেলেছি বলে তারই জন্য নৈরাশ্যের গভীর দীর্ঘনিশ্বাস? – কি এ?

* * * *

আর এখন শিশুও শুনিনে পুরবীও শুনিনে কেও তৈরোও ভাঁজে না, সাহানাও ভাঁজে না, মাঝে মাঝে একটা দমকা হাওয়া আসা যাওয়ার পথে, ধুলো বালি ছড়িয়ে আমার মনকে নাড়া দিয়ে হেঁকে যায়—

সমানা সমানা তোমনে সমানা
বহুত রোতে দুনিয়া পর

"বাস, চুপ করলে যে, তা'বলনা?'

"কি হৃদয়হীন তোমরা এর পরেও আবার তারপর?"

তারপর "চুপ"—একেবারে, অনন্ত কাল ধরে "চুপ" কিন্তু তারপর কি যদি বুঝতে না পার, তবে বলে বোঝাবার শক্তি আমার নাই—তারপর কি, সে কি বলার?—বোঝাবার?

তারপর "চুপ"—একেবারে অনন্ত কাল ধরে "চুপ"।

কিন্তু আজ সমস্ত আকাশ, সমস্ত বাতাস ছাপিয়ে নিবারণের গান উঠেছে—

ও মন, কি ছিলি, আর হয়েছিস কি
ভেবে দেখ না বিচার করে
শুধু সোণা বলে কিন্‌লিরে কাঁচ
ভুল্‌লি ধুলো আঁচল ভরে।

—সে গান আজ কে চুপ করাবে?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

গুহাপার

একদিন—সে কোনদিন, তা জানি না। ইতিহাসে সে তারিখটা লেখে না। একদিন এক তেপান্তর মাঠে সবেমাত্র ঝড়বাদলের বিরাম হয়েছে, না জানি কোথা হতে এক রাজকন্যা তথায় এসে উপস্থিত। পরী কি অপ্সরী, পুষ্পরথ কি পক্ষিরাজ, কে যে কোথা দিয়ে তাকে সেখানে বসিয়ে গেল তা কেউ জানে না, সেও না। পুষ্পেলব চোখদুটি তার তখনও তন্দ্রাজড়িত। কিসের যেন একটা স্মৃতিমুহেলী তখনও তাকে ঘিরে রয়েছে। চোখ মেলে সে দেখল, জায়গাটা যেন একেবারে নূতন—সম্পূর্ণ তার অপরিচিত। কেন যে—কেমন করে সে এমন স্থানে এসে পড়েছে অনেকক্ষণ ধরে ভেবেও সে ঠিক করতে পারিল না। তবে তার মনে হতে লাগল—কি যেন তার ছিল, সেইটে হারিয়ে গেছে। কোথায় যেন একটা বীণা বেজেছিল—বড় মধুর, তারি রেশ তার কানের গোড়ায় এসে ফিরে ফিরে যাচ্ছে। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল—"কই গো?" উত্তর এল "এই যে।" ধনুকে সে চেয়ে দেখে নিকটেই দাঁড়িয়ে একজন—বড় আদর করে—বড় যত্নে ছুরে ভরা ওনটি নিয়ে তার মুখের কাছে ধরে বলছেন—"খাও, মা, বড়ক্ষিদে পেয়েছে, খাও। তোমার জন্যই ত আমার ঘাইটা দুধে এমন ভোরে এয়েছে, খাও।" সত্যই রাজকুমারীর বড় ক্ষিদে পেয়েছিল হাঁ করতেই সেই ক্ষীরধারা তার মুখে পড়তে লাগল, প্রথম ফোঁটায় ফোঁটায়, শেষে অবিরল স্রোতে একেবারে অমৃতের ধোরা। কতকালকার ক্ষিদে! সে পেটভরে' খেতে লাগল। যখন তৃপ্তি-লাভ হয়েছে, তখন কেমন একটা শান্তির আলস্য তাকে জড়িয়ে ধরল। কতক্ষণ এমনভাবে ছিল জানে না। কিন্তু যখন এভাব গেল, তখন চেয়ে দেখে আর সেই তেপান্তর মাঠ নেই—একটা কুটিরে সে তাঁর কোলের কাছে খেলা করছে—ডাকছে—"মা—মা—মা"। তিনি আনন্দে অধীর হয়ে তাকে চুমা খাচ্ছেন আর বলছেন, "আমার চঞ্চল, আমার চঞ্চলকুমারী, কোলে আসবে? এস। অনেকক্ষণত খেলা হল। আর কত খেলবে? এস।" বিদ্যুতের মত অতীত স্মৃতির একটা আভাস রাজকুমারীর মনের মধ্যে খেলে গেল—এই—এই—এই—ত। এ'কেই আমি হারিয়ে-ছিলাম—এই-ই আমার সেই হারাধোরতন। মনে হতেই সে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে উঠে, তাঁর দুই কাঁধে ঘাড় দিয়ে তাঁর বুকের মধ্যে মুখখানা গুঁজেছিল। কিসের অনুভব-সুখ সে তখন পেয়েছিল, তা সেই-ই জানে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তালে তালে পা ফেলে পদাতিক সৈন্যের মত কুচ করে করে চলে গেল। চঞ্চলকুমারী এখন হাসে, খেলে, বেড়ায়, নৃত্য করে। কোনখানে একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। এক কাজ করতে করতে আরেক কাজে ছুটে যায়ে। নিত্য পুতুল ভাঙে, নিত্য নতুন পুতুলের অনুআবদার করে। না পেলে মায়ের চুল ছিঁড়ে, কৈদেকেটে হলস্থুল বাধিয়ে দেয়—এমনি দুষ্ট হয়ে উঠেছে সে। একদিন এমনিতর কিসের যেন একটা বায়না ধরে মাকে অস্থির করছে। এমন সময় পো করে কে এক তালপাতের বাঁশী বাজিয়ে দিল। সে দৌড়ে বাইরে গিয়ে দেখে, তারই মত আর একটি গোলগাল মেয়ে ঐরূপ করছে। সে একদৃষ্টে তারদিকে চেয়ে থাকল আর শুনতে লাগল বাঁশীটার আওয়াজ কেমন মিষ্টি। নবাগত মেয়েটি বোধ হয় চঞ্চলের মনেরভাব বুঝতে পেরেছিল, তাই আস্তে আস্তে কাছে এসে বলে—"নেবে ভাই, এটি?" চঞ্চল হাত পাতল। সে বাঁশীটা দিয়ে বলে, "বাজাও

"বাজাও দেখি"। চঞ্চল পারলে না। তখন সে কৌশলটা শিখিয়ে দিল। আর পায় কে? ছুঁয়ের উপর দিয়ে বারবার বাঁশীটা বাজিয়ে কি যে তার আনন্দ হতে লাগল, তা আর কি বলব? তারপর মেয়েটির সঙ্গে সে আলাপ জুড়ে দিল তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে এপুতুল সে-পুতুল—এখেলা সেখেলা কত কি দেখাতে লাগল। এমনি করে মেয়েটির সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল।

এখন মেয়েটি তার খেলার সাথী। দুজনে যে কত খেলা—যখন তখন—নাওয়া খাওয়া ভুলে। মা ডেকে ডেকেও আর চঞ্চলের সাড়া পান না। সেকি খেলা! পুতুল, ন্যাকড়া, মাটী, ফুলফল, বিড়াল, কুকুর, কত কি তাদের খেলার জিনিষ। তারা ন্যাকড়া পরিয়ে পুতুলের সঙ্গে পুতুলের বিয়ে দেয়—তারা মাটির ব্যাঞ্জন, মাটির ভাত রাঁধে - বিড়ালকে কাপড়ে বিছানায় শোয়ায়—কুকুরকে বেয়াদবী করতে মানা করে, করলে তার কেশ মুচড়িয়ে শাসিয়ে দেয়। আবার ফুলগাছকে বউ বানিয়ে তার ডালে পুঁতির মালা পরিয়ে বরণ করে—তখন উলু দিবার কি ঘটা—তাতে আনন্দই বা কত।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই মেয়েটির সঙ্গে খুঁটিনাটি নিয়ে তার ঝগড়া হতে লাগল। খেলার জিনিষ নিয়ে গালাগালি—মনকসাকসি—মারামারি। মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার সব গোল মিটে যায়—আবার তারা খেলতে আরম্ভ করে।

এমনি করে দিন চলছিল। একদিন চঞ্চলকুমারীর বাড়ীতে একজন ভদ্রলোক এলেন বিদেশ থেকে। সেত তাঁকে কোনদিন দেখেনি—চেনে না, তাই তাঁর দিকে ফিরেও চাইল না। কিন্তু তিনি তাকে কোলে নিয়ে চুমা খেয়ে বল্লেন, "তোমার জন্যে কত কি খেলার জিনিষ নিয়ে এসেছি, দেখবে না?"

"কই, দেখাও দেখি" বলে আগ্রহপ্রকাশ করতেই তিনি তাঁর ভোরঙ্গ হতে নানাবিধ পোষাক পরিচ্ছদ—নানাবিধ গহনা—নানাবিধ ছবির বই খুলে খুলে দেখাতে লাগলেন। কিন্তু এগুলো আবার কি রকম খেলার জিনিস? তার মন উঠল না। সে মুখ ভার করে চলে যেতে চাইল। তিনি তাকে একটা পোষাক পরিয়ে, গলায় হার দিয়ে, পায়ে মল দিয়ে, চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়িয়ে আয়নাখানা সাম্নে ধরে বল্লেন, "দেখ, দেখি কেমন সুন্দর হয়েছ!" সে কিছুই বুঝল না। তবে আয়নার দিকে চেয়েই খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ও কে? কোথা হতে ও মেয়েটি এল? আয়নার পিছনদিকে চেয়েই খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ও কে? কোথা হতে ও মেয়েটি এল? আয়নার পিছনদিকে চেয়ে তাকে দেখতে পেল না। আবার আয়নার মধ্যে দৃষ্টি দিতে লাগল। তিনি তার বিস্ময় বুঝতে পারলেন, বল্লেন, [redacted]ষে তোরই মুখ। দেখছিস কেমন সুন্দর দেখাচ্ছিস তুই?" সে আরও বিস্মিত হয়ে গেল। সে বল্লে "আচ্ছা, এর মধ্যে তোমার মুখ কই?" তিনি আয়নায় মুখ দিলেন। সে একবার আয়নার দিকে একবার তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। দেখে যেন তার অনেকটা বিশ্বাস হল। তখন সেইখানা নিয়ে হেসে হেসে নিজের হাসিমুখ দেখতে লাগল। নিজের হাত তুলে দেখে—আয়নার মধ্যেও হাত তুলছে। নিজে দাঁত বার করে—আয়নার মধ্যেও তাই। বাঃ এইটাইত বেশ খেলার জিনিষ! তখন সেইখানা নিয়ে এক দৌড় দিয়ে সে খেলার সাথীটির কাছে গেল। ছুটতে গিয়ে পায়ে মল বেজে উঠল—রুমর—রুমর—রুম্—কি মজা!

সাথীটি তার বেশভূষা দেখে, তার আয়না দেখে একেবারে যেন অবাক্ হয়ে গেল। "এসব কে দিয়েছেরে?" সে জিজ্ঞাসা করলে চঞ্চল পরিচয় দিবে কি?—বল্লে একটা লোক এয়েছে আমাদের বাড়ীতে—সেই-ই দিয়েছে এসব।"

"তবেত সে বেশ খেলার সাথী হবে। চ' যাই তার কাছে।"

দুজনে তাঁর কাছে গেল। চঞ্চল জিজ্ঞাসা করল—"তুমি আমাদের খেলার সাথী হবে? তোমার কি বলে ডাকব?"

তিনি হাসলেন, বল্লেন, "খেলা করব বলেইত আমি এসেছি। কত খেলা আমি জানি, তা দেখবে এখন। আমায় তুমি বাবা বলে ডেকো।"

পিতাপুত্রীতে অনেকদিন ধরে খেলা হল। সেটা ঠিক খেলা নয়। তবে খেলার মত করেই পিতা প্রতিদিন চঞ্চলকে অনেক বিষয় শিখিয়ে দিতে লাগলেন। খেলার মত করেই সে লেখাপড়া শিখে ফেল। তখন এবই সেবই খুঁজে কেবল ছবি দেখে আর গল্প পড়ে। কোথায় গেল পুতুল? কোথায় গেল খেলার সাথী? রাতদিন সে বাবাকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে চায় না। তাঁর কাছে এটাওটা প্রশ্ন করে করে কত কি সে জানতে লাগল। তার কৌতূহলের আর নিবৃত্তি নাই। এমনিতর তার ঝোঁক!

(৩)

বয়েস হয়েছে। চঞ্চলের এখন বিয়ে দিতে হবে। পিতামাতা সেই কথার আলোচনা করেন। পাড়াপড়শীরা তাকে দেখে ইঙ্গিতে তাই জানায়। সমবয়সীরা হেসে হেসে কত কি বলে। চঞ্চল ভাবে—কোথায় তাকে যেতে হবে—কার হাতে সে হাত দিবে—কার সাথে সে ঘর করবে—কেমন করে সে নিজকে সেখানে বিলিয়ে দিতে পারবে! সে কেমন মানুষ যার জন্যে তার দেহমন নৈবেদ্যের মত প্রস্তুত হয়ে আছে? সে কি মানুষ? না, দেবতা? মানুষই বটে মানুষ! কিন্তু মানুষের কথা মনে হতেই তার প্রাণটা শুকিয়ে যায়। মানুষ যে ছদিনের! মানুষত থাকে না! সব ভালবাসার উপহার পায়ে ঠেলে মানুষ যে হঠাৎ কোথায় পলায়ন করে! না—না, মানুষকে সে তার সর্ব্বস্ব দান করতে পারবে না। ভয় বড় ভয়।

কল্পনায় যখন আগুনের বাঁশী বাজতে সুরু করে, ঠিক সেই সময় এই ভয় এসে তার সব সুরকে বেসুরা করে দিয়ে চলে যায়—সে শিউরে ওঠে।

একদিন রাত্রে সে স্বপ্ন দেখল। দেখল—শুক্লপক্ষের রাত্রি। কিন্তু জোৎস্না নাই; ঘনমেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। প্রকৃতিটা শুম হয়ে বসে আছে একটি বোবা মেয়ের মত। একটা ঘরে অনেকগুলা মেয়ে মানুষ তাকে ঘিরে ব'সে সাজ পরিয়ে দিচ্ছে—কিন্তু সেও যেন আঁধারে—আবছায়ায়। কেন না ঘরে আলো জ্বলছিল কি না বুঝাই যাচ্ছিল না। কারো মুখে কথাটি নাই—হাসিমাত্র নাই। শিরাই বোধ হয় বর এসে পড়বে, তার জন্য চারদিকে একটা ব্যস্ততা-ব্যগ্রতা হঠাৎ দূরে সানাই চোলের আওয়াজ শোনা গেল। তা শুনে চঞ্চলের বুকটা ধড়াস্ করে উঠল—কেমন একটা আতঙ্কে তার সকল শরীরে কাঁটা দিল। সে আওয়াজ বহুদূরে শোনা যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে তা কাছে—অতিকাছে শোনা গেল। এ কি? এ ত সানাই চোলের আওয়াজ নয়—এযে "বলহরি—হরিবল" ধ্বনি! বহুলোকে একটা মড়া নিয়ে আসছে। যারা তাকে সাজিয়ে দিচ্ছিল, তারা ডুকরে কেঁদে উঠল। তখন ঘরের ভিতর কান্না—বাইরে কান্না—চারদিকে কেবল কান্না শোনা যেতে লাগল চঞ্চলের কিন্তু কান্না এল না। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, চোখের পাতা ঘুমে এসেছিল এমন সময় হঠাৎ কে এসে তার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন,: "উঠে এস মা, উঠে এস। মড়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে কেন? ছিঃ! অমর পাত্র যে তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন, মান নেই? এস আমার সঙ্গে।" সে চেয়ে দেখল এক সন্ন্যাসী। তাঁর সমস্ত দেহ হতে এমনি একটা জ্যোতি বেরুচ্ছে যে সমস্ত ঘরটা আলো হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে যাবে বলে পা বাড়াতে গিয়েই খাটের রেলিং-এ বাধা পেয়ে তার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল।

ঘুম ভেঙ্গেও কিন্তু স্বপ্নের রেশ তার মন হতে ঘুচল না। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল মানুষকে সে বিয়ে-করতে পারবে না—সে মানুষকে প্রাণ সমর্পণ করতে পারবে না। মানুষের সঙ্গে তার জীবন-যাপন অসম্ভব। যে অস্থায়ী—যে ক্ষণভঙ্গুর—যে মরে, সে তার প্রিয়তম হতেই পারে না। কিন্তু স্বপ্নে উল্লিখিত সেই অমর পাত্রটি কে? কোথায় তার বাস? সে কি যথার্থই আছে? না, স্বপ্ন তাকে ছলনা করে গেল?

চঞ্চলকুমারী—রাতদিন এখন এই স্বপ্নের কথাই ভাবে। কাজকর্ম, লেখাপড়া, গল্প শুনতে আর তার আগের মত আসক্তি রইল না। তার যৌবন-লাবণ্য-মণ্ডিত মুখের উপর একটা উদাসিন্যের পাণ্ডুর রেখা দেখা দিল। পিতামাতা বিষণ্ণ ছিলেন। সখীসঙ্গিনীরা মেলামেশা কম করে দিল। প্রতিবেশীরা নানাবিধ জল্পনা কল্পনা

আরম্ভ করল। শুনা যায় কেউ কেউ না কি এমন মতও প্রকাশ করেছিলেন যে চঞ্চলকুমারীর এ সব পাগল হওয়ার পূর্ব্বলক্ষণমাত্র।

চঞ্চল খেতে বসে খায় না—ঘুমোতে যেয়ে ঘুমোয় না। ভর্ৎসনা করলে গায়ে মাখে না। আদর করলে বিরক্ত হয়। গল্প করে অন্যমন করতে গেলে হঠাৎ উঠে অন্যত্র চলে যায়। রাতদিন কি যে ভাবে তা সেই-ই জানে। মনের কথা কাউকে বলে না। আবার সময় সময় দেখা যায় তার চোখের পাতা ভিজে উঠেছে—অথবা অকারণ হাসি তার মুখে লেগে রয়েছে। পিতামাতা প্রমাদ গণলেন। এমন মেয়েকে ত পাত্রস্থ করা কঠিন হবে। এ-কে নিয়ে সংসারেও যে বিষম অশান্তি! তবু পাত্রের সন্ধান চলতে থাকল। তবু সহনাপত্র গড়াতে দেওয়া হল—তবু বিবাহের অন্যবিধ আয়োজন বন্ধ থাকল না।

হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখা গেল—চঞ্চলকুমারী ঘরে নাই—বাড়ীতে নাই—কাছে কিনারে কোথায় গেল? খোঁজ্ খোঁজ্। হুলস্থুল পড়ে গেল। নানাদিকে লোক ছুটল খুঁজে আনতে। ঘরছেড়ে সে কোথায়ও যায় নি, সে অল্প কতদূর যাবে? পথচলা যার কোনদিন অভ্যাস নাই, সে কতটুকুই বা যেতে পারে। খোঁজ্ খোঁজ্। কিন্তু হাজার খুঁজেও আর তার দেখা পাওয়া গেল না। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, কেউ তার সন্ধান দিতে পারল না। হতাশ হয়ে পিতামাতা বসে পড়লেন। পাড়াপড়শীরা কত কি ধারণা করে নেয়। কত গুজব যে রটে গেল তার আর ইয়ত্তা নাই। হায়রে অদৃষ্ট!

"এমনি করে মনে মনে আর আমায় কত ঘুরিয়ে মারবে যাকে দেখাতে চেয়েছ। তাকে দেখাও। আর বিলম্ব কেন? এখনও কি দেখাবার সময় হয় নি? আমি যত কাঁদি তুমি ততই যে হেসে উঠ—আমার কথার কোন উত্তর দাও না! কেন, বলত, তুমি এত নিষ্ঠুর?"

একটি রূপসী যুবতী একজন সন্ন্যাসীকে ঐ কথা বলছিল, তোমরা তাকে চিনতে পার নি? সে সেই চঞ্চল কুমারী বাড়ী হতে বেরিয়ে কোন্ পথ দিয়ে কোথায় যে সে চলে গিয়েছে, তা তার জানা নাই। হঠাৎ একদিন জ্যোৎস্না রাতে ঘাটের মধ্যে দেখতে পেল এই সন্ন্যাসীকে দেখামাত্র তার মনে হল—কোথায় যেন এঁকে দেখেছি। স্মরণ করতে করতে মনে এসে গেল স্বপ্নে এঁর সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে "অমর পাত্রের" সন্ধান সে জানতে চাইল। কত কাকুতি মিনতির পরে সন্ন্যাসী তার হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে বল্লেন—"চল আমার সঙ্গে। যাকে দেখতে চাচ্ছ, তাকে দেখতে পাবে। স্থির হও। স্থির না হলে ত তাকে দেখা যায় না, যা।" সেই অবধি সে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। কত দেশ, দেশান্তর, কত অনাহার, কত অত্যাচার, কত রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় যে তাকে ঠেলতে হয়েছে, তা সেই-ই জানে। এবার আবার চলছে সে মনে মনে। কণ্টকাঘাতে তার হাত পা সব ক্ষত-বিক্ষত। বড় বেদনায় তাই সে সন্ন্যাসীকে ঐ পূর্ব্বোক্ত কথা বল। এ কথা যে শুধু আজই সে বলেছে, এমন নয়। পূর্ব্বে আরও অনেকবার এ কথা বলা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সন্ন্যাসী কিছু উত্তর দেন নি, কেবলমাত্র হেসেছেন, আর চলবার সময় চলতে বলেছেন।

কথা কয়টি বলে চঞ্চল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। সন্ন্যাসী হাস্যমুখে তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি ফিরালেন। কতক্ষণ এমন-ভাবে চলে গেল। কারু মুখে কোন কথা হল না। বিশেষ সন্ন্যাসীর গাম্ভীর্য্য দেখলে চঞ্চল বড় ভয় পায়, বেশী কিছু বলতে চাইলেও বলতে পারে না। সন্ন্যাসী আকাশ হতে দৃষ্টি নামাইয়া আবার চঞ্চলের মুখের উপর স্থাপন করলেন। করে বল্লেন, "শোন চঞ্চল, তোমার আসল নামটি কি তা কি তুমি জান? তুমি কে? কোথা হতে এসেছ, কেনই বা এসেছ, এ সব কি তোমার জানা আছে? জানা নাই। আরও কিছুদিন থাক তুমি বুঝতে পারবে তোমার আসল পরিচয়টি কি। যেদিন তুমি টের পাবে তোমার ঐ অন্ধকুমির বাপ মায়ের কাছ হতে তোমাকে ছিনিয়ে আনা হয়নি—

শুধু আহার নিদ্রার ভয়ের মধ্যে হাবুডুবু খেতে তোমায় জন্ম নয়। সেইদিন তুমি দেখতে পাবে অমর পাত্রটি নিজে এসে তোমাকে বরণ করে নিয়েছেন।

"কিন্তু সে দিন আর কতদূরে, প্রভু?" "বেশী দূর নয়। ঐ দেখ একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে—উহার মধ্যে একটি গুহা আছে। সেইটা পার হতে পারলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

"তবে উঠুন ত্বরা করে। দেরী কেন? চলুন, ঐ পাহাড়েই যাই—দেখি, কপালে কি ঘর!"

কিন্তু পথ চলতে গিয়ে চঞ্চল দেখে দূর হতে পাহাড়টা যত কাছে বোধ হয়েছিল, সেটা যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। ধরতে গিয়ে ধরা যায় না, এ আবার কেমন? তার ক্লান্তিবোধ হতে লাগল—কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল—জিভ শুকিয়ে এল। ভাবল একটু বিশ্রাম করি। কিন্তু সন্ন্যাসী তাকে যে দ্রুতবেগে পথ দেখিয়ে চলছিলেন, সে বিশ্রামের কথা ওঁকে মুখ ফুটে বলতেই পারল না। বিশেষতঃ সেই-ই ত সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করে চালিয়েছে। এখন নিজে থামতে চাইলে, তিনি থামবেন কেন? থামতে দিবেন কেন?

এমনি করে ক্লান্তি ও চিন্তা নিয়ে চলতে চলতে সে কিন্তু অনেকটা উঁচুতে এসে উপস্থিত হয়েছে—হঠাৎ বাইরের দিকে—নীচুর দিকে নজর দিয়ে তা সে বুঝতে পারল। এবার খাড়াই পাহাড়ে উঠবার পালা। পথ নাই। বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পাশ দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে তবে উঠতে হবে—কি ভয়ানক! তার মাথা ঘুরতে লাগল। আর বুঝি শক্তিতে কুলোয় না। এবার বুঝি এইখান হতেই ফিরতে হল! ব্যথায় পা অসাড় হয়ে এসেছে—দু'একবার আছাড়ও খেতে হয়েছে। শক্তির সীমা আছে। আর নয়। ওগো মৃত্যুহীন বর, তোমার গলায় মালা দিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কে জানত তাতে এত কষ্ট—এত বিপদ? জানলে বোধ হয় এত ক্লেশ সহ্য করতে সাধ হত না।

চঞ্চল চোখ বুঁজে বসে পড়ল। বসে পড়ল না—একেবারে শুয়ে পড়ল লতার মত। তার সমস্ত শক্তিটুকু যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে! সন্ন্যাসী তখন করুণার ভরে তাকে ধরে ফেলেন। বলেন, "শক্তির বড়াই না করলে কি মা শক্তিমানে বিশ্বাস জন্মে? এইবার চোখ চাও—দেখ, তোমার সম্মুখে কি"। চঞ্চল চোখ মেলে দেখল একটা ভ্রমরকালো গুহামুখ তার সম্মুখে!

"যাও মা, এর ভিতর দিয়ে চলে যাও—অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

কিন্তু গুহামুখ যে বড় ক্ষুদ্র। সে কেমন করে তার মধ্যে যাবে? অসম্ভবকে সম্ভব করবে সে কেমন করে?

"যাও মা, ভয় নেই, পারবে।" চঞ্চল উঠে বসল। তার গায়ে যেন আবার জোর ফিরে এসেছে। ভাল করে চেয়ে দেখল সেই কালো বিদ্যুৎবৎ গর্ত্তটা। সেটা তার নিকটে কি দূরে তা ঠিক করতে পারল না। বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে লক্ষ্য রেখে ছুটতে গিয়েই দেখে সে একেবারে তার সামনে এসে পড়েছে। কিন্তু তার মধ্যে প্রবেশ করতে গিয়ে সে হাঁপ ছেড়ে বাইরে এসে পড়ল। কি অন্ধকার গুহা! জলের মধ্যে বেশীক্ষণ ডুবতে গেলেই যেমন দমবন্ধ হবার ভয়ে লোক হাঁপিয়ে উপরে উঠে পড়ে, বার বার প্রবেশ করতে গিয়ে সেই দশা হল চঞ্চলকুমারীর। ও গুহার মধ্যে ঢুকতে গেলে যেন তার বর্ণাদর্শন লুপ্ত হয়ে যায়! গ্রহ-নক্ষত্র চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবী ধরণীর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সব যেন অন্ধকারে ডুবে যায়!—তার দেহমনজড়িত বাসনা কামনা সব যেন লুপ্ত হয়ে যেতে চায়। তাই ভয়ে হাঁপিয়ে উঠে সে বাইরে এসে পড়ে।

না—না বলে না—হল না। অসম্ভব—অসম্ভব। পৃথিবীর এই এমন আলো—এমন সুন্দর শোভা—এমন সহজভাব—এমন মধুর রসধারা ফেলে রেখে অন্ধকারের অতলগর্ভে নিমজ্জিত হতে পারব না—হতে চাই না। ক্ষমা কর, প্রভো, ক্ষমা কর। এবার এই পর্য্যন্ত। আমি মর্ত্ত্যের জীব, মর্ত্তাই আমার আপনার! আমার পিতামাতা, সখীসঙ্গিনী, তারা যে হাজার বন্ধনে আমায় জোরে টানছে—সে টান কি মধুর! আমি ভুল করে তা ভুলতে চেয়েছিলাম—আমি ভুল করে সে বন্ধন ছিঁড়তে গিয়েছিলাম—কি একটা বিকল নেশায়। আমার সে নেশা ভেঙেছে।

আমি মর্ত্যমানবের অনিত্য মমতার নিত্যধারারূপ খেলাকেই এখন শ্রেয় মনে করেছি—এ অন্ধকারকে নয়। বিদায় দাও আমাকে, আমি ফিরে যাই।

কিন্তু বিদায় চাইলে কি হবে? ফিরে যেতে চাইলে কি হবে? আবার ঐ বিমূঢ়া তাকে আকর্ষণ করল—আবার সন্ন্যাসীর আশ্বাস-বাক্য তাকে টেনে আনল—আবার কৌতূহল—আবার আগ্রহ—আবার চেষ্টা জেগে উঠল। এবার সে সব যেন চতুর্গুণ বেগে। কিন্তু চেষ্টা যেমন জাগল, তেমনি জাগল বিফলতা। দুঃখের অন্ত নাই। কি বিষম যুদ্ধ। হৃদয়ে তার আশা ও নৈরাশ্য ক্ষণে ক্ষণে উঁকি মারতে লাগল। শেষে কোন্ সময় সমস্ত চেষ্টার অজ্ঞাতসারে সে কেমন করে যেন সেই গুহার মধ্যে চলে গেল। গেল—একেবারে গেল—আর দেখা যায় না।

সে কি আর বেরিয়ে আসবে না? সে কি ওর মধ্যেই থেকে যাবে? সে কি অনন্তকাল ঐ গুহার মধ্য দিয়েই চলতে থাকবে?—কে জানে।

* * * *

বালার্ককিরণে প্রোদ্ভাসিত দিগন্তব্যাপী সহস্রবিহগ-রব-সহস্র প্রস্ফুটকুসুমগন্ধে প্রমত্ত। মেঘনির্মুক্ত নির্ম্মল নীল আকাশ। সর্ব্বস্থলে যৌবন-ভূষণ-ভূষিত বসন্তের আবির্ভাব।

চঞ্চল কেমন করে কোন্ সময়ে গুহার অপর প্রান্তে বের হয়ে এসেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—সে বুঝতেই পারছে না যে সে গুহার অন্য মুখ দিয়ে বের হয়েছে। তার মনে হচ্ছে, প্রবেশ-পথ ও নিষ্ক্রমণ-পথ দুটোই যেন এক! তার চোখে চমক লাগল। কিন্তু আলোকস্পর্শ তার অন্ধকার-অন্ধ নয়নকে যেন নূতন করে জাগিয়ে দিল। সে দেখে ধরণ-গগন মধুদেবতার সুকুমার কৌশলে একেবারে নূতনভাবে সজ্জিত—আর তার বক্ষের উপরে—ও কি?—ও কে? সমস্ত সুষমার আকর, সমস্ত জ্যোতির আধার। সমস্ত মাধুর্য্যের মূর্ত্তি এত নিবিড়ভাবে আবদ্ধ—এত গভীর প্রীতির সহিত সম্মিলিত যে হর্ষে সুখে তার বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

কতক্ষণ এমনিভাবে যাওয়ার পর তার বাক্‌শক্তি আবার ফিরে এল। সে নবাগন্তুকে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "আমার প্রাণের প্রাণ, আমার যথাসর্ব্বস্ব, আমার চিরবাঞ্ছিত, আমার চরিত অমর দেবতা, এতদিনে তোমার দয়া হল? এত করুণ তুমি, তোমার কেন এ নিষ্ঠুর লুকোচুরী, দেখা দিতে চেয়েও দেখা দাও না! চিরকরুণ যে, সে কি কখন চির-অপরাধীর অপরাধ নিয়ে থাকে? এত শক্তিমান যে, সে কি কখন চিরদুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে? বল, বল, তোমায় করুণ বলব, না, নিষ্ঠুর বলব? না—না, তুমি বোধ হয় ও দুটোর কিছুই নও। তুমি পাগল—তাই বলেই তোমাকে ডাকতে হবে।"

হাস্যরুচিতে দিগ্‌দেশ শোভিত করে নবাগন্তুক বল্লেন, "আমি ত ও সব কিছুই নই, প্রিয়তম। আমি কি তোমায় আজই নূতন করে দেখা দিলাম? রোজই ত দেখা দিচ্ছি—কতদিন হতে কতরূপে! তুমি আমার দিকে ফিরেও তাকাও নি। আজ নূতন করে দেখছ বলেই নূতন লাগছে। কিন্তু আমি চির পুরাতন। তোমরা নূতন করে দেখ বলে আমি আবার চিরনূতন।"

"মনে পড়ে—শীধুর পরিপূর্ণ ঘন নিয়ে আমি তোমার ক্ষুধাতুর মুখের কাছে ধরেছিলাম—তুমি কত আগ্রহে তা পান করেছিলে? মনে পড়ে—মা—বলে আমায় তুমি জড়িয়ে ধরতে—আমাকে ছেড়ে একদণ্ডও কোথাও থাকতে চাইতে না? তুমি অস্পষ্টভাবে আমাকে ধরতে পেরেছিলে, কিন্তু স্পষ্ট করে বুঝতে পারনি। তাই আবার আমি অন্যরূপে তোমায় দেখা দিলাম। তালপাতের বাঁশী বাজিয়ে তোমার দরজার সামনে উপস্থিত হলাম—মনে পড়ে? কিন্তু সেরূপেও তুমি আমায় ভাল করে ধরতে পারনি। আমি নানারকম পোষাক পরিচ্ছদ শিকারসজ্জা নিয়ে আবার তোমায় দেখা দিলাম। কিন্তু তুমি চিনলে কই? তুমি ধরলে কই? তোমার কেবল ক্ষণিক মাতামাতি। আরম্ভেই হাঁপিয়ে ওঠ। তুমি কেবল নূতন হতে নূতনে লাফিয়ে চলে যেতে চাও। নিবিড় করে কোনটাও ধর না—কোনটার গভীর ছাপই ত গায়ে মাখ না। তবু তুমি আমায় দেখতে চেয়েছ। তাই সন্ন্যাসী

হয়ে আবার দেখা দিলাম। এবার তুমি একটু সামলে গেলে—তাকে ছাড়লে না—তার অত্যাচারেও টলে না—তার কথামতোই চলতে থাকলে। কিন্তু তাকেও তুমি চিনতে পার নি। অমর পাত্রকে তোমার বরণ-মালা দিতে গেয়ে ব্যাকুল হয়ে তাকেও ব্যাকুল করে তুলেছিলে। সেই ব্যাকুলতার দরুণই আজ চেয়ে দেখ, শান্তা, (তুমি চঞ্চল নও—সেটা তোমার মিথ্যা নাম!) আমি কে? আর তুমিই বা কে?

শান্তা দেখল তার অমর পাত্র কতরূপে—স্থাবরজঙ্গম কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী মানব—তার মাতাপিতা সখীসঙ্গিনী সন্ন্যাসী—কতরূপে তার সামনে উপস্থিত। আর সেরূপ ও তার নিজের রূপের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সে বরণ-মালা পরিয়ে দিল। দিতেই সকলের কণ্ঠে সেই পবিত্র মাল্যগাছি বিজড়িত হয়ে গেল। কি আশ্চর্য্য!—তার নিজের গলাতেও সেই মালা দুলতে লাগল—কি সুন্দর!

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

যুক্তি-কল্পতরু।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

(৬৮—৮০ পৃষ্ঠা)।

ধ্বজ-যুক্তি।

রাজসেনার চিহ্নস্বরূপ দণ্ডকে ধ্বজ বলে; তাহা আবার সপতাক ও নিষ্পতাকভেদে দ্বিবিধ।

নৃপতিদিগের (ধ্বজের) দণ্ড পতাকার দেহতুল্য দীর্ঘ হইবে।*

সপতাক ধ্বজের অগ্রভাগে দণ্ডের আকৃতি অঙ্কিত করিলে (১) তাহাকে 'অগ্রদণ্ড' ধ্বজ বলে; ইহা সাধারণের উপযুক্ত নহে।

বংশ (বাঁশ), ধন্বন, শাল, পলাশ, চম্পক, কদম্ব, নিম্ব (২) অথবা বজ্রধারণ কাষ্ঠদ্বারা ধ্বজের দণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। বংশদণ্ড সকলের পক্ষেই সমৃদ্ধিদায়ক।

পতাকা আট প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাত ও প্রস্থে একহাত পতাকার নাম 'জয়া' দৈর্ঘ্যে এক হাত ও প্রস্থে একপাদ (হস্তের এক ভাগ) করিয়া বৃদ্ধি করিলে যথাক্রমে জয়া, বিজয়া, ভীমা, চপলা, বৈজয়ন্তী, দীর্ঘা, বিশালা এবং লোলা এই আট প্রকার পতাকা হইবে।

পতাকার রক্ত, শ্বেত, অরুণ, পীত, চিত্র (নানা বর্ণ), নীল, কর্ব্বুর (হরিদ্রাভ) এবং কৃষ্ণবর্ণ হইবে। "ক'বন্ধ" প্রভৃতি আট প্রকার পতাকার আট প্রকার বর্ণ।

কলস, দর্পণ, চন্দ্র (অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি) এবং পদ্মকোষ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পতাকায় বিন্যাস করিবে।

গজাদিযুক্ত জয়ন্তী পতাকার নাম সর্ব্বমঙ্গলা। গজ, সিংহ, হয় এবং বাঘ্র যথাক্রমে চারি প্রকার রাজার পক্ষে প্রশস্ত। হংসাদিযুক্ত পতাকার নাম অষ্টমঙ্গলা। হংস,

---

* যুক্তির মূলকে এই শ্লোকার্দ্ধ আরও তিনশ্লোক পরে আছে, তাহাতে অর্থ সঙ্গতি হয় না; সুতরাং শব্দকল্পদ্রুমের ধ্বজ শব্দের উদ্ধৃতাংশ অনুসারে এই শ্লোকার্দ্ধ এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল। (১) জয়া। (২) নৈম্বো।

ময়ূর, শুক এবং চাষপক্ষী যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষে প্রশস্ত। চামরাদিযুক্ত সেই পতাকা 'সর্ব্ববৃদ্ধিদা'। চারি প্রকার রাজার পক্ষে যথাক্রমে চারি, তিন, দুই এবং এক (১) সংখ্যক চামর, চাষপক্ষ, বিচিত্রবস্ত্র ও শুভ্রবস্ত্র [ধ্বজাগ্রে প্রশস্ত ; ধ্বজাগ্রে যদি দুইটী পতাকা বিন্যস্ত হয় তাহা হইলে, তাহা 'সর্ব্বভোগদা' (২) হইয়া থাকে, ইহা চক্রবর্ত্তী নৃপতি ব্যবহার করিবে। পতাকার বর্ণ পূর্ব্বের মত হইবে।

কুম্ভ, দর্পণ, চন্দ্র ও পদ্মকোষ যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং মিশ্র ধাতুদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া নৃপতিদিগের পতাকাগ্রে স্থাপন করিবে তাহাতে আধারস্তম্ভ বিন্যাসও করিবে।

মকর, গজ, সিংহ ও ব্যাঘ্র এই চারি পশুর মুখাকৃতি বিশিষ্ট (৩) পতাকা 'সর্ব্বসিদ্ধিদা' হইয়া থাকে ; ইহার নাম ভেরবরী পতাকা। রবি প্রভৃতির দশায় জাত ব্যক্তিদিগের পতাকায় যথাক্রমে মকর, গজ, সিংহ, ব্যাঘ্র, ঘোটক, মৃগ, শুক এবং শুচির (?) আকৃতি প্রধান করিবে। ইহা নৃপতিদিগের পতাকা নির্ণয় উক্ত হইল।

অন্যের পতাকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে পতাকালক্ষণ কথিত হইতেছে।

পদাতি সেনাধিপতির পতাকার পরিমাণ ক্রমে এক বিতস্তি (দশাঙ্গুল) (৪), এক হস্ত ও দুই হস্ত এইরূপে দ্বিগুণ করিয়া বৃদ্ধি হইবে। ইহাতে বুঝা গেল সহস্রাধিপতির পতাকা চারি হস্ত হইবে।

পতাকা-দণ্ডের পরিমাণ পতাকার দেড়গুণ হইবে। বর্ণ প্রভৃতি সকলই পূর্ব্বের মত। সম্পাতক ধ্বজ দীর্ঘ ও ছোট দুই প্রকার হইয়া থাকে। অনুপ প্রভৃতি ধ্বজাগ্রে বিন্যাস করিবে। এই পতাকালক্ষণ সংক্ষেপে কথিত হইল।

যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপে বিচার করিয়া পতাকা নির্ম্মাণ করে, তাহার ধন, খ্যাতি, বংশ, পরাক্রম ও বলের উন্নতি হয়। যে রাজা অজ্ঞান হেতু অন্যরূপ পতাকা করে, সে যুদ্ধকালে ভগ্নদন্ত হস্তীর ন্যায় বিনষ্ট হয়।

(১) পক্ষেষু।
(২) সর্ব্বভোগদা।
(৩) মুক্তা।
(৪) বিতস্তি বধ।

নিষ্পতাক ধ্বজ।

ইহার দণ্ডের নিয়ম সম্পতাক ধ্বজারই মত, কেবল দৈর্ঘ্যে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে।

দণ্ড, পক্ষ, পদ্ম, কুম্ভ, পক্ষী এবং মণি এই ছয় বস্তু দ্বারা লক্ষিত নিষ্পতাক ধ্বজ যথাক্রমে জয়, কপাল, বিজয়, ক্ষেত্র, তত্ত্ব (?) এবং শিবনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

রাজ-সৈন্যের দেহ দৈর্ঘ্যানুসারে দণ্ডের দৈর্ঘ্য হইবে। উক্ত দণ্ড, পক্ষ প্রভৃতি উপরের দিকে দিবে।

মঙ্গলেচ্ছু ত্রিবিধ (১) (জাঙ্গল, আনূপ এবং সাধারণ দেশের অধিপতি) রাজার ধ্বজাগ্রে যথাক্রমে ময়ূর, চাষপক্ষী এবং মাতঙ্গরত্নের পক্ষ প্রধান করিবে।

রাজার নিষ্পতাক ধ্বজে পদ্ম, কুম্ভ, পক্ষী ও মালা যথাক্রমে উপর্য্যুপরি প্রধান করিবে। পদ্মের আট, ষোল, বত্রিশ বা চৌষট্টি দল থাকিবে। কুম্ভ আট বা দশদলযুক্ত অথবা ষোল হইলে সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হংস, চাষ, শুক এবং ময়ূরপক্ষী প্রশস্ত।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের ধ্বজ যথাক্রমে বজ্র, পদ্মরাগ, নীল, বৈদূর্য্যমণি বিন্যাস করিবে।

ত্রিবিধ (১) (জাঙ্গল, অনূপ, সাধারণ) নৃপতিদিগের নিষ্পতাক ধ্বজের পদ্মাদি নির্ম্মাণে যথাক্রমে স্বর্ণ, রজত এবং মিশ্রিত স্বর্ণ ও রজত যোগ করিবে।

চক্রবর্ত্তী রাজার বিশাল নামক ধ্বজের অগ্রভাগে এক হস্ত পরিমাণ পতাকা থাকিবে এবং দুইধারে দুইটী চামর থাকিবে।

ইহা রাজার ধ্বজের বিষয় কথিত হইল, এখন অন্যের সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

ধ্বজের উচ্চতা বিংশতি হস্তের অধিক বা দশ হস্তের ন্যূন হইবে না। দশ হইতে বিংশতি হস্ত পর্য্যন্ত এক এক হস্ত করিয়া বৃদ্ধি করিলে দশ প্রকার ধ্বজ হইয়া থাকে, ইহা

[১] বলেঃ।

যথাক্রমে সহস্রাধিক হইতে আরম্ভ করিয়া অযুতাধিক পর্য্যন্ত সেনাব্যক্তিগণ ব্যবহার করিবে। সহস্রাধিক হইতে ন্যূন যোদ্ধা ধ্বজ ধারণের যোগ্য নহে। কোটিপতি হইলেও ধ্বজ বিংশতি হস্তই হইবে। [আর অধিক উচ্চ হইবে না।] এই স্থলে বর্ণ ও ভূষণাদি পূর্ব্বের মতই করিবে। নিষ্পতাক ধ্বজের, ধ্বজের গুণ স্থিরতা ও চিত্রতা। [পূর্ব্বে নিষ্পতাক ধ্বজের গুণ বলা হইয়াছে দীর্ঘতা ও নমুতা]। এই বিবিধ ধ্বজের যে দুই প্রকার চিহ্ন কথিত হইল ইহা বিশিষ্ট ধ্বজের পক্ষেই জানিবে, সাধারণ ধ্বজের পক্ষে নহে। ভোজরাজ ইহাই নিষ্পতাক ধ্বজের লক্ষণ বলিয়াছেন। ইহা বিচার করিয়া চলিলে চিরকাল সুখলাভ হইয়া থাকে। দম্ভ বা অজ্ঞান হেতু যে ইহার অন্যথাচরণ করে, সে কষ্ট পায়, তাহার খ্যাতি, বংশ এবং বল নষ্ট হইয়া থাকে।

ধ্বজ-যুক্তি শেষ।

উপকরণ যুক্তি।

ছত্র, ধ্বজ, সিংহাসন এবং যান ভিন্ন অন্য যে সকল বস্তু রাজ্যে প্রয়োজন হয়, তাহার নাম উপকরণ; তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়টীরই উপকরণ নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

চামর, ভৃঙ্গার, চষক [পানপাত্র], প্রসাধনী [চিরুনি], বিতান (চন্দ্রাতপ), খট্টা ব্যজন, দর্পণ [আরসী] এবং বস্ত্র এই নয়টিকে রাজোপকরণ বলে।

চামর যুক্তি।

দুই হস্ত উচ্চ [দীর্ঘ], শুক্লবর্ণ, সুবর্ণ দণ্ডবিশিষ্ট ও হীরক ভূষিত রাজ-চামরের নাম 'ভব্য', ইহা সুপ্রশস্ত হইয়া থাকে। চামরের দৈর্ঘ্য বলিলে দণ্ড বা চামর কেশের [১] দৈর্ঘ্য বুঝিবে।

রবি প্রভৃতির দশার জাত ব্যক্তিদিগের পক্ষে [ভব্যের মান হইতে] এক এক হস্ত বৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে ভব্য, ভদ্র, জয়, শীল, সুখ [২], সিদ্ধি চল এবং স্থির নামে চামর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

[১] ত্রিবিধানাং।

[২] সুখঃ।

ভিন্ন দেশের [১] [আনূপ, জাঙ্গল, সাধারণ] অধিপতির চামরদণ্ড নির্ম্মাণে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুক্তা এই তিন ধাতু ব্যবহার করিবে। জাঙ্গল [জলশূন্য দেশের] রাজা স্থলজ চামর এবং আনূপ [জলবহুল দেশের] রাজা জলজ চামর ব্যবহার করিবে।

ব্রাহ্মণাদি জাতির চামরদণ্ডে যথাক্রমে হীরক, পদ্মরাগ, বৈদূর্য্য এবং নীলমণি ব্যবহার করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতীয় নৃপতিদিগের চামর যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত ও নানা বর্ণের হইবে। রাজকেশের চামর সাধারণ রাজা ব্যবহার করিবে না। ভব্য অপেক্ষা ছোট চামর উত্তম নহে।

স্থলজ ও জলজভেদে চামর দ্বিবিধ।

স্থলজ চামর।

সুমেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য, কৈলাস, মলয়, উদয়গিরি, অস্ত গিরি এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতে চমরী মৃগ জন্মে, তাহাদিগের কেশের নাম চামর।

সুমেরু চামর পীতবর্ণ, হিমালয় ও বিন্ধ্যের শ্বেতবর্ণ, কৈলাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ, মলয়ের শুক্ল ও পিঙ্গল, উদয়গিরির রক্তবর্ণ, অস্তগিরির নীল ও শুক্লবর্ণ কোন কোনগুলি বা কৃষ্ণবর্ণ এবং গন্ধমাদনের চামর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। অন্যান্য পর্ব্বতের চামর প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ হয়।

সেই চমরীগুলি আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতিভেদে চারি প্রকার, ইহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্বগুলির গুণ অধিক।

যে সকল চমরীর কেশগুলি সুদীর্ঘ, নম্র, স্নিগ্ধ ও কোমল এবং বিরল সন্নিবিষ্ট এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থিযুক্ত তাহারা ব্রাহ্মণ জাতি। সংস্কার না করিলেও ইহাদিগের চামর নির্ম্মল হইয়া থাকে।

যাহাদিগের কেশ দীর্ঘ, শুক্ল [ধোটা], কঠিন, ঘনসন্নিবিষ্ট তীক্ষ্ণাগ্র এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থিযুক্ত, তাহারা ক্ষত্রিয় জাতীয় মৃগ। ইহাদিগের চামর ও সংস্কার না করিলেও নির্ম্মল থাকে।

[১] ত্রৈদেশানাং।

যাহাদিগের কেশ দীর্ঘ, গুরু, কঠিন, ঘন সন্নিবিষ্ট এবং বৃহৎ গ্রন্থিযুক্ত তাহারা বৈশ্য জাতীয় চমরী। ইহাদিগের চামর সংস্কার করিলে নির্ম্মল হয়, নতুবা মলিন থাকে।*

যাহাদিগের কেশ খর্ব্ব, গুরু (মোটা) বিরল সন্নিবিষ্ট (১) কর্কশ এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থিযুক্ত তাহারা শূদ্রজাতীয় চমরী। সংস্কার করিলেও ইহাদের মলিনতা দূর হয় না।

দীর্ঘতা, লঘুতা, স্বচ্ছতা ও ঘনতা এই চারিটী চামরের গুণ। খর্ব্বতা, গুরুতা, বিরলতা (২) ও মলিনতা এই চারিটী চামরের দোষ।

চামর দীর্ঘ হইলে দীর্ঘায়ু লাভ, লঘু হইলে ভয় নাশ, স্বচ্ছ হইলে ধন ও খ্যাতি লাভ এবং ঘন হইলে স্থির সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে এবং খর্ব্ব হইলে অল্পায়ু, গুরু হইলে বিষম ভয়, বিরল হইলে রোগ ও শোক এবং মলিন হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে।

জলজ চামর।

লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, জল, দধি এবং ক্ষীর এই সাত সমুদ্রে সাত প্রকার চামরী থাকে। ইহাদিগের পর পর গুলিরই গুণ অধিক।

মকর প্রভৃতি জলজন্তুগণ এই চমরীর পুচ্ছ কাটিয়া লয়; পুণ্যশীল ব্যক্তি কদাচিৎ তাহা সমুদ্রতীরে পাইয়া থাকেন।

লবণসমুদ্রে শীতবর্ণ, গুরু এবং লঘু (১) উভয় প্রকার চামরই জন্মিয়া থাকে; ইহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অল্প অল্প চট্ চট্ শব্দ হয়।

ইক্ষুসমুদ্রের চামর তাম্রবর্ণ, নির্ম্মল এবং লঘু হয়; ইহার বাতাসে মক্ষিকা ও মশক পলায়ন করে।

সুরাসমুদ্রের চামর মলিন, কর্ব্বুর (শ্বেত ও পিঙ্গল মিশ্রিত) বর্ণ, গুরু এবং কর্কশ হইয়া থাকে; ইহার গন্ধে বৃষ (২) হস্তীও মত্ত হইয়া উঠে।

ঘৃতসমুদ্রের চামর স্নিগ্ধ, শ্বেত ও পীতবর্ণ, ঘন এবং লঘু হয়; ইহার বাতাসে বায়ুরোগের শান্তি হয়। জলসমুদ্রের চামর পাণ্ডুবর্ণ, দীর্ঘ, লঘু, ঘন এবং বৃহৎ হইয়া থাকে; ইহার ব্যজন-বায়ু সেবন করিলে দেবতার মত ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। দধিসমুদ্রের চামর শ্বেতবর্ণ, খর, লঘু এবং ঘন হইয়া থাকে; ইহার বাতাসে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মত্ততা ও শ্রম দূর হয়; এই চামর গৃহে থাকিলে কোনওরূপ অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। ক্ষীরসমুদ্র-জাত চামর শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘ, লঘু, ঘন এবং বৃহৎ হইয়া থাকে। এই শ্রেষ্ঠ চামরের অনেক গুণ; দেবতারাও ইহা অল্প তপস্যা দ্বারা লাভ করিতে পারেন না। সমুদ্রের অভাস্তরস্থ সম্পত্তিসমূহ নাগগণ ইহা ধারণ করিয়া থাকে। জলজ চামরের জাতিবিভাগ, দোষ ও গুণ স্থলজ চামরেরই মত।

স্থলজ ও জলজের পার্থক্য এই যে, স্থলজ চামর অগ্নিতে দিলে দগ্ধ হয় এবং দাহকালে মিস্ মিস্ করে; কিন্তু জলজ চামর সহজে দগ্ধ হয় না, অগ্নিতে দিলেই রাশি রাশি ধূম উঠে। চামরের এই বিবিধ লক্ষণ কথিত হইল।

যে রাজা এইরূপ বিচার করিয়া চামর ব্যবহার করে, তাহার সুখ হয়। জাঙ্গলদেশের রাজা যদি জলজ চামর ধারণ করে, তাহা হইলে, অচিরে তাহার বংশ, শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও আয়ু ক্ষয় পাইয়া থাকে। অনূপদেশের রাজা যদি স্থলজ চামর ধারণ করে, তাহা হইলে, তাহারও ঐশ্বর্য্য, আয়ু, খ্যাতি ও বল নষ্ট হইয়া থাকে।

বালুকা বা মহরির জল প্রভৃতি দ্বারা চামরের সংস্কার করিবে। কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইলে উষ্ণজলে দিলেই ইহার কৃত্রিমত্ব ধরা যায়।

ভৃঙ্গার।

রাজার অভিষেকজলের পাত্রের নাম ভৃঙ্গার; ইহা আট প্রকার, ইহার পরিমাণ এবং আকারও আট প্রকার।

সুবর্ণ, রজত, মৃত্তিকা, তাম্র, স্ফটিক, চন্দন, লৌহ ও এবং শৃঙ্গ এই আট প্রকার উপাদান দ্বারা ভৃঙ্গার নির্ম্মাণ করিবে।

[এই স্থানে দুইটী শ্লোকের পাঠ বিপর্য্যয় হেতু অর্থ গ্রহ হয় না]।

---

* পুনরুক্তি পরিহারের জন্য (বাচস্পত্য অভিধানের সহিত মিলাইয়া) সার্দ্ধ শ্লোক বাদ দেওয়া হইল।

(১) বিরলা।

(২) বৈরলাং।

(১) গুরু তথা লঘু।

(২) বৃষাবতন্দ্রয়াঃ।

সাত প্রকার ভূঙ্গারে পদ্মরাগ, বজ্র বৈদূর্য্য, মৌক্তিক, নীল, মরকত এবং মুক্তা প্রদান করিবে; মৃণ্ময় ভূঙ্গারে মণি দিবে না।

সুবর্ণময় এবং মৃণ্ময় ভূঙ্গার সকলেরই উপযোগী; নৃপতিগণ স্বর্ণ ভৃঙ্গার ব্যবহার করে, মৃণ্ময় ভূঙ্গার সকলেই ব্যবহার করিতে পারে।

শঙ্খ, পদ্ম, চন্দ্র এবং কদলীর যথাক্রমে চারি জাতীয় নৃপতির ভূঙ্গারাভরণ হইবে, চন্দ্রযুক্ত ভূঙ্গার সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়া থাকে।

শ্বেত, রক্ত, পীত এবং কৃষ্ণ এই চারি প্রকারের চন্দন হইয়া থাকে; এই চারি প্রকার চন্দনযুক্ত জল দ্বারা চারি জাতীয় নৃপতির অভিষেক করিবে।

চারি জাতীয় নৃপতিগণ তাহাদিগের কেশে যথাক্রমে পদ্ম, পদ্ম, নীলপুষ্প এবং কৃষ্ণাপরাজিতা ধারণ করিবে।

চারি প্রকার নৃপতির অভিষেক জলে হীরক, পদ্মরাগ, নীল এবং বৈদূর্য্যমণি প্রদান করিবে।

যে রাজা এইরূপে বিচার করিয়া নিজের অভিষেক করে সে দীর্ঘজীবী এবং সুখী হয়; আর যে এইরূপে বিচার করে না, সে অল্পায়ু এবং দুঃখী হইয়া থাকে।

চষক (পানপাত্র)।

নৃপতিগণের পানপাত্রকে চষক বলে।

এই চষক চারি জাতীয় নৃপতির জন্য স্বর্ণ, রজত, স্ফটিক এবং কাচ দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং গোল, সপ্তকোণ, অষ্টকোণ (১) ও দশকোণ হইয়া থাকে। অন্যেরও এইরূপই মত। ইহা নিজমুষ্টি পরিমিত এবং নানাবিধ রত্ন-ভূষিত হইবে। মৃত্তিকার (২) বা (কঠিন ভস্ম) কলের চষক সকলের পক্ষেই উপযুক্ত। (জাঙ্গলাদি দেশের (জাঙ্গল, অনূপ, সাধারণ) অধিপতিদিগের চষক কাষ্ঠ-নির্ম্মিত, ধাতু-নির্ম্মিত এবং শিলা (পাথর) নির্ম্মিত হইবে। ইহা ভিন্ন রাজার অন্যান্য জলপাত্র বা পানপাত্র সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম ইহাই ভোজের মত।

(১) অষ্টাষ্ট।

(২) মার্ত্তিকং।

প্রসাধনী।

দশ, নয়, আট ও সাত অঙ্গুলি পরিমিত প্রসাধনী (চিরুণি) ব্যবহার করিলে, যথাক্রমে চারি জাতীয় রাজার সম্পত্তি, সৌভাগ্য, খ্যাতি ও সমৃদ্ধি লাভ হয়।

জাঙ্গল, অনূপ এবং সাধারণ দেশের অধিপতির যথাক্রমে কাষ্ঠজ, ধাতুজ এবং শৃঙ্গজ প্রসাধনী ব্যবহার করিবে। কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রসাধনীর কাষ্ঠ সম্বন্ধে হস্তদন্তের মত নিয়ম।

আদিত্যাদি ক্ষত্রিয়জাত নৃপতিদিগের প্রসাধনী যথাক্রমে স্বর্ণ, রজত, তাম্র, শিতল, সীসক, লৌহ সর্ব্বমিশ্রিত ধাতু এবং কয়েকটী মিশ্রিত ধাতু দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। ইহা প্রসাধনী ব্যবহারে মান ও খ্যাতি লাভ হয়।

মৃগ এবং মহিষের শৃঙ্গ হইতে প্রসাধনী হয়, গজদন্তের প্রসাধনী রাজারই উপযুক্ত। চামরদণ্ডের ন্যায় প্রসাধনীও রত্নখচিত করিবে। গুরুত্ব, লঘুত্ব, শলাকার ঘন সন্নিবেশ এবং মনোহরত্ব এই কয়টী প্রসাধনীর গুণ।

বিতান (চন্দ্রাতপ)।

বিতান (চন্দ্রাতপ) আট প্রকার; তাহার লক্ষণ কথিত হইতেছে।

যে বিতান দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে আট হাত পরিমিত তাহার নাম 'মঙ্গল' ইহা নৃপতিগণের পক্ষে শুভকর।

যাহার দৈর্ঘ্য দশ হাত ও বিস্তারে আট হাত সেই বিতানের নাম 'বিজয়' ইহাতে অধিপতির অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

* * * *

[এই স্থলে অনেকগুলি শ্লোক নাই। আট প্রকার বিতানের মধ্যে মাত্র দুই প্রকারের লক্ষণ আছে। অন্য লক্ষণ একরূপ সম্পূর্ণই বাদ পড়িয়াছে। ব্যঞ্জন লক্ষণ পাঠ দোষে বড়ই দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে]।

দর্পণ।

স্বর্ণ, রজত, সীসক বা লৌহ দ্বারা দর্পণ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

বিস্তৃতি (বাদশাঙ্গুল) পরিমাণ, রমণীর দর্পণের নাম 'ভদ্রা', 'সুখ', 'জয়' এবং 'ক্ষেম' নামক দর্পণ হইবে।

হইবে। এইগুলি যথাক্রমে চারি জাতীয় রাজার পক্ষেই হিতকর।

দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ 'বিকঙ্ক' নামক দর্পণ সকলের পক্ষেই উপযোগী।

চক্রবর্ত্তী রাজা, ব্রাহ্মণ এবং সাধারণের জন্য যথাক্রমে এক 'পৌরুষ' পরিমাণ, তাহার অর্দ্ধ ও তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ দর্পণ প্রস্তুত করিবে।

একজন মানুষ ঊর্দ্ধদিকে হস্ত বিস্তার করিয়া দাঁড়াইলে ভূমি হইতে মস্তাগ্র পর্য্যন্ত মাপের নাম 'পৌরুষ' (১)।

অষ্টলৌহ (অর্থাৎ স্বর্ণ, রজত, তাম্র, রঙ্গ, সীসক, কান্তি লোহ, মৃদুলোহ এবং তীক্ষ্ণলোহ) নির্ম্মিত দর্পণ সকলেই ব্যবহার করিতে পারে।

[এই স্থলে পাঠ বিপর্য্যয় ও শ্লোকের অনাবশ্যক পুনরুক্তা প্রভৃতি দোষের জন্য কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ অসাধ্য]।

বস্ত্র।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে বস্ত্র চারি প্রকার। শ্বেত ও নানাবর্ণবস্ত্র সকলেই ব্যবহার করিতে পারে।

ভোজ বলিয়াছেন—জাঙ্গল, আনূপ এবং সাধারণ দেশীয়গণ সুখ-সমৃদ্ধির জন্য যথাক্রমে কৌষেয়, কার্পাস এবং বৃক্ষজাত বস্ত্র ব্যবহার করিবেন। উষ্ণ ও গুরু কৌষেয় বস্ত্রের গুণ, লঘু ও গুরু বৃক্ষজাত বস্ত্রের গুণ। হিতকর লোমজ বস্ত্র সকলেই ব্যবহার করিতে পারে; ইহার গুণ অশৈত্য ও অলঘুত্ব।

কীটকোষ জাত বস্ত্রের নাম কৌষেয় বস্ত্র। কীটগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে চতুর্ব্বিধ। এই কীটজাত বস্ত্র যথাক্রমে সূক্ষ্ম, অসূক্ষ্ম, মৃদু এবং স্থূল হইয়া থাকে।

যে কীটগুলি দক্ষিণ ও পূর্ব্বসমুদ্র প্রান্তস্থ বনে অতি সূক্ষ্ম শুক্লবর্ণ তন্তু প্রসব করে, তাহারাই উত্তম ব্রাহ্মণ-কীট।

[ক্ষত্রিয়-কীটলক্ষণের শ্লোকটী নাই]।

যে সকল কীট পশ্চিমসিন্ধু প্রান্তস্থ বনে অথবা জলপ্লাবিত পর্ব্বতপ্রদেশে ঈষৎ পীতাভ শুক্লবর্ণ তন্তু প্রসব করে, তাহারাও উৎকৃষ্ট জাতীয় বৈশ্য কীট।

যে সকল বড় বড় কীট সমুদ্রতীরস্থ বনে বা সাধারণ ভূমিতে নানাপ্রকার স্থূল সূত্র উৎপাদন করে, তাহারা সূত্রকীট।

এই সকল কীটের তন্তু হইতে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তাহাও আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভেদে চতুর্ব্বিধ; ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্বগুলি পরের গুলি অপেক্ষা উত্তম।

একজাতীয় সূত্র হইতে উৎপন্ন বস্ত্রই উত্তম, দুই জাতি ও তিন জাতি মিশ্রিত বস্ত্র মধ্যম। চারি জাতীয় সূত্রের বস্ত্র কখনও ব্যবহার করিবে না, করিলে, আয়ু, খ্যাতি, বংশ ও বল নষ্ট হয়। শিল্পিগণ এই সকল বস্ত্রের বর্ণ ও আকৃতি নানারূপ করিয়া থাকে।

কার্পাসসূত্রোৎপন্ন বস্ত্রকে কার্পাসবস্ত্র বলে; ইহা শুক্ল, স্থূল ও নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। এই বস্ত্র সকলের পক্ষেই উপযোগী, সকলেই ব্যবহার করিতে পারে।

বৃক্ষত্বক্ হইতে উৎপন্ন পরিধেয়ের নাম বার্ক্ষবস্ত্র, ইহা আবার তিন প্রকার। জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ এই যে ত্রিবিধ দেশ উক্ত হইয়াছে, সে সকল পবিত্র দেশে যে পবিত্র বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগের ত্বক হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাই যথাক্রমে তিন দেশের অধিপতিগণ ব্যবহার করিবে। তাহার আবার সূক্ষ্ম, স্থূল, কোমল এবং কঠিন বস্ত্র যথাক্রমে চারি জাতীয় রাজা ব্যবহার করিবে। শিল্পিগণ এই বস্ত্রও নানারূপ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

অন্যের লোম হইতে উৎপন্ন বস্ত্রকে লোমজ বস্ত্র। সেই সকল মৃগাদি জন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভেদে চতুর্ব্বিধ।

যে মৃগের লোম সূক্ষ্ম, কোমলাঙ্গ এবং স্পর্শে সুখানুভব হয়, তাহা ব্রাহ্মণ-জাতীয়; ইহার বস্ত্র অতি উৎকৃষ্ট। ক্ষত্রিয়-মৃগের লোম মোটা, স্পর্শ-কোমল। [বৈশ্য-মৃগের লক্ষণ পতিত।] শূদ্র-জাতীয় মৃগের লোম মোটা ও গাত্র-কর্কশ, স্পর্শে সুখানুভূতি হয় না।

ব্রাহ্মণ-জাতীয় মৃগ মলয়পর্ব্বত ও বিন্ধ্যাদ্রিতে, ক্ষত্রিয়-মৃগ পশ্চিম দেশে, বৈশ্য-মৃগ পূর্ব্ব দেশে এবং শূদ্র-মৃগ প্রায় সকল দেশেই থাকিয়া থাকে।

একজাতীয় সূতের দোষ হইতে উৎপন্ন বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলকর, দুই জাতি মিশ্রিত হইলেও সুখ-সম্পদ হইয়া থাকে, তিন বা চারি জাতীয় মিশ্রিত দোষের বস্ত্র সুখদায়ক হয় না।

যে রাজা এইরূপ বিচার করিয়া বস্ত্র পরিধান করে, তাহার আয়ু, বংশ ও শৌর্য্য বৃদ্ধি হয়, ইহার অন্যথাচরণ করিলে বিপরীত হইয়া থাকে।

উপকরণ-সূক্তি শেষ।

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য।

বিরাট-বন্দনা (স্তোত্র) *

বিশ্বভুবন-প্রাণ-বন্দিত সুন্দর অমৃত-রস-প্রাণ-ধারা,
কোটী ব্রহ্মা-শিব-অর্চ্চিত পদযুগ সর্ব্বকারণ সীমাহারা।
ইন্দ্র কুবের যম ভাস্কর শশধর স্তোত্র গাহিছে চারি পাশে,
শুক্র বৃহস্পতি মঙ্গল বুধ শনি আরতি রত মহাকাশে।
মন্দ গন্ধবহ রুদ্র ঝঞ্ঝা ঘোর চামর দুলিছে ছন্দে;
কৃষ্ণ জনার্দ্দন বিষ্ণু বিরাটরূপ লোক চরাচর বন্দে।

ব্যাপ্ত অসীম দেহ সৌরজগত ঘেরি ছন্দিত ধ্বনি প্রাণে প্রাণে,
সুরাসুর-অন্তর থরথর কম্পিত বিস্মিত চাহে তব পানে।
অর্ব্বুদ শতকর পুণ্য চরণ শোভে কালচক্র ঘোরে শাসি',
নির্ব্বাণ গুণাতীত মঙ্গল বরাভয় নন্দিত প্রাণভরা হাসি।
দীপ্ত অযুত শির লক্ষ লোচন শোভে মন্ময়ভুবন তনুগন্ধে,
কৃষ্ণ জনার্দ্দন বিষ্ণু বিরাটরূপ লোক চরাচর বন্দে।

---

* ইষনকল্যাণে এই স্তোত্রটী গাওয়া যাইতে পারে।

ঘোর বৈশ্বানর পাবক ধ্বক্‌ধ্বক্ প্রলয় কালানল জ্বালা,
মধুর চন্দ্রকলা করুণ-প্রস্রবন আলোক-স্নেহরাশি ঢালা।
প্রখর রৌদ্রতেজ-প্রোজ্জ্বল রূপছবি রুদ্রমধুর মরু-ভীতি,
মুখর-সিন্ধুজল-পাগল-উর্ম্মিদল ভৈরব-রব-শ্লোক গীতি।
উদার শৈলমালা কৈলাস হিমালয় নন্দিত নিরন্তর ছন্দে ;
কৃষ্ণ জনার্দ্দন বিষ্ণু বিরাটরূপ লোক চরাচর বন্দে।

অনাদি অন্তহারা রূপসিন্ধু-নীরে উত্থিত সদা কলহাসি,
সকল চিত্ত ঘিরি মিলনানন্দ-সুরে মুখরিত তব প্রেম-বাঁশী।
কর্ম্মক্ষেত্র হতে গর্জ্জিছ অহরহ মন্দ্রিত তুমি রণভেরী,
খণ্ড খণ্ডরূপে মণ্ডিত রূপরাজ সর্ব্ব জগতে আছ ঘেরি।
হে চিরগুপ্ত তুমি ব্যাপ্ত বিশাল ছবি নিত্যপ্রকাশ কত ছন্দে ;
কৃষ্ণ জনার্দ্দন বিষ্ণু বিরাটরূপ লোক চরাচর বন্দে

সৃষ্টি মুখর তব প্রণব-কণ্ঠস্বরে মগ্ন অসীম মহাভাষা,
সর্ব্ব হৃদয়ে ফির মিলনে অশ্রুজলে বিচ্ছেদ প্রেম ভালবাসা।
জ্যোতি-মহামণ্ডলে মগ্ন ভূমণ্ডল বিশ্বে গলিছ প্রাণধারে,
ভ্রুকুটী দৈন্য দুঃখ শান্তি তৃপ্তিরূপে আত্মাতে গাঁথা মনিহারে।
ষড়ঋতু পদতলে নৃত্য করিছে চির ছন্দিত করি প্রেমানন্দে ;
কৃষ্ণ জনার্দ্দন বিষ্ণু বিরাটরূপ লোক চরাচর বন্দে।

ভুবন-নৃত্যে তব দুলিছে সৃষ্টি-দোলা মগ্নরসিক মহারাসে,
নিত্য নবীন-আশা-নবরাগ-রঞ্জিত মত্ত অসীম অভিলাষে।
নাদ ব্রহ্মময় শাশ্বত সনাতন শান্তি চিরাশ্রয় দাতা,
দুঃখ-দহন-শোক-মগ্ন মানবকুল-সর্ব্ববিপদত্তয় ত্রাতা।
রাজিত রূপেরূপে বর্ণে বর্ণে চির শব্দ-পরশ-রস-গন্ধে ;
কৃষ্ণ জনার্দ্দন বিষ্ণু বিরাটরূপ লোক চরাচর বন্দে।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য-তত্ত্বানুশীলন

সাহিত্যের কুঞ্জকাননে দেশের সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোকের অতীতিকর আলোচনা আপাত-বৈষম্যের সৃষ্টি করিতে পারে। যেখানে পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি গভীর গবেষণামূলক শিক্ষাপ্রদ বিষয়সমূহের আলোচনা হইবে, সেখানে দুই দশটী জেলার স্বাস্থ্য-বিবরণের আলোচনা কাহারও কাহারও মতে সময়ের অপচয় মনে হইতে পারে।

কিন্তু কথায় বলে, "যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।" আমি যশোহরের অধিবাসী, আমার জন্মভূমি যশোহর। বিগত পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যেই আমার জন্মভূমির পল্লীসমূহের যে শোচনীয় চিত্র অবলোকন করিয়াছি, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ধ্বংসোন্মুখ পল্লীসমূহের যে শ্রীহীনতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম প্রায় জনশূন্য, সুবৃহৎ অট্টালিকাসমূহ পরিত্যক্ত, ভীষণ অরণ্যানী পরিবেষ্টিত, কীর্ণমুখে. কোথাও একটী নিরাশ্রয়া বিধবা অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ বাস্তুভূমির স্নেহ-মমতা বক্ষে লইয়া কালের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কোথাও পরিত্যক্ত গৃহ সর্পাদি বিদ্বেষজন্তুর বাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে, আবার কোথাও বা শত শত নর-নারী বালক-বালিকার আনন্দ-কোলাহল, নিত্যসুখর বাসভূমির সেই নিস্পন্দ গৃহভিত্তি, কুলকের জলমূলে বিদীর্ণ হইয়া ব্যথিতের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। প্রতি দশ বৎসরে আমার জন্ম-ভূমির—আমার স্বদেশের পঞ্চসপ্ততি সহস্র নর-নারী, বালক-বালিকা হ্রাস পাইতেছে। বোধ হয় প্রকৃতির অনৈসর্গিক পরিবর্ত্তন না হইলে অনুমান এক শতাব্দীর মধ্যে আমার স্বদেশ বিজন সুন্দরবনে পরিণত হইয়া ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানকারিগণের গবেষণার সহায়তা করিবে।

উত্তরবঙ্গের কয়েকটী জেলার মধ্যে রঙ্গপুরের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কিছু দীর্ঘকালস্থায়ী। এই রঙ্গপুরের কোন পল্লীগ্রামে আমাকে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। আমার কোন সাহিত্যিক বন্ধুর এবং গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি, এই গ্রামটি এক সময়ে বহুজন-অধ্যুষিত ছিল। এখানে কায়েতের ভিটা, ওখানে ঘোষের ভিটা, অন্যস্থানে পরামাণিকের বাড়ী ইত্যাদি সবই দেখিলাম। এখন এই গ্রামটিতে একজনও বাঙ্গালী ঘোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, কর্ম্মকারের চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে, পরামাণিক দুই এক ঘর বিদ্যমান আছে, ইহাই গ্রামটীর বর্ত্তমান ইতিহাস। রঙ্গপুরেও দেখিয়াছি, পরামাণিক ও ঘোষের কার্য্যে স্থানীয় লোক এক প্রকার পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। এখন স্বতঃই প্রশ্ন হইতে পারে, অতীতের এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির বিলুপ্তির হেতু কি?

স্বীকার করিতে হইবে, আরব্য-উপন্যাসের প্রসিদ্ধ বণিক্ সিন্দাবাদের স্কন্ধে বৃদ্ধ সৈন্যের ন্যায় ম্যালেরিয়া ও কলেরা বাঙ্গালার পল্লীভূমি-সমূহের স্কন্ধে স্থায়ী বাসভূমি নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে বাঙ্গালার অনেকগুলি জেলা ম্যালেরিয়ার উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। রঙ্গপুর হইতে প্রকাশিত "রঙ্গপুর-দর্পণ" নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশ, বর্ত্তমান বর্ষে সমগ্র রঙ্গপুর জেলায় ম্যালেরিয়া যেরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে, বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে এরূপ ভীষণ প্রকোপের কথা জানিতে পারা যায় নাই। আমরা এস্থলে জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের উক্তি লিপিবদ্ধ করিতেছি,—"বর্ষার প্রারম্ভ হইতে রঙ্গপুরে এবার ম্যালেরিয়া যেরূপ ভীম-বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এমন আর কখনও লক্ষিত হয় নাই। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত নর-নারীর রোগ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট আর্ত্তনাদে রঙ্গপুরের

শান্তি-নিকেতন পল্লীভবনগুলি সুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক গৃহে ঔষধ-পথ্য—অধিক কি একবিন্দু জল প্রদানের লোক পর্য্যন্ত ছিল না। রঙ্গপুরের পল্লীগ্রামগুলিতে প্রকৃত সুচিকিৎসকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। সুতরাং রঙ্গপুরের পেটেণ্ট ঔষধ-ব্যবসায়িগণের এ বৎসর সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। • • • আমরা কোন ক্ষুদ্র পল্লীর সামান্য একজন দোকানদারকে দৈনিক গড়ে ১০৲ সত্তর টাকার পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রয় করিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি।"

উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা সম্বন্ধে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে উপলব্ধি হয়, বিগত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বর্ষে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বর্দ্ধিত হইয়াছে। নিদাঘের অন্তে বর্ষার ঘন বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষতঃ হেমন্তঋতুর প্রারম্ভে বাঙ্গালাদেশে ম্যালেরিয়া প্রকটমূর্ত্তিতে দেখা দেয় এবং অসংখ্য নর-নারী বালক-বালিকার জীবন হরণ করে। এ বৎসর নির্দ্দিষ্ট কালের অনেক পরে উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানে প্রকৃতভাবে বর্ষণ আরম্ভ হইয়া ছিল, অসময়ে অনিয়মিত বর্ষণের ফলেই সর্ব্বত্র রোগের প্রখরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিগত ১৯১৩ ও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গের কোন্ জেলায় কত লোকের জ্বরে মৃত্যু হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদান করিলাম। রেখার উর্দ্ধস্থিত সংখ্যা পূর্ব্ব বর্ষের এবং নিম্নস্থিত সংখ্যা বিগত বৎসরের মৃত্যুহার-জ্ঞাপক বুঝিতে হইবে।

	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর
রাজসাহী	২৯০২	৩৭৭৩	৩৭৪১	৪১৪৭
	৩৭৬৫	৩৬৫৯	৪২৫০	৫৪২৯
	+২২	+২১	+২৪	+৪৮
দিনাজপুর	৩০৪০	৪৮৯১	৪৮৬২	৫৬১৩
	৪২৮১	৪৮৭৭	৫৩৯৬	৬৫৭৯
	+৮	+৩	+৫	+৯
জলপাইগুড়ী	১৯ ৮	২৫১৫	২২০৭	২৬৮৬
	১৯২৭	১৭৮৮	২৩৯৭	২৭৬৮
	+১১	+১১	+১৪	+১২
দার্জ্জিলিং	৬৪৬	৭৭৬	৬৩৪	৬৬৮
	৬১১	৫৫০	৬৬৪	৫৫০
	+১৭	+২০	+১৯	+১৭
রঙ্গপুর	৩৩৬৩	৫৩৩৩	৪৫৫০	৫৬৮১
	৫৬১০	৫৫২৪	৮১৯৬	৯১৯৫
	+১১	+১৮	+১৬	+১৪
বগুড়া	১৩৪৮	১৭২৯	১২৩৪	১৬৪২
	২৫৮০	২০০০	২২২৬	২৮৪৫
	+১৪	+৬	+১১	+২১
পাবনা	১৭৬৩	২৮৩৪	৩২৭২	৪৭৩৭
	৩৫২৫	২৯৩২	৪৩৩১	৫৬০১
	+১৯	+১০	+২২	+৪৭
মালদহ	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর
	১৩৯২	২৮৬৯	২৮৪৪	৩১৪৭
	২১৪১	১৭২২	৩১৮২	৪৫২৮
	+০৯	+৩৩	+৫৩	+১৩৪

মূলতঃ বিগত ১৯১৩ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর এই চারি মাসে সমস্ত উত্তরবঙ্গে কত নর-নারী, বালক-বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর
১৯১৩	১৬,৯৮২	২৪,৭৯৬	২৩,৩৪৪	২৮৩২৯
১৯১৪	২৪,২৯০	২৪,৬৪৬	৩০,৬৪২	৩৮,৪৯৫
	+	+	+	+
	১৪১	১২২	১৩৪	৩০২

সমগ্র উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত উল্লিখিত জেলাসমূহের গ্রামের সংখ্যা ৩৯,০০১, উহার মধ্যে ৩৩,৫৬২ খানি গ্রাম হইতে বিগত বর্ষে ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষে উল্লিখিতরূপ ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত গ্রামের সংখ্যা যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বেশ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৩১৯ খৃষ্টাব্দে কোন্ জেলায় কত গ্রামে এইরূপ ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ

করিয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার তালিকা প্রদান করিলাম ;—

জেলা	গ্রামের সংখ্যা	যত গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়ার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।
রাজসাহী	৬,২২	৬,৫০৩
দিনাজপুর	৯,৬৫৯	৭,১০০
জলপাইগুড়ী	২,১২১	২,০৭৭
দার্জ্জিলিং	৫০৬	৩২৫
রঙ্গপুর	৭,৪৪১	৬,৬৫৫
বগুড়া	৩,৬২০	১,৮০৯
পাবনা	৪,২৯৬	৪,০৩২
মালদহ	৪,৬৮৬	৩,৮৬১
মোট	৩৯,০০১	৩৩,৫৬২

কিন্তু আশার কথা এই যে, বিগত ১৯০৮ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের তুলনায় বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর মধ্যে একমাত্র রাজসাহী বিভাগে ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। আমরা নিম্নে বিভিন্ন বিভাগের ম্যালেরিয়া-জনিত মৃত্যুর হার প্রদান করিলাম।

বিভাগের নাম	প্রতি সহস্র অধিবাসীর মধ্যে যত জনের মৃত্যু হইয়াছে।			
	১৯১৩ খৃঃ অব্দ	১৯১২ খৃঃ অব্দ	১৯০৮ খৃষ্টাব্দের সহ	১৯১২
রাজসাহী	২৬·৬৫	২৮·০৬	২৮·৩৭	
বর্দ্ধমান	২২·৯৬	২২·৪৩	১৯·১৩	
প্রেসিডেন্সী	২০·১৫	২০·৭৪	১৮·৪৯	
চট্টগ্রাম	১৯·২১	১৭·৭৯	১৮·৯১	
ঢাকা	১৭·৪৩	১৬·০৪	১৬·৯১	

কিন্তু "মুষীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া ঘরে বাস", আর ম্যালেরিয়ার সহিত সংগ্রাম করিয়া বঙ্গদেশে নিরাপদে অবস্থান একই কথা মনে হয়। কতকাল ধরিয়া এই নিদারুণ ব্যাধি বাঙ্গালীর রক্ত-মাংস "শোষণ" করিতেছে, ইতিহাসে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে ইহা নিশ্চয়, বিগত কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীর মধ্যেই এই দারুণ ব্যাধি "সোণার বাঙ্গলা" ছারখার করিয়াছে।

মেডিকেল কলেজের ম্যালেরিয়া-তত্ত্বানুসন্ধান-বিভাগের সুযোগ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরোজলাল সরকার এম্-এ, মহাশয়, বিগত ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে "Indian Medical Gazette" নামক পত্রে লিখিয়াছেন,—"The study of contemporary Bengali literature affirms that Malaria in epidemic form was unknown in Bengal before the Burdwan epidemic", অর্থাৎ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের বাঙ্গালা-সাহিত্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়া সংক্রামকভাবে দেখা দিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কুত্রাপি ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু এই উক্তি আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজ-পত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, সে সময়ও কলিকাতা এবং বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে ম্যালেরিয়া ছিল।" উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে রঙ্গপুর পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্বেও ম্যালেরিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, এমন কি লোকে রঙ্গপুরকে "ঘমপুর" বলিত। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় বাঙ্গালার সুবাদারের নিযুক্ত ফৌজদারগণ যৎকালে রঙ্গপুরে অবস্থান করিতেন, তৎকালে রঙ্গপুরের স্বাস্থ্য নিতান্ত ভাল ছিল না, এবং এই কারণে তৎকালে ফৌজদারগণের অনেকে একাদিক্রমে বহুকাল রঙ্গপুরের শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে পারেন নাই। ইহা ১০৯০ হইতে ১১২০ খৃষ্টাব্দের কথা। ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল্ লর্ড ওয়েলেস্‌লি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, ঐ সময় মুর্শিদাবাদ ঘোর অস্বাস্থ্যকর ছিল। বহরমপুরস্থিত সৈনিক আবাসের সৈন্যেরা প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিত। ডাক্তার ইলিয়ট বলেন, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এই জ্বর প্রথমতঃ যশোহরে দেখা যায়। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা গঙ্গাতীরে মহামারী আকারে প্রকাশ পায়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এই জ্বর বনগ্রাম ও চাকদহে প্রকট মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহারই প্রকোপে উলাগ্রাম উৎসন্ন হয়। পরবর্ত্তী বৎসর এই জ্বর, কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, নৈহাটী, ত্রিবেণী ও অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হয়।

অতঃপর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই মহামারী অতি প্রবলবেগে বর্দ্ধমান সহরে দেখা দেয়। অতঃপর ইহার লীলাক্ষেত্র অতি-শয় বিস্তীর্ণ হয়। দক্ষিণে বাগবাজারী, পশ্চিমে কাটোয়া, উত্তরে মেহেরপুর, পূর্ব্বে বারাসাত, সোবরতাড়া, ইছাপুর এবং ক্রমে ক্রমে শিমাজপুর, রঙ্গপুর হইয়া সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলে। পঞ্জাবেও ম্যালেরিয়া প্রকট-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। আজ সমস্ত ভারতময় ম্যালেরিয়া। অধুনা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর ১৭ লক্ষের অধিক নর-নারী এবং বালক-বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে, এক শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের যে সকল জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আদৌ পরিলক্ষিত হইত না, এক শত বৎসরের মধ্যেই সেই সকল স্থান ম্যালেরিয়ার উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। অধিক দিনের কথা নহে, বিগত ২৭এ জানুয়ারী তারিখের "কলিকাতা বঙ্গবাসী" নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত "The Provincial outlook" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে আমরা নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

Malaria is raging all over the province and even areas and districts which formerly were free from the fell disease have now fallen victims to it. For instance, Bankura and Birbhum were always known as very healthy districts, and though cholera or small-pox would now and then sweep over them, malaria was unknown to the inhabitants. But this year they, too, in common with other districts are faring extremely badly.

A gentleman from Bishnupur tells us that recently he had occasion to visit a police-station within ten miles from the town of Bishnupur. And he was staggered to find that the death-rate was ten times higher than the birth-rate. Indeed, he was informed that while 150 to 200 deaths were being registered every week from malaria, the births did not come up to even 20.

অর্থাৎ ম্যালেরিয়া সমগ্র প্রদেশের উপর প্রকটমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল জেলার লোকে ম্যালেরিয়ার কথা আদৌ জানিত না, অধুনা তত্তৎ স্থানে বহুলোক ম্যালেরিয়ার করালগ্রাসে নিপতিত হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঁকুড়া ও বীরভূম এই দুইটি জেলার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুইটি জেলায় সময়ে সময়ে বসন্ত ও কলেরার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইলেও, লোকে ম্যালেরিয়ার নাম পর্য্যন্ত জানিত না। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে এই দুইটি জেলার অবস্থাই শোচনীয়। বিষ্ণুপুর হইতে জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আমাদিগকে লিখিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহাকে সহর হইতে দশ মাইল দূরে একটি থানায় গমন করিতে হইয়াছিল, এই থানায় ম্যালেরিয়া-জনিত মৃত্যু-সংখ্যার বিষয় অবগত হইয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। জন্ম-মৃত্যুর তালিকা হইতে তিনি অবগত হইয়াছেন যে, এই একটিমাত্র থানায় কেবল ম্যালেরিয়া-জ্বরে সপ্তাহে ১৫০ হইতে দুই শতের অধিক নর-নারী, বালক-বালিকার মৃত্যু হইতেছে—কিন্তু এ সময়ে এখন কি ২০ জনেরও জন্ম হয় না।

সুতরাং ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের অবস্থা কি হইবে, আমরা তাহা কেমন করিয়া বলিব? অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ভবিষ্যতের জন্য যদি কিছু শিক্ষা করিবার থাকে, আমরা বর্ত্তমানে তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

এখন কথা এই যে, যে কারণে সমগ্র বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়ার উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র উত্তরবঙ্গের অদৃষ্ট-গগনে তদ্রূপ কারণের উদয় হওয়া সম্ভবপর কি না।

ইতঃপূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন বিভাগে বিগত ১৯০৮ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে অন্তরোগে মৃত্যুর যে হার প্রদর্শন করা হইয়াছে, উহার আলোচনা করিলে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইবে, সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা এই চারি বিভাগে ম্যালেরিয়ার মৃত্যু-হার ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু রাজসাহী বিভাগে মৃত্যুর হার ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি উত্তরবঙ্গের মৃত্যুর হার সামান্য নহে। বিগত

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের বিভিন্ন বিভাগে প্রতি সহস্রে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, আমরা নিম্নে উহার তালিকা প্রদান করিলাম।

রাজসাহী	২৬·৬৫
বর্দ্ধমান	২২·৯৬
প্রেসিডেন্সী	২০·১৫
চট্টগ্রাম	১৯·২১
ঢাকা	১৭·৪৩

সুতরাং সমগ্র উত্তরবঙ্গে মৃত্যুর হার ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও, এখনও বঙ্গের অন্যান্য জেলা ও বিভাগ অপেক্ষা উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যোন্নতির বহুল প্রয়োজন রহিয়াছে। মালদহ, পাবনা এবং বর্দ্ধমান হবে রঙ্গপুরে অন্তরোগে মৃত্যুসংখ্যা বড়ই ভয়াবহ। কিরূপে ইহার আশু প্রতিকার হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দেশের শিক্ষিত ও সুধী ব্যক্তিবর্গের বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও নিবারণ সম্বন্ধে দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মত যাহাই হউক না কেন, ইহা নিশ্চয়, কয়েকটি কারণে সাধারণতঃ বাঙ্গালিদেশের সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া বিস্তারলাভ করিয়া থাকে। আমরা সংক্ষেপে নিম্নে উহার কারণ উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের সম্বন্ধে উহাদের সার্থকতা নির্দ্ধারণ করিব। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণেই ম্যালেরিয়া সর্ব্বত্র বিস্তারলাভ করিয়াছে, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে।

(১) রেলপথসমূহের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাভাবিক জলপথসমূহের রোধ।

(২) দেশের নদনদীসমূহ মজিয়া যাওয়ায় এই সকল নদ-নদীর কলে দেশের স্বাস্থ্যহীনতা।

(৩) পাটের চাষ ও অতিরিক্ত পানীয় জলের অপব্যবহার।

(৪) জনসাধারণের দরিদ্রতা।

(৫) অজ্ঞতা, ভোগ, আলস্য-প্রভৃতি।

এবং (৬) জনসাধারণের স্বাস্থ্যবিষয়ক-সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

আমি এখন এক এক বিষয়ের আলোচনা করিব।

ড্রাফিস্, এইচ্ ফ্রাইন নামক ভারতীয় সিবিল-সার্ভিসের জনৈক পেন্সনভোগী কর্ম্মচারী বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের "East and West" পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"Between 1856 and 1864 East Indian and Eastern Bengal Railways were constructed athwart the country's watershed with very inadequate provisions for water-course by way of bridges and culverts. A net of embarked roads interfered seriously with the drainages" অর্থাৎ বিগত ১৮৫৬ ও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র দেশের স্বাভাবিক জলস্রোত রুদ্ধ হয়। রেলওয়ে কোম্পানী সেতু ও কালভর্ট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া এই ক্ষতির পূরণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তাহা যথেষ্ট হয় নাই। রেলপথ-সমূহ সমগ্র দেশকে জালের ন্যায় বেষ্টন করায় দেশের স্বাভাবিক জলপ্রবাহের অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে, অথচ এই সকল জলপ্রবাহের কার্য্যকারিতা যে কতদূর অধিক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্দ্ধমানের ভীষণ সংক্রামক জ্বরের সময় "Epidemic Fever Commission" এই জ্বরের হেতু নির্দ্ধারণে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন,—"The reduction of superfluous moisture of the soil by means of drainages improves water-supply and clearance of the obstruction in the river-beds" অর্থাৎ উহার সুপ্রবাহের ফলে ভূমির অনাবশ্যক আর্দ্রতা দূর হওয়ায় নদ-নদীর খাতসমূহ পরিষ্কৃত এবং জল সব বিশুদ্ধ হইয়া দেশের স্বাস্থ্য উন্নত হয়। কমিশনের উল্লিখিত মন্তব্য সুদূরকালে পরিপূর্ণরূপে না হইলেও অদ্যও বর্ত্তমানে উহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের যে কয়েকটী জেলায় সাধারণভাবে রেলপথ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, যথা দেশের বার্ষিক-বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ সময় রেলপথ কার্য্যের ফলে বিশেষ ভাবে স্বাস্থ্যোন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে রঙ্গপুরের এতদ্বিষয়ক বার্ষিক-বিবরণ হইতে স্বাস্থ্যোন্নতির পরিচয় প্রদান করিলাম—

জেলার নাম	যে বৎসরে ড্রেনেজ কার্য্য শেষ হইয়াছে
দিনাজপুর	১৮৮৭
জলপাইগুড়ী	১৮৯৬
রঙ্গপুর	১৮৭৯ (ঘোষেরা ড্রেণ)
ঐ	১৮৮২ (ক্রাইনের ড্রেণ)

ড্রেনেজ-কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের মৃত্যু সংখ্যার হার (প্রতি সহস্র)	ড্রেনেজ-কার্য্য শেষ হওয়ার পর পাঁচ বৎসরের মৃত্যুর হার (প্রতি সহস্র)
১৮·৭৬	১২·৩২
২৯·২৫	২৫·১১
৫৬·৮৪	২১·২৮
৩৭·৬০	৩০·৩৭

উল্লিখিত ড্রেনেজের ফলে যদি উত্তরবঙ্গের অন্ততঃ তিনটি জেলারও উন্নতি হইয়া থাকে, তবে অন্যান্য জেলারও এইরূপ ড্রেনেজের আবশ্যকতা আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

গবর্ণমেণ্টের বাস্তুহারী বিভাগের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, পূর্ব্বদিকে সলিলবহুল ব্রহ্মপুত্র-নদ এবং পশ্চিমদিকে গঙ্গা ও পদ্মা ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। পরন্তু বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ নদ-নদী এই সীমান্তে আসিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে ব্রহ্মপুত্রের গতি বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গঙ্গা ও পদ্মারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ সর্ব্বসময়েই গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের বুলিলবদ্বীপ, উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত ভূখণ্ডকে শস্যসম্পদ ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছে। কিন্তু অধুনা পদ্মার অবস্থা নানারূপে আশঙ্কাপ্রদ ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য-সম্পদে ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইবার উপক্রম হইয়াছে।

অনুমান চারিবৎসর পূর্ব্বে আমি সর্ব্ব প্রথমে পদ্মার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম; সেই আমার উত্তরবঙ্গের সীমান্ত প্রদেশে আগমন। রামকৃষ্ণিয়া হইতে অনুমান ৫ মাইল দূরে মুনিরাজের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের কার্য্যভার-গ্রহণ করিয়া আমি তথায় গমন করি। মুনিরাজের পুরাতন বোট করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পদ্মার পুরাতন স্রোত তর তর বেগে প্রবাহিত হইত। আমি যখন উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম, বিপুল সলিলা পদ্মা অনুমান দুই মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। আজ অতীতের নিদর্শনস্বরূপ পদ্মার প্রাচীন খাত গ্রামের অদূরে আপনার গতিপথ চিহ্নিত করিতেছে। সুবিস্তৃত জলরাশি অনুমান এক মাইল বিস্তৃত, উহার বুক শূন্য; কেবল বর্ষাঋতুতে প্রবল জলস্রোত একমুখ হইয়া এই প্রাচীন খাতে প্রবেশ করে। আমি দেখিয়া অবাক্ হইলাম, এইখানে ম্যালেরিয়া পূর্ণভাবে আত্মবিকাশ করিয়াছে, কিন্তু এখান হইতে অনুমান ৫ মাইল দূরে রামকৃষ্ণিয়ার স্বাস্থ্য পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, যখন এই বহুদূরবিস্তৃত গ্রাম খানির পাদদেশ দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হইত, তখন ইহার স্বাস্থ্য সুন্দর ছিল। কিন্তু অধুনা এই ভয়াবহী গ্রামখানিকে ধ্বংসপথে টানিয়া লইতেছে। বলিতে দুঃখ হয়, ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে দুই বৎসর মধ্যে আমাকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। স্থান পরিত্যাগের পর আমি আমার পূর্ব্বস্বাস্থ্য অনেকাংশে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য-তত্ত্বানুশীলন কালে আমার মনে স্বতঃই একটী প্রশ্ন উদিত হইতেছে। আমি সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীর নিকট বিনীতভাবে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। আজ যাঁহারা সভায় উপস্থিত, বোধ হয়, তাঁহাদিগের সকলেই সাড়াঘাটের অদূরে পদ্মাবক্ষে ইংরাজের স্থাপত্য-কৌশল ও বিজ্ঞান বলের অদ্ভুত নিদর্শন অপূর্ব্ব সেতু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় পদ্মার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবার উপক্রম হইয়াছে, কেহ কি তাহা চিন্তা করিয়াছেন? আমি অবগত হইলাম, বিগত কিছিদ্দিন এক বৎসর মধ্যে পাবনার নিম্নে এক প্রকাণ্ড চড়া পড়িয়াছে, সলিলরাশি উন্মত্তের ন্যায় একবার এদিক একবার ওদিক আবর্ত্তন করিতে করিতে অবশেষে বেত্রাঘাতের এক ক্ষীণ পন্থা অনুসরণ করিতেছে ফলতঃ অবস্থা যেরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে অচিরকাল মধ্যে পদ্মা উদ্দাম আবেগে এই পাবনা জেলার দক্ষিণ দিয়া নূতন পথ করিয়া লইবে, অথবা ইহার দক্ষিণ

প্রবাহ তীব্র আবর্ত্তে নিম্নবঙ্গের অভিমুখে প্রবাহিত হইবে, এবং অল্প চেষ্টায় ফলেই যশোহর ও খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলের স্বচ্ছসলিলা কপোতাক্ষী, বিপ্লুত-জীবন ভৈরব প্রভৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের অবস্থা হইবে কি? যেরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে পাবনার নিম্নস্থিত ইছামতী যশোহরের প্রান্তবাহী ভৈরবের আকার ধারণ করিয়া লক্ষ লক্ষ জীবননাশের কারণ হইবে, এবং পদ্মার পূর্ব্ব প্রভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইবে। পদ্মা ও গঙ্গার সলিলের অভাব হইলে উত্তরবঙ্গের অনেক নদ-নদী মরিয়া যাইবে। Hunter's statistical Account of Bengal গ্রন্থের রাজসাহী জেলার বিবরণ হইতে আমি নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The Drainage of Rajshahi can best be represented by supposing the District to be the segment of a somewhat irregular circle, of which the Ganges River forms the limb and the Chalan Bil the center. The lines of drainage would then be represented by a series of concentric lines from the Ganges, and from the high country in Dinajpur to the north, towards the southern extremity of the Chalan Bil. The Ganges Bank being higher than the general level country, the water drains away from it The drainage from all parts of the District converges in the Chalan Bil from whence it flows away eastward."

উল্লিখিত বিবরণ হইতে উপলব্ধি হইবে, গঙ্গার সমতল অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া উত্তরবঙ্গের মধ্যে চলন বিল ও অন্যান্য নদ-নদী গঙ্গা হইতে পর্য্যাপ্ত সলিল গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু গঙ্গার স্রোত অপেক্ষাকৃত মন্দ ও সলিলের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে এই সকল নদ-নদী মরিয়া যাইবে এবং সমস্ত উত্তরবঙ্গ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে।

আমার আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নহে, ১৮৬৬খৃঃ-অব্দের Epidemic Fever Commission এর অন্যতম সদস্য স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের উক্তিতে তাহা কার্য্যতঃ স্বীকার করা হইয়াছে। স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের মন্তব্যের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে ;—"পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য শত শত মাইল ব্যাপী যে যমুনা-কেনাল কাটা হইয়াছে, তাহার সমস্ত জল গঙ্গা হইতে লওয়া হয়। ইহার ফলে গঙ্গার নিম্নাংশের স্রোত মন্দীভূত হওয়ায় নিম্নবঙ্গে উহার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দিন দিন মজিয়া যাইতেছে।" যমুনা-কেনালের ফলে নিম্নবঙ্গের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, সাড়া সেতুর ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গের যে সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

উত্তরবঙ্গের সর্ব্বত্র আমন পাটের চাষ অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাট পচাইবার কালে দেশের সর্ব্বত্র জল-স্থল ও বায়ুমণ্ডল এমন দূষিত গন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠে যে উহার ফলে দেশে নানারূপ পীড়ার সৃষ্টি হয়। আমি জানি, পাট পচাইয়া যাহাতে নদীর জল নষ্ট করিতে না পারে, এই জন্য যশোহর-জেলা-বোর্ড একবার যশোহরের সর্ব্বত্র নদ-নদীতে পাট পচান বন্ধ করিবার জন্য কঠোর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপভাবে নিষেধ করা সর্ব্বত্র সম্ভবপর নহে। দরিদ্র কৃষক জানে, পাট তাহার অর্থাভাব বিদূরিত ও সুখ-সুবিধা প্রদানে যেরূপ সমর্থ, অন্য কিছু আর তেমন নহে। সুতরাং তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণের পতিত ভূমিখণ্ডে সে এক মুষ্টি পাটের বীজ নিক্ষেপ করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করে। এ অবস্থায় পাটের চাষ রোধ করা কখনও সাধ্যায়ত্ত নহে। পরন্তু উহার ফলে যে জেলার স্বাস্থ্য অনেকাংশে হীন হইয়া পড়িবে, তাহাও অবশ্যম্ভাবী।

আমি স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি, পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে যোগা, পরামাণিক, বাজকর, সূত্রধর, কর্ম্মকার, তৈলিক প্রভৃতি দেখা যাইত, যমুনা তাহাদিগের সমস্তই প্রায় লোপ পাইয়াছে, এবং পশ্চিমাঞ্চলের মিস্ত্রী, যোগা, পরামাণিক প্রভৃতি তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে! কিন্তু প্রাচীন কালের এই সমস্ত ও অন্যান্য বিভিন্ন জাতীয় শিল্পকুশল ব্যক্তিদিগের পরিণাম কি হইল? বিশেষ অনুসন্ধান করিলে পরিলক্ষিত হইবে, জাতীয় শিল্পব্যবসায় আশানুরূপ অর্থপ্রদ না হওয়ায়, পরন্তু অর্থাভাব বৃদ্ধি পাওয়ায়, ইহাদিগের একাধিক বংশপরম্পরা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে

অথবা কৃষিকার্য্য অধিকতর লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় ইহারা কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের অপেক্ষা বহুলোক অধুনা কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় দেশের সর্ব্বত্র গোচর-ভূমির অভাব হইয়াছে। বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র গোচর-ভূমির অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইলেও উত্তরবঙ্গের পক্ষে পক্ষে ইহা অধিকতর সত্য বলা যাইতে পারে। পশুখাদ্যের দুর্ম্মূল্যতা, গোচর-ভূমির অভাব, এবং নবল দুগ্ধের অভাবে সমগ্র বঙ্গের গোকুল ধ্বংসপথে প্রধিত হইয়াছে। উত্তর-বঙ্গেরও এ বিষয়ে চিন্তা করিবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ দুগ্ধের ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সমগ্র উত্তরবঙ্গের মধ্যে কিরূপ অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতেছে, আমি আবার আলোচনার উপসংহারভাগে উহা প্রদর্শন করিব। অধুনা সমগ্র উত্তরবঙ্গের সমবেত ধনীর ও কমলার বরপুত্রদিগকে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে দেশে গোচর-ভূমি বৃদ্ধি পায় এবং দেশের গোকুল বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাঁহারা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করুন। তাঁহাদিগের চেষ্টা ব্যতীত এই সুবৃহৎ ব্রত সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে।

আমি এইখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি সমগ্র উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। কিছুকাল পূর্ব্বে রঙ্গপুরের স্বাস্থ্য-বিবরণী আলোচনা-কালে এক বিষয়ের প্রতি আমার সাগ্রহ দৃষ্টি পতিত হয়। সমগ্র উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যতত্ত্ব আলোচনাকালে সেই একই বিষয়ে আবার অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইয়াছে। বিগত "১৯১৩ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যবিবরণী" (Report on the Sanitation in Bengal for the year 1913) শীর্ষক পুস্তকের প্রথম পরিশিষ্টের (Appendix) ৮ম ও ৯ম পৃষ্ঠায় সমগ্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় বয়সানুক্রমে নর-নারীর মৃত্যুসংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা উল্লিখিত বিবরণ হইতে কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহের মৃত্যু-উদ্ধৃত করিলাম :—

বয়স		বগুড়া		পাবনা		মালদহ	
উর্দ্ধ—	অনূর্দ্ধ	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
০	১	৩,০৬১	২,৩৪৮	৫,১০৭	৪,৬৬০	৩,৯০৯	৩,৪০১
১	৫	১,০৩৮	১,৪০৯	৩,৯১৮	৪,২১৩	৩,২১১	৩,১৮৬
৫	১০	৮৭২	৬৬৪	২,৪৪১	২,১০৬	২,০৯৫	১,৭৫৭
১০	১৫	৪৪৬	৩০২	১,০৬৩	৮৪৭	১,১৮৬	৭৭৪
১৫	২০	৫৬৭	৪৪৫	৮৭৭	১,১৪৬	৮১১	৭৬৪
২০	৩০	৮৬৮	১,১৭৬	১,৮০০	২,৪০৮	১,৪৫৬	১,৭২৭
৩০	৪০	৪৮৯	৮২৫	২,০৪৩	১,৭৬৯	১,৫৯৭	১,৩৭৯
৪০	৫০	৮৫২	৬৩৩	১,৮৫২	১,৪০১	১,২৭৬	১,০২৩
৫০	৬০	৮৪০	৬৭৭	১,৪৫৬	১,৩১০	৯০৪	৮৮৪
৬০	অূর্দ্ধ	১,০০৬	৬২৫	২,৩৮১	২,০৫২	১,৮০১	২,০২১

বয়স		রাজসাহী		দিনাজপুর		জলপাইগুড়ী		দার্জ্জিলিঙ্গ		রঙ্গপুর	
উর্দ্ধ—	অনূর্দ্ধ	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
০	১	৫,৬৩১	৬,০১৮	৮,২৮০	৭,২৯১	৪,১৫৫	৩,৭৮১	১,০৮৭	১,০৩৭	১০,০৯৭	৮,৪৯২
১	৫	৩,৩৩৭	৩,১৮৭	৪,৫২৭	৪,১১৬	৪,০৩১	১,৮১২	৮১৭	৭০৯	৪,১৪২	৩,৯৮৫
৫	১০	২,০১৭	১,৫৩৬	২,৪৭৯	১,৭০৯	৮৭৫	৬৯২	৩৮৫	৩৯২	২,২৬৭	১,৭৫২
১০	১৫	১,১৩৫	৮৯৭	১,০৯২	৮০৭	৬৫১	৪৯১	২৯০	২৬৫	১,১২০	৮৭০
১৫	২০	১,০৮৪	১,৪৩৩	১,০০৯	১,৩৪১	৬৮৯	৩৪৯	২৫৫	২৮০	১,০০৯	১,৪৪২
২০	৩০	২,৩০৯	২,৯০৪	২,৪৪৭	৩,৩৫৫	১,৭৭৩	২,৪০৭	৭৪৮	৮৬৯	২,৬৮০	৩,৯৪৭
৩০	৪০	২,৫৮০	২,৪১৭	২,৭০৯	২,৫৬২	১,৭৬০	১,৬৮৭	৬২০	৫৮৮	৩,৩১২	৩,০৩০
৪০	৫০	২,০৯৫	১,৬৪৯	২,২৬০	১,৭০২	১,৪৪৯	৯৯৯	৪০১	৩২১	২,৭৪৩	২,২০৪
৫০	৬০	১,৩৮১	১,২১৮	১,৭৪৯	১,৩৪৩	১,১১৯	৯৪৭	৩৩৫	২৮১	২,৫০৯	১,৯৮৩
৬০—	অূর্দ্ধ	২,০০৮	১,৭২৫	২,৩৪৫	১,৭১৩	১,৩৬৯	৮৯৪	৪৯৫	৪৪৯	৩,৫৫৩	২,৪০৮

উল্লিখিত তালিকাগুলি প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি। বিভিন্ন বয়সের মৃত্যু-তালিকাগুলি সাধারণভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই, ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক বেলায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংখ্যা অধিক হইয়াছে—কিন্তু অন্যান্য বয়সে কুত্রাপি স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের অধিক হয় নাই। সমগ্র বঙ্গের মৃত্যুসংখ্যা সাধারণভাবেও আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, একমাত্র উত্তরবঙ্গের পক্ষে ইহা সত্য নহে। পরন্তু উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্রই ইহা সমভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন এই, ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্রই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংখ্যা এইরূপ বর্দ্ধিত হইল কেন? যাহারা বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে নিতান্ত সামান্যভাবেও সংবাদ রাখেন, যাঁহারা দেশের দুঃখদারিদ্র্য, অন্নকষ্ট ও চিকিৎসাবিভ্রাটের বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করেন, দেশব্যাপী অজ্ঞতা, কুসংস্কার, স্বাস্থ্যবিধির অবহেলা, বিশুদ্ধ খাদ্য ও পৌষ্টিকের অভাব প্রভৃতি যাঁহাদিগের চিত্তাকর্ষণ কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, তাঁহাদিগের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান নিতান্ত অসম্ভব হইবে না। যে বয়সে মানুষ পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করে, যে বয়সে মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা কম, সেই বয়সেই যদি মৃত্যুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তবে কি উহা প্রকৃত-ভাবে চিন্তার বিষয় নহে? বিগত বর্ষে সমগ্র উত্তরবঙ্গের পাঁচ হইতে ষষ্টি ও তদূর্দ্ধ বর্ষের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মৃত্যু-সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বয়স	পুরুষ	স্ত্রী
৫-১০	১০,৪৪১	২০,৬৫৮
১০-১৫	৭০০৬	৫,০১৪
১৫-২০	৬,১০১	৪,১০১
২০-৩০	১৪,৩৪১	১৮,৮০২
৩০-৪০	৯৫,৬৫০	১৪,০২৭
৪০-৫০	১২,৪৪১	৯,১০৮
৫০-৬০	১০,৩৬৩	৮,৬৪৯
৬০-তদূর্দ্ধ	১৪,৯৯১	১২,৫৯৩

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে সমগ্র উত্তরবঙ্গে কেবলমাত্র ১৮৮০২ জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। পাঁচ বর্ষ হইতে তদূর্দ্ধকালে কোন বয়সেই স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে এত অধিক মৃত্যুর সংখ্যা পরিলক্ষিত হয় না।

উত্তরবঙ্গ—শুধু উত্তরবঙ্গে বলি কেন—সমগ্র বঙ্গে মানবজাতির এইরূপ অকালমৃত্যু বর্দ্ধিত হইল কেন? স্বাস্থ্য-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, আমার মনে হয়, কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে আমরা এইরূপ অকালমৃত্যু পরিলক্ষিত হইতেছে। ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে জননীগণ সাধারণতঃ সর্ব্ব প্রথম সন্তানপ্রসব করিয়া থাকেন। এই সন্তান-প্রসবের কাল তাঁহাদিগের পক্ষে ঘোর বিপদসঙ্কুল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধুনা ছর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট আমাদিগের নিত্যসহচর হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের নিম্ন শ্রেণির লোকের কথা দূরে থাকুক, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন অসংখ্য পরিবার আছেন, যাঁহারা শীতাতপ হইতে দেহরক্ষার উপযোগী বস্ত্র ও, জীবন ধারণের উপযোগী আহার্য্য সংগ্রহের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হইতেছেন না। জননীর গর্ভাবস্থায় ও সন্তানপ্রসবের পর তাঁহার পক্ষে যে সকল শারীরিকবিধান পালন করা প্রয়োজন, যেরূপ পুষ্টিকর আহারাদি তখন করা আবশ্যক, জানি না কয় জন তদ্বিষয়ে সমর্থ হইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও আহার্য্য ঘোল হইতে নিলুপ্ত হইয়াছে, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তদুপরি স্বাস্থ্যবিধান লঙ্ঘন সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালায় যেরূপ, এরূপ লোকের সংখ্যা বোধ হয় শতকরা একাদশের অধিক হইবে না। বঙ্গদেশে ঐ সংখ্যা বোধ হয় কিছু অধিক হইতে পারে অগণিত জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, উল্লিখিত অত্যল্প সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের কয়জন সাধারণ স্বাস্থ্যবিধান-সমূহ পালনে সম্যক্ মনোযোগী? পরন্তু কয়জন প্রকৃতভাবে এই সমস্ত বিধান পালন করিতে সমর্থ, সকলেই তাহা অবগত আছেন। অনাহার ও অর্দ্ধাহারক্লিষ্ট দেহদেহে রোগ সহজেই আত্মবিকাশ করিতে পারে পরন্তু এইরূপ দেহে একবার রোগ প্রবেশ করিলে, উহা সহজে নিষ্ক্রান্ত হয় না, এবং

ঔষধাদিতে মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। আমি ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি যে, আমাদিগের দারিদ্র্য যতই প্রবল হউক না কেন, আমরা ব্যক্তি ও সমাজগতভাবে চেষ্টা করিলে উল্লিখিত অকালমৃত্যুর পরিমাণ হ্রাস করিতে সমর্থ হইতে পারি না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি প্রদান এবং সাধারণ স্বাস্থ্য-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা সকলেরই পক্ষে সম্ভবপর। আমরা যদি এই সামান্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদানেও অক্ষম হই, তাহার জন্য অপরকে অপরাধী করা চলে না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত, হেমন্ত, যে কোন ঋতুই হউক না কেন, বাটীর মধ্যে যে গৃহখানি সর্ব্বাপেক্ষা অব্যবস্থিত, সেইখানিকে এক সুদূর প্রান্তে, শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা এবং আলোক ও বায়ু চলাচলের উপযুক্ত বিধান না করিয়া প্রসূতির বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। বৈশাখের দীপ্ত বায়ু পৌষের প্রচণ্ড শীত, শ্রাবণের ঘন বরষা এই জীর্ণ পর্ণকুটীরে শিশুর ও তৎপ্রসূতার ভাগ্যলেখা আবর্ত্তন করিতে থাকে। ধাত্রী সূতিকাগৃহের সীমা স্পর্শ হইতে না হইতেই প্রসূতির, অথবা জন্মাবধি বিশেষ বিশেষ রোগের উদ্ভবের, শৈশবলীলার সাঙ্গ করা ইহাকেও কি অমূলক বলিতে হইবে?

উপসংহারে আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিতেছি। বিগত ফাল্গুন মাসের "প্রবাসী" পত্রে একটি সারগর্ভ মন্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের জেলা-বোর্ড সমূহ দেশের স্বাস্থ্য-সাধনকল্পে যেরূপ অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার প্রকৃত উদ্ঘাটন করিয়া লিখিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে জেলাবোর্ডের প্রদত্ত অর্থসাহায্য অনেক স্থলেই এরূপ অকিঞ্চিৎকর যে, দেশের ধনী ও কৃপাবিলম্ব প্রচুর অর্থ প্রদানপূর্ব্বক এইরূপ বহু দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা না করিলে প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই ইতঃপূর্ব্বে আমি পাবনা ও রঙ্গপুর এই দুইটি জেলার দাতব্য-চিকিৎসালয়-সমূহের কার্য্য-বিবরণ আলোচনা পূর্ব্বক পাবনার "সুরাজ" এবং কাকিনার "দিক প্রকাশ" ও রঙ্গপুরের "দর্পণ" পত্রে দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই দুইটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, পাবনার জেলাবোর্ড গড়ে প্রতি রোগীর জন্য দুই পয়সা ও রঙ্গপুরের জেলাবোর্ড এক পয়সার অধিক মূল্যের ঔষধ দান করেন নাই। সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাসমূহের দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহের অবস্থা আলোচনা করিলে, ইহার অধিক আশাপ্রদ অবস্থা পরিলক্ষিত হইবে না। সুতরাং সমগ্র জেলার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে উন্নতি বিধান করিতে হইলে আমাদিগকে কেবল জেলাবোর্ডের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে হইবে না, দেশের ধনী ও কৃপাবান-সম্প্রদায়ের বদান্যতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতে হইবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে দেশের স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ আলোচনাকালে আমি লিখিয়াছিলাম, দেশের স্বাস্থ্যসাধন-কল্পে প্রকৃতি ও দেশের শাসকসম্প্রদায় যাহা কিছু করেন, তৃষিত-কণ্ঠ চাতকের ন্যায় আমরা যদি একমাত্র তাহার দিকে চাহিয়া না থাকি, "জল দাও, জল দাও," রাতদিন করিয়া গাও, তৈলাকর্ষণকারীদের নিকট হইতে ভার্ত্তার প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের দুর্বল কীট বান্ধবের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিফলতা ভোগ করিতে হয় না। বর্ত্তমানেও আমি সেই কথার প্রতিধ্বনি করিতেছি। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার "স্বাস্থ্য-সমাচার" পত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামীয় জনৈক লেখক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বিশেষভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া জনসাধারণ কিছুই করিতে পারেন না, আমি এই মতের সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি। আমি আমার নিজ জেলার উল্লেখ করিতে পারি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যশোহর "Anti-Malarial Society" বা "ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক" সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতি প্রারম্ভে কয়েকটি ম্যালেরিয়া বিজড়িত পল্লীগ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, ডোবাসমূহ পূর্ণ, বায়ু ও আলোক গমনাগমনের উপায় বিধান, জল নির্গমনের কৌশল অবলম্বন প্রভৃতি কয়েকটি সহজসাধ্য উপায়ে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। সুখের বিষয়, এই কয়েক বৎসরের চেষ্টার ফলেই সমিতির আশাতীত উন্নতি হওয়ায়—তাঁহারা অন্যান্য গ্রামে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। যশোহরের ন্যায় ম্যালেরিয়া বিজড়িত

পল্লীগ্রামসমূহের পক্ষে যদি এইরূপ উন্নতি সাধন সম্ভবপর হইয়া থাকে, তবে অন্যান্য স্থানের ও কথাই নাই। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র এই উপায়ে কার্য্য আরম্ভ হউক, বাঙ্গালার পল্লীগ্রামসমূহ সুখ স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতার লীলানিকেতন হইয়া উঠুক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীকেশবলাল বসু।

বন্ধ্যা

জগতের সুধা-ভাণ্ড ভাণ্ডারের দ্বার বাতায়ন
বন্ধ ওগো বন্ধ নারী! হায় তব ব্যাকুল ক্রন্দন
দিকে দিকে তুলিতেছে কি করুণ বেদনার সুর
গলিল না তবু হায় বিধাতার হৃদয় নিঠুর;
অন্তরের অন্তহীন স্নেহক্ষীর করেছ সঞ্চয়
কৈশোরের প্রান্ত সীমা হ'তে; রচিয়াছ হৃদিময়
স্নেহের আসন খানি অনাগত অতিথির তরে
সজল নয়নে তুমি চেয়ে আছ কত বর্ষ ধরে!
শৈশবে খেলার ঘরে পুতুলেরে লোহাগে যতনে
আদরে তুলিয়া কোলে গড়েছিলে কত ছবি মনে;
রচেছিলে হৃদি-পটে ভবিষ্যের রঙ্গীন কল্পনা
আজ হায় ব্যর্থ তব শৈশবের একাগ্র সাধনা।
ব্যর্থ তব বর্ষব্যাপী পুঞ্জিত এ আয়োজন শত
অনাগত অতিথি যে রহিল সে চির অনাগত!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ।

ভিক্ষা

একটা বড় শহরের কাছে চওড়া বড় রাস্তা দিয়ে একজন বোগা বৃদ্ধ চলছিল।

কেঁপে কেঁপে তার পা পড়ছিল; টেনে টেনে, থেমে থেমে, হুচোট খেয়ে খেয়ে তার শুকনো পা হুটো বড় কষ্টে—বড় দুর্বল ভাবে চলছিল কেন সে পা তার নয়; পরনে ছেঁড়া কাপড়; মাথায় টুপি ছিল না। মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত সে।

রাস্তার ধারে একটা পাথরের উপর সে ধপ্ করে পড়্ল সামনে বন্দুকের বাক্ত থেকে। হাঁটুর উপর কনুই রেখে হাতে মুখ ঢেকে সে বসল। তার শুকনো আঙুলের ফাঁক দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে দাড়ী শুকনো ধূলোর মধ্যে পড়ছিল।

সে ভাবছিল—তার গায়ে আগে কেমন জোর ছিল, তার আগে কত ধনরত্ন ছিল আর কেমন করে সে তার স্বাস্থ্য নষ্ট করেছে আর ধনরত্ন বন্ধু বা শত্রুকে নির্বিকারে দান করে ফেলেছে···কিন্তু এখন, হায়, একজনা কটিও তার খাবার নাই! সবাই তাকে ছেড়ে গেছে—বিশেষতঃ শত্রুদের আগে বন্ধুরা! এখন সে কি ভিক্ষা করে দিন কাটাবে? বেদনা ও লজ্জায় তার হৃদয়টা ভরে উঠল।

চোখের জল কোঁটায় কোঁটায় পড়ছিল, দাড়ী ধূলা কাদা হয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ কে যেন তাকে নাম ধরে ডাকলে; মাথা তুলে দেখে একজন অপরিচিত তার সামনে দাঁড়িয়ে।

থতমত খেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কি—কি আপনি ভাবছেন? কিন্তু আমরা—মানুষ আমরা কি আপনার প্রিয়তম সন্তান নই?"

স্ত্রীলোকটি একটা ভ্রূকুটি করলেন। "সকল জীবই আমার সন্তান—এদের সকলকেই আমি সমান ভাবে যত্ন করি—সমান ভাবে ধ্বংস করি।"

"কিন্তু সৎ···বিচার···ন্যায়···" আমি আবার থতমত খেয়ে বলতে যাচ্ছিলাম।

"ওগুলো মানুষের কথা। আমি সৎ ও জানি না, অসৎ ও জানি না···বিচার আমার পক্ষে একটা নিয়ম নয়—আর ন্যায় কি? আমি তোমাকে প্রাণ দিয়েছি, আমি তা কেড়ে নিয়ে আর একজনকে দিব—সে কীটই হউক আর মানুষই হউক আমি দেখি না। যাও তোমার কাজ কর গিয়ে, আর বিরক্ত করো না!"

আমি হয়ত প্রতিবাদ করতাম কিন্তু পৃথিবীটা ভয়ানক গর্জ্জন করে উঠল—আমি কেঁপে উঠে দেখি ঘেমে গিয়েছি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সাহিড়ী।

পরিত্রাণ

(১)

বাহিরের দিক হইতে রামপ্রসন্ন মিত্র মহাশয়ের জীবন কাহিনী আপাত মনোরম বোধ হইলেও উহার পরিণতি ভয়াবহ। মিত্র মহাশয় ৪৫ বৎসর বয়সে ছোট আদালতের জজিয়তী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দুনিয়াদারী ভোগ করিতেছেন। তাঁহার পিতা একজন নামজাদা সরকারি কর্মচারী ডেপুটি হরিপ্রসন্ন মিত্রের নাম পূর্ব্বেকার সিবিলিয়ান মহলে সকলেই পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার প্রতি কর্তৃপক্ষ এরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন যে অবসর গ্রহণ করিয়া দুর্ব্বিষহ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও তাঁহাকে পেন্সন লইতে বাধ্য করান হয় নাই। সে আমলে প্রাচীন কর্ম্মচারীগণের বিশ্বস্ততার পুরস্কার স্বরূপ প্রায়ই তাঁহাদিগকে কর্ম্মবিরল পদে বাহাল রাখা হইত। এইরূপে জীবন সায়াহ্নে অসদৃশ অবস্থাতেও বিনা আয়াসে তাঁহাদের পুরাবেতন লাভ ঘটিত। হরিপ্রসন্ন এইরূপে নফরচন্দ্রীশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের কোন সুবৃহৎ জেলার সদর ষ্টেসনে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং অনাবশ্যক পঙ্গম চক্রের ন্যায় মনোনীত সদস্যরূপে জেলাবোর্ড মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনবিভাগের যন্ত্রসমূহ শকটগুলির বেগ আরও মন্দীভূত করিয়া বহুকাল নিষ্ফল অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

হরিপ্রসন্নের তিন পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সত্যপ্রসন্ন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রাদেশিক শাসনবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন প্রভেদের মধ্যে এই যে পূর্ত্ত আবকারী ডেপুটি কালেক্টার রূপে বহুদিন কার্য্য করার হালবাবস্থায় ৪০০৲ টাকা বেতনে আবকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কোটায় পহুছিয়াছে সুতরাং আর অধিক উন্নতির আশা নাই। সর্ব্বকনিষ্ঠ জ্ঞানপ্রসন্ন বাল্যকালেই বয়াটে হইয়া যায়। তাহাকে ৫।৬ বার তিন তিন স্থানে চাকরী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সে কোথাও টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। এখন অগত্যার গতি রেলবিভাগে সামান্য বেতনে নিযুক্ত থাকিয়া কোনও প্রকারে নিজ উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। তাহার পিতা ও ভ্রাতারা বিশেষতঃ তাহার ভ্রাতৃবধূরা তাহাকে বড় নিকটে ঘেঁসিতে দিত না এমন কি নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তাহার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিত না। হরিপ্রসন্নের একমাত্র কন্যার বড় ঘরেই বিবাহ হইয়াছিল। শ্বশুরের ন্যায় জামাতাও ডেপুটি ছিলেন। উপযুক্ত পুত্র জামাতা কখনই সমতুল্য নহে সুতরাং মিত্র পরিবারের একমাত্র আশা ভরসার কেন্দ্র, কুলপ্রদীপ শ্যাম রামপ্রসন্নের প্রতি সকলেরই সোৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। জ্যেষ্ঠের ন্যায় রামপ্রসন্নের বৃথা পাণ্ডিত্যের ভাণ ছিল না এবং তিনি বৃথা বাগাড়ম্বরও ভাল বাসিতেন না। অপর দিকে চকল মতি কনিষ্ঠের ন্যায় তিনি দায়িত্ব জ্ঞানশূন্য আমোদপ্রিয় যুবকও ছিলেন না। শিষ্ট, সুচতুর ও তেজস্বী বলিয়া সকলেই এই প্রিয়দর্শন যুবককে ভালবাসিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তিনি একত্রেই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন কিন্তু জ্ঞানপ্রসন্নের অদৃষ্টে আইনপড়া সাঙ্গ করিয়া পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠিল না। সে নিজ দুর্ব্যবহার জন্য প্রথম বার্ষিক শ্রেণী হইতেই বিতাড়িত হইল। রামপ্রসন্ন সসম্মানে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। আইন বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তাঁহার যেরূপ স্বভাব ছিল পরে তাহার আর

কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই সাধারণতঃ তিনি সেই একই প্রকার সখা-সঙ্গ-লিপ্সু, সদানন্দ বহুজনপ্রিয় ব্যক্তিরূপে কাটাইয়া গিয়াছেন। এদিকে খোস্‌মেজাজী বলিয়া বন্ধুসমাজে তিনি যেরূপ আদৃত ছিলেন কর্ম্মঠ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া রাজসরকারেও তাঁহার সেইরূপ সুখ্যাতি ছিল। তিনি দৃঢ়তার সহিত নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন কিন্তু সে কর্ত্তব্যের গণ্ডি বড়ই সঙ্কীর্ণ। উপরিতন কর্ম্মচারীরা কাগজে কলমে যাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন তাহাই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত করিয়া তিনি কখনও নিজ কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতেন না। তোষামোদ কাহাকে বলে তাহা তিনি বাস্তবিকই অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বড়লোকদিগের সহিত যেরূপ ভাবে মিশিবার ও তাঁহাদের আচার অনুষ্ঠান, সখ ও আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি নিজস্ব করিয়া লইবার তাঁহার এক অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। উজ্জ্বল আলোক দৃষ্টে উদ্‌ভ্রান্ত পতঙ্গের ন্যায় তিনি ধনী সমাজের প্রতি সবিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যৌবনের গিছিল পন্থা অতিক্রম করিলেও তিনি ঐ ঘৃণিত মনসিজের পূজা হইতে বিরত হয়েন নাই। কিন্তু এখন আর তাহার বাহ্যিক ব্যবহারে কৈশোরসুলভ চাপল্যের লক্ষণ কিছুমাত্র বিদ্যমান ছিল না বলিয়া সেদিকে কাহারও দৃষ্টি সহসা আকৃষ্ট হইত না। বয়োবৃদ্ধি ও পদোন্নতির সহিত তাঁহার স্বভাবও ক্রমশঃ উদারনৈতিক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িতেছিল। 'ল' কলেজে অধ্যয়ন কালে বন্ধুসঙ্গত প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কয়েকবার ব্রীড়াজনক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং এজন্য পরে তাঁহার যথেষ্ট আত্মগ্লানিও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তিনি ধনী সংসর্গে আসিয়া দেখিলেন যে এরূপ নৈতিক পদস্খলন তাঁহাদের নিত্য বৈষয়িক ক্রিয়ার মধ্যে সুস্বাদু অনুশোচনার বেশ শীঘ্রই অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছিল। ইহার পর এরূপ কার্য্য সঙ্ঘটন একান্ত না হইলেও তিনি এগুলি আর তেমন দোষাবহ বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

'ল' কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইতেই রামপ্রসন্ন তাঁহার পিতৃবন্ধু একজন হাইকোর্টের উকিলের নিকট নামমাত্র আর্টিক্‌ল্‌ড্ ক্লার্করূপে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল এবং রামপ্রসন্নও ইতিমধ্যে এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ও ঠাকুর আইন পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়া হাসিমুখে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন। ওকালতীর উপর রামপ্রসন্নের বিশেষ আস্থা ছিল না এবং মৃত পিতৃদেবের উপস্থিত চাকরীর দাবীতে পুত্রের জন্য অপর কিছু সংস্থান করিতে না পারিয়া তাহাকে ৬০৲ টাকা বেতন ও ৫০৲ টাকা ভাতায় ষ্টেট্ বহির্ভূত সাময়িক সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীর পদে বাহাল করাইয়া মফঃস্বলে কার্য্যশিক্ষার জন্য রঙ্গপুরে পাঠাইয়া দিলেন। রামপ্রসন্নের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও অবস্থানুযায়ী সেলসুধার প্রতি তাঁহার পিতৃদেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। চাকরী স্থানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে রামপ্রসন্ন পিতৃদত্ত অর্থে প্রবাসোপযোগী আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তখনও ষ্টেশনটি বহুদূরে একল সাহেবীয়ানার প্রাদুর্ভাব হয় নাই কিন্তু ধনীর বলিয়া মিত্র মহাশয়ের সাহেবী পোষাক ব্যবহার করিতেন। রামপ্রসন্ন ব্যয়বাহুল্য সত্ত্বেও সাহেব বাড়ী হইতে পোষাক তৈয়ার করাইলেন ও কয়েকদিন চৌরঙ্গীর ভিন্ন ভিন্ন সাহেবী দোকানে ঘুরিয়া নূতন সুটকেস্, টুপির বাক্স, সুদৃশ্য বিছানা কম্বল, সাবান, ব্রুশ ও ট্রস প্রভৃতি হাজামতের সরঞ্জাম এবং ল্যাটিন ঘটো সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র সাকেট খরিদ করিলেন। সাকেটটি দেখিতে সুন্দর ছিল না কিন্তু ঘটোটি রামপ্রসন্নের বড়ই পছন্দ হইয়াছিল উহার তাবী ফেলাকাটির হাদায় বিদায় দিতে গেলে পূর্ব্ব সহপাঠীগণ সকলে মিলিয়া ঘটা করিয়া রামপ্রসন্নকে বিলাতি হোটেলে একদিন "ডিনার" বিদায় ভোজনান্তে রামপ্রসন্ন রাত্রির ট্রেণে কার্য্যক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে অপর অপর সহকর্ম্মীদের সহিত একজন পাঠ্যাবস্থার আমোদ আহ্লাদে কাটিয়া যাইতে লাগিল। রামপ্রসন্ন সরকারী কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন এবং যাহাতে সময়মত কাজ সুষ্ঠু হয় এরূপ আমোদ প্রমোদে কখন সাধারণ ভাবে যোগ দিতেন না।

সুতরাং তাঁহার উপরওয়ালারাও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদোন্নতির জন্য রিপোর্ট দিতে লাগিলেন। উপরিতন ও অধস্তন কর্মচারীগণের সম্বন্ধে আত্মসম্মান রক্ষায় রাখিয়া কাজ হাসিল করিতে তিনি ভালরূপেই শিখিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে কর্তৃপক্ষের হুকুম তামিল করিতে অন্যে অন্যে দপ্তরখানায় যাইতে হইত। কুর্সীর মুক্তাসনের জন্য লইয়া কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে তিনিই স্থানীয় জজের জন্য প্রেরিত হইতেন এবং সকল স্থলেই উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করিয়া যথাসময়ে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার সততার জন্য সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল এবং উৎকোচাদির বশীভূত নহেন বলিয়া এসম্বন্ধে তিনি নিজেও যে একটু স্পর্দ্ধা না করিতেন তাহা নহে। তাঁহার অল্প বয়স ও আমোদপ্রিয়তা সত্ত্বেও সরকারী কার্যের সময় সকলেই তাঁহাকে বেশ রাশভারি এমন কি কড়া লোক জানিয়াই সমীহ করিয়া চলিত। সেবার সেটেলমেণ্ট অফিসার সাহেব মহাশয় সদরীক ক্যাম্পে তত্তাবধান করিয়াছিলেন। রায়প্রসন্নের মিতব্যয়িতা, কার্যতৎপরতা ও আদব কায়দার গুণে উভয়েই এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কয়েকবার নেটিব খৃষ্টান রায়প্রসন্নকে সস্ত্রীকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মানিত করিতে বিধা বোধ করেন নাই। সেটেলমেণ্টের প্রধান কর্মচারী মহাশয় ও তাঁহার মেম সাহেবের সহিত এই সৌহার্দ্য ক্রমশই বর্ধিত হইতে লাগিল এবং তিনি প্রাণপণে তাঁহাদের সন্তোষ বিধানে নিযুক্ত রহিলেন। সামাজিক ব্যাপারে তাঁহার বেশাবিশি ও চলাফেরায় জাতে কেহই কখনও দোষ ধরিতে পারিত না। তিনি যাহাই করুন না তাঁহার মধুর ব্যবহারের গুণে সকলেই তাঁহার দোষ উপেক্ষা করিত। হাজার দোষযোগ সত্ত্বেও তাঁহার বেশভূষার পারিপাট্যের অভাব হইত না। রাজদ্বারে সভাসমিতিতে বিশুদ্ধ ইংরাজী ছাড়া তিনি কখনও দেশীয় বা মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করিতেন না। এইরূপে চাকরীর তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

সেই সময় সেটিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে রায়প্রসন্ন পরীক্ষার্থে কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া সাব্‌ডেপুটি পদে নিযুক্ত হইলেন। সাব্‌ডেপুটিদিগকে অল্পবিস্তর বিচারের কার্যও করিতে হইত বিশেষতঃ মফস্বলায় বাঙ্গিলে ত কথাই নাই। মিত্র মহাশয় ভাবিয়া দেখিলেন এক ঘেয়ে জরীপাদি সংক্রান্ত কাজের পর এই নূতন কর্তব্যগুলি বেশ মজা লাগিবে না তাই নূতন পদে বাহাল হইবার পর সাধারণবিভাগে বদলীর হুকুম আসিলে তিনি তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। যাইবার সময় তাঁহার কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে ষ্টেশনে পৌঁছাইতে আসিলেন এবং স্মরণ চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে কাশিকরের তৈয়ারী নাম খোদাই করা একটি রূপার সিগারেট কেস এবং চন্দন কাঠের ফ্রেমে বাঁধান একখানি গ্রুপ ফটোগ্রাফ ট্রেণ ছাড়িবার সময় উপহার দিলেন। তখন আর যৌথিক আপত্তি করিবার বা ধন্যবাদ দিবারও অবসর ছিল না।

সেটলমেণ্ট কার্যে তিনি যেরূপ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। কার্যটীও তাহার মনের মত হওয়ায় কাজের উপর যেন একটু বেশী অনুরাগ দেখা যাইতে লাগিল। কর্তব্য ও সামাজিক শিষ্টাচারের সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি অধীন প্রজাবর্গ ও উকিল মোক্তারগণের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন যে সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার যশোগান করিত। পূর্বে সেটলমেণ্ট আফিসে নাজির সহ্‌রেজেষ্টার প্রভৃতি যে সকল লোকের সহিত জানাশুনার সুবিধা হইত তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তর ব্যক্তির সহিত এখন মিশিবার সুযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। পিতা ও ভ্রাতাকে দেখিয়া বাল্যকাল হইতে "হাকিমি করার" যে একান্ত অভিলাষ মনের কোণে লুক্কায়িত ছিল সে সুখের স্বপ্ন কোনপ্রকারে ঘোলেই মিটাইতে হইল। কাছারীতে রায়প্রসন্ন যে টুল কর্তৃক পাইয়াছিলেন তাহাতেই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেন যত বড় ধনী লোকই হউন না কেন একখানি সাদা কবজে নাম দস্তখৎ করিয়া পাঠাইলেই একদণ্ডে আসিয়া হাজির হইতে

হইবে। তাহার এক মাসের অধিক কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা ছিল না বটে কিন্তু সাক্ষীর কাটগড়ায় দাঁড়া করাইয়া ইচ্ছামত প্রশ্ন করিবার ক্ষমতাও ত নিতান্ত কম নহে। রামপ্রসন্নের একটী মহৎ গুণ ছিল নিজ ক্ষমতা সামান্য হইলেও তিনি কখনও তাহার অপব্যবহার করিতেন না। কোথাও বাধ্য হইয়া কঠোর ব্যবহার করিতে হইলেও তিনি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া যাহাতে সর্ব্বদিক বজায় থাকে এইরূপ ব্যবস্থাই ভালবাসিতেন। তাঁহার যে কত বিষয় ক্ষমতা আছে এবং ইচ্ছা হইলে তিনি যে রাজদ্বারে অনাবশ্যক কঠোরতা বর্জ্জন করিতে পারেন বিচার কার্য্যের এই বিশেষত্ব টুকুই তাঁহার নিকট সর্ব্বদিক প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত। সাক্ষীর এজাহার গ্রহণকালে নিষ্প্রয়োজনীয় অনাবশ্যক বিষয় লিখিয়া তিনি কখনও নথি ভারাক্রান্ত করিতেন না। রায় লেখা সম্বন্ধেও তাঁহার একটু বিশেষত্ব ছিল। যতই জটিল মোকর্দ্দমা হইলেও তিনি শুধু উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী হইতে আবশ্যকীয় অংশ লইয়া এরূপ সরল ভাষায় বৃত্তান্তটী বর্ণনা করিতে পারিতেন যে নিজের ব্যক্তিগত মতামতের উপর বিশেষ জোর না দিলেও ইহাতেই সত্যঘটনা আয়নার মত প্রকাশ পাইত। প্রথম হইতেই মোকর্দ্দমাটীই সত্য বা মিথ্যা এরূপ একটা ধারণা না করিয়া ক্রমশঃ প্রশ্নের দ্বারা তিনি সকল কথা পরিষ্কার করিয়া লইতেন। পরে সাক্ষীসমূহের পরস্পর বিরুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে কোন্ ঘটনা সংযোজনা করিলে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় তাহাই নিজ রায়ে প্রকাশ করিতেন।

নূতন কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি অল্পদিনেই অনেকগুলি নূতন বন্ধু ও নূতন সহচর লাভ করিলেন। এখনও পূর্ব্বের ন্যায় তাসরূপ খেলাকুমা করিতেন তবে এবিষয়ে সামান্য একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তিনি দাড়ি কামান বন্ধ করিয়া দাড়ি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমে এজন্য অনেকে ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণ বলিয়া ইঙ্গিত করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রামপ্রসন্নের কোনও ব্রাহ্ম পরিবারের সহিত পরিচয় ছিল না এবং আচার ব্যবহারেও ব্রাহ্মসমাজের সহিত কোনও রূপ সহানুভূতি লক্ষিত হইত না। তিনি কেবল মুরুব্বি সাজিয়া সভীর হইবার অভিপ্রায়েই দাড়ী রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মহকুমায় বেশ আনন্দেই দিন কাটিতে লাগিল। নূতন সঙ্গীগণ সকলেই সদাশয় ও সজ্জন ব্যক্তি এবং ইতিমধ্যে তাঁহার খাতিরও পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এ ছাড়া "ব্রিজ" নামক নূতন তাস খেলা আরম্ভ করিয়া লইয়া তিনি মফস্বল জীবনে নূতন আনন্দের সন্ধান অনুভব করিলেন। এ খেলায় তিনি বাস্তবিকই পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন। খেলিতে বসিলে তাঁহাকে কদাচিৎ হারিয়া উঠিতে দেখা যাইত।

অল্পদিন পরেই রামপ্রসন্ন মহকুমা হইতে সদরে বদলী হইলেন। সদরে আসিয়া দিনগুলি আরও আরামে কাটিতে লাগিল। এখানে আট সজ্জন ডেপুটি মুন্সেফ—সুতরাং একটি বড় গোছের তাসের ও পোল গল্পের আড্ডা ছিল। রামপ্রসন্নের আগমনে—পুরাদমে ব্রিজ চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এইখানে দুই বৎসর অবস্থানের পর রামপ্রসন্ন তাঁহার ভাবী স্ত্রী মিস্ হিরণ্ময়ীর সহিত পরিচিত হইলেন। সে সময় বঙ্গীয় খৃষ্টান সমাজে হিরণ্ময়ীর ন্যায় সুশিক্ষিতা কন্যা খুব বিরল ছিল না। তাঁহার পিতা ও রামপ্রসন্ন অপেক্ষা পদমৌরবে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। তিনি প্রথম শ্রেণীর best surgeon। কিন্তু তখন কিছুদিনের জন্য অস্থায়ীভাবে সিভিল সার্জ্জনের কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার চাকরী ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইতে কয়েকমাস বিলম্ব ছিল এবং এই কয়মাস কাটাইয়া গেলে পেন্সন লইবেন এইরূপই স্থির ছিল। রামবাহাদুর মতিলাল গুহকে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ভালরূপই জানিতেন বিশেষতঃ পাদরী বংশোদ্ভূত আমেরিকান বন্ধুর কোনও উচ্চপদস্থ ইংরাজ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। যখন এই সাহেবের মহোদয় কেলার সামান্য আসিস্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটমাত্র ছিলেন সেই সময় কিছুদিন তাঁহাকে একোনও অসুখসূত্রে গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিতে হয়। হঠাৎ তাঁহার পত্নী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। দূর হইতে সাহেব ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিবার আর সময় ছিল না সুতরাং

বাঙ্গালী ডাক্তার। অভিলাষ বাসুদেবই চিকিৎসার ভারগ্রহণ করিতে হইল। মৌখাসাক্রমে সাহেব সার্জ্জন অচিরে নিরাময় হইলেন। এবং সেই অবধি সেখানে অবস্থানও ইংরাজ সিবিলিয়ানে যে সৌহার্দ্দ বন্ধন সংঘটিত হইল তাহা উচ্চপদে সমারূঢ় হইয়াও সাহেবটি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সাউথগেটে বড় সাহেব তাঁহার উপর প্রসন্ন কালেক্টার প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীগণও যে তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

রাম প্রসন্ন কোনই নিবন্ধন সভায় নব পরিধিরেই সহিত পরিচিত হইলেন। পরে নির্ম্মল মুখে ও সভা সমিতিতে তাঁহাদের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি সব মুখ সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। প্রায়ই তাঁহার লাভা-জোবদে নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম রামপ্রসন্নের সেরূপ বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। হিমানীর সহিত আলাপ ভাসা ভাসা ভাবেই হইত। কিন্তু কুমারীর ভার লইয়া এরূপ নীরবভাবে কোন কার্য্যে সেলে ক্রমেই অহঙ্কারের বৃদ্ধি হয়। কলেজে পড়িবার সময় রামপ্রসন্ন সুবক্তা গায়ক ও সকল ঐতিহাসিক বলিয়া বন্ধু সমাজে পরিচিত ছিলেন। ইনষ্টিটিউট গৃহের নাট্যশালায় অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য তিনি অনেকটি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার পাইয়াছিলেন। সঙ্গীতে শ্রীকণ্ঠ হওয়া অবধি সঙ্গীত চর্চ্চার দিকে বড় ঝোঁক ছিল না। ভাবিতেন হাকিমি করিতে গেলে মজলিসি আমোদ ছাড়িয়া গম্ভীর হওয়াই আবশ্যক। এখন আবার নূতন উদ্যমে সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিলেন। এই সঙ্গীত চর্চ্চার অছিলায় কুমারী কুমারীতে একটু অধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। তরুণী বালিকা তাহার মনের ভাব পূর্ব্বে প্রকাশ না করিলেও থাকিতে হইতে কোনও কথাই গোপন রহিল না। হিমানী কুরূপা নহে তাহারি পিতাও সম্পত্তিপন্ন। সুতরাং হইতেই তিনি ঈশ্বরের নামে এক সহস্র মুদ্রার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া রাখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনেরই সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রামপ্রসন্ন অভিলাষ বিবাহ করিতে কতি কি? আমার ঐ উক্তির সমর্থন চেষ্টা করিলেই বহুতর পাঠক ছুটিবে বটে কিন্তু উপস্থিত পরিত্যাগ করা উচিত নহে। বেতনের তুলনায় স্ত্রীর কোম্পানীর কাগজের অঙ্ক লাভ্য বটে কিন্তু অবাহতে ও আর কিছু হাত দিতে হইবে না। সুতরাং হাতের মাতব্বর অবস্থা থাকিবে সুতরাং প্রোঢ়া কন্যা স্ত্রী ঘিয়ে আমিনী—হাল কাসুন্দে দীঘিকা ঘরনী—তামাকটা পর্য্যন্ত সাজিতে হইবে তাহার উপর নবোদ্ভিন্ন যৌবনের নবীন ছটা—সুতরাং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া রামপ্রসন্ন বেশীর ভাগ আশাবাদী হইলেন। রামপ্রসন্ন হিমানীর সহিত প্রেমে পড়েন নাই। সাংসারিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যাপারে উভয়ের মতের কোনও গরমিল আছে কিনা তাহার কোনও খোঁজ লয়েন নাই। তাহার আত্মীয়স্বজন কেহই এ বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই বরং তাঁহার কোন কোন আত্মীয়া এ বিবাহে ঘোর আপত্তি করিয়া এরূপ একটা আত্মীয় স্বামী আত্মীয়দের সম্বন্ধে আদৌ গৌরবের বিষয় হইবে না। আমরা তাঁহার মৌন মনোভাব দেখিয়াই তিনি সর্ব্বদা সকলে বিবাহ করার তিনটী প্রধান কারণের উল্লেখ করিয়াছেন প্রথমতঃ ঐ সম্বন্ধে আপনা হইতেই ভুলিয়া যেন দ্বিতীয়তঃ কর্ত্তব্য দেখিতে বলা নহে এবং তৃতীয়তঃ তিনি কাল উপর ওয়ালার নিকট আসায় গিয়াছিলেন যে ঐ বিবাহে রাজী হইলে তুলিও প্রসন্ন হইবেন। ইহাতেই বুঝিতেই পারা যায় রামপ্রসন্নের অন্তর মহাশয়ের রায় বাহাদুরী বুদ্ধি মৌজ মেজাজে কখনো ছিল না। সেই হেতু রামপ্রসন্ন অভিলাষ বিবাহ করিলেন।

আমার সোহাগ নব অনুরাগ নব জনপ্রীতির মধুচন্দ্রিমা হাসিতে হাসিতে কাটিয়া গেল। নূতন সংসারে নূতন কুমারীর নূতন বেশভূষা পরিচ্ছদ সবই নূতন। এ যেন বরার উপর পরীরাজ। ক্রমে যোর কাটিতে লাগিল বৎসরের পরই হিমানী সন্তান সম্ভবা। রামপ্রসন্ন ভাবিয়াছিলেন স্ত্রীর মনের যেরূপ ঐকান্তিক প্রেম রহিতেছিল চিরকালই সেইরূপ রহিতে থাকিবে। ধারা পড়িয়া ঐ নদীর স্রোত বন্ধ হইবার নহে। কিন্তু অকস্মাৎ এই পরিবর্ত্তন। শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তনের যে এরূপ সংযোগ আছে রামপ্রসন্ন তাহা জানিতেন না।

এখন আর দৃষ্টি মাত্রেই পুলক মুক্তা আর অনুরাগ বর্ষাং বিহাগে পরিণত হইয়া যায় অদূর উঠিতে বসিবার উপক্রম হয়। রামপ্রসন্ন প্রাণপণ করিয়া যেখিলেন তাহাই বিভ্রান্তিকর হউক এ অচিন্তপূর্ব অভিনব পরিস্থিতির অভিনয়ের রাশ একবার পাল্টাইবার উপায় নাই।

রামপ্রসন্নের মনে হইত তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ ভাগিনী জীবনের সব সৌন্দর্য্য স্নেহের বিসর্জ্জন দিয়েছেন। এখন কথায় কথায় মান-অভিমান। পান হইতে চুন খসিলেই অনুযোগ অনুরোধের পালা। এরূপ ভাব কখনও দেখা যায়। সর্ব্বক্ষণ নিকটে থাকে না থাকিলেই মনোরমার অপ্রীতির সন্দেহ। ইহাকেই বলে বীরত্ব বরদুমি হওয়া।

রামপ্রসন্ন ভাবিয়াছিলেন দার্শনিকের ন্যায় বিপদটিকে সব উপেক্ষা করিয়াই সকল মোকাবেলা করিয়া যাইবেন। প্রথম প্রথম তিনি গৃহীর নিয়মিত আর রক্ষা করিয়াও দেখিতেন না বীরভাবে নিজ কার্য্য করিয়া যাইতেন। যখন মনে মনে বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এবং সন্ধ্যার সময় নিয়ত তাদের আড্ডায় বসিয়া যাইতেন। কিন্তু এরূপ নিলিপ্ত ভাবে বেশী দিন চলিল না। গৃহিণী ক্রমেই প্রলয়করী মূর্ত্তি ধরিতে আরম্ভ করিলেন। ভদ্রলোক পর্য্যন্ত নিজের স্নেহ-ব্যবহার না করিয়া অন্যের কথায় কথায় বাড়ী বাধান করিয়া তুলতেন। সন্ধ্যার পর আড্ডা জোটা দূর হইয়া রোটি ছিল না। সারাদিন পরিশ্রমের পর রামপ্রসন্ন একটু বসিয়া থাকা রামপ্রসন্নের নিকট বড়ই আরাম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি ভাব গতিক দেখিয়া ভয়ানক ভীত হইয়া পড়িলেন।

একদিনে রামপ্রসন্ন নিজে ঠেকিয়া বুঝিতে পারিলেন যে সংসার ক্ষেত্রে বড় আরামের নিদ্রা নয়। জীবনে দুঃখের চেয়ে অশান্তিই বেশী অসহ্য তাঁহার নিজের ভাগ্যে দুঃখের কথাটা যে বড় বেশী পড়ে নাই সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ মাত্র রহিল না। এখন কি প্রকারে পত্নীর খামখেয়ালীর হাত এড়াইয়া স্নেহের আশ্রয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় এই চিন্তাই তাঁহার আহার নিদ্রা হরণ করিবার উপক্রম করিল। সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ। অবশেষে রামপ্রসন্নও অবশেষে পরিণামের এক পথ আবিষ্কার করিলেন। হিসাবী অন্তরে একটী জিনিষকে নিশ্চয় সন্দেহ করিয়া চলিত উহা অর্থনৈতিক সরকারী কার্য্য। সরকারী কার্য্যের বাস্তব হইলে যে স্বাধীন চালচলন নাই। টাম পাড়াপাড়ি হইবে এবং সরকারী কার্য্য সুসঙ্গত হইলে যে পদোন্নতি তথা বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা একথা তিনি ভালরূপই জানিতেন। সুতরাং সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা বিমুক্ত হইবার জন্য রামপ্রসন্ন বিশু মহাশয় যখন বিশেষ উৎসাহে সরকারী কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, এবং রাশি রাশি মাসীয় ও আপিস ব্যাকরণে এবং যত্ন যত্ন ফাইল ও ফাইল আনিয়া যখন নিজের চতুষ্পার্শ্ব সুরক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন তখন সে আচার ব্যবহার করিয়া কোনরূপ ফল হইল না। গৃহিণীর পক্ষে বড় সহজসাধ্য হইল না। পত্নীর বেদনাকে উপেক্ষা এবং সাংসারিক মনোযোগ যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল রামপ্রসন্নও সেই অনুপাতে সরকারী কার্য্যের অনাদর পূরণে দুর দিয়া ক্রমশঃ তলাইতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার সরকারী দপ্তরে খ্যাতি লাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষা ছিল না এখন তিনি বার্ষিক রিপোর্টে নিজ নাম দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া পড়িলেন।

যখন সময়ে রামপ্রসন্নের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হইল কিন্তু ইহাতে পত্নি প্রসন্না হইয়া আরও হাজার যেন আরও বাড়িয়া চলিতে থাকিল। সৌখীন গৃহস্থের জন্য ঈপ্সিতের বৈশাখিক শিশুপুস্তিকার পাতের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ইহার কোনটি ব্যবহার করিলে নবজাত শিশু শরীরকার মত বৃদ্ধি পাইবে তাহা লইয়াই প্রথমতঃ বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। শিশুদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অনেক স্থলেই শিশুরা বিপরীত হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও প্রায় সেইরূপ ঘটিল। শিশু ও তাহার পরিচারিণী উভয়েই সাধারণ প্রকৃত এ কাল্পনিক পীড়ায় কষ্ট পাইতে লাগিল। রামপ্রসন্নের স্ত্রীরোগ ও বালরোগাধিকারে বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা ছিল না আর থাকিলেই বা কি হইবে? কথায় কথায় নিজগৃহ হইতে চিকিৎসালয় পর্য্যন্ত দৌড়াদৌড়ি না করিতে পারিলে কি পরিত্রাণ আছে? গৃহিণী তখনই ধন্বন্তরীর বর্ত্তমান হাতে পড়িয়াছেন বলিয়া রামপ্রসন্ন উপস্থিত করিবেন সুবরাং রামপ্রসন্ন ধীরা ও ভরসার বিষয় অধিক কিছু খুঁজিয়া আর

যাই যুবক অন্ততঃ ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানে বিশেষ রকম ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সংসারের ভালাপালা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল মিত্রজাও ততই ঘুরে ঘুরে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এখন শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মযোগীর নির্লিপ্তভাব—পরিবারবর্গের সহিত যথোচিত ব্যবহার রাখিয়া এমনভাবে সাহিত্যচর্চ্চা পালন করা—যাহাতে অপর কাহারও কথিক সুখদুঃখ বা রাগদ্বেষ গৃহস্থালীর মনে কিকিন্মাত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়। বিবাহের ঠিক এক বৎসর পরে রামপ্রসন্ন বুঝিতে পারিলেন যে বিবাহটা যতই জটিল ও দুর্ব্বোধ ব্যাপার। যেমন স্কুল কলেজ ছাড়িয়া চাকরী বা ওকালতি করিতে গেলে মনকে ক্রমশঃ সে দিকে লওয়াইতে হয় দাম্পত্য-জীবনেও তেমনি অনেক অপ্রীতিকর অনুভূতি ক্রমশঃ সহ্য করিয়া লইতে হয়। প্রথম প্রথম খাওয়ার সময় আফিসের তিক্ত আস্বাদনে কষ্ট বোধ হয় বটে কিন্তু ক্রমশঃ সে তিক্ততা আর গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না।

জীবনে অনেকেই এইরূপ দার্শনিক গবেষণার দ্বারা সত্য আবিষ্কার করিতে হয়। রামপ্রসন্নও এইরূপে সত্য নির্ণয় করিয়া পারিবারিক বিষয়ে নিজের পূর্ব্বভাব অনেকটা বদলাইয়া লইলেন। নিজ সুখে যেটুকু আরাম বিনা আয়াসে পাওয়া যাইতে পারে তাহার অধিক আর তিনি কিছুই প্রত্যাশা করিতেন না। কিন্তু করিলে যান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য যেটুকু ব্যবস্থার আবশ্যক তাহার গোলযোগ সত্ত্বেও তাহা না করিয়া সরে পাইবার উপায় ছিল না। সুতরাং ঝি, চাকর, পাচক প্রভৃতির বেতনের বন্দোবস্ত, ছেলেদের সহিত একত্রে আহার বসুধে রাত্রি বাস এবং পদ মর্য্যাদা উপযোগী বাহ্যিক চাল চলন সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় বাহাল রহিল কেবল পরিবর্ত্তনের মধ্যে এই টুকু দেখা গেল যে তিনি এখন হইতে আর আরামের আশায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন না বরং অবসর কালে বন্ধুবান্ধবদেরই হাসিমুখের সন্ধানে ফিরিতেন। যদি কাহাকেও গম্ভীর বা রস ব্যবহারের অভাব পাইলে নিজের সঙ্কীর্ণ কর্ম্ম বহুল জীবনের ভিতর নিজকে গুটাইয়া লইতেন এবং যোলআনার স্থলে আঠার আনা রকম রাজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহাতেই আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কার্য্যে তাঁহার সুখ্যাতি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অল্প কালের মধ্যে তিনি উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী প্রাপ্ত হইলেন। ফলে যতই দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল রামপ্রসন্নও ততই জটিলতর যোকর্ম্মবার ধারা ইংরাজীতে সুন্দর সুন্দর রায় লিখিয়া নিজ পারদর্শিতায় নিজেই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। উচ্চ শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোক্তার মহলে ও পুলিস কর্ম্মচারী গণের মধ্যে তাঁহার অনেকটা কদর বাড়িয়া গিয়াছিল। একটী সুবৃহৎ মহকুমার দ্বিতীয় কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার খাতিরের অভাব ছিল না। রামপ্রসন্ন সাজা দেওয়াই চাকরীর মূল মন্ত্র করিয়া তোলেন নাই। তিনি বুঝিতেন সাজা দেওয়া বা খালাস দেওয়ার কিছু আসে যায় না কিন্তু এরূপ ভাবে বিবেচনা করিয়া রায় লিখিতে হইবে যাহাতে অপর কেহ অন্য মত না হইতে পারে। এই বুদ্ধিতে কাজ করিয়া রামপ্রসন্নকে উপর আদালতের নিকট বড় গালি খাইতে হইত না এমন কি তাঁহার রায় হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপিলে গিয়াও সহজে উল্টাইত না। কর্ম্মসার চাকুরী জীবনে ইহা অপেক্ষা আর কি সুখের কারণ হইতে পারে।

ক্রমে রামপ্রসন্নের আরও দুই একটী সন্তান হইল এবং তাঁহার স্ত্রীর ব্যবহার ক্রমশঃ আরও কর্কশ ও অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু রামপ্রসন্ন যে বুদ্ধিতে নিজের পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন তাহাতে আর তাঁহাকে এসব তত্ত্ব কথাটা নূতন করিতে হইত না। সরকারী কর্ম্মের মোহিনী মায়ায় তিনি গৃহিণীর মানসিক প্রভাব একরূপ কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন এখন আর বিমলা মোহনা পত্নীর স্নেহাদরের ফাঁদে তাঁহার আর বড় আসিয়া যাইত না। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিল। আর এক ফ্রেম প্রয়োজন পাইয়া রামপ্রসন্ন অন্যত্র বদলী হইলেন। এ বদলী শুধু এক জেলা হইতে আর এক জেলায় নহে একবারে নূতন প্রদেশ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে। নূতন চাকরী স্থানে তাদৃশ বাসা মিলিল না মোটা রকম ভাড়া হাঁকিয়াও

দেড় খানি কোঠা সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িল। বহুলী সম্বন্ধে সেপুটি সবডেপুটি বিদ্বের প্রায় প্রবাদ কথিত পল্লী বালিকার ন্যায় সাম্রোখান করিয়াই বিবাহের অবস্থা। যে কোনও মুহূর্ত্তে তুলসী তলসা লইয়া অন্য স্থানে রওনা হইবার হুকুম আসিতে পারে সুতরাং কোথাও বাস স্থানের পাকা বন্দোবস্ত করার আর উপায় কোথায়? এ নূতন জায়গা রামপ্রসন্নের পত্নীর বড় ভাল লাগিল না। বাসার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মেজাজ আরও বিগড়াইয়া গেল। বাসাও যেরূপ অসুবিধা জিনিষ পত্রও সেইরূপ মহার্ঘ মাহিনা বৃদ্ধির সঙ্গে খরচও বাড়িয়া উঠিল। ম্যালেরিয়ার প্রভাবে পর পর দুইটী শিশুর মৃত্যু হইল। ঘর সংসার একরূপ অসহ্য হইয়া উঠিল।

নূতন স্থানে আসিয়া অবধি এই সকল জ্বালা যন্ত্রণা শোক তাপের যা কিছু অপরাধ রামপ্রসন্নের সাধ্বী গৃহিণী তাহা নিরপেক্ষ ভাবে স্বামীর স্কন্ধে চাপাইতে দ্বিধা মাত্র বোধ করিলেন না। এখন স্বামী স্ত্রীতে সাংসারিক বিষয়ে কথা আরম্ভ হইলেই রীতিমত কলহ না হইয়া শেষ হইত না। এমনকি যখন তখন ছেলেদের লেখা পড়ার ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়াও এইরূপ ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইত। দ্বিতীয়বারীর যুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্ব সায়াহ্নে পিতামহের শিবিরে আসিয়া স্নেহ সম্ভাষণের ন্যায় উভয়ের মধ্যে ক্বচিৎ কদাচিৎ পুনর্ব্বার দাম্পত্য প্রীতির বিকাশ দেখা যাইত বটে কিন্তু সব সুখে দুবার পাতের ন্যায় এই সকল মুহূর্ত্তের সন্ধিক্ষণ কদাপি দীর্ঘস্থায়ী হইত না। দুইদিন যাইতে না যাইতে প্রথম বিরোধ পূর্ব্বের ন্যায় নিজ মূর্ত্তিতে ক্রমে স্বামী-স্ত্রীতে আন্তরিক বিচ্ছেদরূপে দাঁড়াইয়া গেল। রামপ্রসন্ন মনে করিতেন যে পারিবারিক জীবনের সর্ব্বত্র এই একই পরিণতি। যথাসম্ভব বিরক্তি বর্জ্জন করিয়া ঝগড়াগুলিকে খাটো করিয়া তুলিতে পারিলেই গৃহীর কর্ত্তব্য সুসম্পাদিত হইল। এই বিশ্বাস না থাকিলে রামপ্রসন্নের জীবন একেবারেই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত। অন্তরাত্মার নিহিত জিজীবিষা তিনি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। আপিসটাকে বড় করিয়া তুলিতে পারিলেই ঘরগৃহস্থালী আর বড় নজরে পড়ে না রামপ্রসন্ন এই মূল মন্ত্রের সন্ধান পাইয়া পারিবারিক প্রসঙ্গ যথাসম্ভব কমাইয়া আনাইয়াছিলেন। স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তার অনাবশ্যক অবসর তিনি আর বড় রাখিতে চাহিতেন না। যেহাৎ বেশি সকাল সকাল আপিস-ফেরৎ আসিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আটকা পড়িয়া যাইতেন সেদিন সুতারদিদী বর্ষীয়সীর তীব্রকণ্ঠের বিলাপ বাজিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বৈঠকখানার বন্ধু সমাগমের ব্যবস্থা করিতে হইত। স্ত্রীর সহিত বনিবনাও হইত না বটে কিন্তু বাহিরের লোক ইতর ভদ্র, উচ্চ নীচ সকলের সহিতই বেশ সদ্ভাব ছিল। সরকারী কাজ ও আয়নব্যয় রীতিমত বজায় রাখিয়া ভাবেধার উপরওয়ালা ও অপর সাধারণকে খুসি রাখিতে পারাও বাহাদুরী।

ফৌজদারী ও রাজস্বসংক্রান্ত বড় বড় বিষয়ে উপস্থিত হইবামাত্র অনের মত মীমাংসা করিতে সমর্থ হওয়া সকল রাজকর্ম্মচারীর ক্ষমতায় কুলাইয়া উঠে না। রামপ্রসন্ন সাংসারিক ব্যাপারে অক্ষমী বলিয়াই মনে মনে নিজের ব্যবহারিক দক্ষতা ও কর্ম্মকুশলতার বিষয় স্মরণ করিয়া অন্তরে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভের চেষ্টা পাইতেন। এইরূপে মনটাকে চাঙ্গা করিয়া লইয়া রামপ্রসন্ন গৃহকলহের পর পুনরায় বন্ধুগণের সহিত হাসিমুখে মেলামেশা করিতেন। তাঁহার বাহিরের ভাব দেখিয়া সঙ্গ সঙ্গই মনের ভিতর যে একটা বড় ঝড় বহিয়া গিয়াছে এ কথা কেহ টের পাইত না। নীলকণ্ঠের ন্যায় যে বিষ তিনি স্বেচ্ছায় পান করিয়াছিলেন তাহার তিনটী প্রতিষেধক ছিল—বন্ধু সমাগম, আহারাদির পারিপাটী ও স্ত্রীকে সর্ব্বসন্তাপহারী মনিবা।

এইরূপে আরও সাত বৎসর কাটিয়া গেল। মেয়েটি এখন বড় হইয়াছে দুইটী সন্তান যারা যাওয়ার পর আছে কেবল একটী পুত্র। সে এখন স্কুলে পড়িতেছে। মেয়েটী বাড়ীতে মাষ্টারের কাছেই পড়ে।

ইচ্ছা থাকিলে বাতাসে ফাঁকে পাইয়া ঝগড়া করাও চলে। ছেলে বড় হইয়া কি হইবে তাহা লইয়া গিন্নী এখন মধ্যে মধ্যে স্বামীর সহিত কলহ করিত। রামপ্রসন্নের ইচ্ছা ছিল ছেলেকে আইন পড়াইবেন কিন্তু স্বামীর মত

বলিয়াই গৃহিণীর ইহাতে ঘোর আপত্তি। ছেলে বাপকো বেটা শনৈঃ শনৈঃ পাঠে অগ্রসর হইতেছিল।

(৩)

রামপ্রসন্নের বিবাহের পর বারো বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সব ডেপুটিদিগের মধ্যে তিনি এখন একজন সিনিয়ার কর্ম্মচারী। ইতিমধ্যে দুই একটি ভাল জায়গায় বদলীর কথা হইয়াছিল কিন্তু নূতন স্থানে গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তালরূপ বনিবনাও হইবে কি না ভাবিয়া কোনওরূপে প্রাণ কাটাইয়াছেন। অস্বাস্থ্যকর জল হাওয়া ও বাসার অসুবিধা বলিয়া কেহই সে স্থানে আসিতে চাহিত না সুতরাং রামপ্রসন্ন এ যাবৎ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া বলিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন তাঁহার স্বেচ্ছায় এই বারো বর্ষ বনবাসের ফলে রাজ্যলাভ না ঘটুক অন্ততঃ ডেপুটিগিরি পাকা হইবে কিন্তু প্রমোশনের সময় দেখা গেল নীচের গ্রেড্ হইতে যে এক মোহনলাল ত্রিপাঠী প্রবেশলাভী ডেপুটি নিযুক্ত হইয়াছেন। রাগেতে রামপ্রসন্নের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। ত্রিপাঠীর উদ্দেশে যথেষ্ট গালিমন্দ করিয়া তিনি কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ ফলহের ফলে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিল। ডেপুটিগিরি ত হইলই না পরের বার গ্রেড্ প্রমোশনের সময় দেখা গেল রামপ্রসন্নের নাম বাদ পড়িয়াছে। রামপ্রসন্নের বন্ধু একজন নবীন মুন্সেফ বলিলেন—"ওহে তোমরা ত কোর্ট চৌর্ট যান না কোর্ট থাকিলে দেখিতে তোমার এ বৎসরকার ফল মোটেই ভাল নয়। "বাস্তবিকই রামপ্রসন্নের জীবনে এরূপ দুর্দ্দিনের আর পূর্ব্বে কখনও আসে নাই। রামপ্রসন্ন দেখিলেন মহকুমার হাকিম হইতে আরম্ভ করিয়া সিবিলিয়ান উপরওয়ালারা পর্য্যন্ত সকলেই যেন তাঁহার উপর বীতস্পৃহ হইয়াছেন। তাহার পর তাঁহার উপর এরূপ যে একটা অবিচার হইয়া গেল তাহাতে সহানুভূতি দেখান দূরে থাকুক সকলেই তাহা যেন নিতান্ত ন্যায্য বলিয়া মনে করিতেছে। প্রয়োজন বশে খরচের মাত্রা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে আর এ বেতনে কোন মতেই চলে না। পূর্ব্বে বাড়ী হইতে ছেলেপিলের কাপড় ও বহুদিনের খরচের জন্য মধ্যে মধ্যে টাকা আসিত এখন তাহাও বন্ধ হইয়াছে। রামপ্রসন্নের মনে হইতে লাগিল তাহার দুরবস্থা দেখিয়া আত্মীয় স্বজনেরাও যেন তাহাকে ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। "চাষাইতে জানিলে ১৭৲ টাকাতেই হবে তাতে চলে, আজকালকার চাকরির বাজারে এই বা কয়জনের অদৃষ্টে জোটে" কিন্তু অভাবের সময় আত্মীয় বন্ধুর মুখে এরূপ সদুপদেশ শুনিলে কাহার না পরস্তরামের মত ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে? শুধু রামপ্রসন্নই জানিতেন যে স্ত্রীর সহিত এই বিবাদ বিসম্বাদে অবশ্যম্ভাবিরিক্ত সাহেবিয়ানার ফলে গুরুতার গণতার, এবং অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষের এই অন্যায় অবিচার, তাহার মানসিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। রামপ্রসন্ন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া গ্রীষ্মের সময় দুইমাসের privilege leave এর (ছুটীর) দরখাস্ত করিলেন। ভাবিলেন পুরা বেতন যখন পাওয়া যাইবে তখন আর আপত্তিটা কি? ছুটী মিলিল। যশিদি জংসনের নিকট তাঁহার শ্বশুরের একখানি বাংলো খালি ছিল সেইখানেই সপরিবারে উপস্থিত হইলেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে খোলা মাঠের নির্ম্মল হাওয়ায় ছুটীটা বেশ আনন্দে কাটিবারই কথা; কিন্তু ফলে তাহার উল্টা হইয়া পড়িল। এরূপ নিষ্কর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকিয়া আলস্যে কাল কাটান তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল এরূপ একটানা ক্লান্তি পূর্ব্বে তিনি কখনও অনুভব করেন নাই। রামপ্রসন্ন ভাবিয়া দেখিলেন এই রকম করিয়া ছুটীটা কাটাইলে কোন লাভই হইবে না। একবার উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আর এক নূতন উপসর্গ দেখা দিল। কয়েক দিন ধরিয়া রাত্রে ভাল ঘুম হইতেছিল না। একরাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় ছাদের উপর কাটাইয়া রামপ্রসন্ন স্থির করিলেন যে ডেপুটিগিরির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বরং অন্য কোনও বিভাগে চাকরীর চেষ্টা দেখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া স্ত্রী ও শ্যালকের সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সটান কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন। কোন পরম বন্ধুর নিকট জানিতে পারিলেন যে পুরাতন আবগের সেই

সেটলমেণ্ট বিভাগের যন্ত্রকর্ত্তা এখন গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী, শুনিয়া মনে কতক আশার সঞ্চার হইল।

রামপ্রসন্ন সেক্রেটারী সাহেবের নিকট হাজির হইলেন। এবং তাঁহাকে সেলামে ও পূর্ব্বস্মৃতির আলোচনায় সন্তুষ্ট করিয়া মুন্সেফী বিভাগে Service transfer বা চাকরী-বদলীর জন্য একখানি দরখাস্ত পেশ্ করিলেন। রামপ্রসন্নের দাবীর মধ্যে দুইটী বড় জোর দাবী ছিল—প্রথম কলেজ হইতে M. A. B. L. পাশ হওয়ার পরই তিনি মুন্সেফীর জন্য নাম লেখান। আইন পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেও এবং ঠাকুর-পদক প্রভৃতি পুরস্কার পাইলেও হাইকোর্ট হইতে তাঁহার সম্বন্ধে সেরূপ সুবিবেচনা করা হয় নাই বরং নেহাৎ সাধারণ শ্রেণীর অনেক কর্ম্ম প্রার্থী তাঁহার পূর্ব্বেই মুন্সেফীতে বাহাল হইয়া গিয়াছেন। ২য় দাবী এই যে হিন্দু মুসলমান এই উভয় জাতির লোকই মুন্সেফী কর্ম্মে বাহাল আছেন বটে কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান মুন্সেফের একান্ত অভাব; সুতরাং আবশ্যকীয় গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও যদি খৃষ্টীয় সমাজের একজন সুযোগ্য প্রতিনিধির অদৃষ্টে এ চাকরী না ঘটে তাহা হইলে উহা বড়ই পরিতাপের বিষয়—সন্দেহ নাই। সেক্রেটরিয়েট হইতে আশানুরূপ মন্তব্যের সহিত দরখাস্ত খানি হাই-কোর্টে প্রেরিত হইল। জজ বাহাদুরও কৃপাদৃষ্টি করিলেন রামপ্রসন্ন ২৫০ টাকা বেতনে মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। এবং স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করিয়া এ সংবাদ জানাইলেন। এত-দিনে রায় বাহাদুর শ্বশুর থাকায় সুফল ফলিল।

রামপ্রসন্ন কর্ত্তৃপক্ষের উপর অভিমান ভুলিয়া গেলেন। আর চাকুরীর উপর কোনও বিরক্তি রহিল না। যাহারা তাঁহাকে ডিঙাইয়া উপরে উঠিয়াছিল তাহাদের উপর ও তাঁহার আর কোনও রাগ রহিল না। Service transfer মঞ্জুর হইয়া মুন্সেফী চাকরী সেকেট ভুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার পূর্ব্বতন চাকরীও উচ্চতর গ্রেডে প্রমোশন হইল। তিনি পিছনকার বেতন বাবদ ৪০০৲টাকা পাইলেন। রামপ্রসন্নের আনন্দের আর অবধি রহিল না। যে স্বপ্নের ভয়ে তিনি শশব্যস্ত হইয়াছিলেন তাহা ফুৎকারে উড়িয়া গেল। রামপ্রসন্ন পরমানন্দে বশিষিরতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী ও বালকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার চিত্তে কখনও এরূপ প্রফুল্লতা—এরূপ নির্ম্মল সন্তোষের বিকাশ হয় নাই। হিমানীও স্বামীর উন্নতিতে আনন্দিত হইয়াছিলেন স্বামীস্ত্রীতে দেখা পড়া হইয়া সন্ধি হইয়া গেল। রামপ্রসন্ন সাহেব সমাজের নিকটে কিরূপ আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন তাহা সালঙ্কারে বর্ণনা করিলেন। দুটীর মধ্যে কলিকাতায় অবস্থান কালে কোনও ধনীর প্রাসাদে ডেপুটি সাবডেপুটি-গণের সাংবাৎসরিক ভোজে রামপ্রসন্ন নিমন্ত্রিত হ'ন। এ যাবৎ চাকরী দিয়া আসিতেছিলেন চাকরী স্থান ছাড়িয়া উপস্থিত হইবার অবসর পান নাই এখানে নবীন সহকর্ম্মীগণ কিরূপ চাটুবাক্যে তাঁহাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বীগণ কিরূপ সজ্জনভাবে তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়াছে এবং ভোজের পাত্রগণ তাঁহাকে কিরূপ আদর আপ্যায়ন করিয়াছে এসব কোন কথাই অপ্রকাশ রহিল না। হিমানী এই সুদীর্ঘ কাহিনী স্থির ভাবেই শুনিল—অন্ততঃ বাহিরে দেখাইল যেন সব কথাই এর সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতেছে। পূর্ব্বে যে কথায় কথায় প্রতিবাদ করিত সে অভ্যাসটি যেন সে বহুদিন বিস্মৃত হইয়াছে।

স্ত্রীর মতি গতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া রামপ্রসন্ন মনে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন; বরং অপ্রত্যাশিত বলিয়া এ আনন্দ আরও বিশেষ ভাবে উপলব্ধির বিষয় হইয়াছিল। তাহারা স্ত্রীপুরুষে উভয়ে যেন পর্ব্বত গাত্র হইতে সহ্য সহ্য শব্দে বেগে খাদের দিকে পিছলাইয়া পড়িতেছিলেন হঠাৎ দৈবক্রমে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সমতল উপত্যকায় উন্নীত হইলেন। এখন নূতন দেশে নূতন ঘর কিরূপে সাজাইতে গুছাইতে হইবে পতি পত্নীতে তাহারই ঘর জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। রামপ্রসন্ন দেখিলেন স্ত্রীর সহিত আর বড় মতভেদ হইতেছে না। গৃহ সজ্জাদির সম্বন্ধে উভয়ের মত আশ্চর্য্য ভাবে মিলিয়া যাইতেছিল। আশা কুহকিনী পুনরায় চিত্ত মুকুরে মুহুঞ্জন করিতে করিতে মায়ার ফাঁদ পাতিতে বসিল—এ যেন সেই প্রথম দাম্পত্য সুখের নূতন করিয়া আস্বাদ গ্রহণ! যান ও

বাপুরের পর মিলনের গাড়ী প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। রামপ্রসন্ন ভাবিলেন জীবন স্রোত পূর্ব্বেরই ন্যায় ধীর, স্থির, মধুময় হইয়া উঠিতেছে। অনেক দিনের জন্য শালক-গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে নূতন চাকরীর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। সময় আর বড় বেশী ছিল না; ইতিমধ্যে বাসা ঠিক করিতে হইবে। পুরাতন আসবাব-পত্র লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার পর সাজ-সরঞ্জাম তৈজসাদি কিনিয়া গৃহটীকে নিজের ও অর্দ্ধাঙ্গিনীর পছন্দসই ভাল মতে সাজাইতে হইবে—রাম প্রসন্ন সপরিবারেই যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার শালকের হঠাৎ একটু অত্যধিক সহোদরা-স্নেহের আবির্ভাব হইল। তিনি স্থির করিয়া ধরিয়া বসিলেন যে ছিনাথীকে এখন কোন মতেই পাঠাইতে পারিবে না। তাহাকে আর কিছুদিনের জন্য সেখানে রাখিয়া রামপ্রসন্ন আপাততঃ একাই কর্ম্মস্থানে যাত্রা করুন। ছেলেপিলেরা ইতি মধ্যে আরও একটু ভাল করিয়া স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন করিয়া লক। রামপ্রসন্নের একলা যাইবার বড় ইচ্ছা ছিল না। স্ত্রীর সহিত এরূপ অনেক দিন বিবাহের প্রথম বৎসরেও হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। এই যে দীর্ঘকাল একত্রবাস সে ত শুধু কাছাকাছি থাকিয়া ঘর-করা করা হইত নয়। অনাবিল দাম্পত্য প্রেমের আস্বাদনের জন্য তাঁহার তৃষিত হৃদয় বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হইলে কি হইবে "নিয়মিত কেন বাধ্যতে?" রামপ্রসন্ন উপায়ান্তর না দেখিয়া একাই রওয়ানা হইলেন। এখন পত্নী বিরহেও তাঁহার ধৈর্য্য হারাইবার বড় সম্ভাবনা ছিল না, চিরসোহিত অতীত নিধি ও গাইয়া জীবনের এই নবীন প্রীতি সদাই তাঁহার হৃদয় অভিনব সুখ স্মৃতিতে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে একখানি বাড়ী পাওয়া গেল। এখন সুবিধার বাড়ী সহজে দেখা যায় না—যেন তাঁহাদেরই ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত। যেমনি ক্যাদনের বড় হল ঘর। গৃহস্বামীর সরকারী কাজকর্ম্মের জন্য আলাদিয়া একটী ঘর, স্ত্রী কন্যার জন্য দুইটী পৃথক্ পৃথক্ কামরা, ছেলের পড়িবার ঘর—কিছুরই অভাব নাই। বাড়ী খানির সুব্যবস্থা দেখিয়া রামপ্রসন্ন মুগ্ধ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরগুলি সাজাইবার বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সুন্দর সুন্দর চেয়ার, টেবিল, কার্পেট, পর্দ্দা ঝালর, সতরঞ্চ প্রভৃতি কত কি আসবাব আসিয়া পড়িল। কোথায় বসিয়া মিত্র সাহেব ঘর সাজাইতে লাগিয়া গেলেন, যেখানে যেটী রাখিলে ভাল দেখায় ঠিক সেইখানেই সেটী সাজান হইতে লাগিল। অর্দ্ধাভাবে এতদিন যে রুচি ও সৌন্দর্য্য বোধ মনের নিভৃত কোণে লুকাইয়াছিল তাহা স্বতঃই আজ প্রকাশ করিয়া ক্রমশঃ যেন স্বেচ্ছায়ত মনোরম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। কার্য্য অর্দ্ধ সমাপ্ত হইতে না হইতেই রামপ্রসন্ন দেখিলেন যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা আরও অধিক সুন্দরভাবেই সাজান হইতেছে। গৃহস্বামীর মার্জ্জিত রুচির পরিচয় সর্ব্বত্র বেশ সুস্পষ্ট রূপেই পরিস্ফুট। হলঘরে তখনও হাত পড়ে নাই। সাজান হইলে উহার সৌন্দর্য্য কিরূপ বর্দ্ধিত হইবে তাহা তিনি কল্পনা বলেই অনুভব করিতে লাগিলেন।

কোথায় কৌচ থাকিবে, কোথায় কুশন চেয়ার গুলি রাখা হইবে, কোথায় কোট মার্ব্বেলের টেবিলের উপর পিতলের ফুলদানীর সজ্জিত হইবে। দেওয়ালে কোথায় কোথায় ছবি এবং কোথায় কোথায় ফার্ণ (Fern) পাত্র বিলম্বিত হইবে মনে তাহা যেন আপনা হইতেই ঠিক হইয়া গেল।

রামপ্রসন্নের স্ত্রী ও কন্যা উভয়েরই সৌখীনতার অভাব ছিল না সুতরাং তাঁহারা যে এই সকল গৃহসজ্জা দেখিলে আনন্দিত হইবেন ইহাতেই সদা পরোন্নতি-সৌন্দর্য্যপ্রিয় রাম প্রসন্নের কতই না তৃপ্তি অনুভব হইতে লাগিল। সেই সময় ভাগ্যক্রমে নিলামে কতকগুলি সেকেলে ধরণের ঘর সাজাইবার উপকরণ সস্তায় মিলিয়া গেল। রাম প্রসন্ন ভাবিলেন এইবার মণি কাঞ্চনে সংযোগ হইল। বৈঠক খানাটী দেখিয়া এখন প্রকৃতই বনেদী ধনীগৃহের ন্যায় বোধ হইবে। মিত্রজা এই সকল সাজ সজ্জার কথা ঘুনাক্ষরেও চিঠিপত্রে লিখিতেন না। তাঁহারা আসিয়া হঠাৎ বৈঠকখানা প্রভৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবে ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। রামপ্রসন্ন ঘর সাজাইতে এরূপ মগ্ন হইলেন যে এখন আর আফিসের কাজেও পূর্ব্বের

ভার মন বসিত না। আদালতে যখন পুরোদস্তর উকিলের বক্তৃতা চলিত তিনি তখন অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে থাকিতেন যে কার্পেটের কাজে কিরূপ ভাবে ঝালর লাগাইলে পর্দাগুলির সহিত ভালরূপ মানাইবে। একদিন মিত্র সাহেবের ঝোঁক হইল যে তিনি নিজেই বৈঠক খানাটী সাজাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বাহিরে উঠিয়া মজুরদের দেখাইয়া দিতে গিয়া হঠাৎ পা ফস্কাইয়া গেল, রামপ্রসন্ন মেজের পড়িয়া গেলেন। ছেলেবেলায় খেলাধূলা জিমাষ্টিক্ প্রভৃতি অভ্যাস ছিল; পড়িবার সময় কোঁক সাম্‌লাইয়া লওয়াতে সেরূপ গুরুতর আঘাত লাগিল না কোমরের নিকট একটু বেদনা হইলমাত্র। রামপ্রসন্ন সেটাকে মোটেই গুরুতর বলিয়া মনে করিলেন না। মন প্রফুল্ল থাকায় শরীর বরং তখন বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। স্ত্রীকে চিঠি লিখিলেন আমার যেন ১৫ বৎসর বয়স কমিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। সেপ্টেম্বরের মাঝা মাঝি বাড়ি সাজান সারা হইবে বলিয়া স্থির ছিল কিন্তু কর্যতঃ আরও একমাস দেরী পড়িয়া গেল যাহা হউক বিলম্বে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিল না। সুবিস্তৃত দ্রব্যাদির সৌন্দর্য্য বরং আরও চিত্তাকর্ষক বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। যাহারা দেখিল সকলেই গৃহসজ্জার তারিফ্ করিতে লাগিল। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ধনীর বিলাসিতার অনুকরণ করিতে গেলে সাধারণতঃ যেরূপ ঘটিয়া থাকে রামপ্রসন্নের নূতন গৃহেও তাহা অপেক্ষা বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই। এরূপ দেখা বড়মানুষী সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। সেই সভায় দামি সকল আবলুস কাঠের সৌখীন আস্‌বাব চিকণের কাজওয়ালা, ফুলতোলা রেশমের পর্দা, রঙ বেরঙের অর্দ্ধ দামি কার্পেট, সেই সিল্ক ও ব্রক প্রভৃতি দ্রব্যাদির অপূর্ব্ব খিচুড়ী বিলাসব্যসনে নিম্নতর শ্রেণীর লোকের উচ্চতর শ্রেণীর সহিত পাল্লা দিবার এই বৃথা চেষ্টা—পদ্মুর গিরিলঙ্ঘনবৎ সর্ব্বত্রই ব্যর্থ ও হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছিল। যখন ষ্টেশনষ্টেশন হইতে মেয়েদের সঙ্গে করিয়া নূতনগৃহে আনা হইল তখন সন্ধ্যাকাল। পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত প্রস্তুত ছিল ঘরে ঘরে উজ্জ্বল আলোক চারিদিকে দেওয়ালে লতাপাতার বিচিত্র সৌন্দর্য্য। রঙ্গিন কুর্ত্তাপরা হিন্দুস্থানী চাকর সেলাম করিয়া বড় বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিল দেখিয়া সকলেই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল সে সময়ে আর মিত্রজার আনন্দ দেখে কে? তিনি স্ত্রীপুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক ঘর দেখাইতে লাগিলেন—তাহাদের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন আনন্দের জ্যোতিঃ ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় চা খাইতে খাইতে হিমানী জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি নাকি ঘর সাজাইতে গিয়া আঘাত পাইয়াছ?" রামপ্রসন্ন শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন—পরে কিরূপে মই হইতে পিছ্‌লাইয়া গিয়াছিলেন এবং মিস্ত্রী ও মজুরেরা কিরূপ ভয় পাইয়াছিল তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া ছেলেবেলার ব্যায়ামের কথা উল্লেখে রঙ্গভঙ্গে বলিতে লাগিলেন জিমাষ্টিক্ শিখিয়াছিলাম ব'লেই সে দিন জীবন নষ্ট হয় নাই। আর কোনও সৌখীনগণের বাবুতায় হইলে আর দেখিতে হইত না। সেরকম বিশেষ কিছু গুরুতর আঘাত লাগে নাই। সামান্য একটু মোচ্‌কা গিয়াছিল মাত্র। এইমাত্র কাদিয়া পড়িয়া আছে, হাত দিলে, আর বেদনা বোধ হয়।"

এইরূপে নূতন স্থানে নূতন করিয়া গৃহস্থালী আরম্ভ হইল। দুই এক দিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইল যে নূতন বাটীতে সবই হুপ্রতুল বটে, কেবল একখানি মাত্র ঘরের অভাব। ভাণ্ডার ঘরের কথা এযাবৎ কাহারও মনে পড়ে নাই। ভাড়াটীয়া বাড়ীতে প্রায় এই রূপই ঘটিয়া থাকে। ভাল করিয়া পত্তনীদার না বসা পর্য্যন্ত ঘরদ্বারের সুবিধা অসুবিধা বুঝিতে পারা যায় না। যে বেতন বৃদ্ধির আনন্দে এত উৎসব, এত মনোবিবাদ তাহা হুংকারে উড়িয়া গিয়াছিল। মাসকাবারের পর দেখা গেল তাহাতেও কুলাইয়া উঠে না চাকুরে লোকের মাহিনা বৃদ্ধির সঙ্গে সংসার খরচের কবেই বা সামঞ্জস্য হইয়া থাকে? সুখের মধ্যে এই যে এবার বেশী অভাব হইল না মাত্র ৪০৲ টাকা বাকী পড়িয়াছে দেখা গেল। মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীর তাহাতে আর বিশেষ কি আসিয়া যায়? বড়মানুষী চালে চলিতে গেলে এরূপ তো সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও প্রথম কয় সপ্তাহ বেশ আনন্দেই কাটিয়া

গেল। তখনও সাজান গোছান ঘরদোর অনেক কিছু বাকী ছিল। মেয়েছেলেরা তা'রা লইয়াই মাতিয়া রহিল। স্বামীস্ত্রীতে সামান্য সামান্য মতভেদ উপস্থিত হইত বটে কিন্তু সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকিলে সেরূপ তাল করিয়া ঝগড়া করার সুযোগ আর হইয়া উঠে কই?

কিন্তু বিমানীর গৃহস্থালীর সুব্যবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিনগুলি এক ঘেয়ে গোছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সদাই যেন কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। পাড়াপড়শী ও স্থানীয় ভদ্রগৃহস্থের পরিবারেরা যাওয়া আসা সুরু করিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ আপ্যায়িতে দিনগুলি আবার পূর্ব্বের ন্যায় কাটিতে লাগিল।

তখন গ্রীষ্মকাল। সকালে কাছারী হইতে রামপ্রসন্ন মধ্যাহ্নে বাড়ী ফিরিয়া আহারাদি সমাধা করিতেন। প্রথম কয় সপ্তাহ বেশ ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল তবে মধ্যে মধ্যে বাড়ী সামান্য বা ঘরসংসারের সুবিধা-অসুবিধা লইয়া এক আধবার খিটিমিটি বা যম কষাকষি যে না হইত তাহা নহে, কিন্তু তাহা ক্ষণিকমাত্র। এই বাড়ী সামান লইয়া রামপ্রসন্ন একপ্রকার পরিচ্ছন্নতা-বাতুলের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। টেবিলমুখো (টেবিলের আড়ালে) বা চেয়ারের গদিতে দাগ দেখিলে বা পর্দ্দার ধড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া গেলে তিনি একেবারে রাগিয়া আগুন হইয়া যাইতেন। বাড়ী সামান লইয়া একটা পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে কোথাও সামান্য কিছুর ব্যত্যয় দেখিলে তাহার মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইত। এই সকল সামান্য একটু আধটু গণ্ডগোল ছাড়া তাহার জীবন মোটের উপর সুখেই কাটিতেছিল বলিতে হয়।

রামপ্রসন্নের উঠিতে একটু বেলা হইত সাড়ে সাতটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়াই প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া খাইতে খাইতে খবরের কাগজ পাঠ এবং তাহার পর পোষাক পরিয়া আপিসে রওনা। তাহার পর আপিসে পঁহুছিয়া অর্থী প্রত্যর্থীর আবেদন শ্রবণ, পুরাতন মামলা মোকদ্দমা শুনানি ও সর্ব্বশেষে আফিসের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন ও চিঠি পত্র দস্তখৎ। দিনগুলি এই সব কাজের ভিতর "হু হু" করিয়া কাটিয়া যাইতেছিল। যে সব কারণে এই নিয়মবদ্ধ কর্ম্মজীবনের ব্যাঘাত ঘটে তাহা রামপ্রসন্ন কোন মতেই সহজে ঘটিতে দিতেন না। একবার আপিসে বাহির হইয়া গেলে সরকারী কাজ কর্ম্মছাড়া আর কোনও ব্যাপার লইয়া লোকের সহিত তাঁহার আর কথাবার্ত্তা চলিত না। যদি কোনও দরখাস্তকারী নিজের ব্যক্তিগত কথা লইয়া উপস্থিত হইত রামপ্রসন্ন তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না, কিন্তু কাহারও কোন সরকারী কার্য্য বা মোকদ্দমা সম্বন্ধে আইন সঙ্গত আবেদন থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাহ্য করিয়া হাসিমুখে আবশ্যকীয় হুকুম লিখিয়া দিতেন বা ছাপা কয়েদ্ প্রভৃতি পূরণ কারণের ব্যবস্থা করিয়া যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন। তখন তাঁহার ব্যবহার বড়ই অমায়িক বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু সরকারী কার্য্যের সময় চুকিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। বৃথা বেলা-মেশায় তিনি মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। বহুকার্য্যের মর্য্যাদা হইতে নিজের ব্যক্তিগত জীবন তফাৎ করিয়া রাখিতে তিনি বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। মনে হইত, আপিসের যে মানুষ, বাড়িতে যেন সে-মানুষই নহে। কালে দুইদিকে বজায় রাখিতে তাঁহার এইরূপ দক্ষতা জন্মিয়াছিল যে কখনও কোন স্থলে সরকারী ও যে সরকারী কর্ম্মসূত্র একত্র জড়াইয়া গেলেও তিনি আবশ্যক হইলেও পদগৌরবের পরদার আড়ালে আশ্রয় লইয়া যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সরকারী কার্য্য মিটিবাদে চালাইবার এরূপ কৌশল খুব অল্প লোকেরই দেখা গিয়া থাকে। অবসর পাইলে টিফিনের সময় পাঁচজন বাবুদের সহিত গল্প-গুজব রাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা চলিত কিন্তু প্রয়োজনের কথা উঠিলে সেই সময়েই তাঁহাদের আড্ডা খুব জমিয়া যাইত। এ ছাড়া সকাল সকাল ছুটী হইলেই তাস খেলার ধুম পড়িত। মিত্র মহাশয় যখন আফিস হইতে বাড়ী ফিরিতেন তখন প্রায়ই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িত কিন্তু এ ক্লান্তির ভিতরও একটুখানি আত্মপরিষার রেশ থাকিত বলিয়া মনটা তত অবসন্ন হইয়া পড়িত না। রাজকার্য্যে আমার সমকক্ষ আর কেহই নাই এ বিশ্বাস অনেক সময় রীতিমত টনিকের কার্য্য করিয়া থাকে। বিমলা বাড়ী ফিরিয়া প্রায়ই দেখিতেন

গৃহিণী সকলে হয়তো পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছেন। ছেলেটী হয়তো স্কুল হইতে ফেরে নাই কিংবা পাড়ীতে বাহারের কাছে পড়িতেছে কখনও বা সেদিনের কোনও ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় বৈঠক-খানায় বসিয়া আছেন।

রামপ্রসন্নের পড়াশুনার বড় অভ্যাস ছিল না। তবে হালফ্যাসানের লোকের মত তিনিও দু'চারখানা মাসজাদা চল্‌তি বই খরিদ করা যাহে খরচ বলিয়া মনে করিতেন না। তবে বই কিনিলেই যে পড়িতে হইবে এমন কোন কথাও নাই। ভাল বাঁধা বইগুলি (সেল্‌ফে) সাজান থাকিত যদি কোনও দিন ইচ্ছা হইত মিত্রসাহেব যে কোনও একখানি টানিয়া লইয়া দুই এক পাতা উল্‌টাইতেন। সন্ধ্যার পর প্রায়ই লোকজনার মধি পত্র লইয়া আবশ্যক অংশগুলি রাগ দিয়া রাখিতেন কখনও বা কাগজে তাহার সারাংশ নোট্ করিয়া লইতেন। এইরূপে রায় লেখার মাল-মসলা প্রস্তুত হইলে হু হু করিয়া রায় লেখা আরম্ভ হইত। সময় তন্ তন্ করিয়া কাটিয়া যাইত। সারাদিন খাটুনির পর পুনরায় এইরূপ মধি পত্র ঘাঁটা সাধারণের নিকট ভীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইলেও তাঁহার নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত না। স্ত্রীর সহিত বসিয়া সাংসারিক কথাবার্ত্তার সময় কেবল অপেক্ষা রায়-লেখাই বরং রামপ্রসন্নের ভাল লাগিত। যদি কোনও দিন ক্লান্তি বোধ হইত, তাহা হইলে দুই এক বাজি তাস খেলিলেই মন চাঙ্গা হইয়া যাইত। আবশ্যক হইলে এহেন অবোধ ঔষধ প্রয়োগে প্রায়ই বিলম্ব ঘটিত না। মধ্যে মধ্যে দু'পাঁচ জন গণ্যমান্য লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানও তাঁহার অভ্যাস ছিল। ভাল সাহেবী খানার ব্যবস্থা করিলে অনেক উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দুস্তান অবিশ্যি বাটীতে পদার্পণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। মিঃ মিত্র খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন বেশ পরিপাটী রকমেরই করিতেন। সেই জন্য তাঁহার বাটীতে ডিনারের বেশী সুখ্যাতি ছিল। খানার পূর্ব্বের আগে পাঁচ বন্ধুতে মিলিয়া গানবাজনা গল্পসল্পে বেশ সময় কাটিয়া যাইত।

একবার তিনি সান্ধ্যভোজনে কতকগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেদিন বেজাওটা বেশ ভালই ছিল। বেশ হাসিখুসিতেই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন চলিতেছিল। হঠাৎ তাঁহার স্ত্রীর সহিত মিটার প্রভৃতির ব্যবস্থা লইয়া বিশেষ মতভেদ উপস্থিত হইল। স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও রায়সাহেব ভাল, সাহেবী হোটেল হইতে কেক্ প্রভৃতি আনিবার জন্য কলিকাতায় লোক পাঠাইয়াছিলেন। খরচ পড়িয়াছিল প্রায় ৪০৲ মুদ্রা। গিন্নীর ইহা আর সহ্য হইল না তিনি সেই দিনকার অনুষ্ঠান শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্বামীকে ইতর ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিলেন। রামপ্রসন্ন ক্রোধে আত্মনিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। কেবল অর্দ্ধোচ্চারিত তাঁহার বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবেন এইরূপ আভাষ দিয়া চলিয়া গেলেন। যাহাই হউক সেবার গান্ধ্য অনুষ্ঠানে গানবাজনা আমোদ-প্রমোদের আয়োজন বড় মন্দ হয় নাই। যাঁহারা আসিয়া ছিলেন সকলেই বেশ আপ্যায়িত হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আপন আপন ঘরে ফিরিয়া গেলেন। মেয়েদের জন্য পর্দ্দাপার্টিরও ব্যবস্থা ছিল। তাহাতে একজন "গানবোও" জমিদারের কন্যাও আসিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সুতরাং রামপ্রসন্নের কোন আয়োজনই যে ব্যর্থ হয় নাই এ কথা বলাই বাহুল্য। মিত্র সাহেব আপিসের কাজে যে আনন্দ পাইতেন তাহা আত্মপ্রসাদ বা আত্মপ্রীতিরই রূপান্তর মাত্র। আর সামাজিক ব্যাপারে যে টুকু আমোদ-আহ্লাদ তাহা শুধু তাঁহার বৃথা গর্ব্ব ও আত্মম্ভরীতায় পূর্ণ। সুখ বলিতে যাহা কিছু ছিল তাহা কেবল তাস খেলা। এই সুখটী যেমন অনাবিল তেমনি বিশেষভাবে তাঁহার নিজস্ব। তাহাকে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত যে জীবনের সকল প্রকার ঝঞ্ঝাবাত ও অপ্রীতিকর ঘটনায় তিনজন তাস খেলোয়াড়কে লইয়া আড্ডা ঘরের সমুখ বনাতমোড়া টেবিলটীতে তাস খেলিতে বসিয়া যাও—ব্যস্ খেলিতে খেলিতে দিন শেষ হইয়া যাইবে। ভাবনা চিন্তা মনঃকষ্ট সব কোথায় পলায়ন করিবে। তবে খেলোয়াড় কয়টী ভাল হওয়া চাই। যাহারা রং এর বিভাব মনে রাখিতে না পারিয়া হঠাৎ চটিয়া যাইয়া গোলমাল বাধাইবার উপক্রম করে তেমন লোক থাকিলেই

ঘর খালি। চার'জনের জায়গায় পাঁচজন হইলেই রসভঙ্গ হইয়া যায়। একজনের পিছনে বসিয়া তাহার হাত দেখা ছাড়া উপায় থাকে না। মুখে যে যতই বলুক না কেন এরূপ অবস্থায় খেলিতে বসা কাহারও পক্ষে সুখকর নহে। দর্শকের অবস্থা কি কাহারও অধিকক্ষণ ভাল লাগিতে পারে তাস খেলোয়াড় যোগাড় করাই আসল কথা। যদি খেলার পিঠ্ পিঠ্ জিত হয় এবং রাত্রে আহারের যদি একটু ভাল বন্দোবস্ত থাকে তাহা হইলে বেশ প্রসন্ন মনেই শয্যাগ্রহণ করা যায় এবং সুনিদ্রাও স্বাভাবিক হ'তেই অধিকাংশ আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে অধিক কিছু বাজী রাখিয়া খেলাটা বড় সুবিধার নয়। খেলিতে বসিয়া যদি টাকা পয়সার দিকেই অন্তরস্থানের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে জুয়া হইতে আর তফাৎ থাকিল কি? রামপ্রসন্ন দুঃখ করিতেন যে স্ত্রীদের tricks এর হিসাব রাখিতে রাখিতে ক্রমশঃ অন্তরস্থানেও জুয়াড়ীর ভাবটা আসিয়া পড়িতেছে।

মিঃ মিত্র সপরিবারে এই ভাবেই জীবনযাপন করিতেছিলেন তাঁহারা যে দলে মিশিতেন সেখানে সভ্যতার বাহ্যগণ্য বাড়ি ছাড়া অপর কাহারও স্থান ছিল না।

কন্যা থাকিলেই জামাতার সন্ধান করিতে হয়। সুতরাং মিত্র সাহেবের সামাজিক আসরে স্বধর্মাবলম্বী দুই একজন যুবকেরও অভ্যাগমন হইতে লাগিল। স্বামী-স্ত্রী পুরুষকার আর যতই মতভেদ থাকুক না কেন কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোককে যে কখন রাখিতে হইবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্য ঐক্য দেখা যাইত। পুরাতন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবগণ অনেকেই এখন স্বার্থের খাতিরে তাঁহার দ্বারে আসিয়া ভিড় বাধাইবার চেষ্টা করিত।

জাপানী কুলমানী সাজান সভের বৈঠকখানায় এ শ্রেণীর জীব দাখাইবে কেন? এসব আদব-কায়দা শূন্য নামযশবিহীন মানুষের অন্ত-সমাজে পরিচয় দেওয়াই ভার। তাই কর্ত্তাগৃহিণী স্থির করিলেন ইহাদের আর "নাই" দেওয়া হইবে না। কিছু দিন পরেই এ সকল লোক ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। মিত্র দ্বারে অর্দ্ধ দিন বেশ কুয়া, ফাসন বিবর্জ্জিত জামা কাপড় আর বড় দেখা যাইত না। নীর যায় দিয়া ক্ষীর টুকুই অবশিষ্ট রহিল। এখন যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা চলিতে লাগিল তাহারা সকলেই সমাজের উচ্চস্তরের লোক। যুবক দলের অনেক গৃহস্বামীর কন্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। কিন্তু শ্রীমান্ অতুল চন্দ্রের ন্যায় সামাজিক শিষ্টাচারের ভিতর দিয়া আর কেহই সেরূপ নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই। শ্রীমান্ অতুল ওরফে A. C. Bosu Esqr. এ, সি বোস্ এ'ডোরার। যদা ডেপুটি ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। তাহার পিতা কলিকাতার ধনিজাতীয় বংশের ছেলে। যখন হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজ একতাবদ্ধ হইয়া "কনভার্ট-সোলুপ" খৃষ্টানীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিল সেই সময়ে কোন উদারহৃদয় ইউরোপীয় অধ্যাপকের চরিত্র গুণে মুগ্ধ হইয়া অতুলের পিতা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধটী রামপ্রসন্নের বেশ মনোমতই হইয়াছিল অতুল বাবাজীর আগমন হইতে তাহাদের গার্হস্থ্য জীবন এক রকম শান্তিতেই কাটিতে লাগিল। উপস্থিত আর গোলমাল ঝগড়া ঝাঁটি কিছুই চলিতেছিল না। নিরুদ্বেগে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মিত্রপরিবারের সংসারযাত্রা ঠিকই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের আদব-কায়দাতেই নির্ব্বাহিত হইতেছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীউমাবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

গণিতপাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গচ্ছ আনয়নের উপায়—

গচ্ছোঽষ্টোত্তরগুণিতাদ্দ্বিগুণাদ্যুত্তরবিশেষবর্গযুতাৎ।
মূলং দ্বিগুণাদ্যূনং যোত্তরভক্তিতং সক্রপার্দ্ধং ॥ ২০ ॥

অন্বয় :—(সর্ব্বধনকে) উত্তরের অষ্টগুণের দ্বারা গুণিত করিয়া, দ্বিগুণ আদিধন এবং উত্তরের বিশেষের বর্গ ("উত্তর" হীন দ্বিগুণ আদিধনের বর্গ) তাহার সহিত যোগ করিতে হইবে ; যোগফলের বর্গমূল হইতে দ্বিগুণ আদিধন বিয়োগ করিয়া শীঘ্র উত্তরের দ্বারা ভাগ করিতে হইবে ; ভাগফলের সহিত এক যোগ করিলে, যোগফলের অর্দ্ধেকই "গচ্ছ" হইবে।

ব্যাখ্যা :—আমরা পূর্ব্ব শ্লোকে দেখিয়াছি যে কোন একটী শ্রেঢ়ীর আদিধন, উত্তর, গচ্ছ এবং সর্ব্বধন—এই চারিটী রাশির মধ্যে একটী অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে ; অতএব ইহাদের যে কোন তিনটী জানা থাকিলে চতুর্থটী অনায়াসে নির্ণয় করা যায়। পূর্ব্বশ্লোকে আদিধন, উত্তর এবং গচ্ছ হইতে সর্ব্বধন নির্ণয় করিবার উপায় দেওয়া হইয়াছে ; এখানে আদিধন, উত্তর এবং সর্ব্বধন হইতে "গচ্ছ" নির্ণয় করিবার পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। সূত্রটী এই—

$$\text{গ} = \tfrac{1}{2}\left[\left(\sqrt{[৮\,\text{উ}\,\text{স} + (২\,\text{আ} - \text{উ})^২]} - ২\,\text{আ}\right) + \text{উ} + ১\right]$$

উপপত্তি (rationale) : পূর্ব্ব শ্লোকানুসারে—

$$\text{স} = \left(\frac{\text{গ} - ১}{২}\,\text{উ} + \text{আ}\right)\text{গ} ;$$

সুতরাং, $৮\,\text{উ}\,\text{স} = ৪\text{গ}^২\,\text{উ}^২ + ৪\,(২\,\text{আ} - \text{উ})\,\text{গ}\,\text{উ}$,

$$৮\,\text{উ}\,\text{স} + (২\text{আ} - \text{উ})^২ = (২\text{গ}\,\text{উ} + ২\,\text{আ} - \text{উ})^২,$$

$$২\text{গ}\text{উ} + ২\text{আ} - \text{উ} = \sqrt{[৮\text{উ}\,\text{স} + (২\text{আ} - \text{উ})^২]},$$

$$\text{গ} = \tfrac{1}{2}\left[\left(\sqrt{[৮\text{উ}\text{স} + (২\text{আ} - \text{উ})^২]} - ২\text{আ}\right) + \text{উ} + ১\right].$$

কোন শ্রেঢ়ীতে "গচ্ছ" অর্থাৎ ধনরাশি (positive integer) হইবে। আদিধন, উত্তর এবং সর্ব্বধন ধনরাশি (positive) বা ঋণরাশি (negative) উভয়ই হইতে পারে। পরে আমরা দেখিব যে আর্য্যভট যে ঋণরাশি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন বা ঋণরাশি ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার যে কোন বিদ্বেষভাব ছিল তাহা নহে।

এই গচ্ছ নির্ণয় করিতে আর্য্যভটকে প্রকৃতপক্ষে একটী বর্গসমীকরণের মীমাংসা (solution of a quadratic equation) করিতে হইয়াছে, কারণ ইহাই একমাত্র উপায় —যাহাঃ পদ্ধাঃ।

বর্গসমীকরণের দুইটী "মান" (মূল = roots) থাকে। আর্য্যভট বর্গমূল লইবার সময় "মূল" এই শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন ; কিন্তু এই "মূল" তিনি ধনরাশি গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা ধনরাশি এবং ঋণরাশি উভয় অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যেখানে কোন সংখ্যার বর্গমূল বাহির করিবার নিয়ম দিয়াছেন সেখানে মূল ধনরাশিই লইয়াছেন, ঋণমূল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। উত্তর ঋণরাশি হইলে কোন কোন স্থলে "গচ্ছের" জন্য উভয় মানই উপযোগী। যদি আর্য্যভট একটী মাত্র "মান"ই লইয়া থাকেন, তাহা হইলে "আদিধন" ইত্যাদিকে ধনরাশিরূপে ব্যবহার করিয়াই বোধ হয় প্রয়োজনানুরোধে তাঁহাকে একটী "মান" লইতে হইয়াছে।

তবে ইহা হইতে দ্বিতীয় "মান" সম্বন্ধে আর্য্যভট যে অনভিজ্ঞ ছিলেন তাহা প্রমাণ হয় না। যদিও আর্য্যভট বর্গসমীকরণ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোথাও কিছু বলেন নাই, তথাপি এই সূত্র (এবং ২৪শ শ্লোক) হইতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে আর্য্যভট বর্গসমীকরণমীমাংসার প্রণালী সম্পূর্ণ

ছিলেন। তবে বর্গসমীকরণের দুইটী "ধান" সম্বন্ধে আর্য্যভটের কিরূপ ধারণা ছিল সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি না।

ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য্যও "গচ্ছ" আনয়নের এই নিয়মই প্রদান করিয়াছেন।

সঙ্কলিতের সঙ্কলিত* দ্বারা নোপায়—

একোত্তরাদ্ব্যুপচিতের্গচ্ছাদ্যেকোত্তরত্রিসংবর্গঃ।
ষড়্ভক্তস্ স চিতিঘনস্ সৈকপদঘনবিমূলো বা ॥২১॥

অনুবাদ :—গচ্ছ, একাদি গচ্ছ এবং দ্বাদিক গচ্ছ এই তিনটী রাশির সংবর্গকে (গুণফলকে) ৬ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল হয় তাহাই একাদি এবং একোত্তর উপচিতির চিতিঘন। অথবা, একাদিক পদের (= গচ্ছের) ঘন (= cube) হইতে তাহার মূল (= ঘনমূল = একাদিক পদ) বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট রাশিকে ৬ দ্বারা ভাগ করিলেও ভাগফল চিতিঘন হইবে।

ব্যাখ্যা :—মনে করা যাক্ একটী ইষ্টকের উপচিতিতে সর্ব্বোচ্চ প্রস্তারে (স্তরে = layer) ১ ইষ্টকখণ্ড আছে, তাহার নিম্ন বা দ্বিতীয় প্রস্তারে (১+২) ইষ্টক খণ্ড আছে, তৃতীয় প্রস্তারে (১+২+৩) ইষ্টকখণ্ড আছে, ... এইরূপে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন গ-সংখ্যক প্রস্তরে (১+২+৩ +..... +গ) ইষ্টকখণ্ড আছে ; এখন এই স্তূপে কতগুলি ইষ্টকখণ্ড আছে, তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। লব্ধ ফলের নামই চিতিঘন (cubic contents of the pile)।

অতএব চিতিঘন
= ১
+ (১+২)
+ (১+২+৩)
+ (১+২+৩+...গ) ;

এখন প্রত্যেক বন্ধনীর মধ্যে যে একাদি একোত্তর শ্রেণী আছে তাহার সর্ব্বধনই (বা যোগফলই) সঙ্কলিত ; এবং এই সঙ্কলিতের সঙ্কলিতই (যোগফলই) চিতিঘন। সেইজন্যই চিতিঘনের অপর একটী নাম "সঙ্কলিতৈক্য"। আর চিতিঘনের "গচ্ছ" উপচিতির প্রস্তার সংখ্যা।

আর্য্যভটের প্রথম সূত্রানুসারে এই চিতিঘন

= ১ + (১+২) + (১+২+৩) + ...
+ (১+২+৩+...গ)

$$= \frac{গ \times (গ+১) \times (গ+২)}{১ \cdot ২} \quad \cdots\cdots(১)$$

আর্য্যভটের দ্বিতীয় সূত্রানুসারে এই চিতিঘন

$$= \frac{(গ+১)^৩ - (গ+১)}{৬} \quad \cdots\cdots(২)$$

এই দুইটী সূত্র প্রকৃতপক্ষে একই, কারণ

$$গ \times (গ+১) \times (গ+২) = (গ^২+১)^৩ - (গ+১)।$$

উপপত্তি :—সূত্রগুলির নানাবিধ উপপত্তি হইতে পারে, এখানে আমাদের কল্পনা ছাড়া উপায় নাই। প্রথমতঃ আর্য্যভট অন্তরগণিতের Calculus of Finite Differences) উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন, যথা—

$$= \frac{১ \times ২ \times ৩}{৬}$$

$$১+২ = \frac{২.৩}{২} = \frac{২.৩.৪}{৬} - \frac{১.২.৩}{৬},$$

$$১+২+৩ = \frac{৩.৪}{২} = \frac{৩.৪.৫}{৬} - \frac{২.৩.৪}{৬},$$

$$১+২+৩+...গ = \frac{গ(গ+১)}{২} = \frac{গ(গ+১)(গ+২)}{৬} - \frac{(গ-১)গ(গ+১)}{৬};$$

অতএব আমরা যোগ করিয়া পাইতেছি যে

$$\text{চিতিঘন} = \frac{গ(গ+১)(গ+২)}{৬}।$$

---

* সঙ্কলিত = একাদি একোত্তর অঙ্কসমূহের সর্ব্বধন ; যোগফল (the first, sum, or addition of arithmeticals)।

সঙ্কলিতৈক্য = সঙ্কলিতের সঙ্কলিত—পূর্ব্বোক্ত সঙ্কলিত সমূহের শ্রেণীফল (aggregate of additions; summed sums, or second sum)।

আর একটী উপায়েও প্রথম সূত্রটী প্রমাণ করা যাইতে পারে। যথা—

$$= \frac{১.২}{২} \quad = \frac{১^২+১}{২}$$

$$= \frac{২.৩}{২} \quad = \frac{২^২+২}{২}$$

$$১+২+৩ = \frac{৩.৪}{২} = \frac{৩^২+৩}{২}$$

$$\cdots + গ = \frac{গ(গ+১)}{২} = \frac{গ^২+গ}{২}$$

যোগ করিলে, চিতিঘন

$$= \frac{১}{২}(১^২+২^২+৩^২+\cdots+গ^২) + \frac{১}{২}(১+২+৩+\cdots+গ);$$

পরবর্ত্তী শ্লোকে আমরা $(১^২+২^২+\cdots+গ^২)$ নির্ণয় করিবার নিয়ম পাই। যদি আর্য্যভট এই নিয়মটী এই শ্লোকের সূত্র সাহায্যে প্রমাণ না করিয়া স্বাধীন ভাবে নির্ণয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখানে আমরা ঐ নিয়মটী ব্যবহার করিতে পারি। ঐ নিয়মানুসারে

$$১^২+২^২+৩^২+\cdots+গ^২) = \frac{গ(গ+১)(২গ+১)}{৬}$$

অতএব চিতিঘন

$$= \frac{১}{২}\left[\frac{গ(গ+১)(২গ+১)}{৬} + \frac{গ(গ+১)}{২}\right]$$

$$\frac{১}{২}\left[\frac{গ(গ+১)(২গ+৪)}{৬}\right]$$

$$= গ(গ+১)(গ+২)\div৬।$$

তবে আমার বোধ হয় আর্য্যভট এ প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, বরং পরবর্ত্তী শ্লোকের প্রথম সূত্রটী প্রমাণ করিতে এই শ্লোকের সূত্রেরই সাহায্য লইয়া থাকিবেন।

আর একটী উপায় আছে—আর্য্যভট আধুনিক Mathematical Induction এর মূলসূত্রও ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন।

দ্বিতীয় সূত্রটী যোগফল আর্য্যভট প্রথমটী হইতেই অনুমান বা প্রমাণ করিয়াছিলেন। প্রথমটীর সাহায্য না লইয়াও করিয়া থাকিতে পারেন, যথা—

$$= \frac{২^৩-২}{৬}$$

$$= \frac{২.৩}{২} \quad = \frac{৩^৩-২^৩-(৩-২)}{৬}$$

$$= \frac{৩^৩-৩}{৬} - \frac{২^৩-২}{৬},$$

$$= \frac{৩.৪}{২} \quad = \frac{৪^৩-৪}{৬} - \frac{৩^৩-৩}{৬}$$

$$\cdots + গ = \frac{গ(গ+১)}{২} = \frac{(গ+১)^৩-গ^৩-১}{৬}$$

$$= \frac{(গ+১)^৩-(গ+১)}{৬} - \frac{গ^৩-গ}{৬}$$

যোগ করিলে চিতিঘন $= \frac{(গ+১)^৩-(গ+১)}{৬}$ হইবে।

বর্গচিতিঘন এবং ঘনচিতিঘন নির্ণয়ের উপায় বা বর্গ-সঙ্কলিত এবং ঘনসঙ্কলিত সাধনোপায়—

সৈকসগচ্ছপদানাং ক্রমাভ্রিসংবর্গিতস্য ষষ্ঠোঽংশ।
বর্গচিতিঘনস্ স ভবেচ্চিতিবর্গো ঘনচিতি-ঘনশ্চ ॥২২॥

অন্বয়।—পদ (=গচ্ছ), একাধিক পদ, এবং একাধিক গচ্ছাধিক পদ—এই তিনটী রাশির (গ, গ+১, গ+গ+১) সংবর্গের (বা গুণফলের) ষষ্ঠ অংশই বর্গ-চিতিঘন (অর্থাৎ বর্গের সঙ্কলিত ঘন)। চিতির বর্গ (অর্থাৎ একাদি সঙ্কলিতের যে বর্গ, তাহাই) ঘনচিতিঘন (অর্থাৎ একাদি ঘনের সঙ্কলিত ঘন)।

স্পষ্টার্থ।—এই শ্লোকে দুইটী প্রশ্নের সমাধানের জন্য দুইটী সূত্র বিবৃত হইয়াছে। প্রথম প্রশ্নটী এই যে—যদি একটী উপচিতিতে সর্ব্বোচ্চ প্রস্তারে ($১^{ম}$ =) ১ গোলক

(ন প্রস্তর খণ্ড), তাহার নিম্ন বা দ্বিতীয় প্রস্তারে ২^{২} গোলক, তৃতীয় প্রস্তারে ৩^{২} গোলক,...সর্ব নিম্ন ন-সংখ্যক প্রস্তারে ন^{২} গোলক থাকে, তাহা হইলে এই বর্গচিতির ঘন, অর্থাৎ এই স্তূপের গোলক-সমষ্টি, কত হইবে? অতএব এখানে

$$১^{২}+২^{২}+৩^{২}+\cdots+ন^{২} \qquad (১)$$

এই শ্রেণীফল নির্ণয় করিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নেও এইরূপ একটী চিতির ঘন নির্ণয় করিবার কথাই আছে, তবে পার্থক্য এই যে, চিতির স্তর গুলিতে (layers) ১^{২}, ২^{২},...ন^{২} গোলকের পরিবর্তে যথাক্রমে ১^{৩}, ২^{৩},...ন^{৩} গোলক আছে; অর্থাৎ এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে $১^{৩}+২^{৩}+৩^{৩}+\cdots+ন^{৩}$ ...(২)
এই শ্রেণীফল নির্ণয় করিতে হইবে। অতএব ঘনচিতিঘন একাধিকের সমষ্টিগত ঘন।

আর্যভট্টের সূত্র দুইটী এই—

$$১^{২}+২^{২}+৩^{২}+\cdots+ন^{২}=\frac{ন(ন+১)(২ন+১)}{৬} \qquad (৩)$$

$$১^{৩}+২^{৩}+৩^{৩}+\cdots+ন^{৩}=(১+২+৩+\cdots+ন)^{২} \qquad (৪)$$

সূত্র দুইটিতে কোন অসঙ্গতি নাই, কিন্তু ইহাদের উপপত্তি কি? উপপত্তি নানাবিধ হইতে পারে, আমরা পর পর কয়েকটী উপায়ের নির্দেশ করিতেছি।

প্রথম সূত্রটীর ক্রম—

(ক) $১^{২}=\frac{১.২.৩}{৬}$

$$২^{২}=\frac{২.৩.৫}{৬}-\frac{১.২.৩}{৬}$$

$$৩^{২}=\frac{৩.৪.৭}{৬}-\frac{২.৩.৫}{৬}$$

$$ন^{২}=\frac{ন.(ন+১)(২ন+১)}{৬}-\frac{(ন-১)ন(২ন-১)}{৬}$$

অতএব, যোগ করিলে, ঘনচিতিঘন $=\frac{ন(ন+১)(২ন+১)}{৬}$

(খ). ঘনমূল বাহির করিবার নিয়ম হইতে এবং পূর্ব শ্লোকের ২য় সূত্র হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে আর্যভট নিম্নলিখিত সূত্রটী অবগত ছিলেন—

$$(ন+১)^{৩}=ন^{৩}+৩ন^{২}+৩ন+১।$$

এই সূত্রটী হইতে আমরা নিম্নলিখিত "সমীভবন"গুলি (=identities, যেমন "সমীকরণ"=equations) প্রাপ্ত হই—

$$১^{৩}$$
$$২^{৩}-১^{৩}=$$
$$৩^{৩}-২^{৩}$$

$$(ন+১)^{৩}-ন^{৩}=৩.ন^{২}+৩.ন+১;$$

অতএব, $(ন+১)^{৩}=৩(১^{২}+২^{২}+\cdots+ন^{২})$ +

$$+৩(১+২+\cdots+ন)+(ন+১)\times১,$$

$$\therefore ৩\text{ বর্গচিতিঘন}=(ন+১)^{৩}-(ন+১)-৩\frac{ন.ন+১।}{২}$$

$$=ন(ন+১)(ন+২)-৩\frac{ন(ন+১)}{২}$$

$$\therefore \text{বর্গচিতিঘন}=\frac{ন(ন+১)(ন+২)}{৩}-\frac{ন(ন+২)}{২},$$

$$=\frac{ন(ন+১)(২ন+১)}{২\times৩}$$

এখানে $(ন+১)^{৩}-(ন+১)=ন(ন+১)(ন+২)$ এই সূত্রটীর প্রয়োজন বলিয়াই বোধ আর্যভট পূর্বোক্ত শ্লোকে প্রকারান্তরে এই সমীভবনটীর নির্দেশ করিয়াছেন। এখানে আমরা পূর্বোক্ত শ্লোকের সূত্র দুইটীর কোনটীই ব্যবহার করি নাই, কেবল সূত্র দুইটীর সমতার কল স্বরূপ অনুমানটী (corollary) প্রয়োগ করিয়াছি।

(গ) $\quad -\frac{১\times২}{২}\quad \cdots\frac{১^{২}}{২}+\frac{১}{২}$

$$১+২=\frac{২\times৩}{২}=\frac{৩^{২}}{২}+\frac{৩}{২}$$

$$১+২+৩=\frac{৩\times৪}{২}=\frac{৩^২}{২}+\frac{৩}{২}$$

$$\cdots+গ=\frac{গ(গ+১)}{২}=\frac{গ^২}{২}+\frac{গ}{২};$$

অতএব, যোগ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে "সঙ্কলিতৈক্য" = ½ "বর্গচিতিঘন" + ½ "সঙ্কলিত"

∴ বর্গচিতিঘন = ২ সঙ্কলিতৈক্য—সঙ্কলিত

$$=২\frac{গ(গ+১)(গ+২)}{৬}-\frac{গ(গ+১)}{২}$$

(পূর্ব্বশ্লোকানুসারে)

$$=\frac{গ(গ+১)(২গ+১)}{৩}$$

পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলির মধ্যে (ক) ও (খ) তে আমরা সঙ্কলিতৈক্যের সাহায্য গ্রহণ করি নাই; কেবলমাত্র (গ) চিহ্নিত প্রণালীতে সূত্রটী আমরা সঙ্কলিতৈক্যের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছি।

দ্বিতীয় সূত্রটী আর্য্যভট খুব সম্ভবতঃ Mathematical Induction সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছিলেন। তবে নিম্নলিখিত উপায়ও অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন—

$$গ^৩ = গ^২.গ$$
$$= [গ(গ-১)+গ]গ^২$$
$$= [২(১+২+\cdots+(গ-১))+গ]গ$$
$$= [\{১+২+\cdots+গ\}+\{১+২+\cdots+(গ-১)\}]$$
$$\times[\{১+২+\cdots+গ\}-\{১+২+\cdots+(গ-১)\}]$$

$$\therefore গ^৩ = \{১+২+\cdots+গ\}^২ - \{১+২+\cdots+(গ-১)\}^২$$

এই সূত্রটী হইতে আমরা দেখিতে পাই যে

$$১^৩ = (১+০)^২ - ০^২$$
$$= (১+২+৩)^২ - (১+২)^২$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$গ^৩ = \{১+২+\cdots+গ\}^২ - \{১+২+\cdots+(গ-১)\}^২$$

অতএব, ঘনচিতিঘন = $(১+২+\cdots+গ)^২$

$$=\left\{\frac{গ(গ+১)}{২}\right\}^২$$

= চিতিবর্গ।

এই সূত্রটী প্রমাণ করিতে আর্য্যভট প্রথম সূত্রটীর (খ) প্রণালীর অনুরূপ প্রণালীও অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন। তবে এ সবই আমাদের অনুমান মাত্র—কারণ আর্য্যভটের প্রণালী সম্বন্ধে কোন লিখিত বিবরণ নাই।

ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের বাসন ধার হইবে।

দুইটী রাশির সংবর্গ আনয়নের উপায়ান্তর নির্দ্দেশিত হইতেছে—

সংপর্কস্তু হি বর্গাদ্বিশোধয়েদেব বর্গসংপর্কং।
যস্তস্য ভবত্যর্ধং বিদ্যাদ্‌গুণকারসংবর্গং ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ :—"গুণ" (multiplier) এবং "গুণ্য" (multiplicand) এই দুইটী রাশির যোগফলের বর্গ হইতে তাহাদের বর্গের যোগফল বিয়োগ করিতে হইবে। অবশিষ্টের অর্দ্ধেকই তাহাদের সংবর্গ (বা গুণফল)।

পদার্থ :—"ব" এবং "র" গুণ ও গুণ্য হইলে, সূত্রানুসারে ½[(ব+র)² − (ব²+র²)] = ব × র। ইহা নিম্নলিখিত "সঙ্কলিতঘনটীর" রূপান্তর মাত্র—

$$(ব+র)^২ = ব^২ + র^২ + ২ব র।$$

আমার বোধহয় এই শ্লোকের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত সমীকরণদ্বয়ের মীমাংসা মাত্র—

$$\left.\begin{aligned} ব+র &= ক \\ ব^২+র^২ &= খ \end{aligned}\right\}$$

এই দুইটী সমীকরণ হইতে আমরা অনায়াসেই দেখিতে পাই যে—

$$২ব র = (ব+র)^২ - (ব^২+র^২) = ক^২ - খ;$$

অতএব $(ব-র)^২ = (ব^২+র^২) - ২ব র$

$$= (ব+র)^২ - ৪বর$$
$$= ২খ - ক^২ ;$$
$$ব - র = \sqrt{২খ - ক^২}$$
$$ব = \frac{১}{২}[(ব+র)+(ব-র)]$$
$$= \frac{১}{২}[ক + \sqrt{(২খ - ক^২)}] ;$$
এইরূপে, $র = \frac{১}{২}[(ব+র)-(ব-র)]$
$$= \frac{১}{২}[ক - \sqrt{(২খ - ক^২)}] ।$$

দুইটী রাশির সংবর্গ এবং অন্তর জানা থাকিলে রাশি দুইটী আনয়নের উপায় —

দ্বিকৃতিগুণাৎ সংবর্গাদ্ অন্তরবর্গেণ
সংযুতান্মূলং ।
অন্তরযুক্তং হীনং তদর্দ্ধং কারয়েদ্বয়ং
দলিতং ॥২৪॥

অনুবাদ :—রাশি দুইটীর সংবর্গকে "দুই" এর বর্গ (অর্থাৎ চারি) দ্বারা গুণিত করিয়া রাশি দুইটীর অন্তরের বর্গের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। যোগফলের বর্গমূল নির্ণীত হইলে অন্তরযুক্ত মূলের অর্দ্ধেক এবং অন্তরহীন মূলের অর্দ্ধেকই ঐ দুইটী রাশি হইবে।

স্পষ্টার্থ :—ব এবং র দুইটী রাশি। "ক × খ" এবং "ব—র" জানা আছে। কিন্তু

$(ব+র)^২ = ৪ ব \times র + (ব-র)^২$;

অতএব সংবর্গের চারিগুণের সহিত অন্তরের বর্গ যোগ করিলে আমরা রাশি দুইটীর যোগফলের বর্গ প্রাপ্ত হই। ইহার মূলই রাশি দুইটীর যোগফল।

এখন $\frac{১}{২}[(ব+র)+(ব-র)] = ব$,

এবং $\frac{১}{২}[(ব+র)-(ব-র)] = র$;

অতএব মূল এবং অন্তর যোগ করিয়া ২ দ্বারা ভাগ করিলে একটী রাশি পাওয়া যায়, এবং মূল হইতে অন্তর বিয়োগ করিয়া ২ দ্বারা ভাগ করিলে অন্যরাশিটী পাওয়া যায়। সংবর্গ এবং অন্তর হইতে রাশি দুইটী নির্ণয় করিবার এই প্রণালী উপরোক্ত

$$(ক+খ)^২ = ৪ ক খ + (ক-খ)^২$$

এই মূলসূত্রের উপর নির্ভর করিতেছে।

এই শ্লোকটীর উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত সমীকরণদ্বয়ের (simultaneous equations) মীমাংসা করা—

$ব \times র = ক$ ...(১)
$ব - র = খ$ ...(২)

এখানে ক এবং খ এই রাশি দুইটী জানা আছে।

$(ব+র)^২ = ৪ ব \times র + (ব-র)^২$
$= ৪ ক + খ$,
$\therefore ব+র = \sqrt{(৪ ক + খ)}$
অতএব $ব = \frac{১}{২}[(ব+র) + (ব-র)]$
$= \frac{১}{২}[\sqrt{৪ ক + খ} + খ]$,
এবং $র = \frac{১}{২}[(ব+র)-(ব-র)]$
$= \frac{১}{২}[\sqrt{৪ ক + খ} - খ]$;

আর্য্যভট্ট দুইটীর দ্বারা ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন।

[উদাহরণ—

$ব র = ১০$
$ব - র = ৩$;
এতএব $(ব+র)^২ = ৪ \times ১০ + ৩^২ = ৪৯$,
$ব + র = ৭$;
$ব = \frac{১}{২}(৭ + ৩) = ৫$,
$র = \frac{১}{২}(৭ - ৩) = ২$ ।]

মূল (= Principal) অতীতকাল (= total period) এবং সকলমূলফল (= Interest on the principal for the unit of time + Int. for the total period on that Interest জানা থাকিলে, এককালে মূলফল (Int. on the principal for the unit of time) আনয়নের উপায়—

মূলফলং সকলং কালমূলগুণমর্ণমূলকৃতিযুক্তং ।
মূলং মূলার্দ্ধোনং কালহৃতং স্যাৎ স্বমূলফলং ॥২৫॥

অনুবাদ :— সকলমূলফলকে অতীতকাল এবং মূলের দ্বারা গুণিত করিয়া ঋণফলের সহিত মূলার্দ্ধের বর্গ যোগ

করিতে হইবে। যোগফলের বর্গমূল হইতে মূলার্দ্ধ বিয়োগ করিয়া অতীষ্টকালের দ্বারা ভাগ করিলে (এককালে) মূলফল হইবে।

স্পষ্টার্থ :—যদি মূলধন="ম", এককালে ১ এর ফল (=সুদের হার=rate of interest on 1 per unit of time)="ক" এবং অতীষ্টকাল "গ" হয়, এবং সকল মূলফল "ফ" হয়, তাহা হইলে—

মূলফল + মূলফলের ফল = সকলমূলফল হওয়াতে,

$$\text{ম}ক + \text{ম}ক \times ক \times গ = ফ \qquad (১)$$

$$(\text{ম}ক)^২ + ম \times \text{ম}ক \times ক \times গ = ফম,$$

$$(\text{ম}ক + \frac{ম}{২})^২ \qquad ফম + (\frac{ম}{২})^২$$

$$\text{ম}ক + \frac{ম}{২} = \sqrt{(ফম + (\frac{ম}{২})^২)}$$

$$\text{ম}ক = [\sqrt{(ফম + (\frac{ম}{২})^২)} - \frac{ম}{২}] \div গ \quad \cdots (২)$$

ইহাই আর্য্যভটের সূত্র। ক, ম এবং গ জানা থাকিলে ইহা "মক" বা "ফ" নির্ণয় করিবার উপায় মাত্র। ব্রেড্ফীফন প্রভৃতি হইতে গচ্ছ আনয়নের ন্যায়, ইহা প্রকৃতপক্ষে একটী ব্যস্ত প্রশ্ন (inverse problem)। এখানেও আর্য্যভটকে একটী বর্গসমীকরণের মীমাংসা করিতে হইয়াছে। গচ্ছ আনয়নের সময় আর্য্যভট বর্গসমীকরণটীকে প্রথমে ৪ দিয়া গুণিত করিয়াছিলেন। এখানকার প্রণালী হইতে মনে হয় যে এ সূত্রে আর্য্যভট সেরূপ করেন নাই। সেরূপ করিলে সূত্রটী এইরূপ হইত—

$$\text{ম}ক = \frac{১}{২}\sqrt{(৪\ ফম + ম^২)} - ম] \div গ।$$

গচ্ছসাধন-সূত্র এবং এই সূত্রটী হইতে আমাদের নিঃসন্দেহ ধারণা হয় যে আর্য্যভট বর্গ সমীকরণমীমাংসার উপায় সম্যক্ অবগত ছিলেন।

মূলফলের ফল ব্যবহার করাতে মনে হয় আর্য্যভটের সময়ে মিশ্রফল (compound interest) গণনা প্রচলিত ছিল।

[উদাহরণ—

সকলমূলফল = ১৬, মূল = ১০০, অতীষ্টকাল = ৩ মাস; মূলফল অর্থাৎ একমাসে ১০০র ফল (বা সুদ) নির্ণয় করিতে হইবে। সূত্রানুসারে—

$$\text{মূলফল} = [\sqrt{(১৬ \times ১০০ \times ৩ + ৯^২)} - ৯] \div ৩$$

$$= (১১০ - ৫০) \div ৩ = ১০]$$

অন্যান্য সাধারণ সূত্রের ন্যায় ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীর এই অধ্যায়ে এবং ব্রহ্মগুপ্তের ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের ১২শ অধ্যায়ে "মিশ্র ব্যবহার" দ্রষ্টব্য।

ত্রৈরাশিক গণনা—

ত্রৈরাশিকফলরাশিং তমথেচ্ছারাশিনা হতং কৃত্বা।
লব্ধং প্রমাণভক্তিতং তস্মাদিচ্ছাফলমিদং স্যাৎ ॥২৬

অনুবাদ :—ত্রৈরাশিক পরিকর্ম্মে ফলরাশিকে ইচ্ছারাশির দ্বারা গুণিত করিয়া প্রমাণরাশির দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ ফল ইচ্ছাফল হয়।

স্পষ্টার্থ :—"প্রমাণ", "ফল" এবং "ইচ্ছা" তিনটী রাশি হইতে নিষ্পন্ন কর্ম্মের নাম ত্রৈরাশিক। "প্রমাণ" রাশির দ্বারা যদি "ফল" রাশি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে "ইচ্ছা" রাশির দ্বারা কি রাশি (ইচ্ছাফল) উৎপন্ন হইবে—গণিতের যে প্রণালীর দ্বারা এই প্রশ্নের সমাধান হয় তাহারই নাম "ত্রৈরাশিক।" আধুনিক সঙ্কেতানুসারে

"প্রমাণ" : "ইচ্ছা" "ফল" । "ইচ্ছাফল",

$$\text{ইচ্ছাফল} = \frac{\text{ফল} \times \text{ইচ্ছা}}{\text{প্রমাণ}}।$$

ইহাই আর্য্যভটের সূত্রের অর্থ এবং উদ্দেশ্য। ইহা যে "অনুপাত" সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

[পরমেশ্বরের উদাহরণ—

তাম্বূলানাং শতেনাত্রদশকং লভ্যতে যদি।
তাম্বূলানাং ষষ্ট্যা লভ্যন্তে কিয়ন্ত্যাত্রাণি তদ্বদ ॥

এখানে, ১০০ : ৬০ :: ১০ : 'ইচ্ছাফল'

$$\text{ইচ্ছাফল} = \frac{১০ \times ৬০}{১০০} = ৬।$$

এই উদাহরণে তাম্বূলের পরিবর্ত্তে আম্র প্রাপ্তির কথা হইতে মনে হয় পরমেশ্বরের সময়েও মুদ্রাদ্বারা ক্রয় বিক্রয়ের

(Sale and Puchase) পরিবর্ত্তে বিনিময়েরই (Barter বা Exchage) বহুল প্রচার ছিল।]

এই "ত্রৈরাশিক" প্রণালীটী ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। আমরা আর্য্যজ্যোতিষে এবং বাহ্য জ্যোতিষে নিম্নলিখিত চরণটী পাই—

ছেদরাশিং গতাভ্যস্তং বিভজেৎ জ্ঞানরাশিনা।

অর্থাৎ "ছেদরাশি"কে "গতরাশি" দ্বারা গুণিত করিয়া "জ্ঞানরাশি" দ্বারা ভাগ করিবে। এখানে "ছেদরাশি"ই "ফল", "গতরাশি"ই ইচ্ছা এবং "জ্ঞানরাশি"ই প্রমাণ।

ব্রহ্মগুপ্ত, গণেশ এবং অন্যান্য জ্যোতিষীদের মতে "প্রমাণ" প্রথম-রাশি, "ফল" দ্বিতীয় রাশি, এবং "ইচ্ছা" তৃতীয় রাশি। ইহার মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয় রাশি সমজাতি হওয়া চাই; এবং লব্ধ "ইচ্ছাফল"ও দ্বিতীয় রাশির সমজাতি হইবে। যোগত্রয় ত্রৈরাশিক এইরূপে লিখিত হইত—

প্রমাণ দ্বারা ফল হইলে
ইচ্ছা দ্বারা কি ইচ্ছাফল হইবে?

উত্তর এইরূপ হইবে—

$$\frac{\text{প্রমাণ}}{\text{ইচ্ছা}} \quad \frac{\text{ফল}}{\text{ইচ্ছাফল}}$$

অতএব প্রথম এবং তৃতীয়রাশি সমজাতি না হইলে, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থরাশি সমজাতি না হইলে এই অনুপাতটী ব্যবহার করা যায় না।

আর্য্যভট্ট কেবলমাত্র "ক্রম-ত্রৈরাশিকে"রই (direct rule of three terms) উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য্য "ক্রম-ত্রৈরাশিক" (direct rule of three) এবং "ব্যস্ত ত্রৈরাশিক" (or "বিলোম ত্রৈরাশিক" = inverse rule of three terms)—এই উভয়েরই নিয়ম প্রদান করিয়াছেন; এবং "পঞ্চরাশিক", "সপ্তরাশিক", "নবরাশিক" ও "একাদশ-রাশিক" সাধনোপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের জ্যোতিষী এবং গণিতজ্ঞদের নিকটে এই "ত্রৈরাশিক" প্রণালীটী একটী প্রধান বস্তু; তাঁহারা এই প্রণালীটীর যত বহুল ব্যবহার করিয়াছেন এত আর অন্য কোন প্রণালীর করেন নাই। কোন প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইলে কোনরূপে প্রশ্নটী হইতে একটী বা একাধিক ত্রৈরাশিক গঠন করা সকল জ্যোতিষী অন্ততঃ সিদ্ধান্তকারগণের মুখ্য উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ভিন্ন (= অপূর্ণ = fractional) রাশির গুণ, ভাগ এবং সবর্ণীকরণ—

ছেদাঃ পরস্পরহতাঃ ভবন্তি গুণকারভাগহারাণাং।
ছেদগুণং সচ্ছেদং পরস্পরং তৎ সবর্ণত্বং ॥২৭॥

অনুবাদ :—গুণকার এবং ভাগহারদিগের ছেদগুলি "পরস্পর" গুণিত হইলে লুপ্ত হয়। ছেদবিশিষ্ট অংশকে (বা রাশিকে) পরস্পর ছেদগুণ করিলে ঐ রাশিগুলির সবর্ণত্ব হয়।

স্পষ্টার্থ :—আর্য্যভট্ট এই শ্লোকে ভগ্নাংশ (= fraction) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়াছেন। এই ভগ্নাংশকে আর্য্যভট্ট সচ্ছেদ রাশি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন —অর্থাৎ যাহার ছেদ আছে এইরূপ রাশি।* এইরূপ দুইটী বা ততোধিক রাশির গুণফল বাহির করিতে হইলে, হার-গুলির গুণফলই হার্য্য হইবে, এবং ছেদগুলির গুণফলই ছেদ হইবে। একটী ভগ্নাংশকে অপর একটী ভগ্নাংশ দ্বারা ভাগ করিতে হইলে, দ্বিতীয়টীর ছেদের দ্বারা প্রথমটীর হার্য্যকে গুণিত করিলে ভাগফলের হার্য্য হইবে, এবং দ্বিতীয়টীর হার্য্যের দ্বারা প্রথমটীর ছেদকে গুণিত করিলে ভাগফলের ছেদ হইবে। ইহারই নাম "পরস্পরাহতি" (সঃ টীঃ—হার্য্যস্য ছেদো হরিবেন গুণিতো হারকো ভবতি। হারকস্য

* ভিন্নরাশি = খণ্ডরাশি = অপূর্ণরাশি = সচ্ছেদরাশি = fraction (পূর্ণরাশি = অভিন্নরাশি = integer)।
ছেদ = হার = হারক = denominator.
হার্য্য = numerator.
সবর্ণীকরণ = reduction of fraction to a common denominator.

ছেদো হার্য্যেণ গুণিতো হার্য্যো ভবতি। , ইতি। গুণগুণাভ্যাস্ সচ্ছেদয়োশ্ছেদয়োর্যাবত্তির্হার্যতে ছেদস্ তাবৎ)।

সচ্ছেদ দুইটী রাশির প্রত্যেকটী রাশির হার্য্য ও হারককে অপরটীর ছেদ দিয়া গুণিত করিলে তাহারা সবর্ণ হইবে (যদি দুইটীর অধিক রাশি হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটীর হার্য্য ও হারককে অপর সকল রাশিগুলির ছেদের দ্বারা গুণিত করিতে হইবে)। ইহাই—"পরস্পরং ছেদগুণং"। রাশিগুলি সবর্ণ হইলে, যোগ বা বিয়োগ করিতে পার্শ্ববর্ত্তিত হার্য্যগুলির যোগ বা বিয়োগ করিলেই হয়। আর প্রকৃতপক্ষে যোগ বিয়োগের জন্যই প্রধানতঃ সবর্ণীকরণের প্রয়োজন। আর্য্যভট্ট এই শ্লোকে "ভিন্ন-রাশি"র যোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট উল্লেখ না করিলেও, এই শ্লোকটীতেই তিনি যে—

"ভিন্ন-সঙ্কলিত" (addition of fractions),

"ভিন্ন-ব্যবকলিত" (subtraction of fractions),

"ভিন্ন-গুণন" (multiplication of fractions),

"ভিন্ন-ভাগ-হার" (division of fractions),—

এই "চারিটি ভিন্ন-পরিকর্ম্মের" (operations on fractions) নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

পরবর্ত্তীকালে "ভিন্ন-পরিকর্ম্ম"র সূত্রগুলি যে আরও স্পষ্ট এবং বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীর দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ব্যস্তবিধি * কথিত হইতেছে—

গুণকারা ভাগহরা ভাগহরা যে ভবন্তি গুণকারাঃ।
যঃ ক্ষেপস্তেঽপচয়োঽপচয়ঃ ক্ষেপশ্চ বিপরীতে ॥২৮॥

অন্বয়ার্থ :—(দৃষ্টরাশির দ্বারা উদ্দিষ্টরাশি আনয়ন করিতে) বিপরীতবিধিতে (উদ্দিষ্টরাশির পক্ষে) যাহা গুণকার (দৃষ্টরাশির পক্ষে) তাহাই ভাগহার হয়, যাহা ভাগহার তাহা গুণকার হয়; যাহা ক্ষেপ (বা বৃদ্ধি) তাহা অপচয় বা (বা হ্রাস) হয়, যাহা অপচয় তাহা ক্ষেপ হয়।

স্পষ্টার্থ :—একটী উদাহরণ লইলে অর্থটী পরিষ্কার হইবে। কোন্ রাশিকে ৫ দিয়া গুণ করিয়া ৩ দিয়া ভাগ করিলে, ভাগফলের সহিত ২০ যোগ করিয়া ১৪ বিয়োগ করিলে ১৬ অবশিষ্ট থাকে? এখানে যদি উদ্দিষ্ট রাশি "ব" হয়, তাহা হইলে আধুনিক সঙ্কেতানুসারে—

ব×৫÷৩+২০−১৪=১৬ (=দৃষ্টরাশি §)

অতএব—

ব=(১৬+১৪−২০)×৩÷৫=৩।

এখানে প্রত্যেকটী পরিকর্ম্মই বিপরীতভাবে ধরা হইয়াছে বলিয়া প্রণালীটীর নাম "বিপরীতবিধি"। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটী সরলসমীকরণ বীজগণিতের মূলসূত্রমাত্র।

পরমেশ্বর (টীকাকার) বলিতেছেন—"অব্যক্তমানেনৈব সিদ্ধান্তি বর্গে মূলং মূলীকরণে বর্গীকরণং বিজ্ঞেয়ম্।" অর্থাৎ প্রশ্নটীতে বর্গ বা বর্গমূল করিবার কথা থাকিলে উদ্দিষ্ট রাশি নির্ণয়ের সময় ঐ স্থানে যথাক্রমে বর্গমূল বা বর্গ করিতে হইবে। পরমেশ্বরের উদাহরণ—

কন্যিয়ঃ পঞ্চভির্ভক্তম্ ষড়ভির্যুক্তঃ পতীকৃতঃ।
একোনো বর্গিতো বেদসংখ্যাস্ ন গণকোচ্যতাং॥

এখানে $[\sqrt{(ব\times৩+৫+৬)}-১]^২=৪$,

অতএব $ব=\{(\sqrt{৪}+১)^২-৬\}\times৫\div৩=৫$।

লীলাবতীর তৃতীয় অধ্যায়ে ভাস্করাচার্য্য আরও বিশদভাবে "বিলোমবিধি" প্রদান করিয়াছেন।

বহুসঙ্খ্যের মধ্যে একটী একটী সঙ্খ্য পরিত্যাগ করিয়া শেষলব্ধগুলির সংখ্যা গণিত হইলে, তাহা হইতে সকল সংখ্যার যোগসংখ্যা আনয়নের উপায়—

রাশ্যূনং রাশ্যূনং গচ্ছধনং পিণ্ডিতং পৃথক্কৃত্বেন।
ব্যেকেন পদেন হৃতং সর্ব্বধনং তদ্ভবত্যেব ॥২৯॥

* ব্যস্তবিধি, বিপরীতবিধি, বিলোমবিধি = inversion.

§ দৃষ্টরাশি = the given quantity, the quantity or number which is visible.

অনুবাদ :—এক একটী রাশিহীন সঙ্খ্যেয় (= একৈক সঙ্খ্যহীন সঙ্খ্যেয়ক) পৃথক্ পৃথক্ জানা থাকিলে তাহাদের সবগুলিকে একোনগুণের (= এক সঙ্খ্যহীন ইতরসংখ্যা) দ্বারা ভাগ করিলে সঙ্ঘাত (= সকল সঙ্খ্যের ঐক্য) হয়।

স্পষ্টার্থ :—যদি $স_১, স_২, \cdots স_গ$ — গ সঙ্খ্য হয়,

এবং যদি

হয়, অর্থাৎ যদি

$$স_১ + স_২ + \cdots + স_{গ-১} + স_গ - স_১ = র_১,$$

$$+ স_গ - স_২ = র_২,$$

$$\cdots স_গ - স_গ = র_গ,$$

জানা থাকে, তাহা হইলে আর্যভটের সূত্রানুসারে

$$\cdots + স_গ = \frac{র_১ + র_২ + \cdots + র_গ}{গ-১}$$

ইহার উপপত্তি অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। যোগ করিলে দেখিতে পাই যে $স_১ + স_২ + \cdots স_গ$ এই সঙ্খ্যেয়ক গ-বার গণিত হইতেছে কিন্তু ১-বার বাদ যাইতেছে— অতএব (গ−১) সঙ্খ্যেয়কাই $র_১ + র_২ + \cdots + র_গ$ এই সমষ্টির সমান। অতএব এই সমষ্টিকে (গ−১) দ্বারা ভাগ করিলেই, সঙ্খ্যেয়কা পাওয়া যাইবে। সঙ্খ্যেয়কা নির্ণীত হইলে আমরা সহজেই তাহা হইতে $র_১, র_২, \cdots র_গ$ বিয়োগ করিয়া $স_১, স_২ \cdots স_গ$ যথাক্রমে নির্ণয় করিতে পারিব। বিষয়টী এত সামান্য এবং প্রমাণ এত অনায়াসলভ্য হইলেও কেহ কেহ (যথা, Cantor, ইত্যাদি) বলিয়া থাকেন যে ইহা প্রকৃতপক্ষে একটী গ্রীক প্রতিজ্ঞা, কিন্তু আর্যভট পরম্পরাপহরণ সূত্রাইত, করিবার জন্য সূত্রটীর রূপ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। Cantor গ্রীক গণিতজ্ঞ Jamblichus এর যে প্রতিজ্ঞাটীর উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া তাঁহার এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন (Gow's History of Greek Mathematics দ্রষ্টব্য), ফরাসী Rodet আর্যভটের এই সূত্রটীকে কোন অংশে সেই প্রতিজ্ঞাটীর অনুরূপ মনে করেন না (Rodet, Calcul du Aryyabhata দ্রষ্টব্য)। যদিও (Alexandria) আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ডায়োফ্যাণ্টাস্ (Diophantus) একটী কি দুইটী উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন, তথাপি সেগুলি বিশেষ উদাহরণ মাত্র; কোন সাধারণ সূত্রের (general rule) সত্তাভার উপলব্ধি সম্বন্ধে তাহা হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে আর্যভট Diophantus এর উদাহরণ দুইটী জানিতেন, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে তিনি যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া একটী সাধারণ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন যাহা আর কেহ করেন নাই। ইহাতে অপহরণের লজ্জাই বা কোথায় এবং সে লজ্জা লুকাইবারই বা প্রয়োজন কি? তথাপি এই সামান্য ভিত্তির উপর যে সমালোচক charge of plagiarism আনয়ন করেন, তাঁহার প্রতি যদি আমরা যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের সে ত্রুটী মার্জ্জনীয়। সমালোচকেরা (JASB, March. 1908, p. 134) বলিয়া যান যে, যে ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা আর্যভটের উপর চৌর্য্যাপবাদ আরোপ করেন, সেই একই বৈজ্ঞানিক (!) ভিত্তি হইতে Diophantusকেও ঐ অপরাধে অপরাধী করা যায়। তাহার উত্তর কি?

[উদাহরণ—

ব্যস্তাহরণমেকক্রমাদ্যবয়েন।

দৃষ্টা বনে হরৈকহীনেতরঘাতং।

জ্ঞাত্বা তু সংখ্যার্কশরাদিসংবিত্ত

দ্ব্যাদ্যন্বয়ে প্রাক্ সংখ্যায় কথ্যতাং।

এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাশির সমষ্টি = ১২,

তৃতীয় ও প্রথম রাশির সমষ্টি = ১৩,

প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির সমষ্টি = ১৬ ;
যোগ করিলে আমরা পাই = ৪২ ,
একোত্তর ২ দিয়া ভাগ করিলে ২১ হয় ;
ইহাই ব্যস্ত তিনটীর যোগফল।

অতএব	জ্ঞেনমান	২১—১২	৯,
	কল্পমান	২১—১৪	৭,
	বৎসমান	২১—১০	৫।]

অব্যক্ত মূল্য দ্বারা দ্রব্যের মূল্য প্রদর্শনের উপায়—

গুলিকান্তরেণ বিভজেদ্ধনয়োঃ পুরুষয়োস্তু রূপকবিশেষং।
লব্ধং গুলিকামূল্যং যস্তূর্ধক্বতং ভবতি মূল্যং ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ :—যদি দুইজন লোকের অর্থকৃত (১) (স্বস্ব-গুলিকা মূল্য এবং রূপকের যুক্তিমান) তুল্য হয়, তাহা হইলে উভয়ের রূপকের (২) বিশেষকে (=অন্তরকে) উভয়ের গুলিকার (৩) অন্তরের দ্বারা ভাগ করিলে এক একটী গুলিকার মূল্য লব্ধ হইবে।

(১) পঃ টীঃ—অর্থকৃতং ধনং পুরুষয়োঃ স্বস্বগুলিকা-মূল্যরূপকযুক্তিমানং।

(২) পঃ টীঃ—রূপকশব্দেন পণাদিসংজ্ঞিতং বর্ণাদি-দ্রব্যং।

(৩) পঃ টীঃ—পণাদিদ্রব্যং গুলিকাশব্দেনোচ্যতে।

পদার্থ :—একজন লোকের যদি "ব" সংখ্যক গুলিকা এবং অপর লোকের যদি "র" সংখ্যক গুলিকা থাকে, এবং প্রথমের রূপকমান যদি "ল" এবং দ্বিতীয়ের রূপকমান যদি "ব" হয়, আর উভয়ের অর্থকৃত যদি সমান হয়, তাহা হইলে—

ব গুলিকা + ল = র গুলিকা + ব = প্রত্যেকের অর্থকৃত,
অতএব (ব − র) গুলিকা = ব − ল

অতএব একটী গুলিকার মূল্য = $\frac{ব-ল}{ব-র}$।

"ল" যদি "র" অপেক্ষা বড় হয়, "ব" "ল" অপেক্ষা বড় হইবে ; কারণ তাহা না হইলে উভয়ের অর্থকৃত সমান হইতে পারে না। অতএব (ব − ল)ই রূপকের বিশেষ। (ব − র) = গুলিকার অন্তর। (ব − ল)কে (ব − র) দিয়া ভাগ করিয়া এক একটী গুলিকার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ইহাই আর্য্যভটের সূত্রটীর বক্তব্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটী সরল সমীকরণের মীমাংসা মাত্র।

[উদাহরণ—

সমধনয়ো রূপকাণ্যপি যতঃ ধনিনঃ ক্রমাদ্দদতঃ।
গণয়ত্ শীঘ্রং বণিজৌ তত্র মমূল্যাং কিয়ং।

প্রথমের রূপকমান = ১০০, দ্বিতীয়ের রূপকমান = ৬০ ;
" গুলিকাবাদ্যোমান = ৬, " গুলিকাবাদ্যোমান = ৮ ;

∴ একৈকগোমূল্য = $\frac{১০০-৬০}{৮-৬} = \frac{৪০}{২} = ৩০$;

এবং প্রত্যেকের অর্থকৃত = ১২০ ।

ক্রমশঃ

শ্রীনগেন্দ্রকুমার বসু বিদ্যারত্ন এম,এ

কবিবর নবীনচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভায় প্রেমের বিকাশ

কবির হৃদয়ের দর্পণ তাঁহার গ্রন্থ সমূহ। যদি কেহ কবির অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশের সংবাদ জানিতে অভিলাষ করেন তবে তাঁহাকে কবির গ্রন্থাবলী একবার অনুসন্ধিৎসার চক্ষে অধ্যয়ন করিতে হইবে। যে লেখক যে প্রকৃতি বিশিষ্ট শত চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারিবেন না; নিবিড়তম কুহেলিকা ভেদ করিয়া তাহা তাঁহার লিখিত পুস্তকে ফুটিয়া উঠিবে; ইহা ধ্রুব সত্য। যদি কেহ কবির ভাবের সঙ্গে তাঁহার কাব্যের ভাবের অমিল দেখিতে পান তবে বুঝিতে হইবে যে, কবির হৃদয়ের ঠিক ভাব বাহিরে অপ্রকাশিত অথবা কবি তাঁহার নিজভাবের উল্টাভাব জোর করিয়া ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লেখার প্রাণ নাই—এ লেখায় পাঠকের মনে কোন ছাপ পড়ে না।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের নাম বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞ কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। আজ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার হৃদয়ের একটী ভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পাঠক দেখিবেন যে, তাঁহার গ্রন্থসমূহের ক্রম-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবটীও কেবল ক্রমবিকাশ হইয়াছে! সে ভাবটী—তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি।

প্রীতি বা ভালবাসা নাই এমন হৃদয় এই পৃথিবীতে মিলে না। প্রেমশূন্যের সৃষ্টি এখন হইতেই পারে না। কবিও সে সৃষ্টির বাহিরে নন; বরং তাঁহার লহরীলীলা কবির হৃদয়েই খেলে বেশী। এই প্রীতি ক্রমে বিকশিত হইতে হইতে লোক ভগবানের কোলে আশ্রয় লাভ করে। সে ক্রমবিকাশ কেমন তাহা কবি সুভদ্রার মুখে বলিয়াছেন। বিবাহের পর নারীর প্রেম :—

"পতিতে প্রথম, অপত্যেতে পরে,
পরে পরিজনে শতেক মুখে,
শেষে সীমা ছাড়ি, ঢালি প্রেম-বারি
অনন্ত প্রাণীর অনন্ত বুকে।"

[রৈবতক, দশম সর্গ]।

একের প্রতি প্রীতি, ক্রমে দুই, তিন, চারি ক্রমে যখন "অনন্ত প্রাণীর অনন্ত বুকে" ছড়াইয়া পড়ে, তখন সে আপনাকে অনন্তের মাঝে হারাইয়া ফেলে; নিজের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। তখনই তাহার প্রেম-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি!

ক্ষুদ্র শিশু প্রথমেই সমগ্র জগৎ একবারে চিনিতে সক্ষম হয় না। প্রথমে চিনে সে মাকে; তারপর বাবা, দাদা, কাকা, পিসী, বেটী, খুড়ি, প্রভৃতি পরিজনদিগকে তারপর প্রতিবাসী, গ্রামবাসী, স্বদেশবাসী, ক্রমে বিশ্ববাসীর প্রাণে আপনার প্রাণ মিলাইয়া দিতে চায়। নবীনচন্দ্রের কাব্যে প্রীতির ক্রমবিকাশও এইরূপে। আমরা ক্রমে নীচের স্তর হইতে আরম্ভ করিব।

নবীনচন্দ্রের "অবকাশ রঞ্জিনী," "পলাশীর যুদ্ধ," "রঙ্গমতী" এবং "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাসে" আমরা প্রধানতঃ তাঁহার প্রেমের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই। "অবকাশ রঞ্জিনী" কতকগুলি গীতিকাব্যের সমষ্টি। ইহাতে অন্যান্য কবিতার সঙ্গে প্রীতিমূলক কবিতাও কতক-গুলি আছে। সে কবিতাগুলি পরিজন-প্রীতি ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচায়ক কিন্তু এইগুলি বিক্ষিপ্ত বলিয়া ইহা হইতে তাঁহার প্রীতির কোন পরিচয় দাঁড় করান যায় না। কাজেই দুই এক কথায় এই কবিতাগুলির প্রসঙ্গ শেষ করিব।

পুস্তকে প্রথম সন্নিবিষ্ট কবিতা "পিতৃহীন-যুবক।" যুবক পিতাকে হারাইয়া সংসার মরুভূমি-তুল্য দেখিতেছেন, বলিতেছেন—

"নাহি কাজ এজীবনে পুনঃ এসংসারে
পশিব না, ত্রিদিবদা অর্থ অন্বেষণে ;—
ভাজিয়া আহার নিদ্রা, ভাসি নেত্রনীরে,
পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, নগরে, প্রান্তরে।"

[অবকাশরঞ্জিনী ; পিতৃহীন-যুবক।]

পিতার প্রতি কি গভীর প্রীতি! এ যুবক আর কেহই নহেন—আমাদের কবিই স্বয়ং। এই পিতৃ-প্রীতি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আত্মীয় বন্ধুদের প্রতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতেই "প্রীতি উপহার," "চিরস্মৃতি সুহৃদ" প্রভৃতি কবিতাগুলির উদ্ভব।

এই প্রীতি ক্রমে নিজদেশ—চট্টগ্রামের উপর ছড়াইয়া পড়িল। তাহারই ফলে "চট্টগ্রামের সৌভাগ্য" প্রভৃতি কবিতার আবির্ভাব। তারপর এই প্রীতি কেবল নিজ দেশের ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ থাকিতে চাহিল না ; সে আরও বিস্তৃত স্থান চাহিল। এই সময়ে তাঁহার লেখনী হইতে "আমার সঙ্গীত," "ভারত উচ্ছ্বাস" প্রভৃতি জাতীয় কবিতা বাহির হইয়াছিল। ইহারই অমৃতময় ফল—"পলাশীর যুদ্ধ।"

আমাদের দেশে কাহারও কাহারও এই ধারণা আছে, যে জাতীয় কবিতা মাত্রই রাজ-বিদ্রোহ পূর্ণ।

"পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যে নবীনচন্দ্রের স্বদেশ প্রীতির উচ্ছ্বাস পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাই। কবি বাংলার দুঃখে সত্য সত্যই কাঁদিতেন ; তাই জগৎ শেঠের মুখে বলিয়াছেন

"সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির-পরাধীন ?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদ তলে
কেড়ে লয় সিংহাসন ! করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপর ?
স্বর্গ মর্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত।"

[পলাশীর যুদ্ধ ; ১ম সর্গ।]

তারপর রাণী-ভবানীর মুখে বলিতেছেন—

"পর-দুঃখে সদা যার হৃদয় বিদরে
নহি কিসে দুঃখি-দুঃখ ?"

[পলাশীর যুদ্ধ ; ১ম সর্গ।]

যে প্রীতির টানে মোহন লাল রণ-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া "দাঁড়াবে দাঁড়াবে ফিরে" বলিয়া পলায়িত বীর সৈন্যদিগকে যুদ্ধার্থে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, "নবাবের অন্নমতি কাল-হবে রণ" শুনিয়াও যে প্রেমের টানে প্রভু-ভক্ত বীর প্রভুর আদেশ অগ্রাহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সে প্রেম পলাশীর যুদ্ধ রচনা-কালে নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে তর তর বেগে বহিয়াছিল। নহিলে স্বদেশ প্রেমিক মোহনলালের চিত্র এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিত না—এমন জলন্ত-ভাবে দেখিতাম না।

কত আর বলিব ? নবীনচন্দ্রের স্বদেশ প্রীতির দীপ্ত জ্যোতিতে "পলাশীর যুদ্ধের" প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠা উজ্জ্বল। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধেও নবীনচন্দ্রের স্বদেশ প্রীতি অবলম্বন শূন্য হইয়া কেন্দ্রহীন হইয়া শুধু ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এই কাব্যের কোন নায়ক-নায়িকাই তাঁহার স্বদেশ প্রীতির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। মোহনলাল স্বদেশ প্রেমিক বটে, কিন্তু তিনি রাজার আজ্ঞাধীন কর্ম্মচারী মাত্র—তাঁহার ব্যক্তিত্ব বাহ্যত কিছুই নাই, তাই শুধু তিনি যুদ্ধে আহত হইয়া কাঁদিয়াই গেলেন। প্রেমে একসর্গে মাত্র পাঠক তাঁহার দেখা পান। এইরূপে কেন্দ্রচ্যুত হইয়া কবির স্বদেশপ্রীতি কেবল কাঁদিয়াই বেড়াইয়াছে। বাঙ্গে বাঙ্গে হুতাশ হুতাশ দিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে।

"রঙ্গমতী" বীরেন্দ্রবিনোদে কবির স্বদেশ প্রীতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। বীরেন্দ্রবিনোদে বাঙ্গালী যুবক—নানা ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া মোগলসৈন্য সহ বীরবর শিবাজীর হস্তে বন্দী হন। শিবাজীর উদ্ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের দুর্দ্দশা মোচনে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া তিনি দেশে ফিরিলেন এবং তাহাতেই প্রাণপাত করিলেন।

রঙ্গমতী নবীনচন্দ্রের স্বদেশ প্রীতির আধার, আবার ইহাতেই কবির ভগবৎ প্রীতির অঙ্কুরের উন্মেষ দেখিতে পাই। মহাশক্তির নিকট বীরেন্দ্রবিনোদের প্রার্থনা ইহারই পরিচায়ক। ইহারই পরিণত ফল—নবীন কাব্য কাননের অমৃতময় ফল—"রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস"। এই গ্রন্থত্রয়ে ভগবৎ প্রীতি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এ প্রেমে চঞ্চলতা নাই—আবিলতা

নাই—স্থির, শান্ত, নিত্য! এখানে এখানে মূর্ত্তিমতী—সুভদ্রা ও সৈরন্ধ্রী।

সুভদ্রা বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের নিজ হাতে গড়া প্রীতির পুতুল। ছোট বয়স হইতেই তিনি বিশ্ব প্রকৃতির সাধিকা। প্রকৃতির প্রেমে ডুবিয়া—ঝড়ের দিনে—একদিন—

"সায়াহ্নগগনতলে ঘোর ঘটিকায়,
দশম বর্ষীয়া ভদ্রা বসি একাকিনী
একটী উপল খণ্ডে স্থির দুনয়নে
সতৃষ্ণ পশ্চিমাকাশে রয়েছে চাহিয়া।"

[রৈবতক : দ্বিতীয় সর্গ।]

ভদ্রার হৃদয়ের প্রীতি কেবল প্রকৃতিকে ভালবাসিয়াই ক্ষান্ত নয়। শত্রু মিত্র ভুলিয়া—মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভেদ না করিয়া এ প্রেম তিনি সকলকেই বিতরণ করিয়াছেন। বালিকা ভদ্রা রৈবতকে একদিন একটা মৃতপ্রায় পক্ষীকে তুলিয়া লইয়া জলদানে তাহাকে সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় সহচরী সুলোচনা আসিয়া সেখানে উপস্থিত। তিনি বলিলেন, যে একটা পাখীর জন্য আবার এত কেন? থাকনা ওটা ওখানে পড়িয়া। তদুত্তরে ভদ্রা বলিলেন—

"সমস্ত জগতে
এক মহা প্রাণ, একই প্রাণী।
• • • •
সেই মহাপ্রাণ
তোমার, আমার, জগতময়।
পশুতে, বিহগে, পাদপে, লতায়,
এক মহাপ্রাণ—দ্বিতীয় নয়।"

[রৈবতক : দশম সর্গ।]

তারপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভদ্রা প্রতিদিবসে রণক্ষেত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বপক্ষ বিপক্ষ—সমস্ত আহত সৈন্যদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন—নিজের দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই। সেবাময়ী সুলোচনা ভদ্রার শরীর দিন দিন দুর্বল হইয়া যাইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল; তাহার অনেক অনুরোধেও যখন ভদ্রা বিরত হইলেন না তখন সে বলিল, যে এরূপে দেহপাতে সুখ কি? আর যদি একান্তই করিতে হয় তবে না হয় স্বপক্ষ সৈনিকদের সেবা কর—শত্রুদের কেন? ভদ্রা বলিলেন—

"সুতোধিক রমণীর আছে কিবা সুখ!
রোগে শান্তি, দুঃখে স্নেহ, শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া,
দিদি! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ!
যেমতি অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ,
সৃজি সেইরূপে দিদি! রোগ, শোক, দুঃখ,
সৃজিলা অনন্ত-প্রেম-পূর্ণ নারী বুক।"

আর তুমি শত্রুকে কেন সেবা করিতেছি জিজ্ঞাসা করিতেছ?—

"শত্রু!—শত্রু কি মানুষ নহে লো আমার মত?
রক্ত মাংস নাহি কি তাহার?
তোমার আমার প্রাণ নহে কি শত্রুর প্রাণ?
এক জল, ভিন্ন জলাধার।
• • • •
শত্রু!—এক ভগবান্ সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়!
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, কেবা মিত্র?
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়?"

[কুরুক্ষেত্র : তৃতীয় সর্গ।]

এই, যে সকল একেরই বিকাশ, ইহাই বিশ্বপ্রেম। এ প্রেম যখন হয় তখন আর আত্মপর জ্ঞান থাকে না। পুণ্যবান্, পাপী উভয়েই তখন তাঁহার কাছে সম আদর পায়। পুণ্যবান্‌কে সকলেই ভাল বাসে, পাপীকে কেহ ভাল বাসে না, তাই তিনি বিশ্বপ্রেমিক, তাঁহার পাপীর প্রতি করুণা অধিক। তাই সুভদ্রা বলিলেন—

"কেই জন পুণ্যবান্, কেনা তারে বাসে ভাল?
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর?
পাপীরে যে বাসে ভাল, আমি ভালবাসি তারে,
সেই জন প্রেম অবতার।"

[কুরুক্ষেত্র : তৃতীয় সর্গ।]

এভাব অবতারদের মধ্যে বেশ দেখা যায়। পাপীদের প্রতিই তাঁহাদের করুণা বেশী দেখাইয়া থাকেন—নইলে তাদের গতি কই? তাই ভগবানের আর এক নাম—"পাতকী—তারণ!"

তারপর শৈলজার কথা বলি। স্বভদ্রা বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের হাতে গড়া—বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা। কিন্তু অশিক্ষিতা বালিকা শৈলজার এ সব সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। কাজেই এইপ্রেম লাভ করিবার জন্য অনেক দিন তাঁহাকে সাধনা করিতে হইয়াছিল। শৈলজা প্রথমে অর্জুনের প্রাণবিনাশের উপায় উদ্ভাবনের জন্য বালকবেশে বাসুকী কর্তৃক প্রেরিতা হন এবং ক্রমে অর্জুনের প্রতি মুগ্ধ হইয়া পড়েন। পরে অর্জুনকে পতিরূপে পাইবেন না জানিতে পারিয়া মনে অর্জুনের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিশ্বপ্রেমের সাধনায় নিযুক্ত হইলেন এবং অবশেষে তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইল—শৈল বিশ্ব-মাঝে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

প্রীতি যখন তাহার ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া পড়ে, তখনই এই অবস্থা হয়। ইহা সাধনা সাপেক্ষ। শৈলজাকেও এজন্য চতুর্দ্দশ বৎসর সাধনা করিতে হইয়াছিল। অর্জুনের প্রতি শৈলর পতিরূপে ভালবাসা বিস্তৃত হইতে হইতে বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িল।

তখন

"এই চরাচর
হইল অর্জ্জুন-ময়, হইয়া তন্ময়।
কভু পার্থ পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা,
কভু পার্থ পিতা আমি ভক্তিতে অধীরা।
কভু পার্থ ভ্রাতা, আমি স্নেহে-নিমজ্জিতা,
কভু পুত্র পার্থ, আমি বাৎসল্যে পুরিতা।
কভু পার্থ সখা, আমি সখী বিনোদিনী,
কভু পার্থ প্রভু, আমি দাসী আজ্ঞাধিনী।
কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার,
অভিন্ন হৃদয় কভু—নদী পারাবার।"

[কুরুক্ষেত্র ; ত্রয়োদশ সর্গ]।

কি সুন্দর!

যিনি এমন সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার হৃদয়ে যে ইহার একটি তরঙ্গও খেলে নাই এমন হইতেই পারে না। কবি তাঁহার আত্ম-জীবনচরিতে লিখিয়াছেন, যে এই সময় তাঁহাকে যে কে লেখাইয়া যাইত তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেন না। অনেক সময় নিজের লেখা পড়িয়া তিনি নিজেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিতে তাঁহার অসম্মতি বোধ হইত; সময়ে সময়ে তাঁহার চক্ষু হইতে বিনা কারণে বারিধারা পাত হইত। এমন করিয়া লেখা না হইলে বুঝি উহা এত জীবন্ত হইত না—লোকের হৃদয় এমন ভাবে স্পর্শ করিত না।

কবি কাব্যশেষে শৈলজাকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজের অবস্থাও কিছু কিছু আছে—

"যাও মা মানবী-দেবি! পূর্ণব্রত মা! তোমার!
যাও মা করুণাময়ি! পূর্ণব্রত মা! আমার!
চতুর্দ্দশ বর্ষ যাগো! এরূপে বসিয়া ধ্যানে,
দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা, এরূপে বিমুগ্ধ প্রাণে।
পাইয়াছি শোকে শান্তি; পাইয়াছি দুঃখে সুখ;
প্রেমে ভরিয়াছে নেত্র; প্রেমে ভরিয়াছে বুক।"

[প্রভাস ; শেষ সর্গ]।

এখে কবির হৃদয়ের বাণী কাব্যে মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছে। এই যে প্রেম—

"এই প্রেম মানবের স্বর্গের সোপান,
এই প্রেমে স্বর্গে অবতীর্ণ ভগবান্।"

[কুরুক্ষেত্র ; ত্রয়োদশ সর্গ]।

আমাদের মনে হয় ভগবান্ কবির প্রেমের আহ্বানে তাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বপ্রেমের প্রবাহ চালিয়া দিয়াছিলেন। তাই কবির লেখনী মুখে "রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস" রূপে বিগলিত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

---

* শৈলজা—বাসুকীর পুত্রবধূ ভগিনী। মহাভারতে ইহার কথা পাওয়া যায় না। ইনি নবীনবাবুর একটি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।

হিন্দুর সমাজগঠনরীতি

আত্মজীবনে হিন্দু কখনও একটা পূর্ণ বস্তুস্বরূপ একেশ্বরবাদীকে প্রশ্রয় দেয় নাই। হিন্দুর একেশ্বরবাদ বহুকে আপন করিয়া লইতে, বহুকে আশ্রয় করিয়া। সৃষ্টির বিচিত্র খণ্ড-রূপে মানব ও সমাজজীবনের বিচিত্র সম্বন্ধে সেই একেরই প্রকাশ হিন্দু অনুভব করিয়াছে। সমাজজীবনেও তেমনি হিন্দু একমাত্র সর্বেশ্বরী সর্বসমূহ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে নাই। নানা বিচিত্র আঞ্চলিক সমূহের স্বাধীনতা-গৌরব হিন্দুসমাজে অনুন্ন আছে। হিন্দুর সমূহতন্ত্র ও সমাজসংগঠনে সেই এক রীতিই প্রতিষ্ঠিত, একই অন্তর্জীবনে বেদান্তবাদে, বৈষ্ণব বা তান্ত্রিক লীলাতত্ত্বে প্রকৃতির বা মানবজীবনের বিচিত্র খেলায় সেই একেরই লীলা দেখাইয়াছে। হিন্দু ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়াছে বলিয়াই সে রূপে রূপেও ভগবানকে দেখিয়াছে। তথাকথিত একেশ্বরবাদীর ভগবান বলিয়া যে ভগবানের অনন্ত রূপও দেখিতে পায় না, শত রূপও পায় না। ভারতের "বহুত্বে" সেই অদ্বৈতবাদী হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থায় বহুসমূহের সৃষ্টি ও বিকাশে দেখা দিয়াছে। অধ্যাত্ম-জীবনে যেমন হিন্দু বহুরূপ হইতে বিচিত্র সাধনমার্গের দ্বারা অনন্ত বিশ্বরূপ পরমাত্মাকে পাইবার, দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছে, তেমনি সমাজ-জীবনেও বিচিত্র সমূহের ভিতর দিয়া আপনার ব্যক্তিত্বের এক একটি দিক ফুটাইয়া তুলিতে তুলিতে সে বিশ্বজীবন-উপলব্ধির সাধনা।

বিশ্বজীবনের জ্ঞান ব্যক্তির নিকট সহজে [illegible] দিবার জন্য, ব্যক্তির সহিত বিশ্বের [illegible] স্থাপনের জন্য হিন্দুসমাজ পরিবার, জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী, পেশা প্রভৃতি মধ্যবর্তী সমূহ বা আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছে। সমূহের সমবায়ে সমাজ-জীবনের পূর্ণবিকাশ ও ব্যক্তিত্বের উচ্চ উন্নতি। ব্যক্তি সমাজের এক একটী সমূহের ভিতর দিয়া আপনার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। সমাজের নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমূহের সভ্য হইয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করিতে করিতে শেষে বিশ্বজীবনে মুক্তির আস্বাদ লাভ করে। আজকাল একটা অলীক বস্তুস্বরূপ বিশ্বজনীনতার পূজা কেহ কেহ তুলিতেছেন। তাহারা ব্যক্তি ও বিশ্বমানব হইতে বড়ো কোন প্রতিষ্ঠান বা সমাজ-বন্ধনের স্থান দেন না। বিশ্ব-মানবতা একটা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক জিনিষ, তাহার সহিত পরিবার, সমাজ, জাতি ও সমূহবিহীন ব্যক্তির সম্বন্ধ অলীক। জ্ঞান ও কর্মের পরিবার, শ্রেণী, জাতি ও সমাজের সেবাতেই বিশ্বজীবনের জ্ঞান ক্রমবিকাশ লাভ করে। নচেৎ তাহা অলীক, বস্তুস্বরূপ।

জাতীয়তার একটা বিষম আদর্শ আছে জানি। তাহার নাম jingoism, imperialism। কিন্তু যাহা ইউরোপের বিষাদ সমরক্ষেত্রে প্রলয়ঙ্করী মহাকালীর সম্বরণে কালদর্প হইয়া বসাবসে ফুঁসাইয়া দিয়া বিশ্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত, তাহাই মহাদেবের ধ্যানচক্ষে সুন্দর বহ্নী। বিশ্ব সভ্যতার মহাকাশে আবৃত করিয়া জাতীয়তা সাহিত্য ধর্ম, আর্ট, সমাজের আদর্শের রক্ত বা ভূষণ সুসজ্জিত করিয়া শিব ও সুন্দরকে জ্ঞান ও কর্মের সম্বলে নিত্য বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমাদের এই জাতীয়তার এই সত্য ও বাস্তব আদর্শ আমাদের যেন কিছুতেই ভুল না হয়। তাহা যেন একই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সমর্থ করিয়া তুলিয়া ও সমূহের সঙ্গে বিশ্বজীবনের জ্ঞান ও কর্মের যোগ সহজ হয়।

শ্রীদেবকীনন্দন প্রেসে মুদ্রিত

সচিত্র শ্রীমদ্ভাগবত চইতে গৃহীত

উপাসনা

১৪ বর্ষ। | আশ্বিন—১৩২৫ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আলোচনী

দরিদ্রের আহ্বান *

বাংলা দেশের দারিদ্র্যের কথা কাহাকেও আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভদ্র, অভদ্র, মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবি, সকলেই ত আমরা এখন তাহা অনুভব করিতেছি। পরমুখাপেক্ষী দেশ, বিদেশী বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিয়া ভাবিতেছিল সে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, দুই একটা দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবনের সময় তাহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকিলেও সে তবুও আপনার মনকে বুঝাইয়াছে তাহার সুসময়ে কোন অভাব নাই। কিন্তু আজ তাহার শিল্প বিনষ্টপ্রায়, তাহার মাঠের শস্য তাহার সকল অভাব মোচনে অসমর্থ, বিদেশীকরায়ত্ত বাণিজ্যে আজ আর অধিক স্বার্থলাভ নাই, বিবশ হইয়া সে ভাবিতেছে সে কি আপনারি দুষ্কৃতির ফলে আপনার মুণ্ডপাত করে নাই।

বিদেশী শিল্পকারখানার ও এখন যুদ্ধের সময় প্রতিযোগিতা খুব কমই আছে। এখনও কি নষ্টশিল্পের উদ্ধার হয় না?

অনেকের বিশ্বাস ইউরোপ বড় বড় কারখানা ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াই বৈষয়িক উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ইউরোপে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বড় বড় কারখানার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সক্ষম হইয়াও এখনও যে উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা অনেকের ধারণা নাই। জর্ম্মাণীতে ১৪·৩ ক্রোর শ্রমজীবিদের মধ্যে ৫·৪ ক্রোর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। ইংলণ্ডে বড় বড় কারখানা, যেখানে ১০০০এর অধিক লোক কাজ করে, সেখানকার শ্রমজীবিদের সংখ্যা, ছোট ব্যবসায়ে যে সকল লোক কাজ করে, তাহাদের সংখ্যার সমান। ইতালি, বেলজিয়াম, সুইজারলণ্ড প্রভৃতি দেশে কুটিরশিল্প এখনও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। সুতরাং বড় কারখানা বা ফ্যাক্টরীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষুদ্র ব্যবসায় অথবা কুটিরশিল্প যে সমূলে বিনষ্ট হইতেছে তাহা পাশ্চাত্য বৈষয়িক জীবন হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। বস্তুতঃ

* টাঙ্গাইল সামাজিক হিতসাধন-প্রদর্শনী উপলক্ষে।

পাশ্চাত্য জগতে একদিকে কল হস্তগত হইলে যেরূপ সমাজের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা, সেইরূপ কুটিরশিল্পগুলিরও তাহাদের প্রভাব বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

আমাদের দেশে পল্লীগ্রামসমূহে কুটিরশিল্পগুলি যে একবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। দ্রব্যোৎপাদনে কলের শক্তি অধিক স্থলে বিশেষ সুবিধা প্রদান করিলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে শিল্পীকে কলকারখানার নিকট হার মানিতে হইবে তাহা নহে। যে ক্ষেত্রে একই প্রকার দ্রব্য অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইবে, সেখানে মনুষ্য শক্তি তড়িত অথবা তীম এঞ্জিনের শক্তির নিকট হার মানিবে। কিন্তু যেখানে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়, সেখানে শিল্পীর কর্মকুশলতাকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। দ্রব্য ক্রয়ব্যাপারে যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রুচি প্রকটিত হয়, সে-ক্ষেত্রে দ্রব্যোৎপাদনে শিল্পীর বিদ্যা ও চাতুরী কলের শক্তি অপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইবে। বাস্তবিক আমাদের দেশে যতদিন রুচির বৈচিত্র্য আছে, ততদিন শিল্পীর ব্যবসা কখনও বন্ধ হইবে না। উপরন্তু পল্লীগ্রামে মূলধন খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় এবং কষ্টস্থিতি অধিক হয় না; সুতরাং ক্ষুদ্র কারখানার যেরূপ বিরাট আয়োজন, অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবসায়েরও সেরূপ বিপুল বিস্তৃতি।

আধুনিককালে কুটিরশিল্পসমূহ যে কারখানার প্রতিযোগিতায় নিশ্চয়ই সমূলে বিনষ্ট হইবে, পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা বোধ হয় না। কিন্তু যদি উপায়ে কুটিরশিল্পগুলির উন্নতি সাধন না করিতে পারিলে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখা সুকঠিন। পাশ্চাত্যজগৎ অনেক উপায়ে কুটিরশিল্পগুলির উন্নতি সাধন করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নূতন নূতন যন্ত্রপাতী ও প্রক্রিয়ার প্রচলন প্রভৃতি কারণে শিল্পগুলি নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। পুরাতন গৃহ-শিল্প-সমূহের মধ্যে যেগুলি নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিতেছে না সেগুলির ক্রমাবনতি হইতেছে কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অনেক গৃহশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন ব্যতীত আর এক উপায়ে পাশ্চাত্য জগতের গৃহ-শিল্পগুলি নবজীবন লাভ করিয়াছে,—তাহার নাম "সমবায়"।

রাইফেইসেন কৃষিকার্য্যে সমবায় প্রচলন করিয়া পাশ্চাত্য কৃষকসমাজে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন। হারমনস্ ডেলিটস্ শিল্প এবং শ্রমজীবিগণের মধ্যে যৌথকারবার প্রচলন করিয়া সেইরূপ আর একটী আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। শিল্পিগণের মধ্যে সমবায়ের উদ্দেশ্য মোটামুটি এই,—শিল্পিগণ মূলধন অভাবে পাইকার অথবা ধনীর নিকট দ্রব্য প্রস্তুতকরণের উপকরণ সামগ্রী লইতে বাধ্য হয়। অবশেষে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাইকা অথবা ধনীকে উহা যোগান করে এবং তাহাদের নিকট মজুরী পাইয়া থাকে। অনেক সময়ে ধনী ও পাইকার শিল্পীকে অত্যল্প মজুরী দিয়া দ্রব্যের অধিকাংশই আত্মসাৎ শিল্পিগণের মূলধন নাই বলিয়াই তাহাদের দারিদ্র্যের সীমা থাকে না। এ স্থলে যদি কয়েকজন শিল্পী সমবেত হইয়া মূলধন সংগ্রহ করে এবং ঐ মূলধনে উপকরণ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং অবশেষে নিজেরাই দ্রব্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহা হইলে দ্রব্যোৎপাদনের ন্যায্য লাভ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইতে পারে না। ইহাকেই শিল্পে সমবায়ের পদ্ধতি বলা হয়। শিল্পে সমবায় এদেশে নূতন নহে। আমাদের সমাজে অনেক স্থলেই সমবেতভাবে শিল্প-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কাশীর বিখ্যাত বারাণসী সাড়ী প্রভৃতি সমবেত প্রণালীতেই প্রস্তুত হয়। তন্তুবায়গণ সম্মিলিত হইয়া রেশম ইত্যাদি ক্রয় করে এবং সূত্র বয়ন করিয়া অবশেষে তাহাদিগেরই নিযুক্ত পাইকার দ্বারা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। কাশীর মদনপুরা পল্লীতে যাইয়া অনেকে ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পশ্চিম অঞ্চলে গড়ণ্মেণ্ট তন্তুবায়, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতির মধ্যে অনেক সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেগুলিরও বিশেষ উন্নতি হইতে দেখা গিয়াছে।

পল্লীগ্রামের অসংখ্য শিল্পী এবং শ্রমজীবিগণকে যদি কঠোর দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই এই সমবায়-পদ্ধতির প্রচলন আবশ্যক। সমবায় পদ্ধতি যাহাতে দেশময় প্রচলিত হয় তাহার জন্য প্রচার

আবশ্যক। মধ্যবিত্তশ্রেণীরই এই প্রচার-কার্য্য করিতে হইবে। উপরন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর পক্ষে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের সহায় হইবে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দেশে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাপ্রচারক, স্বাস্থ্যপ্রচারক দেখা দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের দুঃখ দৈন্য ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য তাঁহারা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। শিক্ষাপ্রচারক এবং স্বাস্থ্য-প্রচারকের মত পরিশ্রমব্রত শিল্প ও ব্যবসায় প্রচারকও এখন দেশে আবশ্যক। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া যেখানে শিল্পীরা তাহাদের বিরল কুটীরে বসিয়া সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে, সেখানে যাইয়া তাহাদের নিকট আশার কথা প্রচার করিতে হইবে। জগতের বিভিন্ন স্থানে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেখানকার শিল্পিগণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে; জার্ম্মাণী, ইতালী; হল্যাণ্ড এবং জাপান প্রভৃতি দেশের শিল্প, জগতের বিচিত্র খবর আমাদের শিল্পিগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। আমাদের শিল্পিগণকে জানাইতে হইবে যে তাহাদেরই মত কুটীরে বসিয়া এই সমস্ত দেশের শিল্পিগণ নানাবিধ যন্ত্রাদির সাহায্যে এবং নূতন নূতন প্রক্রিয়া দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করিতেছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-পাতি হার এবং প্রক্রিয়া-প্রকরণ যাহাতে সহজসাধ্য হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলকারখানায় জর্জ্জরিত শিল্পিগণের নিকট সমবায়-পদ্ধতির উপকারিতা বুঝাইয়া তাহাদের অন্তরে নূতন আশার সঞ্চার করিতে হইবে। সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া জার্ম্মাণী, বেলজিয়ম, ইতালী প্রভৃতি দেশের শিল্পিগণ তাহাদের অবস্থার কি বিপুল উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা বুঝাইয়া যৌথ যন্ত্র-ক্রয়-সমিতি এবং দ্রব্য-ভাণ্ডারের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় শিল্পশিক্ষার এই বিপুল আন্দোলনের নেতা হইবেন। শিল্পপ্রচার কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নূতন নূতন স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উপায় আবিষ্কার করিবেন। এই উপায়ে একই সঙ্গে শিল্পপ্রচার এবং স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে।

এই সমবায় প্রবৃত্তি ও আত্মনির্ভরতাকে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় চালিত করিতে হইবে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে পশু-পালনভিত্তিতে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিতে হইবে। যৌথঋণ-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া গো-মহিষাদি পশু, এবং উপযুক্ত কৃষিযন্ত্র, সার এবং বীজ-শস্যের সংগ্রহ এবং ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যৌথ-বিক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া গ্রামের উৎপন্ন শস্যসমূহ ন্যায্য দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামে শস্যগোলা স্থাপন করিয়া কৃষকগণকে সাময়িক ভরণ পোষণের নিমিত্ত অল্প সুদে শস্য ঋণ দিতে হইবে। বিদেশী মহাজনকে শস্য ঋণদান, শস্যক্রয় এবং শস্যরপ্তানি ইত্যাদি ব্যবসায়ে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে না দিয়া, গ্রাম্য সভার দ্বারাই গ্রাম্য শস্যের আদান-প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অপরিমিত পরিমাণে শস্যরপ্তানি বন্ধ করিয়া যাহাতে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীভাণ্ডার স্থাপন করিয়া কৃষিজীবিগণের জন্য বস্ত্র, তৈল, লবণ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী সাইকারী দরে বিক্রয় করিবার সুবিধা সৃষ্টি করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করিয়া বন্ধক ইত্যাদি সম্বন্ধে গো-মহিষাদির জীবন বীমা করিতে হইবে, উৎকৃষ্ট বৃষ ক্রয় করিয়া আনিয়া গোবংশের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শিল্পজীবিগণের জন্য যৌথ-ঋণদান-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া শিল্পকর্ম্মের উপযুক্ত যন্ত্র ও উপকরণ সাইকারী দরে ক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিক্রয় মণ্ডলী স্থাপন করিয়া শিল্পিগণের প্রস্তুত দ্রব্য যথামূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে: তন্তুবায়-গণের জন্য তন্তুবায়মণ্ডলী স্থাপন করিয়া সূতা, রেশম, রং এবং শিল্পকার্য্যের অন্যবিধ সামগ্রী সাইকারী দরে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্ত্রবয়নের পর তন্তুবায়-গণের যাহাতে বস্ত্র-বিক্রয়ের কোন অসুবিধা না হয় তাহার জন্য বিক্রয়সমিতি গঠন করিয়া উহার উপর স্থানান্তরে বস্ত্র বিক্রয়ের ভার ন্যস্ত করিতে হইবে। সূত্রধরগণের জন্য মণ্ডলী স্থাপন করিয়া বড় বড় গাছ চিরিবার জন্য উপযুক্ত চেরিল এবং করাত বিতরণ করিতে হইবে। গ্রামের কাষ্ঠকারগণকে

দিকারীদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যৌথ-সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ দুগ্ধ এবং মাখন প্রস্তুত করিবার জন্য সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ গরুর দুগ্ধ সমিতির কার-খানায় আনিয়া কারখানায় বসে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ঘৃত মাখন প্রস্তুত করাইয়া লইবে। পল্লী-সমিতি স্থাপন করিয়া গ্রামে কয়েকটী ইক্ষু-পেষণ-যন্ত্র, ধান এবং দালডাঙ্গার যন্ত্র, আখ, কাঁঠাল কুল, পেয়ারা প্রভৃতি ফল এবং বনের বন্য হইতে বিবিধ প্রকার আচার এবং মোরব্বা প্রস্তুত-করণ যন্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। এ সমস্ত যন্ত্রাদি গ্রামবাসিগণের যৌথ-সম্পত্তি, সুতরাং সকলেরই ব্যবহার্য্য হইবে। গ্রামকে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বাস্থ্যসমিতি গঠন করিতে হইবে। সমবেত সমিতি গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে কূপ খনন, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, খাল কাটিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য জল-সরবরাহ, বন-জঙ্গল পরিষ্কার, ব্যয়সাধ্য ঔষধালয় স্থাপন, অবৈতনিক কৃষিবিদ্যালয় এবং শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিবসন-সমস্যা আজকালকার সব চেয়ে কঠিন সমস্যা। পৃথিবীর মধ্যে এই দেশে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত এবং এই কার্পাস হইতে তৈয়ারী চরকার কাটা সূতার পৃথি-বীর সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মবস্ত্রও এই সেদিন পর্য্যন্ত তৈয়ারী হইয়া-ছিল। বিলাতী সূতা ও কাপড়ের আমদানীতে আজকাল কার্পাস আবাদ উঠিয়া গিয়াছে, এবং যে চরকায় সৌদামিনী গ্রামে হাতী বাঁধিতে পারার কল্পনা হইয়াছিল—সে চরকা আজ বাঙ্গালীর ঘরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কার্পাসাবাদ পুনরায় প্রচলিত করিতে হইবে। আবার চরকায় সূতা কাটিতে হইবে। উন্নত প্রণালীর চরকাও উদ্ভাবিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামের গ্রাম্যসমাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সময় আমি যে সব পল্লীগ্রামে গিয়াছিলাম সেখানে প্রত্যেক কৃষক গৃহস্থের জমিতে অন্ততঃ দুই এক কাঠায় কার্পাস আবাদ দেখিয়াছি। সেখানকার মেয়েরা চরকায় ঐ কার্পাস হইতে সূতা তৈয়ারী করিয়া গ্রামের তাঁতীদিগকে দিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে নিজেরাও মোটা কাপড় বুনিয়া থাকে। তাই পল্লীর আপনার লজ্জা নিবারণ করিতে অসমর্থ হয় নাই। স্বাবলম্বন না শিখিলে বিবসন-সমস্যা পূরণ হইবে না। দেশের শিক্ষিত যুবকগণ বুড়ি-কাপাসের বীজ অথবা মিসর দেশীয় তুলার বীজ কৃষিবিভাগ হইতে আনাইয়া লইয়া কৃষকগণকে বিতরণ করুন, গ্রামে গ্রামে যাইয়া কার্পাস আবাদ ও চরকার প্রচ-লন করুন। তাঁতীদিগকে লইয়া সমবায় সমিতি গঠন করুন এবং সমবায় সমিতির দ্বারা কার্পাস, চরকা সূতা ও কাপড় সরবরাহ করাইয়া লউন। তাঁহাদের উপর নানাদিক হইতে নানা কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিয়াছে, কিন্তু এই আহ্বান বড় মর্ম্মস্পর্শী, নিদারুণ।

এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার পর তাঁহারা কৃষি ও শিল্পের পুনরুত্থানের আয়োজন করিবেন।

পল্লীসমাজের পুনর্গঠনের ভার দেশের শিক্ষিত উৎসাহী কর্ম্মীগণের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। গ্রামের একটী ভাণ্ডার, —শিল্পজাত দ্রব্য, শস্য ও নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য,—একটী নৈশবিদ্যালয়,—কথক অথবা শিক্ষকের সাহায্যে যাহাতে প্রত্যেক গ্রামবাসী দৈনিক হিসাব লিখিতে, সংবাদপত্র ও সাধারণ সদাচারসম্মত প্রভৃতি পাঠ করিতে পারে এবং সুনিপুণ শিল্পী ও শ্রমীর সাহায্যে যাহাতে তাহার পারিবারিক হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহার জন্য একটী নৈশবিদ্যালয়,—উৎকৃষ্ট সার এবং কৃষিযন্ত্রাদি ব্যবহারে কৃষির উন্নতির জন্য একটী ক্ষেত্র এবং তাহার সংলগ্ন গোজাতির রক্ষা ও উন্নতিকল্পে গোশালা,— এই তিনটী অনুষ্ঠান – কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতির একমাত্র ভিত্তি—এই তিনটীর সবগুলি চাই, একটী না হইলে সব যাইবে।—এইগুলিকে সুচারুরূপে প্রবর্ত্তন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে শাখা প্রশাখা বিচিত্র ফুল ফল সময় ও সুযোগ মত আপনি জন্মাইবে এবং ক্রমশঃ গ্রাম্য সমাজ ও নানা গ্রাম্যসমাজের মিলনে সমগ্র দেশব্যাপী একটী বিরাট জনবায়-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাই আমাদের এই দরিদ্র দেশের দরিদ্র নারায়ণের বিরাট শরীর। দেশের সমূহজ্ঞান ও সমূহশক্তির বিকাশে নারায়ণ প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের অন্তরে প্রতিভাত হইবেন।

সম্পাদক।

"সঙ্গীতের জন্ম"

[১]

কবি গাহে গান সান্ধ্য দিনমান নৃপতির সভাতলে,
উন্মনস্ক শ্রোতৃবৃন্দ আনমনে 'আহা' বলে।
তোষামোদ রণে কে পারে জিনিতে সভাজন তাহে তাই
বিষয়ের বিষে বিষোর রাজার সুধার তৃষ্ণা নাই।
গাহিতে গাহিতে থেমে যায় কবি রাজা কহে "গাও-গাও
মোর রাজকাজ আমি করি তুমি নিজকাজ করে যাও।"
অপমান-শেল বিঁধিয়াছে বুকে কবি কহে "এত ঘৃণা ?
হেন নহে প্রেম, বিত্ত নহেগো চিত্ত চাহে যে বীণা।

[২]

কবি গাহে গান পুলকিত প্রাণ দূরে বকুলের তলে,
রাজসভা হতে লয়েছে বিদায় অভিমানে আঁখিজলে
শুনে পশু পাখী শুনে তরুলতা কবির মধুর গান
রাজপ্রাসাদের বাতায়নে শুনে দুটী সুন্দর কাণ!
মন্ত্রীর সাথে বাতায়ন পথে মন্ত্রীর রিণীঝিণী
তালে তালে বাজে তর্ম্মের মাঝে কঙ্কনকিঙ্কিনী।
রাঙাবাহু যেন ইঙ্গিত করে কাছে এস কবিবর
তব সঙ্গীত-নীরে দিবে কাঁপ তৃষাহত অন্তর।

[৩]

কবি গান গায় মধু-সন্ধ্যায় নিম্ন মধুর স্বরে
অন্তঃপুর উপবন মাঝে সরসী সোপান পরে
অনিমিখ আঁখে মীন ঝাঁকে ঝাঁকে সোপানের পরে লুটে
পালিত ময়ূর হরিণ-শিশুরা চারি পাশে তার জুটে।
বিহগ সেখানে কি গান গাহিবে মুখর যেখানে গুণী ?
কুঞ্জের মাঝে ঝিল্লীপুঞ্জ নীরব হয়েছে শুনি।
রাজার কুমারী সমীপে মুগ্ধা, আধ আঁখিপুট খুলি',
কপোলপদ্ম রাঙ্গের মৃণালে ভাবঘোরে পড়ে ঢুলি।

[৪]

কবি গাহে আজ,—বধ্যের সাজ জল্লাদ করে দান
নৃপতির পায় শেষ নিবেদন,—শুনাইবে শেষ গান।
নব বিরচিত প্রেমের কাহিনী কবি গাহে প্রণপণে
শোণিতরক্ত শেষ সঙ্গীত জয়ী হয়ে উঠে রণে।
বিষয়ের বিষে বিভোর চিত্ত, হেলায় শুনেনি গান
মরুপিপাসিত-প্রাণ আজিকে নির্ঝরে করে পান
সুপ্ত হৃদয় উঠিল জাগিয়া কিন্নর সভা মাঝে
ছল ছল আঁখি মুগ্ধ নৃপতি বুকে ধরে কবিরাজে।

[৫]

কবি গাহে গান খুলি মনপ্রাণ বিবাহ-বাসরে বসি'
বিজয়োজ্জ্বল জলদমুক্ত হাসে তার মুখশশী।
লাজকুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা নৃপবালা তার পাশে—
ফুলকেলি করে হুলাহুলি করি সহচরীগণ হাসে
পরলাসুরী হয়েছে তাহার আজি সুধামণিময়
সিন্ধুর কূলে চিত্তভটিনী গাহে প্রণয়ের জয়।
চারিপাশে আজি বিবাহোৎসবে মধুমাস যেন রাজে
গত ব্যাধ-ভয় গাহিছে কোকিল আম্রমুকুল মাঝে।

[৬]

কবি গাহে গান প্রিয়াসহ তার নৃপের প্রাসাদকূটে
নূতন ছন্দে চারিদিক হতে বন্দনা গান উঠে।
ভুলি রাজকাজ নৃপ গাহে আজ সিংহাসনের পরে
বাদী প্রতিবাদী বিচার ভুলিয়া একতানে গান ধরে।
ভুলি মন্ত্রণা, জরাযন্ত্রণা মন্ত্রীও গাহে ধীরে
রাণী গাহে গান—নবযৌবন এলো যেন তার ফিরে!
তেয়াগিয়ে অসি ধরিয়াছে বাঁশী সেনাপতি রণ ভুলি'
কোষাধ্যক্ষ গান গেয়ে চলে ভুলে কোষাগার খুলি'।

[৭]

কবি গাহে গান চারি পাশে তার নাগরিকগণ জুটে
শত্রু মিত্র প্রভু ও ভৃত্য একসাথে গেয়ে উঠে।
গান গেয়ে গেয়ে বিক্রেতা ক্রেতা বেচা কেনা করে হাটে
পয়সা না দিয়ে গান গেয়ে নেয়ে পার করে দেয় ঘাটে
নাগরীরা গায় গাগরী ভাসায় কেলি হেমভূবা কূলে
সঙ্গীতরত চোর আজিকে চৌর্য্য গিয়াছে ভুলে।
সকল দ্বন্দ্ব মিলে আনন্দে যেন সব বরষধূ
সব কোলাহল হইল ছন্দ—সম হলাহল মধু।

শ্রীকালিদাস রায়।

ভাববার কথা

(বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা)

জ্ঞান উপার্জন ও বিদ্যালোচনা আবহমানকাল থেকেই মানুষের কাছে তার অন্যতম কর্মের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এসেছে। তবু যেন প্রাচীনদের জ্ঞান উপার্জনের উদ্দেশ্য আধুনিকদের তা হতে অনেকটা তফাৎ ছিল। নীতি-চরিত্র ও সামাজিক ভব্যতার উৎকর্ষ লাভই যেন প্রাচীন কালের বিদ্যালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য এ কথা অপরাবিদ্যা সম্বন্ধেই প্রযুজ্য পরাবিদ্যার আলোচনা অন্য কারণেই হতো। আমি 'প্রাচীনদের' বলতে ভারতের প্রাচীনরাই শুধু ধরি নি :—গ্রীক রোমক মিশরীয়, বেবিলনীয় ইউরোপীয় সবারই মধ্যে বিদ্যালোচনার সঙ্গে ঐহিক মঙ্গল অমঙ্গলের তত ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল না। প্রায় সব দেশেই বিদ্যালোচনাটা এক সময়ে একটা সখ-সৌখীন ব্যাপার ছিল, ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার এই ছিল সে কালের বিদ্যার মোট পুঁজি। তখন বিজ্ঞান রীতিমত ভাবে জন্মায় নি, বা জন্মিলেও অর্বাচীন শিশুমাত্র। তাইতেই যুগটাকে প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগ বলা যেতে পারে।

তারপর আমাদের এই বৈজ্ঞানিক যুগ। এখন তো জ্ঞান মানিতে বিজ্ঞান, সব জ্ঞানের সব বিদ্যার শ্রেষ্ঠ। পূর্ব যুগে যেমন দর্শন ছিল রাজবিদ্যা এখন বিজ্ঞান হচ্ছে এ যুগের রাজবিদ্যা। বাস্তবিকই তাই।

মানুষের ভাল মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল, স্থিতি অবনতির সঙ্গে বিজ্ঞানের যেমন ঘনিষ্ট সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে এমন আর কোনো বিদ্যার সঙ্গে নয়। ইংরাজীতে একটা কথা আছে Knowledge is power; এ কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি তা বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে। প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তিকে পদদলিত করে বা অনুকূল করে বিশ্বমানব নিত্য আজ যে ঘটাৎ প্রচণ্ড মাত্রায় একটা সামাজিক হয়ে উঠে নিজেকে প্রকৃতির 'সার্ভেন্টশিপ' থেকে মুক্ত করে সদর্পে মাথা তুলেছে সেতো বিজ্ঞানের প্রসাদে! আজ মানুষ ইথিতে বিদ্যুৎ বায়ু ও জলের তেজ রোধ করে গতি ফিরিয়ে কাজে লাগাচ্ছে; জলে, স্থলে, ব্যোমপথে স্বচ্ছন্দে বিহার করছে; দেশকালকে ইচ্ছামাত্রায় ঘনিয়ে আনছে; অযুত প্রাকৃতিক শত্রু শক্তিকে মন্ত্রবলে বশে করে ফেলেছে; অতীন্দ্রিয় প্রতি ও দৃষ্টিশক্তি লাভ করছে; চাই কি ইচ্ছামৃত্যু হবারও স্পর্দ্ধা প্রকাশ করছে—এতো শুধু বিজ্ঞানেরই বলে।

কাজেই এখন যে অপূর্ব জ্ঞানশাস্ত্র এ যদি সৌখীন সাহিত্য কাব্য-নাটকাদিকে আসর হতে তাদের মামুলি উচ্চাসন থেকে ঠেলে দিয়ে সেই স্থান অধিকার করতে চায় তবে তাকে দোষ দিতে পারা যায় না। বরং মানুষ যদি এখনো এই মহোপকারী বিজ্ঞান-বন্ধুকে অগ্রাহ্য করে সখের কাব্য নাটক উপন্যাস নিয়তে আর সেগুলিতে মত্ত হয় তা হলে বলতে হবে মানুষ অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার। সে শক্তির উপাসনা করে আজ মানুষ তার পশুত্ব ও প্রকৃতি-দাসত্ব নাশ করে আজ বিশ্ব-বিজয়ী হয়ে উঠেছে সেতো বিজ্ঞানের গুপ্ত কারখানা থেকে সংগ্রহ করা? আর এখনো যে যে ক্ষেত্রে উন্নতি বাঞ্ছনীয় তাও ঐ বিজ্ঞানের প্রসাদেই হবে? আধুনিক জগতে যেথি প্রাণপণকর জীব-সংগ্রামে জয়ী হয়ে টিকে থাকতে গেলে ঐ বিজ্ঞান সাধনা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নাই। জাতির অস্তিত্বের পক্ষে "আজ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"! স্বাস্থ্য বল, শক্তি বল, অর্থ বল, এক কথায় মোক্ষও বল সব ঐ বিজ্ঞানের হাতের মুঠিতে! এ কথা সার জেনেও এ দরিদ্র দেশের তো কথাই নাই, অথচ যে বিলাত সেখানেও এতদিন তেমন ভাবে বিজ্ঞানের সাধনা হয় নি বলে সেখাকার মনীষিরা দুঃখ করেন।

গত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড মরলের ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার হওয়া উপলক্ষে মহীবর ব্যাজদুর এই মর্মে কতকগুলি স্পষ্ট উক্তি ও আক্ষেপ-উক্তি করেন। নীচে তার

সার অংশ নিলাম। ঠিক ওই কথাগুলি আমাদের দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রযোজ্য বলে মনে করি। দেখে শিক্ষা-সংস্কারের আন্দোলন হচ্ছে, তাই মনে হয় কথাগুলি কৃত-কর্ম। তাবুকদের কানে পৌঁছলে কিছু না কিছু ফল দিতে পারে। কাকে ধরলে ঘুঘু করে এনে কোথাও ফেলে দিলে, তা হতে বিশালকায় বটের উৎপত্তি যদিই বা হয় তার ফলে কাকের বাবাচারী কিছু নাই।

বাঙ্গলীর বাঙ্গালুর মধ্যেও রাজনীতির ব্যবসায়ী হইলেও নিজেকে a believer in the gospel of "Science the Master" বলে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করেছেন। তাঁর মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? না To train men (and women too) to use their faculties not merely to acquire knowledge of what has been discovered by others in the past but to discover new things and to gain further control over the conditions in which we live and to secure further understanding not only of nature but of man—that is the great business of the university.

Universityর এর অপেক্ষা যোগ্যতর definition আর কখনো কেহ দিয়াছেন কিনা জানি না। বাঙ্গালুরের দুঃখ এইযে তাঁহার জন্মভূমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে এ ধারণা রাখেন না। তিনি বলেন দেশ যদি এ ধারণা রাখিত তাহা হইলে দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী দুটী বিশ্ব-বিদ্যালয় Oxford ও Cambridge এখনো ধনীসন্তানদের জন্যে আলাদা করা থাকিত না এবং এখনো সেখানে মৃত প্রাচীন ভাষা শেখাইবার জন্য বেশীভাগ সামর্থ্য, সময় ও অর্থ নষ্ট করিত না। তিনি দুঃখ করেন এখন আর সে দিন নাই যখন যাহারা কেবল Classical ভাষা শেখা ও শিখে বিদ্যার বহর দেখাই করাই মানুষের প্রধান গৌরব মনে করিত। জ্ঞানের যারা দিন দিন এতই বেড়ে উঠছে যে দেশব্যাপী একাগ্র সাধনা তা যাতে লাগাতে না পারলে দেশের পক্ষেই অশুভ।

আচার্য্য রে ল্যানকাষ্টার স্কুলের বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইংলণ্ড এখনো নাকে তেল দিয়ে নিশ্চিন্ত আছে, কিন্তু জর্মণী অন্তরে অন্তরে এ সত্য উপলব্ধি করে সমস্ত জাতটাকে বিজ্ঞানে দীক্ষিত করবার জন্য কি অমানুষী যত্ন ও চেষ্টাই না করেছে! জর্মণী সমস্ত লোককে বিজ্ঞানে জ্ঞানী করবার জন্য সরকারী টাকার বেশীভাগ খরচ করে, সেখানে বিজ্ঞান-মন্দির ও শিক্ষাপরিষদের অনুষ্ঠান করেছে। তথাকার রাষ্ট্র-পরিচালকেরা বিজ্ঞানের সাধনাকে জাতীয় মঙ্গলের পক্ষে এতই প্রয়োজনীয় বলে বুঝেছেন যে ক্ষমতাশীল সরকারী কার্য্য-বিভাগের কর্তৃত্বপদে বিজ্ঞান জানা লোককে নিযুক্ত করেছেন। সমস্ত রাষ্ট্র যন্ত্রটাই পূর্ণতম মাত্রায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরি-চালিত। যে organisation এর জন্য জর্মণী আজ জগতে এতখানি হয়ে উঠেছে তা ঐ বিজ্ঞান সাধনার ফল। জর্মণীর জাতীয় শিক্ষার মূলে এই বিজ্ঞান-সাধনা। অথচ ইংলণ্ড এ বিষয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে উদাসীন। Lancaster যখন জর্মণীর বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা করেন তখন বোধেন্ নি এই দানব বিজ্ঞানের শক্তিকে কি অপব্যবহার করবার জন্যে এত লেগে পড়েছিল।

আমাদের দেশের পক্ষেও এ কথা খাটে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও বিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। তবে স্যার আশুতোষের বিজ্ঞান কলেজ ও স্যার জগদীশ চন্দ্রের Science laboratory প্রতিষ্ঠা দেখে মনে হয় দেশ-বাসী বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছেন। এটা শুভ লক্ষণ বলেই মনে হয়। জাতি হিসাবে আমরা তো শিশু! কিন্তু তা হলেও এই শিশু জাত বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে গেলে তার পক্ষে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় এই বিজ্ঞানশিক্ষা। অর্থে, সামর্থ্যে ও জ্ঞানে মানুষ হয়ে উঠতে গেলে আমাদের এই বিজ্ঞান-সাধনা পূর্ণমাত্রায় দরকার। অথচ আমাদের দেশের যুবা ও বালকরা ১৪।১৫ বছর ধরে যে সময় অর্থ ও শক্তি ব্যয় করে শিক্ষা লাভ করে, বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাহির হয়ে তার মূল্য কতটুকু? একজন B. A. পাশ করা যুবকের বিদ্যার পরিমাণটুকু কি শোচনীয় ভাবে অল্প! চৌদ্দ পনেরো বছর ধরে স্নেহের রক্ত ও বাপ-মার পয়সা খরচ করে সে কি শেখে আর কতটুকু শেখে? আমাদের দেশের অতি সাধারণ নিয়মগুলি বা অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রকৃতির কার্য্যবিধিগুলির কতটা সে শিক্ষার দ্বারা আয়ত্ত করে? সাহিত্য, ভাষা বা ইতিহাস

কতটুকু সে শেখে তাই কি যথেষ্ট? একটা বিদেশী সাহিত্য বা স্বদেশী প্রাচীন সাহিত্য তাই শিখিতে তার সমস্ত যৌবনটা ব্যয় হয়; তাই বা কতটুকু? অথচ গ্রাজুয়েট হয়ে বাহির হয়ে আসার পর তাহার বিজ্ঞান-জ্ঞান যাচা দেখলে দুঃখে ও হতাশায় বুক ভেঙে যায়। তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় ঝড় হয় কেন? কলেরা ব্যাধির বীজবস্তু কি? উহার প্রতিষেধক উপায় কি? গাছপালার জন্ম বা বৃদ্ধি-রহস্য ব্যাপারটা কি? ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ কি? নানাজাতি জীবের উৎপত্তি কিরূপে হয়? রেলগাড়ী চলার রহস্যটা কি? শরীরের কোনখানে কি যন্ত্র আছে আর কার কি কাজ? মেয়ের পক্ষে চিনি বা মাংসের প্রয়োজনীয়তা কি? সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ কি?—ইত্যাদি—১৫ আনা যুবক এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।

আমাদের দেশের স্কুলের ছাত্রগণ পুরা ৯।১০ বছর ধরে শ্রেণীর পর শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে; অথচ তারা এই দশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে শিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বোঝা মাথায় বহন করে কলেজে এসে উচ্চ শিক্ষার দাবী করে। আর এই গোটা ১০ বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের অতি সোজা অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যগুলিও জানে না।

তারপর কলেজে এরা বেশী আর কি শেখে? কলেজের চার বছরও অধিকাংশ বাঙ্গালী ছাত্রের চর্চ্চায় কেটে যায়। অবশ্য একেবারে যে কিছু শেখে না এ কথা বলতে পারিনি; তবে বক্তব্য আমার এই যে অল্প দু বাঙ্গালী জীবনের অতি মূল্যবান অংশটুকু এবং প্রভূত পয়সার অপব্যয়ে কার্য্যকরী শিক্ষালাভ সে অনুপাতে হয় না। আমাদের দেশের ছেলেরা এত কষ্টে যা শেখে তার অর্দ্ধেক তারা মূল্য দেয় ঢের বেশী। অমূল্য-ধন স্বাস্থ্য তার মধ্যে একটা অপব্যয়ের জিনিস। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে তাদের ভেতর শক্তি উদ্যম এমন থাকে না যার জোরে তারা জীবনযুদ্ধ চালাতে পারে।

Herbert Spencer তাঁর অমূল্য শিক্ষা প্রবন্ধে এক স্থানে বলেছেন এ যুগের প্রধান শিক্ষণীয় ও শিক্ষয়িতব্য বিষয় হচ্ছে "বিজ্ঞান"। বিজ্ঞান যখন বল, বিজ্ঞান যখন শক্তি, বিজ্ঞানই যখন জীবন তখন এই বিষয় ছাড়া আর শেখবার কিছু নাই To prepare us for complete living is the function which education has to discharge —আরো—"Knowledge immediately conducive to Self-preservation is of primary importance."

আত্ম-কল্যাণ বুদ্ধিতে (জাতির ও ব্যক্তির) যে জ্ঞান সাহায্য করে সেই জ্ঞান লাভই সর্ব্বপ্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত? এ কোন জ্ঞান? "What Knowledge is the most worth? uniform reply is Science."—এ কোন জ্ঞান?—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন—এ জ্ঞান বিজ্ঞান সায়েন্স্— জীবসঙ্ঘে আবহমানকাল হতে জীবন-সংগ্রাম চলে আসছে—কি ব্যক্তির পক্ষে কি একটী জাতির পক্ষে উভয় পক্ষেই তাই। এ যুদ্ধে জয়ী হয় কে? যে বলবান, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান;—প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিগুলিকে জয় ও বশ করে তবে মানুষ আত্মরক্ষা করে—আর এ কাজ কেবল বিজ্ঞানের বলেই সাধ্যায়ত্ত। আমরা দুর্ব্বলতাজাত ব্যাধি ও অনশন আমাদের খেতে বসেছে। কাজেই আমাদের মানুষের মত হয়ে বেঁচে থাকতে হলে—স্বাস্থ্য হতে আত্মরক্ষা করতে হলে আমাদের এই বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে বশ করতে হবে। যেমন রোগীর প্রাণ রক্ষার জন্য ঔষধ সেবন দরকার, তেমনি আমাদের বেঁচে থাকবার জন্য বিজ্ঞান-সাধনা দরকার। প্রবল কাল্পনিক দেবতাদের কাছে জোড় হাত করে তাদের লোভ দেখিয়ে ঘুষ দিয়ে 'অন্নং দেহি' 'ধনং দেহি' 'মানং দেহি' এই 'দেহি' 'দেহি' করলে দেহ রক্ষা হবে না।

দেবতাদের কাছে থেকে রাবণের মত জোর করে চোখ রাঙ্গিয়ে ঘাড় ধরে কাজ আদায় করতে হবে। এবং এ কাজ সোজা হবে বিজ্ঞানশিক্ষা লব্ধ জ্ঞান লাভ ছাড়া অন্য উপায় নয়। প্রবলের সাথী বশীভূত দেবতারা পর্য্যন্ত; আজ যে পবন, বরুণ, ইন্দ্র, কুবের প্রভৃতি আর্য্যভূমি ছেড়ে গিয়ে শ্বেতদ্বীপের শ্বেতপদের সেবা আরম্ভ করে দিয়েছেন—সে কিসের বলে? ঐ বিজ্ঞানের বলে!

তাই বলি আমাদের সব বিদ্যা ছেড়ে এখন বিজ্ঞান শিখতে হবে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতি এখন প্রয়

তত্ত্ববিৎরা চর্চা করুন ; ১৫ আনা ৩ পাই লোক এখন বিজ্ঞান শিক্ষা করুক। কুড়িটী অমূল্য বৎসর যাহা ও অর্থ নষ্ট করে আমরা B. A. M.A. হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বেরিয়ে আসি অথচ আমাদের প্রকৃতি পরিচয় হাস্যোদ্দীপক ! আমরা পিথি সাহিত্য ও কলাবিদ্যা ! আর তার শিক্ষা-পদ্ধতিই কি অদ্ভুত ! শেক্সপীয়রের নাটকের একখানার সঙ্গে পরিচয় না হতে হতে তেত্রিশখানা সমালোচনার বই মুখস্ত করে হয়ত আউড়ে যেতে পারি Nerissa বা Iago'র চরিত্র সম্বন্ধে Hudson, Gervinus, Hazlitt, Hugo, Bradely, Coleridge কি মতামত দিয়েছেন ! আর যদি কেউ বলেন তোমার মত কি ? তখন চোখে অন্ধকার দেখি ! আর আমার নিজ মতামতের মূল্যই বা কি ? মূল্য তো পরীক্ষার নম্বর ? তা যখন Hazlitt Hudson এর মত আউড়ে দিলে শতকরা ৯০ নম্বর পাবো তখন আমার মতের জন্যে মাথা ঘামানো কেন ? Hamlet এর আক্ষেপোক্তির মধ্যে 'Sea of arms না পড়ে 'Siege of arms' ধরে কি অর্থ দাঁড়ায় তারই হাজার রকমের উদ্ভট কল্পনা মুখস্থ করে মরছি ! কেন না নম্বর বেশী উঠিবে ?—আমাদেরই বা দোষ কি,—আর অধ্যাপকদেরই বা অপরাধ কি ? পরীক্ষক এই সব চান যে ?—"তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট !"

আধুনিক একজন আর্টস্ গ্রাজুয়েটকে প্রকৃতির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটী অতি অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা জিজ্ঞেসা করলে তিনি মস্তক কণ্ডুয়ন করেন ! সংবাদপত্রে যুদ্ধের খবর বুঝতে হলে অনেক···আর্ট ও সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটকে Vienna, Mukden, Marseillies, odessa, archangel যে কি ও কোথা তা জিজ্ঞেসা করে নিতে হয় ! তবু পুরাতন প্রথানুসারে নিখে ছেলেরা ভূগোলের কতক পরিচয় রাখছে এখন ঐ বিষয়টীকে স্বেচ্ছাধীন (Optional) করে ও বিষয়টী শূন্য বিদ্যের কোঠায় পড়ে গিয়েছে ! সে কালে একটা ম্যাপচিত্র ও ভূগোল বই হলেই কতক দেশজ্ঞান তবু হতো। এখন ওটাকে এমন খরচসাপেক্ষ বিদ্যে করা হয়েছে যে ও একটা বিভীষিকার বিষয় হয়ে পড়েছে !

সাহিত্য ও কলাবিদ্যা সম্বন্ধে Herbert Spencer ভারি একটী সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন এগুলি হচ্ছে সৌখীন বিদ্যা ; সখের চর্চ্চায় ঝিনিস, ঐহিক উন্নতি করে যারা, সম্পদ ও অবসর ভোগ করছেন যে জাত বা ব্যক্তি তাদের বা তার এই সব সখের বিষয় চর্চ্চা শোভা পায় ; যার অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি তার পক্ষে নয়। আগে যারা এবং শক্তি ও সম্পদ সংগ্রহ করে মানুষ হও তারপর Homer Heine শেক্সপীয় কালিদাস পড়ে জীবন কাটাও। *As they occupy the leisure part of life So should they occupy the leisure part of education"* কেন ?—না that culture subserving a healthy civilised life *must occupy the highest place* in our education.

ইংরাজরা এখন হাড় করছেন যে তাঁরা জর্ম্মাণীর মত বিদ্যা-সাধনা করে এতদিন শক্তি সঞ্চয় করেন নি ! জর্ম্মাণীর এই দানব-শক্তি বিজ্ঞানের বহুল চর্চ্চার ফলে তা অনেক হাবুক ইংরাজ স্বীকার করছেন। প্রবন্ধারম্ভে মন্ত্রী বালফুরের আক্ষেপ উক্তি এই ধরণেরই।

অর্থ ধরার অধিপতি স্বয়ং ইংরাজ যদি আক্ষেপ করেন যে তাঁদের স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানশিক্ষার যথোচিত অবহেলা হচ্ছে তবে আমরা মুখ লুকাবো কোথায় ? আমাদের স্কুলের ছেলেরা ১০ বছর স্কুলে পড়ে ! পড়ে সাহিত্য, ইতিহাস, অঙ্ক, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ! তিনটে ভাষা শিক্ষা করে ! ১০ বছরের শিক্ষালাভ তাহাজাম তাদের কিরূপ তা যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন। ব্যাখ্যা বাহুল্য। সংস্কৃতে একটা ৩০ শ্লোক passage মানে করিতে পারেন ! বাঙ্গালা মাতৃভাষা ;—মানের উপর সমস্ত আবদার চলে বলে মাতৃভাষা মূক হয়ে থাকেন ! এক Matric. পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রে অনুবাদ করিয়াছিল "একদা এক ঘোষা এক ব্রাহ্মণের চাকুরী করিত !" ইত্যাদি ! ইংরাজীর তাহাজাম তথৈবচ ! বিজ্ঞানের সঙ্গে মাত্র পরিচয় তো হয়ই না। বিলাতের সব স্কুলের ক্লাশে Nature Knowledge যাহাজাতুলক শিক্ষার বিষয়। ছেলেদের পক্ষে সহজে শিক্ষণীয়, আমোদের সঙ্গে শিক্ষণীয় যদি কিছু থাকে তবে বিজ্ঞানে। কে না জানেন ছেলের স্বাভাবিক কৌতূহল কেমন প্রখর ?—প্রকৃতি তাহাদের কাছে একটী জীবন্ত মানুষ, রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-শ্রীতে

প্রকৃতি দিন রাত মুহুর্মুহু কল-কাকলি শিশু-হৃদয়ের তারে তারে ঝঙ্কার তুলেছে শিশুও সুরে সুর মেলাতে অধির ও আলাপ করিতে ব্যগ্র! কি হবে! কে তাদের হৃদয়যন্ত্রের তারগুলি ঠিক করে বেঁধে দেবে? কে সে ব্যাকুলতা ঘোচাবে? যখন শিশুর ক্ষুদ্র রাঘবদ্বয় ধর্ম-সৌরভ পেয়ে ছুটে এসে বাপ-মাকে জিজ্ঞাসা করে,—বাপ-মা বলে দিলেন "ওটা 'রামেরই বন্ধুক!' তাদের কত কৌতূহল এইভাবে অঙ্কুরে মারা যায়! না ঘটে ঘরে প্রকৃতির পরিচয়, না আছে বিদ্যালয়ে তার ব্যবস্থা! যখন বেশ উঠে বড় বইছে —হটাৎ ঝড়্ ঝড়্ কড়্ কড়্ করে শিল পড়তে লাগলো, বিদ্যুৎ চম্‌কাতে লাগলো—শিশু উল্লাস আবেগে ছুটে গেল —প্রকৃতির সঙ্গে তার মেলাতে;—অমনি বাপ গিয়ে কাণ ধরে টেনে এনে পুঁথির উপর বসিয়ে দিলেন—আর বল্লেন "রাস্‌কেল পড়া ফেলে বৃষ্টি দেখ্‌তে গেলেন!" বালক আহত মৃগের মত বসে মাথা হেঁট করে ক্ষুণ্ণ মনে ভগ্ন স্বরে আরম্ভ করলো—

"সৌঃ গাবৌ গাবঃ" "সৌঃ গাবৌ গবাঃ"

"Testator testatrix, testator testatrix"

কি শিক্ষাল ফলের অভিনব!

আট বছরের বিদ্যালয়ের ছাত্র ক্লাসের বাহিরে একটী প্রজাপতির সঙ্গে সঙ্গে যদি ছুটোছুটি করে বা একটী পাখীর নূতন সুর শুনে ও রং দেখে বই থেকে মাথা তুলে কৌতূহলী চোখ দুটীকে বাইরের দিকে পাঠিয়ে দেয়, তা হলে Autocrat of the classchair এর কণ্ঠ হতে বজ্র-গম্ভীর স্বরে হুকুম হলো "দেতো রে ভোলা, ওর কান ধরে বইএর দিকে চোখ ফিরিয়ে।" ভোলা তো তথাস্তু।

একবার একটী হতভাগ্য শিশুছাত্র কোনো সময়ে বাহির হতে একটী পাখীর ডিম—যা পূর্ব্বে সে দেখেনি—তা নিয়ে বড় আশা করে আনন্দে ছুটে এসে ক্লাস-মাষ্টারকে জিজ্ঞেস করে "Sir এটা কিসের ডিম?" হয় তো Sirএর মেজাজ তখন বাইনে কাটার আক্রোশে পঞ্চমে চড়েছিলেন, হট্‌ খোট্টাই হাতের এক বিষম চড় জিজ্ঞাসুর গালে প্রদান করে বল্লেন—"You Stupid, go and Stand up on the Bench! কোথা সিধ্‌লি এতক্ষণ যে Stupid!" বালক হতভম্ব, বিস্মিত, স্তব্ধ ও মূক! প্রকৃতির পরিচয়ের বদলে যে Sir-এর হাতের চেটোর বল, ও বহরের পরিচয় গণ্ডদেশের রাঢ় স্পর্শ দ্বারা হবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি!—এ কি Kindder-garten না Monster-oden? কেউ বলতে পারেন? বাঙ্গালা দেশের হাজার করা ৯৯৯টী স্কুলের ও ছাত্রের ছাপা-চিত্র এই। একবর্ণ অতিরঞ্জন নয়

কোনো একটী উচ্চ শ্রেণীর কলিজিয়েট স্কুলে ভদ্রলোক College এর Principal স্কুলে Nature Knowledge শিখাবার ইচ্ছা করে উদ্ভিদবিদ্যা পড়াবার ব্যবস্থা করেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বেশ চলছিলো, ছেলেরা আমোদের সঙ্গে শিখ্‌ছিলো—তারপর তাঁর মৃত্যুর পর হটাৎ দেখা গেল কর্তৃপক্ষ উদ্ভিদবিদ্যার আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছেন। ওটা নাকি ছেলেদের সময় নষ্ট হবার একটা উৎপাত স্বরূপ অমনি সিদ্ধান্ত হয়ে ছিল!!

এই সব দেখে মনে হয় আমাদের বালকদের ও যুবকদের বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থার কোনো আশা নাই।

অথচ এই জাতীটাকে সব রকমে মানুষের মত করে তুলতে ঐ বিজ্ঞানই সব প্রথম দরকার! বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মে দিতে বিজ্ঞানের মোটা মোটা মূলসূত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় পেতে ছেলেবয়স যেমন সুবিধাজনক অমন আর কিছুই নয়! শুধু ব্যবস্থা ও পদ্ধতির দোষে দশ দশটা বছর বাজে খরচ হয়, অথচ কিছুই তেমন শেখে না। একটা পাখী এক ঘাসে বুলি বলতে শেখে,—একটা বন্ধ অল্প সময়ে কত তারিখ্ শেখে, আর একটা সভ্য মানুষ-শিশু দশ বছরে কিছুই তেমন শেখে না এ কি কম দুর্ভাগ্য! দশ বছর বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে থেকে রাশ রাশ বই নেড়ে যদি একটী ষোলো বছরের ছেলে বলতে না পারে রাঘবদ্বয় কি করে হয়? চাঁদের সঙ্গে জোয়ার ভাঁটার কি সম্বন্ধ; দিন ছোট বড় কেন? রেলগাড়ী কিসে ছোটে? লিভারের কি কাজ? কলের জল খেলে অসুখ হয় না কেন? ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি কি হতে? পৃথিবী চিরদিন এমনি ছিল কি না? কয়লা কি করে হয়েছিল? রেশমের সুতো কোথা থেকে হয়? বিশুদ্ধ বায়ু কেন উপকারী ইত্যাদি ইত্যাদি—তা হলে কি বলতে পারি সে শিক্ষিত হয়েছে? সে জ্ঞা-

জাতের দ্বারা বল লক্ষ করতে পেরেছে? নাইবা একটা মরা ভাষার হাড় চামড়া নাড়লাম চল্লিশ বছর? নাইবা একটা বিদেশী ভাষার Idion এর দিষ্ট খুবস্থ করলাম?

আমারা এক পূজনীয় স্কটীয় সাহেব অধ্যাপকের কাছে শুনেছিলুম জার্মাণীতে একটা অভিনব উপায়ে বিদেশী ভাষা ছয় মাসের মধ্যে বেশ মত শিখিয়ে দেওয়া হয়! আমাদের ছেলেরা অতি বেশ্বার মত শিখতেই ১২।১৩ বছর কাটিয়ে দেয়। আমরা ৮।১০ বছর ধরে সংস্কৃত শিখি অথচ সমস্ত 'পণ্ডিত'—'অপণ্ডিতের মত দাঁড়িয়ে যায়।

এ সবের প্রতিকার কি? আমার মনে হয়—কি কি বিষয় ছেলেদের অবশ্য জ্ঞাতব্য এইটে স্থির করে তারপর কি উপায়ে অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে, অল্প খরচে তা শেখানো যেতে পারে তা করা উচিত। অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞানকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দিতে হবে—তার নীচে অন্য সব। অনেকে নাসাবক্র প্রকাশ করবেন,—এ নিয়ে তর্ক বাদানুবাদ হবে—হউক। তাতেই তো তর্কের দ্বারা অনেক মাথা এক সঙ্গে হয়ে পথ নির্দ্দেশ করতে পারবেন।—

মোট কথা আসল জিনিস্ বিজ্ঞানশিক্ষা নিয়ে কারো মধ্যে মতদ্বৈধ হবে না। ঔষধ ও পথ্যের মত বিজ্ঞান এই অন্ন ও দুর্ব্বল জাতের পক্ষে দশ আনে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সাহিত্য নয়, কলা নয়; দর্শন নয়, পুরাণ নয়, তন্ত্র নয়, মন্ত্র নয় শুধু বিজ্ঞান।—"জানাং মুক্তি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়:—আমার কথা বিশ্বাস না হয় মহাজ্ঞানীর কথা শুনুন:—"

For direct self preservation or the maintenance of life and health the all-important knowledge is—*Sience*. For that indirect self-preservation which we call gainning a livelihood the knowledge of greatest value is—*Science*. For the due discharge at parental functions, the proper guidance is to be found only in—*Science*. For that interpretation of national life; past and present, without which the citizen can not rightly regulate his conduct, the indispensible key is—*Science*. Alike for the most perfect production and present enjoyment of art in all its forms, the needful preparation is *Still Science*, and for purposes of discipline—intellectual, moral, religious—the most efficient Study is once more—*Science*—

ইহার অর্থ এই :—

সাক্ষাৎ ভাবে স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা করতে গেলে তার জন্য দরকার বিজ্ঞান। পরোক্ষ ভাবে জীবন রক্ষা যার নাম জীবিকাউপার্জ্জন তার জন্য দরকার বিজ্ঞান;—সন্তানের প্রতি বাপ-মার কর্ত্তব্য ঠিক মত সম্পাদন করতে গেলে দরকার বিজ্ঞান। জাতের অতীত ও বর্ত্তমানকে ভাল করে বুঝে নেতে তুলনা করে রাজতন্ত্রের অধীনে ভাল প্রজা হয়ে স্বকর্ত্তব্য সাধন করা ও দেশের ভাল করার জন্য দরকার বিজ্ঞান। খুব উঁচু ধরণে চারুকলার সেবা করার ভাল ভাল কলা-দ্রব্য উৎপাদন করার ও তাদের প্রকৃত উপভোগ করার জন্যও দরকার বিজ্ঞান। পূর্ণাঙ্গীন আত্মশিক্ষা কি মানসিক কি আধ্যাত্মিক কি নৈতিক—এর জন্যও দরকার বিজ্ঞান।

অতএব আমার সাহসের নিবেদন যে দেশের গুণী জ্ঞানী ও ধনীবৃন্দ তাঁদের সমবেত ঐকান্তিক শক্তিকে দেশে বিজ্ঞান-জ্ঞান প্রচারের জন্য নিয়োজিত করুন। এই মহতীর বাণিবাক্য স্মরণ করে যে—

"জানাং মুক্তিঃ; নান্যং পন্থানং—"

শ্রীযদুনাথ বসু।

সুধার ভাগ্য

সুধারাণীর বয়স যখন বারো
তখন এটা ঘুণাক্ষরেও হয়নি মনে কারো ;—
মেয়েটী ছাই, ছার-কপালে এম্‌নি
বাপ-মা তা'র বিয়ে দেবেন যেম্‌নি
হাতের নোয়া দু'দিন পরে খুইয়ে
সিঁথের সিঁদুর চোখের জলে ধুইয়ে
টান্‌তে হ'বে জীবনটারে ছেঁড়া-গাড়ীর ঘোঁড়ার মত নিত্য,
সুখে দুখে একটানাতে সরিয়ে দিয়ে হৃদয়ের সব বিত্ত।

—কারণ, এটা সবাই মনে করে
মেয়ে আমার ভাগ্যমানী পড়বে ঠিকই মনের মত বরে
টুক্‌টুকে লাল রঙটা হ'বে তা'র,
না হয় কিছু হয়েই যাবে বার
বি-এ পাশের কম যদি হয় তবে
মেয়ের আমার মনটী যে তার হ'বে,
কল্পনা ও জল্পনাতে সারাবাড়ী এমনি করে গরম
মেয়ে, আহা, কচি মেয়ে, মনটীও তা'র হয়ে আসে নরম।

—কারণ, সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে তা'র
শুনিয়ে এবং ভাবিয়ে দিয়ে মনটাকে তা'র করে সবাই তার
টুক্‌টুকে বর কল্পনাতে আঁকে
বি-এ পাশটা মনে মনেই থাকে
বাপ-মা ভেবে হয়ে থাকেন কাবু—
মেয়ের ভাগ্যে আঁকাছকা খালি
বুদ্ধির সঙ্গে ভাবনা চিন্তা বালের মত কেবল বেড়ে যায়
বাপের কষ্টে মেয়ের লজ্জা, চোরের মত ক্যাল্‌কেলিয়ে চায়।

সুধা, অতি ছেলে-বেলায় থেকে
বিয়ের কথা শুনে এবং বাপের চেষ্টা ছুটোছুটী দেখে,
বয়স হবার আগে থেকেই যেন
মনে ভাব্‌ত,—"তাইত," "সত্যি," "কেন ?"
অর্থাৎ কিনা বুঝত অনেক কথা
বুঝত মায়ের বাপের প্রাণের ব্যথা,
বয়স চাইতে ছিঁদ্রু ঘরের অনেক মেয়ে বুঝেন অনেকখানি
বুঝা বিশেষ কি আর শক্ত?—ঘরে পরে যখন কানাকানি ?

বারো বছর পেরিয়ে গেলে পর
সুধার ভাগ্যে অনেক চেষ্টায় মিলে গেল সোণারচাঁদ একবর,
ঘরটা বেশই ভাল—
তবে রঙটা একটু কাল
বি-এ পাশ সে করেছে এইবার
এম-এ পড়ায় খরচ চলা ভার
তা যোগ্যে কাল,—সুধা দেখ্‌ল পটে আঁকা ছবি
বিশেষ খ্যাতি সুধার বরের কারণ তিনি উঁচুঘরের কবি।

গরীব হলেও তা'র
মনটা ছিল বেজায় সরল, ছিলনাক একটু অহঙ্কার
কারণ 'ক্লাশের' সেরা ছাত্র
'পাশ' করেছে মাত্র
'মেডেল' পেয়ে, স্তুতিবাক্য শুনে
মুগ্ধ হয়েনিজেই নিজের গুণে
দেমাক হ'লেও হ'তে পার্ত, কারণ, সেটা প্রায়ই হয়ে থাকে
বাইরের চালে মনের গর্ব্ব মনের মধ্যেই ঢাকা দিয়ে রাখে।

ইতিমধ্যে ব্যাপার ঘটল মস্ত
অর্থাৎ কিনা, সুধার বাবা কন্যাদায়ে হয়ে মহা ব্যস্ত—
এলেন ছেলের বাড়ী—
বাবাটী তা'র ঝুলিয়ে লম্বা দাড়ী—

ঘন-ঘন হুঁকাতে টান কসে
কখনও বা শুয়ে কভু বসে
অনেক প্রকার মুখবন্ধে লম্বা ফর্দ্দ করে ফেল্‌লেন শেষ—
সুধার বাবা হতভম্ব, কথাবন্ধ, নয়ন নির্নিমেষ—

বা' হোক্ গা'টা নেড়ে
জোরে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে এবং গলাটা বেশ ঝেড়ে
তাকিয়াটারে সরিয়ে দিয়ে নিজে একটু সরে
ছেলের বাপের হাত দু'খানি ধরে
অনেকখানি 'স্নেহদ্রব্য' ঢেলে
মনের নাগাল একটু যেন পেলে,
অর্থাৎ কিনা, অনেক কষ্টে হবু-বেয়াই হয়েছেন 'নিমরাজি'
হিসাব চুক্তি লাভের বখরায় হ'তেও পারে ধার্য্য মাঝামাঝি।

চুক্তি হ'ল কি যে
সে সব অতি গোপন কথা আমরা সে সব জানিনাক নিজে,
তবে গুজব মত
এটা মনে হ'ত
সুধার বাবা সুধার বিয়ের পরে
মাসিক খরচ চালাচ্ছে ধার করে
সেটা আরও স্পষ্ট করে বুঝা গেল তখন
জমিদারের 'পেয়দা' এসে ঢোল বাজাল হলুদক্ষেতে যখন,—

মেড়টা বছর গেল
পূজার সময় সুধারাণী অনেক কেঁদে বাপের বাড়ী এল ;
দশমীর দিন রাতে
কেবল মাত্র পাতে
সুধারাণী বস্‌ল এসে খেতে ;
দু'দিন পরে হ'বে যে তা'র যেতে
তা'তেই মা তা'র কাছে বসে খাওয়ায় রোজই তা'কে
শ্বশুর বাড়ীর অনেক কথাই ছেলেমানুষ বলে ফেলে মাকে।

এমন সময় একি !—
ছেলের ঝুলি আন্‌লে যে "তার"—দেখি খুলে দেখি ?
সুধার বাবার মুখ
শুকিয়ে এতটুক
বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল তাঁর
—"সুধার বরের প্রাণ বাঁচা যে ভার"—
ছুটে গিয়ে সুধার মাকে সকল কথা বলে
পরের 'ট্রেনেই' জামাই-বাড়ী গেলেন তিনি চলে
* * * *

"হরি হরি বোল !"—
সুধার বাপের কানে গেল ; প্রাণটাকে তা'র কে যায় দিয়ে দোল ?
পথের ধারে দেখে
মরাটাকে ঢেকে
লোকগুলো সব আগলে বসে আছে
সুধার বাবা সুধায় তা'দের কাছে,—
"হ্যাগা তোমরা বলতে পার, কেমন আছে চাটুর্য্যেদের ছেলে,
ওগো, তা'র যে শক্ত অসুখ নরম একটু পড়েছে কি ?—
দেখতে পাব গেলে ?

মুখ নামালে যেন ?—
ওকি, তুমি অমন করে, কেঁদে উঠ্‌লে কেন ?—
তাকি সত্য হয় ?
ধর্ম্মে তাকি সয় ?
সুধা যে মোর বড় ভাগ্যমানী,
তার কপালে ঘটবে এতখানি ?
না, না, বল মিথ্যা কথা,—দেখি মুখের কাপড় তুলে দেখি ?
ওরে, এ যে সুধার ভাগ্য, সিঁথের সিন্দুর, হাতের নোয়া, একি ?
* * * *
মনের মতন জামাই
চোখের কান্না থামতে পারে মনের কান্না কেমন করে থামাই ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

পূজা-বন্ধ

(ছোট গল্প)

"পূজো বন্ধ ? সে কি ? কবে থেকে ?"

তা অনেকদিন বটে ; প্রায় তিনমাস থেকে"—প্রশ্ন করিলেন—শুচি যাত্রা, পঞ্চাশ পরিহিতা একটী বর্ষিয়সী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা। উত্তরদাতা—একটী অন্ত্যজসম্ভব প্রৌঢ় যুবা। মন্দির সোপানে বসিয়া একটা ছুরি দিয়া আপন মনে ছড়ি কাটিতেছিল। তারাপুরের পাশের গ্রামেই বিধবার বাড়ী। দাসী সঙ্গে তিনি উপচার-সম্ভার হাতে মায়ের পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। বিধবা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া একবার মন্দিরের দিকে তাকাইয়া, পর মুহূর্ত্তে যুবার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন,—

"কেন ?"

"সে অনেক কথা মা।"

"তবু শুনি ?"

"শুনবে ? তবে শোনো" বলিয়া যুবা ছড়ি ও ছুরি হইতে নজর সরাইয়া, আরম্ভ করিল—

"তখন শ্রাবণের মধ্যেমাঝি ! ভরাবর্ষায় চারিদিক জলে জলময়। আষাঢ়ের এই সময়ে তরা শ্রাবণি জলের উপর একটী পদ্মপাতার মত ভাসছিলেন, যে দিনের কথা বলছি, সে দিন এক সন্ধ্যায় আমাদের এই কাজলা নদীর এপারের বাঁক ঘুরে ও পারটী ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার কারণ ও পারে নদীর লাল জলকে আর আকাশের নীলকে তফাৎ করে ঘন কালীমাখা একটা অসমান গাছের সার নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়েছিল ? সব চেয়ে বেটী লম্বা আর ঝাঁকড়া ঝোক্‌ড়া তারই বাঁদিকে গাছের সারির ঠিক মাথার উপরে রূপোর কাস্তের মত একখানি ঝক্‌ঝকে ষষ্ঠীর চাঁদ। সেই চাঁদ থেকে একটা লম্বা সরু আলোর রেখা সোনালি জরির পাড়ের মতো নদীর বুক বেয়ে কিক্ কিক্ করে কাঁপছিল।

"যেখানে খেয়াঘাট ঠিক সেইখানে নদীর বাঁকের মোড়ে দাঁড়িয়ে একটী যুবা হাঁ করে তন্ময়তার জলের সঙ্গে আলো আঁধারের এই নীরব খেলা দেখছিল। যুবা বেঁটে খাটো মোটা সোটা শ্যামবর্ণ মাথা নেড়া, কপালে একটা আঙ্গুলির মত সিঁদুরের ফোঁটা। হাতে একটা বাঁশের বাঙ্কে লাঠি। পরণে একটা খস্‌খসে, ময়লা আট হাতি লাল পেড়ে ধুতি ; গায়ে কিছু নাই, ডান হাতে একটা মোটা সোনার বালা। তার বাঁদিকে একটা আমের বোল, ডান দিকে প্রকাণ্ড ধানের মাঠ শ্রাবণলক্ষ্মীর ছড়ানো আঁচোলেরমত নদীর কিনারা হতে গড়াতে গড়াতে গিয়ে দিগন্তে মিশেছে। তার মাঝে মাঝে—ছোট বড়, দূরে কাছে, গোটাকতক গ্রাম জমাট বাঁধা অন্ধকারের বড় বড় বস্তার মত দেখাচ্ছিল। নদীর বাঁক বেয়ে বেয়ে তারাপুর গ্রামের পথ খানিক দূর গিয়ে ধানের ক্ষেতের মধ্যে মিশে গেছে। ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে একটা রেল পথ শ্রাবণলক্ষ্মীর বুকের উপর গাড়ীর চাকার কাটা দাগের মত দেখাচ্ছিল।

যুবা বিভোর হয়ে ওপারের শোভা দেখছিলো। ষষ্ঠীর চাঁদ, এখনি গাছের আড়ালে নেমে পড়বে। যুবা ছেলে মানুষের মত বলে উঠলো, "বাঃ বাঃ কালি দি মাদার।" ঠিক মা কালি, ও মায়ের মাথা, ওই এলোচুলের রাশ ওই চার হাত, শিব ? শিব ওই ?—মা এই নদীটা। (একটু চুপ করিয়া না দিনের চেয়ে রাত ভালো, দুপুরের চেয়ে সন্ধ্যা ভালো, ষাটীর চেয়ে আকাশ ভালো, আলোর চেয়ে অন্ধকার ভালো" পিছন থেকে কে বল্লেন—"তোর মতন পাগলার

কাছে।" বক্তা একজন বর্ষীয়ান লোক। তাঁর নাম নারান ভট্টচার্য্যি, আমাদের এই গ্রামেরই লোক। সঙ্গে একটী ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীলোক, ভট্টচার্য্যির ভাজ, দাদা হারু ভট্টচার্য্যির পরিবার। তাঁর কাণে কলসী। ভট্টাজি ভাজকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "যাওনা ওর কি? ও আমাদের জগা পাগলা। তুমি একটু সরে দাড়া। এখানে একলা কি হকচিস্? বাড়ি যা না?" ষষ্ঠীরাম ওরফে জগা উত্তর না দিয়ে সরে গিয়ে মুখে একটা আধ গাছের ঘাটী ঝোঁয়া মোটা ডালের উপর বস্‌ল। স্ত্রীলোকটী ঘাটে নাবলেন। ষষ্ঠী কি ভেবে উত্তর করলো, "কের যদি পাগ্‌লা পাগলা বলো, তুলে ওই জলে ফেলে দেবো, জানোতো বাকের মুখে জল কত গভীর আর দোস্তি তত জোর টান্।" ভট্টাচার্য্য-পত্নী ঘাটথেকে শুনতে পেয়ে চাপা স্বরে বল্লেন "ঠাকুরপো কেন ওকে খেপাও। পাগল মানুষ যদি তাই করে—" ভট্টাচার্য্য হেসে বল্লেন, "না গো না ও তেমন পাগল নয়; ও ঠাণ্ডা পাগল।" স্ত্রীলোকটী তেমনি চাপা স্বরে বল্লেন, "পাগল আবার ঠাণ্ডা হয়। পাগল পাগল—এই বলে ছুয়ে কলসীটী টেনে নিতে গিয়ে বেচারী সাম্‌লাতে না পেরে স্রোতের টানে ডুবনজলে গিয়ে পড়লেন, এবং চোখের নিমেষে অদৃশ্য হলেন। জগাই দেখতে পেলো; ব্যাপার বুঝতে তার দেরী হল না। পলক না পড়তে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে জলে পড়লো। উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বুঝলেন অন্য রকম। তিনি ভাবলেন তাঁর ভাই জগাকে বধ্‌পাগল সাব্যস্ত করায় জগা আক্রোশ বশতঃ তাঁকে ডুবিয়ে মারতে গেল। ভট্টাচার্য্য সভয়ে চীৎকার করে উঠিলেন,—"ওরে শালা পাগ্‌লা কি করলিরে, শালা, হারামজাদা, গরলার বাচ্চা!" নারাণ ভট্টাচার্য্য কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে অন্য পন্থা না দেখে মহা চীৎকার করতে লাগলেন। ওরে জলে নাবলেন না।" "ওগো সর্ব্বনাশ হলো গো! কে কোথা আছ গো এস গো!" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে গ্রামের দিকে ছুটলেন। তখন কোনকালে চাঁদ গাছের আড়ালে গেছে। নিকটেই গ্রাম। ঠিক সেই সময়ে চাষারা ধানের ক্ষেত থেকে গ্রামাভিমুখে যাচ্ছিল। হাঁকাহাঁকিতে তারা ছুটে এলো। ভট্টাচার্য্যের মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনে সকলে মিলে নদীর ঘাটে এসে হাজির হল এবং তীরে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে জগা পাগলাকে গাল দেওয়া ছাড়া আর কোন প্রতীকার করা সম্ভব বুঝলো না। নারায়ণ গ্রামের ভিতর চুকলো। বর্ষার মুখে কাজলার প্রখর স্রোত আরো বেড়েছে। কিয়দন্তী বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে কাজলার জলে কুমীর দেখা দেয় কাজেই কেহই তরসা করে জলে পা ডোবাতে পর্য্যন্ত চাইল না। অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রাম থেকে নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের জনকয়েক প্রতিবেশী জেলো নিয়ে ঘাটে উপস্থিত হলো। তীরে অসহায় ভাবে ছুটাছুটি করা ছাড়া কেহই অন্য কোনো উপায় দেখলো না।

"একটু দূরে বাক থেকে প্রায় আধ মাইল ঘুরে যাওয়া নদী হতে যেন একটা কাতর-চীৎকার-ধ্বনি শোনা গেল। জনছই তীমবার কৈবর্ত্ত জেলে যারা নদীর তীর ঘেঁষে ছুটে-ছিল—শব্দ শুনে জলের দিকে তাকিয়ে একটা যেন মানুষের মাথার মত দেখতে পেলে। দুরীবাতে দুইজনেই জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে গিয়ে মানুষটাকে ধরে। মানুষটা আর কেহই নয়, জগা স্বয়ং। সে প্রাণপণে অজ্ঞান আধমরা স্ত্রীলোকটীকে ধরে অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় ঘন ঘন হাঁপাচ্ছিল। একজন এগিয়ে গিয়ে জগাকে ধরলো। জগা সাহায্য পেয়ে রক্ষাকর্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে। অনেক ওষ্টে জেলে দুইজন জগাই ও ভট্টাচার্য্যের ভাজকে ডাঙ্গায় তোলে। কিন্তু হায় স্ত্রীলোকটী তখন আত্ত ধরা। চেঁচামেচিতে আরো অনেক লোক সেখানে এসে পড়লো। নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও তাহার ভাই কজন মিলে মরা বয়ে নিয়ে গ্রামে ফিরলেন। কয়েকজন বৃদ্ধা ব্যাটাছেলে জগাইকে কর্ত্তব্যবোধে যা কতক উত্তম মধ্যম দিয়ে তাহার বাকি চৈতন্যটুকু নিঃশেষ করে তাকে ঘাড়ে করে গ্রামে শিবতলায় এনে ফেললে। তখন গ্রামময় রটে গেছে জগা পাগ্‌লা হারু ভট্টাজির পরিবারকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে। জমিদার রতন চৌধুরীরও কানে পৌঁছিল। পরম বৈষ্ণব জমিদার তা সোৎসাহে বিশ্বাস করলেন। কেন না পাগলা জগার উপর তাঁর নানা কারণে আক্রোশ ছিল। জগাইয়ের এক বুড়ী মাসী ছিল—জগতে আপনার বলতে ঐ একমাত্র। শুনে সে কাঁদতে কাঁদতে এসে জগার চৈতন্যহীন দেহের

উপর আছাড় খেয়ে পড়ে "জগুরে বাবারে" বলে কেঁদে উঠল। পাড়ার ছুঁড়ি বুড়ি আদি করে সব ছুটে এল। আর কেও কারো কথার কান না দিয়ে শোক, ক্রোধ, ভয়, বিস্ময়, বিরক্তি প্রভৃতি নানা রকম অপ্রিয় ভাবকে নানা রকম ভাষায় সুরে ও স্বরে প্রকাশ করতে লাগলো। তবে সে বক্তৃতার সার হল, "ঘুঘপোড়া পাগলার কি কাজ গো! কি সর্ব্বনাশ করে গো!" পরিশেষে পাড়ার ছাড়া পাগল থাকলে যে কার কখন কি বিভ্রাট বাধাতে পারে তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়ে নিজ নিজ ছেলে পুলেকে পথে ঘাটে না বেরুতে উপদেশ দিতে দিতে ঘরে টেনে নিয়ে ফিরে গেল।

"বিশ্বাস করলেন না গ্রামের মধ্যে কেবল একজন। তাঁর নাম শিবরাম লাহিড়ী। তারাপুরের কালীবাড়ীর মালিক ও দেবীর সেবাইত। শিবরাম জগাইকে খুব ভালই চিনিতেন। বষ্ঠী বালা হতেই ধর্ম্মপ্রাণ ছিল। এই ধর্ম্মপ্রাণতাই পরে ধর্ম্মোন্মাদে দাঁড়ায়। যখন তার বেশি বছর বয়স তখন সে আস্ত পাগল হয়। কিন্তু কখনো কারো অনিষ্ট করতো না। পরে এই কালীর স্থানত করে পরে নাকি ভাল হয়। সেই অবধি সে কালী বাড়ীতেই পড়ে থাকতো। কালিদাসের সেবা করতো, পুজোর ফুল তুলতো, সাঁঝে ধূপ জ্বালতো, বলির পাঁঠা যোগাড় করতো ইত্যাদি।—গুরু গ্রামের ইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েছিল। বিনা কারণে লোকের উপকার করা তার একটা বিশ্রী নেশা ছিল। বিপদে আপদে,আধিতে ব্যাধিতে, গ্রামের অসহায় লোক জগা পাগলাকে খুবই চিনেছিল। তার দুইটী বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল, যার জন্য সে কারো কারো কাছে অপ্রিয় ছিল। সে স্পষ্ট কথা মুখের উপর বলতে ছাড়তো না; তা লোক-বিচার ছিল না। গ্রামের গুণ্ডামুণ্ডের কর্ত্তা জমিদার মহাশয়কেও রেহাই দিত না। আর শুধু পইতেধারীকে ব্রাহ্মণ বলে খাতির করতো না। তাহার দ্বিতীয় লক্ষণ ছিল—বৈষ্ণবের প্রতি রাগ। বৈষ্ণব দেখলেই সে তর্ক ও ঝগড়া বাধিয়ে বসতো। এক অকাট্য তর্কে সে বৈষ্ণবদের জব্দ করতো। বষ্ঠী পুরাণজ্ঞ ছিল কিনা, জানবার অবস্থা দেখলে সে তার ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড়তো—"তোদের কৃষ্ণ ত কালী ধরেছিল রে!" প্রতিপক্ষ পাল্টা জবাব করতে পারতো না। জগুর এই বা দোষ। তারপর সে নির্দ্দোষ। এ ছাড়া তার আর কোন উপদ্রব ছিল না। তার পাগলামীতে এমন একটা নিরীহতা ছিল যে লোকে তাকে স্নেহ না করে থাকতেই পারতো না। অথচ সেই সব লোকেই আজ বিশ্বাস করে বসলো। বষ্ঠী একটা নিরপরাধা মেয়ে মানুষকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে।

"শিবরাম লাহিড়ী কিন্তু কিছুতেই সে মিথ্যা অপবাদ মনে নিলেন না।

(

"বষ্ঠীরামের সামনে উঠতে তিন দিন লাগলো। তিন দিন পরে থানায় তার ডেরা হলো। ডেরায় বষ্ঠী সত্যকথা বলেছিল। কিন্তু সকলে সেটা অপরাধীর আত্ম-সমর্থনের মামুলী ওজর বলেই ধরে নিলো। বষ্ঠীর কথা যে সত্য, সে যে চোখের উপর অসহায়া অবলাকে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে যমের মুখ থেকে কেড়ে আনতে গেল বাঁপ দিল এ কথা কে বিশ্বাস করবে? নারাণ ভট্টাচার্য্যি যে তার গোড়া মেয়ে রেখেছিল! যে তার সত্য সাক্ষ্য দিত সে যে আজ পরলোকে। পরলোক হতে যে এ লোকে যোকাবেলা করা চলে না।

"বষ্ঠী খুনের অপবাদ-বোঝা মাথায় নিয়ে আর কপালে খুনীর কলঙ্ক-কালি মেখে গ্রাম থেকে বিদেয় হলো। যে এ কালি মুছে দিতে পারতো সে আজ কোথায় কোন অজানা অচেনা পুরীতে! জগতের গতিক দেখে বষ্ঠীর মস্তিষ্ক-বিকার পুরোমাত্রায় ফিরে এলো।

"বষ্ঠীরামকে দারোগা জেরা করলেন, "তুমি হারু ভট্টাচার্য্যের স্ত্রীকে ডুবিয়ে মেরেছ কেন?"

বষ্ঠী। আগে মেরেছি কিনা জিজ্ঞাসা করুন, তারপর 'কেন' হবে।

দারোগা। মেরেছো?

ব। না।

দা। কে মেরেছে?

ব। কালি কি মাদার।

দা। কে?

ঘ; মা কালি, মা কালি, যে মারবার কর্ত্তা! রাখবার কর্ত্তা বুঝলেন?

"দারোগা তোলাদিং হেডকনষ্টেবল ও একজন গ্রামবাসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি পাগল?" উত্তরেই বলিল, "আজ্ঞে হুজুর ও বদ্ধপাগল!" দারোগা সে দিনের মত আসামীকে হাজতে বন্ধ রাখতে হুকুম দিলেন। পরদিন কোর্টে চালান দিতে হবে।

"আদালতের বিচারে ষষ্ঠী দোষী বলিয়াই সাব্যস্ত হলো। হবেই তো, না হবার পথে কোনো বাধা যে ছিল না। তবে বিচারক বুঝলেন ষষ্ঠীর মস্তিষ্ক বিকৃতই বটে।

"সেশন আদালতেও ষষ্ঠী অপরাধী বলে সাব্যস্ত হলো। জজ্ সাহেব যখন জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি নারাণ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রীকে ডুবিয়ে মেরেছ?" ষষ্ঠী উত্তর করলে "আমি মারিনি।" "তবে কে মেরেছে?"—"কালি দি মায়ার? মারা যায় কাজ আর কে মারতে পারে সাহেব? —হাঃ হাঃ হাঃ কালি দি মায়ার, বুঝলে সাহেব। আই সট।" সাহেব বুঝলেন বেচারা ঘোর উন্মাদ খুন করলে তার যা শাস্তি যা ব্যবস্থা হয় তাই হলো। ষষ্ঠীরাম কলিকাতার পাগ্‌লা গারদে চালান হলো।

"লাহিড়ী মশাই তার জন্য লড়াই করতে সহরে এসেছিলেন। বৃথা আসা। ষষ্ঠী একটা বিকট হাসি হেসে হাতের লোহার বালাটা খুলে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে "ঠাকুর বাবা এইটে ফিরিয়ে দিও, কাকে মারো? টু কালি দি মায়ার হাঃ হাঃ হাঃ—লাহিড়ী মশাই বালাটা কুড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরলেন।

"বাগো একি তোর বিচার মা—!"

"লাহিড়ী মশাই সেইদিনই বাড়ী ফিরলেন। কয়েকদিন ধরে কেবলই ভাবতে লাগলেন, "সত্যি ব্যাপারটা কি ঘটেছিল? কেমন করে নারাণ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী ও ষষ্ঠীরাম এরূপ অবস্থায় জলে গিয়ে পড়লো? সংসারে কত ঘটনাই দিন রাত ঘটছে যা যার কার্য্যকরণ সম্বন্ধে চিরদিন লোকলোচনের বাইরে থেকে যাচ্ছে। কদাচিৎ লোকে তাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে মাথা ঘামায়। জড়জগতে জীবের গতি যেমন সরলরেখা পেলে অন্য রেখায় চলতে চায় না মনোজগতেও তেমনি মানুষের বিচারবুদ্ধি যা ধরতাই সিধে পথ ফেলে বাঁকা জটিল পথে যেতে চায় না। নারাণ ভট্টাচার্য্যি বয়ে সে চোখে দেখেছে! বস্ আর কে যাবা যাবার—ঐ কথাই কথা!" যাযোগ্ ভাবতে ভাবতে লাহিড়ী মশাইএর জ্ঞানপথে একটা কথার উদয় হলো। কাজলায় ঐ ঘাটে প্রায় কি বছরেই একটা না একটা ঐরূপ অপমৃত্যু ঘটে। হয় কেহ কুমীরের মুখে পড়ে, না হয় কেহ গভীর জলে স্রোতের টানে ডুবে মরে। হয় তো ভট্টাচার্য্যের স্ত্রীর ঐরূপ কোনো দুর্দ্দৈব ঘটেছিল, ষষ্ঠী তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটে। লাহিড়ী মশাই এটা সম্ভব বলে ভাবতে লাগলেন তত্ত্বই তাঁর মনে ঐটে সঙ্গত বলে হতে লাগলো। কিন্তু এ অনুমানের সপক্ষে অন্য কে বিশ্বাস করতে চাইবে? চিরকালের জন্য ষষ্ঠীকেই নারীঘাতক অপবাদ বহন করতে হবেই।

"লাহিড়ীর রাগ হল তার আজন্ম-সেবিতা দেবীর উপর। হঠাৎ লাহিড়ী মশাই একদিন দেবীর মন্দিরে গিয়ে বল্লেন—

"হায় রক্তখাকী তক্তের রক্ত কি এতই মিষ্টি—? তাই হোক্—এই পর্য্যন্ত তোর আজ থেকে। যতদিন না জগতের কাছে প্রমাণ করবি ষষ্ঠী নির্দ্দোষ ততদিন এ দরজা আর খুলবো না—গাছের জবা গাছেই শুকুক্। তবের বিচার কি চিরকাল এমনিই করবিরে বেটী—!"

সেইদিন হতে মন্দিরদ্বার বন্ধ পড়েছে। পূজারী পূজা নিয়ে ফিরে যায়——।"

যুবক নীরব হইল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে মন্দির গা ঢাকা দিয়া ফেলিয়াছে। সোপানে রমণী বসিয়াই রহিলেন —বুঝিবা বলার কের মিটে নাই আর শোনারও শেষ হয় নাই।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।

মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী *

মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী পরম পূজনীয়া স্বর্গীয়া তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী "গঙ্গাবাঈ" মহোদয়ার জীবন-বৃত্তান্ত অতীব হৃদয়গ্রাহী ও কৌতূহলোদ্দীপক। ভারতে প্রায় সর্ব্বত্র বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এই মহাতেজস্বিনী বিদুষী ধর্ম্মপ্রাণা মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর নাম সুপ্রসিদ্ধ। এই মহাপ্রাণার জীবনবৃত্তান্ত আমরা যে টুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী দাক্ষিণাত্যের রায়ের সংস্থানের বিখ্যাত রাও বংশোদ্ভবা। এই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণবংশে কোন সতীর শাপে হয়পুরুষ কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিত না। ইঁহার পিতামাতা কন্যারত্ন লাভ কামনায় কঠোর সোমেধা-ব্রত অবলম্বন করেন। মাতাজী ভূমিষ্ঠ হইলে এক মহাপুরুষ সদ্যজাত কন্যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া তাহার পিতামাতাকে বলিয়া যান "সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশে এ বালিকার জন্ম, কোনরূপে ইঁহার বিবাহ দিবেন না। ইনি কুমারীরূপী মহীয়সী শক্তির পরিচয় দিয়া অন্তর্হিতা হইবেন।"

মাতাজী পরিবারস্থ বালকগণের সঙ্গে যেমন বিদ্যা-শিক্ষা করিতেন সেইরূপ ললিতকলার চর্চ্চা ও অস্ত্রচালনা এবং অশ্বারোহণ শিক্ষা করিতেন। অশ্বারোহণে তাঁহার সমকক্ষ পুরুষের মধ্যে অল্পই ছিল। পরিবারস্থ বিদ্যার্থী-দিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন; রাজসংসারের মধ্যে একমাত্র কন্যা বলিয়া তিনি যারপরনাই সকলের আদরের পাত্রী ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে মাতাজী পিতামহের অনুমতি লইয়া কঠোর পঞ্চাগ্নি তপস্যা করেন।

মাতাজীর পূর্ব্বপুরুষেরা কিরাত রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করেন। আরোনির সর্দারেরা তাঁহার মাতৃল বংশ। তাঁহার পিতা ও মাতামহের মৃত্যুর পর মাতাজীর ভ্রাতা উক্ত রাজ্যসম্পত্তি যাবতীয় বিষয়ের অধিকারী হন, কিন্তু তিনি তখন বালক সুতরাং মাতাজী তাঁহার হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি অতীব প্রখরা ছিল।

ভ্রাতা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে মাতাজী মহারাণী তাঁহার হস্তে বিষয়ভার অর্পণ করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হন এবং অগস্ত্যকূটের জনশূন্য নির্জ্জন পার্ব্বত্যপ্রদেশে কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এই কঠোর তপস্যার জন্যই রাজনন্দিনী "তপস্বিনী" নামে অভিহিতা হন। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মে মাতাজীর প্রবল আকর্ষণ ছিল। তিনি উপনীত বালকগণের মুখে মাত্র শুনিয়া শুনিয়া বেদ মন্ত্রাদি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ আশ্চর্য্যজনক ছিল। নারী হইলেও তাঁহার কার্য্যকলাপ এবং শিক্ষা প্রভৃতি পুরুষের ন্যায় দৃষ্ট হইত। বেদে ও তন্ত্রে এবং অপরাপর শাস্ত্রেও প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকায় তিনি সর্ব্বশাস্ত্রেই বিশারদ ছিলেন। রমণী হইলেও তাঁহার হৃদয় পূর্ণজ্ঞানের আধার ছিল। বস্তুতঃ যাঁহারা মাতাজীর অন্তরাকৃতি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা মায়ের দেবীমূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিয়াছেন। তাঁহার বিজয়কীর্ত্তি কলিকাতার আদি মহাকালী পাঠশালা-ভবনে। যখন তিনি পূজাকক্ষ হইতে বহির্গতা হইতেন, তখন তাঁহাকে অল্পবয়স্কা কুমারীর ন্যায় বোধ হইত। মধ্যাহ্নে সেই মূর্ত্তি তেজস্বিনী পূর্ণযৌবনা রমণীরূপে এবং সায়াহ্নে বৃদ্ধারূপে দৃষ্ট হইত। মাতাজীর পদরেখায় সুস্পষ্ট পঙ্কজচিহ্ন অঙ্কিত ছিল এবং হস্ত ও পদতল সর্ব্বদাই আরক্তিম থাকিত। তাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত ছিল।

যে সময়ে রাজকার্য্যেরভার মাতাজী মহারাণীর হস্তে

* মাতাজী উৎসবে কাশিমবাজারের মহারাজের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্ত্তৃক পঠিত।

ছিল সেই সময়ে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। দক্ষিণের সমস্ত রাজা মহারাজা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মাতাজী মহারাণীকে সাক্ষাৎ ভগবতী স্বরূপা দেবীবৎ ভক্তি, মান্য ও পূজা করিতেন। এই কারণে তাৎকালিক কয়েকজন ইংরাজ রাজপুরুষ কর্তৃক তাঁহার প্রতি সন্দেহ হওয়াতে মাননীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে একদিন মাতাজী পাহাড়ের উপরে কোন এক দেবমন্দিরে পূজা করিতে গমন করিলে, রাজকীয় সৈনিকগণ সেই পাহাড় ঘেরিয়া করিয়া তাঁহাকে নজরবন্দীতে রাখে। অতএব সেই অবস্থায় তাঁহাকে ছয়মাসকাল পাহাড়ে থাকিতে হয়। কিন্তু দেশীয় সৈনিকেরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট বলিত "মা · জয় দুর্গা! আপনি অনুমতি করুন আপনাকে সম্মুখে রাখিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হই"। কিন্তু মাতাজী তাহাদিগকে রাজভক্তিসূচক উপদেশপূর্ণ নানাবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া নিরস্ত রাখিয়াছিলেন। মাতাজী মহারাণী সেই নজরবন্দী অবস্থাতে পাহাড়ের উপর দেবমন্দিরে থাকিয়াই ব্রাতার রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। তিনি বন্দিনী অবস্থায় থাকিলেও তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান দেওয়া হইত। তৎপরে যখন ভারতের কৃতপূর্ব্ব লাট লর্ড কানিং বাহাদুর শান্তি ঘোষণা করেন, তখন স্থানীয় রাজন্যবর্গের দরবারে মাতাজী মহারাণীকে সর্ব্বাগ্রে আসন প্রদান করাইয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করান হয়।

মাতাজী রমণী হইলেও তাঁহার হৃদয় শূরত্ব, নির্ভীকতা ও তেজস্বীতায় পূর্ণ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই অন্যকৃষির দুঃখ দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। তাঁহার একটী কথা আমাদের সকলেরই প্রাণে জাগে। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "বাক্তভাষার আলোচনায় মনুষ্যের আয়ুঃ সঙ্কুচিত হয়; ব্রহ্মবিদ্যের আলোচনায় পরমানন্দ লভে; আনন্দ-সমাযুক্ত দীর্ঘজীবন কেবল মোক্ষেচ্ছুদিগেরই পরমধন"। এই নীতিবাক্যের দ্বারা তিনি ভারতগভর্ণমেণ্টের আদরনীয়া হইয়াছিলেন। ইংরাজগণ তাঁহার যথেষ্ট সম্মানপ্রদর্শন করিতেন।

তাঁহার ভ্রাতা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মাতাজী মহারাণী দেশ পর্য্যটন ও তীর্থ দর্শনে বহির্গতা হন। যেখানে যাইতেন, সেখানেই একটী না একটী কীর্ত্তি রাখিয়া আসিতেন। মাতাজী যখন প্রথম দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হন, তখন তাঁহার সঙ্গে বহু লোক জন ও অনেক পণ্ডিত ছিলেন; ধন রত্নও যথেষ্ট ছিল।

বর্ত্তমান মহীশূরাধিপতির পিতামহ ও তদ্রূপ পণ্ডিত-গণের বিরচিত মাতাজী মহারাণীর স্তব স্তুতি বিস্তর আছে। লক্ষ্ণৌ সহরে মাতাজীর সহিত অনেকগুলি কৃতবিদ্য ও পণ্ডিত বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ হয় এবং হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকার স্বদেশ হিতৈষী সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহোদয়ের সহিত পরিচয় হয়। তিনি প্রথমে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া, তথায় রাজরাণীর ন্যায় কয়েক বৎসর থাকেন। সেখানে তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হয় কিন্তু তাহাতে মাতাজীর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি সহাস্যে বলিলেন "চোরেরা মুখাগীরের ভারী হাল্কা করিয়া দিয়াছেন।" মাতাজী যখন প্রথম রাজধানী হইতে বহির্গত হন, তখন তিনি কর্ণাটী এবং দ্রাবিড়ী ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানিতেন না সুতরাং সংস্কৃতেই কথা কহিতেন কিন্তু যখন কলিকাতায় শেষে আসেন তখন তিনি ভারতের প্রচলিত সকল ভাষায় লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারিতেন। সুতরাং অনেকেই বুঝিতে পারিতেন না যে মাতাজী কোন দেশীয় রমণী তাঁহার হস্তের বাঙ্গলা পুঁথি আছে। মাতাজী মহারাণী নৈমিষারণ্যে অবস্থান কালে তথায় এক শিব মন্দির এবং ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। সেখানে আলা সাহেব তাঁহার বিরোধী হইলেও, কমিশনার ডেভিস্ সাহেব তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় তিনি শিব মন্দির এবং ধর্ম্মশালা সুচারুরূপে সংস্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নৈমিষারণ্য পরিত্যাগের সময় তাঁহার পাণ্ডার হস্তে মন্দির ও ধর্ম্মশালার ভার অর্পণ করিয়া আসেন। অদ্যাপি সেই শিবমন্দির ও ধর্ম্মশালা বিদ্যমান আছে। তাহার পর মাতাজী নেপাল রাজ্যে চল্লিশ বৎসর বাস করেন। ক্রমে তথায় রাজগুরু পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার বরাবর স্বাধীন নেপালের উপর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলিতেন "নেপালই" স্বয়ং ভারতমধ্যে প্রকৃত একমাত্র হিন্দু রাজ্য বর্ত্তমান নেপালাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মাতাজী

মহারাণীর আশীর্ব্বাদ পূত্র। মাতাজী তপস্বিনী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সেই হিন্দুরাজা নেপালে বহুল সহিত চারি বেদ নিঃখাসান বেদান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদ্বারা লিখাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং বিধিপূর্ব্বক তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় এক বেদবিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই বিদ্যালয় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে এবং এখন সেই সকল বেদগ্রন্থ নেপাল রাজ সরকারের তত্ত্বাবধানে আছে। তিনি তাহারপর নেপাল রাজধানিতে শ্রীপশুপতিনাথের মন্দিরের নিকট গঙ্গামন্দির স্থাপন করিয়া স্বীয় তপস্যা প্রভাবে তথায় গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। গঙ্গামন্দির স্থাপন করিতে সংকল্প করিলে রাজ মন্ত্রী এবং প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা সকলেই তাঁহার বিরোধী হন। তাঁহারা নেপালাধিপতির সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন "মা, অবশ্যই বহু চেষ্টা করিয়াও এখানে কোন মন্দির স্থাপন করিতে পারেন নাই সুতরাং নেপাল রাজ্যে আপনার মন্দির কিরূপে হইবে?" কিন্তু মাতাজী চিরকাল দৃঢ়সংকল্প; গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "আমি যখন সংকল্প করিয়াছি তখন করিবই এবং হিমালয় হইতে বাগমতী নদীর উপর দিয়া মা জাহ্নবীকে এই মন্দিরে আনিয়া উপস্থিত করিব কেহই সীমায় বাধা দিতে পারিবে না; আমি একাকিনী ত্রিলোক বিজেতে আছি এক্ষণে আপনাদের সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে, আমার কিন্তু একমাত্র দৈব সহায়, পারেন আপনারা আমার গতিরোধ করুন।" তখন তিনি নেপালাধিরাজ বাহাদুরের সহায়তায় এক মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আষাঢ় মাসের রথযাত্রার দিবস হুলুহুলু-নাদিনী-পাপিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীকে সেই মন্দিরে আবির্ভূতা করিলেন। তাহারপর সিদ্ধসকলা মাতাজীর গঙ্গা মন্দির সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হইল। তৎপরে তিনি গঙ্গাদেবীর রথযাত্রা প্রচলন করেন। রথোৎসবেরদিন রাজমন্দির হইতে দেবীর বিগ্রহ এবং নেপালী পন্টন সেই রথ সহ গমন করে সে এক অপূর্ব্ব উৎসব। রথোৎসবের দিন প্রাতে মহারাণী মাতাজী তপস্বিনী পূজা ঘর হইতে বহির্গত হইলে নেপাল রাজসরকার তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "—মা আপনি নেপাল রাজ্য লইয়াছেন, যাহা কখনও নেপালে ঘটেনাই তাহা ঘটাইলেন।" মাতাজী হাসিয়া উত্তর করিলেন,—মহারাজ! আমি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছি, তাঁহার সম্মুখে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস উড়িতেছে নেপাল কি ছার ফুৎকারদিলে উড়িয়া যায়।" এই বলিয়া মাতাজীকে নেপাল পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন। নেপালের আবাল বৃদ্ধ বণিতা ও বর্দ্ধিষ্ণু লোক মাত্রেই মাতাজী দেবীবৎ পূজা করিতেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে আর নেপালে রাখিতে পারিলেন না। মাতাজী এইরূপ আরও অনেক স্থানে বহু কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মাতাজী মহারাণী দ্বারবঙ্গেও বহু দিবস ছিলেন। বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গেশ্বর ও তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় মহারাজা লক্ষীশ্বর তখন অতিশয় শিশু ছিলেন। মাতাজী তাঁহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং তাঁহারা উক্ত ভ্রাতাই স্নেহের যথেষ্ট প্রতিদান করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গেশ্বর বঙ্গের প্রধান কীর্ত্তি মহাকালী পাঠশালার অদ্যাপি সভাপতি ও ট্রাষ্টী আছেন। মাতাজী মহারাণী বারানসী ধামে সমাধিলাভের পূর্ব্বে সাধুবাবা সত্যনারায়ণসিংহকে আদেশ করিয়া যান যে, মহারাজকে বলিবে—"আমি বৃক্ষ রোপন করিয়া চলিলাম, মহারাজ আপনি জল সেচন করিয়া সেই বৃক্ষের পুষ্টি সাধন করিবেন, কালে তাহা ফলফুল-শোভিত মহাবৃক্ষে পরিনত হইবে বঙ্গদেশে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্যই এই মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা। ইহা রক্ষা করিলে আপনার পরম মঙ্গল হইবে, বংশবৃদ্ধি হইবে।" বাবাজী মহারাজ বাহাদুরকে মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর এই অন্তীম কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ দ্বারবঙ্গের রাজবংশ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌভাগ্য-জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমাধিভূমি, সেই লোক হিতার্থে আবাল্যব্রহ্মচারিণী সেই নিখিলজননী বঙ্গমাতাস্বিনী পরদুঃখকাতরা অলৌকিক প্রতিভাশালিনী রমণীকুলকুলবধূ ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃতজীবনা প্রাতঃস্মরণীয়া মনস্বিনী মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী মহোদয়ার কোন কথাই এপর্য্যন্ত মিথ্যা হয় নাই।

এই বাকসিদ্ধা মহাভেজস্বিনী রমণী যখন বিংশে অবস্থান করেন সেই সময়ে একবার তাঁহার বিসূচিকা

রোগ হয়। সকলেই তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া তাঁহাকে বাহির করে এমন সময়ে এক ধার্ম্মিক ধনীযুবক সেই মুমূর্ষু দেহের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার (সেবায়েৎ) ব্রাহ্মণকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া বলেন, "আমাদের বরাবর মনে সন্দেহ হয় এ স্ত্রীলোক নয় হয় পুরুষ না হয় নপুংসক। আমি আজি স্বচক্ষে তাহা দেখিব ইচ্ছা করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ লজ্জায় ও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠে এবং তাহার প্রদত্ত টাকা ঘুরে নিক্ষেপ করে। এই কথা কিন্তু মুমূর্ষু মাতাজীর কর্ণে প্রবেশ করে। চকিতের মধ্যে সেই নির্জ্জীব শরীরে জীবনীশক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতাজী নেত্র উন্মীলিত করিয়া ক্ষীণস্বরে সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন আমি পূজায় বসিব আমার স্নানের আয়োজন কর।" এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। মাতাজীর শরীরের অবস্থা যেরূপই থাকুক না কেন, প্রতিদিন রাত্রি চারি ঘটিকার সময় উঠিয়া স্নান করা ও ক্রিয়ায় বসা তাঁহার কখন বন্ধ হইত না।

সেই জমিদার পুত্র নির্লজ্জ যুবক মাতাজীকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া দ্রুতপদে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পরদিন মাতাজী কিছু সুস্থ হইয়া স্থানীয় যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিলেন। অতঃপর বসাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। সেই সমবেত ব্যক্তি মণ্ডলী মাতাজীর উপর বিচারের ভার অর্পণ করিলে তিনি তাঁহার চরণিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন—"উহাকে একশত জুতা গুনিয়া মার।" যুবক যা কতক জুতা খাইয়াই পলাইয়া গেল। তৎপরে "অত্যাচার করিবে ওজনাদিগ করিবে" বলিয়া তত্ত্ব দেখাইতে লাগিল। কিন্তু সেই নির্ভীকা তেজস্বিনী রমণী তাহাতে কিছুমাত্র ভীতা হইলেন না। তখন সেই যুবকের বৃদ্ধ পিতা আসিয়া মাতাজীর চরণে ধরিয়া বলিল "মা আমার ক্ষমা করুন আমার অবোধ পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। মাতাজী বৃদ্ধকে বলিলেন "তোমার পুত্র যদি শতবার চর্ব্ব পাদুকা প্রহার সহ করিত তাহা হইলে কোনও ভয় ছিল না, তোমার জীবিতা থাকার উহার কিছু হইবে না তবে তোমার মৃত্যুর পর তোমার পুত্রের যাহা ঘটিবে তাহা তোমায় শুনিয়া কাজ নাই। বস্তুতঃ সেই অতুল ধন সম্পত্তির অধিকারী যুবকের সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইলে সে দরিদ্রতা হেতু আত্মহত্যায় দেহ বিনষ্ট করে। এখন তাহাদের বংশে বাতি দিতে কেহ নাই। এ ঘটনা বেহার ও বারভাঙ্গার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। ইতিপূর্ব্বে বহুকাল হইল মাতাজী আরও দুইবার কলিকাতাভিমুখে আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন কলিকাতায় আসেন, তখন দ্বারিকানাথ মিত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রমথ বহু মান্যগণ্য ব্যক্তিদিগের নিকট আদর ও সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। তখন ব্যারিষ্টার পল সাহেবেরও সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় হয়। সেই সময়ে তিনি কালীঘাটে অবস্থান করিতেন। আমার পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিহিত মাতাজীর সাক্ষাৎ করাইয়া দেন ও আমার জ্যেষ্ঠাত্মজ জ্যেষ্ঠ দাদাকে পল সাহেব মাতাজী দর্শন করান। তিনিই একজন নারী হয় তাহার কি আর সন্দেহ আছে? যে রমণীর মুখে এমন উচ্চস্বরের কথা, সে রমণী যে নিশ্চয় শক্তিস্বরূপিণী, সে রমণী যে পল সাহেবের সহিত মাতাজীর পরিচয় করিয়া দেন যখন মাতাজী শেষ বারে কলিকাতায় আগমন করেন তখন বহুবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার দেওয়ানজী বাটীতে তাঁহার উত্তরাধিকারী পৌত্রিত্র শ্রীযুক্ত পরমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে আদর ও সম্মানের সহিত আপনার বাটীতে রাখিয়াছিলেন। এই স্থানে ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর প্রভৃতি বিস্তর ভদ্রলোক সমবেত হইতেন। মাতাজী পরম ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গুরু পরমহংস দেবের সহিত পরিচয় করিয়া দেন যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ তাঁহার হৃদয়ের পূজার সামগ্রী ছিল তাই তিনি সমবেত ব্যক্তিবর্গকে যোগবাশিষ্ঠের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন। এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা অদ্যাপি আমরা কখনও শুনি নাই। এরূপ সংসঙ্গ হইতে যে, রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত তথাপি কেহই জানিতে পারিতাম না।

সেই স্থান হইতে মাতাজী গয়াধামে যাত্রা করেন।

সেখানে তাঁহার সর্ব্বস্ব চুরি যায়। তাহার পর মাতাজী কিছু দিনের জন্য পুরুষোত্তম গমন করেন, সেখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাণ্ডাদের লইয়া বিপাকে পড়িয়া প্রচলন অন্ত মহা হুলুস্থূল করিয়া তোলেন। তিনি কোন স্থানে যাইয়াই স্থির থাকিতে পারিতেন না। একটা না একটা ব্যাপার লইয়াই থাকিতেন। তিনি বলিতেন—"কর্ম্মই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য"। তিনি তথায় শুদ্ধাচারে শ্রীজগন্নাথ দেবের পূজা ও ভোগাদির ব্যবস্থা এবং যাত্রী দিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া আসেন। সেখানে অবস্থান কালে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর প্রমুখ কয়েকজন কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আনয়ন করেন। মাতাজী কলিকাতায় আসিয়া কাশিম বাজারের মাননীয় মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কোড়ালিকোর্ট সুবৃহৎ ভবনে ১৩০০ সালের বৈশাখ মাসে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে গচ্ছিত স্বীয় তিন লক্ষ টাকার উপর নির্ভর করিয়া পরম লোকহিতকর স্ত্রীশিক্ষা কার্য্যে মনোযোগী হইয়া এই মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করেন। * এই বালিকা বিদ্যালয় দ্বারা তিনি প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশের একটী মহৎ অভাব মোচন করিয়া গেলেন। এই পাঠশালা স্থাপনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কুম্ভমেলায় আমি এই ভগবতীর প্রথম দর্শন পাই। মাতাজী সর্ব্বদা ব্রাহ্মভাবে থাকিতেন। তপস্বিনীর জটা মস্তকে ধারণ করিয়া মহারাণীর বেশে থাকিতেন বলিয়া বা দুর্গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেন না এবং উৎসবাদি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। স্বয়ং রন্ধন করিয়া সকলকে ভোজন করান তাঁহার খুব সুখ ছিল। তিনি অত্যন্ত পবিত্রভাবে সর্ব্বদাই অবস্থান করিতেন। কোন প্রকার অপবিত্র বা অপরিষ্কার তাঁহার স্পর্শ হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর শীহিত হইয়া পড়িত। কিন্তু তিনি পীড়িতাবস্থায় কোন প্রকার ঔষধাদি সেবন করিতেন না যোগ ক্রিয়ায় তাহার উপশম করিতেন। এইরূপে মাতাজী অনেকবার আসন্ন মৃত্যু হইতে দেহকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভিজ্ঞা ছিলেন সুতরাং যোগ বলে অনেকের কঠিন পীড়া হইতে মুক্তি দান করিতেন। তিনি একবার নর্ম্মদায় জলমগ্ন হন একবার ছিতল হইতে ভূতলে পতিত হন এবং তাঁহার পতিতা সহায় করিতে না পারিয়া ঈর্ষা প্রযুক্ত তাঁহাকে দুই দুইবার দুই লোকে বিষপান করাইয়াছিল। বলা বাহুল্য দুইবারই তিনি যোগবলে বিষ উদ্গীরণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। একবার মাতাজী বলিয়াছিলেন "আমি ইচ্ছা করিলে দেহ রক্ষা আরও কিছুকাল করিতে পারি বটে কিন্তু করিব না।" মাতাজী সহজে কাহাকে দীক্ষা দিতেন না। তাঁহার অনেক কার্য্য কলাপ সম্পূর্ণ রহস্যময় বলিয়া বোধ হইত। তিনি ১১৫ একশত পঁচাত্তর বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ভারতীয় বর্ত্তমান অনেক রাজা মহারাজের পিতা পিতামহের নিকট হইতে বহু সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিলেন। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম ও শাস্ত্র এই স্বয়ম্ভূ পরায়ণ বিদুষী মহিলার নিকট এত পূজ্য ছিল যে কেহ আকার ইঙ্গিতে হিন্দু শাস্ত্রের অনাদর দেখাইলে তিনি ক্রোধে অধীরা হইতেন। এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেন।

তাঁহার মতে সৎসঙ্গ বিনা মানবের জ্ঞান বা মঙ্গল হয় না। কেহ তাঁহার শরণাগত হইলে তিনি প্রাণপণে তাঁহার উপকার করিতেন। বিশেষতঃ যে সব কন্যাদায়গ্রস্থ ব্যক্তি তাঁহার নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইত। পরিশেষে তিনি পরমবংস রামকৃষ্ণদেবের ন্যায় রোগাক্রান্ত হন এবং সন ১৩১৪ সালের ৭ই বৈশাখ শনিবার অশোকাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজার দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মণিকর্ণিকার ত্রৈলোক্যের মন্দিরের সম্মুখে গঙ্গাগর্ভে বজরার উপর কুম্ভকে বসিয়া যোগাসনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র কাটিয়া সমাধি দান হয়। যেদিন মাতাজী সমাধিস্থ হন তৎপূর্ব্ব দিবস প্রাতে স্নান পূজা শেষ করিয়া

* ইনি ক্রমে এক বৎসরের মধ্যে ১০৮টী শাখা পাঠশালা সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে স্থাপন করেন।

বলেন "ইহাই আমার শেষ দান ও পূজা। কল্য ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে আমি এ নশ্বর দেহ-ত্যাগ করিব।" সেইদিন ৺কাশীর অন্নপূর্ণা মহাকালীর শাখা পাঠশালার সমস্ত কুমারীগণকে স্বহস্তে সুভোজ্য পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন এবং সকলকে বলিয়াছিলেন "বঙ্গবাসী হিন্দুসন্তান মাত্রেই কালে আমার এই কীর্ত্তিরক্ষার যত্নবান হইবেন।" ইহা দ্বারা বাঙ্গালী গৌরবান্বিত হইবেন।

বলা বাহুল্য হিন্দুবাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতি ও কল্যাণকল্পে বঙ্গমহিলাসমূহের নিত্যনৈমিত্তিক, পারিবারিক ধর্ম্মনীতি ও ব্যবহারনীতি শিক্ষার নিমিত্ত যে হিন্দুবালিকাবিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন সেই মহাকালী পাঠশালায় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি যখন বাঙ্গালায় আগমন করেন সেই সময় নগদ তিন লক্ষ টাকা, মণি মুক্তা কাঞ্চনাদি খচিত বহুবিধ অলঙ্কার এবং সুবর্ণ ও রৌপ্যময় পূজার বাসন তৈজসপত্র প্রভৃতি বিস্তর সামগ্রী সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন, সে সমস্তই একমাত্র মহাকালী পাঠশালায় অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ পাঠশালাই তাঁহার শেষ জীবনে একমাত্র প্রিয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। তাই মাতাজী মহারাণী শেষে বলিয়াছিলেন—"আমার ইচ্ছা ছিল মহাকালী পাঠশালায় সংস্থাপিত ব্রহ্মবেদ মূলে দেহ রক্ষা করিব কিন্তু পাছে লোকে আমার ভক্ত বাঙ্গালীদের নিন্দা করে, এই মনে করিয়া কাশীধামে সমাধিলাভ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। তিনি সমাধি লাভ করিলে পর তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী পাথরের সিন্দুকের মধ্যে তাঁহার দেহ রক্ষিত হইয়া তাহা মণিকর্ণিকা সম্মুখে গঙ্গা প্রবাহে বিসর্জ্জিত হইয়াছিল। তাঁহার ভিন্না পুত্র কাশী নরেশ স্বর্গীয় মাতার ন্যায় তদীয় সংকারের মহোৎসবাদি বারাণসী ক্ষেত্রে মহা সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কলিকাতার শ্রীযুক্ত ভক্ত বাঙ্গালী সন্তানগণ মহাকালী পাঠশালার ভবনে যাবতীয় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসমূহ শ্রীশ্রীকুমারী ভোজন ক্রিয়া দ্বারা হিন্দুর বালিকাগণকে সুভোজ্যে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং দেশে হিন্দু রাজত্ব ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই তাঁহার লোকান্তর সমনে মর্ম্মবেদনা প্রকাশ সভা সমিতি দ্বারা শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, আরকটে তাঁহার শ্রীযুক্তপুত্রও তাঁর সাধ্বী মহোৎসব শ্রাদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর মহাকালী পাঠশালা স্থাপনের প্রধান কারণ দেশের ধর্ম্মরক্ষা করা,—এ সংসারে ধর্ম্মই ইহলোক ও পরলোক সাধনের মূল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন—"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"; এবং "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কেবল ধর্ম্মেই মুখ্য বলিয়াছেন। ধর্ম্ম হইতেই সকল সুখের উৎপত্তি ও সমাবেশ হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে, সর্ব্বনাশ; কারণ অধর্ম্মাচারী গুরুদ্রোহ ব্রাহ্মদ্রোহ প্রভৃতি কোন পাপ হইতেই সঙ্কুচিত হয় না। এই নিমিত্ত ভগবান জন্ম মৃত্যু রহিত হইলেও ধর্ম্ম স্থাপন নিমিত্ত স্বয়ং বারংবার মর্ত্ত্যলোকে শরীর পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। সর্ব্ব জীব স্ব স্ব ধর্ম্মে মতি থাকিলে প্রায়ই অন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। ধর্ম্ম ধার্ম্মিকের অধীন। ধর্ম্মই ভারতবর্ষ বাসিদিগের মুখ্য শাস্ত্র। এই ধর্ম্ম শাস্ত্রেরই বলে এই বিশাল দ্বীপ ভারতবর্ষের নিখিল প্রজাপুঞ্জ পুরুষং সহস্র বৎসর সুখে পালন করিয়া কত শত হিন্দু রাজা অন্তে যোগিগণের প্রাপ্য পরম গতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য ভারতবর্ষে ধর্ম্ম স্ত্রীলোকদিগেরই অধীন। তাই গীতায় অর্জ্জুন বলিয়াছেন—"স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ শঙ্করঃ।" স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণ শঙ্কর উৎপন্ন হয়। তাই আরও তদুত্তরে উত্তর হইয়াছে—"দশ পুত্র সম কন্যা শিক্ষণীয়া প্রযত্নতঃ।" এক কন্যা দশ পুত্রের সমান, অতএব কন্যাকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হয়, কারণ নারীগণই সন্তানকে গর্ভে ধারণ, তাহার পালন, পোষণ, কুলবৃদ্ধি ও পতি পুত্র প্রতিবেশী বর্গকে সন্মার্গে প্রবৃত্ত করেন। এই দৃষ্টান্তকে আদর্শ করিবার জন্য মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর মহাকালী পাঠশালা স্থাপন। তাঁহার এই বালিকা বিদ্যালয়ে হিন্দুর প্রাচীন রীতি ও নীতি এবং ঋষি প্রোক্ত শাস্ত্রমার্গানুসারে বালিকাদিগকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ও গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম বিষয়ক

শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। সহস্র সহস্র বালিকার এই পবিত্র শিক্ষা প্রাপ্তিতে সমাজের কিরূপ অভূতপূর্ব উন্নতি হইতেছে তাহা সকলেই বিদিত আছেন। বালিকাদিগের পিতালয়ে ও বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে সকলেরই ইহাতে শিক্ষা হইতেছে কারণ তাঁহারা সকলেই এই সুনীতি শিক্ষার মূলে বেশ বুঝিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষ বাসী হিন্দু সন্তানগণের অপর দেশের আচার ব্যবহার অনুকরণ কোনরূপ প্রশংসনীয় নহে।

আমরা মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর একটীমাত্র কথা এস্থানে উল্লেখ করিলেই তাঁহার মনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক বিষয়েই প্রকাশ পাইবে। আদর্শ ব্যতীত কেহ কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। সেই আদর্শ স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় হইলেই অধিকতর আদরণীয় ও কার্য্যকরী হয়। স্বদেশীয় মহাপুরুষগণের আদর্শ জীবন হইতে শিক্ষালাভ করিলে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। ভবিষ্যতের আশা না থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই আর যে দেশের অতীত সৌরব আছে, তাহার ভবিষ্যতের আশাও আছে। এতএব উন্নতিই যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা অতীত যুগের স্বদেশীয় মহাত্মাগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, নীতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অগ্রসর হয়, তাঁহাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অতীতই ভারতবর্ষের সম্বল। পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক দেশেরই অতীত ইতিহাস এরূপ সমুজ্জ্বল ও সমুন্নত। ধর্ম্ম, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই ভারতীয় আর্য্য প্রতিভা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাই মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে আদেশ করিতেন, তাঁহার প্রেষ্ঠ উপদেশ ছিল—"স্বধর্ম্ম পরায়ণ হও"। তাঁহারই কৃপায় এই বহু বিপ্লব ও ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পরে আমাদের আবার সুদিন আসিয়াছিল। তাই বলিতেছি বর্ত্তমান কালে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও উন্নতি করে আন্দোলনটা ভারতবর্ষে কিছু প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন পদে পদে অনুভূত হইলেও শিক্ষার প্রণালী বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে এ কথা আমরা সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য। বর্ত্তমান যুগে, আমাদের দেশের এই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের দিনে এই ঘোর পরিবর্ত্তনের সময়ে মহারাষ্ট্র দেশীয় এই বিধবা সম্ভ্রান্ত মহিলা অধঃপতিত বঙ্গভূমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি একমাত্র হিন্দু ধর্ম্মের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া হিন্দু কুমারীগণের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে তাঁহার শেষ জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী-মহোদয়ার স্থাপিত মহাকালী পাঠশালার ন্যায় আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয় প্রতি গ্রামে গ্রামে স্থাপিত হওয়া উচিত, ভারতীয় মহিলাগণ স্বধর্ম্মানুমোদিত শিক্ষা লাভ করিয়া সুমাতা, সুগৃহিণী হউন এবং গৃহস্থাশ্রম সুখময় ও আনন্দময় করুন; কারণ যাঁহাদের ক্রোড়ে মনুষ্যজাতি লালিত হইতেছে—যাঁহাদিগের স্তন্যরসে মানবগণ পরিপুষ্ট হইতেছে, তাঁহারা ধর্ম্মের পুণ্যপ্রভায় উদ্ভাসিত হইবেন, স্নেহ প্রেম ভক্তির দিব্যরাগে রঞ্জিত হইবেন, তেজস্বিতা ও কোমলতার আধার হইবেন,—বিদ্যার বিমল দিপ্তীতে মণ্ডিত হইয়া দেবীরূপে মাতৃরূপে মানব-শিশুকে মনুষ্যত্বে ও মহত্বে বিভূষিত করিবেন এই প্রার্থনা—এই আকাঙ্ক্ষাই আমরা করিয়া থাকি। ভারতের দেবীকল্প বিধবা আর্য্য-নারীদিগকে মহাকালী পাঠশালা প্রকৃত দেবীত্ব নারীত্ব শিক্ষা দিয়া সেবা ও ত্যাগ-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুণ্যপীঠে বসাইয়া হিন্দুর স্ত্রী-শিক্ষার পবিত্র প্রণালী ও পন্থা প্রদর্শন করিয়া দিতেছেন। মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী সর্ব্বদাই সুকোমলমতি কুমারীগণকে উপদেশ দিতেন যে, প্রত্যেকে নির্ম্মল-চরিত্রা, গুণবতী, সতী-সাধ্বী হইবে, সুনীতি ও স্বধর্ম্মপরায়ণা হইলে ভবিষ্যতে সন্তানগণও সেইরূপ হইবে, তাহারা পবিত্র-চরিত্র ও নির্ম্মল-স্বভাব হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল এবং সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী কুমারিকা হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্রই একটী না একটী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। রামেশ্বর সেতুবন্ধ, বৈদ্যনাথধাম, বদ্রিকাশ্রম-কেদারেশ্বর প্রভৃতি পবিত্র তীর্থস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া যে কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন এই বাঙ্গালায় স্ত্রী-শিক্ষা কল্পে বালিকা-বিদ্যালয় সমূহ স্থাপন করিয়া অতিরিক্ত কীর্ত্তি

রাখিয়া গিয়াছেন। পুরুষ ও রমণী লইয়াই ধর্ম্ম-সংসার। এই সংসাররূপ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে রমণীগণ পুরুষের দক্ষিণ-বাহু স্বরূপ। তাঁহারা মাতৃরূপে আমাদিগকে লালন-পালন করতঃ ধর্ম্ম-জীবন গঠিত করিতেছেন, ভগিনীরূপে স্নেহ করিতেছেন—দয়তা দেখাইতেছেন। পত্নীরূপে জীবনের ধর্ম্ম-সঙ্গিনী হইয়া আছেন। রমণীগণ অশেষ প্রকারে পুরুষের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তাই আমাদের মাতাজী শিক্ষাচ্ছলে সর্ব্বদাই বলিতেন যে, স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে এবং নিজের উন্নতির প্রয়োজন বোধ করিলে সর্ব্বপ্রথমে রমণী-সমাজের প্রতি প্রত্যেক পুরুষেরই বিশেষ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করা উচিত। এই নিমিত্ত আমাদের সমাজ রমণীগণকে "গৃহলক্ষ্মী" এই যে বিশেষণ প্রদান করিয়াছেন ইহা হইতেই উপলব্ধি হয় অন্যান্য সভ্য-প্রদেশ অপেক্ষা কি উচ্চ ও পবিত্র ভাবের সম্মান ও সমাদর ভারতীয় আর্য্য-স্ত্রী সমাজকে প্রদান করা হইয়াছে! বস্তুতঃ রমণীগণ প্রকৃতই আমাদের গৃহলক্ষ্মী, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী দেবী, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। আমাদের ঐহিক হিতকারিণী রমণীগণের ধর্ম্মানুমোদিত ভূমিকায় যে বিশেষ প্রয়োজন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহাদেরই উপর শৈশবে সন্তানগণের সম্পূর্ণ ভার অর্পিত আছে। এই হেতু মাতাজী মহারাণী প্রায়ই আমাদিগকে বলিতেন—যে সকল শিক্ষার ভিত্তি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সে শিক্ষা কখনও সর্ব্বাঙ্গীন-সুন্দর নহে। এই নিয়মের বৈপরিত্য বশতঃই স্ত্রী-শিক্ষায় বিভ্রাট ঘটে। সেই কারণেই মাতাজী মহারাণীর মহাকালী পাঠশালার সৃষ্টি।

কোন্ দেশ কতদূর উন্নত হইয়াছে জানিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে দেশের রমণীকুল কতদূর উঠিয়াছেন। যে দেশের নারীকুল উঠিতে পারেন নাই, সে দেশের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয় নাই। কারণ স্ত্রীলোকই সমাজের প্রকৃত শক্তি। সুতরাং রমণী দুর্ব্বল থাকিতে সমাজ কখনও সবল হইতে পারে না। এখানে যে বলের উল্লেখ করা হইল, তাহা কেবলমাত্র শারিরীক বল নহে—শারিরীক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ বল। এই তিন প্রকার বল স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিরই পূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী। স্ত্রী-প্রকৃতি ও পুরুষ-প্রকৃতি উভয়ই বিকাশ-প্রবণ; সুতরাং তাহাকে বিকশিত হইতে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এই বিকাশের গতিরোধ করা জগৎস্রষ্টার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ; সুতরাং অধর্ম্ম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদিগের দেশে অধিকাংশ স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের বলের গতি বিপরীতগামিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষা-বিপর্য্যয়-নিবন্ধন মহিলাগণ প্রায় সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিরোধিনী হইতেছেন।

আমাদের দেশের স্ত্রীজাতিকে ঊর্দ্ধগতি-প্রবণ করিবার জন্য মাতাজী মহারাণী জগতের পুরাণাদি ইতিহাস হইতে অতীতের রমণী-রত্নের চিত্র লইয়া মহাকালী পাঠশালার কুমারীদিগকে উপহার দিতে দিতে চলিয়া গেলেন। সেই রমণীগণের চরিত্র-শ্রবণে আমাদের ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মী মাতৃ-স্বরূপা সুকোমলমতি বালিকাবৃন্দ যে নিশ্চয়ই উন্নত হইবেন সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পবিত্রচেতা দয়াবতী মাতাজী বঙ্গমহিলাগণের সম্মুখে যে পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল মাত্র যে স্ত্রীজাতির আদর্শস্থল এরূপ নহে, অনেক বিষয়ে পুরুষগণেরও আদর্শস্থল। আত্মোৎকর্ষে পুরুষজাতিকে রমণীগণের নিকট নিশ্চয়ই মস্তক অবনত করিতে হইবে।

পারিবারিক ধর্ম্মের মধ্যে স্ত্রীজাতির সতীত্ব-ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন গন্ধবিহীন পুষ্প, দিনমণিহীন মাণিক, মীনহীন সরোবর ও তরুহীন কানন অনুশোচ্য; সতীত্ববিহীন রমণী তদ্রূপ অনুশোচ্য। সকল ব্রত অপেক্ষা পাতিব্রত্য-ব্রত স্ত্রীর সুতরাং অতি কঠোর। এই ব্রত আত্মোৎকর্ষের পূর্ণ বিকাশ। প্রকৃত পাতিব্রত্য কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠানে আবদ্ধ নহে আত্মাভ্যন্তরীণ তন্ময়ত্ব ও সেই আত্মাভ্যন্তরীণ তন্ময়ত্বের বাহ্যাভিব্যক্তি—এই দুইটী ইহার অঙ্গীভূত। এই সতীত্বগুণে তারা-দময়ন্তী চিরদিন জগতের আদর্শরূপিণী আছেন।

সতীত্বগুণেই পতিকে দেবতারে পূজা আর কোন দেশের মহিলা কখন করিয়াছিলেন কি না জানি না। সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, শিরিস্তা-সতী, বহুলদা, চিন্তা, দ্রৌপদী, শকুন্তলা প্রভৃতি আর্য্য ললনাগণ চরিত্রের আদর্শে ও সতীত্বের উজ্জ্বল মহিমায় জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের

আধুনিক ইতিহাসেও রাজপুত-রমণীগণের সতীত্বের অধিত তেজ ও আত্মোৎসর্গের বীরত্বের অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারা সতীস্বরূপ চরিত্র-গৌরবে অদ্যাপি জগতের আদর্শস্থল হইয়া আছেন। রমণীর সতীত্ব ও আত্মোৎসর্গ পারিবারিক ও জাতীয় সুখের নিদানীভূত বলিয়া তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী আমাদের বঙ্গদেশে আগমন করিয়া সেই সকল আদর্শ সতীত্ব ও উৎসর্গীকৃত-প্রাণা রমণীকুলের ছবি তুলিয়া বঙ্গকুল-বালিকাগণকে উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বীরত্ব, দয়া দাক্ষিণ্য, পাণ্ডিত্য, রাজনীতি ও কুশলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে এবং আধ্যাত্মিক উৎসর্গে যাঁহারা ললনাকুলের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগেরও পবিত্র চিত্র আঁকিয়া সেই জগৎপূজ্যা নারীকুল-কুলমা মাতাজী মহারাণী আমাদিগের সুকোমলমতি বালিকাগণকে শৈশব হইতেই তাহাদিগের কোমলাঙ্গকরণে সন্নিবিষ্ট করিয়া সেই কোমলহৃদয় সংগঠিত করিতে করিতে পবিত্র স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই মহীয়সী-ভারতের প্রধান শাস্ত্র "ধর্ম্ম" সংরক্ষণ কার্য্য ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় রহিবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

"রেণু"

কর্ম্মক্ষেত্র ক্ষুদ্রই হউক আর বিরাটই হউক যেখানে সতীর্থের সহানুভূতি ও উদ্যুক্ত কর্ম্মকুশলতার অভাব সেখানে কোনও কাজে সফলতা লাভ করা কঠিন সমস্যা! যেখানে সুখ দুঃখের ভাগাভাগি আছে, হাসি কান্নার অংশ হিসাব আছে, যেখানে সহানুভূতি ও সহায়তা অযাচিত-ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে নিজেকে কোনও বিশেষ কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলে জীবনের মধ্যে বেশ একটু নবীনতা ও সাফল্যের আভাস পাওয়া যায়! যে কাজে সাধারণের হৃদয় বিনিয়োগ হয় তাহা অসাধ্য হইলেও সঙ্ঘবদ্ধ ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার বলে আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে। —তবে যেখানে সাহার্য্য নাই বিফল আছে, উৎসাহ নাই ইচ্ছাকৃত নিরপেক্ষতা আছে, কর্ম্মস্পৃহা নাই অলস-বাসকতা আছে, সেখানে কোন কাজ সম্পূর্ণ ত হয়ই না, বরং মানুষ ক্রমিক বিপর্য্যয়ের ঘাত প্রতিঘাতে নিজেকে স্থির রাখিতে না পারিয়া অমানুষ হইয়া উঠে! আবেষ্টনের মধ্যে উদ্যম হৃদয় সার্থক হয় বটে কিন্তু সময় ও পাত্রানুযায়ী না হইলে ছিন্নে বিপরিত হয়! আন্তরিকতা বিহীন অনুষ্ঠান বিধাতার অভিশাপে ভ্রষ্ট কাজেই আয়নায় মোছার চেষ্টার মধ্যে কর্ম্ম জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব নাই; বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মের মধ্যে সার্থকতা নাই!

—তাই বলি, কাজই যদি করিতে হয় তবে হৃদয় দিয়া কাজ কর! অন্তর হইতে যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি কর্ম্মের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে, হৃদয় হইতে যে নৈতিক বল তোমাকে সত্য ও ন্যায়ের দিকে উন্নত করিয়া রাখিবে সেই শক্তি ও সেই বলকে আহুতির অগ্নির মত চিরজ্বলন্ত রাখ! আশা চাই, উৎসাহ চাই, সহৃদয়তা চাই, সহানুভূতি চাই; প্রেম চাই অনুকম্পা চাই সবার উপরে "মানুষ" হওয়া চাই! মানুষের মধ্যে দেবতার পাদপীঠ স্থাপন করিতে হইবে! মনে রাখিও তোমরা

"অমৃতস্যপুত্রাঃ"।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে অবিরাম জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে তাহারই মধ্যে মনুষ্যত্ব পূর্ণবিকাশ লাভ করে। যে শক্তি মানুষকে এই সংগ্রামের জন্য অনুপ্রাণিত করিতেছে তাহারই নাম 'অন্তর্শক্তি'! কর্ম্মপৃহার মধ্যে এই শক্তির উন্মেষ এবং কর্ম্মকুশলতার মধ্যেই ইহার চরম অভিব্যক্তি। মানুষ কার্য্যক্ষেত্রে যখন এই অন্তর্শক্তির আভাস পায় তখন তাহার জন্য এই শক্তিকে সম্যগ্‌ভাবে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে! মানুষ তখন আপন আপন কর্ম্মসাধনার আয়োজন করে! জীবনব্যাপী এই কঠোর সাধনার মধ্যে যে সিদ্ধি তাহাতেই মহাশক্তি লাভ হয়!—আবার মহাশক্তির মধ্যেই মানবের চিরবাঞ্ছিত কাম্য "মুক্তি"!

•

কর্ম্মে কীর্ত্তি, সাধনায় সিদ্ধি ও ধ্যানে সমাধি লাভ করিতে হইলে, চাই একমাত্র সঙ্কল্পের দৃঢ়তা! এই সঙ্কল্পের অভাবেই মানুষের জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়! মানুষ যদি বুঝিতে পারে যে তাহার জীবনের সঙ্গে একটা মহান উদ্দেশ্য জড়িত আছে, বিধাতার আশীর্ব্বাদ ও শুভইচ্ছা লইয়া সে এই পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাহা হইলে বাহ্যজগতের ব্যর্থ কোলাহল হইতে তাহার জীবনকে সরাইয়া উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারা তাহার পক্ষে সহজ হয়। এই যে ধারণা Every life has its mission to fulfil এরই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মধ্যে এমন একটা বোধশক্তির উন্মেষ হয় যাহার দ্বারা অনিত্য সুখ ও তুচ্ছ স্বার্থের প্রতি একটা উপেক্ষা জন্মায়, তখন মানুষ নিত্য বস্তুর সন্ধান চায়!

নিত্যের সাধনা ও অনিত্যের বর্জ্জনেই ভারতবর্ষ চিরদিন অধ্যাত্মজগতে শ্রেষ্ঠস্থান পাইয়া আসিতেছে! এই নিত্যের জন্য ঐকান্তিক সাধনার মধ্যেই মানুষের ("Self-realisation") আত্মপরিতৃপ্তি।

এজীবন আর কয় দিনের জন্য?—যে কয়দিন আছে কোনও রকমে কাটিয়া যাইবে, শুধু শুধু বেশের জন্য জন্ম করিব কেন?—ইত্যাদি চিন্তা মানুষের জীবনী-শক্তিকে দূষণ করিয়া ফেলে,—উচ্ছিষ্ট কর্ম্মে শিথিলতা এবং অবহেলা জীবনের প্রতি একটা নিরপেক্ষতা আনিয়া দেয়!

"অপায়ঃ খলপায়ুঃ" "সমস্ত আয়ুঃ" (Life is short, Art is long) এ চিন্তা করিব শুধু কর্ম্মসম্পাদনের সময়, জ্ঞান অর্জ্জনের সময়;—তাহাতে মৃত্যুর ভবিষ্যত ভীতি নাই, অলস জীবন যাপনের জন্য আগ্রহ নাই! কাজ করিবার পূর্ব্বেই যদি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া নিজেকে মৃত্যুর অন্ধপথে অগ্রসর করিয়া দিই তাহা হইলে কর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা ত থাকেই না বরং একটা অলস দুশ্চিন্তা আসিয়া সমস্ত জীবনকে দুর্ব্বিসহ করিয়া ফেলে!

হয়ত জীবনব্যাপী কঠোর সাধনায়ও সিদ্ধির সন্ধান পাইলাম না তাই বলিয়া বলিব কি এজীবন আমার ব্যর্থ হইল?—আমার জীবনের সমস্ত ধ্যান-ধারণা কর্ম্ম-সাধনা একাগ্রতাও নিষ্ঠা লইয়া আবার জন্মগ্রহণ করিব! বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে যে শত শত জীবন একসূত্রে বাঁধা আছে! আমাদের মনে রাখিতে হইবে

We die to live.

কর্ম্মজীবনের মধ্যে মৃত্যুর অধিকার নাই এ বিশ্বাস যাহার আছে সে এই ধর জগতে অমর!

মৃত্যুর বিভীষিকা তাহার চক্ষে অভিনয় মাত্র! সে বলিবে Why? Death is Life, its other half transformed; It is a change, and a change for the better.

জীবনের মধ্যে সে কখনও কিছু হারায় না, খোল আনাই তাহার লাভ!

জন্মে তাহার জীবনের অভিষেক, মৃত্যুতে তাহার অমরত্ব লাভ! এই জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া আত্মার যে ক্রমিক সাধনা ইহকাল পরকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছে, সেই সাধনায় তাহার জীবন মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হয়!

সেই অনাদি অনন্ত শান্তমুক্ত পরব্রহ্মের চরণ নিম্নে জগতের সমস্ত সঙ্গীত বিশ্বসুরে উদ্গীত হইতেছে—সেখানে দুঃখ নাই, শোক নাই, জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, আছে শুধু "আনন্দ"।

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

বিন্দুর কথা

(একটি চিঠি)

"বোন,—আমার বিয়ের কথা শুনি শুনতে তুমি অনেক বার ইচ্ছে প্রকাশ করেছ, আজ একটু সময় পেয়ে লিখছি।

"যখন আমি সবে ছেড় বছরের আমার বাবা আর মা, দুজনাই তখন মারা যান। তাঁদের কথা কিছুই মনে নেই। এ অভাগিনীর দুরবস্থা তখন থেকেই আরম্ভ হল। সবই লিখছি। কিন্তু বোন, প্রাণের ভিতর বড়ই একটা দুঃখ রয়েছে যে বাপ মা কে কখন সেবা করতে পাই নি। মা বাপ না থাকা যে কি, আমার মত অবস্থায় না পড়লে কেউ জানতে পারে না।

"যাঁর আশ্রয়ে নারায়ণ আমাকে ফেলে দিলেন, তিনি কাকা, আমার বাপ মার সঙ্গে কাকার আর কাকীমার কেমন ভাব ছিল জানি না—তবে শুনেছি তাঁরা সুখকার ছিলেন না। বোন, আমি নারায়ণকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দি, যে আমি ছেলে বেলা থেকেই আপনা আপনি, কাজ কর্ম্ম নিতে পেরেছি—কারুর মুখ পানে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় নি, কারুর মতের অপেক্ষা করতে হয় নি। আমার বাপের সামান্য কিছু ছিল, যার সামান্য কিছু গহনা ছিল—বাবার অবস্থা ভাল ছিল না। কিছু ছিল কিনা, নারায়ণ জানেন—জানতে করবার ইচ্ছে কখনও হয়নি।

"কাকার একটী ছোট ছেলে ছিল, আর চারটি মেয়ে ছিল। দুটি মেয়ে আমার বড়, দুটি ছোট। কাকা বীরভূমে মোক্তারী করতেন। আমি সেই সংসারে এসে, তাঁর ছেলে মেয়েদের মধ্যেই মানুষ হতে আরম্ভ করলাম।

"অনেকদিন পর্য্যন্ত কাকার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কাকাকে আর কাকীমাকে, বাবা আর মা বলেছিলাম। তারপর যখন ঠিক মাথা ধরিয়ে দেওয়া হলো, তখন থেকে যেন একটা নূতন কিসের কেমন ভাবের মধ্যে এসে পড়লাম বলে মনে হত।

একটু একটু বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারটা যেন আমাকে চিনে ফেলতে লাগল। কাকার ছেলে মেয়ে রাখা কেবল আমারই কাজ ছিল। কাকার প্রত্যেক ছেলে মেয়ের সমস্ত ভার আমার উপর ত ছিলই, তা ছাড়া, সংসার যেন কাকীমার নিকট বড়ই ভারী বলে ঠেকত। আমি বেশ বুঝতে পারতাম, আমার জন্যে কাকীমার সমস্ত কাজই যেন অপেক্ষা করত। তাঁর নিজের মেয়েদের তিনি কখন কাজ কর্ম্ম করতে বলতেন তাঁদের—তারা ও করেনি। আমাকেই বলতেন—সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত আমিই ভূতের মত খেটে বেড়াতাম। শরীরে কখন কখন সইত না। কিন্তু এত কাজ কর্ম্ম করে আমি বড় খাটি পিটে হয়ে পড়েছিলাম, আর পাড়ার সবাই আমাকে বড় সুখ্যাতি করত। তা আবার কাকীমার সইত না। মাঝে মাঝে বড়ই গালাগালি দিতেন, আর আমি চুপ চুপ করে সে ঘরের আড়ালে গিয়ে কাঁদতাম। তাঁর নিজের মেয়েরা বিয়ের পরও কাজ কর্ম্ম শেখেনি শ্বশুর শাশুড়ী নিকে করে। কাকীমা আমায় বড় অন্যায় করেও বকতেন। একদিন ছোট খুকি ঘাটে গিয়ে একটা বিনুক জলে হারিয়ে ফেলে ছিল, আমি কাকীমাকে বলেছিলাম। ছোট খুকী বলে, 'না মা, ওই ফেলে দিয়ে আমায় দোষ দিচ্ছে" কাকীমা তাই শুনে আমাকে মেরে মেরে প্রায় অজ্ঞান করে ফেলেছিল। একদিন কাকীমা বলে, 'বিন্দু ত আছে তবে আর কিটাকে রেখে কি দরকার?" কাকাবাবু তাই শুনে কিটাকে দূর করে দিলেন—আমাকে বল্লেন, "বিন্দু তুই মা কাজ কর্ম্ম করবি।' আমি মনে মনে ভাবলাম, যদি আমার দিয়ে কাকীমার একটু খরচ কমে, তাতে আমার উপর একটু ভাল নজর হবে। বোন, কিন্তু আমার চেষ্টায়ও তাঁদের যেন মন পেতাম না—মাঝে মাঝে বড়ই খারাপ ব্যবহার করতেন আর

আমি ভাবতাম, বাপ মা না থাকলে কি স্নাই হয়। কাজ কর্ম্ম কিন্তু আমি কাকীমার চেয়েও ভাল করতাম।

"বোন, এত কষ্টের মধ্যেও, এত দুঃখের মধ্যেও একটু সুখ ছিল। সেটুকু না থাকলে আমার জীবন থাকত না। আমাদের পাশের বাড়ীতে এক মুন্সেফবাবু নাম করার দরকার নেই বাসা নিয়েছিলেন। তাঁর দুটি ছেলে, আর দুটি মেয়ে ছিল। একটি ছেলে আমার চেয়ে ৩।৪ বছরের বড়, একটি ২।১ বছরের বড়। মেয়ে দুটির একটি আমার সমান, অপরটি কিন্তু ছোট। বড় ছেলেটির ডাকনাম ভুটান, ছোটটির নাম পুরু। তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে আমরা যেতাম, তারাও আমাদের বাড়ী আসত। তাদের মা আমায় বড় ভালবাসত। একটু অবসর পেলেই—অবসর ত ছিলই না—তাদের বাড়ী গিয়ে খেলা করতাম। তাদের মাষ্টার ছিল, তারা লেখাপড়া করত। আমিও তাদের কাছে গিয়ে লেখাপড়া শেখা আরম্ভ করেছিলাম। তাদের বই নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে ক খ থেকে আরম্ভ করে লিখতে পড়তে শিখেছিলাম। কাকীমার ভয়ে বাড়ীতে কোন দিন পড়তে চেষ্টা করিনি। ভুটান, পুরু, এরা আমায় পড়া বলে দিত। পুরুই একটু বেশী মাষ্টারী করত, আর আমি তারই পরপাপর একটু বেশী বুদ্ধিমান—ভুটান বয়সে একটু বেশী বড় ছিল আর গম্ভীরও ছিল। বেশ লিখতে পড়তে শিখেছিলাম। আমার খুড়তুত বোনরা লেখাপড়া বড় পছন্দ করত না, এবং শেখেও নি। পুরুদের বাড়ীর সঙ্গে আমার বেশ আত্মীয়তা হয়ে গেল—কাকার বাড়ীতে আমার কি অবস্থা তা বোধ হয় তারা বেশ জানতে পেরেছিল। তা না হলে শুধু আমাকেই এত স্নেহ করত না। কই, আমার কাকীমার ছেলেমেয়েদের কথা ত তারা বলত না। আমার অদৃষ্টে আর যে কষ্টই থাক না কেন, এ সুখটুকু বরাবরই ছিল, যে আমার স্বভাব যে দেখত সেই আমায় ভালবাসত। লোকের মন আকর্ষণ করবার যেন একটা ক্ষমতা নারায়ণ আমাকে দিয়েছিলেন। বোন, পুরুদের সংসারটা আমার কাছে এতই ভাল লাগত, আর আমার কাকীমার ব্যবহার এতই অসহ্য হয়ে উঠত, যে কখন কখন মনে হত যে পুরুদের বাড়ীতে গিয়ে ঝিনে বাইনেতে শুধু চারটি খেয়ে, চাকরাণী হয়ে থেকে জীবন কাটাব। কিন্তু প্রাণের কথাটা মুখফুটে বলতে পারি নি, কেউ শোনেও নি। কিন্তু না বলেও একজন শুনেছিলেন—নারায়ণ। তিনি আমার প্রাণের ভিতর কান দিয়ে সবই শুনেছিলেন। যাক্। মুন্সেফবাবু ৪ বছর ছিলেন। তিনি আমাদের স্বজাতি ছিলেন, এবং এই চার বছরে ওদের সঙ্গে যতদূর ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব তা হয়েছিল। পুরুর সঙ্গেই বেশী হয়েছিল। তাকে অনেক দুঃখের কথা বলতাম আর সে আমায় তার মাকে বলত। পুরুর সঙ্গে দিনের মধ্যে দুই একবার খেলা রোজই হত। আমি না গেলে সে এসে ডেকে নিয়ে যেত,—আর বোলত, "ওর কাকীমা বড়ই পাজী।"

"তখন আমার বয়স ১১ বছর। আমার কাকার বড় মেয়ের বিয়ে হবে গেল। বিয়ে হওয়া এই প্রথম দেখলাম। বিয়েতে কাকার অনেক টাকা খরচ হয়েছিল। কিন্তু ওদের কপাল বড় মন্দ। বিয়ের অল্পদিন পরেই জামাইয়ের এমন অসুখ হয়ে পড়েছিল যে, কাকার চের টাকা চিকিৎসায় খরচ হয়ে গেল। কাকার দেনা হল। এইসব জন্যে কাকা ক্রমেই বড় খিটখিটে হয়ে পড়লেন। কাকীমা ত আগে থেকেই অমনি ছিলেন। জামাই সেরে উঠল। জামাইয়ের বাপ-মা তেমন পয়সাওয়ালা ছিল না শুনেছিলাম।

"এর ভেতর পুরু ধনি-টনি হয়ে চলে গিয়েছে। "বোন, ছেলেবেলা থেকেই আমার ভাবনাটা আমার নিজের বড় বেশী হত। কিছু দেখলেই আমার নিজের বিষয় বড় একটা চিন্তা এসে আমার মনটাকে একটু আঁধার করে ফেলত। বোন, তোমায় না লুকিয়েই বলছি, যে আমার কাকার বড় মেয়ের বিয়ের পর আমার মনে কখন কখন হত যে, আমিও ত মেয়েমানুষ, আমারও ত বিয়ে অমনি করে হবে। কিন্তু আমার ভাবনা হত, কে আমায় বিয়ে দেবে, কে টাকা দেবে—কাকা আর কাকীমা ত কেউই আমায় ভালবাসে না। বোন, প্রাণের কথা মুখ ফেটে বেরিয়ে এল। কিন্তু এমনি সব মেয়েদেরই হয়—বোন, বিয়ের কথা, স্বামীর কথা, কোন মেয়েমানুষকে শেখাতে হয়?

"এর দুই এক বছর পরেই কাকার মেজমেয়ের বিয়ে হল। কাকার কিছু দেনা হয়ে পড়ল। সংসারে যেন

আর শান্তি রইল না। বোন, সংসারটা যেমনই হোক, আর আমার সঙ্গে তারা যাই কেন করে থাক, তাদের নিজেদের ভেতর ত শান্তি ছিল। কিন্তু এখন যেন সব কেমন হয়ে গেল—মেয়েগুলো যেন সংসারকে মুড়ে ভেঙে দেয়। আমরা—নারী—কি অবলা?

"বোন, এখন যেন একটা ভাবনা বেশ এক একবার ফুটে উঠত। মাঝে মাঝে মনে হত, এবার যদি কারুর বিয়ের পালা হয়, তবে হয় ত হবে আবার।

"পুরু আমায় চিঠি লিখত। আমিও লিখতাম। তাকে সব জানাতাম। সে লিখেছিল তার বড় দাদার বিয়ে হবে—লোক পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে। আমি ঠাট্টা করে লিখেছিলাম, এবার তোমার নিজের পালা এলে আমায় নিয়ে যেয়ো, যাব। উত্তরে লিখেছিল,আমার বিয়েতে সে আসবে। কিন্তু প্রাণের ভিতর এক একবার মনে হত, তার বিয়ে, আর আমার বিয়ে—কার সঙ্গে কার তুলনা।

"পুরুর কথা আপনা আপনিই মনের ভিতর উঠে পড়ত, যত কিছু সুখ আর দুঃখ, সবার কাছেই যেন সে থাকত। বোন, আমার প্রাণ যেন তাকে গ্রহণ করবার জন্যে সমস্ত দুয়ার অবারিত,—উন্মুক্ত করে রাখত। বোন, কথাগুলি যেন একটু মিলিয়ের মত বলছি,—তুমি হয় ত কি ভাবছ,—কিন্তু যেন বন্যার জলের মত আমার অতি গোপন ভাবনাগুলো প্রবল হয়ে বেরিয়ে এসে সমস্ত কূল-কিনারা ছাপিয়ে ফেলেছে। আমার মন সর্ব্বদা তার কাছে পড়ে থাকত; তাকে দেখতে, তার কথা শুনতে, তার কাছে যেতে যেন একটা তুফানের ইচ্ছে হত। অনবরত মনে হত যে যদি এমন কোন ক্ষমতা থাকত, যাতে করে দূর থেকে তাকে দেখতে পেতাম, তবে আর কিছুই চাইতাম না। সে কোথায় আছে, কি করছে, কেবল তাই মনে হত। জ্যোৎস্না রাতে মনে হত, জ্যোৎস্নায় সমুদ্রে পুরু থাকলে, তাকে নিয়ে সাঁতার দিয়ে, আর জ্যোৎস্নায় ডুবে ডুবে বেড়াতাম। বাগানে, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে যখন ফুলগুলির বাস এসে বিভোর করত, তখন যেন সেগুলি একটা অভাবের সংবাদ দিয়ে যেত। যখন নীল আকাশের নীচে দিয়ে সূর্য্য ডুবে যেত, তখন মনে হত ওটা পুরুর কাছে যাচ্ছে। যেদিন তার চিঠি পেতাম; সেদিন আমার আনন্দের আর সীমা থাকত না—চিঠিখানাকে বুকের ভেতর চেপে ধরতাম, আর মনে হত, ওই চন্দ্র, সূর্য্য, জ্যোৎস্না, হাসি, বাতাস গন্ধ আরো কত কি তারা পৃথিবী ত আমার নয়—যদি পুরুকে না দেখতে পাই, তবে সবই বৃথা। নারীজীবনে আমার মত অবস্থায় পড়লে, সবারই এমন হয়। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, পুরু আমার জীবনের এক অনন্ত সুখের কারণ। যখন মনে হত, এবার ত তার বিয়ের পালা, তখন যেন একটা ভয় এসে মনটাকে আমার করে তুলত। আবার ভাবতাম তাকে দেখেই আমার সুখ—না হয় তাদের বাড়ীর চাকরাণী হয়ে থাকব।

"বোন, মন এমন কেন হত, বলতে পারি না, কিন্তু হত। এ অবস্থাকে কি বলে, তাও জানি না। যদি এই অবস্থাকেই ভালবাসা বলে, তবে আমি ভালবেসেছিলাম, আমার প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম, আমার হাসি, কান্না, আমার জ্যোৎস্না, চাঁদের আলো, ফুলের বাস, মলয়পবন—, এই কত কি তারা পৃথিবী দিয়ে ভালবেসেছিলাম। বোন, তুমিও নারী, তুমিও ভালবেসেছ,—তুমিও আমার মনের ভাব বুঝতে পারছ। বোন, আমরা নারী, আমাদের ভালবাসা প্রাণের ভিতর কোন এক অতলে পড়ে থাকে—সেটার কথা আজ তোমায় এমন করে বলে ফেলেছি। কিন্তু—তোমার মন দিয়ে তুমি কিন্তু যাচা দিয়ো। পুরুষমানুষের ভালবাসা কেমন, একবার পুরুষ হয়ে জন্ম নিয়ে বুঝতে বড় সাধ হয়।

"আমার বিয়ের কথা একটু আধটু হচ্ছিল। বাড়ীতেও কখন কখন একটু আধটু শুনতে পেতাম, আবার পাড়াতেও শুনতে পেতাম। কথাবার্ত্তাও কোন কোন জায়গায় হচ্ছিল। বিয়ের কথার সঙ্গে টাকা, খরচ পত্রের কথা এসে পড়ত। আমরা ত। আমার কাকীমা যখন যখন বলতেন, না হয় থাক,—এখন এর বিয়ে দিয়ে কাজ নেই। কাকাবাবু বোকার মানুষ, তিনিও তাতেই মত দিতেন। আবার কখন কখন বলতেন, লোক নিজে আছে, মেয়ে সেয়ানা হয়েছে, দুর্নাম হয়ে উঠবে। যেমন করে হক একটা ঘরে বেঁধে দিতে হবে। বোন, আর কি তোমায় বলব, আমার বিয়ের

কথা নিয়ে কাকা আর কাকীমার মন কথা বলে এত বিরক্ত হত যে, তাঁরা আমাকে দেখতে পারতেন না, আমার সঙ্গে কথা কইতেন না। কাকীমা বলতেন, যদি লোক-নিন্দের ভয়ই এত বল, তবে নিজের ছেলেমেয়েকে পথে বসিয়ে লোকনিন্দে এড়াও—না হয় গলে দড়ি দিয়ে মরে যেতে বল। আমি যেন টের পেতাম, আমার বিয়ে নিয়ে বেশ একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হল। আমার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ওঁদের মনে একটা ভয়ানক বিরক্তি এসেছিল, আর সেই জন্যে ওঁরা আমাকে বড় যন্ত্রণা দিচ্ছিলেন, আর লাঞ্ছনা করছিলেন।

"বোন, নারীজীবন লাভ করে যার ধন, মন ও বল নেই, তার কিছুই নেই। আমার কি হবে, কেনই বা এদের সংসারে অশান্তি এনেছি, কেনই বা এরা আমার জন্যে টাকা খরচ করবে, এই সব চিন্তা এসে মনকে মাঝে মাঝে বড় খারাপ করত। আবার বোন, কখন কখন সমাজের কথা মনে হত। সমাজ টাকার জন্য যেয়েওয়ালা লোককে যে কি কষ্ট দেয়, তা মনে হলে বড়ই দুঃখ হয়। ভগবান কি গরীব দুঃখিনীর প্রতি কোনই লক্ষ্য করেন না? এই সব মনে করে বসে বসে একা একা কান্নাকাটী করতাম, আর ভগবানকে স্মরণ করতাম। কখন কখন পুরুষবাবুকে চিঠি লিখে মন পাতলা করতাম।

"যেদিন সম্বন্ধ হচ্ছিল, টাকার জন্যে সব ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তারপর কিছুদিন সব চুপচাপ রইল আমিও ভাবলাম, যাক ভালই হল, আর গোলমালে কাজ নেই। লাঞ্ছনায় লাঞ্ছনায় আমার শরীর একেবারে জর্জ্জরিত হয়ে গিয়েছিল। সব কথাই পুরুষকে—এখন থেকে পুরুষবাবুকে, তাল মান তুমি ত জান,—পুরু ত এখন বড় হয়েছে, আর আমল করে নাম ধরে লিখতাম না—সব কথাই তাকে লিখতাম।

"বোন, তারপর হঠাৎ একদিন যে কথা শুনতে পেলাম তা বড় ভয়ানক। আমার কাকার এক জামাতা ছিল—কাকার কাছে কয়েকশ টাকা পেত। সে পিশাচ মহাজনটা এক ঘৃণ্য জীব,—ওকে দেখলে ওদ্বিকের লোক স্নান করে। চরিত্রের কথা জানলে ওকে কাছে আসতে দেয় না। দুটো বিয়ে করেছে, কিন্তু ছেলেপিলে হয় নি। এই জন্যে সে আবার বিয়ের সন্ধান করছিল। তার দুটো বউই বেঁচেছিল। তার আবার কি এক রকমের ব্যাধি ছিল বলে, কেউ তাকে কাছে বসতে দিত না। তারই তরফ থেকে নাকি কথা এসেছিল, যদি আমাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে তার সমস্ত পাওনা ছেড়ে দেবে, এবং ভবিষ্যতে কিছু কিছু টাকা দিয়ে সাহায্যও করতে পারে। শুনলাম কাকা আর কাকীমা আগ্রহে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন—সেখানেই আমার বিয়ে হবে। এক রকম কথাবার্ত্তাও ঠিক হয়েছে।

"বোন, তখন আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, সংসারে আমার কেউ নেই। আমি বলেছিলাম, আমার বিয়ে না হয় নেই হল—ওখানে দেবার দরকার নেই। বলেছিলাম, যদি টাকার জন্যেই ওখানে বিয়ে দেবার দরকার হয়ে থাকে, তবে সে টাকা না হয় আমি ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ করে শোধবার করে দেবো।—আমার এ সব কথায় তাদের ভয়ানক রাগ হল, যা না বলতে হয়, তাই বলেন। বোন, সংসারে কতই সহ্য করেছি, মনে হলে প্রাণ কেঁদে ওঠে। এসময় আমার মনে হত, আমার নারীজীবন আর আমার ভবিষ্যতই আমার শত্রু। আমি এত বলেছিলাম, তবে আমায় ছেড়ে দেওয়া হোক, যেখানে আশ্রয় পাই সিয়ে থেকে খেটেখুটে খাব। ফলাফল কিছুই হবে না। তাঁদের ইচ্ছেই প্রবল থাকবে। আমি তাঁদের অর্থের আশা—তাঁদের কাছ থেকে আমার বাঁচবার কোনই সম্ভাবনা নেই, একবার মনে মনে ভাবলাম, জলে ডুবে মরব।—কিন্তু মরেও তাঁদের হাত এড়াবার উপায় নাই—মরার পরও তাঁরা গ্রাস করে গালাগালি করবেন। একখানা চিঠিতে পুরুষবাবুকে সমস্ত কথা লিখলাম।

"বোন, তারপর শুনতে পেলাম, কথাবার্ত্তা সবই ঠিক হয়েছে। কাকা পত্র করার দিন ঠিক করেছেন—ঠিক একমাস পরে হবার দেরী।

"পুরুষবাবুকে আর একখানা পত্র লিখলাম। সব কথা লিখে তারপর লিখলাম, "শতিকতক টাকা আর একটি লোক পাঠিয়ে দেবেন। আমি আপনাদের বাড়ীতে চাকরাণী

হয়ে জীবন কাটাবো।" অবশেষে আবার লিখলাম, "পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম। বিয়ের পত্র হতে মাত্র ১ মাস দেরী। যদি কোন দিক থেকেই কোন উপায় না হয়, যদি জগদীশ্বর বাস্তবিকই বিমুখ হন, তবে শেষকালে পুকুরের জলে ডুবে মরব—এদেহ চিরকালের মত শীতল হবে।"

"বোন, কি এক ভয়ানক মনের যন্ত্রণার সময় এলো। প্রাণ যেন সর্ব্বদা ছটফট করে। যন্ত্রণায় জীবন আরো যন্ত্রণার হল দুদিন, চার দিন গেল, গুরুবাবুর ত চিঠি এলো না, টাকা এলো না। তবে কি পুকুরই আমার শেষ আশ্রয় হবে! হোক—এই আশ্রয়ের জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছিলাম। বোন, সে কি যন্ত্রণার সময়, মনে হলেই ভয় হয়। ওঃ!

"একদিন বসে বাসন মাজছিলাম। বাইরের ঘরে যেন মোটা মোটা কথা শুনতে পেলাম। প্রাণটা কেঁপে উঠল—মনে হল, ঐ বুঝি আমার যম সেই মহাশত্রু, এসেছে। "বিয়ে" "বিয়ে" এ দুই একবার শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে হল নিশ্চয়ই সেই কাল এসেছে। আর স্থির থাকতে পারলাম না। মনে করলাম, যা অদৃষ্টে থাকে হবে, একবার ছুটে গিয়ে কাণ পেতে শুনি, কি হচ্ছে। অমনি কাজ ফেলে, প্রাণের উদ্বেগে গেলাম, পেছন থেকে, জানালার নীচ থেকে কাণ পেতে শুনলাম।

"গলাটা চেনা চেনা বোধ হল। তারপর শুনতে পেলাম, জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, গুরুবাবুর বড় দাদা আর বাবা! বাবা বুড়ো হয়ে, সমাজচ্যুত হয়ে, আবার এখানে এসেছেন। বলছেন—আমার সঙ্গে পুরুর বিয়ে দিতে হবে—দিতেই হবে।

"বোন, আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল—চোখে জল এল, আর থাকতে পারলাম না, চলে এলাম। কেবল ভগবানকে ডেকেছিলাম, আর বলেছিলাম, নারায়ণ, যার কেউ নেই, তুমি তার।

"বোন, বিয়ে হয়ে গেল—অনেক দিন হল, হয়ে গিয়েছে, তা ত তুমি জান। আমার বিয়ের কথাও ফুরোলো।

"বোন, আজকের মত বিদায় দেব। কেবল একটা কথা বলতে বাকি আছে। আজ আমি এক পূর্ণ সংসারে আশ্রয় পেয়েছি। ধন-দৌলত, মান-সম্মান, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী আমার কিছুরই অভাব নেই। দেবতার মত স্বামী, দেব-দেবীর মত শ্বশুর-শাশুড়ী। যে সুখের স্বপ্নও কখন দেখিনি, নারায়ণ সেই সুখ আমায় দিয়েছেন। বাপের মত বড় চাকরী ছেলেদেরও হয়েছে। আমায় সবাই যেমন ভালবাসে, তেমনি দয়া করে। একদিন উনি বল্লেন,—তোমার একটা কি গড়াল,—তোমার মনের মতন অলঙ্কার দিতে পারি!—তোমার যা ইচ্ছে, বল, তাই দেব। আমি বল্লাম, তোমার 'দয়া'—আর কোন অলঙ্কার চাই না।

"বোন, একদিন দুঃখে পড়ে বলেছিলাম, আমি মরতে পারলেই বাঁচি। আজ মনে হয়, এই সংসারের এই সুখের পূর্ণিমার ভেতর চুপ করে চিরবিদায় নিতে পারলেই ভাল হয়। আবার ভাবি, না, তা হলে ত সেবা করা হবে না। সুখ কি এতই বড় বোন আমার কাছে? যতক্ষণ বাঁচি, এই সুখের, সোণার সংসারের সেবা করব,—সুখ ত তুচ্ছ, সেবাই মহৎ। ইতি তোমার স্নেহের বিন্দু।"

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি, এ।

যুক্তি কল্পতরু

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(৬৩৯—৮১৯ শ্লোক)

অলঙ্কার যুক্তি—

অশ্বিনী, ধনিষ্ঠা রেবতী ও হস্তাদি পঞ্চনক্ষত্রে এবং বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র বারে বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ করিতে হয়।

বিবাহে ও রাজ সম্মান প্রাপ্তি কালে এবং ব্রাহ্মণের অনুমতি পাইলে অপ্রশস্তদিনেও বস্ত্রালঙ্কার ধারণ করা যায়।

শিরস্ত্রাণ (উষ্ণীষ), মুকুট, হার, কুণ্ডল, কেয়ূর, কঙ্কণ, অঙ্গুরীয়ক এবং মেখলা (কটির আভরণ) এই আটপ্রকার অলঙ্কারই প্রধান; ইহাতে যথাক্রমে পদ্মরাগ, বজ্র (১) প্রবাল (২), গোমেদক (৩), মুক্তা, বৈদূর্য্য, নীল এবং মরকত মণি প্রধান করিবে। এই সকল রত্ন যথাক্রমে

রবিপ্রভৃতির দশার জাত ব্যক্তিগণের পক্ষে সমৃদ্ধিপ্রদ হয়। এই সকল অলঙ্কার সুবর্ণদ্বারা ও নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে।

প্রধান সুবর্ণ সম্বন্ধেই এইরূপ ব্যবস্থা; অপ্রধান সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই।

শুক্রাচার্য্যবলেন—মস্তকের শ্রেষ্ঠত্বহেতু মস্তকে ধারণ যোগ্য অলঙ্কারকেই প্রধান অলঙ্কার বলিতে হইবে।

---

(১) বজ্রক।

(২) বিদ্রুমো···।

(৩) গোমেদস্তথা।

বজ্র, বিদ্রুম ও গোমেদ নামে কোনও মণির লক্ষণ এই পুস্তকে নাই এবং ইহার পরেই ক্রমানুসারে বজ্র, বিদ্রুম ও গোমেদের লক্ষণ বলা হইয়াছে; সুতরাং মুদ্রিত আদর্শ, যাচস্পত্যাভিধান এবং শব্দ কল্পদ্রুম প্রভৃতি সকলেই "বজ্রক বিদ্রুমৌ গোমেদস্তথা" এইরূপ পাঠ থাকিলেও তাহা ত্যাগ করিতে হইল।

বিশুদ্ধমণি উত্তম এবং দোষযুক্ত মণি দুঃখদ হইয়া থাকে; সুতরাং ক্রম অনুসারে মণিলক্ষণ কথিত হইতেছে।

রত্ন লক্ষণ—

(গরুড়পুরাণোক্ত কথা)

[সূত বলিলেন—] রত্নের কথা বলিতেছি—পূর্ব্বকালে বল নামে এক অসুর ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজয় করিয়াছিল। দেবগণ বলকে জয় করিতে না পারিয়া স্বকীয় পশু করিবার জন্য বরচ্ছলে তাহার দেবীর ভিক্ষা করিয়া লইলেন। [বলাসুর নিষ্কৃত প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়া] লোকের এবং দেবতাদিগের হিত সাধনার্থ [বলীয় পশুত্বে স্বীয় শরীর প্রদান পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইলেন *] পুত্র-স্বভাব বলের এই পুণ্য কর্ম্মের ফলে শরীরের অবয়ব সকল রত্নের বীজস্বরূপ হইল। এইরূপে রত্নের উৎপত্তি হওয়ায় দেব, যক্ষ, সিদ্ধ, নাগ প্রভৃতি সকলেরই পরম উপকার সাধিত হইল।

রত্নের আকর স্থান]

যখন বলাসুরের মৃত দেহ লইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণ (১) আকাশ পথে যাইতেছিলেন, তখন [সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, কানন প্রভৃতি] যে যে স্থানে (বলের দেহ হইতে রত্নের বীজ পতিত হইয়াছিল, [বলের

---

* "বলোদেহো মৃতস্তত্ত্বাদ্বিসস্থো যথে ছতঃ।
পশুবৎ প্রাবিশৎ তত্ত্বে স্বরাকৃপাশনিয়ন্ত্রিতঃ।"

এই অংশ গরুড়পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইল। মুদ্রিত আদর্শে এই অংশ নাই; তাহাতে অর্থ সঙ্গতি হয় না।

(১) [দেবাস্তদন্তরং]

পবিত্র দেহের মহিমায় সেই সেই স্থান এক একটী রত্নের আকর হইল। ০]

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রত্ন গণনায় আছে—হীরক, মরকত, পদ্মরাগ, মুক্তা, ইন্দ্রনীল, মহানীল, বৈদূর্য্য, গরুড়, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, স্ফাটিক, পুলক, কর্কেতন, পুষ্পরাগ, জ্যোতীরস, রাজবর্ত্ত, রাজমণি, সৌগন্ধিক, গজ, শঙ্খ, ব্রহ্মমণি, গোমেদ, রুধিরাক্ষ,

তক্ষাতক, পূর্ণি, ভুজঙ্গ, নীল, পীলু, প্রবাল, গিরিবজ্র, তাক্ষ্য, ভুজঙ্গমণি, বজ্রমণি, হিঙ্গুলিক, পীত, তাম্রক এবং উৎপল এই সকল রত্ন সুবর্ণসহ করিয়া জয় যাত্রা ও সমৃদ্ধির জন্য নৃপতিগণ ধারণ করিবে।

পদ্মরাগ পরীক্ষা—

(পদ্মরাগ মাণিক্যের প্রকার বিশেষ) সিংহল দেশজাত রক্তবর্ণ মাণিক্যের নাম পদ্মরাগ, ইহা অতি উৎকৃষ্ট রত্ন। কালপুরের পীতবর্ণ মাণিক্যের নাম কুরুবিন্দ। শোক পল্লবের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মাণিক্যের নাম সৌগন্ধিক। কুরুদেশের নীলাভ মাণিক্য নীলগন্ধি নামে অভিহিত হয়। সিংহলের মাণিক্য উত্তম, কুরুদেশের মাণিক্য অধম এবং কালপুরের মাণিক্য মধ্যম; স্থান ভেদে এইরূপ হইয়া থাকে।

পদ্মরাগ মণি অতি উজ্জ্বল ও নানা বর্ণের হয়—বন্ধুক বাঁধুলি পুষ্পের মত বর্ণবিশিষ্ট, গুঞ্জাবর্ণ, ইন্দ্রগোপ রক্তবর্ণ কীটবিশেষ তুল্য কান্তিযুক্ত, এবং জবা পুষ্প, শোণিত, দাড়িম্ব বীজ ও পলাশ পুষ্পের ন্যায় আভাযুক্ত হইতে পারে। সিন্দূর, পদ্ম, উৎপল, কুসুম ও অলক্ত সদৃশ পদ্মরাগ আছে, ইহার বর্ণ সর্ব্বত্র সমান মত হইলেও স্বীয় প্রভায় যথাভাগ অধিক শোভিত হইয়া থাকে।

ঐ সকল স্ফটিকমণি সূর্য্যকিরণ স্পর্শে সমুজ্জ্বল হইয়া স্বীয় প্রভায় পার্শ্বস্থ দ্রব্য সমূহ আলোকিত করে।

কতিপয় পদ্মরাগ রক্তনীল মিশ্র বর্ণবিশিষ্ট, কতকগুলি সদ্যস্ফুটরক্তপদ্মের (১) মত দীপ্তিশালী, অন্যগুলি তাম্রাভক (২) ও কণ্টকারি পুষ্পের মত, আবার কোন কোন পদ্মরাগ বিদ্রুম তুল্য বর্ণ। কোন পদ্মরাগ চকোর, কোকিল ও সারস পক্ষীর নয়ন তুল্য বর্ণ বিশিষ্ট এবং কোন পদ্মরাগ অর্দ্ধস্ফুট কোকনদ গর্ভের মত বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে।

সৌগন্ধিক মণি প্রভাব, কাঠিন্যও গুরুত্বে প্রায়ই পদ্মরাগের সমান হয় এবং তাহার বর্ণ ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত রক্তোৎপলের মত হয়।

কুরুবিন্দের মধ্যে যেটী অল্পপরিমাণে লোহিত বর্ণ (৩) সেটীই স্ফটিক হইতে জাত এইরূপ স্থির করিবে। ইহার অন্তর্গত ভেদ এত অধিক হয় যে অতি প্রজ্ঞা বিশিষ্ট পদ্মরাগ (৪) ও তাহার সমান হইতে পারে না।

রাবণ গঙ্গাতে যে সকল কুরুবিন্দ জন্মে, সেই সকল স্ফটিকাত মণি পদ্মরাগের সমান লোহিত্য ধারণ করে।

ঐরূপ বর্ণবিশিষ্ট যে সকল মণি অঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মূল্য কম।

কুরুদেশে স্ফাটিক পদ্মরাগের মত যে মণি জন্মে, তাহার মূল্যও অতি অল্প হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে মাণিক্য চারি জাতীয় হয়। রক্তবেত মাণিক্য ব্রাহ্মণ অতিরক্ত ক্ষত্রিয়, রক্তপীত বৈশ্য এবং রক্তনীল শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পদ্মরাগ ব্রাহ্মণ, কুরুবিন্দ ক্ষত্রিয়, সৌগন্ধিক বৈশ্য এবং যাংস খণ্ড অর্থাৎ নীল গন্ধি মাণিক্য শূদ্রজাতীয়।

"মহোদধৌ সরিদ্ভি বা পর্ব্বতে কাননেষ্বপিবা।
তত্তদাকরতাং যাতং রাজমাত্রের গৌরবাত্।'

এই অংশও গরুড়পুরাণ হইতে সংগৃহীত। ইহা মূলের আদর্শে না থাকায় বাকা শেষ হয় নাই। সম্পূর্ণ আখ্যানটীই ভোজরাজ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন কি না তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যাহা না থাকিলে বাক্য শেষ হয় না, তত টুকুই গৃহীত হইল।

(১) রক্তাম্বুজ।
(২) তথাপরে রক্তকর।
(৩) মধ্যরাগঃ
(৪) পদ্মরাগসমং রাগং বিভ্রাণাঃ।

রক্ত পদ্মাকৃতি, পদ্মরাগপ্রভাবিশিষ্ট পদ্মরাগ মণি ব্রাহ্মণ জাতীয় ; ইহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছায়া * আছে।

ক্ষত্রিয় জাতীয় কুরুবিন্দ মণি লাক্ষিত পুষ্পের ন্যায় হইয়া থাকে এবং ইহার প্রভা তপ্ত, সিন্দূর, বন্ধুক পুষ্প এবং নাগরঙ্গের মত হয়।

বৈশ্যজাতীয় সৌগন্ধিক মণি—হিঙ্গুল ও অশোক পুষ্পের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, ঈষৎপীত লোহিত বর্ণ এবং জবা পুষ্প ও লাক্ষা রসের মত হইয়া থাকে।

শূদ্রজাতীয় নীলগন্ধি মণি—ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, উজ্জ্বলতাহীন, অতি চিক্কণ এবং দেখিতে ঘাসের খণ্ডের মত।

পদ্মরাগের দোষ—

মুনিগণ মাণিক্যের বিদ্রাবণ (১) বিরূপত্ব, সঙ্কোচ, কর্করত্ব, অশোভন, কোকিল, জল এবং ঘূম এই আট প্রকার দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুণ চারি প্রকার এবং ছায়া ষোল প্রকার কথিত হইয়াছে।

যে মণি হইতে দুই প্রকার ছায়া নির্গত হয় তাহাকে 'বিদ্রাব' বলে. বিদ্রাব মাণিক্য বন্ধুনাশক ; যে মাণিক্যে পক্ষীর পদচিহ্ন থাকে তাহাকে বিরূপ বলে ; এই মাণিক্য যাহার থাকে তাহার পরাভব হয়।

তপ্ত দোষের নাম 'সঙ্কোচ' ; এই মাণিক্যের অধিকারীর উপর শস্ত্রাঘাত হয় ; পদ্মরাগের মধ্যে কর্কর অর্থাৎ পাষাণ চূর্ণ থাকিলে, তাহার নাম 'কর্কর' দোষ, কর্করযুক্ত পদ্মরাগ পতত বন্ধুর অনিষ্টকারী। মণিকে ঘৃষ্টে অতিরিক্ত করিলে দেখিতে যেরূপ হয়, স্বভাবতঃ যে পদ্মরাগ সেইরূপ, তাহা—'অশোভন' দোষযুক্ত ; ইহা বহু দুঃখকর।

পদ্মরাগের উপর মধু বিন্দুর মত চিহ্ন থাকিলে তাহাকে 'কোকিল' দোষ বলে ; এই দোষযুক্ত পদ্মরাগ আয়ু, ধন ও যশ বিনাশ করে, অতএব ইহা কখন ও ধারণ করিবে না (১)।

মাণিক্যের রাগহীনতার নাম জলদোষ, এই দোষযুক্ত পদ্মরাগ ধন ধান্য বিনাশ করে। ধূমের মত বর্ণ হইলে তাহাকে 'ঘূম' দোষ বলে ; ঘূম দোষ বিশিষ্ট পদ্মরাগ বজ্রপাতে ভয় উৎপাদন করে।

কথিত আছে—দুই প্রকার ছায়াযুক্ত মণি ক্ষতিকারক (০)। যাহার দুই দিকে চিহ্ন আছে, এমন মণি ধারণে পরাভব হয়। ভগ্ন মণিধারণে দুঃখে মৃত্যু হয়। কর্করযুক্ত মণি ধননাশ করে। যে মণি ছুরিকায় লিপ্ত বলিয়া বোধ হয় তাহা দুঃখদায়ক ; ইহা রাজা রাখিবেন না। কোকিল-দোষযুক্ত মণির শোভা দেখিতে মধুবিন্দুর মত ; ইহা অনেক প্রকারের হইয়া থাকে ; এই মণি কখনও ধারণ করিবে করিবে না।

মাণিক্যের গুণ

গুরুত্ব, স্নিগ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং বর্ণের গাঢ়ত্ব এই কয়টী মাণিক্যের সাধারণ গুণ। [গরুড় পুরাণেও আছে—] বর্ণের আধিক্য (১), গুরুত্ব, স্নিগ্ধতা, সমবর্ত্তুলতা (২), নির্ম্মলতা, ঔজ্জ্বল্য এবং বৃহৎ আকৃতি এই কয়টী মণির গুণ।

জাতি ও গুণে উৎকৃষ্ট মণির সহিত সমান হইলেও যদি তাহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণ চূর্ণ থাকে অথবা সচ্ছিদ্র, উজ্জ্বলতাশূন্য (৩), স্বচ্ছতাহীন বা বিবর্ণ হয়, তাহা হইলে সে সকল মণি প্রশস্ত নহে।

ফল

যে ব্যক্তি অজ্ঞানতেতু দোষযুক্ত মণি ধারণ করে, তাহার

---

* রত্ন প্রকরণে 'ছায়া' ও 'প্রভা' নামে দুইটী পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শুক্রনীতিতে আছে "বর্ণবাহুল্যে ছায়া প্রভা বর্ণপ্রকাশিনী" অর্থাৎ যে ঔজ্জ্বল্য সন্নিহিত বস্তুকে অস্পষ্ট করিয়া ফেলে, তাহার নাম 'ছায়া' এবং যে ঔজ্জ্বল্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তাহার নাম 'প্রভা'।

(১) বিদ্রাবঃ

(০) ক্ষতিকারকাঃ।

(১) বর্ণাধিক্যং।

(২) সমবর্ত্তুলতা।

(৩) ছিদ্রবদোপলিপ্তা।

শোক, উদ্বেগ, রোগ, মৃত্যু (৪), বিত্তনাশ প্রভৃতি বিপদ ঘটিয়া থাকে।

যাহার নিকট উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ মণি থাকে, সে শত্রুমধ্যে বাস করিলেও, বিপদের সম্মুখীন হইলেও তাহার কোন অনিষ্ট হয় না।

যে উত্তম গুণশালী পদ্মরাগমণি ধারণ করে, লোষ এবং উপসর্গরহিত কোনরূপ উৎপাত তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না।

যে পদ্মরাগ নবীন সূর্য্য-কিরণস্পর্শে রক্তবর্ণ শিখা উদ্গীরণ করে, এবং গৃহ আলোকিত করে, তাহা মহাগুণশালী বলিয়া কথিত হয়।

যে পদ্মরাগ স্বীয় পরিমাণের শতগুণ জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া সমুদয় জলকে রঞ্জিত করে, অথবা লোহিত বর্ণ শিখা উদ্গীরণ করে, সেই পদ্মরাগ অতি উত্তম।

অতি ঘোর অন্ধকারে স্থাপন করিলে যে পদ্মরাগ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ করে, তাহা শ্রেষ্ঠ পদ্মরাগ।

যে পদ্মরাগকে পদ্মকলিকার মধ্যে স্থাপন করিলে পদ্মটী তৎক্ষণাৎ—প্রস্ফুটিত হয়, তাহা দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ উত্তম পদ্মরাগ।

সকল অমঙ্গলনাশক সর্ব্বসমৃদ্ধিপ্রদায়ক চারি প্রকার গুণশালী পদ্মরাগের বিষয় কথিত হইল।

যে মণি দুগ্ধ হইতে দেখিতে প্রজ্বলিত অগ্নির মত, বংশের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, সে মণি সর্ব্বসম্পত্তিপ্রদায়ক।

যে সকল পদ্মরাগ স্বীয় পরিমাণের বিগুণ গুরু নীলীরস, দুগ্ধ বা জলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, ঐ বস্তুগুলি স্বীয় প্রভায় রঞ্জিত করে, তাহারা সৌভাগ্য ও সম্পত্তিকারক; ইহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্বগুলি পর পরগুলির অপেক্ষা প্রশস্ত।

গুঞ্জাফলের সমান আকারবিশিষ্ট পদ্মরাগ ওজনে সাত ও তিন রতি পরিমিত হইতে পারে (১) ইহার মধ্যে যাহা ওজনে অধিক, তাহা অধিক গুণশালী।

শোণফুলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট পদ্মরাগ ওজনে বার আট ও দুই রতি পরিমিত হয় (২); ইহার মধ্যেও যেগুলি ওজনে অধিক তাহাই অধিক গুণশালী।

যে পদ্মরাগ দেখিতে বদরীফলের মত, তাহা বার (৩), দশ বা আট মাষা পরিমাণ এবং যাহা দেখিতে আমলকী ফলের ন্যায় (৪), তাহা তিন, কুড়ি বা ষোল মাষা পরিমাণ হইয়া থাকে।

রুদ্রাক্ষফলসদৃশ পদ্মরাগের ওজন তিন, দুই ও এক মাষা, তাম্বূলীফলের মত পদ্মরাগের ওজন চারি, তিন বা দুই তোলা এবং বিল্ব-(তেলাকুচ) ফলাকৃতি পদ্মরাগের পরিমাণ আট বা দশ তোলা হইয়া থাকে।

ইহার অধিক বৃহদাকার বা গুরুভার পদ্মরাগ পাওয়া যায় না, সৌভাগ্যক্রমে পাইলে, সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

কতকগুলি বিজাতি রত্ন মুক্তাদির ন্যায় সুন্দর হইয়া থাকে, পণ্ডিত ব্যক্তি (১) যত্নপূর্ব্বক সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন।

কলসপুর, সিংহল, চুলুয়, মুক্তপাণীয় (২) এবং শ্রীপর্ব্বতদেশে জাত মণি দেখিতে একই প্রকার হইলেও পদ্মরাগের বিজাতি।

কলসপুরের মণি দুধের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট (২), চুলুয়দেশের মণি তাম্রের মত আভাযুক্ত (৩), সিংহলের মণি কৃষ্ণবর্ণ, মুক্তপাণীয় মণি ও কাশবর্ণ এবং শ্রীপর্ব্বতের মণি দীপ্তিহীন সুতরাং বিজাতীয় মণি মধ্যে পরিগণিত।

যে পদ্মরাগে তাম্রবর্ণের (৪) আভা থাকে, যাহার মধ্যে ধূলের ন্যায় চূর্ণ থাকে, যাহা তৈললিপ্ত বলিয়া বোধ হয়,

---

(৪) তং শোক চিন্তাময় মৃত্যু……

(১) তুলারতি।

(১) তুলারতি।

(৩) সুরদ্রিদলসন্নিভঃ।

(৪) ধাত্রীফলসমস্ত্রিঃ পরিণতি……।

(১) বিদ্যাংস্তাদুপলক্ষয়েৎ।

(২) দুগ্ধোপলবর্ণাং কলসাভিধানম্।

(৩) আতাম্রতাবাদপি।

(৪) রক্তাম্রিকাং।

ঘর্ষণে (৫) যাহার দীপ্তি নষ্ট হয়, এবং যে মণির মস্তকে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে, পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পড়ে, তাহা বিজাতি।

ঔজ্জ্বল্য, আকার ও জাতিতে সমান হইলে, যে মণির ওজন অধিক হয়, তাহারই অধিক গুণশালী বুঝিতে হইবে।

মণির বৈজাত্য বা কৃত্রিমত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ দূর না হইলে, শিলায় ঘর্ষণ করিবে। ঘর্ষণে যাহার শোভা বা গুরুত্ব নষ্ট হয় না, তাহাই বিশুদ্ধ মণি।

স্বজাতীয় বিশুদ্ধ মণিদ্বারা ঘর্ষণ করিয়াও মণি পরীক্ষা চলিতে পারে। হীরক ও কুরুবিন্দ ভিন্ন অপর কোন মণি-দ্বারা পদ্মরাগ ও ইন্দ্রনীল মণিতে দাগ দেওয়া যায় না।

বিজাতি মণির প্রভা কখনও বিশুদ্ধ মণির তুল্য হইতে পারে না, তথাপি সহজে পার্থক্য বুঝিবার জন্য এই সকল ভেদ কথিত হইল।

বিজাতি মণি গুণসম্পন্ন মণির সহিত একযোগে ধারণ করিবে না; এমন কি কৌস্তুভ মণির সহিতও বিজাতি মণি ধারণ করিতে নাই।

যেমন একজন মাত্র চণ্ডাল বহু ব্রাহ্মণের দোষ ঘটাইতে পারে, সেইরূপ একটী মাত্র বিজাতি মণি বহু বিশুদ্ধ মণির গুণ নষ্ট করিতে পারে।

পদ্মরাগের মূল্য

নবোদিত সূর্য্যের রশ্মিতে দর্পণ ধরিয়া তাহার সম্মুখে মণি ধরিয়া মণির প্রকৃত বর্ণ ও ছায়া স্থির করিবে।

'তরুণ'পরিমিত উত্তম হীরকের যে মূল্য, 'মাষক'পরিমিত গুণশালী পদ্মরাগেরও তাহাই মূল্য।

উত্তম পদ্মরাগের যে মূল্য বলা হইয়াছে, বিশুদ্ধ কুরুবিন্দের মূল্যও তদ্রূপই।

উত্তম কুরুবিন্দের যে মূল্য, সৌগন্ধিকের মূল্য তাহা অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ কম।

বৈশ্যজাতীয় সৌগন্ধিকের যে মূল্য, শূদ্র নীলগন্ধি মণির মূল্য তাহা অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ কম।

(৫) ঘোরাপ্রমৃষ্টঃ।

অনন্তের মত বর্ণবিশিষ্ট 'পণ' পরিমিত পদ্মরাগের মূল্য ত্রিশ সহস্র 'কার্ষাপণ।'

ওজনে তিন 'কর্ষ'পরিমিত, ইন্দ্রগোপ কীটের মত রক্ত-বর্ণ পদ্মরাগের মূল্য বাইশ সহস্র কার্ষাপণ।

দুই 'কর্ষ'পরিমিত জবা পুষ্পের মত রক্তবর্ণ মণির মূল্য চৌদ্দ সহস্র কার্ষাপণ।

'কর্ষ'পরিমিত নবোদিত সূর্য্যতুল্য মণির মূল্য ছয় সহস্র (১) 'কার্ষাপণ।'

অর্দ্ধ 'কর্ষ'পরিমিত বাড়িমপুষ্পাভ মণির মূল্য দুই সহস্র 'কার্ষাপণ।'

চারি 'মাষা'পরিমিত রক্তপদ্মতুল্য মণির মূল্য পাঁচ শত 'কার্ষাপণ।'

সকল গুণযুক্ত দুই 'মাষা'পরিমিত মণির মূল্য দুই শত 'কার্ষাপণ।'

একমাষা পরিমিত গুণশালী পদ্মরাগের মূল্য শত 'কর্ষাপণ।'

যে পদ্মরাগ এক 'মাষা' অপেক্ষাও ওজনে কম, তাহার মূল্য বর্ণের বিচার করিবে।

দুই 'গুঞ্জায়' এক 'কার্ষাপণ' হয়।

কতকগুলি স্ফটিকজাত মণি আছে, ইহাদিগের বর্ণ কুসুমবহুল বা মজিষ্ঠামিশ্রিত জলের মত; এইগুলিকে কাচার মণি বলে; পদ্মরাগের মতই ইহাদিগের গুণ দোষ বিচার করিবে। ইহাদিগের মূল্যও অল্প, ধারণেও ফল কম হয়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই যে চারি জাতীয় মণির কথা বলা হইয়াছে, সমৃদ্ধির জন্য, তাহা চারি জাতীয় নৃপতি ধারণ করিবে; নতুবা রোগ, শোক, ভয় এবং ক্লেশ কষ্ট পাইতে হয়।

পদ্মরাগ পরীক্ষা শেষ।

হীরক পরীক্ষা

হিমালয় (২) বাঙ্গদেশ (দাক্ষিণাত্যের পশ্চাদ্ভাগের তীরবর্ত্তী প্রদেশ), সৌরাষ্ট্র, সৌভ, কলিঙ্গ, কোশল,

(১) ষষ্টি। (২) হৈমব।

বেণানদীর (মহারাষ্ট্রের গোদাবরীর উপনদী বেণগঙ্গার) তীর এবং সৌবীর এই আট স্থান হীরকের উৎপত্তিভূমি (১)।

হিমালয়ে ঈষৎ তাম্রবর্ণ, বেণাতটে চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ, সৌবীরে শৈবলপত্র ও শুক্ল মেঘের মত বর্ণবিশিষ্ট, সৌরাষ্ট্রে তাম্রবর্ণ, কলিঙ্গদেশে স্বর্ণবর্ণ, কোশলে পীতবর্ণ, সৌগন্ধদেশে তাম্রবর্ণ এবং মাতঙ্গ-প্রদেশে ঈষৎ পীতবর্ণ হীরক উৎপন্ন হয়।

সত্যযুগে কোশলদেশ, ত্রেতাযুগে হিমালয় ও মতঙ্গ পর্ব্বত, দ্বাপরে শুক্ত ও সুরাষ্ট্রপ্রদেশ এবং কলিযুগে বেণাতট (২) ও সৌবীরদেশ হীরকের উৎপত্তি স্থান।

হীরকবিশেষে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই পঞ্চ মহাভূতের কোনটীর প্রাবাল্য লক্ষিত হয়; তেজের আধিক্যই অধিক দেখা যায়।

যে হীরকেক্ষিতির অংশ অধিক থাকে, তাহা বৃহৎ ও গুরু হয় (৩) এবং যাহাতে জলীয়াংশের আধিক্য থাকে, তাহা মসৃণ, স্নিগ্ধ, ঘন অথবা স্বচ্ছ হয়।

আকাশাংশের প্রাবাল্য থাকিলে, হীরক অতি নির্ম্মল, পবিত্র ও তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া থাকে। তেজঃ প্রধান হীরক তীক্ষ্ণাগ্র, উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হয়। যাহাতে বায়ুর প্রাবাল্য থাকে, সেই হীরক অতি লঘু, তীক্ষ্ণাগ্র ও খরস্পর্শ হয়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতীয় হীরক আছে; এই চারি জাতীয় হীরক হইতে যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ছায়া নির্গত হয়।

ব্রাহ্মণের পক্ষে কুন্দপুষ্প বা স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শশকের চক্ষুর ন্যায় রক্তবর্ণ, বৈশ্যের পক্ষে স্নিগ্ধ কমলদলের ন্যায় হরিবর্ণ এবং শূদ্রের পক্ষে পরিষ্কৃত যজ্ঞের ন্যায় তাম্রবর্ণ হীরক প্রশস্ত।

হরিত, শুক্ল, পীত, পিঙ্গল, তাম্রবৎ ঈষৎ রক্ত এবং শ্যাম এই ছয় বর্ণের হীরকই স্বাভাবিক সুন্দর হয়; হরি, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বায়ু এই ছয় দেবতা উক্ত ছয় বর্ণের এবং সুতরাং উক্ত ছয় বর্ণবিশিষ্ট হীরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

(১) বেণাতটীয় সৌবীরৌ বজ্রজাত্যাবিতীরিতাঃ।

(২) বেণাতটে।

(৩) মহাপ্রভাবং সদনং।

৪৯

জবাপুষ্প ও প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ বা হরিদ্রা রসের ন্যায় পীতবর্ণ এই দুই প্রকার হীরক রাজার পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু অন্যের পক্ষে নহে।

রাজা সকল বর্ণের অধীশ্বর, সুতরাং তিনি ইচ্ছানুসারে সকল বর্ণের হীরকই ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু এক সময়ে বিভিন্ন বর্ণের হীরক কদাচ ধারণ করিবেন না।

হীরকের গুণ

উৎকৃষ্ট হীরকের কয়টী আকরজ গুণ আছে—ইহার ছয়টী কোণ, আটটী পার্শ্ব এবং বারটী ধার থাকে এবং অগ্রভাগ উন্নত, সমান ও তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে।

ষট্‌কোণত্ব, লঘুত্ব, সমান অষ্টপার্শ্বত্ব, তীক্ষ্ণাগ্রত্ব ও নির্ম্মলত্ব এই পাঁচটী হীরকের গুণ।

অত্যন্ত লঘু, উত্তম বর্ণবিশিষ্ট, সমপার্শ্ব, তীক্ষ্ণাগ্র এবং 'রেখা', 'বিন্দু', 'কলঙ্ক', 'কাকপদ' ও 'ব্রণ' প্রভৃতি দোষ বর্জ্জিত হীরক পরমাণু পরিমাণেও যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে অবশ্যই দেবতাদের আগমন হইয়া থাকে।

যে হীরক বিশুদ্ধ, ষট্‌কোণ, নির্ম্মল, তীক্ষ্ণধার, উত্তমবর্ণযুক্ত, লঘু, সুপার্শ্ব, নির্দ্দোষ এবং যাহা হইতে ইন্দ্রধনুর প্রভা বাহির হয়, এইরূপ হীরক পৃথিবীতে সহজে পাওয়া যায় না।

যে হীরক হইতে ইন্দ্রধনুর ন্যায় শিখা বাহির হয়, সেই অতি লঘু তীক্ষ্ণাগ্র হীরক বজ্রপাত ভয় নিবারণ করে।

যে হীরক অতি নির্ম্মল, অভেদ্য, ষট্‌কোণ ও অতিশয় লঘু এবং যাহা সূর্য্য রশ্মিতে ধরিলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রভা নির্গত হয়, সেই হীরক ধারণ করিলে রাজা শত্রু জয়ে সমর্থ হন।

যে হীরক জলে জন্মে, যাহার বর্ণ সূর্য্যের উপর পতিত জলবিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ এবং যাহা ওজনে এক 'সুবর্ণ' পরিমিত, সেই হীরকের মূল্য কোটি মুদ্রা।

হীরক ধারণে উর্দ্ধে বজ্রভয় থাকে না, ভূমিতে সর্প ভয় নিবারিত হয় এবং রাত্রিতে ভূতোপদ্রবের শান্তি হয়।

যে ব্যক্তি তীক্ষ্ণাগ্র, নির্ম্মল এবং নির্দ্দোষ হীরক যত্নের সহিত ধারণ করে, তাহার যাবজ্জীবন কান্তি, সম্পদ্,

পুত্র (১), ধন ধান্য, গো ও পশু বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং সর্প, অগ্নি, বিষ, ব্যাঘ্র ও চোর প্রভৃতির ভয় এবং শত্রুকৃত অভিচার-ভয় নিবারিত হয়।

যে সর্ব্ব-গুণান্বিত হীরক জলে ভাসে, সকল প্রকার রত্ন থাকিলেও সেই হীরক ধারণ করা বিধেয়।

তরুকোণ এবং বিন্দু, রেখা ও বৈবর্ণ্য এই সকল দোষযুক্ত হীরক হইতেও যদি ইন্দ্রধনুর-ন্যায় প্রভা বাহির হয়, তাহা হইলে, সেই হীরক ধারণে ধন, ধান্য ও পুত্র বৃদ্ধি হয়।

বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় প্রভাযুক্ত উৎকৃষ্ট হীরক ধারণ করিলে, রাজা বিক্রমে শত্রুপ্রভাব খর্ব্ব করিয়া সমস্ত সাম্রাজ্য ভোগ করেন।

পার্থিবাংশ প্রধান হীরক ধারণে সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য লাভ হয় এবং জলীয়াংশ প্রধান (২) হীরক ধারণে মানসিক তৃপ্তি, ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি লাভ হয়।

বায়বীয়াংশ প্রধান হীরক ধারণে (৩) উৎসাহও প্রিয়দর্শনত্ব (৪) জন্মে। আকাশ প্রধান হীরক ধারণে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি লাভ হয়। তৈজসাংশ প্রধান হীরক ধারণে প্রতাপ, বীর্য্য ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়।

যজ্ঞ, দান (৫) ও তপস্যা দ্বারা যে ফললাভ হয়, ব্রাহ্মণ জাতীয় গুণশালী হীরক ধারণেও সেই ফল লাভ হয়।

গুণবান ক্ষত্রিয় জাতীয় হীরক যাহার গৃহে থাকে, তাহার জয়লাভ (৬) পরাক্রম বৃদ্ধি এবং শত্রু নাশ হইয়া থাকে।

বৈশ্য-জাতীয় উত্তম হীরক (৭) ধারণে, কলাকুশলতা, বিজ্ঞতা, মঙ্গল ও খ্যাতি-লাভ হয়।

যে ব্যক্তি শূদ্র জাতীয় উত্তম হীরক ধারণ করে, সে সদ্ধোপকারী, অ.য়ুষ্মান এবং ধন ধান্য সমৃদ্ধিশালী হয়।

প্রাচীনগণ আরও চারি প্রকার হীরকের কথা বলিয়াছেন—

হিম, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র বা শুক্লদেবের ন্যায় (১) কান্তি-বিশিষ্ট, ষট্‌কোণ ও অষ্টদল, তীক্ষ্ণধার এবং জলীয়াংশ প্রধান হীরক অন্ধকারেও দীপ্তি পায়, ইহা উত্তম (২) হীরক।

আর এক প্রকার উত্তম, তীক্ষ্ণধার সর্পবিষনাশক হীরক আছে; ইহার ধারণে (৩) বিষভয় প্রশমিত হয়।

কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত, কোটি চন্দ্রের ন্যায় শীতল এবং অন্ধকার নাশক আর একপ্রকার অতি উত্তম হীরক আছে, ইহা ধারণে (৪) সর্ব্ব রোগের শান্তি হয়।

উষ্ণ দুগ্ধ, জল, তৈল ও ঘৃতে নিক্ষেপ করিলে যে হীরক (৫) তৎক্ষণাৎ ঐ সকল বস্তু শীতল করিয়া দেয়, তাহা দেবতা দিগের পক্ষে দুর্লভ।

ইহাদিগের মধ্যে একটী হীরক ধারণ করিলেই রাজা সুখী হইয়া থাকেন এবং ত্রিভুবনে কোন বস্তুই, তাঁহার পক্ষে দুর্লভ থাকে না

হীরকের দোষ

রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণবলিয়াছেন—হীরকের মল, বিন্দু, রেখা, ত্রাস ও কাকপদ এই পাঁচ প্রকার দোষ।

'মল' দোষযুক্ত হীরক ধারণে মনের মালিন্য জন্মে, 'বিন্দু'যুক্ত হীরকে সর্ব্বনাশ হয়, 'রেখা' দোষযুক্ত হীরক ধারণে রংশন ভয় হয়, 'ত্রাস' দোষযুক্ত হীরক ত্রাস উৎপাদন করে এবং 'কাকপদ' চিহ্নিত হীরক অন্ধকারক হইয়া থাকে।

হীরকস্থিত বিন্দু প্রকার ভেদে বিন্দু আবর্ত্ত, পরিবর্ত্ত ও ঘনাকৃতি এই চতুর্বিধ নামে অভিহীত হয়।

---

(১) শীতলংশুযুত ঘনধান্যগোপশূন্যাৎ।
(২) কীর্ত্তিবাপাবহ্নয়া।
(৩) বায়ব্যয়া বিষাহ্নয়াৎ। (৪) প্রিয়দৃষ্টিত্বং।
(৫) দানৈস্তপোভিশ্চ। (৬) জয়ঃ।
(৭) পরিবহ্নয়া।

(১) যেষদন্তাশকান্তিবৎ।
(২) উদ্ভেজং বজ্রমুত্তমম্।
(৩) ধারণমাত্রেণ।
(৪) পবিঃ।
(৫) নায়েৎ।

রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার চিহ্নকে 'বিন্দু', যবাকার চিহ্নকে 'পরিবর্ত্ত' এবং রক্তবর্ণ যবচিহ্নকে যবাকৃতি বলে।

'বিন্দু' যুক্ত হীরকে আয়ু ও ধন নাশ হয়, 'পরিবর্ত্ত' যুক্ত হীরক ভীতিজনক, এবং 'পরিবর্ত্ত' ও 'যবাকৃতি' দোষযুক্ত হীরকে রোগ জন্মে। *

যবচিহ্ন নানা বর্ণ হয়, রক্তবর্ণ যবচিহ্নে হস্তী ও অশ্ব বিনষ্ট হয়, পীত যবে বংশ নাশ এবং শ্বেত যবে ধন ও আয়ু ক্ষয় হয়। যব বিন্দুর এই সকল দোষ কথিত হইয়াছে।

রেখাচিহ্ন দক্ষিণে বক্র (১)হইলে তত ফল প্রদান করে এবং বামে বক্র (২) হইলে নানা বিধ ভয়ের কারণ হয়।

কাটিয়া যে রেখা পড়ে, তাহা শস্ত্রাঘাতের ভয় উৎপাদন করে।

রেখা দক্ষিণা, বামা এবং ঊর্দ্ধ গামিনী হইয়া থাকে; রেখা দক্ষিণবক্রা হইলে আত্মবিচ্ছেদ,বামবক্রা হইলে ধনহানি এবং ঊর্দ্ধগামিনী হইলে বন্ধুগণের সহিত কলহ হইয়া থাকে।

হীরকের উপর কাকের পদের ন্যায় চিহ্ন থাকিলে সেই হীরক ধারণে মৃত্যু, ধনহানি বা গৃহনাশ (৩) হইয়া থাকে।

যে হীরকের অগ্রভাগ অথবা কোন এক ধার ভগ্ন এবং যে হীরক কোণহীন, গোলাকার এবং কান্তি শূন্য সে হীরক নির্গুণ ও নানা দোষের আকর।

যে চিহ্ন দেখিলে ছিন্নকটী আলিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম 'ত্রাস' চিহ্ন; ইহা ত্রাস জনক; নানা গুণ থাকিলেও এই দোষযুক্ত হীরক ধারণ করিবে না।

যে হীরকের একটী শৃঙ্গও ভগ্ন বা বিশীর্ণ দৃষ্ট হয়, সে হীরক জলপাত্রী হইলে ও আত্মবিচ্ছেদ, ব্যক্তি তাহা মুখে রাখিবে না। যে হীরকের অগ্রভাগ ফাটা, শৃঙ্গ বিশীর্ণ এবং যদি কোন মল পূর্ণ, তাহা ধারণে ইষ্টের নষ্ট ও নষ্ট হইয়া থাকে।

যে হীরকের কোন অংশে ক্ষত চিহ্নের ন্যায় চিহ্ন অথবা রক্তবর্ণ চিহ্ন থাকে, সেই হীরক ধারণ করিলে ইচ্ছাকৃত্যা ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়।

যে হীরক, প্রথমে জলপাত্রী বলিয়া বোধ হয় এবং স্বর্ণাদিদ্বারা জড়িত হইলে সন্দেহ প্রতিপন্ন হয়, রাজা এইরূপ গুণহীন হীরকদ্বারা অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিবে না।

যে হীরক স্পর্শ করিলে অঙ্গে শোথ ও জ্বরে গাত্র বৃদ্ধি হয় এবং অঙ্গ চিন চিন করে, তাহা দুষ্ট হীরক।

যে হীরক কর্কশ এবং পরিমাণে গুরু, নৃপতি সেই হীরক ধারণ করিবে না।

ত্রিকোণ হীরক কলহের কারণ, চতুষ্কোণ ভয়জনক, পঞ্চকোণে মুক্তাভয় এবং ষট্ কোণে মঙ্গল হয়।

দ্বিদল হীরক কলহের কারণ, ত্রিদল হীরক সুখনাশক চতুর্দ্দল হীরক সুখ দায়ক, পঞ্চদল হীরক শোক জনক, ষড়দল হীরক রাজভয়ের নিদান, সপ্তদল হীরক মৃত্যুর হেতু, অষ্টদল হীরক অতিবিদ্বেষ্ট।

ছায়া হীন হীরক বিপদের হেতু, বিবর্ণ হীরক শোক জনক, কর্কশ হীরক দুঃখ দায়ক, তৈলবৎ পদার্থ লিপ্ত হীরক নাশকারী, শ্যামবর্ণ হীরক ক্লেশ দায়ক এবং রেখা, কাকপদ ও বিন্দুযুক্ত হীরকমৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে, অতএব যত্নবান ব্যক্তি হীরক পরীক্ষা করিয়া ধারণ করিবে।

গর্ভিণী স্ত্রী দোষযুক্ত মণি ধারণ করিবে না, কারণ এই মণি স্পর্শে তাহাদিগের গর্ভপাত হইয়া থাকে।

লৌহ, পদ্মরাগ, গোমেদ, বৈদূর্য্য, স্ফটিক এবং বিভিন্ন বর্ণের কাচ এই সকল বস্তুদ্বারা সুনিপুণ শিল্পিগণ হীরকের প্রতিরূপ অর্থাৎ কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত করিয়া থাকে, অতএব হীরক ভজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার পরীক্ষা করিয়া লইবে।

তীব্র সংঘোগ, রেখাপাত ও শাণে ঘর্ষণ দ্বারা হীরকের পরীক্ষা করিবে। হীরকে ছাগমূত্র সেচন করিয়া রৌদ্রে দিলে, যদি কৃত্রিম হীরক হয়, তাহা হইলে উহা বিবর্ণ হইয়া যায় এবং উহার নিজের প্রকৃত গুণ প্রকাশ

---

* রক্তোদ্ভবর্ত্তুলোবিন্দুরাবর্ত্তো যবাবর্ত্তুলঃ।
রক্তশ্চপরিবর্ত্তশ্চ রক্ত এব যবাকৃতিঃ॥

পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য করিয়া এই শ্লোকের অনুদ্রিত অংশ পূর্ণ করা হইল।

(১) দক্ষিণবক্রা।

(২) বামবক্রা।

(৩) বাসগৃহং।

পায়। কৃত্রিম হীরক আগুনে ফেলিলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং চূর্ণ হইয়া যায়।

পৃথিবীতে যত প্রকার রত্ন বা লৌহাদি ধাতু আছে, সকল বস্তুই হীরকদ্বারা অঙ্কিত করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল পদার্থ হীরককে আঁকিতে করিতে পারে না।

সকল রত্নেরই গুরুত্ব গৌরবের কারণ, কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন—হীরক সম্বন্ধে এই নিয়মের বিপর্য্যয় হওয়া থাকে, অর্থাৎ হীরক (আকারে বৃহৎ হইয়া) ওজনে কম হইলেই ভাল।

সুবর্ণাদি দ্বারা প্রতিবদ্ধ হীরকের প্রভা উপরদিকে যাইতে পারে না, কিন্তু হীরকটী বক্রভাবে পার্শ্বে কর্ত্তিত হইলে প্রভা ঊর্দ্ধে উঠিতেও পারে।

হীরকের মূল্য

আটটী যব সর্ষপে এক 'তণ্ডুল' হয়, 'তণ্ডুল' পরিমাণ দ্বারা ওজন করিয়া হীরকের মূল্য স্থির করিবে।

বণিগ্‌শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—হীরক যদি নির্দ্দোষ এবং ওজনে বিংশতি 'তণ্ডুল' পরিমিত হয়, তাহা হইলে উহার মূল্য সাধারণ নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়া থাকে।

ইহার তৃতীয়াংশ, ষষ্ঠাংশ, দশমাংশ, ত্রয়োদশাংশ, পঞ্চদশাংশ ও বিংশাংশ এবং অশীতিভাগ, শতভাগ ও সহস্র ভাগই হীরকের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ।

যাদশ 'তণ্ডুল' পরিমিত ওজনের যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দুই তণ্ডুল ওজনের তারতম্যে তাহার মূল্য ন্যূন বা অধিক হইয়া থাকে।

হীরক সাধারণ দোষে দূষিত হইলেও সে দোষগুলাই হউক বা অনেকগুলিই থাকুক, তাহার মূল্য নির্দ্দোষ হীরকের মূল্যের দশ ভাগের এক ভাগ হইবে। যে হীরকের দোষ স্পষ্ট লক্ষ্য হয়, দোষ অল্পই হউক বা অধিকই হউক, সেই হীরকের মূল্য নির্দ্দোষ হীরকের মূল্যের শত ভাগের এক ভাগও হয় না।

ব্রাহ্মণ-জাতীয় হীরকের যে মূল্য, ক্ষত্রিয়-জাতীয় হীরকের মূল্য তাহা অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ কম। এইরূপ নিয়মেই বণিগ্‌ মূল্য স্থির করিবে।

জাতিভেদে যে চারি প্রকার হীরক কথিত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে চারি জাতীয় নৃপতিগণ ধারণ করিবে; ইহার অন্যথাচরণ রোগ, শোক ও ভয় উৎপাদন করে।

হীরক পরীক্ষা শেষ।

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য।

তপোবল

(১)

গুরু যখন তাড়িয়ে দিল তায়,
চক্ষুজলে বক্ষ ভেসে যায়;
মলিনমুখে গহন বনে গিয়ে
কুটীর মাঝে মূর্ত্তি গড়ে তাঁরি;
মূর্ত্তিতে তা'র উঠ্‌ল গুরু জাগি,
বাঞ্ছিত সে বরটী নিল মাগি,
শেষকালে যে সেই ত হ'ল জয়ী,
শিষ্য পাশে গুরু গেলেন হারি।

(২)

ঋষির কাছে শুন্‌ল সকল যবে,
দস্যু ভাবে মুক্তি কিসে হবে,
বস্‌ল শেষে বিশ্ববিভুর ধ্যানে,
বিভুর পায়ে কর্‌ল সবই দান;
বল্মীকেতে কর্‌ল দেহ গ্রাস,
ঝর্‌ণা জলে নয় দিবস, মাস,
দস্যু শেষে কবিকুলের গুরু
গাইল মধুর শ্রীরাম-গুণ গান।

(৩)

হার্‌ল রাজা ঋষির সনে রণে
চল্‌ল তখন তপের ভরে বনে
অস্ত্র ছিল বিপ্র হ'ল শেষে
সৃষ্টি নূতন রচ্‌ল ধরা'পরে;
রাজ্য ত্যজি চল্‌ল শিশু বনে
নিদ্রা ক্ষুধায় ডাক্‌ল ভগবানে
লক্ষ্মীসহ দিলেন দেখা হরি
সিদ্ধি লভে বিশ্বপতির বরে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।

পরিণাম

(৪)

আপাততঃ বিভ্রমের অপর কাহারও শরীর বড় অসুস্থ ছিল না কেবল রামপ্রসন্ন মাঝে মাঝে বলিতেন যে সকাল বেলায় মুখটা কেমন বিস্বাদ হইয়া থাকে আর পেটের বামদিকটায় কেমন যেন ভার ভার বোধ হয়। সকলেই জানিত সামান্য একটু কিছু হইলেই ঝিমলার তাই লইয়া তোলাপাড়া অভ্যাস সেইজন্য তাঁহার কথায় কেহ বড় একটা কর্ণপাত করিল না। কিন্তু ঝিমল মহাশয়ের প্রায়শঃ কাল্পনিক অসুখগুলি যেমন দুদিন পরেই আপনা হইতেই উপশম হইয়া যাইত এটির বেলায় সেরূপ হইতে দেখা গেল না। যন্ত্রণা অসহ্য না হইলেও পেটের বেদনায় তাঁহার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইত উঠিতে বসিতে কিছুতেই যেন আর শান্তি মিলিত না। এইরূপ অচিকিৎসায় রোগ ভোগ করিয়া রামপ্রসন্নের অমন ঠাসা মেজাজও ক্রমশঃ খিটখিটে হইয়া উঠিল সুতরাং গৃহিণীর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কথায় কথায় ঝগড়া আরম্ভ হইল, থাকিল কেবল অপরিচিতের সম্বন্ধে বাহিক শিষ্টতার একটা ক্ষীণ আবরণ মাত্র। হিমানীর সহজও কোন কালেই অধিক নহে তাহার উপর আবার কথায় কথায় মুখঝামটা। আগে ঝগড়ার সূত্রপাত হিমানী হইতেই হইত এখন দাঁড়াইল ঠিক তাহার বিপরীত। এখন সুবিবেচক স্থির-বুদ্ধি রামপ্রসন্নই কোমলে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ঝগড়াঝাঁটির পরও ছেলেদের কথা বা গৃহস্থালীর বিষয় লইয়া স্বামী স্ত্রীতে স্থিরভাবে কথাবার্ত্তা চলিত কিন্তু এখন আর এ কলহ-সান্ত্বনার শান্তির উৎস পাইবার উপায় ছিল না। রামপ্রসন্নের বিশ্রী বেজাজের কথা বলিলে অন্তরঙ্গ বন্ধুসমাজে আর কেহই তাহার প্রতিবাদ করিত না সুতরাং আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট বিভ্রমহিনীর নিজপক্ষসমর্থনের বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। হিমানী যখন রঙ চড়াইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিত যে সে কেন যেচে ঝগড়াই এরূপ নিষ্ঠুর ও হীনচরিত্র পুরুষকে লইয়া এই বিশ বৎসর কাল ঘর করিতেছে তখন তাহার নবপরিচিতা সখীগণ সোৎসাহে বিভ্রম-জায়ার গুণপনা স্বীকার করিয়া স্ত্রীজাতির মুক্তিকল্পে তাবৎ-স্ত্রী মহামণ্ডলে নানারূপ প্রস্তাবের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন।

প্রায় আহারের পূর্ব্বেই সামান্য কিছু লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইত হয়ত থালাটা মাজা হয় নাই বা পড়িয়া টোল খাইয়াছে এমনি একটা তুচ্ছ ছুতা ধরিয়া রামপ্রসন্ন বকাবকি করিতেন এখন তাহা হইতে রান্নার দোষ, ছেলের অশিষ্ট ভঙ্গীতে খাইতে বসা, মেয়ের বিশ্রী বিলাতী ফ্যাসনে চুলবাঁধা প্রভৃতি নানাকথা আসিয়া পড়িত —ঝোলের বাটি হয়তো পাতের গোড়াতেই পড়িয়া রহিত আচমকাওয়া করিয়াই সকলে উঠিয়া পড়িত।

কথায় বলে "যত্নলোভ নত্নলোভ"। যা কিছু 'ঝক্কি' সব গিয়া পড়িত হিমানীর উপর। হিমানী প্রথমে স্বামীর এরূপ অন্যায় ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া স্বামীকে দুঁকথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িত না কিন্তু প্রতিনিয়তই আহারের পূর্ব্বে যখন এরূপ পারিবারিক অশান্তির সূত্রপাত হইতে লাগিল তখন তাহার মনে হইল অজীর্ণ, অম্লিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়াই বোধ হয় এ দুর্ব্যবহারের মূলীভূত কারণ—সে অবধি সে আর বৃথা গোলযোগ না করিয়া—ছেলেদের ডাকাডাকি রাখিয়া যথাসম্ভব নিঃশব্দে তাড়াতাড়ি আহার সমাধার ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট থাকিত।

হিমানী মনে করিত তাহার এই অসাধারণ ধৈর্য্যগুণ— নির্ব্বিবাদে নির্য্যাতন সহ্য করার এই ত্যাগ স্বীকার নেহাৎ জলে ফেলা হইতেছে—প্রশংসা পাওয়ার দূরের কথা

এদিকে কেহ লক্ষ্যও করিতেছে না। রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায়—কামিনীর রুদ্ধশ্বাস ক্রোধানলে—সাংসারিক জীবন—তাহার নিজের পক্ষেই—দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল।

একবার একটা বড় রকম ঝগড়ায় স্ত্রীর প্রতি বিশেষরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়া রামপ্রসন্নর হঠাৎ নির্ব্বোধ উপস্থিত হইল—তিনি কলহান্তে প্রিয়ানীকে জানাইলেন যে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতাই তাঁহার এরূপ মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে—শরীরের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার সুখশান্তি সমস্তই নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

প্রিয়ানী বলিল "তোমার যদি সত্য সত্যই অসুখ করিয়া থাকে তাহা হইলে ভাল একজন ডাক্তারকে দেখাও। কেন? মিছামিছি আমাকে জ্বালাইয়া আর লাভ কি?"

অবশেষে পত্নীর পরামর্শ মত কয়েক দিনের ছুটি লইয়া কলিকাতার কোনও খ্যাতনামা চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়াই স্থির হইল।

রামপ্রসন্ন কলিকাতায় আসিলেন—আসিয়া ডাক্তার দেখাইয়া বুঝিলেন—যাহা ভয় করিয়াছিলেন ঘটিয়াছেও তাহাই। বড় ডাক্তারের বাড়িতে রোগ দেখাইতে আসিলে সঙ্গে সঙ্গেই কিছু সাক্ষাৎ মিলে না। অনেকক্ষণ 'বার' দিয়া বহির্দ্দেশে বসিয়া থাকিতে হয় তাহার পর ভিতরে তলব। কোর্টে হাকিমদিগের যেরূপ তাবেদারী দেখা যায় সম্ভ্রান্ত রোগীদিগের নিকট ডাক্তারের ব্যবহারও অনেকটা সেইরূপ। সেই "বড় কেও কেটা নয়" মুরুব্বিয়ানা ভাবে প্রবেশ—তাহার পর বার কয়েকবার উদরে বা বক্ষে অঙ্গুলীদ্বারা আঘাত করিয়া সেই আদালতের কায়দায় প্রশ্নের উপর প্রশ্ন—তাহার অনেকগুলিরই জবাব চিকিৎসক মহাশয়ের যেন পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে—তবে জিজ্ঞাসাটা যে করিতেছেন সেটা কেবল কর্ত্তব্য করিতে হয় বলিয়া।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা সাধারণতঃ রোগের নিদান লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। রোগীর অবস্থা বিপজ্জনক কিনা এ সব সামান্য বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার তাঁহাদের অবসর থাকে না। এই সকল বহু উপার্জ্জনশীল চিকিৎসক মহাশয়দিগের আকার ইঙ্গিতে ও কথার ধরণে সহজেই বুঝা যায় রোগ লক্ষণাদির কথা অধিক বলিয়া তাঁহাদের কষ্ট দেওয়া নিরর্থক তাঁহাদের সবইতো জানা আছে রোগের কথা আর তাঁহারা নূতন করিয়া শুনিবেন কি? তাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া যাহা বলিয়া দিবেন তাহাই বেদবাক্য জ্ঞানে পালন করিতে থাক পরে যাহা জানিবার আবশ্যক হইবে পুনরায় দর্শনী দিয়া জানিয়া যাইও।

রামপ্রসন্ন স্থূলবুদ্ধি নহেন তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। উঠিয়া আসিবার সময় ডাক্তার বাবু বলিলেন "বাত হইলে চলিবে না—রোগের কাছে কি ছোট বড়'র ভেদ আছে।" তখনও রামপ্রসন্নের বিচারালয়ে বহুবার প্রযুক্ত নিজের একটি প্রিয় উক্তি স্মরণ হইতে লাগিল—"বিচারকের কাছে আবার পক্ষ মর্য্যাদার গৌরব কি? আইনের চক্ষে ছোট বড় সবই সমান।" মনে পড়ে ডাক্তারের ন্যায় কার্য্য ব্যপদেশে তাঁহাকেও কতবার এই প্রকার অনাবশ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছে—আসামী পক্ষের উত্তর জানাই আছে, পাঁচজন উকিল তাহাদের পক্ষে ধরুন তবুও নিস্তার নাই বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব লিপিতে হইবে—এমনি আদালতের কানুন!

তিনি বাহির হইয়া আসিলে ডাক্তার যখন নিজ সহকারীর সহিত তাঁহার পীড়ার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন তাঁহার মনে হইল জজ সাহেব যেন রায়দার মামলায় জুরীগণকে (jurors) চার্জ্জ বা অভিযোগ বুঝাইয়া দিতেছেন। রামপ্রসন্ন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইতেছিলেন ডাক্তার বলিতেছেন যদি এই এই লক্ষণ গুলি মিলিয়া যায় তাহা হইলে দেহের ভিতরকার যন্ত্রাদির বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (ডাক্তারি পরিভাষার রামপ্রসন্ন ঠিক অর্থ বোধ করিতে পারিলেন না) আর যদি পুনরায় প্রশ্নের ফলে যদি রোগীর এই সকল উক্তি না টেকে তাহা হইলে আর এ নিদানে চলিবে না—রোগের ব্যবস্থা তখন অন্যরূপ করিতে হইবে। আমি এখন অবস্থা বুঝে অমুক ব্যারাম বলিয়াই ধরিয়া লইলাম (পুনরায় ডাক্তার মহাশয় একটি বিদ্‌ঘুটে ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিলেন।) কিন্তু consultation অপর কেহ যদি অন্ততঃ একাকী করেন তাহা হইলে এই

সকল হেতুবাদ কাটাইয়া উঠার ভার তাঁহারই উপর, নিজ স্বার্থকে প্রধান তাঁহাকেই প্রয়োগ করিতে হইবে।

রামপ্রসন্ন ভাবিতে লাগিলেন—এ যেন ঠিক সাক্ষীর আইনের burden of proof বা প্রমাণ ভারের বিচার। কখন তাহা আসামীর উপর থাকিবে কখনই বা তাহা বাদীর উপর গিয়া পড়িবে এ যেন ক্ষেত্র ভেদে তাহারই নির্দ্দেশ। রোগটা appendicitis, ভাসমান মূত্রাশয় (floating kidney) কি ডিম্বের পুরাতন প্রদাহ (chronic catarh) উহা কঠিন কি সহজ, উহাতে জীবন হানির সম্ভাবনা আছে কিনা সে দিকে ডাক্তারের দৃষ্টি নাই—তিনি কেবল নিদানের কূট বিচার ও সম্ভাব্যতার বিষয় লইয়াই ব্যস্ত। অবশেষে বিশেষজ্ঞ মহাশয় নিজের বিদ্যাবত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তরুণ সহযোগীটিকে জানাইলেন যে রোগীর মূত্র পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি যতদূর বুঝিতে পারিতেছেন তাহাতে রোগটা appendicitis বলিয়াই তাঁহার ধারণা তবে মূত্র পরীক্ষান্তে যদি কোনও অচিন্তিত-পূর্ব্ব লক্ষণ ধরা পড়ে তখন আবার এ সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচার করা যাইবে।

রামপ্রসন্নের মন হইতে লাগিল আসামী "শঙ্কের" সম্মুখে সুশিক্ষিত সার্জ্জেনের ন্যায় স্বীয় আইন ঘটিত বিদ্যা লইয়া তাঁটা খেলিয়া তিনিও এইরূপ ভাবে কতই না নিজের গুণপনা জাহির করিয়াছেন—কাঠগড়ায় আবদ্ধ অপরাধীর তখন মানসিক অবস্থা কিরূপ তাহা একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই। তিনি যেরূপ যোক্ষদ্দমার শুনানি শেষ হইলে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সোণার চশমার ভিতর দিয়া নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে আসামীর দিকে সপর্দ্দে চাহিয়া দেখিতেন আজ এই যেন বিখ্যাত চিকিৎসকটিও consultation সমাপনান্তে তাঁহার হাতে ব্যবস্থা পত্রখানি দিবার আগ্রহের সহানুভূতিহীন দৃষ্টিতেই তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

চিকিৎসক-বরের রোগ নির্ণয় যুক্তি প্রসঙ্গে—অতর্কিতে ব্যাধির ক্রম বৃদ্ধির বিবরণ শুনিয়া রামপ্রসন্ন বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা যে বড় আশাপ্রদ নহে এ সংবাদ তাঁহার নিকট স্পষ্টই ব্যক্ত হউক না কেন চিকিৎসকের বা অপর কাহারও তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইতেছে না, এই কথাই তাঁহার বার বার মনে হইয়া বড়ই চিত্ত বিক্ষোভ উপস্থিত করিল। এই মনঃপীড়ার সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতিশূন্য ডাক্তারটির প্রতিও তাঁহার এক বিজাতীয় ক্রোধ উপস্থিত হইল যেন সেই এ রোগের একমাত্র কারণ!

রামপ্রসন্ন মনোভাব যথাসম্ভব গোপন করিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর দর্শনীর ষোলটি টাকা গুনিয়া রাখিয়া ডাক্তার পুঙ্গবকে নিতান্ত বিনীতভাবে বলিলেন "মহাশয়! রোগীরা ধর্ম্মের চাঞ্চল্যবশতঃ অনেক সময় অনেক অথথা প্রশ্নও না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারে না। যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া এ রোগে বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা বলিয়া যেন তাহা হইলে বড়ই বাধিত হই," চিকিৎসক মহাশয় শুনিয়া নিতান্ত ক্রূদ্ধভাবে একবার উহার দিকে চাহিয়া অন্য কথায় উত্তর দিলেন "আপনার যে টুকু জানা আবশ্যক তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি যদি আরও কিছু জানিতে চাহেন তাহা হইলে গৃহ-চিকিৎসককে পরামর্শ করার জন্য পাঠাইয়া দিবেন।" রামপ্রসন্ন যে কলিকাতাবাসী নহেন তিনি যে সুদূর মফস্বল হইতে রোগ দেখাইতে আসিয়াছেন একথাও ডাক্তার মহাশয়কে বলিবার অবকাশ ঘটে নাই। রামপ্রসন্নের নিকট এরূপ কঠোর উত্তর বা এপ্রকার দৃষ্টি রোষকষায়িত আশাদবেক্ষণ যেন নিজের পূর্ব্ব আচরণেরই প্রতিফল বলিয়া মনে হইতেছিল। আসামীগণ জবাবের সময় মনের আবেগে উচ্চকণ্ঠে দুই চারিটি অযাচিত কথা বলিলে তিনিই না কতবার তাহাদিগকে ধমক দিয়া অসঙ্গত গোল করার জন্য হাজতবাসের ভয় দেখাইয়াছেন। আজ যেন তাহারই ইহা তীব্র প্রতিশোধ।

রামপ্রসন্ন ডাক্তারকে নমস্কার করিয়া ধীরপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া—নিতান্ত নিরুৎসাহে গাড়ীবারান্দায় তাঁহার ভাড়াটিয়া গিটন খানিতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই মেঘ কণ্টার মধ্যে মহানগরীর বহিঃদৃশ্য যেন হঠাৎ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে—সমস্তই যেন

ইন্দ্রজাল বলে পরিবর্ত্তিত। রাস্তার যাহা কিছু চোখে পড়ে সবই যেন ঘোর নিরানন্দে সমাচ্ছন্ন—চারিদিকেই যেন কেমন একটা দুঃখাভিভূত অবসাদভাব। সকলেই যেন নিরাশাভাবে গতানুশোচনায় নিরত। ভাড়াটিয়া গাড়ীর stand (আড্ডায়) কেহ যাথায় সাদোয়ানসহ অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে কোচবাক্সে বসিয়া যেন বিষয়ভাবেই ঝুঁকিয়া আছে। পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকা শ্রেণী রাজপথের পথিকপ্রবাহ সকলই যেন এক অদ্ভুত শোকাস্তরণে আচ্ছাদিত।

গাড়ী বেগে চলিতেছে আর রামপ্রসন্ন মনে মনে ডাক্তারের কথাগুলি স্মরণ করিয়া তাঁহার দুর্ব্বোধ্য বৈজ্ঞানিক ভাষার তাৎপর্য্য গ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন—কেবলই মনে হইতেছে "ব্যারামটা বড়ই কঠিন—এ যাত্রা বুঝি আর রক্ষা পাইলাম না"। উদরের সেই নিরবচ্ছিন্ন অপ্রখর বেদনা আর মধ্যে মধ্যে অম্ল সান্নিধ্যে চর্ব্বণের ন্যায় অনুভূতি ডাক্তারের সেই অস্পষ্ট ভবিষ্যৎ বাণীর যেন এক ভয়াবহ নূতন অর্থ জ্ঞাপন করিতেছিল। বাড়ী আসিয়া মিত্র মহাশয় সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া সবিস্তারে সকল কথা জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার করুণকাহিনী অর্দ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সুশোভন পরিচ্ছদে ভূষিতা কন্যা প্রেমপ্রভা আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতার সহিত সে আজ হরদমে কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইবে তাই গাড়ী ডাকাইবে কি টেলিফোন করিয়া ট্যাক্সি আনাইবে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে। পিতার অসুখের কথা শুনিয়া সে একবার নিকটে আসিয়া বসিল বটে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই রোগী-চিকিৎসক সংবাদের সেই একঘেয়ে বর্ণনায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। কন্যার ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া মিত্র জায়াও তাঁহার স্বামীর কথা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না তাঁহাকেও বেশপরিবর্ত্তনের জন্য গাত্রোত্থান করিতে হইল। যাইবার পূর্ব্বে বলিলেন "তা বড় ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে এলে ভালই হ'ল। এখন যা ওষুধ করে দিয়েছে তাই আজ থেকে নিয়মমত খেতে আরম্ভ কর। আমাকে বরং প্রেস্‌ক্রিপশনটা দাও আমি দরওয়ানকে ঘোড়ের নূতন ডিস্পেন্সারী থেকে ওষুধ আনতে পাঠাই।" রামপ্রসন্ন প্রত্যক্ষ ভাল করিয়া বাস-প্রশ্বাসও করেন নাই পত্নীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে শ্বাসগ্রহণ করিয়া আপন মনে নিজেকেই প্রবোধ দিতে লাগিলেন—মনে মনে বলিতে লাগিলেন "মিছা-মিছি উতলা হই কেন? ব্যারামটা হয়তো সেরূপ কঠিন নহে কেবল দুর্ভাবনাতেই এইরূপ দাঁড়াইয়াছে"। রামপ্রসন্ন নিয়ম করিয়া ঔষধ খাইতে লাগিলেন। প্রস্রাব পরীক্ষার ফলে ব্যবস্থা যাহা কিছু পরিবর্ত্তিত হইল তাহাও বর্ণে বর্ণে পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত করিয়াও কোথা হইতে একটা অনর্থ ঘটিয়া গেল—ডাক্তারের উপদেশ ভুল বুঝার ফলেই হউক বা গৃহকর্ত্রীর অযথা-ভাবেই হউক কতকগুলি নিয়মলঙ্ঘনে বড়ই ব্যত্যয় ঘটিতে লাগিল। রামপ্রসন্ন ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। রামপ্রসন্ন ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারেরও সে সময়ে এত বেশী ভাক হইতে লাগিল যে তাঁহারও বাড়ীতে দেখা শুনা ভার সুতরাং এ ভ্রমের নিরসন তাঁহার দ্বারাও ঘটিয়া উঠিল না। ভুলই হউক আর ঠিকই হউক রামপ্রসন্ন যতটুকু বুঝিতেন ডাক্তারের আদেশ পালন করিতে ত্রুটি করিতেন না বরং ঔষধ পথ্য ঠিক সময়ে পাওয়া হইলে তাঁহার মনে যেন বিশেষ শান্তি বোধ হইত। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উপদেশগুলি রক্ষা করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ হইত না। নিজের শারীরিক ক্রিয়া ও বেদনার তারতম্য লক্ষ্য করা ক্রমশঃ তাঁহার এক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শারীর তথ্যের আলোচনায় তাঁহার এখন বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত। কাহারও মুখে নিজ ব্যাধির লক্ষণযুক্ত কোনও রোগের কথা শুনিলে মিত্রজা। তাহা সাগ্রহে শ্রবণ করিতেন, রোগ লক্ষণাদির কথা খুঁটানু-পুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতেন এবং মানসিক উদ্বেগ যথা সাধ্য গোপন করিয়া নিজ অবস্থার সহিত স্থির ভাবে মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেন। ঔষধ ব্যবহার চলিতে লাগিল বটে কিন্তু বেদনা কিছুতেই কমিল না। রামপ্রসন্ন নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে তিনি ক্রমশঃই

আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন। কোন ও কারণে হঠাৎ চিত্তবিপ্লব উপস্থিত না হইলে এই মানসিক প্রবোধেরই আত্মপ্রবঞ্চনা করা চলিত কিন্তু যে দিন স্ত্রীর সহিত কলহ সহকারী কার্য্যে অসাফল্য বা তাসের বাজিতে পরাজয় বিষম হঠাৎ মনটা অবরোধ হইয়া যাইত সে দিন আর রোগের পূর্ণ প্রভাব অনুভব করিতে বিলম্ব হইত না। পূর্ব্বে এ সকল সামান্য ব্যাপার তাঁহার কোন দৈনন্দিনই দেখা যাইত না। গৃহের অশান্তি সহজেই পরিহার করা চলিবে, সহকারী কার্য্যে ব্যথা কাসে, নিশ্চয়ই যশোলাভ ঘটিবে এবং পরের দিন তাস খেলায় কখনই হার হওয়া সম্ভব নহে এবম্বিধ উদ্ভাবিত আশ্বাস বাক্যে তাঁহার ক্ষণিক চিত্ত বৈকল্য সহজেই দূরীভূত হইয়া যাইত এখন কিন্তু এই সকল কারণেই তাঁহার ঘোর অবসাদ ও গভীর নৈরাশ্য লাগিল। এখন আর এরূপ অবস্থায় তিনি কথা ঠিক রাখিতে পারিতেন না ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতেন "এমনি করিয়া পাঁচজন মিলিয়াই আমার সর্ব্বনাশটা করিল সবে ঔষধটা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে ঠিক সেই সময়েই যত রকম উৎপাত—এতে কি কখনও রোগ সারিতে পারে।"

মিত্রজা মধ্যে মধ্যে বুঝিতে পারিতেন যে যখন তখন হঠাৎ এরূপ রাগান্বিত হইলে ব্যারাম বৃদ্ধি হইলেই এমন কি জীবন হানির ও সম্ভাবনা আছে কিন্তু বুঝিয়াই কোন ক্রমে আত্ম সংবরণ করিতে পারিতেন না।

অপ্রিয় প্রসঙ্গে মনোযোগ না দিয়া যে ওষধি নীরবে উপেক্ষা করিলে মন ও শরীর উভয়ই সুস্থ থাকে কিন্তু বিপৎ কালে বিপরীত বুদ্ধি তাই জ্ঞানদাস রামপ্রসন্নকে ক্রমশঃ উল্টা পথই অবলম্বন করিতে দেখা যাইত—কেহ অনুযোগ করিলে মিত্র মহাশয় বলিতেন সকল বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিলে কখনও সংসারী লোকের মন স্থির থাকে না ফলে সামান্য খুটিনাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে গিয়া সামান্য অসুবিধা বোধেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। ইহার উপর নিত্য নূতন ডাক্তার দেখান এবং রোগের অবস্থা স্বয়ং বুঝিবার চেষ্টায় ক্রমাগত ডাক্তারী পুস্তক পাঠের ফলে ব্যারামটিও ক্রমশঃই জটিলতর হইয়া পড়িতেছিল। অবশ্য একদিনেই রোগের কিছু বিশেষ একটা হ্রাসবৃদ্ধি বুঝা যায় না কিন্তু পরিবর্ত্তন যেখানে অল্প রোগী যদি সেখানে চিকিৎসকের ন্যায় রোগের অবস্থা বুঝিতে যায় তাহা হইলে ভুল হইবারই অধিক সম্ভাবনা। তাই মধ্যে মধ্যে নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিয়া এক একবার এক এক জন নূতন ডাক্তারের কাছে গেলে রোগের গতিও দ্রুততর বলিয়াই বোধ হইতে থাকে।

রামপ্রসন্নের কিন্তু কি অভ্যাস হইয়াছিল কোথাও কিছু নূতন ওষধ না পাইলেও তিনি ডাক্তারখানের বাড়ী বাড়ী হাঁটিতে ছাড়িতেন না। সেই এক মাসের মধ্যেই অপর আর একজন বিলাত ফেরত বিশেষজ্ঞকে দেখাইতে গিয়া তাঁহার মন আরও খারাপ হইয়া গেল। প্রথমবারের বড় ডাক্তারটি যাহা বলিয়াছিলেন ইনিও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন তবে তফাতের মধ্যে এই যে ইহার প্রশ্নগুলি কিছু পৃথক ধরণের। দুইজন প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসকের রায় মিলিয়া যাওয়ায় রামপ্রসন্নের মৃত্যুভয় ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

রাজধানীর অপর একজন সুবিখ্যাত ডাক্তার রামপ্রসন্নের কোনও বন্ধুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। রামপ্রসন্ন ভাবিয়া চিন্তিয়া এক রবিবার দেখিয়া তাঁহার নিকট যাওয়াই স্থির করিলেন। এ ডাক্তারটির রোগের নিদান কিছু আলাদিয়া রকমের। তিনি আরোগ্য লাভ সম্বন্ধে আশ্বাস দিলেন বটে কিন্তু তাঁহার প্রশ্নগুলির ইঙ্গিত আভাসে মিত্রজার দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়া গেল। শেষে লুকাইয়া লুকাইয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও চলিতে লাগিল। হোমিওপ্যাথিক মতে প্রায় রোগের দেখা মিলা থাকে পূর্ব্ব ডাক্তারগণের রোগনির্ণয় এক্ষেত্রেও সেইরূপ ভ্রান্ত বলিয়াই স্থিরীকৃত হইল। রামপ্রসন্ন অন্যান্য ঔষধাদির সহিত গোপনে এক সপ্তাহকাল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিলেন কিন্তু উহাতে কোন ফলই হইল না অবশেষে হোমিওপ্যাথিকে বিশ্বাস হারাইয়া মাদুলী ও দৈব-চিকিৎসার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। একজন কোনও প্রাচীন অন্ধলোক জনৈক বৈষ্ণব-যোগাভ্যাসের এক শালগ্রাম-শিলার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ব্যাখ্যান করিতেছিলেন —বলিতেছিলেন কোনও বিশেষ তিথিতে সেই শিলাদৌত

জলপানে অতি কঠিন ব্যাধিও আরোগ্য হইয়া থাকে। রামপ্রসন্নের মনে মনে একবার হিন্দু-দেবতার দৈব ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল—ভাবিতে লাগিলেন 'সামান্য একটু জলদান করিয়াই যদি ফল পাওয়া যায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কি?' পরক্ষণেই চিত্তদুর্বলতার জন্য তাঁহার নিজের উপর বড় বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল—ভাবিতে লাগিলেন শেষে আমি হইতে বসিলাম কি? এ সবই তো মিথ্যা মূলকথা দুই তিন পুরুষ ধরিয়া খৃষ্টান-ধর্ম্ম মানিয়া শেষকালে কি জ্ঞান-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া অন্ধ কুসংস্কারে আবদ্ধ হইব? এখন হইতে আর শুধু রোগের কথা ভাবিয়া হিতাহিত বোধ নষ্ট করিয়া ফেলিব না। বার বার এমন করিয়া আর মত পরিবর্ত্তন করিতেছি না। গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত এবার এক ডাক্তারেরই ঔষধ খাইব তাহাতে যদি কোনও উপকার না দেখি তখন বরং নূতন কোনও ব্যবস্থা করা যাইবে।" এমত প্রতিজ্ঞা মুখে করা যত সহজ কাজের বেলা তত সহজ নহে।

পেটের বেদনা ক্রমেই দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল যেন কোন ক্রমেই আর তাহার বিরাম নাই। মুখের বিস্বাদভাব ক্রমশঃ আরও বাড়িতেছিল, আহার কমিয়া গেল। শরীরের দুর্ব্বলতা যেন দিন দিন বাড়িয়া চলিল আর সেই সঙ্গে মুখেও বিশ্রী দুর্গন্ধ অনুভূত হইতে লাগিল। দেহের ভিতর যে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা রামপ্রসন্ন ছাড়া আর কেহই বুঝিল না। আত্মীয়-স্বজন এসব লক্ষণ দেখিয়াও দেখিল না—মনে করিতে লাগিল তাঁহার শরীর পূর্ব্বেরই মত রহিয়াছে। নিতান্ত আপনার জনেরও এই প্রকার নির্ব্বিকার নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া তাঁহার এক এক সময়ে বড়ই রাগ হইত।

সেই সময়ে হোট আদালতের রেজিষ্ট্রার পদ খালি হওয়ায় রামপ্রসন্ন চিকিৎসার সুবিধা হইবে বিবেচনায় অনেক চেষ্টা করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। এখানে আসিয়া অবধি স্ত্রী-কন্যা উভয়েই সামাজিক নিমন্ত্রণ, সাজা-সমিতি ও সঙ্গীতাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিত সুতরাং স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করার আর তাহাদের অবসর ছিল না। হিমানী মধ্যে মধ্যে তাহার স্বামীর খুঁৎখুঁতেমি ও কোপনস্বভাবে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিত যেন সবই তাহার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ। রামপ্রসন্ন দেখিলেন তিনি ক্রমশঃই যেন স্ত্রী-পরিবারের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইতেছেন। তাঁহার অসুখ সম্বন্ধে তাঁহার স্ত্রীর যে ধারণা জন্মিয়াছিল তাহার তর্কবিতর্ক সত্ত্বেও তাহার একচুল বদলাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার স্বামীর উপস্থিতিতে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সমক্ষে হিমানীকে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত রোগ আর ভাল হ'বে কি? ঔষধ পথ্যের নিয়ম না মানলে কখনও ব্যারাম সারে? একে উনি মন স্থির করে ভদ্রলোকের মত এক ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবেন না তার উপর আবার যোর অনিয়ম। আজ হয়তো রীতিমত ঔষধ পথ্য খেয়ে ঠিক সময়ে সকাল সকাল শুতে গেলেন কিন্তু কাল আবার লক্ষ্য না রাখলে ঔষধ খেতে ভুলে যাবেন হয়তো কুপথ্য আহার করে বসবেন আর রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত জেগে বসে বসে তাস পিটবেন এতে কি ভাল মানুষেরই শরীর টেকে?" শুনিয়া রামপ্রসন্ন একদিন চটিয়া উঠিয়া বলিলেন "তোমার আর বলতে কি? নিয়ম অনিয়মের বুঝি তাদি খোঁজ রাখ কিনা? কবে আমি কি অত্যাচার করেছি বলতো?"

হিমানী "কেন সেই সেদিন লীলাময় বাবুর বাড়ীতে অত রাত্রি পর্য্যন্ত তাসের আড্ডায় কে বসেছিল?"

রামপ্রসন্ন—"সেকি আর সাধে বসেছিলাম—তাস হাতে করে ভুলে থাকবার চেষ্টা না করলে রোগের জ্বালাতেই যে আমাকে দুপুর রাতপর্য্যন্ত জাগিয়ে রাখতো।

হিমানী—"তা যে যাই বলে বলুক ও রকম করে চলতে থাকলে রোগও তার সাধ্যের বাইরে আমাদের চিরকাল জলে পুড়ে মরতে হ'বে।" এত একদিনের ঘটনা কিন্তু এরূপ যে আরও অনেক অনেক না হইত তাহা নহে। স্বামী যে নিজ দোষেই রোগ ভোগ করিয়া তাহার অন্যান্য আলার উপর আর কয়েকটি অতিরিক্ত যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছে একথা হিমানী কোন দিনই সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

রামপ্রসন্ন বুঝিতেন তাঁহার পত্নী যাহা বলিতেছে তাহা তাহার অধিক বিরক্তি সহকারে—আদিতেন এ সকল

উক্তি কখনই তাহার স্নেহ প্রণোদিত বা স্থির বিশ্বাস প্রসূত নহে কিন্তু জানিয়াও তাহার বড় সান্ত্বনা বোধ হইত না।

রামপ্রসন্ন ক্রমশঃ সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে আদালতের লোকে যেন তাঁহার প্রতি কেমনতর নূতন ভাবে ব্যবহার করিতেছে। কাহারও কাহারও কথার ভাবে মনে হইত তিনি যে শীঘ্রই কর্ম্মত্যাগ করিবেন এরূপ যেন সকলে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার তাঁহার উপর উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহিত তামাসা করিতেও ছাড়িতেন না। যে কালব্যাধি তাঁহার সুঠামদেহে নিজ অধিকার স্থাপন করিয়া তাঁহাকে পলে পলে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহারই দুঃসহ যন্ত্রণা সহিয়া পরিহাস!

হায়, শিক্ষিত সমাজের অন্তর সহানুভূতি, সহকর্ম্মীগণের মধ্যে যে সেন সাহেবের অন্তরতা ও প্রফুল্ল সদানন্দভাব তাঁহাকে নিজের দশবৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে তাঁহারই হাল্‌কা বিদ্রূপগুলি তাঁহার নিকট এখন সর্ব্বাধিক কষ্টকর বলিয়া মনে হইত। একদিন সন্ধ্যাকালে রামপ্রসন্নের কয়েকজন বন্ধু তাঁহার গৃহেই তাস খেলিতে আসিলেন। ঘটা করিয়া এক প্যাক নূতন তাস খোলা হইল। রামপ্রসন্নের হাতে আরও দুইখানি। রামপ্রসন্ন হাঁকিলেন—No Tramps (নো ট্রাম্পস্)। যেরূপ সুবিধার হাত তাহাতে একখানি পিঠও ফাঁক যাইবার নহে। হঠাৎ বিদ্যুতের পেটের পার্শ্বে সূচী বিদ্ধ করার ন্যায় ভীষণ যন্ত্রণা অনুভূত হইল—মুখটা বিকৃত ও বিবর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার খেলায় অস্থির হইয়া রামপ্রসন্ন চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন তাসের ডিং তখন নেহাইৎ অতিরিক্তরূপ ভারী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার 'পেন্থ' (partner) অন্যত্র করিয়া 'পিঠ' গুলি তাঁহার দিকে আসাইয়া দিতেছিলেন—উদ্দেশ্য বাকী পিঠ কয়টি তিনিই গ্রহণ করেন। রামপ্রসন্ন উল্টা বুঝিলেন—ভাবিলেন "আমি কি রোগে এতই অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি যে 'পিঠ' কয়টাও সরাইয়া লইতে পারি না" উত্তেজনায় তাঁহার ভুল হইয়া গেল! হাতের তাস গোলমাল করিয়া তিনি বাকি পিঠ সব কয়টিই নিতান্ত নিরুপায়ের ন্যায় বিপক্ষ পক্ষের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ক্রীড়া-সঙ্গীরা খেলায় ওরূপ আকস্মিক বিপর্য্যয়ে যে কিরূপ দুঃখিত হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়াও তাহার বিন্দুর কোনই কষ্ট হইতে ছিল না—খেলার ফলাফলের উপর হঠাৎ এই অসাধারণ তাঁহার কেমনতর অস্বাভাবিক বোধ হইতেছিল। রামপ্রসন্নের মুখ দেখিয়া সঙ্গীগণ সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে হঠাৎ তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে—তাই সকলেই তাঁহাকে সে রাত্রির মত খেলা বন্ধ রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসন্ন ক্লান্তি বা অসুস্থতার কথা কোনক্রমেই স্বীকার করিলেন না, জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমার শরীরত ভালই আছে তবে আর মিছামিছি বিশ্রাম করিয়া সময় নষ্ট করি কেন? বরং কতক্ষণ পাল্টা বাজীটা শেষ হইয়া যাইবে।" তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া খেলায় আর কাহারও উৎসাহ ছিল না। সকলেই চুপচাপ অবলম্বন করিয়া গম্ভীরমুখে বসিয়া রহিলেন। ভাগ্যক্রমে সেই সময়েই আহারের ডাক পড়িল। তাসের টেবিল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সকলেই যেন স্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। আধঘণ্টার পর রামপ্রসন্নের বন্ধুবান্ধবেরা চলিয়া গেলেন। রামপ্রসন্ন ভাবিতে লাগিলেন—"নিজের জীবনটা বিষময় হইয়াছে এখন দেখি পরের সুখেরও অন্তরায় হইতে চলিলাম। যে বিষে নিজের দেহমন জর্জ্জরিত তাহা কি অপরের জীবনেও সংক্রামিত করিতে থাকিব। হায়—দুর্ভাগা ইহার যে আর প্রতিষেধক ঔষধও নাই।" এইরূপ ভয়, দুশ্চিন্তা ও রোগযন্ত্রণায় প্রায়ই মনে মনে অভিভূত হইয়া রামপ্রসন্ন দিনশেষে শয্যাগ্রহণ করিতেন কিন্তু রাত্রির অধিকক্ষণ ধরিয়াই চক্ষের পাতাটিও বুজিতে পারিতেন না। পরের দিন সকাল হইতে হইতেই শয্যাত্যাগ না করিলে নয়—রাত্রি লিখিতে না হইলে উপায়ন্তর আবশ্যকের সহিত আপিসের কার্য্য সম্পর্কীয় নানাবিধ আলোচনা করিতে হইবে তাহার পর, সমস্তার মধ্যে

আহারাদি সারিয়া আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে সুতরাং রাত্রে ঘুম হয় নাই বলিয়া সাড়ে আটটা নয়টা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়িয়া থাকিলে চলে কি করিয়া। যেদিন বিমলা শরীর নিতান্ত অসুস্থ বোধ হওয়ায় আপিস যা যাইতে পারিতেন সেদিন আর রক্ষের পরিসীমা থাকিত না।

৫

(৫)

ইহার পর আরও মাস ছয় কাটিয়া গিয়াছে। বহুদিনের ছুটীর আদেশ দিবস রামপ্রসন্নের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়া তাঁহার ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আপিস ফেরতা রামপ্রসন্ন বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্নেহ জুতাটী মেজের উপর বসিয়া ব্যাগ হইতে কাপড় চোপড় বাহির করিতেছেন। সমস্ত শুনিয়া রামপ্রসন্নের দিকে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইতেই ভগিনীপতির চেহারার বিষম পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ভদ্রলোকের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। তাঁহার নীরব হতভম্বভাব তাঁহার মনের কথাই স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া দিল। রামপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে আমার শরীর খুব খারাপ দেখিতেছ নাকি?" উত্তরে তাঁহাকে যেন একটু কিন্তুর সহিতই বলিতে হইল, "তা তেমন কিছু নয় বটে তবে যেন বড় রোগা হয়ে পড়েছেন দেখ্‌ছি।"

অনেক শুকনো জবাব করিয়াও বড় কুটুম্বের নিকট ইহার চেয়ে আর বেশী কিছু জানিতে না পারিয়া রামপ্রসন্ন নীরবে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে তাঁহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিতেই তাঁহার সম্বন্ধী বাটির ভিতর চলিয়া গেল রামপ্রসন্ন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া নিবৃত্তে মুকুরে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে লাগিলেন। আয়নার সম্মুখে ও পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কতবার কত রকম করিয়া দেখিলেন কিন্তু কিছুতেই মনে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। অবশেষে বেয়াল খুলিয়া তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার এক সঙ্গে তোলা একখানি ফটোগ্রাফ বাহির করিলেন। আলোক চিত্র নিহিত নিজ প্রতিকৃতির সহিত মুকুর গাত্রস্থ আলোক চিত্র প্রতিবিম্ব মিলাইয়া দেখিতেই রামপ্রসন্ন শিহরিয়া উঠিলেন—এই কয় দিনে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন। আয়না ছাড়া টানিয়া তুলিতেই বুঝিলেন আবাহ নয় হস্ত দুইখানি কি অসম্ভব শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামপ্রসন্নের মুখে দুর্ভাবনার অন্ধকার আরো ঘনীভূত হইয়া আসিল। সদি আটা কৌচের উপর বসিয়া পড়িয়া একবার নিজেই নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন মনে মনে বলিতে লাগিলেন এ সব কিছুই নয় শুধু মানসিক ব্যাধি একবার জোর করিয়া—"নাই" বলিলেই—সকল আপদ চুকিয়া যাইবে।

রামপ্রসন্ন মন চাঙ্গা করিয়া তখন তখনই নথিপত্র খুলিয়া কাজে বসিয়া গেলেন কিন্তু কিছুতেই আপিসের কাজ আর ভাল লাগিল না অল্পক্ষণ পরে মনে হইল একবার বৈঠক খানায় যাই। তখায় কেহ ছিল কাজে যাইতেই শুনিতে পাইলেন তাই তথাতে অস্ফুট কণ্ঠে কথা বার্ত্তা হইতেছে তাঁহার স্ত্রী বলিতেছেন "তোমার যেমন কথা। সবতাতেই ব্যস্ত হয়ে পড় কেন, এত ভয়ের কারণটা দেখ্‌লে কি সে বলত।

ভয় আর কি দিতে হয়, মিত্র মহাশয়ের চেহারা দেখেই আমার চক্ষু স্থির চোখের দিকেও কি একবার চেয়ে দেখনি ঠিক যেন মরণাপন্ন লোকের মত জ্যোতিটুকু সব নিভে গিয়েছে। ব্যারামটা কি বল দেখি।

কি যে ব্যারাম তার কেউই ঠিক করে বলতে পারে না। সহরের দুজন বড় বড় ডাক্তারকেই দেখান হয়েছে। দুজন ডাক্তার বলেছিল কি একটা ব্যারামের ভাব কিন্তু রাখহরি ডাক্তার বলেছে—রামপ্রসন্ন আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না আপিস ঘরে ফিরিয়া আসিয়া রোগের কথাই ভাবিতে লাগিলেন কেবলই মনে হইতে লাগিল "রোগটি ও সহজ নয়—"ভ্যাম্পায়ার মূত্রাশয় ডাক্তার বলিয়াছিল মূত্রাশয়টা কোন প্রকারে স্থানচ্যুত হইয়া সরিয়া বড়িয়া যেতেছে।" মনে হইল একবার নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রাণ পণে প্রয়োগ করিয়া দুই মূত্রাশয়টাকে স্বস্থানে ফিরাইয়া আনা যায় নাকি। শুনিয়াছি সেকালে সাধু সন্ন্যাসীরা ইচ্ছা শক্তির জোরেই কত কি অসাধ্য সাধন করিতেন। আজকাল ইংরাজী বইতেও ও এসব কথার আলোচনা

আরম্ভ হইয়াছে। একবার দেখিই না কেন। চেষ্টা করাটা কি এতই কঠিন।

কিন্তু মনের এ ভাবটাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। একটু পরেই মনে হইল না—একবার অনুকূলের কাছেই যাই।

অনুকূলবাবু তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধু। ডাক্তার রামধন ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্টতা আছে।

রামপ্রসন্ন ঘণ্টা দিতেই আরদালী উপস্থিত হইল। বলিলেন "আভি গাড়ী লানে বলো"।

মিত্র গৃহিণী স্বামী সম্ভাষণে আসিতেছিলেন গাড়ীর কথা শুনিয়া বলিলেন "সেকি! এখনই আবার বাহিরে যাবে নাকি? আপিসের কাপড় ও যে ছাড়া হ'ল না।"

পত্নীর হঠাৎ এরূপ মেহার্দ্র ভাবে রামপ্রসন্নের মন যেন আরও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন "অনুকূলের সঙ্গে দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

চিকিৎসক-সখা প্রিয় বন্ধু অনুকূল বাবুকে সঙ্গে লইয়া রামপ্রসন্ন ডাক্তার ভবনে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাড়ীতেই ছিলেন। অনুকূলবাবুর খাতিরে আজ তাঁহার সহিত রামপ্রসন্নের অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল। ডাক্তারের মতে যাহা প্রকৃত নিদান রামপ্রসন্ন আনাটমি ও শারীরপাত্র বিষয়ক যে সকল তথ্যগুলি ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইলেন। কবির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে অঙ্গটি তাহাতেই অতি ক্ষুদ্র কোনও কঠিন পদার্থ প্রবেশ করিয়াছে। ডাক্তার আশ্বাস দিলেন যে এ ব্যাধি দুরারোগ্য নহে। ঔষধ বা অস্ত্রপ্রয়োগ ফলে বাহির হইয়া যাইবে, তাহার পর ঘা শুকাইলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ। সেদিন সন্ধ্যার সময় রামপ্রসন্নের বেশ ক্ষুধা বোধ হইল। বন্ধু কুটুম্বের সহিত হাসি-খুসি গল্প-গুজব করিতে করিতে আহার সমাধা হইল কিন্তু খাওয়ার পর আপিস ঘরে গিয়া রায় লেখাটা সাঙ্গ করিতে আর ইচ্ছা হইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে কোন রকমে জোরজার করিয়া কাজে বসিলেন বটে কিন্তু সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল কি যেন একটা বেশী প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যে মনঃসংযোগ করিতে এখনও বাকি রহিয়া গিয়াছে। রায়টা লেখা শেষ হইয়া গেলে কিছুক্ষণ চিন্তার পর মনে পড়িল যে সেই বেশী প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যটি আর কিছুই নয় তাঁহার সেই রোগগ্রস্ত অঙ্গাংশ সম্বন্ধে একটা ঠিক ঠাক মীমাংসা করিয়া ফেলা। রামপ্রসন্ন আরও কিছুক্ষণের জন্য এচিন্তাটিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বৈঠক-খানায় গিয়া চা-পানে ও অভ্যাগতদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় নিরত রহিলেন। তাঁহার ভাবী জামাতারূপে মনোনীত সেই নবীন ডেপুটিটিও আসিয়াছিলেন। একটু অধিক রাত্র পর্য্যন্তও গান ও পিয়ানোর বাদ্য শুনিয়া এবং সাধারণ সদালাপ ও কথাবার্ত্তাদিতে নিরত থাকিয়া রামপ্রসন্ন যেন সুস্থব্যক্তির মতই আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও লক্ষ্য করিতেছিলেন যে অন্য দিন অপেক্ষা তাঁহার জীবন-পথের সঙ্গিটীর মন আজ যেন বেশ খুসী খুসীই বোধ হইতেছে। রামপ্রসন্ন কিন্তু নিজ ব্যাধির কথা বিস্মৃত হন নাই। আদালতের মোকর্দ্দমার ন্যায় এ চিন্তাটা মুলতবি রাখিয়াছিলেন মাত্র। এইবার আরোগ্য লাভের উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটা কিছু স্থির না করিলেই নয়। রাম-প্রসন্ন অসুখের পর হইতে একটি ছোট ঘরে একাকী শয়ন করিতেন। এটি তাঁহার আপিস-কামরারই সংলগ্ন। রাত্রি-বাসের কাপড়খানি আলনা হইতে উঠাইয়া লইয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে মনে হইতে লাগিল ঘুম না আসা পর্য্যন্ত একটা কিছু না পড়িলে দুশ্চিন্তায় আরও অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইবে। রামপ্রসন্ন বাছিয়া বাছিয়া প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার একখানি পুস্তকের অনুবাদ লইয়া আসিলেন কিন্তু পড়িতে গিয়া পুনরায় চিন্তাস্রোতেই ভাসমান হইলেন। কল্পনাবলে মনে করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে। দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া গিয়া ঘা সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া আসিয়াছে। যেন ঔষধসেবন আর বিন্দুমাত্র বেদনা নাই। রামপ্রসন্নের মনে হইতে লাগিল—শুধু 'নাই' বা 'সারিয়া গিয়াছে' শুধু এরূপ বিশ্বাস করিলেই চলিবে না। সেই সঙ্গে শারীরিক ক্রিয়াদির সৌকার্য্য-সম্পাদনেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই সময়ে ঔষধ সেবনের কথা স্মরণ হওয়ায় বিজলী পাখা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঔষধের শিশি হইতে

একদাগ ঔষধ ঢালিয়া লইয়া—পানাতে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া মনযোগ সহকারে শরীরের আভ্যন্তরিক ব্যাধির উপর ঔষধের ফলাফল লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য ঔষধপানের পর যন্ত্রণাটি কি পরিমাণে কমিয়া যায় তাহাই একবার বুঝিয়া লন। রামপ্রসন্ন আপন মনেই বলিতে লাগিলেন "কিন্তু ঔষধটা নিয়ম করিয়া খাওয়াই আবশ্যক—আর যাহা কিছু অনিষ্টকর তাহার ত্রিসীমানা দিয়াও যাইব না। এই ত ঔষধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরটাও যেন একটু ঝরঝরে বলিয়া মনে হইতেছে। দেহের ভিতরকার দূষিত পদার্থের শোষণ-ক্রিয়াটা নিশ্চয়ই এতদিনে আরম্ভ হইয়াছে।

এই কথা কয়টি ভাবিতে ভাবিতেই পুনরায় উষধাভ্যন্তরে সূচী ভেদের ন্যায় অসহ্য,—অতীব (ull) বিরামহীন যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল। মুখেও হঠাৎ কিরূপ বিশ্রী বিস্বাদ বোধ হইল। হৃৎপিণ্ড বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। রামপ্রসন্নের চিন্তাস্রোত প্রতিহত হইয়া—সমস্তই যেন উল্টা পাল্টা হইয়া গেল। হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে রামপ্রসন্ন ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন, প্রভু! যন্ত্রণার কি আর শেষ হইবে না অকস্মাৎ শারীরিক অবস্থার একি ভয়াবহ পরিবর্ত্তন—তাহা হইলে একি শুধু অন্ত্রাশয় ও মূত্রাশয়ের প্রদাহ হইতেই জন্মিয়াছে। ব্যারামটিও ত বড় ছোট নয়—এ যে প্রাণ লইয়াই টানাটানি। "রামপ্রসন্নের বোধ হইতেছিল যেন পলে পলে জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হইতেছে। জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিলেও ত এ আর আটকাইয়া রাখার উপায় নাই মিছামিছি আর নিজেকে ফাঁকি দিয়া লাভ কি? মৃত্যু যে ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহা বাটীর অপর কাহারও আর জানিতে বাকী নাই আমিই কেবল এই আসন্নমৃত্যুর বার্ত্তা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কৈ এখনও ত মরিতে চলিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে না, আর কয়দিন কয় সপ্তাহই বা বাঁচিব - এখনই যে আয়ু শেষ হইবে না তাহাই বা কে জানে। এই ত জীবন প্রদীপ দেখিতে দেখিতে নিভিতে চলিল সংসারের আলো আঁধার আলো অন্ধকার হইয়া আসিতেছে যাইতেছে। এই ত এই পর্য্যন্ত অজ্ঞানে এখানেই বা কাটাইতেছিলাম এইবার মহাপথের যাত্রী হইতে হইবে—কিন্তু যাইবই বা কোথায়—?"

রামপ্রসন্নের সর্ব্বশরীর যেন হিম হইয়া উঠিল—দেহ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নাসারন্ধ্র দিয়া নিশ্বাস ও যেন আর বহিতেছিল না কেবল থাকিয়া থাকিয়া হৃৎপিণ্ডের আবেগ স্পন্দন টুকুই বক্ষমধ্যে অনুভূত হইতেছিল।

রামপ্রসন্ন মৃত্যুর পর আত্মার অবিনশ্বরতায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী না হইলেও এ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা করিতে লাগিলেন। আচ্ছা মাটির দেহ তো মাটিতেই মিশিয়া গেল কিন্তু মনের কি কোন পরিবর্ত্তন হইবে না আগে যেমন 'আমি' ছিলাম তখনও কি সেইরূপই 'আমি' থাকিব। কিন্তু আত্মাই বল আর আমিত্বই বল সেই আমিটাই বা থাকিবে কোথায়। তবে এই মৃত্যুই কি চরম পথ?—না সহজে জীবনটাকে যাইতে দিব না।" এই বলিয়া মিছ মহাশয় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কোথায় বিচারকের ধৈর্য্য কোথায় শিক্ষাদত্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস ইতস্তাইয়া হাতড়াইয়া আলো জ্বালিতে গিয়া বাতি বাতিদান সমস্তই মেজের উপর কাত হইয়া পড়িয়া গেল। রামপ্রসন্ন আর বসিতে পারিলেন না এই টুকুতেই অবসন্ন হইয়া বিছানার উপর এলাইয়া পড়িলেন। অন্ধকারের মধ্যেই অন্ধকারের চক্ষুর ঘথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন "আর বাঁচিবার ইচ্ছা করিয়াই বা ফল কি? এখন আর চেষ্টা করা না করা দুইই সমান এখন বাকী কেবল শুধু—মৃত্যু—মৃত্যু—মরণ।

উষারাণী এ সবের কোন খোঁজই রাখে না—রাখিতে ও চায় না আমার উপর উহাদের এতটুকুও মমতা নাই। এখন পর্য্যন্তও পুরা দমে গান বাজনা চলিতেছে বৈঠক খানা হইতে বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার এ অন্তিম শয্যাকেও বেহাৎ করিতেছে না আমি বাঁচি বা মরি তাহাতেই বা উহাদের আসিয়া গেল কি? কিন্তু উহারাই কি আর চিরদিন বাঁচিবে? না বাঁচুক আপাততঃ ত প্রাণ ভরিয়া ফূর্ত্তি করিয়া লইতেছে—ওঃ কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর মনের পশুরাজ এদের চেয়ে অনেক ভাল। রাগে রামপ্রসন্নের

দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। আমি যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছি আর অদূরে আত্মীয় আত্মীয়া কলরব করিতেছে এই অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য ব্যবহার তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়িত করিতেছিল। এ ব্যবহার তাঁহার কাছে ভয়ানক অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। আর থাকিতে না পারিয়া বিজয়া পুনরায় বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"কি জানি কেন সমস্তই যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। মা এত উতলা হইলে চলিবে না একবার প্রথম হইতেই সমস্তটা আগা গোড়া মনে করিয়া দেখি। তাইত ব্যারামটার সূত্রপাত হইল কিসে? হাঁ এখন মনে পড়িতেছে বটে—"এই বলিয়া তিনি সকল ঘটনাগুলি আদ্যোপান্ত স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—বই হইতে পড়িয়া গিয়া পায়ে লাগিয়াছিল বটে কিন্তু তাহাতে ত, তখন কোন ক্ষতিই হয় নাই বেদনাটাও সম্পূর্ণরূপেই সারিয়া গিয়াছিল। তাহার পর কি জানি কেন অসুখ নূতন করিয়া বেদনা আরম্ভ হইল। বাড়িতে লাগিল দেখিয়া ডাক্তারের নিকট গেলাম কোথায় একটু আরাম পাইব তা নয় নিদান বিভ্রাটে ভয় ও নিরাশায় মন আরও দমিয়া গেল। তাহার পর কত রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলাম কোথায় উপকার হইবে তা নয়, যন্ত্রণের দিকেই হু হু চলিতে লাগিল। ক্রমেই বল কমিয়া যাইতে লাগিল—যেটুকু সামর্থ্য ছিল এখন তাহাও রসাতলে গিয়াছে। দেহ ত শুকাইয়া শুকাইয়া অস্থি কয় খানিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—পাঁচটির বাতিল বলিলেও হয়। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে আর কাজ করিবারও শক্তি নাই বিমুনী বলে যখনই মাথিবে চড়িয়া আসেন এদিকে মৃত্যু-যাতন মাথিবে গলার ঘণ্টাধ্বনি বন্ধই কাণের কোণায় আসিয়া বাজিতেছে আমি হতই উদরের অন্নের সেই ফিনিষ্টুকুর কথাই ভাবিয়া সারা। কেবলই ভাবিতেছি কোন প্রকারে যদি এটাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া বেরাদত করাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে এবারকার মত রক্ষা পাই। মৃত্যু যে নিশ্চিন্ত ভাবে শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে সে দিকে একবারও লক্ষ্য করিতেছি না—তাহা হইলে কি প্রাণবায়ু এখনই বাহির হইয়া যাইবে। মৃত্যু ভয়ে রামপ্রসন্ন পুনরায় অস্থির হইয়া পড়িলেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া বসিয়া আর একবার দেশলাই এর বাক্সটা খুঁজিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন বিছানার যাবেই গোল টেবিলের মত একটা বড় টিপয় teapoi ছিল সেটার উপরও অনেক সময় খবরের কাগজ বোতল প্রভৃতির সহিত দুইটি দেশলাই থাকিত টিপয়ের উপর অল্পক্ষণ ভর দিয়েই দুইয়ে বেদনা বোধ হইতে লাগিল। রামপ্রসন্ন অজ্ঞান শিশুর ন্যায় ক্রোধান্ধ হইয়া আরও জোরে দুই দিয়া চালিতে লাগিলেন—ফলে টিপাইটি সশব্দে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল।

রামপ্রসন্নের যাবতীয় ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বিজয়া মাথিবের উপর কাত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভাবিলেন এখনই তাঁহার মৃত্যু হইবে।

এদিকে উৎসব শেষে অভ্যাগতগণ গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলেন বিজ গৃহিণী তাঁহাদিগকে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আসাইয়া দিতে আসিতেছিলেন। চেঁচিয়ে পড়ার শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হঠাৎ এ শব্দ হইল কিসের? "ও কিছু না কি একটা পড়ে গেছে বুঝি"।

হিমানী পার্শ্বের ঘর হইতে বাতি লইয়া আসিল। দেখিল তাহার স্বামী নিতান্ত অসহায়ভাবে চাহিয়া আছেন খুব খানিকটা দৌড়াইয়া আসিলে লোকে যেমন হাঁপায় রামপ্রসন্নও তখন পর্য্যন্ত ঠিক তেমনি ভাবে হাঁপাইতেছিলেন।

হিমানী। টিপাইটা পড়ে রয়েছে দেখ্‌ছি কোথাও লাগে টাগে নিত।

রাম। না—হাত লেগে উল্টে গিয়েছে বোধ হয়।

বিজয়া ভাবিলেন ইহার সহিত আর অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া কি হইবে? বলিলেই বা বুঝিবে কি?

বাস্তবিক হিমানী ভিতরের কথা কিছুই বুঝে নাই। সে তাড়াতাড়ি টিপাইটি খাড়া করিয়া বাতি দানে বাতি জ্বালাইয়া দিয়া গৃহ গমনোন্মুখ অপর নিমন্ত্রিতগণকে বিদায় সম্ভাষণের জন্য বাহিরে চলিয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেলে কিরিয়া আসিয়া দেখিল গৃহস্বামী সেই এক ভাবেই স্থির হইয়া পড়িয়া আছেন।

"এখন কি আগেকার থেকে বেশী কষ্ট যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে ?"

হাঁ।

হিমানী স্থিরভাবে মাথা নাড়িয়া কাহের গোড়ায় একখানা চেয়ারা টানিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর একটু ভূমিকা করিয়া আরম্ভ করিল "দেখ এখন যারা করে ব্যারামটাকে তাড়িয়ে করলে চল্‌চেনা। আমি বলি ডাঃ চক্রবর্ত্তীকেই একবার খবর দেওয়া যাক অর্থাৎ তাঁহার মত অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর খরচ খরচার দিকে না তাকাইয়া সহরের সব চেয়ে বড় ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই এখন সর্ব্ব প্রধান।" রামপ্রসন্নের ওষ্ঠে অবজ্ঞাসূচক হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল তিনি একটু গাঢ়স্বর বিশ্লেষণ সহিতই বলিলেন "না আমার অত আর ডাক্তারের দরকার নাই" হিমানী একটু বসিয়াই রামপ্রসন্নের কাছে উঠিয়া আসিল এবং ললাটে পতিত ললাট দেখে চুম্বন করিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল। রামপ্রসন্ন বুঝিলেন পৌঢ়িত্বের ওই চুম্বনে পাছে সংক্রামক রোগজীবাণুর আশঙ্কা ঘটে সেইজন্যই এই পাশ্চাত্য ব্যবস্থা। ঘৃণায় তাহার সর্ব্ব শরীর ভরিয়া গেল। কাছ হইতে চুম্বনকালে পত্নীকে একবার জোর করিয়া ঠেলিয়া দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু কোনও প্রকারে আত্ম সংবরণ করিয়া লইলেন।

হিমানী যাইবার সময় বলিল "ভগবান করেন যেন রাত্রিতে একটু ঘুমিয়ে হয়।" রামপ্রসন্ন শুধু "হুঁ" বলিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

"সেদিন"

"সেই একদিন আর এই একদিন
পিছনে জীবন-স্মৃতি হ'য়ে আসে ক্ষীণ।"
—তবু জাগে সেদিনের কত শত কথা,
এতখানি ছুটে আসে অনাহত ব্যথা।
সেদিনের করা ফুলে বকুলের মালা;
সেদিন আঁচলে ঢে'কে গন্ধদীপ জ্বালা,
নিভৃতে সাজায়ে রাখা বাসর শয়ন;
দেবতা আসিবে ব'লে সাজান তোরণ,
আজি জীবনের সাঁঝে মনে পড়ে সব—
সেই হাসি, সেই গান, সেই সে উৎসব;—
সেই সে মদির গন্ধ জ্যোছনার আলো,
আজ বুঝি সব তার মুছে যাওয়া ভালো।
সেই সে বাজান বাঁশী কি মোহন সুর
আজো মোরে নিয়ে যায় সেই কতদূর!
কেন জাগে—নিভে যাক ঘুচে যাক সব
জীবন জুড়িয়া থাক শুধু হাহারব।
ওগো কেন—আজ আমি অতি বড় দীন
অসীম ধরণীতলে আমি গৃহহীন,
তুমি কেন চেপে ধর বুকের মাঝারে!
ছেড়ে দাও জ্বলে যাবে জ্বলন্ত আগুনে।
তার চেয়ে ওগো প্রিয় এই মোর ভালো,
আমার পরশে সখা কেন হবে কালো?

শ্রীঅমূল্যকুমার ভাদুড়ী।

ঘটনার স্রোত

(১)

মেডিকাল কলেজের শেষ পরীক্ষাটা দিয়া ডক্টর-উপাধি বাঁধিয়া উত্তোগপর্ব্বের এক প্রকার শেষ করিয়াছি। ডাক্তারী শাস্ত্রের মোটা মোটা বইগুলা মাথার মধ্য হইতে নামিয়া গিয়া মনটাকে হাল্কা করিয়া দিয়াছে—তাই বহুদিনের কামনাকে চরিতার্থ করিবার অবসর পাইয়াছি বলিয়া মনও বেশ প্রফুল্ল। ভারতবর্ষের নানাস্থান দেখিবার একান্ত বাসনা বহুদিন হইতে আমার অন্তরতম দেশকে আলোড়িত করিতেছে—আজ তাহাকে সত্যই সার্থক করিবার আহ্বান-সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অতীত ভারতের কীর্ত্তিকলাপ—তার অতীতের গৌরবময় স্মৃতিচিহ্ন এখনও অক্ষয় রেখিয়া কালের সংহার-মূর্ত্তিকে রুদ্ধ করিয়া নিজেকে যেখানে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—মনের গভীরে সেগুলি দেখিব, এখন একবার এই আমার সাধ এবং সম্ভবতঃ অতীত ইতিহাসের ধারা জের করিয়া আমার নিজের মধ্যে দেশাত্মবোধকে শাইতের করিয়া তোলারও উদ্দেশ্য আমার কোথাও উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল।

এতদিন পাঠ্য-পুস্তকগুলি যেন হাতকড়া এবং পায়ের বেড়ীর মতন আমাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল—হঠাৎ সে বোঝা নামিয়া গিয়া মুক্তির পুলক-স্পর্শে আমার সমস্ত হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

পরীক্ষা যখন আসে—সে যেন ভূতের মতন ঘাড় চাপিয়া ধরে; একেবারে সমস্ত বুকের রক্ত চুষিয়া খাইয়া, সমস্ত শক্তিকে অসাড় করিয়া দেয়! নিজা চোখের সামনে তার ভীষণ-করালদার মূর্ত্তি প্রাণকে পীড়ন করিতে থাকে—মনের মধ্যে একটা অতল ভয় কি হয় কি হয় করিয়া অশান্তির সৃষ্টি করে মাত্র।

আজ পরীক্ষার শেষে যান্ত্রিকতার জীবন-প্রবাহের আড়ালে সান্ত্বনার সাক্ষাৎ পাইয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছিলাম—কখন্ যে বেলা হইয়া গিয়াছে, তাহা টেরও পাই নাই। রুদ্ধ কবাটে বেয়ের চাকর বার বার আঘাত করাতে নিদ্রাভঙ্গ হইল—আসিয়া দেখিলাম যে বেশ বেলা হইয়াছে।

ঘরে প্রবেশ করিয়া চাকর জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুজি, আজ চা খাবেন না?" সংক্ষিপ্ত উত্তরে জানাইলাম—"খাব", এবং টেবিলটা নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। টেবিলের উপর চা ও রুটির টুকরা রাখিয়া সে চলিয়া গেল। সে কেন আমার ঘুম ভাঙাইল?—তার উপর বিরক্ত হইলাম। যাবার সময় সে বুঝি এই বিরক্তিভাব লক্ষ্য করিয়াছিল, তাই যেন চোরী একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিল।

আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—কারাকক্ষে আমি বন্দী। সহসা রুদ্ধ পাষাণ কপাট মুক্ত করিয়া এ কারার মূর্ত্তি দেখা দিল—নিষ্ঠুর পাষাণে এ যেন করুণাময়ী দেবীমূর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা! উজ্জ্বল আলোক হস্তে তিনি ধীরে অগ্রসর হইয়া আমাকে ধীরে ধীরে কহিলেন—"বন্দি, আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম; দেরী কর না—পালাও।" সেই স্বর সঙ্গীতের ঝঙ্কারে পূর্ণ—করুণায় স্নিগ্ধ, অথচ আদেশের মত দৃঢ়। আমি মুগ্ধের ন্যায় অবিচলিত রহিলাম। এমন সময়ে আর একজন সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তিনি রমণী বটেন—তা তাঁর বোরখার বেশ দেখিয়াই বুঝিলাম; পরুষ-কণ্ঠে তিনি শুধু কহিলেন "নবাব-নন্দিনী একি!" উত্তেজিত স্বরে রমণী শুধু উত্তর দিলেন—"আমি স্ব-ইচ্ছায় এই বন্দীকে মুক্তি দিলাম; তুমি এখানে কেন? নবাব ফৌজের অন্যত্র অনেক কাজ আছে।" বীরপুরুষ হাসিয়া উত্তর দিলেন—"সত্য বটে নবাব-নন্দিনী, কিন্তু নবাবের বিনা অনুমতিতে এই বন্দীকে মুক্তি দিবার তুমি কে, জানিতে পারি কি?" কুপিতা-ফণিনীর ন্যায় অধর দংশন করিয়া, ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া বরিষাময়ী সেই নারীমূর্ত্তি অকম্পিত স্বরে কুণ্ঠাহীন ভাবে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"তবে শোন বলি,

গুলমান্, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।" উত্তপ্ত দীপালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে বীরের মুখমণ্ডল নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল এবং প্রচণ্ড আঘাতের বেদনা স্ফুটতঃ হইয়া তাহাকে নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় করিয়া দিল। ঠিক এই সময়েই চাপরাশি আসিয়া আমাকে ডাকিয়াছিল।

যাহা হৌক, অধিক বিলম্ব না করিয়া নীচে হাত-মুখ ধুইবার জন্য নামিয়া গেলাম। নামিতে নামিতে ভাবিতে লাগিলাম, এ স্বপ্ন আমি কেন দেখিলাম? সত্য বটে আজ ক'দিন হইল তুর্গেশ-নন্দিনী পাঠ করিয়াছি, তা বলিয়া কিন্তু থাক্ সে।

আমি বেনে থাকিয়া লেখা পড়া করিতেছি—কলিকাতা আমার দেশ নহে। হ্যারিসন রোডে আমাদের মেস—তার প্রবেশ-পথ ঠিক বড় রাস্তার উপর নহে, একটা সরু গলির ভিতর দিয়া; বাটীর নম্বর কিন্তু হ্যারিসন রোডের। হ্যারিসন রোডের বাড়ীগুলির যেমন দশা আমাদের বাসার দশাও ঠিক তাই—অর্থাৎ আরজনের অভাবটা গৃহস্বামী উর্দ্ধ দিকে পূরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বাটী-প্রবেশের মুখেই সিঁড়ি—সে সিঁড়ি বরাবর আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়াছে—বর্ষাকালের বাকাবলীর মতন আঁকা-বাঁকাই তার গতি।

মুখ হাত ধুইয়া উঠিবার পথে সিঁড়ির মোড়ে ঘড়ি দিয়া ঝুলানো পরিচিত Huntley Palmer এর টিনের বাক্সটা একবার ঝাড়িয়াছিলাম—কেন না, সেইটাই আমাদের লেটার বক্স (Letter Box) আমার একখানা চিঠি নজরে পড়ি—চিঠিখানা বৌদির। লেখা আছে:—

* * *

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

দেবেশ ঠাকুর পো!

তুমি পশ্চিম বেড়াবার বন্দোবস্ত এঁটেছ—আপাততঃ তা বন্ধ থাকে তা বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি নিশ্চয় বলে উঠ্‌বে—তা আর না। তাই বলনা কেন, তোমার এখন যাওয়া হবে না কিন্তু—তুমি খুব দুঃখিত হবে, কেমন নয় কি? আমার ভাই, খুব আহ্লাদ হচ্ছে। তুমি যেমন আমাদের ফাঁকি দিয়ে বেড়িয়ে আস্‌তে চেয়েছিলে, তাতে তুমি যে এখন ফাঁকে পড়লে, অথচ হ'লে, এইটেই আমার সুখ। তুমি মনে মনে ভাবছ, উঃ বৌদি কি স্বার্থপর—এতদিন ঘরকন্নার পর আজ যদি তুমি এটা নতুন ঠাঁইয়ে থাক, তা হলে ভাই আমি কোনো মতেই তোমার বুদ্ধির প্রশংসা কর্ত্তে পারিনি।

লম্বা ভূমিকা না করে, এখন আসল কথাটাই তবে বলি বাবা তোমাকে এখন একবার দেশে আস্‌বার জন্য বল্‌ছেন—তাঁর হুকুম অমান্য করে পশ্চিমে যাওয়ার ভরসা হল, তোমার বুকের পাটার ছবে না—এবং নানা স্বাভাবিক কারণে তা হওয়াও বাঞ্ছনীয় মনে করি না।

তবে একটা কথা এখন আমার কাছে জান্‌বার জন্য তুমি উতলা হবে। হঠাৎ এ ডাক কেন? সত্যি, বল্‌ছি আমি এতে বিস্মিত হয়েছি—কিন্তু তাকের ঘরের তেল কমতে পারিনি। তুমি ভাব্‌ছ বৌদির বুদ্ধি নেই—সেটা বোধ হয় তোমাদের বাড়ীর গ্রোব, কেন না আমাকে যখন যাচাই করে তোমাদের ঘরে আনা হয়েছিল, তখন বুদ্ধি যাচাই করার বয়স আমার হয় নি। সে জিনিসটা তখন খুবই কাঁচা অবস্থায় ছিল কিন্তু তোমাদের ঘরে এতদিনেও যদি সেটাতে পাক না ধরে থাকে, তবে তাতে আমার বাপের বাড়ীর দোষ দেওয়া যায় না—বিশ্ববিদ্যালয়ও না।

বাবা আমাকে লিখ্‌তে বল্লেন তাই লিখ্‌লাম—আশা করি আমার ওপর রাগ কর্ব্বে না; আমি তবু মিষ্টি খাব।

আশা করি বেশ ভাল আছ। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি।

তোমার—

বৌদি।

বাবার হুকুম!—আমার সমস্ত "প্ল্যান" খানির উপর কামানের গোলার ন্যায় পড়িয়া তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। ম্লানমুখে বন্ধুদের নিকট গিয়া বলিলাম:—

"আমার বেড়াতে যাওয়া হবে না; বাবার হুকুম আমাকে দেশে যেতে হবে।"

সকলের উচ্চ হাসিতে কক্ষটি পূর্ণ হইল। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিলাম—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এই নিষ্ঠুর হাসির নির্ম্মমতা আমার বুকে জ্বলিয়া উঠিল! নবকুমার উত্তেজিত স্বরে কহিয়া উঠিল—"all nonesense; তুমি ও

আর Baby মত—বিন্দুকে তবে তুলে খাওয়া ত। তুমি যদি এখন বেঁকে বস, তা হলে সব মাটি হবে যে। এত-দিনকার programme তোমার বুড়ো বাপের খেয়ালে এমন করে নষ্ট হতে পারে না—কিছুতেই না। কেমন, কি বলবে তোমরা?" সুশীল চট্ করিয়া আসি বলিল—"সুরেশ বাবাকের মত গুরুজনদের সব কথাই মেনে চলতে হবে, স্বাবলম্বন জিনিষটা একেবারে মাটে মারা যায়।"

বিপিন কহিল—"ইস্কুলে গুরুমশায় আর বাড়ীতে বাপ-মা শুধু এঁদের কথা মেনে চলবার জন্যে বিধাতা যদি ঠিক আমা-দের সংসারে পাঠাতেন, তা হলে আমার মনে হয়, প্রত্যেক মানুষের মাথায় বুদ্ধি বলে জিনিসটা তিনি তা হলে নিশ্চয় দিতেন না। মানুষের মাথায় বুদ্ধি দিয়ে ভগবান যে এত বড় একটা মাসে খরচ করেছেন, সেটা ত আজ পর্য্যন্ত কেউ বলেন নি।—বিপিন থামে না, তাই দেখিয়া সুরেশ তাড়া-তাড়ি বলিল—"থাম ভাই, ওর বাবার এই তাকের ত একটা অর্থ থাকতে পারে। এই পৌষ মাসের পর মাঘ মাস, ওর একটা ত ছিরি হতে পারে। ওরে পাশ করা ডাক্তার দরে বিকোবে—আমার মনে হয়, সেই জন্যে বোধ হয় তিনি ভেবেছেন।" সকলে বলিয়া উঠিল—Bravo হিমু হাসিতে হাসিতে কহিল "তোর ভাই খুব খারাপ বুদ্ধি যাহোক্, এমন বুদ্ধি নিয়ে তুই বাঁচলে হয়। এস ভাই সকলে মিলে সুরেশের জন্য Three cheers দেওয়া যাক।" যা বলা কাজেও তাই, মেসের ক্ষুদ্র ঘরখানা তাহাদের চীৎকারে মনে হইল ফাটিয়া যাইবে। আমার বিরক্তি বোধ হওয়াতে আমি চলিয়া আসিলাম—আমাকে পলায়নপর দেখিয়া তাহা আবার হাসিয়া উঠিল।

(২)

আমি যে বিবাহিত এ কথাটা মেসের কেহই জানিত না—আমিও জানাইবার আবশ্যকতা কোনোদিন মনে করি নাই, কেননা জানানর অপেক্ষা না জানানটাই ভাল মনে করিয়াছিলাম। আমি যদি জানিতাম যে, শুভবিবাহ রাত্রির অভিশাপ বহন করিয়া সুদীর্ঘ যাত্রাপথে আমাকে একলাভাবে চলিতে হইবে, তাহা হইলে হয়ত বিবাহই করিতাম না—কেননা বিবাহশূন্যের সহস্র অভাব, তবুও বিফলতা হয়ত একেবারে অসহনীয় নহে। জীবনে যাহা একেবারে না পাওয়া যায়, তার জন্য হয়ত কোথাও একটা শূন্যতার অভাব থাকিয়া যায়, কিন্তু যাহা পাওয়া যায়, সেই প্রাপ্ত-ধন হইতে যদি কেহ আমাদিগকে বঞ্চিত করে, তখন সেই হারান সুখের নিষ্ফল স্মৃতিটুকু জীবনের ছোট-বড় প্রত্যেক ঘটনায় নিজের নিষ্ঠুর পরিচয়ের দ্বারা আমাদের শুধু পীড়ন করিতে থাকে!—যে গভীর বেদনা যে মর্ম্মস্থানে বাস্তবিকই কোনো সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, জীবন-ব্যাপী তাহার গুরুভার যে বেচারাকে বহন করিতে হয়, সে দুর্ভাগা। বিবাহের পরেই বুঝিলাম যে আমার কপালে সুখ নাই—তাই ডাক্তারী বইগুলার মধ্যে একেবারে মনপ্রাণ দিয়া নিজেকে ঢালিয়া দিলাম। দীন দুঃখী দরিদ্রের সেবার দ্বারা যদি কোনোমতে হৃদয়ের শূন্যতা কতক পূরণ করিতে পারি এ শুধু তাহারই ক্ষীণ চেষ্টা!

পত্র-প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক যেমন দায়ী নহেন—তেমি বিবাহক্ষেত্রে যে দুটীকে লইয়া কার্য্যসম্পন্ন হয় সে দুটী প্রাণীকে তাহার জন্য দায়ী করা চলে না—এখানে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম; সুতরাং আমার বিবাহে আমার কোনো হাত ছিল না একথা সত্য, কিন্তু যে কাজে আমার হাত ছিল না, তার এরূপ ফলভোগ করাটা যদি সত্যই বিধাতা লিখিত, তাহাতে নিঃসন্দেহে আমি সব চেয়ে দুঃখী হইতাম। সমস্ত জিনিসটা এত জটিল হইয়া পড়িল কেন? আমি কোথাই চাই গতির পথ খুঁজিয়া পাই না!

সেদিনের কথা আজও খুব স্পষ্ট মনে আছে—যেদিন সুখের আশার কাঁপ দিয়া অতলস্পর্শ দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে শুভ বৈশাখের গোধূলি লগ্নে যাত্রাদলের রাজার ন্যায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া কোন্ এক অজানা বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় দখল করিবার জন্য কি উৎসব আয়োজন!—আর আজ তার বার্থ পরিণাম অদৃষ্টের তীব্র উপহাসের মতন শুধু আমাকে পীড়া দেয়! শুভদৃষ্টির সময়ে সেই-নিমেষের-চারিচক্ষুর মিলন—জীবনের একটা সামান্য মুহূর্ত্ত,—কিসের স্পর্শলাভ করিয়া অনন্ত মুহূর্ত্তে

পরিণত হইয়া গেল! বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও এতদিনে আমি বুঝিতে পারিলাম না! তার মুখখানা তখন দেখিয়াছিলাম,—হাঁ, তা সুন্দর বটে, কিন্তু সে মুখখানা যে ঠিক মনে আছে জোর করিয়া এমন কথা বলিতে পারিনা; তবে তার সেই-সরল-দৃষ্টিখানি আজও বেশ স্পষ্ট, তেমি উজ্জ্বল তেমি স্নিগ্ধ রেখাঙ্কিত আধার হৃদয়ে চিরমুদ্রিত হইয়া গিয়াছে! কি সরল বিশ্বাসের একান্ত আত্মসমর্পণ! প্রভাত কিরণপ্রাপ্ত অরুণ রশ্মিরেখার ন্যায়ই তার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও বিমল। হয়ত সে আমার কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে! বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় যে তার বালিকাহৃদয়ের সমস্ত সুখকে লুণ্ঠন করিয়া ঘুরে চলিয়া গিয়াছে, আজ তার বেদনাবাধিতা জাগ্রত নারীচিত্রখানি পরিত্যাগের অভিমানে এবং অপমানে সঙ্কুচিত হইয়া মাটির মধ্যে আশ্রয় খুঁজিতেছে না কি! তার বালিকা জীবনের শুভ্র নিষ্পাপ কুসুমমালিকা দেবতার পাষাণকণ্ঠে তুলিয়া দিয়া সংসারে সে শুধু ঘুরিবার জন্যই আসিয়াছিল? ওগো, আমি নির্দয়, আমি নিষ্ঠুর, আমি কঠিন, আমি কঠোর, এই স্মৃতির ধ্যানে তার জীবনের শেষ হইবে? সত্যই আমি পাষাণ? ভালবাসিবার যখন আমার ক্ষমতা ছিল—যাহাকে আমার জীবন মন ঢালিয়া দিয়া সুখী হইব ভাবিয়াছিলাম, তাহাকে ঘুরে কে কাড়িয়া লইয়া গেল? যদি দিয়াছিলে তবে বঞ্চিত করিলে কেন, প্রভো? ইহজীবনে যাহাকে চিরদিনের মতন হারাইলাম, একবার—শুধু আর একবার তাকে দেখিতে চাই! তারপরে সহস্র বজ্রাঘাতে আমাকে চূর্ণ কর—কিন্তু আর একবার!

বিবাহের পরের দিন সেই যে চলিয়া আসিলাম—সেই শেষ। আমার বিবাহ কিম্বা শ্বশুরবাড়ীর কথা আলোচনা পিতার নিষেধ। শুনিতে পাই বেনা পাওনা লইয়া শ্বশুরের সঙ্গে পিতার কি গোলমাল হইয়াছিল—গর্ভবান অবস্থা তাহাই নাকি বিবাহ ভঙ্গ! আমার কহিবার কিছু নাই, তবে সহিবার যথেষ্ট আছে। নিঃসন্তান বৌদির অক্ষয়-মেহ কবচের মতন আমাকে ঢাকিয়া রাখে—নহিলে যে আমার পরিণাম কি হইত, তাহা শুধু আমার অন্তর্যামী জানেন।

৩

বাড়ী ফিরিলাম, বেলের বাস উঠিল। সর্ব্বপ্রথমে পিতার সঙ্গে দেখা হইল, প্রণাম করিলাম, তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন।—"মেয়েমানুষের পড়ায় পড়ায় দেখ্‌ছি পরীক্ষাটা কাহিল ঘরে পড়েছে।" আমি কোনো উত্তর না দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সেবাপরায়ণা অচঞ্চল লক্ষ্মীর প্রতিমা আমার বৌদিদি, গৃহকাজে ব্যস্ত। আমাকে দেখিবামাত্র তাঁর স্বাভাবিক হাস্যোজ্জ্বল মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম—নীরবে দাঁড়াইয়া। বিষাদিত মেজে তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন—বুঝিলাম এই চিরকল্যাণময়ীর নীরব প্রার্থনা মঙ্গলঘরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইল। আমি একটু হাসিলাম—সে হাসি তাঁর অশ্রুদৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। তিনি কহিলেন "হাস্‌লে যে, ঠাকুরপো।" আমি কহিলাম—"তোমার আশীর্ব্বাদই আমি চাই—সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" তিনি কহিলেন—"তুমি কি তবে আজকাল ঠাকুর দেবতা মান না?" আমি উত্তর করিলাম—"মানি কিনা বলা অত সহজ নয়, তবে মানিলে এ কথাটাও জোর করে বল্‌তে পারিনি।" বিস্মিতা বৌদি আমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। আমি কহিলাম "মুখে আমার কি আছে তা আমিই জানিনি, বৌদি, তুমি হাঁ করে তাকিয়ে থেকে কি বুঝ্‌বে বল, তবে তোমার চোখ দুটো যদি ছুরি হয়ে আমার মনের মধ্যে যায়ে, তাহ'লে সেখানে পাঁক ছাড়া আর বোধহয় কিছু পাবে না, যদি কোনো রস থাকে—বোধহয় তা নেই—তা সে পাঁকের সঙ্গেই মিশিয়ে আছে; সেখানে অন্বেষণ অর্থ—পণ্ডশ্রম। তবে পেটে যে আপাততঃ যথেষ্ট ক্ষুধা আছে, যদি কিছু খেতে দাও আমি তার হাতে হাতে প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।" বৌদি একটু লজ্জিতা হইলেন—"যাও ভাই ঠাকুরপো, সত্যিই ত এতদূর পথ আস্‌ছ কিছে পাবারই ত কথা। যাও তাই চট্ করে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এস—ততক্ষণে খাবার ও তৈরী হয়ে যাবে 'খন।" আমি উপরে আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরে গেলাম। যখন নামিয়া আসিলাম আহার্য্য তখন প্রস্তুত।

রান্নাঘরের দাওয়ায় আবার জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। খাওয়াও চলিল বৌদির সঙ্গে কথাও চলিল। তিনি কহিলেন—"ঁা ভাই,ঠাকুরপো, এবার যেন তোমাকে একটু বেশী বেশী কাহিল দেখছি।" আমি উত্তর দিলাম —"তা হবে যে পড়ায় চাপ গেছে।" একটু চুপ করিয়া হঠাৎ গাঢ়স্বরে তিনি কহিলেন "যাবার সময় একটুকু আমার কোলে ফেলে দিয়ে যা'ত নিশ্চিন্ত হয়ে বলে গেলেন 'ওকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম বৌমা, তুমি আমার মা লক্ষ্মি, দেখো যেন বাছা আমার মায়ের অভাব বোধ না করে।' তারপর তোমাকে এত বড়টা করলুম। ছি ভাই আমার কাছে ঁাকি!"

গম্ভীরস্বরে আমি কহিলাম—"বৌদি, এত বড় সংসারটা এতই ঁাকি! সত্য নিয়ে কারবার করা ঠিক চলে না। তাতে দেউলে হবার যথেষ্ট ভয় আছে। যে সত্যিটা, ধর না, আমাকে উঠ্‌তে বসতে পীড়ন করছে, সেটা বাস্তবিক যদি কোনোদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে এ-বাড়ীতে আমার স্থান অসংকুলান হয়ে পড়বে—সেদিন তুমিও তাকে ঠেকাতে পারবে না।"

স্নেহার্দ্রস্বরে তিনি কহিলেন—"যা বলছ তা ঠিক বটে। আমার বড় দুঃখু রয়ে গেল তোমাকে সংসারী করলুম সুখটুকু দিতে পারলুম না।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম—বৌদি আবার কহিতে লাগিলেন—"যাবার মন যদি কেরে, ভগবান যদি—আমি তাঁর কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম—"রক্ষে কর বৌদি। ওই কথায় কথায় ভগবানের দোহাই আমার পক্ষে কেমন অসহ্য! ঘরকন্নার খুঁটিনাটির মধ্যে আমরা যা করে থাকি, তা'তে ভগবান তাঁর গ্রাপা থেকে যতখানি বাদ পড়েন এতখানি বোধ হয় আর কেউ নয়। মানুষ সৃষ্টি করে ভগবান বেচারা সত্যিই বিপন্ন হয়েছেন।"

বৌদি কহিলেন—"কি বল যে ঠাকুরপো, তাঁর ইচ্ছে-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষ কতটুকু কাজ করতে পারে?"

উত্তেজিতস্বরে আমি উত্তর দিলাম—অনেক কাজই করে আসছে। চিরকালেরই এই এক ধারা—তিনি যে মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছে শক্তি দিয়ে বিদ্রোহি হবার সুযোগ দিয়েছেন বৌদি! সে কথাটা কেন ভুলে যাও।"

বৌদি কহিলেন—"তিনি ইচ্ছে করলে দাও দিতে পারতেন ত—তবে দিলেন কেন?"

আমি কহিলাম—"কেন দিলেন, তা আমি কেমন করে বলব, দিয়ে যে তিনি ভুল করেছেন তাও আমি বলতে চাইনে। মানুষ নিজেকে এত ছোট করে নেবে তা তাঁর অন্তর্যামী প্রথমে হয়ত বুঝতে পারেন নি। ঘরে বাইরে কাড়াকাড়িটা চরম সুখের পরম সোপান বলে মানুষগুলো এমন যারা ছুটোছুটি করছে, বিধাতা দাঁড়িয়ে নিশ্চল শুধু দেখছেন তা তাঁর চোখে হয়ত জল আছে, কে বলতে পারে? আমাদের ধর্ম, আমাদের দেবতা আমাদের স্বার্থের বাইরে ন'ন। কেউ যশের জন্য, কেউ যমের জন্য, কেউ কোন-না কোন একটা উদ্দেশ্যেই সাধারণভাবে ধর্ম কিম্বা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হ'ন। ক'জন আত্মা কিম্বা অনন্ত জীবনের কথা ভাবেন কিম্বা ভাবতে পারেন—যাঁরা ও-সব চিন্তা করেন, সংসারের গণ্ডীর বাইরে দাঁড়িয়ে, তাঁরা মুক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়েছেন!"

বৌদি কহিলেন—"কি বলছ ঠাকুরপো, তাহলে কি সংসারে ধর্ম নেই?"

আমি কহিলাম—"একেবারে নেই বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না, তবে যত যে বেশী আছে তা মনে হয় না। অত্যন্ত নাচ জবন্য দুষ্কর্ম যে করতে যায়, সেও তার সিদ্ধিদাতা দেবতাকে স্মরণ করে যায় হয়—এও একরকম ধর্ম, এও এক রকম ডাকা। ধর্ম এবং ভগবান মানুষের অর্জনের পথে যতখানি সহায়, মানুষও তাঁদের ঠিক ততখানি চায়—তার বাইরে যে অসীম সত্তা আছে মানবের আবাসে, তার স্থান কোথায়? ওপরে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, দিগন্ত বিস্তৃত পৃথিবীকে দেখ—এদের ভেতর দিয়ে অনন্তের লীলাক্ষেত্রকে তবু বুঝতে পারি। ফুলের হাসিতে জীবীর কাকলিতে, নদীর কলতানে—বিশ্বসঙ্গীতের বর্ণগন্ধময়ী বিচিত্র ছন্দের সুরে হৃদয় মুগ্ধ হয়। প্রকৃতি মুক্তহস্তে দান করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন আর মানুষ দুহাত দিয়ে কুড়িয়ে

পাওয়া ধনগুলিকে বার বোঝাই করে তালা বন্ধ করে চাবিটা নিজের হাতে রেখেছে—তাই তার ওজন-করে-নেওয়ার ভেতর দিয়েই সে সংসারে বিরোধের সৃষ্টি করে—তার জন্য সে নিজে দায়ী, তার বিধাতা নয়।" বৌদি কহিলেন—"চল ঠাকুরপো, ঘরে চল এখানে আর কতক্ষণ বস্‌বে।" আমি কহিলাম—"না এইখানেই বেশ। কি বলছিলাম জান, আমরা যখন জীবন প্রথম আরম্ভ করি তখন যে আমরা খুব স্বার্থপর তা নয়—পরের সুখের জন্যই প্রথমে অর্জ্জন, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার পরিবার, তাদের সেবার জন্যই সংগ্রাম আরম্ভ। মনের মধ্যে একটা সুখের ছবি এঁকে নিয়ে সবাই অগ্রসর হয় কিন্তু পাওয়ার নেশা যখন মাথায় চড়ে তখন স্বার্থটাই প্রবল হয়ে উঠে পথ দেখায় তখন অপরকে আঘাত দিতে আমরা আর কুণ্ঠা বোধ করি না—ভোগের বাসনা ভোগে হুড়াহুড়ি দিতে থাকে, তাই তার নেওয়ার আর শেষ হয় না। এর মধ্যে থাকে মাতালের উন্মাদনা আসল লক্ষ্যটা লুপ্ত হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের স্বার্থ সম্বন্ধে যেদিন সহজ বোঝাপড়া হয়ে যাবে, সেদিন পরিবারে এবং জগতে যথার্থ শান্তি নেমে আসবে। হাহাকার ক্রন্দনগুলি বেড়ে গিয়ে অত্যাচারের প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধরে সংসারের যে রুদ্রলীলা আজ চোখের সামনে ঘটেছে—মানব জীবনের তা'ত সত্য আদর্শ নয়। ওই হিংসার মরুভূমে পরস্পর শত্রু আবদ্ধ সৈন্যের মধ্যে যে সৌহার্দ্যের কথা শোনা যায়—মরণের বাঁশি যখন বেজে ওঠে,—তারই মধ্যে এই চির উপেক্ষিত যথার্থ মানবের ফুটে উঠে সভ্যই নিজেকে মহিমান্বিত করে তোলে! তবু আমি মানি বিপ্লবের মধ্যেই হোক, আর যুদ্ধের মধ্যেই হোক, স্বার্থের ভেতর দিয়েই মানুষ তার মহান্ আদর্শকে একদিন না একদিন জাগিয়ে তুলবে! এখনও তার সেই চেষ্টা ফলবতী হয়নি, কিন্তু মরণের ভেতর যদি পথ থাকে,—যদি কেউ সে-মরণের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে—খুঁজতে খুঁজতে সে পথ তার চোখের সামনে একদিন না একদিন পড়বেই পড়বে। যে পথ ধরেই আমরা চলিনে কেন, সমস্ত ভুলের মধ্যে উন্নতির সত্য পথে আমাদের চল্‌তেই হবে এ আমি বিশ্বাস করি। শিল্প ইউরোপ পথরোধ করে রেখেছে—একদিন কল্যাণের পথখানা চোখের সাম্‌নে খুলে যাবে, সেই দিনই মানুষে মানুষে খাঁটি বোঝাপড়া হবে। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা ধর্ম্ম বিচিত্র অবস্থার মাঝখান দিয়ে আমাদের সেই দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী বিপ্লব এক মহাসমন্বয়ে নূতন প্রাণ পাবে—সমস্ত মীমাংসার সমাধানে চির উপেক্ষিত বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিচিত্র সাধনা, বিবিধ জাতি ও বিভিন্ন দেশের একটা বিপুল সামঞ্জস্যের সত্যস্পর্শে নূতন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আজ কেঁচোর মাথায় কি যে বলে ফেল্লুম। আমার আহত প্রাণের বেদনা দিয়ে সংসারের যে চিত্রখানা দেখ্‌তে পাচ্ছি বৌদি সেইটাই তোমাকে জানিয়ে দিলুম।"

বৌদি কহিলেন—"তা' না হলে, এসব কি তুমি বুঝতে। বয়সের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়েছ। নিজের মধ্যে যেটা বড়, বিশ্বের মধ্যে সেটাকে দেখ্‌তে পেয়ে, তোমার চিত্ত একটা মীমাংসার পথ চায়—সে পথখানি এক হতে বহুর মধ্যে গিয়ে একের মাঝখানে ফিরে আসে—তার মধ্যে যে বোঝা-পড়া হবে, সেইটেকেই তুমি চরম বল্‌তে চাও।" আমি কহিলাম—"সেইটা বলাই আমার উদ্দেশ্য। দেখ না কেন, শক্তির সংঘর্ষে সংহারের লীলা কিন্তু শক্তির মিলনে নবশক্তির বিকাশ; সম্মিলিত শক্তি যেদিন এক অখণ্ড মহাশক্তির সন্ধান পাবে, সেদিন বুঝতে পারবে রক্ষা করাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই শক্তির অপব্যবহারেই দুঃখ-দারিদ্র্যের সৃষ্টি করে—অপব্যবহারটা যা হয়ে আস্‌ছে তা অধিকাংশস্থলে আমার অজ্ঞতামূলক। এই দেখ বাবা আমাকে খুবই স্নেহ করেন, কিন্তু নিজের কর্তৃত্বাভিমানের শক্তিকে উদ্যত রেখে আমাকে যে কতদূর পীড়ন করছেন, এ কথাটা যদি আমি তাঁহাকে বুঝিয়ে দিতে চাই, তা হলে তার ফল কি হবে বল দেখি—পুত্র-স্নেহ পর্য্যন্ত চূর্ণ হয়ে যাবে। কেন, বল ত দেখি? তার মানে আর কিছুই নয় শুধু তিনি তাঁর দিক দিয়েই দেখে আস্‌ছেন, সে দিকটায় হয় ত তিনি খুবই অভ্রান্ত মহা করেছেন। কিন্তু তা বল্লেই হয় না, সব জিনিসেরই ত দুইটা দিক আছে—দুইটা নিরীহ প্রাণীর উপর কতদূর অত্যাচার হচ্ছে, কেন সেদিকে

তাঁর দৃষ্টি নেই? অন্ততঃ আমার মনের ভাব বোঝাটার যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, সে কথাটা তাঁর মনেই আসে না। তার ফলে বাইরে আমি তাঁকে যতই মেনে চলি না কেন, আমার অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে ত! এবং তিনি যদি আমাকে ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত দিতে থাকেন তা হলে পিতা পুত্রের মধ্যে শক্তির সংঘর্ষ হবেই হবে। কেউ তা রদ্ করতে পারবে না! সমস্তটা যাতে রক্ষা হতে পারে সে রাস্তা দিয়ে না চল্‌লে—একদিন আমরা ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়বই পড়ব। খোলা তলোয়ার হাতে পেলে ঘাড়ের ওপর থেকে মুণ্ডটাকে অতি সহজেই নামিয়ে দেওয়া যায়—কিন্তু মুণ্ডটাকে বাঁচাবার জন্ত খোলা তলোয়ার খাপের মধ্যে পোরার যে শক্তিটা প্রকাশ পায়, সেটা ত নিতান্ত তুচ্ছ নহে। আমার শ্বশুরকে ক্ষমার মধ্যে দিয়ে যথার্থ শক্তি দেখিয়ে বাবা তাঁকে লজ্জাও দিতে পারতেন এবং বশেও আন্‌তে পারতেন। তা না করে তিনি যে পথ ধরলেন, তাতে মীমাংসা ত হবেই না, ব্যবধান শুধু বেড়ে যাবে।"

বৌদি কহিলেন—"দেখ ঠাকুর পো, তোমার মতন অত তলিয়ে না হোক, আমি যে একেবারে এসব কথা ভাবিনি তা নয়—কিন্তু কিছুরই কূল কিনারা করতে পারিনি। সব দিকেই সুবিধে হয়ে যায়, ভগবান যদি এখন মুখ তুলে চান—যদি বাবার মনটা কোনো গতিকে ফিরিয়ে দেন।"

দীরঘশ্বাস আমি বলিলাম—"বৌদি, আবার ভগবান! আপাততঃ বাবার মন তিনি যে ফিরিয়ে দেবেন, তার ত কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তা ছাড়া মন জিনিসটা তিনি মানুষের মধ্যে দিয়ে চালাবার ভারটা নিজের হাতে রাখেন নি, সেটা ভাল করেছেন কি মন্দ করেছেন, সে বিচারের ভার তোমার আমার ওপর নয়। তবে মানুষ নিজের হাতে আপনার মন যখন তাঁর পায়ে নিবেদন করে, সে স্বতন্ত্র কথা, তখন তাকে চালাবার ফেরাবার ভার তিনি নন—কিন্তু বাবার যে সে অবস্থা হয়েছে এমন কথা ত বলা যায় না। আর এক কথা পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে বাবার মনটার ওপর বিধাতার যদি লোভ না পড়ে থাকে সে জন্ত তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তোমার আমার সুখ-দুঃখের ওজন কতটুকু!—মানুষের প্রত্যেক কাজের খুঁটিনাটির মধ্যে বিধাতা যদি হস্তক্ষেপ করতে চান, তা হলে মানুষ ও বিধাতা-দুইয়ের অচল হয়ে পড়বার ভয় আছে! তিনি মন দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, সবই দিয়েছেন, চলাফেরার পথখানিকে নিষে করে না দিয়ে, আমরা যদি বাঁকা করে নিই, বিধাতা ঠিক তার জন্তে দায়ী নন। সৃষ্টি করার শক্তি তিনি নিজের হাতে শুধু রাখেন নি, আমাদেরও দিয়েছেন। পূর্ণজ্ঞানের সৃষ্টিতে আনন্দের প্রকাশ—তাই তিনি নিজে আনন্দময়; অজ্ঞানতা কিম্বা সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে যা কিছুর সৃষ্টি হয় তা' দুঃখ-জড়িত—তাই মানুষ তার দুঃখের সৃষ্টিকর্তা—বিধাতা নয়।

বৌদি কহিলেন—"তবে যা তার আয়ত্তের মধ্যে নেই, যা তার সৃজনী শক্তির বাইরে, মানুষ তা চায় কেন?" আমি কহিলাম—"সেটা বোধহয় তার স্বভাব—আমার শক্তির বাইরে যে একটা বিপুল শক্তি আছে, নিজের অজ্ঞাতসারে তার ওপর নির্ভর করা এটা আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং বিধাতার কৌশল। থাক্, বৌদি, আজ তবে এই পর্যন্ত থাক"—বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

(৯)

বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে অলস দিনগুলি বোঝার মতন চাপিয়া ধরিয়া আমার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল, এমন কি বৌদির অনাবিল স্নেহও আমাকে ঠেকাইতে পারিল না—মনের মধ্যে হাঁফ ধরিল। ফাঁক পাইয়া সহস্র-চিন্তা মনের দ্বার দিয়া অবাধ প্রবেশ লাভ করিতে থাকে শূন্য জীবনের নিষ্ফলতার উপর বিদ্রোহি চিন্তারাশির অবিশ্রাম সংঘাত, আমার তরুণ হৃদয়কে আকুল ঝুরিয়া তুলে! কোন্ অপরাধে অঙ্কুরেই আমার সবখানি বিনষ্ট হইয়া গেল—নিজের জীবনের পরিণাম বা পরিণতি কি, তাহা ভাবিলেই আমার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে!

মেসে এক রকম দিন বেশ কাটিয়া যাইত—বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের একত্র সমাবেশ আমার চক্ষে মন্দ ঠেকিত না। উদার তরুণ হৃদয়ের সরল উল্লাস অথবা প্রবল উন্মাদনার বেহিসাবী কর্মবহুলতার যে অনাবিল

আনন্দ-প্রবাহ নিজেকে চিরমুক্ত রাখিয়া দিয়াছে, বহু জনাকীর্ণ মানব-সংসারে সত্যই তাহা দুর্লভ—মেসের বিচিত্র সমাবেশে, যাহাই থাকুক না কেন, স্বার্থের সংগ্রাম নাই। যৌবনের বিয়াদি-গাছা যতই কণ্টকময় হোক না কেন, সেইটুকু সম্বলের মধ্যে সে শুধু অজস্র আকাশ-কুসুম আবাদ করিয়াই সুখী কিন্তু বয়সের অভিজ্ঞতার ফলে বুদ্ধির যখন পাক ধরে, তখন চলনের দিনে সমস্ত ক্ষতিটুকু পুরাইবার সম্বন্ধে তার সতর্ক দৃষ্টি শুধু লাভেরই দিকে থাকে। সুতরাং যৌবনে অর্জ্জন অপেক্ষা অর্পণই অধিক; কিন্তু বার্দ্ধক্যে ঠিক তার উল্টা—কেবল আদায়ের চেষ্টা! সহজ নেওয়া-দেওয়ার কারবারে পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই,—তাই সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টি অন্তরন্তম দেশ ভেদ করিয়া দেখিতে চাহে না। তা' না হইলে, মেসেতে, হাসি দিয়া আমার গভীর বেদনা এমন করিয়া ঢাকিতে পারিতাম না!

পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য দেশ ভ্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া দেশে আসিলাম কিন্তু এই হঠাৎ আহ্বান যে কেন তাহা ত এখনও বুঝিতে পারিলাম না? পিতা কোনো কথাই বলেন না—আমিও তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া চলি, কেন না তাঁর এই মুখী ভাবের মধ্যে হয় ত এমন একটা কিছু আছে, প্রকাশ হইলে বাস্তবিকই সেটা আমার পক্ষে বিপদ। যা হোক, এ ভাব বেশীদিন রহিল না। একদিন পিতা আমায় বলিলেন—"আজ খাওয়া দাওয়ার পরে, দুপুরবেলা একবার আমার কাছে এস ত।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া আসিলাম—কিন্তু বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

আহারান্তে শুইয়া শুইয়া-নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম—ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। চট্‌পট্ পিতৃ-সন্নিধানে গেলাম। বাহিরের ঘরের দাওয়ায় তক্তপোষের উপর বসিয়া তিনি তখন নিশ্চিন্তমনে গুড়গুড়িতে টান দিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে এস, এখানে বস।" আমি তক্তপোষের এক কোণে গিয়া বসিলাম। তিনি তেম্নিই তামাক টানিতে লাগিলেন। খানিক পরে আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন; একটু কাশিয়া কহিলেন—"তাই ত তোমার শরীরটা এবার একটু বেশী কাহিল কাহিল দেখ্‌ছি। হাঁ, হাঁ, তুমি না পশ্চিমে বেড়াবার ইচ্ছে করেছিলে। তা বেশ, তা বেশ, মাঝে মাঝে একটু ঘোরা ফেরাও ভাল—তবে শরীরটা কাহিল কিনা, তাই বলা, আয়গায় না গিয়ে কোনো একটা ভাল আয়গায় দিনকতক গিয়ে থেকে এলে মন্দ নয়। কি বল?" আমি আর কি বলিব? তবু সংক্ষেপে উত্তর দিলাম—"আজ্ঞে হাঁ।" তিনি কহিলেন;—হাঁ, হাঁ, আমি ও তাই মনে করছিলাম—একটু সুবিধেও আছে। কাশীর বাঙ্গালী টোলার বাড়ী খানা খালি আছে, আমার ইচ্ছে তুমি কিছু দিনের জন্য সেখানে গিয়ে না হয় থেকে এস।" আমি কহিলাম—"কিন্তু দাদা সে দিন বলছিলেন, তাঁরও নাকি তাড়াটে জুটেছে—তাহলে"—আমার কথায় বাধা দিয়া পিতৃদেব কহিয়া উঠিলেন—"না, সে তাড়াটেও কেঁদে গেছে, তোমাকে সেখানে পাঠাব বলে তোমার দাদাকে এখন নতুন করে তাড়াটে খুঁজতে নিষেধ করেছি। তাহলে তুমি প্রস্তুত হও দুই এক দিনের মধ্যেই যাওয়া ভাল—বিধ্যাবিধি আটটা দশটা দিনত কেটে যেন। কি বল?" আমি কহিলাম—"আপনার যা আদেশ।" পিতা সন্তুষ্ট হইয়া একটু হাসিলেন। উত্তরেই চুপ চাপ বসিয়া রহিলাম—নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি কহিলেন—"হাঁ, হাঁ, আর একটা কথা ভাবছিলাম, সেখানে তোমাকে দেখবে শুনবে কে—বৌমাকে দিন কয়েকের জন্য ছুটি দেব ভাবছিলাম, সে বেচারা কোথাও নড়তে পায় না, তোমার সঙ্গে গেলে তোমাকেও দেখ্‌তে পারবে আর দিন কতক বিশ্রামও পাবে।" আমি উত্তর দিলাম—"ঠিক আমার জন্য তাঁকে পাঠাবার কোনো দরকার দেখ্‌ছি না; ছেলে থেকে থেকে নিজেকে চালিয়ে নিতে শিখেছি; তবে বৌদির নিজের শরীরের জন্য যদি তাঁকে পাঠান দরকার মনে করেন, সে আলাদা কথা কিন্তু তাতেও ত দেখ্‌ছি এখানকার নানা অসুবিধা হবে—বৌদি গেলে এখানকার সংসার যে অচল হবে।" পিতা ধীর স্বরে কহিলেন—"আমিও যে ওসব কথা না ভেবেছি তা নয়; সবাই যদি যেতে পারতাম, তাহলে হ'ত, কিন্তু সবাই গেলেত আর চলবে না। যাক্‌গে সে

যখন যাবার নয়, তখন তুমি একলা যাবার জন্যই তৈরী হও—আজই কাশীতে সরকার ম'শায়কে আমি লিখে দিচ্ছি। কি বল?" আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া উঠিতেছিলাম। আমাকে উঠিতে দেখিয়া পিতা কহিলেন আর একটু বোস।—এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন। উভয়েই নীরব। একটু পরে একটা বড় গোছের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিতে লাগিলেন:—"দেখ অনেক দিন থেকেই আমার মনে হচ্ছে যে আমার অপমানের শোধ তুলতে হবে—অর্থাৎ বিনা সব দিক ভেবে চিন্তে বেশ ভাল করেই দেখ্‌লাম, যে তোমার শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলে না। হাঁ বুঝতাম, গোলমালের পরও বেহাই যদি হাতে পায়ে এসে ধরত তা হলেও বা কথা—পাঁচ বছর অপেক্ষা করে দেখ্‌লাম। উঃ, মেয়ের বাপের এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি আর কি করেছিলাম বল? তাকড়া দিয়ে গয়নাগুলো ওজন আর পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম—তাইতে বিনা সব লোকের সামনে আমাকে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে 'বেহাই মশাই এ পরীক্ষাটা যদি দুদিন আগে করতেন তাহ'লে বোধ হয় ভাল হ'ত, তাহলে গয়না আর মেয়ে দুটোকেই আপনার হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম!'—এই রকম যখন কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, তখন দুপক্ষের লোকেরা আমাদের দুজনকে সরিয়ে দিল—তারপরে তাদের ব্যবহার তাওত জান, এতদিন আমি চুপ করেছিলাম, কিন্তু ব্যস্, আর নয় আমি ঠিক করেছি, আবার তোমার বিয়ে দেব।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রলয়ের অন্ধকারে পৃথিবীর সমস্ত আলোক আমার চোখের সামনে নিভিয়া গেল—আমি শূন্য দৃষ্টিতে হাঁ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পিতা পুনরায় দৃঢ়স্বরে কহিলেন—"এমন হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলে যে,—তাবছ আকাশ ও বেশ সাফ্ তবে এত বড় বাজ কোত্থেকে পড়ল। আমার কথা শোন ভাল, না শোন তার ফল তুগতে হবে; আমাকে দোষী কর না। এখন কি বল?—" এই বলিয়া তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার উপর স্থাপিত করিলেন। আমি ধীরে ধীরে মত বেবে কহিলাম—"আজ্ঞে, আমার ইচ্ছা।" আমাকে উঠিতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি কহিলেন—বিয়ে দেব বলেই আমি কাল বিয়ে দিচ্ছি না—যাও পশ্চিম ঘুরে টুরে এস, তার পরে ধীরে সুস্থে যা ব্যবস্থা করবার তা কর্ব্ব খন। তোমরা এখনকার ছেলে দুদিন বিয়ে শুন্‌লেই পিটয়ে ওঠ তা জানি, সবই জানি, তা বলেত তোমার শ্বশুরের পায়ে গিয়ে পড়তে পারিনি। তারাত নিজেরাই সম্পর্ক চুকিয়েছে—তুমি মনে কর তোমার স্ত্রী নেই। মেয়ের বাপের এত স্পর্দ্ধা? আমি বলে এতদিন চুপ করে আছি—গ্রাম শুদ্ধ লোক আমাকে এর জন্য কত কি বলে।"

(৫)

সটান নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। সূর্য্যাস্তের লাল আভাটুকু পশ্চিমাকাশকে বেদনা-রঞ্জিত ম্লান হাসির ন্যায় আচ্ছন্ন করিয়াছে—আর একটু পরে ঘন অন্ধকারে বিরহিণী নারীর ন্যায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া প্রকৃতিদেবী আপনাকে ঢাকিয়া ফেলিবেন! ডাকিয়া ডাকিয়া মাথার উপর দিয়া পক্ষীকুল উড়িয়া গেল। আলোক ও অন্ধকারের সন্ধিস্থলে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়ী লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। বিবেচনের জন্য আপনার কথা ভুলিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই বাঁধমুক্ত প্রবাহের বারিরাশি আমাকে কোথায় ভাসাইয়া লইল।

চিন্তার তরঙ্গরাশি দুঃস্বপ্নের ন্যায় দুলিয়া দুলিয়া আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—মোহাবিষ্টের ন্যায় আমি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম! জ্ঞানপটে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণাম এবং পরিণতি মূর্ত্ত হইয়া আমাকে পীড়ন করিতে লাগিল! অন্তরতম প্রদেশের নিগূঢ় বেদনা নিষ্কৃতির পথ খুঁজিতেছে—ওগো আমার মুক্তি কোথায়—মুক্তি কোথায়?

"তুমি মনে কর তোমার স্ত্রী নেই!"—পিতৃ-দেবতার এই কথাটা আমার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। ওরে অক্ষম, ওরে নিরুপায়, ওরে হতভাগ্য, হীনতম অপরাধীর কঠিনতম দণ্ডের চেয়ে এ আজ্ঞা যে তোর পক্ষে ভীষণতর। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন ঠেলিয়া আমার বুকের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—নিরুপায় হইয়া মনকে প্রবোধ দিলাম:—

পিতা স্বর্গ পিতা স্বর্গ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা॥

মিথ্যা কথা!—অবস্থার চক্রে পড়িয়া আজ আমার কাছে এই সার শাস্ত্রের বচন, অত্যন্ত অসার ঠেকিল—সমস্ত শাস্ত্রের চেয়ে যা বড় আমার সেই বিবেকবাণী আমাকে চোখে আঙুল দিয়া স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে নিরপরাধিনী বালিকাকে ত্যাগ করা কোনোমতেই উচিত নয়—ইহাতে যদি আমাকে সর্ব্বস্ব খোয়াইতে হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু একজনকে বাদ দিয়া যদি আমি অন্য সব বজায় রাখি, তা হলে আমার বিধাতা আমাকে কোনো দিনই ক্ষমা করিবেন না। দোষ-গুণের বিচার-ভার আমার উপর নহে, কিন্তু যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হৃদয়ের বন্ধন তাহার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করায় আমার ব্যক্তিত্ব অথবা মনুষ্যত্ব ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া আমাকে অপমান করিবে, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। না,—না,—তা কিছুতেই হইতে দিব না—কিন্তু এইখানে একটা "কিন্তু" আসিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। পিতৃ-আজ্ঞা ও আপনার স্বাস্থ্য ও বাকিত্ব, এই দুয়ের বিরোধে, যে জটিল সমস্যা আমার চলিবার পথকে সঙ্কটময় করিয়া তুলিল, আমি যতই তাহাকে সহজ করিতে গেলাম, ততই তাহা দুর্গম ঠেকিতে লাগিল।

আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে বালিকা-হৃদয় সংসারের অত্যাচার সহ্য করিতেছে, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের কোনো না কোনো দিন মিলনের সম্ভাবনাকে চিরদিনের জন্য সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিলে, তার প্রাণের ক্ষীণ আশার আলো-রেখাটিকে একটী ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া দিলে, তার জীবনব্যাপী সাধনাকে নিষ্ফল করিয়া দিলে, সেই চিরলাঞ্ছিতা চিরপরিত্যক্তা অভিমানিনী নারীচিত্তের নিঃশ্বাস অভিশাপে আমার জীবনের সুখের নীড় কি ভস্ম হইবে না? আমার সঙ্গে যেখানে অন্য একটি জীবন জড়িত, সেখানে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া যদি শুধু নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিতে হইত, ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সে আজ্ঞা পালন করিতে গেলে যদি নিরপরাধ হৃদয়ের সমস্ত সুখের সম্ভাবনাকে সমূলে পদদলিত করিতে হয়, তাহা কি উচিত? সমস্ত সংস্কার, সমস্ত নীতি-বাক্যকে ঠেলিয়া দিয়া আমার অন্তরাত্মা বলিয়া উঠিল না,—না,—তা কোনো মতেই উচিত নয়।" রোষপরবশ হইয়া পিতা আজ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, পরে তাহারই জন্য হয় ত তিনি দুঃখ করিবেন—সুতরাং আজ তাঁর কথা পালন না করিলে, হয় ত তিনি আমার উপর খুবই বিরক্ত হইবেন এবং এমন কি হয় ত বা তিনি আমার মুখও দর্শন করিবেন না; তাহা হউক, তবু তাহাতে এই আশা থাকিবে যে একদিন না একদিন তিনি আমায় ক্ষমাও করিতে পারেন—তাঁহার স্নেহ-অঙ্কে ফিরিয়া যাওয়ার পথ চিররুদ্ধ না ও হইতে পারে, কেন না এ রকম ভুলের সংশোধন হয়! কিন্তু তাই বলিয়া আজ যদি নিতান্ত নির্বোধ ও একান্ত সুবোধ বালকের ন্যায় আমি তাঁর আদেশ পালন করিতে গিয়া এত বড় একটা ভুল করিয়া বসি, যে ভুলের সংশোধন হয় না, তার জন্য পূর্ণরূপে পিতাকে দায়ী করিলেও, আমার অন্তর্য্যামীকে ত আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। মনে মনে তাই স্থির-সঙ্কল্প করিলাম—আমার বিবাহ?—তা করিব না। এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিব না—এমন কি বৌদিকেও নয়।

এই সময়ে বৌদি আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওমা সন্ধ্যে বেলায় কি এমন করে পড়ে থাকে, ঠাকুরপো, উঠে বস, মুখ হাত পা ধুয়ে একটু বেড়িয়ে এস।"

আমি কহিলাম—না থাক, আজ আর বেড়াতে ভাল লাগ্‌ছে না—মনটা ভাল নেই।

বৌদি কহিলেন—কেন ঠাকুরপো?

আমি কহিলাম—সে আর শুনে কি হবে বল সে? অনেক কথা।

বৌদি কহিলেন—কি কথা ঠাকুরপো—আমাকে বল্‌বেনা বুঝ— বলিয়া কেরোসিনের ল্যাম্পটা আনিয়া দিয়া শয্যার একপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন।

আমি গাঢ়স্বরে কহিলাম—বৌদি, তোমার কাছে আমি কখনও কিছু লুকিয়েছি, ছাপিয়েছি, তবে আজকের কথা শুনে কোনো লাভ নেই, মনে ব্যথা পাবে, তাই তোমাকে বল্‌তে চাইনিনি।

বৌদি ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন—ছি, ভাই ঠাকুরপো—দুঃখের

তাদীনার একজনকেও করতে পারলে, দুঃখটা কি হাল্কা হয় না ?—নিজের মনের মধ্যে গুমরে যেনা:ক জড় করে তুলে, নিজেকে পীড়ন করা কি ভাল ?

আমি কহিলাম—আমি ত তা বল্‌ছিনে—আমি বল্‌তে চাই যার প্রতীকার সম্ভাবনার কোনই উপায় নেই, অপরকে তা শুনিয়ে উতলা করায়, কি ফল—যা শুধু নিজের আমার, তা জবাট বেঁধে আমারই বুকে থাক্ না কেন—এই বলিয়া আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলাম। দেখিলাম স্নেহময়ী বৌদি অশ্রু সজল নয়ন অঞ্চল দিয়া মুছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর হাতখানি ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিলাম—বৌদি, কাঁদছ।

তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আমি তাঁর কাছ ঘেঁসিয়া বসিলাম। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলাম—সংসারে সবাই যদি তোমার মতন হ'ত বৌদি।—তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন—তা হলে কি হ'ত ঠাকুর পো !

আমি কহিলাম ঠিক কি হ'ত তা জানিনি—কিন্তু এর চেয়ে ভাল হ'ত, এইটেই জানি।" এই অদ্ভুত প্রকৃতি করুণাময়ী নারীচিত্তের স্বাভাবিক স্নেহ আমার দগ্ধও চিত্তে সর্ব্বদা অমৃত বর্ষণ করিয়া আসিতেছে, নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া দেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা চিরবহিমাবরী দেবীর ন্যায় আমার কল্যাণ কামনা যাঁর জীবনের ব্রত হইয়াছে সেই বাক্‌ময়ী প্রতিমার নিকট আমি কত তুচ্ছ, কত হীন, কত অযোগ্য, আজ একবার স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলাম—তাই তাঁর চরণধূলি লইয়া কহিলাম—আশীর্ব্বাদ কর, বৌদি, যেন তোমার মনের মতন হই।" প্রসন্ন হাসিতে তাঁর বদনকমল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, করুণার্দ্র স্বরে তিনি কহিলেন—"ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন, ভাই।" আমি হাসিয়া কহিলাম—"ওটা খুব বড়দরের কথা বৌদি—তোমার আশীর্ব্বাদই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" "ছি, ঠাকুর পো, এই বলিয়া তিনি আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন—"মুখে শুধু তুমি জোর করে যে জিনিসটা উড়িয়ে দিতে চাও, আমি জানি অন্তরে সেটাকে তুমি খুব বেনে চল—তা'না হলে এত বড় দুঃখ অমন সহজে বইতে পারতে না। "আমি কৌতুক করিয়া কহিলাম—বৌদি তুমি কি আমায় অন্তর্যামী ?" তিনি উত্তর দিলেন— কতকটা—দৃষ্টি থাকলে বাইরের ভেতর দিয়ে অন্তরের অনেকখানি জানা যায়। আমরা জান্‌তে চাই না বলেই না, জানাজানি হয় না—যে যেটুকু দরকার মনে করে সে সেটুকু জেনে নেয় খালাস—বেশী জান্‌তে গেলে অনেক সময়ে নিজের স্বার্থে ঘা পড়ে বলে, আমরা অনেক সময় চোখ বুজে থাকি। এই দেখ না কেন, তোমার দুঃখটা দিয়েই যোগমা এটাকে দূর করতে পারা যায় তুমিও সুখী হতে পার, কিন্তু এক বোকামিতে দোষেই না এই কাণ্ড। বাবা এত বিচক্ষণ হয়ে এই সামান্য সমস্যাটাকে এত জটিল ক'রে কেন যে তিনি ফেল্লেন, সত্যিই এটা যোগমা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।"

আমি হাস্যমুখে কহিলাম—"বৌদি আর চিন্তা নেই—তার ব্যবস্থা এবারে তিনি করেছেন, সেই কথাটা বলবার জন্যই আজ তিনি আমায় ডেকেছিলেন।"

অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বৌদি দৃপ্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—"ঠাকুরপো, আজ আহ্লাদে যদি খানা হয়ে বাড়ী মাথায় করে তুলবে, তা'না করে কিনা মন খারাপ করে শুয়ে পড়ে আছ—নির্জ্জীবের মতন আর শুয়ে থেক না, উঠে এস—আজ যে বড় আনন্দের দিন !"

আমি কহিলাম—"চিরদিনের সঞ্চিত দুঃখ বিপুল আনন্দের ধাক্কা না সাম্‌লাতে পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে যদি কান্না জুড়ে দিয়ে থাকে, সেটা কি তার পক্ষে খুব বেমানান হয়েছে ?"

বৌদি কহিলেন— "ঠাকুরপো, অমনতর হেঁয়ালিতে কথা কইলে সত্যি কিন্তু আমার হাঁফ ধরে যায়।"

আমি কহিলাম—"বৌদি, আমি বলছি যে বাবা প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আনন্দে তুমি যদি উন্মত্ত হয়ে যাও, তাতে আমার দোষ নেই—কেন না এই প্রতিকারের সমস্ত ইতিহাসটুকু শোনার পরেও যদি তোমার আনন্দ করবার ক্ষমতা থাকে, তা হলে আমার বল্‌বার কিছু নেই—তোমার হৃদয়ের মতন সংসারের পথখানা স্বচ্ছ, অবাধ মুক্ত এর ত। বাবা নিজের মত প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছেন—পাঁচ বছরের আগে-

কারের অপমানের প্রতিশোধ তুলবেন তিনি আমার আর একবার বিয়ে দিয়ে। এখন বুঝ্‌লে বৌদি ?"

আমার কথা শুনিয়া বৌদি মুখের ভাব বদলিয়া ফেলিলেন, —আমি আবার কহিতে লাগিলাম—"মুখে যে আর কোনো কথা নেই, বেশ ত আবার নূতন করে আনন্দ করবার সুযোগ পাবে ত।" হাকাবাক-বিদ্ধা বৌদি এবারে কাতরকণ্ঠে উত্তর দিলেন— "কি যে বল, ঠাকুরপো, এও কি হয় ?"

"হয় বৈকি—না হলে আমার ভাগ্যেই বা হতে চল্ল কেন ?" বৌদি কহিলেন—"না না, এ আমার প্রাণ থাকতে হতে দেব না, এখন উপায় ?" আমি কহিলাম—"এক অতি সহজ উপায় আছে—সেটা হচ্ছে দড়ি-কলসী-সংযোগে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া—যা গঙ্গার ঠাণ্ডা জলে প্রাণের জ্বালাও জুড়োবে।" "ষাট-ষাট—ও কি অলুক্ষণে কথা, দেখই না কি হয়।" আমি গম্ভীর ভাবে কহিলাম—"বৌদি, দেখ্‌ব কি আর বল, অদৃষ্ট আর কর্ম্মফলের ওপর তোমাদের হস্তটা আছা আছে আমার তা যদি না থাকে আমাকে ক্ষমা কর— আমি জানি এ সমস্ত ব্যবস্থাকে উল্‌টে দেওয়া আমার আয়ত্তেই আছে, সেটাকে সপ্রমাণ করতে হলে আমাকে অনেক সহ্য করতে হবে, কিন্তু তাতে আমার মনুষ্যত্ব আমার কাছে খাটো হয়ে যাবে না, এবং সে কষ্ট স্বীকারের মধ্যে বিবেকের ভ্রূকুটিভঙ্গী থাকবে না—কেন না একদিকার ক্ষতি যত বড় একটা লাভের পথে নিয়ে যাবে, এবং সেই লাভের পথেই সংসারের বিচিত্র অবস্থার মাঝখান দিয়ে আমার ভগবান আমাকে বহিয়ে নেবেন, জীবনের যত বড়ই ক্ষতি হউক না কেন, সে ক্ষতিপূরণ একদিন না একদিন একদিক দিয়ে না হয় আর একদিক দিয়ে হয়ে যাবেই যাবে। শুধু সেইটেই কোনো দিন পূর্ণ হয় না—বেটা মনকে ফাঁকি দিয়ে কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে একটা মনগড়া ধর্ম্মের আবরণে সাজিয়ে শান্তি সুখের বলে পরিচিত হতে চায়—আমার কথায় বাধা দিয়া বৌদি কহিলেন—"ঠাকুরপো, তোমার উত্তেজিত হবার কথা—বাবা যা বলেছেন তা নিয়ে এখন আর নাড়াচাড়া কর না—আমার ওপর ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমাকে ত বিশ্বাস কর ?"

ও কথা কেন তুলছ বৌদি—তুমি কি আমাকে চেন না। বৌদি, প্রাণের বড় জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েছি—আর যে আমার সহ্য হয় না—আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সবেই ত আস্‌ছি। বেটা ভয় করছিলাম, আজ তা বাবা স্পষ্ট বল্লেন। সংসার, মরুভূমিতে তোমার স্নেহাকুল ছায়া, তাও বুঝি এবার যায়।" দৃঢ়স্বরে বৌদি কহিয়া উঠিলেন—কিছুতেই নয়—বলিতে বলিতে তাঁর কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল, মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল ধীরে বৌদি কহিলেন,— "ঠাকুরপো, তার সম্বন্ধে আমি এতদিন কোন কথাই প্রায়ই বলিনি—পাছে তোমার মনে কষ্ট হয়। আমি যদি তোমার দাদা হতাম—" আমি একটু শুষ্ক হাসিয়া কহিলাম,—"রক্ষে কর বৌদি, খোদার ওপর খোদ্‌গিরি কর না—যারা না করে তোমাকে যে বৌদি করেছেন শুধু এই জন্যেই,—এই একটা কারণেই—আমি ঈশ্বরের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। দাদা যেমন সদাশিব আছেন, তেমি থাকুন, তার জন্য আমি একটুও দুঃখিত নই, আর তুমিও ত অসুখী নও।"

বৌদি কহিলেন,—"আচ্ছা ঠাকুরপো, তাকে তোমার মনে পড়ে ?"

"ঠিক মনে পড়ে কিনা তা আমি হলফ করে বলতে পারিনি—তবে মনে পড়ে না একথাটাও বোধ হয় সত্যি কথা বলা হবে না।"

বৌদি অবাক হইয়া শুনিলেন, একটু হাসিয়া কহিলেন— তোমার ওই বয়সের কথাই ত আমার কাছে দুর্বোধ ঠেকে —আচ্ছা তাই সত্যি কথাটাই বল না কেন ?"

একটু উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিলাম "এর চেয়ে গভীর সত্য কথা, আমি আর কখনও বলিনি। আজ যদি সে আবার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায় তাহলে আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, তাকে চিন্‌তে পারব না, তবে শুভদৃষ্টির সময় যে দৃষ্টিখানি সে আমার বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে গেছে,—শুধু সেইটুকু সম্বল নিয়ে আজ পাঁচ বছর কাটিয়ে দিলাম—সে দৃষ্টিতে কি ছিল তা জানিনি, কিন্তু এইটুকু আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে, সে দৃষ্টি বড় মধুর, বড় স্নিগ্ধ, বড় উজ্জ্বল—আজ তারই

ক্ষীণ স্মৃতিটুকু নিয়ে কেমন করে জীবন কাটাচ্ছি, শুধু সেইটুকু তাকে জানিয়ে যেও, নিষ্ঠুর সংসার আমাকে তারও সুযোগ দিলে না—অব্যক্ত বেদনার তীক্ষ্ণতম আঘাত, কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাময়!

স্নেহাপ্লুতস্বরে বৌদি কহিলেন—"ঠাকুরপো, যাকে সঙ্গে করে আনিনি, তাকে ত তুমি সত্যিই খুব ভালবাস!"

"—ঠিক ভালবাসি কিনা তা জানিনি, তবে তাকে খুবই ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে। সে আমার বুকেও আমার বল না। তাকে যদি একবার কাছে পেতাম, তাহলে বুঝিয়ে দিতাম যে আমার বিধাতা আমাকে পাষাণ দিয়া গড়েন নি।"

এই সময়ে ঝি আসিয়া খবর দিল যে কর্ত্তার সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হইয়া গেছে। বৌদিকে কাজেই উঠিতে হইল—যাইবার সময়ে তিনি শুধু আমাকে বলিলেন,—"জীবনের সর্ব্ববিধ অবস্থায় বিশেষতঃ বিপদের দুর্দ্দিনে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিও।"

আমি কহিলাম,—তোমাদের ভগবান আর আমার ভগবানে একটু তফাৎ আছে, বৌদি—আমার ঈশ্বর বলেন 'মাথায় বুদ্ধি দিয়েছি, দেহে শক্তি দিয়েছি এত বড় পৃথিবী দিয়েছি, এতেও যদি তুমি কিছু না-করে উঠ্‌তে পার, বলব সে দোষ তোমার।' স্মিতহাস্যে বৌদি কহিয়া গেলেন—সমস্ত ঘটনা কিম্বা অবস্থার আমাদের চেষ্টা উদ্যম ও থাকবেই কিন্তু তার ওপরে দৈব বলে একটা জিনিস আছে তা কি তুমি অস্বীকার কর?',

"না, তা কেন কর্ব, তবে কথায় কথায় অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া, কর্ম্মফলের কথা বলা, আর ভগবানকে নিয়ে টানা-টানি করা—এগুলা বরাবরই আমার কাছে অসহ্য।" "তাহলে ত আমার সঙ্গে তোমার মতের কোনো প্রভেদ নেই"—এই কথা বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

প্রকৃতি

স্বপ্নে দেখিলাম আমি ভূগর্ভস্থ একটা প্রকাণ্ড মন্দিরে গিয়েছি। মন্দিরের ছাদ উঁচু ও বাঁকা। ভূগর্ভের এক রকম আলোকে সেটা আলোকিত।

মন্দিরের ঠিক মধ্যখানে কতা কাঁসরের রকমের স্ত্রীলোক বসে রয়েছেন—সবুজ রংয়ের আলখেল্লা পরা। মাথাটি হাতের উপর রেখে তিনি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

তৎক্ষণাৎ আমি বুঝিতে পারিলাম তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং প্রকৃতি দেবী; একটা ভক্তি-মিশ্রিত ভয়ের সঞ্চারে হঠাৎ আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

তাঁর কাছে গিয়ে সসম্মানে প্রণাম করে বল্‌লাম, "নিখিল জননি আপনি কিসের চিন্তায় মগ্ন? মানুষের ভবিষ্য ভাগ্য সম্বন্ধে আপনি ভাবছেন কি? অথবা কেমন করে মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণতা ও সুখ পেতে পারে তাই ভাবছেন?"

স্ত্রীলোকটি ধীরে ধীরে তাঁর কালোভীতিপ্রদ চোখ আমার দিকে ফিরালেন। তাঁর ঠোঁট নড়ল—লোহার কন্‌কনানির মত একটা স্বর বেজে উঠল শুনতে পেলাম।

"এই পাপাসক্ত লোকটার পক্ষে কেমন করে অধিকতর শক্তি দিলে সে শত্রু হতে অধিকতর সহজে ত্রাণ পেতে পারে, তাই আমি ভাবছি। আক্রমণ ও রক্ষার ভারকেন্দ্র নষ্ট হয়ে গেছে—তা সংশোধন করা আবশ্যক।

একখানা শান্ত গম্ভীর মুখ—কঠোর নহে; চোখ জ্বলছিল না, কিন্তু পরিষ্কার; দৃষ্টি মর্ম্মভেদী কিন্তু নিষ্ঠুর নয়।

শান্ত স্বরে তিনি বল্‌লেন, "তুমি তোমার সমস্ত ধন রত্ন দিয়ে দিয়েছ—কিন্তু তা বলে তোমার অনুতাপ জাগত না—নিশ্চিত?"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বৃদ্ধা উত্তর দিল, "না, তাতে আমার অনুতাপ নাই, তবে আমি যে না খেয়ে মরছি।"

অপরিচিত বল্‌লেন, "কিন্তু কোন ভিখারী যদি তোমার কাছে হাত না পাতত, তবে কার উপর তুমি দয়া দেখাতে আর কেমন করেই বা তোমার পরোপকার ব্রত সম্পন্ন হতে পারত?"

বৃদ্ধা কিছু না বলে চিন্তা করতে লাগল। অপরিচিত আবার বল্‌লেন, "অতএব গর্ব্ব করো না, যাও হাত পাত গিয়ে—ভাল লোকদের একটা সুবিধা দাও যে তারা ভাল কাজ করে। প্রমাণ তারা ভাল লোক।"

বৃদ্ধ চক্ষুকে মাথা উঁচু করে চেয়ে দেখল অপরিচিত ব্যক্তিটি অন্তর্হিত হয়েছেন আর ঘুরে রাস্তা দিয়ে একটা লোক চলছে।

তাঁর কাছে গিয়ে সে হাত পাতল। লোকটা মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল, কিছু দিল না।

কিন্তু তার পরে আর একজন আস্‌লেন তিনি বৃদ্ধাকে সামান্য কিছু দিলেন।

সেই সামান্য কিছুতেই বৃদ্ধ রুটি কিনে আন্‌ল। ভিক্ষালব্ধ এই খাদ্য আজ তার কাছে বড় মিষ্ট। হৃদয়ের কোথাও সে কোন লজ্জা বোধ কর্‌ল না বরং তার বিপরীত। শান্তি ও আনন্দ আশীর্ব্বাদের মত আজ তার উপর অবতীর্ণ।

শ্রীসুধাংশুনাথ লাহিড়ী।

মাসিক কাব্য-সমালোচনা

অর্চ্চনা, শ্রাবণ—অবনীকুমার দের "তুলসী" কবিতায় লেখকের ভক্তির দিকটা একটু ফুটিয়াছে। তবে প্রকাশভঙ্গিতে যাবে যাবে একটু দোষও আছে,—

"রোগে শোকে স্বস্ত্যয়নে জীবনে মরণে
তোমার মহিমা
বিশ্বের মঙ্গলধাত্রী,—তুলসী তোমার
নাহি বুঝি সীমা"

"নাহি বুঝি সীমা"র স্থলে "অতুল্য অসীমা" করিলে ভাষাবিন্যাসের কোনো দোষ ঘটিত না।

অন্ত্য ভারত, আষাঢ়—শ্রীযুক্তা ঘানকুমারী বসুর 'মাতৃহারা' কবিতাটি মর্ম্মস্পর্শী। লক্ষ্ণৌএর নবাবের—"মাথের প্রাণ" কবিতা হয় নাই। কবিতায় কবি যে করুণ ভাবটীকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা কবিত্বশক্তির অভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। লেখকের হৃদয় আছে।

শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য মহোদয় যে শিলনের শান্তিশতকের অনুবাদ করিতেছেন—তাহা কবিতা হিসাবে ব্যর্থ হইতেছে।

শ্রীকবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের "সূর্য্য ও চন্দ্র" রবীন্দ্র দ্বিজেন্দ্র প্রশস্তি। উপমাটি মন্দ হয় নাই। রবির আলোকেই যে চন্দ্রের আলোক একথাটিও কবেন্দ্র বাবু বলিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সনেটটীর শেষ দুলাইন একেবারে ব্যর্থ—একেবারে anti climax—

সুবর্ণ কিরীট পরি' যাবে সবে অতে
লোকেরের জয়মালা যাবে তব গলে।

এই দুটী অপদার্থ পংক্তিতে সমস্ত কবিতাটিই বিশ্রী হইয়া গিয়াছে।

সন্দেশ, শ্রাবণ—'জীবনের বিসাব' কবিতাটি একটী খোশগল্প হইতে লিখিত। নৌকার আরোহী একজন বিদ্বান ব্যক্তি, তিনি মূর্খ মাঝিকে বিজ্ঞানের জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন কিন্তু মূর্খ মাঝি তাহার একটীও বলিতে পারিতেছিল না। লেখক বিদ্বান আরোহী মাঝিকে বলিলেন—

"দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা"

কিন্তু—

খানিক পরে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে
বাবু দেখেন নৌকোখানি ডুবল বুঝি দুলে
মাঝিরে কন—"একি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি"
ডুবল নাকি নৌকো এবার? মরব নাকি আজি?
মাঝি তখন "সাঁতার জান?" মাথা নাড়েন বাবু
মূর্খ মাঝি বলে "মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে
তোমার দেখি জীবন খানা বোলো আনাই মিছে"।

"দুঃখের কথা"—কবিতাটিও বেশ সুরচিত। ছন্দোবন্ধ বেশ সুন্দর।

ব্রহ্মবিদ্যা, শ্রাবণ—"শাকং" ও "তদ্বং" দুটী সনেট। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের। সনেট দুটীর ভাব কবি ধরিয়াছিলেন বেশ কিন্তু ভাষায় তেমন প্রকাশ ক'রতে পারেন নাই। কবি হেমচন্দ্রের—নন্দনতলাসের নৃত্যে ছন্দের নৃত্য নাই। তা ছাড়া ছন্দ পদে পদে ভঙ্গ হইয়াছে কুশাঙ্গক যেমন বৈতবীতে গান ধরিয়া পূরবীতে তুলিয়া শেষে কালীসিন্ধুতে শেষ করে কবিবর মহাশয় তেমনি একছন্দে আরম্ভ করিয়া আর এক ছন্দের মধ্য দিয়া তৃতীয় প্রকারের ছন্দে শেষ করিয়াছেন।

"প্রেমবৈচিত্র্য"—অপদার্থ। "কালীসঙ্গীত" কবিতাও নহে—সঙ্গীতও নহে! ইহাতেও সমালোচনার কিছুই নাই।

অর্চ্চনা, ভাদ্র—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বর্ম্মণের "পূর্ণাবর্ত্ত" কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে। কবিতাটি—গাথা,

আখ্যান বস্তুটী সুন্দর। কবিতার আরম্ভটি বেশ মানানসই—ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে বেশ মিল হইয়াছে।

ভাদ্র মাসের ভরা শস্যায় ঘুরিছে ঘূর্ণিঝড়
ছুটিছে তীব্র বর্ত্তুল স্রোত গর্জ্জিয়া অবিরল
উৎক্ষিপ্ত গজমুখসম বিটপী শুদ্ধ বুকে
তরল পরে তরল জল ধাইছে ঘূর্ণী মুখে

আত্মসমী অন্ত্য লাগী।—প্রথমেই পাইকা অক্ষরে তার রবীন্দ্রনাথের একটী সুন্দর গাথাকাব্য "ভীরু"। এই যে ছন্দটী ইহা এই গল্প-কাব্যের অতি সুন্দর ভাবে উপযোগী। সাইয়া ও গ্রাবা তার প্রকাশের উপযোগী ছন্দই হইয়েছে বাস্তবিক। বাস্তবিক ছন্দের মধ্যে যেমন মিল ও মাত্রার বন্ধন রহিয়াছে—তেমনি প্রতি পংক্তিতে মাত্রার সংখ্যা মিলাবে তেমনি অবাধ মুক্তি। এক এক লাইনে মাত্রার সংখ্যা এক এক রকম। কখনো ভাবটীর ঝোঁক যেখানে শেষ শেষ হইয়াছে প্রায় সর্ব্বত্র পংক্তিও সেইখানেই শেষ হইয়াছে।

সমালোচ্য কবিতাটীর ভাব অতি রমণীয়। বহুদিন রোগ ভোগের পর 'বিনু' (কোনো গৃহস্থঘরের বধূ) হাওয়া বদলের ছলে স্বামীর পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে—সংসারে এতদিন স্বামীর সহিত অবাধ প্রণয়ের স্বাধীনতা লাভ করে নাই। জীবনে গৃহিণীপনা এখনো ভাগ্যে ঘটে নাই—কোনো বিষয়ে স্বাধীন ভাবে আপনার কর্ত্তৃত্ব দেখাইতে পায় নাই—স্বামীর উপরও আপনার হৃদয়ের অধিকার বিস্তার করিবার অবসরও তা'র ঘটে নাই—বিনুর স্বামী বলিতেছেন—

নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আড়ালে
স্নেহের স্রোত বেগা গুমা তাড়নার তালে
বিলন ছিল ছাড়া ছাড়া
চাপা হাসি টুকরো কথার নানান জোড়া তাড়া
আজকে হঠাৎ ধরিত্রী তার আকাশ ভরা
সকল আলো ধরে'
ঘর-বাহিরে মিল বরণ করে'
রোগাতুরের বড় বড় দুটী চোখে
বিনুর যেন স্বপ্নদৃষ্টি নতুন করে' হলো নতুন লোকে"

আজকে বিনুর এই পরিপ্রেক্ষের অবাধ গৌরব, মুক্তির পরমানন্দ অনুষ্ঠিত বদান্যতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সে পথের ভিক্ষুককে আজ টাকা দিতে যায়, হাতের গোড়ায় পাইতেছে তাহাই খয়রাৎ করিতেছে। দেহের জীর্ণ-মন্দিরে আজি মহোৎসব সমস্ত হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল—সর্ব্বাঙ্গ সাত্ত্বিকরসে কণ্টকিত। আনন্দ আজ উথলিয়া উঠিয়া নিখিলে পরিব্যপ্ত, নিখিলের সকল তারকে ডুবা'য়া দিতে প্রস্তুত—

সকল দুঃখ দূর না হলে পরে
আনন্দতায় আপনারি তার হইবে কেমন করে'?
সন্ধ্যেবেলার ঐ তাতা ঘাটের বাঁধন হতে'
আজ আষাঢ়ের তাপান যেন চির-প্রেমের স্রোতে
তাই যেন আজ প্রাণে প্রাণে
ভাবতে হবে সে পাত্রটী বিশ্বের কল্যাণে।

রেলপথে যাত্রাকালে যাহাদের বিনুদের এক ষ্টেশনে ছয় ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হইবে—ইহা বিনুর স্বামীর ক্লান্তি-দায়ক বোধ হইতেছিল—কিন্তু বিনুর আজ ক্লান্তি স্বামীর সহিত অবাধ মুক্তি পাইয়া কোনো অবস্থাকেই ক্লান্তি-জনক মনে করিতে চাহে না—বিশ্বের সকল দুঃখই আজ তাহার কাছে বধূবিবার মণ্ডিত তুচ্ছ নীরস ধারা কিছু সবই যে সরল হইয়া উঠিয়াছে—

"পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চল।
আনন্দে তাই এক বলো তার পৌঁছান আর চলা।"

ইষ্টেশনের বাবুরা স্বামী-স্ত্রীতে স্বাধীন ভাবে থাকে—তাহাদের ঐ মুক্তিময় জীবনের কথা স্মরণ করিয়া বিনু বলিতেছে—

"আহা ওরা কেমন সুখে আছে!"
বিনুর মনে জাগ্‌ছে বারে বার
নিখিলে আজ একলা তবু আমিই কেবল তার
কেউ কোথা নেই আর।
শুভর ভাগ্যে সাদনে পিছে তাইনে বাঁয়ে
সেই কথাটী মনে করে' পুলক দিল গায়ে।"

তার ইতিমধ্যে বন্ধুতার উত্তেজনায় ও আনন্দের উৎফুল্লতায় বিনু একটী ঘূর্ণি-ঝড়ীর কবলে বিবাদের সাহারা

ঘরে ২৲ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিল। বিন্নুর স্বামী বিন্নুকে ফাঁকি দিয়ে ঐ কুলীরমণীকে গোপনে দুইটী টাকা দিয়ে কিনে করিয়া নিল এবং বিন্নুকে জানাইল তাহাকে ঐ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বিন্নুকে যে এই ফাঁকি দেওয়া হইল ইহা হইতেই কবিতার নাম হইল 'ফাঁক'। কে জানিত যে ইহাই বিন্নুর শেষ বাসনা হবে। কারণ দুমাসের মধ্যেই বিন্নুর স্বামীর—

"জীবন প্রদীপ আধার ঘরে' নিবলো
হঠাৎ আলো।"

শেষ-নিশ্বাসে পায়ের ধূলি লইয়া বিন্নু বলিয়াছিল—

এজীবনে আর যা কিছু ভুলি
শেষ দুটী মাস অনন্তকাল মাথায় ক'রে রব
বৈদুর্য্যেতে নারায়ণীর সীঁথের পরে নিত্য সিঁদুর সব।
এই দুটী মাস দুধায় দিলে ভরি
বিদায় নিলেম সেই কথাটী স্মরণ করি'।

বিন্নুর স্বামী আজ হাহাকার করিয়া সেই কুলীরমণীকে খুঁজিতেছে যদি তাহার বিন্নুর শেষ বাসনাটি আজো পূরণ করিতে পারে, সে বলিতেছে—

ওগো অন্তর্য্যামী—
বিন্নুরে আজ জানাতে চাই আমি
সেই দুমাসের অর্ঘ্য আমার বিরহ বাকী
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
সেই যদি আজ রুক্মিণীকে পঞ্চ টাকা
তবুও ত তবুবে না সেই ফাঁকা।

বিন্নু যে সেই দুমাসটীরে নিয়ে গেছে আপন সাথে
জানলনা ত ফাঁকি শুধু দিলেম তারি হাতে।

• • • •

সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন
ফাঁকির বোঝা নামাতে বোর আছে সেই একজন
"এই দুটী মাস দুধায় দিলে ভরে"
বিন্নুর মুখের শেষকথা সেই বইত কেমন করে'
রয়ে গেলাম বাকী
মিথ্যা আমার হলো চিরস্থায়ী।

এইত গল্পাংশের সাধারণ সৌন্দর্য্য। তার পর কবিতার শব্দগুলির ফাঁকে ফাঁকে কত যে মাধুরী তাহা আমি সামান্য তুচ্ছ লেখক কিরূপে বুঝাইব।

কবিবর রবীন্দ্রনাথেরও এত সুন্দর প্রাঞ্জল কারুণ্যমধুর মর্ম্মশোভন কবিতা খুব বেশী নাই। আমরা কবিবরের উচ্চ-স্তরের অনেক ভাবজটিল কবিতা হইতে এই সকল মনোরম গার্হস্থচিত্রের সৌন্দর্য্য অধিক উপভোগ করি। তাঁহার উচ্চভাবের কবিতাগুলি সমগ্র জগতে সমাদৃত হইতে পারে Nobel prize আহরণ করিতে পারে আমরাও যে তাহার সম্বন্ধে একেবারে বুঝি না তাও নহে। তবে এসকল কবিতা খাঁটী বাংলা দেশের—বাংলা দেশের পাঠকের নিকট ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের গুরুপ্রধান কবিতার ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা বাংলাভাষা জানিলে আরো মুগ্ধ হইতেন বাংলার লোক হইলে আরো বেশী মুগ্ধ হইতেন তাঁহারা আবার বাঙ্গালাদেশের লোক হইয়া বা বাংলার গার্হস্থ্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এসকল কবিতা পড়িলে একেবারে মুগ্ধতায় ও বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইবেন, আমরা যে তাঁহার গুরুপ্রধান কবিতাকেই শুধু শ্রেষ্ঠ বলিয়া না জানিয়া এসকল কবিতাকে আরো শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি সেজন্য আমরা ধন্য ও সৌভাগ্যবান্।

সমগ্র জগতের পক্ষ হইতে কবির নৈবেদ্য গীতাঞ্জলির কবিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে পারে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে দেশের কবি সে দেশের পক্ষ হইতে এসকল কবিতাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নৈবেদ্য গীতাঞ্জলির কবিতার অনুবাদ চলে—এসকল কবিতার ত অনুবাদ চলে না—কেমন করিয়া অন্যদেশের লোককে এসকল কবিতার মহিমা ও সৌন্দর্য্য বুঝান যাইবে?

কবি বসন্তকুমারের 'প্রবীর পত্র'—তারপর ছাপা হইয়াছে। কবি "শ্রীচরণেষু"টী পর্য্যন্ত ছাপিয়াছেন। কবিতাটীতে বেশ মাধুর্য্য ফুটিয়াছে বসন্তবাবুর এরূপ কবিতা সেই 'প্রিয়ার চিঠি' 'বন্যার ব্যথার, পর পড়েছি বলে

মনে হয় না। তবু একবিতা সম্বন্ধেও দুইটী কথা বলিতে চাই।

"সঘন জলে ভিজিয়ে তোমার চামর"
"সেই কি আমার রূপ কি গুণ আছে"

আর

"বাসনা তাল আমি বাসি যত"

এ তিনটী লাইনে ছন্দ কি ঠিক বজায় আছে? ছন্দের বিশ্লেষণ— বসন্তবাবুর Boswell শ্যামলরাজবাবু কি বলেন?

"সারা দিনেও যা
পড়ে তুমি উঠ্‌তে পারতে না"

একটু! গদ্যাত্মক। 'তাইই যাবে ঘুচবে না পিপাসা' এপংক্তিটী যেন সুপ্রযুক্ত হয় নাই।

"ইন্দ্রধনুর মত
মিলায় ক্রত জলকণায় শত"

"শত জলকণায়"কে 'জলকণায় শত' বলিলে চলিবে কেন? 'গভীর সাগরে'কে 'সাগরে গভীর' বলিলে যে দোষ হয়। তাহা ছাড়া—উপমাটী সুন্দর হইলেও কবি যে তাহার স্ত্রীর পত্র লিখিতেছেন বা অশিক্ষিতা ছিন্ন-নারীর মুখে যে ভাষা বসাইয়া কবিতাটী লিখিতেছেন সে ভাষার সহিত এরূপ উপমা ও আলঙ্কারিক ভাষার সামঞ্জস্য কই?

"ভাবছি কেবল সেই এ তোমায় কিরি"

'ফিরায়ে'কে 'কিরি' লেখা নেহাৎ মিলের খাতিরে। আর, 'ছ' ও 'ক' এর মিল হয় না দেওয়া যায় ততই ভাল—উহাতে কবির দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ৪র্থ stanzaতে 'দাও' এর সহিত 'দাও' এর মিল। বোধ হয় একটী 'চাও' হইবে।

৩য় stanzaর ভাবটী সুন্দর।

"যখনি তোমার ভাবতে সাধ হয়
সময়ও চেয়ে পাও
সকলি যা তাহারও মাঝে তব
তবু চাও
করতে হয় না লোকের অন্বেষণ
ভাবে দেখার আছে মানা জন

ইত্যাদি ও বেশই সুন্দর। এই সকল কবির রচনায় মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ও প্রকাশভঙ্গি এই দুটীরই অত্যন্ত আবশ্যক। বসন্তবাবুর মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অতিসুন্দর। প্রকাশভঙ্গিটী সবসময় কবিত্বময় হয় না—স্থলে স্থলে নীরস হয়—স্থলে স্থলে গদ্যাত্মক হয়—আবার কোথাও কোথাও ভাষাসঙ্কটও ঘটে।

শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চক্রবর্ত্তীর 'স্বপন' নামী কবিতা হইতে অনূদিত। নলিনীবাবু অনুবাদের জন্য বেশ সুন্দর অংশ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। 'অনুভূতা'—শ্রীমতী অমিয়া দেবীর। কবিতার ভাবটী আমাদের খুবই পরিচিত। মাসিক কবি সম্পাদক মহোদয়েরও সুপরিচিত। প্রকাশটী অনিন্দ্যই হইয়াছে।

পিলু বারোঁয়া সুরের একটী গান। গায়ককবি শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের। সঙ্গীতটিতে উল্লেখ যোগ্য কিছু নাই। শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষের বন্ধুকরা কবিতায় "শতকোটি পিতৃদেব গুরুগণ" ও "সুধা মিটাইবার(?) অন্য বাণীর হৃদয়ের জন্য মরিবার পাত্র" ছাড়া অন্য কিছুই লক্ষ্যের বস্তু বা উল্লেখযোগ্য নাই। এইটীতে একটু অভিনবত্ব আছে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহোদয়ের-"দেশের লোক।" এ কবিতায় যে গৃহ-সংসারটীর কথা বর্ণিত হইয়াছে—তাহাই প্রকৃত বাংলা দেশের সংসার। এই গৃহস্থই প্রকৃতপক্ষে বাংলার Representation-কয়েকটী কথায় কবি বাংলার হৃদয়রাজি প্রকাশ করিয়াছেন—

রোজ আনে রোজ খায় ঘর-বার কিবা হবে আর
খেটে এনে দিয়ে খুয়ে যত বেশী বাঁচে না যে তার
ধর্ম্ম বলো কর্ম্ম বলো যাহা কিছু এই তবু আছে
পথ যাথা পেলে বাহুমূলে জানায় তা আকাশের কাছে
পেয়ে কবি Gogya মত—

(Nor pandeur hear with a
disdainful smile
The short and simple annals
of the poor)

উপসংহারে বলিয়াছেন—

এই দেশ—এই লোক—হাসিও না শিক্ষা অভিমানী বঙ্গ জানে তার কাছে সভ্যতাপুলী কার কতখানি। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ যাত্রা। কবিতাটী রীতিমতই নিরুদ্দেশ যাত্রা—কবিতায় কোনো উদ্দেশ বা দীশ পাওয়া গেল না। কবি যাহা বলিতে চান—তাহা একেবারেই ফুটে নাই।

—"লুকিয়েছে চাঁদবদনগুলি দিল বাসার।"

এ পংক্তিতে ছন্দঃপতন হইয়াছে। মাননীয় সম্পাদক মহোদয় ছন্দ সম্বন্ধে উদাসীন্য প্রকাশ করেন না বলিয়াই বিশ্বাস ছিল। 'কনক-পারা' প্রভৃতিও। কবির দেখ্‌ছি সন্ধিপতিক আছে—'বক্ষঃ' ও 'মাঝে' র মধ্যেও সন্ধি করিয়া বক্ষোমাঝে করিয়াছেন—'পুকুরের ধারে' কে 'সরোধারে' না লেখেন "বক্ষোমাঝে বড় ব্যথা চাপছে হাতি" কি যে বুঝিলাম না।

"সবাই যখন সুপ্তিমগন ভুলে ব্যথা একলা আমি জাগছি কেন কে বলবে তা?" অনেক চেষ্টার পরে বোধ হয় এরূপ চমৎকার বিদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। "দুঃখনাশা তোমার স্পর্শে" কি কবিতায় "স্পর্শে তোমার দুঃখনাশা" আকার ধারণ করিয়াছে? কবিতা বলেই কি শব্দগুলিকে 'যা খুসী' সাজান যায়? "তাহার স্বাধীন ইচ্ছায়" কে "ইচ্ছায় তার স্বাধীন" লিখিলে অর্থ বোধ হয়! শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সমুদ্রসঙ্গকে বিশেষত্ব নাই—মানসীর অনুপযুক্ত কবিতা।

কবি 'আজ্ঞল' শব্দ কোথায় পাইলেন? 'ঘুটি' কি 'খুঁজি' শব্দে ব্যবহৃত? অশ্রু প্রবালের দ্বারা চর্চ্চিত কিরূপে হইবে বুঝা যায় না। দেহ অনুলেপনের দ্বারাই চর্চ্চিত হয় বলিয়া জানা ছিল। "প্রবাল চর্চ্চিত" অদ্ভুত ভাষা প্রয়োগ। সিন্ধুকে পুংলিঙ্গ কল্পনা করিয়া লিখিতে লিখিতে নীলাকাশাদির দ্বারা শেষে তাহাকে নারীত্ব প্রদান করিলেন কেন? এ সংখ্যার শেষ কবিতা—কবি কুমুদরঞ্জনের "চণ্ডীদাস ও রামী।" শেষ চারি পংক্তি সুন্দর।

"প্রণয়ের মহাসিন্ধু শতধারা লয়ে
চুমে ও চরণ দিবারাত্রী—
অনন্তের বুকে আছ নারায়ণ হয়ে
পার্শ্বেতে সেবিতেছে রামী।"

ছাক্কা স্লিভিউ ও সম্মিলন। আষাঢ়—দুইটী কবিতা। ১টী শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবের "পূজারী।" অন্যটী কালিদাস রায়ের "শেষ গোলাপ।" পূজারী একটী সঙ্গীত উল্লেখযোগ্য নহে। শেষ গোলাপ The last rose of summer এর অনুবাদ। অনুবাদ সুন্দর হয় নাই।

সৌরভ। শ্রাবণ—'নিশীথে' শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের প্রলাপ। প্রথমেই ছন্দঃ পতন। প্রেমের জন্মভূমি কি প্রেয়সী? কবিতায় শব্দবিন্যাস বড়ই বিশ্রী—উদাহরণ স্বরূপ—

যখন তুমি থাক দূরে
প্রথটী তখন চুপটী করে' যায়গো যোজন দূরে—
পুলক তখন উছলে পড়ে জীবন তখন ধাসা
যত স্নেহ যত প্রেম যত ভালবাসা।

সাহিত্য শ্রাবণ—Robert Browning এর another way of love এর অনুবাদ 'ভালবাসার আর এক ধারা' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। কবিতার যেমন গদ্যাত্মক নাম—তেমনি গদ্যাত্মক কদর্য্য অনুবাদ। পাঠককে ২।১টী স্থল উদাহরণ করিয়া দেখাইতেছি—

১। কহিলা গম্ভীর স্বরে পুরুষ উচিত
ভাল যদি নাহি লাগে বসন্ত তোমার
রুচি আর নাহি হয় তাহাতে আবার
অধিক কি আছে তার তার ভাবিবার?"
যথাপূর্ব্বং যথাপূর্ব্বং সেত সেই হায়
তবে যাও—তাই ভাবি অন্য কি অধিক
মনুষ্যত্ব তব চেয়ে শ্রীহীন যে দিক
এখন তা' করিয়াছি ঠিক—তাই ঠিক।
বিয়োগ নাহিক যায় সেরূপে সে যাসে—
অথবা বুঝিয়া রীতি পুরুষসুতায়
নিবারিতে নবজাল, করে ব্যবহার
কীটস্ অবনি তা সে করিবে বিচার।

Browning এর কবিতা অনুবাদ করা সোজা নহে—খুব বড় কবি ভিন্ন Browning এর কবিতাকে অন্য কেহ

সরস করিয়া অনুবাদ করিতে পারে না। তবু তাহা গদ্যাত্মক হইলেও সহ্য হইত—কিন্তু দুঃখের বিষয় আগাগোড়া ছন্দবার্ণ। এ কবিতার বিন্দুমাত্র অর্থবোধ করিতে পারা গেল না। এমন প্রলাপ সাহিত্যেও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। ভাল কবিতা সংগ্রহ করিতে না পারেন ত সম্পাদক মহোদয় একেবারে কবিতা বন্ধ করিলেই পারেন। সম্পাদক মহোদয় নিজেই তাঁহার সাহিত্য সমালোচনায় এই অনুবাদটী সমালোচনা করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দিন। আমরা তাঁহাকেই অনুরোধ করি—তিনি একজন বিখ্যাত সমালোচক—তিনি ইহার কতটা অর্থবোধ করিয়াছেন এবং কতটা রসবোধ করিয়াছেন আমরা তাহা জানিতে বাসনা করি।

আর এক অদ্ভুত কবিতা বাহির হইয়াছে শ্রাবণের নবুজ পত্রে। লেখক স্বয়ং সম্পাদক। কবিতাটী এই :—

ছোট কালীবাবু

(ছেলেটী)

লোকে বলে বাঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু
অথচ বয়স তার আড়াই বছর
কোঁচা ধরে চলে যবে সেজে ফুলবাবু
লোকে বলে বাঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু
যাহা হলে ব্র্যাণ্ডি খায় খায়না'ক সাবু
সুরে গায় তালে নাচে হাসে চরাচর
লোকে বলে পাকা ছেলে ছোট কালীবাবু
অথচ বয়স তার আড়াই বছর।

এ কবিতা সম্বন্ধে পাঠকই বিচার করুন—ইহার মাথা মুণ্ড সৌন্দর্য্য বা রস আমরা কিছুই উপভোগ করিতে পারি নাই।

আমাদের মনে হয় প্রমথবাবুর ইহাকে কবিতা বলিয়া চালান উচিত নহে—ফরাসী কবির Triolet এর ছাঁচ বা form যেমনর জন্য কতকগুলি শব্দবিন্যাস মাত্র। যেমন অসারত্ব বোধ বুঝাইবার জন্য "থাকিটি থাকিটি ভেরেকেটে গদিবিনি তা" ইত্যাদি - অক্ষরবিন্যাস তেমনি বোধ হয় Triolet এর ছাঁচটী বুঝাইবার জন্য ছোট কালী বাবুকে লইয়া টানাটানি।

পরিচারিকা, শ্রাবণ—গান—শ্রীমান বিমল কুমারের প্রথম পদ্যেই। ব্যতিক্রম ধরিতে হইবে। কবিতায় বিন্দুমাত্র বিশেষত্ব নাই। তারপর কবি রজনীকান্তের একটী গানের ছায়াও বিলমান।

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবীর—'ভোরার এল বনের বুকে' সঙ্গীতটী অতি সুন্দর।

"ফুলের দল করিয়া পড়ে পাতারপতাতি উঠাও ওড়ে
বাতাস ছোটে আকাশ গাহে এদেহে সব বরষর।
তিলবোলে জাগর গান ঘুমের বুকে হানিল বাণ
চেতন তরু বরণে ফুলে ধরিয়া নিল চরাচর।"

বেতালভট্টের—'সমাজে'। বিদ্রূপাত্মক কবিতা। হিন্দু-সমাজের মধ্যে যাহারা গোপনে সর্ব্ববিধ অখাদ্য ও নিষিদ্ধ আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া সমাজের মধ্যে মিথ্যা কথা বলে অর্থাৎ সব অস্বীকার করে এবং কুদ্র অপরাধ বা বিনা অপরাধে অপরকে একঘরে করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দলাদলি করে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া একবিতা লিখিত।

ভণ্ডিদের হেঁসেলের চাট সহ আঁধারে
যেমো মদ খাই বটে বসে' তার পাঁদারে
আকাচা কাপড়ে খাই অজানে লকালে
সাহাবাড়ী খাই বটে লোভ কিছু দেখালে
খাই বটে একপাতে ধনীদের সঙ্গে
সে কেবল সখ্যভাবে আর রসরঙ্গে
কেহ যদি জিজ্ঞাসে এ সব খাও কি ?
সমাজে স্বীকার করি তাহাদের তাও কি ?

আবার পক্ষান্তরে—

তাই ব'লে দাতা ভাত দেখা দেখা খাব কি ?
ছেলের সাথে চলে তার বাড়ী যাব কি ?
গণকের জল খায় নামে রাধামাধব'
কি ভীষণ ! তার বাড়ী আমি গিয়ে পা ধোবো
যার বাপ নালিশের দায়কর্ত্তা চালাত
তার বাড়ী খেতে হবে ? কভু নয় আদাত ?
অমুকের শালা সেল বিলাতে যে পালায়ে
নেব তার আত্মীয় আমারেরে চালায়ে ?

শ্রীসুকুমার দাশগুপ্তের 'চিত্ররূপ' স্বপ্নময়ী কিশোরীর মোহে যখন মুগ্ধ তখন কবি বলিতেছেন—

"ভবসাগরে এপারে ওপারে ভাসিল দুখানি-তরী"—

দুইখানি তরী ভাসার সার্থকতা কি বুঝা যায় না।

তারপর "জীবনসন্ধ্যা আসিছে ঘনায়ে সম্মুখে মিলন রাতি"। প্রিয়জনকে হারাইলে মৃত্যুর পর তাহার সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা অনেক কবিই করিয়াছেন। কিন্তু এ কবিতায় প্রেয়সীর সহিত কবির বিয়োগের কথা নাই। তবে বাল্যজীবনের শেষে 'মিলন রাতি' বলিবার সার্থকতা কি? মল্লিক কবির 'ফুলের বাজার' এ সংখ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। ফুলগুলিকে এরূপভাবে humanise করিয়া কবিতা আর কেহ লিখিয়াছেন কিনা—জানিনা। সমস্ত কবিতাটাই উদ্ধরণ করিয়া দেখাইবার বাসনা ছিল। স্থলাভাবে কতকটা দেখাইতেছি।

নাগেশ্বরের বড়ই বাহার ভাল মোজবরে বর
পদ্ম করবী নয়ত পরবী আলো করে চরাচর
বালতী মাধবী সতীন দুবোন কুলীন ঘরের বাসে
নীরি কোলাহল নাহি রাগারাগি একবার এক বাসে
বিমল 'কমল' বধূবধূ সেবে পূজা আয়োজন করে
শ্রোতির শুভা শতগুণযুতা নিকষ ফুলের ঘরে।

বঙ্কিম প্রশস্তি।

কোচবিহার সাহিত্য সভার বিশেষ অধিবেশনে সাহিত্য গুরু স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের একশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত। স্বরলিপিসহ মুদ্রিত হইয়াছে।

কবি, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ঠিক স্বরূপটীই প্রকাশিত হইয়াছে: বঙ্কিমচন্দ্র শুধু উপন্যাসকার নহেন। তাঁহার উপন্যাসও শুধু art for art's sake এও নহে। ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ তিনি উপন্যাসের মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন। সামাজিক উপন্যাসে শুধু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া তিনি বঙ্গসমাজের চিরন্তন বেদনাকে প্রকাশ করিয়াছেন - সমাজের প্রচলিত সমস্যা-গুলি লইয়া প্রকারান্তরে আলোচনা করিয়াছেন এবং সামাজিক প্রসঙ্গে পরিণতমনীষার সুচিন্তিত ভাবপুঞ্জ তিনি দেশকে দান করিয়াছেন। বঙ্গের পরিচারিকা জীবনের সর্ব্ববিধ সুখদুঃখ তাঁহার চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়াছে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল বেদনা মৈত্র সান্ত্বনা ও সমাধাসে তিনি উপন্যাসের মধ্য দিয়া দান করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন—

বঙ্গসমাজ বরষ বেদনানিরন্তরোমার পীড়িল বক্ষ
পড় বারণীতে করে ছলছল চলিল যা তব নয়ন পক্ষ
বাণীর বরাণী করে তাহে কেলি তীরে তীরে জাতি
বেজন কুঞ্জ
গীতা ঘরে। সান্ত্বনা তাহে ফুটে আছে হয়ে সরোজপুঞ্জ

ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি একাধারে Realist এবং Idealist. বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ঔপন্যাসিক নহেন তিনি অন্যতম কবি তিনি কলাজগতের প্রজাপতি—তাঁহার সৃষ্টি কল্পনা জগতের কিন্তু তাহা পরমসত্য।

"সত্য হইতে পরম সত্য তোমার সৃষ্টি এধারা বিশ্বে
নিত্য হইতে পরম নিত্য নিয়ছ দীক্ষা যতেক শিষ্যে।"

বস্তু হইতে মনঃ ষষ্ঠী সত্যতর ব্রাহ্মসন্তান হইতে দানব-সন্তানও ততটাই সত্যতর। বঙ্কিমচন্দ্র দেশ-মাতৃকার মন্দিরের পুরোহিত দেশজননীর পূজার মন্ত্র তিনিই দিয়াছেন তিনি বাঙ্গালীর নবশ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র দান করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দান—দেশের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তন। তিনি নিজে সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলেন না তিনি ছিলেন পরমার্থিক—তিনি ছিলেন স্বকৃত পন্থী। নানা সংস্কার জর্জ্জরিত দেশে তিনি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছিলেন। গীতার বাণীই ছিল তাহার ধর্ম্ম। তিনি জানিতেন—

"কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"

তিনি ছিলেন পরম হিন্দু—প্রকৃত হিন্দু। আমাদের প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম যে কি তাহাই তিনি সাহিত্যের নানা শাখার মধ্য দিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। এত গভীর আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সহিত দেশের কথা অতি অল্প মনীষিই ভাবিয়াছেন। অন্ধসংস্কারের মোহজালকে বিদূরিত করিয়া প্রকৃত হিন্দুত্বের প্রভাকরকেই তিনি বঙ্গের আকাশে প্রোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় তিনি অজ্ঞান

তিথিরাজের নয়নোন্মোচন করিয়াছেন বলিয়াই তিনি দেশ-গুরু। কবি বলিতেছেন—

গত'নুগতিক জনমনে তুমি তুলি বিদ্রোহ বৈজয়ন্তী
আন্ধ-গুহায় আবিত পুরুষে জাগায়ে তুলেছ স্বরূপ সত্য
চিনিতে শিখেছে অন্ধ-প্রমাদে দেশবাসী তব সাধনা ফলে
ধনিখাত খুঁড়ে গিরিদরী চুঁড়ে আহরি এনেছ সত্যবলে।

কবি বসন্তকুমারের "পুত্র বিসর্জনে" কবিতাটী এই করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী যে কবিতার মধ্যে ছন্দের দোষ, মিলের দোষও স্থলে স্থলে গদ্যাত্মক ভাষার কথা উল্লেখ করিবার অবসর নাই। যে কবিতা পাঠ করিতে চোখের জল সম্বরণ করিতে পারা যায় না—সে কবিতার শত ত্রুটীও মার্জ্জনীয়।

পরিচারিকা এবার সর্ব্বশেষে "কেন?" কবিতাটী কেন যে ছাপিলেন তাহা আমরা বুঝি না। লেখিকার রচনার সহিত এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাই না।

পঙ্কজ

গৌরব

(১)

আমি যে ফুটিয়া উঠি শতদল মেলি,
আকুল কিরণ চুমে এত,
অলি যে ছুটিয়া আসে সব কাজ ফেলি,
সমীরণ এত যে উন্মত,
সে শুধু, দিয়েছ বলে এক কণা তব
অপার সৌরভ,
সেই মোর—সকল গৌরব।

(২)

আমি যে ঝরিয়া যাই ঝরি আমি যবে,
পুলকে খসায়ে যত দল,
শেষ শুভ্ররণ উঠে কিরণ-উৎসবে,
সমীরণ ছড়ায়ে পাগল,
সে শুধু, মিশেছে বলে চরণেতে তব
সকল সৌরভ,
এই মোর—সকল গৌরব।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

উপাসনা

১৪ বর্ষ। } কার্ত্তিক—১৩২৫ { ৭ম সংখ্যা।

আলোচনী

মাসিক গল্প সমালোচনা

পূজার সংখ্যার মাসিক পত্র সমূহে গল্প উপন্যাসই অধিক স্থান জুড়িয়া থাকে। আমরা শারদীয় সংখ্যার মাসিক পত্রিকার গল্পগুলির সমালোচনা করিতেছি।

ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক—ক্ষমা,—শ্রীঅনুরূপা দেবী। উপন্যাস। গোড়াপত্তন খুব ভালই হইয়াছে। বর্ণনা ও মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ চিত্তাকর্ষক। শেষ দিকটায় দার্শনিক বক্তৃতা না থাকিলেই ভাল হইবে।

ব্যবধান। শ্রীবাণিক ভট্টাচার্য্য। ছোট গল্প। বিকলাঙ্গ অনাবৃত করার করুণ কাহিনী। সৌন্দর্য্যগর্ব্বে পিতা ও মাতার হৃদয়ের মধ্যে একটা "ব্যবধান" আসিয়াছে। প্রাণপূর্ণ স্নেহ ও অক্ষমের প্রতি করুণায় গল্পটী মনোজ্ঞ হইয়াছে। আখ্যান বস্তু নূতন কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গী আরও ভাল হইলে হইত।

দরিদ্রবন্ধু। শ্রীবিভূভূষণ বসু। গল্পে বিশেষ নূতনত্ব নাই। অমিদার ও প্রজার সেই মামুলি বিবাদের কথা। অস্বাভাবিক ও অবাস্তব ঘটনা লেখকের শক্তির পরিচায়ক নহে। জলধর বাবুর অনুরূপ কত লিখিয়াছেন।

পুষ্পাঞ্জলি। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। একটী উচ্ছ্বাস। শরতের কল্পনালোক হইতে অভিসার করিয়া এক অপরিচিতা হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছে। প্রতি বৎসর পূজার সময় যখন শরৎ-প্রকৃতির বিধুর হৃদয়ে মিলনাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। তখন নিভৃত অন্তস্থলে বহুদিনের সঞ্চিত কল্পনা কাঁদিতে থাকে। শেষে বিজয়ার দিনে অভ্যাচারক্লিষ্টা শশানবাসিনীর, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ। প্রাণপ্রতিমার এই রূপক, কল্পনা ও অনুভূতিতে সজীব হইলেও নিতান্ত লঘু ও ক্ষণিকের জিনিষ হইয়াছে। এই প্রকার রূপকে অসীমের বিলাস, অতলস্পর্শের গভীরতা নাই।

আশার আশা। শ্রীবিশিকান্ত সেনের ছোটগল্প। প্রবাসী স্বামীর পুনরাগমনের আশায় নির্ব্বাণোন্মুখ প্রকৃতি ও মনের সহিত যুদ্ধ অতি করুণ। অভাগীর শুষ্ক ও কাতর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস মর্ম্মগ্রাহী। আখ্যান বস্তুতে বৈচিত্র্য নাই।

দুর্ব্বোধ্যকে। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। একটী

কিম্বদন্তীমূলক পার্জিলিং রেল গাড়ীর গল্প। গল্পে কোনরূপ বিশিষ্টতা নাই।

আনন্দমিলন। শ্রীহিরণকুমার রায়চৌধুরী। কন্যাপক্ষ বরপক্ষের কলহে পূর্ব্বের সেই বাঁধুলি মধুবেদনা, তাহার পর সেই অনুশোচনা ও দুর্ঘটনার পর সেই হঠাৎ মিলন।

ক্ষমা। শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। সেই দরিদ্রের সন্তান, সেই শ্বশুর জমিদার, সেই স্বামিস্ত্রীর বিচ্ছেদ, আগাগোড়া সেই মামুলি ভাব ও বর্ণনা।

পূজার ছুটি। শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়। গল্পের আখ্যানে কোনরূপ পারম্পর্য্য নাই। শুধু উচ্ছ্বসিত বিরহবিধুর সৈনিক স্বামীর পূজার ছুটিতে স্নেহময়ীর ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবার তীব্র অনুভূতি এক রকম ফুটিয়াছে।

বিধি। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র। প্রথমে পল্লীগ্রামের একটী ক্ষুদ্র সংসারের দারিদ্র্য ও নির্য্যাতনের বর্ণনা, তাহার পর পলায়িতা হতভাগিনীর কলিকাতায় বাবুদের গৃহে ভাগ্যপরীক্ষার পালা একঘেয়ে ও সমভাবে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। শেষে অনুতপ্ত গৃহস্বামীর অনুগ্রহে কি পাইবার স্বামীর চিঠা ফিরিয়া পাইয়া নিজ জীবন ও গল্প শেষ করিল।

সময়ের ফেরে। শ্রীঅনন্তর সেন। মূল গল্পটাকে আদিতে কাজ করে। বিধবার সন্তান অতির জন্য কত কি সংগ্রহ করিয়াছে, মায়ের জন্য কাপড় কিনিয়াছে। কিন্তু আদিতের ছুটী নাই। শেষে চাকুরি পরিত্যাগ, বৌচকা বগলে করিয়া পাঁচক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাওয়া, তারপর আরও বিলম্ব,—খেয়াঘাটে পাটনি নাই। শেষে বৌচকাটি নদীতীরে পরিত্যাগ করিয়া কেন কেন প্রকারে মায়ের কোলে আসিয়া পুত্রের শান্তি ও মৃত্যু।—এমন করুণকাহিনী চিত্র সৃষ্টি না করিয়া হাসির উদ্রেকে ব্যর্থ করা।

ভারতবর্ষের এতগুলি গল্পের মধ্যে একটিতেও সতেজ হর্ষ ও সরল জীবনের উদ্বেল আনন্দ ফুটিয়া ওঠে নাই।—আগাগোড়া শুধু বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছে। সরস্বতী যেন নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছেন। শারদাকাশের রক্তরাগের সঙ্গে ঘনঘাস আশাভরা সোনালি ধরণীর সঙ্গে সানায়ের আগমনীর আনন্দেই মনের সঙ্গে কোথাও কোনও নবজীবনের সরসতা, পূর্ণতা ও আনন্দ নাই।

বাঙ্গালী গল্পলেখক কি শুধু ব্যথিতস্বরে ঔদার্য্যতরা অন্তরে চিরকাল দুঃখেরই গান গাহিবেন? বাঙ্গালীর জীবনে একটা সন্তোষ অনুভূতি, আত্মপ্রসাদ, আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রফুল্লতা আসিয়াছে। সে প্রফুল্লতা, সে জীবনপূলক বাঙ্গালার গল্প উপন্যাসকে যতদিন না কানায় কানায় ভরিয়া ফেলে ততদিন সাহিত্যের অন্তরে একটা বিপুল শূন্যতা আমরা অনুভব করিতে থাকিব।

সাহিত্য, কার্ত্তিক—

সমুদ্রতীরে। শ্রীউমাদাস সরকার। বাল্জাক্ প্রণীত গল্পের অনুবাদ। পুত্রস্নেহের অতি করুণ ও শোকাবহ দৃষ্টান্ত। পিতার জীবন প্রায়শ্চিত্ত ও কঠোর কর্ত্তব্য-সাধন কাহিনী বাল্জাকের অসাধারণ শক্তির পরিচয় দান করিয়াছে। কিন্তু অনুবাদ অত্যন্ত আড়ষ্ট ও স্থূল।

পল্লীপ্রেম। লেখক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গল্প। কথোপকথন খুব স্বাভাবিক ও সরস। লেখকের ইহাই বিশেষত্ব। গল্পের ঘটনাগুলির বলার কোনও শক্তি নাই। ইহাও লেখকের বিশেষত্ব। আখ্যান বস্তু অতি লঘু, লেখকের সহানুভূতি ও ব্যাপক দৃষ্টি-সত্ত্বেও জীবনের সরলতা ফুটিয়া উঠা দূরে থাক চলা ফেরা রসও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

সত্যস্পর্শিনী। শ্রীনরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। লেখক নিম্ন-শ্রেণীর লোকের অন্তর আরও দু'একটী গল্পে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাহিত্যের নূতন দিক সম্বন্ধে সাহস আছে। লেখক লিখিতেও জানেন। বর্ত্তমান গল্পে একটী ডোমের মেয়ের চরিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। ভালবাসার অপমান তীব্র অভিমানের আকারে সাধ্বীর হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যখন তাহার মাতৃহীন ছেলেটাকে মানুষ করাইয়া লইবার জন্য সাধ্বীকে আজ্ঞা করিল। কিন্তু শেষে অভিমান টিকিল না। মৃত্যুশয্যায় হাতের চুড়ি দুই গাছা

পুলিয়া ফেলিয়া সে পুত্রের পিতার অক্ষিত খাসের সঙ্গে তাহার ভার গ্রহণ করিল।

ভারতী, কার্ত্তিক—

বিস্তব্ধকরী। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। বিস্তবী একটী যাত্রার দলের মেয়ে। চরিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে। দারিদ্র্য ও দুর্ভাবনা এবং যাত্রার দলের প্রমোদের মধ্যে দরদ দুঃখময় জীবনের ইতিহাস বড় করুণ।

বিত্ত ও বসনালীর চরিত্র প্রকাশিত হইতে পায় নাই। সমস্ত জিনিষটা মিলিয়া একটা নক্সা হইয়াছে গল্প হয় নাই। পর পর তিন চারিটী মানুষের চিত্র ও ভাবের খেলা পর পর আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সঙ্গতির অভাবে কোন চরিত্রই আমাদের মনের উপর স্থায়ী ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিল না। গল্প লেখকের নিকট যাহাপেক্ষা আরও অধিক কিছু আমরা আশা করি।

উৎপাতজুরে। বেবেন্দ্রকুমার রায়। রস লেখক লেখকের দ্বারা অবলম্বনে। কৌতুহলোদ্দীপক। কিন্তু এইরূপ কৌতুক পাশ্চাত্য সমাজে যতটা শোভা পায় আমাদের সমাজে ততটা পায় না।

অন্ধে আতঙ্কম্। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। গল্পাপেক্ষা তত্ত্বের দিকটা এত বেশী ফুটিয়াছে যে আর্টের বিচারে ইহার নাগাল পাওয়া যায় না।

আত্মসখী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী—শারদীয়া সংখ্যা।

প্রলোভিতের পত্র। গল্পে নূতনত্ব নাই লেখাও আড়ষ্ট।

দুঃস্বপ্ন। শ্রীঘাসিক ভট্টাচার্য্য। গল্পের মাথা মুণ্ড কিছুই নাই।

মুক্তি। শ্রীঅনিলবরণ রায়। গল্প নহে, বক্তৃতা।

স্যাক্সবাগীশের অন্তর্দ্ধান। শ্রীজলধর সেন। গল্প নহে, সন্ন্যাসীর অলৌকিক জীবনের কথা তবুও ভারবাগীশ মহাশয়ের অদৃষ্ট-বিশ্বাস সহিষ্ণুতা ও হৃদয়ের বল অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। জলধর বাবু তাঁহার আখ্যান বস্তুতে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন না করিয়া পারেন না?

রক্তের টান। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মামুলি রকমে 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' এবং মামুলি রকমে 'কেহ নাই, কেহ নাই।'

মমতাময়ী। (ফরাসী হইতে) শ্রীজ্যোতিপ্রসন্নাথ ঠাকুর। একটী পেশাকর রমণীর অন্তরের অফুরন্ত স্নেহ ও মাধুর্য্যের কথা। একটী অকলঙ্ক চরিত্র কবি যুবক তাহার বর্ণনায় মুগ্ধ ও ধন্য।

দেহবিনিময়। (ইংরাজী হইতে) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বিয়োগান্তি অনুযোজিত দেহ বিনিময়ের অবলম্বনে কৌতুকপ্রদ গল্প।

জন্মের ইতিহাস। শ্রীহেমচন্দ্র বকসী। পাপের ভিতর জন্ম এমন একটী লোকের ত্যাগ জীবনের ইতিহাস। লেখক বলিতে চাহিয়াছেন লোকের জন্মের পরিচয়ে নহে তাহার বর্ত্তমান জীবন অনুসারেই সমাজে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করা উচিৎ। আখ্যান বস্তু ভাল। তবও ভাল। ঘাতপ্রতিঘাতে চরিত্রগুলি আরও বিকসিত হইলে ঘটনার ঘটা, বক্তৃতার ধারা নহে, লেখকের তত্ত্ব সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইত।

উৎসবের অনুভূতি

আমাদের প্রতিদিনকার খণ্ড আনন্দের মধ্যে অখণ্ড আনন্দকে গড়ে তোলা বেশ একটু অভিনব, একটু শক্ত—আমাদের সাধারণ জীবনের গতি নিতান্ত একঘেয়ে একটানা, সেটা তা'র অভ্যস্ত পথের চিহ্নিত রেখা ছেড়ে বাহিরে যেতে পারে না—তাই ভগবানের বিধিব্যবস্থার মধ্যে আমাদের জীবনে উৎসব এসে উৎসাহের আভাস দিয়ে যায়—সেই উৎসবের দিনটাই আমাদের জীবনের একটা বিশেষ দিন! আমরা সেদিন যেন একটা নূতন জাগরণের সাড়া পাই—দিনের অম্লান আলোক এসে সেদিন আমাদের চোখে একটা নবীন সৌন্দর্য্যের অঞ্জন পরিয়ে দেয়, প্রভাতের বাতাস সেদিন হতাশ প্রাণেও আশার কথা বলে, পাখী সেদিন যেন একটু বেশ নূতন সুরে তান ধরে!—জীবনের মধ্যে যা অতি তুচ্ছ কথা তাও সেদিন অতিমাত্রায় বড় হয়ে ওঠে! যে কথা জীবনে হাজার বার শুনেছি সে কথাও সেদিন নূতন বলে বোধ হয়! আকাশে, বাতাসে, আলোকে, ভুবনে ভুবনে দ্যুলোকে যেন সেদিন আমাদের আনন্দময় উৎসব-দেবতার আবির্ভাবে জাগ্রত হয়ে ওঠে! সেদিন আমরা আমাদের "নৈমিত্তিক আমি"কে "উৎসবের আমিতে" গড়ে তুলি।

এই যে আমরা আমাদের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর্ম্মপুঞ্জ থেকে মাঝে মাঝে অবসর গ্রহণ করি, একি কর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হ'বার জন্য?—না, তা নয়, কর্ম্মের সঙ্গে একটা নবীন আনন্দময় যোগকে সংযোগ করবার জন্য!

জীবনটা যদি মিউনিসিপালিটীর 'রোলারের' মত শুধু পথের ঘোয়া পাথর সমান করে যাওয়া হত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের চরম কর্ত্তব্য বলে চলতো, তবে সেটাও স্থাণুর মত অচল প্রাণহীন হয়ে শুধু যন্ত্রতন্ত্রের বালখেলা জোগাত।

কিন্তু মানুষের জীবন তা' নয়। 'রোলার' একটা জড়পদার্থ, তার গতিবেগটা (Locomotive force) পিছনের চালকের শাসনদণ্ড এবং সামনের গরুর শক্তির উপর নির্ভর করে। আমরা খুব বড় আখ্যান দিতে হলে তাকে বলি যন্ত্র (Machine) মানুষ যন্ত্র নয়, মানুষ একটা organic unity, একটা Harmonious Combination of Life-Substance with pleasure and pain—কাজেই তা'র প্রাণে নূতনের গান জেগে ওঠে, নবীন আনন্দ তা'র প্রাণে একটা উদ্দীপনার আভাস দিয়ে যায়।

যে মানুষ সেই উৎসবে মেতে ওঠে, যে জড় সে উৎসবের উৎসাহের মধ্যেও অসাড় হয়ে থাকে!

উৎসবের দিন আমাদের দেবতা আসেন; সমস্ত বছরের ধূলামাটি মুছে ফেলে আমরা সেদিন একটু নূতন করে বেশবিন্যাস করি—মনে করি, আমাদের ধূলিমলিন বেশ দেখ্‌লে দেবতা বুঝি অগ্রসর হবেন, আমাদের পূজার অর্ঘ্য সানন্দে গ্রহণ করার পক্ষে অন্তরায় হবে আমাদের মলিন বেশ!—কেননা মলিন বেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনটাও যে মলিন হয়ে পড়ে, আমরা আমাদের ছলনাময় মনকে তখন আর পূজা-পুষ্পের অম্লান শুভ্রতা দিয়ে পূজার গৌরব লাভ করতে পারি না।—

এই যে উৎসবের অসীম আনন্দ এটা আমরা অনুভব করতে না পারলে আমাদের মনও অক্ষমতার বেদনে লজ্জায় ম্লান হয়ে পড়ে।—কিন্তু এই উৎসবের উৎসাহদাতা কে? আনন্দের এই ধারা প্রবাহের গন্তোত্রী কোথায়?

এই ছড়ান মনটাকে কুড়িয়ে এনে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে।—আমার সব চিন্তাভাবনা শুধু আমার আনন্দের আবির্ভাব সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠ্‌ছে, আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত আনন্দ সব উৎসাহ সকল আশাই "কে"

ও "কোথায়" থেকেই আমার প্রাণকে উদ্বোধিত করে তুলছে!

—"কে" আমারই প্রিয়জন, "কোথায়" আমারই অধিকৃত একটা বিশাল হৃদয়-সাম্রাজ্য!

আমার উৎসবের দেবতাকে ধ্যান করতে যেয়ে দেখি আমার প্রিয়তমের মধুর মূর্ত্তিটী দেবতার ধ্যানের অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে; উৎসবের আনন্দকে অনুভব করতে যেয়ে দেখি, আমার প্রিয়জনের দেওয়া—অশ্রুই আমি দু'হাতে ছড়িয়ে নিচ্ছি!

এই জন্যই প্রিয়তমকে উদ্দেশ করে, প্রিয়জনকে সম্বোধন করে, বলি—

"তোমার মাঝারে দেখিব দেবতা
তোমাতে প্রাণের হরি।"

তাই বলছি—এক একটা উৎসবে আমরা আমাদের প্রাণের স্নেহপ্রবণতা, ভালবাসা ও প্রীতিকে জাগিয়ে তুলি, নূতন করে স্নেহ-সম্ভোগকে আপনার করে নিই।

যে অভাগা তা' পারে না, সংসারের ঘটনার আবর্ত্ত থেকে নিজের পঙ্কিল জীবনকে একটা বিশেষ দিনেও দেবত্বের আবির্ভাব-স্ফূর্ত্তি দিয়ে জাগিয়ে তুলতে পারে না,—শুধু ঘটনা-বিপর্য্যয়ের অন্ধকারকে জীবনের আবরণ বলে, জড়িয়ে ধরে', শুধুই কেঁদে ওঠে, তা'র চোখে উৎসবের আলো ম্লান দেখায়, আনন্দের গান তা'র প্রাণে বেসুরো বাজে, উৎসাহের বাঁশী তা'র কানে একটা মরণের সঙ্গীত গায়—উৎসব তা'র কাছে ব্যর্থ, দেবতার আহ্বান-লিপি সে এমনি কতদিন উপেক্ষা করে আসে—মিথ্যা ক্ষোভের সঙ্গে বিধাতার অভিশাপ নিয়ে সে জীবন্মৃত হয়ে কাল কাটায়।

আজ পূজাপ্রাঙ্গণের আনন্দ কোলাহল ছাপিয়ে কি একটা আনন্দের বার্ত্তা অতি পরিচিত ভাষায় আমার মনকেও মাতিয়ে তুলছে না? আজ শিশুর অকারণ পুলক হাস, যুবার পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস, বৃদ্ধের ভক্তি প্রকাশ, যুবতীর মোহিনী হাস, প্রৌঢ়ার কল্যাণ-কামনা, মাতার অযাচিত আশীর্ব্বচনের মধ্যেও যেন আমার বড় আনন্দের অবসাদ, তোমারই আনন্দময় মধুর মূর্ত্তিটী প্রকট হয়ে উঠ্‌ছে!

পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ, স্তোতৃবর্গের পুষ্পাঞ্জলী, যজ্ঞ-বেদিকার ধূপ দীপ গন্ধদান, পূজাশেষের সিদ্ধি-কামনার শান্তিজল—সব অনুষ্ঠানের মধ্যে যে আমার প্রিয়তমের সেবাপরায়ণ হাত দু'খানি প্রেম-নিবেদিত হৃদয়টী আজ প্রিয়জনের মঙ্গলকামনায় উন্মুখ আগ্রহে কাঁপছে!

তাই ত বলছি আমাদের উৎসব দেবতার আবির্ভাবে, প্রিয়জনের প্রভাব সংস্পর্শে আজ উদ্বোধিত।

আজ ভোরের সানাই যে প্রভাতী বাজিয়ে গেল তা'তে, শুধু বর্ত্তমানকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকা যায়,—তা'র প্রত্যেক মূর্চ্ছনাটী যেন কত যুগযুগান্তের কথা বিস্মৃতির অতল তল থেকে উদ্ধার করে দিয়ে গেল, পঙ্ক-জীবনের যে পরিচয় কথা সানাইটী তার ক'টি ছিন্ন দিয়ে সমস্ত আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে গেল সে ত সানাই কথা নয়, আজ অমরত্বলাভের ইতিহাসের পাতা মর-উন্মীলিত চোখের সামনে খুলে গিয়েছে! সানাই তার সারা সুরের সঙ্গে অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকে এক পর্দ্দায় বেঁধে দিয়ে গেল—

জনমে জনমে জীবনে মরণে
কতরূপে কত গানে
গন্ধ ও রূপে ভরিলে ভুবন—
প্রকাশিত হলে প্রাণে।
* * * * *
"দেবতারে মোরা আরতি আনি
আকাশে প্রদীপ জ্বালি'—
প্রিয়ের মাঝারে দেখিয়াছি মোরা
মানুষের ঠাকুরালি।"

হৃদয়-দেবতার উদ্দেশে আরতি পূজার অনুষ্ঠানকল্পে এই যে দিনরাত আমাদের প্রাণের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছি সেটী আমাদের অনুভূতিতে ধরা দেয় তখন, যখন আমরা এই উৎসব-আয়োজনের মধ্যে, প্রদীপ আলোকরশ্মির সাহায্যে নিজের মনের আলোর সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে পড়ি। প্রিয়ের উদ্দেশে আমাদের

সকল জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনুষ্ঠান প্রণালীর মধ্যে দেখি দেবতা পূজারই প্রাথমিক আয়োজন! বাহ্যজগতের উৎরোলের মধ্যে আমাদের প্রত্যেক ছন্দস্রোতটী কি স্নেহাকুলী স্পর্শে প্রহৃষ্ট হয়ে ওঠে না? প্রস্তর বেদীকায় সযত্নরক্ষিত পূজোপচার যে আমাদেরি সৎ-প্রবৃত্তি পরিস্ফুটির পবিত্র সংস্করণ! দেবতার ভোগ-সম্ভারের মধ্যেও যে দেখি—আমাদের ঘুমন্ত্রাস্তরব্যাপী শ্রেয়সন্ধানের চেষ্টা সকল সার্থক হয়ে মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে মহনীয় করে রেখেছে।

"জগৎ দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দিশো দেহি" এই যে 'দেহি' 'দেহি' সব সাধক-জীবনের অভাব ও অপূর্ণতা জ্ঞাপন করছে এর উৎপত্তি স্থান কোথায়? প্রেমিকের সৌন্দর্য্য সুষমায় আমি ভগবান্, তাঁর হৃদয়-সম্পদে আমি রাজাধিরাজ, যশোগানে আমি চির-সৌরবময়।

মানুষের সমস্যা ও অভিযোগ, মূঢ়তা ও বিফলতা, তাঁর অতীতের প্রাক্তন ও বর্ত্তমানের পুরুষকার নিয়ে মানুষ জয়জয়ান্তর ধরে গড়ে উঠ্‌ছে—সেটা কি তার নিজস্ব নিরবলম্ব জীবনের অনুষ্ঠিই নিয়ে?

আমাদের সমগ্র জীবনের সকল কর্ম্মের মধ্যে একটা অভিনব উন্মেষ ও জাগরণ দেখতে পাই তার কারণ কি?

আমরা এমনি এক একটা দিনে আমাদের কর্ম্মকে নূতন করে দেখি, জীবনকে নূতন ভিত্তিতে স্থাপন করে আমরা আমাদের ধূলিমলিন দেহের উপরও একটা সাবধ আন্‌তে চেষ্টা করি—সে চেষ্টা কখনও ব্যর্থ হ'বার?

আমাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও প্রসাধনের মধ্যে শুচি-পবিত্রতার নিরাবরণ কি শুধু এক দেবতা পূজারই প্রাথমিক কর্ত্তব্য?—আমরা যে চিত্ত-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সৌন্দর্য্যানুভূতিকে অতি প্রিয় অতি প্রয়োজনের বলে মেনে নিই।—

জীবনের সৌম ও মূঢ় কর্ম্মের সমন্বয় সাধন করছে আমাদের উৎসব; আয় বাণিজ্য ও ব্যবসায় বোঝনে, নিকাশনে ও প্রসার বিতরণে; শান্তি ও অভিবাদনে, আনন্দ ও শান্তি বিধানে মূলতঃ আমাদের উৎসবের দেবতা।

আমরা যদি এই উৎসব-রচনার উৎসুক আবেগের মধ্যে প্রিয়-দেবতাকে ভুলে যাই, তবে কি আমাদের পূজা-মাঙ্গলিকী, সঙ্কল্প কথা, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা মূঢ় দেবতার মনো-মালিন্যে অভিশপ্ত ও ব্যর্থ হয়ে যাবেনা?

কিন্তু আমরা যদি উৎসব-মনে দেবতার আবির্ভাবের মধ্যে পূজা-অর্চনা ও হোমযজ্ঞের মধ্যে, প্রিয়জনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, নিবেদন ও আবেদন, অনুভূতি ও অনুকম্পাকে হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করে তুমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করি, প্রেমানন্দ ও তুমানন্দকে সাধন-জীবনের পরম শান্ত ও চরম পরিণতি বলে মনে করি তবেই আমাদের উৎসব সার্থক।

• • •

প্রতিদিনকার কর্ম্ম-বাহুল্যের মধ্যে যে দীনতা ও অবসাদ সারা বছর ধরে মনের উপর জমা হয়ে আমাদের জীবনের গতিকে মন্থরীভূত করে ফেলবার চেষ্টা করে, আমরা সেই দুর্ভর ভাবনা মন থেকে নামিয়ে ফেলে একদিন উৎসবের মধ্যে আনন্দ করতে ছুটে আসি।

এ উৎসব আমরা রচনা করিনা, সুযোগ আমাদের উৎসবকে চিনিয়ে দেয়। দেহের জড়তা ও চিত্তের বিষাদকে সেদিন আমরা স্বীকার করি না, উৎসবের মধ্যেকার চরম সত্যকেই সেদিন বিশেষভাবে দেখি। কারণ সত্য সেদিন তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য্য সম্ভার বহন করে আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়! তখন সত্যকেই ভক্তিভরে প্রণতি করি, জীবনের মৈত্র ও ত্রুটী সেদিন আমাদের মনে স্থান পায় না।

এই উৎসবের মধ্যে আমরা যে আমাদের আনন্দময় দেবতাকে দেখ্‌তে এসেছি সে শুধু হৃদয়ের আনন্দকে নবীন রাখিবার জন্য।

কর্ম্মজীবনের বাহিরের সাজসজ্জা, কারণে অকারণে ব্যস্ততা, তুচ্ছ কোলাহল ও কলুষতার মধ্যে যখন আমরা ডুবে থাকি, তখন আমাদের পক্ষে আত্মশক্তির গর্ব্বানুভব করা স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু যখন কর্ম্মের ভিতরকার সত্যকে আমরা দেখিতে পাই তখন অহঙ্কার দূর হয়ে যায়, মনের বাধা ঘুচে পড়ে, সত্যের মধ্যে আনন্দের সন্ধান পাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে।

আমাদের মঙ্গলচেষ্টা ও প্রাণের স্পন্দন একটা বিশেষ দিকে তাদের গতি বেগ ঠিক করে নিয়েছে। তাই কেউ প্রশংসা করলে সে প্রশংসা আমাদের জন্য নয়, আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে এ তারি প্রশংসা।

আমরা যদি মনে রাখতে পারি যে, আমাদের কর্ম্ম সত্যকে লাভ করিবার একটা উপায়, সেই বিশ্বকর্ম্মার কীর্ত্তিরই একটা অঙ্গ তবে তাঁর কল্যাণ আলোকে আমাদের সমস্ত কর্ম্মই উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে, প্রতিকূলতার অন্ধকার আমাদের হতাশ করতে পারবে না।

কিন্তু এবার উৎসবে বুঝি আনন্দময় দেবতা আসেন নাই, তাই আমাদের উৎসুক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে উৎসব যেন ম্লান হয়ে গেল—আলোও জ্বলল না, সানাইও বাজ্‌ল না, পূজার আঙ্গিনায় লোক সমাগমও হ'ল না,—পূজার দিনে, প্রকৃতি প্রকাশ হলেন মমতা-হীনা শ্মশানচারিণী ভৈরবীর বেশে!—সে রুদ্র আনন্দে যোগদান করে, তাণ্ডব নৃত্যে তাথৈ তাথৈ করে নাচ্‌তে কেও পারলে না। কারণ কপালি-নী-বেশে মহাপ্রকৃতি দশদণ্ডে সংহার করে গেলেন, সংসার-শ্মশানে একটীবারও মাতৈঃ শব্দে কেহ অভয় পেল না।

ঘরে ঘরে উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদ, রোগীর চীৎকার, অন্নহীনের হাহাকার, সবার উপর মৃত্যুর গগনভেদী প্রলাপিনী অট্টহাস্য।

বাংলার শান্ত পল্লী-চিত্রের উপর বিভীষিকার করাল-ছায়া পড়ে, সমস্ত বৈচিত্র্য ম্লান হয়ে গেল! এবার প্রকৃতির এই দানবী লীলার মধ্যে মহাপ্রকৃতিকে মঙ্গলময়ী প্রাণময়ী শক্তিরূপে উৎসবের দেবতা বলে প্রণাম করতে কেন প্রাণে বাধা পাই কেন?

উৎসবের দেবতা যে আনন্দময়।—আকাশ পরিপূর্ণ করে আনন্দময়কে দেখবার জন্যই ত আমাদের যত চেষ্টা তাই উপনিষৎ বলছেন—

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো নঃ স্যাৎ।

—কেই বা কোন্ প্রকারের চেষ্টা করত যদি আকাশ পরিপূর্ণ করে সেই আনন্দ না থাক্‌তেন?

কিন্তু কৈ আনন্দ কৈ? স্ফূর্ত্তি কৈ? শান্তি কৈ?

সকলের মুখেই আহি আহি শব্দ!—তবে কি দেবতা এবার আসেন নাই? না তা' হ'তে পারে না, দেবতা এসেছিলেন, অরূপমূর্ত্তি নিয়ে। তাঁর রুদ্র-লীলার মধ্যে সুপ্ত প্রাণকে তাঁরই উদ্দেশে জাগিয়ে দিতে!

দেবতা আমাদের সুপ্ত-চৈতন্যের সাম্‌নে অপ্রকাশ থেকেই ত আমাদের কর্ম্মে অনন্ত প্রেরণা দিয়ে বলছেন—

ওরে, উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত।

—সুতরাং দেবতার এই অপ্রত্যাশিত দানও মঙ্গলের দান। আমরা এখন, যে মহামারি ও বিপর্য্যয়কে অমঙ্গল বলে হা-হুতাশ করছি—তা'র পিছনেও মঙ্গলময়ের বিচার-দণ্ডের শাসন আছে।

তাই বলছি এখন শুধু আমাদের এই শক্তিকেই বড় বলে মেনে নিলে চল্‌বে না!

বর্ত্তমানের ক্ষতি ও আসন্ন ভবিষ্যতের মঙ্গলের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করে কাজ করে যেতে এক মানুষই পারে।

আর ক্ষতি হওয়াও যে সত্যের একটা নিয়ম। নিয়মকে অস্বীকার করে মঙ্গল চাই কি করে? ভুলতা না থাক্‌লে পূর্ণতার স্থান কোথায়?

মানুষ প্রথম দিন নয়ন-উন্মীলন করেই যদি দেখ্‌ত

ঊর্দ্ধপূর্ণ-মধ্যপূর্ণমধঃ পূর্ণ—

তা' হলে তা'র জীবনে গতি ও কর্ম্মের চেষ্টা আসত কেমন করে? তাই আমরা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে অমৃতের দিকেই চেয়ে চল্‌ব। কর্ম্ম সাধনার মধ্যে প্রলোভনকে জয়ী হ'তে দেব না, আমাদের সম্মুখে সাফল্যের বহ্নি রেখে আমরা যেন হৃদয়ের সঙ্গে বলতে পারি।

যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

ভাণ্ডা.

ভাণ্ডা তুমি রবে রাজা চিরদিন রক্তে
যুগে যুগে আঁখিজলে কাঁদাইবে ভক্তে।
ফুলধরা ভাঙ্গা শাখী চৈতে ভাঙ্গা পত্র
ম্লান মুখে চেয়ে থাকে ছলছল নেত্র।
ভাপিতের ভাঙ্গা কথা, ভাঙা লাল পদ্ম,
করে' রাখে মরমেরি কাতরতা বদ্ধ।
ভাঙ্গা বুক, হত সুখ, জনপদ ত্যক্ত
অকথিত কাহিনী যে করে নিতি ব্যক্ত।
মহিমার 'সোমনাথ' মোহেনাক ধ্বংসে
অপরূপ পুরুভুজ পূর্ণিত অংশে।
দেয় স্মৃতি অনুভূতি অমরতা বরগো—
জড়ীভূত হয় পাণি লেগে রয় খড়্গ।
অস্ত্রেতে গৌরব হয়না ক অন্ত
কাল কাঁধে ধরি 'কালা পাহাড়ের' হস্ত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ

ঘটনার স্রোত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৯)

কয়েকদিন হইল কাশীতে আসিয়াছি—উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াই—কত বিচিত্র দৃশ্যই নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এখানে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি—নিজের গৃহের মধ্যে যম আটকাইবার জোগাড় হইয়াছিল। অন্তরের মধ্যে যে ভাবধারা প্রবল হইয়া আমাকে এক রকম দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছিল, সেটা অন্ততঃ যেন লঘু হইয়া গিয়াছে। এখন মাস কয়েকের জন্য, নিশ্চিন্ত এই যথেষ্ট।

সরকার মহাশয় বেশ যত্ন করেন। আমি এক রকম বেশ আছি। সংবাদ পাইয়াছি আমি পাশ হইয়াছি যথা সময়ে গেজেটে নাম বাহির হইল—পিতা ও বৌদি আশীর্ব্বাদ করিয়া পত্র দিলেন।

বাঙ্গালীটোলায় থাকি। উঃ, গলিগুলি কি ভয়ানক—পাশাপাশি কোনোমতে দুটা লোক যাইতে পারে, এত সঙ্কীর্ণ। প্রথম প্রথম বড় মুস্কিলে পড়িতাম—রাস্তা চিনিয়া উঠিতে পারিতাম না। এখন আর রাস্তায় গোল হয় না। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করি; প্রায়ই বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়া আসি।

পাশ করিবার পরই বাড়ীর প্রবেশদ্বারের সম্মুখে ইংরাজী ও বাঙ্গলাতে নামের ট্যাবলেট লাগিলাম—এম, বি, ডিগ্রিটি লিখিলাম—নাম পুরা দিই নাই, তাহলে ঠিক হাল ফ্যাসনের হয় না, তাই আদ্যাক্ষর (initial) দিলাম শুধু একটা খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্যই এরূপ করিলাম কিন্তু বাস্তবিক জিনিসটা যে কতদূর গড়াইবে, তাহা কি তখন ছাই জানিতাম—কোন্ সূত্র দিয়া কাহার

আগে যে কি ঘটে তা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যদি কেহ থাকেন তিনি তার রহস্য জানেন।

বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়া ফিরিতেছি—একটু রাত্রি হইয়াছে; চুপ্ চুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; গাড়ীর এক জায়গায় একটু দাঁড়াইয়াছিলাম রাত্রে যে বৃষ্টি থামিবে তার কোনো লক্ষণ নাই; আকাশ ঘন-মেঘাবৃত—যদি পরে বৃষ্টির বেগ বাড়ে, আরও মুস্কিলে পড়িব এই ভাবিয়া ভিজিতে ভিজিতেই বাড়ীর মুখে, রওয়ানা হইলাম। বাড়ী পৌঁছিয়াই ভিজা কাপড় ছাড়িয়া ফেলিলাম। একটু বিশ্রাম করিতেছি। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল একটা ফেরুকাবাবু আমাকে ডাকিতেছেন। তাহাকে উপরে ডাকিলাম। দেখিলাম চাকর সঙ্গে করিয়া এক বালক—তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি চাও?" সে বলিল আমি ডাক্তার বাবুকে চাই। আমি উত্তর দিলাম—আমিই ডাক্তার বাবু।"

বালক কহিল—আপনাকেই আমি ডাকতে এসেছি, আমাদের বাড়ী একবার যেতে হবে।

আমি কহিলাম—এখুনিই।

"হাঁ; এখুনিই।" আমি কহিলাম তোমাদের বাড়ী কত দূর? সে উত্তর দিল—খুব কাছেই। আমি কহিলাম—তবে চল। আড়ালে ভৃত্যকে খাবার ঢাকিয়া রাখিতে বলিয়া আমি বালকের সহিত নীচে নামিয়া গেলাম। বালকের সঙ্গী বাঙ্গালী চাকর, তার হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন ছিল। তিনজনে বাহির হইয়া পড়িলাম। তখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি যে

গলিতে থাকি সেই গলিরই মোড়ের বাড়ীর কাছে আসিয়া আমার সঙ্গীরা থামিল। বালকটি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, আমাকে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া উপরে খবর দিতে গেল। একটু পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিল—শিগ্‌গির আসুন। তাগ্‌গির সে হাতে করিয়া একটা আলো আনিয়াছিল; সে ছুটিয়া উপরে উঠিল—কাজেই আমাকেও ছুটিতে হইল। দ্বিতলে উঠিয়াই বালক একটা ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিল—চলুন, ওই ঘরের ভেতর চলুন। ঘরের মধ্যে ঢুকিলাম—ঢুকিয়াই শুনিতে পাইলাম "মা, তুমি যদি অমন অস্থির হওত এখান থেকে চলে যাও বলছি।" যিনি এই মৃদু ভৎর্সনা করিতেছিলেন তিনি যুবতী ও সুন্দরী—আমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই মাথার ঘোমটা ভাল করিয়া টানিয়া দিলেন। দেখিলাম খাটের উপর শয়ানা এক রমণীমূর্ত্তি—বোধ হইল তিনি নিদ্রিতা—আর তাঁহাকে ঘেরিয়া চারি পাঁচটি বিভিন্ন বয়সের রমণী। ঘরখানি বেশ সুসজ্জিত। বালক আমাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল "ডাক্তারবাবু এসেছেন"। সকলেই একটু সন্ত্রস্ত হইলেন, এবং জায়গা ছাড়িয়া দিয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন। যুবতী একখানা চেয়ার টানিয়া আনিতেছেন দেখিয়া আমি কহিলাম—থাক্, থাক্, দরকার হলে ওখানা আমিই টেনে নেব।" বালক কহিল—না ওখানা আমিই এগিয়ে দিচ্ছি।' আমি বলিলাম—শুনিলাম বৃদ্ধা বলিতেছেন—খোকা ছেলে মানুষ, ওকি সব গুছিয়ে বলতে পারে, তার ওপরে ছুটোছুটি করেও বেচারা হাঁফিয়ে পড়েছে, তুই যা মা এগিয়ে যা, এ সময় কি আর লজ্জা করলে চলে। দাঁড়িয়ে রইলি যে মা, লজ্জা আগে না দিদি আগে।" যুবতী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আমি কহিলাম—এখন আমরা ডাক্তার, আমাদের কাছে অত লজ্জা করলে আমাদের মুস্কিল হয় সত্যি বটে, কিন্তু তার চেয়ে মুস্কিল হয় রোগীকে নিয়ে—কেন না রোগের ইতিহাস ভাল করে জেনে ব্যবস্থা না করলে, রোগ সারান অসম্ভব। আপনার দিদির অসুখের অবস্থা কেমন হয় আমাকে জেকেছেন। উনিও এখন বেশ সুস্থ আছেন।" যুবতী উত্তর দিলেন—"না না উনি মূর্চ্ছা গেছেন। আমি কহিলাম—তাই নাকি; দেখি আলোটা একটু উজ্জ্বল করে ধরুন দেখি—হাঁ-হাঁ, তাইত দেখছি—কতক্ষণ এ অবস্থায় আছেন?"

"বোধ হয় আধ ঘণ্টার ওপর"। আমি কহিলাম—আধ-ঘ-ণ্টা-র ও-প-র। আমার কথার ভঙ্গীতে তাঁর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, আর্ত্তস্বরে তিনি কহিয়া উঠিলেন—কেন ডাক্তার বাবু, কোন ভয় আছে কি? আমি উত্তর না দিয়া নাড়ী টিপিয়া দেখিলাম—নাড়ীর গতি দুর্ব্বল। খোকা বাবু শিগ্‌গির দোয়াত কলম এনে দাও ত। তারপরে যুবতীকে কহিলাম আপনাদের Smelling Salt আছে? তিনি কহিলেন—আছে, এনে দিচ্ছি—Smelling Salt নামে দিতে দু-একবার উঁ-আঁ শব্দ হইল মাত্র।

খোকা কাগজ কলম আনিয়া দিল—আমি তাড়াতাড়ি প্রেসক্রিপ্‌সন লিখিয়া তার হাতে দিয়ে বল্লাম, চাকরকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে এইটে চট করে এনে দেও দেখি—দেখ তুমি কেমন কাজের লোক; যেন একটুও না দেরী হয়। কাগজখানি হাতে করিয়া সে আবার ছুটিল। সকলে শুনিতে পায় এমি ভাবে কহিলাম—এ ঘরে বেশী লোক না থাকলেই ভাল—রোগীর পক্ষে ভাল। আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধা যুবতীকে থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া অন্য সকলকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

আমি রোগিনীকে পুনরায় ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম—মনে হইল তিনি বেশ থাকিতে নিদ্রা যাইতেছেন। শান্ত বিষাদপূর্ণ মুখশ্রী—তবু তাহারি অধরোষ্ঠে ক্ষীণ হাসির রেখা—জমাট বেদনা চিরিয়া চিরিয়া যেন স্নিগ্ধ সৌদামিনীর খেলা! পরস্পর বিরোধী ভাবের একত্র সমাবেশে তাঁর সুন্দর মুখখানি করুণ চিত্রের ন্যায় দেখাইতেছিল। আমি তাঁর মূর্চ্ছাতুর মুখে চোখে জোরে জলের ছিটা দিতে লাগিলাম—তাঁর কনিষ্ঠাকে মাথায় বাতাস করিতে বলিলাম। শয্যার উপরেই পাখা ছিল, তিনি বাতাস করিতে লাগিলেন—আমি রোগিনীর মাথার কাপড় একটু সরাইয়া দিলাম। বাতাস ও জলের ছিটা দিতে দিতে, তাঁর যেন একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইল—চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—দৃষ্টি

তখনও মুক্ত—অর্থাৎ সংজ্ঞালুপ্ত হইবার পর চেতনা ফিরিয়া আসিতেছিল তখনও স্মৃতি ফিরিয়া আসে নাই। আমি একটু ঘুরে সরিয়া গেলাম; তিনি একবার আমার দিকে দেখিলেন—পুনরায় চক্ষু মুদিত করিলেন। তখন যথাসম্ভব আমি তাঁর কনিষ্ঠাকে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—আবার মূর্চ্ছা গেলেন নাকি? তিনি ভাল করিয়া দেখিয়া কহিলেন "না"। এমন সময়ে খোকাবাবু ঔষধ-পত্র লইয়া আসিলেন। আমি এক বাটি দুধ চাহিলাম—খোকা দুধ আনিতে গেল। ঘরের মধ্যেই টোভ ছিল, আমি সেটা জ্বালাইয়া তার উপরে দুধের বাটি বসাইয়া দিলাম। দুধ গরম হইলে feeding cup এ ঢালিয়া ঔষধ মিশাইয়া দিলাম। রোগিনীর তখন চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে, আপনার মনে প্রশ্ন করিলেন, "আমার কি হয়েছিল?" তাঁর কনিষ্ঠা উত্তর দিলেন "কিছু নয়, এই দুধটা খাওত দিদি।" দুধ খাওয়া শেষ হইল। আমি একটু ঘুরে গিয়া বসিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পুনরায় ঔষধ দিলাম—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি অনেকটা সুস্থ হইলেন।

আমি তাঁর নাড়ীর গতি আর একবার পরীক্ষা করিলাম। সেই সময়ে উজ্জ্বল দীপালোকে দেখিতে পাইলাম যে অনিমেষ নয়নে আমার দিকে তিনি চাহিয়া আছেন—আমি সহসা এরূপ দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। নতনেত্রে তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করিতেছি, হঠাৎ তাঁর হাতখানা কাঁপিয়া উঠিল—আমি তাড়াতাড়ি কহিলাম—"দেখুন স্থির হোন্ নড়বেন না"। এই বলিয়া যখন তাঁর দিকে তাকাইলাম দেখিতে পাইলাম যে তাঁর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেছে, পরক্ষণেই আমার দেখিলাম অত্যন্ত উত্তেজিত হইলে, মুখ যেমন রক্তাভ হইয়া উঠে, তাঁর মুখও সেইরূপ রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। আর একবার আমার প্রতি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন—আমার হঠাৎ মনে হইল আমার অন্তর-ভেদ করিয়া তাঁর এই দৃষ্টি যেন আমার মর্ম্মের সন্ধান লইয়া ফিরিয়া গেল! কিন্তু একি? [illegible] ঠেকিল যে মনে হইল এখান হইতে কোনোমতে পলাইতে পারিলে বাঁচি। কাশীতে ডাক্তারের অভাব নাই! সদ্য পাশ করা ডাক্তারের পক্ষে সুন্দরী যুবতী রোগিনী খুব বাঞ্ছনীয় বটে!

আমি উঠিলাম—"কনিষ্ঠা সহোদরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তার বাবু, যাচ্ছেন?"

আমি কহিলাম—"হাঁ খাবার আর প্রয়োজন নেই—উনি এখুনি ঘুমিয়ে পড়বেন। দুচার দিন বেশ সাবধানে রাখবেন।"

"আপনি একটু দাঁড়ান, চাকরটাকে আলো ঘরে এগিয়ে দিয়ে আসতে বলি।"

"না—না, কোনো দরকার নেই, আমি খুব কাছেই থাকি।"

"তাও কি হয়, শুনতে পাই কাশী নাকি ভাল জায়গা নয়।"

"সেজন্য আপনি চিন্তিত হবেন না—পাড়ার মধ্যে কোনো ভয় নেই"—বলিয়া আমি নীচে নামিবার জন্য সিঁড়ির কাছে যখন গিয়াছি, তিনি ক্ষীণ যোগ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—এতক্ষণ বেশ ছিলেন, হঠাৎ বাত্ত হলেন কেন? একটু দাঁড়ান নীচে অন্ধকার, আমিই না হয় আলোটা দেখাই—এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি ঘরে ঢুকিলেন এবং আলো হাতে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখনও সম্পূর্ণরূপে সে হাসি মিলাইয়া যায় নাই—আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"চলুন নীচে অবধি আপনাকে রেখে আসি।" আমি চলিয়া আসিতেছি, তিনি ডাকিলেন—"শুনুন, কাল কি আবার আপনি আসবেন?" আমি কহিলাম—"বোধহয় দরকার হবে না—আর যদি দরকার হয় আমিত খুব কাছেই আছি।" তিনি কহিলেন—"তা হলে ভাবব কিন্তু।"

"সে আপনাদের দয়া।"

"তাই বই কি—কি বিপদেই না আজ আপনি রক্ষা করলেন—কাশীতে ত বেশী দিন আসিনি, আমরা এখানকার ও কিছুই জানিনে—খোকা বুদ্ধি খরচ করে ডাকলে তাই হয়, আপনার এ উপকার কখন ভুলব না।"

"আপনি ভুল করছেন—উপকার বলে ত এটা আমাদের করা নয়—এ যে আমাদের ব্যবসা।"

"ও—তাও ত বটে, কিন্তু এ ব্যবসায়ে আপনি দেখ্‌ছি খুব কাঁচা।" এই বলিয়া অকলাত্র হইতে কয়টী টাকা বাহির করিয়া বলিলেন—"ডাক্তার বাবু, ক্ষমা করবেন, গোলে মালে আপনার দর্শনীটী দিতে ভুলে গিয়েছিলাম; আচ্ছা আচ্ছাই এতক্ষণ কিরছে—এই নিন।"

আমি হাসিয়া কহিলাম—"একেবারে চুকিয়ে দিলে হয় ত ভেকে পাবেন না—ওটাকে এখন না হয় হাতের পাঁচ করে রাখুন।"

"আপত্তি নেই—তবে ওপের বাজা বাড়িয়ে লাভ কি—শেষে যদি আপনি সুদ শুদ্ধ চান।"

"তখন না হয় বলবেন সব তাবাদি হয়ে গেছে।" এই বলিয়া আমি হাসিয়া উঠিলাম—তিনিও আমার হাসিতে যোগ দিলেন। চলিয়া যাইবার মুখে দাঁড়াইলাম, তখনও তিনি আলো হাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ফিরিয়া কহিলাম—দেখুন আপনার দিদির কি কিটের ব্যারাম আছে?

"না, কৈ তাঁর ত কোনো অসুখই নেই।"

"এর আগে তাঁর কখনও এমন হয়েছিল?"

"হাঁ, হাঁ—আর একবার হয়েছিল—সে তিন বছরের আগে।"

"ওঁর কোনো মানসিক কষ্ট আছে?"

"যথেষ্ট।"

"কি কষ্ট জানতে পারি?"

"সে অনেক কথা, এইটুকু বল্লেই বুঝতে পারবেন—যে ওঁর স্বামীভাগ্য বড় মন্দ।

"সম্প্রতি এমন কিছু হয়েছে কি যাতে মনুল করে ওঁর মনে চোট লাগতে পারে?"

"হাঁ, আজ বাবার চিঠি এসেছে যে ওঁর স্বামীর আবার শিগ্‌গির বিয়ে"——"বলেন কি এখন স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে।"

"এখন ভাব্‌ছেন, মোটেই ওঁকে নিয়ে ঘর করবে না, তার ওপর আবার মায়া।"

আমি গম্ভীর ভাবে কহিলাম—দেখুন মনের ওপর চিকিৎসা বিদ্যা চলে না, ওষুধে ওঁর বেশী কিছু হবে না ওঁকে সর্ব্বদা খুসিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন। আমার কথাটী শুনিয়া তিনি ঈষৎ হাসিলেন মাত্র—আমিও লজ্জিত হলাম। যাহা হউক, পুনরায় কহিলাম ওঁর স্বামীর নাম ও ঠিকানা জান্‌লে আমার একটু সুবিধে হ'ত।"

"মোটেই না—আপনি তাঁকে সবিশেষ বুঝিয়ে লিখে, তাঁর মত ফেরাবেন? কিন্তু তা যে হবার নয়—" কথার শেষে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল,—সুদীর্ঘ বেদনার অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। "আপনি ভাবছেন, আমি লুকোতে চাইছি—মোটেই তা নয়। আমি তাঁর নাম ও ঠিকানা বলছি, কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করছি সেখানে আপনার ঐ ডাক্তারি একেবারেই চলবে না—সে চেষ্টা করলে আপনি অপদস্থ হবেন। আমার দিদির স্বামীর নাম——এঁ্যা এঁ্যা একি হল ডাক্তার বাবু অমন করে চলে গেলেন যে। যাঃ যে!"

(৭)

মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। মাথার উপরে আকাশ, পায়ের নীচে মাটি মনে হইল যেন চারিধার ঘুরিতেছে। আমার দুর্ব্বলতা ও ধরা পড়িয়া গেছে—ছি, ছি, কি করিলাম; আর একটু পরিচয় লইলে ত সব চুকিয়া যাইত। না, না, আর চেয়ে যা দেখেছি সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট—সম্পূর্ণ সত্যের সঙ্গে যদি আমার কোনো সম্বন্ধ না থাকে, তার চেয়ে এই অসম্পূর্ণ পরিচয়ের মধ্যে আমার সঙ্গে যে সামান্য মিল আছে, সেই ভালো। মনে পড়িল মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তাঁর ভাবের পরিবর্ত্তন—সে কি দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ভ্রম মাত্র? আমার অন্তর চিরিয়া চিরিয়া যে দৃষ্টি আমার অন্তরতম দেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহা আমার ভাল লাগে নাই, সত্যই আমার মনে এমন বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল, সে কি সত্যই অর্থপূর্ণ? তবে কি—তবে কি পাগল; তাও কি হয়?

শুধু নামের দিদির ভিজিট উপর এত বড় সুখের প্রাসাদ গড়িয়া তুলিবার জন্য হঠাৎ আমি এত ব্যাকুল

হইল সে কেন? চিরসঞ্চিত বিরহের মাঝখানে কিসের স্পর্শলাভ করিয়া আমার ক্ষুব্ধ হৃদয় মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে শুভদৃষ্টির সময়ে যে সুন্দর মুখ একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম, সে মুখখানি স্পষ্ট মনে নাই—অনেক করিয়া মনে আনিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হতাশ হইয়া পড়িলাম। যতই তাহাকে মনে করিতে যাই, এই মুখখানা, সে দিনের সেই কিশোরী মূর্ত্তির মুখের মধ্যে দেখিতে পাই। এ আমার কল্পনা, এ আমার স্বপ্ন, এ আমার তরুণ হৃদয়ের অসীম বেদনাপূর্ণ ব্যর্থতার বিপুল আত্মপ্রবঞ্চনা! এ যাহাই হোক্ না কেন, আমার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া রহিয়া রহিয়া আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়া কহিতেছে—যেটুকু সত্য হইলে আমার হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, আজিকার ঘটনা যদি ততটুকু সত্য হয়! যাহা আমার হইয়াও আমার হয় নাই, তাহাকে চিরদিনের মতন আমার করিয়া যাও। সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি শুধু এ যদি সে হয়!—একবার ইচ্ছা হইল দৌড়িয়া গিয়া সমস্ত ঘটনা বলিয়া আসি—এবং ওঁদেরও পরিচয় ভাল করিয়া জানিয়া আসি। অতি সামান্য পরিচয়ে এরূপ আচরণ ইহাদের যে অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিবে—এটুকু বুঝিবার শক্তি লোপ পায় নাই, তাই আর গেলাম না। কৌতূহল কিম্বা উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হইতে গেলে হাস্যাস্পদ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, তাই বিনিদ্র-নয়নে কেমন্ বিলাবে চলিতে হইবে তার পাকাপাকি আলোচনা মনে মনে করিলাম—আজ যেটুকু শুনিয়াছি তাহাতে ক্ষীণ আশার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাকি টুকুর উপরেই তার সমস্ত অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে।

আশা ও আশঙ্কার মাঝখান দিয়া রাত্রি ভোর হইয়া গেল। শীতল প্রভাতবায়ু স্পর্শে আমার উত্তপ্ত ললাট ও উদ্বেলিত হৃদয় শান্ত হইল—আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গিল দেখিলাম বেলা বেশ হইয়াছে। রাত্রের খাবার যেমন ঢাকা ছিল তেমি ঢাকা আছে। ভৃত্য আসিয়া তাহা লইয়া গেল। ঘর ঝাঁট দিবে, তাই সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিলাম। ভৃত্য কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গেল—আমি ও পুনরায় ঘরে গিয়া বসিলাম।

গতরাত্রের কথা মনে হইল; আরব্যোপন্যাসের অদ্ভুত গল্পের মতন মনোরম ঘটনাপূর্ণ কিন্তু তারই মত অলীক। একটা সামান্য সাদৃশ্য, তার জন্য গতরাত্রে এত বিপুল চিন্তা। নিজের মনে মনে নিজের আচরণে হাসি পাইল। সৌন্দর্য্যের কুহকে পড়িয়া আপনার মনের মধ্যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিলাম।

কাল রাত্রে ঘুম হয় নাই—তাই সকাল সকাল খাবারের ফরমাস করিয়া লইয়া যথাসাধ্য নিদ্রা যাইব, ঠিক করিয়া রাখিলাম। শুইলাম বটে কিন্তু পোড়া চোখে ঘুম আসিল না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে লক্ষিত পলে পলে পুঞ্জীকৃত অসংলগ্ন চিন্তার মাঝখানে ডুবিয়া গেলাম। যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখিলাম মোটে ২টা বাজিয়াছে। মনে হইল বাড়ীর বাহির হই—কিন্তু বড় রৌদ্র, তাই বাহির হইলাম না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী খানা খুলিয়া বসিলাম, ভাল করিয়া মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম না। তবু পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আখির অপরাধ দেখিতে পাইলাম—পড়িতে সুরু করিলাম। কবিতাটিতে আমারই প্রাণের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমার মনে হইল আমি যদি আমার প্রাণের কথা অবনি করিয়া নিবেদন করিবার সুযোগ পাইতাম! বারবার এই কয় ছত্র পড়িলাম:—

জান কি আমি এ পাশ আমি যে দ
তোমারে দেখেছি চেয়ে,
মিলেছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপানে যেয়ে।
বুঝি কি তখন পেয়েছ জানিতে
বিমল হৃদয় আরশি খানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে
নিশ্বাস রেখা ছায়া!
ধরার মুখরা ম্লান করে যথা
আকাশ উষার কায়া!
লজ্জা সহসা আসি অকারণে
বদনের মত ঘাড়া আবরণে

চাহিয়া ছিল কি চাহিতে তোমায়
শুদ্ধ নয়ন হতে !
মোহ চকল সে লালসা ময়
ক্ষুব্ধ ধরণ ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন্ গুন্ কেঁদে
তোমার দুই পথে ?
দেবি, আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাত রশ্মি সম,
দীপ্ত বিবেক দাও বাসনা দহন

এ কালো নয়ন মম !
এ আঁখি আমার শরীরে ত নাই
ফুটেছে মর্ম্ম তলে,
নির্ব্বাণহীন অনল সম
নিশি দিন শুধু জ্বলে !
দেখা হতে তারে উপাড়িয়ে দাও
আমার দুটো চোখ,
তোমায় লাগিয়া নিরাশ যাহায়
সে আঁখি তোমারি হোক !

ক্রমশঃ

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

ভাবময়ী

দাঁড়াও আঁখির আগে, নিরখি কল্যাণি,
আবেশে বিকল তনু, তোমার পরশে,
শ্রবণ-কুহরে তব আশাময়ী বাণী,—
জাগাল নিরাশ্ প্রাণ আকুল হরষে।
তুমি কি স্বপন মম কিশোর বেলার
পুষ্পিত অধরে সুধা এনেছ বহিয়া ?
তুমি কি আনস রাণী যৌবনে খেলার
ফুটিয়া উঠিলে ধীরে রহিয়া রহিয়া ?
আমার জীবন-স্রোতে বহালে কি সুধা।
চরণে দিয়াছ দলি' মোহ অভিমান,
জ্ঞানের অনলে পুড়ি' দেহময় ক্ষুধা,
আমারে দিয়েছ নব রাজ্যের সন্ধান।
তুমি মোর সাধনার সরবস্ব ধন,
লহ এবে হীন অর্ঘ্য মম প্রাণ-মন।

শ্রীসুকুমার দাশ গুপ্ত বি, এ,

চর্ম্মকার ঋণদান সমিতি

বেহুলাবাজারে চামারদিগের একটী ছোট পল্লী আছে। পশ্চিমদেশীয় কয়েকঘর চামার বহুদিন হইতে শ্রীপুর লইয়া সেখানে বাস করিতেছে। অনেকেই চটীজুতা তৈয়ারী করে; কেহবা জুতার কাজও করে; কয়েকজন ফুটবলের কারিগর; বাকী অনেকেই কলিকাতা করপোরেশনের "সৌখানায়" চাকুরী করে।

পল্লীটীর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়; অ রিষ্কার রাস্তা। পল্লীর ভিতর আলোর কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই। জলেরও অভাব; দুই একটী কল যাহা আছে, তাহাতেই ইহারা অতিকষ্টে কাজ চালায়। ইহা ছাড়া আর্থিক হিসাবে তাহাদিগের জীবন একেবারে বৃথা। সকলেই জানেন, পশ্চিমদেশীয় চামারগুলি বেশী পরিমাণে দেশী তাঁটীর মদ পান করে। ইহারাও খুব মদ খায়। দিনে যাহা উপার্জ্জন করে তাহার অধিকাংশই মদে বায় করে। সুতরাং তাহাদের স্ত্রীপুত্রের এবং নিজেদের আহারের জন্য মহাজনের নিকট ধার করে। একজন চামার দৈনিক ৩ জোড়া চটী তৈয়ারী করিতে সক্ষম। এবং এই জোড়া যদি সে উচিত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে, তবে প্রায় ১৲ লাভ হয়। কিন্তু পাইকার এবং মহাজনদিগের জ্বালায় তাহার উচিত মূল্যে জিনিষ বিক্রয় করিবার উপায় নাই। সন্ধ্যার সময় যেমন জিনিষ তৈয়ারী হইল, অমনি মহাজন আসিয়া ২৲ টাকার জিনিষ ১৲ বা ১৷৹ মূল্যে জোর করিয়া নিয়া গেল। আর যেদিন মহাজন না আসে, সেদিন পাইকারই (middleman) জোর করিয়া নেয়। পাইকারের যত সস্তায় জিনিষ কিনিতে পারে ততই তাহাদিগের লাভ।—সুতরাং তাহারা মূল্য বৃদ্ধি করিতে কম করিবে কেন? আর মহাজনদিগের কথা ত পৃথক। কাবুলী এবং জুতার দোকানদারগুলিই ইহাদিগের মহাজন। চামারেরা লেখাপড়া জানে না; সুতরাং বলিলে তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত টাকা বসাইয়া নেয়। সুদের কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। তাহারা টাকা প্রতি মাসিক ৵০ আনা হইতে ।০ আনা সুদ আদায় করে। সরীব ইহারা সুতরাং লাঠির ভয়ে আর কোন কথা বলিতে সাহস করে না। আপনাদিগের তৈয়ারী জিনিষ এইরূপে কম দরে বেচিতে হয় বলিয়া দিনে দিনে তাহারা দেনায় ডুবিয়া যাইতেছে।

এখন শ্রীপুরকন্যাদিগের ভরণপোষণ করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুখের বিষয় দুই বৎসর হইল কলিকাতার সেণ্টপলস্ কলেজের কয়েকটী ছাত্রের যত্ন ও চেষ্টায় তথায় চর্ম্মকারদিগের মধ্যে একটী যৌথঋণদানসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ১৯১২ সালের ২ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত; এবং বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর সহযোগীতায় পরিচালিত হইতেছে। ১৪।১৫ জন চামার ইহার মেম্বর। ইহারা চটী, ফুটবল এবং জুতা প্রস্তুত করে এবং কয়েকজন অন্য কাজও করে। সমিতি তাহাদিগের প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করেন। এই সমিতি হইতে প্রত্যেক মেম্বরে টাকায় ৴৷৹ পাই সুদে টাকা কর্জ্জ পাইয়া থাকে। সমিতি নিয়ম করিয়াছেন যে প্রত্যেক মেম্বর সমিতির আফিসে বসিয়া কাজ করিবে; এবং সন্ধ্যার সময়ে দৈনিক খরচখরচার জন্য যাহা দরকার সেই পয়সা পাইবে। প্রত্যেক মেম্বরের মহাজনের নাম সমিতির নিকট আছে; এবং দৈনিক উপার্জ্জনের পয়সা হইতে মেম্বরদিগকে দিয়া যাহা বাঁচে, তাহা জমাইয়া মহাজনদিগের ঋণশোধ করা

যায়। এইরূপ নিয়মে সুফল ফল ফলিয়াছে; সাধারণ খাটে; দৈনিক খরচের বেশী কেহ পায় না বলিয়া ঋণ পাওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু ঋণ তো আর সহজে ছাড়িতে পারা যায় না তথাপি ২।১ জন ঋণ ছাড়িয়াছে! যে সমুদয় চাষার সমিতির আফিসে কাজ করে এখন তাহারা অনেকে সপ্তাহে ৩ বারে তাহাদিগের উপার্জ্জন হইতে সঞ্চয় করিয়া সমিতিতে জমা দেয়। সেজন্য অবশ্য তাহারা সুদ পায়। কারণ যৌথকলাদ সমিতির উদ্দেশ্যই মেম্বরদিগকে ঋণ হইতে মুক্ত করা এবং কমসুদে টাকা ধার দিয়া ঋণশোধ করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং তাহাদিগকে সঞ্চয় করিতে শিক্ষা দেওয়া।

ইহাদিগের নৈতিক জীবনের উন্নতির জন্য ও সাধ্যমত বন্দোবস্ত করা হইতেছে। গত দুই বৎসর হইতে সেবাশ্রমে সেটেলমেণ্ট কলেজের উদ্যোগে পল্লীতে একটী নৈশবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। চন্দকার বালক বালিকারা সেখানে সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এবং সমিতি আশা করেন যে তাহারা লাভ হইতে বার্ষিক কিছু কিছু বিদ্যালয়ে সাহায্য করিতে সক্ষম হইবেন। রাস্তা ও আলোর বন্দোবস্তের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হইতেছে।

এই সমুদয় চন্দকার এই সমিতিতে কিরূপ তৎপরতার সহিত কাজ করিতেছে, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহাদিগের প্রস্তুত জুটবল যেসার্স বোমাইটএণ্ডকোং লেডুল কোম্পানী কিনিয়া লইতেছেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় বলগুলি কিরূপ মজবুত এবং উৎকৃষ্ট। ইহাদিগের প্রস্তুত বুট পাইয়া ভারতের পরমবন্ধু স্যার জ্যামিয়েল হ্যামিল্টন সাহেব বলেন "বুটজোড়া অতি উত্তম হইয়াছে; ইহাদিগের শিল্পকৌশল অতিসুন্দর"। দামও খুব সস্তা। এখানে তো আর পাইকার কিংবা মহাজনের ঘুরাঘুরি নাই। সমিতি দামান্য লাভে সমুদয় জিনিষ বিক্রয় করেন।

ভগবানের কৃপায় এক এক বৎসরেই ফল বেশ ভাল হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে সমিতির চেষ্টা আরো সফল হইবে।

স্যার জ্যামিয়েল সাহেবের উৎসাহ এবং সহানুভূতিতেই এই সমিতি স্থাপিত। চাষাদিগের দুঃখ মোচন করিবার জন্য তিনিই প্রথম কম সুদে টাকা ধার দেন। তাঁহার নিকট আমরা কিরূপ ঋণী তাহা বর্ণনাতীত। এই সমিতি আজ ভাল করিয়া চালাইবার জন্য কেবল কো-অপারেটিভ সোসাইটী একজন উপযুক্ত লোক দিয়াছেন। এই জন্য সমিতি রেজিষ্ট্রার মে, টি জনষ্টনের নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ। সার্কেল ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই সমিতির উন্নতির জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন। এইজন্য সমিতি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

শ্রীবাক্তেশ্বর দাস।

সম্পাদক—চন্দকার ঋণদান সমিতি

বঙ্গসাহিত্যে ৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের স্থান

বাঙ্গালীর আজ মহাজাগরণের দিন। তাহার রবি কবি-জগতকে মহাসিলনের গান শুনাইয়া বঙ্গভাষাকে ধন্য ও বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ধার্মনিক ব্রহ্মেন্দ্র-নাথ বিশ্বসভায় শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত সমাদৃত হইয়াছেন, তাহার বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র সকল সভ্য জাতির সম্মুখে প্রমাণিত করিয়াছেন জড়বিজ্ঞানে বাঙ্গালী জগতের পিছনে পড়িয়া থাকিবে না, আর জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে বেদান্ত প্রচার করিয়া তাহার মৃত আত্ম-বিশ্বাস আবার ফিরাইয়া আনিয়াছেন। আজ যে জাগরণের দিন, মহাজাগরণের মহা উৎসব, তাহা তখন আরও ভাল করিয়া জানিতে পারি যখন মনে হয় দলে দলে শিক্ষিত যুবক দেশের কলঙ্ক ঘুচাইবার জন্য সাধারণ সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আজ যে নূতন এক যুগের অবতারণা হইতেছে তাহা তখন আরও বুঝিতে পারি যখন মনে হয় সারা দেশ জুড়িয়া দেশ-প্রেমের এক প্রবল বন্যা ছুটিয়াছে, তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি তখন, যখন দেখি চারিদিকে নিত্য নূতন নূতন কর্ম্মী সকল বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন এবং ঘনীভূত অবসাদের পরিবর্ত্তে জীবন্ত উৎসাহ সকলের প্রাণে ঢালিয়া দিতে চাহিতেছেন। এই নূতন যুগের অবতারণা কিসে হইল? এই যে অভিনব সাহিত্য, এ কোন্ কলাকুশল শিল্পীর নিপুণ হস্তে গড়িয়া উঠিয়াছে, কোন্ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের কঠোর সাধনার ফলে আজ আমাদের দেশের আবহাওয়া এমন ধারা বদ্‌লাইয়াছে?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর এক কথায় হয় না; অনেক নায়ক যুগ যুগ ধরিয়া বুকচেরা রক্ত দিয়া কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন, আজ আমরা তাহার ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি মাত্র। তবে এ সকল প্রশ্ন উঠিলে আমাদের মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা—বঙ্গদর্শনের কথা। সেই যুগেই সেই শুভ মুহূর্ত্তেই এই শুভ পরিবর্ত্তনের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবের সংস্পর্শে আসিয়া দেশে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, জাতীয়তার জন্য; দেশের কোথায় কি কাজ হইতেছে তাহা জানিবার জন্য, বিশ্ববার্ত্তা জানিবার জন্য লোকের মনে আগ্রহ জন্মিল। বঙ্গ-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতী, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, নব্যভারত, সাধারণী, সাহিত্য, জন্মভূমির আবির্ভাব হইল। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রচারও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পণ্ডিত যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তখন ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্‌ডির জীবনী লিখিয়া 'চিত্র-চরিত্রিণী' ও 'কীর্ত্তি-মন্দির' রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস সঙ্কলনপূর্ব্বক, জাতীয় সম্মুখে মহান্ আদর্শ উপস্থাপিত করিতেছিলেন। এমনি সময়ে রজনীকান্ত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার ইতিহাস ও অন্যবিধ রচনার সাহায্যে সমগ্র জাতির সুপ্ত আত্মবোধ জাগাইতে চাহেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই আলোচনা করিব। কোনও লেখকের স্থান বিচার করিতে হইলে তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগের কথা ভুলিলে চলিবে না, ——তাই এ ভূমিকার আয়োজন।

জন্ম তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা জেলায় মতগ্রামে—১৮৬৬ সালে। তখনকার দিনে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া তাহাতে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। এ পরীক্ষার ফলে তিনি বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রজীবন শেষ হইলে অভিভাবকের ইচ্ছা হইল, তিনি বৈদ্যশাস্ত্র শিখিয়া জাতীয় কর্ম্মে মন দেন। কিন্তু রজনীকান্ত সে ধাতুতে গঠিত ছিলেন না। ছাত্রাবস্থায় তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যাবজ্জীবন দেবী বীণাপাণির আরাধনায় রত থাকিবেন, জীবনকে একটা জ্ঞানযজ্ঞ করিয়া

গড়িয়া তুলিবেন, সাহিত্য-সেবায় সমস্ত প্রাণ-মন উৎসর্গ করিবেন। অভিভাবকের আদেশ তাঁহার সঙ্কল্পকে টলাইতে পারিল না, অর্থও সাহিত্য-সেবা এই দুয়ের মধ্যে তিনি সাহিত্য-সেবাকেই বরণ করিয়া লইলেন। প্রাচীন উৎকলে গঙ্গাধরাদ্যনুলোভব মহাকবি উপেন্দ্র ভঞ্জ একদিন রাজ্যভার কনিষ্ঠের হস্তে দিয়া স্বয়ং নির্জ্জনে সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। রজনীকান্তকে রাজ্যত্যাগ করিতে না হইলেও অভিভাবকের আদেশ অমান্য করিতে হইয়াছিল, যৌবনে অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হইতে হইয়াছিল, সাহিত্যসাধনার জন্য দারিদ্র্যকে তিনি বাধ্যতঃ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর তিনি বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার এই জীবনকালে বঙ্গসাহিত্যের অনেক উন্নতি হইয়া গিয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, কবি ঈশ্বর গুপ্ত, "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"—প্রণেতা অক্ষয় দত্ত, সমাজ-হিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাগর তেজস্বী ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, আদি নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন, ঐতিহাসিক দীনবন্ধু, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, স্বদেশ প্রেমিক রঙ্গলাল, কবি নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ,—বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি কল্পে ইঁহারা সকলেই কিছু না কিছু করিয়াছেন, ইঁহাদের জন্যই আজ আমাদের সাহিত্যের এত গৌরব। কিন্তু রজনীকান্তের ন্যায় একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক অতি বিরল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, তাঁহার প্রবণশক্তির খর্ব্বতা ছিল, শারিরীক স্বাস্থ্যও তেমন ভাল ছিল না। অভিভাবকের ইচ্ছা যে তিনি সরকারী সাব-ডিপুটী বা আর কোনও চাকুরী করেন, বা জাতীয় বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু এ সকল বাধা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হন নাই। সামান্য পারিশ্রমিকে এডুকেশন গেজেটে লেখা; বঙ্গবাসীতে নিয়মিতরূপে লেখা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হওয়া, বিদ্যালয়োপযোগী পাঠ্য-পুস্তক রচনা —এই সকল ছিল রজনীকান্তের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। বঙ্গদেশে—শুধু বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে আধুনিক যুগে এরূপ একনিষ্ঠ সাধক, খুঁজিয়া পেতে তার হইবে যিনি জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান বিষয়ে নিশ্চিন্ত। সাহিত্যই তাঁহার তনু, মন, প্রাণ, জ্ঞান, ধ্যান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর কোনও চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইত না।

তাঁহার রচনাবলীর সংখ্যা বড় কম নয়। আর্য্য-কীর্ত্তি, প্রতিভা, ভীষ্মচরিত, বীর-মহিমা, অবতার-চরিত, আমাদের জাতীয় ভাব, হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, পাণিনির বিচার, মেরী কার্পেন্টার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পরিচয় দিতেছে। ইংরেজের বাঙ্গালার, ইতিহাসও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং কটন সাহেবের "New India" পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার, তিনি "সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস"—এক নিরপেক্ষ মৌলিক ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাহা পাঁচ ভাগে সমাপ্ত। কি নীতি, কি ধর্ম্ম, কি জীবন-চরিত, কি বিজ্ঞান, কি ব্যাকরণ, কি ইতিহাস, কি অনুবাদ —সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়াছিলেন এবং যাহাতেই হাত দিয়াছিলেন তাহাই সুপাঠ্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস' বঙ্গভাষার এক অক্ষয় কীর্ত্তি, অক্ষয় গৌরবস্থান; 'মেরী কার্পেন্টার' ও 'প্রতিভা' আদর্শ জীবন-কথা।

তাঁহার লিখিবার রীতি বিশদ, ভাষা ওজস্বিনী, অথচ কোথাও পাণ্ডিত্য দেখাইবার প্রয়াস নাই। লিখিবার বিষয়ও অতি গম্ভীর। আমরা তাঁহার তিনটী গ্রন্থ হইতে এ বিষয়ে প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিব।

'আর্য্য-কীর্ত্তি' পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রথম খণ্ডে রাজপুত-কাহিনী। ভারত-সন্তানকে বাঙ্গালীকে শিক্ষা-প্রদানই যে তাঁহার লেখনী ধারণের কারণ সে কথা এখানে বেশ স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে। "বীরভূমি রাজপুতনা বাঙ্গালা দেশ নহে। রাজপুতনার বাঙ্গালীর ন্যায় পাত্র খুঁজিয়া বেড়ান না। এখনকার বাঙ্গালীর ন্যায় বলশালীর অভাবপ্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য পুত্র বা বি-এ, এম-এ, উপাধিধারী বিলাসী যুবক পাইলেই রাজপুতনীর আহ্লাদে অধীর হয় না।" "এই মহাপ্রাণতা এবং এই তেজস্বিতার সমুচিত সম্মান করিতে পারেন, আর এই বিশাল ভারতে এমন কয়টি প্রকৃত কবি বা প্রকৃত ঐতিহাসিক আছেন? আর

কি চারণগণ অতীত গৌরবের গীতি গাহিয়া চির-নিদ্রিত ভারতকে জাগাইবে না?" "বাঙ্গালী! তুমি ভীরু। প্রকৃত তেজস্বিতা আজও তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তুমি আজও প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষিতার মহান্ ভাব বুঝিতে পার নাই।" "ভারত আজ শীত-সঙ্কুচিত বৃদ্ধ অথবা কূর্ম্মের ন্যায় আপনাতে আপনি লুক্কায়িত। তাহাতে আজ নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট।" দ্বিতীয় খণ্ডে শিখ-কাহিনীতে এ ভাব আরও স্পষ্ট হইয়াছে। এমন কি শিখ-গুরু গুরুগোবিন্দের সাধনার কথা বলিতে গিয়াগ্রন্থকার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সংযম হারাইয়াই বলিতেছেন,—"পাঠক! তুমি মাজিনীর কীর্ত্তির কথা পড়িয়াছ; গারিবল্‌ডির বীরত্বে স্তম্ভিত হইয়াছ; ওয়াশিংটনের বীরত্বের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছ; শেষে যক্ত-ভূমিতে জলদগম্ভীর স্বরে মাজিনীর আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিতেছ; গারিবল্‌ডির গরীয়সী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছ; কিন্তু এক সময়ে তোমার মাতৃভূমিতে—এই পরাধীন, পরপদ-দলিত, ঘোর দুর্দ্দশার ক্ষেত্রে এরূপ আত্ম-ত্যাগ, এরূপ দৃঢ়তার উদয় হইয়াছিল। ইতিহাসের অনুসরণ কর, বুঝিতে পারিবে।" আর্য্য-কীর্ত্তির অন্ত কিন সংখ্যা অনুসন্ধান করিলেও এইরূপ অনেক কথা পাওয়া যায়।

তাঁহার 'প্রতিভা'—ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গের এই পাঁচটি সুসন্তানের সুলিখিত জীবন-কথা। এই বইখানি পড়িলেও, রজনীকান্তের মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়; তিনি যে যশ লাভের জন্য বা মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সাহিত্য-চর্চ্চায় লিপ্ত হন নাই, তিনি যে সাহিত্য-সাধনা দ্বারা বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; দেশপ্রীতি, দেশের প্রতি অনুরাগ যে তাঁহার কত ছিল, তাঁহার প্রাণ যে আধুনিক বঙ্গবাসীর জন্য কাঁদিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন;—"আজ পর্য্যন্ত গুরুগোবিন্দের মহামন্ত্রের মহীয়সী শক্তি বিরোধিত হয় নাই। সেই শক্তিতেই দেবকীর্ত্তির পবিত্র পঞ্চমন্দে অপূর্ব্ব বীরত্বের বিকাশ দেখা গিয়াছে। তিনি পাদেবাটেই সমস্ত বিষয় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশ কি স্বদেশবাসিগণের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উদ্দীপক হইবে না? যে জাতি শত আন্দোলনেও বিচলিত হয় না, শত উত্তেজনাতেও আত্মদোষ বিসর্জ্জন দেয় না, সেই জাতি স্বার্থপরতার মোহিনী মায়ার কুহকে না ভুলিয়া, পরানুগত্য, পরমুখপ্রেক্ষিতার আপাতমধুর ভীরুতার না দেখাইয়া এবং সর্ব্ববিষয়ে নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় না হইয়া, বিশ্ববিজয়ী পুরুষসিংহের প্রবর্ত্তিত পথানুসরণে বিশ্ব-সংসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।" তাঁহার ভাষার বৈশদ্য ও গাম্ভীর্য্য, এবং সুস্পষ্ট লিখন রীতি উদ্ধৃত উদাহরণ দুইটি হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

"সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস" গ্রন্থকার রজনীকান্তের কীর্ত্তি, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংরাজী সাহিত্যে সিলির "রোম-সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের" সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। ইহার রচনায় দুই বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছিল। গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন,—"আমি দুই বৎসরেরও অধিক কাল হইল এই ইতিহাস প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঘটনাচক্রের বহুবিধ আবর্ত্তনে আমার উদ্যম দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ ছিল। শেষে নানা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক সকল সাধনে পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। * * * এখন আমার কর্ম্ম শেষ হইল। আমি আমার যে যাহা ক্ষমতা অনুসারে যাহা করিতে পারিয়াছি, দুই বৎসর পরে এখন তাহা সহৃদয় পাঠকের হস্তে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করিলাম।" বিজ্ঞাপনে তিনি জানাইয়াছেন, "প্রসিদ্ধ পুস্তক রাজকীয় শাসনপত্র, লৌকিক বার্ত্তা প্রভৃতি হইতে ইতিহাসের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। কোন কোন বৈদেশিকের হস্তে ভারতীয় ঐতিহাসিক চিত্র স্থলবিশেষে অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা সে দোষ পরিহার করিতে যথাশক্তি যত্ন করিয়াছি। গ্রন্থে যে যে বিষয়ের সূচনা করা গিয়াছে, তাহা সত্য ও উদারতার সম্মান রক্ষা করিয়া তৎসমুদায়ের বর্ণনা করা হইয়াছে।" এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রজনীকান্ত তাঁহার ইতিহাসে নির্ভীক ভাবে, নিরপেক্ষ ভাবে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, কোথাও সত্য কথা বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যেখানে ইংরাজের দোষ পাইয়াছেন সেখানে তাহা স্পষ্ট

করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, আর যেখানে যুক্তিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীই লেখী, সেখানে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এই যুগের সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়া "বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস" প্রণেতা রমেশচন্দ্র বলিয়াছেন,—"History continues to be studied in English and little progress has been made in this subject in the Bengali language except in the matter of school books. Rajani Kanta Gupta's History of the Sepoy War is, however, valuable and meritorious Work, compiled from original sources". (R. C. Dutta's Literature of Bengal, p. 235.) উত্তরোত্তর কালে আমরা ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা যতই হৃদয়ঙ্গম করিব, ততই "সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে"র মর্য্যাদা বুঝিতে পারিব, ততই রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ হইব, কারণ তিনিই নবীনবঙ্গের প্রথম ঐতিহাসিক।

বঙ্গসাহিত্যে রজনীকান্তের স্থান ঠিক যে কোথায় তাহা আর কাহারো সহিত আর কোনও সাহিত্যিকের সহিত তুলনা করিলে, বা তিনি "বঙ্গসাহিত্যে গিবন" এ কথা বলিলে কিছু নির্দ্ধারণ করা হইবে না। সাহিত্যে তাঁহার স্থান নিরূপণ করিতে গেলে তাঁহার জীবন ও গ্রন্থের মূল নির্দ্দেশ করিতে হইবে, বর্ত্তমান ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে তাহারই চেষ্টা করিয়াছি। শুধু নিজে সাহিত্যসেবা করিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, দেশের সকল সাহিত্য-সেবীই তাঁহার নিকট উপদেশ ও আশার বাণী শুনিতে পাইত। ১৩০১ বঙ্গাব্দে সাহিত্যপরিষৎ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি নিউটার্ড সাহেব ও ৺ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তীর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন; এইরূপে গোপনেও তিনি মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী জাতির যে জাগরণ-ব্রতে তিনি একজন মহাপুরোহিত ছিলেন, সে ব্রত আজিও উদ্‌যাপিত হয় নাই। আজিও তাঁহার পরিশ্রান্তি ঘটে নাই, আজিও আমরা তাঁহার জীবনব্যাপী দারিদ্র্যের মর্ম্ম বুঝি নাই, তাই তিনি বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গালী জাতির কি পরিমাণ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করার সময় আমাদের এখনও আসে নাই; এবং তাহা আজ সুকরও নহে। তথাপি সকলেই এ কথা স্বীকার করিবেন যে তিনি বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে প্রাণপাত করিয়াছেন। ইতিহাস বিভাগে মৌলিক গ্রন্থ রচনায় বাঙ্গালীর এই নবযুগে তাঁহারই প্রথম প্রয়াস। যাঁহাদের যত্নে ও উদ্যোগে আজ সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত, তিনি তাঁহাদেরই একজন। তিনিই বঙ্গভাষাভাষী ছাত্রের হস্তে তাহার স্বদেশী "প্রতিভাষ্ণ উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি প্রথম দিয়াছিলেন, তাহাকে ভারত-গৌরব অযুত আর্য্য কীর্ত্তির পবিত্র কথা শুনাইয়াছিলেন। এই পবিত্র জাতির জন্য, এই বঙ্গভাষার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, আর কাঁদিয়াছিল বলিয়াই তিনি স্বাধীন বৈধয়বৃত্তি ও উচ্চপদের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া, স্বাস্থ্যের স্বজনের বিরাগভাজন হইয়াও সাহিত্য-সেবায় জীবন দিয়া গেলেন। তাঁহাদের যুগে যে সকল উদারচেতা হৃদয়বান্ ব্যক্তি ওজস্বিনী ভাষার সাহায্যে জাতির মধ্যে একটা গুরুবোচিত ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, রজনীকান্ত তাঁহাদের অন্যতম, এবং তিনি স্বীয় আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যাবজ্জীবন যথাশক্তি অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন; এ কথা—"সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস"-প্রণেতার গৌরবময় জীবনকথা—বঙ্গসাহিত্যে চিরকাল থাকিবে।

শ্রীপ্রেমরঞ্জন সেন গুপ্ত বি, এ,।

মজুর

(১)

তুমি শুধু কাজের মনীব প্রভু
মনের মনীব কখ্‌খন না হও,
তুমি শুধু কাজের কাজী ওগো
সুখের সুখী দুখের দুখী নও।
নাই কি কিছু দাবি দাওয়ার জোর ?
নাই কি কোনো স্নেহ মায়ার ডোর ?
সদাই তোমার দৃষ্টি কঠোর ঘেরি
ভুলেও কভু মিষ্টি নাহি কও
চিরদিনের কাজের মনীব তুমি
মনের মনীব কখ্‌খন না হও।

(২)

তোমার সনে মোদের কিগো হায়
নাইক কোনো পরাণ মনের যোগ ?
খোঁজ কি কভু রাখ মোদের প্রভু
কত মোদের দুঃখ জ্বালার ভোগ ?
তুমি শু কাজের হিসাব লও
তুমি শুধু নিজের কথা কও
হিসাব কভু লও প্রভু ভুলে
কত মোদের দেহ মনের রোগ,
তোমার সাথে মোদের কিগো হায়
নাইক কোনো পরাণ মনের যোগ ?

(৩)

পিতৃদায় আর মাতৃদায়ের কথা
মোদের বলি বুঝতে নাহি চাও,

ছেলের যখন এখন-তখন দশা
বোঝাই তোমা বুঝবে নাক তাও,
তবু তোমার কাজ-বাজান চাই
মেয়ের বিয়ের দিনেও ছুটী নাই
দুইটা টাকা আগাম দিতে হায়
পরাণ ধরে সাহস নাহি পাও
মোদের কোনো দুঃখ জ্বালার কথা
ভুলেও তুমি বুঝতে নাহি চাও।

(৪)

পায়ে ফেলে মাথার ঘামে মোরা
পরাণ পণে খাটি দিবস রাত,
গড়ি তোমার চৌখাহাল্লা বাড়ী
করি মোদের হৃদয় শোণিত পাত।
শুকনো কটা তোমার রুচি দিয়ে
বুকের শোণিত নিচ্ছ তুমি পিয়ে
বুক ঘাছা দেয় কোঁটা কোঁটা করে
তার দেওয়া কি শুধতে পারে হাত ?
বুকের শোণিত বিন্দু করি জল
পরাণ পণে খাটি দিবস রাত।

(৫)

করলা লোহা কাঠ পাথর আর ইটে
সারা জীবন করে' নাড়া চাড়া
তাদের মতন কঠোর হলে তুমি
হৃদয় হলো দয়া মায়া হারা
জীবন হতে জড়ই তোমার বড়
অধিক দামী তাদের মনে কর
মোদের বুকের রক্তপাতে পাতে
নীরস ছিল সরস হলো তারা
তুমি নীরস কঠোর হয়েই র'লে
করে' সদাই তাদের নাড়া চাড়া।

(৬)

চিরটি দিন সমান চলে নাক
এ কথা হায় কইগো তুমি বোঝো,
একটু যদি কাজের ত্রুটি ভাখো
নাইক ক্ষমা অন্ত জনে খোঁজো।

দেহ মনের তাগদ একই ভাবে
সারা বছর নিত্য কোথা পাবে ?
দিন মজুরী বিনা মেহন্নতে
ভুলেও কভু খাওনাত এক রোজও,
সকল দিবস দেহ মনের জোর
রয়না সমান কই গো তুমি বোঝো।

(৭)

যদ্দিন আছে শক্তিটুকু দেহে
তদ্দিনই ও রাখবে দয়া করে'
হলে পরে বুড়ো থুড়ো রোগা
পঙ্গু কুঁজো তাড়াবে ঘাড় ধরে'।

তার পরে হায় ভিক্ষা যেচে যেচে
কয়েকটা দিন রইতে পারি বেঁচে
জ্বালাতাবে রোগের যাতনায়
পথের ধারে রইব শেষে মরে'
তোমার সাথে চুকলে লেনা দেনা
ভুলেও কভু দেখ্‌বে দয়া করে ?

(৮)

সারা জীবন তোমার কাজে খাটি'
সবল দেহ মোদের ভেঙ্গে যায়,
কাঁচা কচি ছেলে গুলো তবু
পায় না কৃপা তোমার দ্বারে হায়।

হায় রে তোমার মহিষ গরু ঘোড়া
বুড়ো হলে কিম্বা হলে খোঁড়া
আশ্রয় ও দানার মাক কভু
বাজারবাজুর তাড়াও খেতে পায়,

মানুষ গুলো এতই খলো হের
যারা তোমার দ্বারেই খেটে খায়।

(৯)

এর চেয়ে যায় অনেক ছিল ভালো
পুরাকালের ক্রীতদাসের প্রথা,
পরিজনের মধ্যে ছিল তারা
স্নেহ পেত না পাক স্বাধীনতা।

ধুড়ো হলে মিলত তারো দানা
রোগে ওষুধ শীতে কাপড়খানা
হলে সবাই ফেলত আঁখির জল
প্রভুর বুকে থাকত জেগে ব্যথা
এর চেয়ে যায় অনেক ছিল ভাল
পুরাকালের ক্রীতদাসের প্রথা।

শ্রীকালিদাস রায়।

পরিণাম

রামপ্রসন্ন নিজের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা বড়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন মৈরাস্তের ঘনঘটায় তাঁহার চিদাকাশ তত্তই আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। মৃত্যু সন্নিহিত জানিয়াও কেহই সহজে নিজ পরিণামে অভ্যস্ত হইতে পারেন। রামপ্রসন্নও তাই একথা কোনমতেই বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না।

কেশব মানুষ, মানুষমাত্রেই মরণশীল অতএব কেশবকেও মরিতে হইবে। কলেজে ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্র পাঠকালে রামপ্রসন্ন বিচার পদ্ধতির এই উদাহরণটী পাইয়াছিলেন।

এতকাল ধরিয়া যেন মনে মনে ধারণা ছিল যে একথাটী কেবল সেই কেশবের বলাই প্রযোজ্য। কেশব তাঁহার ন্যায় অন্য মানুষ নহে কেশব একটা উদাহরণ মাত্র সুতরাং তাহার মরণশীলতায় কাহার কি আসে যায়। তাহার সত্তা অপর কোনও ব্যক্তির সত্তা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুতরাং মানুষ জাতির সাধারণ উদাহরণস্বরূপ কোন এক অজ্ঞাত কেশবের সহিত তাহার আর সম্পর্ক কি তাহার বাল্যকালে মা, বাপ, ভাই, বোন্ খেলার সামগ্রী কত কি ছিল। মা আদর করিয়া ভুলু বলিয়া ডাকিতেন। চাকর বাকর, দরিদ্র কোচ্‌ম্যান সকলেই "ভুলুবাবু" বলিত। কত হাসি খুসী আমোদ আহ্লাদের ভিতর দিয়া তাহার বাল্যকাল কাটিয়া গিয়াছে। ছেলেবেলায় তাহার একটা পাঁচরঙ্গা রবারের বল ছিল। বলটা যখন নূতন কেনা হয় তাহার সেই গন্ধটা ভুলুর বড়ই ভাল লাগিত। কেশবের সঙ্গে এমন একটা প্রিয়বস্তুর কখনও কোন সম্পর্ক ছিল কি? কেশব কি কখনও মা কাছে আসিলে এত আহ্লাদ অনুভব করিত? সেকি কখনও তাহার ন্যায় মার কোলে বসিয়া মার গলা জড়াইয়া চুমা খাইয়াছে? কলেজে পড়িবার সময় হোষ্টেলে কোনও দিন যাবারের বেবন্দোবস্ত হইলে গলাবাজী করিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে অস্থির করিয়া তুলিবার সময় বা তরুণবয়সে "প্রেমে" পড়িয়া হাবুডুবু খাইবার সময় এই কেশবচন্দ্রের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কোথাকার কোন কেশব কবে আদালতে বসিয়া দক্ষতার সহিত তাহার ন্যায় বিচার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে? কিছুই যাহার সঙ্গে মিল নাই আজ সেই কেশবের ন্যায় তাহাকেও মরণের বাধ্য হইতে হইবে এ কেমনতর সুবিচার হঠাৎ এমন একটা অন্যায্য কথা ধারণা করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

আচ্ছা যে লোকটাকে মরিতে হইবে তাহার নিজের মনে আপনা হইতেই একটা এসম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মান উচিৎ বটে। রামপ্রসন্নের মনে মনে হইতে লাগিল আর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের সকলের ন্যায় আমিও এযাবৎ মরণের কথা বুঝিতে পারি নাই। কই এখনও সর্ব্বক্ষণ মরিতে হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কই ভিতর হইতেও এসম্বন্ধে স্পষ্ট রকম একটা প্রত্যাদেশও পাওয়া যায় না। এমন অতর্কিতে মৃত্যু আসে কেন? না এমন একটা অনাসৃষ্টি কাণ্ড অনাসৃষ্টি বা বলি কিরূপে দেহের অবস্থা মনের অবস্থাই বা এমন হবে হইতেছে কেন? এযে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মৃত্যু চিন্তা অযাচিত কায়িক ও মানসিক সন্তাপ মনে এইরূপ ধারণা করিয়া রামপ্রসন্ন অনেকক্ষণ তাহা চিত্ত হইতে অপসারিত করিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু অন্যদিকে মন দিয়া অন্য বিষয় চিন্তা করিয়াও কোন ফলই হইল না। জোয়ারের জলের আবর্জ্জনার ন্যায়

এ দুর্ভাবনা যতই সরাইয়া ফেলিতে লাগিলেন মৃত্যুভয় ততই বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিকটে ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিল। শুধু কথা লইয়া ব্যস্ত না থাকিয়া যেজন্যই হউক বিভিন্ন বিষয়িনী আলোচনায় মন নিয়োগ করিলে দুশ্চিন্তা পরিহার করা যায় বটে কিন্তু রামপ্রসন্নের বেলায় সবই উল্টা হইয়া গেল পূর্ব্বে যে সকল চিন্তাপ্রবাহ অবসাদ কলুষিত মনকে সতেজ করিয়া মৃত্যুবিভীষিকা মনশ্চক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিত এখন আর সেগুলি কোন মতেই কার্য্যকারী হইল না পূর্ব্বে সরকারী কাজের চাকরীই তাহার জীবনের একমাত্র ক্ষেত্র ছিল এখন হাজার চেষ্টা করিয়াও সে পূর্ব্বানুরক্তি ফিরিয়া আসিত না। পূর্ব্বের "সু" গুলি কি এক অতিশাপে সমস্তই "কু" হইয়া গিয়াছিল। রামপ্রসন্ন স্থির করিলেন আবার একবার কাজে কর্ম্মে মন দিয়া দেখিবেন। আগে যাহা জীবনের চিন্তা ছিল তাহা কি এত সহজে ত্যাগ করা যায়। "নাই বলিলে দালের বিষও থাকে না।" দ্বিজ সাহেব এই মৃত্যুভয় প্রবাসের উপর নির্ভর করিয়া সকল দুশ্চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া আদালতে গিয়া মহা আড়ম্বরে নিজ কর্ত্তব্যে মনঃসংযোগ করিলেন। সেদিন ছোট আদালতে কি একটা মোকর্দ্দমায় আইন ঘটিত তর্ক লইয়া দুজনেক বসিয়াছিল দ্বিজ মহাশয় অস্থায়ীভাবে চতুর্থ জজের কার্য্য করিতেছিলেন তাহাকেও সেদিন বেঞ্চে বসিতে হইল। সহকর্ম্মীগণের সহিত কিছুক্ষণ আলোচনার পর রামপ্রসন্ন কাগজপত্র একপার্শ্বে সরাইয়া চেয়ারের হাতলের উপর বাহুর রক্ষা করিয়া বিচার গৃহে সম্মিলিত জনগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বসিলেন। চিন্তা সখী অলক্ষ্যে কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন দ্বিজবর তাহা জানিতেও পারেন নাই। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী জজের সহিত নিম্নস্বরে দুই একটা বিষয়ের মীমাংসা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন। মোকর্দ্দমার ওকালি আরম্ভ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই সবে মাত্র ঘাড় সোজা করিয়া সম্মুখভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন আর অমনি যেন জলধারার চিত্রপটের ন্যায় সমস্ত দৃশ্যখানি অকস্মাৎ কোথায় অপসারিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ অচঞ্চল ভাবে বসিয়া থাকিতেই পুনরায় উহাতে বিষম যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল যেন কিসে তাহার যন্ত্রাদি চর্ব্বণ করিতেছে। রামপ্রসন্ন মনোযোগের সহিত পার্শ্বস্থদের যন্ত্রণা বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতে করিতে মন হইতে এসব চিন্তা রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় মুখোমুখি সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তবে রামপ্রসন্নের আর ধাঁধাঁ লাগিতেছিল না তাহার জ্যোতিহীন চক্ষুর যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল রামপ্রসন্ন উন্মাদের ন্যায় আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন এখনও যে যমযাতনার সময় বড় আনাগোনা রহিয়াছে। তবে কি আদালতে বসিয়াও মৃত্যুভয় এড়াইবার উপায় নাই?

অন্য একজন বুদ্ধিমান সুচতুর আইনজ্ঞ বিচারককে আদালতে বসিয়া আবল তাবল বকিতে শুনিয়া তাঁহার সহযোগী অন্য মহাশয়গণ ও কেরাণী পেস্কারেরা সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। তিনি রোগ যন্ত্রণার মোকর্দ্দমায় যেই হারাইয়া এইরূপ প্রলাপোক্তি করিতেছেন তাঁহার রোগক্লিষ্ট মুখমণ্ডল হইতে তাহা বুঝিতে পারিয়া সকলেই বিশেষ দুঃখিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সেদিন দ্বিজবর আর সামলাইয়া লইতে পারিলেন না। যেন তেন প্রকারে সাক্ষীটা শেষ হইয়া গেলেই মোকর্দ্দমার অন্তদিন ধার্য্য করিয়া বিচারগৃহ ত্যাগ করিলেন। রামপ্রসন্ন বিষণ্ণবদনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বড় আশা ছিল যে চাকরী সংক্রান্ত কর্ত্তব্যে মন হইয়া থাকিলে মৃত্যুভয় হইতেও নিস্তার পাওয়া যাইবে কিন্তু সে আশাও ধূলিসাৎ হইল। সর্ব্বাঙ্গে আবর্জ্জনা জড়াইয়া বসিলেও যে মৃত্যু ভূতে ছাড়িয়া দেয় না এ সত্যের উপলব্ধি দ্বিজবর তালরূপেই করিতেছিলেন। অন্যমনা যাহাই বলুন না কেন ক্রমশঃ সবই অভ্যস্তের সহ হইয়া যায় মৃত্যুবিভীষিকায় এখন আর রামপ্রসন্নের ভয় হইত না। কিন্তু তাহাতেই বা সুনীতি কতটুকু? সর্ব্বক্ষণই মনে হইত যমদূতেরা ভয় দেখাইতেছে না বটে কিন্তু নজরবন্দী করিয়া রাখিতে ছাড় নাই। এক একবার আসিয়া নিজেদের আনাগোনা সংবাদ জানাইয়া যাইতেছে। যেন কোন অদৃশ্যশক্তি আমার পীড়াদায়ক অদৃষ্ট দৃষ্টি সময় অসময়ে তাহার প্রতি নিবদ্ধ

হইতে থাকে। অসুখটি বাড়াইবার এখনও হইতে আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই। পঙ্গুর ন্যায় সমস্তই নীরবে সহ্য করিতে হয়।

এই দৃষ্টি এড়াইবার আত্মরক্ষণের জন্য রামপ্রসন্ন আপনাকে নানারূপ প্রবৃত্তির আঘাত হইতে ঘিরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম আশ্রয় কার্য্যকারী হইয়াছিল বটে কিন্তু মৃত্যুর সম্মুখে সুখের প্রাচীর কতক্ষণ টিকিয়া থাকে? খানিকটা আপনা হইতেই ধসিয়া গেল কোথাও বা মৃত্যু ধ্বনিকার ছিদ্র দিয়া মৃত্যু আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। এত করিয়াও এই ভীষণ স্পর্শ অতিথিকে দূরে ঠেকাইয়া রাখা চলিল না।

গত কয় সপ্তাহ হইতে বিমলা মধ্যে মধ্যে তাহার সুখের সাম্রাজ্য সেই বৈঠকখানা ঘরে গিয়া বসিতেন। এই ঘরখানির সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধন করিতে গিয়া তাঁহাকে নিজ প্রাণ মূল্যস্বরূপ দিতে হইয়াছে। কি উচ্চ মূল্যে এই অকিঞ্চিৎকর সাজ মিটাইতে হইয়াছে তাহা মনে হইলে রামপ্রসন্নের মুখে বিষাদের কালিমা কণপ্রভার ন্যায় দেখা দিয়াই মিলাইয়া যাইত। ঘর সাজ হইতে গিয়া সেই ঘর হইতে পড়িয়া যাওয়াই যে কাল হইল তাহাই যে রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ।

একদিন রামপ্রসন্ন সন্ধ্যা করিলেন সুন্দর পালিস করা সাদের টেবিলটিতে কিসের একটা দাগ পড়িয়াছে এটা ওটা নাড়িতে চাড়িতেই বুঝিতে পারিলেন যে একখানা ফটো এলবামের ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত কবজাটা টানাটানিতে খুলিয়া গিয়াছে এ তাহারই আঁচড়। মনে পড়িল এই মূল্যবান আলবামখানি বেশ উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে হইয়াছিল। তার পর কত যত্ন করিয়া প্রিয়জনের আলেখ্যগুলি তাহাতে সাজাইয়া ছিলেন। আজ আলবামখানির দুর্দ্দশা দেখিয়া কন্যা ও তাহার সখিগণের উপর বড়ই রাগ হইল। তাহারাই ত যখন তখন এখানি লইয়া টানাটানি কাটাকাটি করিয়া থাকে তাহারা অসাবধান না হইলে এমন মোটা পাতাগুলি মলিন হইত না বইখানি ত এমন ছিঁড়িয়া যাইত না। রামপ্রসন্ন স্বহস্তে পাতাগুলি মুড়িয়া ঠিকমত সাজাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাহার মনে হইল আলবাম শুদ্ধ টেবিলটিকে এস্থান হইতে সরাইয়া ফেলিলে ইহা সহজে কাহারও চোখের উপর পড়িবে না টানাটানও বন্ধ হইয়া যাইবে। কোণে ব্রাকেটের উপর একটা ফুলদানি ছিল সেই দিকেই বিমলা টেবিলখানি লইবার মনস্থ করিলেন। চাকরকে ডাকাডাকি করিতে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। এস্থান পরিবর্ত্তন তাহাদের মনঃপুত হইল না তাহারা রামপ্রসন্নের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে তর্ক কলহে পরিণত হইল। রামপ্রসন্ন বড়ই রাগিয়া গেলেন। কিন্তু এ ক্রোধে বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না, আর কিছু না হউক তখনকার মত মৃত্যুর কথাটা আর মনে পড়িতেছিল না।

রামপ্রসন্ন ক্রোধবশে নিজেই টেবিলটা সরাইবেন স্থির করিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন তাহার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'না না তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না সরাইতে চাও এখনি চাকর ডাকিয়া সরাইতেছি মিছামিছি জোর করিয়া হাচড়া হাচড়ি করিলে হয় তো আবার বেদনা বোধ হইবে। রামপ্রসন্ন বেদনার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহার স্ত্রীর উক্তিতে পার্শ্বদেশের সেই সুতীক্ষ্ণ কামড়ানর ন্যায় যন্ত্রণার কথা মনে পড়িল। তাই ত সে যন্ত্রণা যে পূর্ব্বের মতই সমান ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে! মৃত্যু-দূত কিয়ৎক্ষণ না ডাকা দিয়াছিলেন যন্ত্র-আবরণের ভিতর দিয়া পুনরায় তাঁহার আকৃতি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যদি তো একটু দেখা দিয়াই অদৃশ্য হইয়া যাইবে কিন্তু সে ভরসা আর রহিল না। মনে হইল সম্মুখের ফুলদানির পাশে দাঁড়াইয়া যমদূত যেন তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। আর মিছামিছি চিন্তা করিয়াই বা ফল কি? ইহার হাত কিছুতেই এড়ান যায় না। লোকে মৃত্যুর পর যেমন জীবন হারায়, নিজ বাসগৃহে বৈঠকখানার পর্দ্দায় ধাক্কা পড়িয়া গিয়া সামান্য একটু আঘাত পাইলেও কি লোকে তেমনি জীবন হারাইয়া থাকে। আমি সত্য সত্যই প্রাণ হারাইতে বসি নাই? কি ভয়ানক কি ভয়ানক! না না এ সত্য নহে এ প্রমাণ করিতে পারি না এখনি লক্ষ্য হয়। তখনি যে লোকে হাসিতে থাকিবে! সত্য নয়! তবে

এ আশা এ বিভীষিকা হয় কোথা হইতে মিথ্যা বলিবার জো কি ?

রামপ্রসন্ন একাকী নিজ শয়নঘরে যাইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। এবার মরণের সহিত নির্জ্জনে বিশ্রম্ভালাপ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুই শব্দটী করিবার জো নাই। উপাধের মধ্যে কেবল এক একবার সেই ভীষণ আকৃতির প্রতি কটাক্ষ পাত ও সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠা !

(৭)

ইহার পর আর ৩ মাস রামপ্রসন্নের ব্যাধি এত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল যে সহজে তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি ধরিয়া উঠা সুকঠিন। এ রোগের কবল হইতে তাহার যে উদ্ধার নাই রামপ্রসন্ন তাহা নিজেও জানিতেন এবং ডাক্তার পরিচারক হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পুত্র কন্যা স্ত্রী পরিজন তাহারও উহা অবিদিত ছিল না। শুধে তাঁহার প্রাণ কবে যে মুক্ত হইবে কবে যে তিনি চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বয়ং রোগ-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবেন এবং অপর সকলকেও নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দিবেন এই প্রশ্নের সমাধানেই সকলের চিন্তায় বিষয়ীভূত হইয়াছিল। এখন রামপ্রসন্নের আর ভালরূপ ঘুম হইত না। আর প্রতিদিনই ফুলের ঘায়ের ঘটিত! ডাক্তার গায়ে সূঁচ ফুটাইয়া মর্ফিয়া পিচকারী করিয়া দিতেন কিন্তু তাহাতেও বড় উপকার দর্শিত না। প্রথম প্রথম ঔষধের মাত্রাধিক্য ভয়ে যেমন যেন এক প্রকার বিষাদী আসিত শরীর যেন অসাড় হইয়া পড়িত তখন তখন বেদনারও যেন একটু উপশম বোধ হইত কিন্তু নিত্য ব্যবহার ফলে ঔষধের শক্তি কমিয়া আসিতে লাগিল, যন্ত্রণা কমিবে কি সময়ে সময়ে পূর্ব্বের চেয়ে আরও অসহ্য বলিয়া মনে হইত। চিকিৎসকের উপদেশ মত মৃদুতর পথ্যের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল বটে কিন্তু রামপ্রসন্নের মুখে কিছুই ভাল লাগিত না পাচকের মুখে দিলেই বিষাদ বলিয়া বোধ হইত। সহজেই বমনোদ্রেক ঘটিত।

শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াদিও এখন আর আপনা আপনি হইতে চাহিত না। সে গুলি সহজ ভাবে সুসম্পন্ন করাইবার জন্য অনেক কল কৌশল জোড় যোড়ের আবশ্যক হইত ইহাতে রাম প্রসন্নের যে কি কষ্ট হইত তাহা আর বলবার নহে। একে স্বাভাবিক স্বাধীনতার অভাব তাহার উপর আবার অনেক সময় শয্যাদি কলুষিত হওয়ায় সর্ব্বদাই যেন কেমন একটা দুর্গন্ধ জনিত গ্লানি। সকলের চেয়ে সাহায্য ব্যতিরেকে কোন আবশ্যকীয় কার্য্য করিবার অক্ষমতাই। তাহার মর্ম্মন্তুদ বেদনার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল দুস্তর মরুর মধ্যে একমাত্র শান্তির প্রস্রবণ ছিল তাহার বয়স্ক ভৃত্য হারাধন। সেই তাঁহাকে এই সকল ব্যাপারে সাহায্য করিত এবং ঘর হইতে মল মূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া শিশুর ন্যায় অসহায় এই রোগাতুর প্রবিচারকটিকে বোঝাইয়া পুঝাইয়া রাখিবার ভার সেই অসঙ্কোচ গ্রহণ করিয়াছিল। হারাধন—পল্লী গ্রামের, কৃষক সন্তান। সহরে চাকরি করিতে আসিয়া মনের ঘাসীয় পুষ্টিকর খাদ্যে তাহার দেহের শক্তির ও অঙ্গের লাবণ্য পূর্ণ বর্দ্ধিত হইতেছিল, হারাধন কিটকাট বাবু গোছের চাকর ছিলনা বটে কিন্তু নিজের সামান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে সে ভাল বাসিত। সরলা শিশুসুখে আদেশ পালন করিয়া সে এই পাঁচ চাকরটি সহজেই মনিবের স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই মৃদু স্নেহ সুকুমার বৃত্তাটিকে যে তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া নানারূপ অপ্রীতিকর, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইত ইহাতে রামপ্রসন্ন মনে মনে ভাই বাধা পাইতেন।

একদিন কষ্টে সৃষ্টে শয্যা হইতে উঠিয়া সহজে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া দিব্যজ্ঞা দেখিলেন যে ধুতিখানি ভালরূপ কোমরে জড়াইয়া পরেন সে সামর্থ্যও আর তাহার নাই। নিজ মহাশয় প্রান্তিভয়ে একখানি গদি মোড়া আরাম কেদারার উপর এলাইয়া পড়িয়া বিশুষ্ক অধরের নিম্ন আন্দোলনের প্রতি হতাশভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন সেই মুহূর্ত্তে হারাধন দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই গীতের এক হাস্যকা টাঙা হাওয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর বড় ঘরে প্রবেশ করিয়া যেন একটু বাহিরের সজীবতা আনিয়া দিল। হারাধনের পরিধানে একখানি মোটাবুটি ডাহাও হাঁটুর নীচে অধিকদূর নামিয়া আসে নাই। গায়ে একখানি ফতুয়ের ন্যায় মোটা গামছা কেশা। তাহার

সবল বাহুদ্বারা বাৎসল্যের সমুদ্রের সংস্থিতি শেষীর উপর হইতেই বেশ স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল। ধীরে ধীরে ঘর হইতে ঔষধ প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য জলাই করা একটী বাস্ত্রী হাতে করিয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিতেছিল পাছে তাহার পদ শব্দে রোগাতুর প্রভুর ঘুমটুকু ভাঙ্গিয়া যায়। রামপ্রসন্ন কিন্তু ঘুমাইয়া পড়েন নাই। আসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি তাহাকে আসিতে দেখিয়া একবার ক্ষীণকণ্ঠে অস্পষ্ট স্বরে ডাকিলেন "হারাধন"—মনিবের অপ্রত্যাশিত আহ্বানে খানিক স্তব্ধ চমকিয়া উঠিল তাহার মনে ভয় হইল বুঝিবা সেবায় কোনরূপ ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া আজ তিরস্কার খাইতে হয়। সে তাহার সদা প্রস্ফুটিত কুসুম কোরকের ন্যায় সাদা দাঁতগুলি বহির্গত নির্মল মুখখানি সসঙ্কোচে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল আজ্ঞে আমায় কি ডাকছেন ?"

"আমি বলছিলাম বাবা, আমার জন্য তোমার কত তোষামোদ না করতে হয়, তা বাবা তুমি কিছু মনে করো না আমি ইচ্ছে করে তোমাকে কষ্ট দিই নে।

হারাধনের চক্ষুদ্বয় স্বাভাবিক সহানুভূতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার ঔষধালয়-প্রকাশিত অধর প্রান্তে শুভ্র গুচ্ছ-সমন্বিত উজ্জ্বল দন্তপাতি মুহূর্ত্তেক নয়ন পথে আবির্ভূত হইয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল। সে সম্ভ্রম বিনয়ের সহিত উত্তর করিল "সেকি কর্ত্তা বাবু আপনার শরীর অসুখ এখন সেবা কর্ত্তনাত কর্ত্ত কখন ? হারাধন ক্ষিপ্র হস্তে আপনার কাজ সারিয়া লইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। মিনিট পাঁচের মধ্যে শিকদানী প্রভৃতি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিল তিনি সেই একই ভাবে চেয়ার ঠেস দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। হারাধন মিত্য ব্যবহার্য্য তৈজস গুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেই রামপ্রসন্ন তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন "হারাধন উঠিয়া বসিবার সে সামর্থ্যও আর নাই। রামমনিয়াটাকেও আজ দেখিতে পাইতেছি না। তুমি আমাকে একটু তুলিয়া ধরত বাবা।"

হারাধন প্রভুর কোটিদেশ বেষ্টন করিয়া তাহাকে ধীরে চেয়ার হইতে উঠাইয়া এবং অনন্তর শয্যাদি ঝাড়া পূর্ব্বক পরিধান করাইয়া দিল। রামপ্রসন্নের আর আরাম কেদারা ভাল লাগিতেছিল না তাই তাহার নির্দ্দেশ মত হারাধন একরূপ কোলে করিয়াই একটী সোফায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে আস্তে আস্তে শোয়াইয়া দিল।

রামপ্রসন্ন বলিলেন "বেঁচে থাক বাবা এখন ঘরে একটু আরাম বোধ হচ্ছে। তুমি যেমন একাজ গুলি সহজে করিতে পার রামমনিয়ার দ্বারা তেমন হয় না।"

হারাধন মনিবের প্রশংসাবাদ শুনিয়া স্মিত মুখে কার্য্যান্তরে যাইতেছিল কিন্তু বিমলার নিঃসঙ্গ অবস্থা আর ভাল লাগিতেছিল না। হারাধনের উপস্থিতি যখন তাহার নিকট বড়ই শান্তিপ্রদ বলিয়াই মনে হইতেছিল। রাম প্রসন্ন বলিলেন হারাধন শোনো একবার ওই রামদিকের চেয়ারটা এখানে সরাইয়া এর উপর আমার পা দুইখানা তুলিয়া দাও ত। পাদুইটা উঁচুতে উঠান থাকিলে যেন একটু শান্তি বোধ করি। হারাধন চেয়ার খানি আনিয়া পায়ের নীচে রাখিয়া দিল। সে যখন পা দুখানি তুলিয়া ধরিয়া চেয়ারের উপর বিন্যস্ত করিতেছিল রোগীর মনে হইতেছিল যেন আজ অনেক লাঘব হইয়াছে।

বিমলা বলিলেন পাটা আরও একটু উঁচুতে রাখলে ভাল হয়। চেয়ারের উপর একটা বালিশ দিয়ে দাওত। হারাধন একটা বালিশ আনিয়া পায়ের তলায় রাখিয়া দিল। বালিশ রাখিবার পূর্ব্বে তুলাটি যতক্ষণ ধরিয়াছিল ততক্ষণ রামপ্রসন্ন যেন একটু বিশেষ আরাম অনুভব করিতেছিল কিন্তু বালিশের উপর পা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বস্তি বোধ কোথায় তিরোহিত হইয়া গেল। হারাধনকে ছাড়িয়া দিতে রামপ্রসন্নের আর মোটেই ইচ্ছা হইল না। রামপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন "হারাধন আজ তোমার বৈকালে কি কিছু বেশী কাজ আছে। হারাধন সহরে আসিয়া সভ্যতা শিখিয়াছিল—তাই সভ্যভাবে বলিল কাজ আর বেশী কি থাকবে কি করতে হবে বলুন।" "তবে কি কাজ আছে শুনি"।

"গিন্নিমা হুকুম করেছেন যে কাল সকালে উনান ধরাবার জন্য চারটি কাঠ কেটে রাখতে হবে তা সে কালকের কাজ

পরে ক্ষয়লেও চলবে দলা সলা করতে হবে এমন কোনও কথা নাই।"

"তা হ'লে আমার পা দুটো আর একটু উঁচু করে রাখতো—পারবে তো, বিশেষ কোনও কষ্ট হবে না?" "আজ্ঞে না—এ আর এমন কঠিন কাজটা কি? এই বলিয়া দ্বারাধন পা দুখানি উঁচু করিয়া ধরিল নিজ মহাশয়ের মনে হইতে লাগিল যে যতক্ষণ হইতে দ্বারাধন পা দুখানি তুলিয়া ধরিয়াছে ততক্ষণ হইতে আর কোন যন্ত্রণা নাই। রামপ্রসন্ন বলিলেন "আচ্ছা এইলে কাঠের ব্যবস্থা কি হইবে?"

সে জন্য আপনি ভাবিবেন না—কাঠ কাটার যথেষ্ট সময় আছে।"

নিজের কৃতকে সম্মুখে রাখিয়া পা দুখানি ধরিয়া থাকিতে বলিলেন এবং সে তাহার আদেশমত কার্য্য করিতে তাহার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। যতক্ষণ দ্বারাধন কাছে বসিয়া রহিল ততক্ষণ রোগ-যন্ত্রণা হ্রাস হইতেছে বলিয়া নিজ মহাশয়ের বোধ হইতেছিল।

ইহার পর হইতে রামপ্রসন্ন প্রায়ই দ্বারাধনকে তাহার কাছে আসিতে বলিতেন। সেও অবসর পাইলেই শয্যাপার্শ্বে বৃদ্ধস্বামীর কাছে আসিয়া তাহার পা দুখানি কাঁধের উপর রাখিয়া বসিয়া থাকিত। সেই সময় প্রভু ভৃত্যে নানারূপ সুখ দুঃখের কথা লইয়া আলোচনা চলিত। দ্বারাধনের প্রয়োগ ও যথার্থ পূর্ব ব্যবহার সত্য সত্যই রাম প্রসন্নের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। অন্য সকলের দ্বারা সাধ্যমত সেবা যত্ন ও যাহাতে সুবিধা করিয়া রাম প্রসন্নের বিরক্তি বোধ হইত বটে কিন্তু দ্বারাধনের স্ফূর্ত্তি ও সৈহিকশক্তি তাহার চিত্তে ঈর্ষাকলুষ স্পর্শ করিতে দিত না বরং মনে হইত তাহার সংস্পর্শে থাকিয়া নিজের যত দ্বারাও ফিরিয়া আইসে। তথাকথিত শিষ্টাচার রামপ্রসন্নকে চারিদিক হইতে একটা মিথ্যা জালে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। আসিয়া অবধিও সকলেই এবিষয়ে প্রসঙ্গ দিত বলিয়া রামপ্রসন্ন বড়ই মনোকষ্টে অনুভব করিত যে, যে বাঁচিবে না একথা কেহই প্রাণান্তে স্বীকার করিতে চাহিত না। সকলেই তাহাকে ভুলাইবারই বলিত, ফির হইয়া বিশ্রাম করিলে ও ডাক্তারের আদেশাদি যথাযথ পালন করিলে ব্যাধি অচিরাৎ আরোগ্য হইয়া যাইবে।

যে নিজ মৃত্যুর আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে, ঔষধ ও চিকিৎসার নিষ্ফলতা যাহার বুঝিতে বাকী নাই, ঔষধে রোগ ভোগ প্রবঞ্চিত হওয়া ছাড়া অন্যকোন ফললাভের যে আর আশা রাখে না তাহাকে আবার এইরূপ ছেলেভুলান করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করা কেন! রামপ্রসন্ন ভাবিতেন তোমরাও বুঝিয়াছ আমিও বুঝিতেছি তবে আবার প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া এবিদ্যা অভিনয়ের আবশ্যকতা কি? প্রাণের আশা যে আর নাই একথা যখন সকলেই জানিয়াছে তখন আর মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া সকলে মিলিয়া পাপের ভাগী হওয়া কেন? এই অনন্তের দুর্ভেদ্য রেখনী তাহার নিকট বড়ই পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল। কোথায় বন্ধুবান্ধব সকলে আসিয়া মরণাহত ব্যক্তির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিবে কোথায় তাহারা তাহাকে ভবের সুখদুঃখ চরণে বলিয়া মর্ম্মযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিবে। আবশ্যক হইলে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহার দুর্ব্বল মনে শক্তির সঞ্চার করিবে তা নয় এসব যেন শুধু সামাজিক ক্রিয়াকলাপে রঙ্গ দেখিতে আসাযাওয়া কেহ আসিয়া রোগীর ব্যবহৃত ঔষধিটার খুঁত ধরিতেছেন কেহ বা বালিসের ওয়াড়ের খুঁত কাটিতেছেন কেহ বা বড় জোর নূতন রকম রুচিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন কিন্তু ধর্ম্মরাজের অমূল্য সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কেহই সাহসী হইতেছেন না। একি কম দুঃখ? কম পরিতাপ। এই সব দেখিয়া রামপ্রসন্নের এক একবার বড় ত্রাস হইত মনে হইত একবার সকলকে বড় গলায় শুনাইয়া বলেন "যাহা সকল মিছা কথা বলিবার কি আর দরকার নাই? আমি যে আর দুদিন পরে মিলা যুঁকিব। এখন একবার ভুলিয়াও সত্য কথা বলিলেও কি মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হইয়া যাইবে? কেহ যমিনরূপে প্রবেশ করিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিলে শিষ্টাচারের ক্রটিতে উপস্থিত ভদ্রব্যক্তিগণের যেরূপ বিরক্তি বোধ হয় রামপ্রসন্নের মোহমায়ের এই ভাবহ ক্লেশকর

বয়স্থাও অনেকেই সেইরূপ একটা বিরক্তিজনক অসহ্যতা বলিয়া মনে করিতেছিল। রামপ্রসন্ন এযাবৎ যে অসহায় উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন এযেন তাহারই প্রতিশোধ। সাধারণও আর দয়া মমতা দেখাইবার অবসর নাই কেহই আর কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহার অবস্থা বুঝিতে প্রস্তুত নহে। যা একটু সহানুভূতি তাহা ভৃত্য হারাধনের নিকট হইতেই মিলে। সেই যা একটু তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারে। সেইজন্য আর সকলের চেয়ে হারাধন কাছে থাকিলেই তাঁহার মন বড় ভাল থাকিত, হারাধন কদিন প্রায়ই অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত রামপ্রসন্নের পা ধরিয়া বসিয়া থাকিত কখনও বা ঘাড়ে তুলিয়া লইত। বিব্রতা সে সময় শরীর বড়ই হাল্কা বোধ করিতেন যন্ত্রণারও যেন অবসান হইয়া আসিত। নিজের অক্ষমতায় হইলেও রামপ্রসন্ন হারাধনের ক্লান্তির কথা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। বার বার তাহাকে শুইতে যাইতে বলিতেন। হারাধনও তদবারই মাথা নাড়িত বলিত "কর্ত্তা আপনার শরীরটা এইতো একটু সুস্থ হয়ে আস্‌ছে মিছামিছি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! আমার ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হবে না।" প্রভু ভৃত্যের সহজ অনাবিল স্নেহ নিকনে ক্রমশই দৃষ্টীভূত হইতেছিল।

হারাধন এক একবার পল্লীসুলভ অভ্যাস বশে "আপনার বদলে তুমি মরিলেও ফেলিত—বলিত "কর্ত্তা বাবা তোমার যদি এমন কঠিন ব্যারাম না হত তাহলে এখুনি ঘুমুতে যেতাম তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ তা তোমার কাছে বসে থেকে কর্‌ব না?" সকলেই মিথ্যা স্তোকবাক্যে তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখার চেষ্টা করিত কেবল হারাধন কখনও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিত না। লোকে দেখার ভাবে রোগীর অবস্থা গোপন করিতে বা মৃত্যুশয্যার শায়িত দুর্বল ব্যক্তিটির প্রতি নিজের আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন রাখিতে সে মোটেই ভালবাসিত না। একদিন হারাধনের কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্যত্র কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় সে রামপ্রসন্নকে প্রবোধ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলিতেছিল "কর্ত্তা, কেবল কাজের গতিকে মাঝে মাঝে আপনাকে ছেড়ে উঠে যেতে হয় মরতেতো একদিন সকলকেই হবে তা আমি কিন্তু আপনার সেবার কসুর হতে দেবো না" আসন্ন মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া প্রভুর মনে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য হারাধনের মোটেই ছিল না সে কেবল বলিতে চাহিতেছিল যে তুমি যাই আর থাকুনে আমার সেবা কর্ত্তে কি কখনো কষ্ট হয়। আজ আমি কে তোমার একটু যা'হক বন্দোবস্ত করছি ভগবানের দয়ায় কেউ না কেউ আমারও শেষ দিনের খোঁজ খবর নিতে ভুলবে না। আত্মীয় বন্ধুর মিথ্যা সান্ত্বনা ও কপট সহানুভূতির ভাবে রামপ্রসন্ন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেন। এক একবার মনে হইত এই দুঃখসঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে তাহাকে দয়া মায়া দেখাইবার মত বুঝি একটী প্রাণীও নাই। শুধু ইচ্ছা হইত যে অসুখের সময় কেহ ছোট শিশুর মত তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া গায় হাত বুলাইয়া আদর যত্ন করিয়া তাহার রোগ শান্তির চেষ্টা করে। যৌবন দশায় পদার্পণ করিতেই যে মাতৃহারা এতদ্ধ বয়সে জননীর স্নেহচুম্বন তাহার আর কেমন করিয়া মিলিবে। ছেলেবেলার স্নান আদরকুড়ান অর্দ্ধ-পক্ক শুভ্র শঙ্খীমূর্ত্তি যৌবনা চোখের অল সাবেরের পক্ষে যে মোটেই শোভা নহে—এবয়সে এরূপ আবদারের কথা শুনিলে লোকে যে তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে—রামপ্রসন্নের ব্যাধি-ক্লিষ্টচিত্ত এসব জানিয়াও এ অভাববনিত দুঃখের বেগ কোনমতেই সম্বরণ করিতে পারিত না।

হারাধন মণিবের মনের অসহিষ্ণুতাভাবটুকু বুঝিয়া লইয়া যথাসাধ্য তাহার ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিত বলিয়াই তাহার সংসর্গ রামপ্রসন্নের পক্ষে এরূপ সুখকর বলিয়া বোধ হইত।

কিন্তু সকলের মনের একটাকে ভালা নাই কোন দিন বয়স বিস্তারের বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছে মনে হইতেছে—একবার বালকের ন্যায় গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া লই এমন সময় হঠাৎ খবর আসিল তাঁহার সহযোগী রমণবাবু তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন। হাসিকান্না যাহার নিকট সমানভাবেই বর্জ্জনীয় এমন ভাবহীন শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় ব্যক্তির কাছে স্নেহ আদরে আর

মর্য্যাদা কোথায়? রামপ্রসন্ন রমণবাবু আসিতেছেন শুনিয়াই তাড়াতাড়ি চোখের জল চাপিয়া ফেলিতেন! পরে তাঁহার প্রস্তরখোদিতবৎ ভ্রূকুটি-কুটিলমুখ দেখিয়া কেহই আর সে লুক্কায়িত দৌর্ব্বল্যের বিষয় অনুমাত্র জানিতে পারিত না। রমণবাবু আসিলেই রামপ্রসন্ন হয়তো সদ্য প্রকাশিত কোন হাইকোর্টের আপিলের রায় লইয়াই তর্ক তুলিয়া দিতেন। নিজে মোকদ্দমাটি বিচার করিবার সময় যে মতটী অবলম্বন করিয়াছিলেন হয়তো হাইকোর্টের সহিতের বিরুদ্ধে সেই মতেরই সপক্ষে দুচারিটি চোখা চোখা কথা প্রয়োগ করিতে ছাড়িতেন না। কিন্তু পরে নিজের এই কপটতা টুকুর জন্য এইরূপ হীন-ভাবে শত্রুর নিকট আত্মগোপন করার জন্য বড়ই দুঃখ হইত। বস্তুতঃ তাঁহার শেষের কদিন সত্যনিষ্ঠায় এই দম্ভ লইয়া মোটেই শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই।

শ্রীজগদানন্দ সরকার এম্, এ,

আবাহন

রাজ সভায় আজ ডাক্ পড়েছে
শাঁখ বেজেছে ওরে।
নূতন রবির নবীন কিরণ
কণক-বরণ
জেগেছে তোর তোরে।
ওরে কাজাল রাত্রি দিনে
রক্তের রেখা রাখ্‌লি চিনে
আজ কুমারের জয়-পতাকা
উড়েছে তোর দো'রে
আয় রে উদাস আয় রে পাগল
আয় ছুটে আয়
আশায় হৃদি ভরে
এই ডাকে আজ ঘুমাস্ যদি
না দিস্ যদি সাড়া
এই জীবনের নন্দনে তোর
জাগ্‌বে শ্মশান
গড়্‌বে ভীষণ কারা।

ভয় কিরে অচেনার পথে
রাজা যে তোর ছুটল রথে
মহাযানের যাত্রী নিয়ে
রাত্রি দিনে
চল্‌বে আপন হারা।
সঙ্গে মোদের ডেকে নে ভাই
মাঝ পথে আই
অচল হ'য়ে যারা।

মহারাজের পূজার ঘরে
বলির বাদ্য
বাজে রে আজ বাজে।
মায়ের হাতে ভীষণ খাঁড়া
দেখ না চেয়ে
রঙীন হ'য়ে রাজে।

আয় রে অবোধ আয় রে ত্বরা
জরাকে আজ দিস্‌নে ধরা
উদাসকে আজ প্রবোধ দিয়ে
আয় রে নিয়ে
আয় রে তোরই কাজে।
মহারাজার পূজার ঘরে
বলির বাদ্য
বাজে রে আই বাজে।

তোর, ঘরের মানুষ পড়ে' আছে
আলের পাছে
ওরে হতভাগা।
আই অলসের বুকের 'পরে
পাথর ছুঁড়ে
ঘা মেরে তুই জাগা।

পিতামহের মন্ত্রে প্রবীণ
আজ উদাত্ত জাগ রে নবীন
ধূলির পরে মাথাটী থা'র
পড়্‌ল মুয়ে
তারেও আজি রাগা
রাজার ডাকে হাজার দিকে
আয় রে ছুটে
আয় রে হতভাগা

মন্ত্রদেবের আশীষ ক'রে'
মাথার 'পরে
পড়্‌ল অযাচিত
সাত সাগরের ওপার হ'তে
আকাশ পথে
দূতটী উপনীত।

সমিধগুলি লুকিয়ে রেখে
রাখিস্ না রে ছায়ায় ঢেকে
বিকাশকে আজ পূর্ণ ক'রে'
আকাশ জুড়ে
কর রে প্রকটিত
সাত সাগরের ওপার হ'তে
আলোর পথে
দূতটী উপনীত।

শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার।

প্রেমের বাঁশী

(গল্প)

টিনাপু যখন তাহার জীর্ণ কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আবার উঠানে দাঁড়াইল, তখন জ্যোৎস্না আসিয়া সমস্ত পৃথিবীকে ভুলাইয়া ফেলিয়াছিল। জ্যোৎস্নার নীরব মধুরতার সহিত টিনাপুর প্রাণের নীরব প্রেমটুকু মিশিয়া গিয়াছিল। তাই সে এই অসীম নীরবতার অনন্ত ভাষা ও ধ্বনি বুঝিতে পারিতেছিল। এই নীরবতাই তাহাকে বলিল, "টিনাপু; তোমার অভাব ত যাইল না।"

দূর হইতে চির পরিচিত বাঁশীর ধ্বনি আসিল। বাঁশীতে যে গান ধ্বনিত হইতেছিল, টিনাপু তাহা শুনিল। ধ্বনি যেমন দূর হইতে আসিয়াছিল, তেমনি আবার দূরে, দূর হইতে দূরে, চলিয়া গেল।—তখনও একটু ভনা যাইতেছে। টিনাপু ভাবিল, "আলেয়ার প্রেম উপহার ত আজিও পাইলাম। জীবনের আর একটী দিবস ও আলেয়ার ভালবাসায় সফল হইল। কাল সকালে বাসরী আসিব।" জ্যোৎস্নায় ডুবিয়া, নীল আকাশের দিকে চাহিয়া টিনাপু তখন কি করিবার ভাবিল। সুন্দর চাঁদের দিকে চাহিয়া টিনাপু আলেয়ার কথা ভাবিতে লাগিল। ভাবিল—চাঁদ কেন টিনাপুর মনে আলেয়ার কথা আনে? আলেয়ার মুখচন্দ্রই কি আকাশের চাঁদকে সুন্দর করিয়াছে? চাঁদ বোধ হয় আলেয়াকে দেখিবার জন্যই আলেয়াকে ভাল বাসিবার জন্যই আকাশে উঠিয়াছে। আলেয়ার চিন্তায় বিভোর হইয়া টিনাপু যেন চাঁদকে একটু বিদায় করিল।

টিনাপু আলেয়াকে ভাল বাসিত, আলেয়া টিনাপুকে ভাল বাসিত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন ঘটার এক প্রতিকূল হইয়াছিল। দেশের এক অরণ্যময় প্রান্তে, সাধারণ ব্যবধানে উভয়ের বাস ছিল। টিনাপুর কেহই ছিল না, আলেয়ার পিতা ছিল। আলেয়ার পিতা তাহাদের এই বিবাহের প্রতিবন্ধক। একটী ধর্ম সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের সংস্কার এই যে এই সম্প্রদায়কে যিনি রক্ষা করিতে পারিবেন, পর জীবনে তাঁহার স্বর্গ হইবে। অবিবাহিতা বালিকাকে গ্রহণ করিলে, সম্প্রদায়ের কাহারো সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইত। যতদিন পুত্র না হইত, ততদিন স্বামী গৃহে বাস করিবার পদ্ধতি ছিল। পুত্র হইলে পিতা পুত্রকে পালন-পালন ও ধর্মে শিক্ষিত করিতেন, ও স্ত্রীকে এক নির্দিষ্ট আশ্রমে পাঠাইয়া দিতেন। স্বামীর সহিত তাহার কখন কোন সম্বন্ধ থাকিত না। কোন কোন ক্ষেত্রে পুত্র কখন জানিতেও পারিত না কে এবং কোথায় তাহার বাপ। সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই এই প্রথাকে সম্মানিত। আলেয়ার পিতা এই ধর্ম সম্প্রদায়ের নিকট কন্যাকে দান করিয়া পরকালে স্বর্গী হইবে, এই মত ভাবিয়াছিল।

টিনাপু ও আলেয়ার প্রণয় গভীর। বিবাহ তাহাদের মধ্যে ঘটিবে না, তাহারা জানিত। কিন্তু তাহাদের ভাল বাসা গভীর, সাদা থাকিতে ছুটিবে না। পিতার ভয় ও বাধায় আলেয়া টিনাপুর কুটীরাভিমুখে আসিতে পারিত না। অন্ধ ভালবাসার বশে তাহাদের মধ্যে একটী বন্দোবস্ত ঘটিয়া গিয়াছিল। রাত্রি অধিক অন্ধকার না হইতে একটী নির্দিষ্ট স্থানে, টিনাপুর বাটী হইতে অনতিদূরে অরণ্যের ভিতর কোন নির্দিষ্ট সময়, একটী বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে আলেয়া আসিত। আসিয়া এক বৃক্ষের শাখায় বসন্তে প্রচিত একগাছি ফুলের মালা টিনাপুর উদ্দেশে রাখিয়া বাঁশীতে একটী মধুর প্রেম গীতি ধ্বনিত তার পর পুনরায় বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে

গৃহাভিমুখে চলিয়া যাইত। বংশীধ্বনি টীলাপুর নিকট পৌঁছিত এবং সে মূর্চ্ছিত, আলেয়া আসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইয়া গেল। টীলাপু প্রভাতে গিয়া তাহা লইয়া আসিয়া পড়িত। নীরব নির্জ্জন অরণ্যে চাঁদকে সাক্ষী করিয়া, আলেয়া তাহার সরল সত্য প্রেমের নিদর্শন দিয়া আসিত। বিরহিণী আলেয়াকে দেখিবার জন্য চাঁদও যেন তাহার সৌন্দর্য্যের পূর্ণতায় নীরব দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। আলেয়া কখন কখন ভাবিত, আহা, ঐ চাঁদ, ও কি একা আমার মত, না, আর একটী চাঁদের অন্বেষণে ওটাও আমার মত ঐ আকাশের অনন্তে ঘুরে বেড়ায়।

সে রজনীতে টীলাপু বাঁশীর গান অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে পাইল। এতক্ষণ কোন দিন শুনিতে পায় না। টীলাপুর নিকট বোধ হইল, যেন ঘুরে, অনেক দূর চলিয়া যাওয়ার পর, বাঁশীর আওয়াজ একস্থান হইতে স্থিরভাবে আসিতেছে। টীলাপু একটু বিচলিত হইল।

সেই অরণ্যের ভিতর দিয়া আলেয়া যখন একা ঘরে ফিরিতেছিল তখন সে পশ্চিমধ্যে দুইটী শার্দ্দূল দেখিতে পাইল। তাহার পক্ষে অগ্রে বা পশ্চাতে যাওয়া কঠিন হইয়া পড়িল। আলেয়ার বোধ হইল তাহার বিনাশ নিশ্চিত। মনে হঠাৎ অতিশয় ভয় হইল। কিন্তু নিমিষে সে ভয় ভাব যেন কোথায় ভাসিয়া গেল। সে ভাবিল, যদি নিতান্তই মরিতে হয়, তবে যাহার চরণে আমার জীবন-যৌবন-মন সমর্পণ করিয়াছি, তাহাকে একবার স্মরণ করি, একবার তাহার উদ্দেশে বাঁশী বাজাইয়া শুনি করি। যদি সে কাছে থাকিত তাহা হইলে যেমন করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণের ভালবাসার কথা বলিতাম, তেমনি করিয়া একবার বাঁশী বাজাই, এ মরণেও শান্তি পাব।

আলেয়া বাঁশী বাজাইল। বাস্তবিক পক্ষে আলেয়া ভুলিয়া গেল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা কি! প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সে বাঁশী বাজাইল। সে ধ্বনি বায়ুতে মিশিয়া যেন সমস্ত দিকে গিয়ে পৌঁছিল, সমস্ত অরণ্যের প্রাণের ভিতর দিয়ে পৌঁছিল, বায়ুতে মিশিল, ফুলের গন্ধে মিশিল চাঁদের কিরণে মিশিল। শার্দ্দূলদ্বয় স্থির, নিষ্পন্দ রহিল—সে বাঁশীর সুর যেন তাহাদের মধ্যেও গিয়া পৌঁছিয়াছিল, যেন তাহাদিগকেও জয় করিয়াছিল। আলেয়া প্রেমে মাতিয়া বাঁশী বাজাইতে লাগিল যেন তাহার সমস্ত প্রাণ সমস্ত প্রেম টুকু সেই বাঁশিতে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রম করিল, তখনও আলেয়ার বাঁশী শুনা যাইতেছে টীলাপুর মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল তবেকি সে টীলাপুকে আহ্বান করিতেছে, না কোন স্থানে ক্লান্ত হইয়া গমন শক্তি রহিত হইয়াছে, না নির্জ্জন অরণ্যে পথ ভুলিয়া গিয়াছে। টীলাপুর মনে নানারূপ চিন্তা উদিত হইতে লাগিল কিন্তু চিন্তার বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া টীলাপু আলেয়ার উদ্দেশে তাহার ঘর হইতে বাহির হইল।

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া আলেয়ার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার জ্ঞান বুদ্ধি প্রায় যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। দূর হইতে টীলাপু দেখিল, অরণ্যের ভিতর একটু খোলা স্থানে এক সুদীর্ঘ বৃক্ষের নিম্নে আলেয়া দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেছে। সম্মুখে অনতিদূরে দুইটী শার্দ্দূল তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উপবিষ্ট, আলেয়াও তাহাদের দিকে স্থিরনেত্রে ছিল। টীলাপুর মন চিন্তাশক্তির পুনরাভির্ভাব হইল তখন সে স্থির করিল এরূপ অবস্থায় অগ্রসর বা কোনরূপ শব্দ করিলে আরও বেশী ক্ষতি হইবে, পরন্তু নিশ্চয় আলেয়াকে আক্রমণ করিবে। নানারূপ চিন্তা করিয়া টীলাপু আর অগ্রসর না হইয়া একটী বৃক্ষের অন্তরালে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল ও ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। আলেয়ার বাঁশী থামিল না শার্দ্দূলও নড়িল না। রজনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল।

প্রাতে আলেয়া গৃহে না দেখিয়া তাহার পিতা ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। আলেয়ার সন্ধানে বাহির হইয়া সেও সেই স্থানে আসিয়া নিঃশব্দে উপস্থিত হইয়া টীলাপুর মতই অনিমেষনয়নে এক স্থানে দাঁড়াইয়া, এক ভয়ানক অথচ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিল, এবং তখন, থাকিতে ডাকিতেছিল। কেহই কাহাকে দেখিতে পায় নাই।

সকলেই ভগবানকে ডাকিতেছিল। ডাকিতে ছিল না কেবল আলেয়া। সে যে কাল বাসিয়াছে, সে যে প্রেমের পূজা করিয়াছে, তাহার আর কাহারও শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন নাই। এ ভালবাসা আকাশের চাঁদ দেখিল, ধরিত্রী দেখিল, জগৎ জানিল, মানব জানিল, বনের শার্দ্দূল এ ভালবাসা জানিল। যদি সকলেই দেখিয়াছিল, তবে সবার সঙ্গে ভগবানও বুঝি দেখিয়াছিলেন। তিনি যে সর্ব্বময় অন্তর্য্যামী, দয়ালু করুণাময়। আর এ ভালবাসা যে সত্যহীন, ভয়হীন।

আলেয়া বাঁশী বাজাইতেই ছিল। তাহার বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী শেষ হইতে চলিয়াছিল—চন্দ্র ঢলিয়া আকাশের একদিকে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। শার্দ্দূলদ্বয় উঠিয়া একটীর পর আর একটী নিঃশব্দে অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া চলিয়া গেল! আলেয়ার বাঁশী থামিল না। বাজিতেই লাগিল।

ধীরে ধীরে টীসাপু অগ্রসর হইয়া ডাকিল "আলেয়া"—বাঁশী থামিল। আলেয়া উত্তর করিল টীসাপু,—আমি এতক্ষণ বড় আনন্দে ছিলাম। বাজিয়ে জানবার সময় এখানে দেখি, সামনে দুটো বাঘ লড়াই করে আকুলেতে মরেছে। মনে হল, আর উদ্ধার নেই। তারপর ভাবলাম যদি মরতেই হয়, তবে শেষ সময় একবার তোমাকে স্মরণ করে মরি,—যে বাঁশী বাজিয়ে আমার ক্ষুদ্র প্রাণের প্রেম টুকু তোমায় সমর্পণ করি, একবার আবার সেই বাঁশী বাজাই, মৃত্যুতেও সুখ পাব। তাই বাঁশীটি বাজালাম। তারপর আবার প্রাণ যেন ভয়ে উঠল। সব ভুলে গিয়ে নিজের বাঁশীতে নিজে মাতোয়ারা হলাম। মনে হল, তুমিই বুঝি সামনে রয়েছ, তোমাকেই বুঝি বাঁশী শুনাচ্ছি। কতক্ষণ বাজিয়েছি জানি না। তারপর তোমায় কেন যেন লক্ষণ-বাণ দুটো কই?"

টীসাপু বলিল, "কি সর্ব্বনাশ। এমনি কি করতে হয়। আমি কেবল তোমার কথা ভেবেছি আর ঈশ্বরকে ভেবেছি। আলেয়ার পিতা অগ্রসর হইয়া বলিল "টীসাপু; আলেয়াকে তোমার হাতেই সমর্পণ করলাম, গ্রহণ কর। আলেয়ার যে বাঁশী আজ বনের শার্দ্দূলকে জয় করেছে সে বাঁশী আমাকেও পরাভূত করেছে। যে প্রেম তোমাকে আজ রক্ষা করেছে, সেই প্রেম তোমায় চিরদিনই রক্ষা করবে। ভগবান্ নূতন দম্পতীকে সুখী ও চিরজীবী করুন।

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার।

প্রেমের পরশ

মনের মাঝে কান্না যখন জাগে
শক্ত তা'রে চুপ করিয়ে রাখা
চেষ্টা-করা মুখের হাসি তখন
দেখায় যেন মলিন, কালিমাখা—
মনের কাঁদন নীরব থাকে বটে
কথা তবু বন্ধ যেন রটে।

আড়াল দিয়ে মুছতে গেলে চোখ
আকাশ-আড়া বৃষ্টি আসে নেমে
প্রাণের কথা প্রাণের মাঝেই রয়
কেন এমন নিথর হয়ে থেমে?
কাঁদন সে যে হৃদয়-ছেঁড়া কাঁদন,
একে একে ছিঁড়ছে বুকের বাঁধন!

হাসি দিয়ে কান্না ঢাকা শুধু
নূতন করে আগুন জ্বালা প্রাণে
মনের সাথে যুদ্ধ করা মিছে
কান্না, কাঁদে ছন্দে ঘুরে গানে—
বাজার তারে যখন পড়ে ঘা
মন যে তখন মোটেই মড়ে না!

আসা-যাওয়া সেইত কালের গতি
তবে কেন কেঁদে ভাসাই ধরা?—
সে কথাটা আমিও বুঝি না
কেন মিছে মনকে পাগল করা।
তবে এটা খুবই সত্য ঠিক
মুখ চেয়ে মোর নয়ন নির্নিমিখ্।

সন্ধ্যা সকাল কেন আনা-গোনা
শুধু, মুখের একটী কথার আশে
হঠাৎ যদি চোখো চোখিই হয়
সোহাগ ভরে একটু খানি হাসে—
একটু হাসি একটী মধুর কথা
তাতেই ঘরে' প্রাণের গোপন ব্যথা।

আদর করা সোহাগ করা শুধু'
বুকের 'পরে আমায় টেনে নিয়ে
হাতের 'পরে হাত দু'খানি রেখে
কথায় কথায় শতেক চুম্বা দিয়ে
ধন্য আমি,—আমার প্রাণের কাছে
প্রেমের পরশ নিবিড় হয়ে আছে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

পল্লী-সমস্যা

জলকষ্ট ও তাহার প্রতিকার প্রার্থনা

১। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কলিকাতায় চা, কয়লা, রবার ও বস্ত্রের ব্যবসা করিয়া বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন এবং আমরা নদীয়া-বাসিগণ বিলক্ষণ ঠাট্টাবিদ্রূপে, পরনিন্দায়, পরচর্চ্চায় কালযাপন করিতেছি তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। ঐ সমস্ত কারবারে প্রথমতঃ ৫।৭ জন উদ্যমশীল যুবক লিমিটেড কোম্পানী গঠনপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের নিকট সেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ অর্থে রীতিমত কারবার চালাইতেছেন এবং প্রতি বৎসর শতকরা ১৫৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশ বিতরণ করিতেছেন। উক্ত প্রকারে ছোট ছোট লিমিটেড কোম্পানী গঠন পূর্ব্বক কি প্রকারে নদীয়া-কেলার এই পল্লীগ্রামের জলকষ্ট নিবারিত হয় কারবারে প্রথমতঃ ৫।৭ জন উদ্যমশীল যুবক লিমিটেড ও বৎসরে লাভবান হইতে পারেন তাহার আভাসমাত্র কোম্পানী গঠনপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের নিকট সেয়ার বিক্রয় করিতেছি।

২। যদিও যশের বহু স্থান এখনও জলাভাব, কিন্তু নদীয়া জেলার বহু পল্লীতে ইতিমধ্যে সুপেয় জলের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এই জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অধীন লোকনাথপুর গ্রাম ৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির আকর স্থান ছিল। বন-জঙ্গলহীন শুষ্ক খট্‌খটে গ্রামখানি, পল্লী-জনের অমায়িক সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ও গ্রামের উত্তর প্রান্তে দোহার বিলের কাকচক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল, সুপেয়, স্বাস্থ্যকর জল ভিন্ন-গ্রামবাসী ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত রোগীগণকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য আকর্ষণ করিত। চতুর্দ্দিকে অনুমান ১৫।২০ ক্রোশের মধ্যে এরূপ স্বাস্থ্যকর স্থান না থাকায়, প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে: বিল দোহারটী কোম্পানীর নীলকুঠিয়াল সাহেবগণ এই বিলের পূর্ব্বপার্শ্বে রাজপ্রাসাদতুল্য কাছারী ও কুঠিবাড়ী, বাগান ও বজরাখানা ইত্যাদি প্রস্তুত পূর্ব্বক লোকনাথপুরকে অধীনস্থ মোলটি নীলকুঠীর সদর করিয়া স্বপরিবারে বসবাস করিত; গ্রামে মাইনর স্কুল, হাটবাজার এবং প্রবাসী ও বাসিন্দা বহু ভদ্র-লোকের বাসস্থান ছিল। বিস্তীর্ণ বিলের চতুষ্পার্শ্বে নবদুর্ব্বাদল সদৃশ গালিচার ন্যায় তৃণাবৃত করিত। ঐ বিলের জলকর সাধারণ প্রজার একমাত্র সম্পত্তি ছিল; তাহারা প্রতি সন ৮ঐপঞ্চমীর দিনে চাক্, পলো ইত্যাদি লইয়া মহামহোৎসব করিত এবং জলের পাঁক, দাম্-শেওলা ইত্যাদি অপসারিত করিয়া বিল পরিষ্কার রাখিত। পরে উক্ত নীলকুঠী বন্ধ হইলে অনুমান ১২৯৪ সালে গ্রামের পত্তনীদার প্রজা জব্দ করিবার জন্য জলাশয়ের পার্শ্বের জমি কোন অনুন্নত ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করেন। জলকরের যাবেক প্রজাগণ তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপে যাহাদের নাম পত্তনীদার সেরেস্তায় প্রচলিত রাখিয়াছিল তাহাদের সকলের স্বত্ব কালবশে এক ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও ঐ জলকর উক্তপার্শ্ববর্ত্তী জমি অনুন্নত প্রজার সহিত অধীন বন্দোবস্ত করায় সেই ব্যক্তি জল ও স্থলের কর্ত্তারূপে গ্রামের একমাত্র জলাশয়টী ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন এক্ষণে বিলের চতুষ্পার্শ্বের সেই তৃণের গালিচা নাই তৎপরিবর্ত্তে রীতিমত চাষ আবাদ হইতেছে; জলে এক ব্যক্তির স্বত্ব থাকায় সাধারণ প্রজার সাধ্য কি যে দাম্‌শেওলা অপসারিত করে? বরং স্নানকার্য্যে বিলম্ব ঘটিলে মৎস্য ধরা সন্দেহে তিরস্কারভাজন হইতে হয়। ফলে ঐ বিলের জল এক্ষণে অস্বাস্থ্যকর আগাছায় পরিপূর্ণ এবং ভেলা জমির চাষে বিল ক্রমেই ভরাট হইতেছে। এক্ষণে প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে গ্রামবাসিগণের জলকষ্টের সীমা থাকে না, চৈত্র-বৈশাখ মাসে একমাইল দূরবর্ত্তী ডুগডুগীর বাজার হইতে স্নান ও পানের জল সংগৃহীত হয়। এরূপ-অবস্থায় গ্রামবাসিগণের সুখ দুঃখ সহজেই অনুমেয়।

৩। উক্ত দুর্গতি নিবারণ উদ্দেশ্যে গ্রামের কয়েকজন সহৃদয় সুধী সন ১৩১৯ সালে পূজার ছুটীতে সভা করিয়া স্থির করেন (ক) উক্ত বিলের জলকর জলকর মকরারী জমা দেওয়া হউক, (খ) জলকরের প্রজা ও চাষীপ্রজার নিকট হইতে সত্ব ছাড়াইয়া লওয়া হউক (গ) লিমিটেড কোম্পানী গঠন করিয়া টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক অনুন ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে বিলের পঙ্কোদ্ধার করা হউক। তদনুসারে প্রায় ২৫০৲ টাকা ব্যয়ে গ্রামস্থ দুই জনের নামে উক্ত বিল মকরারী জমা দেওয়া হইয়াছে এবং নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে সাহায্য চাওয়ায় তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন্, সি, মুখার্জ্জি বাহাদুর স্বয়ং উক্ত বিল পরিদর্শন পূর্ব্বক ১৯১৩। ৩০ শে তারিখের ৩৩১নং পত্র দ্বারা একালীন এক সহস্র টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন।

৪। উক্ত বিলে ৩০/০ বিঘা জমি আছে; এবং সংলগ্ন ২০/০ বিঘায় একটী খাল সহ মোট ৮০/০ বিঘা জমি বার্ষিক ৩৯৲ টাকা খাজানায় মকরারী জমা দেওয়া হইয়াছে। বিলের ৩০/০ বিঘার মধ্যে ৩০/০ বিঘা পরিমাণ জমি হল সহযে মুক্তা ব্যয়ে পঙ্কোদ্ধার করিতে পারিলে বিলের জল-কর বার্ষিক ১০০০৲ টাকা আয় হইবে; এবং চতুর্দ্দিকে যে পাকবাটী উঠান হইবে তাহাতে ১০ সহস্র নারিকেল বৃক্ষ রোপন করিতে পারিলে তাহাতে অন্যূন ৫০০৲ টাকা বার্ষিক আয় হইতে পারে। লোকনাথপুরের নিকটে কাদীপুর, পলাশপুর, বলদীয়া, বড়কলুয়া, ছোট দুধপাতিলা প্রভৃতি গ্রামে ভরাটি বিল, পুষ্করিণী ও নীচু জমির অভাব নাই। গ্রাম-হিতৈষী ৫।৩ জনের সাহায্য লইয়া, যদি কোন উদ্যোগী মহাত্মা লিমিটেড কোম্পানী গঠন করেন,

ও ৫,১০,১২৫,৪০৲ টাকা হিসাবে সেয়ার করিয়া টাকা তুলেন তবে অতি সহজে টাকা উঠিতে পারে। লিমিটেড কোম্পানীর পক্ষে জলাশয়ের জমি সংগ্রহ (acquire) করা অতি সহজ—যদি সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে যে উদ্যোগী বর্গের উদ্দেশ্য ও পন্থা সৎ তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিমিটেড কোম্পানীর দ্বারা দেশের জলকষ্ট দূরীকরণ ও সঙ্গে সঙ্গে লাভবান হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য ব্যাপার হইবে না।—

৫। উপস্থিত লোকনাথপুর বিলের অংশীদার গণের ও বিলেচ্ছুবর্গ তাঁহাদের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া অনেকের নিকট নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও অপবাদ ভোগ করিতেছেন। উদ্যোগী বর্গের কাহারও কাহারও স্বার্থ হানী হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা পশ্চাদ্‌পদ হইতেছেন, ফলে কোম্পানী গঠনে বিষম অন্তরায় উপস্থিত। যদি কোন মহাত্মা তাঁহার যত্ন চেষ্টা দ্বারা বিলটী পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন; যদি কোম্পানী গঠন করিবার পক্ষে বিন্দুমাত্র সাহায্য করেন তবে উদ্যোগীগণ চির কৃতজ্ঞ হইবে। যদি বিধির বিধানে তাহা ঘটিয়া না উঠে তবে যে কোন ধনী ব্যক্তি উক্ত প্রকারে স্বল্প মাসহারায় বরিদ মূল্যে লইয়া বিলের পঙ্কোদ্ধার করুন ও নিজে লাভবান হউন গ্রামবাসী গণ মুখের জল ভিন্ন আর কিছুই প্রত্যাশী নহে।

অতঃপর বিষয় মিত্র সাধক কারীর নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীভবানন্দ চক্রবর্ত্তী।
উকিল, চুয়াডাঙ্গা (নদীয়া)

পল্লী-সমস্যায়

জলকষ্ট ও তাহার প্রতিকারের উপায় *

শ্রীযুক্ত ভবানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে সমুদায় প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সমীচীন ও প্রণিধানযোগ্য। ইউরোপের জার্ম্মাণী এবং আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে সমবায় বা কো-অপারেটিভ প্রথা অনুসারে কলিকারি ক্রয়, গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি অনেক ব্যয়সাপেক্ষ কার্য্য অনায়াসে সম্পাদিত হইতেছে। আমাদের দেশেও সমবায় প্রথায় (co-operative system) প্রচলন হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে উহা বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত প্রচারিত করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্গের কৃষি-ঋণদান-সমিতি তন্তুবায়-যৌথ-কারবার, ধীবর-সমিতি, দুগ্ধ-সরবরাহ সভা, সমবায়-ভাণ্ডার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই অঞ্চলে সমবায় প্রথা অনুসারে গৃহনির্ম্মাণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে। আমাদের মনে হয় যদি Bengal Co Operative Organisation Society চেষ্টা করিয়া এই স্থানে

* বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালেশ্বর দাশ পল্লী সমস্যার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লোকনাথপুর গ্রামবাসীর বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সা, প্র, চ,

গ্রামবাসীদিগের মধ্যে একটী জমিদারী-সমিতি গঠন করিয়া এই বিলটী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার পক্ষোদ্ধার করেন, তাহা হইলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লীবাসীগণের জলকষ্ট নিবারণ হয় এবং সেই সঙ্গে সোসাইটীও লাভবান্ হইতে পারেন। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে ভবিষ্যৎ উৎপন্ন দ্রব্যের একটী খতিয়ান দেওয়া গেল :—

১। মৎস্যের চাষ—বিলটীর জলকর হইলে সোসাইটীর প্রথম কর্ত্তব্য মৎস্যের চাষ করা। দৈনিক যে মৎস্য ধরা হইবে, তাহা স্থূলপার্শ্ব গ্রামে সমস্ত বিক্রয় করা সম্ভবপর না হইলেও, সমিতি অনায়াসে কলিকাতায় চালান দিতে পারেন। লোকনাথপুর (দর্শনা) হইতে কলিকাতা রেলে মাত্র ৩ ঘণ্টার পথ। ট্রেণেরও সুবিধা আছে। সুতরাং মৎস্যের চাষ খুবই লাভজনক হইবে।

২। বিলের চতুষ্পার্শ্বে নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষ রোপণ করিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার অতিতরকারির চাষ করিয়া লাভবান হওয়াও সুনিশ্চিত।

৩। শুনিতে পাই লোকনাথপুর কিছুদিন পূর্ব্বেও বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল; কিন্তু এখন জলকষ্টের জন্য পল্লীটী শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং বিলটীর পক্ষোদ্ধার হইলে গ্রামবাসী সমিতির নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবে এবং আশা করি এই মহৎ উপকারের প্রতিদান স্বরূপ পক্ষোদ্ধারের খরচের কিয়দংশ তাঁহারা সাধ্যানুসারে ন্যূনকল্পে ৵০ পয়সা অথবা ঐ মূল্যের কেত্রফাত যে কোন ফসল সমিতিকে দিতে রাজী হইবেন।

উপরের প্রস্তাবিত লাভের হিসাব হইতে আমরা আশা করিতে পারি যে সমিতি যাহা ব্যয় করিবেন, তাহা তাঁহা অনায়াসে ৩।৪ বৎসরের মধ্যে উঠাইয়া লইতে পারিবেন। কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। আজ প্রায় এক বৎসর হইল Bengal Co-operative Organisation society জন্ম হইয়াছে; কিন্তু আমরা জানি না কোন প্রকার প্রকৃত কাজ হইয়াছে কি না। পল্লী ব্যবস্থার Organisation society'র এই কার্য্যক্ষেত্র। এ কার্য্যটী সম্পন্ন হইলে, একাধারে পল্লীবাসীর জলকষ্ট নিবারণ হইবে, গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ তিরোহিত হইবে এবং সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র বিশেষ প্রসারলাভ করিবে। আমরা সাদরে এ বিষয়ে সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীকান্তেশ্বর দাস।
(সম্পাদক, কো অপারেটিভ জৌর্ণাল,
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা।

ভোগ

বাড়িয়া কাটিয়া পড়া
শোভাময় দিশা—
জাগে তার ক্ষুধা জাগে
জাগে তার তিষা।

আন বর্ণ, আন গন্ধ,
আন আন গান,
আন মধু, আন শীধু,
তৃপ্ত কর প্রাণ।

দাও তোজ দাও দাও
শ্রবণে নয়ানে
অধরে উরসে ভুজে
যে চাহে যেখানে।

এ কিরে প্রমত্ত প্রাণে
দুর্দ্দম লালসা!—
ভুঞ্জিবে সবায়? কারো
ছাড়িবে না আশা!

লোকে তারে মূর্খ বলি করে পরিহাস।
সে বলে, "দুয়ারে মোর মুক্তি-পরকাশ!"

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

পল্লীচিত্র

[১]

"পরঃ ভ্যাদাৎ পরো যজ্ঞাৎ পরাৎ পরতরশ্চ যঃ।
অনাদিরাদি র্বিশ্বস্য তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥
অন্ন প্রাণেন্দ্রিয়মনো রস প্রাণ বিবর্দ্ধনঃ।
যো ধারয়তি ভূতানি তস্মৈ প্রাণাত্মনে নমঃ॥
যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বঃ যঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥"

মহাভারত; শান্তিপর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়।

পল্লী-প্রকৃতি। (*Nature*)

সুখলাভই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমরা সর্ব্বদা বাসনার বশে ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তির অদম্য-তাড়নে নানাবিধ বিষয়-সম্ভোগে সুখলাভের প্রত্যাশায় সংসারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছি। যেমন বহু পশুর কণ্ঠবন্ধন রজ্জু একটি দীর্ঘ বন্ধন রজ্জুতে গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ সাংসারিক প্রাণী মাত্রেরই মন এই সম্ভোগ বাসনায় গ্রথিত আছে। এই বাসনা উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, মণিমাণ্ড, দুঃস্পর্শ, হেমময় দীর্ঘদণ্ড-সম্পন্ন, প্রত্যক্ষ গোচর উল্কাই দীপশিখার তুল্য। তাহার আলোকও নিবিড় জলদজালে সৌদামিনী সদৃশ ক্ষণস্থায়ী ও চঞ্চল।

তবে বাস্তবিক সুখ কোথায়? জীবদেহের উন্নতি সাধন বা তৃপ্তির জন্য নানাবিধ উপায় অন্বেষণ বা আমাদের বৃত্তি বৃত্তির পরিচালন ও প্রসারণ, কিছুই আমাদের সুখ লাভের হেতু বা উপায় নহে। আত্মার-বিকাশ ও তাহার পরিবর্দ্ধন ও আত্মার বিকাশেই সুখ। পুষ্টি-সাধন ভিন্ন সুখ কোথাও বা কিছুতেই নাই। আত্মা একটি জীবন্ত ও বাস্তব পদার্থ। জীবদেহ অপেক্ষা আত্মা-সাধনেই আত্মার বিকাশ। আত্মা অধিক জীবন্ত। আত্মার বিকাশ; পরিবর্দ্ধন ও পরিপুষ্টি সাধন হয়। জীব-দেহের পক্ষে অন্ন, বস্ত্র, ব্যায়াম প্রভৃতি যেমন প্রয়োজনীয়, আত্মার সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য, ধর্ম্ম-সাধন, মনুষ্য মাত্রেরই তেমনি প্রয়োজনীয়। উপাসনা, বন্দনা, প্রার্থনা, প্রভৃতি ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ। কবিতা তাহার ধর্ম্মসাধনের সহায়। হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, উহাকে মধুময়, কোমল ও রমণীয় করিয়া তোলা কবিতার কার্য্য। কবিতা হৃদয় নিহিত গূঢ়, মহান্ ও সুন্দর ভাবগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। যাহা নীচ জঘন্য ও মলিন তাহা ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলে। কবিতার সাহায্যে আমাদের হৃদয় বিস্তৃতি লাভ করে। পবিত্রতার স্বর্গীয় সমীরণ উহাতে অবাধে সঞ্চারিত হয়। কবিতা আমাদিগকে প্রকৃতির সহিত পরিচয় করাইয়া দেয় ও প্রকৃতির নীরব ভাষা আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়: বেদ, উপনিষদ্ পুরাণাদি সংকাব্য আমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যানুভবশক্তি জাগরিত ও স্ফুরিত করিয়া আমাদিগকে প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দেয় ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও শোভা, রস ও ভাবে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে।

"The grand power of poetry is its interpretative power; by which I mean not a power of drawing out in black and white an explanation of the mystery of the universe, but the power of so dealing with things, as to awaken in us a wonderfully full, new and intimate sense of them and our relation with this sense is awakened in us, as to objects without us, we feel ourselves to be in contact with the essential nature of these objects, to be no longer bewildered and oppressed by them; but to have this secret and to be in harmony with them; and this feeling clams and satisfies us as no other can. Poetry indeed

interprets in another way besides this ; but one of its two ways of interpreting or exercising its highest power is by awakening this sense in us. I will not now inquire, whether this sense is illusive, whether it can be proved, not to be illusive, whether it does absolutely make us possess the real nature of things ; all I say is that poetry can awaken it in us, and that to awaken it is one of the highest powers of poetry. The interpretations of science do not give us the intimate sense of objects as the interpretations of poetry give it ; they appeal to a limited faculty and not to the whole man." *

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও শোভা।—মনুষ্যের বাহিরে যখনই যাইবে, দেখিবে প্রকৃতিদেবী প্রতি ঋতুতে, কি প্রভাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি সন্ধ্যায়, কি অর্দ্ধনিশার ঘোর অন্ধকারে, কি জ্যোৎস্না-স্নাত রজনীতে, নব নব ও নানাবিধ লাবণ্যপূর্ণ মনোহর বেশে সুসজ্জিত হইয়া, বীণা-উদ্যুক্ত নিকেতনে, নানা রাগরঞ্জিত, হীরক খচিত সিংহাসনে বিশ্ব-সম্রাজ্ঞীর ন্যায় উপবেশন করিয়া বীণা ও বংশীবাদন দ্বারা আমাদের চিত্ত বিনোদন করিতেছেন। দেবীর সুপবিত্র, সুমধুর কমনীয় সৌন্দর্য্য ও শোভা, দেবীর সুমধুর স্বর্গীয় বীণা ও বেণুধ্বনি তোমার বহির্নিন্দ্রিয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ন্যায়, অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়া তোমার হৃদয় আকুল করিয়া দিবে। তুমি তখন আপনাকে আপনি ভুলিবে ; বিশ্বও তখন তোমার নিকট তুচ্ছ বোধ হইবে।

ভগবান রামচন্দ্র তাঁহার বনবাসকালে অবস্থান কালে প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, —"পর্ব্বতের (চিত্রকূট) কি আশ্চর্য্য শোভা ; ইহাতে বিহঙ্গেরা নিরন্তর বাস করিতেছে ; শৃঙ্গসকল আকাশস্পর্শী ; গৈরিকাদি নানাপ্রকার ধাতু আছে বলিয়া ইহার কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোন স্থান পীত, কোন স্থান মণিরাজি রাগযুক্ত, কোথাও নীলকান্ত মণির ন্যায় প্রভা, কোথাও বা স্ফটিক ও কেতক পুষ্পের ন্যায় আভা এবং কোন কোন স্থানে নক্ষত্র ও গ্রহদের সদৃশ জ্যোতিঃও দৃষ্ট হইতেছে। এই পর্ব্বতে অধিরূঢ় নানাপ্রকার মৃগ এবং বাঘ ও ভল্লুক ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। আম্র জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, ধব, অঙ্কোল, তিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, অরিষ্ট, ধব, মধুক, তিলক, বদরী, আমলক, নীপ, বেত, ইঙ্গুদ ও নীলক প্রভৃতি ফল পুষ্প সুশোভিত, ছায়াবহুল মনোহর বৃক্ষ সকল বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত সুরম্য শৈল প্রদেশে, কিন্নর মিথুন, পরম সুখে বিহার করিতেছে। অদূরে বিদ্যাধরীদিগের ক্রীড়াস্থান। ঐ স্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও রত্না সকল বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন আছে। কোথাও জল-পাত, কোথাও উৎস, কোথাও বা নিঝর, সুতরাং শৈল যেন, মদপ্রাবী গাত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গুহামুখ হইতে সমীরণ স্রাবতর্পণ কুসুমগন্ধ বহন করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। জানকি! তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত যদি আমি বহুকাল এই পর্ব্বতে বাস করি, শোক কোন মতেই আমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না এই ফল পুষ্পপূর্ণ, বিহঙ্গকুল কূজিত সুরম্য গিরিশৃঙ্গে আমি যথেষ্টই প্রীতিলাভ করিতেছি। তুমি আমার সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে থাকা, মন ও দেহের অনুকূল নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়া কি আনন্দিত হইতেছ না? * * * * এই পর্ব্বতে রজনীতে ওষধি সমূহ স্বকান্তি প্রভাবে, অগ্নি-শিখার ন্যায়, প্রজ্বলন্ হইয়া থাকে। ইহার চতুর্দ্দিকে নানাবর্ণের বিশাল শিলা সকল রহিয়াছে, ইহার কোন স্থান, সুখ সদৃশ ও কোন স্থান উষ্ণ তুল্য। ঐ সমস্ত শিলা সমূহের আস্তরণ। উহা স্বয়ম্ভু, পুরাণ, কুর্ম্মপৃষ্ঠ ও উৎপলে বিরচিত হইয়াছে।" ঐ দেখ, উহারা ফল ভক্ষণ করিয়াছে এবং পত্রের থালা দলিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রিয়ে! বোধ হইতেছে যেন, এই চিত্রকূট পৃথিবী ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ইহার শিখর অতি সুন্দর। কুবের নগরী অলকা যাহা, ইন্দ্রপুরী নলিনী ও উত্তর কুরুকেও অতিক্রম করিয়া ইহা সুশোভিত আছে।" * * *

* Essays, Literary & critical, by Mathew arnold.

"অয়ি প্রিয়ে! এই স্থানে মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইতেছেন। এই নদীর পুলিন, অতি রমণীয়, ইহাতে হংস ও সারসেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে। তীরে ফল-পুষ্পপূর্ণ, নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ইহার অবতরণ পথ অতি মনোহর। একণে তটের সন্নিহিত জল অত্যন্ত আবিল হইয়াছে এবং তৃষ্ণার্ত মৃগেরা আসিয়া উহা পান করিতেছে। ঐ দেখ, জটাচীরধারী ঋষিগণ, যথাকালে এই নদীতে অবগাহন করিতেছেন। উর্ধ্বাহু মুনিরা সূর্য্যোপস্থান এবং অন্যান্য সকলে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তীরস্থ বৃক্ষ সকল, পুষ্প ও পল্লবে অলঙ্কৃত, উহাদের শাখাগ্র বায়ুভরে পরিচালিত হইতেছে; তদর্শনে বোধ হয় যেন পর্ব্বত স্বয়ং নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। মন্দাকিনীর কোন স্থানে জল যেন মণির ন্যায় নির্ম্মল, কোন স্থানে পুলিন, কোন স্থানে বহুসংখ্যক সিদ্ধপুরুষ, কোন স্থলে বা পুষ্প রাশি; ঐ সকল পুষ্প বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া বারম্বার জলে নিপতিত হইতেছে। চক্রবাক সকল কলরব করিয়া পুলিনে আরোহণ করিতেছে। প্রিয়ে! বোধ হয় মন্দাকিনী ও চিত্রকূট পূর্ব্ববাসও তোমার দর্শন অপেক্ষা অধিকতর সুখাবহ। তপ, সংযম ও আত্মিক সম্পন্ন নিষ্পাপ সিদ্ধেরা ইহার জলে প্রতিনিয়ত স্নানাদি করিয়া থাকেন, তুমি সতীর ন্যায় আমার সহিত ইহাতে অবগাহন এবং ফল ও ফুলের পত্র সকল উত্তোলন কর। তুমি বিহঙ্গম সকলকে পৌরজনের ন্যায়, পর্ব্বতে অযোধ্যার ন্যায় এবং মন্দাকিনীতে সরযূর ন্যায় অনুমান কর। * * * এই নদীতে ত্রিকালীন স্নান বনের ফল মূল ভক্ষণ ও মধু পান করিয়া আমি আজ তোমার সহিত অযোধ্যা বা রাজ্য কিছুই অভিলাষ করি না"—প্রকৃতির এমনই মোহিনী শক্তি বটে!

প্রকৃতি।—প্রকৃতি লোক লোচনের সম্মুখেই সুবিস্তৃত রহিয়াছে ও চারিদিকে সৌন্দর্য্য ও শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। উহা আমাদের হৃদয় ও মনের অত্যন্তরেও বিস্তৃত থাকিয়া ধীরে ধীরে আমাদের কাছে সেই সনাতন সত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছে।

প্রকৃতি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বচৈতন্যময়; সেই অনন্ত-সুন্দর, সচ্চিদানন্দ বিশ্বপতির আধার। উহাই তাঁহার বিশ্বরূপ। যে চৈতন্যময় চৈতন্যশক্তি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত, তাহা সূর্য্যকিরণের ন্যায়, প্রকৃতির সর্ব্বত্রই চৈতন্যময় রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। পরমাত্মা দেব উহাতে বিলীন হইয়া আছেন। সেই স্বয়ংপ্রকাশ, শুদ্ধ জীবরূপে নহে, সর্ব্বত্রই, সর্ব্বতে, নদীতে, প্রস্রবনে, বনস্থলিতে, এমন কি ক্ষুদ্র পুষ্পেও তিনি চৈতন্যশক্তি সম্পন্ন হইয়া প্রকাশিত হইয়া আছেন। এবং সকল পদার্থকেই নবীন, সবল, সুপুষ্ট ও সুন্দর করিতেছেন। সর্ব্বদাই তাঁহার বিকাশ ও সত্তা উপলব্ধি করা যায়। পুষ্প যেমন বৃন্তের সহিত, বৃন্ত বৃক্ষের সহিত, বৃক্ষ মূলের সহিত, মূল মৃত্তিকার সহিত, মৃত্তিকা পর্ব্বতের সহিত, পর্ব্বত প্রকৃতি মণ্ডলের সহিত, সংশ্লিষ্ট ও শৃঙ্খলিত রহিয়াছে, সেইরূপ অনন্ত ব্যাপী পরমাত্মার সহিত জীবগণ ও প্রকৃতির প্রত্যেক অণু, পরমাণু, সংশ্লিষ্ট ও শৃঙ্খলিত হইয়া আছে। সূত্রগ্রথিত মণি সমূহের ন্যায় কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সমস্ত বিশ্ব ও ভূত সমূহ তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে। প্রকৃতির সহিত মানবের অন্তঃপ্রকৃতির চিরন্তন ঐকতানিক বন্ধন বর্ত্তমান আছে। তাহার ফলে যতদিন না পরস্পরে মিশিয়া উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন প্রকৃতির ভাব নিচয়, মানব মনে সঞ্চালিত হইয়া উহাতে তাহা প্রতিফলিত হইয়া থাকে এবং দয়া, ভক্তি, প্রভৃতি আমাদের মনোবৃত্তি সকল, স্ফূরিত, পরিপুষ্ট ও সুদৃঢ় হইয়া আমাদের হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

নগরের সাময়িক জীবনে আমরা ঐ ঈশ্বরের প্রকৃতি রূপিনী, ঐ প্রেমময়ী প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য, মনোহারিণী শোভা ও সুমধুর রস উপভোগে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকি। তথায় ধন, মান, পদ ও যশোলাভের নিরন্তর ইচ্ছাও চেষ্টা আমাদের হৃদয় ও মন অত্যন্ত কলুষিত ও কদর্য্য করিয়া ফেলে ও আমাদের সমস্ত চিন্তা ও উচ্চাভিলাষকে জগতের সৌন্দর্য্য দর্শন ও জগতের হৃদয়ের যে সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইতে দূরে রাখিয়া দেয় আমরা এত অন্ধকারময়, হীন, নীচ ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ি, যে আমাদের উপর প্রকৃতির নৈতিক প্রভাব প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছুই দেখিতে পাই না।

এ বিষয়ে পল্লীবাসিরা সর্ব্বাধিক ভাগ্যবান্। পল্লীগ্রামই অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মিলন স্থান। এইখানেই উহারা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করে; এইখানে প্রত্যেকে বিশ্ব উপযোগী ভাষা দেখিতে পায়; এবং পরস্পরের সংস্পর্শে কি পরমানন্দই না লাভ করে! পল্লী-বাসীরা প্রকৃতির মধ্য দিয়া ভগবদালাপে সমর্থ হয়। এবং কবির ন্যায় মনে করে;—

"যেথায় তাহারে পাই কাছে,
যত কাছে দরাজল, যত কাছে ফুল-ফল,
যত কাছে বায়ু জল আছে।
যেমন পাখীর গান, যেমন জলের তান,
যেমনি এ প্রভাতের আলো,
যেমনি এ কোমলতা, অরণ্যের শ্যামলতা,
তেমনি তাহারে বাসি ভালো।
যেমন সুন্দর সন্ধ্যা, যেমন রজনীগন্ধা,
শুকতারা আকাশের গায়ে,
যেমন সে অকলুষা, শিশির নির্ম্মল উষা,
তেমনি সুন্দর হেরি তারে।
যেমন বৃষ্টির জল, যেমন আকাশ তল,
সুখ মুক্তি যেমন বিশাল,
যেমন তটিনী-নীর, ঘটচ্ছায়া অটবীর,
তেমনি সে মোর আপনার।
যেমন নয়ন ভরি, অশ্রু জল পড়ে ঝরি,
তেমনি সহজ মোর প্রীতি;
যেমন রয়েছে প্রাণ, যাগুতরে বর্ম্মখান,
তেমনি রয়েছে তার প্রীতি।"

পল্লী-জীবনই আমাদের বিশুদ্ধ অনুরাগ ও আকাঙ্ক্ষার পরিপক্কতা লাভ করিবার উপযুক্ত ভূমি। আমরা যতই প্রকৃতি দেবীর আহ্বানে ও আকর্ষণে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও সাধীন্য লাভ করি, ততই ক্রমে ক্রমে আমরা ঈশ্বর সাক্ষাৎ-কার লাভের পথে অগ্রসর হই এবং পরিশেষে এই সৌন্দর্য্যময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সত্তা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারি। তখন আমরা উদ্ভূত পর্ব্বতমূলে তত্ত্বকথা শুনিতে পাই ভ্রমর গুঞ্জিত, কোকিল কূজিত, নানা ফলপুষ্প পরিশোভিত, বায়ু-সঞ্চালিত বনস্থলীতে তাঁহারই সুগন্ধি নিঃশ্বাস ও বংশীধ্বনি শুনিতে পাই; স্নিগ্ধ শ্যামল ক্ষেত্রে তাঁহারই সুকোমল শ্যামচ্ছবি, কলনাদিনী তরঙ্গিণীর তরঙ্গাভিঘাতে, প্রস্রবণের ঝর ঝর ঝঙ্কারে তাঁহারই মধুর নৃত্য ও উত্তাল তরঙ্গমালা সমাকুল সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গে তাঁহারই সেই আদিম তাণ্ডব নৃত্য, প্রস্ফুটিত কুসুমে তাঁহারই সুন্দর মুখখানির সুকোমল হাস্য বিভাস দেখিতে পাই। তখন কবির ন্যায় বলিতে ইচ্ছা করে;—

"শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে ধরণীভূমি
মানবের পুরাতন বাস গৃহ তুমি।
নিস্তব্ধ নির্জ্জীব বহু সৌম্যের মতন,—
তোমার মুখশ্রী খানি নিত্যই নূতন
প্রাণে, প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল।
তুমি দাও ছায়া খানি, দাও ফুল ফল,
দাও বস্ত্র, দাও শয্যা দাও স্বাধীনতা;
নিশিদিন মর্ম্মরিয়া কহ কত কথা,
অজানা ভাষার মন্ত্র; বিচিত্র সঙ্গীতে
গাও জাগরণ গাথা; গভীর নিশীথে,
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মত
জননী বক্ষের; বিচিত্র হিল্লোলে কত
খেলা কর শিশু সনে; বৃদ্ধের সহিত
কহ সনাতন বাণী বহু সমাতন অতীত।"

"I have felt
A presence that disturbs me, with the joy
Of elevated thoughts; a sense sublime
Of something far more deeply interfus-d,
Whose dwelling is the light of setting *Suns*,
And the round Ocean, and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man
A motion and a spirit, that impels,
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things."

ক্রমে যখন আমরা প্রকৃতির সহিত আরো ঘনিষ্ঠ হই এবং তাঁহার সাযুজ্য লাভে সমর্থ হই, যখন আমরা প্রকৃতির ভিতরে নিজ্ঞ বাস করি এবং প্রকৃতিও আমাদের অন্তঃ-

প্রকৃতির সহিত মিশিয়া যান্ তখন আমরা নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্রোত দেখিতে দেখিতে স্তব্ধপ্রাণে স্থিতি লাভ করি। এই স্থিতি ও বিস্মৃতিই সকল সাধনার চরম ফল ও যোগের চরম সীমা।

কবি বলেন :—

"What soul was his, when from the naked top
Of some bold head-land, he beheld the sun,
Rise up and bathe the world in light! He looked
Ocean and earth, the solid frame of earth
And ocean's liquid mass, in gladness lay
Beneath him:—Far and wide the clouds were touched
And in their silent faces, could be read
Unutterable love. Sound needed none
Nor any voice of joy; his spirit drank
The spectacle; sensation, soul and form,
All melted into him; they swallowed up
His animal being; in them did he live,
And by them did he live; they were his life.
In such access of mind, in such high hour,
Of visitation from the living God,
Thought was not; in enjoyment it expired."

কি সুন্দর! কি মহান কি সুখের ও আনন্দের অবস্থা!

পল্লী-বালক ও প্রকৃতি।—পল্লী-বালকগণও খেলিতে খেলিতে প্রকৃতি মাতার স্নেহময়তা আকর্ষণ করে। বালকগণ কখনও তরুলতা-কুসুমশোভিত উদ্যানে কখনও সুবিস্তীর্ণ হরিত শ্যামল প্রান্তরে, কখনও সুমধুর পক্ষী সমাকীর্ণ বনভূমিতে কখনও পর্ব্বতোপত্যকায়, কখনও পর্ব্বত নিঃসৃতা তরঙ্গিণী তীরে কখনও বা তরুর নদী প্রস্রবণ পার্শ্বে খেলা করে। তাহাদের রক্তাভ গণ্ডস্থল আনন্দে আনন্দময় সমুজ্জ্বল চক্ষু আরো উজ্জ্বল, সুগঠন সুন্দরদেহ, চিন্তারেখা শূন্য সুবিস্তীর্ণ ললাট। কেহই বলিতে পারে না, তাহারা নিজেও জানে না যে তাহারা কি খেলা করিতেছে। প্রকৃতি দেবী মাতার ন্যায় তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাহাদের হৃদয়ে তাঁর হৃদয়ের ন্যায় অমৃতধারা ঢালিয়া দেন; তাঁহার প্রীতি ও সৌন্দর্য্যে তাহাদের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়। তাহাদের খেলার ভিতর হইতে সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা, মহত্ব, সাধুতা প্রভৃতি দিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাহাদের হৃদয় গঠন করিতে থাকেন। 'স্বভাব' বালকের ভিতর দিয়াই মানব প্রকৃতি দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে বিকাশিত হয়। কেন না "Child is the Father of Man."

২। নগর ও পল্লীগ্রাম

পল্লীবাসীগণের মধ্যে পশুপ্রীতি বড়ই সুন্দর। তাঁহারা নিজের গৃহপালিত পশুগণের আত্মীয় স্বজনের ন্যায় যত্ন ও আদর করিয়া থাকেন। মনুষ্যের আদর, সেবা ও যত্ন গৃহপালিত পশুরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। পশুরাও তাহার প্রতিদান করিয়া থাকে। পল্লীবাসী গৃহস্থ ও আশ্রমবাসীদের মধ্যেই কেবল উহা দেখিতে পাওয়া যায়। কণ্বাশ্রমে শকুন্তলার পশুপ্রীতি অতুলনীয় ও অনির্ব্বচনীয়।

পল্লীবাসীর মধ্যে তাঁহার পল্লীভবন প্রীতি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সেইখানে তাঁহার জন্ম, সেইখানে তিনি তৎপার্শ্ববর্ত্তী তরু-লতাদির সহিত ক্রমে ক্রমে বড় হইয়াছেন। উহাই তাঁহার স্নেহমমতা, সুখদুঃখের কেন্দ্রস্থান। নগরে সেরূপ নহে। বাহির হইতেই তিনি সাধারণ ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। তিনি বাড়ী, বা গৃহ পরিবর্ত্তন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা দুঃখিত হন না। কিন্তু পল্লীবাসীর পক্ষে তাহা অন্যরূপ। তিনি মনে করেন যে, সেই তৃণ-শ্যামল প্রান্তরভূমি, সেই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গ্রাম্যপথ, সেই পথবিহীন বনস্থলী, সেই বাতাসে নিত বৃক্ষ সকল, সেই নানারঞ্জিত পক্ষবিশিষ্ট বিহগাবলীর সুমধুর কাকলী, সেই নানাবিধ সুবর্ণপূর্ণ মনোহর কুসুম, সেই কোকিল মধুর ধ্বনিত হরিৎপুষ্প বেষ্টিত কুঞ্জবন, সেই মনোহারিণী লহরীলীলা পরিশোভিত তরঙ্গিণীর বক্ষঃস্থল, সেই স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকা, সেই অভ্রভেদী সুমহান্ পর্ব্বত, সেই অমৃতরশ্মি-চন্দ্রমা, সেই স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্র, সেই বিশাল সুনীল আকাশ, সমস্তই যেন তাঁহার। বাসভবনের প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড, তৃণ কুটীরের প্রত্যেক তৃণ কুশ, সুমভূমির প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক জীবজন্তু, প্রত্যেক

অণু পরমাণু, যেন তাঁহার। ঐ সকল সম্বন্ধনে তাঁহার যথার্থ আনন্দ; ঐ সকলের প্রতি তাঁহার স্নেহ মমতা, তাঁহার অস্থি মজ্জার সহিত মিশিয়া থাকে। ঐ সকলের সহিত তাঁহার আশৈশব খেলাধূলা, সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার স্মৃতি, ভগ্ন-গৃহোপরিস্থিত অশ্বত্থবৃক্ষের শিকড়ের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত জড়াইয়া থাকে। তিনি প্রবাসে বা সুদূর বিদেশে যাইলেও বা চিরদিনের জন্য তাঁহার সেই প্রিয়তম পল্লীভবন হইতে বিতাড়িত হইলেও ঐ সকল তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিলুপ্ত হয় না। একটি পক্ষীর স্বর, একটি ক্ষুদ্র পুষ্প, আকাশের একটি মেঘখণ্ড, একটি ক্ষুদ্রতারকা, ভিতরের বা বাহিরের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা, সুদূর প্রবাসেও তাঁহার পল্লীভবনের জন্য, তাঁহার হৃদয়কে ব্যাকুলিত করিয়া ফেলে। তিনি বিদেশে, প্রবাসে থাকিলেও তাঁহার হৃদয় প্রতিনিয়ত তাঁহার পল্লীভবনের ভিতরেই বাস করে এবং তাঁহার ঐ সমস্ত শৈশব-পরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্যে ডুবিয়া থাকে।

যাঁহারা নগরবাসী, যাঁহাদের হৃদয় নাগরিক ব্যাপারে ময়, তাঁহারা ঐ পল্লীভবনের ঐ পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য কোন ক্রমেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমার অনেকে নগরবাসী হইলেও তাঁহাদের হৃদয় কেবলমাত্র নাগরিক সংবাদ, নাগরিক দৃশ্য, নাগরিক আচার ব্যবহার লইয়া ব্যাপৃত থাকে না। সময়ে সময়ে তাঁহারা পর্ব্বতে, নদীতীরে, সমুদ্রোপকূলে বা পল্লীগ্রামের নির্জ্জন স্থানে ছুটিয়া গিয়া বাস করেন—আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যখন তাঁহারা পর্ব্বতোপরি উচ্চ হইতে উচ্চতর ও উচ্চতম প্রদেশে আরোহণ করিতে থাকেন, যখন তাঁহাদের প্রতিপাদ-বিক্ষেপে চতুর্দ্দিকের দৃশ্যাবলী ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, নিম্ন পুরাতন বনভূমি, মোহন-কুঞ্জকাননের ন্যায় এবং নদী সকল রজতসূত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয় তখন তাঁহাদের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়? যখন তাঁহারা সুবৃহৎ নির্জ্জনতার চিহ্নস্বরূপ উচ্চতম শিখরে গিয়া দণ্ডায়মান হন, যখন কোন অজ্ঞাত বায়ুমণ্ডল হইতে বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ বায়ু তাঁহাদের উপর দিয়া বহিয়া যায়, যখন তাঁহারা অতীত স্মৃতির ভাবনায় মগ্ন থাকেন, তখন কি তাঁহাদের মনে হয় না, যে এই স্থির সুদৃঢ় পর্ব্বত যাহার উপর তাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন, কেবল তাহা নহে, পার্শ্ববর্ত্তী ঐ সকল কঞ্চুলীযুক্ত পর্ব্বতশ্রেণী তাহাদের বন্ধুর চূড়া, তাহাদের সুরম্য গুহা, কত কাল হইতে এইরূপ থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। মানবের শিল্প-কৌশল, এই অবিনশ্বর কারুকার্য্যের নিকট কি ছার! কি অসার! যখন তাঁহারা এই বিপুল প্রভাবশালী জগৎকে দেখিয়া চিন্তা করেন, তখন কি তাঁহাদের মনে হয় না যে উহা ও রহিয়া যাইবে, কিন্তু আমরা বা আমাদের দুরাশা, আমাদেরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমাদের সম্মাননা কোথায় কত দিন থাকিবে? সেই সামাজিক জীবনের সঙ্কীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র, তাহার সেই আইন কানুন, তাহার জন্য তাঁহাদের চেষ্টা, পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা, মর্ম্মব্যথা, যাহা তাঁহাদের অস্তিত্বের জীবনীশক্তিকে প্রতিনিয়ত বিনষ্ট করিতেছে, কি অসার। কি তুচ্ছ! এইরূপ কত গভীর কত অনির্ব্বচনীয় ভাবের তরঙ্গ, তাঁহাদের হৃদয়ে আঘাত করিতে করিতে তাঁহাদিগকে জীবনের উদার ও সমুচ্চ তীরে লইয়া যায়।

নগরের সাময়িক জীবনে চরিত্রের স্বচ্ছতা নষ্ট হয়। নগরে কেবলমাত্র মনুষ্যের সংসর্গে মনের স্বাভাবিক স্বার্থপর হয়, কোমল কঠিন হয়, উদার নীচ ও অমত হয়। এই জন্য মধ্যে মধ্যে নাগরিকদিগকে প্রকৃতির মুক্ত নিকেতনের ধারে গিয়া তাঁহার সাধনা করা কর্ত্তব্য; তাহা করিলে তাঁহাদের দেহাসক্তিবোধ হ্রাস হইবে এবং তাঁহারা যে জন্য উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর কার্য্য সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন, ইহা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। এইরূপে আমরা যতই আমাদের মনের প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারিব, ততই আমরা আমাদের নৈতিক জীবন সোপানে ক্রমে ক্রমে উঠিতে থাকিব। ঘটনা বিপর্য্যয়ে যদি আমাদের ঐরূপ অনুভূতি সর্ব্বদা পুনরাবির্ভাব না হয়, তাহা হইলেও ঐ প্রকারে অন্তের মানসিক উন্নতি দেখিয়া তাহা সম্বরণ করিতে করিতে আমরা সুদৃঢ় ও স্থায়ী মঙ্গলাভে সমর্থ হইব।

আমরা পল্লীগ্রামে পরস্পরে যেরূপ সখ্য ও পরিচয়

লাভ করি, নগরে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সহরে, কেহ কাহারও খোঁজ লয় না। পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীরও কেহ কোন খোঁজ খবর রাখে না। পরস্পরে দেখা হইলে সাধারণ কথাতেই পরস্পরের আলাপ সমাপ্ত হয়। কাহারও কোন ব্যক্তিগত বা চরিত্রগত কোন কথাই মুখে প্রকাশ পায় না। পল্লীগ্রামে, পরস্পরে মিলিত হইলে ঔৎসুক্য, সরল ও অকপট হৃদয়ের কত সহানুভূতি, কত আদর ও যত্ন, কত নৈকট্যের ভাব পরস্পরের মনে ও মুখে প্রকাশিত হয়। "বসুধৈব কুটুম্বকং" কথার সারবত্তা পল্লীগ্রামেই উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত চরিত্র, ব্যক্তিগত সংস্কার, পরস্পরের কাছে, সহজ ও স্বভাবভাবে ফুটিয়া পড়ে। এইরূপে আমরা আমাদের দাস দাসী জন মজুর, অধীন কর্ম্মচারী বা আশ্রিত দরিদ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া পড়ি। ইহা যে জীবন নির্ব্বাহ পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ, সুখ ও সুবিধাজনক তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যখন আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, তখনকার কথা ছাড়িয়া দিলেও, এখনও পরিবার মধ্যে কর্ত্তাই পরিবারের ধাতা। তাঁহার নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগশীলতার জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই, আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির সহিত সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তন করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামে এমন একদিন ছিল যে সে সময়ে কৃষক কেবলমাত্র তাহার চাষের জমির উপর অনুরক্ত ছিল না। সে মনে করিত যে তাহার প্রভুর জমি যেন তাহার নিজের সম্পত্তি। সে উহা ভাবিয়া তাহার প্রদর্শিত শস্য ও তাহার প্রভু ও প্রভু পরিবারকে সমানচক্ষে দেখিত; প্রভু ও প্রভু পরিবারের স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গল সে নিজের বলিয়া মনে করিত। অপরদিকে, তাহার প্রভুও তাহার শ্রীসুদ্ধ পরিবারের দুঃখ, কষ্ট ও অভাব মোচন করিতে সুখসম্পদ ও বিপদাপদে রোগে, শোকে, দারিদ্র্যদুঃখে, তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তি দিতে সুহৃদয় ছিলেন। এইরূপে পুরুষানুক্রমে পরস্পরের হৃদয়ের কোন অবিশ্বাস স্থান পায় নাই। পরস্পরেই পরস্পরকে ভাল করিয়া চিনিত ও বুঝিত। পরস্পরেই পরস্পরকে সমাদর করিত। এইরূপে সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাস প্রণোদিত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিত।

বড় বড় নগরে সাধারণতঃ মধ্যলোক জন্মগ্রহণ করেন না। বড় বড় নগরের অধিবাসীগণের জীবনের বৃত্তি ও লক্ষ্য যেরূপ তাহাতে ক্ষুদ্রমনা লোকই জন্মগ্রহণ করেন। কর্ম্মের দুর্ব্বার চক্র ও আমোদ নগরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে অধিবাসীগণের মন, সর্ব্বদা নানাদিকে আকৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহার উন্নতির পথে উহা সম্পূর্ণরূপে ব্যাঘাত প্রদান করে। এক উত্তেজনা যাইতে না যাইতে আর এক উত্তেজনা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে কোন ঘটনার ফল মানব মনে স্থায়ীভাবে মুদ্রাঙ্কিত হয় না। একটি আর একটিকে মুছিয়া ফেলে। পল্লীবালক ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হয়। নাগরিক বালক ক্ষিপ্রগতিতে বাড়িয়া উঠে। কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মীদের সহিত অবিরাম সংঘর্ষণে, নাগরিক বালক তীক্ষ্ণধী ও সুদক্ষ হইয়া, থাকে ও নিজ নিজ কর্ম্মে বিলক্ষণ তৎপর ও ক্ষিপ্রকর্ম্মা হয়; কিন্তু সেখানেই থাকিবে, আর তথা হইতে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

নাগরিক জীবন বুদ্ধিবৃত্তিঘটিত কার্য্যের বিরোধী। নগরে ক্রমাগতই উত্তেজনা; শান্তি ও বিশ্রাম অতি অল্প অল্প। সংবাদপত্রপাঠ, নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যাপৃত, রঙ্গালয় দর্শন ও নানা দুষ্কর্ম্মে দিন কাটিয়া যায়। নগরবাসীদের বন্ধুবান্ধব সংখ্যা অতি অল্পই থাকে; যাহারা থাকে তাহা নিজের মত। নগরবাসীগণ সামুদ্রিক পর্ব্বতের খোলকাবৃত শংখের ন্যায়; তাঁহারা তাঁহাদের বাহিরের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কার্লাইল তাঁহাদিগকে "narrow built, considerably perverted men, rather fractions of men" বলিয়া মনে করিতেন।

নগরে তথাকার অধিবাসী জনসঙ্ঘের একজনমাত্র। তাঁহার প্রতিবেশীগণ তাঁহার কিছুই জানেন না। তিনিও প্রতিবেশীগণের কাহারও কিছুই জানেন না। তিনি যেমন যাহা দেখিয়া আসিতেছেন, তাহাই দেখেন। তাঁহার অভাব ও আমোদ পূর্ণ হইলেই হইল। সমষ্টিক উন্নতি লাভের জন্য তাঁহার মনে কোন নবীনবল সঞ্চারিত হয় না।

কিন্তু পল্লীবাসীগণের প্রকৃতি বিভিন্নরূপ। তাঁহারা একেবারেই মাতৃভূমি হইতে আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পল্লীবাসী জনসঙ্ঘের একমাত্র ব্যক্তি নহেন। তিনি আপনাকে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের জন্য দায়ী বিবেচনা করেন। নগরবাসী যন্ত্রচালিত হইয়া যথাযথ ভাবে যে কার্য্য করেন, পল্লীবাসী সেইরূপ অনেক কার্য্য করিতে অক্ষম। ভিন্ন ভিন্ন উত্তেজনায় তাঁহার মস্তিষ্ক কোন প্রকারে বিচলিত হয় না। তিনি ধীরে ধীরে সকল সময়ে থাকিতে থাকেন। তিনি তাঁহার প্রতিবাসীগণকে জানেন, প্রতিবেশীগণও তাঁহাকে জানেন। তিনি চির-জীবনের জন্য লোকের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়েন; বহুসংখ্যক উদাসীন পরিচিতের অপেক্ষা একটি মাত্র বন্ধু লাভে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি সোজাসুজি ভাবেই তাঁহার সহকর্ম্মীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার মন তাঁহাদের উপরে প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে এবং তাঁহার মনে যাহা মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে।

পল্লী-বালকদিগের মনে যে সকল বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা বহুসংখ্যক না হইলেও সহজে পরিবর্ত্তিত হয়, কেননা একে তাহা মনোহারী, তাহাতে আবার তাহা ক্রিপ্রগতিতে তাহাদের মনকে হটাইয়া যায় না; তাহারা বৃত্তিকে বিহ্বল করে না, অনুরাগকে নিষ্প্রভ করে না। পল্লীগ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানেন। পল্লীবালকগণ তাঁহাদের প্রতিবেশীগণের কার্য্য ও অকার্য্য সকলই দেখিতে পায়। তাহারা তাহাদের পারিবারিক ইতিহাস জানে; পিতা, পিতামহ, মাতা, পিতামহীর নিকট সকলই শুনিতে পায়; এবং বাল্যকাল হইতেই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনের চরিত্র ও কীর্ত্তি-কলাপে দিন দিন সমধিক অনুরাগী হইয়া উঠে। ঐ সকল জীবন চরিত কেবলমাত্র গল্প হইলেও তাহা অন্তের প্রতি অনুরাগের সূচনা করিয়া দেয়। এবং যেখানেই গল্প, সেইখানেই অনুরাগ ও সখ্য প্রচ্ছন্নভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। অপর পক্ষে বড় বড় নগরে যেখানে লোকে জনবহুল হইয়া বাস করে, সেখানে গল্প নাই, সখ্যও অতি বিরলদৃষ্ট; কেননা তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অতি সামান্য ভাবেই জানে এবং অতি সামান্য ভাবেই পরস্পরের জন্য দায়ী হয়। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরেই লোকে সমাজ হিসাবে দূরে অবস্থান করে।

যদিও পল্লীবালক নাগরিকবালক অপেক্ষা শীঘ্র পরিণতি লাভ করিতে পারে না, কিন্তু যখন তাহা লাভ করে তখন তাহা নাগরিক বালক অপেক্ষা অনেক বেশী। পল্লীবালক আপনার উপায়েই আপনি কাজ করে এবং বাল্যকাল হইতেই আপনাকে আপনি সাহায্য করিবার সাংসর্গ উপদেশ শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়। যখন সে নগরে উপস্থিত হয় তখন তাহার মনে, বিস্ময় ও শ্রদ্ধা-উদ্দীপিত হইয়া উঠে; এবং নূতন কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহার মনে সমুদিত হয় এবং তাহার তৃপ্তিসাধনের জন্য সচেষ্ট হয় এবং পূর্ণ সজ্ঞান হইয়া ইচ্ছাবলে, নাগরিক জীবনের সমুচ্চ সোপানে উঠিয়া বসে। এইরূপে পল্লীবালক, নাগরিক বালক অপেক্ষা সংসার-ক্ষেত্রে সমধিক কৃতকার্য্য হয়। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন "Huge centres of intellectual and political life are said to be unproductive and it may be that the feverish excitement which exhausts the parents' strength and in which the youth of the off-spring is spent, leaves but little vigours and creative power in the genuine cockney. At any rate there are few men great either in politics, science or art who have sprung from the exhausted soil of a metropolis."

নিউটন প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীগণ প্রায় সকলেই পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা বয় পল্লীগ্রামেই বাল্যকাল হইতে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। উইক্লিফ, লুথার, নক্স, মরেলা, প্যাট্রিয়ার, ওয়েন্‌লি, ক্রমওয়েল, ওয়াসিংটন্ প্রভৃতি মনীষিগণ, পল্লীগ্রামের নিভৃত কক্ষে থাকিয়াই স্ব স্ব মনীষার বিমল জ্যোতিঃ জগতে বিস্তার করিয়াছিলেন। নিভৃতবাস বুদ্ধি বৃত্তির পরিমার্জ্জন ও অনুশীলনে প্রতিরোধ করে না; বরং মন অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায় তাহাকে সমধিক

উৎক্ষিপ্ত করে। নিভৃতবাস আমাদিগকে আমাদিগের ভিতরে আনিয়া দেয়; জনসঙ্ঘ আমাদিগকে আমাদের হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। এই জন্য যাঁহারা নিভৃতবাসে অভ্যস্ত তাঁহাদের মনোবৃত্তি দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে। উচ্চমনা ব্যক্তিগণ জনসঙ্ঘের অব্যাহত ঘাত-প্রতিঘাতে অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাঁহাদের আত্মার তীব্রতা একেবারে নষ্ট হয় এবং কোন বিষয়ে তাঁহাদের দৃঢ় অনুরাগ স্থাপনের ক্ষমতা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়। নিভৃতবাসী সখ্য, পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম সাধনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। আর্য্য ঋষিগণ উহা সম্যক্ প্রকারে বুঝিতেন।

নিভৃতবাসে সর্ব্বাধিক সুরক্ষা-পরায়ণ, আত্মজ্ঞানী হন ও নব নব সত্যানুভব করিতে সমর্থ হন। জেনার তাঁহার অন্তর্ভূমি রমণীয় সাগরের ক্ষুদ্র পল্লীতে বসিয়া বসন্ত যোগের টিপ্পা দেওয়ার অধিকার আবিষ্কার করেন ও বৃষ্টির চিহ্ন সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রণয়ন করেন। জেমার তাঁহার পল্লীবাস এত ভালবাসিতেন, যে অমূল্য প্রলোভন সম্মুখে পাইয়াও তাঁহার পল্লীবাস পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন।

ডাক্তার আর্ণল্ড তাঁহার পল্লীভূমি ও তথাকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, শুষ্ক প্রান্তর, পর্ব্বত ও হ্রদ বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহার জলবায়ু উহাদের সহিত আবদ্ধ ছিল এবং উহা তাঁহার জগতের কেন্দ্রস্থল ছিল। তিনি গ্রামের প্রান্তভাগে তাঁহার সন্তান সন্ততি লইয়া বায়ুসেবন করিতেন; নির্ম্মল বায়ু তাঁহাকে ব্যজন করিত। বন্যফুল তুলিতে, পক্ষীনীড় দেখিতে, বেড়া ও পরিখা ডিঙ্গাইতে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। কয়েকটি গ্রাম তাঁহার চক্ষে, পৃথিবীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্বরূপিনী ছিল।

প্রসিদ্ধ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও সাদি পল্লীগ্রামেই বাস করিতেন। "এডিন্‌বর্গ রিভিউ" এর বিখ্যাত লেখক সিড্‌নী স্মিথ পল্লী পুরোহিত ছিলেন। যখন তিনি ইয়র্ক-সায়রের অন্তর্গত কক্সউল্ডমিল্লে নামক গ্রামে যান, তখন তথা হইতেই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হয় এবং তাহাতেই তিনি সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠেন।

কার্লাইল, ডন্‌ফ্রেশায়রের অন্তর্গত বিজন কৃষক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যের নিভৃতনিবাস, যৌবনে তাঁহার অন্তর্মুখী প্রতিভা উদ্দীপিত করে।

ইংরাজেরা সাধারণতঃ বড়ই পল্লীভবন প্রিয়। গোল্ড-স্মিথ, স্কটে, ওর্ড্‌স্ ইলিয়ট, ম্যাথিউস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ লেখকের উপন্যাসে, পল্লীভবন, পল্লীসমাজ, পল্লীসৌন্দর্য্য অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে হৃদয় ও মন, আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে। সার ওয়াল্টার স্কট আজন্ম পল্লীবাসক। পল্লীভবন ও পল্লীজীবন তাঁহার এত ভাল লাগিত, যে তাহা তিনি জীবনে কখনই ভুলিতে পারেন নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আনন্দময় অনুভূতি যাহা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছিল, তাহা কখনই তাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত হয় নাই। এবট্‌স্ ফোর্ডে তাঁহার যে পল্লীভবন ছিল তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন;—"my heart cling to the place I have created; there is scarce a tree on it that does not owe its being to me." পৃথিবীর নানাস্থান বিশেষতঃ আমেরিকা হইতে শত শত যাত্রী ঐ তীর্থস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার Lady of the Lake, Waverly, Rob Roy এবং অন্যান্য উপন্যাসাবলী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর শত শত ভ্রমণকারী, স্কটল্যাণ্ডের প্রান্ত সীমায়, এবট্‌স্ ফোর্ড, লক্ ক্যাট্রিন ((Loch Katrine) এবং লক্ লোমণ্ডের (Loch Lomond) উপত্যকাস্থিত রবরয়ের (Rob Roy) লীলাভূমি দেখিতে আসিতেন। বাইরণ, স্কটের ন্যায় পল্লীপালিত না হইলেও, তিনি বাল্যকালে স্কটল্যাণ্ডের যে আরণ্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, জীবনের শেষভাগে, তাহা অনুভব করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কবিগণের জন্মভূমি অনেকস্থলেই পল্লীভবনে, পল্লী-কুটীরে, নগরে নহে। কোন প্রসিদ্ধ লেখক বলেন;—"Let no poet get himself born and reared in a capital; but rather if possible, in a village or at most, in a small town. The super-

abundance, and over-fascination of a large town are to the delicate, excitable young soul, a feasting at de-ert, a drinking of burning spirits, a bathing in glowing wine. Life is exhausted in him during boyhood; and after the greatest he has nothing left for which to wish, but that which at any rate is smaller, namely the village."

সেক্সপীয়র, সেনষ্টোন্, কার্ডলি, গোল্ডস্মিথ্, বর্ণস্ ও টেনসন্ সকলেই পল্লীবাসক ছিলেন। পল্লীজীবনের কত নব নব সুন্দর চিত্র, প্রকৃতির কত নূতন সৌন্দর্য্য, আমরা তাঁহাদের নিকট পাইয়া আজ আনন্দ উপভোগ করিতেছি। উহাদের সহিত তুলনায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি পার্ব্বত্যপ্রদেশে হ্রদপ্রান্তে জন্মগ্রহণ করেন ও তথায় প্রতিপালিত হন। তাঁহার পদার্থ সকল বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বিদ্যালয়ে অলস ও নির্জ্জনপ্রিয় ছিলেন; ইচ্ছানুসারে যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু প্রকৃতিই তাঁহার একমাত্র সঙ্গিনী ও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি প্রকৃতিকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন। পর্ব্বতবহুল কম্বারল্যাণ্ডের রাখা কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেখানে বাস করিতেন, সেখানে মনে হয় যেন, তাঁহার প্রেতাত্মা আজিও তথায় বিচরণ করিতেছে। গ্রাস্‌মিয়ার (Grasmere) রাইডাল মাউন্ট (Rydal mount) এবং কেস্ উইক (Kes wick) তাঁহারই জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইরূপে সেক্সপীয়রের নামে Stratford-on-Avon হ্যাম্‌ডিনের নামে Pensburst, ওয়ালার হার্ষ ও ডিস্‌রেলীর নামে Beaconsfield পোপের নামে Twickenham; কাউপারের নামে Olny; সেন্‌ষ্টোনের নামে Lea owds; টেম্‌সনের নামে Richmond; বর্ণসের নামে Alloway Kirk; স্কটের নামে Abbotsford; বাইরণের নামে Newstead Abbey জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

নগরে জন্মগ্রহণ করিলে এবং তথায় প্রতিপালিত হইলেও পল্লীগ্রাম মানবের মনে, সুদূর ও স্থায়ীভাবে তাহার প্রভাব বিস্তার করে। মিল্‌টন লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করিলেও প্রকৃতির ভক্ত ছিলেন; তিনি প্রকৃতির দৃশ্য ও শব্দ তাঁহার পুস্তকে সমুজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। বর্ণস, লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন কম্বারল্যাণ্ডে উপনীত হন তখন তথাকার হ্রদ ও পর্ব্বতশ্রেণী সন্দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে বিগলিত হইয়া কতই না গভীর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন! কীট্‌সের অন্তঃকরণও ঐরূপ কোন মোহ প্রভাবে বিচলিত হইয়াছিল। তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থান গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। তৃণগুল্ম, পুষ্প-সৌন্দর্য্য, সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ তাঁহার হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিত, তাঁহার চক্ষুর জ্যোতি সহসা স্ফুরিত হইত; তাঁহার গণ্ডস্থল উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করিত; তাঁহার মুখমণ্ডল কম্পিত হইত।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধ-নীতি, গার্হস্থ্যনীতি ভারতবর্ষের অনুপমনীয় সভ্যতা সমস্তই সেই ব্যাঘ্র-শ্বাপদ সমাকুল, হ্রদ-নদী-নির্ঝরিণী পর্ব্বত সমাকীর্ণ ফলপুষ্প পরিশোভিত, বিহঙ্গ কাকলী কূজিত সুদূর আশ্রমবাসী ঋষিগণের চিন্তা-প্রসূত। তাঁহারা তথায় অবস্থান করিয়া ত্রিলোকের সংবাদ লইতেন। ঐ আশ্রমে বসিয়াই তাঁহারা বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বুদ্ধদেব ও ভগবান শঙ্করাচার্য্য বিজন তপস্যা বলেই স্ব স্ব ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। এখনও সেই আর্য্য ঋষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শত শত মহাত্মা সন্ন্যাসীর বেশে নির্জ্জনে পর্ব্বত গুহায় সাধনা করিতেছেন। যিনি, যে বিষয়ের সাধনা করুন না, নির্জ্জনই তাহার প্রকৃত স্থান, ইহা তাঁহারা কখনও ভুলেন নাই।

আর্য্য ঋষিগণের বা ঐ সকল মহাত্মাগণের কথা, বহুক্ষণ বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও বাঙ্গালার কবি ও মনীষীগণ, সুন্দর পল্লী-ভবনের নির্জ্জন প্রান্তে বসিয়া আপনাদের সাধনা করিয়াছেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র দাশুরথি, রামপ্রসাদ প্রভৃতি অন্যান্য কবিগণও সকলেই পল্লীবাসী; পল্লীগ্রামের কুটীরে, নদীতটে বা বৃক্ষতলে তাঁহাদের সঙ্গীত ও বিমল প্রতিভা

বিকশিত হইয়াছিল। অধুনাতন কালের মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ইঁহারাও পল্লীবাসী। পল্লীগ্রামের প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের হৃদয়ে, বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের পুস্তক পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায়। প্রকৃতির লোহাগ ভূমি চট্টগ্রামের অকূল নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে সুদৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল, ইহা তিনি তাঁহার "অবকাশ-রঞ্জিনী" কাব্য গ্রন্থের ভূমিকায় বিশদভাবে লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জন্মীয় গৃহে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিলেও শৈশবে প্রকৃতির উন্মুক্ত নিকেতন তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান। বাল্যে পিতার সহিত নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কখনও নদীতীরে কখনও পর্ব্বতাধিত্যকায়, কখনও উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থান করিয়া প্রকৃতি পূজা করিয়াছেন, প্রকৃতিদেবীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় অল্পই দিনই থাকেন। বাহিরে প্রকৃতি মাতার সান্নিধ্যেই তাঁহার আবাস স্থান। শিলাইদহ ও বোলপুরই তাঁহার প্রিয় নিকেতন। তিনি প্রকৃতি মাতাকে এত ভালবাসেন, যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে চরিত্র ও জীবন সুগঠিত করাইবার জন্য তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথকে দাসদাসীর সহিত পদব্রজে হিমাচল পরিভ্রমণে পাঠাইয়াছিলেন। সে সময়ে (২৬শে জ্যৈষ্ঠ। ১৩০১) তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন বন্ধুকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

—"তীর্থভ্রমণের যদি কোনো উপকার থাকে স্বীকার করিতে হয় তবে রথীর বয়সই অনুকূল সময়—এখনই তাহার শরীর দৃঢ় ও সবল, কোনো অভ্যাসে ও সংসার-বন্ধনে সে বদ্ধ নয়—এখনি নবীনসী প্রকৃতির প্রভাব তাহার মনের মধ্যে সুগভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া যাইবার সময়—এখন তাহার শরীর মন সম্পূর্ণ মুক্ত এই জন্যই অসীমের মধ্যে মুক্তির ভাব অবারিত চিত্তে সে গ্রহণ করিতে পারিবে। ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিবেন—তাহার পথে যাহা মঙ্গল তিনিই সে বিধান করিবেন—আমি নিতান্তই উপলক্ষ্য মাত্র—আমাকে রথীর সম্বন্ধে তিনি যে শুভ বুদ্ধি দান করিবেন, স্নেহের প্রয়োচনায় তাহাকে যেন আমি কোনো দিন প্রতিহত না করি।"

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পূজাও তিনি প্রকৃতি মাতার নিকট অতি অল্প বয়স হইতেই যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বাল্যরচিত প্রথম প্রকাশিত "কবিকাহিনী" কাব্য হইতে সমস্ত কাব্যগ্রন্থ ও তাঁহার "ছিন্নপত্রে" সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি নগর অপেক্ষা পল্লীগ্রাম কত ভালবাসেন, নিম্নোদ্ধৃত কবিতা হইতে পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ, লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন, পুণ্যচ্ছায়া রাশি,
প্রাণিবীন দিনগুলি,—সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই সোচারণ, সেই শান্ত নাম গান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
সরল হৃদয়ে আস্থা যাবে নিত্য আলোচন
মহাতরুগুলি। পাখার পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি, নিরাপদে রাজা ভোগ সব ;—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,—
প্রাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন।"

ইংলণ্ডের রাজকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতি দেবীর পূজায় ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মানবগণকে শিক্ষা-দান করিয়া পৃথিবীতে অশেষ যশোলাভ করিয়াছেন আর আমাদের এসিয়ার রাজকবি রবীন্দ্রনাথ সহরে ও বনীগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রকৃতি দেবীর পূজায় ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ন্যায় পৃথিবীর সকল জাতির নিকটেই পূজ্য হইয়াছেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, রাজগোপাল, দ্বারকানাথ, হরিনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী প্রভৃতি বনীগণ সকলেই পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া এই

হতভাগা বঙ্গদেশকে তাঁহাদের প্রতিভা প্রভায় সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন।

পল্লীগ্রাম, উন্মুক্ত প্রান্তর, পার্ব্বত্য প্রদেশেই পৃথিবীর সকল দেশের বীরগণের জন্মভূমি। ভারতবর্ষের রাজপুত, শিখ, গুর্খা, জাঠ ও সিপাহীগণ উপরোক্ত প্রদেশে জন্মলাভ করিয়া বীরত্বের জয়মালা গলদেশে ধারণ করিয়াছে। নাগরিকগণ, বুদ্ধিমান, মেধাবী, কর্ম্মপটু কিন্তু কঠিন ও কষ্টসহিষ্ণু নহেন বলিয়া শারীরিক সামর্থ্য বা যুদ্ধকার্য্যে সম্পূর্ণ অযোগ্য। কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"Thews and sinews may not be so universally and pre-eminently valuable among civilised as among cultivated peoples; but in all ages, since the English became a nation, their position among other nations has been in a great measure due to the frequency among them of individuals of great strength and physical energy; and when we as a nation fall below others in this respect, we shall suffer for it, note merely in our military but in ours, commercial and even in our scietific position."

বড় বড় নগর, বড় বড় কার্য্য ও কারখানার কেন্দ্রস্থল, কিন্তু তাহা লোকের স্বাস্থ্য, উদ্যম ও শক্তি রক্ষার উপযোগী নহে। কোন বিখ্যাত ইংরাজ বড় প্রকাশ্য সভাস্থলে বলিয়াছেন—"The rush of modern days to the towns was such that they were sucking up the life-blood and strength of the country."

যৌবন-মধুরা

(১)

সহসা ও 'কি ও' মধুরার পথে ওঠে ক্রন্দন রোল,
গগন প্লাবিয়া মানব-কণ্ঠে উঠিল গণ্ডগোল।
"রক্ষ রক্ষ আর্ত্ত-শরণ দেবদেব নারায়ণ,
অত্যাচারীর নিঠুর পীড়নে কাঁদে যে ভক্ত জন।"
রসময় শ্যাম শ্রীরাধার সনে
ছিল ভুলি প্রেম-রস-নিমগনে,
বৃন্দাবনের কুঞ্জে তখন ভরা কোকিলের গান;
মধুময় ব্রজে মধুর মিলনে মাতিয়া উঠেছে প্রাণ।
সহসা দূরে সে ক্রন্দন-রোল
শ্রীহরির প্রাণ করে উতরোল
চমকিত শ্যাম চঞ্চল-হিয়া,
কহিল রাধায় অয়ি প্রাণ-প্রিয়া,

আর নহে সখি, আজ হ'তে মোর প্রণয়ের লীলা শেষ ;
কাঁদে ওই কোটী আর্ত্তের প্রাণ ডাকে ওই নরদেশ।
খুলে দাও আজি প্রেমালিঙ্গন ভুজবল্লীর ডোর,
আর্ত্ত আজিকে মাগিছে শরণ, ঝরে কোটী আঁখি লোর।

(২)

"কোথায় দয়াল বিশ্বের নাথ ভূভার-হরণ হরি !
দৈন্যের শত ওঠে হাহাকার সোণার মথুরা ভরি'।
আনন্দ-আলো কেন গো মলিন ভয়ে কেঁপে ওঠে প্রাণ,
শুষ্ক কেন গো সব হাসি মুখ থেমে গেছে সব গান।
অমঙ্গলের খর পরশন,
শান্তির মাঝে এনেছে শাসন,
যাচি তাই মোরা তব দরশন, এস শ্যামসুন্দর !
ঝর ঝর প্রাণে শান্তির ধারা দাও ঢালি ঝরঝর।
কৃষ্ণ কহিল—"রাধে তবে আসি'
শোন ক্রন্দন আসে ওই ভাসি',
বিপন্ন আজি কাঁদি মোরে চায়
আসি তবে প্রিয়ে বিদায় বিদায়,
বিশ্বের আজি কোন্ কিনারায় যেতে চায় ছুটি' প্রাণ ;
পাপের রুদ্র পীড়নে সাধুরে করিতে পরিত্রাণ"।
মলয় ছুটিল অধীর চপল,
যমুনা বহিল কল্-কল্-কল্,
ফুটিয়া উঠিল কোটী শতদল অলি দিল ঝঙ্কার ;
শ্রীরাধা কহিল—"মোর রসময়,
মোরে ছাড়ি' যাবে তাও কিগো হয়,
তোমার হিয়ায় রাধা ছাড়া আর কার আছে অধিকার ?

(৩)

যমুনা-পুলিনে কুঞ্জ-বিপিনে বংশী বাজায় কালা,
ব্রজাঙ্গনারা এসেছে চরণে ঢালিতে সর্ব্ব জ্বালা।
সহসা কানাই উঠিল চমকি' দূরে পুনঃ ক্রন্দন,
শরণাগতের ওঠে হাহাকার অন্তর বিদারণ।

কৃষ্ণ কহিল—"রাধে প্রিয়ে মোর
তোমার প্রেমেরি বন্ধন ঘোর,
আর কতদিন রাখিবে বিভোর আমার এ ভোলা প্রাণ.
নিরাশ্রয়েরা কাঁদে শোন ওই আসে তারি আহ্বান।

ক্রন্দন শুনি' বুক ফেটে যায়,
সারা অন্তর ছুটে যেতে চায়,
আমার শরণ চাহে যেই জন,
বিঘ্ন তাদের করিব মোচন ;
রাধা কহে—"বঁধু কেবলি তো মিছে নহে এ পিরিতি মোর;
অসীম হিয়ার অসীম বাঁধন অসীম এ প্রেম-ডোর।

(৪)

"হে পরাণপ্রিয়, হিয়ার রক্ত তিল তিল করি ক্ষয়,
তোমারি মাঝারে প্রেমের দেবতা গড়িয়াছি অক্ষয়।

তোমার নিবিড় বাহু-বন্ধন-নন্দন-তলে লুটি',
আমার প্রাণের গোপন কুঁড়িটী উঠিয়াছে তবে ফুটি।

তব সুখপূজা-সাধনে দিয়াছি আনন্দ-দীপ জেলে,
তোমারি সে ভোগে সারা ইন্দ্রিয় অর্ঘ্যে দিয়াছি ঢেলে।

মোরি প্রেমরসে আজো আছ বাঁচি' তবে সে তোমারি নাম,
এত যে সাধন, প্রাণ বলিদান, নাহি কি তাহারো দাম ?"

শ্যামরায় কহে চালি' মধুস্বর,
"প্রিয়ে, বটে তব প্রেম সে অমর,
বড় সে মধুর বড় রসময় আকুল উন্মাদন ;
স্বপনের সে যে মায়াময় পুরী মদিরার বন্ধন।

প্রাণ চাহে সেথা রহে চিরদিন,
হোক ভোগ সুখ নিত্য নবীন,
সোণালী স্বপন টুটাতে কে চায় ?
সাধে কেবা নামে ঘোর দরিয়ায় ?

মানব জাতির তরী ডুবে যায় তাহাতো তুলিতে হবে ;
সকল সৃষ্টি ভেসে যদি যায় প্রেম সে কেমনে রবে ?"

অধীর হৃদয় ঘোর বেদনায়
কাঁপিল কণ্ঠ কহে কাঁদি রাই,
"হে পাষাণ, তব নিঠুর বিদায় কেমনে শুনিব কাণে ?
শাণিত ছুরিকা চাহে বসাইতে মম হৃদি মাঝখানে।
তুমি যে আমার পরশমাণিক অভাগীর আঁখিধন,
কোন্ সে মায়াবী ভুলায়েছে আজ করে দেছে উচাটন ?
রাধার রতন ছিনাইয়া লয়,
এমন শকতি কাহারো ত নয়,
তব তরে সখা যুঝিতে জগতে চাহে আজ প্রাণ মন।
জ্যোছনা আজি যে ঢেউ খেলে যায়, উজান বহেছে যমুনার গায়
এত শোভাসুখ নিখিল-হিয়ায় বৃথা হবে অবসান ?
আজ যে গো ব্রজে বনতরা ফুল গানে আর ঘ্রাণে ভরেছে দুকুল,
আজো ওগো ভুল মিলন-আকুল চুম্বন লহ দান।"

(৫)

পাগল বাঁশীতে শ্যাম ঘনঘন দিল পুনঃ ঝঙ্কার,
পুরনারী-প্রাণ চঞ্চল, ঘরে নাহি মন বাঁধা আর।
ভুজপল্লবে বাঁধে রাই শ্যামে, শ্যাম ঢালে চুম্বন,
মিলনে মিলনে ছেয়ে গেল গৃহ সারা বন উপবন।
সহসা কাটায়ে অম্বর তল,
পুনঃ আসে ওকি ঘোর কোলাহল,
কোটী কণ্ঠের আহ্বান সে যে ত্রাসিতের ক্রন্দন ;
শরণাগতের ওযে প্রাণঢালা উদ্বেল আবেদন।
সকল কণ্ঠ বধির করিয়া উঠিল করুণ ধ্বনি,
"আর এ কারার র'ব কতদিন আয় আয় নিলমণি।
কাঁদি হ'ল পিতা অন্ধ, মায়ের ত' কঙ্কাল সার,
কতদিন আর রইবে বহিতে বক্ষে পাষাণ-ভার ?
এত যে কষ্ট, এত যে যাতনা, তবু সব আছি সয়ে,
তোরি মুখ স্মরি পথ চাহি' হায় দিন যায় মিছে ব'য়ে।
কাঁপিয়া উঠিল শ্রীহরির বুক,
পড়ে' র'ল সব হাসি কৌতুক,

সুখ হ'য়ে যায় প্রিয়ার সোহাগ-ভুজ-বল্লীর ডোর ;
খসে' পড়ে বাঁশী বিলাস-লীলায় ভাঙ্গিল রঙীন ঘোর।
কৃষ্ণ কহিল প্রিয়ে নহে আর,
সুখের স্বপন ভেঙেছে এবার,
ওই শোন ওই ওঠে হাহাকার ভক্তের নিবেদন ;
বুকের ধমনী ছিঁড়ি উঠিয়াছে জননীর ক্রন্দন।
মায়ের রোদনে এ পরাণ দহে,
ছলিছে হৃদয় আর নাহি সহে,
যেতে হবে হায় প্রণয়েরি লীলা করি' আজি অবসান।
বৃথা—বৃথা—আর এ প্রেম লোভন,
মার ডাকে আজি চঞ্চল মন
বিদায়—বিদায়—ওই পুনঃ আসে জননীর আহ্বান।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পল্লী-প্রসঙ্গ

ভূমিকা

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সে বড় এক শুভ মুহূর্ত্ত ; যখন পতিতের ভগবান্ তার হৃদয়-মন্দিরে আপন স্বর্ণ-সিংহাসন খানি স্থাপন করিয়া তাহাকে কর্ম্মের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তখন সে এক নবীন প্রেরণা পাইয়াছিল, এক অনন্ত শক্তির সঙ্কেতস্পন্দন অনুভব করিয়াছিল, গরিমাময় ভবিষ্যতের এক মনোরম চিত্র সম্মুখে দেখিয়াছিল ; তাই প্রেরণার পুলকে, শক্তির সামর্থ্যে, বিশ্বাসের আলোকের হাত ধরিয়া সে সোজা চলিয়াছিল।

তারপর নবীন চেতনার চপল-চাঞ্চল্যে অন্তর দেবতার আদেশ অমান্য করিয়া নিজেকে সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল—হীন দ্বন্দ্ব কোলাহলের ভিতরে। নিজেকে সে সম্পূর্ণ এক নূতন ধরণে—আপন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া গড়িতে চাহিয়াছিল। সে চাহিয়াছিল স্বর্গ—আত্মাকে ত্যজিয়া—সৃষ্টি চাহিয়াছিল, স্রষ্টাকে ছাড়িয়া—ধর্ম্মের মোহিনী রাগিনীর উত্তেজনায় মর্ম্মের বাণী সে উপেক্ষা করিয়াছিল। তাই পর্ব্বতের মত কত শত বিঘ্ন তার জীবনের গতিকে

বাধা দিয়াছিল আর পঙ্গু গিরি-লঙ্ঘনের প্রচেষ্টায় যত নিষ্ফল উদ্যমে ক্লান্ত হইয়া ধরণীর গাঢ় অন্ধকারে সে মৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সে-এক সঙ্কটের দিন গিয়াছে।

আজ আবার দেবতার উদাত্ত-কণ্ঠে ধ্বনি উঠিয়াছে—আত্মানং বিদ্ধি! ওরে আপনহারা ভ্রান্ত মানব! আপনাকে দেখ, বোঝ আত্মস্থ হও। অন্তরের ঘুণাক্ত-সঞ্চিত কালিমা প্রক্ষালিত করিয়া পূতশুদ্ধ চিত্তে ঈপ্সিতের সন্ধানে প্রবৃত্ত হও। বাঙালী তাই আজ আপনাকে খুঁজিতেছে ঘর ঘর করিয়া—রাষ্ট্রের মাঝে, সমাজের সঙ্গে—আপন চিত্তের গোপন-গহ্বরে।

এমনই ব্যাকুল আগ্রহে নিজেকে খুঁজিতে গিয়া আজ সে দেশের মাটীর সঙ্গে আপন সম্বন্ধের অস্তিত্ব জ্ঞাত হইয়াছে। তাহার পরাণ ছাপাইয়া আজ স্বদেশ-প্রেমের মন্দাকিনী ধারা বহিয়াছে। তাহার স্বদেশ—সে শুধু ইট পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড একটা পুরী নহে, তুচ্ছ একটা জড়-পিণ্ডের মত উপেক্ষার সামগ্রী নহে—তার নীরস একটা মৃত্তিকার স্তূপমাত্র নহে। কেবল কবির কল্পনায় স্বদেশ বিরাজিত নহে। বাঙালী বুঝিয়াছে স্বদেশ তাহার একটা সত্তা ও জাগ্রত প্রতীক। নিজেকে এই দেশেরই আলো ও বাতাসের প্রভাবে বাড়িতে দেখিয়াছে, সে এই দেশেরই জলে ও জলে পালিত দেখিয়াছে,—যুগে যুগে সে দেখিয়াছে এই দেশেরই বুকে নরের সঙ্গে নারায়ণের মিলন—পুরুষোত্তমের আবির্ভাব!

সে দেখিতেছে ব্যাধির তাড়নায়, অভাবের পীড়নে, অজ্ঞানতার জমাট বাঁধা অন্ধকারের সেবণে আজ দেশের পরিবর্তিত এই অবস্থায় মানুষের জীর্ণ কঙ্কাল বাহিতে লুটাইয়া পড়িতেছে।

দেহের স্থিতি দেশের অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে, যদি না মানুষ উদাম অবিচারে প্রবৃত্ত হয়, দেশ যদি ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত, পঙ্কিল-জল-কলুষিত এবং অসংখ্য রোগের বীজাণু পরিপূর্ণ হয়—বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন যদি দেশকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সাধ্য কি মানবের যে, সে নিশ্চিন্তে তাহার আরাধ্যের ধ্যানে মগ্ন থাকে। আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে মানুষকে তাই আগে দেশ-মাতৃকার পূজা করিতে হয়। ক্রমে দেশের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্বের গতি ও পরিণতির যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান, তাহাই উপলব্ধি করিতে পারিয়া মানুষ আপনার মাঝেই বিশ্ব এবং বিশ্ব ছাড়িয়াই আপনার রূপ দেখে।

বাঙালী আজ এই পথ ধরিয়াই মুক্তির মার্গে অগ্রসর হইয়াছে এবং নিজের উন্নতি সাধন করিতে গিয়া দেশের দিকেও ফিরিয়া চাহিয়াছে। তাই উপেক্ষিতা, অনাদৃতা পল্লীমায়ের অঞ্চল-প্রান্তে বাংলার কোটি কোটি সন্তান—নিজেদের বাঁচাইবার জন্য ফিরিয়া আসিতেছে।

সারা বাঙলা ব্যাপিয়া এই যে ভাবের বন্যা বহিয়াছে, তাহারই তরঙ্গ-সঙ্গে ভাসিয়া দেশমাতৃকার অকৃতী সন্তান আমরাও মাতৃ-পদতলে আসিয়া সমবেত হইয়াছি। অন্তরের কথা ও মর্মের ব্যথা প্রকাশ করিব বলিয়া আজ পরস্পরের সাহায্যে আমাদিগকে মানুষ হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে; গত বর্ষেও এমনি এক সম্মিলনে আমরা বুকের ব্যথা প্রকাশ করিয়াছিলাম; কিন্তু অপার, অগাধ বিষাদ সিন্ধুর কূলে পৌঁছিতে পারি নাই বলিয়া আজ আবার পরাজনের পুনরাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

স্বাস্থ্য

মানুষ সকলের আগে চায় বাঁচিতে। সৃষ্টির পরিণতি যত হইলেও মানুষ দুনিয়ার এই চিরন্তন সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারে না। তাই মৃত্যুর সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। এই জীবন-সংগ্রামে অপেক্ষাকৃত বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারে তাহারাই, যাহারা অর্থের বিনিময়ে ওষুধ কিনিয়া খাইবার উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু সংসারের বার আনা লোক অকালে মৃত্যুর কবলে আপনাদের সঁপিয়া দিতে বাধ্য হয়।

অধুনাতন, বাঙলার পল্লী-সন্তানগণ দারিদ্র্যবশতঃ অথবা উপযুক্ত শিক্ষার অভাব প্রযুক্ত—যে কোন কারণেই হউক—স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি অমনোযোগী হইয়া এমন অলস-উদাসে কালযাপন করিতেছে যে, দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন

সংসারের সুখ দুঃখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরপারের পরোয়ানার জন্যই উন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

—কিন্তু মানুষ কি দুনিয়ায় আসিয়াছে শুধু টাকা রোজগার করার জন্য?—কেবল স্ত্রীভোগের, কঙ্কাল-সার, আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব একপাল জীব-সৃষ্টির প্রয়োজনে! মানুষ কি জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার অভিপ্রায়ে—পরিত্রাণকে সম্পদশালিনী করিতে—অজ্ঞানের তমোরাশি ভেদ করিয়া বিধি-নির্দ্দিষ্ট আসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে আসে নাই? মরিতে সে আসে নাই—সে বাঁচিতে আসিয়াছে। গতি অতিক্রম করিয়া নিজেকে বাড়াইয়া, পূর্ণতর বৃহত্তর ক্ষেত্রে নারায়ণের সঙ্গে নিজেকে মিলাইতে আসন তার। এই সত্য আজ বাঙালী বুঝিয়াছে—কিন্তু অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে তাহার মোহাচ্ছন্ন মন, আর রোগ-জীর্ণ দেহ।

দুঃখের বিষয় যখনি আমরা বাঙলার ব্যথার কথা প্রকাশ করিয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিয়াছি, তখনই এক দল লোক অবিশ্বাসের তরল হাসি হাসিয়া বলিয়াছেন—"অতিরঞ্জিত এই কথা।" আমরা জানি কি ভীষণ সত্য আমাদের এইসব উক্তি। তবুও আমরা সরকারী রিপোর্টের সেই কয়েকটী বাক্যের প্রতি, অতি বিজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। তাহার প্রত্যেক বর্ণটি বাঙালীর চিত্তফলকে রক্তের দাগে অঙ্কিত রহিয়াছে। ১৯১১ সালের census report এ লিখিত হইয়াছে:—

"Year by year fever is silently at work. Plague slays its thousand, fever its ten thousands. Not only does it diminish the population by death, but it reduces the vitality of the survivors, saps the vigor and fecundity and either interrupts the even tenor or hinders the development of commerce and industry. A leading cause of poverty and of many other disagreeables in a great part of Bengal is the prevalence of malaria."

বাঙলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরও বলিয়াছেন—

"Every year there occurs in Bengal from 3,50,000 to 4,00,000 deaths from this cause alone. But a mere enumeration of the death gives but a faint idea of the ravages of the disease. It is probable that at least hundred attacks of malaria occur for every death and it is estimated that this disease alone is responsible for 20,00,00,000 days of sickness in the presidency every year."

এই সব উক্তি নিশ্চিতই আন্দোলন-কারীদের উক্তি-বাহুল্যদোষ বলিয়া উপেক্ষিত হইবে না। বাঙলার এই শোচনীয় অবস্থার বাস্তিক্রম সেনহাটীতেও কিছু পরিলক্ষিত হয় না।

সেনহাটীর অধিবাসিগণও এখনি রোগে ভুগিয়া, পলে পলে, তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইতেছে। এক যাত্রব্য চিকিৎসালয়েই গত বর্ষে দুই হাজার তিনটী রোগী ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় অন্যান্য ডাক্তার কবিরাজগণও বহু ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ম্যালেরিয়া নির্ব্বাসনের ইতিহাস সকলেই অবগত আছেন; সুতরাং এই ব্যাধির প্রকোপ নিবারণ যে অসাধ্য, তাহা মনে করিবার হেতু নাই।

স্বর্গীয় সারদা চরণ মিত্র মহাশয় বাঙালীকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, চেষ্টা করিলে পীড়ার আকর বাঙলার পল্লী সমূহ হইতে ম্যালেরিয়াকে বিতাড়িত করা যায়। সেনহাটীর বর্ত্তমান ইউনিয়ন কমিটি এই চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছেন এবং গ্রামের বহু উন্নতি সাধনেও সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু কার্য্যের পরিসর অনেক বেশী। জল নিষ্কাশনের আরও সুব্যবস্থা করিতে হইবে, স্থানে স্থানে রাস্তার সংস্কার-সাধন প্রয়োজন। এখনও গ্রামে এমন অনেক পুষ্করিণী রহিয়াছে, যাহার মধ্যে ডোবের ময়লা ধোয়া পচা জল অবাধে পতিত হইয়া সে গুলিকে কাদায় ভরা বিষ পাত্রের মতই অস্পৃশ্য করিয়া তুলিতেছে। এই সকল পুষ্করিণীর জল সকলে পান না করিলেও রন্ধন ও স্নানাদি কার্য্য ইহা দ্বারাই করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ পানার্থেও এই জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই জন্য পেটের পীড়াও অধিক হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে

দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে চারিশত একাশী জন রোগী স্পেটের পীড়ার ঔষধ গ্রহণ করিয়াছে, বলা আবশ্যক স্পেটের পীড়া কঠিন রকমের না হইলে আমাদের দেশের লোক সাধারণতঃ ঔষধ ব্যবহার করে না, দুইবেলা ব্যবহার করিয়াই রোগের নিবৃত্তি করে। গ্রামের মধ্যে, যতদূর সম্ভব মালিশ দেখা গিয়াছে, প্রায় পৌনে দুইশত বিঘা জমি আগাছায় বার মাস পূর্ণ থাকে। আগাছা কাটিবার যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা দাতব্য অনেক আগাছাও বহুবার ছড়িয়া রহিয়াছে। এই সব আগাছা কাটিয়া সজীবাগ করিলে একদিকে যেমন গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল হয়, অন্যদিকে তেমনি অতিরিক্ত অর্থমূল্যে ক্রয় করিতে হয় না। এ সম্বন্ধে যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা বলেন যে, মনুষ্য রাখিয়া এই কাজ করাইলেও বেশ লাভ থাকিয়া যায়। যাহারা দশ পনর টাকার চাকরীর জন্য বাড়ি ছাড়িয়া, হোটেলে খাইয়া শরীর পাত করেন, অথবা যাহারা চাকরীর উমেদারী করিয়া ব্যর্থ চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই ধরণের জমি পত্তনি লইয়া সজীবাগ করিলে উপকৃত হইতে পারেন। ইহা অসম্মানজনক কার্য্য নহে। আমেরিকায় এইরূপ Truck farming করিয়া অনেকে ধনী হইয়াছেন।

ইউনিয়ন কমিটি হইতে প্রতি বৎসর গৃহস্থদিগকে জঙ্গল কাটাইতে বাধ্য করান হয়। এই সব কর্ত্তিত আগাছা ডোবা ও ডোবার জলে পচিয়া দূষিত-বাষ্পে বাতাস কলুষিত করে সে গুলি অপসৃত করিবার কষ্ট স্বীকার কেহ করেন না। আমরা একটি দরিদ্রা রমণীর কথা জানি, যিনি এই আগাছা পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিয়া মাটির কলসী ভরিয়া রাখিতেছেন - এবং প্রতি কলস ছয় পয়সা হইতে দুই আনা মূল্যে বিক্রয় করিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। সোডা চুণ্যাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইবার দরুণ অনেকেই এক্ষণে ক্ষার দিয়া কাপড় কাচিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কেবল ইউনিয়ন কমিটির উপর গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির ভার অর্পণ করিয়া বসিয়া থাকিলে, গ্রামের স্বাস্থ্য কখনও ভাল হইবে না। গ্রামবাসী প্রত্যেকেরই মনে করিতে হইবে যে, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য রহিয়াছে। এই বৎসর পুরাতন রিজার্ভড্ টাক্সটির পত্তোদ্ধার করা হইয়াছে; তবুও জানিনা কেন ইহার জল মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত এমন দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহা একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। কুত্রা যাহাদের নাই, এমন সব ভদ্র-পরিবারের মহিলাদের অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে পানীয় জল লইতে হইয়াছিল। কিছুদিন ভাল থাকিয়া উক্ত পুষ্করিণীর জল পুনরায় দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আলোক-প্রাপ্ত, শিক্ষিত জনমণ্ডলের চেষ্টায় এই গ্রামের এতদূর একটা অভাব আজ পর্য্যন্ত বিদূরিত হইল না। বাংলার দলাদলি সম্বন্ধে লর্ড রোণাল্ডশে যাহাদুর Bengal social service League Exhibition এ যথার্থই বলিয়াছেন—

We all know that during recent years Scientific men in Europe and America and also in India have been making discoveries of the greatest value to the people at large. But the discoveries cannot be made the best use unless we can explain them to the masses of the people." শিখিয়াছি ত আমরা অনেক—কিন্তু কাজে লাগাইতে পারি না। ইহা কি আমাদের শিক্ষার ত্রুটি, না স্বভাবের দোষ?

এই বৎসর বাংলায় সর্ব্বত্রই জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দমদমার অথবা Influenza তার প্রবল প্রতাপ লইয়া সেনহাটীতে আসিয়াছিল—কিন্তু ম্যালেরিয়ার দাপটে গ্রামে টিকিতে না পারিয়া সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছে—আর সদাহত ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া ম্যালেরিয়া তার দানবী শক্তির পরিচয় দিতেছে। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে এক হাজার পাঁচশত চৌষট্টিজন রোগী ম্যালেরিয়ার ঔষধ গ্রহণ করিয়াছে—পূর্ব্ব বৎসর এই সময় রোগীর সংখ্যা নয়শত আটাইশ জন মাত্র ছিল।

কুইনিনের মূল্য দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজারেও ভাল কুইনিন পাওয়া যায় না। ধাত্রব্য চিকিৎসা সমরে বিগত বর্ষে ৮৭৪ জন ম্যালেরিয়ার রোগীকে কুইনিন দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছিল এবং quinoidin দ্বারা ১১২৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছিল।

শিক্ষা

স্বাস্থ্যের পরেই শিক্ষার দিকে মানুষের দৃষ্টি পড়ে। অন্য কোন উপায় না থাকায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেই আমাদের দেশে শিক্ষা-বিস্তারের মানদণ্ডস্বরূপ ধরিয়া লইতে হয়। আমরাও তাহাই করিতে বাধ্য হইয়াছি—যদিচ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাই যে কেবল মানুষকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারে, অন্য কোনও শিক্ষা-পদ্ধতি পারে না, এ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংশয় বিদ্যমান। কয়েক বৎসর যাবত দেখা যাইতেছে যে, সেনহাটী হইতে তেমন ভাল ছেলে বাহির হইতেছে না, গতবর্ষে শারদীয়সম্মিলনে আমরা এদিকে গ্রামের অভিভাবকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছিলাম। তাহাতে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, memory culture এর অভাব বশতঃই এরূপ হইয়াছে। আধ্যাত্মিকগণও একালে আবৃত্তিকে "বোধাদপি গরীয়সী" বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা বলিতেও তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই যে, শিক্ষার্থী যদি শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তাহা কেবল স্মৃতির কোটায় পুরিয়া রাখিতে ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে চন্দন-কাষ্ঠ-বাহী গর্দ্দভের ন্যায় তাহাকে শুধু বোঝা বহিয়াই মরিতে হয়। যাহা-হউক আবৃত্তিকেই "বোধাদপি গরীয়সী" বলিয়া মানিয়া লইয়াই দেখা যাউক সেনহাটীর ছাত্রবৃন্দ তাহাতে পরাঙ্মুখ কিনা? স্কুলের শিক্ষার উপরই সকল রকম উচ্চশিক্ষা নির্ভর করে বলিয়া আমরা স্কুলের কথাই আরম্ভ করিলাম।

আজকাল বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রকেই memory culture এর বেশী অনুরাগী দেখা যায়। তাহারা যে বিভিন্ন বিষয়ের Bazar notes গুলিই কেবল আগাগোড়া মুখস্থ করিয়া ফেলে তাহাই নহে, কেহ কেহ ৫০।৬০ টা ইংরাজি Essay পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বোধ হয় একেবারে অসঙ্গত হইবেনা যে, কোন কিছু মুখস্থ করিবার দিকে আমাদের ছাত্রদের খুব প্রবল একটা ঝোঁক রহিয়াছে; কিন্তু ধারণ করিবার শক্তিরই অভাব। দৌর্ব্বল্য দোষ পাঁচ দুই কারণে। প্রথমতঃ শারীরিক ও তজ্জনিত মানসিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ আর দ্বিতীয়তঃ চিত্ত চাঞ্চল্যের হেতু। ব্যক্তি বিশেষের চিত্ত চাঞ্চল্যের বিশেষ কোন কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও সমষ্টিগতভাবে সেনহাটীর মত শান্ত পল্লীর ছাত্রদের চিত্ত-চাঞ্চল্যের কোন হেতুই খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। তাহা হইলে দেখা আবশ্যক যে, শারীরিক অথবা মানসিক দৌর্ব্বল্য ছাত্রদের সুশিক্ষার পথে বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়ায় কিনা। দু'বছরের স্কুলে উপস্থিতির হিসাব দেখিতে গেলে, দেখা যায় যে, পূর্ব্বাপেক্ষা ছাত্রের উপস্থিতি-সংখ্যা হ্রাস পায় নাই; সুতরাং একথাও বলা যায় না যে, শারীরিক অসুস্থতাই তাহাদের শিক্ষার অবনতি ঘটাইতেছে। কিন্তু এসম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য রহিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়ার প্রথম আক্রমণগুলি বেগে আসিয়া রোগীকে শয্যাশায়ী করে; কিন্তু পুরাতন হইলে তদ্রূপ করে না। রোগী তাহার দৈনন্দিন কর্ম্ম নিয়মিতভাবেই করিয়া যায়—হঠাৎ কখন ঝড়ের মত বেগে আসিয়া, ম্যালেরিয়া তাহার দেহটাকে কাঁপাইয়া তুলিয়া, আবার ঝড়ের মত চলিয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সে তস্করের মত গোপনে আবার শরীরে প্রবেশ করে। এইরূপ সব আক্রমণে শরীর একেবারে অন্তঃসার শূন্য হইয়া যায়। এমনও ত হইতে পারে যে, আমাদের ছাত্রদের অনেকে এই শ্রেণীর রোগী-পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। তাহারাও রীতিমত প্রত্যহ স্কুলে উপস্থিত হয়; কিন্তু হয় রাত্রিকালে নতুবা ক্লাসে বেঞ্চের উপর বসিয়াই তাহারা জ্বরের বেগ সহ্য করিয়া থাকে। অবশ্য আমাদের এই আশঙ্কা অমূলকও হইতে পারে; তবে এমন দু'চারিটি ভাল ছেলের কথা আমরা জানি যাহারা ক্লাসের মধ্যে অগ্রগামী হইয়াও আবার পরদিবস নিয়মিতরূপে স্কুলে উপস্থিত হয়।

কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্ মহাশয় গত শ্রাবণ ও ভাদ্রের দুই সংখ্যা

ভারতবর্ষে "বাঙালীর শিক্ষা" নামক একটি সারগর্ভ সন্দর্ভে বাঙালী ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি নিজে অশেষ পরিশ্রম সহকারে কলিকাতার কতকগুলি বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা উক্ত প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশে অনেক কৃতবিদ্য ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন। তাঁহারা যদি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের গ্রামের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া সত্য-নির্ণয়ে যত্নবান হয়েন, তাহা হইলে গ্রামের অনেকেই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য অথবা চিত্ত-চাঞ্চল্য আমাদের ছাত্রদের বীর্য্যশক্তির লোপ সাধন করে না, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, সেনহাটীর মাটিতে এক্ষণে কেবল নিরেট বোকা ছেলে ভূমিষ্ঠ হয় এবং সেই জন্যই পরীক্ষা প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে না? এই প্রকার উদ্ভট ধারণা কাহারও থাকিতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা যে আশানুরূপ হইতে পারিতেছি না, সে কথাটা সেহাৎ উড়াইয়া দিবার অথবা উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। আমাদের অনুসন্ধান করিতেই হইবে, গলদ কোথায় রহিয়াছে। কেহ কেহ হয়ত বিনা বিচারে স্কুলের শিক্ষকদের ঘাড়েই সকল দোষ চাপাইয়া দিবেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, দেশের কয়টা উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের staff অধিকতর দক্ষ? কোন পরিদর্শক কখনও বর্ত্তমান staffএর বিরুদ্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। শিক্ষাপদ্ধতি বাংলার সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ এবং শিক্ষাদান-প্রণালীর মধ্যেও বিশেষ কোন তারতম্য আছে, তাহাও আমাদের মনে হয় না। সেনহাটীর সমকক্ষ কোন একটি গ্রাম-বিশেষের ছাত্রগণ কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন। এফ, এ ও বি, এ-পরীক্ষায় তাঁহারা যে শুধু প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ হইতেছেন, তাহা নয়—পরীক্ষা প্রতিযোগিতার প্রতিবৎসরই এই চারিজন উচ্চ স্থানও অধিকার করিতেছেন। অথচ বিগত দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের গ্রাম হইতে একটি ছাত্রও প্রথম বিভাগে এম, এ পাশ করেন নাই, অথবা বি, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর 'অনার্স' লাভেও সক্ষম হন নাই। উক্ত গ্রামের যে সকল ছাত্র পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করেন, তাঁহারা ছেলেবেলা হইতেই বিদেশে থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাংলার অধিকাংশ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের staff প্রায় আমাদের staffএরই অনুরূপ। কিন্তু তবুও দেখা যায়, যে গ্রামের বয়স্কেরা ছেলে বাহিরে যাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন; শিক্ষা ব্যাপারে সেই গ্রাম তত বেশী উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ কি?

কারণ কি ইহাই যে, জ্ঞান কখনও পাঠ্যপুস্তকের নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি পাতার মধ্যেই লুপ্ত থাকে না—তাহাকে উদ্ধার করিতে হইলে জগতের আরও অনেক জিনিষ খুঁজিতে হয়; এবং সে রত্নের সন্ধান যে ছাত্র পায়, সেই ছাত্রই পরীক্ষা প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হইতে পারেন? একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের ছাত্রদের কেবলমাত্র memory culuure করিতে উপদেশ না দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জ্ঞান-পিপাসা বাড়াইবার চেষ্টা করাই সঙ্গত।

স্কুল কলেজের শিক্ষাই মানুষকে কিছু সর্ব্বস্ব দানে সমর্থ হয় না। সুতরাং সেনহাটী শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে হইলে সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধেও দু'চারিটী কথা বলা আবশ্যক। পৃথিবীর সকল সভ্য-দেশেই লোকশিক্ষার জন্য একটা বিপুল প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। শুধু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্ত্বাবধীয় গভর্ণমেণ্ট সাধারণ-শিক্ষার প্রচার করিতেছেন। আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট আবার দেশের দরিদ্রতম লোকও যাহাতে অধিক মূল্যের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী পড়িয়া জ্ঞানার্জ্জনের সুবিধা পায়, তাহার জন্য এক শ্রেণীর লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষিত অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে এই সকল লাইব্রেরী সাধারণের জন্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে

দীড় হয়! আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষার অনুষ্ঠান খুবই কম; সুতরাং লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা আমাদের দেশে খুবই প্রয়োজন। নবযুগপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-এ্যাট-ল মহাশয় দেশে লাইব্রেরীর আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমার মনে হয় এদেশে লাইব্রেরীর সার্থকতা হাঁসপাতালের চাইতে কিছুই কম নয়; এবং স্কুল কলেজের চাইতে কিছু বেশী! এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছিনে, অদ্ভুত কথাও বলছিনে । আমি লাইব্রেরীকে স্কুল কলেজের উপরে স্থান দেই এই কারণে যে, এস্থলে লোকে স্বেচ্ছায়, স্বচ্ছন্দচিত্তে স্ব-শিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল-কলেজ বর্ত্তমানে আমাদের যে অপকার করছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয় গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, লাইব্রেরী হাঁসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় লাইব্রেরী হচ্ছে মনের হাঁসপাতাল।"

তথাকথিত অনুন্নতজাতীয় লোকদের শিক্ষিত করিতে না পারিলে যে, আমাদের জীবিত মিলিবে না, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে তাহা ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জাতি হিসাবে কাহাকেও উপেক্ষা করা সমীচীন হইবে না; তা, সে জাতি সমাজের যত নিম্নস্তরেই থাকুক্ না কেন।

সম্প্রতি আমাদের কয়েকটি শিক্ষিত যুবকের প্রচেষ্টায় সেনহাটীর মুচিপাড়ায় একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। উদ্যোক্তৃগণ নিজেদের চেষ্টায় উক্ত পাঠশালার জন্য একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন এবং ওয়েষ্টিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জেলা বোর্ডের সাহায্য-প্রাপ্ত একজন পণ্ডিতকে শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু জেলাবোর্ডের সাহায্যের পরিমাণ অতি সামান্য—বিদ্যালয়টি অবৈতনিক বলিয়া ছাত্রবেতন-স্বরূপও পণ্ডিত মহাশয় কিছু দাবী করিতে পারেন না। তিনি উদ্যোক্তৃগণের নিকট মাসিক অন্ততঃ দুই টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিয়েছেন। উদ্যোক্তৃগণ কৃষ্ণচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউটকে এই সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহারা সাহায্য দান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমরা এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানটির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সুধীবর্গ যদি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এরূপ বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে তাহারা এই অনুষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। উদ্যোক্তৃগণ যদি তাহাদের চেষ্টায় সফলকাম হইতে পারেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহারা সেনহাটীর পার্শ্ববর্ত্তী অপেক্ষাকৃত অনুন্নত গ্রাম সমূহে এক একটি করিয়া এই শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন। ভগবান তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

এইবার গ্রামের স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিব। আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক নিয়মানুসারে আমাদের মেয়েদের এমন বয়সে বিবাহ দিতে হয় যে, প্রকৃত শিক্ষা লাভের সুযোগ ও সময় তাহারা খুবই কম পাইয়া থাকে। কাজেই আমাদের পক্ষে 'স্ত্রী শিক্ষা' কথাটা একরূপ 'অপপ্রয়োগ' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, বহুদিন হইতেই আমাদের গ্রামে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। এবং স্বর্গীয় ত্রিগুণাচরণ সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে সেনহাটীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে কিছুদিন পরে বিদ্যালয়ের কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এমনও সময় গিয়াছে, যখন বিদ্যালয়ের কার্য্য একেবারে স্থগিত ছিল। সম্প্রতি গ্রামবাসী ভদ্রমহোদয়গণের উদ্যোগে এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন, এল্, এম্, এস্ মহাশয়ের সাহায্যে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আপাততঃ বিদ্যালয়ে নিম্ন প্রাইমারী standard পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে। ছাত্রীদের নিকট হইতে শিক্ষার ব্যয়স্বরূপ কিছু গ্রহণ করা হয় না। বর্ত্তমান সময়ে স্কুলে তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত

আছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ৮০। এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সম্প্রতি প্রতিবৎসর কুড়ি টাকা, জেলা বোর্ড বার টাকা এবং শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন দশ টাকা হিসাবে সাহায্য দান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামীণ ভদ্রলোকদের নিকট হইতেও সাহায্য পাওয়া যায়। যাঁহারা এইরূপে গ্রামে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

দাতব্য ভাণ্ডার

মানুষ যখন ধনবান ও শিক্ষিত হয়, তখনি সে দুঃখ নিবৃত্তির সামর্থ্য লাভ করে। কেবল নিজের অথবা নিজ-পরিবারের অভাব মোচন করিতে সক্ষম হইলেই মানবের দুঃখ নিবৃত্ত হয় না। তাহার অন্তরে আরও একটী মহত্তর উদ্যমের প্রবৃত্তি রহিয়াছে—যাহা তাহাকে পরদুঃখকাতর সাধুর অন্ত উদ্গ্রীব করিয়া তুলে। বিধাতা অন্তরালে বসিয়া ও কখনও কখনও দৈব-বর্ষণাদির বিকট গর্জ্জনে ভীত হইয়া মানুষ তাহার অন্তরের এই প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া আত্মসুখকেই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করে। বাংলার নূতন চিন্তাস্রোত এই শ্রেণীর লোকের গতি ফিরাইয়া তাহাদিগকে সত্যের পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, ইহারই ফলে দেশে অসংখ্য লোকহিতসাধন-অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেনহাটীতেও দাতব্য ভাণ্ডারনামক এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে আছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয় অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে এই প্রতিষ্ঠানটীর কার্য্য পরিচালন করিতেছেন এবং সোসাইটি অনুসন্ধান করিয়া অনেক অভাবগ্রস্ত অন্ধ পরিবারের সাহায্যের বন্দোবস্ত করিতেছেন। কর্ম্মচারী ইন্সপিটিউটের সভ্যগণ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

গ্রামের অনেকেই সপ্তাহে একবার করিয়া এই ভিক্ষা দিতে কিছুমাত্র বিরক্তি বোধ করেন না, বরং আনন্দ সহকারে নিজের অন্ন যোগাইতে বাধ্যও হয়েন। যাঁহারা নিঃস্বার্থ সেবাব্রত সম্বলের ভরসায় এই ভিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, আমরা আশা করি, এই অনুষ্ঠানটির আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া ক্রমে তাহারাও মুক্তহস্তে সাহায্য করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রতি সপ্তাহে ছুটি হইতে পঁচিশ সের করিয়া ধানে আড়াই মণ চাউল সংগৃহীত হয়। এই চাউল হইতে নয়টি পরিবারকে নিয়মিত রূপে সাহায্যদান করা হয়। বলা বাহুল্য যে এই সমস্ত পরিবারের জীবন ধারণের অন্য কোন উপায় নাই। বর্ত্তমান বর্ষে মোট তিন মণ চাউল সংগৃহীত ও আটাশ মণ বিতরিত হইয়াছে এবং উহার তণ্ডুল-বিক্রয়লব্ধ ছয় টাকা মাত্র ভাণ্ডারের স্থায়ী তহবিলে জমা রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা সমবেত সুধীবর্গ সমীপে একটি বিনীত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা জ্ঞাত আছি, সেনহাটিতে পূর্ব্বে যে দাতব্য ভাণ্ডারটি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার তহবিলে এখনও একশত টাকারও অধিক Savings bank এ জমা রহিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি যে, ঐ টাকা গ্রামের কোন আকস্মিক দুর্দ্দিনের সাহায্যের জন্য জমা রাখা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে দাতব্য ভাণ্ডার হইতে যে কয়েকটি পরিবারে সাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহাদের চিরদিন এইরূপ public charityর উপর নির্ভর করিয়া রাখা সঙ্গত ও সম্ভবপর হইবে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি কোন কারণ বশতঃ দাতব্য ভাণ্ডারের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে এই সকল অসহায় পরিবারের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, আজ যাহারা মুষ্টি ভিক্ষায় পালিত হইতেছে, এমন কোন উপায় অবলম্বন সম্ভবপর হয় কি না যাহাতে ইহাদের সাধারণজীবন একমুষ্টি তণ্ডুলের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয়।

সুতরাং আমরা প্রস্তাব করি যে, দাতব্য ভাণ্ডারে যে এক শত টাকা জমা রহিয়াছে, তাহা হইতে কয়েকটি চরকা কিনিয়া উক্ত পরিবার সমূহে বিতরণ করা হউক। চরকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যাঁহার আছে এবং যিনি যন্ত্রতে সূতা প্রস্তুত করিতেছেন; এমন একজন মহিলার নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, চেষ্টা করিলে চরকার সাহায্যে সূতা কাটিয়া একজন স্ত্রীলোক অনায়াসে তাঁহার জীবিকার্জ্জন করিতে

পারেন। আমরা আশা করি পুরাতন বাহারা তাহাদের ট্রাষ্টিগণ আমাদের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিয়া নিরক্ষরতা দূর করিবার কয়টির অন্ন সংস্থানের সহায়তা করিবেন।

জনসাধারণ সভা

দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়া মানুষ ক্রমে বুঝিতে পারে যে, ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় না। মানুষ তাই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং লোকমত গঠনের চেষ্টা করে। দেশে এইরূপ সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়—কেবল হুজুক জমাইবার উদ্দেশ্যে নয়।

সেনহাটীর অধিবাসীবর্গকে জনগণ কর্ত্তব্য (civil-right) শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সেনহাটী জনসাধারণ-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার কথা উল্লেখ করিতে সর্ব্ব প্রথমেই ইহার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র ধর মহাশয়ের স্মৃতি জাগরিত হয়। আজীবন মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এই সভার উন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে এই সভার যে ক্ষতি হইয়াছে, আশা করি চিরদিন তাঁহারই ভাবের ভাবুক, তাঁহারই মত খাঁটি দেশ ভক্ত, সেনহাটী বাসের কোন না কোন কৃতী সন্তান সে স্থান পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন এবং এই সভাকে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণেরই সভা করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। বর্ত্তমান জনসাধারণ সভার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—লোকমত গঠন করা। গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় বিধান রাস্তাঘাট সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ইউনিয়ন কমিটী ও লোকালবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জনসাধারণ সভার কার্য্য হউক—উপরুক্ত লোকের দ্বারা ইউনিয়ন কমিটী ও লোকালবোর্ডের সভ্য সংখ্যা পূর্ত্তিকরা এবং তাহাদের দ্বারা গ্রামের সকল হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়া লওয়া জনসাধারণ সভাই দেশের শত মূক নরনারীর দুঃখ-বেদনার কথা গভর্ণমেণ্টসকাশে নিবেদন করিবার "মোসাফেল" স্বরূপ, এবং ইহাই মানুষকে দিউক—কর্ত্তব্যের বোঝা হৃষ্টচিত্তে বহিতে ও স্বত্ব-অধিকার সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে। লোকমত গঠিত ও ঠিকভাবে পরিচালিত হইলে ইহা দ্বারা বুঝিতে পারে; শাসকের co-operation ব্যতীত শাসিতের ইষ্টসাধিত হইতে পারে না—পল্লীর প্রজার সঙ্গে শাসকের সম্মিলন হইবে গ্রামের ইউনিয়ন কমিটিতে, আর সে মিলনগ্রন্থি সুদৃঢ় করিবার ভার ন্যস্ত থাকিবে জনসাধারণ সভার উপর। শুধু সেনহাটীকে নয় বাংলার প্রত্যেক পল্লীতে এই দুইটী প্রতিষ্ঠানকে ভাল করিয়া গড়িতে হইবে। সকলেই জানেন যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যর সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মহোদয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন-বিধি আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন, শীঘ্রই উহা আইনে পরিণত হইবে। উক্ত আইনের ফলে গ্রাম্য ইউনিয়নকমিটি সমূহ এবং পঞ্চায়েৎ কমিটী একত্র মিলিত হইয়া village committee তে পরিণত হইবে। রোনাল্ডসে বাহাদুরের ভাষায় উহা হইবে—

... ... a network of comparative small, self-governing unions, looking after their local needs, imposing the necessary taxation with the assent of the taxed—of course; the taxes which they pay are spent to their own interest and advantage," সেনহাটী জনসাধারণ সভার আজ সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজই হইতেছে—গ্রামের লোককে এই আইনানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত করা। তাহার জন্য কেবল বর্ত্তমান সম্পন্ন লোক-দিগকেই জনসাধারণ সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেই চলিবে না—যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ লিখিতে বা পড়িতে শিখে নাই; তাহাদিগকেও কাছে টানিয়া লইতে হইবে, কারণ, টাক্স যাহারা দিবে আপনাদের সুখ সুবিধার কথাও তাহারা বুঝিতে চাহিবে। এই সকল লোক নিরক্ষর সত্য, কিন্তু মূর্খ নিশ্চিতই নহে। জনসাধারণসভার লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে গ্রাম্যস্বায়ত্তশাসনবিধি আইনে প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেনহাটি village committee গঠন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেই গ্রামের অভাব মোচন সহজ সাধ্য হইবে।

ইউনিয়ন কমিটি

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে সেনহাটী এই হিতকর অনুষ্ঠান স্থাপনের অধিকার পাইয়াছেন। সেনহাটী

চন্দনীমহল, গোয়ালপাড়া, হালীগ্রাম, বন্দিয়া, বাস্তিতিটা, দেয়াড়া ও ভয়রাইল্‌পানা লইয়া বর্ত্তমান সেনহাটী ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। এই ইউনিয়নের পরিমাণ ফল ৩'৯৯ বর্গমাইল এবং কমিটির সভ্যসংখ্যা ৯ জন। গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির বিধানই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ইহারা ইউনিয়নের অন্তর্গত যে সকল গৃহস্থ এক টাকা কিংবা তাহার বেশী চৌকিদারী ট্যাক্স্ দিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট হইতে তদুর্দ্ধ পরিমাণ টাকা sanitation-tax রূপে আদায় করেন। এতদ্ভিন্ন ইউনিয়নের অন্তর্গত খোয়াড় সমূহের আয় এবং জেলা বোর্ডের সাহায্য দ্বারা ইউনিয়নে ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। আলোচ্যবর্ষে sanitation-tax বাবদ ১৩৪৸৵০, খোয়াড়ের আয় হইতে ১০৪৲ টাকা জেলাবোর্ডের সাহায্য ৯৮৯৸৵০ এবং গত বর্ষের উদ্বৃত্ত তহবিল ১০৫।৶৪ পাই মোট ১৩৩৪৸৶৪ পাই আয় হইতে রাস্তা সংস্কারের জন্য ৬৪৩৲, ড্রেনের উন্নতির জন্য ২০০।০, অঙ্গন কাটার জন্য ২৫৲, "সরকার কি" ও "বাস" পরিষ্কার করিবার জন্য ৯৲ এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য নূতন রিজার্ভ্‌ড্ ট্যাঙ্ক খনন করিবার কালে জেলা বোর্ড হইতে যে টাকা লওয়া হইয়াছিল, তাহার আংশিক পরিশোধকল্পে ২০০৲, কমিটীর নিযুক্ত কর্ম্মচারিদের বেতন প্রভৃতি বাবদ ২১৲, ট্যাক্স আদায়কারীর কমিশন বাবদ ৮।০ এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য খরচ বাবদ ১০।০, একুনে ১১৩৪।০ ব্যয় হইয়াছে; এবং তহবিলে রহিয়াছে ২০২।৶৪ পাই।

বর্ত্তমান কমিটির প্রাচীন সভাপতি শ্রীযুক্ত নারদা কান্ত দাস গুপ্ত, বি, এ, মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইউনিয়নের রাস্তাঘাটের বহু উন্নতি সাধন হইয়াছে। তিনি তাঁহার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন—পল্লীর উন্নতি সাধন করিতে। কিন্তু পল্লীবাসিগণ সমস্ত কার্য্যের বোঝা কমিটীর উপর চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া রহিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে গ্রামবাসিগণ ইউনিয়ন কমিটীর কার্য্যের কোন সাহায্য না করিয়া ইহাকে একটি অনাবশ্যক অনুষ্ঠান মনে করিয়া কার্য্যের নানাপ্রকার বি। করিতেছেন। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ ড্রেন সমূহের উন্নতিবিধান কিরূপে সম্ভাবনা হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধার করিবার জন্য গ্রামের শিক্ষিত কতিপয় ভদ্রলোক লইয়া একটী কমিটী গঠিত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় উক্ত কমিটীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে যত সত্বর সম্ভব হয় উক্ত কমিটি তাঁহাদের মন্তব্য সভাপতিকে জ্ঞাপন করিবেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, প্রায় এক বৎসর কাল অতীত হইতে চলিল, তবুও সভাপতি মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও এই কমিটি তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন নাই; কাজেই ড্রেনগুলির সংস্কার সাধন হইতে পারিতেছে না, এবং তজ্জন্য বহু রাস্তার অংশ বিশেষের উন্নতি অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি যে, কেহ কেহ নাকি ইহারই জন্য Sanitation tax প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আরও দুঃখের কথা এই যে গ্রামের কোন কোন ভদ্রলোক বাহি বৎসরে মাত্র একবার অথবা তাহারও ন্যূনকাল গ্রামে বাস করেন বলিয়াই Sanitation-tax এর দ্বারা কোনরূপে উপকৃত হইতেছেন না, এইমত ব্যক্ত করিয়া ট্যাক্স্ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। হালিগ্রাম প্রভৃতি অনুন্নত গ্রামের লোকদিগের নিকট হইতে বাকী ট্যাক্স্ আদায় করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না; কিন্তু সেনহাটীর শিক্ষিত ও উন্নত ভদ্রমহোদয়গণ ট্যাক্স্ বাকী ফেলিয়া তাহা পরিশোধ করিতে আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এইরূপ নানারূপ প্রতিবন্ধক বশতঃ ইউনিয়ন কমিটির দ্বারা পল্লীর যতদূর উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইয়া উঠিতেছে না। গ্রামবাসীর সহানুভূতি না হইলে কমিটির সভাপতির এবং সদস্যগণ যেরূপ কঠোর পরিশ্রমই করুন না কেন, তাঁহাদের শ্রম সার্থক হইতে পারে না। Responsible Government এর এতটুকু কম কিছু পাইলেও আমরা তাহা গ্রহণ করিতে রাজি না বলিয়া যখন আমরা ঘোষণা করিব, আমরা সম্পূর্ণ যোগ্য—পূর্ণস্বরাজ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে, তখন হয়ত আমরা আমাদের অলস ও কর্ম্মে উদাস প্রকৃতির কথা ভুলিয়া যাই।

ধর্ম্ম-সভা

বান্ধব নাট্য-সমিতির সভ্যবিগের চেষ্টায় গত বৎসর সেনহাটীতে একটি ধর্ম্ম-সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। গ্রামবাসীগণের ধর্ম্মালোচনার একটী কেন্দ্র গঠন ও বিভিন্ন স্থান হইতে

প্রকৃত জ্ঞানী ও ধর্ম্মপ্রাণ-মহাত্মাদিগকে এ স্থানে আনাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দান করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। বান্ধব বন্ধুকে প্রত্যহ রবিবার বৈকালে এই সভার অধিবেশন হইবে স্থির হয়, সভার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনের জন্য একটী কার্য্য নির্ব্বাহ-সমিতি গঠিত হয়। সেনহাটীর কয়েকজন প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কার্য্যে আহ্লাদের সহিত যোগদান করেন।

গত আষাঢ় মাসে এই ধর্ম্মসভার চেষ্টায় উদাগ্রাম হইতে একটী মনোরম শিবলিঙ্গ আনাইয়া নদীর তীরে বড় রাস্তার পার্শ্বেই স্থাপন করা হইয়াছে। সেখানে নৈমিত্তিক পূজা, আরতি ও ভোগের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

পল্লীবাসীর মনে ধর্ম্মভাব জাগাইবার চেষ্টা সাধারণের নিকট প্রশংসনীয় হইবে আশা করা যায়; সুতরাং ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠানটীকে সাধারণে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন আমাদের এইরূপ বিশ্বাস। কিন্তু শিবপ্রতিষ্ঠাকার্য্যটী কেহ কেহ ভাল বলিয়া অনুমোদন করেন না। যেখানে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার যেরূপ হউক একটা না একটা বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। সাধারণের ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জনবহুলসহরে দেবালয় স্থাপন করা যাইতে পারে—যদিও সেরূপ দেবালয়ের সংখ্যাও বড় বেশী নয়—কিন্তু সেনহাটীর মত স্থানে যেখানে দু'চারি ঘর বাদে প্রায় সকলেই কোনমতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছেন, সেখানে উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ৺কালীবাড়ীর মন্দির ২০ বৎসরের অধিককাল সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখিতে পায় নাই, এইরূপ স্থানে বৃত্তিবিহীন দেবালয়ে ভবিষ্যতে দেবতার সেবায় ও পূজায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা আছে, অনেকে এইরূপ মনে করেন। আশুতোষ নিজের ব্যবস্থা নিজে না করিলে যে তাঁহার সেবা কোনমতেই হইতে পারে না, এ বিশ্বাস যেমন সত্য; মানুষকে সেই সেবার নিমিত্ত-কারণ হইতে হইবে, এই ধারণাও অনেকের নিকট তেমনই সত্য বলিয়া মনে হয়। আমরা এই বিষয় কোনরূপ আলোচনা করিতে চাহি না। এই আশঙ্কাটী নিতান্ত অমূলক কিনা, উদ্যোক্তৃগণই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউট্

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউটের সৃষ্টি হয়। পল্লীহিতকর কার্য্য সাধারণতঃ সম্পাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যাবলী তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—Library, Debating Club, Nursing-brotherhood. ইহা ব্যতীত ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণ দাতব্য ভাণ্ডারের চাউল আদায় করিয়া উহার সম্পাদককে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন। আমরা তিনটি বিভাগ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিব।

Library লাইব্রেরী:—বর্ত্তমানে লাইব্রেরীর মোট পুস্তক সংখ্যা ৮২৮। তন্মধ্যে ইংরাজী পুস্তকের সংখ্যা ৩৯৫ বাংলা ৪৩৩। লাইব্রেরীর পুস্তক ব্যতীত প্রবাসী, বালক, সমূজপত্র, উদ্বোধন, উপাসনা, নারায়ণ এবং ভারতবর্ষ এই কয়টী মাসিক পত্রিকা এবং দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা রাখা হয়। ইহাদের মধ্যে 'ভারতবর্ষ' ইন্‌ষ্টিটিউটের হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্তের দান। আমরা এই জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কিছু কিছু পুস্তকও আমরা এইরূপ সময় সময় আমাদের পাঠক ও পাঠিকাগণের নিকট হইতে উপহার পাইয়া থাকি। এই প্রসঙ্গে একটী দানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। লাইব্রেরীর আলমারীর বড় অভাব হয় বলিয়া আমরা কাহারও কাহারও নিকট সে অভাবের কথা জানাইয়াছিলাম এবং আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন, এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় আমাদের একটী সুন্দর কাচের আলমারী দান করিয়া আমাদের একটা বড় অভাব দূর করিয়াছেন। কিন্তু আলমারীর অভাব আমাদের এখনও যায় নাই। আশা করি অন্য কোন সহৃদয় মহাত্মার এইরূপ দানের কথা আগামী বৎসর আবার গ্রামবাসিদের গোচর করিতে সক্ষম হইব।

Debating club (তর্কসভা)—ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণের মধ্যে নানাবিষয়ক আলোচনার সুবিধার উদ্দেশ্যেই

debating club স্থাপিত হয়। নির্দ্দিষ্ট বিষয় প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের উপদেশ দ্বারা সভ্যগণের বিশেষ উপকার হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মৌলভীপুর হিন্দু একাডেমীর একাধিক অধ্যাপক স্থানীয় ভদ্রলোক ও স্কুলের শিক্ষকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ আগ্রহ সহকারে এই বিভাগের অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এই সভার ২০টি অধিবেশন হইয়াছে।

Nursing Brotherhood (শুশ্রূষা-সমিতি) —আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগ হইতে ১৪ জন রোগীর শুশ্রূষার ভার লওয়া হইয়াছে। কয়েকটী আবশ্যকীয় জিনিষের অভাবে পূর্ব্ব শুশ্রূষায় বড়ই অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। প্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের একটী Bed pan দান করায় এই অসুবিধার কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল। গত বৎসর শারদীয় সম্মিলনে ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেন, এল, এম্, এস্ মহাশয় একটী Bed pan একটী Hot water Bag একটী Ice Bag ও একটী Feeding cup দান করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং ৺পূজার অব্যবহিত পরেই জিনিষগুলি আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছে। এই দানের জন্য ইঁহারা প্রত্যেকেই কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই জিনিষগুলির, বিশেষতঃ প্রথম দুইটীর অভাব যে কতদূর ছিল, তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, Bed pan ৩০টি বাড়ীতে এবং Hot water Bag ১৮টি বাড়ীতে ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। বয়সের উপযুক্ত সরবরাহ করিবার অসুবিধা-বশতঃই Ice bagটী তত বেশী ব্যবহৃত হয় নাই। আমরা এখনও দুইটি জিনিষের অভাব বড় বেশী অনুভব করিতেছি—একটী ভাল Thermometer ও একটী Douche.

এই জিনিষগুলির অভাব ভিন্ন অনেক সময় ঔষধের অভাবেও অনেকের চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইত না। সেনহাটীতে ভাল ঔষধালয় একটীও নাই, সুতরাং রোগী যখন সাংঘাতিক অবস্থায় উপনীত হইত, তখন সময়োপযোগী ঔষধ পাওয়া যাইত না। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ গত বৎসর ৺ বয়দাচরণ সেন বহুদর্শি মহাশয়ের প্রাণপ্রতিমের কার্য্যফলে সঞ্চিত টাকার সুদ হইতে ঔষধের ট্রাষ্ট হয়। বিপিনবিহারী সেন মহাশয় কতকগুলি আবশ্যকীয় অথচ দুষ্প্রাপ্য ঔষধ ক্রয় করিয়া রাখিবার জন্য কুড়ি টাকা এবং এই বিভাগের অন্যান্য কার্য্যের জন্য কুড়ি টাকা, মোট ৪০ টাকা ইন্‌স্টিটিউটে দান করিয়াছেন। স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুযোগ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র গুহ মহাশয়ের উপদেশ মত আমরা কতকগুলি ঔষধ আনাইয়া রাখিয়াছি; এগুলির ব্যবহারও হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা ডাক্তার বাবুর সদাশয়তার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যখন যে অবস্থায় তাঁহার সাহায্য আমরা চাহিয়াছি, তখনি তাহা পাইয়াছি।

ঔষধগুলির মূল্য সর্ব্বত্র আদায় হয় না, কারণ মূল্য-দানের সঙ্গতি সকলের থাকে না। ইহা ভিন্ন কোন কোন রোগীর ঔষধ ও পথ্য দুইই ইন্‌স্টিটিউট্ হইতে দিতে হইয়াছে। এইজন্য ঠিক ধরিদ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় না করিয়া সামান্য কিছু বেশী লইয়া থাকি। এই বেশী মূল্যে আমাদের ঐ খরচগুলি কতকপরিমাণে পোষাইয়া যায়। কিন্তু Nursingএর জিনিষগুলি সম্বন্ধে একটু সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। বেশী দিন ব্যবহার করিবার পর সেগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সময় সময় ব্যবহার করিবার সময়ও ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। আমাদের একটী Bed pan ইতিমধ্যেই এক বাড়ীতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সুতরাং আমরা মনে করিতেছি যে এখন হইতে কেহ উহা লইতে চাহিলে আমরা উহার মূল্যস্বরূপ কিছু টাকা জমা রাখিব এবং জিনিষটী পূর্ব্বাবস্থায় ফেরত পাঠাইলে জমা টাকা ফেরৎ দিব, ঐ টাকা হইতে সামান্য কিছু কিছু রাখিয়া একটী তহবিলের সৃষ্টি করা যাইবে এবং এই তহবিল হইতে নষ্ট জিনিষগুলির স্থান নূতন জিনিষে পূর্ণ করিতে সক্ষম হইব। প্রয়োজন হইলে সামান্যমত নূতন জিনিষও খরিদ করা যাইতে পারিবে। এ বিষয় বোধ হয় কাহারও কোন অমত হইবে না।

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারকল্পে গত বৎসর কৃষ্ণচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউট্ হইতে ৪৮ প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় ৪টী পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। এ বৎসর পুরস্কারের সংখ্যা ৬টী করা হইয়াছে।

এই পুরস্কারগুলির সম্পূর্ণ ব্যয় ৺ ত্রিগুণাচরণ সেন মহাশয়ের গুণমুগ্ধ জনৈক ভদ্রলোক বহন করিয়া থাকেন। এ বৎসর ডাক্তার শ্রীযুত ঈশচন্দ্র সেন, এল্, এম্, এস্ মহাশয় তাঁহার পরলোকগত পুত্র সুশীলচন্দ্রের স্নেহময় পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে 'সেনহাটীর প্রধান দেবস্থানগুলির ঐতিহাসিক তত্ত্ব' বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে একটী রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন। যাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে এই সকল লোক-হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, আমরা ভগবৎ সমীপে তাঁহাদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

* ইন্‌স্টিটিউটের আয় ব্যয় হিসাব।

আয়—

সভ্যগণের নিকট প্রাপ্য	২৭৬৶০
বিবাহ প্রভৃতি বিশেষ ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে প্রাপ্ত	৫৮৲
ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে এককালীন দান	৪০৷৶০
মহিলাগণের নিকট হইতে	৮৲
৺ বরদাচরণ ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে	৪০৲
মোট আয়—১৭৪৶০	

ব্যয়—

পুস্তক, সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি খরিদ	৫৭৷৹
পুস্তক বাঁধান	৯৷৹
৺ কালীঘাটীর আরতি	৲
১৩২৪ সালের রিপোর্ট ছাপাইবার খরচ ...	
১৩২৪ সালে শারদীয় সম্মিলনের খরচ	১১৷৹
আস্‌বাব পত্র	১৪৷৶০
ঔষধ খরিদ	১৪৲
কয়েকটী অসহায় রোগীর পথ্যাদির ব্যবস্থা	৪৷৹
মোট ব্যয়—১২৭৷৶০	
নগদ তহবিল—	
Nursing—২১৷৹	
সাধারণ—২৫৷৶০	
মোট—৪৬৶০	

পরিশিষ্ট

† গ্রামের লোকসংখ্যা—৩৬৫০

পুরুষ	১৭৫০	স্কুলে গমনোপযোগী ছাত্রসংখ্যা	...৫৩২
স্ত্রী	১৯০০	ছাত্রীসংখ্যা	...২৮০

শিক্ষা

পাঠশালা ও স্কুলের ছাত্র সংখ্যা	৩৬৮
ছাত্রী সংখ্যা	১৪২
কলেজের ছাত্র সংখ্যা ...	৯১
টোলের ছাত্র সংখ্যা	৮
এম, এ	২০
বি, এ ও বি, এস্ সি	৭৫
বি, এল্	২৮

* ১৩২৪ সালের রিপোর্ট ছাপাইবার জন্য বিশেষ-ভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।

শারদীয় সম্মিলনের ব্যয় আমরা কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট হইতে পাইয়া থাকি।

† রোগীর সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। আমরা ধাত্রীর চিকিৎসালয়ের ১৯২৭ সালের রোগীর সংখ্যা এবং বর্ত্তমান বৎসরের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সংখ্যা দিলাম।

কৃষি ও অন্যান্য ব্যবসায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা সময়াভাব প্রযুক্ত সংগ্রহ করিতে পারিলাম না; ভবিষ্যতে চেষ্টা করিব।

সামরিক বিভাগে আবদুল আজিজ, রাজার অন্ত ইতিপূর্ব্বেই মেসোপটেমিয়ার রণাঙ্গনে প্রাণ দিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

বি, ই.	
এল, এম, এস্	
এম, বি	
বার-ম্যাট-ল	
সংস্কৃত উপাধিধারী	

স্বাস্থ্য	
ডোবার সংখ্যা	৬৩
আশ্রয়হীন পূর্ণ অঞ্চলের পরিমাণ	১৮৯।০ বিঘা
ম্যালেরিয়া রোগী	১০০৩
উদরাময় রোগী	৫৬৬
কলেরা	১৩
টাইফয়েড্	২
মিউমোনিয়া	৪
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা	১৬৮
অন্যান্য রোগী সংখ্যা	৪২৬৪
ব্যবহৃত কুইনিনের পরিমাণ	... ৮পাঃ ৬ আঃ
ব্যবহৃত কুইনোক্সিনের পরিমাণ	৫ পাঃ

জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন	
ব্যবসা—	
আইন	৩৪
চিকিৎসা	৫০
অন্যান্য ব্যবসায়ী	৫৭
চাকরী—	
শাসন ও বিচার	
রেল ও ডাক	
শিক্ষা	
পুলিশ	
অন্যান্য	
সামরিক বিভাগ—	
Lt. (I M.S.)	
Sub. Asst. Surgeon	
সুবাদার মেজর	
প্রাইভেট্	

মাসিক কাব্য-সমালোচনা

সাহিত্য, আশ্বাঢ়— চিরসুন্দরী। শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের। রচনাটি বেশ ঝরঝরে ঝরঝরে—তবে ভাবের কোনো বৈচিত্র্য নাই—এভাবের অনেক কবিতাই পড়িয়াছি।

পরিচারিকা, জ্যৈষ্ঠ—এবার প্রথমে সম্পাদিকার তিন তিনটী কবিতা। এ কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমরা কোনো মত প্রকাশ করিব না। তারপর বসন্ত-সেনা শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের। মন্দাক্রান্তা না হয়া থাকিলে ইহার কোনো রসবোধের উপায় নাই। কবিতাটী একটু দীর্ঘ হইয়াছে। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। স্থলে স্থলে প্রকাশ বড়ই জটিল এবং আড়ষ্ট যথা—

"চরণ-নূপুরে কি বাধা বিষয়ে
যে কথা ভাবিয়া দেখেনি কেহ
নৃত্যলহরে বিন্দু বিরহে
লীলা যেন সবে ফিরেছে গেহ"

* * *

"মণির মরীচি মরীচিকা শুধু
তৃষার সলিল তাহাতে নহে
ধূলিকণা যাহা পরশট তলে
তার যে করুণা নদীটি বহে"

* *

কবি সব বেশী বলায়িত তব
তনুর মাঝারে যে ধন জাগে
যাথার মরমে চন্দন সম
দেবের অর্ঘ্যে প্রকাশ মাগে
ধরাজননীর স্তন যে যেন
স্নেহ কমলেও পদ্মবধূ
দেবতার পায় ঠাঁই আছে তার
বিলাসিনী নহে কুসুমবধূ।"

ইত্যাদি পংক্তিগুলিতে ভাব বেশ, স্পষ্ট হইয়া ফুটে নাই।

কবিতার ভাবটি এই—

বসন্তসেনা নাম করিয়া কুলত্যাগ করে নাই—কুলটার গৃহে 'পঙ্কের মাঝে পঙ্কজিনীর মত' জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—সে যেন কামের কিঙ্করী নহে—সে যেন কামের ভগিনী বসন্তসেনার ঐশ্বর্য্যের অন্ত ছিলনা—সে অন্নের জন্য অবরোধের গৃহে বরণ করে নাই—তাহার ধর্ম্ম ধরার চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের প্রাসাদের মত ছিল—ধনী লোকের মণি-উজীরগুলি যেন তাহার পাদপীঠ ছিল।

বসন্তসেনা বিদুষী ছিল। বৃদ্ধকটিকের নাট্যকার বসন্ত-সেনার মুখ দিয়া প্রাকৃতের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত বলাইয়াছেন। সংস্কৃত নাট্যে সীতা শকুন্তলা রত্নাবলী মালবিকা ধারিণী বাসবদত্তা ঔশীনরী ইত্যাদি রাজমহিষীরা প্রাকৃতে কথা বলিয়াছেন—কিন্তু বসন্তসেনা সংস্কৃতে কথা বলিবার সম্মান ও অধিকার লাভ করিয়াছিল। বসন্তসেনা বৃত্তাগীতবাদ্য ইত্যাদি সুকুমার কলাতে অদ্বিতীয় পণ্ডিতা।

দেহমনের এত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও বসন্তসেনা "ধূলিকুটীরে লুটিয়া লুটিয়া নয়নে বরষাজিনী বরষাইতেছে"। সে চাহে প্রেম—সে চাহে মহাপুরুষ চারুদত্তের শ্রীচরণাশ্রয়। সে সাধারণ গণিকা-জীবন যাপন করিতে চাহেনা। সে চাহে গৃহিণী-পদের গরিমা—সে চাহে মানুষের মহিমা। যে চারুদত্ত আপনার সর্ব্বস্ব দীনদরিদ্রকে বিলাইয়া প্রায় সাত দরিদ্র হইয়া আপনার শিশুসন্তানকে ক্রীড়ার জন্য (মৃৎ+শকট) মাটীর গাড়ী কিনিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন—সেই চারুদত্তের মহত্ত্বে ও মনুষ্যত্বে মুগ্ধ হইয়া বসন্তসেনা তাঁহার অনুরাগিণী হইয়াছে—তাহারি চরণে আপনার অনুপম সম্পদ্ দান করিতে চাহে।

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'প্রত্যাবর্ত্তন' একটী সঙ্গীত। শ্রীমান্ শরৎকুমার সেনগুপ্তের "তুমি" কবিতা অন্যান্য "তুমি" কবিতা যেরূপ হইয়া থাকে সেরূপই হইয়াছে। "কণ্ঠ" কথাটী কাব্যরচনার একটী অবশ্য প্রয়োজনীয় শব্দ কিন্তু তাহার একটীও মিল বঙ্গসাহিত্যে নাই। একটী সংস্কৃত কবিতায় "কণ্ঠ" শব্দের সহিত "কণ্ঠ" মিল দেখিয়াছিলাম। বঙ্গসাহিত্যে "কণ্ঠে" কথার সহিত "বণ্টে" মিল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে; সকল কবির কবিতাতেই এই মিলটী দেখিতে পাই। সদংকুমারের কবিতাতেও উহা বাদ পড়ে নাই।

এসংখ্যায় 'শেফালিকা' 'কুলিশধর' ইত্যাদি নূতন নূতন নামের অনেক সাহিত্যসেবী ও সেবিনী আসরে নামিয়াছেন—তবু পরিচারিকা বড়ই নিস্তেজ—বড়ই দুর্ব্বল। এসংখ্যার শেষে অভিনন্দন আর বাদ, প্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা ইত্যাদি বিষয়ক সংসাহিত্য (?) যোগ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তবুও সংখ্যাটী উল্লেখযোগ্য হয় নাই। পরিচারিকা সম্বন্ধে অতঃপর একটু ভয়ে ভয়েই প্রকাশ করিতে হয়, কার্য্যাধ্যক্ষের ধৈর্য্য ও মনে রহিয়াছে কিনা।

ঢাকা সিভিক ও সম্মিলন, জ্যৈষ্ঠ—শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ ঢাকা সাহিত্যসম্মিলন উপলক্ষে "উদ্বোধন" লিখিয়াছেন—কিন্তু উদ্বোধনে সাহিত্য-সেবিগণের আবাহন করিয়াছেন। সাহিত্যসম্মিলনের আবাহন কবিতায় যে সব কথা থাকে অর্থাৎ এদেশে অমুক অমুক সাহিত্যসেবী জন্মিয়াছিল, এখন আর সে সৌভাগ্যদিন নাই, এখন ইহা অতীতস্মৃতির শ্মশান—বঙ্গবাসীর সেবকগণ! এসো—আমরা কাঙ্গাল—অনেক ক্রটিচ্যুতি হইবে, নিজগুণে ক্ষমা করিও ইত্যাদি সবই ইহাতে আছে—কোন নূতন কথা নাই। "সুধাহস্তে এসো নিশিস্তর"—নিশিস্তর

অর্থাৎ ও অতিরিক্ত। "তুচ্ছ কর যৌবন সুন্দর"—'তুচ্ছ', 'উচ্চ' করিলেই ভাল হইত। 'আলো' মুদ্রাকরের হাতে 'আলোর' পড়িয়াছে।

শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস, সি মহোদয়ের 'সমবেদনা' পাঠে মনে হইল, ত্রিগুণ বাবুর যন্ত্রই গুণ থাকুক কাব্যবিচারের গুণটী নাই। অন্ত সাধনার তিনি ত্রিগুণ আনন্দ দিতে পারেন—সাহিত্যসাধনায় আমরা একগুণও পাইলাম না। বি, এস, সি মহোদয়ের শব্দের vibration জ্ঞান থাকিতে পারে, ছন্দস্পন্দের জ্ঞান একেবারেই নহে—রসায়নে জ্ঞান থাকিতে পারে রস সাহিত্যে জ্ঞানের অভাব, বিদ্যুতের প্রবাহ বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত হইতে পারেন, ছন্দের প্রবাহ সম্বন্ধে তিনি বড়ই অজ্ঞ। পাণ্ডিত্যের গড় করিয়া লইলে অনেকস্থলে ছন্দের মাত্রা ঠিক হইতে পারে। ১ম লাইনে ১৪ মাত্রা—৩য় লাইনে ১২ মাত্রা—৪র্থ লাইনে ১৬ মাত্রা। ১২+১৬—২৮। কাজেই গড়ে ১৪ মাত্রা করিয়া হইল। এ নিয়ম চলিলেও হইত। কিন্তু পরে তাহাদের মাত্রার আছে বহুবার। তারপর ছন্দঃপতন ত আছেই।

'অন্বেষণ'—জীবেন্দ্রবাবুর। উল্লেখযোগ্য নহে। কবিতার "তলাসি" কথাটি শুধু উল্লেখযোগ্য। "তলাসি" কিনা "তল্লাস" অর্থাৎ কিনা 'অনুসন্ধান করিয়া'।

আলেখ্য, বৈশাখ—"সাগরের ডাক"। ঐ জীবেন্দ্র বাবুরই। প্রথম পংক্তিতেই ছন্দের গোলমাল জীবেন্দ্র বাবুর ন্যায় প্রবীণ লেখকও ছন্দের ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না, বড়ই দুঃখের বিষয়। শ্রীযুক্তা জয়ন্তী পণ্ডিতের "বাষ্প-শ্রাদ্ধ" তারপরই। সুন্দর কবিতা। কবিতার মধ্যে যে শাস্তীর্ষা বর্তমান তাহাতে মিলের দোষ ধরিবার অবসর নাই।

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের—"শিল্পী" এ কবিতায় কবি একটী সুন্দর তত্ত্বশিল্পী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কিছু গড়ে না—সে যাহা গড়ে তাহার মহিমা সে নিজেই জানে না। যিনি এই বিশ্বের মহাশিল্পী তাঁহারি শক্তি শিল্পীর মধ্যে বাস করিতেছে—শিল্পীর আত্মচৈতন্য লুপ্ত হয়, সে শক্তি তখন জাগিয়া উঠে—শিল্পীর পূর্ণচৈতন্য ফিরিয়া আসিলে সে তাহার সৃষ্টি দেখিয়া নিজেই অবাক হয়। শিল্পী সচেতন ও সচেষ্ট হইয়া বসিলে সে শক্তি আসে না। শিল্পী যায় গড়িতে এক, হইয়া পড়ে আর। যাহা গড়িয়া তুলে তাহার কথা শিল্পী পূর্বে কখনো ভাবেও নাই। গড়িতে গড়িতে শিল্পী সমাধিস্থ হইয়া পড়ে, তখন সে হয় তিন এক ব্যক্তি, সে হয় তখন inspired তারপর যাহা রচিত হয় তাহা যেন শিল্পীর অজ্ঞাতসারে। তারপর সমাধি যখন দূর হইয়া যায়, তখন সৃষ্টি থাকিয়া যায়, তাহা দেখিয়া শিল্পী 'আপনার সৃষ্টি মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। সেক্সপীয়রের একজন বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন যে, সেক্সপীয়রের কল্পনাশক্তি একবার নাট্যের উপাদানের মধ্যে ছাড়া পাইলে তাহা একটী পৃথক জীবনীশক্তি লাভ করিয়া আপনার যাত্রাপথ আপনি তৈয়ার করিয়া লইত। কবি কেবল অন্তরালে সেই শক্তির আদর্শ প্রতিপালন করিয়া চলিতেন। সকল শিল্পীর সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। Scott এর সম্বন্ধে একটী উক্তি আছে যে, প্রভু তাঁহার নিজে তাহার লেখনী ধরিয়া লিখিয়া দিয়া যাইতেন। কবি তাই বলিয়াছেন—

খেলার খাতে গল্প আসে
লোকে তোমায় ধন্য ধন্যে,
নিজেই যেন অবাক হয়ে
কথা তোমার লক্ষ্য হে।
পাথর কেটে পুতুল গড়
দেবতা এসে বাস করে
তোমরা নিজেই চিন্‌তে নারো
আসরেরি আসরে।

"পাড়াগেঁয়ে" নামক কবিতাটি কবি কুমুদরঞ্জনের অনুকরণ। লেখক বোধ হয় কাব্যসাধনার প্রথম ব্রতী।

"সন্ধ্যা" সম্বন্ধেও ঐ কথা। এ সকল কবিতা সমালোচনার যোগ্য নহে। যাহারা নূতন ব্রতী, কিশোর বয়স, যাহাদের মধ্যে ভবিষ্যতের আশার লক্ষণ আছে, তাহাদিগকে তীব্র আঘাত করিয়া নিরুৎসাহ করিতে চাহি না।

"আহ্লাদে দশভুজি" (নবা শিল্পাচার্য্যের দশভুজির অনুসরণে) চঞ্চলকুমার রচিত।

চঞ্চলকুমার—"কুহু" "গুঞ্জর" "ফুলের দওলা" "অন্ধ আবীর" "মত্ত মন" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন—তিনি "আহ্লাদে" হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার ইলেক্‌ট্রিসিটি ফুরাইয়া গিয়াছে একথা সত্য নহে—তিনি যে কাব্যদীপ্তিতে। 'বিদ্যুৎ গঞ্জায়' পঙ্‌ক্তির প্রবর্ত্তক এবং সেই পঙ্‌ক্তিই যে ভবিষ্যতের কবিগণ অবলম্বন করিবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণ তীর্থের দু' লাইনের কবিতা "দুঃখের অভিধা"—তা আবার অনুবাদ—তাতে আবার 'নীরবি' ও 'বোবার লাজ'। কাগজে একবার ছাপা অক্ষরে আপনার নাম দেখিবার জন্যই কি এই দু' লাইনের উৎপাতের সৃষ্টি নহে?

শ্রীকুমার লাল দাশগুপ্তের 'ভৈরবে' —উল্লেখযোগ্য কবিতা। ছন্দটি বেশ মুসিই। ভাবও একটু আছে। 'হাসিখান' ব্যতীত ভাষাবিন্যাসেরও অন্য কোন দোষ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের কবিরত্ন মহাশয়ের 'পরিণতি' কবিতাটী উৎরাইয়া গিয়াছে।

সবুজ পত্র. আষাঢ়—

এসংখ্যায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা—'কালমেঘে' প্রকাশিত হইয়াছে। বরষে পড়া তাহা জানালার পাশে অরক্ষনীয়া কালোমেয়ে নন্দরাণী বসিয়া থাকে—পাশে মেসের একঘরে দরিদ্র একযুবক সকল বিষয়ে ব্যর্থচেষ্টা লক্ষহারা,—দারিদ্র্যের জন্য লেখাপড়া ছাড়িতে বাধ্য—অন্ন-চিন্তায় কাতর। তার একমাত্র সান্ত্বনা ঐ কালমেয়েটীকে ঘেরিয়া

'ঐখানেতেই খুটি কয়েক তান'

ঐমেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুরিয়ে দিল অসীম ব্যবধান।'

কিন্তু হায়———

এসংসারে অচেনাদের দ্বারায় যতন আনাগোনা।
কেবল বাঁশীর সুরের দেশে হই অজানার রইল জানাশোনা।

কতকগুলি সুন্দর সুন্দর উপমায় কবি কালোমেয়েটীর বর্ণনা করিয়াছেন—

"আমি যে ওর দুনয়ন খানি চোখের পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা
ও যেন ভুঁই কুলের বাগান সন্ধ্যাছায়ায় ঢাকা।
একটু খানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে শুক্ল দ্বিতীয়ার।
কালোজলের গহন কিনারাতে।
লাজুক তীরু হরিণ খানি ফিরি ফিরি
কালোপাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে বনে ধীরি ধীরি
রাঙ্গাপায়ে এক পাখী
বৃষ্টিকণা কাকুতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি,
এ যেন মোর ভোরের স্বপন কান্নাভরা।
ঘন ঘুমের নীলাঞ্জনের বাঁধন দিয়ে ধরা।"

এই যে একটী ভাবের সহিত ভাবের উপমা ইহা যে কত ব্যঞ্জনায় ভরা তাহা ভাবুকেরই উপভোগ্য।

এবার সবুজ পত্রে 'দু-চুবার' নামে শ্রীযুক্ত পশুপতি চৌধুরীর একটী গল্প বাহির হইয়াছে, তাহাকে কবিতাও বলা যায়। ভাষা কবিতার মতই।

গল্পের নায়ক প্রথম বিবাহ করেন—একটী পল্লীগ্রামের মাইনার স্কুলের থার্ডমাষ্টারের এক অচঞ্চলা অশিক্ষিতা কন্যাকে। সে চিরদিন বিনাবাক্যব্যয়ে দাসীপনা করিয়া তার স্বামী দেবতার পূজা করিয়া চলিয়া গেল।

তারপর নায়ক বিবাহ করিলেন প্রৌঢ়বয়সে—একটী চঞ্চলা ষোড়শীকে। বলা বাহুল্য তিনি নায়কের মাথায় চড়িয়া বসিলেন। নায়ক প্রথমতঃ ধরিয়া তাহার চরণ সেবা করিয়া তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া শেষে তাহাকেও ইহ-লোক হইতে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

প্রথমা পত্নীর অভাব হওয়ার পর গল্পের নায়ক বলিতেছে—"মীরদা চলে যেতে সমস্ত শরীরটা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলুম—কোন খানটায় তার অভাব রেখে গেছে। বুকে হাত দিলুম সেখানেত কোনো নূতন অভাব নাই—মাথায় দিলুম—সেখানেও তাই—কিন্তু পায়ে হাত দিতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—এইখানেই যে তার সমস্ত অভাব রেখে গেছে! পা-টেপ্‌বার লোকের অভাবইত—সে তার চলে যাবার পথের মধ্যে রেখে গেছে। বুকে হাতবুলোবার অভাব পূরণ করিবার জন্য সে আসে নাই।—"

তারপর একজন এলেন তিনি মাথায় চড়িয়া বসিলেন। তাঁহারও যখন অন্তর্ধান হইল তখন —নায়ক বলিতেছেন—

"আজও যৌবনের রত্নাসন তেমনি খালী পড়ে রয়েছে দেবীর অভাবে। ধূপ ধুনা দিনের পর দিন কেবল ছাই হয়ে ঝরছে—সিংহাসনের চারিদিকে তার কুণ্ডলীকৃত ধূম্রটি ধূমরাশি চড়িয়ে ছড়িয়ে। ঘণ্টা বাজছে—আরতি প্রদীপ 'জ্বলে' 'জ্বলে' নিভে যাচ্ছে। পুষ্পদন্তার পুষ্পপাত্রে উন্মুখ হয়ে রয়েছে—কার চরণ স্পর্শের মানসে।

পায়ের সেবা আমার হয়ে গেছে—মাথার সেবা ও বন্ধ হয়নি—কিন্তু বুকের সেবা আশো বাকী আছে। হুকুম করবার সাধ আমার মিটিছে, হুকুম তামিল করবার সখও পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আবদার শোনবার সাধ আজো অপূর্ণ হয়ে' গেছে।"

লেখক বলিতে চাহেন—'পত্নী শুধু নিরবচ্ছিন্ন চরণ সেবার জন্যও নহে'—মাথায় চড়িয়া বসিবার জন্যও নহে। বুকে হাত বুলাইবার জন্যই জীবনসঙ্গিনী সহধর্মিণীর প্রয়োজন।

এই সূত্রে আমি St. Augustine এর একটী অমূল্য উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভসম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

"If God had designed woman as man's master, He would have taken her from his head, If as his slave, He would have taken her from his feet ; but as He designed her for his companion and equal, He took her from his side."—'De Civilate Dei.'

পরিচারিকা, ভাদ্র।—প্রিয়ম্বদা দেবীর—"চাহনি" কবিতা চলনসই। বিষয়ের চাহনি দেখিয়া লেখিকা বলিতেছেন—

এই কি ক্ষিতির সেই বাষ্পের আবেগ
নীহারিকা যুগান্তের স্মৃতি এ উদ্বেগ।

পৃথ্বী হইতে নীহারিকাবস্থার সেই বাষ্পময় চাহনি এখনো যায় নাই, তাই—

যারে ভয় যেন করা
যাহারে করুণা পান তত্ত্ব আপনার
তারি বক্ষে তরি উঠে যায় শুনিবার।

তারপর পরিমল কুমারের 'অভিমান'। ছন্দোবন্ধে বিশেষ কোনো দোষ নাই। কিন্তু তবু কবিতায় একটুও প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না—বিশেষ কিছু বলিবার না থাকিলে রচনায় হাত না দেওয়াই ভাল। "হাওয়ায় ঘরে দত্তার মত শশাশয়নে" পংক্তিতে কবি কি বলিতে চাহিয়াছেন বুঝা গেল না।

শ্রীকালিদাস রায়ের "আগন্তুকে" ২১টী লাইন মন্দ হয় নাই। যথা—

"দিবারাত্রির মধ্যে যেন জ্যোতির্ময়ী উষা"
"কুশত্তিকার কুশের বনে তুই যে কুসুম ফল।"

"একটী কুসুমপাত্রে মোরা আজকে মধু নাই"—"মধু বিবেকঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ" ইত্যাদির ভাবছায়া স্পষ্ট।

অন্নিক কবির "কাশী" একটী সনেট। দুইএকটী পংক্তি বেশ সুন্দর, যেমন—

"অশুচীর শুচি তুমি—অকামীর কামা
উদাসীর বন্ধন—বিরোধীর সামা"
"স্বরগের মরতের তুমি শুভসন্ধি।"

ইত্যাদি। ছন্দের Rhythmটী বেশ সুশ্রাব্য। সত্যেন্দ্রনাথের মিলের উৎপাত কুসুমরঞ্জনেও দেখা দিয়াছে—

"স্বর্গের দ্বার তুমি—স্বর্গীয় স্বর্গ
ভারতের হৃদি প্রাণ, কণ্ঠের স্বর গো।"

কাশীর সম্বন্ধে একটী ১৪ লাইনের কবিতায় কবি কুসুমরঞ্জনের নিকট হইতে একটীও রসসৈন্ধবময় পংক্তি প্রত্যাশা করি নাই। চতুর্দশ পংক্তির সবগুলিই সুন্দর সরস ও সুরচিত হওয়া উচিত ছিল।

কবি বসন্তকুমার—'ধর্মজ্ঞান' নামক কবিতায় সম্রাট্ আকবরের ধর্মমতের উদারমতের উদাহরণ দেখাইয়াছেন। ধর্মমতে সম্রাট্ আকবরের catholicism ও Toleration চিরপ্রসিদ্ধ। তবে এ উপাখ্যানটী কতটা ইতিহাসমূলক বলিতে পারি না। তবে কাব্য-হিসাবেও কবিতাটি ভাল হয় নাই।

না হইবার একটী কারণ—একই stanzaর মধ্যে দুই প্রকারের মিল দেওয়া যেমন প্রথম stanzaর প্রথম

দুটী মিল 'র' এর শেষ দুটী মিল 'ন' এর। এই চারটীই এক 'র' কিম্বা 'ন' এর মিল হইলে ভাল হইত। তাহা না হওয়ায় Harmonyর অভাব হইয়াছে। 'দেশে' ও 'বেশে'—মিল ভাল হয় নাই। 'পদ্ম' ও 'অর্ক' একেবারে মিলই নয়। আর একটী কারণ ভাষার লাবণীল গতি নাই—কই ঠেকা আছে যথা—

আমারে বিংশি আমার বর্ম্ম
অবসানি যদি লভে সে পদ্ম
কৃপার পাত্র। মানব মর্ম্ম
ভকিতে পদাঘাত
আমি তা' নারিব! ইত্যাদি—

'বনফুল' রচিত "দুর্জ্জা" কবি কুমুদরঞ্জনকে মনে পড়ায়। রচনারীতি একই রকম। ভাবে নবীনতা নাই,—এই ভাবের কবিতা আরো পড়িয়াছি। প্রথম পংক্তিটী যেমন—

দীনতার দুহিতা সে বিনয়ের বনিতা।

সন্দেশখণ্ড, ভাদ্র।—'ঝড়ের দুড়া'—সত্যেন্দ্রনাথের। ছন্দে বেশ চাতুর্য্য আছে—

ঝড়—কবিয়ে তাল—ঘটকায়
ধায়—ঘুলিয়ে এক—ঘটকায়
ঘোল—ঘুঁসিয়ে ফুল—চটকায়
খুব—হুঁসিয়ার সব—দুনিয়ার।

মানসী, ভাদ্র।—অতুলবাবুর বাউলের 'গানে' বিশেষত্ব নাই।

শ্রীকমলাল বসুর "স্বার্থ" মন্দ নহে। "ভিখারী"—শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষের কবিতা। কবিতায় কোনো বিশেষত্ব নাই। কবি বলিয়াছেন—

ভগবান মোরে ভিখারী করিয়া
আজ কে যে আর যেয় না সাড়া।

তাই যদি হয়, তাহা হইলে কিছুদিন নীরব থাকাই ভাল। "সাধের চিরসুখ 'পরে লাগ্‌ল যে অনল" ইত্যাদি পংক্তি একেবারে অচল। কবি 'চির' কথাটীর যত্রতত্র ব্যবহার করিয়াছেন—"দুখীর চির হে ভগবান"—তাহার আর একটী উদাহরণ। ভাষার উপর অধিকার না জন্মিলে এবং রচনার অনায়াস ও লাবণীল গতি অভ্যস্ত না হইলে কবিতা প্রকাশ করা উচিত নহে। মানসী আজকাল কবিতার প্রতি তত মনোযোগ দিতেছেন না বলিয়া মনে হয়, সেজন্য অনেক অপদার্থ কবিতা মানসীতে চলিতেছে।

আজকালকার অধিকাংশ কবিতাতেই ভাবগৌরব দেখিতে পাই না—সকলের নিকট ভাবগৌরব প্রার্থনাও করি না—কিন্তু রচনাটী নির্দ্দোষ হইলে ছন্দোবদ্ধ ভাষা-চরণ মিল অনুপ্রাস থাকিলেই বাঁচিয়া যাই—তাহাও প্রায় কবিতাতেই পাই না।

ছন্দোবদ্ধ ভাষাচাতুর্য্য না থাকিলে শুধু ভাবগৌরব থাকিয়াও লাভ নাই—ভাবগৌরব ত গদ্যেরও থাকিতে পারে। শব্দালঙ্কার যদি না থাকিল, তাহা হইলে গদ্যে ও পদ্যে প্রভেদই বা কি থাকিল?

কবিবর দেবেন্দ্রনাথের "খোকলা মদন" ২৩টী সন্তানে সমাপ্ত। ১২শ গানটীর ভাবটী আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

"বড় দিদি"—শ্রীকালিদাস রায় বিরচিত। কবিতাটি তেমন রসঘন হয় নাই। কবিতাটির যাহা ভাববস্তু তাহাতে রচনা এরূপ তরল ও স্থলে স্থলে নীরস হইবার কথা নহে। বিষয় নির্ব্বাচন হিসাবে কবিকে প্রশংসা করা যাইতে পারে কিন্তু এত সুন্দর বিষয়টীই যদি কবিতার জন্য কবি নির্ব্বাচন করিলেন, তাহাতে বিষয়ের উপযোগী সৌন্দর্য্য ও রসসৃষ্টি করিতে পারিলেন না দেখিয়া ব্যথা অনুভব করিলাম। কবি বাঙ্গলার পারিবারিক জগতে নূতন একটী সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া কবিতায় ফুটাইতে চাহিয়াছেন এ উদ্যম সাধু। গল্পে ও উপন্যাসে অনেক কৃতী লেখক এ সকল সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন—বাংলার কাব্যসাহিত্যকেও ঐ সৌন্দর্য্য নূতন শ্রীদান করুক—ইহা আমরা চাই। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিন্দুর ছেলে" নামক পুস্তকে বাংলার 'বউদিদির' যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অনুপম। কাব্যসাহিত্যে যাঁহারা বাংলার পারিবারিক মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য ফুটাইতেছেন—আমরা তাঁহাদের কবিতা সাগ্রহে পড়িয়া থাকি।

বাংলার পারিবারিক সৌন্দর্য্য অবলম্বন করিয়া কবি বসন্তকুমার আর একটী কবিতা এ সংখ্যায় মানসীতে লিখিয়াছেন তাহার নাম "খোকার মা"। কবিতাটী

মোটের উপর ভালই হইয়াছে—প্রথম দুটী stanza অপেক্ষাকৃত নীরস—বাকীগুলি সুরচিত। ৪র্থ stanzaটী উদ্ধৃত হইল—

এখন তিনি বিদেশ গেলে পরে
লিখতে না হয় চিঠি তাঁরে ভাবনা দিয়ে ঘরে
আসতে জবাব আর সে দেরী নাই
আগের চেয়ে ঘন ঘনই পাই
নয় তা শুধু তোদের ঘরের মত
প্রেমের কথায় ভরা।
ছেলের কথাই আসাযোড়া তাতে
সবার কাছেই যায় যে চিঠি পড়া।

"আগের চেয়ে ঘনঘনই পাই" এই পংক্তিতেই নীচের চারি পংক্তির ভাব ব্যক্ত হইয়াছিল। শেষ চারি লাইনের Explanation দিয়া কবি আগেকার ঐ পংক্তির ব্যঞ্জনার মাধুর্য্য নষ্ট না করিলেও পারিতেন। কবি রবীন্দ্রযোগের এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে নিঃশেষ করিয়া বলিয়া ফেলার ঝোঁক না থাকায় ব্যঞ্জনার সৌন্দর্য্যগুলি আরও সুন্দর হইয়া থাকে। কবি কালিদাস ও বসন্তকুমার এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে নিঃশেষ করিয়া সকল কথা যাহা পাঠক সাধারণের চিত্তনীয়—বলিতে চেষ্টা করেন।

এই কবিতাটিতে কবি বসন্তকুমার অনেকটা সংযমের পরিচয় দিয়াছেন—নিঃশেষ করিয়া বলিবার ঝোঁকে কবিতাকে সুদীর্ঘ না করিয়া অল্পের মধ্যেই অধিক বলিয়াছেন। কবি বসন্তকুমারের বাংলার পারিবারিক সৌন্দর্য্য পর্য্যবেক্ষণের শক্তির পরিচয় আমরা অনেক কবিতাতেই পাইয়াছি তাঁহার কবিত্বশক্তিও আছে। রচনা চাতুর্য্যের অভাবে তাঁহার অনেক কবিতা সাফল্যলাভ করে নাই। সমালোচ্য কবিতাতেও ২।১টি লাইন পড়িয়া দুর্ব্বল, যথা—

আর কাজ মোর ছাড়িয়ে, দেছেন সবে
শুধু খোকার কাজ।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "বনের চাকর"—কবিতাটী বেশ করুণ হইয়াছে। বাংলার পারিবারিক সংসারের আর একটী চিত্র।

"ভাঙ্গা দেওয়াল" শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের।—ভাবটী করুণ—কোথাও উপমার পারীর মাধুর্য্য একটু নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কবি কুমুদরঞ্জন উপমার মালা গাঁথিতে পটু। শুধু উপমায় ভাবব্যঞ্জনা করিতে গেলে অনেক কথাই বলা হয় না অথবা অনেক রসের ইঙ্গিত দেওয়া হয় না। তাহা ছাড়া উপমাগুলি সুষ্ঠান শক্তিসম্পন্ন না হইলে রসোপভোগের ব্যাঘাত জন্মে। আর—মৌলিক উপমা দু'একটীও বেশী দেওয়া কঠিন—অজস্র উপমা দিতে হইলে অধিকাংশ স্থলেই পুরাতন ও চিরপ্রচলিত উপমারই সাহায্য লইতে হয়। অজস্র stereotyped common place উপমা দেওয়া অপেক্ষা দুই একটী অনন্য ও মৌলিক উপমা দিলেই যথার্থ কবিতাটী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। রসের ভাণ্ডারের ঝুলিকার মত একটী উপমাতেই মহাকবিগণের সমগ্র কবিতাই উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে চাণক্যই বলিয়াছেন—"একশ্লোকস্তমো হরি ন চ তারাশতৈরপি" কবি কুমুদরঞ্জনের উপমা দিবার ক্ষমতা বিস্ময়জনক। তাঁহার অনেক মৌলিক নিজস্ব উপমা আছে। যিনি মৌলিক উপমা দিতে পারেন, তিনি যে কেন জীর্ণ-জর্জ্জর নিষ্প্রভ উপমাগুলিকে কাব্যে স্থান দেন। তাহা বুঝিতে পারি না; একই উপমাকে বারা কবিতায় ব্যবহার করাও একটু দুর্ব্বলতা।

বিসর্জ্জন। শ্রীহেমাঙ্গিনী ঘোষ। কন্যা বিয়োগ জননীর শেল।

আলেখ্য, ভাদ্র।—'উদ্বোধন'—সিস্টার নিবেদিতার কবিতা। সিস্টার নিবেদিতাকে আমাদের বুঝিবার কোনো উপায় নাই। আমরা মাসিক পত্রের সমালোচনা কার্য্যে ব্রতী হইয়া পরিচারিকার 'সিস্টার' নামে একটী কবিতার সমালোচনা করিয়াছিলাম—সে কবিতার রচয়িতা কে তাহা আমরা জানি না—এ কবিতাও তাঁহারি রচিত বলিয়া মনে হয়। কবিতাটীতে ভেজ আছে, রচনা চাতুর্য্য আছে, আর আছে নিদারুণ সত্য কথা। শেষ stanza উদ্ধৃত করিতেছি—

ভোগের শকতি নাহি নাহি কোনো ভোগের সাধন
ত্যাগ শুধু মুখের বচন
নাহিক সাহস

প্রেম শান্তি বলি মুখে ভয়ে ছুটি কাহার বিদেশ
একি উপহাস ?
অত্যাচার সহি সহি কথা বলি নিজেরে ভুল না ?
রাখ চিত্ত বাণী
ছাড় আজ প্রবঞ্চনা, মৌন কর মত হৈন্য গ্লানি
এসেছে আহ্বান আজি, রাখ ওরে বঙ্গবাসীর মান
রাজার দেশের লাগি কত গিয়া আজ বলিদান।

"সুখ দুঃখের ভাগী"—শ্রীবিনোদমোহন চক্রবর্ত্তী। অষ্টপদী কবিতা। ছন্দ দোষ যথা—

"এক হস্তে পুঁটুলি বাঁধি (মুছি) অপর হস্তে নয়ন।" ৪ মাত্রা+৪ মাত্রার স্থলে ৩ মাত্রা+৫ মাত্রা। তারপর আবার পংক্তির মধ্যেই ব্র্যাকেটের বন্ধনীতে ২ মাত্রা বেশী।

"তীর্থ যাত্রী" শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

"প্রত্যাবর্ত্তন" কবিতার ছন্দ ও মিলের দোষ আছে বটে কিন্তু ভাবটী নেহাৎ মন্দ নয়।

কথক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিবর 'ছন্দ ও তার' নামক কবিতার মানস ভাণ্ডার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

চিরন্তন এ ভাণ্ডার কিছু না হারায় তার
অনাদি কালের এক বিরাট সঞ্চয়
পরিপূর্ণ হয়ে আছে মহাকাল বসি কাছে
নির্নিমেষ প্রহরায় মেলি আঁখি দ্বয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের "নিবেদন" একটুও নূতনত্ব নাই। প্রকাশ ভঙ্গীতেও সঙ্গীত মাধুরী নাই।

শ্রীঅজিতকুমার সেনের "কবিতার প্রতি"। কবি বলিতেছেন—

কবিতারাণীর কৃপা কটাক্ষ-পাত হওয়ার পর 'সারা বসুন্ধরা অসীম সৌন্দর্য্যে ভরিয়া গিয়াছে, তাঁহার কাছে সৃষ্টির সবই নয়নরঞ্জন হইয়া উঠিয়াছে—'। কবিতা রাণীর কৃপায় নবীন কবি তাহা হইলে যথেষ্টই লাভ করিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্রে যশোলাভ না করিলেও চলিবে এবং অপযশ হইলেও তিনি কাব্য সাধনা ত্যাগ করিবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের সমালোচনায় তাঁহার কিছু আসে যায় না।

'অসময়ে'। বেতালভট্ট প্রণীত। শেষের stanzaটী—

খেতাবের লাগি যে ধনারী গেল, জমা টাকা ছিল যা'
তাও গেল সব পরোপাসনায় উপাধি মিলিল না—
রায় বাহাদুরী মিলিল যখন, তখন সে আছে, ছিঃ
নাই ঘোড়া গাড়ী সহরের বাড়ী খেতাবে হইবে কি ?

ভারতবর্ষ—ভাদ্র। নিমাই—শ্রীহরীন্দ্রমোহন বাগচী। কবিবরের অধুনা প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণ ছন্দে গাথাটী লিখিত। রচনাচাতুর্য্য বেশ আছে—কবিত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই—সন্দেহ একটু জন্মিয়াছে উপসংহারটুকু নিয়ে। শিরের পথে নিরুদ্দেশ যাত্রীরা ও পুণ্যতীর্থ যাত্রীরা তর্ক বিচার করুন এই প্রকারের উপসংহার চলিবে কিনা!

কথা শুনে তাড়া গলায় নিমাই বল্লে—
মা!
তোমার মত বাপের মেয়ে কলঙ্কিনী হতেই পারে না।
আজকে তুমি দাঁড়িয়ে নিজের গ্রামে
যে কথাটী বল্লে মুখে পেটের মেয়ের নামে
সত্য কথার সেই সাহসে। যদি এ কথা
মেয়ে তোমার পায় যদি মা শুনের তাড়ার থাকবে না তুলনা
তোমার অশীষ মাথে
নূতন করে' দান করো তায় আজকে আমার হাতে
দোষ যদি তায় ঘটেও থাকে ভুলে
তোমার মতন সতীর হাতের দান-বলে' আজ
যাবার নিলাম ভুলে।

শ্বশুরঘরে নির্য্যাতীতা দশ-বছরের ছোট বউটির নিরুদ্যমের বর্ণনাটী সুন্দর।

"যত বড় কথা বলে' জল আনে সে সুদূর নদী হতে
কোমরটী তার ঘরে বলে ওপথে
বাঁড়ায় নাক ফুলে;
ছোট কোলে তুলে
মেজকাদের তিন বছরের মেয়ে
নাবায় নাক ভরে তারে বাজার বাধা পেলে
এত করে'ও তবু কালো পায় না সে যে মন
কপালটা এমন"

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসুর "দুটী কথা"। গিরিজা বাবুর ৩২ লাইনের পদ্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদেরও পদ্যগ্রন্থ হইল. কবিতার ভাবটী অতি নিম্নস্তর। ভাবটী চারি লাইনেই প্রকাশিত হইতে পারিত। কবিতার সবগুলি পংক্তিতে মিলও দিতে পারেন নাই। অথচ বঙ্গবাসীর মেঘদর্শনের পর যেটুকু ধৈর্য্য তাহাতে চাতকের তৃষ্ণও মিটিবে না।

নব্য ভারত, শ্রাবণ।—"শোকগাথা।" শ্রীশৈলবালা বসু। কবিবর মধুসূদনের স্মৃতি অবলম্বনে রচিত।

মধু নাম মধু ভাষা	মধুময় মনঃপ্রাণ
মধুর মধুর যাহা	তাহাই করেছ দান
তোমার পরশ ভরে	বাসু মধুময় হোক্
জলদ বর্ষুক মধু	মধুরশ্মি সূর্য্যালোক
চন্দ্রমা ঢালুক মধু	মধু আত্মা মধুময়
বাঙ্গালী হউক ধন্য	গাহি মধু জয় জয়।

"সোনাও" শ্রীবেনওয়ারি লাল গোস্বামী। কবিতার অধিকাংশই মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। আগাগোড়াই ব্যক্তিগত প্রশংসা নিন্দা শ্লেষ ইত্যাদি। তার ভাষা মিল ছন্দ সম্বন্ধে কোনো সাবধানতা নাই। কোনরূপ শৃঙ্খলতা সুসঙ্গতা বা বিধি বিধান না মানিয়া—কবি যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই ছড়ায় গাঁথিয়া দিয়াছেন। পড়তে পড়তে হাসিও পায়—কান্নাও পায়। কিছু কিছু বক্তব্যের আভাস দিতেছি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবাবুর কবিতা শর্করার ন্যায় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তরু রামানন্দবাবু তাঁহার কবিতা প্রশংসাতে ছাপেন না—দেবেন্দ্রবাবু ও চারুবাবু প্রবাসীর লেখিকা—তাদের কবিতা ইন্দিরা ইত্যাদি তাহার লেখিকা ইত্যাদি।

শ্রীযুক্তা সরযুবালা দাশগুপ্তার রচনার সহিত হেমিল কবেটের সহিত তুলনা করা হইয়াছে—রাধাকমলবাবু হীরেনবাবু ও রবিবাবু comet সুধা করুন পান। তারপর আবোল তাবোল অনেক কথার পরে সরযুবালাকে বাদ করা হইয়াছে—প্রমথবাবুর Petrarch এর form এর Sonnet সম্বন্ধে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। তারপর চুপ করে সম্পাদকপত্তি Little learning বাস্ত ঘুরা।" Little learning কার? সম্পাদকপত্তির? না প্রমথবাবুর? না কবির নিজের? তারপর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় সম্বন্ধে কিছু আছে। তাঁহার "দত্তা" গ্রন্থখানির দুর্ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'গৃহদাহ'কে Psychology র জবাই—"শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী"কে কাঁটাল ভাঙ্গা ভুতুড়ী বা শুরুহীন খিচুরী বলা হইয়াছে। "দীনেশ তোমার মাথার রাখুন" দীনেশবাবু কি শরৎবাবুর খুব ভক্ত? রামানন্দ বাবুর রুচিকে সাবানবাধা বিলাসী রুচি বলা হইয়াছে—রামানন্দ-বাবুকে বলা হইয়াছে—

"যখের রবি তাঁরে কেন Sectarian কচ্চো তাই
প্রতিভারে যবো মাক কোরো মাক ব্রাহ্ম ঠাঁই"

রবিবাবুকে influence করিয়া রবিবাবু যেন ব্রাহ্ম চাঁই করিয়া তুলিতেছেন! "মর্ম্মবাণীর পিঞ্জরে তেড়ে যার হয়েছি ঘুঘু পাখী" বোধ হয় "মানসী-মর্ম্মবাণীর" সম্পাদক-দ্বয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তারপর "মানের পরশে জড়িত ছলছল নয়ন পূর্ণ বিষে" "ধনীর পদ লেহন তলা তক্ত বাঙ্গীশ খুঁজে।" ইত্যাদি কত কি আছে। সব ত বোঝা যায় না। তারপর বর্ত্তমান দেশের অবস্থা সমাজের অবস্থা সম্বন্ধেও অনেক Digression আছে। অনেক ধানাই পানাইয়ের পর আবার মর্ম্মবাণীর অন্তরালে দুটী কবির কথা—এদুটী কবি কে কে? পরে দু'খানি কাব্যের নামে বোঝা যায়। 'সন্ধ্যাতারা'র কবি—মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ 'অপরাজিতার' কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন। তাহার পর mysticism লইয়া কত চটা প্রলাপ। তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়কে সপ্তস্বর্গে তোলা হইয়াছে। নগেনবাবু 'কাব্যরসে বসিয়া' 'প্রবন্ধাস্তরে' কি যে উপহার দিলেন আমরা তাহা জানি না। সাহিত্যসেবী হিসাবে নগেনবাবু নিজের ক্ষমতা নিজে বুঝেন তাহার এই অতি-মাত্রিক প্রশংসা বাদ পড়িয়া তিনি নিজে নিশ্চয়ই খুব লজ্জিত হইবেন। বেনোয়ারীবাবু কাহাকেও বাদ করিয়া লজ্জা দিয়াছেন—কাহাকেও আবার বে-আব্রুকী প্রশংসা করিয়া লজ্জা দিয়াছেন। আর প্রত্নতত্ত্ববাবুকে এক হাতে সাধুবাদের লজ্জা দিয়াছেন—অন্য হাতে উপহাসের লজ্জা দিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু (মজুমদার) ও বসন্তবাবুকে (চট্টোপাধ্যায়) সাধুবাদ দিয়া শেষে এই অদ্ভুত কবিতা শেষ হইয়াছে।

ইহাকে সোনাও না বলিয়া "প্রলাপ" বলিলেই ঠিক হয়। ইহাতে না আছে ছন্দ—না আছে ভাল মিল, না আছে ভাষা চয়ন। ইহা পদ্য কি গদ্য তাহাই ঠিক করা যায়। তাহার বক্তব্য যে কি, তাহাও ভাল বোঝা যায় না—কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই—হিসাব বহীন হুঁস কিছুই নাই। এ মাথামুণ্ডু কেন যে প্রবীণ কবি লিখিতেছেন আর প্রবীণ সম্পাদক কেন যে ইহা ছাপিতেছেন—ইহা আমাদের বুদ্ধির অনধিগম্য। ব্যঙ্গাত্মক কাব্যসাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট জিনিস—কিন্তু ইহা তাহাও নহে। ইহাতে কোনো plan নাই কোনো জ্ঞানজ্ঞান নাই—কোনো Sequence নাই Emotional ও নয়—logical ও নয়। আবার স্থলে স্থলে যাহা আছে তাহাকে গদ্যকবিতার রচনা বলিয়া মনে হয় না। যথা—

সখি হুইহুই সখি হুইহুই
স্পষ্ট কথা বলতে গিয়ে
আমি যদি কু—
সখি হু—হু—হু—হু।

পঞ্চানন

উপাসনা

১৪ বর্ষ। } অগ্রহায়ণ—১৩২৫ { ৮ম সংখ্যা।

আলোচনী

আজ রাষ্ট্রীয় শক্তির অভ্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে প্রজাগত বীরধর্ম্মের বিষম-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান হইতে অতীতের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। যুদ্ধের প্রারম্ভে কোন মহাজন কি বলিয়াছেন আজ রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে তাহারই আলোচনা চলিতেছে। আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে Figaro পত্রিকায় দার্শনিকপ্রবর হেনরী বারগসো (Henri Bergson) বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারই আলোচনা করিব। বিলাতী Westminster Gazette এ উহার এক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে ভবিষ্যের গর্ভে তাঁহার সুপরিচিত অধ্যাত্মবাদের আশাবাদীর ধ্বনি পাওয়া যায়। তিনি দেশবাসী যোদ্ধাগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—

"এ যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে কোন সন্দেহই করিও না জারমেণির পরাভব নিশ্চিত। যে দৈহিক ও নৈতিক বলের গুণে জারমেণি যুদ্ধমত্ত, পরিণামে তাহাও তাহারা হারাইবে। যে রসদ, গোলাবারুদ, সেনাসামন্ত পূর্ব্ব হইতে তাহারা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই ও তাহাদের ভরসা? আর এদব যেরূপ অমিতরূপে তাহারা ব্যয় করিতেছে তাহাতে উহা ফুরাইলে পুনঃ সঞ্চয়ের পথ কোথায়?"

জারমেণির টাকা কড়ি প্রচুর তাহা ঠিক, কিন্তু টাকা কড়ির উপায় পথ যে অন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য, তাহারও পথ বন্ধ। তা ছাড়া বৈদেশিক কর্জ্জেরও বড় আশা কম, কেন না যে খাতির সম্ভ্রমে লোকে টাকা ধার দিবে সে খাতির সম্ভ্রম জারমেণি হারাইতেছে। হারাইবার কারণ জারমেনির সর্ব্বগ্রাসী দুরাকাঙ্ক্ষার সকল শক্তিই কিছু না কিছু শঙ্কিত। তা ছাড়া জারমেণি যত গর্জ্জিয়াছিল, তত বর্ষিতে পারিতেছে না, বিজয়ী শক্তিকেই অস্ত্র শক্তি ধার দিতে অগ্রসর হয়, হারিবার অবস্থা দেখিলে কেহ টাকা ধার দিবে না—তাহাদের খাদ্যের জন্য নাইট্রেট সোডা দরকার, মোটরের জন্য আলানী তেল দরকার, ৭ কোটী লোকের খোরাক চাই। অবশ্য এ সবের সঞ্চয় না করিয়া তাহারা যুদ্ধে নামে নাই সত্য, কিন্তু এমন এক দিন আসিবে যখন শস্যভাণ্ডার ফুরাইবে, সোরা বা আলানী তেলের আমদানী বন্ধ হইবে। তখন কেমন করিয়া এ সব তাহারা জোগাড় করিবে?

অর্থ, খাদ্য ও যুদ্ধোপকরণ সম্বন্ধে উহাদের পক্ষে

অসম্ভব। যে পদ্ধতিতে তাহারা যুদ্ধ চালাইতেছে তাহাতে অসম্ভব সেনার জন্ম হইতেছে। এ লোক সংগ্রহই বা কোথা হইতে হইবে? বাহিরে এমন কোন উপনিবেশ নাই যাহা হইতে ইচ্ছামত লোকবল পাওয়া যাইবে। মিত্রশক্তি এখন কেহ নাই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়াইবে। জার্মেণির এ যুদ্ধাভিনয় কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজের রাজ্যবিস্তার, নিজের সভ্যতাশিক্ষা অপরের ঘাড়ে চাপান, নিজের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি, এই জার্মেণির এখন একমাত্র উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যের সঙ্গে জার্মেণ-জাত ব্যক্তিরই সহানুভূতি থাকিতে পারে। অপরের সহানুভূতি ইহাতে কেমন করিয়া হইবে? এ বিষয়ে জার্মেণির সহিত ফ্রান্সের তুলনা করিলে ফ্রান্সেরই সুবিধা ষোল আনা বুঝা যায়। এ পর্য্যন্ত জগতের দরবারে ফ্রান্সের খাতির অসুর। তাহার বন্ধুগুলি সমানে আস্কালন চালাইতেছে। মিত্রশক্তিদের নিকট সাহায্যও পাইতেছে। সমস্ত নিরপেক্ষ জাতির সহানুভূতিও তাহার দিকে; কেন না আত্মরক্ষার্থ সে যুদ্ধে অবতীর্ণ।

একটা ঐশ্বর্য্যশক্তির দিক্ দিয়া হিসাব করিয়া যুযুৎসু-দলের এই অবস্থা বুঝা গেল। অন্যান্য নৈতিক শক্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে কিরূপ দাঁড়ায় দেখা যাউক। মানুষের জীবনব্যাপারে নৈতিকশক্তির খেলাই বরং বেশী প্রবল। ঐশ্বর্য্যশক্তির অভাব অনেক ক্ষেত্রে ইহার দ্বারা পূর্ণ হয়; শুধু তাই নহে—নৈতিকশক্তি পশ্চাতে না থাকিলে শুদ্ধ মাত্র ঐশ্বর্য্যশক্তি বড় কিছু করিতে পারে না। ব্যক্তির মত জাতিরও নৈতিকশক্তি ততদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, যত দিন সে একটা মহান্ পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করে। যখন তার সাধন ভাঙ্গিয়া পড়ে, বুক ফাটিয়া যায়, তখন সে এই আদর্শের মুখ চাহিয়াই আশা, অভয় ও শক্তি লাভ করে।

আধুনিক জার্মাণের এরূপ আদর্শ কি? সে দিন চলিয়া গেছে, যখন তার ঋষি ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা পবিত্র স্বর স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ মহাপাপ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন,— যে দিন তাঁরা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন, ব্যক্তির নিকট ব্যক্তির মত জাতির নিকট জাতির মর্য্যাদা রক্ষা ধর্ম্মের একটা অঙ্গ। প্রুশিয়ার নিকট সমরযন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জার্মেণী সে সব মহাবাক্য ভুলিয়া বসিয়াছে। এই সব মহাবাক্য জার্মেণী অষ্টাদশ শতাব্দীর ও রাষ্ট্রবিপ্লব যুগের ফ্রান্সের কাছেই যে শিখিয়াছিল! আজ সেই জার্মেণির জাতীয় কলেবরে এক নূতন আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। এবং সে নবমন্ত্রকে গুরু Bismark এর নিকট অরণ্যমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছে। "জোর যার মুলুক তার" এই রাজনীতি মন্ত্রের প্রবাদবাক্যটী না কি প্রথম বিসমার্কের মুখ হইতে বাহির হয়। যাই হোক তিনি কিন্তু কখনও এই মন্ত্র অনুসারে কাজ করেন নাই—কেন না Might ও Right এই দুইটা কথার ঠিক্ তাৎপর্য্য আর তফাৎ তিনি বুঝিতেন। তাঁর মতে Might বলিতে সর্ব্বাপেক্ষা বলবানের মনোগত কামা বা তাই। জেতা বিজিতের উপর যে বিধিব্যবস্থা করে, সেই বিধি ব্যবস্থার মধ্যেই তার Might বা স্বত্বের অস্তিত্ব। এই কথাটাই একটা প্রকাণ্ড নীতিশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সার। জার্মেণি এ নীতিশাস্ত্র ছাড়া অন্য নীতিশাস্ত্র জানে না। জার্মেণির পাশব-বল-তন্ত্রের ইহা মূলমন্ত্র। জার্মেণিরা নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্ জাতি মনে করে, কাজেই আত্মপূজার মন্দিরে সে এখন এই মন্ত্রের সাধনা করিতে চায়। তাহাতে শরীর পতনও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

—জার্মেণির নৈতিক বল

পশু বলেরই রূপান্তর—

জার্মেণির এই প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি তার আত্মাহারা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। নিজের অন্তরস্থ পার্থিব ঐশ্বর্য্যশক্তিই তাহাদের বলে এই নৈতিক বলের সংস্কার করিয়াছে। এই বিশ্বাসের বলেই সেবার Reserve এর ভরসা করিয়া বলিয়াছে, নূতন সেনা সংগ্রহের উপায় নাই। ইংলণ্ড তার উপকূল রেখাও করিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই সে নিজেকেই নৈতিক সংকীর্ণতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। সব জীবন সঞ্চারক প্রত্যেক আদর্শ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া সে জগৎসম্মিলনীতে পাঁচজনের সহিত মিলিয়া কাজ করিবার অধিকার হইতেও নিজেকে

ব্যক্তি করিয়াছে—তার এই নৈতিক নির্জ্জনতা তার পতনের হেতু হইয়া দাঁড়াইবে।

সুরাই যাইতেছে কৈফিয়ৎ করিয়া আর্শেলি তার বল ও সাহস অপচয় করিতে বলিয়াছে। কিন্তু হে আমাদের সৈন্যসামন্তগণ, তোমাদের মনের বল, উদ্যম ও কার্য্যশক্তি এমন একটা ভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ হইতেছে যাহার ক্ষয় নাই ফুরাণ নাই। সেই ভাণ্ডার হইতেছে ন্যায় ও স্বাধীনতার আদর্শ। "দেশ রক্ষা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা রক্ষাই হইল তোমাদের উত্তীপনার বিষয়। কাপ-এই উত্তীপনাকে নিভিতে দিবে না। পশুবলকাত উদ্যমের বিরুদ্ধে ন্যায়-জান তোমাদের বাহুবল-জাত উদ্যম। প্রথম শক্তির এটি মধ্যে অপচয় লক্ষণ দেখা দিয়াছে, দ্বিতীয়শক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান। হে স্বদেশবাসিগণ, আশ্বস্ত হও, ন্যায় তোমারই, তোমাদেরই জয় অবশ্যম্ভাবী। তোমাদের প্রচণ্ড প্রেমশক্তির কাছে উহাদের সর্জ্জশক্তি শুকাইয়া যাইবে।" মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। আজ সত্য সত্যই মানবের আত্মা'সকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

"কাল-জলধিতে জলবিম্ব প্রায়
উঠে কত শক্তি কত যশে যায়"
নর-নারায়ণ ধর্ম্মের সহায়—
পাপের পতন পক্ষ চিরদিন।"

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বি, এ।

রাক্ষস

রাক্ষস রাক্ষস তুমি তাই বলি নহ বিভীষণ
ব্যবহারে বিপরীত, তেজে দর্পে বীরেন্দ্র রাবণ।
বিভীষণে কর ঘৃণা ভীষ্ম দ্রোণ আদর্শ তোমার
প্রভুভক্ত মন্ত্রিরাজ পূর্ণ রজোগুণের আধার।
তব বক্ষ ছায়াতলে, রক্ত-রক্তে প্রাণপুষ্টি দিয়া
নন্দরাজগণে তুমি পুত্রস্নেহে রক্ষিলে পালিয়া।
একে একে সবি গেল রাজপুরী হ'লো অন্ধকার
মূষিক উলূকগণে পূর্ণ হলো রাজকোষাগার।
মেলিল অশ্বত্থ বট ডাল পালা নন্দ হর্ম্ম্য'পরে
রাজলক্ষ্মী কেঁদে গেল গৃহ হতে পেচকের স্বরে।
তবু দেব, সেই গৃহে বক্ষে ধরি, প্রভুদত্ত অসি
নন্দরাজ চিতা ভস্মে আগুলিয়া ছিলে তুমি বসি।
তখনো ভরসা তবু চিতা ভস্মে জাগিবে জীবন,
চালিতে লাগিলা তাই তব অশ্রু ভাগীরথীপাবন।
প্রভুর মুদ্রাঙ্ক তুমি রক্ষা করি কৃপণের মত
ক্ষুধাতৃষা-নিদ্রাহীন দিবানিশি ছিলে অবিরত।
প্রাণত্যাগে রাজি তুমি মান ত্যাগে বড়ই কাতর,
শত প্রলোভনে স্থির অচঞ্চল তোমার অন্তর।
লভিয়াছ পরাজয় তবু তুমি জয়োন্নত শির,
হেরেও জিতেছ তুমি দিগ্বিজয়ী সর্ব্বজয়ী বীর।
জয়ী সে যে ম্লান হয়ে তোমা পানে চাহে কৃতাঞ্জলি,
নিরস্ত্র দাঁড়ালে তুমি অগ্নি সম ভারত 'উজলি'।
চাণক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী, দ্রোণ সম রাজনীতি রণে,
মহানীতিশাস্ত্র তুমি জাগায়েছ কৌটিল্যের মনে।
চাণক্যেরও গুরু তুমি হে তপস্বী শুক্রাচার্য্য-সম
হে প্রভুবৎসল মন্ত্রী; ও চরণে নমো নমো নমঃ।

শ্রীকালিদাস রায় বি,এ।

ঘটনার স্রোত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পড়িয়া পড়িয়া আমার তৃপ্তি মিটিল না। আমারই প্রাণের প্রার্থনা যাহা আমার দেহীর উদ্দেশে উত্থিত হইতেছে, আমি যদি আজ ঠিক কবির ন্যায় নিবেদন করিতে পারিতাম। কেন এত করিয়াও আমি আমার মনকে বুঝাইতে পারিতেছি না, যে সুমুল সংগ্রাম আমার মনের মধ্যে উঠিয়াছে, সত্যই তাহা অপ্রাকৃত এবং কঠিন সত্যের কষ্টি পাথরে যাহা যাচাই করিবার, অন্ত আমি একান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছি, বাস্তবিকই তাহার কোনো মূল্য নাই!

এই সময়ে হাতে মণিঅর্ডার লইয়া চাকর প্রবেশ করিল। পিতা খরচের টাকা পাঠাইয়াছেন। টাকাটা বাক্সে তুলিয়া রাখিলাম।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনটা বাজিয়াছে। বেলা যেন পড়িতে চাহে না। ঘরেও মন টিঁকিতেছে না, বাহিরে যাইবারও জো নাই—উভয় সঙ্কটে পড়িয়া আমি হাঁফাইয়া উঠিলাম। গত্যন্তর নাই, চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

পাঁচটার পর কাঁধে চাদরখানা ফেলিয়া বাড়ীর বাহির হইলাম। কোথায় যাইব, তার কোনো ঠিকানা নাই। মোড়ের বাড়ীটার কাছে আসিয়া কখন্ যে দারদেশে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তারও হুঁস ছিল না। অবস্থায় দেখিয়া সে-বাড়ীর চাকর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এই যে ডাক্তারবাবু, চুপ্ করে দাঁড়িয়ে আছেন যে? খবর দিতে হয়।"

"খবর দেব কিনা তাই ভাবছিলাম—" হঠাৎ এ রকম উত্তরটা আমার নিজের কাছেই খাপছাড়া ঠেকিল এবং ঠিক এই ভাবের উত্তর সেও আশা করে নাই—বারেকমাত্র আমার মুখের দিকে তাকাইয়া এই বলিয়া চলিয়া গেল—"দাঁড়ান লক্ষ্মীদিদিকে খবর দিচ্ছি।" একটু পরে বাহিরে আসিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আসুন।" আমি যন্ত্রচালিতের ন্যায় তার অনুসরণ করিলাম। সিঁড়ির শেষে দাঁড়াইলাম—প্রসন্ন হাসিতরা যে-কৌতুকময়ী একখানি স্নিগ্ধ-মূর্ত্তি আমাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আহ্বান করিল।

একখানা চেয়ারে বসিলাম, তিনি "আসছি" বলিয়া চলিয়া গেলেন। নিমেষের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন, একটু দূরে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। একটু হাসিয়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমাকে কহিলেন,—"ডাক্তারবাবু, এমন যেচে না চাইতেই জল—হঠাৎ এতটা অনুগ্রহ যে!" শেষদিকের কথাগুলি চোখা-বিদ্রূপ বিষাক্ত।

আজ ইচ্ছা না ঠিক করিয়াছিলাম, তাই আমিও চট্ করিয়া উত্তর দিলাম—"কেন অন্যায় করেছি কি?"

"ছাঃ অন্যায়ের কথা কেন তুলছেন, তা' ছাড়া ডাক্তারশাস্ত্রটা আমার দখলেও নেই, দখল ত ওতে নেই, আর ওটা আমি বুঝতেও চাইনি—ওটা ঠিক বুঝতে যাওয়ার মানে অনেক গণ্ডগোল। একদল বেটাকে ডাক্তার বলে, আর একদল বলে; ঠিক আর একদল সেই সময়ে চেঁচিয়ে ওঠে। যাক আমি বলতে চেয়েছিলাম—একদিনের পরিচয়েই আপনি ডাক্তারীর পাঁচির ভিতর একেবারে আত্মীয়তার অন্দরে ঢুকতে চান যে—আপনার ত খুব সাহস!"

"নাঃ! নাঃ! এই দিক দিয়ে ভাবিনি; তাই ভাবলাম —একবার খবরটা নেওয়া—"

আমার কথায় বাধা দিয়া কথার সুরে রঙ চড়াইয়া তিনি কহিলেন—"সব রাস্তা ছেড়ে এই রাস্তাটায় আসা এইখানেই ত গোল। হঠাৎ রাস্তাটাতেই—বলত যে তাঁর একচেটে ব্যবসা-বাণিজ্যের লোভে পড়েছেন, এ কথাটা আমরা কেউ

যান্‌ব না—ডাক্তারী শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আপনিও যদি বলেন তা যান্‌ব না। আচ্ছা ধরলাম বেড়াবার পক্ষে এ রাস্তাটা না হয় ভাল, কিন্তু তা ব'লে আমাদের বাড়ী চৌকবার চৌকাটের কাছটা এত ভাল নয়, যে—সেখানটা পরিচারী করার দরকার হতে পারে।"

"কা'কে ডাক্‌ব তাই ভাব্‌ছিলাম, তাই একেবারে না দাঁড়িয়ে একটু পরিচারী করছিলাম।"

"আমি জান্‌লা থেকে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম, ভাবলাম আপনার কি হয়ত হারিয়ে গেছে, তাই খুঁজছেন।"

"না, কৈ? আমার ত কিছু হারায় নি!"

"অবিশ্যি হারিয়েছে।" এই বলিয়া তিনি একটা অর্থ পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। হতাশভাবে আমি কহিলাম—"তা' হলে দেখছি আমার চেয়ে আমার খবর আপনারা বেশী জানেন?"

"ডাক্তারবাবু, সজাগ আত্মদৃষ্টি সব সময়ে যদি প্রখর থাক্‌ত, তা' হলে মানুষে এত ভুল করত না। আমার আরও মজা: মানুষ যখন এক এক অবস্থায় অন্ধ হয়, তখন তার চোখ ফুটিয়ে দিতে গেলে এই হয় যে, সে তার অন্ধতা মানে না, তার দৃষ্টি ঠিক আছে এই বিশ্বাস করে।" আমি অবাক্ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম, এই বাক্‌চতুরা বালিকার নিকট আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, তিনি পুনরায় কহিলেন—"তা' হলে আপনার জিনিষ আপনি ফেরৎ চান না? আমি ত জঞ্জাল ব'লে সেটাকে ফেঁটিয়ে দিচ্ছিলাম, দিদি সেটাকে হুক্ ক'রে তুলে নিয়ে বাক্স-বন্দী করেছে।"

"আপনি কি বল্‌ছেন, আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি—আমার ত মনে পড়ছে না, কি হারিয়েছি?"

"ডাক্তারবাবু, ঠিক হয়েছে, প্রথমে গোল বাধে ত এখানেই—এত বড় একটা জিনিস হারিয়েছেন, অথচ বিন্দু-মাত্র হুঁস নেই!"—এই বলিয়াই আবার সেই হাসি-তীক্ষ্ণ দীপ্ত ছুরির ন্যায় সজাই তাহা আমাকে বিঁধিতেছিল; আমি ক্রমে অস্থির হইয়া পড়িতেছিলাম। তবু তুচ্ছকণ্ঠে কহিলাম—"তা' হলে আমার জিনিস আমাকে ফেরৎ দিন।"

"আপনার জিনিস আমি তুলে রাখিনি—যিনি তুলে রেখেছেন তাঁর কাছে দাবী করবেন; যাবার দিয়ে আপনার যে উপকারটুকু করেছি, সেইটুকু মনে রাখ্‌বেন, তার বেশী পুরস্কার দেবার আপনারও শক্তি নেই,—দেবার আমারও নেই—" এই বলিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহের মতন ঘর হইতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

(৮)

আমি কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম—যখন স্থির হইলাম, তখন দেখি রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছি। সুতরাং বাড়ী ফিরিলাম। জামাটা ছাড়িয়া আবার শুইয়া পড়িলাম; এই যে একটু পূর্ব্বে কথাবার্ত্তা হইল, সেগুলাত নিতান্ত ফাঁকা নহে—আমাকে লক্ষ্য করিয়া এত কথা বলার তাৎপর্য্য কি? কোনো কথাটাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন না কেন? সামান্য পরিচয়ে এতখানি আত্মীয়তাই বা কেন—কৈ কেহ ত আমাকে বাধা দেয় নাই! সাধ যাচিয়া কেন'ও সাধি শুধু প্রশ্ন উত্থিত করিল—মীমাংসা জটিল হইতে জটিলতর হইল।

চোরের মতন যখন পলাইয়া আসিয়াছি—তখন না ডাকিলে আর যাইব না বৎস।

একটু পরেই "ডাক্তার বাবু, ডাক্তারবাবু" করিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে দেখি খোকা বাবুর প্রবেশ। একেবারে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল "উঠুন, আমাদের বাড়ী যেতে হবে।"

"এই ত তোমাদের বাড়ী থেকে আস্‌ছি।"

"না বলে পালিয়ে এসেছেন—তাই আপনার ঘরে ছোড়দি যেচারা কত কন্সুনীই না খেলে। ছোড়দিই ত আমাকে পাঠিয়ে দিলে, বল্লে—"ধরে আনিস্।" আর কি বলেছেন জানেন যদি আপনি এক্ষুনি না যান, তা' হলে সে আর কখ্‌খনও আপনার সাম্‌নে বেরুবে না, কথাও ক'বে না—জানেন না, ছোড়দি ভালমানুষ, কিন্তু যেটা জিদ্ করে বস্‌বে, সেটা কিছুতেই ছাড়বে না।" আমি কহিলাম—"আচ্ছা চল।" বালক-সঙ্গীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞাধারে আবার তাদের বাড়ী গেলাম।

সেই ঘর ও সেই চেয়ারে বসিলাম। জলখাবার সাজাইয়া লইয়া সেই দীপ্ত মুখখানি আবার দেখা দিল। পুনরায়

চেয়ারে বসিলেন ; খোকাবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"সুকুমার লক্ষ্মী ভাইটি, দিদির ঘরে যাও, দিদি একলাটী আছেন ; আমিও যাচ্ছি।" সুকুমার চলিয়া গেল।

তিনি কহিলেন—"জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে এসে দেখি—ঘর ভোঁ, ভোঁ, অমি করে না, বলে-ক'য়ে যায়। আমাকে সবাই মিলে কত কি বলে যে—আমার মুখের 'আব্বি' নেই, কি বলতে কি বলেছিস্, তাই ভদ্রলোকের ছেলে রাগ করে চলে গেল। আপনি একদিনেই এ বাড়ীর লোক হয়ে উঠেছেন, সকলে কত দুঃখু করছিলেন। তাই খোকাকে সাত তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলাম ; ঘাবোক এলেন, এতেই আমার মান রক্ষে, আপনি যে আমার ওপর রাগ করেন নি, এটা এখন সকলে বুঝতে পার্বে। হঠাৎ গেলেন কেন ?

"কি জানি, তা আমি জানি নি। রাস্তায় গিয়ে প্রথম বুঝলাম যে, ঘর ছেড়ে চলে এসেছি—কাজেই বাড়ী চলে গেলাম—কি জানি মনের মধ্যে আমার একটা কি হয়েছে।"

"রোগী সারাতে এসে রোগে ধরল না কি ডাক্তার বাবু ?—সাবধান !"—বলার পর দেখিলাম বেদনুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তাঁর মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। আমি চুপ করিয়া জলখাবার খাইতে লাগিলাম।

"ডাক্তারবাবু, আপনাদের বাড়ী দেখে আস্‌ব, সবাই মিলে কিন্তু যাব।"

"সে কেমন করে হয় ?"

"এই সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তা ধরে সটান আপনার বাড়ী চড়াও হব।"

"এখানে আমি যে একলা আছি !"

"ও মা, বলেন কি ! ছেলেরা কেউ নেই !—আহা দেখে শোনে কে ? আপনার ভারি কষ্ট হয়। আমরা রোজ তরকারী রেঁধে পাঠিয়ে দেব 'খনি—দিদির হাতের রান্না যদি খান—ভুলতে পার্বেন না।" রমণী হৃদয়ের স্বাভাবিক করুণা !—সেইজন্যে আমি মুগ্ধ হইলাম। তিনি আবার কহিতে লাগিলেন—"অন্ততঃ আপনার স্ত্রীও আসতে পারতেন।"

"আমার স্ত্রী—" এই বলিয়াই দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলাম। "আপনার বুঝি···হয়নি—তাই 'স্ত্রী' বলতেই দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল ; ওর জন্যে আর ব্যস্ত হবেন কেন ? একটা করে ফেলেই হয়।"

"করা হয়েছিল, সয় হল না।"

"আহা তিনি বুঝি নেই।"

"আছেন—কিন্তু আমার কাছে থেকেও নেই।"

"সে কি।"

"অদৃষ্টের উপহাসের মতন।"

"একটু খুলেই বলুন না ?" আমি আদ্যপূর্ব্বিক সব ঘটনা বলিলাম।

"এযে দেখছি আমার দিদির কাহিনীর মতনই দুঃখময়। আচ্ছা, আপনাকে আমি গোটাকয়েক প্রশ্ন করব, উত্তর দেবেন ?"

"বলুন,যদি বিশেষ কোন বাধা না থাকে—উত্তর দেব।"

"আপনার নাম কি ?" নাম বলিলাম। "বাবার নাম ?"—বলিলাম।

"শ্বশুরের নাম ?" তাও বলিলাম।

"স্ত্রীর নাম বোধ হয় মনে আছে ?" "খুব মনে আছে।"

"তার নামটি কি ?" আমি কহিলাম—গৌরী !

"ও মা, কি আশ্চর্য্য !—দিদির সঙ্গে এত মিল, শুধু একটুর জন্যে—ও মা ! তা না হলে বেশ হ'ত।" আমি তাঁর দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। তিনি শুধু একটু হাসিলেন।

"দিদির স্বামীর নামের সঙ্গে আপনার নাম যে মিলে গেছে, তাই বুঝি সে নামটী শুনে কাল আপনি অমন করে পালিয়ে গেলেন—কিন্তু আমার দিদির নাম যে—উমা, আর আপনার বাবার নামটার সঙ্গেও দিদির শ্বশুরের নামটা মিলেছে না।

আমি অন্যমনস্ক ভাবে আপনার মনে কহিলাম—"গৌরী উমা—দুই এক, শুধু উমা—গৌরী নয়।" আমার কথায় তিনি হাসিয়া উঠিলেন—"দেবতা হলে এক হতেন, মানুষ কি না,—তাই এক নয়। তাছাড়া আপনার বাবার নাম বাদ্‌গাতে কি বাকি আছেন ?

একদিনেই আপনার এই অবস্থা !

"মিষ্টি মুখের খোঁচা খেতে মিষ্টি হউক, তবু তাহাতে জ্বালা থাকে। তাই কথাটা চাপা দিবার জন্য আমি বলিলাম, আপনার নাম বুঝি লক্ষ্মী।

"হাঁ, বাপমায়ে তাই দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু নামের অনুযায়ী মানুষটি সব সময়ে হয় না, তাই লক্ষ্মী হয়েও আমি দুষ্টু।"

"তবু লক্ষ্মীর সঙ্গে একটা বিষয়ে আপনার খুব মিল আছে, সেটা হচ্ছে আপনার রূপ।"

"শুনতে পাই তাই বটে—এটা একটা বালাই হয়ে দাঁড়িয়েছে—সোড়া কাশীতে এলাম, ভাবলাম একটু বেড়িয়ে বেড়াব, তার কি জো আছে; হাঁ করে হুসারি লোক চেয়ে থেকে, সে আমার বড় লজ্জা করে, কাজেই ইচ্ছে করে বেড়ান বন্ধ করেছি। স্ত্রীলোক কি একটা দেখবার জিনিস।"

"রূপের সৃষ্টি করে ভগবান্ চোখে সৃষ্টি দিয়েছেন, অন্তরে রূপের পিপাসা দিয়াছেন; রূপ না থাকলে আনন্দের আস্বাদন কেউ বোধ হয় পেত না। ফুলের হাসি চাঁদের কিরণ কার না ভাল লাগে? চোখের সাম্নে দিয়ে যদি একটা লীলায়িত গতির ছন্দ, একটা সৌন্দর্য্যের সুর, একটা চিত্তবিনোদ হিল্লোল, যুবতী স্ত্রীর মূর্ত্তিরূপে চলে যায়, তা যদি দেখে কারও মনে আনন্দ হয়, তার জন্যে তাকে দোষ না দিয়ে তার বিধাতাকে দোষ দেওয়া উচিত।"

"যাক সে কবি যাক—হাঁ করে গিলতে আমার মধ্যে যে বিষেটা বেরিয়ে পড়ে, তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক সেটা আর আমাদের বোঝাতে হবে না, উনি সেটা আনন্দ দিয়ে চাকতে যান। পুরুষ মানুষদের বর্ব্বর ব্যবহারই আমাদের ঘরের মধ্যে আটক করে রেখেছে—নৈলে আমাদের শিকল দিয়ে আটকে রাখবে সে ক্ষমতা তোমাদের নেই সে কথায়। আমরা ইচ্ছে করেই তোমাদের সুখের জন্যে স্বেচ্ছাবন্দী। যাক্ গিন্নিকে গিয়ে বলে দিচ্ছি যে তাঁর ডাক্তারটি তবু বাড়ী ঢুকেন না—আবার কবিতারও চাষ করেন।"

"না, না, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন? সকলেই কি ওরূপ করে।"

"আমি ত তার হিসেব জমা করিনি—তবে প্রায়ই।"

"সেটা কিন্তু শিক্ষার অভাবের ফলে।"

"মশায়েরা ত আমাদের চেয়ে ভাল শিক্ষা পান—ওটা স্বভাবে তফাৎ, তবে শিক্ষায় একটু তফাৎ হয়ে, অত সহজে ধরা পড়েন না, এই যা তফাৎ।"

"আপনার কাছে আমি হার মান্লাম। আচ্ছা একটা কথা, এখানে আপনাদের অভিভাবক কে?"

"আপাততঃ আপনি। দেখুন আপনাকে একেবারে জানি শুনিনি, তবু কতটা বিশ্বাস করেছি—পুরুষ মানুষ হলেও আপনাকে বিশ্বাস করি। আহা! আপনি সত্যি যদি আমাদের আপনার লোক হতেন। সে যাহোক, এখন আপনিই আমাদের ভরসা।"

"আমি ত আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত, আমার ভরসায় ত এখানে আসেন নি।"

"একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভগবান্ আপনাকে কত দূর থেকে আমাদের কত কাছে এনে দিয়েছেন—এক দিনে আপনি আমাদের কত আপনার হয়েছেন, তা আপনি জানেন না। অসম্ভাবিত অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই যে সহজ পরিচয় হয়ে গেল, তাতে আমরাও আশ্চর্য্য হয়েছি, আপনিও আশ্চর্য্য হয়েছেন—আমরা এতে খুবই সুখী হয়েছি, আপনিও বোধ হয় অসুখী হবেন না।"

আমার এ কি রকম কথা; লক্ষ্মীর বাক্চাতুর্য্যে আমি মুগ্ধ হইলাম, এত কথা বলিতেছে অথচ সম্পূর্ণ ধরা দিতে চায় না—মনের মধ্যে আশার উদ্দীপনা করে কিন্তু পরক্ষণেই রহস্যের জালে তাহাকে আবার ঢাকিয়া ফেলে।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া লক্ষ্মী আবার কহিতে লাগিলেন—অবস্থা ও ঘটনা—এই নিয়েই আমাদের সংসারে কারবার; তা আবার আমাদের আয়ত্তে নয়—তাই ঘটনার মধ্যে দিয়ে এমন জিনিস এসে পড়ে—যেটা আমরা ভেবে উঠতে পারি নি; অবস্থা এমন বিষয়ের মধ্যে ফেলে, সরল সত্যটাকে খোচড় দিয়ে প্রহেলিকার মতন করে তুলতে হয়—ইচ্ছা হলেও তাকে দমন করে, শাসন করে, এমন আচরণ করতে হয়; সেটা অনেক সময় পীড়ন করে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিরুপায়—তাই স্পষ্ট

জিনিসটাকে মারপ্যাচে আনাই করতে হয়, আর বেটা নাই অথবা যাহা নয় তা'হাই সহজভাবে যাতে চোখে ঠেকে তার জন্যে কওই না আড়ম্বর, কতই না আয়োজন! তাহের যত্ন দিয়ে যার মুখের উন্মেষ ঘটছে, তাকে সইয়ে সইয়ে আনা ভাল, ফুল যেমন ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে কতকটা তেমি—একেবারে ফুল ফোটাতে গেলে তা ঝরে যেতে পারে, একেবারে অসহ্য সুখে মানুষ ভেঙে পড়তে পারে। যাক্, এ সব কথা কি আপনাকে বলছি? আপনি যা শুনতে চান তাই বলি। আমার একটি বান্ধব আছে, তা বোধ হয় বুঝেছেন, তিনিই এখানকার অভিভাবক। তাঁকে আমি দিন কয়েকের ছুটি দিয়েছি—তিনি এলাহাবাদ, দেওঘর, আগ্রা বেড়াতে গেছেন। কাল তার পেয়ে আমি তাঁকে 'তার' করবার জন্য বলেছিলাম, যা করতে যেন আই বড়লোক বেচারা গেছে তাকে ব্যস্ত করা কেন, দেখাই না কি হয়। তাপ্রিস তার করিনি, এলে আমাকে ঠাট্টার চোটে উড়িয়ে দিতেন—উঃ যে তাঁর মুখ, যেন খই ফোটে। বাবা আমাদের রেখে চলে গেছেন, এখানে বসে থাকলে ত আর চলে না—রসদ জোগাতে ত তিনিই। অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করে ত কাটিয়ে দিলেন। এখন চলুন, প্রাণ যেখানে পড়ে আছে, তাঁকে একবার দেখতে চলুন।"

আমি কহিলাম—"কি রকম?"

"ঐ এক রকম, সবে পাশ করে বেরিয়েছেন, এমন একটা রোগী হাতে পড়েছে, তাতে লোভ হয় না?"

"বাস, আপনি তারি ছুটি!"

"সেটা ত আমি আগেই বলে রেখেছি—যদি নতুন কিছু পাবেন ত বলুন। এখন চলুন"—এই বলিয়া তিনি উঠিলেন এবং আমাকেও সঙ্কেত করিলেন। আমিও উঠিলাম।

(৯)

পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রোগিণী শয্যায় শায়িতা, খাটের পাশে একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া লক্ষ্মী কহিল—"দিদি রইল ডাক্তারবাবু আপনি বসুন, আমি দেখি গে যা কি করছেন, একলা বোধ হয় তিনি হিষ্টিরিক্ষ্ যাচ্ছেন।" লক্ষ্মী চলিয়া গেল।

আমার মুখে কথা ফুটিল না—রোগিণী ও নীরব। লক্ষ্মীর অনুপস্থিতিতে সব যেন নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। শেষে আমি জোর করিয়া কহিলাম—"আজ কেমন বোধ করছেন?"

"ভাল।"

"দেখি একবার হাতখানা।"

হাতখানা তিনি বাড়াইয়া দিলেন। উজ্জ্বল দীপালোকে মুখখানা দেখিলাম বড় সুন্দর; দৃষ্টি করুণ—বড় মর্মস্পর্শী! নিবিষ্ট মনে রোগীকে পরীক্ষা করিতেছি—হ্যাং টুং টুং—চুড়ীর শব্দে এবং মৃদু কলহাস্যে আমার চমক ভাঙ্গিল—পিছন ফিরিয়া দেখিলাম—লক্ষ্মী! তার ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিলাম যে একটা ঠাট্টার বিদ্যুৎ প্রবাহে সে আমাকে জলসাইবে। আশ্রয় ভিখারী কাতর দৃষ্টি খানি রোগিণীর উপর নিক্ষেপ করিলাম—তিনি শুধু একটু হাসিলেন মাত্র।

লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে কহিল—"নাড়ী টিপ্‌তে টিপ্‌তে মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে পরীক্ষা করা দরকার এটা কি আপনার ডাক্তারি শাস্ত্রে লেখা আছে?"

রোগিণী তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন—"লক্ষ্মী তুই যাস্ কি করিস যে, তোর কি একেবারে লজ্জা সরম নেই—উনি কি মনে করবেন?"

"সে কথা পরা! এই আর একটু আগেই উনি আমাকে বলছিলেন যে ওঁর মন হারিয়ে গেছে।"

"উঃ! কি অসভ্য, আমি কখ্‌খন এমন কথা বলিনি!"

"রাগ করবেন, তবে আমি শুনতে ভুল করেছি—কিন্তু দেখতে ত আমি ভুল করিনি।"

"দেখলেন আবার কি?"

"কি দেখলাম নাই বা যদি বলি!—আর বলব না-ই বা কেন—আমি দেখছিলাম যে আপনার দৃষ্টি যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে তাই দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে আপনার অন্তরাত্মা যেন বলতে চাইছে—

মন লুকাইতে, মন ছড়াইতে,
মন ভুল ধরি চলি বেড়াইতে,

সহসা যখন দেখিনু চেয়ে
সহসা আমি গো চেতনা পেয়ে
রাশি রাশি তারা মনের আকারে
আমার মনটি ছাপায়েছি !

ডাক্তার বাবু বেরিয়ে ও দুটি আঁখি বুজিয়ে কি রয়ে থাকে—তার কথার বাধা দিয়া যোগিনী পুনরায় কহিলেন—"লক্ষ্মি দিদিটি আমার চুপ কর।"

"না না, দিদি আজকে আমি কারু কথা শুনব না। তুই আমাকে বাধা দিস্‌নে দিদি—আজ আমার ভেতর থেকে আমার অন্তরাত্মা আমাকে বলছে ওরে আজ তোর বড় আহ্লাদের দিন। দুঃখের পাঠশালে চোখের জলে তুই পড়ে আসছিস্—আহ্লাদের কি খুবরি তুই। আজ সুখের পূর্ণ জোয়ারে চোখের জল বাঁধ মানছে না—দিদি আমার বড় ব্যথা পাচ্ছে।" সত্য সত্যই সে কাঁদিতে লাগিল—তার দিদিও অঞ্চলাগ্রে চক্ষু মুছিলেন। আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম কিন্তু আমার চক্ষু ও আর্দ্র হইল। লক্ষ্মীর সমস্তই অদ্ভুত!

লক্ষ্মী আমাকে লক্ষ্য করিয়া গাঢ়স্বরে কহিল—"সত্যিই ডাক্তারবাবু আপনি কি মনে করছেন, না? অনেক দিবসে আপনাকে পরীক্ষা করে দেখ্‌লাম—কিন্তু কোনোটাতেই আপনি উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। কথাবার্ত্তায় আপনার সংশয়কে দৃঢ়তর করে তুলেছি কিন্তু সত্যকে নিজের চোখে কেমন করে পরখ করে নিতে চিন্‌তে হয়, ভগবান আপনাকে সে বুদ্ধি দেন নি—তাই আজ আপনাকে সেটা আমি নিজেই চিনিয়ে দেব। গৌরীকে ঠকা বলে আপনাকে ঠকিয়েছি, সেটা আপনাকে যাচাই করে নেবার জন্যে। পাঁচ বছরের আগেকার ঘটনা মনে করুন, আপনাকে দেখ্‌বামাত্র যে চেন্‌বার সে চিনেছে—এখন বুঝ্‌লেন পুরুষ আর স্ত্রীলোকে প্রভেদ কোথায়। এখন বুঝতে পাচ্ছেন যে কাশীর এই অদ্ভুত প্রকৃতির বালিকার আচরণ—যতটা বেমানান মনে হচ্ছিল, সত্যিকার সেটা ততটা বেমানান নয়—দিদির স্বামীকে দিদিই চিনিয়ে দিয়েছিল, আমি শুধু তার নিজের সম্পত্তি বুঝে নেবার লাগে আমার ভাগে যেটুকু পেয়েছি, তার দাখিলটা দিয়ে সে অস্বীকার করেছি তা মনে হয় না। আমি দিয়ে সুখী হয়েও সম্পূর্ণ সুখী হতে পারিনি—দিদির কষ্ট দেখে। দেখ ডাক্তার দেখ, তুলের মতন যে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, আনন্দে তা আজ কেমন ফুটে উঠেছে। তুমি যে চেয়েছিলে, তা পেয়েছ—ওরা আমার কেউ না, আমার দিদি তোমারই গৌরী!" বলিয়া ধীরে ধীরে সে চলিয়া গেল, ডাকিলাম—শুনু শুনিল না।

গৌরীর দিকে ফিরিয়া তাকাইলাম—তখনও সে কাঁদিতেছে।

(১৮)

লক্ষ্মী ফিরিয়া আসিয়া কহিল—জামাইবাবু আজ তোমায় ছাড়ছিনে কিন্তু—মা বলেন তোমায় খেয়ে যেতে হবে।

আমি কহিলাম—তথাস্তু। লক্ষ্মী আঁধার চলিয়া গেল।

আমি ডাকিলাম—গৌরী।

গৌরী উত্তর দিল—কেন? চেয়ার ছাড়িয়া একেবারে খাটের উপর গিয়া বসিলাম। আবার আমি কহিলাম—গৌরি, আমাকে তুমি কি ভাবতে? বড় মিষ্টুর নয়? নতমেত্রে সে উত্তর দিল—"না"। তার গলায় আওয়াজ ভারি ভারি ঠেকিল। আমি কহিলাম—তুমি কাঁদছ। সে কোনো উত্তর দিল না—দেখিলাম সত্যই সে কাঁদিতেছে।

"এখনও কান্না, গৌরী!"

"কি জানি—আমি পারছিনে।" তাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলাম—গৌরি তুমি আমার, সত্যি তুমি আমার, একবার বল তুমি আমার।" সে শুধু স্থির দৃষ্টিতে নীরবে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল—তার বক্ষ ঈষৎ আন্দোলিত হইল—তার বুকে যে ঝড় উঠিয়াছে এখনও তাহা শান্ত হয় নাই। তার সজল নয়ন দুটি চুম্বন করিয়া কহিলাম—"গৌরি, আমি বিশ্বাসের যোগ্য নই, তবুও তোমার দিব্য, একবার আমাকে বিশ্বাস কর, তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করব না। এখনও যদি তোমার সে ভয় থাকে সেইটুকু তুমি মন থেকে বিদায় করে দাও, এই আমার ভিক্ষা! পারবে না কি?" "পারব।"—বলিয়া আমার বুকে মুখ লুকাইল।

খানিকক্ষণ পরে বাহিরে চুড়ির শব্দ হওয়াতে, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—আমরা উভয়েই বুঝিলাম যে লক্ষ্মী সাড়া দিয়া আসিতেছে। বাহির হইতেই লক্ষ্মী ডাকিল—"দিদি।"

সৌরী কহিল—"আয় লক্ষ্মী আয়।"

ঘরে ঢুকিয়াই দিদিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"তাহলে, জামাই বাবুর ঠাঁই এইখানেই করি!" উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই সে ঠাঁই করিতে লাগিল। রসিকতার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, আমি কহিলাম—"এর মধ্যে সব হয়ে গেল?" বিদ্যুৎ কটাক্ষ হানিয়া সে কহিয়া উঠিল—"জামাইবাবু, এখন একটা মুহূর্ত্তের মতন মনে হবে,—রাত কোন্ দিক দিয়ে ভোর হয়ে যাবে তারও হুঁস থাকবে না। ঐ দেখ দিদি লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ছে। ও দিদি, আমার কি দোষ ভাই, আমাকে ক্ষেপাতে বারণ করে দাও বল্‌ছি। চিলটি মারলেই পাঁটকেলটি খেতে হয় তাকি উনি জানেন না।

সৌরী কহিল—"লক্ষ্মীকে খেঁটিও না, ও কি বল্‌তে কি বলে ফেল্‌বে, ওর কি মুখের আট আছে।" "যাঃ, তাই দিদি, বেশ, বেশ, তা এখন বলবে বই কি—একেই বলে কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি।" সৌরী হাসিতে লাগিল। আমি কহিলাম—"লক্ষ্মীর কথার খোঁচায় মধু আছে।"

"মধু থাকলে হুলের ভয়ও আছে"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া গেল।

একখানা বড় রূপার থালায় সাজাইয়া নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি রূপার বাটি ভরিয়া লক্ষ্মীকে আনিতে দেখিয়া সৌরী কহিল—"লক্ষ্মী তুই অত খাট্‌চিস কেন ভাই, বাবুন ঠাকুরকে বল্লেইত পারতিস।"

প্রশ্ন দৃষ্টিতে দিদির দিকে তাকাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া সে বলিয়া উঠিল—আমাকে আজ কোনো জিনিসে বারণ দিও না, তাহলে আমি কিন্তু একলা ঘরে গিয়ে চুপটি করে কাঁদব।"

"না ভাই তোর আর কেঁদে কাজ নেই, তোর যা প্রাণ চাই করু।"

"দিদি তুই ভাই, এদিকে একটু তাখ্ না, ওগুলোতে বেরালে যেন মুখ না দেয়, আমি খপ্ করে লুচি আনি।"

লক্ষ্মী যখন লুচি আনিল, তখন তার পিছনে পিছনে আর একজন আসিলেন—অনুমানে বুঝিলাম তিনি উহাদের মাতৃদেবী।

থালায় লুচি কয়খানি রাখিয়া লক্ষ্মী আমাকে উদ্বেগ করিয়া বলিল—"জামাইবাবু, উঠে আসুন, লুচি বেলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, আমাই বলে খাতির কর্ব্বে না।"

"যাচ্ছি।"—বলিয়া অগ্রসর হইলাম। মাতাকে লক্ষ্য করিয়া আমাকে দেখাইয়া দিয়া লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে কহিল—"মা এই দেখ তোমার জামাইবাবু।" সৌরী তাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—"লক্ষ্মী কি যে করিস, যার সামনে ঠাট্টা।"

"ও ভুলে গেছি—যার সামনে ঠাট্টা করতে নেই, ওটার ব্যাকরণ দোষ হয়, না, দিদি?"

"চুপ কর্‌লি লক্ষ্মী!"—এই বলিয়া সৌরী তার পা টিপিল।

"মা, দেখ না যত দোষ আমার বেলায়—আমার নিজের ইচ্ছে মত কিছু করতে গেলেই, ওরা আমার বকে মের। যার সামনে ছুটো কথা কইলে যদি পাপ হবে তাহলে তাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাওগে—মা যে আমার, পাপের চেয়ে ঢের বড়। তুমি বলত মা আমি কিছু অন্যায় করেছি—" বলিয়া সে মায়ের কাছে গিয়া ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। মৃদুকণ্ঠে মাতা উত্তর দিলেন"—মা, মা, তোর কাণ্ডকারখানা দেখ্‌লে হয়ত তোকে অনেকেই নিন্দে করবে; তারাও তোকে জানে না। আমি জানি তুই আমার পাগ্‌লা মেয়ে আর তোর মন গঙ্গাজল। আমি যাই ওদিকে রান্নাঘর দেখিগে, তোরা দুবোনে মিলে জামায়ের খাওয়া দাওয়া দেখিস শুনিস—লক্ষ্মী ওকে ভাল করে খেতে দিস, দেখিস।"

"যাও, মা, তোমারও ঐ কথা, কেন আমি কি জামায়ের পাত থেকে কেড়ে খাব!"

"মারে, পাগল, না না, তোকে কি আমি তাই বল্লুম!"

এই সময়ে মাকে নিয়া আমি প্রণাম করিলাম। মৃদুকণ্ঠে তিনি কহিলেন—"দীর্ঘজীবি হও বাবা।"

তিনি চলিয়া গেলেন। আমিও আহারে বসিলাম। লক্ষ্মী কহিল—জামাইবাবু লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ওগুলো খেওনা, পাতে ঠেলে রাখ মিদি খাবে, ঘন—আমি গরম লুচি আন্‌ছি—উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে চট্ করিয়া চলিয়া গেল। এক নিমিষে গরম লুচি লইয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

"দিদি, তুই তাহলে একটু বোস ভাই, আমি আস্‌ছি!" ফিরিয়া আসিয়া দুইখানা জলার বেকারী বিস্কুট এবং কলমূল সহ আবার পাতের সাম্‌নে ধরিয়া দিল। তারপরে আমার পাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"ওমা পোড়া কপাল আমার, এখনও যে দাঁতে কিছু কাটা হয়নি। যাক্ না লুচি ঠাণ্ডা হয়ে কারী হয়ে গেল আবার"—বলিয়া সে মুখখানি ঘুরাইয়া তুলিল।

আমি কহিলাম—"এগুলো ঠাণ্ডা করে তোমার জন্যে রেখে দেব, কিনা তাই এখনও খাইনি লক্ষ্মি!"

লক্ষ্মী কহিল—"লক্ষ্মী কারো প্রসাদ চায় না—লক্ষ্মীর প্রসাদই লোকে চায়।"

"আমি তা দিতে প্রস্তুত আছি।"

"তুমি যা উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ পাঁচ বছরে তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছ—সুতরাং তুমি লক্ষ্মীর কৃপা থেকে চিরশঙ্কিত—তোমাকে সৌরীদান করা হয়েছে এই যথেষ্ট, এখন যাও বলছি।"

আমি আহারে বসিলাম। লক্ষ্মী আবার উঠিয়া গিয়া খানকতক গরম লুচি আনিয়া পাতে দিল।

আমি হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলাম—"কর কি, আমি কি রাক্ষস?"

"না—না ঠাণ্ডাগুলো রেখে দাও—দিদি খাবে 'খন।"

"কেন লক্ষ্মি, আমরাই গরম খাব, তোমরা ঠাণ্ডা।"

"উঃ, ভারি যে দয়া দেখ্‌ছি। শাস্ত্র বলে যা চালাও, সেখানে ত প্রীটেই তোমরা দেখিয়ে আস্‌ছ।"

"কিন্তু শাস্ত্র ত আমি লিখিনি।"

"তুমি নয়, তোমরা ত!"

"তোমার যে শাস্ত্রের ওপরে ভারি রাগ, দেখ্‌ছি।"

"তা নয়, তবে শাস্ত্রের নামে যে সব অন্যায় চালাও, তাতে রাগ কার না হয়? মেয়ে মানুষের মুখে এসব শুন্‌লে তোমরা চমৎকারে, তাই তাদের অবলা করে রাখ্‌তে চাও কিন্তু কেমন মুরুব্বি তোমাদের অত্যাচার নীরবে সহ্য কর্ব্বার বরদ ভগবান তাদের সৃষ্টি করেন নি। মেয়েদের নিজস্ব তোমরা কিছু রেখেছ কি—তার খাওয়া পরা পরের মুখে, পরের চোখে। যাক্ এসব কি বল্‌ছি, দিদি তুই যে মুহ্-মুহ্যার মতন বসে রইলি। আমি কি একলাই বক্‌ব।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"একা মানে রক্ষা নেই সুগ্রীব সহায়।"

"দেখ্ ভাই দিদি, তোর বর তোকে কি বল্লে, তুই এক বর্ণি শোব না তুলিস্ তাহলে আবার সঙ্গে তোর আড়ি। যাই, তাই দই টই ভাল আনিগে।" একটু পরেই দই রাবড়ী আনিয়া পাতের সাম্‌নে ধরিয়া দিল।

খাঁ করিয়া উঠিয়া আসিয়া আমার কান দুইটা মাড়িয়া দিয়া, বিকৃত বিশাইয়া লক্ষ্মী কহিয়া উঠিল—"দেখ; দেখ, হাঁ করে দেখ, এতদিন ঘরে ছিল না, যে একখানা সুন্দর মুখ, তার চেয়ে আরও সুন্দর প্রাণ চোখের বলে তার জীবন্তটাকে বিফল করে তুলেছে। দেখ্‌বার চের সময় আছে, দিদির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে পেটের খিদে মুখবে না। এখন পাতের দিকে তাকিয়ে দেখবার সময়।"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া, আমি খানিকটা জল খাইলাম।

এতক্ষণ পরে গৌরী কহিল—"অত জল খেলে, তাহলে আর খাবে কি?"

আমি রঙ্গ করিয়া বলিলাম—"মিষ্টি খাওয়ার পর জল খেতে হয়।"

গৌরী কহিল—"কি রকম?"

আমি কহিলাম—

"মিষ্টি মধু, মিষ্টি গুড়, আর মিষ্টি চিনি,
তারও চেয়ে মিষ্টি যাদের কাণ্ডী মহেন্দ্র দিদি।"

আমার কথায় উচ্ছ্বসিত হাসির হিল্লোলে ঘরটী পূর্ণ হইয়া গেল।

আমার খাওয়া শেষ হইলে লক্ষ্মী কহিল—"পানিও না"—দিদির দিকে তাকাইয়া কহিল—"তুই ওর পাতে বস, তোর আর কি কি চাই আমি বামুন ঠাকুরকে এইবারে পাঠিয়ে দিচ্ছি, খাই আমিও গেয়ে আসি।" লক্ষ্মী চলিয়া গেল।

আহারাদি শেষ করিয়া সৌরী আমার কাছে আসিল। সৌরীর সঙ্গে ভাবিয়াছিলাম এই ফাঁকে কত কথাই কহিব, কিন্তু কোনো কথাই হইল না—সেও কথা কহিতে পারিল না, আমিও না। সমুদ্র যেখানে গভীর, সেখানে সে যেমন তরঙ্গবিহীন প্রশান্ত ও স্থির, তেমনি মানব হৃদয় যেখানে গভীর অনুভূতিতে পূর্ণ, সেখানে সেও বাক্যহীন নীরব, প্রশান্ত ও স্থির; শুধু এই প্রশান্ত নীরবতাকে ভেদ করিয়া যে একটা নীরব সঙ্গীতের মধুর সুর অন্তঃসলিলার ন্যায় বহিয়া যায়, সমস্ত দুঃখ ও দারিদ্র্যকে তুচ্ছ করিয়া, বিচ্ছেদের আশঙ্কাকে ঠেলিয়া দিয়া, সংসারের সমস্ত নিষ্ঠুরতাকে উপেক্ষা করিয়া, এক হৃদয়কে অপর হৃদয়ের বিচিত্র অবস্থা ও ঘটনার সমাবেশে ঘনীভূত ও একীভূত করিয়া যে মধুর মিলনের নিবিড় বাক্যহীন আস্বাদনকে সঞ্চিত করিয়া সে একটী নূতন আভাসকে চেতনার দ্বারা স্পর্শ করিয়া ফুলে, তাহা ইচ্ছা করিলেই ধরা না, চেষ্টা করায়ও হয় না—তাহা সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে, আপনা হইতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমি ধীরে ধীরে সৌরীকে বুকে টানিয়া লইলাম। সে অপলকনেত্রে আমার মুখে দৃষ্টি স্থাপন করিল—সৃষ্টির প্রথম উষালোকের ন্যায় তাহা স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল, কিন্তু বেদনা রাগ-রঞ্জিত! চাহিয়া চাহিয়া সে নয়ন মুদ্রিত করিল—অমনি পুলক বেদনায় তার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল—আমি গাঢ় চুম্বনের দ্বারা তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম। মোহাবিষ্টের ন্যায় চির-বিরহকাতর এই দুটী প্রাণী সীমাহীন অসম্পূর্ণ ও অতৃপ্ত প্রেমের অবাধিত মিলনমধু নিঃশেষে পান করিয়া যে হারাবার যাবার যন্ত্রণাকে বিস্মৃত হৃদয়ে আত্মহারা হইয়া মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছিল, সেখানে আশার পশ্চাতে ভয় কোনোদিন উঁকি মারিতে পারে না। কতক্ষণ এইভাবে কাটিল হুঁস ছিল না। বাহির হইতে লক্ষ্মীর ডাকে উভয়ের চমক ভাঙ্গিল। সৌরী কহিল—"কে ও লক্ষ্মি আয় ভাই।" লক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া মুখ রাঙ্গাইয়া, গ্রীবা বাঁকাইয়া কহিল—"বাবারে, ডেকে ডেকে সারা হলাম, উত্তর নেই। আর একটু হলেই আমি ফিরে যাচ্ছিলাম। আমি ভাবলাম ঘুমিয়ে পড়লে বা।" কথার গতি ফিরাইবার মানস সৌরী কহিল—"তোর হাতে ওটা কিসের ভাই?" লক্ষ্মী মুখ করিয়া বলিল—বয়লো, বয়লো, বয়লো ডালা—দিদি, আজ যে তাই তোর ফুলশয্যা, তার জোগাড় করেছি।" সৌরী শুধু একটু হাসিল। আমি বলিয়া উঠিলাম—"উঁহু, তা হচ্ছে না, ব্যাকরণ অশুদ্ধ। শ্বশুরবাড়ীতে ফুলশয্যা।"

লক্ষ্মী কহিল—"এ যে শিবস্থান, এখানকার সব উল্টো—আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম—কিন্তু কাঁটার ভয় করি।"

প্রসন্ন দৃষ্টিবাণি আমার উপর সঞ্চালিত করিয়া লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল।—

'যদিও বা ফুলে কাঁটা থাকে ফুলে
তাহাতে কিসের ভয়!
ফুলের উপরে ফেলিবে চরণ
কাঁটার উপরে নয়।'

আর ভাই দিদি, অনেক রাত হল তোকে সাজিয়ে দি।" —বলিয়া সে ফুলের গহনাগুলি একে একে পরাইয়া দিয়া সৌরীকে সত্যসত্যই ফুলের রাণী সাজাইয়া দিল। আমি অবাক হইয়া তার কারুকার্যখানা দেখিতে লাগিলাম। তার দিদির প্রতি কি প্রগাঢ় গভীর ভালবাসা—বালিকার সুনির্মল হৃদয়দর্পণ সংসারের ম্লান ছায়া পড়িয়া এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই, তার স্বাভাবিক চঞ্চলতার মধ্য দিয়া অনাবিল স্বচ্ছ হৃদয়ের অমীম স্নেহধারায়, সে সমস্ত গৃহ ও পরিবারকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! সৌরীর হাতে একগাছি সুন্দর "গড়ের" মালা দিয়া কানে কানে কহিল—"দিদি, ওকে তুই এই একটা পরিয়ে দেনা ভাই।"

"এইবার জো পাইয়া আমি কহিলাম—"বা রে, তোমার জিনিস ও কেন পরিবে দেবে—তোমার ত হাত আছে।

"আছে—কিন্তু আমার যে হাত জোড়া।"—বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল; তার মিষ্ট হাতে মলখানি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"দিদি, তা হলে এখন আমি যাই।—লক্ষ্মী সৌরীর পদধূলি লইল। সৌরী তাকে বুকে টানিয়া লইল।

লক্ষ্মী চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া আমি কহিলাম—আমার প্রণাম?

"ইস্, ওর পায়ে হাত দেব। আজ পাঁচ বছর ধরে দিদির জন্যে তোমার পায়ে প্রণাম করে আস্‌ছি; কিন্তু আজ আর সে দিন নেই—তোমার সঙ্গে আমার পায়ে ধরার সম্পর্ক নয়, আজ নিজের সম্পর্কও বুঝে নিয়েছি, তাই কাণ ধরে তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, পরে নিজেই দেখতে পাবে যে তুমি কত ভাগ্যবান্!" তার পরে দিদির দিকে ফিরিয়া কহিল—"তুই যেমন বোকা 'দিদি' গলে গেলি; একটু মর্ম্ম বোঝাতে হয়। আমি হলে বলাতাম দেখি পদধূলিমযুদায়—লক্ষ্মীকে বাধা দিয়া সৌরী বলিল—"ছি লক্ষ্মি ও কথা কি বলে!"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি বলতে পেরেছিলেন—তখন অন্যে পর কা কথা। আমাদেরও একটা ঘর আছে—নারীরও একটা মর্য্যাদা আছে—শুধু দাসীগিরি করবার জন্য আমরা আসিনি—তা হলে আমাদের শক্তির অংশ বলত না—যে দেশে শক্তির এত অপমান সে দেশ যে কেন শক্তিহীন হয়েছে, তা দেখ্‌তে হলে ত বেশী দূর যেতে হয় না! কি বল জামাই বাবু ঠিক লেকচারের মতন বল্‌ছি—না? তবু তোমায় এইটুকু বলে যাই!—

————রমণীর মন,
সহস্র বর্ষেই সখা সাধনার ধন।"

"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া গেল। আমি প্রশংসাপূর্ণ চোখে মুগ্ধ হইয়া তার কথামৃত পান করিতেছিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

পূজারিণী

কত বিনিদ্র-রজনী কেটেছে শুধু পথপানে চেয়ে
কত দিনমান আঁধারে মিশেছে হতাশের গান গেয়ে,
কত আদরের নিজে হাতে গাঁথা বকুলের মালা হ'তে
ঝরে গেল ফুল, পরাণ আকুল বেঁচে র'ল কোন মতে।
শাঁঝের আঁধারে চাহি বারে বারে নয়ন পলক-তারা
শুধু নিরাশায় প্রাণ কেটে যায়, নিলিমায় ফুটে তারা।
পথের কাঙাল দ্বারে দ্বারে ঘুরি' কিসে চাই নাহি জানি,
মাঝে মাঝে যেন জেগে ওঠে প্রাণে শতজনমের বাণী,
পথের পথিক চলে যায় পথে, আমি পড়ে পথপাশে
ফিরেও চাহে না তবে কেন তা'রা এই পথে যায় আসে ?
নয়নের আগে কুসুম-কলিকা বুক ভরা তা'র মধু
ফুলের নেশায় রঙিন হয়েছে ঠিক যেন নব-বধূ।
তারও ফুটে সুখ ঝরা সে ধরে না গন্ধ বিলায়ে খুসি
হৃদয়ে বাহিরে এত প্রেম নিয়ে গোপনে রাখে কে পুষি ?
ভ্রমর আসিয়া কত গান গায় বুঝি না তাহার মানে
আমারি সমুখে নদী বয়ে যায় কি যে বলে সেই জানে।
মলয় বাতাস জাগায়ে হতাশ কাণে কাণে কি যে কয়
অর্থ বুঝার নাহি সামর্থ আর প্রাণে কত সয় ?
আমার প্রাণের পথ বেয়ে গেছে অজানা অচেনা কত
ধূলায় আঁকিয়া চরণ-চিহ্ন চির-জীবনের মত।
মনে পড়ে যেন চিনেছি তা'দের দেখেছি কোথায় ক'বে
তারা বুঝি পুন আসিয়া আমায় আপনার করে লবে।

কোন দিন কোন মধুময় প্রাতে কা'রে দিয়েছিনু মালা
শুধু সে মালার পরশে কেন গো এত বুকভরা জ্বালা ?
মধুময় প্রাতে যাহাদের সাথে হয়েছিল মোর দেখা
আপনার মনি নিয়েছিনু টানি কে জানে ভাগ্যলেখা।
ফুরাল সে খেলা, বেড়ে এলে বেলা, পিছনে চাহিনু যবে
দেখি কে কোথায়, ফেলিয়া আমায় চলিয়া গিয়াছে কবে।
মানুষের রীতি জানে না পীরিতি নীতি সে নূতন চায়
পুরাতনে কণে পড়ে নাক মনে আনমনে চেয়ে যায়।
তবু মনে পড়ে তারা যেন মোর কোথা আছে এইখানে
শতরূপে যেন রয়েছে প্রকাশ অন্তর মাঝখানে।
নিখিল রূপের মাঝারে রয়েছে অন্ধ দেখিতে নারি
অবিরাম রসে বয়ে চলে যায় সকল তৃষ্ণা হারি ;
ললিত কণ্ঠে গেয়ে যায় গান আমারই কাণের কাছে,
চারু পরশের মাধুরী লভিয়া পরাণ বাঁচিয়া আছে।
হৃদয়ানন্দ কুসুম-গন্ধে নন্দি আমার প্রাণ
মণি-লাবণ্যে উছলিয়া ওঠে আমার সকল গান।—
আমারে ঘেরিয়া আমরি তোমরা আছ কি গোপন করি
ঢালিতেছ শুধু অন্তর-মধু মম প্রাণমন ভরি ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের দান

ভূমিকা—৪০ বৎসর পূর্ব্বে যেদিন বাঙ্গলার কবিসম্রাট 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করিয়া বিশ্বের মাঝে বঙ্গসাহিত্যকে বরণীয় আসনে তুলিয়াছিলেন, সে দিন নবীন বঙ্গসাহিত্যের এক স্মরণীয় দিন। সেদিন—

'বাঙ্গালীর কবি গাহিছে আজিকে ঘরাঘিলনের গান
বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম, বিফল নহে এ প্রাণ'—

কবির এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধ হইয়াছিল। সেদিন এই আধিব্যাধিক্লিষ্ট বাঙ্গালী জীবনও গৌরবময় মনে হইয়াছিল, চারিদিকের ঘনীভূত নৈরাশ্যের মধ্যেও যেন একটু আশার কিরণ দেখিতে পাইয়াছিলাম, এই দারিদ্র্য-পীড়িত দেহকার জাতীয় সাহিত্যসম্পদ্ গৌরবে যেন ধন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেদিন মনে পড়িল, নবীন বঙ্গসাহিত্যের জন্মকথা। শুভমুহূর্ত্তে এই নবীন বঙ্গসাহিত্য ভূমিষ্ঠ হইল, রাজা রামমোহন উহার ভালে জয়টীকা প্রদান করিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ কবিগণ উহাকে বরণ করিয়া লইলেন;—সে আজ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সকল সাহিত্যের নবীন সৃষ্টির সময় প্রতিভাশালী লেখকদিগের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহাদের পুণ্যস্পর্শে সাহিত্যে সজীবতা আসে, শক্তি আসে, নবীনতা আসে। বঙ্গভাষার সেই নবকলেবর ধারণের দিন যে সকল তেজস্বী পুরুষ আপন আপন প্রাণের রস ঢালিয়া সাহিত্যকে সরস করিয়া তুলিয়াছিলেন, যাঁহারা আপন প্রাণ দিয়া জাতীয়সাহিত্য আবার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম, কবির সাগরদাঁড়ীর শ্রীমধুসূদন বাঙ্গলাসাহিত্যকে কি দান করিয়া গিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা—বঙ্গ-সাহিত্য যে তাঁহার নিকট কি পাইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে তখনকার বঙ্গসাহিত্য কি অবস্থায় ছিল তাহা মনে করা আবশ্যক। ঈশ্বরগুপ্তই তখন সমাজের কবি তাঁহার "নীলকরদের কথা" তাঁহার "পৌষপার্ব্বণ" তাঁহার "বড়দিন", ইহারাই তখন শিক্ষিত অশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকের চিত্তবিনোদন করিত। সাধারণ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা—তাহাই ছিল তখনকার রীতি। তাহাতে গভীর ভাব বড় ফুটিত না, সরল পরিহাস-রসিকতাই বেশী দেখা যাইত; অবশ্য ইহা ভাষার দোষে নহে, কারণ সাধারণ কথায়ও অনেক সময় গভীর ভাব ব্যক্ত হয়, এমন কি কোন কোন সমালোচকের মতে ভাষা যতই সহজ হইবে, ভাব ততই গভীর হইবে।

সে কথা এখন থাক। নাটকের মধ্যে মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' রচনার এক বৎসর পূর্ব্বে কেবল পণ্ডিত রাম-নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' প্রকাশিত হয়, "কলিরাজার যাত্রা", "কৌতুকসর্ব্বস্ব বা বিদ্যাসুন্দর" প্রভৃতি যে চার খানি 'নাটক' ইহারও কিছুকাল পূর্ব্বে অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা উল্লেখযোগ্য নহে। ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবক তখনও কেহ বঙ্গভাষার উন্নতি করে চেষ্টা করেন নাই,- রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়দত্ত, সকলেই বিদ্যালয়ে নহে, অন্যত্র ইংরাজী শিখিয়া-ছিলেন, সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব তাঁহাদিগকে পূর্ব্বদিগের স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই সময়ে যে সকল যুবক হিন্দু কলেজ হইতে বাহির হইতেছিল, তাহাদের মন স্বদেশপ্রীতিতে পূর্ণ, ডিরোজিও রিচার্ডসনের উপদেশ পূর্ণ

শিল্পী তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা দেশের কথা নূতন করিয়া ভাবিতে ও স্বাধীনতাকে ভালবাসিতে শিখিল। নিয়ম ঘুসক বিধিবিধান ভাঙ্গিয়া চলিতে, কুলাচারে কুদ্রাচারের ক্ষুদ্র গণ্ডী লঙ্ঘন করিতে, বন্ধন ছাড়িয়া মুক্তির দিকে সহজেই চলিতে, তাহাদের আচার্যগণ উপদেশ দিতেন, আর তাহারাও সেই মত চলিতে চাহিত। এইরূপ অবস্থায় মাইকেল দেখা দিলেন। সামাজিক অবস্থা তাঁহার রচনায় স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহার সাহিত্য সাধনা আরম্ভের পরে আজ ৬০ বৎসর হইতে চলিল, তাঁহার নিকট আমরা কি পাইয়াছি তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক

নাটক—তাঁহার নাটক :—শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী। তাঁহার প্রথম বাঙ্গলা রচনা 'শর্মিষ্ঠা', দেবযানীর উপাখ্যান লইয়া রচিত এবং বঙ্গভাষার প্রথম পৌরাণিক নাটক। ইহার আর একটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য,—সংস্কৃত সাহিত্যের কোনও প্রভাব, যেমন প্রস্তাবনা বা মঙ্গলাচরণ বা ভরতবাক্য,—সে সব কিছুই ইহাতে নাই। 'পদ্মাবতী'র উপাখ্যান মৌলিক কিন্তু নৃত্যগীতপূর্ণ এবং গ্রীক পুরাণের আদর্শে রচিত। তাঁহার তৃতীয় নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'—বাঙ্গলার প্রথম ঐতিহাসিক ও প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। এই তিনটী নাটকে তিনি তিন বিভিন্ন পদ্ধতি দেখাইয়া গিয়াছেন। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ আজ নাটকের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধ ইহাও তাঁহার অসম্পূর্ণ "রিজিয়া"র প্রথম নাটকে দেখা দিয়াছিল। তাঁহার "একেই কি বলে সভ্যতা"র নববঙ্গকে এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"তে প্রাচীন বঙ্গকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে—এই দুইটি বঙ্গভাষার প্রথম শ্রেষ্ঠ প্রহসন। এখন কি আজকাল নাটকে পর্যন্ত দীনবন্ধুর এই দুই প্রহসনের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। নাট্যসাহিত্য এইরূপ ব্যাপকভাবে বহু তাঁহাকে বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের অন্নদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

তিলোত্তমাসম্ভব—তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব' রচনাবিষয়ে ইংরাজীপদ্ধতির অনুসারী। বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ আমরা ইহাতেই প্রথম দেখিতে পাই। বাঙ্গলায় অমিত্রাক্ষর প্রবর্তন করা সম্ভব কি না, তাহা লইয়া ৺যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার তর্ক হইয়াছিল, সেই তর্কের ফলে, বিবিধসাহিত্যসমুদ্রের করালী তাঁহা যাহা পায় নাই, মাইকেল বাঙ্গলা তাহার তীরে করিয়া দিয়াছেন ইহার ভাষার সম্বন্ধে, বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছিলেন, "If Indra had spoken, he might be supposed to speak in such a language."

মেঘনাদবধকাব্য—এই গ্রন্থে সমাপ্ত তাঁহার অতুলনীয় মহাকাব্য মেঘনাদবধের সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহার বিষয়ে প্রাচ্যপ্রতীচ্য বিদেশীয়গণ স্বাধী বলিয়া গিয়াছেন,—"ই একটা genius" তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের ম· বিতীয় কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় ত নাই-ই, সমস্ত ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য উদাহরণ পাওয়া দুষ্কর।" কেবল বিদেশীয়গণ কেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত—নবীন ও প্রাচীন সকল সমালোচকই ইহার প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ইহার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার "জীবন-স্মৃতি"তে সে ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক, "মেঘনাদবধে"র যথোচিত প্রশংসা বা আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। তাহার পর আরও মহাকাব্য রচিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও "মেঘনাদবধ" শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতা—বঙ্গসাহিত্যকে মধুসূদন আর এক জিনিষ দিয়া গিয়াছেন,—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় এরূপ কবিতা কেহই লিখেন নাই। এরূপ কবিতা ইউরোপে 'সনেট' নামে পরিচিত এবং ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গ। স্পেন্সার, স্যার ফিলপ সিড্‌নি, মিল্টন, ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ, টেনিসন, রসেটী—ইহাদের সনেট ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সনেট-পঞ্চাশৎ লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাও এই আকারে লিখিত। মাইকেলের দুই একটি

চতুর্দ্দশপদী কবিতার উল্লেখ করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই একশতটি কবিতার মধ্যে ৩।৪টি ভিন্ন আর সকলগুলিই বিষয়বিশেষ উপলক্ষে ও বিশেষভাবে রচিত। দুইটি পংক্তি প্রায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে—

"চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে,
করি ভস্মরাশি, ফেল কপনাশা জলে।"

'আমরা' শীর্ষক কবিতায় কবি লিখিয়াছেন,—

"আকাশ পরশি গিরি গর্ব্ব করে,
নিশিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে,
তাদের সন্তান কিবে আমরা সকলে?
আমরা, দুর্ব্বল, হীন, কুখ্যাত জগতে,—
পরাধীন, হা বিধাতঃ আরও দুর্ব্বলে?"

শেষ চতুর্দ্দশপদী 'সমাপি'তে কবিবর চাহিতেছেন,—

"এই বর, হে বরদে! যাচি শেষ বারে,—
জোড়করে কর বঙ্গ ভারত-রতনে।"

কবির অন্তরে স্বদেশপ্রেম যে কত গভীর ছিল তাহার সম্বন্ধে কিছু আভাস উপরের এই ছত্র কয়টি হইতে কিছু পাইতে পারি।

বীরাঙ্গনা কাব্য—অধিকাক্ষর ছন্দে রচিত বীরাঙ্গনা কাব্য নয়টি পত্রের সমষ্টি। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে, তারা সোমকে, রুক্মিণী দ্বারকানাথকে, কৈকেয়ী দশরথকে, সূর্পণখা লক্ষ্মণকে, দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে, জনা বীরবাহুকে, জাহ্নবী শান্তনুকে, উর্ব্বশী পুরূরবাকে এবং জনা নীলধ্বজকে পত্র লিখিতেছেন। পণ্ডিতেরা বলেন, ইহা রোমান্ কবি ওভিদের অনুকরণে। সে যাহা হউক, পত্রচ্ছলে কিংবা উপন্যাস রচিত হইয়াছে ও হইতেছে বটে, কিন্তু পত্রচ্ছলে কিংবা এই ধরণের কাব্য বঙ্গভাষায় বোধ হয় আর কখনও রচিত হয় নাই।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য—ব্রজাঙ্গনা কাব্য অভিনব বৈষ্ণবকবিতা। শুনা যায়, এই কাব্য পাঠ করিয়া নবদ্বীপ হইতে কোনও বৈষ্ণবপ্রবর কাব্য-রচয়িতাকে দেখিতে আসেন। প্রাচীন বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব মধ্যে কিছুদিন লোপ পাইতে বসিয়াছিল, সে প্রভাব মধুসূদন আবার প্রবল করিলেন। এরূপ গীতিকাব্য আমাদের সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবার যোগ্য। নীচের ছত্র কয়টিতে ভাবের কেমন উন্মাদনা প্রকাশ পাইতেছে—

"যে যাহারে ভালবাসে, সে যাবে তার পাশে,
যখন ব্রাজাতে বিধি লিখিবে কেমনে?
যদি অবহেলা করি, লিখিবে শরম অরি,
কে লঙ্ঘিবে বিধি-লিপি এ তিন ভুবনে।"

ইংরাজীতে যাহাকে বলে sound, an echo to the sense—শব্দঝঙ্কার অর্থপ্রবণ—তাহাও তাঁহার এই গীতিকাব্য গুলিতে বেশ আছে;—যথা—

"সখিরে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে।
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে।
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজবধূনে।"

আবার,—

"এই দেখ, তুলসীকে— গাঁথিয়াছি আমি,
চিকণ গাঁথন,
দোলাইব ভালতলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে,
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন।
যাবে তোর পায়ে ধরি,— কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ, রাধাবিনোদন?"

অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা—তিনি যে সকল অমূল্যনিধি আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা ত পাইয়াছি, বিধাতা তাঁহাকে অনন্তরে ফিরাইয়া না নিলে আরও পাইতাম। বিলাতে যাইয়া যখন তিনি ফরাসী ভাষায় ও ইটালিয়ান ভাষা শিখেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, দেশে ফিরিয়া বিদেশলব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার দেশবাসীদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।" Should I live to return, I hope to familiarise my educated friends with these languages through the medium of our own." বিদেশে তিনি বঙ্গসাহিত্যের কথা নিরন্তর চিন্তা করিতেন,—য়ুরোপে যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি বালাবন্ধু ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"You must not fancy old boy, that I am a traitor to the cause of

our native muse. If it had'nt been for the extraordinary success the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is over, and I may well have the rest to younger hands, not ceasing to direct their movements from long distant retreat." 'ব্রজাঙ্গনা', পদ্মাবতে 'দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর' ও বীরাঙ্গনার দ্বিতীয় অংশ আরম্ভ করেন, কিন্তু ইহার কোনটিই শেষ হয় নাই।

উপসংহার—He could render a far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself if he would employ the taste and talents which he has cultivated by the study of English in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language,—মনস্বী ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেবের (Drinkwater Bethune) এই উপদেশপূর্ণ বাক্য শুভমুহূর্ত্তে উচ্চারিত হইয়া বিধাতার কোন্ অদৃষ্টবিধানে মধুসূদনের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল! বঙ্গসাহিত্যকে তিনি দিয়াছেন তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্ববিধ নাটকের রীতি, নূতন যুগের বৈষ্ণব কবিতা, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ। পদ্য সাহিত্যে তাঁহার স্থান এখনও অতি উর্দ্ধে। একাধারে এত প্রাণ তাঁহার সর্ব্বতোমুখী এই প্রতিভা দেখিলে অগাধ সাহিত্যের একছত্র সম্রাট গেটের কথা মনে পড়ে, আর "ভিক্টোরিয়া যুগে বঙ্গসাহিত্য"-লেখক মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হয়—

"সকল দিক্ বজায় রাখিলে, ইংরাজীনবিশের আদর্শে বঙ্গসাহিত্যে মাইকেলের স্থান সকলের উচ্চে। কেননা প্রায় সকল বিষয়ে তিনিই প্রথম পথ দেখাইয়া যান।"

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত বি, এ।

হিন্দু নারী

(১)

ধৈর্য্য তোমার ধরার মত কার্য্য তোমার মুগ্ধ করা,
হৃদয় তোমার কুসুম কোমল স্নেহ তোমার বক্ষ ভরা,
সার করেছ বিশ্বসেবা যুক্ত যাহে যুগ্ম পাণি,
দুঃখজনে সুস্থ কর শুনলে তাদের দুঃখবাণী;
অন্ন জলে সবার তোষ শ্রান্তদলে শান্ত করে,
শ্রান্তজনে পন্থা দেখাও মর্ত্ত্যমাকে বর্ত্তি ধরে,

শিক্ষা কর গৃহস্থালী শৈশবেতে ক্রীড়ার ছলে,
কন্যা মাঝে মোদের তরী বাঁচে তোমার চরণ তলে ;
ধৈর্য্য তোমার ধরার মত কার্য্য তোমার মুগ্ধ করা,
মূর্ত্তি তুমি বিশ্বমাতার মর্ত্ত্যে তুমি পরাৎপরা।

(২)

কর্ম্ম তোমার স্বামীর সেবা ধর্ম্ম তোমার মাথার মণি,
বর্ম্ম তোমার লৌহ বলয় সিঁথির সিঁদুর শঙ্খে গণি ;
অন্ন দিয়ে বাঁচাও সবে স্তন্যে সবাই জীবন পায়,
দুঃখে যদি কথা ভাতে মৌন থাকি কত গো তা'য়,
প্রাণের চেয়ে মান বড় যার সতীত্ব যার শ্রেষ্ঠ ধন,
সংযমে যার উঠ্‌ল টলি বিশ্বনাথের সিংহাসন,
ভারতব্যাপি' যাহার দেহে অর্দ্ধ শত তীর্থধাম,
সেই ত তুমি হিন্দু নারী নম্য যাহার পুণ্য নাম ;
ধৈর্য্য তোমার ধরার মত কার্য্য তোমার মুগ্ধ করা,
মূর্ত্তি তুমি বিশ্বমাতার মর্ত্ত্যে তুমি পরাৎপরা।

(৩)

কল্যাণ-আলো হিন্দু গৃহে আঁচল হ'তে আশীষ ঢালো,
আঁধার রাশি যত্নে নাশি রত্ন-প্রদীপ নিত্য জ্বালো ;
পুত্রে তুমি গঙ্গা সম পঙ্ক মুছি অঙ্কে ধর,
সত্য বটে সেবায় মলিন তবু তুমি বিশ্বে বড় ;
কোমল করে কঠোর কৃপাণ ধারণ কর ধরম লাগি,
পতির পদের পুণ্য রেণু মাখলে মাথে সর্ব্বত্যাগী,
মৃত্যুকে তা'ও করলে মধুর পতির চিতায় ত্যজলে প্রাণ,
বিশ্ববাসী দেখুক আসি আর্য্য নারীর আত্মদান ;
ধৈর্য্য তোমার ধরার মত কার্য্য তোমার মুগ্ধ করা,
মূর্ত্তি তুমি বিশ্বমাতার মর্ত্তে তুমি পরাৎপরা।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি, এ

অদৃষ্টের পরিহাস

(স্বামী-স্ত্রী)

নরেশকে দেখিলে একটু ঈর্ষান্বিত হইয়া স্বভাবতঃ মনে হইত তাহার উজ্জ্বল চেহারার মধ্যে কেমন একটা তীব্র সংঘমের ভাব ছিল যা'তে তার বন্ধুবর্গ তার নাম দিয়াছিল 'কাঠখোট্টা'। কিন্তু এই মানুষই যখন কলেজের পাঠগৃহে উৎকর্ণ ছাত্রদের নিকট কবিতার ব্যাখ্যা করিত, তখন উপযুক্ত ছাত্রগণ হাড়ে হাড়ে বুঝিত যে মাষ্টার মহাশয় নববিবাহিত। নরেশের নিকট আত্মীয় তেমন কেউ ছিল না, কলিকাতার অদূরে এক গ্রামে তার পৈতৃক বাটীখানি—তার মায়া সে ত্যাগ করিতে পারে নাই, আর কলিকাতার অপেক্ষাকৃত সুরুচিপূর্ণ জীবনও তাকে গ্রামের কোল হইতে টানিয়া আনিতে পারে নাই; বহু অসুবিধা সত্ত্বেও সে শেষকালে যে "ডেলি প্যাসেঞ্জার" সেই "ডেলি প্যাসেঞ্জারই" রহিয়া গেল। এই সমস্ত কারণে ছুপুর বেলাটা প্রফেসার-পত্নী 'মাধুরী' ঘরখানির উপর নিজের একাধিপত্যটা নিরুদ্বেগে ভোগ করিয়া আসিতেছিল। নরেশ প্রায়ই পুস্তক নিয়া ব্যস্ত থাকে, মাঝে মাঝে একটা উপভোগ্য কবিতার অনুবাদ স্ত্রীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কেমন লাগ্‌লো?" মাধুরীর এটা তত ভাল লাগিত না, সে একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে একটা ছোট্ট 'বেশ' উচ্চারণ করিয়া অন্যমনা হইয়া পড়িত; স্বামীর রাশি রাশি পুস্তক সে অতি বিষ চক্ষেই দেখিত।

একদিন নরেশ হঠাৎ বুঝিতে পারিল যে মাধুরীর প্রতি ঠিক ব্যবহার করা হইতেছে না এবং মাধুরীও এটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। সেদিন ছুটির দিন, নরেশ সকাল হইতেই কতকগুলি সেরা বাছা বাছা প্রেমের কবিতা বাগ দিয়া রাখিল। আহারের পর নরেশ ডাকিল "মাধুরী"—মাধুরী আহারের পর অলসভাবে একটা মাদুরে শুইয়া তাহার জীবনের একান্ত ব্যর্থতা এবং নিষ্প্রয়োজনীয়তাটাকে বেশ গাঢ়ভাবে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল; সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া একটু ব্যস্তভাবে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিল; নূতন রসজ্ঞতার মধ্যেই সে বীর পাদক্ষেপে স্বামীর নিকট অগ্রসর হইল; তাহার রূপ-মহিমা নরেশের নিকট একটা নতুন কবিতার মত প্রতীয়মান হইল, নরেশ ভাবিল এই ত সার্থকতা, এমন জনকেই ত সেক্সপীয়রের ভাবময়ী ভাষা শুনাইয়া সুখ; মুখে শুধু বলিল 'হেঁ', মাধুরী বসিল না শুধু একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার হাতে ওটা আবার কি বই?" নরেশ বলিল—"এটা রোমিও জুলিয়েট, গল্পটা ত তোমায় আগেই বলেছি, শোন, এখানে জুলিয়েটের সংজ্ঞাশূন্য দেহের পাশে বসে', রোমিও কি বলছে; উঃ কি সুন্দর, প্রেমের এমন সুন্দর চিত্র আর কেউ ফুটাতে পারে নি, আমি মানে করে বলে যাচ্ছি শোন।" মাধুরী বসিয়া পড়িল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, স্বামীকে পড়িবার সময় না দিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ওই সেক্সপীয়রের কি বিয়ে হয়েছিল, তার বউটা কি রকম ছিল বল ত?" নরেশের মনটা একবার সাহিত্যের ইতিহাসের লাইনগুলির উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিল, সেক্স-পীয়রের বিবাহিত জীবন? কই তার মধ্যে এমন ত কিছুই নাই সে একটু বিরক্তির স্বরেই বলিল, "সে শুনে কি হবে?" মাধুরী একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। পাঠান্তর নরেশের ভাবের স্রোতটা যখন একটু মন্দা হইয়া আসিল তখন সে মুখ তুলিয়া দেখিল মাধুরী চেয়ারে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তার গোলাপী মুখ-খানার চারদিকে কালো চুলগুলি ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে—

কতকগুলি গুচ্ছ একেবারে কপালে আসিয়া পড়িয়াছে, সেগুলি যাবে একটু ভিজিয়া গিয়াছে, নরেশ সযত্নে সেগুলিকে একটু সরাইয়া দিয়া খুব সন্তর্পণে তার ললাটে একটা মৃদু চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল, তার পরে নিজের মনেই বলিয়া উঠিল "একেবারে পাষাণ, কবিতায় গলে না, কিন্তু তবুও তাকে আমি এত ভালবাসি।"

(২)

নরেশের মামাত ভাই জ্যোতির্ময় এবার বি, এ, পাশ করিয়াছে; তার গুণের মধ্যে দানানসই চোখ, মুখ, নাক, রং, সুষ্ঠিই গলা, আর অভিনয়-পটুতা; জ্যোতির্ময় অনেক দিন পরে গ্রামে ফিরিয়াছে, বাড়ীতে প্রণামাদির পর সে একেবারে পিসতুতো ভাইয়ের বাড়ী গিয়া হাজির হইল। মাধুরী তখন নরেশের কলেজের পোষাক ঠিক করিতেছিল, নরেশ তার চিরন্তন প্রথা অনুসারে পুস্তকের মধ্যে নিমগ্ন;—কাহার পদশব্দে চমকিয়া ঘাড় ফিরাইতেই মাধুরী দেখিল একটি সুন্দর যুবক তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে। জ্যোতির্ময় একটু জোরে ডাকিল 'নরেশ দা'—নরেশ মাথা তুলিয়া চাহিল, "কিরে জ্যোতি যে, আরে আয় বোস বোস, এই তোর বৌদি।" জ্যোতির্ময় বৌদিকে প্রণাম করিল, বৌদিকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখিল, বৌদি আগেই সে কক্ষ ত্যাগ করিয়াছে—সে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং নরেশের প্রশ্নমালার ঠিক বেঠিক নানারকম জবাব দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মাধুরী একটা থালায় খাবার লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া থালাটি জ্যোতির্ময়ের সামনে একটা টুলে রাখিয়া নীরবে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পক্ষে এই অস্বাভাবিক গৃহিণীপনায় নরেশ একটা বেশ আরাম বোধ করিল, সে প্রসন্নবদনে মাধুরীর দিকে চাহিয়া হাসিল, তাহার স্বামীর হাস্যটা লক্ষ্য করিয়া, মাধুরীর মনটা অকারণ বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল, সে নিজের মনে মনে বলিতে লাগিল "আচ্ছা আমার স্বামীর দাঁতগুলো যে এত বড় তাতো আগে লক্ষ্য করিনি; দাড়ি রাখলে কিন্তু মানুষকে মোটে মানায় না" তার এই অসংলগ্ন চিন্তাপ্রবাহ বন্ধ করিয়া জ্যোতির্ময় বলিয়া উঠিল "এখন আসি নরেশ দা, পরে আবার আসবখন," মাধুরীর দিকে একটু চকিতে চাহিয়া জ্যোতির্ময় বিদায় গ্রহণ করিল। নরেশ খাইতে বসিল; অন্যদিনের ন্যায় আজও মাধুরী অলসভাবে কাছে বসিয়া আছে; কিন্তু আজ তাহার দৃষ্টিতে যেন একটু অনুসন্ধানের ভাব, সে ভাল করিয়া দেখিল তার স্বামীর আঙুলগুলো বড় মোটা, আর মাগো! নখগুলো কি বড়, অনেক দিন কাটেনি যে; হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল "খাবার জিনিষগুলোকে অত ঘেঁটে চটকে রাখো কেন?" নরেশ একবার মুখ তুলিয়া চাহিল; কথাটা সে অন্যভাবে লইয়া বলিল, "ওটা আমার চিরকেলে অভ্যাস।" নরেশ ব্যাগ ভর্তি বই লইয়া কলেজের জন্য প্রস্থান করিল; মাধুরী সেদিন আর থাকিল না; তার মনটা বড় হাল্কা হইয়া উঠিয়াছিল, ইচ্ছা করিতেছিল যেন সে একটা গান গায় বা ওই রকম কিছু একটা করে; বালিশ দুটোকে খানিকক্ষণ টানাটানি করিয়া শেষে বেঞ্চের উপর ফেলিয়া দিয়া প্রথম খানিকটা নিশ্চিন্ত অনুভব করিল, তারপর আবার কি ভাবিয়া সে দুটোকে উঠাইয়া রাখিল; এঘর ওঘর করিয়া, জিনিষপত্র ওলটপালট করিয়া তার দীর্ঘ দ্বিপ্রহরটা এক রকম করিয়া কাটিয়া গেল। বিকেল বেলাটাই তার কাছে সর্বাপেক্ষা অসহ্য সময়—জানালা দিয়া খানিকটা উঁচুনীচু মাঠ দেখা যায়, তার পরেই রাস্তা এবং রাস্তার ধারে কতকগুলি গৃহস্থের বাড়ী; চারিদিকে একটা মলিন এবং নিষ্করুণ ভাব জীবন্ত রহিয়াছে। জীবনের যে আনন্দ, তার সাড়া এখানে আসে না; মাঠে এক জায়গায় খানিকটা তৃণাচ্ছাদিত আবর্জনা, তার পাহারাওয়ালা এক অস্থিচর্মসার খেলে কুকুর; জন্তু ও প্রাণীর মধ্যের ব্যবধানটা লোপ করিবার একটা চেষ্টা চতুর্দিকে প্রকটিত হইতেছিল। গবাক্ষপথে অস্তোন্মুখ সূর্যের খানিকটা কিরণ একটা আলমারির উপর আসিয়া পড়িতেছিল, তার ভিতর ছোটো ছোটো বাঁধান বইগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। মাধুরী কি ভাবিতেছিল, তাহা বন্ধ করিয়া একটা নূতন আগ্রহের সহিত রাস্তার এক পথিককে দেখিতে লাগিল। পথিক

ক্রমশঃ তাহার বাড়ীর দিকে আসিয়া বাহিরের দরজায় ঘা মারিল—মাণিক জ্যোতিষীর, মাধুরীর দেবর। মাধুর ঠাকুর ও কি তাহাদের গল্প স্থগিত রাখিয়া, একজন গিয়া দরজা খুলিয়া দিল; জ্যোতিষীর জিজ্ঞাসা করিল "নরেশদা কলেজ থেকে ফিরেছে?" উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সে অগ্রসর হইয়া বাহিরের ঘরে একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। মাধুরীই উত্তর দিল "না, তাঁর আসার এখনও দেরী আছে" জ্যোতিষীর একটু সহানুভূতির সুরে খুব আত্মীয়তার ভাবে বলিল "তা হলে বৌদিদি তোমাকে দেখ্‌ছি বড্ড বুদ্ধিলে পড়তে হয়; সারাদিনটা একলাটি কর কি? দাদার মত কি কেতাবকীট হয়ে উঠেছ নাকি?" মাধুরী একটা উত্তেজনা বোধ করিল; একজন পুরুষ এত সহজভাবে তাহার সহিত কথা কহিতেছে; তার কাছে এই নূতন অনুভূতিটা বেশ সুখকর লাগিতেছিল; সে চকিতে একবার ভাবিয়া লইল তাহাকে এখন কেমন দেখাইতেছে, সম্মুখের দেওয়ালে একটা আরশী ঝুলান ছিল, সে দিকে চোখ ফিরাইতেই আর দুটী চোখের দৃষ্টি সে দেখিতে পাইল; প্রথমের খতমত ভাবটা কাটিয়া যাওয়ার পর সে মনে মনে বলিল "ঠাকুরপো খুব সরল আর তার আচরণও বেশ সহজ, খুব মিশুকও বটে; কেমন সোজা কথাবার্ত্তা, সোজা চাউনি আর হাসি-মুখ"—একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে গলাটাকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল "আচ্ছা, আপ—তোমার কেমন করে আজ সমস্ত দিনটা কাটল তাই বল না"; এরপর দুজনে অনেক কথা-বার্ত্তা হইল, প্রথমে গ্রামের নারদ জীবন, কলিকাতার জীবনের তুলনায় কত বিভীষিকাময়, তারপর কলিকাতার বায়স্কোপ থিয়েটার, এবং সকলের শেষে জ্যোতিষীর কোন্ কোন্ অভিনয়ে কি কি 'পার্ট' লইয়াছিল এবং কোন্ রাজাবাবু কবে তাহার অভিনয়ের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, এবং কবে সে মেডেল পাইয়াছিল কিছুই বাদ গেল না। ইতিমধ্যে নরেশ ফিরিয়া আসাতে কথোপকথন তাহার এবং জ্যোতিষীরের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল; উঠিবার পূর্ব্বে জ্যোতিষীর নরেশের পীঠপীঠিতে একটা গান গাহিল; তারপর হাসা, বৌদিদিকে আপ্যায়িত করিয়া সে প্রস্থান করিল। এরপর নরেশের উপস্থিতি অনুপস্থিতি সকল সময়েই জ্যোতিষীরের আগমন হইতে লাগিল এবং মাধুরী ও সে দুজনেই কি রকম করিয়া একসঙ্গে আবিষ্কার করিল যে জ্যোতিষীর একজন খুব ভাল বক্তা আর মাধুরী একজন খুব ভাল শ্রোতা। নরেশ মাধুরীর মধ্যে একটা শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি দেখিয়া উৎফুল্লভাবে আরও বেশী করিয়া তাহাকে কবিতার অনুবাদ শুনাইতে লাগিল। মাধুরীর আজকাল আর বিরক্তি নাই, সে আর ক্লান্ত অবসন্নভাবে বসিয়া পড়ে না, দীর্ঘ-নিশ্বাসটাও একেবারে অন্তর্ধান হইয়াছে; এখন কবিতার অনুবাদ আরম্ভ হইলেই সে হাসিয়া চলিয়া যায়, না হয় সেখানে বসিয়া অন্য কিছু ভাবে; জীবনের অনেক জিনিষেই তার এখন আগ্রহ হইয়াছে, তার ভাবিবার জিনিষেরও অভাব নাই। নরেশ বুঝিল, তার স্ত্রীর মনের বিক্ষিপ্ত ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে, সে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল এবং দুইদিন ধরিয়া গবেষণা করিয়া ঠিক করিতে পারিল না যে এই উন্নতির জন্য, সেক্সপীয়ার, শেলি, কীটস্ টেনিসন ও ব্রাউনিং এই কয়জন কবির মধ্যে কাহার বাহাদুরী বেশী। এইরূপে একটি মাস কাটিয়া গেল।

(৩)

"নমস্কার চক্রবর্ত্তী খুড়ো" "আরে নরেশ যে, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে" এই বলিয়া প্রৌঢ় চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলেজ ফেরতা নরেশের হাত ধরিয়া আপনার বাহিরের ঘরে বসাইলেন। নরেশ হাতের বইটার প্রতি একটা দৃষ্টিমাত্র করিয়া গ্রামের গোসপন্নের আড্ডার প্রধান পৃষ্ঠপোষক চক্রবর্ত্তী খুড়োর হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। চিরন্তন নিয়মানুসারে অভিজ্ঞ চক্রবর্ত্তী প্রথমে নরেশকে নিরস্ত করিলেন, তার হাতের বইটি কাড়িয়া লইয়া আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া একেবারে কাজের কথা আরম্ভ করিলেন, "কেবল বই আর বই, ছেলেবেলা থেকে কেবল বই এই এক রোগ বই; পৃথিবীতে যে আর কিছু আছে তার জ্ঞান নেই। যদি দিনরাত বই নিয়েই থাকবে, তা'হলে বিয়ে করে একটা বউ আনবার কি দরকার ছিল।

ও রকম করলে সংসার চলেনা কিন্তু ; কিছু বোঝো না, বৌমা ছেলে মানুষ, একলাটি থাকেন আর জোতে বকাটা রোজ রোজ অত ধার কেন ? একটা হিশেবে দেওয়া উচিত নয়—ধরি,—ঈশ্বর না করুন যদ্দ কিছু দাঁড়ায় তা হলে দোষী হবে তুমি, ওরা নয়, যে সংসারের কর্ত্তা তার আগে থাকতে সাবধান হওয়া উচিত ; তোমার আশ্রয়ে যে নাবালকরা আছে তাদের প্রলোভনের কাছে থাকতে দেওয়া তোমার উচিত নয় বাপু—এ সংসার বড় কঠিন জায়গা, কখন যে কে পা পিছলে অগাধ জলে পড়ে তার ঠিক নাই—তুমি একটু সাবধান হয়ো" এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন ; নরেশ ধীরে সেখান হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিল, আজ জীবনের প্রথম দিন সে বইয়ের কথা ভুলিয়া গেল। বই ও বইয়ের ব্যাগ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তক্তাপোষের উপর পড়িয়া রহিল। নরেশের মানসচক্ষের সম্মুখ দিয়া বিখ্যাত নাট্যকারদের বিয়োগান্ত নাটকগুলির শেষ দৃশ্য চিত্রের মত একটার পর আর একটা ভাসিয়া গেল, অতি ধীরে সে গৃহে প্রবেশ করিতেই দেখিল—জ্যোতির্ম্ময় বাহির হইয়া আসিতেছে,দরজার গোড়ায় চারিচক্ষু মিলিত হইল, নরেশ ভাবিল জ্যোতির্ম্ময়ের দৃষ্টিটা কি চটুল, কি রকম শঠতাব্যঞ্জক, আর আজ জীবনের বোধ হয় প্রথমদিন জ্যোতির্ম্ময় উপস্থিত অভিবাদনোপযোগী কথা খুঁজিয়া পাইল না। নরেশ আজ অস্বাভাবিক গম্ভীর কিন্তু মাধুরী বাক্যময়ী। আজ নরেশ ভ্যাক্টের 'ইন্‌ভারনো' হইতে খানিকটা অনুবাদ করিয়া শুনাইল, কবির নিকট ভিবিনির ফ্রান্‌সেস্‌কা নামক রমণীর প্রেতাত্মা তাহার জীবনের অবৈধ প্রণয়ের কাহিনী ব্যাবৃত করিতেছিল—মাধুরী আজ নরেশের প্রতি একটা সহানুভূতি বোধ করিতেছিল সেইজন্য সে একটু মন দিয়াই অনুবাদ শুনিতেছিল—হঠাৎ তাহার মনটা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল একটা আশঙ্কার ছায়া আস্তে আস্তে তার হৃদয়ে আসিয়া পড়িল।

পরদিন নরেশ কলেজ যাইবার সময় বলিল "দেখ আমাদের আজ একটা পার্টি আছে—আসতে একটু রাত্তির হবে ; কিছু ভেবো না।" বিবাহিত জীবনে আজ মাধুরী নরেশকে প্রথম তাহার বাঁধা নিয়ম ভাঙিতে দেখিল। সে যে ইহাতে উল্লিসিত হইল, না সন্তুষ্ট হইল, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিলনা। নরেশ কিন্তু আজ কলেজে গেল না ; সকলের অলক্ষ্যে সে কলেজের পোষাকেই, ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিল ; তাহার মাতার মৃত্যুর পরে এঘর একবারও ব্যবহৃত হয় নাই। সাহিত্যচর্চ্চায় নরেশের পূজার্চ্চনার অবকাশ ছিল না এবং সে কোনও তার দিন প্রয়োজন মনেও করে নাই। পিতৃষাস্থহীন মাধুরীর খুল্লতাতও মাধুরীকে কেবল সদগ্রহ মনে করিতেন, তাহার আত্মার ত দূরের কথা, তাহার মানসিক ও শারীরিক উন্নতি সম্বন্ধেও তিনি নিস্পৃহ ছিলেন ; তথাপি অন্তঃসংস্কার,—এই বহুকালের অব্যবহৃত কক্ষে জুতাপায়ে প্রবেশ করিতে নরেশও একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু আজ তাহার সম্মুখের কাজ তাহার সংস্কারকে ধাক্কা মারিয়া দূরে সরাইয়া দিল। নরেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল, আজ তাহাকে বুঝিতে হইবে। সংসারের কর্ত্তা সে, সে আজ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া তবে বিচারকের আসনে বসিবে তারপর নিরপেক্ষভাবে উচিত বিধান করিবে। বারান্দার বড় ঘড়িটা অনবরত টক্ টক্ শব্দ করিয়া বাজিতে লাগিল। মাধুরীর মনটা আজ যেন বড় অস্বাভাবিক রকমের। কালকার সেই গল্পটা তাকে খুব বেশী নাড়াচাড়া দিয়াছে ; তার চঞ্চলতা ও বিমর্ষতার কারণ সে কিছুই ধরিতে পারিতেছিল না কেবল একটা কারাহীন আসন্ন বিপদ যেন তাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া ফিরিতেছিল। সেইজন্য আজ যখন জ্যোতির্ম্ময় আসিয়া তাহার নিত্য প্রাপ্য বৌদির হাতের সাদা পান দাবী করিল তখন সে জোর করিয়া নিজেকে লঘু কথাবার্ত্তার মধ্যে চালিয়া দিল ; আজ সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না যে কত দ্রুতগতিতে কোথায় অগ্রসর হইতেছে। একথা ও কথার পর জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া ফেলিল যে, সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। মাধুরী বুঝিল যে তাহাদের কথাবার্ত্তা বড় বিপদসঙ্কুল রাস্তা ধরিয়াছে, তবুও তাহার চেতনা হইল না বরং ইহাতে যে উত্তেজনাটা আছে সেইটাকে সে আরও জাঁকড়াইয়া ধরিতে লাগিল, আজ তাহার অবস্থা নেশাখোরের মত ; নেশার অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনাকেই সে কামনা করিতেছিল। সে উত্তর দিল

"কেন কাউকে কি পছন্দ হয় না?" জ্যোতির্ময়—"না তা ঠিক নয়, তবে আমি মনের মত পাই কোথায়? যে মেয়েমানুষ সব আজকালকার"—মাধুরী,—"কেন মেয়েমানুষ কি একই ধাঁচে, আচ্ছা তাহলে আমিও ত তোমাদের মত শিক্ষিত পুরুষদিগের সঙ্গে কথা কহিবার যোগ্য নই;" জ্যোতির্ময়—"তোমার কথা বলিতেছি না, তোমার মত আমি আর কাহাকেও দেখি নাই" মাধুরী ঈষৎ হাসিল—"তার মানে, আমার বিয়ে হলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে, কেমন?" জ্যোতির্ময় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল "এখনও রাজি।" মাধুরী এবার চমকিয়া উঠিল, একেবারে বিজলীর আলোকে অসম্ভিত পথিকের পথমধ্যে বিষাক্ত সর্পদর্শন; সে একটা কি ভুল করিয়া উঠিয়া গেল। এতক্ষণে সে নিজের অধোগতিটা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল। বুক ফাটিয়া তাহার কান্না আসিতেছিল; সে বিছানায় পড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল হে ভগবান আর একবার আমায় সুযোগ দাও আমি এর প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো; এই ঘৃণিত বন্ধন থেকে আমায় মুক্ত করে দাও। আমি আবার নূতনভাবে আরম্ভ করি এতদিনে আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। স্বামীর নিকট কিছু আশা করিবনা কেবল তাঁকে ভালবাসার সুযোগ দাও ভগবান! —জীবনে এই তাহার প্রথম আন্তরিক প্রার্থনা। সন্ধ্যাবেলায় নরেশ দেখা দিল; সে জ্যোতির্ময়ের শেষ কথা পর্য্যন্ত সব শুনিয়াছে; তবে তাহার মুখ অবিচলিত, গম্ভীর। আহারের পর সে জানাইল, যে দিনকতক তাহাদের দুজনকেই কলিকাতায় গিয়া থাকিতে হইবে, প্রাণের বড় অসুখ হইতেছে। মাধুরী মনে মনে ভগবানকে আবার ধন্যবাদ দিল, যাহা হউক একটা পরিবর্ত্তনের আশা ত, সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মরণা বুড়িটা অন্ততঃ দিন-কতকের জন্যও পিছনে ফেলিয়া যাইতে পারিলে কাজ হইবে। সে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তার পরদিন কলিকাতায় নরেশ সব বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিল।

(৪)

মাধুরী নূতন বাসভবন দেখিয়া খুব খুসী হইল। বাড়ীটা বেশ ভাল করিয়া সাজান, সোফা, চেয়ার, টেবিল খাট, আরশী যথাস্থানে সজ্জিত; বাড়ীটা অনেক বড় তাতে অনেক লোক থাকে বলিয়া মনে হয়; চারিদিকে গোলমাল তবে বড়লোকের এককোণে এই ঘরটা বেশ পরিষ্কার, তবুও কেমন যেন নিরাপদ, কোনও আক্রু নাই; কলিকাতার রীতি এইরকম বলিয়া মাধুরী তার নিজের ঘটকা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সে আজ অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল—সেই যেন আজ সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছে স্বামীকে সকল জিনিষ-গুলির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া সে বেশ আরাম পাইতে-ছিল। আজ যেন সে নিরাপদ, মণি-বস্ত্র পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে স্বামীর মন্দিরে আজ হইতে সে নীরব পূজারি, আকাঙ্ক্ষাকে বর্জ্জন করিবে, কেবল একটী একটানা সেবার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে, দেখিয়া নিবে পাষাণ দিয়া টলে কিনা। নরেশ ম্লানভাবে এককোণে বসিয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল; তাহার মুখে ব্যথার ভাবটা স্পষ্ট ছাপার লেখার মত স্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা এ বাড়ীতে এত মেয়ে মানুষ থাকে, ওরা কে?" নরেশ অতি কষ্টে উত্তর দিল "না ওরা কেউ নয়—ক্রমশঃ চিন্‌বে।" তারপর নূতন কি আর ঠাকুরকে ডাকিয়া দৈনিককর্ম্ম তাহাদের বুঝাইয়া দিয়া সে—"ঘুরে আসি এখন—" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

মাধুরী একবার চারিদিকে দেখিয়া লইল, তাহার নূতনজীবনের গতিটীর সহিত সে ভাল করিয়া পরিচিত হইবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া পড়িল। এমন সময়ে তার মনের বাসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্যই এক রূপসী রমণী ঘরটা ঠেলিয়া তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার উদ্ধাম অসঙ্কুচিত ধরণটা মাধুরীর কাছে একটু বিসদৃশ লাগিল; তবে তাহার মনটা আজ বড় উদার, তাই সে কলিকাতার রীতি বলিয়া নিজের সঙ্কোচকে নিজেই মুছিয়া দিল। অপরিচিতা অনুক্ষণ অতি আশ্চর্য্যভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া যেন অতি অপ্রস্তুতভাবে প্রস্থানোদ্যত হইল। মাধুরী ডাকিল "ফিরে যান কেন বসুন না?" অপরিচিতা মূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মাধুরী কি বলিয়

কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিবে ভাবিতেছিল ; এমন সময় অপরিচিতা নিজেই বলিল "আমার নাম গোলাপী, আপনার নাম—আচ্ছা সে থাক, আপনার বাসুটী কে ?"—

মাধুরী। উনি কলেজের মাষ্টার নাম ত করতে পারি না তবে খুব নাম আছে—সোণার মেডেল আছে।

গোলাপী। ওঁকে দেখে ত বেশ নিরীহ বলে বোধ হয় ?

মাধুরী। খুব ভাল লোক, মাটির মানুষ, দিনরাত পড়াশুনা করেন, বিয়ের পর থেকে একদিনও আমার মনে একটু ব্যথা দেন নি।

গোলাপী। বিয়ে ! আপনি কি ওঁর স্ত্রী ?

মাধুরী। কেন বুঝতে পারেননি নাকি ?—আচ্ছা আপনার কথাই কিছু বলুন না ; আপনার নামটী কিন্তু বড় নূতন রকমের—আমরা পাড়াগাঁয়ে এমন নাম কখনও শুনিনি—আচ্ছা কলকাতায় কি সব এই রকম নাম না কি ?

আজ গোলাপী আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করিল, তাহার অন্তরের মরচেধরা লজ্জাটা আজ একবার নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল—কিন্তু এভাব ক্ষণিক, আজ ১০ বৎসর সে এই ঘৃণিত ব্যবসায় করিতেছে—শত শত রাত্রির উন্মত্ত পৈশাচিক লীলায়, মানুষের পশুত্বের ইন্ধন যোগাইয়া, সে খুব শক্ত হইয়া গিয়াছিল—সে কঠোর স্বরে বলিল—"আমরা বেশ্যা, বারবনিতা, এটা আমাদের বাড়ী, আপনি কি কিছুই জানেন না ?" যেন তার কথাটার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য অদূরে কে একজন আড়ষ্ট মোটা গলায় গাহিয়া উঠিল, "চালো আরো ঢালো, রূপের সঙ্গে তীব্র সুরা লাগে আরো ঢালো" মাধুরীর মাথা ঘুরিতে লাগিল, পরক্ষণেই তার সংজ্ঞাশূন্য দেহ বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। গোলাপী স্থিরে তাকিয়া তাহার জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিল ; মাধুরীর দেহের স্বর্ণালঙ্কার তাহার চোখে বিঁধিতেছিল ; মাধুরীর জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেই, তাহার নেক্‌লেসটা এক মোহিনী মন্ত্রে অদৃশ্য হইয়া গেল, ঝিকে পাখার বাতাস দিতে বলিয়া গোলাপী চলিয়া গেল।

আজ দুইদিন হইল মাধুরী এই বাটীতে বাস করিতেছে ; সেই বাড়ীর সমস্ত ছাপটা যেন তার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে—শুষ্ক মুখ এবং তার চেয়ে আরও শুষ্ক কঠোর দৃষ্টি তার বুকের আগুনের চিহ্ন ; এখনও সে বড় দুর্ব্বল, মাথা-ঘোরা পূর্ব্ববৎ, স্থির দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে চাহিয়া ছিল, এমন সময়ে ধীরে ধীরে গোলাপী প্রবেশ করিল ; সে আসিয়া মাধুরীর পায়ের কাছে তার স্বর্ণ হারটা ফেলিয়া দিল মুখে শুধু বলিল "কাল সমস্ত দিন উপোস গেছে"।—এই কথাটার মধ্যে তার মনের মধ্যে এক দীর্ঘ কর্ম্মহীন দিবব্যাপী দেহমনের তুমুল সংগ্রামের বিবরণ যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা মাধুরী বুঝিল না ; সে বুঝিল না যে সারাজীবন ধরিয়া যে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিয়াছে তাহার পক্ষে এটা কতটা সাধনের কথা। মাধুরী প্রাণহীনভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি বেশ্যা হয়েছ কেন ?" এই বিরাট দুঃখের মূলে গোলাপীর বহুদিনের সযত্নপালিত নীচপ্রবৃত্তিগুলি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই আজ সোণার জিনিষে তার এত অবহেলা ; তাহার মধ্যেও আজ লাঞ্ছিত রমণীর ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে উত্তর করিল "আমি বেশ্যা হয়েছি কেন ?—কেন হয়েছিলুম তা বলতে পারি না তবে কেন রয়েছি তা বেশ বুঝি। জগতে নারীর দুইটী শত্রু আছে, এক সমাজ, আর এক নারী নিজে। তাই আমি এইভাবে সমাজকে আর আমার নারীত্বকে নষ্ট করছি—একটী বিরাট অভিমানের আমি 'একটা' মাত্র। কোনও দিন কারো কাছে একটু দয়া পাই নি, যারা আমাদের কাছে আসে তাদের দেখলেও ঘেন্না হয় আবার যারা বাহিরে থেকে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করেন বা লম্বা নৈতিক বক্তৃতা করেন তাঁদের আরও ঘেন্না করি।" গোলাপী আপন মনে বলিয়া যাইতেছিল হঠাৎ তাকাইয়া দেখিল মাধুরী আবার মূর্চ্ছা গিয়াছে।

কলেজের দারওয়ান নরেশবাবুর হাতে একখানা চিঠি দিল—মাধুরী লিখিতেছে, তার মর্ম্ম এই—"আমি আর পারিতেছিনা, দোষ যা করেছি তার শাস্তি আর কেন দাও, অনেক সহ্য করেছি, আর পারিনা ; আমার শরীর বড় খারাপ ; হতভাগীকে এখনও ক্ষমা কর ; এর

পর নিজেই অনুতাপ করিবে যে কেন আগে ক্ষমা করি নাই ; সময় বয়ে যাচ্ছে এখনও বলো আমাকে ক্ষমা কর—তুমি যে আমায় কত বড় শাস্তি দিয়েছ তা বুঝবে কেন ? মেয়েমানুষ হইলে বুঝিতে" নরেশ তাড়াতাড়ি চোখের জল রুমালে মুছিল—মনে মনে বলিল "আর চারটা দিন কেটে যাক্, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে, আমার মাধুরীকে প্রথম করেছি। এক সপ্তাহের প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট ; তারপর মাধুরী তোমার কাছে অতি দীনভাবে ক্ষমা চাইবে। ভগবান্ আর চারদিন সে তাদের তালায় থাকুক তারপর সে নির্মল হয়ে যাবে ; সর্ব্বযুগের সকল কবিই একবাক্যে বলিয়াছেন—"দুঃখই চরিত্রগঠনের একমাত্র উপায়।"

মাধুরী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল ; কে যেন তাহাকে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "আশা নাই—আশা নাই" তাহার নিঃশ্বাস টানিতে কষ্ট হইতেছিল ; তার বেদনাটা আজ যেন নিষ্ঠুর, ভারী হইয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া যেন তার প্রাণটাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, যেন তার প্রাণটাকে টানিয়া বাহির করিতে চায় ; আজ দুই দিন হইল সে চিঠি দিয়াছে এখনও তার জবাব নাই, স্বামীরও দেখা নাই। নরেশ আবার চিঠি পাইল ; এবার চিঠিটা বড় ছোট আর অতি কষ্টে লেখা,—

"স্বামী,

দাসী বোধ হয় আর বাঁচিবে না—একবার দেখা দিও—আমার জ্ঞান থাকতে থাকতে তোমায় কেন দেখতে পাই ; আমায় কি একেবারে পরিত্যাগ কর্লে ?—তাতে আর ক্ষতি কি, আমি ত শীঘ্রই এ জীবন শেষ কর্চ্ছি ; তবে—বড় সাধ "অন্ততঃ তুমি ক্ষমা করেছ" এই বেলে মরবো

সেবিকা—মাধুরী"

নরেশের বুকের মধ্যের রক্তটা হঠাৎ শীতল হইয়া আসিল, দূর হইতে যেন শ্মশানের গন্ধ তাহার নাকে আসিয়া লাগিল, অজ্ঞাত আশঙ্কায় সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং কয়েক মিনিট মধ্যেই সে উন্মত্তের মত রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। কিসে যেন তার পা জড়াইয়া ধরিতেছিল; "আর কেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে"। রাস্তায় এত ভিড় কেন, সব কলিকাতা শুদ্ধ লোকেরই কি একসঙ্গে এই এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া চাই—ধাক্কা খাইতে খাইতে নরেশ চলিতে লাগিল—

মাধুরী আজ বিছানা হইতে উঠিতে পারে নাই, সে সকল আশা ত্যাগ করিয়া মৃত্যুরই অপেক্ষা করিতেছিল—জীবন থাকিতেও সে এখন মৃত্যুর আস্বাদনে যেন বিভোরা—কথাটুকু থামিয়া গিয়াছে। জড়তার পথপ্রদর্শক মূর্চ্ছা এখন তার দেহে অধিকার স্থাপন করিয়াছে, কেবল তাহার চোখদুটী আজ অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল ; যেন প্রাণশক্তি সমস্ত দেহ হইতে বিদায় লইয়া, চিরবিদায়ের পূর্ব্বে তাহার আহত চোখদুটিতে আশ্রয় নিয়াছে, তাহাদের সৌন্দর্য্যের মায়া এখনও কাটাইতে পারিতেছে না—নরেশ ঝড়ের মত কক্ষে প্রবেশ করিল, তারপর সব শান্ত নীরব। মাধুরীর চোখের কোণে একবিন্দু অশ্রু জমিয়াছিল ; আস্তে আস্তে তাহা প্রাণহীন পাণ্ডুর গণ্ডের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল ; তাহার কালো চুলগুলি কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, নরেশ এক হাতে সেগুলিকে সরাইয়া দিয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। নরেশের চোখের এক ফোঁটা অশ্রু তাহার গাল বহিয়া মাধুরীর গণ্ডে পড়িল—আজ এই প্রথম স্বামী-স্ত্রীর চোখের জল এক সঙ্গে মিলিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩৯৭

বন্ধুহারা বিশ্বে সারা
আমি গৃহহীন,
এস মোর বুকে এস
হে ব্যথা রঙ্গীন।
কে তোমারে চেনে নাক
করে 'দূর দূর'?
আমারে পিয়াও মধু
আমি দুখাতুর।
বিদীর্ণ দেউল ভেদি,
জাগাও লতিকা—
জ্বালাইয়া তোল মৃদু
জীবনের শিখা,
তোমার করুণ রসে
বিশ্ব আছে বেঁচে,
কি অমৃত তুলিয়াছ
হলাহল সেঁচে।
হে যুবতি! হে যোগিনি!
কমণ্ডলু জলে,
জাগালে নূতন সৃষ্টি
হৃদয়ের তলে,
হে প্রেয়সি! হে সঙ্গিনি।
তোমারি উরসে,
শির রাখি নিদ্রা যাই
মনের হরষে।
তোমার অঞ্চল বায়ু
অলক সৌরভ,
আমার জীবন সে যে
আমারি গৌরব।
হে সুন্দরি! প্রিয়তমে!
একটী চুম্বনে
চিরবন্দী করে' রেখ'
অভাগা জীবনে।

শ্রীঅতুল্যকুমার ভাদুড়ী।

কূলে ও অকূলে

ভয়ানক তুফান! ঢেউগুলো হাত পা তুলে একেবারে পাগলের মত নাচ্‌তে সুরু করে দিয়েছে; তা'দের উদ্যত বাহু যেন ঊর্দ্ধ আকাশকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্‌ছে "ও! তুমি আর কত উঁচু গো, এই তোমায় ছুঁলাম বলে।"

সারা জলে যেন পাগল আজ মাতাল হয়ে একটা ভয়ঙ্কর রকমের প্রলয় বাধিয়ে তুলেছে!

এক একবার কতকগুলো ছোট ছোট ঢেউ পালিয়ে তীর-বেগে তীরের দিকে ছুটে চলেছে;—কিন্তু তাদের সমস্ত বেগটা যেন অসামাল হয়ে নিজে নিজে আছড়ে পড়ে বল্‌ছে—"আর পারিনে গো—আর পারি নে।"

ঘড়োকোণে মেঘ জমে এসে সারা আকাশের উপর ঘন্ ঘন্ করছে!—পৃথিবী তা'র সমস্ত নিশ্বাসটুকু বন্ধ করে একটা ভীষণ কিছুর জন্ত অপেক্ষা করে আছে!—এই বুঝি এলো!

সারা আসমানময় একটা ভয়ের সাড়া পড়ে গেল!

জলের উপর নৌকাগুলো নিতান্ত নিরুপায় নিরাশ্রয় হয়ে আপনাকে বাঁচাবার জন্ত বিপুল যুদ্ধ করছে। তা'দের আসন্ন বিপদ দেখে নিরাপদ তীরও নিজেকে অসহায় স্থির করে ভাব্‌ছে "আমিও বুঝি ভাসি"!

চারিদিকে 'সামাল' 'সামাল' রব পড়ে গেল।

আমার তরীখানিও ডুবু ডুবু—জল ছেঁচেও শেষ নাই, দাঁড়-টেনেও কূল নাই, জীবনের সঙ্গে একি ভয়ানক যুদ্ধ!—এর শেষ কোথায়?—গেল, গেল, গেল! সত্য কি? পাল নামাও? পাল নামাও? আর পাল নামাও,—নৌকা বাগ চলে হল বুঝি—সব শেষ!!!

আমি—গে—লা—ম্!—পাগলা ঢেউগুলোর উপর চড়ে হ'হাতে হ'পায়ে দাঁতার দিয়েও কূল নাই!

হাত পা অবশ হয়ে আস্‌ছে!—নিশ্বাস আর থাকে না।

সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত! আমি ডুব্‌ছি তা' কেও দেখে না! আর দেখ্‌বেই বা কেন?

একটা আশ্রয়? কোনও রকমের একটা আশ্রয়?—কিছু নাই!—সব সাদা!

ওই দূরে একটা কি ভেসে যাচ্ছে! কি—ত, অ—ত—দূ—রে! আ—মি—ব—রি—কি—ক—রে?

এই যে এই দিকেই আস্‌ছে ভেসে! ধরব, ঠিক ধরব।

এই এসেছে! এই ধরেছি! কিন্তু ওই যাঃ! তলিয়ে গেল! তার সইতে পারলে না!—তবে নিরাশার এই তুফানের মধ্যে আশার আশ্রয় কোথায় কেন?—বিধাতার বিদ্রূপ? অসহ্য! অসহ্য!!

উঃ! আর যে পারি না।

এই যে পেয়েছি—সইবে কি? আবার তার সইবে কি? এই ত পেয়েছি।

ভগবান্ তুমি এত দয়াময়!—কিন্তু এত নিষ্ঠুর।

এতে ভর করে আমি কূল পাব কি?

নাই বা পেলাম কূল! তবু ত একটা আশ্রয়! আমার মরণ মুহূর্ত্তের সহায়! আমি এতে ভর করেই ভাস্‌ব। এই অকূলে নাই বা পেলাম কূল তবু ত মরণবেলার সঙ্গিনী!

আমার অশ্রান্ত অশান্তজীবনে আমার দুর্ব্বহ প্রাণে এ কি যেন কি, কেমন একটা কিছু!

—•—

শান্ত, একেবারে স্থির, নিথর নিশ্চল সাগরে—চাঞ্চল্য নাই, গতি নাই, তুফান নাই!—ছোট, অতি ছোট ছোট ঢেউগুলি; পশ্চিমের সূর্য্য তা'দের মাথায় সোণালি রঙের টোপর পরিয়ে দিয়ে ধীর মন্থর বাতাসের তালে তালে তাদের নাচিয়ে নিয়ে চলেছে!

'সাগর যাত্রীর' গান!—সাধা-আসোয়ারী সুরে—খুব

সুখের নৌকাখানি থেকে বাতাসের পরশার পরশার যেন আরো মধুর হয়ে, অসীম উদ্দেশে কিসে র অভিসারে চলেছে!—কে জানে?

'গানের সুরে পড়বে কি না ধরা'—তবু বুঝি

"গান গাওয়াতেই আনন্দ!" এর যাঁর এত বয়স গতি, সেথায় পৌঁছাবে কি?

"তবু এই বুকে বুক দিয়ে বাহুর বেষ্টনে বাঁধা থেকে নাই বা এগিয়ে গেলাম আমি?

"তবু এই পথ চলাতেই আনন্দ!"

আজ আমি খুব নিরাপদ!—তবু অতীত জীবনের সেই ভয়ঙ্কর 'তুফান' যেন শেষরাত্রির দুঃস্বপ্নের মত তার ভয়াবহ স্মৃতিটীকে মনের নীচু থেকে উপরে ঠেলে দিচ্ছে! তা' দিক্, তবু আমি, আজ আমি নদী পেরিয়ে!—মহাযাত্রীর গানের সুরে আমি বিভোর!

নীচের এই বিস্তৃত জলরাশিকে আমারি অধিকারের একটা সুখসচ্ছন্দের উপায়মাত্র বলে মনে হচ্ছে!

এমনি বুঝি হয়! তাই!

এখন জলে আবার তুফান হয়?—এত স্নিগ্ধ, এত স্থির, এত শান্ত? এতে আবার তুফান?—সে আমার মানসিক দুর্ব্বলতা!

এই 'আমিই' ঠিক 'আমি'! সে 'আমিটা' আমার চিত্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্কের একটা কাল্পনিক সৃষ্টিমাত্র! কেমন, নয়?

একটা লম্বা কাঠে ভর করে নাকি তুফানে ভেসে-ছিলাম! সেই আশ্রয়টুকু অবলম্বন করে নাকি আমি কূল পেয়েছি!—শুনে হাসি পায়!—কবে গো?—ওই ত আমার নীচে দিয়ে একখানা ভাঙ্গা কাঠ ভেসে চলেছে, এই ছোট ছোট ঢেউ গুলোর সঙ্গেই সে দোলে উঠ্‌ছে না, আর তুফানে সে আমায় রেখেছে!

তুফান সত্য হ'লেও তোমার এ কাঠের কথা সত্য বলে মান্‌তে আমরা রাজী নই!—সত্যই কি সে তুফান! কি ভয়ঙ্কর! মনে হ'লে এখনও গা' শিউরে ওঠে।—কিন্তু, কিন্তু আমায় রাখ্‌লে কে?—কাঠ?—

অমন কত শত ভেসে যায়, ভেসে আসে! তা'দের দিকে তাকায়ই বা কে? আশ্রয় বলে ধরেই বা থাকে কে? শ্মশানের পোড়া কয়লাও অমন হাজার হাজার ভেসে যায়, আমরা ঢেউ দিয়ে বরং সেগুলো সরিয়ে দিই;—এই ত এখনও দিচ্ছি!—কিন্তু মনের গর্ব্বটুকু আজ কেন হ'ল?

আর আমি 'কৈফিয়ৎ' দিতেই বা বসেছি কেন? কেওত তা' চায়নি!—নিজের বলায় কিছু না থাক্‌লে অপরাধটা ঢেকে নেওয়ার জন্য শুনেছি নাকি মানুষ অযাচিতভাবে কৈফিয়ৎ দিতে বসে! তা'তে অপরাধটাকে যেন গুরুতর বলে মেনে নেওয়া হয়। এও কি তাই নাকি?

না, না, তা নয়।

যাই হোক—তবু সেটা একখানা ভাঙ্গা পোড়া পচকা কাঠ; হাঁ, নিশ্চয়ই!—কিন্তু, কিন্তু—আচ্ছা ভেবে দেখি!!

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

মিনতি

ঢের দিয়েছ সুখ তুমি গো ঢের দিয়েছ দুখ,
শেষ দাবী দাও ওই চরণে লুকিয়ে নিতে মুখ।
অকারণে যশ দিয়েছ অকারণে মান,
অকারণে নিন্দা ঘৃণা হিংসা অপমান
তুমি সান্ত্বনাতে জুড়িয়ে দেহ শতেক ভাঙা বুক।
শেষ দাবী দাও ঐ চরণে লুকিয়ে নিতে মুখ।

২

গরীব আমি, তুমিই আমার গরব বাড়ালে,
এখন, তাপিত আমি দাও হে যেতে তোমার আড়ালে।
কান্না হাসি লয়ে আমার বৃথায় গেল দিন,
জীবন তরী ডুবু ডুবু আসছে হয়ে ক্ষীণ,
এখন তারিয়ে দাও জীবন ব্যাপি' শতেক ভুল চুক
শেষ দাবী দাও ঐ চরণে লুকিয়ে নিতে মুখ।

৩

তোমার নামের অনুরাগী আমায় কর হে
ভেঙে চুরে একেবারে নূতন গড় হে।
চুকিয়ে দাও আমার নেশা সকল অহঙ্কার,
নামিয়ে দাও প্রাণের বোঝা অভিমানের ভার
তুমি থামিয়ে দাও একেবারে হিয়ার ধুক্ ধুক্
শেষ দাবী দাও ওই চরণে লুকিয়ে নিতে মুখ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যুক্তি-কল্পতরু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৮২০—৯৮৬ শ্লোক)

প্রবাল

শ্বেত সমুদ্রের মধ্যে দেখিতে বজ্রের ন্যায় এক প্রকার লতাকৃতি বস্তু জন্মে ; এই বস্তুর নাম বিদ্রুম (প্রবাল)। ইহা রত্নপুঞ্জক পাক করিলে প্রস্তরের মত হয়।

এই বিদ্রুমরত্ন ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে চারি প্রকার হইয়া থাকে।

শুকের চঞ্চুর ন্যায় (১) অরুণবর্ণ, কোমল ও স্নিগ্ধ প্রবাল ব্রাহ্মণজাতি ; ইহা দেখিতে সুন্দর এবং অনায়াসে ভেদ করা যায়।

ক্ষত্রিয় জাতীয় বিদ্রুম জবা, বন্ধুকপুষ্প, সিন্দূর, অথবা দাড়িমপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, কঠিন সহজভেদ্য (২) ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

যে বিদ্রুম গাঢ়নীলবিশিষ্ট, পলাশ ও পাটলপুষ্প সদৃশ, স্নিগ্ধ ও অল্পকাকৃত অল্প কান্তিযুক্ত তাহা বৈশ্যজাতীয়।

যাহার ঔজ্জ্বল্য অচির স্থায়ী, এবং যাহা রক্তপদ্মের মত বর্ণবিশিষ্ট এবং কঠিন ও দুর্ভেদ্য, সেই বিদ্রুম শূদ্রজাতীয়।

রক্তবর্ণ, স্নিগ্ধতা, সুখভেদ্যতা এবং বর্ণের চিরস্থায়ী ঔজ্জ্বল্য এই কয়টী প্রবালের গুণ ; এই সকল গুণশালী প্রবাল ধনধান্যকর।

হিমালয় পর্ব্বতে যে প্রবাল জন্মে, তাহা গাঢ় রক্তবর্ণ এবং কঠিন হয় ; এই প্রবাল নিম্নের ওষ্ঠে স্পর্শ করাইলে তাহাও সুস্নিগ্ধ হয়, ইহা ধারণমাত্র বিষবেগ প্রশমিত হয়।

বিবর্ণতা এবং খরস্পর্শতা এই দুইটী প্রবালের দোষ এবং রেখা, কাকপদ ও বিন্দু প্রভৃতি হীরকের দোষগুলিও প্রবালেরবর্জ্জনীয়।

'রেখা'দোষে খ্যাতি ও সম্পত্তি নষ্ট হয়, 'কাকপদে' কুলনাশ, 'পটলে' রোগ, 'বিন্দুতে' ধনক্ষয়, 'ডাগে' ত্রাস এবং 'নীলিকায়' মৃত্যু হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ প্রবালের মূল্য রৌপ্যের বিগুণ। পূর্ব্ববর্ণিত অপরাপর রত্ন ধারণের মত প্রবাল ও জাতিবিভাগ অনুসারে ধারণ করিবে।

কশ্যপমুনি বলেন—যে ব্যক্তি বিরূপ, বিজাতি, বন্ধুর, বিবর্ণ ও খরস্পর্শ প্রবাল ধারণ করে, সে আপনার মৃত্যু আপনি আনয়ন করে।

গোমেদ

হিমালয় পর্ব্বত ও সিন্ধুনদে গোমেদমণি উৎপন্ন হয়। স্বচ্ছ, গুরু, স্নিগ্ধ, প্রশস্তবর্ণ ও দীপ্তিমান্ শুক্ল এবং হরিদ্রাবর্ণ গোমেদ প্রশংসিত হইয়া থাকে।

গোমেদেও ব্রাহ্মণাদি চারিপ্রকার জাতিভেদ আছে। শুক্লবর্ণ ব্রাহ্মণজাতীয়, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় জাতীয়, ঈষৎ পীতবর্ণ বৈশ্যজাতীয় এবং ঈষৎ নীলবর্ণ গোমেদ শূদ্রজাতীয়। এই গোমেদের শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চতুর্ব্বিধ 'ছায়া' থাকে।

গুরু, প্রভাশালী, শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল, অত্যন্ত পুরাতন ও স্বচ্ছ গোমেদ ধারণে ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়।

লঘু, বিবর্ণ, কর্কশ, ভ্রান্তিজনক, যাহা দেখিতে স্নেহলিপ্তের মত অথচ মলিন ও খরস্পর্শ এইরূপ গোমেদমণি সম্পত্তি, ভোগ ও সন্মান শৌর্য্য বিনাশ করে।

হীরকের যে সকল দোষ বর্ণিত হইয়াছে, গোমেদমণিতেও সে সকল দোষ লক্ষিত হয়। রত্নজ্ঞ পণ্ডিতগণ অগ্নি-বা শাণে গোমেদের পরীক্ষা করিবেন। স্ফটিক হইতে কৃত্রিম গোমেদ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ গোমেদের মূল্য কেহ বলেন—সুবর্ণের বিগুণ,

কাহারও মতে—বিপ্রদের সমান, আবার অন্য কাহারও মতে চাষদের সমান হইয়া থাকে।

চারি জাতীয় গোমেদ রত্নের বিষয়, হীরক রত্নের বিষয়ের অনুরূপ।

মুক্তা

প্রসিদ্ধি আছে—হস্তী, মেঘ, বরাহ, শঙ্খ, মৎস্য, সর্প, শুক্তি এবং বংশ মুক্তার উৎপত্তি স্থান; ইহাদিগের মধ্যে শুক্তি হইতেই অধিক পরিমাণে মুক্তা জন্মিয়া থাকে। শুক্তিজ মুক্তাই বেধ করা যায়, অন্যমুক্তা অবেধ্য।

গজমুক্তা

উত্তম হস্তীতে মুক্তা জন্মে, এই মুক্তা গোলাকার, ঈষৎ পীতবর্ণ এবং প্রভাহীন হইয়া থাকে।

গজ পরীক্ষায় চতুর্বিধ হস্তীর বিষয় কথিত হইবে। সেই চারি জাতীয় গজে উৎপন্ন মুক্তাও চারি প্রকার হয়।

যে মুক্তা পীতের আভাযুক্ত শুক্লবর্ণ, তাহা ব্রাহ্মণ-জাতীয়; যাহা পীতাভ রক্তবর্ণ, তাহা ক্ষত্রিয়; যাহা পীতাভ তাম্রবর্ণ, তাহা বৈশ্য এবং যে মুক্তা পীতাভ নীলবর্ণ, তাহা শূদ্র জাতীয়।

কথোজদেশ জাত হস্তীর মস্তকে যে মুক্তা জন্মে, তাহা আকারে আমলকী ফলের ন্যায় বৃহৎ, ওজনে ভারী, অতি পীতবর্ণ এবং অল্প উজ্জ্বলযুক্ত হইয়া থাকে।

মেঘজ মুক্তা

মেঘের জলবিন্দু দ্বারা যে মুক্তার উৎপত্তি হয়, তাহা মানুষের পক্ষে দুর্লভ, দেবগণ আকাশ হইতেই উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কুক্কুটের অণ্ড সদৃশ গোলাকার, ওজনে ভারী, নিষ্প্রভ এবং সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল মেঘজ মুক্তা দেবভোগ্য ও মানুষের অপ্রাপ্য।

মেঘজ মুক্তা পৃথিবীতে আসে না, দেবগণ শুক্ল হইতেই তাহা হরণ করেন। অতি উজ্জ্বল প্রভার জন্য যেমন সূর্য্য-মণ্ডল দেখিতে কষ্ট হয়, সেইরূপ অতিদীপ্তি হেতু এই মুক্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে কষ্ট হয়।

মেঘজ মুক্তা তেজে অগ্নি, চন্দ্র, নক্ষত্র, তারা ও গ্রহগণকেও পরাভব করে। এই মুক্তা যেমন দিবসে সেইরূপ তামসী রাত্রিতেও দীপ্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

যে পৃথিবীর চারি সমুদ্রের জল বিচিত্র রত্নের প্রভায় রঞ্জিত সেই সুবর্ণপূর্ণ সমগ্র পৃথিবীও একটী মেঘজ মুক্তা মূল্য হয় কি না সন্দেহ।

অতি হীন ব্যক্তিও যদি ভাগ্যক্রমে একটী মেঘজ মুক্তা লাভ করে, তাহা হইলে, যত দিন সেই মুক্তা তাহার নিকট থাকে ততদিন সে অপ্রতিবন্ধিরহিত পৃথিবী ভোগ করে।

মেঘজ মুক্তা যে কেবল অধিপতিরই মঙ্গলজনক তাহা নহে, ইহা সাধারণের পক্ষেও হিতকর। এই মুক্তা যেই স্থানে থাকে, তাহার শত যোজনের মধ্যে সকল বিপদের আশঙ্কা বিনষ্ট হয়।

জল, তেজ ও বায়ু এই ত্রিবিধ পদার্থ হইতে মেঘের উৎপত্তি। যে মুক্তার জলের ভাগ অধিক থাকে, তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ, কোমল, ওজনে ভারী ও কান্তিবিশিষ্ট হয়।

যাহাতে তেজের প্রাধান্য থাকে, সে মুক্তা কান্তিবিশিষ্ট গোলাকার, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল সুতরাং চুনিরীক্ষ্য হইয়া থাকে এবং যাহাতে বায়ুর অংশ অধিক থাকে, সেই মুক্তা কান্তিবিশিষ্ট, কোমল, গোলাকার নির্ম্মল ও ওজনে লঘু হইয়া থাকে।

বরাহমুক্তা

বরাহদন্তক (১) হইতে যে মুক্তা জন্মে, তাহা বরাহদন্তের মত শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে; কোন কোন স্থলে কখন বা বরাহের শরীরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টও হয়।

ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে বরাহও চারিপ্রকার, তদুৎপন্ন মুক্তাও চতুর্বিধ।

ব্রাহ্মমুক্তা শুক্লবর্ণ ও কোমল, ক্ষত্রিয়মুক্তা শ্বেতরক্ত ও

(১) বরাহদন্তপ্রকরণম্।

কর্কশ, শ্বেতমুক্তা বরাহের দন্তের ন্যায় শ্বেতপীত ও কোমল এবং সূত্রমুক্তা শ্বেতনীল বা ভাস্বরবর্ণ ও কর্কশ হইয়া থাকে।

বরাহজাত মুক্তা আকারে কুলের মত, বরাহদন্তের ন্যায় শুক্লবর্ণ, অতি দুর্লভ এবং পুণ্যহীন ব্যক্তির অপ্রাপ্য।

শঙ্খমুক্তা

পীতশঙ্খ গর্ভে শঙ্খমুক্তা উৎপন্ন হয়; এই মুক্তা স্বীয় উৎপত্তিস্থানের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং শেয়াকুলের মত বৃহদাকার হইয়া থাকে।

পাঞ্চজন্যজাতীয় শঙ্খ হইতে উৎপন্ন মুক্তা কপোত ডিম্বাকৃতি, বদরের মত স্বচ্ছ, উজ্জ্বল এবং সুদৃশ্য হইয়া থাকে।

অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে সপ্তবিংশতি প্রকার শঙ্খ উৎপন্ন হয়, তদনুসারে শঙ্খমুক্তা ও সপ্তবিংশতিবিধ হইয়া থাকে।

শুক্ল, কৃষ্ণ, ঈষৎ পীত, গাঢ় রক্ত, নীল, ঈষৎ রক্ত, গাঢ় পীত, পিঙ্গল এবং পাটল এই নয় প্রকার বর্ণ আছে।

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে অশ্বিনী হইতে অশ্লেষা পর্য্যন্ত নয় নক্ষত্রে জাত মুক্তা ওজনে অতি গুরু, মঘা হইতে জ্যেষ্ঠা এই নয় নক্ষত্রে জাত মুক্তা ওজনে মধ্যম প্রকার (অর্থাৎ অতি গুরুও নয় অতি লঘুও নয়) এবং মূলা হইতে রেবতী পর্য্যন্ত নয় নক্ষত্রে জাত ওজনে লঘু হইয়া থাকে।

মৎস্যজ মুক্তা

সমুদ্রজাত মৎস্যের মুখে মুক্তা উৎপন্ন হয়; মৎস্যজ মুক্তা গোলাকার ক্ষুদ্র ও ওজনে লঘু হয় এবং ইহার বর্ণ বোয়ালমৎস্যের পৃষ্ঠভাগের বর্ণের মত হইয়া থাকে।

তিমি মৎস্য হইতে যে মুক্তা জন্মে, তাহা আকারে শুক্তির (ঝুঁচের) ন্যায়, ওজনে লঘু, পাটলীপুষ্প সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, গোলাকার এবং অনেকাস্থিবিশিষ্ট হয়।

বাত, পিত্ত, কফ, বাতপিত্ত, বাতকফ, কফপিত্ত এবং বাতপিত্তকফ এই সপ্তবিধ ধাতুর প্রাধান্যানুসারে মৎস্য সপ্তবিধ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার মুক্তাও সপ্তবিধ।

বাতপ্রধান মৎস্যজ মুক্তা ওজনে অতিশয় লঘু ও অরুণবর্ণ; পিত্তপ্রধান মৎস্যজ মুক্তা পীতবর্ণ ও কোমল, কফপ্রধান মুক্তা ওজনে গুরু ও শুক্লবর্ণ, বাতপিত্তাধিক মুক্তা কোমল ও লঘু, বাতকফপ্রধান মৎস্যজ মুক্তা আকারে বৃহৎ, কফকফপ্রধান মৎস্যের মুক্তা স্বচ্ছ এবং বাতপিত্তকফপ্রধান মৎস্য হইতে উৎপন্ন মুক্তা প্রথমোক্ত ত্রিবিধলক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই সপ্তবিধ মুক্তার মধ্যে যেগুলি এক ধাতুপ্রধান বা সর্ব্বধাতুপ্রধান মৎস্য হইতে জন্মে, তাহারাই গুণজনক।

সর্পজ মুক্তা

সর্পজ মুক্তা শাণিত পরশুধারের ন্যায় অতি উজ্জ্বল নিরুষ্ট নীল আভাযুক্ত হইয়া থাকে।

যে সকল সর্পের মস্তকে মুক্তা জন্মে, তাহারা বাসুকিবংশীয়; কদাচিৎ কোন পবিত্র প্রদেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

গোলাকার, রমণীয়, নীল ছায়াবিশিষ্ট, অতি উজ্জ্বল সর্পজ মুক্তা পুণ্যহীন ব্যক্তির নয়নগোচর হয় না।

সর্পজ মুক্তা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে চতুর্ব্বিধ হইয়া থাকেন। সর্পজ মুক্তার ব্রাহ্মণজাতীয় মুক্তা শেয়াকুলের ন্যায়, ক্ষত্রিয় মুক্তা আমলকীর ন্যায়, বৈশ্যমুক্তা কুলের ন্যায় এবং শূদ্রমুক্তা ঝুঁচের মত হইয়া থাকে।

সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ ধন, ধান্য, ঐশ্বর্য্য এমন কি রাজশ্রী লাভ দ্বারাও যেরূপ তেজস্বী হন, একটি মাত্র এই মুক্তাধারণে সেরূপ তেজস্বী হইতে পারেন।

যখন কোন ব্যক্তি রত্ন পরীক্ষকদিগের উপদেশানুসারে শুভলগ্নে অতি যত্নপূর্ব্বক সর্পজ মুক্তা গৃহে রক্ষা করেন, সেই সময়ে আকাশে ঘন ঘন দুন্দুভিধ্বনি হইতে থাকে।

যে ব্যক্তির ধনভাণ্ডারে সর্পমুক্তা থাকে, সর্প, অসুর, রাক্ষস বা দুষ্টলোকে তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

কখন কখন ভেকাদির মস্তকেও মণি জন্মিয়া থাকে এই মণিকে সর্পমণির তুল্য মণিয়া জানিবে।

শুক্তিমুক্তা

সেই বলাসুরের মস্তাবলী স্বর্গভ্রষ্ট নক্ষত্রমালার ন্যায় সমুদ্রের বি চত্বর্ণ জলে পতিত হইয়াছিল।

তাহা এবং সমুদ্রের অন্যান্য মণিই শুক্তির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ণচন্দ্রের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল অতি উত্তম মণি সকলের বীজ স্বরূপ হইল।

সমুদ্রের যে প্রদেশে ঐ সুন্দর মুক্তা, মণি ও রত্নের বীজ পতিত হইল সেই প্রদেশের জলই শুক্তিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মুক্তারূপ ধারণ করিল।

সিংহল, পারলৌকিক, সৌরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণী, পারসীক, কৌবের, পাণ্ড্য, বিরাট এই আট স্থানে মুক্তা উৎপন্ন হয়।

সূর্য্য যে সময়ে স্বাতী নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন, তখন যে সকল জলবিন্দু শুক্তিগর্ভে পতিত হয়, তাহাই অতি উজ্জ্বল মুক্তারূপে পরিণত হয়।

পতিত জলবিন্দুর পরিমাণ অনুসারে মুক্তা স্থূল, যথাযথাকার বা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে।

সিংহলের মুক্তা অতি স্নিগ্ধ এবং পারলৌকিক দেশের মুক্তা অতি নিবিড় (নিরেট) সুতরাং ওজনে ভারী হয়।

সৌরাষ্ট্রের মুক্তা নিবিড়, শ্বেতবর্ণ, স্বচ্ছ, গোলাকার ও বৃহৎ হয় এবং তাম্রপর্ণ দেশীয় মুক্তা তাম্রবর্ণ, পারসবের মুক্তা পীতবর্ণ, পাণ্ড্যদেশীয় মুক্তা পাণ্ডুবর্ণ এবং বিরাটের মুক্তা শ্বেতবর্ণ ও রুক্ষ হইয়া থাকে।

রুক্মিণী নামে এক প্রকার শুক্তি জন্মে; ইহা অতি দুর্লভ। এই শুক্তিতে যে মুক্তা উৎপন্ন হয়, তাহা শ্বেতবর্ণ, স্বচ্ছ এবং আকারে জামরুলের মত হয়।

বহুজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—উত্তম ছায়াবিশিষ্ট, গোলাকার, সুন্দর, নির্দ্দোষ মুক্তা অমূল্য, দুর্লভ এবং কেবল রাজভোগ্য; এই মুক্তা অন্যভোগ্য ব্যক্তিগণের অপ্রাপ্য।

কেহ বলেন—সকল শুক্তিতে মুক্তাই একরূপ আকর হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহাদিগের রূপ ও আকৃতি প্রায় একরূপই হয়, কিন্তু দোষগুণ একরূপ হয় না।

শুক্তি ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে চতুর্ব্বিধ, সুতরাং শুক্তি-জাত মুক্তাও চতুর্ব্বিধ।

ব্রাহ্মণজাতীয় মুক্তা শুক্লবর্ণ, স্বচ্ছ, ওজনে ভারী, স্নিগ্ধ ও প্রভাবিশিষ্ট এবং ক্ষত্রিয়মুক্তা ঈষৎ রক্তবর্ণ, আকারে বৃহৎ এবং অরুণবর্ণপ্রভাবিশিষ্ট হয়। বৈশ্যজাতীয় মুক্তা ঈষৎ পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ অথচ শ্বেতপ্রভাযুক্ত হয় এবং শূদ্রজাতীয় মুক্তা শুক্লবর্ণ ও ক্ষুদ্রকায় এবং কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎকায় এই দুই প্রকারের হইয়া থাকে।

বংশজ মুক্তা

বংশের পর্ব্বমধ্যে যে মুক্তার উৎপত্তি, তাহা বংশের বর্ণবিশিষ্ট হয়; কিন্তু যাহাতে মুক্তা এরূপ বংশ কেবল পুণ্যশীল ব্যক্তিগণের বাসস্থলেই জন্মে, সকল স্থানে জন্মে না।

বংশজাত মুক্তা দেখিতে চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ, আকারে কক্কোলফলের (সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ) সদৃশ; এই মুক্তা দেবভোগ্য রত্ন বহু পুণ্যে লাভ হইয়া থাকে।

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের আধিক্য অনুসারে বংশ পাঁচ প্রকার হয়, সুতরাং বংশজাত মুক্তাও পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে।

পার্থিবাংশপ্রধানমুক্তা ওজনে ভারী ও নির্ম্মল, তৈজস-মুক্তা ওজনে লঘু, বায়বমুক্তা মৃদু ও স্থূল, আকাশাংশপ্রধান মুক্তা কোমল ও লঘু এবং জলীয় মুক্তা স্নিগ্ধ ও অতিশয় শুভ্রবর্ণ হইয়া থাকে। এই পাঁচ প্রকার মুক্তাই প্রধান ইহা ধারণ করিলে কোন প্রকার বাধা হয় না

হস্তী, সর্প, বরাহ এবং মৎস্যের মস্তকে, বংশ, শুক্তি ও শঙ্খের গর্ভে এবং মেঘের জলবিন্দুতে মুক্তা উৎপন্ন হয়।

মেঘে শুভ্রবর্ণ, গজে উজ্জ্বল পাটল, মৎস্যে অনুজ্জ্বল শ্বেত, সর্পে উজ্জ্বলনীল, বংশে হরিৎ ও শ্বেত বরাহে পীত এ শ্বেত এবং শঙ্খ ও শুক্তিতে শ্বেতমুক্তা জন্মে।

রত্নজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন—মুক্তার পীত, মধুর, শুক্ল ও নীল এই চারিপ্রকার ছায়া হয়।

পীতছায়া ঐশ্বর্য্যদায়িনী, মধুরছায়া বুদ্ধিবর্দ্ধিনী, শুক্লছায়া কীর্ত্তিকরী এবং নীলছায়া সৌভাগ্যপ্রদা হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণজাতীয় মুক্তার ছায়া শুক্ল, ক্ষত্রিয় মুক্তার ছায়া সূর্য্য রশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল, বৈশ্যমুক্তার ছায়া পীত এবং শূদ্র-মুক্তার ছায়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

মুক্তার গুণ।

সুস্বরত্ব, সুবৃত্তত্ব, মসৃণত্ব, নির্ম্মলত্ব, ঘনত্ব, স্নিগ্ধত্ব, গুরুত্বত্ব ও অস্ফুটিত্ব এই আটপ্রকার গুণ মুক্তায় বর্ত্তমান থাকে।

যে সকল মুক্তায় তারার ন্যায় আভা থাকে, তাহাদিগকে 'সুতার', যে মুক্তা সম্পূর্ণ গোলাকার, তাহাকে 'সুবৃত্ত', যে মুক্তায় কোন দোষ না থাকে, তাহাকে 'স্বচ্ছ', যাহাতে কোনরূপ মল না থাকে, তাহাকে 'নির্ম্মল', যে মুক্তা ওজনে ভারী তাহাকে 'ঘন', যে মুক্তা দেখিতে স্নেহদ্রব্য দ্বারা লিপ্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে 'স্নিগ্ধ', যাহা উত্তম ছায়া-বিশিষ্ট, তাহাকে 'গুরুত্ব' এবং যে মুক্তা প্রবেধাদি বিহীন, তাহাকে 'অস্ফুটিত' বলে।

উজ্জ্বল, কোমল, স্নিগ্ধ ও সুন্দর মুক্তা দেখিয়া যদি মনে হয় যেন উহা হইতে তেজ ক্ষরিত হইতেছে, তাহা হইলে ঐ মুক্তা যথার্থ।

শ্বেতকাচের ন্যায় শুক্ল, শুভ্র-কিরণচ্ছটাবিশিষ্ট, বৎসাকৃতি যে কৃষ্ণ দেবতাদিগের ভূষণযোগ্য।

বংশ, হস্তী, তিমিমৎস্য, শঙ্খ ও মেঘ হইতে যে মুক্তা জন্মে, তাহা প্রায়ই উজ্জ্বলা বিহীন হয়, কিন্তু তথাপি এই-গুলি মঙ্গলজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যে মুক্তা ওজনে ভারী, উত্তমদীপ্তিবিশিষ্ট, শুভ্রবর্ণ, গোলাকার, সমান সুন্দরত্বযুক্ত হয় এবং সৌন্দর্য্যে দ্রষ্টা ভিন্ন অপরেরও আনন্দবর্দ্ধন করে, সেই মুক্তাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

যে মুক্তা এই সমুদয় গুণযুক্ত হয়, তাহা যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে, তাহাকে কোন দোষই স্পর্শ করিতে পারে না।

এতদ্রূপ সর্ব্বগুণযুক্ত মৌক্তিক যে ধারণ করে, তাহার আয়ু ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিলাভ করে এবং সকল অনিষ্ট বিনষ্ট হয়।

যে গৃহে (১) গুণশালী মৌক্তিক থাকে, স্বভাবচঞ্চলা লক্ষ্মী সেই গৃহে স্থিরভাবে বাস করেন।

মুক্তার দোষ

মুক্তাসম্বন্ধে দশ প্রকার দোষ উল্লিখিত হইয়াছে; তাহার চারিটী মহাদোষ এবং ছয়টী অবান্তরদোষ মধ্যে পরি-গণিত; তাহাদিগের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

মুক্তার এক অংশে শুক্তিখণ্ড সংলগ্ন আছে, এরূপ দোষ হইলে, 'শুক্তিসঙ্গ' দোষ হয়; এই দোষযুক্ত মুক্তা ধারণে কুষ্ঠ হয়।

মুক্তার মধ্যে মৎস্যচক্ষুর মত দোষ থাকিলে তাহাকে 'মৎস্যাক্ষ' দোষ বলে; এই দোষ পুত্রের অনিষ্টকর।

মুক্তায় দীপ্তি ও ছায়ার অভাবকে 'অঠর' দোষ বলে; এই দোষযুক্ত মুক্তাধারণে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মুক্তায় বিদ্রুমের ন্যায় ছায়া থাকিলে, তাহাকে 'অতিরক্ত' দোষ বলে; এই দোষযুক্ত মুক্তা দারিদ্র্যজনক, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিবে।

মুক্তাতে যে উপর্য্যুপরি তিনটী বলয়াকার রেখা থাকে, তাহা 'ত্রিবৃত্ত'-দোষ নামে অভিহিত হয়; এই দোষ সৌভাগ্য নাশক।

যে মুক্তা গোলাকার নহে, তাহার নাম 'চিপিট'; এই মুক্তাধারণে অখ্যাতি হয়।

যে মুক্তা ত্রিকোণ, তাহার নাম 'ত্রস্র', ইহা সৌভাগ্য-নাশক।

দীর্ঘাকৃতি মুক্তার নাম 'কৃশ'; কৃশমুক্তা বুদ্ধিনাশ করে।

মুক্তার এক অংশ ভগ্ন হইলে, তাহাকে 'কৃশনাথ' বলে; এই দোষযুক্ত মুক্তা অতি নিন্দনীয়, ইহা উৎসাহ নাশ করে।

---

(১) গেহে।

পীড়কা-যুক্ত মুক্তার নাম 'অবৃত'; এই মুক্তা পশু-সম্পত্তিনাশক।

মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হইলেই সেই মুক্তাকে লবণমিশ্রিত উষ্ণজলে একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। অথবা ওষধের মধ্যে মুক্তাটী রাখিয়া উপরে ধাত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে যে মুক্তা বিবর্ণ হয় না, তাহাই অকৃত্রিম।

অন্যত্রও আছে—লবণযুক্ত গোমূত্রপূর্ণ ভাণ্ডে মুক্তা ফেলিয়া রাখিবে, পরে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বস্ত্র দ্বারা জড়াইবে এবং তাহা হস্তে লইয়া কুশ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে; ইহাতে কৃত্রিম মুক্তা ভাঙ্গিয়া যায় এবং অকৃত্রিম মুক্তা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

আরক্ত কাচপাত্রে মুক্তাটী রাখিয়া পাক করিলেই মুক্তা ফুটিয়া বাহির হয়, ইহার পর মুক্তাটী একমাস কাল-যাপনের মধ্যে রাখিবে।

মুক্তা অম্লভাণ্ডে রাখিয়া জম্বীররসের সহিত পাক করিবে, তাহার পরে তোমার মুখে ঘর্ষণ করিলেই মুক্তাকে ইচ্ছানুসারে বিদ্ধ করা যায়।

'মৎস্যপিত্ত' মধ্যে মুক্তা রাখিয়া, তাহার উপরে মৃত্তিকা লেপন করিয়া 'বিভীতকাগ্নি' দীপ্তিতে অগ্নিতে পক্ক করিবে; পরে ছুচ্ছে, জলে এবং মধ্যে পাক করিয়া ধনে শোধন করিবে; ইহার পর পরিষ্কৃত বস্ত্রে ঘর্ষণ করিলেই মুক্তা উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত হয়।

মুক্তার মূল্য

ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—পাঁচ গুঞ্জা (রতি)তে এক মাষক এবং চারি মাষকে এক শাণ হয়।

যে গুক্তিজ মুক্তার গুরুত্ব পরিমাণ এক শাণ, তাহার মূল্য ষোলশত কপর্দ্দক।

এই মুক্তা অপেক্ষা গুরুত্বে অর্দ্ধ মাষক ন্যূন মুক্তার মূল্য চারি সহস্র এবং দুই মাষা পরিমিত মুক্তার মূল্য দুই সহস্র কপর্দ্দক।

আড়াই মাষা পরিমিত মুক্তার মূল্য ছয় শত এবং ছয় মাষা পরিমিত মুক্তার মূল্য আট শত কপর্দ্দক।

যে মুক্তার গুরুত্ব পরিমাণ এক মাষা, তাহার মূল্য তিন শত পঁচিশ এবং যে-মুক্তা ছয় রতি পরিমিত, তাহার মূল্য তিন শত কপর্দ্দক।

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধশ্লোক ইহার অব্যবহিত পরে যাইবে, নতুবা সামঞ্জস্য থাকে না। "ধরাষকোন্মোলিত মাষকৈকং চত্বারিংশদ্বিভিঃ শতং তাং।"

এক মাষা পরিমিত মুক্তার মূল্য এক শত কুড়ি এবং চারি রতি পরিমিত মুক্তার মূল্য অষ্টাবিংশতি কপর্দ্দক।

ইহা ব্যতীত 'ধরণ' দ্বারা মুক্তার পরিমাণ করিবে; 'ধরণের' ত্রয়োদশাংশের এক অংশ পরিমাণের নাম 'ধিক্কা'; ধিক্কা-পরিমিত মুক্তার মূল্য ছয় শত কপর্দ্দক।

'ধরণে'র ষোড়শাংশের এক অংশের নাম 'দার্ব্বিক'। দার্ব্বিক-পরিমিত মুক্ত মুর্দ্ধের হস্তে থাকিলে ও এক শত দশ কপর্দ্দক মূল্যে বিক্রীত হয়।

'ধরণের' বিংশাংশের এক অংশকে 'মৌক্তিকক' বলে; এই ওজনের মুক্তা গুণহীন না হইলে, তাহার সাতানব্বই কপর্দ্দক মূল্য হয়। 'ধরণ' পরিমাণের ত্রিশ ভাগের এক ভাগকে 'শিক্কা' বলে; এই ওজনের মুক্তার মূল্য চল্লিশ কপর্দ্দক।

ধরণের চল্লিশ ভাগের এক ভাগের নাম 'শিক্ষক'; এই ওজনের মুক্তার মূল্য ত্রিশ কপর্দ্দক।

ধরণ পরিমাণের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগের নাম 'সোম'; এই ওজনের মুক্তার মুক্তার মূল্য কুড়ি কপর্দ্দক।

'ধরণ'-পরিমাণের ষাট ভাগের এক ভাগকে 'নিকর শীর্ষ' বলে; এই ওজনের মুক্তার মূল্য চৌদ্দ কপর্দ্দক।

'ধরণের' আশীভাগ ও নব্বই ভাগের এক ভাগকে 'কুপ্যা' বলে; এই দুই প্রকার ওজনের মুক্তার মূল্য যথাক্রমে এগার ও নয় কপর্দ্দক হইয়া থাকে।

'ধরণের' শত ভাগ, দেড় শত ভাগ এবং দুই শত ভাগের এক ভাগকে 'চূর্ণ' বলে; এই তিন প্রকার ওজনের মুক্তার মূল্য যথাক্রমে সাত, পাঁচ এবং তিন কপর্দ্দক।

'শাণ' পরিমাণের উর্দ্ধে এক এক মাষা করিয়া অধিক হইলেই প্রতিক পীড়িত দেশেও সেই মুক্তা দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও মধ্যম সকল মুক্তারই মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু কেবল মুক্তা জাতি দেখিয়াই মুক্তার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে না; সকল গুণে অলঙ্কৃত মুক্তারই ঐরূপ মূল্য জানিবে।

যে মুক্তা চন্দ্রকিরণের মত প্রভাবিশিষ্ট এবং দেখিতে প্রায় বিল্বফলের (তেলাকুচের) মত, সম্পূর্ণ গোলাকৃতি না হওয়ায়, তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সাত ভাগের এক ভাগ হইয়া থাকে।

পীতবর্ণ মুক্তার অর্দ্ধমূল্য এবং শঙ্খোদর ও অশ্বখাদ মুক্তার যথাক্রমে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের তিন ভাগের এক ভাগ ও ছয় ভাগের এক ভাগ মূল্য হয়।

ভগ্নমুক্তার অর্দ্ধমূল্য এবং যে মুক্তার গাত্রে চূর্ণ প্রস্তর থাকে, যে মুক্তা অশ্বার ও যাহার আকৃতি বংশের মত, যাহার একাংশ মাত্র উজ্জ্বল, যাহার অঙ্গসকল বিচ্ছিন্ন, যাহার বর্ণ চাতক, কাংস্য বা মৎস্যচক্ষুর মত যাহা প্রভা-পূর্ণ অথবা কোনরূপ দোষযুক্ত এরূপ মুক্তার মূল্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যের এক চতুর্থাংশ হইয়া থাকে।

অন্যরূপ পরিমাণ ও উল্লিখিত আছে—তাহা পরিমাণের নাম 'সকালী', তিন সকালীতে এক 'প্রপক' হয় এবং দশ প্রপকে এক 'কলঞ্জ' হয়

রাজা দুই কলঞ্জ-পরিমিত মুক্তা ধারণ করিবে না, এক মুক্তা দেবতোগ্য মাত্র বলিয়া অযোগ্য।

যে রাজা এইরূপ নিয়ম করিয়া মুক্তা ধারণ করে, তাহার আয়ু, খ্যাতি ও শৌর্য্য বর্দ্ধিত হয়; অন্যথাচরণ করিলে ঐ সকল অপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আপদ

(গল্প)

চাটুয্যেদের ঘরে
একে একে সবাই হ'ল বি এ, এম এ, সরস্বতীর বরে।
কেবল তাদের অভাগিনী পিসির ছেলে
ফেলের পরে ফেলে
কোন মতেই প্রবেশিকার চৌকাঠটা আর পারল না টপ্‌কাতে।
ফেলের খবর আসলে পরেই গদার মামা লাঠি নিয়ে হাতে
বছর বছর মারত তাকে তাড়া করে
কাণটা ধরে বলত তাকে "পাজি, আমার ঘরে
জায়গা তোমার আর হবে না আসছে বছর পাশ না হলে পরে।"
বছর বছর একই কথা এমন করে
শুনতে শুনতে হ'ল না তার জ্ঞান।
কোনও মতে বাঁচিয়ে ছুটো কাণ

দিবারাত্রি খেলে বেড়ায় আমোদ করে পাড়ার ছেলের দলে।
অভাগিনী মা যদি তার কেঁদে কেটে বলে
"এতখানি বয়েস হ'ল একটুখানি বুদ্ধি হ'ল নাক'
চিরটা কাল বোকা হয়েই থাক"
মায়ের পানে চক্ষু তুলে বল্‌ত গদা "পড়ি শুনি ঢের
তবু যে কেন করি মাগো সেটা কেবল অদৃষ্টেরি ফের।"

ওটা কিন্তু একেবারেই মিথ্যা কথা।
পড়ার নামে গদার মাথায় ধর্‌ত যেন টন্‌টনে কোন্ ব্যথা।

পাঠ্য-কেতাব খুল্‌ত না সে কভু
বল দেখি তবু
কেমন করে পাশ হবে সে পড়াশুনা কিচ্ছুই না করে?
পড়ার কথায় গদায় ধরে জ্বরে।

দিবারাত্রি খেলিয়ে বেড়ায় যারা
কেমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে পাশ কর্‌বে তা'রা?
বছর খানেক না পেরুতেই গদার মামা গেলেন স্বর্গলোকে।

এতদিন যে গদার মাকে আগ্‌লে ছিল হাজার দুঃখে শোকে
তাঁহার স্নেহের ভাই—
এখন থেকে একা হলেন—অভাগিনীর কেউ যে গো আর নাই।

এখন থেকে প্রতিপদে সবাই তাঁকে দুষে—
তুচ্ছ কথায় সবাই তাঁকে রুষে
ব্যথার পরে কাঁটার মত বাক্যবাণে সবাই বিদ্ধ করে
উঠ্‌তে বস্‌তে কটুকথা নির্দ্দোষীরেই আঘাত চিত্ত পরে।

ধীরে ধীরে নানান্ রোগের পালা
গদার মাকে ধর্‌ল শেষে; একে রোগের জ্বালা
তার উপরে মিথ্যাপবাদ বিষের জ্বরে
শয্যাশায়ী কর্‌ল তাঁকে একেবারে।

এতদিনে মায়ের দুঃখ ব্যথা
এতদিনের মায়ের হাজার কথা
একে একে পড়্‌ল গদার মনে।

স্বাধীন হয়ে মায়ের দুঃখ করতে হবে দূর
এই রাগিণীই তার কাণেতে বাজাল এক সুর
মেতে গেল পড়ার ঝোঁকে দিবারাত্রি পড়ে ঘরের কোণে।

গদার মা যে দিনে দিনে বিছানাতে যাচ্ছে মিশে মিশে
তার উপরে কথার বিয়ে
শেষের দিন যে এগিয়ে আসছে ধীরে
মরণসিন্ধু-তীরে
সে কথাটা বুঝ্‌ল না কেউ—ভাব্‌ল সবাই সবই বুড়ীর ফাঁকি।
অনেকদিনই বাঁচ্‌বে সে যে—এখনও যে অনেক আছে বাকী।

পড়ার নেশায় আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে,
আমোদ খেলা কোথায় গেছে—দিবারাত্রি আছে কেতাব নিয়ে।

গদার পড়া দেখে
সবাই হেসে বলে "এবার একে
মেডেল দিতে হবে তা সে চামড়ারই বা টিনের।"

● ● ● ●

পরীক্ষারই দিনের
সকল লেঠা গেল চুকে—গদা এসে মায়ের পাশে বসে,
হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ধীরে ধীরে মায়ের মাথার কেশে
বল্‌ল "এবার নিশ্চয়ই পাশ হব—তবে—"
থাম্‌ল ধীরে। মা বলিলেন "ফল বেরুবে কবে—"
"মাস দু'তিনের মধ্যে বুঝি"
মা ভাবিলেন "বাঁচ্‌তে হবে—"বোঝাবুঝি
এর ভেতরেই শেষ কোরো না—হে ভগবান্ প্রভু
গদার ভাল দেখে যেন মর্‌তে পারি তবু।"

"পাশ হয়েছে গদা এবার সর্ব্বপ্রথম হয়ে
অদ্ভুত ছেলে এ—"
গদার মা তা শুন্‌তে পেয়েই উঠ্‌তে গেল বেগে
পড়ে গেল—এমন সময় বৌমা এসে হেসে

হাত পা নেড়ে বল্‌ল—"ওগো একি ব্যাপার তোমার
তোমার জন্যে নষ্ট হল সংসারটা যে আমার—
সারারাত যে পিদিম জ্বালাও তেল আসে কোত্থেকে ?"

আসল কথা এখন একে
বল্‌তে হবে—কারণ এরই ছেলে পাশ হয়েছে—এঁ—
প্রথম হয়ে ! আমার ছেলে কেল করেছে যে।

চক্ষু মুছে নীরব হয়ে রইল গদার মা।
একটা "টুঁ" বা "রা"ও করল না।

পায়ের ধুলো নিল এমন সময় গদা এসে
তার পরেতে হেসে
বল্‌লো "মাগো পাশ করেছি সর্ব্বপ্রথম হয়ে—"
কোলের উপর বসিয়ে তাকে মাথাতে হাত দিয়ে
আপন মনে বল্‌ল কি যে—তারপরেতে তার হাতটা নিয়ে
দুহাত দিয়ে ধরে বল্‌ল "এবার আমি সুখে
বরণ করে নেব বাবা মরণকে মোর বুকে।"

এলিয়ে প'ল দেহলতা
এতদিন যে পেয়েছিল কেবল দুঃখ-ব্যথা
এবার সে যে শান্তি পেল।

গদার বিষম চীৎকারেতে দৌড়ে সবাই এল
ভেবেছিল বক্‌বে সবাই গদার মাকে
বল্‌বে "এমন চেঁচামেচির বিষম ঝোঁকে
টিক্‌তে তারা পারছে না কেউ
বকাবকির ঢেউ
শেষ ত কভু হবে না আর—বের করে দাও গদার মাকে,
তা হইলেই সব আপদ চোকে।"
আপদ সে যে নিজে থেকেই বেরিয়েছে কোন্ ফাঁকে
তাড়িয়ে দিতে হ'ল না আর তাঁকে।

শ্রীরাধারমণ নাগ।

চতুর্ব্বেদাশ্রম

(গল্প)

তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। ভারতের উত্তরাঞ্চলকে তখন আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইত। সে সময় ব্রাহ্মণের তপোবল ছিল, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল ছিল, বৈশ্যের বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসতি ছিল এবং শূদ্রের দাসত্বে সেবায় ত্রুটী হইত না।

আর্য্যাবর্ত্তের সেই সৌভাগ্যের দিনে স্বামী ত্রিলোচনাচার্য্যের চতুর্ব্বেদাশ্রমে ছাত্র সংখ্যা অগণিত ছিল। মহাপণ্ডিত ত্রিলোচনাচার্য্য দশ বৎসরকাল নানা দেশের অসংখ্য ছাত্রকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া সহসা একদিন ইহলোক মুক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। ত্রিলোচনাচার্য্যের পুত্র ছিল না। তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী ও দুইটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

ত্রিলোচনাচার্য্যের মহাপ্রস্থানের পর তাঁহার চতুর্ব্বেদাশ্রম শূন্য হইয়া পড়িল। তাঁহার প্রধান ছাত্র পুণ্ডরীক যখন চতুর্ব্বেদ লাভ করিয়া গুরুর নিকট গৃহিতানুজ্ঞ হইয়া সমাবৃত্ত স্নান করিয়াছিল তখন তিনিই তাহাকে উপদেশ দিয়া অপর একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। সুতরাং বিদ্যার্থী ছাত্রের দল তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অন্যান্য গুরুর শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইল। কেবল একটী মাত্র ছাত্র কোথাও নড়িতে পারিল না—সে বিনায়ক।

অনাথ ব্রাহ্মণ বালককে অপুত্রক ত্রিলোচনাচার্য্য অনেক আশা করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহাকে দ্বিতীয় প্রধান শিষ্য করিবার জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য বিনায়কের অদৃষ্টে তাহা সহিল না ত্রিলোচনাচার্য্য ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন, বিনায়কেরও বেদশিক্ষা সম্পূর্ণ হইল না।

ত্রিলোচনাচার্য্যের বিধবা পত্নী আর্য্যা মায়াদেবী বিনায়ককে অনেক বুঝাইলেন। অন্যত্র গিয়া সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনেক মিষ্ট উপদেশ দিলেন।

এই শ্রিয়বাদিনী রমণী দেশ বিশ্রুত কবি রঘুপতি সেবের একমাত্র কন্যা। কাব্যে ও অলঙ্কার শাস্ত্রে মহাকবি রঘুপতি সেব তাঁহার কন্যাকে মুক্ত করিয়া এই প্রাপাধিকা দুহিতাকে শিখাইয়াছিলেন। বেদবাদিনী মায়াদেবী তাহার একটী ধর্ম্ম ও আজিও ভুলেন নাই। সে অনেক দিনের কথা—একদা যেদিন অবিবাহিত যুবক ত্রিলোচনাচার্য্য কবি রঘুপতির গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যার মুখে স্বরচিত কবিতার স্বললিত আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই ঘোর বৈষয়িক ব্রাহ্মণ যুবক এ জগতকে যায়া এবং এ সৃষ্টিকে প্রপঞ্চ জানিয়াও সেদিন ব্যাকুল হইয়া এই কন্যাটীর পাণি-প্রার্থী হইয়াছিলেন। মায়াদেবী সেদিন তাঁহার পিতৃদেবের এই তেজঃপুঞ্জ কলেবর প্রেমার্দ্র নবীন অতিথিটিকে বিমুখ করেন নাই। তাঁহার রূপ-সমুজ্জ্বল কাব্যালঙ্কার লইয়া ত্রিলোচনাচার্য্যের চতুর্ব্বেদাশ্রম মণ্ডিত করিতে আসিয়াছিলেন।

বিনায়ক কতদিন মায়াদেবীকে তাঁহার কন্যাদ্বয়কে শিক্ষা দিতে শুনিয়াছে। এই মন্ত্র-মুগ্ধ ব্রাহ্মণ বালক তাহার কর্ণদ্বয় বন্ধ করিয়া মায়াদেবীর মুখে সুছন্দ কবিতার মধুর আবৃত্তি ও তাহার সুচারু ব্যাখ্যা বিস্মৃত হইয়া শুনিত। মাতা ও কন্যাদের কাব্যালোচনা শুনিতে শুনিতে বালকের প্রাণের ভিতর এই ললিত কাব্যকলা শিক্ষা করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা উথলিয়া উঠিত। তাই আজ মায়াদেবী যখন তাহাকে বেদপাঠ সম্পূর্ণ করিবার জন্য অন্যত্র যাইতে উপদেশ দিলেন, বিনায়ক অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল।

চতুর্ব্বেদাশ্রমের ক্রোড়ের উপর দিয়া স্বল্পস্রোতা 'সুরম্যা' তরতর করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। বিনায়ক তাহার আন্দোলিত হৃদয় লইয়া এই সুরম্যা তীরের এক বন-পত্রাচ্ছাদিত কিংশুক তরুমূলে গিয়া উপবেশন করিল। সেদিনের অপরাহ্ণটী বেশ নির্জ্জন। মিষ্ট মলয়পবন অন্তর সঘন ও দেহ রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছে। কেবল বিনায়কের অন্তরে সেদিন বিষম দ্বন্দ্ব চলিতেছিল—বেদপাঠ

সম্পূর্ণ করিবার আবশ্যক কি? কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করি না কেন?

মায়াদেবী কন্যাদের নাম রাখিয়া ছিলেন ছাতি ও মেখলা। ছাতি সকলের অজ্ঞাতসারে তাহার পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল এবং মেখলা নির্ব্বিঘ্নে চতুর্দ্দশে পদার্পণ করিয়াছিল। ছাতির দেহ দৃঢ় ও সবল; সে পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ। আশ্রমের সমস্ত কঠিন কার্য্য-গুলি সে যেচ্ছায় আপন হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। মেখলা তাহা পারে না। সে সুন্দর বটে কিন্তু সবল নয় তাই ছাতি তাহাকে আশ্রমের ছোটখাট হাল্‌কা কাজগুলি ভাগ করিয়া দিয়াছিল।

নিত্য প্রভাতে উঠিয়া উষাস্নানান্তে পট্টাম্বরী পরিয়া বেদপাঠ করিতে করিতে সাজি হাতে মেখলা বন হইতে বনান্তরে কুসুম চয়ন করিয়া বেড়াইত। যত্ন করিয়া সে আশ্রম মৃগগুলিকে পালন করিত। প্রতিদিন অপরাহ্নে সে তাহার কীণ কটিতে বসন বাঁধিয়া কানন তরু তলের মূলে মূলে জলসেক করিয়া ফিরিত। মেখলার সুঠাম দেহলতা—তাহার কমনীয়-অঙ্গের স্নিগ্ধ-লাবণ্য সকলেরই নয়নরঞ্জন করিত।

বিনায়ক বেদপাঠ সম্পূর্ণ করিবার জন্য অন্য কোথাও যাইতে কিছুতেই মনকে সম্মত করাইতে পারিতেছে না। এমন সময় পুস্তকক্ষে মেখলা আসিয়া ডাকিল, "বিনায়ক!" বিনায়ক সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। মেখলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখানে একলাটী বসে কি ভাবছ? আমার আজ একটী কলসও জল তুলে দিলে না। আমি একা জল তুলে তুলে শ্রান্ত হয়ে পড়িছি।" মেখলা কলস ভূমিতে নামাইয়া রাখিল, কটি হইতে অঞ্চল খুলিয়া মুখের চারুললাটের স্বেদ-মুক্তাবিন্দুগুলি মুছিয়া লইয়া কিয়ৎক্ষণ অন্যমনে বিনায়কের পরিত্যক্ত স্থানটী বেশ গভীর ভাবে অধিকার করিয়া বসিল। বিনায়ক তখন মানসিক চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় আজ তাহাকে জলসেকে সাহায্য করিতে যাইতে পারে নাই বলিয়া মার্জ্জনা চাহিতেছিল। মেখলা মৃদু হাসিয়া তাহার মানসিক বিপর্য্যয়ের কারণটী কি জিজ্ঞাসা করিল। বিনায়ক তাহার সমস্ত চিন্তাগুলিকে অকপটে মেখলার সম্মুখে বাহির করিয়া ধরিল। কি জানি কেন ইদানিং এই মেয়েটীর কাছে বিনায়ক তাহার কিছুই লুকাইয়া রাখিতে পারিত না। মেখলা হাসিতে হাসিতে বলিল "এর জন্য তোমার এত ভাবনা! তা আমাকে একবার বল্লেইত' হ'ত যে বেদে আর আমার রুচি নাই কবিতা আর অলঙ্কারের জন্য আমার প্রাণ কাঁদছে!' তা চল এখন কুটীরে চল।" মেখলা উঠিয়া দাঁড়াইল বিনায়ক কলসটী তাহার স্কন্ধে তুলিয়া দিল। মেখলা বলিল আমি মাকে বলে সব ব্যবস্থা করে দেব এখন, তুমি আর ভেব না, বেদ শিখ্‌তে তোমাকে এখান থেকে আর কোথাও যেতে হবে না।" এই বালিকার মুখের অভয়বাণী বিনায়কের অস্থির চিত্তকে কতকটা নিশ্চিন্ত করিয়া দিল।

ইহারই দুই একদিন পরে মেখলা একদিন তাহার জননীকে বলিতেছিল, "মা। বিনায়ক বেদ শেষ কর্ব্বার জন্য আর কোথাও যেতে রাজি নয়।" মায়াদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?" "সে বল্‌ছিল তোমার কাছে কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র ভাল করে শিখ্‌বে।" মায়াদেবী অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তবে তাই শিখুক, ওর যখন বেদপাঠে আর প্রবৃত্তি নেই তখন আর মিছে কেন সেজন্য ওকে অন্যত্র পাঠাব।" এই কোমলহৃদয়া নারী কাহাকেও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কর্ম্মে লওয়াইতে প্রয়াস পাইতেন না।

সেদিন রাত্রে শয়ন করিবার সময় ছাতি মেখলাকে বলিল, "বিনায়কের বেদ শিখ্‌তে না যাওয়াটা ভাল হ'ল না।" মেখলা বলিল "কেন তাতে তার কি হয়েছে? ওতো যার কাছে কাব্য আর অলঙ্কার শাস্ত্র শিখ্‌বে।"

"তা শিখুক কিন্তু বেদটা শেষ করতে পাল্লে ওর ভাল হত।"

"কেন এতেই বা ওর মন্দটা কি হবে? কাব্যে ওর বরাবরই একটা ঝোঁক আছে আর অলঙ্কার শাস্ত্র শেখবার একটা প্রবল ঝোঁকও আছে, তা ছাড়া শিল্পকলায় ওর বেশ হাত আছে; কি সুন্দর বাটীর প্রতিমূর্ত্তি গড়ে দেখেছ'ত?"

"তা হ'ক, বেদ শিখতে যাওয়াটাও ওর প্রয়োজন ছিল।"

"কিছু না। বরং না যাওয়াটাই আমাদের পক্ষে বেশী প্রয়োজন। তবু আশ্রমে আমাদের দেখবার শোনবার একজন লোক থাকবে। "কিছু আবশ্যক নেই। ও গেলে আমাদের কোন ক্ষতি হত না, আর একজনত' রয়েছেন প্রায়ই এসেত' আমাদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন।" —এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে এই একজন আর কেহই নহেন, স্বর্গীয় ত্রিগুণাচার্য্যের প্রধান শিষ্য পুণ্ডরীক। শ্রান্তি এই পুণ্ডরীকের বাগ্দত্তা পত্নী। বহুদিন হইতে ইহাদের বিবাহ স্থির হইয়া আছে। ত্রিগুণাচার্য্য সহসা দেহত্যাগ না করিলে এতদিন ইহাদের পরিণয় সম্পন্ন হইয়া যাইত।

মেখলা বলিল, "তিনি তাঁর আশ্রম নিয়েই ব্যস্ত। সকল সময়ত' তাঁকে পাওয়া যাবে না কখন কি আবশ্যক হবে কে জানে?"

শ্রান্তি আর কিছু বলিল না কিন্তু তাহার মনে মনে এই কথাটা কেবলই উঠিতে লাগিল 'পুণ্ডরীকের নিকট বিনায়ক তাহার বেদ শিক্ষাটা সম্পূর্ণ করিলেই ভাল করিত। পুণ্ডরীকের চতুর্ব্বেদ কণ্ঠস্থ এবং সে যে বেদের নূতন ভাষ্য করিতেছে তাহা যে সম্পূর্ণ নির্ভুল হইতেছে ইহা ভাবিয়া শ্রান্তি অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদাই একটা গৌরব অনুভব করিত।

প্রতি বৃহস্পতিবার গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া পুণ্ডরীক চতুর্ব্বেদাশ্রমের ভার লইতে আসিতেন এবং তিনি বেদের যে নূতন ভাষ্য করিতেছিলেন তাহারই নবরচিত অংশটুকু মায়াদেবীকে শুনাইয়া যাইতেন। এই ভাষ্য লইয়া পুণ্ডরীকের সহিত বিনায়কের মাঝে মাঝে মহা তর্ক বাধিয়া যাইত। পুণ্ডরীকের ভাষ্যের নানাস্থানে বিনায়ক আপত্তি করিয়া বসিত এবং বহুতর্কের পরও কিছুতেই তাঁহারা একমত হইতে পারিত না। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল না। পুণ্ডরীক কতদিন মায়াদেবী ও শ্রান্তির নিকট অযাচিতভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে এই অনাথ ব্রাহ্মণ বালক অতীব বিচক্ষণ ও প্রখর বুদ্ধি শক্তি সম্পন্ন। শ্রান্তি বলিত "তা'হক্ কিন্তু আপনার সঙ্গে বেদ নিয়ে তর্ক করাটা ওর মোটেই শোভা পায় না।" অবশ্য পুণ্ডরীক একথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিতেন না বরং তাঁহাকে স্পষ্ট স্বীকার করিতেই হইত যে বিনায়কের পক্ষে সেটা শোভা পায় না বটে কিন্তু তথাপি তাঁহার উদার হৃদয় বার বার অকপটে বলিত "এই প্রতিভাবান বালকের মধ্যে অনেক সংপদার্থ আছে।" এই কথা শুনিয়া মেখলার অন্তঃকরণ পুণ্ডরীকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিত।

একখানি প্রশস্ত অজিনের উপর মায়াদেবী তাঁহার কন্যারত্নকে লইয়া কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিক্ষা দিতে বসিতেন এবং তাঁহার সম্মুখে একখানি কুশাসনের উপর বিনায়ক বসিত। মায়াদেবীর মধুর-সুরভ কণ্ঠে কাব্যের বিনোদ-আবৃত্তি ও সাধু বাক্যে তাহার সুললিত ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে বিনায়ক যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্যে গিয়া পড়িত। তাহার মনে হইত যেন বাণী ও কমলাকে লইয়া মহামায়া স্বয়ং তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তাঁহার আবৃত্তির কল-কাকলি-মন্ত্র-তান যেন বীণার তারে ঝঙ্কারে-ঝঙ্কারে-ঝঙ্কারে-ঝঙ্কারে উঠিয়া পড়িয়া খেলিয়া বেড়াইত। সুকণ্ঠ বিনায়ক অতি অল্পদিনের মধ্যেই কাব্য আবৃত্তিতে মায়াদেবীর উত্তম ছাত্রীকেই পরাস্ত করিল। হ' হ' করিয়া অলঙ্কার শাস্ত্র শিখিতে লাগিল। তাহার অদ্ভুত মেধা ও স্মরণশক্তি দেখিয়া মায়াদেবী বিস্ময়ে পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে 'শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-জ্যোতিস্-ছন্দস্' এ বিনায়ক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিল।

একদিন মেখলা ছুটিয়া আসিয়া তাহার জননীকে একটা কিছু অপরূপ জিনিষ দেখাইবে বলিয়া টানিয়া লইয়া গেল। শ্রান্তি তখন আপন মনে একখানা জীর্ণ বস্ত্রের সংস্কার করিতেছিল, মেখলা তাহাকেও ডাক দিল, "দিদি! শিগ্গির উঠে আয়, দেখে যা বিনায়ক কি সুন্দর মূর্ত্তি গড়েছে!" শ্রান্তি উঠিল না তাহার হাতের কাজ শেষ না হইলে সে উঠিতে পারিবে না বলিল, অগত্যা মেখলা একা তাহার জননীকে লইয়া গিয়া দেখাইল। মূর্ত্তিটি তাহাদের অতীত

কাব্যের একটী পরিচ্ছন্ন হইতে গৃহীত। বিষয় "প্রথম সন্দর্শন!" মূর্ত্তিশিল্পী বিনায়ক অপরাধীর মত সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। লজ্জায় তাহার গণ্ডদ্বয় কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠিতেছিল।

মেখলা খুব উৎসাহের সহিত তাহার জননীকে বিনায়কের গঠিত মূর্ত্তির এইরূপ পরিচয় দিতেছিল, "ঐটি বেণুমতী তীরে দানব গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম। ঐ আশ্রমের কুসুমিত কুঞ্জাভ্যন্তরে সন্তযাতা দেবযানী সাজি হাতে পূজার জন্য সদ্যবিকশিত পুষ্পরাজি চয়ন করিতেছে। দেবযানীর পিতার নিকট শিক্ষা গ্রহণের জন্য বৃহস্পতি-সুত স্বর্গ হইতে আজ এই প্রথম পুষ্পবনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! কিশোর ব্রাহ্মণ! চন্দনে চর্চ্চিত ললাট! কণ্ঠে পুষ্পমালা—পট্টবাস পরিহিত, অধরে নয়নে যেন একটা প্রসন্ন সরল হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে!"

মায়াদেবী মূর্ত্তিটীর যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মন যেন কি একটা চিন্তায় ভরিয়া উঠিল। সহসা সেদিন যেন তিনি প্রথম দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার কন্যাটীর সমস্ত অন্তঃকরণ এই শিল্পদর্শন ব্রাহ্মণ বালকের প্রতি নীবিড়ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে!

মূর্ত্তিগঠন শিক্ষা করিবার জন্য হঠাৎ সেদিন মেখলা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহাকে এখনই একটা কিছু গড়িতে শিখাইবার জন্য বিনায়ককে সে বড় ব্যস্ত করিয়া তুলিল। অগত্যা বিনায়ক কিছু মৃত্তিকা লইয়া মেখলাকে ত্রিখণ্ডলা, কপিত্থ, ত্রিশূল প্রভৃতি কয় প্রস্তরের প্রণালী শিখাইতে লাগিল। মেখলা একটী ত্রিখণ্ডলী গড়িয়াই বলিল, বাঃ এত বেশ সোজা! আমি এ অল্পদিন শিখ্‌লেই তোমার চেয়ে ভাল পুতুল গড়তে পারবো, তুমি রোজ আমায় একটু করে শিখিয়ো।" বিনায়ক করুণহাস্যে মেখলার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "তোমায় শেখাতে পারি আমার এত বিদ্যা ত' নাই মেখলা!"

সেদিন রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া মেখলা ছাতিকে বলিল, "বিনায়কের পুতুলটী দেখ্‌লে না? কি সুন্দর যে গড়েছিল কি বলবো!" ছাতি বলিল, "আমার ও সব ভাল লাগে না।" মেখলা বলিল, "এটী যদি দেখ্‌তে তোমার খুব ভাল লাগতো, এ মূর্ত্তিটী তোমার একবার দেখা উচিত ছিল।" ছাতি এবার একটু রুক্ষভাবে উত্তর দিল, "যতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে পুতুল দেখ্‌বো ততক্ষণে আমার একটা কাজ সারা যাবে। মাটীর পুতুল দেখে আর কি লাভ!" মেখলা এবার হাসিল ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "খুব লাভ হ'ত। মুখটা হাঁ করে বসে পুণ্ডরীকের বেদের ভুল ভাষা শুনে তোমার যা লাভ হয়নি, তার চেয়ে অনেক বেশী লাভ হতে পারতো।" ছাতি তাহার ভাবী-পতির উপর এবং তাহার নিজের উপর মেখলার এই অযথা আক্রমণে মনে মনে খুব হাসিল বটে, কিন্তু আর কোনও উত্তর দিল না।

"বিনায়কের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! কাহারও নিকট কখনও শিখে নাই, তথাপি কি সুন্দর গড়িয়াছে!" মেখলা ইহাই ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দে কখন ঘুমাইয়া পড়িল। তারপর নিশিশেষে সে একটা স্বপন দেখিল। দেখিল সেই বেণুমতীর তীর! সেই কুসুমিত কুঞ্জবন! সেই কুঞ্জবনের অন্তরালে তরুণ অরুণের মত এক ব্রাহ্মণ যুবক দাঁড়াইয়া আছে, সে যেন তাহাদেরই এই বিনায়ক!—আর যে বালিকা সাজি হাতে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছিল, তাহার মুখ যেন বড় চেনা চেনা! সে যেন মেখলাই নিজে নিত্য-পূজার ফুল তুলিতে আসিয়াছে!

* * * *

দেখিতে দেখিতে উত্তরায়ণ অতীত হইল। চতুর্বেদাশ্রমে ইহারই মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন বিনায়কই মায়াদেবী ও তাঁহার কন্যাদ্বয়কে কাব্য পড়িয়া শোনায় ও তাহার সুললিত ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের মুগ্ধ করিয়া দেয়। অলঙ্কার শাস্ত্রের সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া তাহাদের চমৎকৃত করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে বিবিধ ছন্দোবন্ধে সরল মধুর কবিতা রচনা করিয়া, তাহাদের শুনাইয়া প্রীত করিয়া দেয়। 'গায়ত্রী' 'মাতৃকা' 'লক্ষ্মী' প্রভৃতির মানসী প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া সে আশ্রম-চত্বরের এক অংশ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সকল প্রতিমূর্ত্তির পাশে পাশে মেখলার হাতে গড়া ছোট ছোট হংস, মৃগ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলিও সগর্ব্বে তাহাদের আসন অধিকার করিয়া থাকিত। ছাতি কতদিন তাহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছে, "ওরে, ওগুলো ফেলে দিস্। ওর পাশে তোর

মাটীর ঢেলাগুলো খাড়া করে রাখিস্‌নি !" মেখলা হাসিয়া বলিত, "তা হ'ক, ও থাক্ ; ওকর চেয়ে না হয় শিষ্যের ভাল হয়নি তা বলে কি গুরুর পায়ের কাছেও একটু স্থান পাবে না !"

সেদিন বৃহস্পতি বার। পুণ্ডরীক আসিয়াছিল—তাহার বেদের ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। মায়াদেবী, ছ্যুতি, মেখলা, বিনায়ক সকলে আজ তাহাকে ঘেরিয়া তাহার ভাষ্যের সমাপ্তি শুনিতে বসিয়াছে। পুণ্ডরীক কিয়দংশ পাঠ করিয়া অবশিষ্ট বিনায়ককে পড়িয়া শুনাইতে অনুরোধ করিল। মধুকণ্ঠে বিনায়ক যখন প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক উদাত্তস্বরে বেদের স্তোত্রগুলি আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল তখন একটা অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় হৃত চতুর্ব্বেদাশ্রমের প্রতি ক্ষুদ্র কোনটী ধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল ! বিনায়কের সেই পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ কণ্ঠ, সেই সুস্পষ্ট ওঙ্কার-উদাত্ত-বিন্যাস মেখলার হৃদয় তন্ত্রীতে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া তাহার বক্ষের ভিতর যেন একটা মধুরাভিনীর মোহিনী ঝঙ্কার বাজাইয়া গেল !

সেদিন রাত্রে মেখলা ছ্যুতিকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, বিনায়ক পুণ্ডরীকের অপেক্ষা অনেক ভাল আবৃত্তি করিতে পারে !" ছ্যুতি গম্ভীরভাবে বলিল, "তা হতে পারে ; বেদ আবৃত্তির বোধ হয় তুমিই একমাত্র সুবিচারক !" মেখলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না আমি তা বল্‌ছি না ; তবে আমার যেন বিনায়কের আবৃত্তিই ভাল লাগল।" দ্যুতি তেমনই ভারি গলায় উত্তর করিল, "তা হতে পারে ; সকলের পড়াই যে সবার ভাল লাগ্‌বে এমন ত কোন কথা নাই !" দ্যুতির কণ্ঠের এই অভিমানের সুর মেখলার প্রাণে গিয়া আঘাত করিল। সে রাত্রে দুই তরুণীর কেহই ভাল নিদ্রার গতি পাইল না।

আজ কয়দিন হইল বিনায়ক তাহার কাব্যালোচনা বন্ধ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে একখানি চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল। চিত্রখানি যে কি তাহা কাহাকেও বলে নাই কাহাকেও দেখায় নাই। মেখলা ইতি মধ্যে অনেকবার আসিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে 'আঁকা শেষ হইল কিনা' তাহার তাগাদা করিয়া গিয়াছে। তিন দিন পরে মায়াদেবীও আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছেন 'চিত্রখানি সমাপ্ত হইয়াছে কিনা ?' ছ্যুতি এ কয়দিন এ ঘরেও আসে নাই ; কিন্তু চারদিনের দিন সেও দুরুদুরু করিয়া বিনায়কের ঘরের দ্বার পানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ছবি লইয়া বিনায়কের আর কতদিন ছেলেখেলা চলিবে জানিতে চাহিল। আজ চার দিন পড়াশুনা বন্ধ হইয়া আছে ইহা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। বিনায়ক সভয়ে উঠিয়া বলিল, "আজই এটা আমার শেষ হয়ে যাবে' কাল থেকে আবার রীতিমত পড়া সুরু করবো !" দ্যুতি চলিয়া গেল। বিনায়কের কক্ষের ভিতর ক্ষণিকের জন্য যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল।

ইহারই প্রহরার্দ্ধ পরে বিনায়ক তাহার চিত্রাঙ্কণ সমাপ্ত করিয়া তুলিকা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নির্নিমেষ-নয়নে কিয়ৎক্ষণ আপনার চিত্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, তার পর আরও কতক্ষণ কি ভাবিয়া সে চিত্রখানা হাতে করিয়া মেখলার সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

মায়াদেবী তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা দ্যুতি ও তাঁহার ভাবী-জামাতা পুণ্ডরীককে লইয়া আপন কক্ষে বসিয়া মৃদুস্বরে কি পরামর্শ করিতেছেন। সেই কক্ষের দ্বারেই কিছু দূরে একখানা মৃগচর্ম্মের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মেখলা আপন মনে একটী কবিতা রচনা করিতেছে ! লেখনীর প্রান্তভাগ কুন্দদন্তপ্রান্তে চাপিয়া ধরিয়া, বাম করতলে শির বিন্যস্ত করিয়া দূর-দিগন্তের পানে চাহিয়া মেখলা তখন কবিতার উপাদান সংগ্রহ করিতেছিল। সে দেখিতেছিল, দূরে—বহুদূরে—নীল আর ছায়ার অন্তরালে বিস্তীর্ণ আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার দুই বাহু মেলিয়া পর্ব্বতের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিতেছে !

মায়াদেবী বলিতেছিলেন "ওদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে পুণ্ডরীক ! অবশ্য বিনায়কের সহিত মেখলার পরিণয়ে যে কিছুই বাধে না সে আমি ভেবে দেখিছি কিন্তু তবু তোমাদের কাছে একটী পরামর্শ জান্‌তে চাই !" ছ্যুতি বলিল, "দেখ মা, বিনায়ক বড়ই ভাল ছেলে হ'ক তবু সে অনাথ। আমাদের মেখলাকে কি তুমি এক অনাথের হাতে তুলে দেবে মা।" পুণ্ডরীক বলিলেন, "অনাথ হ'ক এতে কিছু এসে যায় না—পিতামাতা সকলের

চিরদিন থাকে না কিন্তু কিছু উপার্জনক্ষম হওয়া আবশ্যক। মায়াদেবী আগ্রহের সহিত বলিলেন, "বিনায়কের আমাদের অনেক গুণ আছে। সে নানা উপায়ে অর্থ উপার্জনে সক্ষম।" পুণ্ডরীক বলিল, "তা জানি মা, কিন্তু কবি ও চিত্রকরেরা বড় অলস! তারা সক্ষম হলেও উপার্জন করতে চায় না!"

ঠিক এই সময়ে চিত্র হস্তে সহাস্যমুখে বিনায়ক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মেখলা বিনায়ককে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার কবিতার অর্দ্ধলিখিত অংশটুকু ক্রোড়াঞ্চলে গুপ্ত করিয়া সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। বিনায়ক মেখলার দিকে অগ্রসর হইয়া কম্পিত-হস্তে তাহার সদ্য-সমাপ্ত চিত্রখানি মেখলার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বলিল, "এই ছবিখানি শেষ হয়ে গেছে মেখলা, তুমি নেবে?" কথাগুলি বিনায়ক বেশ সহজ সরল ও স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে পারিল না; তাহার চোখে মুখে একটা লজ্জার রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মেখলা আজ বিনায়কের সেই ভাব দেখিয়া কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল! তাহার জননী, তাহার ভগ্নী, পুণ্ডরীক সকলেই তাহার পানে তাকাইয়া আছে দেখিয়া ছবিখানা গ্রহণ করিতে তাহার কেমন যেন একটা বাধা বোধ হইতেছিল। মায়াদেবী উভয়েরই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। তিনি বিনায়ককে ডাকিয়া বলিলেন, "কি ছবি এঁকেছ, দেখি?" বিনায়ক সত্বর গিয়া তাঁহার সম্মুখে চিত্রখানা ধরিল। পুণ্ডরীক চিত্র দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—বাঃ বাঃ! সাধু সাধু! চমৎকার হয়েছে! সুন্দর হয়েছে বিনায়ক!" মেখলা এতক্ষণ সেইখানে—সেই ঘরের দ্বারখানেই দাঁড়াইয়াছিল; ছবিখানা দেখিবার একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল। সহসা পুণ্ডরীকের মুখে এই উচ্চ প্রশংসাধ্বনি শুনিবামাত্র মেখলা ছুটিয়া তাহার জননীর নিকট গেল এবং তাঁহার পশ্চাৎ হইতে চিত্রখানি দেখিতে লাগিল।

দ্বারকা—শ্রীকৃষ্ণের আবাসের অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যান। উদ্যানের লতাকুঞ্জদ্বারে শ্বেতপ্রস্তরাসনে কুমারী 'ভদ্রা' বদন অবনত করিয়া বসিয়াছিলেন। ভদ্রার প্রিয়তম হরিণ-শিশুটী তাহার মুখের পানে কাতরনয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মহাবীর ফাল্গুনী তখন দ্বারকার রাজপ্রাসাদে শ্রীকৃষ্ণের অতিথি—তিনি উদ্যানভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। কোনওক্রমে পথ ভুলিয়া অন্তঃপুর উদ্যানে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং ভদ্রাদেবীর ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সবার্দ্র চিত্তে তাঁহার সমীপে আসিয়া নত জানু হইয়া ভদ্রার মৃণাল কোমল বাহু বল্লরীর কঠিন বন্ধন সযত্নে উন্মোচন করিয়া দিতেছেন! অর্জ্জুন-করস্পর্শে সলজ্জে সসঙ্কোচে সুশীলা-ভদ্রা যেন কত জড় সড় হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার দু'টী ইন্দীবর নয়নে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিয়াছে! অদূরে তরু অন্তরালে শিশু মদন দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি এই অপরিচিত দীর্ঘকায় বীর্য্যবান পুরুষটীকে অন্তঃপুরে আসিতে দেখিয়া এবং তাঁহার পিসীমার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিতে দেখিয়া যেন কত রাগিয়াছেন, ভদ্রা তাঁহাকে কিছু পূর্ব্বে খেলিবার জন্য যে 'ফুল-শর'টী গড়িয়া দিয়াছিলেন তিনি তাঁহার ছোট ধনুটীতে তাহাই যোজনা করিয়া অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিতেছেন! দূরে প্রাসাদ বাতায়ন হইতে পরিহাস-রস-রঙ্গিনী রাণী সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া সহাস্য অধরে এই বন্ধুর দৃশ্য দেখাইতেছেন!"

চিত্রখানি বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মায়াদেবী বলিলেন—এ চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে বিনায়ক। পুণ্ডরীক বলিলেন "ভাই! এ তুমি ঘর ক'রে রেখে দাও; আগামী বৎসর উজ্জয়িনীর বাসন্তী মেলায় পাঠিও, রাজসম্মান প্রাপ্ত হবে।" ব্যস্ত হইয়া বিনায়ক বলিল "কিন্তু মা এখানা আমি মেখলার জন্যই এঁকেছি যে।" মেখলার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে মুখটী নীচু করিয়া রহিল।—বিনায়কের চিত্র আঁকার উদ্দেশ্য স্বীকার শুনিয়া তাহার মনে মনে একটা ভারী খুসি ও গৌরব অনুভূত হইতেছিল। মেখলা স্থির করিল এই ছবিখানি লইয়া সে তাহার চারিপার্শ্বে একটা চন্দন কাষ্ঠের ধড়ুলী দিবে এবং একখানি রেশমের আবরণী বুনিয়া সে ইহা খুব যত্ন করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে।

মায়াদেবী বলিলেন—"না বিনায়ক, এত ভাল ছবি মেখলাকে দেওয়া উচিত নয়; ছেলে মানুষ নষ্ট করে ফেলবে।" বিনায়ক ব্যাকুল হইয়া বলিল—"না মা। এ

ছবিখানা এমন কিছুই ভাল হয়নি যে খুব বয় করে রাখতে হবে।" এই বলিয়া বিনায়ক চিত্রখানি গুটাইয়া মেখলার হাতে দিতে গেল—তখন ছাতি বলিয়া উঠিল—"ছি মেখলা ও ছবি তুমি গ্রহণ করো না; ও মূল্যবান ছবি যদি আমরা গ্রহণ করি বিনায়কের ক্ষতি করা হবে।" মেখলা বড় অনিচ্ছার সহিত তাহার প্রদারিত কর সম্বরণ করিয়া লইল।

বিনায়ক তাহার প্রত্যাখ্যাত চিত্রখানা মুঠা করিয়া ধরিয়া একবার সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—তাহার মনে হইল এ কক্ষের সকলে যেন আজ তাহাকে উপহাস করিতেছে! হঠাৎ তাহার সর্বাঙ্গে যে যেন একটা অপমানের তীব্র জ্বালা অনুভব করিল! ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে, আত্মহারা হইয়া বিনায়ক নিমেষে তাহার চিত্রখানা দুইহাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া খুব সম্ভব অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল!

"ঐ যাঃ! কি করলে!" বলিয়া মেখলা ছুটিয়া আসিয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে ঝুঁকিয়া পড়িল—।

বিনায়কের কাণ্ড দেখিয়া গুণ্ডরীকও হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন—উদ্ভত যুবক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক ও উচ্চরাজসম্মান হেলায় নষ্ট করিল।—মায়াদেবী শুধু অসীম অনুকম্পার সহিত বলিলেন, "অমন সুন্দর চিত্রখানি নষ্ট করে ফেল্‌লে বিনায়ক!—" ছাতি ভ্রূকুটী করিয়া করিয়া বলিল "বিনায়কের নিজের আঁকা ছবি, ইচ্ছে করলে ও পোড়াতে পারে, ছিঁড়ে ফেলতে পারে; ওর যা খুশী তাই করতে পারে; আমাদের সে জন্যে দুঃখ করাটা অনধিকার চর্চ্চা!"

ছাতির এই কঠোর বাক্য বিনায়কের পৃষ্ঠে যেন নির্মমতার কষাঘাত করিল!—সে আহতের মত ধীরে ধীরে সেখান হইতে বাহির হইয়া আপনার কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়ন সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং ঘন কৃষ্ণটিকাবৃত নিশিথিনীর প্রথম পাদক্ষেপের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। তখন চারিদিকে বিপুল অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে সবে দুই একটী তারকা ক্ষীণ দীপিকার মত দূরে-দূরে অস্পষ্ট মিট মিট করিতেছে।

বিনায়ক কতক্ষণ সেই জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিল তাহার মনে নাই। ঐখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে যখন ভাবিতেছে 'দোষটা তাহারই অধিক হঠাৎ কাজটা তাহার খুবই অন্যায় হইয়া গিয়াছে; সুতরাং সকলের নিকট তাহাকে মার্জ্জনা চাহিতে হইবে।'—সেই সময় মায়াদেবী আসিয়া তাঁহার স্বভাব কোমলকণ্ঠে ডাকিলেন "বিনায়ক। কিছু আহার করবে এস বাবা। অনেক রাত হয়েছে তোমার খাবার সময় কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে!"

বিনায়ক আহার করিতে আসিয়া দেখিল পুণ্ডরীক ভোজনে বসিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে ছাতি আনত হইয়া প্রদীপটী উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। দীপশিখার সমস্ত আলোক ছটাই যেন ছাতির মুখের উপর গিয়া পড়িয়াছে। আসনের উপর স্তব্ধ পুণ্ডরীকের প্রেমমুগ্ধ স্নিগ্ধ আঁখি দুটী নির্নিমেষে সেই দীপান্বিতা সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। মেখলা সেখানে নাই। যতক্ষণ বিনায়কের চিত্রখানি অগ্নিকুণ্ডে ভস্ম হইয়াছিল ততক্ষণ সে সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল তারপর অভিমানিনী তার অনিরুদ্ধ অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। 'তার সমস্ত প্রাণ যখন সহস্র বাহু বিস্তার করে সেই ছবিখানি গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিল—সে ছবি তখন তার নেওয়া হয় নাই। দারুণ অভিমানে বিনায়ক তার বড়সাধের ছবিখানা আগুনে পুড়িয়ে ফেল্‌লে! মেখলা আশ্রমের একটা পরিত্যক্ত কক্ষে বসিয়া এই সব কথাগুলি ভাবিতেছিল আর অবিশ্রান্ত-চক্ষের জল মুছিতেছিল। মেখলাকে আহারের সময় দেখিতে না পাইয়া বিনায়কের মনে হইল মেখলা নিশ্চয়ই তাহার উপর রাগ করিয়াছে। বেচারা শুষ্কমুখে নিতান্ত অপরাধীর মত আহারে বসিল; পুণ্ডরীকের সহিত একটীও বাক্যালাপ করিতে পারিল না। ছাতি তাহার জননীকে ইহাদের নীরব ভোজনের সাক্ষী রাখিয়া মেখলার সন্ধানে উঠিয়া গেল।

করুণাময়ী মায়াদেবী যেদিন তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর নিকট হইতে এই নিরাশ্রয় অনাথ ব্রাহ্মণ বালককে সাদরে তাঁহার অপত্যহীন ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন সেইদিন হইতে এতদিন ইহাকে আপন গর্ভজাত সন্তানের মত

তাঁহার নিবিড় স্নেহাঞ্চলে ঘেরিয়া অসীম যত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন। আজ ইহার এই আধার-মলিন বিষণ্ণ মুখখানি দেখিয়া তাঁহার স্নেহ-প্রবণ মাতৃ-হৃদয়খানি পুত্রের বাধিষ্ঠ হৃদয়ের সহিত সমবেদনায় জননীর মতই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বিনায়ক আহারে বসিয়াছিল মাত্র। খাদ্যদ্রব্য কিছুই তাহার গলাধঃকরণ হইতেছিল না। মায়াদেবী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কিছুই খেলিনে যে বিনায়ক? তখন থেকে মন খারাপ করে বসে আছিস্ কেন বাবা! ছবিখানার জন্ত কি তোর বড় কষ্ট হয়েছে?" তাঁহার প্রতি বাক্যটীতে সুগভীর স্নেহ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিনায়ক বলিল "না মা! ছবিখানার জন্ত কিছু না; অকারণ আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছি বলিয়াই আমার মনে বড় কষ্ট বোধ হচ্ছে। আপনারা সকলেই বোধ হয় আমার উপর বড় রাগ করেছেন?" মায়াদেবী হাসিয়া বলিলেন "ছি বোকা ছেলে! রাগ করবো কেন? তুই বরং আর একখানা ছবি এঁকে দিস্, মেখলাকে এবার নিজে বসে দেখো। এখন লক্ষ্মী ছ'য়ে খা' দেখি; ঐ ব্যঞ্জনগুলো রেখে দে' কিন্তু ফেলিস্নি।"

বিনায়কের আধার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত ব্যঞ্জনগুলি টানিয়া লইয়া অন্নের শেষ কণাটী পর্য্যন্ত কুড়াইয়া খাইয়া উঠিয়া গেল এবং তাহার কক্ষের দীপশিখাটী উজ্জ্বল করিয়া দিয়া পরক্ষণেই আর একখানি চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিয়া গেল।

করুণ-প্রাণ মায়াদেবী স্মিতমুখে কত কি ভাবিতে ভাবিতে কুমারের আহার করাইতে চলিয়া গেলেন।

আহারে বসিয়া মেখলা তাহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ মা! ছবিখানা সবটা পুড়ে গেছে না? বিনায়ক কি বল্লে? আমাদের ওপর খুব রাগ করেছে?" ছাতি গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল "কেন আমাদের ওপর রাগ করবে কিসের জন্ত? আমরা তার কি অনিষ্ট করিছি? বরং যদি কেউ রাগ করে তবে সে বাবা রাগ করবার কথা; কি বল মা?" মায়াদেবী ধীরে ধীরে বলিলেন "কিন্তু ছাতি সে যে এখই মনে মেখলার জন্ত আর একখানা ছবি আঁকতে বসে গেছে!" ছাতি অবাক হইয়া বলিল "সেকি মা! কে তাকে আঁকতে বল্লে?" মায়াদেবী তেমনই ধীর স্বরে বলিলেন "আমি বলেছি ছাতি!" উৎসুক হইয়া ছাতি জিজ্ঞাসা করিল "কি বলেছ?" তখন হাসিতে হাসিতে মায়াদেবী বলিলেন বলেছি মেখলা এবার তোমার ছবি লেখে।" ছাতি বিস্ফারিতনেত্রে তাহার জননীর প্রশান্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার নিজের মুখখানা যেন বিশেষ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল 'ঁ্যাঁ একাজটা ভাল হয়নি। এ'তে বিনায়ককে আরও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।'

তখন মেখলা ভাবিতেছিল ছাতি কেন এত বাধা দিচ্ছে? কই সেবার পুণ্ডরীক যখন তাকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা "শ্রীমদ্ভগবত" এনে দিয়েছিল আমিতো কোনও বাধা দিই নি? বরং সাধু পুণ্ডরীককে কত ধন্যবাদ জানিয়েছিলেম। আর আমার আজ একজন একখানা সামান্ত চিত্র দেবে ছাতি কেন তাতে এত বাদ সাধ্‌ছে? ও কেন আমার ওপর এত নিষ্ঠুর হচ্ছে!"

বিনায়ক নিবিষ্টচিত্তে চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত। কয়দিন কাটিয়া গেল তবুও সে আঁকিতেছে। এবার আর কেহ তাহাকে বিরক্ত করিতে আসে নাই। ছবি শীঘ্র শেষ করিবার জন্ত কড়া তাগাদা করে নাই। সে একাগ্রচিত্তে আঁকিতেছে,—

উৎসবময়ী বৈজয়ন্তী!—চন্দ্র করোজ্জ্বল নিশীথিনী!—সুরসরসী মন্দাকিনী তটে জ্যোৎস্নালোকিত অভিরাম নন্দনবন!—নন্দনবনে বিকশিত পারিজাতকুঞ্জ!—সেই সুরভিত কুঞ্জকাননে—বিকচ মন্দার তরুতলে—সুর-লোকেশ্বরী ইন্দ্রাণী শচী সুদাসনে—ফুল তুষারে নীলায়িত ভঙ্গিমায় বসিয়া আছেন—তাঁহার সম্মুখে অসিক্ষিতা রূপসী উর্ব্বশী ললিতনৃত্যকলা প্রদর্শন করিতেছেন—সুধাপানোন্মত্ত দেবরাজ তাঁহার বরবর্ণিনী অমরী প্রেয়সীর দু'টি অরুণ রাঙ্গা চরণতলে অর্পণারিত হইয়া স্বর্গের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীর বিমোহন রাগ-রঙ্গ মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছেন!"

চিত্রের প্রতি ক্ষুদ্র অংশটিতে ত্রিদিবের অলোক সৌন্দর্য্য ফুটাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তুলির পরে তুলি বর্ণের পরে বর্ণ বুলিয়া যাইয়া—যাইয়া—বুলিয়া শেষ যখন "আর না" বলিয়া বিনায়ক তুলিকা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল অমনি একটী পরিচিত কণ্ঠের সুমধুর উচ্চহাস্যে কোমল পল্লবের মত ছোট দুটি হাতের মুষ্টিবদ্ধ করতালি ধ্বনিতে কক্ষটী পূর্ণ হইয়া উঠিল! বিনায়ক ফিরিয়া দেখিল—মেখলা! তাহার মুখে হাসি, চক্ষে বিস্ময়—বক্ষে আনন্দ! তারপর বিনায়ক যখন স্পন্দিত হৃদয়ে কত সাধ কত আশা লইয়া চিত্রখানি মেখলার প্রসারিত করে তুলিয়া দিল—মেখলা অতি দীর্ঘক্ষণ একটা অসীম কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ পুলক-চঞ্চল-কোমল-দৃষ্টি বিনায়কের মুখের পরে রাখিয়া সহসা চিত্রখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল—সেদিন বিনায়ক সেই প্রথম তাহার জীবনে ধন্য মানিয়াছিল! তাহার চিত্র-বিদ্যা সার্থক হইল মনে করিয়াছিল!

পরদিন প্রত্যূষে মায়াদেবী যখন পূজায় বসিয়াছিলেন ও ভ্রান্তি রন্ধন শালায় ব্যস্ত ছিল বিনায়ক মেখলাকে একটা কিছু বলিবার জন্য তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। মেখলা তখন আপনার কক্ষে বসিয়া ক্রোড়ের উপর বিনায়কের চিত্রখানি বিছাইয়া আনতশিরে অপলক দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। সে যতই মনোযোগের সহিত সেই চিত্রখানি দেখিতেছিল ততই অধিকতররূপে মুগ্ধ হইতেছিল। মেখলা ভাবিতেছিল এনিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমনতর চিত্রটী আঁকিতে পারে বুঝি তেমন চিত্রকর আর কেহই নাই, এহেন সুনিপুণ বর্ণ-চাতুর্য্যে অমরাবতীর ষড়ৈশ্বর্য্য বিকশিত করিতে পারে এমন তুলিকা বুঝি আর কাহারো নাই; চিত্রের প্রত্যেক রেখাটিতে এমন বিচিত্র ভাবের যাদুরী ফুটাইয়া তুলিতে বুঝি আর কেহই সমর্থ নয়! এমন সময় বিনায়ক ধীরে ধীরে আসিয়া মেখলার সম্মুখে দাঁড়াইল। বিনায়ককে দেখিয়া মেখলা সচকিতে উঠিয়া ক্ষিপ্রহস্তে চিত্রখানি তাহার পশ্চাতে লুকাইয়া ধরিল। যেন এতক্ষণ সে কিছু চুরি করিতেছিল। বিনায়ক সহাস্য অধরে জিজ্ঞাসা করিল "ছবিখানা কি তোমার পছন্দ হয়েছে মেখলা?" মেখলা চুপ করিয়া রহিল। বিনায়কের কণ্ঠস্বর আজ যেন অতিরিক্ত কোমল! বিনায়ক বলিল "মেখলা! আজ তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি, দেখ, আমাদের দুজনের মধ্যে আমি একটা নূতন সম্বন্ধ করতে চাই! তোমাকে আমার সহধর্ম্মিণী হতে হবে—কি বল—হবে কি?—"

মেখলা একদিনও কল্পনা করে নাই—যে এমন একটা দিন একদিন আসিবে এবং সেদিন আসিলে তাহাকে কি উত্তর দিতে হইবে! বেচারি বড়ই মুস্কিলে পড়িল! যদিও সে বিনায়ককে ঠিক প্রণয়ী হিসাবে একদিনও ভাবে নাই তা সত্ত্বেও তাহার মনে ইদানিং বিনায়কের জন্য নূতন করিয়া এমন একটা প্রবল আকর্ষণ আসিয়াছিল যাহা সে তরুণী বালিকা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না! সহসা আজিকার এই নির্জ্জন প্রভাতে কে যেন তাহাকে এই প্রথম বুঝাইয়া দিল যে নিশ্চয় সে বিনায়ককে তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া ভালবাসিয়াছে! নতুবা এ কিসের আবেশে তার সকল প্রাণ আজ এমন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে! এ কিসের আবেশে—উল্লাসে তার সমস্ত হৃদয়খানি আজ তখন মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেছে!

মেখলার সেই আনতসুন্দর রক্তিম মুখের পানে প্রেমবিচ্ছুরিত দৃষ্টি ফিরাইয়া বিনায়ক বলিল "আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলবে ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছ না, দেখ যাক জিজ্ঞাসা ক'রে কাল তুমি আমার কথার উত্তর দিও? কেমন?" মেখলা তুলির পানে চাহিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। তারপর বিনায়ক অনেকক্ষণ মেখলার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, মেখলা তখন সেই শূন্য কক্ষতলে বসিয়া পড়িয়া একাকিনী অনেক কথা ভাবিতে লাগিল।

অনেক বেলায় জননী মায়াদেবী আসিয়া ডাকিলেন মেখলা! কি হয়েছে মা? শরীর কি অসুস্থ? আজ এখনও স্নান করলিনি—পূজা করলিনি—একাদশ দণ্ড যে অতীত প্রায় মা!" মেখলা জননীকে দেখিয়া সহসা উঠিয়া সিক্ত-কণ্ঠাবেষ্টন করিয়া ধরিল। অকূল চিন্তা

লাগরে ভাসিতে ভাসিতে সে কেন একটা কূলে আসিয়া ঠেকিল। জননীর মুখের পানে হর্ষোৎফুল্লনয়নে চাহিয়া বেখলা একে একে তাঁহাকে বিনায়কের সকল কথাগুলি বলিল। মায়াদেবী অশ্রুর বেগে কণ্ঠার শিরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি তাকে কি বলেছ মা?" বেখলা এইবার অবনত মুখে বলিল "আমি তো' মা কিছুই বলে উঠ্‌তে পারিনি।" মায়াদেবী কন্যার অবনত মুখখানি তাহার চিবুক ধরিয়া উঁচু করিয়া তুলিলেন, সহাস্য অধরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিনায়কের হাতেই কি তোমাকে সম্প্রদান করবো বেখলা। লক্ষ্মী মেয়েটী আমার!—তোর মনের ইচ্ছেটা কি আমার কাছে' প্রকাশ করে বল মা!" বেখলা তাহার সলজ্জ প্রফুল্ল মুখখানি জননীর বক্ষের মধ্যে লুকাইল! মায়াদেবীর কণ্ঠ বেড়িয়া দুহিতার বাহু বেষ্টন আরও নিবিড় হইয়া উঠিল! বালিকার মনের কথা আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

ইহারই পরদিবস পুণ্ডরীক আসিয়া মায়াদেবীকে বলিলেন "অবন্তীপুরের মহারাজ 'অনন্ত বর্ম্মা' একজন সভাকবির জন্য ঘোষণা করেছেন! আপনি বিনায়ককে সেখানে পাঠিয়ে দিন। বিনায়ক এইরূপ পদের একমাত্র যোগ্যলোক।" মায়াদেবী একটু ইতস্ততঃ করিয়া করিয়া বলিলেন "আর কিছুদিন থাক্, উহাদের বিবাহের পর ওকে সেখানে পাঠিয়ে দেবো এখন।" পুণ্ডরীক জোর করিয়া বলিলেন না মা, তা হতে পারে না; এমন সুযোগ খুব অল্পই পাওয়া যায়। অবন্তীপুর রাজসভায় গুণের পরীক্ষা করে, কবি নির্ব্বাচিত হবে। মহারাজ অনন্ত বর্ম্মা কাহারও অনুরোধ উপরোধ মান্‌বেন না তিনি স্বয়ং বিচার করে যেই লোক নির্ব্বাচিত কর্ব্বেন। আমার বিশ্বাস, বিনায়ক সেখানে উপস্থিত হলে অনিবার্য্য নির্ব্বাচিত হবে।" মায়াদেবী একটু যেন শঙ্কিতভাবে বলিলেন "কিন্তু পুণ্ডরীক! যদি বালক পরাজিত হয়?" পুণ্ডরীক অবশির সঞ্চালনে তাহার দীর্ঘশিখা আন্দোলিত করিয়া বলিল "তা হতেই পারে না মা। বিনায়কের শরীরে বিক্রমার হবার বহু লক্ষণ বিদ্যমান আছে। এমন সুযোগ অবহেলা করা কোনক্রমেই উচিত নয়। বিনায়ক আজই অবন্তীপুর যাত্রা করুক।"

অগত্যা মায়াদেবী বিনায়ককে ডাকিয়া সমস্ত বলিলেন, শুনিয়া বিনায়কের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বেখলার নিকট হইতে দূরে যাইতে তার প্রাণ যে কিছুতেই সম্মত নয়!—বুদ্ধিমতী মায়াদেবী বিনায়কের মুখভাবে একথা স্পষ্টই বুঝতে পারিলেন, সস্নেহ বেখলার ললাটে, চিবুকে তাঁহার পদ্ম হস্ত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন "বৎস বিনায়ক! একটু মনস্থির করে বুঝে দেখ; তুমি এখন বয়োপ্রাপ্ত হয়েছ' শীঘ্রই তোমাকে পত্নী গ্রহণ করে গৃহধর্ম্মের জন্য সংসারী হতে হবে, সুতরাং তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভরণ পোষণে সক্ষম হওয়া চাই। অতএব এই উপার্জ্জনের কার্য্যে তোমার এই হতে যাওয়া কর্ত্তব্য। বিনায়ক কাতরভাবে বলিল 'মা তোমাদের ছেড়ে' তোমাদের না দেখে আমি সে সুদূরদেশে গিয়ে কি করে থাক্‌বো?" মায়াদেবী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "কি কর্ব্বে বৎস! কর্ত্তব্যের অনুরোধে থাকতে হবেই। তাছাড়া তুমি বেখলার পাণিপ্রার্থী।—" বিনায়কের সমস্ত দেহের ভিতর দিয়া একটা অধীর কম্পন বিদ্যুতের মত বহিয়া চলিয়া গেল! মায়াদেবী বলিতে লাগিলেন—"বেখলা তার জনীয় পিতার আদরে ও আমার অত্যধিক স্নেহে অকর্ম্মণ্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং তোমাকে নিরুপায় দেখেও আমি তার পাণিপ্রার্থী হয়ে কি করে তাকে তোমার হাতে সমর্পণ করবো। বেখলার ও তোমার বিবাহিত জীবনের সুখগুলি যে তাহ'লে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌বে।"

বিনায়ক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একেবারে সেইদিনই অপরাহ্নে অবন্তীপুরে যাত্রা করিতে চাহিল। মায়াদেবী বলিলেন "আজ কি তিথিতে যাত্রা হচ্ছে?" বিনায়ক পাঁজি পাতিয়া গণনা করিয়া বলিল—"তিন প্রহর ও আড়াই দণ্ড অতীত হ'লে কাল বেলা উত্তীর্ণ হ'বে তখন নৈঋতে যাত্রা শুভ—সিদ্ধ ও সৌভাগ্য যোগ!" মায়াদেবী বলিলেন "তবে তাই যেও; ছাতি ও বেখলাকে বলে দিই সব আয়োজন করে দিক্। কার-মনো-বাক্যে আশীর্ব্বাদ করি যেন সফল কাম হও। ছাত্রির বিবাহের সময় তোমায় সংবাদ দেবো

তখন কয়েক দিনের অবসর গ্রহণ করে এখানে চলে এস।" বিনায়ক সুবোধ বালকের মত ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বিনায়কের অবন্তীপুরে যাওয়ার কথা অবিলম্বে ছাতি ও মেখলার নিকট পৌঁছিল। এ সংবাদ মেখলার সর্ব্বাঙ্গে যেন পক্ষাঘাতের মত বাজিল! "সেকি! এত শীঘ্র! এখনও যে একটী দিবারাত্রি সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই! এই যে সবেমাত্র তাহারা পরস্পরের নিকট ধরা দিয়াছে! এইত প্রথম দুজনে দুজনের মনোভাব জানিতে পারিয়াছে! এ যে আবার নূতন করিয়া বিনায়কের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে! আজ যে তাহার নিকট আকাশ নূতন—পাতাল নূতন—সুনন্দার কলহাস্য নূতন—আশ্রমের বনকুসুম নূতন—বিহঙ্গের কূজন কাকলি নূতন! সকলই যে আজ তাহার চক্ষে নূতন সৌন্দর্য্যের আলম্বন হইয়া উঠিয়াছে! সহসা তাহার সুখ স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া এ কাহার বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠিল!

ছাতি সত্বর তাহার জননীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হাঁমা! বিনায়ক এখন হঠাৎ অবন্তীতে যাচ্ছে কেন গো! মাতাদেবী বলিলেন "যত শীঘ্র সে উপার্জ্জন-ক্ষম হবে তত শীঘ্র সে মেখলার পাণিগ্রহণের যোগ্য হতে পার্ব্বে এই আশায়।" বিস্মিতা ছাতি জিজ্ঞাসা করিল 'সে কি। তুমি কি তাকে এসম্বন্ধে কিছু বলেছ মাকি মা!" হাসিয়া মাতাদেবী বলিলেন "হাঁ মা, বলিছি বই কি। সে যে মেখলার পাণি-প্রার্থী হয়েছিল। মেখলাকে তার সহধর্ম্মিণী হবে কি না জিজ্ঞাসা করেছিল!" ছাতি অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "সেকি মা। কবে গো? কবে জিজ্ঞাসা করেছে? কি বলেছে তাকে মেখলা? মাতাদেবী প্রশান্ত কণ্ঠেবলিলেন "ছাতি! উতলা হস্‌নে মা! বিনায়ক আমার বড় সৎ ছেলে। সে মেখলাকে বলেছে যাকে জিজ্ঞাসা করে তবে আমার কথার উত্তর দিও।" ছাতি বলিল "তুমি তাকে নিশ্চয় খুবই উৎসাহ দিয়েছো, না মা!" মাতাদেবী আবার হাসিয়া বলিলেন "তা ছেলেমানুষ বিদেশে যাচ্ছে—দুটো উৎসাহের কথা না শোনালে যেতে তার মন সরবে কেন মা।"

বিনায়ক তখন যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। সে আজ দূর বিদেশে চলিয়া যাইতেছে—সেখানে তাহার কি কি আবশ্যক হইবে না হইবে, মেখলা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সেই সকল তাহাকে দেখিয়া শুনিয়া গুছাইয়া বাঁধিয়া দিতেছিল। পুণ্ডরীক যানবাহন ও শকটাদির বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইয়াছে।

যখন যাত্রা-দ্রব্য সমস্ত শেষ হইয়া গেল, বিনায়ক মেখলার দিকে চাহিয়া বলিল "তবে চল্লেম মেখলা! অনেকদিন পরে আজ আমাকে এই চতুর্ব্বেদাশ্রম পরিত্যাগ করে, যেতে হচ্ছে!" মেখলা স্খলিত অঞ্চলে অশ্রুজল মুছিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আবার কবে আস্‌বে?" বিনায়ক একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "কি জানি। বোধ হয় অনেকদিন আর আমাদের দেখা হবে না!" বিনায়ক মেখলার চক্ষের পানে চাহিল; যদি সেখানে যাবার বেলা কোন আশার ভাষা পড়িয়া লইতে পারে। কিন্তু মেখলার সে বড় বড় চোখ দুটী আবার তখন জলে ভরিয়া উঠিয়াছে! বিনায়ক সত্বর মেখলার নিকট গিয়া আপন উত্তরীয় বাসে তাহার অশ্রুপূর্ণ আঁখি দুটী মুছাইয়া দিল তারপর তাহার হাত দুখানি ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল "এই ছাতির বিবাহের সময়ই আবার আস্‌বো মেখলা।" এমন সময় পুণ্ডরীকের ডাক শোনা গেল "বিনায়ক! প্রস্তুত হয়ে এস—যামামি সমাগত।" বিনায়ক মেখলার হাত দুটী টানিয়া আপনার বক্ষের উপর রাখিয়া বলিল মেখলা! আমি আমি তোমার স্নেহের অধিকার তুমি আমায় দিয়েছ; কিন্তু তবু যাবার আগে তোমার মুখে একটী কথা শুনে যেতে চাই তোমার প্রেমে আমার অতিরিক্ত করে নেবে কিনা? তোমার এই শেষ কথাই সুদূর বিদেশে আমাকে সঞ্জীবিত করে রাখবে! মেখলা নতশিরে নীরব। বিনায়ক কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়—সে বারম্বার তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। তখন অশ্রুসিক্ত মেখলা সলজ্জ জড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিল "আঃ! বিনায়ক! কেন—কেন—সেতো—তুমিতো—জানত!—তবে—" মেখলার এই অস্ফুট স্বীকার উক্তি শুনিয়া বো বো

করিয়া হাসিতে হাসিতে বিনায়ক বৃদ্ধা ভগীর সহিত কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বেখলার হঠাৎ মনে পড়িল বিনায়কের সঙ্গেতো আহার্য্য দেওয়া হয় নাই। পথেত' তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইতে পারে। সে তাড়াতাড়ি কিছু আহার্য্য সংগ্রহের জন্ত ছাত্তির সন্ধানে চলিয়া গেল। ছাত্তি তখন রন্ধনশালায় ছিল না সুতরাং বেখলা আজ নিজেই অন্নব্যঞ্জন হতে দেখিয়া শুনিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন বিনায়ক সকণ্ঠে আলোচনা করিতেছে। মায়াদেবী, ছাত্তি ও পুণ্ডরীক আশ্রমদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। বেখলা ছুটিয়া গিয়া খাদ্যের পুলিন্দাটা বিনায়কের হাতে তুলিয়া দিতে গেল—বিনায়ক তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি এনেছ বেখলা!" বেখলা বলিল "খাবার"। বিনায়ক কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল "খাবার! একি হবে বেখলা?" বেখলা বলিল "পথে তোমার ক্ষুধা পাবে না?" বিনায়ক হাসিয়া বলিল "তোমার মুখের কথা না শুনতে পেলেতো আমার ক্ষুধা শান্তি হবে না বেখলা! তুমি যাবার সময় আমায় কিছু মিষ্টি কথা শোনাও, আমার সব ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়ে যাক্।" বেখলা স্মিত অবনত মুখে বলিল "যাও।" বিনায়ক বলিল "আচ্ছা তবে তুমি আমায় একটু আশীর্ব্বাদ কর।" বেখলা এবার বিনায়কের মুখের পানে প্রেম কটাক্ষে চাহিয়া অতি মধুর কণ্ঠে বলিল "ছি!" বিনায়কের কর্ণকুহরে কে যেন অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল—পরিপূর্ণ আনন্দে বিহ্বল বিনায়ক গদ্-গদ্‌স্বরে বলিল—"তবে আমি যা বলছি তুমিও তাই বল বেখলা! এই বলিয়া বিনায়ক তাহার সুললিতকণ্ঠে কক্ষমধ্যে প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিয়া উঠিল—

"ওঁ অস্তি পন্থা মনু চরেম—
সূর্য্যা চন্দ্র মসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা—
জানতা সঙ্গমেমহি॥"

গলদ্ অশ্রুনেত্রে বেখলা ও সঙ্গে সঙ্গে ছাত্তি, পুণ্ডরীক, এবং মায়াদেবীও পরস্পর কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়া সকলে একত্রে বিনায়কের সহিত ঋগ্বেদের এই শক্তি-সূক্ত গাহিতে লাগিলেন—

"রবি শশী তারা সব, এ পথে চলিতে নব,
বাধা বিঘ্ন নাহি যেন থাকে।
সাধু ইষ্টদাতা যত, অহিংসা ধর্ম্মের ব্রত,
সবারে তাঁহারা মনে রাখে।
এ পথে তাঁদের সনে, মিলি যেন দুই মনে,
এই বর দিন সুরলোকে॥"

তিন মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। ছাত্তির সহিত পুণ্ডরীকের উদ্বাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিনায়ককে যথাসময়ে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু বিনায়ক আসে নাই। পুণ্ডরীক ছাত্তিকে চক্রকেলাশ্রম হইতে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছেন সুতরাং বেখলাকে এখন আশ্রমের অনেক কার্য্যই করিতে হয়। সি-রাক আসে নাই, কোনও সংবাদ পাঠায় নাই। ক্রমে ক্রমে ছয়মাস —এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। মায়াদেবী বিনায়কের জন্ত বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। একদিন বেখলাকে লইয়া তিনি পুণ্ডরীকের আশ্রমে গিয়াছিলেন সেখানে ছাত্তি তাঁহাকে বলিয়াছে 'বোধ হয় রাজপ্রাসাদের মোহকরী বিলাস-লালসার মধ্যে বিনায়ক আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে। বেখলার কথা আর কি তাহার মনে আছে? তাগ্যে তাহার সহিত বেখলার বিবাহ দেওয়া হয় নাই। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন।' ছাত্তির মুখের এই শ্লেষ বাক্যগুলি সহ্য করা বেখলার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন—এক একটা কথা তাহার বুকের পাঁজরে গিয়া তপ্ত লৌহ শলাকার মত বিঁধিয়াছে। এক বৎসর আগে হইলে সে ছাত্তির কথার প্রতিবাদ করিতে পারিত কিন্তু আজ সে এই কঠিন শাস্তি নীরবে সহ্য করিয়া রহিল। বিনায়কের কার্য্যকলাপের শেষ কথাগুলি স্মরণ করিয়া বালিকা অন্তরে অন্তরে সান্ত্বনা পাইত বটে কিন্তু ছাত্তির এইরূপ দারুণ অভিযোগ অসহনীয় মনের গভীর আশঙ্কা ও উদ্বেগ—ভাবিয়া সে যাকে যাকে শিহরিয়া উঠিত।

তথাপি একদিনের জন্যও বিনায়কের প্রণয়ে সে সন্দিহান হইতে পারে নাই। বিনায়ক সাহসী—সে নির্ভীক—সে সত্যবাদী—ইহাই কেবল তাহার মনে হইত। সে কখনও বিনায়ককে অবিশ্বাস করিতে পারিবে না—কখন না—কখন না! সে প্রতিদিন তাহার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবে,—চিরজীবন থাকিবে,—যুগ-যুগান্তর থাকিবে!'

আষাঢ় শ্রীম আসিল, বর্ষা চলিয়া গেল, শরৎ ও হেমন্তের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ শীতের আবির্ভাব হইল তথাপি বিনায়কের কোনও সংবাদ আসিল না, কোনও পত্র পাওয়া গেল না। মায়াদেবী তাঁহার জামাতাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে কোনও লোককে অবন্তীপুরে পাঠাইয়া তাহার সংবাদ লওয়া হউক কিন্তু প্রভাতি ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিল। অকৃতজ্ঞ বিনায়কের নিকট এতটা দীনতা স্বীকার করিতে সে কিছুতেই সম্মতা হয় নাই।

মেখলা যেন দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে! আর তাহার মুখে সদা প্রফুল্লহাসি নাই। কাননবিহঙ্গী পিক-কণ্ঠের সে অবিশ্রান্ত কলগান একেবারেই থামিয়া গিয়াছে! বনে বনে আর সে কুসুম চয়ন করিয়া ফেরে না। আশ্রম মৃগগুলির কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আর সে তাহাদের আদর করে না। বৃথা তাহারা কোমল গ্রীবাগুলি উন্নত করিয়া মেখলার নিকট ছুটিয়া আসে তারপর হতাশ হইয়া শুষ্কমুখে অনাদৃত ফিরিয়া যায়। মায়াদেবী দিন দিন কন্যার অবস্থা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিতা হইয়া উঠিলেন। অনেক ভাবিয়া শেষে তিনি তাঁহার দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সোমদেবকে ডাকাইয়া গোপনে বিনায়কের সন্ধান লইতে পাঠাইলেন।

যথাসময়ে সোমদেব অবন্তীপুর হইতে ফিরিয়া আসিল মায়াদেবী তাহার নিকট শুনিলেন বিনায়ক রাজপ্রাসাদে সুস্থ শরীরে পরম সমাদরে বাস করিতেছে। সে এখন অবন্তীর রাজকবি! মহারাজ অনন্তবর্মার অতীব প্রিয়পাত্র। তাহার কবিযশ-রেখা দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহার রচিত সরল মধুর কবিতাবলী অবন্তীপুরের ঘরে ঘরে গীত হইয়া থাকে। নিত্য সন্ধ্যায় রাজধানীর প্রত্যেক প্রাসাদ-ভবন তাহারই রচিত সুখর-সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। বিনায়ক সর্বলোকপ্রিয় ও প্রভূত অর্থবান হইয়াছে। সোমদেব নাকি আরও শুনিয়াছে যে মহারাজ তাঁহার একমাত্র দুহিতা 'কুমারী মধুবাদিনী'কে বিনায়কের হস্তে সমর্পণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। বিদুষী রাজনন্দিনী নাকি এই সুকণ্ঠ-চারুমূর্তি-নবীন-কবির বড় অনুরাগিণী হইয়াছেন!

মায়াদেবী এই সংবাদ পাইয়া বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ব্যথিতা কন্যাটীর জন্য তাঁহার অন্তরটী আজ বড়ই কাতর ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সেই দিন হইতে বিনায়ককে ভুলিবার জন্য কন্যাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। 'দরিদ্র বলিয়া—অনাথা বলিয়া—আমরা যাহাকে বিদায় দিয়াছি; সে আজ আপন প্রতিভাবলে যশস্বী ও অর্থশালী হইয়াছে! সে কেন আর—আর আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে? তাহার কথা ভুলিবার চেষ্টা কর্ মেখলা!' কন্যার প্রতি মায়াদেবী সজলনেত্রে যখন এইরূপ উপদেশ দিতেন, তাঁহার পুষ্পকুলা স্নেহের বিনায়ককে যখন ভুলিয়া যাইতে বলিতেন—দুঃখিনীর রুদ্ধকণ্ঠ ঠেলিয়া মর্মন্তুদ বেদনা-অনুতাপ ও অভিমান কাঁদিয়া বাহির হইতে চাহিত! তিনি আর অধিক কিছুই বলিতে পারিতেন না "পুরুষ মাত্রেই এইরূপ অকৃতজ্ঞ; তাহারা নারী-হৃদয়কে অবজ্ঞা করে, তাহারা প্রেমের মর্যাদা রাখিতে জানে না।' শুধু এই বলিয়াই তিনি নীরব হইতেন। মেখলা কিন্তু একথা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিত না, সে বার বার তাহার জননীকে বলিত, "না মা! বিনায়কের সেরূপ প্রকৃতি নহে।"

ক্রমে প্রভাতিও এ সংবাদ শুনিল। তখন তরুণীর বক্ষ তাহারও অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ধর্ম উপদেশ দিয়া সে তাহার এই অসহায়া ললিতা সহোদরাটীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ধর্ম-উপদেশ পাইয়া অনেকেই শোকে দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে বটে কিন্তু মেখলা তাহা পারিল না। যদি অবস্থা বিপর্যয়ে দীন হইয়া পড়িলে হয়ত একদিন ধর্ম উপদেশে সে সান্ত্বনালাভ করিতে পারে, কিন্তু যে তাহার প্রাণাধিক প্রেমাস্পদকে হারাইতে বসিয়াছে—ধর্ম উপদেশ

তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। নির্জনে পরমাত্মার ধ্যানে মনঃসংযোগ করিতে বলিলে তাহার প্রণয়াহত অন্তরপটে তাহার সেই অতি পরিচিত দীপ্ত মূর্ত্তিটী ভাসিয়া উঠে।

ছাত্রি যখন কিছুতেই মেখলাকে শান্ত করিতে পারিল না বরং দিন দিন তাহাকে বিনায়কের জন্য ভাবিয়া শীর্ণা ও মলিনা হইয়া পড়িতে দেখিল,সে তখন মেখলার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইল। মেখলা সেদিন হইতে আর তাহার ভগিনী মুখে একটীও সান্ত্বনার বাণী শুনিতে পাইল না। অভাগিনী তাহার প্রণয়-নিরাশ ব্যর্থ-জীবন ধরণীর বক্ষ শীতল অতল ক্রোড়ে অনেকবার বিসর্জ্জন দিবে মনে করিয়াছিল কিন্তু তাহার এই অতি স্নেহময়ী জননীর মুখের পানে চাহিয়া সে তাহা পারে নাই।

আজ কয়েক দিন হইল মেখলা বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। একবারও শয্যা হইতে উঠে নাই। মায়াদেবী কন্যার নিকট বসিয়া তাহার মাথার কক্ষ কেশগুলির মধ্যে অতি সযত্নে তাঁহার স্নেহাশীষরাশি স্নেহ-কর সঞ্চালন করিয়া দিতে দিতে বলিলেন "বিনায়কের কথা আর ভাবিস্‌নে মা! সকলেই বল্‌ছে সে আর ফিরে আস্‌বে না।" মেখলা ক্ষীণস্বরে বলিল "সত্যই কি আর আস্‌বে না মা?" অভাগিনীর চোখ দুটী জলে ভরিয়া উঠিল। মায়াদেবী সস্নেহে আপন অঞ্চলে কন্যার আঁখিজল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "ছিঃ! মেখলা! চুপ্ কর্ মা! আর কাঁদিস্‌নে আর আমার কাঁদাস্‌নে!" মেখলা মাথার উপর দিয়া তাহার শীর্ণ হাত দুটী তুলিয়া দিয়া মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল "হাঁ মা! বিনায়ককে ভালবাসা কি আমার অন্যায় হয়েছিল?" মায়াদেবী স্নেহভরে কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "না মা! তোমার কিছু অন্যায় হয়নি!" মেখলা তখন ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "মাগো! তবে কেন তোমরা তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিলে বল না।"

এমন সময় তাঁহাদের বাটীতে একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়াদেবী সম্বর অতিথির অভ্যর্থনার জন্য উঠিয়া গেলেন। অতিথি অবন্তীপুর হইতে আসিয়াছেন। তিনি মায়াদেবীর হাতে একখানি পত্র আনিয়াছেন। কম্পিতহস্তে পত্র খুলিয়া মায়াদেবী পড়িলেন—বিনায়ক লিখিয়াছে—"মা! পত্নী ও পুত্র পরিজনের ভরণপোষণের জন্য এতদিন পরে আমার যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। আমি শীঘ্রই আপনার চরণ দর্শন করিতে চন্দ্রকেতুাশ্রমে ফিরিয়া যাইব। আপনার আশীর্ব্বাদে আশা করি এবার আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। ইতি।"

এই মাত্র! খুব সামান্য ক্ষুদ্র পত্র! এপত্রে মেখলার নামগন্ধও নাই। কিন্তু ইহাতেই মায়াদেবীর সকল দুশ্চিন্তা দূর হইয়া গেল। তবে পত্র পড়িয়া তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। বিনায়ক তাহাদের উপর অভিমান করিয়াছিল তাই সে এতদিন তাঁহাদের কোনও সংবাদ দেয় নাই! এই পত্রের কতিপয় ছত্র হইতে তিনি ইহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তা হউক কিন্তু মেখলাকে যে সে ভোলে নাই ইহাই যথেষ্ট। অবন্তীপুর রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্যময়ী বিলাস লালসার দুর্ব্বার প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া সে যে মেখলার জন্যই আবার চন্দ্রকেতুাশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছে ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। দীন—অনাথ বিনায়ক আজ ধনী হইয়া—বিশ্বের পরিচিত হইয়া যশস্বিত শিরে তাহার প্রণয়িনীর দ্বারে ফিরিয়া আসিতেছে—মায়াদেবীর অন্তর মহানন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল!

দুই একদিন পত্রখানি বারম্বার আপন অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া মায়াদেবী পীড়িতা কন্যার শয্যাপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

"মেখলা! এখন কেমন আছিস্ মা?"

"ভাল আছি।"

"একবার উঠে বসতে পার্বি্‌নে?"

"হাঁ মা, পার্ব।"

মেখলা উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, মায়াদেবী কন্যাকে দুই হাতে ধরিয়া সাবধানে বসাইয়া দিতে গেলেন সেই সময় পত্রখানি তাঁহার অঞ্চল হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল মায়াদেবী ক্ষিপ্রহস্তে তৎক্ষণাৎ তাহা লুকাইয়া ফেলিলেন

কিন্তু মেখলা তৎপূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"ও কি মা ?"

"এ একখানা পত্র। আমাদের আশ্রমে আজ একজন অতিথি এসেছে জানিস্ মেখলা ?"

"হাঁ মা।"

"কোথা থেকে এসেছে বল দেখি ?"

"কি জানি মা !"

কথাটী বলিয়াই হঠাৎ মেখলা তাহার জননীর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"মা !"

"কি মা" বল !

"সেখান থেকে বুঝি ?"

"হাঁ মা। অবন্তীপুর থেকে তিনি এই পত্র এনেছেন।"

এই কথা বলিয়া মায়াদেবী যেমন পত্রখানা বাহির করিয়াছেন বাজপক্ষীর মত মেখলা তাঁহার হাত হইতে পত্রখানা ছিনাইয়া লইয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল।

আজ অনেকদিন পরে অভাগিনীর বিষাদাচ্ছন্ন আবার মুখে আবার স্নিগ্ধ হাসি দেখা গেল; চিন্তা-ক্লান্ত বিবর্ণ গণ্ডদ্বয় আনন্দে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—

"বিনায়ক ফিরে আস্‌বে লিখেছে না মা ?"

"হাঁ মেখলা।"

"দেখ মা! দ্যুতিকে এখন একথা বোল না। সে এলে তারপর দ্যুতিকে খবর দেবো কেমন ?

"আচ্ছা তাই হবে।"

"দ্যুতি কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, না মা ? সে কত জোর করে বলেছিল যে বিনায়ক আর ফিরে আসবে না !"

"ঠিক বলেছিস মেখলা। দ্যুতি শুনে ভারী আশ্চর্য্য হবে।"

"আমি কিন্তু মা তোমাদের বরাবর বলিছিলুম যে সে নিশ্চয় ফিরে আসবে। কেমন বলিনি মা ?

"হাঁ মা বলিছিলি। তুই যে আমার অন্তর্যামী মেয়ে! তারপর মাতা ও কন্যা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন।

অতিথি চলিয়া যাইবার পর একমাস অতীত হইয়াছে। মেখলা ইহারই মধ্যে বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বের মত আবার সে আশ্রম মৃগগুলির যত্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুটিতে বসন বাঁধিয়া কুটীর প্রাঙ্গনের তরু আলবালে জলসেক করিতে লাগিয়া গিয়াছে। চতুর্ব্বেদাশ্রমের নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ-বনশ্রী যারা এতদিন অযত্নে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছিল মেখলার প্রাণপণ যত্নে আবার তাহারা সচেতন হইয়া পূর্ব্বগৌরবে ফিরিয়া আসিতেছে। চারি পার্শ্বের কুসুম-তরুরাজি আবার ফুলভারে অবনত হইয়া পড়িতে লাগিল। শুষ্কপ্রায় মালতীর বিস্তৃত লতাজাল আবার মুঞ্জরিত হইয়া কান্তি ও কুসুমে হাসিতে লাগিল।

একদা এই নবসন্তের সমুজ্জ্বল অপরাহ্নে মায়াদেবী বস্ত্রযন্ত্র করিয়া কন্যার কবরী রচনা করিয়া দিতেছিলেন এমন সময় আশ্রমের পরিপ্রান্তন হইতে অতি পরিচিত কণ্ঠে কে ডাকিল "মা !" মায়াদেবী তাড়াতাড়ি কন্যার অর্দ্ধসমাপ্ত কবরী ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—মেখলা ত্রাস্ত হরিণীর মত ছুটিয়া নদীকূলে পলাইয়া গেল।

বিনায়ক গৃহে প্রবেশ করিয়া পুলকিত হইয়া মায়াদেবীর চরণধূলি মাথায় গ্রহণ করিল। মায়াদেবী পুলকাপ্লুতস্নেহে বিনায়কের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং যথাবিহিত কুশল প্রশ্নাদির পর বিনায়কের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া মেখলা যে নদীতীরে পলাইয়াছে এসংবাদটীও তাহার নিকট গোপন করিলেন না। বিনায়ক তৎক্ষণাৎ মেখলার সন্ধানে সুবন্ধার তীরে ছুটিল।

নদীতটের ঘন পুষ্পাগ শ্রেণীর অন্তরালে দাঁড়াইয়া মেখলা গোপনে আশ্রম কুটীরের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। অনেকদিন দেখে নাই; যদি একবার সেই দেবতার মত মুখখানি দেখিতে পায়! বিনায়ক অতি সন্তর্পণে পশ্চাৎ হইতে পা'টিপিয়া গিয়া দুই হাতে মেখলার উৎসুক আঁখি দু'টী চাপিয়া ধরিল। এ যৌবন করস্পর্শ যে কাহার মেখলার বিকম্পিত সর্ব্বাঙ্গ তাহা নিমেষেই বুঝিতে পারিল! বালিকার সেই বেপথু রোমাঞ্চিত তনুখানি বিনায়ক তাহার বিশাল অঙ্কের পরে তুলিয়া লইল। সুধাসিনীর স্নিগ্ধাধারে আর দুইটী সধাস্ত অধর সন্নিবিষ্ট হইল! তখন জোনাকী জ্বলিয়া উঠিয়াছে, বসন্ত বাতাস কুসুমসুবাস অপহরণ করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। নীড়প্রত্যাগত পোষের ও পাখিয়ার সুখা কণ্ঠের কলকাকলী তখনও মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে!

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

স্মৃতি-কণা

জ্যোৎস্না তখন আকাশভরা,
দিগবধূরা পাগলপারা,
আলোর খেলা ঢেউয়ের মেলা ধানের মঞ্জরীতে,
তখন কমল বনে অমল শোভা সজল অটবীতে,
এমন সময় বাহির হলেম সুদূর গ্রামের পথে,
পথের শেষে নিরঞ্জনের সানাই কোথা হতে ?
রাস্তা আমার ভুল হবে না,
সে ঘর আমার বড়ই চেনা,
এই খানেতে আছে আমার
একটী ছোট বোন,
আমার বাবার সোহাগী সে আদুরী মার,
আমার স্নেহের ধন।
মুখে তাহার আছে লেগে সদাই হাসি
সদাই মধুর হাসি,
আমার সে যে বড়ই প্রিয়, আমি তারে
বড়ই ভালবাসি।

দুঃখ সেত জানে না গো
একটু তারে পড়ে যেন ছুঁয়ে,
সকল প্রাণের আশীষ ধারে
আমরা যেন নিইছি তারে ধুয়ে।

* * *

বাহির হতে হল আবার
ত্রয়োদশীর রাতে,
কে যেন কি জড়িয়ে দিল
আমার মনের সাথে।
পথের পরে পথ চলেছি
দেশের পানে মোর,
বোন, পরাণ যে মোর রইল পড়ে
সকল ঘরে তোর।

শ্রীসুশীলকুমার বাগচী

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ

দেশের জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী দেশের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মানবধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনে এক অভিনব আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিবে, ইহাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য দেশের তথাকথিত উৎপত্তিমূলক এবং তুলনামূলক জ্ঞানচর্চ্চায় এসিয়াবাসীর সমাজ-জীবনের ধারা ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। ইংলণ্ডের পূর্ব্বকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংযত অনুকরণের ফলে আমাদের দেশের ছাত্রগণ ও অধ্যাপকগণ তদ্দেশীয় সমাজ, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধীয় সেই তথ্যগুলি "বিজ্ঞানসম্মত", সার্ব্বজনীন ও সর্ব্ব যুগের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান এবং আমাদের দেশে তাহার অনুকরণে গঠিত যে সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা হইতে কোন সার্ব্বভৌমিক চরম তথ্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে—তাহা হইতে কেবল কতকগুলি আংশিক সত্য ও নিতান্ত অসম্পূর্ণ বা একদেশদর্শী তথ্যই পাওয়া যায় মাত্র। কেননা, পাশ্চাত্য জগতের সেই সব বিজ্ঞানগুলি সমগ্র মানবজীবনের অসম্পূর্ণ পরীক্ষা ও আংশিক পরিচয় ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গঠিত। ভারতবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র জগতের সমাজ, ব্যবসায় ও শিল্পের ক্রমোন্নতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমাজ-জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া ইতিহাসে ভারতের আদর্শ ও অনুষ্ঠানের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে তৎপর হইবে। কেবলমাত্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সমাজ-জীবনের ধারা ও অবস্থাদির তুলনা করিয়া যে অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্য তথ্যগুলি আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলির সংশোধন ও ব্যাপক বিধানের একমাত্র উপায় আরোহ-পদ্ধতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার সমাজ-জীবনের অনুষ্ঠান ও আদর্শগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহাদিগকে উৎপত্তিমূলক ও তুলনামূলক বিচারের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লওয়া। ইহার ফলে মানবধর্ম্ম, সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, তাহা সার্ব্বভৌমিক হইবে, তাহা যে কেবলমাত্র কোন একটী বিশেষ সমাজ বা সভ্যতার পক্ষেই সত্য ও জীবন্ত হইবে, তাহা নহে। তাহা সর্ব্বসভ্যতায় ও সর্ব্বযুগে প্রযোজ্য হইবে, পরে এই সকল সার্ব্বভৌমিক তথ্য হইতে কোন একটী বিশেষ সমাজের বা দেশের পক্ষে প্রযোজ্য তথ্য অধিরোহ-প্রণালী অবলম্বনে সহজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

তখন মানবধর্ম্ম ও সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন সভ্যতার আদর্শের ও ক্রমবিকাশের বৈচিত্র্যের অনুযায়ী হইয়া সত্য সত্যই তাহাদের উন্নতির পথ ইঙ্গিত করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্বন্ধে মেকলে সাহেব যে সকল নিতান্ত ভ্রম সঙ্কুল একদেশদর্শী মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের অনুযায়ী আদর্শে এখনও যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করা আবশ্যক। তাহা না হইলে বিদ্যানুশীলনে পূর্ব্ব কথিত সার্ব্বজনীন তথ্যসমূহের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। পরন্তু মেকলে সাহেবের মতের পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে পারিলে এসিয়াবাসী ও তাহাদের শিল্পকলা, সামাজিক আদর্শ-অনুষ্ঠান প্রভৃতি যে এতদিন মানববিজ্ঞানের উপেক্ষা পাইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতিবিধান হইবে এবং পাশ্চাত্য মানবসমাজবিজ্ঞান যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নীরস বস্তুতন্ত্রতায় 'abstraction'এ পরিণত হইয়াছে ও ভারতের জীবনধারার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াছে, তাহারও প্রতিবিধান হইবে। ইহার ফলে ভারতসভ্যতার অন্তর্নিহিত ঐক্যবিধান ও গঠনশক্তি

পাশ্চাত্য জগতে অবশ্যম্ভাবী নব্য সমাজতন্ত্রগঠনের সহায়তা করিবে। যুদ্ধের পর এবং মধ্যেই যে পাশ্চাত্য সমাজের আমূল পরিবর্তন দেখা যাইবে, অথবা যাইতেছে, সেই পরিবর্তনবিধানে যদি ভারতের আদর্শ কিছু সহায়তা দান না করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতের সভ্যতা ব্যর্থ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুভার

কিন্তু ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যানুশীলনকার্য্যের অংশ মাত্র। আমাদের জাতির পথপ্রদর্শক ও ভবিষ্যৎ গঠনকারী বিশ্ব-বিদ্যালয় আমাদের বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনের সকল সমস্যার প্রতিবিধান করিবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসকারী শক্তি হইতে সমাজকে রক্ষাকল্পে দেশে আদর্শ গ্রাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নগর, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবার প্রভৃতি সুগঠনের জন্য যথাসাধ্য উপায় নিরূপণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেই সমস্তে শিক্ষা দান করিবে। দেশবাসীর শারীরিক অবনতি, তাহাদের কর্ম্মাভাব, মধ্যবিত্তদের মধ্যে অন্নসংখ্যার হ্রাস প্রাপ্তি, কৃষির অধঃপতন, শিল্প-কলা প্রভৃতির দুরবস্থা, অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় গ্রাম ও রোগাক্রান্ত নগর, গ্রামবাসী-দিগের আর্থিক অসচ্ছলতা ইত্যাদির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিতব্য বিষয় ও জীবনের কর্ম্মরাশির মধ্যে আধুনিক যুগে যে একটা বিরাট ব্যবধান থাকিয়া যাইতেছে তাহার উপলব্ধি হইবে। বিদ্যার্থিগণ যাহা শিক্ষা করে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় ও জীবনের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাহা নিরাকরণ করিবে এবং অর্জ্জিত বিদ্যা যাহাতে জাতীয় জীবনযাত্রার কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার উপায় করিয়া শিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন করিবে।

জাতীয় শিক্ষা ভারতের জীবনধারার এবং সার্থকতার সম্যক প্রতিষ্ঠা করিবে। ভারতের দুরূহ সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার ও সাধনার সম্মীলন-পূর্ব্বক আমাদের দেশের সনাতন সভ্যতাকে সজীব করিয়া তুলিবে। দেড়শত বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষাদান করিয়াছে, তাহা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এবং তাহা ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি নিতান্ত উদাসীন। ভবিষ্যতে যে শিক্ষা দান করা হইবে, তাহা দেশের, সমাজের ও জাতির জন্য হওয়া উচিত এবং তাহার কর্ত্তব্য সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতিসাধনের উপায় নির্দ্ধারণ। এখন হইতে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ, জাতি ও সভ্যতার কল্যাণকল্পে নিজের শিক্ষা-প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করুক।

সম্পাদক

পরিণাম

(৮)

অন্ধের দিবারাত্রির ন্যায় রামপ্রসন্নের কাছে দিনরাত্রি বড় ভেদ ছিল না। তবে যাওয়াদন চলিয়া গেলে তাহার স্থানে রামধনিয়া আসিয়া তাহার গৃহমার্জ্জনার পর জানালার পরদা প্রভৃতি সরাইয়া দিনিষপত্র গোছগাছ করিতে আরম্ভ করিলে তাহাতেই দিবাগমের লক্ষণ সূচিত হইত। অন্ধকূপ সূর্য্যকিরণের ন্যায় আশা বোধই যাহার হৃদয়ের একমাত্র পরিচায়ক, মৃত্যুর নিদাঘ স্পর্শে যাহার জীবনস্রোতস্বিনী সংসার সৈকতভূমিতে ক্রমশই ক্ষীণতরা হইয়া কেবল অন্তর্লীলা হওয়ার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে তাহার আর দিবারাত্রির ছুটি বেছুটি পরখ বেপরখ খোঁজের আবশ্যক কি।

যাহার কাল গণাইয়া আসিতেছে ভীষণ ঘৃণাজনক মৃত্যুই যাহার একমাত্র পরিণাম তাহার আর দিন, সপ্তাহ, ঘণ্টা গণিয়া লাভ কোথায়? একদিন সকালে রামধনিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুর চা নিয়া আসব কি?" রামপ্রসন্ন ভাবিলেন রামধনিয়াকেও চায়ের নেশায় ধরিয়াছে। বাড়ীর কেহ সময় মত চা খাওয়ার পাকিপতি করিবে তাহা আর তাহার বরদাস্ত হইতেছে না। রামপ্রসন্ন ভৃত্যেরা নির্ব্বাহাতিশয়ে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"নারে যাদু চা টা চাহি না মিছামিছি জ্বালাতন করিস কেন!" তাড়া খাইয়া রামধনিয়া চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল—"হুজুর, একবার গরীবোড়া কৌচখানার উপর এসে হাত পা ছড়াবেন কি?"

রামপ্রসন্ন ভাবিতে লাগিলেন—"আমি কেন এখন এদের আপৎ বালাই নোংরা আবর্জ্জনার মধ্যে! আমি থাকায় বেটার তাড়াতাড়ি ঘর পরিষ্কারের অসুবিধা হইতেছে তাই কৌচে শোওয়াইবার জন্য এত আগ্রহ" রামপ্রসন্ন পূর্ব্বের ন্যায় কক্ষস্বরে মুখভার করিয়া বলিলেন—"না আমাকে আর তোর দয়াতে মরাতে হবে না।"

রামধনিয়া ধনিয়কে আর বিরক্ত না করিয়া আপন মনেই ঘর ঝাঁট দিয়া আসবাবপত্র গোছগাছ করিতে লাগিল।

রামপ্রসন্ন তাহাকে একবার হাতছানি দিয়া ডাকিতেই সে নিকটে ছুটিয়া বলিল "আজ্ঞে কি বলছেন?" "ঘড়িটা একবার দেতো।" কৃত্য ঘড়ি আনিয়া দিল রামপ্রসন্ন দেখিলেন ৮ টা বাজিয়া গিয়াছে।

রামধনিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "হাঁরে এত বেলা হয়ে গেলো কাকেও দেখছি না এখনো কি বিছানা ছেড়ে ওরা ওঠেনি নাকি।"

"আজ্ঞে খোকাবাবু সকাল সকাল উঠে পড়তে গেছে। গিন্নি ঠাকরুণ বলেছেন 'বাবু যদি খোঁজ করেতো আমায় ডেকে তুলিস্।' এখন একবার খবর দেব কি? "না আর ডাকা ডাকিতে কাজ নাই বরং আমাকে একটু চা এনে দে?"

রামধনিয়া দুয়ারের কাছে যাইতেই রামপ্রসন্নের একলা পড়িয়া থাকিতে বড়ই ভয় বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলেন কোন ছুতায় উহাকে আর একটু কাছে রাখি, হঠাৎ ঔষধের কথা মনে পড়িল সভয়ে বলিতে লাগিলেন বেটা ফিরে আসবে এখন। ঔষধটাও আর বড় খাওয়া হচ্ছে না। খেয়েই দেখি যদি একটু উপকার হয়! রামধনিয়া বাহিরে যাইতে না যাইতেই ফিরে ব্যগ্রস্বর ডাকিলেন "ওরে একবার ঔষধটা দিয়ে যাতো।"

ঔষধ আসিল। চামচে করিয়া একবার খাইতেই মুখে আগার সেই রকম বিশ্রী বিস্বাদ বোধ হইতে লাগিল—কোনও প্রকারে মনোদ্রেক নিবারণ করিয়া রামপ্রসন্ন আপন মনেই বলিতে লাগিলেন—ব্যাটাদের সব ফাঁকিবাজী এতে আবার অসুখ সারবে না ছাই হবে! ঔষধে আর এতটুকুও বিশ্বাস নাই আর এই বেদনা সহ্য

সর্ব্বদা যন্ত্রণা এত কি এক ছাই পাশ ওষুধ চলে আছে? মিত্রজা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রামধনিয়া ওষুধ কাছে আনিতেছিল রামপ্রসন্ন অন্যত্র বলিলেন—যাও চা আনতে যাও। রামধনিয়া বাহিরে গেলে মিত্র মহাশয় আরও সজোরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

যন্ত্রণা যে হঠাৎ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা আরও দুঃসহ বলিয়া বোধ হইতেছিল। সর্ব্বক্ষণ সমান কষ্ট এখন আর দিন রাত্রের প্রভেদ বুঝিবার যো নাই! যদি সকাল সকাল একটা কিছু বেস্ত নেস্ত হইয়া যায় তা হলেই বাচোয়া তাই বা আর কি হইবে। বেস্ত নেস্তর মধ্যেত মৃত্যু—সেই অজ্ঞাত অন্ধকারের গর্ভে কি প্রবেশ—না না তাও কি হয়। এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও মিত্রজা এদর্ভে রাজী হইতে প্রস্তুত নহেন।

রামধনিয়া চা লইয়া ফিরিয়া আসিলে মিত্র মহাশয় তাহার প্রতি সুস্থ দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন। সেযে কি প্রয়োজনে গিয়াছিল কিসের জন্যই বা ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা যেন আর কিছুই মনে নাই তাহার মুখের ভাব দেখিয়া রামধনিয়ার ভয় হইয়া উঠিল। সে একবার বাবু বাবু বলিয়া ডাকিতেই রামপ্রসন্ন একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—চা এনেছিস্, বেশ বেশ দাঁড়া আমি একটু মুখটা ধুয়ে নিই একটা কর্পা সেজী দেখি দেত।

রামপ্রসন্ন যাযে যাযে এক একটু করিয়া ফিরাইয়া লইয়া মুখ হাত ধুইলেন। টুথব্রাস দিয়া দাঁত পরিষ্কার করিলেন অবশেষে অতিকষ্টে আয়নার দিকে মুখ ফিরাইয়া চিরুণী দিয়া অল্প সংস্কৃত চুলগুলি আঁচড়াইতে লাগিলেন। কেশ সমূহ তাহার রক্তশূন্য ললাটের উপর পড়িয়াছিল। নিজের চেহারা দেখিয়া ভদ্রলোক নিজেই ভয় পাইতে লাগিলেন। চাকরে গায়ের জামা খুলিয়া লইয়া একটী ফরসা সেজী পরাইয়া দিল। পাছে মেহের অসহ্য কষ্টতা ফুটে দুর্ভাবনায় মাথা ঘুরিয়া যায় এই ভয়ে রামপ্রসন্ন জামা বদলাইবার সময় দর্পণের দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে রামপ্রসন্নের প্রাতঃকৃত্য টয়লেট শেষ হইল। ভৃত্য গায়ে একখানি শাল জড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে আরাম-কেদারায় বসাইয়া দিল। মিত্রজা চা পানে রত হইলেন! চা খাইতে খাইতে খানিকক্ষণ শরীর বেশ ভাল বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মুখের তিক্তস্বাদ ফিরিয়া আসিল সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বেদনাও অনুভূত হইতে লাগিল।

মিত্রজার আর আরাম করিয়া চা খাওয়া হইল না, অতিকষ্টে বাটীর চাটুকু সমাধকরণ করিয়া, আরাম-চেয়ারের পার্শ্বের হাতলে পা দু'খানি ছড়াইয়া রামধনিয়াকে যাইতে আদেশ করিলেন! আবার সেই ভাবনার অতল সমুদ্রে হাবুডুবু। শরীরের ত কিছুমাত্র উন্নতি নাই, যদি কদাচিৎ আশার ক্ষীণরেখা দূর হইতে দেখা দেয় অমনি নিরাশার ঘনমুক্তে তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রাস করিয়া ফেলে। একলা ভাল লাগে না কেহ কাছে থাকিলে মনটা সুস্থ থাকিবে বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু অপর কাহাকেও নিকটে দেখলেই বিরক্তি তখন থাকে না বোধ হয় মানসিক চাঞ্চল্য আরও অসহ্য হইয়া উঠে। এই অবিরাম বেদনার নিরাশার এই নিরন্ন নিপীড়নের আর অবসানও দেখিতে পাই না বরং তার চেয়ে ঔষধের সহিত একটু বেশী মাত্রায় মর্ফিয়া খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকাই ভাল। মৃতবৎ অসাড় শরীরে আর তেমন যন্ত্রণা বোধ হইবে না—না আর সহ্য হয় না, এইবার ডাক্তার আসিলেই এমত কিছু একটা অজ্ঞান করার ঔষধ দিতে বলিতে হইবে। রাম-প্রসন্ন ডাক্তারের বিষয় চিন্তা করিতে না করিতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইল। আকার ইঙ্গিতে রোগীকে অথবা আশা ভরসা দেওয়া এ ক্ষেত্রে যে কতদূর অসঙ্গত ডাক্তার তাহা যে বুঝিতেন না তাহা নহে, কিন্তু করিবেন কি? এতকাল ধরিয়া আমার চিকিৎসা আসিয়া এখন হঠাৎ অন্য মত করিলে চিকিৎসা শাস্ত্রের মর্য্যাদা থাকে কোথায়? ব্যারাম কিছুই নয় দুই দিনে সারিয়া যাইবে রামবাবু এই কথার পর হঠাৎ উহা মেরের অসাধ্য বলিয়া জানাইতে অন্ততঃ চক্ষু-লজ্জাও ত আছে। অল্পক্ষণের জন্য কলিকাতায় আসিয়া মুরুব্বি প্রকৃতির সহিত দেখা করিতে

সেলে মফস্বলের বড় চাকুরে বাবুদের যেরূপ প্রায় সাধা-সিনই আবুবা জোবুবা টানিয়া বেড়াইতে হয়—অসুবিধা হইলেও নিস্তার নাই, এ অবস্থায় হঠাৎ "ভোল" বদলান সম্বন্ধে ডাক্তারেরও অনেকটা সেইরূপ ঘটিয়াছিল। ডাক্তারটি বড় শীত কাতুরে লোক তখন পৌষমাস—শীতে তাঁহার হাত দুইটি বড়ই ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। ডাক্তার আসিয়াই দুই হাতের তালুতে তালুতে ঘর্ষণ করিয়া বলিত "আঃ কি শীতটাই পড়েছে মশায় হাত দুটো যেন অবশ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

হঠাৎ ডাক্তারের হাত দুইটি একটু গরম হইয়া উঠিলেই রোগী যেন সঙ্গে সঙ্গে আধি-ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবেন!

ইহার পর প্রায় মিনিট দুই যাইতে না যাইতেই ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ্ঞা আজ কেমন আছেন বলুন তো? রাত্রে ঘুম টুম হচ্ছে কেমন? ডাক্তারের মুখের ভাবে রাম-প্রসন্নের মনে হইল ডাক্তার যেন রোগীর অবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কাজ কর্ম কেমন করিতেছে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন। প্রশ্নটি যেন আপনা হইতেই তাহার ঠোঁটের আগায় আসিতেছিল আর একটু হইলেই উচ্চারিত হইত কেবল শেষ মুহূর্তে ইহার অসঙ্গতি বুঝিতে পারিয়া কোনও প্রকারে চাপিয়া লইলেন। রাম-প্রসন্ন ডাক্তারের দিকে নীরব তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। চোখের ভাষায় যেন স্পষ্টই বলিতেছিলেন—"বাপুরে তোদের কি আর প্রবঞ্চনার স্রোত বাকিবে না?" ডাক্তার কিন্তু সে চাহনীর মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না তাই মিত্রজাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে হইল আর মহাশয় যে যন্ত্রণা ঘুম কি আর আছে—এ কষ্টের ত কিছুতেই কমতি হয় না আর সহ্য করিতে পারি না। একটা কিছু যা হয় উপায় করুন—আর কোনও ওষুধ টষুধ কি নাই?

রোগী মানুষদের শুধু একই কথা, শরীর সারছে না আগের মতই আছি। আরে মহাশয় আগে মন ঠিক করুন তবে ত শরীর সারবে—বেশি একবার বাড়খানা। শীতে হাত দুটো আমার যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছলো আসবা-মাত্রই আপনার গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে গেলে আপনি চমকে উঠতেন এখন এইবার ডাক্তার বাজে কথা রাখিয়া গম্ভীরমুখে রামপ্রসন্নকে রীতিমত পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। মেরের উত্তাপ ও নাড়ীর গতি লক্ষ্য করা হইলে পরে কখনও হাঁটু গাড়িয়া কখন বসিয়া পড়িয়া কখনও বা পেটের উপরে নীচে নানা স্থানে কি দিয়া কাণ লাগাইয়া জীবনান্তিক কসরতের সাথে বিভিন্ন ভাবেতে চিকিৎসক মহাশয় কিছুক্ষণ মিত্রজার ক্ষীণ দেহখানি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে থাকিলেন। রামপ্রসন্ন আসিলেন এ সব শুধু বাহিরে লোক দেখান ফাঁকী বাজী-মাত্র, তবে আদালতে কাজ করতে করতে কেমন একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল মিথ্যা আড়ম্বর আর তেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইত না! ছোটে মোকর্দ্দমার বক্তৃতায় উকিলবাবুরা যুড়ি যুড়ি রচা কথা বলিয়া যাইতেন এ প্রকার মিথ্যা উত্তেজনার উদ্রেক রামপ্রসন্নের অধিকিত না থাকিলেও গম্ভীরমুখে স্থিরভাবে বসিয়া সকল কথা শুনা তাঁহার ক্রমশঃ বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। তাই এ ক্ষেত্রেও ডাক্তারের রোগ পরীক্ষার অভিনয়ে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না বরং শেষের দিকে ব্যাপারটা ক্রমশঃ যে জমজমাট হইয়া পড়িতেছে তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে এ ভাবটাই যে কতক কতক প্রকাশ পাইতে লাগিল। ডাক্তার যখন পরীক্ষা সমাধার অব্যবহিত পূর্ব্বে পেটের পাশটা একবার ভাল করিয়া টিপিয়া দেখিতেছিলেন সেই সময় বাহিরে মিত্রপত্নীর বেদনী সাড়ীর খস্ খস্ শব্দ শুনা গেল।

তার পর দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া তিনি রামধনিয়াকে ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে সংবাদ না দেওয়ার জন্য তিরস্কার করিতেছেন ইহাও মিত্রজার তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় অতিক্রম করিতে পারিল না। হিমানী ঘরে প্রবেশ করিয়া একবার স্বামীর কপালে হাত দিয়া দেখিলেন তাহার পর রামপ্রসন্ন এ বিষয়ে কোন উল্লেখ না করিলেও তাঁহার বিলম্বে শয্যা-ত্যাগের লজ্জাই গাহিয়া বলিতে লাগিল শুধু কোন্ সকালে উঠে বসে আছি—কেবল মুখপোড়া চাকরটার জন্য নেবে আসতে দেরী হল। ক্রমশঃ ডাক্তারবাবু একণে এসেছেন তাই কি একটা কোনও খবর দিয়েছে। রামপ্রসন্ন একবার

হিমানীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন অটুট স্বাস্থ্যে ও উহল লাবণ্যে ভরপুর সে মুঠাম দেহখানি আর মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। পূর্ব্বে যে প্রিয়তমার গোলাপীরঙ চিকণ কেশপাশ সুপরিচিত কোমল অধরদ্বয় তাহার চিত্তকে এরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করিত, আজ তাহা দেখিয়া কেবল অস্বস্তিই উপস্থিত হইতেছিল। জীবনসঙ্গিনীর প্রতি উদাসীন উপেক্ষায় চিত্ত ভরিয়া তাঁহার সিয়াছিল। মনে হইতেছিল তাহার স্পর্শ মাত্রেই রোগযন্ত্রণা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। হিমানীর ধারণার নিজ গৃহের এই রোগী বা রোগ সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্বভাবের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যাইতেছিল না—স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে এখন যেন কেবল রোগী চিকিৎসকের সম্বন্ধ বেশ একটু পর পর ভাব। ডাক্তারেরা যেরূপ হাজার দর্শনী লইয়াও এই দূর দূর ভাবটা দূর করিতে পারে না দ্বিজদ্বিপী লোক যেমন বহু-ব্যক্তির বাহ্যাড়ম্বরে কোন মতেই ভিতরের এ আসল অভ্যাসটা চাপা দিতে পারিতেছিলেন না। হিমানী প্রণয়-লীলার অপূর্ব্ব অভিনয়চ্ছলে স্বামি আরোগ্য না হওয়ার সমস্ত দোষই রামপ্রসন্নের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপাইয়া অর্দ্ধ অনুযোগ অনুযোগ করিয়া বলিতেছিলেন, "বলুন ত ডাক্তারবাবু, এই ব্যারাম সারবে কি করে ওষুধ তা নিয়মমত খাবেন না, আপনারা যা মানা করবেন তা শুনতে চাইবেন না। এই দারুণ শীতে গায়ে ঠাণ্ডা লাগাবেন, বারাণ চাকরের কাজই হচ্ছে লেপ-কম্বল ফেলে দিয়ে ওর খালি পা দুটো বুকে করে বসিয়া থাকা। এতে ফলই বা হবে কি, শরীরই বা সারবে কোত্থেকে। হিমানীর অভিযোগ শুনিয়া ডাক্তার মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। হাসির অর্থ এই যে রোগীমানুষেরা ওরকম অবুঝ হইয়াই থাকে তাহাদের উপর অত কড়াকড়ি করিতে গেলে চলে না। মিত্র মহাশয়ের দেহ পরীক্ষা হইলে ডাক্তার ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিতে লাগিলেন। হিমানী এতক্ষণে সময় বুঝিয়া প্রকাশ করিল যে সে আপন-বুদ্ধিতে সময়ের বিপাকে ডাক্তার শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়কে ডাকাইতে পাঠাইয়াছে তিনি আসিয়া পারিবারিক চিকিৎসক মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া রোগীর চিকিৎসার ভাল রূপ ব্যবস্থা করিবেন।

রামপ্রসন্নের মুখে বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী কাক-ভঙ্গিমা সহকারে বলিলেন, "দেখ, এসে শুধু তোমার মঙ্গলের জন্যই করছি তা না, এ আমার নিজের প্রাণের দায়ে কর্ত্তে হয়েছে এতে তুমি কিন্তু রাগ কর্ত্তে পাবে না।" মিত্রজা কোথায় আর অবলম্বন কোনও জবাব দিলেন না। এই মিথ্যার বেড়াজাল কাটাইয়া বাহির হওয়া যে বড় কঠিন তাহা তাহার বুদ্ধিতে বাকী ছিল না কেবল উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন এ সকল প্রবঞ্চনার স্তোক বাক্যের কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা তাহা বুঝিয়া উঠি কি করিয়া? রামপ্রসন্ন আর কি করিবেন তাহার স্ত্রী ত স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে তাহার জন্য যা কিছু করা হইতেছে সে কেবল তাহার নিজের স্বার্থেরই জন্য এই শুধু স্বার্থপ্রিয় প্রভু রাজহংসকে জীবিত রাখারই ব্যবস্থা মাত্র; কিন্তু বুদ্ধি করিয়া কথাটা এমনি ঘুরাইয়া বলিল যে তাহার জবাব দেওয়াও কঠিন। ভুলাইয়া না বুঝিলে মনে হয়, যে কেবল প্রিয়হিতানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়াই সে অপর কাহারও পরামর্শের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বয়ং এই সকল ব্যবস্থার উদ্যোগী হইয়াছে। সুবিখ্যাত ডাঃ ঘোষ বেলা ১১৪০ টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার সেই টেপাটেপি কান লাগাইয়া শোনা আরম্ভ হইল, এবার দুই ডাক্তারে মূত্রাশয় ও যন্ত্রাংশ লইয়া স্বরে বড় রকম বিতণ্ডা চলিতে লাগিল তাহা আর বলিবার নয়। রোগীর সম্মুখে তর্ক করিতে করিতে যখন আর মুলাইয়া উঠিল না তখন ধনতন্ত্রীর শিষ্যের পাশের ঘরে উঠাইয়া গিয়া নবীন উৎসাহে নিদান সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক কথা মিত্রজার কান এড়াইয়া গেলেও এটা তাঁহার বুদ্ধিতে বাকী রহিল না যে, এ ক্ষেত্রে রোগীর জীবন-মৃত্যুর সমস্যা পূরণ লইয়া ডাক্তারদের বড় মাথা ব্যথা পড়িয়া যায় নাই। তাঁহারা কেবল যন্ত্রাংশ ও মূত্রাশয়ের অবস্থার কথা লইয়া ব্যস্ত। শরীরে এই সকল যন্ত্রাদি একবার বিকল হইয়া গেলে এগুলিকে কেবল ঔষধাদির দ্বারা আটকাইয়া কতদূর কার্য্যক্ষম রাখা যাইতে পারে ইহা লইয়াই গণ্ডগোল। রোগী বাঁচুক না বাঁচুক এসে যায় না। একবার যন্ত্রের উপর ঔষধ বিশেষের ক্রিয়া

বুঝিতে পারিলেই হইল তাহা হইলেই ডাক্তার মহাশয় সন্তুষ্ট—তাহা হইলেই তাহাদের কাজ হাঁসিল।

বড় ডাক্তারটী চলিয়া যাইবার সময় জানাইয়া গেলেন—ব্যারামটি গুরুতর বটে তবে হতাশার কোনও কারণ নাই। রামপ্রসন্ন আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে মন আন্দোলিত নিজ চিত্তকে সংযত করিয়া একবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ডাক্তারবাবু তাহ'লে এখনও সেরে উঠবার আশা আছে কি? দেশবিখ্যাত চিকিৎসক কূটতার্কিকের ন্যায় উত্তর করিলেন সেকি কথা মহাশয় ভরসা নাই একি কখন বলা যায়! মানুষে পরমায়ু দিতে পারে না মানি, কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। রোগী নিশ্চয়ই সারিয়া উঠিবে একথা কোন ডাক্তারই জোর করিয়া বলিতে পারে না তবে আপনার আরোগ্য লাভের যে যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

এই অনিশ্চিত আশ্বাসে রামপ্রসন্নের শীর্ণ মুখ এরূপ আনন্দের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল যে ডাক্তারের ভিজিটের টাকা দিতে আসিয়া হিমানী নির্ব্বাপিত প্রদীপের এই শেষ উজ্জ্বলতা টুকু লক্ষ্য করিয়া অতিকষ্টেও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না।

আশার যে ক্ষীণ সীমাটুকু দূর হইতে দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রমেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল মিরজা নিজের পীড়িত রোগ যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহ লইয়া পূর্ব্বেকার ন্যায় একইভাবে পড়িয়া রহিলেন সেই একই ঘর চারিদিকে সেই পূর্ব্বেকার পুরাতন ছবিগুলি সাজান। মেজের সেই পূর্ব্বেকার ম্যাটিং পাতা দুয়ারে সেই একই পর্দ্দা, দেহে সেই একই প্রকার যন্ত্রণা। যন্ত্রণাও যতই বাড়িয়া চলিল রামপ্রসন্নও ততই আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ছুঁচ ফুটাইয়া দেহে অহিফেনের আরক অন্তর্নিক্ষেপ করা হইল। ঔষধের গুণে রামপ্রসন্ন অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। রামপ্রসন্নের যখন জ্ঞান হইল তখন সন্ধ্যাকাল চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। ডাক্তার বোধ হয় বলিয়া গিয়াছিলেন তাই ভৃত্যদের মধ্যে কেহ তাহার জন্য খানিকটা বার্লের জাথ লইয়া আসিল। রামপ্রসন্নের গিলিতে কষ্ট হইতেছিল দুই এক চামচ খাইয়া আর খাইতে পারিলেন না। আবার সেই অসীম নিরানন্দ সেই চিরন্তন একঘেয়ে ভাব অবশেষে পূর্ব্বের ন্যায় সেই দীর্ঘ শান্তিহীন বিনিদ্র রজনী। রাত্রি ৭টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া মিরজাহিবী একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মুখে পাউডার মাখা, গায়ে গলাবন্ধ লেস্ আটা হাল ফ্যাসানের ব্লাউস্ রামপ্রসন্ন পত্নীর এই অসাময়িক বেশভূষার পারিপাট্য দেখিয়া বড়ই চটিয়া উঠিয়াছিলেন কিন্তু মনে পড়িল আজ সকালেই ছেলেদের থিয়েটার যাওয়ার কথা উঠায় তিনি জোর করিয়া বক্সের টিকিট কিনাইয়াছেন সুতরাং এখন আর রাগ করাটা ভাল দেখায় না। এই লইয়া এখন কথান্তর হইলে রাত থেকে ছেলেদের আমোদ-আহ্লাদ সবই মাটি হইয়া যাইবে বিশেষতঃ আজ সেখানে সাহেব পাড়ার বিলাতি থিয়েটার আবার ভারতীয় বর্ণবিষয়ক নাটকের অভিনয় হইবে বলিয়া আজ সমরময় সাজ পড়িয়া গিয়াছে। নানাবিধ রঙ্গীন বিজ্ঞাপনে মনোবিমোহন সাজসজ্জা ও অভিনয় জন্য পটাদির সৌন্দর্য্য ঘোষিত হইতেছে। এরূপ রঙ্গালয়ে এহেন ভূমিকায় বিলাতের বিখ্যাত অভিনেত্রীর অভিনয়কলা দর্শন করিলে একাধারে নীতিশিক্ষা ও সৌন্দর্য্য জ্ঞান উভয়ই পরিস্ফুট হইবার কথা। তাই তখন মিরজা বিনা অপেক্ষা ছেলেদের থিয়েটারে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলেন পরে সেই ছেলেদের মুখ চাহিয়াই পত্নীর বিষদৃশ বিবিয়ানায় কোনও রূপ প্রতিবাদ করিলেন না। হিমানী বেশ বাহ্যিক স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতার সহিত স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল বটে কিন্তু কেমন একটা বিবেকের অস্ফুট তাড়নাজনিত ভিতরকার সঙ্কোচ কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই একবার স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এখন শরীরটা কেমন বুঝ্‌ছো একটু সুস্থ বোধ হচ্ছেতো?"

হিমানীর এপ্রশ্নটী করিবার ইচ্ছা মাত্র। শরীরের বিষয় যে রামপ্রসন্নের নূতন কিছু বলিবার নাই তাহা সে ভালরূপই জানিত। কিন্তু রূপ স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া কথা না কহিয়া ফিরিয়া যাওয়াত ভাল দেখায় না একটা কিছু বলিয়াও বাক্যালাপ করা চাই। সেই যুক্তিহীন

শিক্ষিতা রমণী স্বামীর মন ভিজাইবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল "আমার কি আর ওসব ছাই দেখতে যেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু করি কি, এদিকে এত টাকা দিয়া বক্সের টিকিট কেনা হ'ল তারপর, অনেক দিন থেকে হবু জামাইটি ধরে বসেছে যে ছেলেদের একবার ইংরাজী থিয়েটার দেখিয়ে নিয়ে আসবে। তা মেয়েটাকেত তার সঙ্গে একলা পাঠাইতে পারিনে একজন তারিক্কি লোক অভিভাবক যত সঙ্গে না থাকলে কি ভাল দেখায় কি করি এখন পাকাপাকি সোহ কথাবার্ত্তা হয়েছে তার উপরেশটাই বা ঠেলি কি করে। মেয়ের মা হয়ে জানান কি কম জ্বালা এ ত আর সহ্য করে যাওয়া নয়। তাহ'লে কি তোমায় একলা এ অবস্থায় ফেলে ঘর ছেড়ে যেতে পা উঠে। তা নলিন ছেলেটি বড় ভাল। লীলা তোমাকে দেখ্‌তে আসছিল, সে ঘরে আসিও যাব তা তাদের এ কথায় তাকব কি?

মেয়েটী প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিল। যৌবনসম্ভার পরিপূর্ণ করিয়া বালিকার স্বাস্থ্যও সৌন্দর্য্য যেন অপূর্ব্ব ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরণে বেশ জমকালগোছ সাড়ী, গায়ে জননীর ন্যায় আটা সাঁটা নীচু গলা বিবিপছন্দ ব্লাউস। দেখিলে মনে হয় যেন নিটোল দেহের রূপসৌষ্ঠব গোপন না রাখার উদ্দেশ্যেই সে এই বেশ ভূষা করিয়াছে, রায় প্রসন্ন বড়ই সন্তানবৎসল ছিলেন। কিন্তু মেয়েটীর চেহারায় তাঁহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতির লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পিতার এই কঠিন রোগে তাহার এই অনন্ত জ্বালাময়ী যাহা হয়ে থাক্ তাহার মুখে যেন কেমন একটা রোষ বা আক্রোশের ভাব দেখা যাইতেছিল, যেন কিসজন্যই তাহার সুখের অন্তরায়। তিনি এমনি করিয়া অসুখে পড়িয়া না থাকিলে এতদিন তাহাদের বিবাহ হইয়া যাইত এমন করিয়া আজও ঘরে দাঁড়াইয়া তুফার হাতি কাটিত না কুমারী লীলা ওরফে মিস্ লিলি বারার মৃদুপ্রতিজ্ঞ ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল যে পিতার মৃত্যু নিবন্ধন তাহার দাম্পত্যবন্ধনে প্রতিবন্ধকতা ঘটিলে সে স্বয়ং যমরাজকেও ছাড়িয়া কথা কহিবেনা! নলিন স্বাভাবিক সঙ্কোচ বশতঃ আসিতে ইতস্ততঃ করিতেছে বুঝিয়া গৃহিণী তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। মিঃ নলিন ঘোষ বিলাতের সাইকেনসেষ্টার হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া ডিঃ মা পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বয়স বছর ২৮ এর অধিক হইবেনা। এদেশ বিলাত ফেরত তাহাতে আবার বিলাতী থিয়েটারে যাইতেছেন সুতরাং মিঃ ঘোষ রীতিমত ইংরাজী সজ্জা পোষাকে সজ্জিত ঘোষ সাহেবের বেশ বিন্যাসের কিছু ত্রুটী ছিলনা। মাথায় আধুনিক ভঙ্গিতে চেরা সিঁথি। গোঁপ দাঁড়ি কামান। দীর্ঘ গ্রীবা পালিশ করা উঁচু কলারে সুরক্ষিত। পরণে টাইট পাজামা নীচু ওয়েষ্ট কোটটিরও ছাট কাঁট বাল ক্যাসানের। মিঃ নলিন একহাতে সাদা দাস্তানা আঁটিয়া অপর হাতে অবশিষ্ট দস্তানাটি সময়োপযোগী নরম টুপীর সহিত ধারণ করিয়াছিলেন।

রায় প্রসন্ন হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন নলিনীর পিছনে পিছনে তাঁহার পুত্রটীও কখন চুপি চুপি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে কিন্তু কেহই পিতৃ সন্নিধানে আসিবার জন্য অনুরোধ করে নাই। রায়প্রসন্ন জানিতেন হারাধনের ন্যায় তাঁহার এক মাত্র আত্মজ পিতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও সহানুভূতি পোষণ করিয়া থাকে। ছেলেটি কিন্তু মুখ তুলিয়া বাপের দিকে চাহিতে পারিল না, তাহার রোগী চোখ দুটির নীচে কালো দাগ ও অস্বাভাবিক লজ্জাশীলতা দেখিয়া রায় প্রসন্ন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে কুসঙ্গে পড়িয়া পুত্রটি নানাবিধ অসদ্ব্যাসন শিক্ষা করিয়াছে। ছেলেটির ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া রায় প্রসন্নের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। সকলে মিলিয়া রায় প্রসন্নকে ঘিরিয়া বসিয়া এক একবার তাঁহার শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিল তারপর সব চুপ, কিছু বলিবার থাকিলে বলিবে। কিন্তু স্ত্রীজাতি কতক্ষণ মুখ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? টমসের ব্রস্ পাওয়া যাইতেছিল না। সেইটি কাহার হাত হইতে হারাইয়া যাওয়া সম্ভব তাই লইয়া ঘরে ফিরে এক পালা ছোট খাট ঝগড়া হইয়া গেল। মিঃ নলিনও এ সময়ে অন্তরার অনুরোধে একটা কিছু লইয়া কথাবার্ত্তা কহা আবশ্যক মনে করিয়া করিয়া ইওরোপের বিখ্যাত অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্টের উত্থাপন করিলেন। রায় প্রসন্ন প্রথমটা অন্যমনস্ক ছিলেন। ঘোষ কথায় তেমন কান দেন নাই। হঠাৎ বিখ্যাতা অভিনেত্রী সারা

বার্ণার্টের নাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহাকে দেখছ নাকি? নলিন বলিল, আজ্ঞা হাঁ, বিলাতে থাকবার সময় একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। সাহা বার্নার্টের অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমশঃ অভিনয় ও কলার আর্ট ও বাস্তবতা বিচারে পর্য্যবসিত হইল। মিত্র-গৃহিণী ও মিত্র কন্যা উভয়েই সোৎসাহে পরস্পর বিরুদ্ধ নিজ নিজ মত অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানে কথাবার্ত্তা জিয়াইয়া রাখাই বিচারে বিতর্কের উদ্দেশ্য, সেখানে আর এ সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসার সুযোগ কোথায়। এই সকল কথাবার্ত্তার ভিতরে রায় প্রসন্নের দিকে কেহই আর বড় লক্ষ্য রাখেন নাই। হঠাৎ তাহার দিকে মিষ্টার ঘোষের একবার নজর পড়ায় তিনি কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ হইয়া সহসা গম্ভীর হইয়া বসিলেন তাহার এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আর সকলেও রায় প্রসন্নের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন যে মরনাহত গৃহস্বামী তাহাদের দিকে একটানা দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন রাগে তাহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। রায় প্রসন্নের কম্পান্বিত দেহে স্পষ্টই প্রকাশ হইতেছিল যে পরিজনের এইরূপ হৃদয়হীন ব্যবহারে তাঁহার আর ক্রোধের ইয়ত্তা নাই। এ সময় রোগীর চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া দিলে তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত করিতে পারা যায় বটে কিন্তু উপস্থিত কাহারো মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। রোগ শয্যায় কতক্ষণই বা চুপ করিয়া থাকা যায় কিন্তু নিস্তব্ধতা দুর্ভর-বলিয়া বোধ হইলেও কেহ আর আপনা হইতে টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত করিল না। সকলেরই ভয়ে পাছে লোক দেখান ভদ্রতা করিতে গিয়া তাহাদের মনের প্রকৃত ভাবটী প্রকাশ হইয়া পড়ে। অবশেষে কুমারী লীলা কোন ও প্রকারে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের একটা শেষ করিয়া ফেলাই স্থির করিয়া পিতৃপ্রদত্ত সুন্দর সোণার ঘড়িটি দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন। ঘড়ি দেখেই হয় তাহা হইলে আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। "মিস্ লীলার বাবার কাছে নিজ মনের ভাব গোপন রাখারই ইচ্ছা ছিল কিন্তু মুখ খুলিতে না খুলিতেই আসল কথাটী ফাঁস হইয়া গেল। লীলা কথা কয়টী বলিয়া ফেলিয়া একটু থতমত খাইয়া আবার পর ঈষৎ লজ্জিতভাবে নিজ প্রেমাস্পদের প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন। এই উপলক্ষে দুজনের মধ্যে চোখের ইসারায় গোপন বিনিময় হইয়া গেল। কাণ্ড যেন কাণ্ডকে কি একটা বিস্তৃত কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন "কি যে বার্ত্তা নয়ন তা কহিল নয়নে।" এই সকল ব্যাপারে দুই মিনিটও সময় লাগিয়াছিল কিনা সন্দেহ। দেখিতে দেখিতে মেয়েরা সকলের ধস্ ধস্ শব্দের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। গাড়ী-বারান্দায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলেই ঘরিত পদে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া নিজ স্থান অধিকার করিলেন। গাড়ী থিয়েটার অভিমুখে রওয়ানা হইল। তাহারা চলিয়া গেলে রায় প্রসন্ন একটী আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। রোগ যন্ত্রণা সহজে দূর না হয় না হউক বিদায়-বেলাটাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সেই একই যন্ত্রণা একই দুশ্চিন্তা। আগের চেয়ে বাড়ে নাই বটে কিন্তু কমিতেছেই বা কোথায়? এদিকে দেহের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া আসিতেছে। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত্তই না চলিয়া যায়, সময়ের অন্তর গতির যেন আর বিরাম নাই, কিন্তু যে অবশ্যম্ভাবী নিয়তির হাত এড়াইবার আর উপায় নাই তাহাও যে অলক্ষ্যে নিশ্চিন্তভাবে অগ্রসর হইতেছে সেদিকে আর কাহারো লক্ষ্য নাই। হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া রামধনিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল দুধ টুধ কিছু আনব কি?

না তুই ছাদীমকে ডাকিয়া দে।

ক্রমশঃ

শ্রীগুরুদাস সরকার এম্, এ।

"মরু কুসুম"

কে রে তোরা মরু মাঝে জাগিস নিখুম
স্নেহ দয়া মমতার ত্রিদিব কুসুম ?
ভাণ্ডারের যত মধু যত বাস-রূপ
নিঙাড়ি অন্তরে কিরে দিল বিশ্ব ভূপ ?

প্রাণ যবে যায় যায় অচল চরণ,
মৃগতৃষ্ণিকার মায়া ধাঁধায় নয়ন,
এ ধরা-মরুতু মাঝে কে রে আত্মহারা
ঢালিস হিয়ার মধু-মন্দাকিনী ধারা।

কোমল পরশ প্রাণে ঢালে এত সুধা,
ঘুমে আঁখি মুদে আসে যায় তৃষা-ক্ষুধা,
এত মায়া এত দয়া এত ভালবাসা
তোদের প্রাণের মাঝে বেঁধেছেরে বাসা।

তোরা কিরে মরু মাঝে বিশ্বের জননী
তাপিতে তারিবি ব'লে নামিলি ধরণী।
ধরতর তাপ মাঝে আর কেরে পারে
বুকে টেনে তুলে নিতে সবে অবিচারে ?

পতিতেরে দিলি যদি স্নেহের পরশ,
পাষাণে ছুটালি ধারা বিমল সরস,
জীবনের তরে তরে এক নিবেদন,
শেষ-ঘুম শেষে যেন পাই দরশন।

শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্র।

কর্ম্মযোগ

সাংখ্য দর্শন, এই বিশ্ব প্রকৃতির শক্তি সম্বন্ধে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের আকর্ষণ বিকর্ষণ ও জড়ত্বের সামঞ্জস্য সংরক্ষণ, এই শক্তিত্রয়ের কার্য্য। তমঃ শক্তিতে আকর্ষণ, রজঃ শক্তিতে বিকর্ষণ এবং সত্ত্ব শক্তি দ্বারা এই গুণদ্বয়ের সামঞ্জস্য সাধন হইয়া থাকে। তমোগুণের ধর্ম্ম, অজ্ঞান মোহ ভ্রম বা জড়তা; রজোগুণের ধর্ম্ম চৈতন্য—এ গুণের প্রত্যেক অংশ পরমাণু যেন তমোগুণের আকর্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য নিয়তই প্রয়াসী আর সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়দিকের সামঞ্জস্য সাধন।

প্রত্যেক মানুষেরই তিনটী গুণ আছে। কোনও সময়ে মানুষের তমোগুণের উদয় হয়। লোক তখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, জড়তায় জড়ীভূত হইয়া কেবল কল্পনা-তরঙ্গে ভাসিতে থাকে। কখনও মনুষ্যের অস্তি চৈতন্যের বিকাশ হয়, অন্ত দৃঢ়তার সহিত মানুষ তখন সকল মায়াবন্ধনের আকর্ষণ কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য চেষ্টা করে, এই চেষ্টা রজোগুণের আবির্ভাবে হইয়া থাকে। আবার কখন দেখিবে সত্ত্বশক্তির আবির্ভাবেই সেই মানুষই কেমন জড়-চৈতন্যের সামঞ্জস্য রাখিয়া অতি মধুর স্বভাবের পরিচয় দিতেছে। এই গেল মানুষের শক্তিগত অবস্থা। আবার প্রতি মানুষই কোনও বিশেষ শক্তির পরিমাণ স্বভাবতঃ অধিক লইয়া জন্মগ্রহণ করে। আমাদের মধ্যে কেহ তমঃ প্রধান, কেহ রজঃ প্রধান, এবং কেহ বা সত্ত্ব প্রধান। তমঃ প্রধান লোক স্বভাবতঃই কেমন অলস, কাজকর্ম্মে উৎসাহহীন মহা প্রধান লোকের স্বভাব কেমন উগ্র, কর্ম্মের সম্মুখে বিশ্বের বাধা আসিলেও যেন তাহা গণনায় আসেনা; আর সত্ত্বঃ প্রধান লোক এই তীব্র শক্তি, জড় চৈতন্য এবং কর্ম্ম ও নিষ্কর্ম্ম ভাবের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ভাবেরই সামঞ্জস্যের পরিচয় দেয়। এমনিয় স্বাভাবিক।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণ কর্ম্মযোগের বিষয়। ঐ গুণ তিনটী গুণ কি এবং কিরূপে ঐ গুণত্রয় কার্য্যোপযোগী হইতে পারে, কর্ম্মযোগ তাহা শিক্ষা দেয়। যে সকল উন্নত কর্ম্ম দ্বারা মানুষের ঐ সকল শক্তি জন্মে, সেই সকল কর্ম্মে কর্ম্মযোগ সহায়তা করে মনুষ্য-সমাজ তিন ভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। নীতি কাহাকে বলে, আমরা জানি; কর্ত্তব্য কাহাকে বলে তাহাও জানি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঐ নীতি ও কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন কেন, এক দেশে যে কর্ম্ম সুনীতি সঙ্গত, অন্য দেশে সে কর্ম্ম দুর্নীতির আকর। এ দেশে স্বসম্পর্কীয় তনয়ার পাণিগ্রহণ সুনীতির বিধি অন্য দেশে উহা দারুণ ঘৃণা ও কলঙ্কজনক দুর্নীতি সুতরাং এ মানবীয় নীতির কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট ক্রম নাই। কিন্তু বিশ্ব জনীন নীতির অবশ্যই একটা সর্ব্বদেশ ব্যাপিনী সামঞ্জস্য আছে।

কর্ত্তব্য কর্ম্মও ঐরূপ দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এক দেশের নিন্দিত কর্ম্ম যদি অন্য দেশেও তদ্রূপ নিন্দিত হয়, তবেই জানা গেল, এই এই দুইদেশ একমতই এই হইতে বিশ্ব জনীন নীতির ধারণা আমরা করিতে পারি।

এখন আমাদের সম্মুখে দুইটী পথ উন্মুক্ত। যে মুহূর্ত্তে মনুষ্য সত্যের একটী মাত্র পথ আর সৎ-কুপথ প্রভাগ ভাবিয়া অন্ধের ন্যায় সেই পথেই গমন করে, না হয় মনুষ্যের মানসিক শক্তি ও তাহার অবস্থা এবং উহার উন্নত কর্ম্মশীলতার বিশ্বাস করিয়া জ্ঞানীর পথে গমন কর, তখন নীতি ও কর্ত্তব্য অনেক স্থলেই সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে। পরন্তু এই বিষয়ই যে মনুষ্যের অবস্থানুসারে নীতি ও কর্ত্তব্য অন্য উচ্চ কি অন্য শ্রেণীস্থ লোকের পক্ষে কখনই উপযোগী হইতে পারে না।

এই উপাখ্যানটী আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সুন্দর দৃষ্টান্ত। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, অসৎসংসর্গ করিও না। আমরা ইহা হইতে বুঝিলাম তবে অসৎ সংসর্গ—না করাই সর্ব্বোচ্চ নীতি কিন্তু আদি যদি সমগ্র পৃথিবী এই নীতির অবলম্বন করে, তাহা হইলে লোকের ধনপ্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়।

পৃথিবীর অবস্থা এখন যেমন তেমনটী আর থাকে না। অসতের দাস কৃতকর্ম্ম ভাবিয়া আত্মপ্রতি অবিশ্বাসী ও আত্ম নিগ্রহ করিতে থাকে। আত্মনিগ্রহের ন্যায় দুর্ব্বলতা আর নাই। যাহারা নিজে নিজের নিন্দা করে, সকলের দ্বারা তাহারাই তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসে। নিরংশ হইবার এমন সহজ উপায় আর দ্বিতীয় নাই।

আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য, আত্মনিন্দা পরিহার। যাহার নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই, সে কখনও ভগবানের প্রতি অটলা বিশ্বাস রাখিতে পারে না। এ দেখে যারা সৎ, অন্য দেখে তাহা অসৎ সুতরাং এই সদসতের উপর পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ নীতি কখনও স্থিতিতে পারে না।

অনেকেই জানত জানেন, ভগবদ্গীতায় আমাদের শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধবিরত দর্শনে ভীরু বলিয়া শ্লোক করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের বিপক্ষপক্ষ সকলেই আত্মীয় বন্ধু। আত্মীয় বন্ধু বিনাশ অর্জ্জুন অসৎ কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন অথচ অর্জ্জুন সেই অসৎ কর্ম্ম করিলেন না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। এই যে নীতি ইহা বড়ই বহুতর ও জগতে প্রায় সকল বস্তুরই দুই দিক একরকম। মূল্য ও মৌল, বস্তুর উভয় দীপাই প্রায় সমান। সৎ ও অসৎ নীতির তুলনায় এ দুটীও ঠিক তদ্রূপ। কোন অবস্থায় তাড়নায় অসৎ সংসর্গে পাপার্জ্জন করিলে অন্য কেহ সে পাপ পাপ বলিয়াই গ্রহণ করিল না। আবার কেহ যা অসৎ সংসর্গই করিল না। বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন ও অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের দেবী-সোনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, কেন না তাঁহার ত্যাগ করিবার উপযোগী রাজ্য ও সিংহাসন ছিল, কিন্তু রাজ্য সিংহাসন ত্যাগ করিয়া একজন ভিক্ষুক কি তাদৃশ ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় দিতে পারে? সুতরাং সদসৎ অবস্থার একান্ত অধীন। অর্জ্জুন মোহ বশতঃ ক্ষাত্রধর্ম্ম বিরত হইয়া রাজা ও রাজ্যের প্রতি তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য পালন করেন নাই, এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছেন "তুমি বিজ্ঞজনের ন্যায় কহিতেছ, কিন্তু তোমার কার্য্য তোমাকে কাপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতেছে, অতএব উঠ, এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"—

ক্রমশঃ

পুরাণে হিন্দুসমাজের আদর্শ

সমাজের জ্ঞানে ও আদর্শে হিন্দু সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দেয় না। আমাদের পুরাণ বলিয়াছেন,—সে কথা আগে বলিয়াছি, কিন্তু পুরাণের কথা অমৃতসমান, বারবার বলিতেও ভাল লাগে, জগতের অসংখ্য জাতীয় জীব প্রথমে এক বিরাট্ পুরুষের গর্ভশায়ী ছিলেন। তাহার পর সেই এক বহু হইলেন। হিরণ্যগর্ভ বহুরূপে বিভক্ত হইলেন, তিনি দেশকালসীমাবদ্ধ হইয়া ব্যক্তিরূপে শরীরী হইলেন। তিনি বহু হইয়া অসংখ্য জাতীয় জীব হইলেন, তিনি বহু জীব-ব্যক্তিরূপে বিরাট্ শরীরে অভিব্যক্ত হইলেন। নিখিল জীবই তাঁহার ব্যষ্টিবিকাশ। সমগ্র মানবজাতি তাঁহার বিরাট শরীর। নিখিল ব্যক্তি মানবই তাঁহার ব্যষ্টিবিকাশ। তিনি আপনাকে নারী ও পুরুষে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বিরাট্‌কে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। বিরাটের সন্তান মনু এবং মনুই স্থাবর-জঙ্গমের স্রষ্টা। মনুর সন্তান আমরা জীব-জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

তিনি আপনাকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্বর্ণেও বিভক্ত করিয়াছিলেন। চতুর্বর্ণের সমবায়ে, পর পরের জন্য ত্যাগে সমগ্র সমাজদেহের পূর্ণ পরিণতি।

এই বিশাল মানব-সমাজ নারায়ণের বিরাট্ শরীর। নারায়ণ দেশকালসীমাবদ্ধ হইয়া খণ্ড খণ্ড সমাজে, খণ্ড খণ্ড শ্রেণী, বর্ণ, সমূহ বা জাতিতে নিত্য অভিব্যক্ত। প্রত্যেক জীবে ও প্রত্যেক নরে তিনি নিত্য প্রতিভাত।

বৈষ্ণবী শক্তি, সৃষ্টি-স্থিতির শক্তি

প্রত্যেক জীব ও নরে, শ্রেণী ও সমাজের অন্তরে থাকিয়া নারায়ণ তাঁহার ব্যষ্টিপ্রকাশকে আপনার বিরাট বক্ষে নিরন্তর টানিয়া লইতেছেন। এই শক্তির নাম নারায়ণী, জীব ও সমাজের সৃষ্টি ও স্থিতির শক্তি। উদ্ভিজ্জগতে বৃক্ষলতা-গুল্মের বীজ রক্ষার চেষ্টার নামই নারায়ণী। জীব ও মনুষ্য-রাজ্যে বংশ বা জাতিরক্ষার চেষ্টাই নারায়ণী। জড়রাজ্যে তিনি যোগমায়া, আপনার ধ্যানে তিনি মহানিদ্রারূপে অবস্থিত। জীবরাজ্যে তিনি শক্তিরূপা, ক্রিয়ারূপা, জগৎ-প্রতিষ্ঠা-রূপা। তিনি প্রকৃতির নির্ব্বাচনী শক্তি, তাই জীবের নিকট কখনও তিনি অতিসৌম্যা লক্ষ্মীবৃদ্ধিপ্রদা, কখন অতিরুদ্রা ক্ষয়িষ্ণুতা করালিনী। তাঁহার অলক্তরাগ-রঞ্জিত চরণের রেখা উদ্ভিদ্ ও জীবরাজ্যে অভিব্যক্তির কত না জয়-পরাজয়ের কাহিনী অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্যরাজ্যে তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে অসংখ্য জাতির কত না উত্থান-পতনের ইতিহাস ধরাতলে মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া রহিয়াছে।

জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাসের তিনিই অধিষ্ঠাত্রী। অক্ষম জীবের সমবের বা জাতির বিনাশসাধন করিয়া তিনি কখন শবরা মুণ্ডমালিনী, আবার কখন বরাভয়করা অন্নপূর্ণা হ'য়ে তিনি সক্ষমকে অন্নদানে পোষণ,ভোগ্যবস্তু দানে পালন করেন তাই সক্ষম সত্তা জাতি তাঁহার নিকট ত্রৈলোক্যের কল্যাণ প্রার্থনা করে—

সর্ব্বশক্তিবিনাশিনি ত্রৈলোক্যাভয়দে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

অক্ষমের নিকট তিনি কালী, কপালিনী, চামুণ্ডা, সক্ষমের নিকট তিনি ভদ্রকালী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, জয়ন্তী, সর্ব্বমঙ্গলা। বসুন্ধরার জীবের জীবনেতিহাসে সকল রূপ,জয়,যশ,সকল সৌভাগ্য ভগবতী সক্ষমকেই দান করেন। সক্ষমের এই নির্ব্বাচন ও পুরস্কার জগতের উপকারের জন্য। "দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থম্" সকলের পাপ দুঃখ-আর্ত্তিনিবারণের জন্য,অক্ষমের প্রতি নির্য্যাতন অত্যাচারের জন্য নহে।

নারায়ণই সমাজ : সমাজের স্থিতি ও বিকাশের শক্তিই নারায়ণী। তিনি ধ্রুবা—ন্যায় অন্যায় বুদ্ধি, আচার নিয়মের শাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সমাজস্থিতির মূল। তিনি সমাজশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি। তিনি লক্ষ্মী, ধন সম্পদুৎপাদন-শক্তি। তিনি শাকম্ভরী—বসুন্ধরার আদি উৎপাদিকা শক্তি হইয়া জীবকে শাকান্নের দ্বারা পোষণ করেন। তিনি শোভা জগতের নিখিল সৌন্দর্য্যের আধারভূতা। তিনি কান্তি, মনুষ্যের ব্যবহারে, আহার-বিহারে চারুশিল্পকলায় যাহা কিছু সুন্দর ও আনন্দের তাহাই তিনি। নিখিল জ্ঞান, চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা তিনিই। ভূগলে তিনি আকর্ষণী শক্তি। সকল বৃত্তি,জাতি,বর্ণ,সমূহ তিনিই। তিনিই সর্ব্বজীবে চৈতন্য বুদ্ধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণারূপে থাকিয়া তাহাকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করান। কান্তি, লজ্জা, শ্রদ্ধা, বৃত্তি ও জাতিরূপে তিনি মনুষ্যের অন্তরে সবিকল্পকজ্ঞান জাগাইয়া তাহাকে নানা সমূহে নানা সামাজিকসম্বন্ধে আবদ্ধ করেন। তিনি শান্তি ও তুষ্টি হইয়া মনুষ্য ও সমাজের আদর্শ সম্মুখে ধরেন, মনুষ্য, সমাজ, সমূহ, জাতির প্রতিষ্ঠার কারণ-জ্ঞান অনুভূত করাইয়া স্মৃতি হইয়া অতীতকে সম্মুখে ধরিয়া তিনি ভবিষ্যৎ-গঠন করেন।

জীবে মাতৃশক্তির ক্রমবিকাশ

সর্ব্বভূতে শক্তিস্বরূপা হইয়া তিনি শক্তির উদ্বুদ্ধ করেন। মাতৃস্বরূপা হইয়া তিনি সন্তানধর্ম্ম, পালনধর্ম্ম, ত্যাগধর্ম্ম ও সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। জীবজগতে মাতৃত্বের বিকাশ-সাধনাই জীবের বংশবৃদ্ধি ও উন্নতির মূল। মনুষ্য-সমাজে সেবাধর্ম্ম ও মাতৃধর্ম্মের বিকাশই উন্নতির মূল। বীজের জন্য বৃক্ষলতার ত্যাগে, জীবজগতে মাতার সন্তানপালনে, সন্তান পরিবার, গোষ্ঠী ও স্বজাতির জন্য নরনারীর ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগে ভবিষ্যৎসমাজ ও ভবিষ্যৎবংশের জন্য বর্ত্তমান সমাজের আত্মোৎসর্গের আমরা সেই একই বিশ্বময়ের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই।

তাই হিন্দু জননীকে শক্তি অপেক্ষা মাতৃরূপে পূজা করিতে ভালবাসে। 'জননি জাগৃহি' ইহাই হইতেছে আবাহন মন্ত্র, শুধু শারীরিক সৃষ্টি ও অবসাদ হইতে জাগরণ নহে, যাহা কিছু জীবজগতে ও মনুষ্যজগতে evolution এর বিরোধী—সেই সকল বিঘ্ন নিবারণে। মনুষ্যের অন্তরে মাতৃশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট্ মানবসমাজ পরার্থ কর্ম্মের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। মনুষ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ মাতৃশক্তির ক্রমবিকাশে।

জ্ঞান-বিরহিতা শক্তির ধ্বংসলীলা

ত্যাগবিরহিতা শক্তির লীলা ধ্বংসলীলা। প্রচণ্ড কামনা ও শক্তির উন্মেষে শেষে শক্তির আত্মহত্যা। আজ ছিন্নমস্তার লীলা বিস্তৃত জগৎখণ্ডে প্রকাশিত। ধন, বিদ্যা, জীবের পালনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনার স্বার্থসন্ধানে মত্ত হইয়া আত্মবিলোপ করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ আত্মঘাতী।

একটা প্রাচীন গৌরব-মণ্ডিত সভ্যতা আপনার যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত সমস্ত বেশ-ভূষা অলঙ্কার, সমস্ত কান্তি ও সৌন্দর্য্য ত্যাগ করিয়া নগ্না, কুৎসিতা হইয়া আপনারই হস্তস্থিত শাণিত তরবারে আপনাকে হত্যা করিল এবং আপনার রুধির আপনি পান করিয়া নিছক বিপরীত বুদ্ধি ডাকিনী যোগিনীর সম্ভোষ বিধান করিতে লাগিল। উন্মা-দিনী তাহার পার্শ্বচারিণী ডাকিনী যোগিনীর সঙ্গে বিপরীত কুরবে নাচিতে নাচিতে তাহারই অগণ্য সন্তানের রক্তের উপর উল্লাসে হাসিয়া উঠিল। দিগ্ দিগন্তের করুণ হাহাকার ও মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ভেদ করিয়া সেই অট্টহাসি বিকট চীৎকার সমস্ত ভাসাইয়া দিল।

এসিয়ার বাণী

এই বিতীষিকাদর্শনে বিশ্বমানব আজ স্তব্ধ, ভীত, নির্ব্বাক্, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। ভারতকে আজ বিশ্বমানবকে সান্ত্বনা দিতে হইবে। বিশ্বমানবের দেহ আজ ছিন্ন ভিন্ন। অঙ্গ সমুদয় ইউরোপের সমরক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত। বিশ্বমানবের ছিন্ন অঙ্গ ও দীর্ঘ অস্থিকে সংযোজিত করিয়া, অন্তস্থানে প্রলেপ দিয়া ভারতমাতা আজ ত্রৈলোক্যশুভদায়িনী—ভুবনেশ্বরী হইয়া বিশ্বমানবকে কোলে তুলিবে, স্নেহাশ্রু প্রদান করিবে।

বিশ্বমানব অমর। কত জীব, কত নর, কত সমাজ আসে যায়, কিন্তু বিশ্বমানব অমর। অস্ত্রে শস্ত্রে তাহার আঘাত, অগ্নিতে তাহার উত্তাপ লাগে সত্য; কিন্তু বিশ্ব-মানবের এমন একটা শক্তি আছে, যাহাতে তাহা শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে। যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতমাতা বিশ্বমানবকে কত না প্রেম, জ্ঞান ও ভক্তির কাহিনী শুনাইয়াছে। আজও ভারতকে আবার অমৃতবাণী প্রচার করিতে হইবে। হিংসার পরিবর্ত্তে মৈত্রীর, শক্তির পরিবর্ত্তে ত্যাগের, বুদ্ধির পরিবর্ত্তে জ্ঞানের, বিচারের পরিবর্ত্তে ভক্তির। অতি মানব বা অতিজাতির গুণকীর্ত্তন নহে,—বিশ্বমানব বা বিশ্বজাতির, নরোত্তম ও নারায়ণের গুণকীর্ত্তন। সমগ্র জীব লইয়া তাহাদেরই চৈতন্যে নারায়ণের প্রকাশ। নরোত্তমের শক্তিতে অতি ক্ষুদ্র নর, কীটানুকীট জীবও শক্তি-লাভ করে। জাতিতে জাতিতে সখ্যবন্ধনে এক বিরাট্ মানব-সমাজগঠন। সমগ্র জাতি লইয়া তাহাদের জাগ্রৎ-চৈতন্যে বিশ্বজাতি বা নারায়ণের প্রকাশ। জনক, গৌতম, বুদ্ধ, অশোক, শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্যের ভারত এই বাণী দর্শনে বিজ্ঞানে প্রচার করিবে। শুধু জ্ঞানের রাজ্যে নহে, তাহার সমাজগঠন, রাষ্ট্র, শিল্পানুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারাও। সমাজতন্ত্রে, পরিবার, গোষ্ঠী সমূহ স্বজাতির জীবনের ভিতর দিয়া সেই একই ত্যাগ ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখা যাইবে, যাহা অন্তর্জ্জাতীয় ক্ষেত্রে সমগ্র জাতি সমুদয়কে এক বিরাট্ মানব-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া চিরশান্তি ও চিরমৈত্রী আনিয়া দিবে।

যে সকল ভারতবাসীর ভারতবর্ষের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তাঁহারা আপনাদের কর্ত্তব্যবোধ ও গুরু-দায়িত্ব অনুভব করুন, ক্ষণিকের ব্যর্থপ্রয়াসের জন্য অপবাদ ত্যাগ করিয়া সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই সত্যই আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিতর ও কর্ম্মক্ষেত্রে বিচিত্র অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া জাতির স্বধর্ম্ম রক্ষার সহায় হইবে, এবং স্বধর্ম্মের সহিত বিশ্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া একই সঙ্গে জাতির ও বিশ্বমানবের সেবা করিবার অধিকার দান করিবে।

সম্পাদক

মাসিক কাব্য-সমালোচনা

ভারতবর্ষ, আশ্বিন—আগে-উপাধি-শিরে-উপাধি সংযুক্ত শ্রীপূর্ণচন্দ্র এ মহোদয় ৺সাগর ৺কবি কৃষ্ণচন্দ্র ভাদুড়ী মহোদয়ের সমস্যা-পূরণমূলক কবিতাগুলি ভারতবর্ষে ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছেন। সেকালের জনপ্রিয় সাহিত্যের আদর্শে একবিতাগুলিতে বেশ চাতুর্য্য আছে স্থলে স্থলে মাধুর্য্যও আছে। ইহা ছাড়া আর একটী জিনিষ এই সমস্যাপূরণে কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় তাহা তাৎকালিক বাংলার ইতিহাস।

একটী কবিতায় মুর্শীদ কুলিখাঁর দেওয়ান রঙ্গীখাঁর বাংলার জমিদারগণের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা আছে। রঙ্গীখাঁ "রসমূত্র যাহা কিছু পুতিগন্ধময়" তাহাই দিয়া একটী গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন হিন্দুগণের চরম কাম্যালোক বৈকুণ্ঠ।

যে সকল জমিদার যথাকালে কর—
দিতে নাহি পারিতেন বহিয়া তৎপর
খাঁ সাহেব সেই সবে লইয়া তখন
করিতেন সমাদরে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ।

একটী কবিতায় ১২০০ সালের ভীষণ বন্যার বর্ণনা আছে।

প্রাণ ভয়ে ছেলে ফেলে পোয়াতী পলায়
বোধ হলো বর্গী এলো যেন বাংলায়
ক্ষুধায় জ্বালায় ঘাস চিবাইয়া খায়
মরিতে লাগিল লোক মানান পীড়ায়
পাখী সাপ বসে আছে একই শাখায়
তিরিশ সালের বন্যা তবে কান্না পায়।

অন্য একটী কবিতায় সিরাজ-উদ্দৌলার চরিত্রের ইঙ্গিত আছে।

হিন্দু অবলার জাতি হিন্দু অবলার জাতি
অত্যাচার হইতে আজ পাইল নিষ্কৃতি
তুমি পলাশীর পতি তুমি পলাশীর পতি
তাই কৃষ্ণচন্দ্র! এই তোমার সুখ্যাতি।

অন্য একটীতে সিরাজের পতনের পর তাঁহার পরিজন-গণের দুর্দ্দশার বর্ণনা আছে—এই প্রসঙ্গে লুৎফ-উন্নিসার তেজস্বিতার কথা কবি বলিয়াছেন—মীরণ যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কার ঘরে গিয়া ঘর করিলে এখন
সিরাজ মহিষী! তব ভুই ঘরে ঘর?"

সিরাজ মহিষীর উত্তর—

কবী পৃষ্ঠে চিরদিন বিরাজ যাহার
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে রুচি হয় কি তাহার?

স্থলে স্থলে বেশ কবিত্ব আছে—কন্দর্প শরের বিশেষত্বকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"একখানা বস্ত্র কেটে করে দুইখানা
এইত বাণের গুণ—আছে বেশ জানা।
মদন বাণের গুণ মনে বেশ জানি—
দুইখানা কাটা বস্ত্র করে একখানি।"

অন্যত্র—

"চুলিও ভাগ্যে খাল মোশালা ছেলের ভাগ্যে কালি
খাসটাওয়ালীর ভাগ্যে হীরা-মুক্তা-মণি
ঠাকুরের ঘোড়া ঘোড়া আর ঠোঁটে কলা
খাজা গজা বস্তিকুর উয়ারের বেলা
বল কলি! তোরে বলি—কি রাখিলি বাকী
বেকী হলো সাচ্চা আর সাচ্চা হলো বেকী।"

চাতুর্য্য ও শিল্পকুশলতা প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই আছে। এই কবিতাগুলি সংগ্রহের জন্য পূর্ণবাবুকে ধন্যবাদ।

"সাগর"—শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষের কবিতা। কবিতার ভাববিন্যাসের পারম্পর্য্য নেই। ১ম শ্লোকে—সাগরের অভিশাপ-বিরহের কথা; ২য়ে দিশেহারা সন্তান, ৩য়ে ঐ প্রকার কিন্তু চতুর্থে কবির মনন 'ভাগীরথি' বলে আহ্বান। "বিরহবহ্নি" যাহার অন্তর পরিসিক্ত" লিখিয়া কবি তাঁহার ভাবপ্রকাশও করিতে পারেন নাই, "চঞ্চল

নুভোয়" সন্ধিও মিলাইতেও পারেন নাই। শেষে যুক্ত-বর্ণের মিল বজায়ও না রাখিতে পারার দুঃখের সন্ধানও রাখেন নাই। "চিরপ্রেমিক" সাগরকে "উদ্ধতভীম মত্তসাগর" ইত্যাদি বিশেষণ না দিলেই ভাল হতো। তারপর—সাগরকে "প্রকৃতির আদরে দুলাল" বলিয়াছেন—আদরে দুলাল আবার সন্তীর দুঃখে "অভাগাদুঃখে" জানাই বলিয়া আহ্বান করিতেছেন—সে বহুযুগ পূর্ব-ধারার চিত্তে প্রবেশ করিয়া "নবালোক লভি" কবিকে কবে "পুলকানন্দে (?) কোনো শুভউষায় জাগাইবে তাহারি প্রতিক্ষায় কবি বসিয়া আছেন। এ কবিতায় কোনো সৌন্দর্যই আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না।

"চিতোর"—শ্রীবল্লিক কবির। এ কবিতায় কয়েকটি পংক্তি সুন্দর হইয়াছে। যথা—

১। "অনলেতে পদ্মিনীর জোটালে সৌরভ" (অনলেতে না লিখিয়া 'বহ্নিমাঝে' বা ঐরূপ কিছু লিখিলে বোধ হয় ভাল হইত)।

২। বিজিত হইয়া তুমি জিনিলে জেতায়

৩। কালানলে হাসিতেছ দীপ্তিমতী সীতা

কবি লিখিয়াছেন—"গৌর্য্যের অলকাভূমি" অলকা কি গৌর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ?

৺ কালিপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহোদয়ের এক কবিতা এসংখ্যায় আছে।

আলেখ্য, অমাবস্যায়—'আগমনী' শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের। ইহা আদৌ কবিতা হয় নাই।

'পুষ্পহারা' শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু রচিত। কবিতাটী বেশ করুণ হইয়াছে। প্রথম বারো লাইন দিলেই ভাল হইত। কবির বেশ পরিমিতি আছে—কলা নৈপুণ্য এখনো আয়ত্ত হয় নাই।

ফাটবুকটা শুরু করেছিল
আধখানা খাতা রয়েছে লেখা,
কথামালা খানা শেষ করে' গেছে
ভাগকথা তার হলো না শেখা।
রেশমের নীল শিয়রে পরুক
ঘুমায়ে থাকুক নতুন ঘুড়ী,
ঘুড়িদাদা পাশে থাকে থাকে রেখো
সাথে দিও সুতী লাটাই সুতো।
পড়ে থাক তার শিশিতরা গন্ধ
ছেঁড়া ঘুড়াজোড়া পুরাণ' বোধ।
আর পড়ে থাক দুখিনী মায়ের
বুকভরা যত শোকের বোঝা।

এ সকল পংক্তি সুন্দর ও সুরুচিত।

"শেষ করিব ও কৃষ্ণকথা।" শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র। কবিতাটীর আখ্যান বস্তু সুন্দর হইলেও কবির লেখনীতে ইহা সুরুচিত হয় নাই। তাহা এ-গা-মেলো ছন্দে যাকে যাকে ঝোল আছে—মিলগুলি সুনির্বাচিত নহে। তারপর বলিবার ভঙ্গি ও রসসৃষ্টির মূল সূত্রটী কবির এখনো আয়ত্ত হয় নাই।

আখ্যান বস্তুটী কবি বহুজন-বিদিত পাঞ্চালী প্রবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কবি জানেন কিনা জানি না—এই উপাখ্যানই মহাভারতেও বিদ্যমান। কৌশিক ঋষি ও ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যানেও এইরূপ অপোবনে পক্ষীদহন ও সতী নারীর নিকট তপস্বীর পরাজয়ের কথা আছে। ঋষি সতীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং সতী তাঁহাকে ধর্ম্মশিক্ষার জন্য একজন ব্যাধের নিকট শিষ্যত্ব-গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। ঐ ব্যাধ শুধু জনক-জননীর সেবা করিয়াই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কৌশিক ঋষি আপন জনক-জননীর অনভিমতে তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া তপশ্চরণে বনে গমন করেন ধর্ম্ম-ব্যাধের সিদ্ধির কথা শুনিয়া ও সতীর পতিসেবাদ্বারা বাকসিদ্ধি লক্ষ্য করিয়া ঋষির চৈতন্য হইল। এ উপাখ্যানের উদ্দেশ্য, তপ যতই উগ্র হউক, পিতামাতার অপেক্ষা তপ উচ্চ অঙ্গের সাধন নহে। জনক-জননীর পরমভক্ত সাধারণ ব্যাধও পতিসেবারত সাধ্বী রমণীও উগ্রতপস্বী ব্রহ্মচারী ঋষি অপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—

রবীন্দ্রনাথের—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

• • • •

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয়ের "অক্ষয়" অক্ষয়তার চরম নিদর্শন। কবি ভূধরঞ্জন মল্লিকের "কালী" পূর্ব্বেই পরিচারিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং সমালোচিত হইয়াছে। এক কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ—কবির পক্ষেও নিন্দনীয়—সম্পাদকের পক্ষেও নিন্দনীয়।

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের "প্রিয়" কবিতাতে ২৪টী "প্রিয়" শব্দ থাকিলেও পাঠকের প্রিয় হইবে না। কবিতাতে কিছুই নাই। শুধু পড়িবার 'প্রিয়' শব্দের সহিত সাক্ষাৎ। ভাবের গভীরতা যাহা কিছু তাহা কবির চিত্তেই আছে—কবিতায় একবিন্দুও নাই। "জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে বচনে মননে সজনে বিজনে আঁধারে কিরণে জনমে জনমে মরমে করমে" ইত্যাদি একঘেয়ে শব্দের পুনঃ পুনঃ বিন্যাসে যে মাধুর্য্য সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন—তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। "বিশ্বাস।" বসন্তবাবু ঘুটুযোগের সর্ব্ববিষয়ে এবং শুদ্ধ-বাক্যে অবিশ্বাসটি কবিতায় ভাল করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই। বেশ সুন্দর ভাবটী কবির মনে উদয় হইয়াছিল—কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গীর দোষে সব মাটী হইয়া গিয়াছে। এমন বিশ্রী ছন্দে কবিতাটী লিখিয়া ফেলিয়াছেন—যে ছন্দের সঙ্গে ভাবটীর আদৌ মিল নাই। কবিতার ছন্দের নমুনা—যথা— যোড়শা পুলকিত বপুতে
চরণধূলা লয়ে মাথাতে,
ঘরিয়া করে-করে কহিল সবিনয়ে
"সকলি ভাল তব লাগিতে।"

এইরূপ শব্দবিন্যাসের অনুপাতে—

"ছোট যে ছেলে কটি! ইইমন্তর
নাহি নিতে হবে কভু তো—"
"ভিটেখানা হুখানা ঘরও তুলে দিব,
বলদও জোড়া চই বাড়াবো।"
একটি ছন্দঃপতন।

ভাষা স্থলে স্থলে অতিরিক্ত গদ্যাত্মক। আবার বসন্তবাবুর patent মিলও কতকগুলি আছে—

"চাইলে" ও "যাইব"—"শিব" ও "নিজ" ইত্যাদি। সবদিক হইতেই বিচার করিলে কবিতাটীকে সুরচিত বলা যায় না।

"পল্লীচাষা"—শ্রীহরানন্দ সেনগুপ্ত। লেখকের কবিতা এখনো মাসিকপত্রের ছাপিবার উপযুক্ত হয় নাই। অনুশীলন করিলে একদিন ১ম শ্রেণীর মাসিকপত্রেই প্রকাশযোগ্য হইতে পারিবে। এখনো ছন্দোবন্ধ আয়ত্ত হয় নাই—ভাবেরও পরিপুষ্টি হয় নাই।

"মা"—শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন। কবিতাটী রচনাকালে কি লেখকের cowper's "On the receipt of my mother's picture" কবিতাটী মনে পড়িয়াছিল?

শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্রের "আগমনী"—আজকালকার বঙ্গসাহিত্যের বস্তুসঙ্কটের করুণ কাহিনী।

আমাতা দেখিয়া সবারে ত্রস্তে জীবন ভাজিছে নয়া শস্ত
পাথার তলায় পাখারি তবুও ঘরে না কি তোর মনে অন্ত
নবীন বস্ত্রে তুষিতা শিশুরা নাচিবে না আর পূজার ছন্দে
তার সম্পদ লাভ রহিতা শোকসন্তাপ তাপিতা বঙ্গে।

বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। কবিতার মিলগুলি সুন্দর!

"তোমার তাপিনী প্রব বিষাক্তিনী কুলিশি তন্ত্রতালিকা বঙ্গে" অনুপ্রাসের ভূরিভোজনে অক্ষীর্ণের নিদর্শন। "চলাপীড়ন ভাবনা তাপিতা শঙ্কা শিহরী জননী বঙ্গে"—বড় নিস্তেজ পংক্তি।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের "ঐ রুনুঝুনুরুনু প্রেম-বন্ধুয়ানী" "এস নন্দনবন বসুন্ধরাণী" ইত্যাদি সুললিত শব্দবিন্যাস সত্ত্বেও তাঁহার "আনন্দোৎসব ব্যর্থ হইয়াছে। শ্রীপতিবাবু নন্দনবনের বড় ভক্ত। তাঁহার প্রায় সকল কবিতাতেই "নন্দনবন" বিদ্যমান। কবিতায় অনুপ্রাস ছাড়া অন্যান্য অলঙ্কারও আছে যথা—"ধানক্ষেতের কূলে—আশা-তরিনী দুলে" "সুধা সাগর বহি, সুরা গাগরী বহি" "নীল সাগর টুটে যেন পড়িল লুটে" ইত্যাদি। আর কত খুলিব? ছন্দ সর্ব্বত্র পড়াও হয়সাধ্য। শ্রীপতিবাবু এখন কিছুদিন নিভৃতে সাধনা করুন। পিতামহের আশীর্ব্বাদে একদিন প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেও পারেন। বঙ্গের আর একজন সাহিত্যরথীর পৌত্র আজ একজন বিখ্যাত কবি—তাঁহাকেও

বহুদিন নিষ্কৃতে সাধনা করিতে হইয়াছে—আগে সমস্তোদিত পক্ষ হইয়া তবে তিনি সাহিত্য-আকাশে উড্ডীন হইয়াছিলেন।

ছাকা ব্রিভিউ, শ্রাবণ ও ভাদ্র—'প্রার্থনা-সঙ্গীত'। সমালোচনার অযোগ্য।

"বিরহ" (Burns হইতে)—শ্রীকালিদাস রায়। কবিতার লাইনগুলি এক একটী বিশগজী—ইহাতে বিরহ খুব দীর্ঘ বলিয়াই মনে হয়। এক একটি লাইনের নমুনা—

হারও আমার মাঝখানে ঐ
আলোকি আলোকি গর্জ্জিছে নিশিদিন
গর্জ্জিছে ঐ বিরহের মহাসিন্ধু।

প্রবাসী, ভাদ্র—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর "অভিলাষ" ৮ লাইনে সমাপ্ত। ৮ পংক্তিতেই যখন সমাপ্ত তখন অভিলাষ বিশেষ উচ্চ নহে। তাহা ছাড়া কবিতাতেই সে-কথা আছে—

নাহি খাটি উচ্চতম, সে যদি সূর্য্যের মত
রহি ঊর্দ্ধে, নিম্নে রহে বন,
হব নীচে সেও ভাল, সে যদি চাতকসম,
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি রবে অনুক্ষণ।
চাহি না বৃহৎ বৃক্ষে সে যদি ভিমির মত
বেকুবীন সিন্ধু আন্দোলন।
ক্ষুদ্র হই, ক্ষতি নাই প্রবাল কীটের মত
রত্নদীপ করিব গঠন।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের "নবযৌবনে" বিশেষত্ব নাই—নবযৌবন সমাগমে সকলেই এরূপ দু' একটী কবিতা লিখিয়া থাকেন—ইহা বয়োব্রতের মত। কবি নবযৌবনকে বরণ করিতেছেন—কাব্যক্ষেত্রে যৌবনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে আমরাও সুখী হইব। কবিতার ভিনগুলি সুন্দর। বিশেষতঃ ২য় শ্লোকে একটু কৃতিত্বও আছে। আমরাও বলি "থাকুক তন্ত্রী বিচিত্র সুরে।"

যৌবনের আবাহন আরো একটী এ সংখ্যায় আছে। শ্রীশ্যামীমোহন সেনগুপ্তের "যৌবন-বরণ"। এ কবিতার একটী পংক্তি আমাদের ভাল লাগিয়াছে—"তরুণী শৈশব যোর কোন সাধনায় আবাহন তোমায়"।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "আটকে বাঁধা"।

(একটী চীনে কবিতার ইংরাজী হইতে)।

"আসছে যেদিন পূর্ণ সে মোর বিশ্বাসের আশ্বাস
সেছে যেদিন মূর্ত্ত সে বিশ্বে
সে বিশ্বে অপরূপের অরূপ সে আভাস
অভাবা সব সম্ভাবনাময়।"

ইহা কতকটা চীনে—কতকটা ইংরাজীই থাকিয়া গিয়াছে—বাংলা হয় নাই। আবার পক্ষান্তরে—

বিশ্বাসে বুক বেঁধেছি, বল পেয়েছি নিশ্বাসে
আট্‌কে আমার ঘরে গেছে বাঁধা
নিশ্বাসে মন খুসী আমার, নিশ্বাসে নিশ্বাসে
উড়িয়ে দিল উড়িয়ে দিল ধাঁধা।

বেশ সুন্দর ও সুরচিত।

"মানুষ হওয়া"—বেদলতা দেবীর। অতি সুন্দর কবিতা।

আপনাকে যে ঠেকিয়ে রাখা দায়
মানুষ হওয়ার আগুন আমার জ্বলছে সারা গায়
• • •
চিন্‌তে গেলে নিজের পানে
উঠছে আগুন জেগে
আপনি পড়ি পরকে পোড়াই
রাখতে নারি চেপে—
বিষম জ্বালা আপনাকে তাই
দাহতে হবে হায়,
সইতে হবে বইতে হবে
মানুষ হওয়ার দায়।"

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্তের "পসার বন্যা"। মন্দ নহে।

"পূর্ণ ছিল ষোলকলায় গৌরবানী সবা
ভাসিয়ে দিছি তোর জলে সে মনের মনোরথা
আজিও তোর জোছনা মাখা লহর খেলা জলে
স্বর্ণ হালা তরণী তাহার ঝিনুক দিয়ে চলে।"

সুরচিত।

প্রবাসী কার্ত্তিক—১৩২৩। খোঁপার কাঁটার মত দুলাইনের কবিতা—'প্রেম' খুঁজি হেরায়

অন্ত ব্যবহৃত. উহার সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্রের "পল্লীপ্রশস্তি"। কবিতার নামটী বেশ সুপ্রযুক্ত হয় নাই। বঙ্গের অধিকাংশ কবিগণ বাংলার পল্লীকে সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি করিয়া কাব্যে বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পল্লী বাংলার প্রকৃত পল্লী নহে—উহা কবিগণের আপন মনের মাধুরী মিশ্রণে কল্পনার উপাদানে গঠিত। প্রবাসীর নবীন কবি বাংলার দুর্দশাগ্রস্ত ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দুঃখদৈন্য জর্জ্জরিত পল্লীর বর্ণনা করিয়াছেন এবং যে সকল কবি কল্পনার পল্লী লইয়া মুগ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে একটু কটাক্ষও করিয়াছেন—"পল্লীর নারী যারা কবিতার বরণা গাছায় মাথা বেঁধে করে ঘরকন্না।" এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল আজকালকার নবীন-কবিরা পল্লীর কাল্পনিক সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ বিভোর হইয়া নেই—তাঁহাদের লেখনী আজকাল সাম্যমন্ত্র পল্লীর দুঃখদৈন্য তাপপরিতাপের কার্য্য জগতে প্রকাশ করিতেছে। নগরের বিলাসবিভ্রম ইহলক্ষ্যতা ভোগলালসা নীচতা স্বার্থপরতা ইত্যাদিতে মর্ম্মাহত হইয়া কবির চিত্ত স্বতই পল্লীর দিকে ধাবিত হয়। কবি সুন্দরের পূজারী সুন্দরের সেবক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই তাহার কাজ। সেজন্য যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পল্লীর স্তামল প্রান্তরের ও অমল অন্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। শত দুঃখদৈন্য তাপজ্বালা সত্ত্বেও এখনো বঙ্গের পল্লীসুন্দর, জীর্ণা শীর্ণা ম্যালেরিয়া পীড়িতা অনশনক্লিষ্টা অনশ্নাক্ বাসনা কুৎসিতা হইলেও পল্লীর বধূ আজিও কবিতার বরণা। পল্লীর নিসর্গশ্রী আজ পাণ্ডুবর্ণিন, গৃহশ্রী আজ ম্লান, গৃহ-আঙ্গিনা আজ অরণ্য, পথঘাট আজ জঙ্গল—তবু পল্লীর অন্তরকোষে এখনো একটু বধূ আছে। তবে যেরূপ দুরদৃষ্টের আক্রমণ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ তাহাতে পল্লীর অন্তঃসৌন্দর্য্যও আর বেশি থাকে না।

কোনো উদ্দেশ্য লইয়া কবিকে লিখিতে অনুরোধ করিলে কোনো বস্তুতান্ত্রিক লক্ষ্যকেই উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহাকে লেখনী ধারণ করিতে বলি না। তবে যাহা কিছু করুণ মর্ম্মস্পর্শী শোকাবহ—অশ্রুসলিলে অভিসিঞ্চিত তাহা কবির চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া কবির লেখনীকে চঞ্চল করিবে সে আশা রাখি। যাহা জাতীয় বেদনা, যাহা দেশব্যাপী যন্ত্রণা, যে সকল দুঃখ মানবজাতিকে কুবানলের ন্যায় দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে, যে দুর্নিবার ব্যথার সন্তাপ বঙ্গের শিরায় শিরায় তাহা দেশের কবির অন্তর্দৃষ্টি এড়াইবে ইহাও স্বাভাবিক নহে। পল্লীই দেশের অধিকাংশ। পল্লীবাসীর সংখ্যা ৪ কোটী ২৫ লক্ষ—নগরবাসীর সংখ্যা ২৯ লক্ষ। ইহাতে দেখা যায় বাঙালী বলিলেই পল্লীবাসীকেই বুঝায়, দেশ বলিলেই পল্লীকেই বুঝায়। পল্লীর দুঃখ বেদনাই সমগ্র দেশের দুঃখবেদনা, কবি দুঃখসংবেদনারই কারণ। দুঃখ বেদনাই চিরদিন কবির বীণাকেই মুখর করিয়াছে। ইহাতে আশা করা যায় এবং ইহাই স্বাভাবিক যে বঙ্গের কবিগণ পল্লীর শোকদুঃখই তাঁহাদের কাব্যে প্রকাশ করিবেন। এক বড় বিরাট দেশব্যাপী দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া দেশের কবির লেখনীর লীলা কিরূপে চলিতে পারে, কবির শ্রী কিরূপে রাখিতে পারে তাহাই সবিস্ময়ে ভাবিবার কথা। কবি কোনো উদ্দেশ্য মনে গোপন করিয়া না লিখিলেও পল্লীর অন্তরতলে অভিসিঞ্চিত কবিতা আপন উদ্দেশ্য সাধন করিবেই—অজ্ঞানতঃ শিল্পীর দেশের প্রতি কর্ত্তব্যও সাধিত হইবে।

আজকাল প্রায় সকল কবিই পল্লীর দুঃখদৈন্যের কথাই তাঁহাদের কবিতার আখ্যানবস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব আরো গুরুতর তিনি সমগ্র দেশের নেতৃত্বও গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভক্ত শিষ্যগণের মধ্যে যতীন্দ্র, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাসের লেখনী —পল্লীর হৃদয় শোণিতে সিক্ত। কবি সত্যেন্দ্রনাথের ব্যথিতা কল্পনা—সমগ্র দেশের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে। দেশের রাজনৈতিক ব্যাকুলতা তাঁহাকে অধিকতর চঞ্চল করিয়াছে। করুণানিধানের প্রতিভা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কল্পনাপ্রবণ। পরতন্ত্র বঙ্গ জগতের আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করেন। আকাশকুসুম-চয়নে ও পল্লীবাসে কিছুদিন তাঁহার কবিপ্রতিভার প্রীতিকর লীলা। দেশবাসী দুর্দ্দশাগ্রস্ত বেদনাপূর্ণ দেশের সকল কবিকেই চঞ্চল করিয়া তুলিবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা কবি কল্পনানিবাসের অন্তরকে কেন যে ব্যাকুল করে না তাহা বুঝা যায় না।

সুখের বিষয় নবীনতম কবিদের চিত্ত পল্লীর দুঃখে বিগলিত হইয়াছে। তাঁহারা সব নবীন উদ্ভব, প্রথম যৌবন, তাহাদের কল্পনার অসংযম ও মোহমুগ্ধতা অস্বাভাবিক নহে—তবু তাহারা কল্পলোকপানে না ছুটিয়া—আকাশে স্বপনকে কেবলি বসন না করিয়া দেশের অশ্রুজলে তাহাদের কাব্য-পল্লীর অভিষেক করাইতেছে ও পল্লীর দুঃখমোচনে তাহারা দীক্ষার টীকা গ্রহণ করিয়াছে।

সমালোচ্য কবিতায় পল্লীর বর্তমান অবস্থাটি বেশ সরস করিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

ভাদ্রিদের মত পেট যাদা জোড়া পিলেতে
ঘোটাঘোটা রসে যেরা রংকরা নীলেতে।
• • •
বছরের শেষে এসে ঠাকুরাণী অঘ্রাণে
তখনও ভালবেসে ডেকে যেন ভাগ্যে।
ওনাদের হাত হতে যদি পড় রসুকে
দেখে আছে কাঁকরার আছে পা'ক রসুকে।
ঘাড়গোড় গুড়ো হয় কুড়িকাছে খাটুতে।
মহাজন ক্ষেতে খাড়া ধানগাটি কাটুতে।
• • •
পাটপচা কালো জল তরা বিল খালাতে
কত কাল বিষকীট কিল বিল সাঁতারে। ইত্যাদি।

"রসুনের গোলা চাক" ইত্যাদি সুরুচির পরিচয় দেয় নাই। 'রস'কে "রসুনো" করা ভাল হয় নাই।

"পরশমণি"। শ্রীঅরবিন্দমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কবির সাহিত্য-ক্ষেত্রে নূতন প্রবেশ। এ প্রবেশ আশাপ্রদ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাবচ্ছায়া বর্তমান থাকিলেও কবিতাটিকে সুরুচির বলিতে হইবে। এ সংসারে পরশমণি সকলেই খুঁজে—সকলেই আশা করে খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর। কাহারো পরশমণি ঐহিকতার আদর্শ কাহারো বা পারমার্থিকতার আদর্শ। কবি দুই রকমই দেখাইয়াছেন। যাহা ঐহিকতার ব্যাকুল কল্পনাপ্রসূত তাহা "পদ্মে ঢাকা জীবন অমনি"—তাহা "কালফণী"—তাহা তরঙ্গহারা শূন্য মায়া মরুভূমির মধ্যে চিরমরীচিকা—তাহাতে—

পতঙ্গের মত নর কত রঙে আসি মনে মনে
প্রাণের আহুতি দেয় মরুবনে যেন তব চরণের তলে
অনন্ত অনলে
জীবনে মরণে মেশা সর্বনাশা নেশা ঘোরে
ধাঁধাইয়া জ্ঞান
তব পাশে অনায়াসে কি মহা সুখকে পড়ে'
কেন বলিদান
নিজ নিজ প্রাণ।

পারমার্থিক পরশমণি—পর্ণশালা ও লোকবাসনার ব্যাকুলতা-প্রসূত নহে—উহা "সত্য নিত্য চিত্তাকর্ষে স্বপ্রকাশ চিন্ময় তপন"। ইহার সন্ধান মরীচিকা পানে ধাবিত পান্থের আশার মতন ব্যর্থ হয় না। ঐ পরশমণিকে এক জন্মের অনুসন্ধানে না লভিলেও জন্মজন্মান্তরেও লাভ করা যায়। জীবনভরা সন্ধান নিষ্ফল যায় না—উহা জীবনকে অমর করাইয়া যায়।

কবি বলিয়াছেন—

যাকে যাকে লীলা ভরে যবে তুমি করিয়া চাতুরী
মায়া আচরণে ঘিরে আপনাকে করে রাখ চুরি—
তবে লোক না পেয়ে সন্ধান
অপ্রাকৃতে কবি জড় জ্ঞান
করে তব ধ্যান।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

"অথবা জনম তব হে পরশমণি
দরিদ্রের মর্মভেদী রুদ্র অভিশাপে
তীব্র মনস্তাপ
• • •
দুঃখে ক্ষোভে নিজ বুক টুটিল যেমনি
অমনি বাহির হলে, তুমি কালফণী—হে পরশমণি"—
ইত্যাদি অংশ অতিসুন্দর। ধনীর ভাণ্ডারে দরিদ্রের কৃপার অন্ন তৃষ্ণার জল পরিধানের বসন অবহেলায় অনাদরে পুঞ্জীকৃত—দরিদ্র সারাদিন তাহারই দুয়ারে খাটিয়াও জীবনযাত্রার ধারণোপযোগী প্রাণাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারে না—সে ধনীর দুয়ার দ্বারে ঘুরিয়াও যখন একমুষ্টি অন্ন পায় না, একবিন্দু পানীয় জল বা এক কণা উষধপাত

না তখন তাহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে যে অভিশাপ নির্গত হয় তাহাই পরশমণির রূপ ধরিয়া ইহসর্বস্ব ভোগ-সুখের বিভ্রান্তিকে মরীচিকার মত প্রভূত করে।" দরিদ্রের অভিশাপে দরিদ্রের হৃদয়ে যে বেদনা তাহা তাহার হৃদয় পরিতাপিত হয়। দরিদ্র ছটফট্ করে সামান্য অন্নের জন্য কুটীরে,—ধনী ছটফট্ করে ঐ যাদুমণির জন্য প্রাসাদে মর্ম্মে। দরিদ্রের হৃদয়ভেদী অভিশাপ বড়ই সাংঘাতিক—ঐ অভিশাপে বিত্তবানের চিত্তে শত শত আকাঙ্ক্ষা শত শত নূতন নূতন অভাবের বেদনা—নব নব ভোগবাসনা শত শত নাগিনীর মত ফণা তুলিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে থাকে। অন্নাভাবের যে বেদনা দরিদ্রকে পীড়ন করে সেই বেদনাই জগতের midas গণকেও পীড়ন করিতে থাকে। স্বর্ণ তখন করিয়াও দেহ ও আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। দরিদ্রের অভিশাপে পরশমণির ঐহিকরূপ যাদুমণি। কিন্তু পরশমণির যাহা প্রকৃতরূপ তাহা যাদুমণি নহে তাহা চিন্তামণি তাহারি আশায়—কবির ভাষায়—

"বসিয়া বিরলে আমি আঁখি জলে শুধু সেই দিন গণি
দিবস রজনী
মোর হৃদিতলে থাকি তোমার মানিক করে আসিবে আপনি
সে পরশমণি।"

পরিচারিকা, কার্ত্তিক— "সন্ধ্যাদাস" সম্পাদিকার। 'ধ্যান' শ্রীকালিদাস রায়ের। আহ্লাদে নয়ন পীড়িতে পীড়িতে তথা হতে গেলে চলে" একটু প্রতিকটু।

'তাজমহল'—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের। সকল কবিরই তাজমহল সম্বন্ধে কবিতা আছে। কবি কুমুদরঞ্জনের এ কবিতা সম্ভোষ্ঠ,কল্পাও প্রবন্ধনাথের 'তাজমহলের' নিকট নিষ্প্রভ। তাজমহল কবিদের অফুরন্ত নির্ঝর কবি কুমুদরঞ্জন সে নির্ঝর হইতে একেবারে বঞ্চিত রহেন নাই। তবে কবির কথাও একেবারে মিথ্যা নয় কবি কথা খুঁজিয়া না পাইয়া—

"লাবণ্যের মহাসত্রে কেবে হায় কুবাকী তাপস
শোভার প্রবাহধারা তাকে কাল চাতকের রস।"

"কুবাকী তাপস" কি? বুঝিলাম না। শেষ চারি পংক্তি মন্দ হয় নাই

বাসনা আকার দিল মর্ম্মরেতে যদি অমরতে
হাফেজের কালিদাস ওমরের প্রেম লভিতে
কিম্বা তুমি শুকতারা বিরহের মহাদানে যাদু
চন্দ্রকলা বনে দিলে মিলনের ইদের সংবাদ।

'কুমুদের মালা'—কবি বসন্তকুমারের ভাষাটী মন্দ নহে। তবে প্রকাশ ভঙ্গি তেমন সুন্দর নহে—বিশেষতঃ "জানি আমি কণ্ঠ কাছে সারানিশি রেখে থাকি" পর্য্যন্ত বড়ই রুক্ষ প্রকাশ।

"কাকদূতে" কৌতুকরস প্রকাশের বৃথা প্রয়াস। কবিতাটী অতি দীর্ঘ—পড়িতে পড়িতে চিত্তাকর্ষক পংক্তি-পুঞ্জের অভাবে বিরক্ত লাগে।

"বন্ধুর দ্বারে যুরি দ্বারেদ্বারে রবিবাবু ভবনের
উলটিপালটি লেখা এই চিঠি বুলিও না এটি ফের"
সম্মুখে তোমার টীন বিয়েটার সংহত রেজুমি
দাঁড়ায়ে তুঙ্গ শিখর মৃঙ্গ শতকে গগন চুমি"
"বিরাজে পূর্ব্বে অতি অপূর্ব্ব Theosophical hall
বিকার যেখানে ব্রহ্মবিদ্যা খাঁটীস্তুত আটা চাল।"
চরণ লক্ষ কুলায় রক্ষ কুলায় শুধু বাদুল"
"Scavenging এর আলায় কিছু ভরসা না পাই মোটে।"

ইত্যাদি কবির অপরত্তার নিদর্শন। যাকে যাকে বেশ বল করিয়াছে। যথা—

"পাঁথির মোড়ক পাহারা দাঁড়ায় ভয়ঙ্করনোনা
রূপান্তরিত মকরধ্বজ সিন্ধুর ইঁট ভারা।"
"বিকচ পাখী তার দুটী আঁখি ধরে জলে তর তর
বৈশাখ মাসে কাঁচ তাল পাঁশ যায়রে যেমন ঝর।"

আবার—

ঘন কাল দাড়ী গোঁফে ভরা হাঁড়ি মুখে বিড়ি পিয়া সম
গ্রন্থ সবলে এগুয় কবলে অবলা সরলী সম। ইত্যাদি
রীতিমত বিশ্রী।

অদূরে বেখুনকলেজ! মিথুন-কাটকে পশিছে Light
হিংসানীপিলা কবিবারে চিলা রচিত এ Dynamite.

অদ্বৈতবাদ।

কবির শব্দ-ভাণ্ডার বেশ সম্বল। অনেকস্থলে বিদ্যুটে শব্দবিন্যাসে প্রহেলি। অনেকস্থলে কষ্টকল্পনা ও দুরান্বয়। অনেকস্থলে কৌতুকরসের উপযোগী ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই। সরস পংক্তিগুলি বাছিয়া কবিতাটিকে অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব করিলে বোধ হয় সুন্দর হইতে পারিত।

কিছুকাল আগে কবি করুণানিধান এক "বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত" নামে এই শ্রেণীর কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাও তেমন সরস হয় নাই বলিয়া পাঠকসমাজে সমাদৃত হয় নাই। হয় ত বা সেই জন্যই কবি-করুণানিধান "ছেড়ে দিলেন পথটা।"

এ কবিতাটীও সুরচিত না হইলেও লেখকের কৌতুক-রস সৃষ্টির শক্তি স্থলে স্থলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

"হাসি ও কান্না"—কাব্যপুরাণতীর্থ মহাশয়ের। ব্যর্থ-রচনা।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার সেনগুপ্তের 'পাহাড়িয়া'। ছন্দো-বন্ধ সম্বন্ধে কবি আর একটু সাবধান হইলে কবিতাটী চলনসই হইতে পারিত। কোনো একজন মধ্যকবির কোনো কবিতার ছায়াও ইহাতে বিদ্যমান। ২৩টী লাইন মন্দ হয় নাই।

"সূর্য্য তাদের দিনের বন্ধি,
জ্যোৎস্না তাদের সাঁজের বাতি
হাত-বালিশে রাখে মাথা,
কাটায় তারা সারা রাতি।"

"খুদী তাদের হু'মাস রাখে
বাকী ছ'মাস মহাজন।"

প্রবাহিনী, কার্ত্তিক—প্রবাহিনী আগে সাপ্তাহিক পত্র ছিল—মধ্যে প্রবাহিনী বন্ধ হইয়া সুপ্তাবিত হইয়াছিল। আবার শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় মাসিক হইয়া প্রকট হইয়াছে।

'গল্পলেখক' একটী কবিতা। এই ব্যঙ্গ কবিতার রচয়িতা শ্রীলেখকণ্ঠ সরস্বতী। কবিতাটীতে যদিও তেমন রসসৃষ্টি হয় নাই—কিন্তু বিষয়ের ব্যাপকতাতেই ইহাকে উল্লেখ যোগ্য করিয়াছে। দু' একটী উদাহরণ দেওয়া যাক্ঃ—

"চাকরী ছিল হরিষপালের পাট আফিসে দরমাহাটায়
যায় কাজেরই মিলতো আমার যৎকিঞ্চিৎ দরমাহাটায়
Story-teller থাকতে কাজে plot-এর জন্য চিন্তা কি আর
চালাই কলম তড়িৎবেগে ঠেস দিয়ে রাতদিন তাকিয়ার।
লিখন কেবল চলিত ভাষায় ভাবটা কিন্তু শক্ত বেজায়
তার ওলা বেশ হলে হজম পড়তে পুরা সখ তবে যায়।
ইত্যাদি।

পূজার নৈবেদ্য—শ্রীহরানন্দ শর্ম্মা প্রেরিত। কয়েকটী ব্যঙ্গ কৌতুকাবহ ক্ষুদ্র কবিতার সংগ্রহ। ২।৮।১০।১৭।১৯ সংখ্যক শ্লোকগুলি মন্দ হয় নাই—বাকীগুলি যেন সরস হয় নাই।

কোর্টশিপ হয়ে যত হয় পরিণয়
অধিকাংশ তার কোর্টে পায় তার লয়

বোনাই বিদ্রূপ করে তাহার শালীরে
ক্রিটিক বিদ্রূপ করে প্রতিভা শালীরে।

"প্রতিজ্ঞা রক্ষা"—কবি কালিদাস রায়ের রচিত। হাস্যরস কলহের কথা—কাজেই বক্তব্যারম্ভে সমুক্তিয়া।

'যা'—কবিতার নীচে নাম নাই। সম্পাদকের নাকি? যাহারি হোক্ হাতটা বেশ মিঠে। তবে কবিতাটিতে অন্য কবির অনুকরণ বড়ই কষ্টকর।

'অকর্ণা'—শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী। কবিতাটিতে ছন্দের দোষ বর্ত্তমান—তবু চলিত যদি উহা কবি কুমুদরঞ্জনের 'অকেজো' কবিতার পুনরাবৃত্তি মাত্র না হইত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসেবক—শ্রাবণ। শ্রীকালিদাস রায়ের ব্রজরেণু কাব্যসমালোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মাসিক পত্রিকায় আধিরস প্রধান বৈষ্ণব কবিতাকে নিন্দা করিয়াছিলেন—আমরা উপাসনা পত্রিকায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। আবার বহুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাংখ্য-তীর্থ মহোদয় বিজয়বাবুর সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় বৈষ্ণবশাস্ত্রও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে যুক্তি ইত্যাদি উদ্ধরণ করিয়া বৈষ্ণবমতের সমর্থন করিয়াছেন। আলোচনাটীর অনেকস্থলই বড়ই সুবোধ হইয়াছে সেজন্য

সাধারণের উপভোগ্য হইবে না—বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য-কেহ প্রবন্ধটীর তাৎপর্য্য উদ্ধার করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকা আমাদের দেশে প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতেছে। গৌরাঙ্গসেবকের অধিকাংশ লেখকেই পণ্ডিত জ্ঞানী ভক্ত। তাঁহাদের রচনার আলোচ্য বঙ্গে বৈষ্ণবসাহিত্যের ধারা রক্ষিত হইতেছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও সাহিত্য আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ অনেকস্থলে উহার বিপরীত অর্থ গ্রহণে ও কদর্থার্থ গ্রহণে আমরা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করি। গৌরাঙ্গসেবক পত্রিকা প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম যে কি তাহা আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতেছে। গৌরাঙ্গসেবকে যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ডের বিচারে উচ্চস্থান লাভ না করিলেও উহাতে যে ভক্তি আন্তরিকতা ও ভাবের গভীরতা আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পরম-ভাগবত মহাত্মা, ভক্তিবীর শ্রীগৌড় রাজর্ষি মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়া নিখিল বৈষ্ণবসমাজের ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

যমুনা—কার্ত্তিক।—যমুনাকে আবার আমরা নূতন ভাবে দেখিতেছি। এ সংখ্যা নবপর্য্যায়ের ৭ম সংখ্যা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—

যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী?—একদিন যে যমুনা অবলম্বন করিয়া গল্পোপন্যাস সাহিত্যের মহারথী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় প্রথম সাহিত্য গগনে অবতীর্ণ হন—যে যমুনায় শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, চারুচন্দ্র মিত্র হেমেন্দ্র কুমার রায় করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি সুলেখকগণ নিয়মিতরূপে লিখিতেন—এই কি সেই যমুনা? তবু যমুনা যে মাসিক সাহিত্যের জীবন সংগ্রামে এতদিন টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছে। ইহা তাহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। কবি যোতীন্দ্রমোহন ও কবি যতীন্দ্রনাথ যমুনার যোগদান করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

'শরৎ-রাণী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহোদয়ের। শরৎ সংখ্যায় নেহাৎ একটা শরৎ সম্ভোগযোগী কবিতা না দিলে নয়—তাই যেন কবিসম্পাদক টেনে বুনে মামুলী সেই গোটাকতক কথাকে ছন্দে সাজাইয়া শরৎ-রাণী লিখিয়াছেন। কবির স্বভাবসুলভ ছন্দোমাধুর্য্য ছাড়া ইহাতে বলিবার উপযুক্ত কিছুই নাই।

'কবির কসরৎ' ইন্‌জিনিয়ার কবির কারখানা হইতে তাহা বুঝিতে আমাদের বাকী নাই।

কবিতার লক্ষীভূত কবির শব্দ বিন্যাসে যে নিজস্বতা বৈচিত্র আছে, তাহাকেই ইহাতে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। যেরূপে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে এই ছন্দই যে কবির প্রিয় এবং যে ভাষাতে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে এই প্রকারের ভাষা বিন্যাস উক্ত কবির কাব্যাদিতে প্রায়ই পাওয়া যায়। কবির অনুপ্রাসের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রার লোভকেই অধিক আক্রমণ করা হইয়াছে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের সহিত অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত পারসী শব্দের মিশ্রণ কিরূপ বিকট হয় তাহাও ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় দেখাইয়াছেন—

উঁচুকি চালের ঘুরকি দেখে তড়কে যাবো আমরা কি!
শক্তহাতের কব্‌জি যোরের সবজি সবুজ চাষকাটি।

• • • •

অমঙ্গলের সঙ্গে থেকে তাকবো শিবে সর্ব্বদাই
মর্ত্তাসনে সর্ব্বে বসে' কর্ব্বো যোরা কোর্ব্বানী।

ইত্যাদি।

একথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে কবিকে ইন্‌জিনিয়ার কবি ব্যঙ্গ করিয়াছেন তিনি এত উর্দ্ধে উঠিয়া গেছেন যে তাঁহার সিংহাসন স্পর্শ করিতে সাধ্য করিতে পারে এমন কলকব্জা ইট সুরকি খুঁটী খাদা ইন্‌জিনিয়ার মহাশয়ের কারখানাতে নাই। তাহের পাত্র এখন ছন্দের আকাশে বিদ্যুৎ তালাবে উধাও উড়িতেছেন।

ইন্‌জিনিয়ার মহাশয়ের মিস্ত্রীখানা হইতে আর একটী অস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার নাম "কবির প্রয়াস" বাঙ্গলার আর একজন বিখ্যাত নব্য কবির প্রতি দৃষ্টি। ব্যঙ্গের বিষয় কবিতা হইতে যতটী বোঝা যাইতেছে তাহা এই—

এই নবীন কবি বহু আঙ্গুর নিঙ্গাড়িয়া বহু বহুরা কলস খালি করিয়া যোহনার বাগে ফুলবাস ছাঁকিয়া বাংলার

তাহার বক্ষ ঈপ্সা লাভলে বিদারণ করিয়া কিছুতেই তাঁহার প্রিয়ার যাতনা ঘুচাইতে পারেন নাই। বাংলার কবিদের ব্রজের যমুনাকে ইজিয়ান বহাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তারপর সংস্কৃত কাব্যনাটোর ব্যবহৃত বহু শব্দ ও উপমা সংস্কৃত পুরাণ হইতে বহু allusion সংগ্রহ করিয়া অনেক কবিতাই তিনি লিখিয়াছেন কিন্তু সবগুলিতেই একটু নবত্ব কম হইয়া গিয়াছে।

বাহুড়ীর শব্দে কাণ ঝালাপালা হইয়া গেলে বীণাবেণুর সুর কাণে ভাল না লাগিবারই কথা—ইট হইতে উচ্চতর জিনিষের সহিত পরিচয় না ঘটিলে—"পক্ষিরাজের সঙ্গে যোহন মর্ণার কুস্তীর" উপহাসের বিষয়ও হবেই। নিত্য যাহার সুরভির ঘ্রাণে ঘোলা খেলার অভ্যাস ব্রজের ঘোলাখেলার কথা তাহার ভাল লাগিবে কেন?

যমুনার মাসিকসাহিত্য সমালোচনা বেশ্যৎ বন্ধ হইতেছে না। হঠাৎ নবপর্যায়ের যমুনাকে দেখিয়া প্রথম অবস্থার যমুনাকে মনে পড়ে। ষষ্ঠীবাবু ও সুরেশবাবুও আছেন—কবিরাজ কই?

সাহিত্য, আশ্বিন—শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'নাবিকার শেষ কথা' Robert Brown হইতে অনুদিত। অনুবাদের ভাষা তেমন সরস, সলিত ও কবিত্বময় নহে। ৭ম ও ১০ম শ্লোকে মিলেরও দোষ আছে—সে শুধু অমর মিল নহে উহা অবশ্যবর্জ্য মিলের উদাহরণ।

"আজি এ বিদায় বঁধু একটু কাঁদিব
অরোধের মত হবে তা সে,
কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে
ঘুমাব পড়িব ঢলে তব প্রেমের পরশে।"

এই ৪টি লাইনেই অনুবাদকের সর্ব্ববিধ অক্ষমতা ধরিতে পারা যায়। সাহিত্য পাঠ করিয়া মনে হয় সাহিত্য-সম্পাদক মহোদয় গদ্যপ্রবন্ধ নির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী কিন্তু কবিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। সাহিত্য সম্পাদক মহোদয় সমালোচক (?) হিসাবে কবিতা সম্বন্ধে কিছু একটু উদাসীন নহেন বরং গদ্যপ্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহাকে উদাসীন বলা যাইতে পারে। একটা ১২।১৪ লাইনের কবিতার জন্য তিনি এক পৃষ্ঠাব্যাপী হাস্যরসাত্মক বাঙ্গকৌতুক ঢালাইতে পারেন কিন্তু ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধের সমালোচনা অনেক সময় তিনি দু লাইনেই সারেন, বড়জোর বলেন "আমাদের অল্প পরিসরে এপ্রবন্ধের যথাযথের আলোচনা সম্ভবপর নহে।" অধিকাংশ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের ভাগ্যে "সুখপাঠ্য" "সারগর্ভ" অথবা "জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ" এইরূপ একটা বিশেষণ যায় লাভ হয় সম্পাদক মহাশয় কবিকুলের জন্যই কিন্তু এদিকে কবিকুলও সজ্ঞাগ হইয়া উঠিয়াছেন কিছুতেই তাহাদিগকে হরিনাম ছাড় ইতে পারিবেন না।

সম্পাদক মহাশয়ের মাসিকসাহিত্য সমালোচনা আর তেমন সরস হইতেছে না। এখন দেখিলে কতকগুলি পুরাতন পর্য্যুদস্ত বাঙ্গকৌতুকের বাসি মুখের পুনরাবৃত্তি হইতেছে। "গাছে গাছে পুরুষ নারীর" বাঙ্গটী প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই থাকে। 'কোদণ্ডের' কার্ম্মুকত্ব লাভের মত 'পুলক' এখন 'আনন্দের' নামান্তর হইয়া উঠিয়াছে—কাহারো ক্ষমতা নাই—পুলকের এই অর্থশক্তিকে বিনষ্ট করে।

আলেখ্য—অগ্রহায়ণ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রের "ভালবাসা" কবিতা নামের অযোগ্য। বক্তব্য বিষয়টী কবির মনে সুস্পষ্ট ভাবে নাই বলিয়া মনে হয়—ভাষার ত কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। ছন্দ আগাগোড়াই দোষযুক্ত—মিল অষ্টম শ্রেণীর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একটু নমুনা দিই—

"পূর্ণকে যে পূর্ণ রেখে রচলো বিরাট সৃষ্টি এ
যাহার লীলা শাস্ত্রলেখে প্রেমিক বলে প্রেম যে সে

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তীর "কে?" কবিতাও ওথৈব চ। বাড়ন্তির ভাগ বিনোদবাবুর "ভালবাসার" একটু নির্লজ্জতা আছে। নগেন্দ্রবাবু যা হোক 'পূর্ণ' 'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ' ইত্যাদি দুচারিটা দার্শনিক শব্দ দিয়ে একটু ঘোরালো কবিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন—বিনোদবাবু "অস্তিমার" "আকুল আলিঙ্গন" "চুম্বন" "শিথার অধর" ইত্যাদি অনেক মাধুর্য্য সৃষ্টি করিয়াও কবিতাকে কবিতাপদবাচ্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

"টুকরী" শ্রীসুরেন্দ্র বর্মণ মহাশয়ের। সে দিন এই কবিরই বাসর-সংসারের সহিত কুম্ভ সংস্কারের উপমালঙ্কৃত সুন্দর কবিতাটী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি—এ কবিতায় মানব-হৃদয়ের সহিত ফলের উপমা। কাঁঠাল, নারিকেল ও আমের উপমা সুন্দর হইয়াছে। লিচু ও কুলের উপমা তেমন সরস হয় নাই। কবি নিজেকে জামের সহিত তুলিত করিয়াছেন—আমরা তাঁহাকে বুনো কষায়লেবুর মত সরস বলিয়া জানি এবং বুনো ওলের পক্ষে তিনি যে বাঘা তেঁতুলের রস ধরেন তাহাও আমাদের জানা আছে।

"আকুল আহ্বান"—শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়ের, কবির আকুল আহ্বান জননী বীণাপাণি এ কথাটিই শুনেন নাই।

শ্রী সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "গোপাল" কবিতাটী মন্দ হয় নাই। বালককে কাব্য হিসাবে বিচার করিতে হইলে 'অপটু' বলিতে হয়। এইরূপ দু' একটী কবিতার মাঝে মাঝে অপরাধের ছায়ার আভাস পাওয়া যায়।

"গান" ওঙ্কার নন্দরচিত—উল্লেখযোগ্য নহে।

"পল্লী-কুটীরে"—শ্রীসন্তোষচন্দ্র পালের। কবিতাটির রচনা ছন্দবিল ইত্যাদি হিসাবে অনবদ্য—ভাবের মাধুর্য্যও বেশ আছে। তবে সাধারণ নবীন কবিগণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি—এই কবিতাকে অবলম্বন করিয়াই সব কথা যাইতে পারে।

কবিতার আরম্ভটি এই—

তরুণ-তপন জাগিয়া তখনো ওঠেনি গগনকোলে
শুভ্র তরুণ তিমির তখনো তরুর তলে তলে

ইহা পড়িলে কি কবি কালিদাসের দুইটী কবিতার ছত্রকে মনে পড়ে না!

পল্লীবধূ—"না ফুটিতে প্রাচী লোহিত বরণ না জাগিতে সব পাখী"—

কুড়ানী—"পোহেঃ বিমল কুঁকুম ভীত,
তখনো ঘুমনি ভোর,
পূবের আকাশ হয়নিক লাল,
ঘাট ঘাট ঘোর ঘোর।"

"আকাশে বাতাসে তারে ডাকিবারে কণ্ঠে মৃদুগান।" অপর কবির—"আকাশে বাতাসে মাতাইয়া তারে নিমাইকণ্ঠে মধুর গান" পংক্তিটিকে মনে পড়ায়।

"কুলের গন্ধ"কে—"কুলের প্রীতি" বলাও নূতন নহে। "কুণ্ঠাজড়িত-কণ্ঠের" অনুপ্রাস বহুবার চোখে পড়িয়াছে। আঁধারের সহিত কেশের উপমা—সন্ধ্যার সহিত বালিকার উপমা—আশার সহিত পক্ষীর তুলনা—এ সকল বিন্দুমাত্র নূতনত্ব বা নবীনত্ব নাই।" তিমির সাগরে ডোবার আসা যায় তাতা পড়া" সজ্ঞোক্তসাথে একাধিকবার দৃষ্ট হইয়াছে।

"সহসা হিয়ার ফুল ফুলে আজ ঘটিল স্বপন ঘোর
বাঁশরীর রব বাজিল মধুর উদাস হৃদয়ে মোর—

• • • •

তাপিতের তরে কুটীর দুয়ার মুক্ত করেছ তুমি
ধন্য হইনু পরাণ আমার তোমার চরণ চুমি

• • • •

জননী গো, একি শান্তিগভীর নেমে এলো মোর বুকে
ধীরে ধীরে ধীরে ঘুমে আসে আঁখি আদরে সোহাগ সুখে

• • • •

কেহও গো, কভু ফিরেও চাহেনি কহেনি একটী কথা
তুমি স্নেহময়ি, অকূল বারে ঘুচাইলে সব ব্যথা
তোমার স্নেহের করপরশনে পুলকি উঠিছে কায়,
নমঃ, নমঃ, নমঃ পল্লীজননী প্রণতি তোমার পায়।"

এই সকল পংক্তির ঠিক অবিকল গঠন অন্য কবিতার ছত্র ত দেখি নাই—কিন্তু এগুলি পড়িলে মনে হয় এ সকল পংক্তি যেন কোথা পড়েছি। ইহার কারণ আর কিছু নহে—লেখকের নিজস্ব রচনাভঙ্গি নাই—পূর্ব্ব কবিগণের কবিতাবলী মুহুর্মুহুঃ পড়িয়া তাঁহাদের ভঙ্গি ও সুর তাঁহার লেখনীর সঙ্গে অজ্ঞাতসারে জড়াইয়া গিয়াছে। শুধু ভঙ্গি ও সঙ্গীতের সুর নহে—তাঁহাদেরই ব্যবহৃত ভাষাগুলিও অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়িয়াছে। সেইজন্যই বলি নবীন কবির পক্ষে আহরণী প্রবৃত্তি অপেক্ষা পরিবর্জ্জনী প্রবৃত্তির প্রয়োগ অধিক করা উচিত।

শব্দ কখনো পুরাতন হয় না এ কথা ঠিক কিন্তু এক

শব্দের সহিত একই বাক্যে বা পংক্তিতে একাধিক শব্দের সন্নিবেশ পূর্ব্বে একাধিক বার দৃষ্ট হইলে তাহা পরবর্ত্তী লেখকের পরিবর্জ্জন করা উচিত। শব্দের সহিত শব্দের নূতন নূতন যোগ ও সরস রচনা করিতে হইবে নতুবা তথায় নবীনতা দেখান যাইবে না।

"অপরাধী"—শ্রীকালিদাস রায় রচিত।

"লুকোলুকি"—না "লুকালোকি"? কবি নিজের ধারে 'লুকালোকি' করিয়াছেন।

"বৃষ্টি তোমার বজ্রশিখা ঘুরছে সারা বরষায়
আড়াল, গুহা গোপন বনবনে,
তীরে বিঁধা পাখী যেমন নীড়েও ফিরে মরে রয়
উপায় কোথা আছে পলায়নে?"

ইহার তৃতীয় পংক্তিতে বাক্যবিন্যাসের দোষ হইয়াছে। উপমার জন্য "যেমন" দিয়াছেন—কিন্তু "তেমন" কই? 'যেমন ঘরেই' একটা 'তেমন চাই'। ৪র্থ পংক্তির ভাব ও ছন্দ। এখানে 'যেমন' কথাটি না দিলে পংক্তিটী নির্দ্দোষ হইত।

শ্রীকেদারমোহন সেনের—"উর্ম্মিলা"—কবিতাটির আখ্যান-বস্তু সুন্দর কবিত্বোদ্দীপক। তার পর লেখক কবিগুরুর "কাব্যের উপেক্ষিতা" পাঠে লিখিতেছেন—এজন্য যদি কবিতাটি সুন্দর হওয়া উচিত ছিল।

কবিতার প্রথমে বাল্মীকিকে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং আদিকবিকে আহ্বান করিয়া তাঁহার মহিমা ও মর্য্যাদার উপযোগী সম্ভাষণ না করিয়াই কবি উর্ম্মিলাকে সম্বোধন করিয়াছেন। তবু ৬ষ্ঠ শ্লোকটি সুরচিত হইয়াছে—তাহাতেও "প্রেমাক্ষ নির্ম্মাল্যখানি" কণ্টকসম কর্ণে বিঁধিতেছে। কমলে কানন উজ্জ্বল কিরূপে হইবে? সরোবরের উজ্জ্বল হইবার কথা। 'বনানী' শব্দ কবি কোথায় পেলেন? সভার জন্য সম্ভবেদনায় 'বেদিকা' বলা সঙ্গত হয় নাই। সভার জন্য বালকবৃন্দের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। Hybrid "সরসবতা" শব্দ।

শ্রীযুতী মনোরমা দেবীর "নিবেদন" মনোরম হয় নাই।

"পল্লীবিপ্লব"—শ্রীগোবিন্দলাল বৈরাগ্যের শোকশোক অনশন নগরা বস্তা আরো শত সহস্র আধিব্যাধির দ্বারা দেশ জর্জ্জরিত। দেশের দুঃখ দুর্দ্দৈব মোচনের চেষ্টা না করিয়া যে সকল সাহিত্যসেবী ও দেশনেতারা তথাকথিত রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক ও সাহিত্যিক সমস্যা লইয়া ব্যস্ত তাঁহাদিগকে নবীন কবি এই কবিতায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ব্যঙ্গটি সুপ্রযুক্ত হইয়াছে—কবিতা সুরচিত হইয়াছে—কিন্তু দীন পল্লীকবির দারুণ মর্ম্মবেদনাসঞ্জাত ব্যথানিবেদন কি মহামান্য দেশনেতৃবৃন্দের শ্রবণে পৌঁছিবে? তাঁহারা নগরেরই মাতব্বর-গাংবা পল্লীর কি কোনো সন্ধান রাখেন? তাঁহাদিগকে কিছুতেই আমরা দেশনায়ক বলিতে পারি না। তাঁহারা বলিবেন—"দেশের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য আমরা দিল্লী সিমলা বোম্বে লাহোর ছুটাছুটি করিতেছি।" কিন্তু তাঁহারা কি যেন শ্মশান হইয়া গেলে তার পর মৃত ও প্রেতগণের জন্য সুখসৌভাগ্যের ব্যবস্থা করিবেন? যাহা আশুপ্রতিকার্য্য তাহার ব্যবস্থা না করিয়া সুদূরবিস্তারের জন্য আয়োজন করা কি সুস্থ মস্তিষ্কের কার্য্য? তাঁহারা যে সকল সমস্যা লইয়া নিয়ত বিব্রত তাহারও যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে—তবে চোখের সামনে যখন শত শত কণ্ঠ "জল জল" করিয়া চীৎকার করিতেছে—তখন কূপ সরোবর খননের আয়োজন করিলে তাহাদের তৃষ্ণা কিরূপে মিটিবে?

এই যে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস অনাহারে বিনা চিকিৎসায় পথের ভিখারীর মত যারা গেল—কই? সাহিত্যরথীগণ তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়াছেন? তিনি ত আনুকূল্যের জন্য প্রার্থনার ত্রুটী করেন নাই। আজ কাল যা লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের গৃহেই ত বঙ্গসরস্বতী বিরাজ করিতেছেন—যাঁহাদিগকে তাঁহারা স্বর্ণগর্দ্দভ বলিয়া উপহাস করেন তাঁহারা সাহায্য না করুন উক্ত জননীর অনুগৃহীত ব্যক্তিগণও ত তাঁহার দুঃখ মোচন করিলেন না। স্বর্গগত কাঙ্গাল কবির জীবনের সকল কথা স্মরণ করিতে গেলে বঙ্গের অনেক সাহিত্য রথীর প্রতি ঘৃণা জন্মে।

দেশের নায়করা আজ কাল সকলেই হইয়াছেন স্বদেশ-সিন্ধু। তাঁহারা যাহা কিছু করেন সবই স্বদেশের জন্য—মায়ের জন্য। দেশের জন্য তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে না। তাহা যদি কাঁদিত তাহা হইলে তাঁহারা দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লীবাসিগণের জন্য কিছু না কিছু ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহাদের কেহ কি বঙ্গের পল্লীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা নিজ চক্ষে দেখিবার জন্য একবার পল্লীগ্রামে গিয়াছেন? স্পর্শবিষের ভয়ে তাঁহারা দার্জ্জিলিং পুরী দেওঘর সিমলায় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। স্বচক্ষে না দেখিলে পল্লীর দুর্দ্দশা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না—সংবাদপত্র পাঠ আর উপন্যাস পাঠ এই-ই সমান।

গ্রাহকগণ মরিয়া গেলে সংবাদপত্র কেমন করিয়া চলিবে? প্রজাগণ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলে জমিদার কোথা রাজস্ব করিবেন? শিল্পজীবী শ্রমজীবী কৃষক নাবিকগণ ধরাধাম হইতে সরিয়া গেলে তাঁহারাই বা কিরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবেন? এ সব কথা কি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন?

পঙ্কজ।

LIBRARY
Book No.
CALCUTTA UNIVERSITY

উপাসনা

১৫ বর্ষ। | পৌষ, মাঘ—১৩২৫ | ৯-১০ম সংখ্যা।

সাহিত্যে ভাব-বিপর্য্যয়

• • • রাজার ও রাজ্যের মঙ্গলার্থ রাজভক্ত ভারত তাহার দেহের শেষ শোণিতবিন্দু পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলে স্বর্গে ভগবানের আসন নড়িয়া উঠে বলিয়া যে দেশের বিশ্বাস; দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারে সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত অভিসম্পাতে যে দেশে কাব্যের সৃষ্টি; সে দেশের লোক অত্যাচার-প্রপীড়িত ভূমণ্ডলের উদ্ধার-সাধনের জন্য যে প্রাণপণে যত্ন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে! এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় ভারত যে তাহার বর্ম্মপ্রাণতার চিরপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় আনন্দে ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাস্তবিকই গত চারি বৎসরের কথা স্মরণপথে উদিত হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সুরম্য সৌধমালা-পরিশোভিত আনন্দমুখর জনপদের তলদেশে লোক-চক্ষুর অন্তরালে আগ্নেয়গিরির যে ভীষণ আলোড়ন আস্ফালন চলিতেছিল, তাহা কে জানিত? শত শত বৎসর ধরিয়া যে সম্পদ, যে সৌন্দর্য্য, যে অমূল্য জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত হইতেছিল, কে জানিত, তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া ভাসাইয়া দিবার জন্য উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গের সহিত অনলাম্বুধি অতর্কিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইবে? ইয়োরোপের এত সভ্যতা, এত বিদ্যা, এত শিক্ষা—যাহার আদর্শে আমরা আমাদের জীবন গঠন করিবার জন্য ব্যগ্র—তাহার ভিতরে এত বিষ, এত দাহ, এত উন্মত্ততা! ইহা স্বহস্তে যাহা গঠন করে, অব্যবস্থিতচিত্ত বালকের ন্যায় এক দিনের খেয়ালে তাহাই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করে। এ সভ্যতা—এ শিক্ষার সার্থকতা কি? এই প্রশ্নই তখন আমাদের মনে স্বতঃ উদিত হইয়া থাকে।

এই প্রশ্নের সহিত আমাদের সাহিত্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সাহিত্যের আদর্শ লইয়া এখন আমাদের মধ্যে যথা আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভারতীয় অর্থাৎ আর্য্য-সাহিত্যের আদর্শ—ত্যাগ, সংযম—ভোগবিলাস নহে: পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Pessimistic বা দুঃখবাদের সাহিত্য বলিয়া আমাদের সাহিত্যের অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুকরণে আমাদের দেশেরও এক সম্প্রদায় লেখক এখন এই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু য়ুরোপ যাহাকে Pessimism বলে, আমাদের সাহিত্যের

আদর্শ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের সাহিত্য সুখের বা ভোগের বিরোধী নহে; তবে শাস্ত্র ভোগেও সংযত হইবার উপদেশ দিয়াছেন, বহুধা ভোগের পরিণামে বিষময় হইয়া উঠে।

আমাদের কবি ও শাস্ত্রকারগণ স্থায়ী সুখলাভের জন্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভোগ কর—কিন্তু সংযত ও নিষ্কাম হইয়া। তাহার ফলে অনন্ত সুখ ও শান্তির অধিকারী হইবে। আমাদের ধরণীর অধীশ্বর, প্রয়োজন হইলে, অন্তঃপুরের বনে বনে গোচারণ করিতে পারিতেন; মর্ম্মর-প্রাসাদে হগ্ধফেননিভ কোমল শয়ন ত্যাগ করিয়া ধরিত্রী উটজে তৃণ-শয়নে নিশাযাপন করিতে পারিতেন। আর্য্য-শাস্ত্রকার ধরণীকার সৃষ্টি করিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত পথিককে ধ্বংসের পথে লইয়া যান না। তিনি তাহাদের প্রকৃত সুখের অনন্ত ভাণ্ডার-সমুদ্রের সন্ধান বলিয়া দেন। সেই ভাণ্ডার-সমুদ্রে উপস্থিত হইতে হইলে বহু প্রলোভন, বাধা বিঘ্ন এড়াইতে হইবে; কিন্তু ভোগবাদ ঐহিকতা-প্রধান (materialistic) ইহকাল-সর্ব্বস্ব য়ুরোপের আদর্শ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা জীবন-সুধার সমস্ত পাত্র করিবেন, ভোগের কণামাত্রও বাদ দিবেন না। তাঁহাদের কথা—"আমি যা চাই, তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে লুটব, দুই পায়ে ক'রে দলব। সমস্ত প্রাণে তা খাব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব।"

এই উৎকট ভোগপ্রচারের ফল য়ুরোপ হাতে হাতে পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপে যে কোনও আন্দোলনের সূচনা হয়, আমাদের দেশে তাহারই সমর্থন করিয়া একদল লোক আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন, এবং ক্রমশঃ পরতঃ তাহারই প্রচারকল্পে বদ্ধপরিকর হন। য়ুরোপীয় সমাজে ঐ আন্দোলনের ফলাফলের প্রতীক্ষা করিবার ধৈর্য্য তাঁহাদের থাকে না। দেশের সুমতি ইহারা তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই দেখিয়া যাইতে উৎসুক। কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কত চিন্তা কত ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে! তাহাদের কতকগুলি স্রোতের অবস্থায় স্তব্ধ হইয়া রহিয়া পড়িয়া গিয়াছে; কতকগুলি ছুটিতে ছুটিতে প্রতিকূল অবস্থায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কতকগুলি আবার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। যে গুলিকে এক সময়ে পৃথিবীর লোক চিন্তা বা ভাবের চরমোৎকর্ষ বলিয়া মনে করিয়াছিল, কালে তাহাদেরই উচ্ছেদের জন্য কত শত চেষ্টা হইয়াছে। অতএব, পুরাতন হইলেই যেমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, এমন নহে, সেইরূপ নূতন হইলেই যে তাহা সর্ব্বথা গ্রহণীয়, এমনও হইতে পারে না। বরং পুরাতনের যে সব গুণ অনেক দিনের পরীক্ষিত বলিয়া উহার পক্ষে বিপক্ষে দুই একটি কথা বলিতে পারা যায়; কিন্তু একেবারে অপরিচিত নূতনকে—সম্পূর্ণ অপরিচিত অতিথির ন্যায় কতকটা সন্দেহের চক্ষে দেখা আমাদের স্বভাব। তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি না, কি জানি যদি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে ছুরিকা লুক্কায়িত থাকে। এই সন্দেহ, সন্দেহের জন্য যাঁহারা আমাদিগকে উপহাস করেন, করুন; কিন্তু ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

য়ুরোপের এক একটা নূতন মতবাদ গ্রহণ করিতে আমাদের সন্দেহ সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে কি না, তাহা সেই সকল মতের একটু আলোচনা করিলেই উপলব্ধি হইবে। আজকাল য়ুরোপীয় সাহিত্যে নীট্‌সে ও ইব্‌সেনের মতের খুব আলোচনা হইতেছে। যে অতিমানুষবাদ (Superman) এখন প্রত্যক্ষভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, নীট্‌সে সেই মতের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে "feminist movement"ও খুব প্রবল হইয়াছে। ইব্‌সেন সেই আন্দোলনের একজন প্রধান সহায়। নীট্‌সে ও তৎসম্প্রদায়ের মত আধুনিক জর্ম্মাণ সাম্রাজ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং মত সর্ব্বধ্বংসী যুদ্ধের জন্য ইহারা বহুল পরিমাণে দায়ী। আমরা আমাদের উক্তির সমর্থনার্থ এই মতের একটু আলোচনা করিব।

নীট্‌সের মতের সারাংশ এই—আজ পর্য্যন্ত মনুষ্য-জাতি জীবন যাপন করিতেছে, তাহা একেবারে উদ্দেশ্যহীন।

করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্য হইতেছে—Superman বা 'অতিমানুষ' জাতির সৃষ্টি; অর্থাৎ এই মনুষ্যজাতি সংঘাতি সহকারে যাহাকে এক শ্রেষ্ঠতম জীবে পরিণত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে। যে ধর্ম, যে রাজনীতি বা সমাজনীতি, ইহাদের মতে, এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিকূল, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। জগতে কেবল শক্তিশালী লোকেরই প্রয়োজন; কারণ এই সকল শক্তিশালী লোক হইতেই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতশক্তি জাতির সৃষ্টি হইয়া সুদূর ভবিষ্যতে "অতিমানব" জাতির সৃষ্টি সম্ভবপর হইবে।

নীৎশের নীতিশাস্ত্রে দয়াধর্ম্মের স্থান নাই। কারণ দৌর্ব্বল্য ও দুর্ব্বলতা হইতেই দয়ার সৃষ্টি। দয়া মানুষকে শক্তিহীন করে। নীৎশের নিজের কথা এই—

"Pity is opposed to the tonic passions which enhance the energy of the feeling of life, its action is depressing. A man loses power when he pities. On the whole, pity thwarts the law of development which is the law of selection. It preserves that which is ripe for death, it fights in favour of the disinherited and the condemned of life. By multiplying misery quite as much as by preserving all that is miserable, it is the principal agent in promoting decadence."

অর্থাৎ দুর্ব্বলের উপরেই লোকে দয়া করিয়া থাকে। যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা জগতের আবর্জ্জনা; তাহারা জগতে 'disinherited', অর্থাৎ সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত এবং condemned অর্থাৎ ঘৃণ্য। তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে কেবল দুঃখদৈন্যের ভার বর্দ্ধিত করা হয় তাহাতে মানবজাতির অবনতিই ঘটিবে, জগৎ superman এর দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতএব দুর্ব্বলের প্রতি দয়া প্রকাশ অতি অন্যায় কার্য্য।

আবার—

"The weak and the botched shall perish; first principle of our humanity. And they ought even to be helped to perish".

অর্থাৎ দুর্ব্বল লোকদিগকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যজাতির নীতিশাস্ত্রের প্রথম মূলসূত্র। ইহারা যাহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহার সুবিধা পর্য্যন্ত করিয়া দিতে হইবে। এই সকল কথা ডারউইনের যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনবাদের (Survival of the fittest) প্রতিধ্বনিমাত্র। ডিমিত বর্ত্তমান সভ্যসমাজে অযোগ্য, পীড়িত, রুগ্ন মানবের রক্ষার্থ বিজ্ঞানের চেষ্টা মানবজাতির উন্নতির পরিপন্থী—এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজীগিষা, রণপ্রিয়তা—ইহাই নীৎশের মতে উন্নত মনুষ্যজাতির বিশেষত্ব।

"War and courage have done more great things than charity. What is the good? Ye ask. To be brave is good. Live your life of obedience and of war".

যাহারা জর্ম্মান্ সেনানী Bernhardi প্রণীত "Germany and the next war" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে নীৎশের কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। Bernhardi লিখিয়াছিলেন—

"War is a biological necessity, an indispensable regulator in the life of mankind, failing which would result a course of evolution deleterious to the species, and, too, utterly antagonistic to all culture. War, said Heraclitus, is the father of all things. Without war, inferior or demoralised races would only too easily swamp the healthy and vital ones, and a general decadence would be the consequence. War is one of the essential factors of morality. If circumstances require, it is not only the right but the moral and political duty of a statesman to bring about a war."

সেই একই কথা। অর্থাৎ যুদ্ধে মনুষ্যজাতির যাহারা দুর্ব্বল, অক্ষম, আবর্জ্জনাস্বরূপ, যুদ্ধ ঘটিলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া জাতির সারাংশটুকুই অবশিষ্ট থাকে।

অতএব খুব সংযতচিত্ত হওয়া রাজনীতিকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

এই শিক্ষার ফলেই আমাদের দুর্বল বেনজিমনকে পদদলিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই।

ধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য—এ সমস্তই নীট্‌শের মতে পুরোহিতদের একটা অন্যায় বিদ্যা চাতুরী—

"All lies through and through, without a shred of psychological reality—a vampirism of pale subterranean leeches! Sin was invented in order to make science, culture, and every elevation and noble trait in man quite impossible; by means of the invention of Sin the priest is able to rule".

ঈশ্বর সম্বন্ধে নীট্‌শের মত পূর্ব্ববর্ত্তী মত সকলেরই অনুরূপ। তিনি বলেন—

"An omniscient and omnipotent God who does not even take care that his intentions shall be understood by his creatures could he be a god of goodness? A God, who for thousands of years has permitted innumerable doubts and scruples to continue unchecked as if they were of no importance in the salvation of mankind, and who, nevertheless, announces the most dreadful consequences for any one who mistakes his truth,—would he not be a cruel God, if being himself in possession of the truth, he could calmly contemplate mankind, in a state of miserable torment, worrying its mind as to what was truth?"

বিবাহ সম্বন্ধে নীট্‌শের মত—ভবিষ্যতে বিবাহের উচ্ছেদ হইবে—এক নূতন জাতির সৃষ্টি করা। এ মত "concubinage" প্রথার প্রচলনের প্রয়োজন হইতে পারে। "Wife" ও "concubine"এর দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কারণ—

"If, on the ground of his health, the wife is also to serve for the sole satisfaction of the man's sexual needs, a wrong perspective opposed to the aims indicated, will have most influence in the choice of a wife".

নীট্‌শে, এমন কি, "Trial marriage" বা "Leasehold marriage"এরও পক্ষপাতী ছিলেন। কিছুকাল একত্র বাস করিয়া যদি অসুবিধা বলে হয়, উভয় পক্ষ সে বিবাহ বাতিল করিতে পারেন।

আবার সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধেও সমাজকে কঠোর বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এমন কি স্বল-বিশেষে বন্ধ্যাত্ব-সম্পাদনও সমাজের কর্ত্তব্য হইবে।—

"Society, as the trustee of life, is responsible for every botched life before it comes into existence, and as society has to suffer for such lives it ought, consequently, to be made impossible for them ever to see the light of day. Society should in many cases actually prevent the act of procreation and may, without any regard for rank, descent, or intellect, hold in readiness the most rigorous forms of compulsion and restriction, and, under certain circumstances, have recourse to sterilisation."

মহাভারতের ও চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের পাঠক অল্পশক্তির অভিবৃদ্ধির দিনে এই সকল ভাবহ অনার্যজুষ্ট মতবাদের সুস্পষ্ট আভাস অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সেই সকল মতবাদেরই পরিণতি। এই অনর্থকর মতবাদের সহিত আমাদের প্রত্নচর্য্যা-ব্যবহার তুলনা করুন। সে উপদেশ কি পবিত্র ও মহান্! এই তুলনা হইতে, আর্য্য সভ্যতার মহত্ত্ব সহজেই উপলব্ধ হইবে; আর উপলব্ধ হইবে যে, আমরা অন্ধের ন্যায় কাচন ত্যাগ করিয়া কাচের সমাদর করিতেছি।

এই সমস্ত ভাব সমাজের কিরূপ অনিষ্টকর, তাহা আধুনিক "Bolshevism"এর দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইতেছে। Bolsheviksরা বিবাহ-পদ্ধতি উঠাইয়া দিয়া "nationalisation of women", অর্থাৎ, স্ত্রীসাধারণকেই সাধারণের সম্পত্তি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

ইব্‌সেনের নাটকগুলির সার মর্ম্ম এই যে, সমাজ স্ত্রীলোকদিগকে এমনই চাপিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা পুরুষের হস্তে ক্রীড়নকের ন্যায় হইয়া আছে,—ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনে একেবারেই সমর্থ নহে।

আমাদের আধুনিক এক শ্রেণীর সাহিত্যে পূর্ব্বাপর এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়;—

"সমস্ত সমাজ চারিদিক্ থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে যেন ছোট ক'রে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। তারা ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়া খেলছে—স্বামী পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে।"

ইব্‌সেনের Doll's Houseএর প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে Millএর Subjection of Women প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই "নারীজাতির উদ্ধার বিষয়ে আন্দোলন দিন দিন শক্তিসঞ্চার করিতে থাকে। ইহার ফলস্বরূপ বিলাতে suffragettesদের বিদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতার কথা সকলেই অবগত আছেন।

আমাদের সমাজ, আমাদের শাস্ত্র, নারীজাতির শত্রু। আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি সমুদায় নারীজাতিকে পাষাণপিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এবং তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গল্পে, গানে, কবিতায় এই কথারই প্রচার করা ও সেই সঙ্গে হিন্দুসমাজের, হিন্দুশাস্ত্রের ও সেই শাস্ত্রপ্রণেতা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা, উপহাস প্রভৃতি করা এক সম্প্রদায় লেখকের 'কর্ত্তব্য' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইঁহাদের কথা মানিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে, যে স্ত্রীলোকেরা রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য লজ্জা, শিষ্টাচার প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া প্রকাশ্য রাজপথে দাঙ্গাহাঙ্গামা করে, লোকের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব অত্যাচার করে, তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ হইয়াছে, বা তাহারা সেই পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে; আর সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, রাণী ভবানী, অহল্যা বাঈ প্রভৃতি নারীগণের জন্য সঙ্কীর্ণ ও শাস্ত্রবিধিত আচার-পালনে নিষ্পিষ্ট হইয়া বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছে। ইঁহারা এ কথা স্বীকার করেন, করুন; কিন্তু আমরা সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি নারীগণকে চিরকাল দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিয়াছি, এবং এখনও পূজা করিব। কারণ, আমরা ত্যাগীর পূজা করি, ভোগবিলাসীর নহে।

পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কি নারীর ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রধান সহায়? আমরা তাহা মনে করি না। আমাদের সমাজে নারী—জননী, পত্নী, এমন কি, সর্ব্বস্বহীনা বিধবা রূপেও ত্যাগের যে মহান্ আদর্শ প্রত্যহ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রহিয়াছেন, তাহার নিকট অন্য সমস্ত আদর্শই নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

য়ুরোপীয়েরা নিজেদের আচার ব্যবহার প্রভৃতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা আমাদিগকে বুঝিতে পারেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করেন না। এরূপ অবস্থায় বহুমূল সংস্কার লইয়া একদেশদর্শী য়ুরোপ যদি আমাদিগকে নারীশত্রুক বলেন, তাহা হইলে আমরা তাহাই কেবাকা মনে করিয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইব কি? আমাদের শাস্ত্র কখনও নারীশত্রুক নহে। যে শাস্ত্র বলেন—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রম্যন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥"

সে শাস্ত্র কখনও নারীশত্রুক নহে।

একেবারে দোষস্পর্শ-শূন্য সমাজ কখনও ছিল না, কোথাও নাই, এবং কোনও স্বরাজ্যে সম্ভব হইলেও বাস্তবজগতে পরিলক্ষিত হইবে না। এক অনর্থের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে, অন্য অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, সন্তানজনন প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কার করিতে যাইয়া তথাকথিত য়ুরোপীয় সমাজ-সংস্কারকেরা কত বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অতএব সংস্কারকের দায়িত্ব কত গুরুতর, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

তবে কি সংস্কারের কোনও প্রয়োজন নাই? নিশ্চয়ই আছে। সংস্কার হইয়াছে, হইতেছে, হইবে। কিন্তু সেই সংস্কার আমাদের জাতীয়তা, আমাদের দেশকালগত আদর্শের অনুরূপ হওয়া চাই। নচেৎ, তাহা কখনও সুফলপ্রসূ হইবে না।

এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাব হইতে সমাজে একটা প্রবল অশান্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; ইহার ফল অনেক সময় অতি ভীষণ হইয়া থাকে। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে Sir John Woodroffe, Sir George Birdwoodএর মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাহা এই—

"It has destroyed in Indians the love of their own literature, the quickening soul of a people, and their delight in their own arts, and worst of all their repose in their own traditional and national religion, has disgusted them with their own homes, their parents, and their sisters, their very wives, and brought discontent into every family so far as its baneful influences have reached."

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যিকেরা উচ্ছৃঙ্খল য়ুরোপীয় ভাবের প্রবর্ত্তন দ্বারা এই অনিষ্টের মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। কয়েক জন বর্ণনাকুশল লেখক তাঁহাদের প্রবাহিতে কুলত্রই নারীগণের চরিত্র এমনই চিত্তাকর্ষকভাবে চিত্রিত করিতেছেন যে, অনেক অপরিণতবয়স্ক পাঠক-পাঠিকা তাহা পাঠ করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এ সাহিত্য চিরস্থায়ী হইবে, সে আশা অনেকের নাই। কিন্তু উহার অস্থায়ী জীবিতকালের মধ্যে উহা দ্বারা যে কত বৃহৎ অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপ সাহিত্য সাহিত্য-কাননের আবর্জ্জনামাত্র। ইহার উচ্ছেদসাধনে সমাজ ও সাহিত্যের মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে য়ুরোপীয় ভাবে পুষ্ট হইতেছে, সংক্ষেপে তাহার প্রকৃতির আলোচনা করিলাম। আমি বলিয়াছি, আমরা দেশের মঙ্গলের পরিপন্থী নহি। আমরাও সংস্কারের পক্ষপাতী। তবে আমাদের মঙ্গলোদ্ধার বা সংস্কারের মূলে অতীতের প্রতি অবজ্ঞা, শাস্ত্রের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ নাই। আমরা যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার গর্ব্ব করি, তাহার মূল ধর্ম্মশাস্ত্র। সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই আমাদের জাতীয়তার অপূর্ব্ব ধর্ম্মসৌধ যুগযুগান্তর ধরিয়া, অরাতির আক্রমণ পরম্পরা ব্যর্থ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; যাহা দেখিয়া য়ুরোপীয়গণও বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন যে, "They have survived in a way, and to a degree, which is not seen in the case of any other country in the world." অর্থাৎ, বিশ্বের এই সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আপনাদের অস্তিত্ব যেমন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এমন আর পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। সেই গৌরবের সংস্কারে আমরা ইহকাল সর্ব্বস্ব, অস্থিরচিত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মুখাপেক্ষী হইব কেন? যে দেশে এ বিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে, সে দেশে ইহার সংস্কারের উপাদান নাই, ইহা কি সম্ভব? একান্ত প্রয়োজন হইলে বিদেশ হইতে সাহায্য লইব, কিন্তু তাহাদের আদর্শ লইব না। তাহা করিলে আমাদের জাতীয়তা বিলুপ্ত হইবে।

সুখের বিষয়, গত যুদ্ধে য়ুরোপের চক্ষু কিয়ৎপরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে। ইহাতে আশা করা যায়, আমাদের দেশেও অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইবে। আমাদের উচ্চ উদার আদর্শের অনুসরণ করিয়া, অধ্যবসায় ও সাধনার বলে, আমরা আবার উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া জগতে পরিচয় দিতে পারিব—"অমৃতস্য পুত্রা বয়ম্" আমাদের সাহিত্য সেই আদর্শের অনাবিল উৎসস্বরূপ হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত দৈন্য-দারিদ্র্য, ক্লেদ-কলুষ বিধৌত করিয়া দিবে। ভগবৎ সমীপে ইহাই আমার প্রার্থনা। কারণ—

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"*

শ্রীবসন্তকুমার মল্লিক

* গত ১৯শে মাঘ সাহিত্যসভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

সর্ব্বজাতি-মণ্ডল

"উপাসনা" পূর্ণে হিন্দুর সমাজের ও রাষ্ট্রের আদর্শ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নারায়ণের বিরাট শরীরের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সমাজদেহের প্রতি অঙ্গে যেরূপ নারায়ণের প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া সমাজের প্রত্যেক বিভাগকে পরস্পরের ও সমূহের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছে সেরূপ তাঁহারই বিরাট প্রাণ বিভিন্ন জাতিমণ্ডলকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেকের ও সকলের স্বধর্ম্মের ও বিশ্বধর্ম্মের বিকাশ সাধনের দ্বারা বিশ্বমানবের ও বিচিত্র জাতি সমূহের কল্যাণ নির্ণয় করিয়াছে।

হিন্দুর এই মহৎ কল্পনা সেই মহাভারতীয় যুগের। সেই কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে আধুনিক কাল ও পাত্র-ভেদে আবৃত্তি করিয়াছিলাম। আমরা এইখানে উহার পুনঃ সঙ্কলন করিতেছি।

মহাভারতের এক পর্ব্ব

কাল—বর্ত্তমান

স্থান—পাশ্চাত্য জগৎ

অধ্যায়—স্ত্রী-বিলাপ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মচারিণী পতিপরায়ণা গান্ধারী মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রদত্ত বরপ্রভাবে দিব্যচক্ষুদ্বারা রণস্থল অবলোকন করিয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রধানতঃ নারীগণের রোদনশব্দে বাধিত হইয়া তিনি বধূসূদনকে করুণ বচনে কহিলেন, বৎস, ঐ দেখ, আমার বধূগণ অনাথা হইয়া আলুলায়িতকেশে কুররীগণের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তোমার নিকট আগমনপূর্ব্বক স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতৃ ও ভ্রাতৃগণকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের মৃত-দেহের নিকট ধাবমান হইতেছে। আহা, পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ যে সকল বীরের সমীপে সদা সমুপস্থিত থাকিতেন, এক্ষণে গৃধ্রসকল তাঁহাদের সমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে পরিচারকেরা যাঁহাদিগকে বেদধ্বনিযুক্ত ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, অদ্য বিহঙ্গমেরা সেই বীরকে পক্ষপুট দ্বারা বীজন করিতেছে। এই দেখ, মহিলাগণ বীরগণের মস্তকশূন্য দেহ ও দেহশূন্য মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছে। কোন কোন রমণী এক বীরের দেহে অন্য বীরের মস্তক যোজনা করিয়া, "হায়! তোমার মস্তক কাহার স্কন্ধে যোজিত করিলাম" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। কতকগুলি নারী পশুপক্ষীর নখদন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নমস্তক ভর্ত্তৃগণকে সন্দর্শন করিয়াও আপনার পতি জ্ঞান হইতে সমর্থ হইতেছে না। হা কি কষ্ট, ঐ দেখ, কোন কোন মহিলা বীরগণের দেহের কোন কোন অংশ না দেখিয়া শোকভর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইতস্ততঃ রণভূমিময় ক্রতপদে বিচরণ করিতেছে।

কাল—ভবিষ্যৎ

স্থান—নূতন ভারত

অধ্যায়—অনুগীতা

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্, পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধের পর জগতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে মহারাজ বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ইহারা কি করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ, পাণ্ডবগণের অশ্বমেধের পর জগতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় কিছুকাল মহানন্দে জগতের প্রসিদ্ধ নগরী ও রাজধানীতে এবং ভারতীয় তীর্থস্থান সমূহে বিচরণ করিয়া পরিশেষে ইন্দ্র-প্রস্থ মহাসভায় উপবিষ্ট হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সৃষ্টিবৃত্তান্ত এবং ঋষি ও দেবতাদিগের বংশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,

বসুদেব, যুদ্ধকালে আমি তোমার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্ত্তিও নিরীক্ষণ করিয়াছি। তুমি পূর্ব্বে বন্ধুজনিবন্ধন আমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষে তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়াছি। তুমি অচিরাৎ দ্বারকায় গমন করিবে; অতএব এই সময় আমার নিকট পুনরায় তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে ভারত, তুমি আমার পরম প্রিয়, তোমার সহিত দ্বারকা হইতে আগত বহুজনসমাকীর্ণ সর্ব্বজাতীয় সভার উৎসবের মধ্যে বাস করিবার কথা দূরে থাকুক, ছর্দ্দিনে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, শ্মশানে অবস্থান করিলেও আমি পরম প্রীত হইয়া থাকি, এ কারণে আমি তোমার নিগূঢ় ধর্ম্মের বিষয় পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছি। কিন্তু তুমি অতি নির্দ্দোষ ও শ্রদ্ধাযুক্ত। যাহাই হউক, আমি পুনরায় তোমার নিকট সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিব।

পূর্ব্বে তোমায় আমি লোকক্ষয়কারী উগ্র কালস্বরূপ দেখাইয়াছি—এইবার আমার পালনকারী স্নিগ্ধ বিশ্বাত্মক পরম রূপ দেখাইতেছি।

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনের নিকট পুনরায় বিশ্বরূপ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এবারে এই বিশ্বরূপ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় ভীষণ নহে, তরুণবর্ণ অতি সৌম্য মহাসমুদ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ প্রশান্ত ও মনোরম।

অনন্তর সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া শ্রীঅর্জ্জুন হইয়া তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে ভগবন্, আপনার উদরে স্বর্গধাম, পৃথিবী, গগনতল বর্ত্তমান। কিন্তি জলাদি পঞ্চভূত ও নিখিল-জগতের একমাত্র আধার, সকলের আদি, সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর যে আপনি আপনাকে বারম্বার নমস্কার করিয়া আপনার দেহে রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, প্রজাপতিগণ, দেবর্ষিগণ অদিতি, নিতি ও সপ্তর্ষিগণ বর্ত্তমান। আপনি শীত, উষ্ণ ও বৃষ্টিরূপ ভিন্ন ভিন্নমূর্ত্তি সংবৎসরাত্মক কালচক্রকে বহন করিয়া শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার সৃষ্টি করিতেছেন। আপনি কর্ত্তা, উৎপত্তি, বিধি, অদৃষ্ট পদার্থ, বেদ, বিদ্যাৎ, ঐরাবৎ ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় ভূত।

জগৎগ্রহণ করিয়া আপনি সকল জাতির সকল লোককে পালন করিতেছেন। আপনি বিশ্বসংসারের একমাত্র রাজা; আপনি একাকী সকল লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আপনি বিশ্বসংসারের একমাত্র রাজা এবং আপনি একমাত্র প্রজা হইয়া আপনার ধর্ম্মপালন করিতেছেন। আপনি ধনের পুষ্টিকর্ত্তা ও একমাত্র বিজীগিষু। আপনি সংহারক, আপনি হন্তা। আপনি অন্নদাতা, বহুধারূপী ও ভীষণমূর্ত্তি। আবার আপনিই শান্তিদাতা, শান্তিরক্ষক, বহুধারূপী ও করুণমূর্ত্তি।

নিখিল জাতির সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন আপনার প্রিয়োপন। নিখিল লোকের বিভিন্ন মন্ত্র, স্তুতি, কীর্ত্তন, স্মরণ আপনার শ্রবণ। সর্ব্বলোকের যজ্ঞ ও নিখিল কল্যাণ-ধর্ম্ম আপনার অনুপম তনু। নিখিল লোকের শিষ্টাচার, রীতিনীতি, চারুশিল্পকলা আপনার অলঙ্কার। বিশ্বসংসারের কৃষিশিল্পবাণিজ্যব্যবসায় আপনার সর্ব্বদিক্‌বিস্তৃত হস্তপদ।

আপনি পৃথিবীর যাবতীয় জাতির নিকট বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র-রূপে আপনাকে প্রকটিত করিয়া প্রত্যেকের কার্য্য ও অকার্য্যের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। আপনি কাহারও নিকট হইতেছেন ব্রহ্মজ্ঞান, কাহারও নিকট হইতেছেন ক্ষত্রিয়বল, কাহারও নিকট বৈশ্যশক্তি। আপনাকে যে ভাবে যে জাতি ভজনা করে, তাহাকে আপনি সেই ভাবে অনুগ্রহ করেন, যেহেতু আপনাকে ছাড়িয়া অর্থ অথবা সৈন্যবলের ভজনা করিলেও তাহারা আপনারই ভজনমার্গ অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। আবার আপনিই সর্ব্বজাতিস্বরূপ হইয়া স্বতন্ত্র জাতির কার্য্য ও অকার্য্যের মধ্যে বিধে সুবমা-সামঞ্জস্য আনিতেছেন। যেরূপ সকল যন্ত্রের আপনিই স্রষ্টা, সেরূপ সকল যন্ত্র আপনাকেই সমাশ্রয় করিতেছে।

বহুনদী যেরূপ বিচিত্র পর্ব্বতপ্রদেশ, বনভূমি, নগর, গ্রাম অতিক্রম করিয়া সাগরসঙ্গমতীর্থে পৌঁছিয়া অনন্ত কল্লোল-গীতিতে আপনাদের হর্ষ জ্ঞাপন করে, সেরূপ বিভিন্ন জাতি তাহাদিগের বিচিত্র ভাবসম্পদ আপনাকে অর্পণ করিয়া পরম জ্ঞানানন্দ লাভ করে। আমি আজ আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত সর্ব্বজাতির সেই মহামিলনের বিপুল হর্ষগীত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইলাম। আপনি সপ্তস্বরের ভিতর দিয়া যেরূপ রাগ-

রাগিণীতে প্রকাশিত হন, সেরূপ নব নব বিভিন্ন জাতির বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়া বিশ্ববীণায় এক নিত্যমঙ্গল সুর রচনা করিতেছেন। আপনি এক একটি বিভিন্ন শঙ্খ, আপনি গান, আবার আপনিই গায়ক। যে শাশ্বত গায়ক, আমি বহুদিনের সেই গান শুনিয়া ধন্য হইলাম। সূর্য্যরূপে প্রতিদিন নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া আপনি যেরূপ কালবিভাগ করেন এবং আপনারই দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণ হইয়া থাকে, সেরূপ জগৎক্ষেত্রে আপনি সভ্যতা রূপে উদিত হন। আপনারই ক্রমবিকাশ ও অবনতি হইয়া থাকে। ইতিহাস আপনারই তির্য্যক্ ও সরল গতি কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আপনিই বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ।

প্রত্যেক সমাজে আপনি যেমন প্রত্যেক বর্ণ হইয়া পরস্পরের সহযোগে সমাজদেহের পূর্ণ উন্নতির লক্ষ্যে বর্ণ গুলিকে পরিচালিত করিতেছেন, সেরূপ বিরাট্ সর্ব্বজাতি-দেহের অন্তরে থাকিয়া আপনি অলক্ষ্যে সমুদয় জাতির স্বতন্ত্র চেষ্টার সাফল্য ও বিফলতার মধ্য দিয়া বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। যুদ্ধবিগ্রহ, শান্তি, সুশাসন, মাৎস্যন্যায়ের মধ্য দিয়া আপনি জাতিরূপে ধরাতলে মঙ্গল প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন। আপনিই জাতিরূপে, মনুষ্যরূপে, বিশ্বসংসাররূপে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছেন। আপনার বিরাট্ বিশ্বদেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কার্য্যনির্ব্বাহে আমি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের পরস্পর ও সমষ্টির কল্যাণবিধান নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইলাম।

জগতে যাহা প্রশস্ত, পবিত্র, শুভ, সুন্দর ও অসীম আপনি তৎসমুদয় স্বরূপ। সকলের অন্তরে থাকিয়া আপনি প্রত্যেকের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশী। আপনি মিলনের কর্ত্তা এবং আপনিই মিলনের একমাত্র সাক্ষী। আপনি সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন এবং সকল জাতির শিক্ষা, গঠন ও শাসনের অধিষ্ঠাতা হইয়া সকলকে স্বধর্ম্মে নিয়োজিত রাখিয়া আপনার বিরাট্ সত্য-শিব-সুন্দর বক্ষে নিরন্তর টানিয়া লইতেছেন। আপনি বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, বিশ্ব-সংহারক। আপনি বিশ্বদেব, আপনি জগন্নিবাস। আপনি অচিন্ত্যনীয়, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্পনা অকল্পনামাত্র।

আজ এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। জাতিতে জাতিতে অবিচ্ছিন্ন মৈত্রী স্থাপনের সুচেষ্টার সহিত অনুন্নত ও শিশু জাতি সমূহের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের যত্ন চলিতেছে।

সর্ব্বজাতিমণ্ডল একত্রে মিলিয়া অথবা কোন এক বিশিষ্ট জাতি ভার প্রাপ্ত হইয়া অনুন্নত জাতির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে; এই লইয়া বাদ-প্রতিবাদের যুদ্ধ চলিতেছে।

ম্যাণ্ডেট ও ইন্সিপ্টে একাধিক জাতির ভার গ্রহণের বিবরণ ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে। অপরদিকে সর্ব্বজাতি-মণ্ডল যদি কিছুরই ভার গ্রহণ করিবার অবসর না পায় তবে উহা যে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের মত বস্তুতন্ত্রহীন থাকিয়া যাইতে পারে, এই ভয়ও নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়।

যিনিই দায়িত্ব লউন না কেন, মোটামুটি বাধাবাধি নিয়ম এই শান্তি স্থাপনের সুযোগে সৃষ্ট না হইলে অনুন্নত ও অর্ব্বাচীন জাতিগণের শোষণ ভয়ানক আকার গ্রহণ করিবে।

বার্লিন ও ব্রুশেল্‌স্ কংগ্রেসদ্বয় উক্ত অনুন্নত জাতি সমূহের ব্যবহারে যে নিয়ম সূত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল সেই-গুলিকে আরও ব্যাপক, বিস্তৃত, ও সর্ব্ব সাধারণের সম্মতি ক্রমে গ্রহণ করিতে হইবে। আরও বিভিন্নদিকে অনুন্নত জাতি সমূহের রক্ষা কল্পে তাহাদের সমাজের শান্তি ও সুব্যবস্থার জন্য কয়েকটী নিয়ম সর্ব্বসম্মতিক্রমে সৃষ্টি ও পালন করা চাই। এবং সেই নিয়মগুলির লঙ্ঘনে শাস্তির ব্যবস্থা চাই।

প্রায় একমাস পূর্ব্বে মাঞ্চেষ্টার ও ট্রিচনপলীতে এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া আমি জগতের প্রীতিপ্রধান খণ্ডে অনুন্নত জাতি সমূহের রক্ষা ও বিকাশসাধন কল্পে যে সকল নিয়ম কানুন অবশ্য প্রতিপাল্য তাহাদের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলাম, এই স্থলে আমি তাহাদের কতকগুলি মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

সর্ব্ব-জাতি মণ্ডল বা বিশেষ ভার প্রাপ্ত কোন বিশিষ্ট জাতি বা জাতি সংঘ এই সকল নিয়ম কানুনের মর্য্যাদা যদি এখনও না বুঝে, তবে শাসনের সহিত শোষণের, সভ্যতার সহিত বর্ব্বরতার, বাণিজ্যের সহিত স্বার্থ সাধনের সম্বন্ধ লুপ্ত

হইবে না, এবং বিশ্বজগতে অবিচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপন সুদূর পরাহত হইবে।

যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য আমরা একে একে তাহার উল্লেখ মাত্র করিতেছি।

(১) প্রত্যেক অনুন্নত জাতির পক্ষে মদ্য বিক্রয় এবং মদ্যের ব্যবহার বিশেষরূপে কমাইয়া দিতে হইবে। এবং স্থানীয় মদ্য ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইবেন।

(শ্বেত বা কৃষ্ণকায় উভয় প্রকার ব্যক্তির প্রতি যৌন সম্বন্ধীয় কদাচারের জন্য আইন সমভাবে কার্য্য করিবে। এবং আরব দাস-ব্যবসায়ীদের শিকারীকার রীতিমত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) উপদংশ প্রভৃতি রোগের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মানুযায়ী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৪) কৃষি এবং খনির কার্য্যের জন্য কেবলমাত্র পুরুষশ্রমী গ্রহণ করিলে চলিবে না—স্ত্রীলোক এবং বালক-দিগকেও লওয়া চাই। স্ত্রীশ্রমজীবীর সংখ্যা পুরুষ শ্রম-জীবীর সহিত তুলনায় কম হওয়ার জন্যই নীল-কোকো চা-কফি প্রভৃতি চাষের ক্ষেত্রে এবং খনিতে নানারূপ ব্যভিচার এবং কদাচারের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(৫) আইনের চশমা চক্ষে দিয়া দেখিলে মনে হয় যে ক্রীতদাস প্রথা জগৎ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে এই হীন প্রথা এখনও সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। অনুন্নত জাতিদিগকে শ্বেতকায় মহাজনেরা যেরূপ নানাভাবে ঋণের জন্য এবং অন্যান্য কারণে ঘোর অবনতি করিয়া [illegible] আফ্রিকার বিভিন্নখণ্ডে খাটাইয়া থাকেন তাহা ক্রীতদাস প্রথার নামান্তর মাত্র। এই দুর্ব্যবহার দূর করিবার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন।

শ্রমজীবীর নিয়োগকালের চুক্তিতে যাহাতে অজ্ঞতা বা মূঢ়তার জন্য তাহারা অন্যায়ভাবে বিদেশ হইতে আনীত হইয়া শ্রম-আইন লঙ্ঘনের শাস্তি ভোগ না করে, তাহার প্রতিবিধান চাই। শ্রমজীবীদিগের বসতি নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ও সকলের অনুমোদিত আইন কানুন চাই।

(৬) গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে শ্বেতকায়গণ নানা প্রাকৃতিক কারণে চিরকাল বাস করিতে পারেন না। এই সকল স্থানে অক্ষেপবাসীদিগকে স্থানীয় কৃষিশিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আত্মোন্নতি লাভের সুযোগ এবং শিক্ষার জন্য উপযুক্ত আন্তর্জাতিক বিধান আবশ্যক।

(৭) জমির উপর আধিপত্য স্থাপনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় এবং জমি বিভাগ বিষয়ে অদূরদর্শিতায় অনেক স্থলে স্থানীয় লোককে বলপূর্ব্বক স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত এবং স্বাধিকারচ্যুত করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক দেশের লোকই স্ব স্ব সভ্যতার আদর্শে এবং দেশের প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জ ও রীতি-নীতি অনুসারে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিলে তাহাদের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় জমির উপর অধিকার এবং তাহাদের স্ব স্ব আদর্শের পরিবর্ত্তন বিষয়ে কঠিন আন্তর্জাতিক বিধান থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ যে সকল স্থানে শ্বেতকায়গণ প্রাকৃতিক কারণে চিরবসতি করিতে পারিবেন না, তথাকার জমিতে তাঁহাদের চিরস্থায়ী অধিকার থাকিতে পারিবে না। জমি গভর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিবে। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে কোনও শ্বেতকায় মহাজনকে কিছু জমি দিতে পারেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে দুটী সর্ত্ত করিতে হইবে। (১) সে জমিটীকে অকর্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না। (২) সময়মত বিজ্ঞাপন দিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহার নিকট হইতে যখন ইচ্ছা জমির অধিকার ফিরাইয়া লইতে পারেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই উপায় অবলম্বন করিলে শ্বেতকায়গণের তথায় চিরবসতি অসম্ভব হইবে অথচ তাঁহারা স্থানীয় লোকদিগকে কৃষি এবং অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে পারিবেন।

(৭) অনুন্নত জাতিদিগের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্যক প্রচার হওয়া চাই। সভ্য জাতিগণের মধ্যে যাহারা অনুন্নত জাতির শাসনের ভার লইবেন তাহাদিগকে সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ভার লইতেই হইবে।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

হৈমন্তকী

(১)

শরতের অবসানে
হেমন্তের হিমানী
ঘরে ঘরে ঢেলে দেছে
মরণের ঝিমানী।

(২)

ধব ধবে ধলা জামা
বাবু তারা সৌখীনে
নাই কোন ভেদাভেদ
কাল্‌সিটে কৌপীনে।

(৩)

অনাহারে ছেলে মেয়ে
জুড়ে দেছে কান্না
জননী যে বিছানায়
কেবা করে রান্না।

(৪)

কেবা কারে দেবে জল
কেবা সেবা করবে
সবে আছে ঘরে পড়ে
কেবা কারে ধরবে।

(৫)

মার কোলে ঘোরো ছেলে
বুকে পিঠে বেদনা
ক্ষণে কভু কেঁদে ওঠে
ক্ষণে নাই চেতনা।

(৬)

খৈ-কোটা তাপ গায়
যাতনায় কোঁকানি
নিমুনিয়া বুকে বসে
ঠেসে দেয় কোঁকানি।

(৭)

বাপ তার মাথা খুঁড়ে
কেঁদে কেটে ক্ষুণ্ণ
কোথা পাবে ডাক্তার
বাক্স যে শূন্য।

(৮)

খাঁচা ছাড়া প্রাণ পাখী
নাই তার উদ্দিশ
স্নেহে কাদা মাতা তবু
বুকে দেয় পুলটিশ।

(৯)

নিমুনিয়া দয়া করে
ছেঁড়ে দেন যাহারে
কলেরায় গলাটিপে
ধরে ফেলে তাহারে।

(১০)

দুই একবার বমি
তিন চার দাস্ত
টাঁসে হাতপায়ে ভেঙ্গে
গিলে খান আস্ত।

(১১)

"পালানেতে" স্থান নাই
কবরের ভিড়েতে
চিতা কাটিবার স্থান
নাই নদী তীরেতে।

(১২)

ছেড়ে গেছে প্রাণ প্রিয়
হাতে নাই শঙ্খ
চোখে ফোঁটা জল নাই
দেখি খালি অঙ্ক।

(১৩)

মাতা গেছে পিতা গেছে
নাই ভ্রাতা ভগ্নী
ঘরে ম'রে আছে কেহ
কেবা দেবে অগ্নি।

(১৪)

খা খা করে পোড়া কাক
সারা রাত ডাকেরে
কুকুরেরা কেঁদে মরে
দিবা শিবা হাঁকেরে।

(১৫)

দিনে মরি দশবার
ভরে আঁখি ঝরে গো
কেবা জানে কোন্ ক্ষণে
কার ডাক পড়ে গো।

শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্র।

হিউম-স্মৃতি

ভারতের জাতীয় মহাসমিতি বা Congressএর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, স্বদেশবৎসল ও ভারতহিতৈষী, কর্মবীর Allan Hume অনুমান ১৮৪৯ সালে ভারতে পদার্পণ করেন। কৃতজ্ঞতাভাজন Digby, Wedderbern, Cain, Cotton, প্রভৃতি খ্যাতনামা ইংরাজ ভারতবাসীর উন্নতিকল্পে যথোচিত চেষ্টা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু Allan Humeএর মধ্যে মাতৃভূমি অপেক্ষা ধাত্রীভূমির প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসার প্রাচুর্য্য দেখা যাইত। ভারতবাসীর জন্য প্রকৃতই তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তিনি একবার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন,—"India In which I have spent forty-five years of my life—India in which all the best and brightest, the worthiest and happiest days of my now waning life have been passed. Youth, manhood, age with all the dreams and hopes, their efforts failures and successes, good and evil fortune—all are inevitably bound up in India.—India that has become integral and the best part of me, myself, my thought, my hopes,—India and Indian people that with all their faults and failings I shall so dearly love". ভারতবাসীর জন্য নিঃস্বার্থভাবে আত্মদান তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল—এ বিষয় উল্লেখ করিয়া উক্ত বক্তৃতা-সভার সভাপতি মহাশয় ও মাননীয় Javerilal U. Yajink বলেন, "If self seeking had formed part of his nature, he would, I dare say, have returned a different man". ১৮৮৩ সালে মার্চ্চ মাসে Hume, স্বদেশ প্রত্যাগমনকালে, বোম্বাই সহরের Apollo Bunderএ তাঁহার শেষ কথাগুলি বলিয়া যান। বোম্বাই-এর প্রতিনিধিগণ Mehta, Wacha, Dharamsi, Chandravarkar প্রভৃতি Bombay Presidency Associationএর মুখপত্র স্বরূপ Framjee Cowasjee Instituteএ Humeএর বিদায়কালে তৎকালোপযোগী সম্মানপ্রদর্শনার্থে Humeকে আহ্বান ও নিমন্ত্রণ করেন। Hume কর্ত্তব্য-প্রসঙ্গে প্রত্যুত্তরে বলেন,—"Hundreds of others have served you and thousands of others will serve you and yours better and more to the purpose than fate has permitted me to do. To you my going is but an one dying star dropping from your firmament, in which thousands of brighter luminaries still shine. But to the poor lost star it means the end of all things, and when I think of this final parting from you, from India, from everything that for years has filled my heart, it seems as if all colour were fading out of life". উক্ত বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি আমাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা ও উপদেশ দেন। তাহার মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ কথা বলেন, "you can work at high pressure for a week, but to run at low pressure uniformly and unwearingly for a year, is beyond most of you." আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় উন্নতিসম্বন্ধে বিস্তার-রূপে অনেক কথা বলেন। তাঁহার রাজনীতিজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির কথা ভাবিলে তাঁহাকে প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ, আখ্যা প্রদানে না বলিয়া থাকা যায় না। "The day of democracies is opening out"—এই প্রকারের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার বক্তৃতায় আমরা প্রাপ্ত হই। তিনি বলেন, "All progress may for a time seem arrested." এ কথা যখন কথিত হইয়াছিল তখন

ভূমণ্ডলের কোন দেশে বা রাজ্যে কোন প্রকার রাজনৈতিক অসন্তোষের অভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং সমসাময়িক কালের অবস্থা ও রাজ্যসমূহের শাসনপ্রণালী ও ঐক্য (harmony) সত্ত্বেও এ কথা উল্লেখ করা কত কঠিনসাধ্য, পাঠক সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। তাহার উদ্বেগ রোধ করিতে না পারিয়া তিনি স্পষ্টই বলেন,—"A darker shadow yet broods, for all who have eyes to see, above us in the near distance—a shadow which when it emerges into manifestation will arrest all constitutional progress, not only in India, but even in great Britain itself. No greater calamity can befall the civilized world, and yet though one may prophesy its exact time of appearance, every thinking European politician feels, that it is already in the air." ভারতবর্ষ এবং Great Britain, এমন কি সমস্ত সভ্যজগতের সর্বনাশের জন্য যে এক ভীষণ শক্তি ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবে, তাহাকেই Prophet বা পীরের মত দূরদর্শীর ন্যায় ভাষা দিয়াছিয়া Hume বলেন, "A great European war in which, despite all efforts England will be involved—I do not pause here to depreciate or deplore, this teriblo visitation." তিনি আরও দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া অতি দুঃখে, অতি কষ্টে, মানসিক ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলেন,—"Throughout Europe they are crying Peace, Peace, but all know that war is already trembling on the horizon."

তাহার ভারতবাসীর কথা। সমরকালে এ দেশীয়দের কি কর্তব্য সে বিষয়ও তিনি বলিতে ও উপদেশ দিতে ত্রুটী করেন নাই। কোন কোন তথাকথিত Anglo-Indianদের মনে যখন বিশ্বাস ছিল, এই সময়ের যুদ্ধকালে ভারতবাসী সুযোগ পাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে—অনেকেই সন্দেহ করিয়া মনে করিতেন, "England's difficulty will be India's opportunity". এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের ভ্রম, অবজ্ঞা ও তাচ্ছল্য করিয়া Hume বলেন,—"Believe them not". পরে শুভানুধ্যায়ী পিতার মত তিনি উপদেশ দিয়া ভারতবাসীকে বলেন, If war should break out and England should unfortunately be involved, subordinate all considerations to the welfare and safety of the entire common-wealth, hand together as one man, and with one design—to support and strengthen England." ভারতবাসী তাঁহার সে কথা ভুলিয়া যায় নাই। বিদেশে বিজাতীয় সৈন্যদিগের সহিত এক প্রাণে, এক তানে সমরক্ষেত্রে ভারতীয় বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনিধনকার্যে প্রাণবিসর্জন দিয়া ইংলণ্ডের ও ভারতের সম্মান রক্ষিত ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে—কর্মযোগীগণের এচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। ইংলণ্ড ও তাহার শক্তিগুলির বিজয়শিরে সাফল্য-মুকুট শোভিত হওয়াই ভারতবাসীর আশাতীত পুরস্কার ও শ্রেষ্ঠতম উপঢৌকন।

Mesopotemiaর ভারতীয় যুবকবৃন্দ নিঃস্বার্থভাবে আহত সৈন্যদের প্রভৃতি কর্তব্যপালন করিয়া মৃতপ্রায় আর্যপরিবার পরিচয় দিয়াছেন। অনশনক্লিষ্ট কয়েকলক্ষ কৃষক বইতে আরম্ভ করিয়া স্বল্প-আয়জীবি মুটে-মজুর পর্যন্ত তাহার দৈনিক আয়ের কিয়দংশ সমর ব্যয়ে অর্পণ করিয়া কর্তব্যপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে! জানি না Hume মহোদয় আজ আমাদের মধ্যে থাকিলে তাঁহার কতই না আনন্দ হইত! পরিশেষে Hume বলেন, "No doubt I may be taken frome the the evil to come, and be dead and gone before the storm and I pray that it may be so; but when the time comes—and com it will—let all who have evere cared for me, followed me, believed in me, remember my words and rally as one man, not hesitatingly and grudgingly, but spontaneously

and enthusiastically to the side of those little isles which have been just designated freedom's last stronghold—freedom's keep !" উত্তরে তিনি আশঙ্কার মধ্যেও একটু আশ্বাস ভাষায় হইয়া বলেন, "yes, in the nobler sense of the words, a great war will be India's opportunity for proving that if in periods of Peace she clamours—at times somewhat angrily—for equal civil rights, in the hour of war she is ever ready and anxious to accept equal military risks." *

* বক্তৃতার অংশগুলি London হইতে প্রকাশিত Mr. A. O. Hame's farewell to India নামক পুস্তক হইতে লওয়া হইয়াছে।

Australia ও Canada উপনিবেশবাসী অপেক্ষা ভারতবাসী কর্ত্তব্যপালনে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ঘটনা পরম্পরায় ঘাত-প্রতিঘাতে ইংলণ্ড ও ভারতের ভাব-ভাণ্ডারের আদান-প্রদানের ফলে ভারতবাসীর মুক্ত বৃত্তিগুলি আবার ধীরে ধীরে আসিবে, যখন ইংলণ্ডের অধীনস্থ উপনিবেশগুলির মত ভারতবর্ষও স্বায়ত্তশাসন কার্য্যে উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। উহাই ইংলণ্ডের চরম শান্তিস্থল, ভারতবর্ষের পুনর্জীবন। সেই দিনের জন্য সকলেই কামনা করেন। সেদিন নিশ্চয় আসিবে—তখন Allan Humeএর নাম প্রতিঘরে হইবে, ভারতবাসী হৃদয়মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করিবে, সেদিন ইংরেজের ভাষায় বলিতে গেলে, "Proudest day in the annals of England."

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র শর্ম্মা

শোধন-যজ্ঞ

তুমি যে জ্বেলেছ হোমের কুণ্ড ঝলমলি উঠে
তাহার অগ্নিশিখা
মহা মহিমার আকাশের গায় রচিল কি আজ
শোধন-মন্ত্র লিখা
কোন্ মহাবন আহরণ করি এনেছ হে হরি, এই হবিকাঠ
নিমেষে জ্বালিয়া নিলে
যেখানে যা'ছিল ভরা ও জীর্ণ কুড়ায়ে তা'দের
অঙ্গার করি দিলে।

জীবে মাতৃশক্তির ক্রমবিকাশ

সর্ব্বভূতে শক্তিস্বরূপা হইয়া তিনি শক্তির উদ্বোধন করেন। মাতৃস্বরূপা হইয়া তিনি সন্তানধর্ম্ম, পালনধর্ম্ম, ত্যাগধর্ম্ম ও সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। জীবজগতে মাতৃত্বের বিকাশ-সাধনাই জীবের বংশবৃদ্ধি ও উন্নতির মূল। মনুষ্য-সমাজে সেবাধর্ম্ম ও মাতৃধর্ম্মের বিকাশই উন্নতির মূল। বীজের জন্য বৃক্ষলতার ত্যাগে, জীবজগতে মাতার সন্তানপালনে, সন্তান পরিবার, সৌষ্ঠী ও স্বজাতির জন্য নরনারীর ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগে ভবিষ্যৎসমাজ ও ভবিষ্যদ্বংশের জন্য বর্ত্তমান সমাজের আত্মোৎসর্গের আমরা সেই একই বিশ্বতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই।

তাই হিন্দু জননীকে শক্তি অপেক্ষা মাতৃরূপে পূজা করিতে ভালবাসে। 'জননি জাগৃহি' ইহাই হইতেছে আবাহন মন্ত্র, শুধু নারীরিক সৃষ্টি ও অবসান হইতে জাগরণ নহে, যাহা কিছু জীবজগতে ও মনুষ্যজগতে evolution এর বিরোধী—সেই সকল বিঘ্ন নিবারণে। মনুষ্যের অন্তরে মাতৃশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট্ মানবসমাজ পরার্থ কর্ম্মের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। মনুষ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ মাতৃশক্তির ক্রমবিকাশে।

জ্ঞান-বিরহিতা শক্তির ধ্বংসলীলা

জ্ঞানবিরহিতা শক্তির লীলা ধ্বংসলীলা। প্রভু কামনা ও শক্তির উন্মেষে শেষে শক্তির আত্মহত্যা। আজ ছিন্নমস্তার লীলা বিশ্বের সর্ব্বত্রই প্রকাশিত। ধন, বিদ্যা, জীবের পালনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনার স্বার্থসন্ধানে মত্ত হইয়া আত্মবিস্তার করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ আত্মঘাতী।

একটা প্রাচীন গৌরব-মণ্ডিত সভ্যতা আপনার দুর্ব্বহ ভারের সঞ্চিত সমস্ত বেশ ভূষা অলঙ্কার, সমস্ত কান্তি ও যৌবন ত্যাগ করিয়া নগ্ন, কুৎসিতা হইয়া আপনারই রক্তস্রোতে প্লাবিত করিবার, আপনাকে হত্যা করিল এবং আপনার হৃদয় আপনি পান করিয়া নিজ বিপরীত বুদ্ধি আসুরী যোগিনীর সহায় বিধান করিতে লাগিল। উন্মাদিনী ক্ষুধার্ত্তা পুরুচারিণী ডাকিনী যোগিনীর সঙ্গে বিপরীত উল্লাসে নাচিতে নাচিতে তাহারই অগণ্য সন্তানের রক্তের উৎস উল্লাসে ছুটিয়া উঠিল। দিগ্ দিগন্তের করুণ হাহাকার ও প্রতীর আর্ত্তনাদ তেদ করিয়া সেই অট্টহাসি বিকট হইয়া সমস্ত আকাশ ভরাইয়া দিল।

এই বিভীষিকাদর্শনে বিশ্বমানব আজ স্তব্ধ, ভীত, নির্ব্বাক্, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। ভারতকে আজ বিশ্বমানবকে সান্ত্বনা দিতে হইবে। বিশ্বমানবের দেহ আজ ছিন্ন ভিন্ন। অঙ্গ সমূদয় ইউরোপের সমরক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত। বিশ্বমানবের ছিন্ন অঙ্গ ও দীর্ঘ অস্থিকে সংযোজিত করিয়া, জড়ত্বানে প্রাণের দিয়া ভারতমাতা আবার ত্রৈলোক্যতারিণী—ভুবনেশ্বরী হইয়া বিশ্বমানবকে কোলে তুলিবে, স্নেহামৃত প্রদান করিবে।

বিশ্বমানব অমর। কত জীব, কত নর, কত সমাজ আসে যায়, কিন্তু বিশ্বমানব অমর। অস্ত্রে শস্ত্রে তাহার আঘাত, অগ্নিতে তাহার উত্তাপ লাগে সত্য; কিন্তু বিশ্ব-মানবের এমন একটা শক্তি আছে, যাহাতে তাহা নিজই আরোগ্য লাভ করে। যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতমাতা বিশ্বমানবকে কত মা প্রেম, জ্ঞান ও ভক্তির কাহিনী শুনাইয়াছে। আজও ভারতকে আবার অমৃতবাণী প্রচার করিতে হইবে। হিংসার পরিবর্ত্তে মৈত্রীর, শক্তির পরিবর্ত্তে ত্যাগের, বুদ্ধির পরিবর্ত্তে জ্ঞানের, বিচারের পরিবর্ত্তে ভক্তির। অতি-মানব বা অতিজাতির গুণকীর্ত্তন নহে,—বিশ্বমানব বা বিশ্বজাতির, নরোত্তম ও নারায়ণের গুণকীর্ত্তন। সমগ্র জীব লইয়া তাহাদেরই চৈতন্যে নারায়ণের প্রকাশ। নরোত্তমের শক্তিতে অতি ক্ষুদ্র নর, কীটানুকীট জীবও শক্তি-লাভ করেও জাতিতে জাতিতে সদ্ভাবন্ধনে এক বিরাট মানব-সমাজগঠন। সমগ্র জাতি লইয়া তাহাদের জাগ্রৎ-চৈতন্যে বিশ্বজাতি বা নারায়ণের প্রকাশ। জনক, গৌতম, বুদ্ধ, অশোক, শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্যের ভারত এই বাণী মর্ম্মে বিজ্ঞানে প্রচার করিবে। শুধু জ্ঞানের রাজ্যে নহে, তাহার সমাজগঠন, রাষ্ট্র, শিক্ষানুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারাও। সমাজতন্ত্রে, পরিবার, স্নেহ, সখ্য স্বজাতির জীবনের ভিতর দিয়া সেই একই ত্যাগ ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখা যাইবে, যাহা অন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে সমগ্র জাতি সমূদয়কে এক বিরাট মানব-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া চিরশান্তি ও চিরমৈত্রী আনিয়া দিবে।

যে সকল ভারতবাসীর ভারতবর্ষের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তাঁহারা আসুন আমাদের কর্ত্তব্যবোধ ও গুরু-দায়িত্ব অনুভব করুন, ক্ষণিকের স্বার্থপ্রয়াসের জন্য আত্মবাদ ত্যাগ করিয়া সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই সত্যই আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিতর ও কর্ম্মক্ষেত্রে বিচিত্র অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া জাতির স্বধর্ম্ম রক্ষার সহায় হইবে, এবং স্বধর্ম্মের সহিত বিশ্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া একই সঙ্গে জাতির ও বিশ্বমানবের সেবা করিবার অধিকার দান করিবে।

সম্পাদক

কর্ম্মযোগ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কোন্ কর্ম্ম সুকর্ম্ম, এবং কোন্ কর্ম্মই বা কুকর্ম্ম, কর্ম্মের এই সদসৎ জ্ঞান কর্ম্মযোগ দ্বারা জন্মে। আসক্তি, তিতিক্ষা, বস্তুগত্যা যে অতিত্ব কর্ম্মযোগীরা তাহা জানেন। জানেন বলিয়াই তাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্মে নিস্পৃহ কর্ম্মী। আমারই স্বদেশবাসী একটী লোক কখনো কোনও কাজ কর্ম্ম করিত না। কিছু জানিত না—জানিতেও চাহিত না। একদিন ঐ ব্যক্তি আমাকে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি তাহাকে মিথ্যা কথা কহিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। নিষ্কর্ম্মা হইয়া পশুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা, মিথ্যা কথা কহা ভাল। মিথ্যা কথা কহিতেও চেষ্টা ও বুদ্ধির প্রয়োজন। ফলতঃ জড়তা পরিহার করিয়া কর্ম্মশীলতা লাভই যথার্থ বিশ্রাম লাভের উপায়। "কি শারীরিক, কি মানসিক, অসৎ সংসর্গ করিও না, অসতের সঙ্গ পরিবর্জ্জন করিতে পারিলেই বিশ্রাম। কাহাকেও ঘৃণা করিও না, অথচ অসতের সঙ্গ করিও না।" এ সকল কথা বলা অতি সহজ, কিন্তু নিঃসঙ্গ হওয়া তত সহজ নয়। সমাজের চক্ষে আমরা নিঃসঙ্গ, কিন্তু আমাদের অন্তর সঙ্গ লাভের একান্ত প্রয়াসী। তুমি ধনের সঙ্গ করিতে প্রয়াসী, কিন্তু পৃথিবীর লোককে জিজ্ঞাসা কর, সকলেই বলিবে, অর্থ অনর্থের মূল। এই কথায় তুমি হয়ত অর্থোপার্জ্জনে বিরত হইলে কিন্তু তোমার মন অর্থের জন্য দিবারাত্রি ব্যাকুল হইয়া রহিল। এ সকল গোঁড়ামী, ইহাতে সুফলের আশা নাই। অর্থের জন্য পৃথিবী মোহন কর, প্রচুর ধনের সংস্থান কর, তখন দেখিবে, ধনের প্রতি তোমার প্রকৃত বিরাগ জন্মিয়াছে। ইহাই বিশ্রাম। এইরূপ তোমার অন্তরের সকল বাসনা পূর্ণ কর, বাসনা পূর্ণ হইলে, তখন দেখিবে, সে সকল অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকল বাসনার পরিনিবৃত্তি না হইতেছে, ততক্ষণ সর্ব্বত্যাগী নিঃসঙ্গ পুরুষের তোমা সেই নির্ব্বিকল্প বিরাম, তুমি অনুভবেও আনিতে পারিবে না। এই পরম পবিত্র নিঃসঙ্গতা ও আত্মসংযুক্ত নির্ব্বাণ বিরামের ধারণা, সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ঘোষিত হইয়া আসিতেছে, মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়াই ঐ ঘোষণা শুনিতেছে, কিন্তু জীবনে তাদৃশ নীতির বিকাশে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে, পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ পরিভ্রমণ করিয়াও তাদৃশ ব্যক্তি বিশজনের অধিক আমি দেখি নাই।

প্রত্যেক মনুষ্য স্বকীয় ধারণার অনুসরণ করুক, কেননা পরীক্ষায় ধারণার অনুসরণ অপেক্ষা ইহাতেই ফল লাভের সম্ভাবনা অধিক। মনে কর একটী শিশু, তাহাকে বিশ মাইল পথ চলিয়া যাইতে অনুমতি করিবে, শিশুর পক্ষে কি এ কার্য্য অসম্ভব নয়? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা সেই শিশু দ্বারা ঐ বিশ মাইল পথ অতিবাহনের প্রত্যাশা করিয়া থাকি। এ জগতের কোনও নরনারী একই বিষয়ে একরূপ নহে। প্রত্যেকেরই ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। সে ধারণা বিচলিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। এজন্য যেরূপ ধারণা লইয়া যাহার জন্ম, তাহাকে সেই ধারণার অনুসরণ করিতে দাও, সুফল ফলিবে। তোমার ধারণার বিচারক আমি নহি, এবং আমার ধারণার বিচারেও তোমার অধিকার নাই। শালবৃক্ষের তুলনা শালবৃক্ষের সহিতই সম্ভব, আম্রবৃক্ষের সহিত কখনো শালের তুলনা হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সমবায়, সৃষ্টির প্রধান নিয়ম। নর ও নারী যখন এক প্রকৃতির হয়, তখন তাহারা একত্র হয়, ভিন্ন প্রকৃতির নরনারী কখনও ঐক্য হইতে পারে না। সৃষ্টির বিধানানুসারে স্বভাবতঃই তাহারা ভিন্ন প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে; সুতরাং সেই ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি তোমার ধারণা অনুসারে বিচারিত হইতে পারে না। পরন্তু সর্ব্বত্রই স্ব স্ব ধারণা অনুসারে অন্যকে তুলনা করিয়া লোকে অন্যকে ঘৃণা করে এবং নিজের নিকটে নিজেই সাধু ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেয়। হিন্দুর নীতিবিদেরা এই কথা বহু-

পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, একত্ব অধিকারি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন নীতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। নিলিপ্ত সন্ন্যাসী ও সংবদ্ধ গৃহস্থ, ইহারা কখনো এক নীতির বশবর্ত্তী হইতে পারে না। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্মপথ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। শিক্ষার্থী পাঠ-শেষে বিবাহ করিয়া গৃহী এবং বৃদ্ধবয়সে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইবে, ইহাই হিন্দুজীবনের আরম্ভ হইতে পরিণতি। এই তিন অবস্থার জন্য—তিন প্রকার কর্ত্তব্যকর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। পরন্তু এক এক শ্রেণীর লোকের অবস্থা প্রায় একরূপ। অবিবাহিত বালক হইতে বিবাহিত প্রধান, দরিদ্র হইতে রাজা যখন, কিন্তু রাজার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া তাহার স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি দাও, দেখিবে, দরিদ্রগণের সহিত তাহার যেমন বিশেষত্ব কিছু নাই। ফলতঃ সংসারনির্ম্মুক্ত ব্যক্তি, সংসারস্থ ব্যক্তি হইতে সর্ব্বাংশে সর্ব্বোচ্চ, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই কষ্টজনক সংসারে থাকিয়া ভগবানের চিন্তা অপেক্ষা এ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবন ও অক্ষয় বিশ্রাম উপভোগ করা সহস্রাংশে শ্রেয়। ভারতবর্ষে গৃহী এবং প্রচারক এ উভয়েরই সংখ্যা কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৃহী সংসার ধর্ম্ম করিবে এবং পুরোহিত ধর্ম্মপ্রচার ও পূজা অর্চ্চনা করিবেন, কিন্তু এখন দেখ আদর্শ জীবনলাভ একান্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। গৃহী হওয়া যে কতদূর কঠিন, আমি "মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র" হইতে তাহার উদাহরণ দিতেছি :—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥
ন বিধ্যুক্তমপাং কুর্য্যাৎ ন চ শাস্ত্রং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজায়াং গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ॥
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
যস্য গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।
তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি।
তস্য প্রীতির্ভবেন্নিত্যং পরব্রহ্ম প্রসীদতি॥
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সন্নিধৌ পিতৃশাসনে॥
বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যো কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবিকৃতঃ॥
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
বিহায় গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥
বন্ধয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে মোদসঞ্চয়ঃ।
ইহৈব লোকে সর্ব্বোঽসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ॥
গৃহদ্বারে সোপবেদ্ধারান্ বিশ্রামস্থানসংযুতান্।
সোপবেশ্য স্বজনান্ বন্ধূনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
ন ভার্য্যা তাড়য়েৎ কাপি যাড়্‌বৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেদ্‌ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥
স্ত্রিয়েষু গীতদায়েষু স্ত্রিয়মস্থায় ন সংস্পৃশেৎ।
দৃষ্টেন চেতসা বিদ্বানেষ ধর্ম্মো নাশকো ভবেৎ॥
বিহসে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাবণৈঃ স্ত্রিয়ং সৌখ্যং ন দর্শয়েৎ॥
ধনেন বাসসা প্রেম্না প্রথমাকৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্ধারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বপনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রাদ্যান্যবিধর্ম্মিতাম্॥
যদ্যিয়ং ধর্ম্মনিরতা তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতীত্যেষ এব সঃ॥
চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েৎ গৃহকর্ম্মসু।
তত্তদ্যোগ্যস্বভাবেন যথা স্বেষাং প্রদর্শয়েৎ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥
এবং ক্রমেণ ব্রাহ্মণ্যাবস্থাত্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্‌গৃহী॥
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অন্যান্ ব্রাহ্মণাদীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ॥
অল্পেষ্বপি কুলাচারং সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্।
প্রধর্ষয়েদ্যথাভাবমেব ধর্ম্মং বিলম্বয়েৎ॥
বীরং ধর্ম্ম পৌরুষঞ্চ তত্তদ্যে কথিতঞ্চ যৎ।
কন্যাং বহুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ॥

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
ন বিভেতি রণাদ্ যো বৈ সংগ্রামেষ্বপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো যাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে।
মনঃ পূতং তবেদ্যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ॥"

গৃহীর ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহী যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মে অর্পণ করিতে হইবে। গৃহস্থ লোকে মিথ্যা কথা বা শঠতার বশীভূত হইবে না; দেবতা ও অতিথিপূজায় সতত নিযুক্ত থাকিবে। মাতা পিতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাতুল্য, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নিরন্তর তাঁহাদের সেবা করা কর্ত্তব্য। যাহার প্রতি মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন, হে পার্ব্বতি, তুমি তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া থাক; দেবি! তোমার প্রীতি ঘটিলে পরব্রহ্মও প্রীত হইয়া থাকেন! মাতা পিতাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণামপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিতে হয়, তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আসনে বসিতে নাই, (অধিক কি,) সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের শাসনে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। যে পুত্র বিভবমদে বিমোহিত হইয়া মাতাপিতাকে অবহেলা করে, সে ব্যক্তি সকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হয়। যদি নিজের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তাহা হইলেও মাতা, পিতা, পুত্র, ভার্য্যা অতিথি ও সহোদরদিগকে না দিয়া আপনি আহার করিবেন না। যে উদরপরায়ণ ব্যক্তি মাতা পিতা প্রভৃতি গুরু, বন্ধু, বান্ধব ও স্বজনদিগকে বঞ্চিত করিয়া আপনি ভোজন করে, তাহার কেবল ইহলোকে নিন্দাপ্রচার হয় না, পরলোকেও তাহার নরকনিবাস হইয়া থাকে। পরিবার প্রতিপালন, সন্তানগণের শিক্ষাদান এবং স্বজনগণের ভরণপোষণই গৃহীর সনাতন ধর্ম্ম। ভার্য্যাকে তাড়না করা দূরে থাকুক, মাতৃবৎ পালন করা কর্ত্তব্য, ঘোরকষ্টে পতিত হইলেও সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে না। আপনার গৃহলক্ষ্মী বর্ত্তমানে অন্য রমণীকে স্পর্শ করিতে নাই; বুদ্ধিপূর্ব্বক অন্তঃকরণে পরনারী স্পর্শ কল্পনাতেও নরকনিবাস ঘটিয়া থাকে। পরস্ত্রীর সহিত বিরলে শয়ন প্রাজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে, স্ত্রীর সহিত অনুচিত বাক্যপ্রয়োগ বা শৌর্য্য প্রদর্শন করিতে নাই। অর্থ, বসন, প্রেম, শ্রদ্ধা ও অমৃতবাক্যে স্ত্রীর মনস্তুষ্টি করা কর্ত্তব্য, কখনও স্ত্রীলোককে অপ্রিয় কথা বলিবে না। পুত্র অথবা আত্মীয় সঙ্ঘ ব্যতিরেকে উৎসবে, লোকযাত্রা, তীর্থদর্শনে, পরগৃহে পত্নীকে একাকিনী রাখা বুদ্ধিমান পতির কর্ত্তব্য নহে। মহেশ্বরি! যে পতির প্রতি পতিব্রতা পত্নী তুষ্ট থাকে, তাহার সকল প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এবং সে ব্যক্তি তোমার প্রিয় হইয়া থাকে। চতুর্থবর্ষ পর্য্যন্ত শিশু সন্তানের লালন পালন করা পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অনন্তর ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিদ্যা ও গুণ শিক্ষাদান করিতে হয়। যখন পুত্রের বয়স বিংশতিবর্ষ হইবে, তখন তাহাকে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিবে, অনন্তর আত্মতুল্যজ্ঞানে পুত্রের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে! পুত্রের ন্যায় কন্যাকে যত্নপূর্ব্বক লালনপালন ও শিক্ষাদান করিতে হয়, পরে (যোগ্যকালে) সমারোহে বিভূষিত করিয়া জ্ঞানবান্ বরকে সম্প্রদান করিতে হয়। এইরূপে যথাক্রমে ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃপুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যাদিগকে পালন করা গৃহীর কর্ত্তব্য। অনন্তর স্বধর্ম্মানুরক্ত, একাগ্রবাসী, অভ্যাগত অতিথি ও উদাসীনগণের প্রতিপালন করাই গৃহীর পক্ষে বিধেয়। শত্রুব্যক্তি সামান্য হইলেও তাহাকে ভয়, সত্বরে আত্মপ্রভাব প্রদর্শন করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য, কিন্তু ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিতে নাই। অন্যের উপকার করিয়া তাহা প্রকাশ করা, স্বীয় যশ ও গৌরবের পরিচয় দেওয়া বা কাহারও নিকটে অন্যের গুপ্তকথা ব্যক্ত করা, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। সত্যই যাহার ব্রত, যে ব্যক্তি দীনজনে দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, কাম ক্রোধ যাহার বশীভূত, সেই ব্যক্তি ত্রিলোক জয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে বিরক্ত, পরবস্তুতে নিস্পৃহ, যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতসমদর্শী, সেই ব্যক্তিই ত্রিলোক জয় করিয়া থাকে। যে রণভূমি হইতে পলায়ন করে না, যে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয় না, যে ধর্ম্মযুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই ত্রিলোক জয় করিয়া থাকে। হে শিবে! অধিক কি বলিব, যাহাতে মনঃপূত হয় তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা গৃহস্থের পক্ষে কর্ত্তব্য।

গৃহস্থই সংসারের কর্ত্তা, সমাজের প্রধান ও প্রতিপালক।

গরীব দুঃখী, রুগ্ন দুর্বল, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রীকন্যা সকলেই তাঁহার প্রতিপাল্য। এ প্রতিপালন তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম গৃহী আপনার ধারণানুসারেই করিয়া থাকেন। এজন্য যদি তাঁহার কোনও কৃতকর্ম্মের ত্রুটি ঘটে, সে ত্রুটী সাধারণে প্রকাশ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। সে আত্মপ্রকাশে এবং ভবিষ্য জীবনের কর্ত্তব্য যাহা উপস্থিত হয়। পরন্তু সেই ত্রুটীর মার্জ্জনা জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তিনি অবশ্য প্রতিপালন করিবেন। জ্ঞান ও ধন, সে ত্রুটী মার্জ্জনার একমাত্র উপায়; সুতরাং যথোচিত জ্ঞান ও প্রয়োজন অনুরূপ ধনের উপার্জ্জন গৃহীর পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। গৃহী যদি মনোপার্জ্জন না করেন, তিনি অসাধু। গৃহী যদি পরিবার প্রতিপালন না করেন, তিনি অপার্শ্বিক, কেননা তিনি পরিবারগণের একমাত্র প্রতিপালক। এরূপ স্থলে অর্থোপার্জ্জন দোষের নহে; কেননা ঐ অর্থে পরিবারবর্গ প্রতিপালিত হইয়া থাকে। অর্থের উপার্জ্জন এবং উহা পরিবারবর্গের মধ্যে প্রসন্ন মনে বণ্টন করিতে পারিলে, আপনার উপার্জ্জন সকলের মধ্যে বিলাইয়া আনন্দলাভ করিতে পারিলে, পরিণামে সেই আত্মত্যাগ হইতেই ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পণের অধিকার ও শক্তি জন্মে। যিনি উপার্জ্জিত অর্থ অন্যকে দিতে যাহার মনে ক্লেশ উপস্থিত হয়, সে কখনও ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে না।

"সুনাম অর্জ্জন করিবে, অসৎ সংসর্গ করিবে না, মিথ্যা কহিবে না, অন্যের প্রাণে ব্যথা দিবে না, অতিথি সেবা করিবে, মৃদু প্রকৃতি করিবে, পরের কৃতকর্ম্মের বিচার আলোচনা না করিয়া নিজের কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিবে,"—এই সকল বিধি পালন করিয়া এবং পরিবারবর্গ যথাবিধানে প্রতিপালন করিয়া গৃহী পরিণত বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের নৈতিকবিধি।—ঋগ্বেদের একাংশ।

"যদি কোনও ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে, স্বদেশ কি স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করে, সেও নির্ম্মুক্ত যোগীগণের বাসস্থলীতে বসতি করিতে পারে।" ইহাও হিন্দুর নীতিশাস্ত্রের বিধি; পরন্তু এই উভয় বিধি নীতি যে একই ব্যক্তির দ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়। এইজন্য বলিয়াছি, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে একই নীতি কার্য্যকরী নহে। যে ব্যক্তি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে সে সেই অবস্থানুসারে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেই সে পরম্পদ লাভে অধিকারী হইতে পারে।

আর এক কথা। বেদ বলিয়াছেন, "ভয় করিও না, নির্ভয় হও। ভয় দুর্ব্বলতার চিহ্ন।" প্রত্যেক মনুষ্য স্ব স্ব অবস্থানুরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ভয়ে সমাধা করুক, বেদের ইহাই মর্ম্ম। যদি কেহ সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানের উপাসনায় জীবন উৎসর্গ করে, স্ত্রীপুত্র পরিবার পরিবৃত গৃহস্থ কখনো তাহার নিন্দা করিতে পারে না। সেইরূপ যিনি সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী, সংসারীকে দেখিয়া অপার্শ্বিক বলিয়া ঘৃণা করাও তাহার পক্ষেও বিহিত নহে। যে যে ভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করে, তাহা তাহার উপযোগী. সে যোগ্যতা বিচার করিবার ক্ষমতা অন্যের নাই।

এক রাজা আগন্তুক সন্ন্যাসীদিগকে দেখিলেই প্রশ্ন করিতেন এ সংসারে বড় কে? সন্ন্যাসীরা উত্তর করিতেন, এ সংসারে বড় সন্ন্যাসী। রাজা প্রমাণ দিতে বলিতেন, কিন্তু কোনও সন্ন্যাসী প্রমাণ দিতে পারিতেন না, রাজা তাঁহাদিগের জটা মুড়াইয়া বিবাহ দিতেন। এইরূপে কতদিন অতীত হইলে এক নবীন সন্ন্যাসী রাজধানীতে আসিয়া রাজার অতিথিশালায় অতিথি হইলেন; রাজাও তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "প্রত্যেকেই নিজের কাছে নিজে বড়।" রাজা প্রমাণ চাহিলেন, সন্ন্যাসী বলিলেন, "আইন, আমি ইহার প্রমাণ দিতেছি, রাজা সন্ন্যাসীর অনুবর্ত্তী হইলেন।

কত দেশ কত নগর কত বন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এক রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রাজধানী উৎসবময়, শুনিলেন, অদ্য রাজকন্যার স্বয়ম্বর হইবে। পূর্ব্বেও কত কত রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, রাজকন্যার মনোনীত হন নাই; তাই রাজা এবার সমগ্র রাজপুত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া এই বিরাট্ স্বয়ম্বরের আয়োজন করিয়াছেন। স্বয়ম্বর দেখিবার জন্য নবীন সন্ন্যাসী ও রাজা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

স্বয়ম্বর সভায় বহু বহু রাজপুত্র সুবেশে ভূষিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, রাজকন্যা একে একে সে সকলকে দেখিলেন, কাহাকেও তাঁহার মনে ধরিল না; অদূরে এক পরম সুন্দর সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিলেন, রাজনন্দিনী সেই সন্ন্যাসীর গলায় বরমালা অর্পণ করিলেন। বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "কি নির্ব্বোধ, আমি সন্ন্যাসী, বিবাহ করিয়া আমি কি করিব?" রাজা বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব তোমার। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের সহিত তুমি রাজকন্যাকে বিবাহ কর।" সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত মালা ভূতল হইতে উঠাইয়া লইয়া, রাজকন্যা পুনরায় তাহা সন্ন্যাসীর গলায় অর্পণ করিলেন। সন্ন্যাসী বিরক্ত হইলেন, গলার মালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "দেখিতেছ না, আমি সন্ন্যাসী। তোমার রাজার ঐশ্বর্য্য আর এই রাজকন্যা লইয়া আমি কি করিব?" বিরক্ত সন্ন্যাসী সভা ত্যাগ করিয়া দ্রুত-বেগে প্রস্থান করিলেন। রাজকন্যা সন্ন্যাসীর অনীম সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাসীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। আমাদের প্রথমোক্ত নবীন সন্ন্যাসী ও রাজা রাজনন্দিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বিবাহবিমুখ সন্ন্যাসী দ্রুতপদে রাজধানীর সন্নীপবর্ত্তী কাননে প্রবেশ করিলেন, প্রেমবিমূঢ়া রাজকন্যাও তদনুসরণে বিরত হইলেন না। বনের পথ সন্ন্যাসীর জানা ছিল, তিনি কোন্ পথে কোথায় অদৃশ্য হইলেন, রাজকন্যা জানিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী ও রাজা গিয়া দেখেন, রাজনন্দিনী এক বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতেছেন। সন্ন্যাসী আশ্বাস দিলেন, প্রভাতে রাজধানীতে পৌঁছাইয়া দিবেন বলিলেন, কিন্তু সে রাত্রি তিনজনকেই এক বৃক্ষতলে রাত্রি বাস করিতে হইল। বৃক্ষের উপর এক বিহঙ্গদম্পতি তিনটী শাবক লইয়া বাসা বাঁধিয়াছিল। পক্ষী বলিল, "দেখ আমাদের গৃহে আজি তিনটী অতিথি উপস্থিত। শীতে অতিথিদের বড়ই কষ্ট হইতেছে, একটু আগুন দিব কি?" জায়া সম্মতি জানাইল, পক্ষী কোথা হইতে চঞ্চুপুটে করিয়া আগুন আনিল, সন্ন্যাসী আগুন পাইয়া তাহাতে কাষ্ঠ সংযোগ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। শীত রক্ষা হইল। কতক্ষণ পরে পক্ষী বলিল, "আমরা গৃহী, গৃহে অতিথি উপবাসী থাকিবে, তাহা হইবে না। গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য" এই বলিয়া পক্ষী বৃক্ষতলস্থ অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। স্ত্রী বলিল, "স্বামীর যাগ অতি প্রচুর, তিনটী অতিথির কিছুই হইবে না। আমি স্বামীর পথানুসরণ করি। পক্ষীবধূও সেই আগুনে পুড়িয়া মরিল। শাবক তিনটী বলিল, মাতাপিতা জীবন দিলেন, কিন্তু অতিথির উদর পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। চল আমরাও জীবন দিয়া অতিথি সৎকার করি।" শাবক তিনটীও সেই আগুনে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া অতিথি সৎকার করিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "রাজা দেখিলে কি? যদি তুমি এই বিহঙ্গ-দম্পতির ন্যায় গৃহী হইতে চাও, পরের সংকারের জন্য এইরূপ আত্মোৎসর্গ করিও। যদি তুমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে চাও, বিরক্ত সন্ন্যাসী যেমন অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভুবনমোহিনী রাজকন্যা পরিত্যাগ করিলেন, তদ্রূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে শিক্ষা কর। একের কর্ম্ম, অন্যের পক্ষে উপযোগী নহে, সন্ন্যাসীর কর্ম্ম, গৃহীর কার্য্যের উপযোগী নহে, সন্ন্যাসী ও পক্ষীর উদাহরণ তো সম্মুখেই দেখিলে; তাই আমি বলিয়াছিলাম, প্রত্যেক মনুষ্যই নিজের পথে বড়, প্রত্যেক মনুষ্যই স্বীয় অবস্থানুরূপ কার্য্যের উপযোগী"। রাজকন্যাকে রাজধানীতে রাখিয়া নবীন সন্ন্যাসী ও রাজা আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, পঞ্চপাণ্ডব রাজসূয়যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দেশে আর দরিদ্র ছিল না, পাণ্ডবেরা এত অধিক ধন বিতরণ করিয়াছিলেন যে রাজধানীর সকলেই বলিয়াছিল, এমন দান আর কখনও কেহ দেয় নাই। একদা এক হংস রাজসূয়যজ্ঞের বিতরণ স্থলে আসিয়া বলিল, "এ দান কিছুই নহে। এমন আত্মত্যাগ সকলেই করিতে পারে!" লোকে আশ্চর্য্য হইল। আরও আশ্চর্য্য হংসের অর্দ্ধাঙ্গ স্বর্ণময়। হংস বলিল, "অমুক স্থানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের রাজকন্যা ব্যবসায়, সে ব্যবসায় চারিটী লোকের জীবিকা, তাহাও অতিকষ্টে নির্ব্বাহিত হইত। কালক্রমে সেই দেশে পাঁচ বৎসরব্যাপী অকাল হইল। ব্রাহ্মণের দিন চলা ভার হইল। পাঁচ দিন সপরিবারে উপবাসের পর, বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণ কিছু ধানের ছাতু সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, তাহাও পরিবারে চারিজনের পক্ষে প্রচুর নহে। পাঁচদিনের উপবাস, সুতরাং পরিবারে সেই যাহাই চারি অংশে বিভাগ করিয়া আহারে বসিবে, হঠাৎ এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ নিজের ভাগ অতিথিকে দিয়া নিজে উপবাস রহিলেন। অতিথি বলিলেন, "দশদিন আমি জলস্পর্শও করি নাই, এই সামান্য খাদ্যে আমার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইল। আর কিছু নাই?" ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ নিজের অংশ দিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। অতিথি তখনও ক্ষুধাতুর। পুত্র অবিলম্বে নিজের অংশ অতিথিকে দিয়া প্রসন্ন মনে উপবাসী রহিলেন। পুত্রের অংশ ভোজন করিয়াও অতিথি বলিলেন, "আর সামান্য মাত্র হইলেই পরিতোষ হয় এবং পরিতোষ ভোজনই অতিথি সেবার নিয়ম।" বালিকা পুত্রবধূ গৃহধর্ম্মের মহিমায় আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজের অংশ অতিথিকে দিল। পরিতৃপ্ত হইয়া অতিথি প্রস্থান করিলেন। অনাহারে সেই রাত্রেই ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলেরই প্রাণ-বিয়োগ হইল। সেই পবিত্র ছাতুর কিয়দংশ একস্থানে পড়িয়াছিল, সেই ছাতুর সংস্পর্শে আমার অর্দ্ধাঙ্গ স্বর্ণময় হইয়াছে। অপর অর্দ্ধাংশ স্বর্ণময় করিবার জন্য আমি পৃথিবী পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কৈ? এমন আত্মত্যাগের পরিচয় আর ত কোথাও পাইলাম না।"

এই প্রণালীর অতিথি সেবার ধারণা আজিও ভারতবর্ষে আছে। এই প্রণালীর আত্মোৎসর্গ দেখাইয়া, এই প্রকার সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভারতের লোক নিঃস্ব হইতে নিঃস্বতর হইয়া পড়িয়াছে। বাল্যকালে একখানি ইংরেজি গল্পের পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, তাহার প্রথম উপাখ্যান একটী কর্ত্তব্য-পরায়ণ বালক নিজের উপার্জ্জনের অংশ তাহার বৃদ্ধা-জননীকে দিত। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া সেই চারি পৃষ্ঠায় পূর্ণ উপাখ্যান, বালকের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও তাহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ! কিন্তু এই গল্পের যে কি মাধুর্য্য, তাহা ভারতীয় বালকেরা বুঝিতে পারে না, কেননা নিজের উপার্জ্জনে জননীরও সম্পূর্ণ অধিকার, সুতরাং উপার্জ্জনের অংশ দান, তাহার আবার প্রশংসা কি? কিন্তু যখন বুঝিলাম, পাশ্চাত্য প্রদেশের সকলেই আত্মসর্ব্বস্ব আপনারটী লইয়াই ব্যস্ত, তখন সেই বালকের মহত্ত্ব বুঝিলাম। পরন্তু এতাদৃশ উদাহরণ ও গৃহীর পক্ষে উপযোগী নহে।

এখন কর্ম্মযোগ বলিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, নীরবে জীবন দিয়াও পরের প্রাণ রক্ষা করিবে, নীরবে শত শতবার প্রতারিত হইবে, কথা কহিও না, যাহা করিতেছ, করিয়া যাও, তাহার ফলের প্রত্যাশায় চিন্তাকুল হইও না। দরিদ্রকে প্রতিপালন করিতে কদাচ বিরত হইও না।" এই সকলই গৃহীর লক্ষ্য। এখন ভাবিয়া দেখ, গৃহী হওয়া কত কঠিন। নিষ্ক্রিয় জীবন লাভ অপেক্ষা যথার্থ কর্ম্মশীল-জীবন লাভ করা নিতান্ত দুরূহ।*

---

* The notes of a class Lesson, held in New York, on the 13th of December, 1895.

এই প্রবন্ধের লেখক বঙ্গবাসীর প্রথম সম্পাদক স্বর্গীয় কালিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। লেখক স্বর্গগত বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমান লেখকের প্রণীত বরাহমিহির, সংসারসর্ব্বস্ব, ভবানীঠাকুর, হৈববাণী, হিন্দুসর্ব্বস্ব, শতদল প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তক সর্ব্বজনসমাদৃত। অধুনা তাঁহার পুস্তকাবলী কে প্রকাশ করিতেছেন জানি না। যারান্তরে তাঁহার বিষয় আমরা সবিশেষ আলোচনা করিব। ঃঃ সঃ

অজানা

(১)

খেলার ছলে ছড়িয়েছি বীজ
কখন জানি না,
ভরে গেছে দেখছি—ফুলে
আমার আঙিনা।
পাইনি যারে যত্ন করে
আজকে এলো অনাদরে,
অনাহুত গৌরবেরি
গুমর ভাঙি না।

(২)

হৃদয় আমার উল্লাসেতে
উঠছে উথলে,
পরাণ এলো কেমন করে
খেলার পুতুলে।
অশ্রু হল মুক্তা মতি
পীযূষ পেলাম গরল মথি'
আকাশ দেউল মূর্ত্তি ধরি
নামলো ভূতলে।

(৩)

হরি বলে কোথায় কবে
ক্ষণিক কেঁদেছি,
অন্ধকারে পারের তরী
ঘাটেই বেঁধেছি
ছিন্নাহত আকুল ভরে
পতিত আমি নিরাশ হয়ে
ব্যাকুল ভূপে অভয় পদ
বুকেই ছেঁদেছি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ

ঘটনাস্রোত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১১)

অবস্থার বিচিত্র পরিবর্ত্তনে, মনেরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইল। পলে পলে লক্ষিত দিনে দিনে পুঞ্জীভূত অবসাদের বিপুল বোঝার অন্তর্ধানে আবার সজীব হইয়া উঠিলাম। মনের কোন্‌খানটায় যে একটা অভাবের অপূর্ণতা অনুভব করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলাম, কি যেন একটা কেন যেন কিসের অনুসন্ধান করিতে করিতেই প্রান্তিভারে নুইয়া পড়িতেছিলাম, অত্যন্ত জীবনযাত্রার একঘেয়ে সুরে, বিচিত্র সুরের সংস্পর্শ মন্ত্রশক্তির ন্যায় আমার অন্তরে কার্য্য করিতেছে, তাহা তালরূপেই বুঝিলাম। জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র বিবর্ণ হইয়া পড়িতেছিল,—আজ তার সমস্তখানি মুহূর্ত্তে হইয়া ভাবশস্পায়ত শ্রীমণ্ডিত দেখিতে পাইলাম। ধারাবাহিকতার কঠিন শুষ্ক আবরণ ভেদ করিয়া কমনীয় ও স্নিগ্ধতার মাধুর্য্যে যে মূর্ত্তি মধুরিমা আমার নয়ন সম্মুখে সমুদ্ভিত দেখিতে পাইলাম, তাহারই পুলকস্পর্শে জীবনে নূতন আনন্দের আস্বাদন পাইয়া, আমার করুণ হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সংসারে ভালবাসা পাইয়া আসিতেছি—কিন্তু আজিকার এই পাওয়ার মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় মহান্ বিচিত্রতা অজস্রিক বেদনার তলদেশে যে বিপুল আনন্দধারায় আপনাকে মহিমাময় করিয়া তুলিয়াছে, সত্যই ইহা দুর্লভ, সত্যই ইহা তুলনা রহিত!

সংসারের হাটে এতদিন ধরিয়া আমার যে কেনাবেচা চলিতেছিল, সত্যই তাহা অকিঞ্চিৎকর—আমার নিজের হৃদয় আমার নিকট সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত ছিল। আজ ঘটনাচক্রে তার এই অপূর্ব্ব আবিষ্কার আমাকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল, প্রচলিত জীবনপথের পুঁজি আমার কতটুকু, আর যেটা আমার ধারণার বাহিরে পড়িয়াছিল, সেটা কি বিপুল। এই অভূতপূর্ব্ব মিলনের ইতিহাস গভীর রেখাঙ্কিত হইয়া আমার হৃদয়ে চিরমুদ্রিত হইয়া গেল।

এত আনন্দ তবু তার আশে পাশে আশঙ্কা মাঝে মাঝে উঁকি মারিত। কেন না এই অলঙ্ঘনীয় মিলন আমাদের নিকট যত মধুর হৌক না কেন, ইহার সমস্তখানি যখন পিতৃদেব জানিতে পারিবেন, তখন যে ফল কি দাঁড়াইবে, সে চিন্তা মনে উদয় হইলে আমার বুক শুখাইয়া যাইত! পিতৃরোষের বহ্নিমুখে আমার সুখের অট্টালিকা ভস্মীভূত হইলে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে? ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া যাহা আপনি আসিয়াছে তার জন্য আমি কতটুকু দায়ী, এ সমস্ত বুঝিবার পূর্ব্বেই পিতার নিকট আমার অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে—আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার কিছুই থাকিবে না, পিতৃহৃদয় যতই স্নেহপ্রবণ হৌক না কেন, উদ্ধতপ্রকৃতি অন্যায়কারী সন্তানকে তিনি কখনই মার্জ্জনা করিবেন না। জীবনসংগ্রামে সহসা আশ্রয়চ্যুত হইলে আমি যে কিরূপ বিপন্ন হইব, এ কথা ভাবিলে আমার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে। কিন্তু এখন আর উপায় নাই—এতদিন তাঁর মতেই চলিয়া আসিয়াছি, আজ যদি তিনি মনে করেন আমি তাঁর বিদ্রোহী হইয়াছি, তাহা হইলে আমি নিরুপায় কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী যিনি; তাঁর কাছে আমার প্রাণের ইতিহাস গোপন থাকিবে না। আমি যার ইহকালের সর্ব্বস্ব পরকালের আশ্রয় সেই নিরপরাধিনী নারীচিত্তের সত্যই অবমাননা করি, তা হলে আমার বিধাতা আমাকে কোনো দিনই ক্ষমা করিবেন না।

একটা কথা। এতদিন পর্য্যন্ত পিতাকে কোনো কথাই জানান হয় নাই, কিন্তু এরূপভাবে চলা ঠিক নহে—ইহাতে তাঁহার সঙ্গে প্রতারণা করা হইতেছে। ঠিক করিলাম তাঁকে সবখানি জানাইতে হইবে। তাঁকেই বা সব কথা কেমন করিয়া লিখি? কাজেই বৌদিকে সব লিখিয়া তাঁকে জানাইতে বলিব। বৌদির কথা মনে হইতে চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। আমার বৌদি, আমার

যে কি আমিই জানি—এই করুণাময়ীর বুকে যে এবার কত বড় শেল বাজিবে, তাহা বেশ বুঝিলাম। তিনি আমাকে যতই স্নেহ করুন না কেন, এবার সে সম্পর্ক ছিন্ন হইবে—কেন না আমাদের বাড়ীতে আমার নামে মুখে আনা অমার্জ্জনীয় অপরাধের মতন দাঁড়াইবে—স্নেহের পরীক্ষা শাসনের কঠোরতাকে ভেদ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে অক্ষম হইয়া, মনের মধ্যে হাহাকারের সৃষ্টি করিবে।

আমি নিরুপায় হইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম—মন অনেকটা হাল্‌কা হইল। জমাট অন্ধকারকে চিরিয়া চিরিয়া বিদ্যুতের মতন আশার ক্ষীণরেখা দীপ্ত হইতে লাগিল, মনে মনে ভাবিলাম এ স্নেহ কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছে—সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত পরিপূর্ণ আলোকে আমার জীবনাকাশ কি কখনও আচ্ছন্ন হইবে না?

চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া গেলাম। সৌরীকে লইয়াই মুস্কিল। চিরপরিচিত স্নেহবন্ধনপাশ মুক্ত করিয়া সে যখন আমার সংসারে প্রবেশ লাভ করিবে সত্যই দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাত হইতে আমি তাহাকে কেমন করিয়া রক্ষা করিব? সে আমাকে ভালবাসে—আমাকে পাইলে সে আর কিছু চাহিবে না, তবু প্রচুর স্বচ্ছলতার দাবখান হইতে বিপুল টানাটানির দাবখানে সে চারিদিক কেমন করিয়া সামলাইবে? অজস্র দারিদ্র্যের মাঝখান দিয়া যারা বরাবর চলিয়া আসিতেছে, অর্থাভাবের ক্লেশ তাহাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে কিন্তু যে চিরদিন আদর ও স্নেহছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, হঠাৎ অবস্থার প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনে, চিন্তা ও পরিশ্রমের ক্লান্তি সে হাসিমুখে বহন করিবার চেষ্টা করিলেও, যদি তাহার শক্তিতে না কুলায়, তাই তার পরিণাম আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলাম। আজ নিজের অক্ষমতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আমার অন্তরাত্মাকে পীড়ন করিতে লাগিল—সামান্য দুইটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন জোগাইবার যোগ্যতা আমার যদি না থাকে, তবে এতদিন যে স্নেহের শাসনে মানুষ হইয়া আসিয়াছি, তাহাতে ভালবেসের মতন দেখাপড়া করিয়া আসিয়া মেডিক্যাল কালেজের ডিগ্রিলাভ করিয়াছি মাত্র কিন্তু মানুষ হই নাই। সহায়সম্পত্তিহীন সংসারের রাজপথে একেলা দাঁড়াইয়া আমার যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হইবে—নিষ্ঠুর সংসার নিষ্ঠুরভাবে দাঁড়াইয়া শুধু দেখিবে মাত্র। যাহা হউক পাশ করিয়া বাহির হইয়াছি, একটা চাকরীও কি জোগাড় করিতে পারিব না? এত লোকে সংসার চালাইতেছে—আমিই কি শুধু অচল? বিধাতার সংসারে যেমন করিয়া হৌক দিন কাটিয়া যাইবে—কিন্তু সৌরীকে আপাততঃ কষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিব না, এই একথাটা বুকের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে থাকে ততই আমি কেমন দমিয়া যাইতে লাগিলাম।

শ্বশুর মহাশয় আসিয়াছিলেন—তিনি আমার সঙ্কট অবস্থা বুঝিয়াছেন, তাই স্পষ্ট করিয়া না হৌক, আভাসে তিনি যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত সে কথাটা বুঝাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি ঠিক করিয়াছি অনাহারে মরিব, তাহাও স্বীকার, তবু তাঁর এই অযাচিত করুণা, যতই লোভনীয় হউক না কেন, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেই হইবে—কেননা এই দানের মধ্যে অবস্থার তীব্রতাকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে, আমার চলিবার পথখানিকে সরল করিতে পারে কিন্তু ইহার গতি আমাকে ছাড়াইয়া আমার পিতৃদেবতাকে স্পর্শ করিলেই, সেটা নিদারুণ অপমানে গিয়া দাঁড়াইবে। আমার অক্ষমতার আমি নিজে দগ্ধ হইব—পিতার অপমান হইতে দিব না। নিরুপায় হইলে পিতৃচরণে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করিব, তিনি আমার মুখ দর্শন না করিতে পারেন কিন্তু সত্যই কি তিনি তাঁর নিরন্ন পুত্রের মুখে অন্ন জোগাইবার ব্যবস্থা করিবেন না? কঠোরতার বহু আবরণে উহার শাসনদণ্ড যতই প্রচণ্ড হউক না কেন, ঠিক তাহারই তলে যেখানে তাঁর পিতৃহৃদয় সেখানে কি তিনি আমার জন্য বেদনা অনুভব করিবেন না! শাসনই মানবজীবনের সর্ব্বস্ব নহে, ওটাই সংশোধনের একমাত্র উপায় নহে—পিতৃহৃদয় তার স্বাভাবিকত্বকে ক্ষণিকের জন্য ঢাকা দিতে পারে কিন্তু চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিতে পারে না।

সৌরীকে কিছু বলা হইবে না—যথাসাধ্য তাহাকে গোপন করিয়া চলা দরকার। আহা, বেচারা সবে যার মুখের ঘরে ফিরিয়াছে, তার মুখের নীড় নিষ্ঠুর সত্যের

প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙিয়া গেল কি?—সে বুদ্ধিহীনা নহে, নিজের অবস্থা দুইদিন পরে সে ভাল রকমই বুঝিতে পারিবে, আপনা হইতে যারা বুঝিতে পারিবে, তাহাকে সে সরাইয়া লইতে পারিবে, এবং সম্ভবতঃ যে অধিকার হইতে সে এতদিন বঞ্চিত ছিল, সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের দখলে পাইয়া, অন্য কাহাকে সে আশ্রয় করিতে পারিবে।

চিন্তার শেষ নাই পর্য্যায় আশ্রয় লইলাম—ঘুম আসিল না। আবার উঠিয়া বসিলাম। 'টানা' হইতে চিঠির কাগজ বাহির করিলাম—বাহিরে বিপুল সংসার নিদ্রায় মগ্ন, আমি বৌদিকে চিঠি লিখিতে বসিলাম।

চিঠি লেখা শেষ হইলে, শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ঘড়িতে দেখিলাম ১টা বাজিয়াছে। শিয়রের জানালা খোলা ছিল—দেখিলাম মুক্ত আকাশে অসংখ্য তারকা জ্বলিতেছে। নিদ্রাহীন চোখে রাত্রি কাটিয়া গেল—ভোরের দিক হাওয়ায় আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল হইল; ঘুমাইয়া পড়িলাম। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম বেশ বেলা হইয়াছে। মুখ হাত পা ধুইয়া চা-পানে করিতেছি, ঠিক সেই সময়ে সুকুমার আসিয়া ডাকিল।

আমি কহিলাম—কে খোকা বাবু যে।

"চলুন আমাদের বাড়ী যেতে হবে।"

একেবারে কথাবার্ত্তা নেই—চলুন। কেন আমি কি ওয়ারীণের আসামী?"

"তা আমি জানিনি আমার ওপর হুকুম আছে যে ধরে নিয়ে যেতে হবে।"

"হুকুম দিয়েছেন কার তিনি?"

"বলব না।"

"তা হলে আমিও যাব না।"

"বেশ, যাবেন না—যেতেই হবে।"

"কিছুতেই নয়।"

আচ্ছা, তাহলে আমি চল্লাম—সত্য সে চলিয়া যায় দেখিয়া, জিজ্ঞাসিলাম। আমি কহিলাম—"দিদি বুঝি যেতে বলেছেন।"

ওরা দিদি কেন বলবেন, তিনি বুঝি কাউকে কিছু বলেন। ছোড়দি ধরে নিয়ে যেতে বলেছে। বলে দিয়েছে "যদি ধরে আনতে পারিস্ত তোকে বকশিস দেব—আর যদি এখন না আসেত বলে আসিস, যে আমি তাকে গিয়ে কিন্তু বেঁধে আনব।" সত্যি ছোড়দি কোত্থেকে এক-গাছা বেশ মোটা দড়ী যোগাড় করেছে। আপনি হাস্‌ছেন ভাবছেন আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছি, চলুন দেখিয়ে দেব'খন।"

একদিন যাই নাই, তার জন্য তলব পড়িয়াছে। একদিনের অদর্শন তাও অসহ্য লক্ষ্মী ভাকিয়াছে—কিন্তু এ ডাক ত তার নয়! হায়রে মানুষের মন! খোকা বাবুর সঙ্গে রওয়ানা হইলাম।

(১২)

সিঁড়ির উপর উঠিতে উঠিতে ছোড়দি, ছোড়দি করিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে সুকুমার বিদ্যুতের মতন ছুটিয়া গেল। আমি সিঁড়ির সামনের ঘরটায় দাড়া দিয়া প্রবেশ করিলাম। গৌরী ও মাতাঠাকুরাণী বসিয়াছিলেন—আমাকে দেখিতে পাইয়া গৌরী মাথার কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিল। মাতাও উঠিলেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—সঙ্কেতে একখানা চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। গৌরী ও আমি রহিলাম। দুইজনে চুপ করিয়াই বসিয়া রহিলাম। শেষে আমি কহিলাম—গৌরী তোমার কি সঙ্কোচ যাবে না?"

"কি জানি" বলিয়া সে শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল। "কেন, এখনও তোমার এত দুঃখু কিসের? তবে শোন বলি, তোমাকে পেয়েও আমি এখনও নিশ্চিন্ত হই নি—যেন এখনও কোন্‌খানটায় একটা ব্যবধান রয়ে গেছে—যেন একটা বাধা পথটাকে জটিল করে রেখেছে।"

গৌরী স্তব্ধ হইয়া শুনিল এবং তার বেদনাকাতর দৃষ্টি-খানি আমার উপর নিক্ষেপ করিয়া, একটু হাসিল—সে হাসি বড় করুণ, বড় মর্ম্মান্তিক!

আমি গাঢ়স্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার যেন কোন্‌খানটায় বেদনা রয়েছে, তুমি যেন নিজেকে চেপে রেখে আমার কাছে ধরা দিতে চাও—তাই তুমি ভালবাসা দিয়ে আমাকে ঘেরে ফেলেছ, সেটা যত সত্যি হোক্ না কেন, তার দ্বারাই আমি এটুকু বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে তুমি নিজের কাছে এমন একটা জিনিষ চেপে রেখেছ, যেটা

তোমাকে বরাবর কষ্টই দিয়ে আসছে। আমাকে বলবে না গৌরি! বল, তোমার কি হয়েছে—এই বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া যেই উঠিতে যাইতেছি, সে ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আহা কি যে কর, এখুনি যে লক্ষ্মী এসে পড়বে। কৈ আমার কি হবে আমার ত কিছু হয়নি।"

কিছু হয়নি? ওটা ত তোমার মুখের কথা—মনের কথা ত নয়।" এই বলিয়া আমি চুপ করিলাম। একটু পরে গৌরী কহিল—তুমি আমার ওপর রাগ করলে?"

"কই, নাত।"

"তবে চুপ করলে যে।"

"চুপ করে ভাবছিলাম।"

"কি ভাবছিলে।"

"এই—তোমার—কথা।"

"আমার কথা?"

হাঁ, তোমারই কথা—এত দিন ত ভাবিনি, তাই তার মুখ শুধু পুরিয়ে দিচ্ছি। তুমি যে আমার সমস্ত অধিকার জুড়ে বসেছ।" গৌরী লাল হইয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে কহিল—আমারও ত ঐ ভাবনা।"

"সে কি গৌরী?"

বলছি।—এই সময় দ্বার হইতে সাড়া পৌঁছিল "দিদি" সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্মীর আবির্ভাব। লক্ষ্মী আসিয়াই কহিল—যা, বেশ ত আমি আসতেই নীরব, তা বল না বাপু আমি চলে যাচ্ছি—গৌরী কহিল—না, ভাই তুই বোস্ বাসনি, এতক্ষণ কি করছিলি।

"বেশ্ লে জামাই বাবু, দিদি না তবে কথা বলতে জানে না—কেমন কথা চাপা দিলে।" গৌরী থামিল না, চট করিয়া বলিল—"ওলো, তোর জামিজুরি দেখা যাবে'খন—ভগীন এলে এমন ভাল মানুষটী সাজ্‌বেন যে আর বলা যায় না, সাত চড়ে তখন রা বেরোয় না।

"ইস, তাই বই কি, দেখব'খন।"

চের দেখা আছে যে—নতুন করে আবার কি দেখাবি?

কথার গতি ফিরাইবার জন্য লক্ষ্মী আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—জামাই বাবু, আজ বিকেলে তোমার এখানে নিমন্ত্রণ রইল—এস, এস, এস। দাত তাড়াতাড়ি তোমাকে কি আমি সাধ করে ডেকে পাঠিয়েছি, দিদি ত জেনেই খুন। অনেক রাত হয়ে গেল যখন তুমি এলে না, তখন দিদি কি বলছিল, তা জান"—লক্ষ্মি, কি করিস, আমি আবার তোকে কি বলাব"—বলিয়া গৌরী সজোরে লক্ষ্মীর মুখ চাপিয়া ধরিল।

"তা, সে যা হোক, জামাই বাবু, তুমি কিন্তু এস।"

"তোমার যখন নেমন্তন্ন, তখন না এসে কি পারি"—"অতিথি যদি না বুঝতে আমার আহ্বানের পেছনে যত বড় একটা ব্যাকুল নীরবতা সমস্ত আগ্রহ নিয়ে পথ চেয়ে তোমারই জন্য দাঁড়িয়ে আছে।" আমি তার কথা শুনিয়া হাসিলাম, বেলা হইয়াছে দেখিয়া উঠিলাম। লক্ষ্মী বলিল—এত বেলা হয়ে গেল, খেয়ে গেলেই ত হ'ত।"

কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, তবে কি জানি বাড়ীতে পড়ে আমার অন্ন কাঁদবে, সেটা ঠিক নয়—বলিয়া সজোরে উঠিলাম। আর কেহ বাধা দিল না।

বাড়ী ফিরিলাম কিন্তু মন পড়িয়া রহিল। বিকাল আর কিছুতেই হয় না—দিবস হঠাৎ এত দীর্ঘ হইল কেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া নিজের উপর বিরক্ত হইতে লাগিলাম। চং চং করিয়া ঘড়িতে চারটা বাজিল। আমিও তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করিয়া লক্ষ্মীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলাম।

পরিচিত সিঁড়ি বাহিয়া পরিচিত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম যে সে ঘরে জনপ্রাণী নাই—এ ঘরটিতে আজকাল বড় কেহ থাকিত না, কেননা ওটা আমার ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

সুকুমারকে ডাকিলাম। নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে গিয়া বসিলাম। পূর্ব্বার ডাকিব ডাকিব ভাবিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে গৌরী দেখা দিল। সহসা এক্‌বেবারে আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"ওমা, চুপটি করে একলা ঘরে কি করছ, খবরও দিতে পারনি।"

আমি কহিলাম—সুকুমারকে এসেই ডেকেছিলাম, সে ডাক-বোধ হয় পৌঁছয়নি।"

গৌরী কহিল—"না, কই আমরাত কেউ জানিনি। ভগীন এসেছেন, তাঁকে নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম।"

আমি কহিলাম—"আমিও তাই অনুমান করছিলাম, আনন্দের কল্লোল আমার কানেও এসে পৌঁছেছিল।"

সৌরী হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল—সব চেয়ে যেখানটা ফেঁপে ওঠে, আজ কিন্তু সেইখানটাই সব চেয়ে নীরব। আমিও রঙ্গ করিয়া কহিলাম—সমুদ্র যেখানে সত্যিই অতল সেখানে আর চাঞ্চল্যের লক্ষণ বড় একটা দেখা যায় না।

সৌরী শুধু হাসিতে লাগিল। সৌরী কহিল—তুমি একটু বোস, আমি এখনি আসছি।"

সৌরী চলিয়া গেল, কাজেই আমি একেলা বসিয়া রহিলাম। বেশীক্ষণ একা থাকিতে হইল না। সৌরীর সঙ্গে করিয়া আর একজনকে আনিল—বুঝিলাম তিনি লক্ষ্মীর স্বামী পূর্ব্ব হইতেই বোধ হয় আমার পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাই প্রথমেই আমাকে নমস্কার করিলেন। একখানা চেয়ার দেখাইয়া আমি তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। সৌরী আমাদের বসাইয়া আবার চলিয়া গেল। আমরা দুজনে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম।

সৌরী সহসা ঘরে ঢুকিয়া আমাকে মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—শিগ্‌গির একবার এস। যতীনবাবু, তুমি ভাই উঠ্‌লে যেন, তোমাকেও ডাকিনি। তোমাকে ডাকলাম না বলে রাগ কোর না—ওঁকে একটা মজা দেখাব তাই ডাকলাম।

যতীন বসিলেন, আমি উঠিলাম। সৌরী আর একটী ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রবেশ করিবার জন্য সঙ্কেত করিল। ঘরের কোণে যেয়াটোপের মতন ঘোমটা দিয়া, নিস্পন্দ ও আড়ষ্ট হইয়া, কে একজন বসিয়া আছেন—সৌরী ঘরে ঢুকিয়াই হাসিয়া লুটিয়ুটি হইল, পরমুহূর্ত্তেই আড়ষ্ট রমণীর মুখাবরণ প্রায় উন্মোচন করিয়া দিলে—দেখিলাম সে মূর্ত্তি আর কাহারও নহে, স্বয়ং লক্ষ্মীর। আমি ও খুব খানিকটা হাসিলাম।

আমাদের কাণ্ড দেখিয়া লক্ষ্মী ছটফটে বলিল—আহা তারী মজা পেয়েছেন, আর কি। আর দিদি, ছিছি তোমার এই কাজ ভাই, তুমি না আমায় দিলে"—বলিয়া দিদিকে অনুযোগ করিল।

সৌরী কহিল—আমার বেলায় মনে ছিল না, ভাই। লক্ষ্মী কহিল—আহা, আমি কি আর করেছি।

সৌরী কহিল—কিছুই না।

আমি কহিলাম—লক্ষ্মী এখানে একলাটি একলাটি চুপ করে বসে কি হবে। চল ও-ঘরে যাই।

মৃদুকণ্ঠে সে কহিল—আমার বড় লজ্জা করে যে।

আমি কহিলাম—কি লক্ষ্মিটি, এখানে একেবারে একলাটি বসে আছ, আচ্ছা ওখানে গিয়ে চুপ করেই না হয় বসে থাকবে।

কাতরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া সে শুধু উত্তর দিল—যাই হবে আমি মার কাছে যাই—বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আজ প্রভাতের বিদ্যুদ্দাম চলন-মূর্ত্তির কি বিপুল পরিবর্ত্তন—এত সহজে বালিকা তার স্বভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। বৈচিত্র্যই বোধ হয় রমণীর প্রকৃতি।

সৌরী ও আমি যতীনের কাছে ফিরিয়া গেলাম। যতীন আমাদের দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল—"কি বলুন ত?"

আমি উত্তর দিলাম—আর কি আমাদের উপোষপর্ব্ব একেবারেই গত—বলিয়া লক্ষ্মীর কথা বলিলাম।

ইহার পরে যতীনের সঙ্গে নানা কথা হইল—আমি নবে ডাক্তার হইয়াছি; সেও সদ্য ওকালতি পাস করিয়াছে। উভয়ের নিকট উভয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের নক্সার খসড়া এক রকম স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

সৌরী যে কখন্ চলিয়া গিয়াছিল, তার হুঁস অবধি আমাদের ছিল না—ইহাতে দুপাত্র জলখাবার লইয়া যখন সে হাজির হইল, তখন আমাদের চেতনা ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে কি আসিয়া দুই জনের চাঁই করিয়া দিল। কাজেই আমাদের উঠিতে হইল। সহাস্যে আমি যতীনবাবুকে কহিলাম—আসুন এগুলির সুবিচার করা যাক্।

যতীন কহিল—তথাস্তু।

আহারান্তে দুজনে আবার চেয়ারে গিয়া বসিলাম—বীরত্বব্যঞ্জকভঙ্গিতে লম্বা ঘোমটা টানিয়া পায়ের দিকে

হাতে করিয়া লক্ষ্মীকে আসিতে দেখিয়া সকলেই আমি হাসি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। অবগুণ্ঠনের আড়াল ভেদ করিবার শক্তি যদি আমার দৃষ্টিতে থাকিত তাহ'লে নিশ্চয় দেখিতে পাইতাম যে বড় বড় দুটি চোখের নীরব ভর্ৎসনা আমাকে মৃদু আঘাত করিতেছে এবং নীরব ওষ্ঠের কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে।

লক্ষ্মী যখন টেবিলের উপর পানের ডিবা রাখিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বিদ্রূপচ্ছলে কহিলাম—সংসারে অত বড় ঘোমটার যদি একান্ত প্রয়োজন থাকত, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান্ তাহ'লে তার ব্যবস্থা করতেন। লক্ষ্মী উত্তর দিতে পারিল না—চলিয়া যাইবার সময় শুধু তার হাতের চুড়িগুলি টুং টাং করিয়া বাজিয়া উঠিল। সেদিন আড়ালে আমাকে সে মিনতি করিয়া বলিয়াছিল—"জামাইবাবু, সবাইয়ের সাম্‌নে আমাকে অমন কর না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি। তুমি আমি আর দিদি যখন থাকব তখন যা খুসী বল, ঠাট্টা কর, আমি কিছু বলব না কিন্তু ওই একজনের সাম্‌নে আমাকে কিছু বলে সত্যিই আমার ভারি লজ্জা করে।" তার মিনতিপূর্ণ নয়ন দেখিয়া আমিও ব্যথিত হইলাম—তাই স্নিগ্ধকণ্ঠে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলাম—আচ্ছা লক্ষ্মি তাই হবে। আমার কথায় তার বড় বড় চক্ষু দুটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার শেষে বিছানা সেলে, আঁচলে মুখ মুছিতে মুছিতে গৌরী ঘরে ঢুকিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "গৌরী খাওয়া হয়েছে"। ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—হাঁ।

শয্যার এক পাশে আসিয়া সে বলিলে, আমি কহিলাম—"সকালে কি বলছিলে?"

"এখন কিছুই নয়"—বলিয়া চুপ করিয়া রহিয়া, আঁচলের খোঁট লইয়া খেলা করিতে লাগিল। আমি তার কাছ ঘেঁসিয়া গিয়া বসিয়া, অতৃপ্ত নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। আমার রকম দেখিয়া একটু হাসিয়া তার পরায় সে কহিল—কি যে রকম করি হচ্ছে?"

"দেখ্‌ছি তোমায় ভাল করে দেখ্‌ছি—তোমার চোখের আলোকের নীচেই কত বড় বেদনার ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠে, আমাকে কতদূর আঘাত দিয়ে, সত্যিই যদি সেটা তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পারতে, তাহলে অমন মিষ্টার হয়ে চুপ করে থাকতে পারতে না?"

আমার বুকে মুখ লুকাইয়া ঝিন্নকণ্ঠে সে কহিল—"আমার ওপর রাগ করলে, আমি কি তোমায় বলব না বলেছি।" আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া পলকহীন নেত্রে আর একবার দেখিলাম, তারপর ধীরে ধীরে তার মস্তক বিন্যাস হইতে আমার শুষ্ক অধরকে সিক্ত করিয়া লইলাম,—সে মুদ্রিতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু মুদিত করিল, অনন্ত সুখ বেদনায় নয়ন উন্মীলিত করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তখন তার লোপ পাইয়াছিল। বহুযোজন প্রসারীর উন্মুক্ত প্রেমধারায় আমার পাষাণস্তূপ হৃদয় গলিয়া গেল।

অতীতের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া পরস্পর দুটী হৃদয় যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে বিচ্ছিন্ন বীণার সুরে মিলনের রাগিনী সেখানে স্বতই অপ্রতিহত আনন্দে আপনাকে সপ্তাম রাখিতে চেষ্টা করুক, সংসারের নিজ অকরুণ বিচারের মাপকাটিতে, সে যে টিকিবে না, তাহা আমি তাল রকমই জানি এবং সম্ভবতঃ গৌরীও তাহা বুঝে,—তাই আনন্দায়ুক্ত হৃদয়ের ঘাবখানে কেহ বেদনা বাজিলেও তাহাকে ঘায়ের সাম্যাতীত ঘুমিয়া আমরা উভয়ে ম্লান হইয়া পড়ি।

প্রথম যখন চেতনা লাভ করিলাম—দেখিলাম গৌরী আমার বুকে মুখ লুকাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। আকুলকণ্ঠে তাকে একটু জোরে চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলাম—"গৌরী, তুমি কাঁদ্‌ছ?"

ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া আবেগভরা কণ্ঠে সে কহিল—আজ অনেক কথা মনে পড়ছে—আমার মনটা কেমন করছে, চোখ্ কেবল জলে ভরে উঠ্‌ছে?"

কেন গৌরি?

তা ঠিক জানিনি। এতদিন তোমাকে মনে মনে কত নিষ্ঠুরই না ভেবেছি, আর আজ তোমাকে পেয়ে

হারাবার ভয়ে প্রাণ আমার হাহা করে বেড়াচ্ছে। যে সুখ আমার সবে এসেছিল, আনন্দে তাকে ভাসিয়ে দিয়ে, আজ নতুনের আশঙ্কা আমাকে দারুণ কষ্ট দিচ্ছে।"

তার কি সৌরি? তোমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

"না—না, তোমার পায়ে পড়ি,, আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাও। তুমি যে আমায় ভালবাস সেই আমার যথেষ্ট—তোমার স্মৃতিতেই আমার জীবন পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমাদের সুখের সংসারে, শান্তির সংসারে আমার জন্যে আগুন লাগিয়ো না—না জানি কোনোজন্মেই পাপ করতে পারব না।"

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে ভগবান্ যে জিনিসটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সেটাকে ফাঁকি দিয়ে, সমস্ত দুঃখের আগুনটাকে বুকে জীবন কাটাবার জন্যে তিনি কাউকে সংসারে পাঠান না, দুঃখের আগুনে লোহ পেরিয়ে সংসারের কষ্টিপাথরে যেদিন দাম কষবে সেদিন হয়ত সিকি আনার সোনা হয়ে যাবে—তা না করে নিজের ঔদ্ধত্যের জন্য আজ নিষ্ঠুর ইচ্ছার চরণ তলে আমার সমস্ত বিসর্জন দিয়ে যদি ভালবাসুষটি সেজে ফুরে দিয়ে যাই, আমার এখনকার সমস্ত কাহিনী শুনেও যারা আমাকে নিশ্চয় মার্জ্জনা করবেন, কেননা যৌবনের চপলতায় একটু আধটু ভুল কখনও সংশোধন করে নিতে হয়, কখনও বা মার্জ্জনা করে মেয়েকে ঘুরু করে নিতে হয় এটা তিনি জানেন কিন্তু তাই বলে ভালবাসুষটি সেজে নিজের ফুরে দিয়ে যাবার আমার আর পথ নেই—আত্মপ্রবঞ্চনা করে চলবার পথকে সরল করে নেওয়ার চেয়ে বিপদের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরণকে আলিঙ্গন করা ঢের ভালো। তুমি আমাকে আজ আর বোঝাবার চেষ্টা কর না—আমি বুঝে সুঝেই এই সিদ্ধান্ত করেছি। যৌদ্দিকে সব লিখেছি। মার্থা আমাকে ক্ষমা করবেন না—তা আমি জানি, কিন্তু সে যত বাধাই পেতে রেখ, তা সে যতই কঠিন হোক না কেন—তা বলে তোমাকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করে গেলে আমার অন্তর্যামী আমাকে কোনো দিনই ক্ষমা করবেন না। তাঁর বিচারাসনে আমার দণ্ডের যেদিন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে, সেদিন বাবা যুধিষ্ঠির পার্বেন যে আমি তাঁর অবাধ্য পুত্র নহি। সৌরি, বিধাতার হাতে যেটা ভুল সেটা আপাততঃ যত প্রবল হোক্ না কেন, একদিন তার শেষ হয়ে যাবে। তখন তুমি আর তত ভাবিবে, তোমাকে নিয়েই আমার যত ভাবনা। হঠাৎ দারিদ্র্যের ভীষণ কষ্ট তুমি কি সহ্য কর্ত্তে পার্বে।

তুমি আমার কাছে থাকলে আমার সব সহ্য হবে—আমার আবার কষ্ট কিসের। আমার ভয় হয় তুমি কি সইতে পার্বে?"

"সৌরি, তোমার মুখ চেয়ে আমি সব সইতে পার্ব।" আমার কথায় তার বিষাদক্লান্ত সুন্দর মুখখানি হাসিরেখায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

(১৩)

সৌরির নিকট হইতে পত্রের উত্তর না পাওয়াতে আশ্চর্য্য হইলাম। পিতার পত্র পাইলাম মনে হইল আশিয়াছিলাম সেই ভাব চিঠিতেও দেখিলাম। এখনও ফিরিয়া যাইলে তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন—যদি পত্রপ্রাপ্তির ৩ দিনের মধ্যে না ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ ছিন্ন হইল, তিনি এইরূপ বুঝিবেন। বেশী কথা লেখা কিম্বা বলা তাঁর অভ্যাস নাই—কাজেই চিঠিখানা সংক্ষিপ্ত। অবিলম্বে কাশীর বাড়ীখানা ছাড়িয়া দিবার আদেশও করিয়াছেন।

যে আশঙ্কা আমাকে পীড়ন করিতেছিল আজ তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া, আমার বোঝা-ভারকে হাল্কা করিয়া দিল।

বাড়ী ফিরিব না, কাশীর বাড়ী ছাড়িতে হইবে—অথচ হাতে তেমন পয়সা নাই; পৃথক বাড়ীতে গেলে যুক্ত জোর মাসখানেক না হয় টানাটানি করিয়া চলিবে। শূন্য মন লইয়া চিন্তার জালে নিজেকে জড়াইতে লাগিলাম কিন্তু নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়া পাইলাম না।

সৌরীজেরও এড়াইয়া চলিতে লাগিলাম—আমার মনের মধ্যে যে বিপ্লব আসিয়াছে, তাহা সবাই বুঝিল,

লক্ষ্মী সবখানি জানিবার জন্য কত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই প্রকাশ করি নাই, কেননা আমার নিরুপায় অবস্থায় তাঁরা আমাকে সাহায্য করিতে চাহিবেন, তাহা গ্রহণ করাও যেমি আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহা প্রত্যাখ্যান করাও তেমি দুঃসাধ্য; তাই সৌরী যাহা সবিশেষ বুঝিয়াছিল, সভয়ে আমি তাহা গোপন করিয়া তাহাকে অন্যরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

যেটুকু না বলিলে নয়, সেটুকু আমাকে বলিতে হইল। আমার কথা শুনিয়া লক্ষ্মী তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করিল—না; না; তোমার কলকাতায় গেলে চলবে কেন? এখানে আমাদের কে দেখবে শুনবে? সত্যিই যদি যাও, তাহলে আমাদের নিয়ে চল। বা'র সবে শরীরটা ভাল হয়ে আসছিল, তাঁর অসুখটা আসা। দুচার দিন আগে যদ্যেইত ব'ত।

আমি কহিলাম—তাহলে ভাল হ'ত, তা আমি জানি; ঘটনাকে তাহলে তোমরা আটকাতে পারতে। আর যেটা একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে, চারদিন আগে সে দরকারটা যে মনেই হয়নি—ঘটনা ও অবস্থাকে অতিক্রম করে চলতে পারে, সে রকম মানুষ সৃষ্টি হয়নি, সুতরাং তার জন্যে তোমরা আমাকে দোষ দিতে পার না।"

লক্ষ্মী কহিল—দরকারটা যে হতে পারে আমরা তা'ত অস্বীকার করছিনি, অথচ দরকারটা ঠিক ধরতে পারছিনি বলেই না আমরা পেঁদে পড়ছি।"

আমি কহিলাম—জানলেও যে বড় বেশী কিছু করতে পার্তে তা মনে হয় না।

লক্ষ্মী উত্তর দিল—আমাদের তরপের বাঁধটা কেটে যাবে আপাততঃ সেইটেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

লক্ষ্মী না-হোক-বক্তা, সৌরী উৎসুক নয়নে আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল। আমি সব খুলিয়া বলিলাম। লক্ষ্মী কহিল—এর জন্য এত ভাবনা?

আমি কহিলাম—এটা কি কম ভাবনা।

লক্ষ্মী কহিল—এখন ও-ভাবনা থাক; বৌদির কোনো চিঠি পেয়েছ?

আমি কহিলাম—না।

সৌরী কহিল—তাঁর উত্তর না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে; তিনি চুপ করে বসে থাকবার লোক নন্।"

আমি কহিলাম—"তুমি যে দেখছি আমার চেয়ে তাঁকে ভাল রকম চিনেছ।"

"লক্ষ্মী কহিল—"তা চিনি আর না চিনি, বেশী মন খুলিস নমুনা কর। তারপরে বল লক্ষ্মী তাঁকে চেনে কি না।"

লক্ষ্মীর কথাই ফলিল—দিন দুএক পরে বৌদির চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন:—

কল্যাণীপুর।

কল্যাণীয়েষু—

চিঠির শিরোনাম দেখেই বুঝতে পারছ যে আমি এখন বাপের বাড়ী। হঠাৎ বাপের বাড়ী চলে আসাতে তুমি বোধ হয় খুব বিস্মিত হবে—হবারই কথা; কেন না যারো বৎসর পরে হঠাৎ বাপের বাড়ী আসার ইচ্ছাটা কেন এত প্রবল হল, সেটা বুঝে ওঠা তোমার পক্ষে খুবই কঠিন হবে। কেমন নয় কি? আমার কাছে যে জিনিসটা দুর্বোধ্য মনে হয়েছে, সেটা অন্যের কাছে আরও দুর্বোধ্য হওয়া বিচিত্র নয়।

বারো বছরের আগের ঘটনা—আজ আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—সে সত্যিই আজ এক যুগের কথা, তবু মনে হচ্ছে যেন সেদিন! এর মধ্যে কত বিচিত্র পরিবর্ত্তনই দেখ্‌লুম।

তবে ভাই তোমায় সত্যি করেই একটা কথা বলি, অসহ্য দুঃখের আঘাত সহ্য করতে পারিনি বলেই এখানে আমি এক রকম পালিয়ে এসেছি। বাড়ীর সুদ্ধি খুঁটি-নাটির মধ্যে তুমি এমি জড়িয়ে আছ, সেখানে তোমাকে বাদ দিয়ে টিঁকে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। যিনি এতটুকুটিকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে চিরকালের জন্য চলে গেলেন—আজ এই দুর্দ্দিনে তাঁর কথাই আমার সব চেয়ে বেশী মনে পড়ছে। আমি যদি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করি, তাঁর অভিশাপ আমাকে দহন করবে,—সেই শেষ সময়ে আমার কথায় নিশ্চিন্ত হয়েই না তিনি হাসতে হাসতে চলে গেলেন। যতই কঠোর হোই না কেন সে

ব্রত আমাকে পালন করতে হবে, তাই সে ব্রত পালন করতে আমাকেও যদি শাস্তি বরণ করতে হয়, আমি মনকে তার জন্য প্রস্তুত করেছি। মায়ের আদেশ পালন করতে গিয়ে যদি অপরাধী হই, সে দোষ আমার নয়—সংসারের আদালতে সন্তানের আইনের কাছে আমি বেকসুর খালাস পাব না জানি কিন্তু তার চেয়ে বড় বিচার যদি কিছু থাকে, সেখানে পুরস্কার না পাই, তিরস্কার পাব না—এই কথাটাই মনের মধ্যে আজ আমাকে কে যেন জোর করে বলছে।

বাবা তোমাকে কি লিখবেন, তা জেনেই এসেছি। এতদিনে নিশ্চয় তাঁর চিঠি পেয়েছ। যখন তোমার দাদাকে ও আমাকে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেন, আমি কোনো কথারই প্রতিবাদ করিনি—বাবার কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আমার অধিকারও নেই—তিনি যা ভাল বুঝেছেন, তিনি তা করেছেন, আমি যা ভাল বুঝি তা করবার সময় এখন আমার উপস্থিত। কত বড় দুঃসাহস যে আমার, সেটা পরে বুঝবে—বাঙালীর মেয়ের হাতে পায়ে এখন বেড়ী দেওয়া আছে যে সতর্ক পাহারার গণ্ডীর মধ্যেই তাকে চলা ফেরা করতে হয়—সেই বেড়ী ভেঙে গণ্ডী কেটে চলতে যাওয়ার যে বিপদ কতখানি সে কথা আমি খুব ভাল রকমই জানি। একটা ঝোঁকের মাথায়, কিম্বা একটা কোনো খেয়ালের বশে, আমি যদি কিছু করতে চাইতুম, তা'হলে সে ঝোঁক কেটে গেলে কিম্বা খেয়াল চলে গেলে, আমি নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হতুম কিন্তু কর্তব্যের আহ্বান আমার অন্তরাত্মার কাণে এসে পৌঁচেছে, আজ তাই স্পষ্ট বুঝেছি যে তার চেয়ে বড় জিনিস আর কিছুই নেই, তাই তাকে বরণ করতে গিয়ে যদি ক্ষতি সহ্য করতে হয়, তা আমাকে হাসিমুখেই করতে হবে, কিন্তু পিছু হটিয়া পালাবার পথ আর নেই!

ভেবেছিলুম তোমার দাদা বাবাকে কিছু বলবেন—কিন্তু তিনি কিছু বলেন না। তার জন্য তাঁকে দোষ দিইনি—কেন না স্বভাবকে অতিক্রম করে চলা পুরুষ মানুষের হাতে নেই। আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁকে দিয়ে বলাই—কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম সেটা ঠিক হবে না। তাই আজ নিজের পথ নিজে চিনে নিয়েছি।

আমি যে এখানে হঠাৎ চলে এলুম, তার কারণ সম্বন্ধে বাবা যে সম্পূর্ণ উদাসীন, একথা বলতে পারিনি, তবে তিনি যে আমাকে সম্পূর্ণ বোঝেননি—আজ না হয় দুদিন পরে সেটা তিনি খুব ভাল রকমই বুঝবেন। তিনি যা বর্জন করেছেন, আমি কেন যে তা বর্জন করতে অক্ষম, এই ছুটো জিনিসের বিচিত্র মীমাংসার সমাধান করবার সময় এসেছে, তা তিনি যতদিন না পারবেন সংসারে শান্তি ও সুখ ফিরে আর পাওয়া যাবে না।

তোমার মাথার ওপরে মেঘ ঘনিয়ে এসে অন্ধকারকে ঘনাট করে তুলেছে—বিপদে হাল ছেড় না; যিনি বিপদভঞ্জন তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন। দুর্দিনের অন্ধকার যতই ভীষণ হোক্ না তার শেষ হবেই। পরীক্ষায় পশ্চাৎপদ হয়ো না—তুমি মানুষ কিনা এবার দেখা যাবে। প্রবাসে নিজেকে অসহায় ভাবছ—ভয় কিসের? যিনি অসহায়ের সহায় তাঁকে ডাকতে শেখ।

প্রসাদী ফুলের মতন ঘটনার স্রোতে ভেসে এসেছে, তাকে কখনও অবহেলা কর না—কেননা দৈব যাকে অজ্ঞাতসারে এনে দিয়েছে, তার মধ্যে দেবতার ইঙ্গিত আছে। তাকে যখন তুমি গ্রহণ করেছ, তখন তোমার নিশ্চয় মঙ্গল হবে। বাবা যদি ঠিক সেটা বুঝতে পারতেন, তাহলে তাঁর জন্যে আমার ভয় হত না। একটা তুচ্ছ ঘটনাকে বড় করে তুলে একটা বড় ঘটনাকে তিনি তুচ্ছ করছেন বলেই সত্যিই তাঁর জন্যে আমার ভয় হচ্ছে। যেটুকু সাহস করে বুঝিয়ে দিতে পারে, এমন লোকও কাউকে দেখ্‌ছি না, তাই সে ভার আমাকেই নিতে হবে—সেই উদ্দেশ্য নিয়েই নিজের ঘর-সংসার ছেড়ে একযুগ পরে আজ আবার আমি বৈবাহ্যের ভাইয়ের সংসারে এসেছি!

আমার আর একখানা চিঠি না পেলে, আমার লিখো না। আশা করি শারীরিক ভাল আছ।

সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি তোমরা সুখী হও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষিণী,
বৌদি।

পুঃ—

ছোট বৌকেও আমার আশীর্ব্বাদ দিও—তাকে শুধু বলে রেখ দিদি থাকতে তার কোনো ভয় নেই।

পত্রখানা বহুবার পড়িলাম—উচ্ছ্বসিত হৃদয় অন্তস্তলে আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। হৃদয়হীন নির্ম্মমতার রঙ্গভূমিতে এই চির স্নেহময়ী কল্যাণময়ী রমণীর মূর্ত্তি ঘুরিয়া আমাকে আর্দ্র করিল। গোল গোল স্পষ্ট হরফের অন্তরালে আমার জীবনের এই সঙ্কটকালে একখানি হৃদয়ের অসীম করুণা স্নেহাকুল অন্তরের সুদূর হইতে আমার স্নেহলাকাঙ্ক্ষ হৃদয় স্পর্শ করিয়া—সে শুধু তার সমস্ত জ্বালা, সমস্ত বেদনা, সমস্ত আশঙ্কাকে শীতল প্রলেপে শান্ত করিতে চাহিতেছে। আসন্নপ্রায় শাবককে যেমন করিয়া বিহঙ্গিনী আপনার পক্ষপুটে রক্ষা করে, ঠিক তেমি করিয়াই এই নিঃসহায় নারীচিত্তের মাতৃস্নেহদ্বারা আজ আমাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র! সংসারে এই বিচিত্র লীলার অভিনয়ে আমার প্রাণ হর্ষ বিষাদের আলোক আঁধারে বিচিত্র কুহকের সৃষ্টি করিল।

বৌদির চিঠিখানা ঠিক ভাল বলে বুঝিতে পারিলাম না—তবে একটা উদ্বেগ লইয়াই যে তিনি পিত্রালয়ে গেছেন, সেটা বুঝিতে পারিলাম। আমার ভয় হইল, আমাকে স্নেহ করিতে গিয়া পাছে তিনি বিপদে পড়েন—তারই পরিণাম আশঙ্কা করিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। স্পষ্ট করিয়া কিছুই ধরিতে না পারিয়া ক্লান্তিভারে দেহমন অবসন্ন হইল।

(১৯)

সৌরী চিঠিখানা পড়িয়া একটু ম্লান হাসিয়া আমার হাতে ফেরত দিল—কোনো কথা বলিল না। তার এই স্তব্ধ ভাব দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম; আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। একটু পরে তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি যে একেবারে চুপ!" সে বিষাদের সুরে উত্তর দিল—"আমি আর কি বলব—আমার জন্যেই এই বিপদ"—তার কথায় বাধা দিয়া আমি বলিলাম—"অমন সেরূপ তোমাকে দায়ী করা যায় না।"

না যাক্, আর না যাক্, আমার জন্যেই সব, একথাও অস্বীকার করবার জো নেই। এই রকমই একটা কিছু হবে জান্‌তুম, তাই মা তোমাকে ফিরে যেতে বলেছিলুম, একজনকে বাদ দিলে সব যেমন ছিল তেমিই থাকত, শুধু একজনকে নিতে দিতে কতখানি নষ্ট হ'ল, একবার হিসেব কর দেখ। এখনও তুমি আমাকে ফেলে যাও বল্‌ছি, এখনও বাবার হাতে পায়ে ধরে গিয়ে ক্ষমাভিক্ষা চাও গে—এখন সময় আছে।"

"এই না বৌদির চিঠি পড়লে—তিনি কি বলেছেন। তা' যাক্ সৌরী কথায় কথায় তুমি রাগ, রাগ কর না, আমার কিন্তু তোমার ঐ কথাটা বুকে গিয়ে একেবারে বেঁধে—তুমি বোধ হয় আমাকে ভালবাস না।"

তার বুক একটু কাঁপিল একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল—তারপর গদগদ ধরিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সে শুধু নির্নিমেষ-নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি স্তব্ধ হইয়া তাকে দেখিতেছিলাম। আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া সহসা সে উত্তেজিত স্বরে কহিয়া উঠিল—তোমাকে খুব বেশী ভাল না বাস্‌লে অমন করে দিয়ে যাবার কথা বল্‌তেই পারতুম না। নিজের সুখের জন্য তোমাকে আট্‌কে রেখে তোমাদের সংসারে আমি আগুন লাগাতে চাইনে। তোমাকে যে আমি পেয়েছিলুম, তুমি যে আমার, তুমি যে আমার অন্তরের আসনে অধিষ্ঠিত, সেখান থেকেও তোমায় কেউ কেড়ে নিতে পারবে না; বাইরে তোমাকে হারিয়ে ভেতরটা আমার সনাথ করে রাখ্‌ব—সেখানে আমার অন্তর্যামী রূপে তুমি চিরদিন আমার পূজা গ্রহণ করতে।—বলিয়া সে চুপ করিল। আমি দেখিলাম মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু তার গণ্ড বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া পড়িতেছে। নারী প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ ভাব আর এই অদ্ভুত রমণী প্রকৃতির আত্মত্যাগ আমার যৌবনের যৌবরাজ্যের নবীন সম্রাটত্বের উপর একটা প্রশান্ত ভাবের ছায়া ফেলিয়া তাহাকে আরও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিল। জগৎসংসার সুন্দর, সৌরীও সুন্দর কিন্তু আরও সুন্দর এই মমতাময়ী রমণী হৃদয়।

আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে নীচে

আসিয়া আমাদের দুজনকে বিস্মিতভাবে দেখিল এবং সকৌতুকে বলিয়া উঠিল—"তোমাদের কি হয়েছে বলত ?"

আমি বলিলাম—"কি হবে, কিছুইত নয়।"

সে চটে্ করিয়া আমাকে উত্তর দিল—"আমা আমাকে আর ছাকা বোকাতে হবে না। গলার আওয়াজ যে এখনও ভারি ভারি।" আমি আর কথা না কহিয়া বৌদির চিঠিখানা তার হাতে দিলাম। সে চিঠিখানা পড়িয়া আমার হাতে দিবার সময় বলিল—"তোমার এই বৌদিটিকে আমার কিন্তু বড় দেখ্‌বার ইচ্ছে ছিল, তা যা'হোক ভগবান এবার সে সুবিধে করে দিচ্ছেন।" সৌরী ও আমি বিস্ময় প্রকাশ করাতে সে হাসিয়া কহিল—"তোমাদের যেমন বুদ্ধি, চিঠিতেইত রয়েছে যে তিনি আসছেন, তা না হলে সত্যিই আমি তাঁর অন্তর্যামী নই যে তাঁর অন্তরের কথা জান্‌তে পারব।"

আমি কহিলাম—"আমরাত কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি—তুমি যখন পড়েই তাঁর অন্তরের কথা বুঝতে পেরেছ, তখন অন্তর্যামী মত বা কিসে ?"

সৌরী কহিল—"তোমাদের মনের ঠিক থাক্‌লে, আমি যা সহজে বুঝেছি, তা তোমরা সহজে বুঝতে পারতে।"

আমি তাড়াতাড়ি কহিলাম—"লক্ষি, এখন রঙ রাখ—লক্ষি বল না ?" আমার কণ্ঠে উৎকণ্ঠার পরিচয় পাইয়া সে আরও রঙ চড়াইয়া দিল। কহিল—জাহাজ, বাত টিপে নাড়ির গতি দেখ্‌তে পার, আর এতকাল ঘর করে এসে প্রাণের গতির কোনো খোঁজই রাখ না। তোমরা দেখ্‌ছি ডোবড়ার সঙ্গে, শাঁস জল কি তার আবাদ জান না।"

আমি ক্রমেই অধীর হইয়া পড়িতেছিলাম, তাই ব্যাকুল ভাবে তাকে বলিলাম—"লক্ষি, কথাটা খুলেই বল না ?"

স্থিরকণ্ঠে সে কহিল—"উঁহু একেবারে যে ভর সয় না। আগে, তোমাদের কথা তোমাদের বল্‌ব নাত কি ? লুকিয়ে আমার দাদা কি ? দেখি চিঠিখানা !" চিঠিখানা তার হাতে দিলাম।

সে উচ্চকণ্ঠে পড়িল—"আমার আর একখানা চিঠি না পেলে আমার লিখো না।—অর্থাৎ কি না, তুমি উত্তর দিলে সে চিঠি তিনি পাবেন না, তার মানে হচ্ছে যে তার পূর্বেই তিনি এখানে এসে পড়বেন।"

আমি রুদ্ধনিশ্বাসে তার কথা শুনিতেছিলাম, তার কথা শেষ হইবামাত্র ঘর চালিয়ের ভাঙ্গা মুখ দিয়া বাহির হইল—সর্বনাশ ! লক্ষী আমার দিকে তাকাইয়া কহিল—"মোটেই না।"

আমি বিরক্তিপূর্ণস্বরে কহিলাম—"তুমি ছেলেমানুষ লক্ষি, এর যে কি ভীষণ পরিণাম, তা তুমি কেমন করে বুঝ্‌বে।"

গলবস্ত্র হইয়া হাতযোড় করিয়া লক্ষী আমাকে কহিল—"তা ঠিক জামাইবাবু, আমি ছেলেমানুষ সেটা আমি বেশ ভাল রকমই জানি, কিন্তু তা বলে যে আমি কিছুই বুঝিনি একথাটা আমি জানতাম না—আমার যে একটু বুদ্ধি আছে এই হাতে হাতে তার প্রমাণ দিয়েছি। ভীষণ পরিণামে তুমি শিউরে উঠ্‌ছ, তাতে তোমার অভিজ্ঞতার মৌজ দেখে আমার যদি হাসি পায়, তুমি কিন্তু রাগ কর না। পরিণাম ভাল করবার জন্যই তোমার বৌদি এখানে আসছেন।"

আমি কহিলাম—"এখানে এলে কেমন করে ভাল হবে ?" লক্ষী কহিল—"তা আমি ঠিক জানিনি—শুধু এইটুকু বুদ্ধি তুফানের মুখে পাকা মাঝি হাল ধরলে নৌকা রক্ষা পাবার আশা থাকে। তোমাদের সংসারে যে তুফান উঠেছে তাতে যদি তিনি শুধু কোনের বৌটি হয়েই চুপ্‌টি করে বসে থাকতেন, তা'হলে জীবন ভরে চোখের জলের কারবারেই তাঁর দিন কাবার হ'ত, কিন্তু তাতে যে কারুর বড় উপকার হ'ত তা মনে হয় না, তাই আজ এমন পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, যেখানে প্রথমে সব ভেঙ্গে দিতে হবে—তারপর মনে নিয়ে নতুন করে গড়ে তুলবার তাঁর শক্তি আছে, আজ তাই তিনি ভাঙবার পথেই চলেছেন। তাঁর নিজের শক্তির ওপর তাঁর বিশ্বাস আছে, তা না হলে এ দুঃসাহসের কাজ তিনি কখনই করতে পারতেন না।"

আমি স্তব্ধ হইয়া সব শুনিলাম—সৌরী মুগ্ধ হইয়া সব শুনিতেছিল। সে মুগ্ধকণ্ঠে কহিল—"লক্ষি, তুই ভাই ছোট

বয়েও আমার চেয়ে সব বিষয়েই বড়।"—লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল—"দিদি, ওরকম করে বলে আমি কিন্তু এখুনি চলে যাব। আমি ছোট বলাবরই বেশ ছোট থেকে যাই, তুই তাই আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করিস। তোর দুঃখু কষ্ট দেখে আমি সংসারকে একটু চেনবার চেষ্টা করি কি না, তাই বয়সের চেয়ে আমার বুদ্ধিতে একটু বেশী পাক ধরেছে—আমি পাকা মেয়ে হয়েছি"—বলিয়া সে আবার তার মিষ্ট হাসিতে ঘরখানি ভরিয়া দিল!

আমি কহিলাম—"লক্ষ্মি, এ সবত তোমার অনুমান!"

সে দৃঢ়স্বরে বলিল—"মোটেই নয়, এ আমার গণনা।"

আমি কহিলাম—"তুমিও দৈবজ্ঞ নয় লক্ষ্মি?"

আমার পরিহাসে সে একটু উত্তপ্ত হইল—তার সুন্দর গ্রীবাখানি বাঁকাইয়া দৃপ্তকণ্ঠে সে কহিল—"আমি অন্তর্য্যামীও নই, আমি দৈবজ্ঞও নই, আমি যা বুঝেছি তাই বলেছি, দুদিন অপেক্ষা কর সবই দেখতে পাবে, তখন বুঝতে পার্বে লক্ষ্মী ছেলেমানুষ হলেও সংসার সম্বন্ধে সে তত ছেলেমানুষ নয়। দেখি চিঠিখানা" এই বলিয়া সে জোরে পড়িতে লাগিল ;—

'প্রণামী ফুলের যখন ঘটনার স্রোতে যে ছেলে এসেছে, তাকে কখনও অবহেলা কর না—কেননা দৈব যাকে অজ্ঞাতসারে এনে দিয়েছে, তার মধ্যে দেবতার ইঙ্গিত আছে। তাকে যখন তুমি গ্রহণ করেছ তখন তোমার মঙ্গল হবে। বাবা যদি ঠিক সেটা বুঝতে পারতেন, তাহলে তাঁর ক্ষমা আমার ভয় হইত না। একটা ক্ষুদ্র ঘটনাকে বড় করে তুলে একটা বড় ঘটনাকে তিনি ক্ষুণ্ণ করছেন বলেই সহাই তাঁর জন্যে আমার ভয় হচ্ছে। সে টুকু সাহস করে বুঝিয়ে দিতে পারে এমন লোকও কাউকে দেখছি না—তাই সে ভার আমাকেই নিতে হবে—সেই উদ্দেশ্য নিয়েই নিজের সুখ-সংসার ছেড়ে এক দূর পরে আজ আবার আমি দৈবাদেশে ভাইয়ের সংসারে এসেছি।"

বেশ করে জানলেও। তোমার বাবার জন্যে নির্ভর করতে পারলে তাঁর পথ এত কঠিন হ'ত না—কেন্ নির্ভর করতে পারেন নি সেটা আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান—তাই সব ভার তিনি দিয়েছেন। পাকা ঘাটির মতন সব বিপদ কাটিয়ে তিনি সবাইকে নিয়ে তীরে উঠবেন—এ আমার বিশ্বাস। হয় ত তাঁর মনে এই একটা ধারণা থাকা অসম্ভবও নয় যে তোমাকে বর্জ্জন করলে বাহ্যতঃ তোমার বাবার তেমন ক্ষতি হবে না কিন্তু সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তোমার বৌদিকে বর্জ্জন করা বোধ হয় তাঁর শক্তির বাইরে, আজ তাই তিনি পিতা যখন পুত্রকে ত্যাগ করেছেন তিনি তাঁর স্নেহাতুরা হৃদয়ের করুণা দিয়ে তোমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে স্ত্রীলোকের বাহুবন্ধনের অক্ষয় কবচ দিয়ে সমস্ত অকল্যাণকে ঠেকে তোমার বাবাকে যে জিনিষটা বুঝিয়ে দিতে চান সেটাকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে বলেই ঘরের গণ্ডী ছেড়ে তাঁকে এমন এক জায়গায় দাঁড়াতে হয়েছে সেটার প্রকাশে তোমার বাবা বুঝতে পার্বেন, তাঁর উদ্দেশ্যটা কি—সেদিন পরীক্ষায় দিন, এবং সেদিন যে তোমার বৌদি ফলাফল কর্বেন, এ বিশ্বাস তাঁর যদি না থাকত এত বড় দুঃসাহসের কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না। বাপের বাড়ী যাওয়া ওটা একটা কৌশল মাত্র, কাশীতে আসাই তাঁর উদ্দেশ্য।"

আমি কহিলাম - "তুমি ঘড়টা সব জিনিস তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছ, আমি নিজে ততটা করিনি কিন্তু তোমার ধারণা যদি সত্য হয়, বৌদি যদি এই রকম পথই ধরে থাকেন তাহলে সব জিনিসটা হয়ত আরও জটিল হয়ে পড়বে। একদিন রাগ পড়লে হয়ত বাবা আমাকে ক্ষমা করলেও করতে পারতেন কিন্তু বৌদি যদি সত্যই কাশীতে আসেন, বাবা সেটা ভাবতে পারবেনই, তাতে তাঁর রাগ আরও হয়ত বেড়ে যাবে, তার ফলে এই হবে যে একদিন তিনি আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সে জায়গায় হয়ত আমার দাদার বিয়ে দেবেন।"

লক্ষ্মী দীপ্তস্বরে কহিল—"জামাই বাবু, তোমার বাবা কি কর্বেন অথবা না কর্বেন, সে বিষয়ে আমি কিছু জানিনি কিন্তু তোমার বৌদি যা করবার সঙ্কল্প করেছেন, সে বিষয়ে যে আমি ভুল করিনি, এটা আমি খুব জোর করেই বলতে পারি। তবে এটাও বলে রাখতে পারি যে তিনি যা করছেন, তা বিদ্বেষের উপর নিয়েই করছেন—স্নেহে অন্ধ হয়ে তিনি আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছেন না।

তোমার বাবাকে তুমি বোঝনা একথা বলতে চাইনি কিন্তু চালের এত বড় ভুল করে তিনি যে ঘরের ভাতে এসে বসবেন, এও ত আমার মনে হয় না। সাপ কামড়ালে মানুষ মরে কিন্তু তাকে বশ করবার মন্ত্র সাপুড়েরাই জানে। সে টুকু ভরসা মনে তার না থাকলে, সাপ নিয়ে খেলার তার পক্ষে অন্যায় যে—তেমনি তুমি হয়ত বিচারে তাকে অক্ষম বলে' সেখানে তিনি নিজেকে হেরিয়ে ফেলেছেন।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—"আমি কিন্তু ভাল করে এসব বুঝতে পারছিনে—বৌদি নতুন সোনাবাগানের সৃষ্টি করবেন দেখছি।"

উত্তেজিত স্বরে লক্ষ্মী কহিল—"তোমার মত বুদ্ধি হলে তিনিও ঠিক এই রকমই ভাবতেন—কপালের উপর হাত দিয়ে নিজের ঘর বিষ দিয়ে ছারখার করতেন, তাতে কারো এক তিলও উপকার হ'ত না। ভগবান যাঁকে যে অলঙ্কারের মত বস্তুকে বুঝে দিয়েছেন, সেটাকে চিরদিন খাপের মধ্যে পুরে রাখলে মরচে ধরে, ধারে, সেটা তিনি বোঝেন বলেই বোধ হয় কাজে লাগাতে চান। তোমার মনের দুর্বলতা আছে, আই ড্রপ্স্ তার ঠিক বুঝতে পারছ না—বুঝতে পারলেও তুমি হয় ত মনে করতে পার, দুদণ্ডের গল্পে এত খানি মনের জোর খাটান ভাল নয়। এর জন্যে কল্পনা করতে আমি কিছুই চাইনা, তবে এটা যেনো শক্তি-নিষ্ঠেই মনে থাকে না, কেননা সেটা অতি দুর্বল। তবু তোমাকে বাঁচাবার জন্যে কি মহান্ ত্যাগের পথে তিনি যাত্রা করেছেন, তা একবার ভেবে দেখেছ কি? তিনি এমন ত্যাগ করতে পারেন, তাঁর কতখানি শক্তি এই কথাটা ভাবলে পরে তাঁর পায়ে আমার মাথা নুইয়ে দিতে ইচ্ছে করে। তিনি কতখানি তুমি ছাড়া আরো কথায় প্রতিষ্ঠা করেছ, এত বড় অন্যায়ের যে বিচার করেন নি, তাঁর সেই ঘরে তুমি বসিয়ে রেখে গিয়েছ—এইটের ওপরই বিশ্বাস ছাপন করে—এই বিপদের ঝুঁকি কাঁধে তুমি যে সবচেয়ে বড়, আজ আমাদের দিন এসেছে বলেই তিনি আমাকে চাইলেন।"

আমি উত্তরে কহিলাম—আর এরই জন্যে তুমি—তুমি ও হ'ত। লক্ষ্মী আবেগভরে বলিল—ওটা দুর্বলতার ফাঁকি, শক্তির খেলা নয়।"

সৌরী মৃদু ভাবে শুনিতেছিল এতক্ষণ পরে বলিল—"জানিস লক্ষ্মি, এই সব গোলমাল হবে বলে আমি ওঁকে বলেছিলাম যে ঘরের ছেলে তুমি ঘরে ফিরে যাও।"

লক্ষ্মী কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল—দিদি ওসব বলবার দিন চলে গেছে। পিতার বাধা হওয়া মানে এ নয় যে অন্যায়কে বাধা না দিয়ে তাকে বাড়তে দেওয়া। নিজের খুঁটি ঠিক না রেখে কেউ কারুকেও প্রশ্রয় দিতিসটা দিতে পারে না—বড়বাবু ছেলেকে করে বাপকে কেউ ভক্তি করতে পারে, একথা আমি যদি না জানি তাহলে আশ্চর্য্য হয়োনা। জামাই বাবুর বাবা তোমাকে বরাবরই ত্যাগ করে রয়েছেন আজ যে তিনি ছেলেকে ত্যাগ করেছেন, তা নয় কিন্তু তুমি যে ওঁর ভাবা এইটেকেই স্পষ্ট করবার জন্য ছেলেকে তিনি আবার করেছেন? কেন?—এর চেয়ে অন্যায় আর কি হ'তে পারে? আমার বাবার পদে তাঁর যদি কিছু হয়ে থাকে, তা তাঁরা বুঝে সোজাসুজি করে নিন্—না কেন? বাবারই যদি অপরাধ থাকে, তুমি তাঁর মেয়ে অন্তত সেইটে তোমার পক্ষে যথেষ্ট অপরাধ, এই যদি তাঁর বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহলে কাকির অমন বিচারের চেয়েও যে সে জিনিসটা অনেক ভাল মানুষেই হবে। কথামালার বাঘ বরিণকে যেমন জব্দ হতে দেখে বলেছিল ছুই খুলোমুনি ত তোর বাপ খুষিয়েছিল, এ বিচারও তাই—বাবার উপর রাগ করে শাস্তি দিলেন তাঁর মেয়েকে। মহিলা মেয়ের মেয়েরা অবলা তাই নিজে তারা নানা ভাবে কত অপমানই না সহ্য করে আসছে। আর তুমি কিনা সেই পথেই তোমার স্বামীটিকে শায়েস্তা করতে চাইছিলে, এমন মজার লোক সংসারে।

আমি কহিলাম—তোমার দিদি বলেছিলেন আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম, সেটা শোনই—আমার কথাতে বাধা দিয়ে লক্ষ্মী কহিল—না, না, না ওসব আমি সব বুঝতে পেরেছি। তাদ বাড়ুজ্জে মেয়ে ঘরে শুধু নি, এ কথা তোমাকে বলাবাহুল্য কিন্তু পাঁচ বছর বয়স থেকে কি মুক্তস্বর্গের নিশ্বা দিয়াছিলে।

আমি কাতরকণ্ঠে কহিলাম—লক্ষ্মি, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না। আমি নীরবে যা সহ্য করেছি, তা আমার অন্তর্যামী জানেন; আমার মনের মধ্যে সংগ্রাম উঠে কত তীক্ষ্ণ আঘাতে আমাকে বিঁধেছে, সে আমি কেমন করে দেখাব? তোমাদের ডাকও ত আমার কানে কখনও পৌঁছয় নি।

লক্ষ্মী লজ্জিতা হইয়া কহিল—মাপ কর জামাইবাবু দোষ তোমার একার নয়—আমাদেরও আছে; তাই'বার তা বুঝে গেছে—অন্যায় করে গেছে বলেই যে বরাবর অন্যায় পথে চলতে হবে তা নয়; ভুলটাকে বুঝতে পারলে যে তার শোধরাবার চেষ্টা করে সেই ত মানুষ। ভুল আমাদের পদে পদে হতে পারে, তা নিয়ে তোমার সঙ্গে কলহ করতে চাইনে। তুমি বল, গালিও না কিন্তু, আজ তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ব না—অনেক তদ্বিরেছি এখন মিষ্টি মুখ করানও চাই—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া গেল।

(১৫)

কথায় বলে "পড়া বাড়ী বড় ভয়, পড়লে বাড়ী সরে যায়।" আমার জন্যে ঠিক তাই হইল। প্রথমে যখন হাজতে গিয়াছিলাম, কতদিন উত্তর আসে নাই, কতই না উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম—তার পরে যখন উত্তর আসিল, তাহাতে আমার মেয়াদটা যখন স্থির হইয়া গেল, তখন সংসারের চিত্রখানা আমার চোখের সামনে ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ আমার মনের অবস্থা কতকটা পরিবর্তিত হইয়া আমার কর্তব্যের ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে, সম্পূর্ণরূপে ভাবনা চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি যে তাহা নয়, তবে আত্মনির্ভরের একটা উদ্যমী শক্তি সহসা জাগ্রত হইয়া, আমাকে অসহায় অবস্থার মাঝখানে আপন মুক্তমন্ত্রে আজ কেহ জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। মনের তখন অবস্থার নবপ্রভাতের সোনা-কিরণ সামান্য স্পর্শে, কাঁচা কাদার ছাঁচে ঢালা ছাপার মত একাকার হইয়া পড়ে; কিন্তু অবস্থার আঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে করিতে সে যখন কঠিন হইয়া উঠে, তখন বুদ্ধিরেখাঙ্কিত ছাপা কালির অক্ষরের মত চাপে ও তাপে, সে নিজেকে স্পষ্ট করিয়াই রাখে, তাই আর আঘাতসহনের আপ শাপ আঘাত সহ্য করিয়া যেখানে দানা বাঁধিতে সুরু করিয়াছে, সেখানটা কঠিন হইয়া উঠিয়া বুদ্ধিরেখাঙ্কিত অক্ষরের ন্যায় স্পষ্টরূপে আমার 'নিকট যাহা' যাক করিতে চাহিতেছে, তার অর্থ সহজ না হইলেও, আমার কাছে তার কোনোখানটা আর অস্পষ্ট নহে।

জীবন যতই প্রিয় হোক, তাকে চিরদিন রক্ষা করা যায় না, মৃত্যু যতই ভয়াবহ হোক, তাকে ঠেকান যায় না। আমাদের ইচ্ছা ও শক্তিকে আমরা যতদূরই খাটাই না কেন, বৈচিত্র্যময় জীবন-ধারার প্রত্যেক অবস্থার অন্তিত্বে তাদের কতকটা নির্দিষ্ট স্থান আছে কিন্তু তারা সর্বস্ব নহে। আমার ইচ্ছা ও বর্তমান অবস্থা ঠিক আমার সৃষ্টি নহে, অথচ আমার এই অবস্থাকে আমার ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখাও কঠিন—একটা অচিন্তিত ঘটনার মাঝখান দিয়া সমস্ত জিনিসটা গড়িয়া উঠিয়াছে মাত্র, আমি তার প্রধান অভিনেতা হইলেও সেটা আমার স্বেচ্ছাকৃত নহে। যাহা আসে, অথবা যাহা চলিয়া যায়, যাহা চাই কিম্বা যাহা পাই,—এই চিরন্তন আসা-যাওয়া, চাওয়া-পাওয়ার, কোথায় যে শেষ তাহা আমরা জানি না, যা জানিলেও খেলার খেলা খেলোয়াড়কে খেলতেই হয়।

প্রথমেই "ধর" খোওয়াইয়া আমার খেলা সুরু হইল। অজানা জীবনে যে বরাবর চালিত হইয়া আসিয়াছে, এখেলা তার পক্ষে সহজ নহে—হারিয়া যাই, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? বহুজনাকীর্ণ সংসারে হারজিতের নিত্য অভিনয় কতভাবে চলিতেছে—জীবনসংগ্রামে কতলোক নিষ্পেষিত হইতেছে, আবার কতলোক উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতেছে—উত্থান পতন, সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয়, জীবন মৃত্যু—এই সকলের মধ্য দিয়াই চিরন্তন জীবন-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে—কোনো দিকেই তার ভ্রূক্ষেপ নাই, অবাধ তার গতি, অফুরন্ত তার লীলা, অসীম তার বহর!

নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা উচিৎ নয়—কাজের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এখানে যে 'প্র্যাকটিস্' করিয়া সুবিধা করিতে পারিব, তারও ভরসা কম। সংবাদ-পত্রের

কর্মখালির অংশটা ভাল করিয়া পড়িয়া স্থানে স্থানে আবেদনপত্র পাঠাইতে লাগিলাম।

প্রাতঃকালে কাজে ব্যাপৃত ছিলাম—কাজ শেষ হইলে ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া দেখিলাম যে ১০৪ টা বাজিয়াছে—তাড়াতাড়ি উঠিলাম, স্নানাদি সারিয়া ওবাড়ীতে যাইতে হইবে। দুবেলা আহারের ব্যাপারটা ওখানেই সারি, ওঁরা ছাড়েন না কাজেই যাই। বেলা হইলে ওঁদের খুবই অসুবিধা হয়, আমি না গেলে সবাই আটক পড়েন—তাই যত শীঘ্র পারি, স্নান করিয়া চট্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্রথমেই লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হইল; সে খুব এক চোট ঠাট্টা করিল, তারপরে কহিল—কি গো জামাইবাবু, চাকরীর কতদূর হ'ল। আমি উত্তর দিলাম—কিছুই হয়নি, তবে চেষ্টায় আছি। আমাকেই চাকরী খুঁজে নিতে হবে, চাকরীও আর আমাকে খুঁজে নেবে না। হাসিতে হাসিতে লক্ষ্মী বলিল—যদি খুঁজে তাই খুঁজি পাও, তাহলে বলতে হবে তোমার ভোর কপাল; আজকালকার বা' বাজার! তার চেয়ে আমি বলি আমাদের সঙ্গে কলকাতায় চল না কেন, সেখানে অতগুলো হাঁসপাতাল আছে, একটায় না একটায় লেগে যেতে পারে! আমি বলিলাম—ডাক্তারগুলো সেখানে কম নেই, নতুন যাঁরা তাঁরা অনেকেইত ভাতেভা ভাজ্‌ছেন। তা যাকগে যাক্, তবু যাবার ঠিক করেছিলাম এই বৌদি এখানে আসছেন বলে তুমিই না আমায় ধরাধরি করেছ। বেশ তিন দিন আমি অপেক্ষা করলাম, আর দুদিন আমি দেখব, তারপর কলকাতায় গিয়ে যা হয় করব।"

এই সময়ে সৌরী প্রবেশ করিল। আমাদের দুজনকে নক্ষ করিয়া বলিল—কি কথা হচ্ছিল। লক্ষ্মী সংক্ষেপে বলিল। সৌরী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—অত বড় জায়গায় গিয়ে কি কর্বে; সেখানে বড় বড় সাহেব সুবোকে না ধরলে কিছুই করতে পার্বে না। আমি কহিলাম—তা ঠিক বলেছ সৌরি, তবে দেখা যাক্ কতদূর কি করে উঠ্‌তে পারি। "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।" এবার লক্ষ্মী বলিল—জামাইবাবু, কলকাতায় গিয়ে কোথায় থাকবে? আমি কহিলাম—কলকাতায় থাকবার অভাব হবে না লক্ষ্মি, একটা ভাল দেখে যেন্ টেন্ দেখে নেব 'খন।

লক্ষ্মী কহিল আমাদের বাড়ী থাকতে যেনেই বা থাকবে কেন? বাবার অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে—তিনি চেষ্টা করলে যা হয় কিছু করে দিতে পার্বেন।

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন, তাই একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া উত্তর দিলাম—সে হলেও খুব ভালই হ'ত, কিন্তু—আমার কথায় বাধা দিয়া লক্ষ্মী কহিয়া উঠিল—জমীদারের ছেলে শ্বশুর বাড়ী থাকলে মান যাবে।—আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম—না লক্ষ্মি ঠিক তা নয়, তবে বাবা পাছে মনে করেন, যাতে তাঁর অপমান হবে আমি তাই করছি, তা' না হলে বর্তমানেও আছেন, তাঁর মাথার ওপরে বাপ থাকলে তাঁর মত না নিয়ে তিনি কি থাকতে পারতেন। সব দিক্‌দেখে কাজ করা কি ভাল নয়। লক্ষ্মী আমাকে ভুল বুঝ না; আমার অবস্থাটা বিচার করে দেখলে বুঝতে পার্বে আমি অন্যায় বলছিনে। তোমাদের আশ্রয় ঘরের লোভটা ছেড়ে দিয়ে, বেলের উড়ে বামুনের হাতে আপনাকে সঁপে দিতে চাইনাব না।

ঈষৎকণ্ঠে লক্ষ্মী উত্তর দিল—তা বটে, তোমার কথায় যুক্তি আছে। তাহ'লে যাতে যাচবে এই রকম কর—অর্থাৎ আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি থেক; তা'হলে ছেলে যান করাও হবে আর আমাদের বাড়ী দুবেলা নেবন্তন্নও খেতে পার্বে।

এই স্নেহময়ী বালিকার কথায় আমার মন ভিজিয়া গেল। আমি গদগদ ভাবে বলিলাম—লক্ষ্মি, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকতে পারা যায় না তোমার মন সুন্দর—সব চেয়ে সুন্দর তোমার ঐ প্রাণখানা।

হাসিতে হাসিতে লক্ষ্মী বলিল—আর সব চেয়ে সুন্দর যেটি সেটি নিয়ে, ঐ দেখ জামাইবাবু—বলিয়া সে সৌরীকে দেখাইয়া দিল। সৌরী লাল হইয়া উঠিল।

বহুবার আলিয়া খবর দিল, মা বলিতেছেন যে অনেক

বেলা হইয়াছে। সভা ভঙ্গ করিয়া ছইবোনে আহারের আয়োজন করিতে গেল—একটু পরে আমার ডাক আসিল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার তন্দ্রার ঘোর কাটে নাই, সৌরী কাছে আসিয়া ডাকিল, আমার চমক ভাঙিল। সৌরী বলিল—ঘুমুচ্ছিলে নাকি।

আমি উত্তর দিলাম—না ঠিক ঘুম নয়, হাঁ তবে একটু তন্দ্রার ঘোঁক আস্‌ছিল বৈ কি!" "তাহলে তুমি একটু ঘুমোও, আমি লক্ষ্মীর কাছেই যাই, সে আবার এখন ঘতীনকে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌ল।" আমি তার হাত দুটি ধরিয়া সাদরস্বরে কহিলাম—না সৌরি, আমি আর ঘুমাব না—তুমি যেও না।" সে একটু হাসিল এবং আমার নিকটে আসিয়াই বসিল। আজ সে কত কথাই কহিল—প্রাণের পর্দা উঠিয়া গিয়া মুক্ত হৃদয়ের সমস্ত কাহিনী আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া, সে যেন হাঁফ ছাড়িবার অবসর পাইল। আমিও তাকে কত কি বলিলাম—দুইটি তরুণ প্রাণের প্রেমের উচ্ছ্বাস, অর্থহীন হইলেও পরস্পরের মর্ম্মস্পর্শ করিল। বস্তুতন্ত্রের কঠিনতা ভাবুকতার মোহের জালে পড়িয়া বাধা তুলিতে পারে নাই—কল্পনার তুলিতে রংয়ের উপর রং ফলাইয়া যে ছবি আঁকিতেছিলাম, কর্ম্ম-ক্ষেত্রের প্রখর তুলিতে তার স্থান হয় না কেন?

হঠাৎ আমার বুক হইতে মুখটি তুলিয়া লইয়া করুণ দৃষ্টি খানি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া, ধীরে ধীরে সৌরী কহিল—বল, একটা কথা তুমি বল, যে আমার জন্যে তুমি ভাব্‌বেনা। আমার জন্যে তুমি অমন করে ভাব, আমার কিন্তু ভারি খারাপ লাগে।"

"আমার যে খুব ভাল লাগে, তা নয় সৌরি!"

"দিন যেমন করে হয় কেটে যাবে, আমরা না হয় খুব গরীবের মতন থাকব—দিন চলবার যা হয় উপায় একটা হয়ে যাবে।"

"ঐ যা হয় একটা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন আমার পক্ষে নিশ্চিন্ত হওয়া শক্ত।

"ঘতীন ত নতুন উকীল হয়েছে, কৈ সে ত অমন করে ভাবে না।"

"ভগবান সবাইকে এক ছাঁচে ত গড়েন নি সৌরি।"

"তাহলে তোমার শরীর খারাপ হবে, তাই আমার ভয় করে।"

"সৌরি, তেমন ডাক্তারকে আমি প্রশ্ন দিই নি। তবে কি জান জীবন সংগ্রামে হঠাৎ প্রতিকূল অবস্থায় পড়েছি কি না, তাই একটু গোলমাল বেধেছে—অর্থাৎ যদি এই চাকরী যদি বা করেই পাই, তা হলেও আমি যা চাই তা হবে না, তোমাকে হয়ত কিছুদিন বাপের বাড়ীতেই থাকতে হবে।"

"তা আমি থাক্‌বনা কিন্তু—তোমাকে ছেড়ে একলা থাকা আমার দ্বারা হবে না।"

তার কথা শুনিয়া আমি একটু হাসিলাম।

সৌরী বলিল—এমন করে হাস্‌লে যে।

"চোখের জলটা হাসি দিয়ে ঢেকে দিলাম।"

সৌরী আমার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল—বড় বড় চোখের করুণ দৃষ্টি আমার গাল স্পর্শ করিল, সে কহিল—আমার জন্যেই তোমার যত দুঃখ—তার কথার বেদনার সুর আমার কানে বেসুরা ঠেকিল।

আমি উদাস ভাবে আপনার মনে বলিয়া উঠিলাম—দুঃখের রাত্রি দিয়ে যে আনন্দ আসে, সেটা বোধ হয় সব চেয়ে মধুর। অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে উষার প্রকাশ, তাই তার আলো এত মধুর।"

সৌরী এবার হাসিল—সে হাসি বড় মিষ্ট। মেঘ সরিয়া গেলে চন্দ্রমা যেমন হাসেন, সৌরীর হাসিও ঠিক তেমি।

"দিদি" বলিয়া ডাকিয়া লক্ষ্মী ঘরে ঢুকিল। তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—লক্ষ্মি, আমি হাত গুনতে শিখেছি।

"ইস, কবে? আচ্ছা আমার হাত দেখ দেখি"—বলিয়া কাছে আসিয়া হাতখানা বাড়াইয়া দিল।

বিজ্ঞ গণকঠাকুরের মতন এদিকে মাথা হেলাইয়া ওদিকে মাথা হেলাইয়া আমি বলিলাম—"এই একটু আগে কি কর্‌ছিলে যদি বলে দিতে পারি।"

উপযুক্ত বখ্‌শিস পাবে।"

"তুমি লিখ্‌ছিলে—আঃ হাত সরাও কেন?—চিঠি লিখ্‌ছিলে—কাকে লিখ্‌ছিলে বলব?

খা'ম গো, আর বলতে হবে না—দিদি এসে বলে দিয়েছে আর বাহাদুরী নিতে হবে না; তা যা'হোক বখশিস্ যেন বাদ পড়ে, এই নাও।

"উঃ, মন্টি কর কি আমার যে ছিঁড়ে যাবে।"

মৌরী এতক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল—লক্ষি, তোর কিন্তু ভারি অন্যায়।"

-দিদি, তোর যে ভারি দরদ দেখছি—একেই বলে কান টানলে মাথা আসে। সাবধান করে দিতে পারিস নি?"

মৌরী মৃদুস্বরে কহিল—দেখ দিদি একেবারে লাল হয়ে উঠেছে।"

লক্ষ্মী কুণ্ঠাহীন উত্তর দিল—তোর বর ভাই খুব সোন্দর কিনা, তাই কানে হাত দিলেই লাল হয়ে ওঠে, তোর বুকে আরও লেগেছে বড় না ওর কানে লাগুক, তুই না হয় একটু হাত বুলিয়ে দে।

"আমি কেন দিতে যাব, তুই করেছিস্ তুই দে।"

"আপত্তি নেই তবে হাতের দোষে যদি ঠিক না হয়। লক্ষি তুই আয় আমার আলাদনে তাই।"

দুই ভগিনীর কথা কাটাকাটি বেশ উপভোগ করিতেছিলাম এমন সময়ে পুরুষার আসিয়া খবর দিল যে সরকার মশায় অপেক্ষা করিতেছেন। হঠাৎ সরকার মশায়ের আবির্ভাবে আমি বিস্মিত হইলাম। "আসছি" বলিয়া নীচে নামিয়া গেলাম।

তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বৌমা আপনার খোঁজ করছেন, তাই খবরটা দিতে এলুম। বিস্ময় বিহ্বল স্বরে আমি প্রশ্ন করিলাম—"কে বৌদি?"

"আজ্ঞে হাঁ বাসিকপণ হ'ল তিনি এসেছেন।" তথাপি আমি প্রশ্ন করিলাম—এমন সময়েত কোনো ট্রেন নেই।"

"আজ ট্রেন নেই হয়েছে।"

"ওঃ।—আপনি এগোন আমি যাচ্ছি।"

উপরে উঠিয়া খবরটা দিয়া—বাসার অভিমুখে ছুটিলাম।

(১৩)

জানালার ধারের সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া বৌদি সিল্ক কেশরাশি শুকাইতেছিলেন প্রণাম করিলাম—ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন—বলিয়া তিনি আশীর্বাদ করিলেন। পথের ক্লান্তি অথবা চিন্তারাশি তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে ম্লান করিতে পারে নাই সদা প্রফুল্ল মুখশ্রী তেমি উজ্জ্বল তেমি স্নিগ্ধ। আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। এত বড় বিপ্লবের ঝঞ্ঝাঘাতে কাঁপ দিয়াছেন অথবা মুখে তার কোনও চিহ্ন নাই কোন্ শক্তির বলে সমস্ত অবসাদ ও বিপদকে তুচ্ছ করিয়া আমার নৈরাশ্যের অন্ধকারকে বিতাড়িত করিবার জন্য জ্যোতিষ্কী মেয়েরূপে, আমার বেদনাকে শান্ত করিবার জন্য আনন্দদায়িনীরূপে, আমার অসাড় প্রাণকে জাগ্রত করিবার জন্য সঞ্জীবনী শক্তিরূপে, আমার জীবনের এই সঙ্কটকালে তিনি আমার কাছে আসিলেন। যাঁর অযাচিত স্নেহাকর্ষণ খানি আমাকে চিরদিন আকৃষ্ট রাখিয়াছে, যাঁর মাতৃহৃদয়ের করুণাধারায় সংসারের কঠোরতাকে কোমল করিয়া দিয়াছে, আমি তাঁহাকে ডাকিতে সাহসী হই নাই কিন্তু আমার শতদল হৃদয়ের গভীর আর্ত্তনাদ যে বহুদূর হইতে তাঁর প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে—প্রাণের যথার্থ আহ্বান প্রাণ তুচ্ছ করিতে পারে না বলিয়াই আজ তিনি ঘর হইতে একেবারে বাহিরের-নতুন পথে দাঁড়াইয়া সংসারের চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করিয়া বিপুল বিসর্জ্জনের অন্তরালে, একটা জিনিস-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। রমণীর মাতৃহৃদয়ই সমস্ত নিন্দা গ্লানি শাসন অথবা দণ্ডকে পরাভূত করিয়া নির্দ্বিধ অকুণ্ঠিতচিত্তে আপন স্নেহকে চির জয়ী করিবার জন্য ঘর বাহার দুরাসাহসে এমি করিয়া বুক বাঁধিয়া বাহির হইতে পারে—বাহিরের সমস্ত নিয়ম অথবা শৃঙ্খল পদতলে দলিত হইয়া মুক্ত অন্তর যখন জাগ্রত হইয়া উঠে তখন সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিখানি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। যে সহ্য করিতে পারে, সে আঘাত করিতেও জানে।

আমাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, বিস্ময় বিহ্বলা বৌদি বলিলেন—ঠাকুরপো, একেবারে যে চুপচাপ।

আমার এরকম করে চলে আসাটা তোমার ভাল লাগছে না বুঝি ?

আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিলাম—না, তা নয়, তবে একেবারে খবর না দিয়ে এলে তাই ভাবছিলাম।"

সেটা যে একটা গুরুতর দুর্ভাবনা হতে পারে, আমার তা মনে হয় না—নিজের বাড়ীতে আসব, তাতে হয়েছে কি ?

না তাতে কি—তবে কাজটা—আমার কথায় বাধা দিয়া তিনি কহিলেন—তবে কাজটা ভাল কি মন্দ হ'ল সেটা এখন ঠিক বলতে পারিনে, কেবলা ফলের ওপর ভাল মন্দ দাঁড়াবে। খুব হিসেব করে দেখতে গেলে বুদ্ধিমান লোকে আমাকে সমর্থন করবে না, তা করুক আর নাই করুক; বরঞ্চ উল্টে নিয়ে যে পথে আমি এসে দাঁড়িয়েছি, আমার বিশ্বাস আমার দেবতা তাতে আমাকে রক্ষা করবেন।"

তাঁর কথার ভঙ্গীতে আমার প্রাণ সন্ত্রমভরে নত হইল, তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম—তবু বলিলাম—এত বড় একটা নিয়ম ভঙ্গ আমাদের পরিবারে কেউ সহ্য করতে পার্বেন কি না।"

"সে বিষয় যে আমি না ভেবেছি তা নয় কিন্তু আজ তাকে মেনে চলতে গেলে আমাদের সংসার মাটি হয়ে যায়, আমার মনের দেবতা এই কথাটাই আমার মনকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরপো, নিয়ম মানুষের জন্য কিন্তু মানুষও নিয়মের জন্য নয়।"

কিন্তু চিরদিন যাঁরা নিয়মের রাস্তায় চলাফেরা করে এসেছেন, তাঁরা নিয়মটাকেই বড় করে তুলেছেন, তাই নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হলেই তাঁরা মতের ব্যবস্থা করলে, তার জন্যে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।"

"তাহলে তুমি মনে করছ যে বাবা আমাকেও দণ্ড দেবেন।"

হাঁ, বৌদি আমারও সে-ই ভয়। আমার জন্যে তুমি কেন এমন করলে ?

ঠাকুরপো, ঠিক তোমার মত ভয় পেলে আমি যে চলে আসতে পারতাম তা নয় কিন্তু। তোমার বেটা ভয় আমার সেটা ভরসা। এতদিন ঘর করে বাবাকে যদি চিনতে না পারি বল, তার ওপরে কথা চলে না। আট বছর বয়সে তোমাদের সংসারে প্রবেশ করেছি, বাবাও আমাকে খুব ভাল রকমই জানেন। আমার চলে আসাতে তিনি ভেবে দেখবার অবসর পাবেন, যে সব দিক্ রক্ষা করতে পারিনি বলেই, নিষ্ফল স্নেহের অভিমান আমার চিরদিনের ঘরকন্নার মধ্যে আমাকে আর আটক করতে পারছে না। রাগ স্নেহের মরম, তার স্নেহের মত গর্ব্বাক্ না কেন, প্রাণের মধ্যে বিধাতা যে স্বাভাবিক আলো দিয়েছেন তাকে ধরিয়ে সে দিতে পারে না তবে ঢেকে রাখতে পারে কিন্তু সে-ও কতক্ষণের জন্য ?"

"তুমি তাঁকে এক রকম না বলেই পালিয়ে এসেছ—তাতে উল্টো ফল হবারই কথা।"

"কিন্তু তাঁর কাছে লুকিয়ে রাখাটাও আমার ইচ্ছা নয়, তাই আসবার সময়ে একখানা 'তার' করে এসেছি, আর সব খুলে তোমার দাদাকে একখানা চিঠিও দিয়েছি। তাঁর মুখে সমস্ত ঘটনাটা শুনলে, প্রকৃত অবস্থাটা বাবার চোখে আর ঝাপসা ঠেকবে না—সুতরাং যিনি দণ্ড দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে ক্ষমা করাটাও বিচিত্র মনে হয় না।"

"বৌদি, বিরক্ত হয়ো না—যত সহজে তুমি সমস্ত জিনিসটা বুঝতে পারছ, বাবা যে ঠিক তা পার্বেন, আমার তা একেবারেই মনে হয় না, সেজন্য তাঁকে আমি দোষও দিতে পারিনি! ঠিক তোমার আমার ওপরেও তাঁর রাগ নয়ত—রাগটা কোথায় তাও জান!"

"সেইটে জানি বলেই, এটা জানাতে চাইছি, যে একদিনের একটা ঘটনায় একজন সত্যিকার নির্দ্দোষী চিরদিন সাজা পেতে পারে না—তাই আর একদিনের ঘটনা দিয়ে ভগবান্ যে অবস্থার পরিবর্ত্তন করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান শুধু ভুল নয়, অন্যায়ও বটে। ভুল কিম্বা অন্যায় বুঝতে পারলেই, বাবা তার বিহিত করবেনই করবেন।

তাই যেন হয় বৌদি—তোমার কথাই সত্য হক।

সরমা সুকুমারকে সঙ্গে করিয়া লক্ষ্মী আসিয়া হাজির।

তাহাকে দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম—না বলে কয়ে একেবারে বাড়ী চড়াও লক্ষ্মী ?

এ এখন আর তোমার বাড়ী নয় জামাইবাবু—যাঁর বাড়ী তিনি আমাকে না তাড়ালে আমি নড়ব না—বলিয়া চিপ্ করিয়া বৌদিকে প্রণাম করিল। তার মাথায় হাত দিয়া সুখে থাক—বলিয়া বৌদি তাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং আমার দিকে তাকাইয়া কহিলেন "ঠাকুরপো এটি বুঝি আমাদের বৌয়ের—

"ছোট বোন। তা না হলে অত জোর"—বলিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম।

বৌদি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তা ও বেশ করেছে। যেখানে যার জোর খাটে সেখানে সে জোর খাটাবে না ?

লক্ষ্মীও বলিয়া উঠিল—বলুনত দিদি, আমি কি এসে অন্যায় করেছি।

বৌদি কহিলেন—অন্যায় কিসে হল, ভাই ?

লক্ষ্মী প্রশান্তভাবে উত্তর দিল—তা জানিনে আর লোকের স্ত্রী অন্যায় আবার কাকে বলে ! সে যাক্, ঘরে বসেছিলাম। একটা আকর্ষণী শক্তি আমাকে টেনে এনে এখানে হাজির করেছে, আমি নিজে ইচ্ছে করে আসিনি।

আমি ঠাট্টা করিবার সুযোগ ছাড়িতে পারিলাম না, তাই হাসিয়া বলিলাম—চমৎকার, লক্ষ্মি, চমৎকার। কিন্তু সে শক্তির সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়নি ত।

লক্ষ্মী কহিল—অজ্ঞাত শক্তির কবলগ্রস্ত মানুষ চিরকাল বাধ্য হইয়ে এসেছে—তা না হলে সংসারের অত্যাচার সহ্য করা তার পক্ষে সত্যিই শক্ত হ'ত। যাঁকে দেখ্‌বার এক ইচ্ছে ছিল, সত্যিই যখন তিনি এসেছেন, তখন দেখ্‌বার লোভ ত্যাগ করাটা আমি পারলাম না—আলাপ না থাকলেও তিনি যে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত একথা আমি মনে করিনি।

আমি বৌদিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলাম—তা বটে বৌদি, তুমি যে এখানে আছ সে কথা কেউ বুঝতে পারিনি কিন্তু, তবু লক্ষ্মী তোমার চিঠিখানা পড়েই বলে যে তুমি আছ ?

বৌদি প্রসন্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

লক্ষ্মী কহিল—এসে অবধি ত বৌদিকে বকাচ্ছি। এতখানি পথ এসেন একটু বিশ্রাম করতে যাও। বৌদির খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা খোঁজ করেছ কি ?

আমি হাসিয়া কহিলাম—না লক্ষ্মি ও কথাটা আমার মনেই আসেনি—উনিই আমাকে বরাবর বাইরে এসেছেন কিনা, হঠাৎ পাছি উল্টে ধরতে হবে ভোটেই আমার হুঁস ছিল না।

বৌদি কহিলেন—তার জন্যে আর এত ভাবতে হবে না আমি খবর পেয়েছি। এখন চরসংস্কার এসব কি খায় ? লক্ষ্মী চট্ করিয়া বলিয়া উঠিল—কথা কইতে কইতে রাত পুইয়ে যাবে, কিন্তু রান্না না চড়ালে খাবার ত তৈরী হবে না। আমি রসিকতার লোভ ছাড়িতে পারিলাম না। আমি কহিলাম—কাশীতে বাজারের খাবারের এখনও দুর্ভিক্ষ ধরেছে, তাত জানতাম না লক্ষ্মি।

লক্ষ্মী এবারে একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিল—তা বলবে বই কি জামাইবাবু—বাজারের খাবার খাওয়াবে বলতে একটু বাধল না। এই রকম একটা হবে জানতে পেরেছিলাম বলেই দিদির খাবার আয়োজন আমাদের এখানেই করেছি। আজ আমাদের এখানে তোমার নেমন্তন্ন কিন্তু ; যাবে না দিদি ?"

বৌদি কহিলেন—কাশীতে অন্নপূর্ণার অপমান করন—তা কি হয় দিদি।

লক্ষ্মী লাল হইয়া উঠিল—কিছু উত্তর দিল না—পায়ের বুড়া আঙুল মেঝে খুঁটিতে লাগিল।

আমি কহিলাম—হঠাৎ একরকম বৌদি, তুমি ওকে অত করে বাড়িয়ো না, আমাকে তাহ'লে একেবারে আস্ত করে তুলবে। কথা খাওয়ায় আমি জানুর ভাল রকমই জানি, সব চেয়ে ভাল আমার কান দুটো জানে—আমার কথায় বাধা-দিয়া লক্ষ্মী কহিল—আঃ কি কর জামাইবাবু ! বৌদি হাসিতে হাসিতে কহিলেন—ঠাকুরপো, তুমি কিন্তু ভাই বড় নেমকহারাম। শালীর হাতের কাদখলায় বড়ি

সাধনার কাজ করত, তাহ'লে অনেকেই খরচের হাত থেকে বাঁচত।

আমি কহিলাম—তা বটে বৌদি, লক্ষ্মী আমাকে সত্যিই খুব ভয় করে থাকবার, তবে ওর দৌরাত্মটা আমারই কাছে যতদূর খাটে এতটা আর বোধ হয় কারো কাছে নয়।

লক্ষ্মী এবারে কহিল—আমি যে দিদির ছোট, তাই আমার শতখুন মাপ;—পরে বৌদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—তাহ'লে আমি এগোই দিদি—বেশী দেরী কর না, তাহ'লে কিন্তু আমি আবার আসব।

লক্ষ্মী চলিয়া গেল।

জমাট বহুদিনের সমস্ত শক্তি অপহৃত করিয়াই যেন সে চলিয়া গেল। বৌদি বলিলেন—ঠাকুরপো, মেয়েটি খাসা কেমন রূপ, তেমি গুণে। সত্যই ওর কথা মনে হচ্ছে ততই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার প্রাণটা কেড়ে নিয়ে গেছে,—মনে হচ্ছে ও যেন আমার চিরদিনের আপনার লোক।"

"বৌদি, সত্যি; ও যেন সংসারে সোনার কাঠি যা ছোঁয়, তাই সজীব হয়ে ওঠে। ও যেন একটা অফুরন্ত বিদ্যুৎ মেঘের অন্ধকার বুকে চিরে চিরে আলো বার করে। ওর বুদ্ধির এতটা পরিচয় পাওনি—এত অল্প বয়সে এতখানি বুদ্ধি কোত্থেকে পেলে সেইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়। যার ভাল হয়, তার সবই ভাল হয়, লক্ষ্মীকে দেখ্‌লে সবাই একবাক্যে তা বলবে।"

"না আসতে আসতেই ওর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে। ভগবান্ ওর ভাল করুন।"

"বৌদি, তুমি তাহ'লে একটু বস, আমি মুখ হাত ধুয়ে নিই, বেশী দেরী করা হবে না, লক্ষ্মী তাহ'লে অভিমান করবে।"

"আমি ও তৈরী আছি। এলেই কুটুম বাড়ী গিয়ে খাওয়া কেমন কেমন ঠেকছে।"

"লক্ষ্মীর হাতের পায়স নয় বৌদি—আর তুমিও যে কথা দিয়েছ।"

"আচ্ছা ওর মনে লাগবে বলেই ত খাওয়া। কুটুম্বিতার চেয়ে বড় জিনিসের তাকে তুচ্ছ করা ত যায় না, ঠাকুরপো। কুটুম্বিতার বেড়া ডিঙিয়ে ছোট বোনটির মতন যে ও আমার করে নেছে—এত তাই ওর শুধু মুখের নেমন্তন্ন নয়। তাহ'লে আর দেরী করো না, যাও।"

প্রবাসে দুইটি বিভিন্ন পরিবারের কয়েকটী প্রাণীর অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতা বেশ জমাট বাঁধিল—শুধু ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার নিষ্ঠুর পরিণাম করাল মূর্ত্তির ভয় আমার চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইয়া আমাকে অন্তরে অন্তরে পীড়ন করিতে লাগিল। কর্ম্মহীন বসিয়া বসিয়া পুঞ্জীকৃত চিন্তারাশির ভারে অবসন্ন হইতে লাগিলাম—কিন্তু উপায়? বিদ্রূপ জীবনের ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, যে সমস্ত উপকরণ থাকিলে জীবনসংগ্রাম সহজ হয়, তাহার কিছুরই অভাব নাই—সমস্ত থাকিয়াও যাহার কিছুই নাই, সত্যই সে দুর্ভাগা। মোহমুগ্ধের অতীতের পথ বাহিয়া আসিয়া আজ যে সঙ্কটময় স্থানে পৌঁছিয়াছি, সেখানে নিজের শক্তিবলে চলিতে না পারিলে, দুঃখ এবং দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। লিখা লিখা কাগজে আজি লিখিয়া যে কপালাত করিয়াছি, তাহাতে দুশ্চিন্তার ভার বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। আমার যা হয় হউক কিন্তু আমার জন্য সৌরী কষ্ট পাইবে এ-কথা মনে হইলেই আমি কেমন দমিয়া যাই। নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার আগে আমার অদৃষ্টসূত্রের সহিত আর একজনের অদৃষ্ট এরূপভাবে কেন গ্রথিত হইল? আমার ইচ্ছাকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইলে, আমার বলিবার কিছুই ছিল না, কিন্তু যাক্—

আমার মনের মধ্যে যে ঝড় উঠিয়াছে, তা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। অদূর দুইটী তরুণ যাত্রী যে অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহাতে সবাইয়ের উদ্বেগের কারণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু কোন কিছুর যেখানে কূলকিনারা হয় না, ইচ্ছা কিম্বা শক্তি যখন স্তব্ধ হইয়া যায়, নিজেদের গভীর উর্দ্ধে যে প্রভু শক্তি আছে, শুধু তাহারই উপর নির্ভর করা ভিন্ন তখন আর অন্য উপায় থাকে না। শুধু চেষ্টা করা ত চাই—এরূপ নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা আমার পক্ষে ঘোর অন্যায় হইতেছে। বাদ্ আর নয়।

বিকাল বেলা জলখাবার খাইয়া ইজি চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া আমার এই চিন্তাভারক্লিষ্ট দেহকে এলাইয়া দিলাম। বৌদি রোয়াকের ওধারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—অবাক্ করলে ঠাকুরপো; তুমি এমন কুণো হয়ে পড়লে কেন? যাও একটু বেড়িয়ে এস গে।

আমি উত্তর দিলাম—আমার আর ভাল লাগে না।

বৌদি একটু গম্ভীরভাবে কহিলেন অমন করে ভাবলে ভাল লাগবে কেমন করে বল।

আমি শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলাম—"এ অবস্থায় ভাবনা যে আমার সঙ্গ ছাড়ে না। আর কতদিন এমি করে একলা কাটাব। একটা কিছু করা ত চাই!" "নিশ্চয়ই—আমিও তোমাকে চুপ করে বসে থাকতে বলছিনে। তবে কি ভাল অবস্থা বুঝে ত ব্যবস্থা করতে হবে। মিথ্যে ছুটোছুটি করে এখন যে কি লাভ হবে, তাও ত বুঝতে পারছিনে—সব পাশকরা ডাক্তারের যুক্তির জোর না থাকলে, একলা যা'হোক কিছু করতে যাওয়া খুব যে সহজ তা নয়, তাই আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম যে অত অধীর হয়ো না, আরও না হয় দুটো মাস দেখ।"

"দুটো মাস ত দেখলাম, তাতে কি ফল হয়েছে বল?"

যথেষ্ট হ'য়েছে। চমনের কিছু ওপর ত আমি এসেছি, তাতে কি তোমার একটুও সুবিধে হয়নি? আমি না এলে তোমাকেও এবাড়ী ছাড়তে হ'ত। তারপর ধর, এই যে খরচের টাকা আসছে, তাতে দুজন খেয়ে পরেও কিছু বাঁচে। এগুলো কি কিছু নয়, ঠাকুরপো?"

"জীবনের এ অবস্থায় ওরকম ধীমে আর আমার মনে সান্ত্বনা মানছে না—আর একটা কথা ভেবে দেখ এভাবে চলতে থাকলে আমার যেটুকু শক্তি আছে, তাও ক্রমে নষ্ট হবে। তাই আমি মনে করেছি, সত্যিই একবার চেষ্টা করে আমাকে দেখতে হবে।"

"তার মানে?"

"এখান থেকে আমাকে যেতে হবে।"

"আমি তোমাকে আটক করে রাখিনি কিন্তু একটু বুঝে সুঝে কাজ করা ত চাই।"

"কিন্তু আমি বলে রাখছি"—এই সময় লক্ষ্মী আসিয়া আমার অসমাপ্ত কথার উপর প্রশ্ন করিল—"কিন্তু কি বলে রাখছ জামাইবাবু।" বৌদির দিকে প্রায় পিছন ফিরাইয়া সে কহিল—"তোমায় বুঝি ভয় দেখাচ্ছেন?" বৌদি কহিলেন—"হাঁ ভাই, ও এখানে আর থাকতে চায় না।"

লক্ষ্মী হাসিয়া কহিয়া উঠিল—"ইস্ যেতে আর দিই না—আমরা ছাড়লে ত?"

তার বিদ্রূপে আমি উত্যক্ত হইয়া কহিলাম—"কেন, আমি ত কারও কেনা গোলাম নই।"

লক্ষ্মী খোঁচা দিয়া কহিল—"অবিশ্যি।"

বৌদির দিকে ফিরিয়া কহিলাম—"বৌদি, আমি কালই কলকাতায় যাব।"

"তা বেশ যেও'খন—রাগের মাথায় কাজ করে ছেলে-মানুষী প্রকাশ পেলে, মাথা ঠাণ্ডা হলে লজ্জা পাবে। তোমার মাছ সমুদ্রে গেলে তলিয়ে যাবে যে। কলকাতায় গিয়ে লক্ষ্মীদের ওখানে যদি থাক, তাহ'লে আমার আপত্তি নেই, তা না হলে আমি কিন্তু যেতে দেব না।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। লক্ষ্মী এবার গম্ভীরভাবে কহিল—"তুমি ভুল করলে নিদি। এখন আমাদের বাড়ী গেলে খাপ-খ্যাচার মিটমাট হবার সম্ভাবনা থাকবে না। জামাইবাবু দু'তিন মাস বসে আছেন আর কোলো হকরে দু'তিন মাস থাকুন না;—এর মধ্যে গোলমাল হয়ত মিটে যাবে।"

আমি তীব্রকণ্ঠে কহিলাম—"কিসে?"

লক্ষ্মী কহিল—"তা জানিনি। তবে নানা কারণে আমার মনে হয় আমার ধারণাই শেষে ঠিক হবে। মানুষ যা-ই করুক না কেন সে আপনার স্বভাবকে একেবারে অতিক্রম করতে পারে না—এতদিনকার স্নেহবন্ধন নিজের হাতে টুকরা টুকরা করা তোমাদের কর্তার পক্ষে খুবই কঠিন হবে, আর ভাল করে ভেবে দেখলে এটা ত বেশ স্পষ্টই দেখা যায় যে রাগটা তাঁর তোমাদের ওপর নয় শুধু আমাদের ওপরই, আর আমাদের ছেড়ে দিয়ে তোমরা যদি ফিরে যাও, তাহ'লে ত কথাই নেই—আমাদের বাদ দিয়ে তোমাদের ফিরিয়ে নিতে পারে, তাঁর বুক বিফল-গর্বে

ভুলে উঠ্‌বে। যা কিছু সোণ আমাদের দিয়ে, তিনি বুঝেছেন যে আমার দিদিকে ফেলে তোমরা যেতে চাইবে না, তাই আপনা হ'তে ডাক্‌তে না পেরে যা প্রশস্ত মনে করেছেন তিনি তাই করছেন,—অর্থাৎ চুপচাপ আছেন। তোমরা ফিরে যেতে চাইবে, কেন না চিরদিন এমন করে থাকা ত যায় না, তারই প্রতীক্ষা করা ছিল এখন তাঁর পক্ষে অন্য পথ নেই, অসময় যখন আস্‌বে, তখন তিনি বুঝ্‌তে পার্বেন, সংসার ছেড়ে যেওয়ার চেয়ে একটু আগে ছোট হ'য়ে তাকে রক্ষা করার কোন ক্ষতি নাই। তোমরা যা ভাল বোঝ, তার ওপরই তিনি একদিন সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নেবেন। আজ হালের চেয়ে অতিমান তাঁকে বেশী পীড়ন করছে, সেটা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। আমার কিন্তু তাঁর কথা মনে হ'লে খুবই কষ্ট হয়।" তার পর আমার দিকে ফিরিয়া সে করুণ মিনতিভরা স্বরে কহিল—"জামাইবাবু, ঠিক নিজের শক্তি পরীক্ষার সময় তোমার এখন নয়, সমস্ত জীবন পড়ে আছে তাবনা কি? আজ ঘটনাস্রোতের প্রতিকূলে যাবার চেষ্টা করলে, সব দিকই মাটি হয়ে যাবে। এখন চুপ করে দেখ কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।"—বলিয়া বৌদিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"কথায় কথায় ভুলে গিয়েছিলাম, দিদি তোমার জন্যে বসে আছে। আমিও হাতের কাজ ফেলে এসেছি, দিদি কি মনে করছে! জামাইবাবু, একটু বেড়াও গে—তার পর আমাদের ওখানে যেও।" বলিয়া বৌদিকে সঙ্গে করিয়াই লইয়া গেল।

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে কুলি আসিয়া হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিল—সহি করিয়া লইলাম। হাত কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বুকও কাঁপিল। আমার নামে টেলিগ্রাম।

খুলিয়া দেখিলাম—সর্ব্বনাশ! দাদা 'তার' করিয়াছেন, বাবার অবস্থা সঙ্কটজনক তোমরা চলিয়া আইস।

টেলিগ্রাম হাতে করিয়া ছুটিয়া গিয়া বৌদিকে সংবাদ দিলাম। তবে তাঁর মুখ একটুখানি হইয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে তিনি শুধু কহিলেন—কি হবে ঠাকুরপো!

আমি কহিলাম—যেতে হবে। তিনি কহিলেন—নিশ্চয়ই!—আজই চল ভাই।" আমি কহিলাম—আজ আর হবে না, ট্রেণ নাই।" বাড়ীশুদ্ধ সবাই এসংবাদে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। লক্ষ্মী কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে কহিল—জামাইবাবু, বাবাকেও খবরটা দিও।"

আমি কহিলাম নিশ্চয়। তার পরে 'তার' আফিসে গিয়া দুইখানা 'তার' করিলাম, একখানা দাদাকে আর একখানা শ্বশুর মহাশয়কে।

কালই যাওয়া ঠিক। আবার ঘটনাস্রোতে পড়িয়া কাশী লোকানপাট উঠিল। সে-ই বাড়ী ফিরিতে হইল কিন্তু আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ফিরিতে পারিলাম না। একটা বিষয়ে বড় সোলে পড়িলাম—সৌরীকে লইয়া কি করিব, সে সঙ্গে যাইবে, না, তাহাকে রাখিয়া যাইব। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, না সে এখন এখানেই থাকুক। টেলিগ্রামে স্পষ্ট কিছুই নাই, সুতরাং তাহাকে সঙ্গে না লওয়াই ভাল।

মাথার উপর এত বড় বিপদ, তবু বিদায়ের সময় সকলই সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সৌরী একেবারে কোথায় গা-ঢাকা দিয়াছে! লক্ষ্মী একটি ঘরের কোণে চুপ করিয়া ম্লান মুখে বসিয়া আছে—তার সদাপ্রফুল্ল মুখখানি জলভরা মেঘে যেন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—আজ এই ম্লানমুখী ফুলের মতন শুভ্র এবং স্নিগ্ধ বালিকা হৃদয়খানি বিদায়-বেদনায় নিষ্ঠুর আঘাতে অস্থির হইয়াছে। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়া তার কোমল করপল্লব ধরিয়া স্নেহভরে তাহাকে ডাকিবামাত্রই সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—অশ্রুচ্ছায়াক্রান্ত নয়নে আমি তাহাকে বলিলাম, লক্ষ্মী সৌরীকে দেখ।—বলিয়া আমি অন্যত্র চলিয়া গেলাম।

আর সময় নাই, বৌদি ও আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত। সৌরী আসিয়া চিপ্ করিয়া আমাদের দুজনকে প্রণাম করিল—নীরবে আমার দিকে একবার যাচ্ঞা চাহিয়া সে মুখ ফিরাইল। সৌরীও লক্ষ্মীর মস্তক চুম্বন করিয়া বৌদি আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি লক্ষ্মীকে বলিলাম—লক্ষ্মি,

আদি তবে, হাসি মুখে বিদেয় দিতে পারে না, ছি! অশ্রুর কথায় উদ্বেলিত অশ্রুবারি সে কোনমতেই থামাইতে পারিল না—টস্ টস্ করিয়া অশ্রুবিন্দু দুজনার তার গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। সেদিনার সে হাতেও সুন্দর অশ্রুদানেও সুন্দর। অবগুণ্ঠনের আড়ালে বৌদি নিজেকে পূর্ণভাবে ঢাকিয়াছিল;—বুঝিলাম সেও কাঁদিতেছে। গাড়ীতে উঠিবার সময়ে আমি বলিলাম—"বৌদি এইল লক্ষ্মী, তার ভার তোমার ওপরে।—ছোট বোনটির হাতে দিদির ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনেই যাচ্ছি।" এইবার লক্ষ্মী জোর করিয়া কহিল—বিদেয়ের মধ্যেই দিদির অমঙ্গল হবে, এই বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা, বিপদ থাকিবেকাহার, মঙ্গল চিরদিনের। যাক্, গিয়েই খবর দিও।" আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বৌদি বলিলেন—হাঁ তা যেন বৈকি। শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম—গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটিল—সুবার জিদ্ করিয়াছিল, তাই সে ষ্টেশন অবধি আসিয়াছিল।

হু-হু শব্দে ট্রেণ ছুটিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের আমি প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম! প্রথম যখন ঘুম ভাঙ্গিল দেখিলাম বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়াছি। বৌদি একলার মুখ বাড়াইয়া চন্দ্রালোক-শোভিত প্রকৃতির নিস্তব্ধ ছবি দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলেন। আমাকে উঠিতে দেখিয়া বলিলেন—আচ্ছা বা'হোক ঠাকুরপো, কি ঘুমোতেই পার। আমি লজ্জিতভাবে একটু হাসিলাম মাত্র। গাড়ী বর্দ্ধমানে অনেকক্ষণ থামে।

একটু পরে আমি কহিলাম—এখনিকার কিছু খাবার কিনি।

"তা বেশত—কিন্তু সীতাভোগ নিয়ো না, ওগুলো আমার একেবারেই ভাল লাগে না।"

"বিদিদাদা তবে আনিগে—আচ্ছা যদি খুব ভাল তা'হলে আসানসোল থেকেই ফিরব।"

"বর্দ্ধমানের খাবারই ভাল।"

"সবাই আই বলে আমার একি ফল বাপু, বর্দ্ধমানের নাম বেশী বলে, এখন ঢাকিও বেশী চলেছে"—বলিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

খাবার লইয়া ফিরিয়া আসিবামাত্র, বৌদি বলিলেন—"খাবারত নৌদিদির সঙ্গে দেছে এই সঙ্গে তুমি কিছু খাও।" আমি বলিলাম—"আর তুমি?" তিনি হাসিয়া কহিলেন—"আমিত ভাই ষ্টেশনে কিছু খাইনি—বাড়ী পৌঁছে কাপড় চোপড় ছেড়ে কিছু খাব'খন।" আমি কহিলাম—ইস্, ছাত ঘাবে বুঝি? তিনি শুধু হাসিলেন।

কিছু খাইলাম—ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। জিনিসপত্তর গোছগাছ করিতে লাগিলাম। ট্রেণ হইতে যখন নামিলাম—ভোরের মিঠা হাওয়ায় সমস্ত প্রাণ মন শীতল হইল।

দাদা ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন—ষ্টেশন হইতে আমাদের বাড়ী বেশী দূর নহে; তবু বৌদির জন্য পাল্কি প্রস্তুত ছিল; অবশ্যের পুরুষের অতি প্রত্যুষেও এক পা হাঁটা যে অগৌরবের কথা!

দাদা ও আমি পদব্রজে চলিলাম—রাত থাকায় তত লোক দিদের কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই; তবে শুনিলাম দাদা এখন একটু ভাল।

বাড়ী পৌঁছিয়া দাদাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলাম। দাদা কহিতে লাগিলেন—গেল আজ আট দিন হ'ল, হঠাৎ কোথায় কিছু নাই বাঁয়ের ব্রাঙ্ক মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। তখনি বুদ্ধি করে, অগ্নিস আমি ডাকে; আথার, নাকে মুখে বরফ দিয়েছিলাম, তারপর যা কাণ্ড ডাক্তার এসে দেখে খুবই ভয় পেলেন। এসে ব্যাপার দেখে কলকাতার একজন বড় ডাক্তারকে 'তার' করে দিলেন—টেলিগ্রামের মধ্যেই রোগীর অবস্থা মতন পাঠালেন লিখে দিলেন। ডাক্তারের আর ঔষধপত্র দিয়ে তিনি এখন অনেকটা ঝাড়া রয়েছেন। কলকাতার ডাক্তার কাল চলে গেছেন, বলে গেছেন কিছু কেটে গেছে; তবে খুব সাবধানে থাকতে হবে, আর কতকগুলা ব্যবস্থাও করে গেছেন—আমি তাঁর কথার বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম—ইঁহার এরূপ হবার কোন কিছু কারণ নির্দ্দেশ করে গেছেন কি?

দাদা বলিলেন—না! শুধু blood pressure এ কোথাকার শির ছিঁড়ে গিয়ে এরকম রক্ত বেরিয়েছে, এই বলেন। রক্ত বেরিয়ে গেছে বলেই তিনি এযাত্রা রক্ষা পেলেন।

বৌদি চুপ করিয়া সব শুনিতেছিলেন, গম্ভীরভাবে শেষে বলিলেন—এত দেরী করে যে আমাদের খবর দেওয়া হ'ল।

বাবাও মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন—তুমি ছিলে এলে আমার খবর দেবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। বাবার কথা কইবার শক্তি হওয়ার পরে তাঁর আদেশেই আমি খবর দিয়েছি—নইলে হয়ত দিতাম না।

ঠিক এমার মুখে এরকম কাঁকাল উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁর চিরদিনের ভাল স্বাস্থ্যটির যে খাঁক আছে, তা বোধ হয় তাঁর জানা ছিলনা, তাই তিনি ম্লান হইয়া চুপ করিয়া গেলেন। একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল।

কথার গতি ফিরাইবার জন্য আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বাবা উঠেছেন কি?

দাদা কহিলেন—না উঠে থাকেন এখনই উঠবেন। তোমরা মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হোক—তারপর। বৌদির দিকে চেয়ে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—আমার কথায় তোমার মনে কষ্ট হয়েছে, না? সত্যি—বলো যদি তবে শোন কোথা দিয়ে যে আমার রাত্রিদিন গেছে তা আমার অন্তর্যামী জানেন—মোহনের খবর দিতে আমার দেরী করাটা অন্যায় হয়েছে, তা আমি স্বীকার করছি—বৌদি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—তুমি আজ নিজের অপরাধ স্বীকার করছ, তার চেয়ে তোমার পায়ে যে আমি কত বেশী অপরাধ করেছি—সেইটেই আজ প্রসন্নমনে আমাকে ক্ষমা কর, তুমি আমায় ক্ষমা না করলে আমার বিবাহও যে আমাকে ক্ষমা করবেনা।

দাদা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—আমাকে না বলে চলে যাওয়াতে তুমি মনে আমার যতই কষ্ট উদ্বেগ পাও না কেন তবু সেটা একটা বড় রকম অপরাধের হয়েছে। তোমাদের চলবার পথ এমি করে বেঁকে-চুরে গেছে, একটু সতর্ক হয়ে চলা চাই—সেটা ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে আমি কোনদিন কিছু বলবার দরকার মনে করিনি—তবে এতদিন একত্র ঘর করে এ যদি না বুঝে থাক যে সব চেয়ে তুমি আমার কাছে বড় তাহলে আমার সম্বন্ধে একটা ভুল ভুল করেছ বৌদির বিষমূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—গলবস্ত্র হইয়া দাদার পায়তলে তিন বার মাথা নোয়াইলেন।

বৌদি ও আমি বাবার ঘরে প্রবেশ করিলাম—অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে তিনি তখন ইজি চেয়ারে শুইয়াছিলেন। আমরা নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না। চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র আমাদের দেখিয়া পিতৃদেব আনন্দ উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিয়া উঠিলেন—এই যে তোমরা কখন এলে। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না—নীরব নয়নধারায় পিতৃদেবের হৃদয়ের সমস্তখানি প্রকাশ হইয়া পড়িল।

প্রথমে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম—নীরবে আমার মাথায় হাত রাখিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই রহিলেন। পরে স্নেহের আবেগে গাঢ়কণ্ঠে কহিলেন—বেশ ভাল আছত বাবা।

বৌদি তাঁর প্রণাম করিলেন, তাঁর মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন—মা পাকা, মাথার সিঁদুর দাগ, হাতের নোয়া বজায় থাক। কিছুকাল নীরবেই স্তব্ধ রহিলাম।

একটু পরে পিতাই কথা সুরু করিলেন। বৌদিকে কহিলেন—মা লক্ষ্মী আমায় অবহেলা করেছিল, তার ফলে কি দাঁড়িয়েছিল আজ কা ফিরে এসে নিজের চোখেইত দেখতে পাচ্ছ।

বিস্ময়ের বৌদি কহিলেন—বাবা আমি ভুল করে চশমা দিয়ে দোষ করেছি, আপনি যদি—আর বলিতে পারিলেন না, পিতৃদেবের পায়তলে বসিয়া সেখানকার মাটি অশ্রুসিক্ত করিলেন।

তাঁকে এভাবস্থায় দেখিয়া পিতা স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন—ছি মা, অমন করে কি চোখের জল ফেলতে আছে। যা হবার তা হয়ে গেছে—তুমি দোষ যা করেছিলে,

আমার পক্ষে সাজাটা খুব বেশী হয়েছিল, তাই আমি সহ্য করতে পারলাম না। তবে এরকম না করলে আমারও বোধ হয় চৈতন্য হ'ত না। কতবার ইচ্ছে হ'ত তোমাদের ডেকে পাঠাই, কিন্তু ডাকি ডাকি করেও ডাকতে পারিনি—থাক্, আর কিছুদিন যাক্, দেখি না কি হয়। এক একবার মনে হ'ত, তাদেরও ত কেরবার আগ্রহ নেই, কেননা তারা কি কিছু বলতে পারে না—দেরী হয়ে পড়ছিল ভগবান অনেক সহ্য করে, শেষে বোধহয় আর সহ্য করতে পারলেন না, তাই সহজে যা বোঝা যায় চেষ্টা করিনি, বুঝে রক্ত উঠিয়ে, তাই আমাকে বোঝালেন। আর দেরী নয়, সমস্ত ক্ষতিপূরণ করে দিয়ে সংসারের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করবার সময় এসেছে, মা—তা না হলে ভগবান আমায় রেহাই দেবেন না, ঘরের দরজায় গিয়ে গিয়ে তাই তিনি আমায় ফেরত পাঠিয়েছেন।"—একটু চুপ করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন—তাহলে ছোট বৌমাকে আন্বার ব্যবস্থা কর। তোমাকেই বোধ হয় গিয়ে আন্তে হবে। দেরী দেরী কর না, আমার শরীর গতিক দেখছত।

নতনেত্রে আমি উত্তর দিলাম—আমাকে যেতে হবে না, এতদিনে বোধ হয় শ্বশুর মশায় সেখানে এসেছেন, তাঁকেই বলে পাঠাই পাঠাবার ব্যবস্থা করবার জন্য।

পিতা কহিলেন—উত্তম কথা। তাঁকে এখনি এই বলে টেলিগ্রাফ করে দিও যে তিনি যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন সেই ভাল, নতুবা তুমি গিয়ে আন্বে—বুঝলে?

আজ্ঞা, হাঁ—বলিয়া আমি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যার সময় উত্তর পাইলাম। বাবা ইজি চেয়ারে বসিয়াছিলেন—বৌদি কাছে দাঁড়াইয়া তাঁর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন। দাদা অদূরে একখানা চেয়ারে বসিয়াছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বাবা কহিলেন—একখানা চেয়ার টেনে এনে এদিকে বস। আমায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?

আমি কহিলাম—আজ্ঞে, হাঁ। টেলিগ্রামের উত্তর এসেছে।

তিনি কহিলেন—বল।

আমি কহিলাম—পরশু দিন সকালে শ্বশুর মহাশয় সপরিবারে এখানে আস্ছেন। এঁ্যা বল কি এত কি হয়! বিস্ময়বিহ্বলস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন। শ্লোকটি স্মরণ করিয়া তার পরে ধীরকণ্ঠে কহিলেন—ভাল করে দেখছ ত। উত্তরে আমি কহিলাম—আজ্ঞে হাঁ। আপনার মনে তিনি বলিতে লাগিলেন—আশ্চর্য্য! এ যেন তোজবাজি—সমস্ত অপমান ভুলে, আজ বেহাই আসছেন;—আসছেন আবার সপরিবারে। স্বপ্নে যা ভাবিনি, সেটা কি কখনও এত সত্যি হ'তে পারে? বৌদি এবার কথা কহিলেন—হাঁ, বাবা, সত্যিই তিনি আস্ছেন। তাঁর মনের অভিমান এত শিগ্‌গির যেতনা, এ ব্যবস্থা যে তাঁর ছোট মেয়ে লক্ষ্মী করেছে, তা আমি এখানে বসেই বুঝতে পেরেছি। অতটুকু মেয়ের অতবড় প্রাণ যে কেমন করে হ'ল, সেই টেই সব চেয়ে আশ্চর্য্য। ঘটনাচক্রের হাতখানা যে ভুলটা পাকা বন্দোবস্ত করেছিল সেটাকে ভেঙ্গে দেবার জন্যে এ তারই আয়োজন—এতদিন সে সুযোগ খুঁজছিল, তাই সুযোগ যখন এসেছে সে সেটা হাত ছাড়া করেনি মেসো-কুটুম বাড়ীতে এমন করে কে কবে আর আসে।' বাবা অবাক হইয়া সব শুনিতেছিলেন—"লক্ষ্মী বৌমা"—বৌদি কহিলেন—"হাঁ, আমাদের বৌএর ছোট বোন।"

আমাকে লক্ষ্য করিয়া বাবা বলিলেন—"পরশুদিন সকালেই তাঁরা তাহলে আস্ছেন। পাল্কির যোগাড় রেখো।"—তারপর বৌদিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"এত দিনের অপমানের প্রতিশোধ নেবার তার এবার তোমার ওপরই দিলাম—অবুঝ বুড়ো আর কোনো ভার নেবে না, মা—নেবার বুদ্ধি-ভার শক্তিও নেই।"

সন্ধ্যার ম্লান আলোকেও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে বৌদির মুখে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

যখন ষ্টেশনে গেলাম, তখনও রাত্রের ঘোর কাটে নাই। ক্রমে কর্ণা হইল—বিহঙ্গের প্রভাতী গানে প্রকৃতির নিদ্রা ভাঙ্গিল। আজ ট্রেণ আসিতে আধ ঘণ্টা লেট্ হইবে—

ষ্টেশনের লোকেদের মুখে এই সংবাদ শুনিলাম। যাহাহউক ট্রেণ আসিল—লোকেরও ছুটাছুটি সুরু হইল।

লোকজন সঙ্গেই আসিয়াছিলাম—মালপত্রের ভার তাহাদের উপর দিয়া শ্বশুরমহাশয়কে পাল্কির কথা জানাইলাম। শাশুড়ীঠাকরুণ, গৌরী ও লক্ষ্মী পাল্কিতে উঠিলেন। শ্বশুরমহাশয়ের জন্যও পাল্কি প্রস্তুত ছিল—তিনি তাহাতে উঠিলেন না। সেখানা আমাদের সঙ্গে খালি চলিল। বাড়ীতে গিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যে হোল উঠিয়াছে।

নীচের ঘরেই তাঁরা প্রথমে উঠিলেন—বৌদি পাশের ঘরে ছিলেন। গৌরী ও লক্ষ্মী দুজনেই তাঁকে খুঁজিতে লাগিল—তাহাদের দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছিলাম। লক্ষ্মীকে চুপি চুপি বৌদির সন্ধান দিলাম। লক্ষ্মী গৌরীর গা টিপিল—তার পরে দুজনে উঠিল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই লক্ষ্মী বৌদির বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকুলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"দিদি, আমিও এসেছি!" প্রত্যুত্তরে বৌদি কহিলেন—বেশ, করেছ ভাই।" লক্ষ্মী কহিল—"ভাগ্‌গিস তোমরা ভাই দিদিকে ফেলে এসেছিলে, নৈলেত আর আসা হ'ত না। আর এতেও কি ছাই হ'ত, ভাগ্‌গিস আমার কর্ত্তাটির এসময়ে কি একটা কাজ পড়ে গেছে, তা না বলে কথা হয়েছিল, তিনিও আমাদের সঙ্গে আসবেন, বাবা দিদিকে দিয়ে এখানে নামবেন, আর তিনি সোজা আমাদের নিয়ে কল্‌কাতায় চলে যাবেন।—সহসা তার কথায় বাধা দিয়া বৌদি বলিয়া ফেলিলেন—"লক্ষ্মি, সত্যিই তোমার বর অদ্ভুত।" ঝাঁকুনি বাঁচাইয়া চট্ করিয়া সে উত্তর দিল—"ছি ভাই দিদি, তুমি ওকথা বল—মা'ও কথায় কথায় আমাকে বলেন মেয়েটা অদ্ভুত, বাবা শুনলেই কিন্তু হেসে বলেন 'যা আমার পাগ্‌লী মেয়ে'—দিদি, আমি অদ্ভুতও নই, পাগ্‌লীও নই, আমি লক্ষ্মী—বলিয়া সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। গৌরী তার গা টিপিয়া কহিল—লক্ষ্মি, কি করিস্, অত জোরে কি হাসে। হাসিতে হাসিতেই লক্ষ্মী কহিল—"ঠিক বলেছিস্ ভাই, মেয়ে মানুষের যে হাসতে নেই—বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েদের চাপা কান্না শুনতে পাও এমন কান যখন বাংলাদেশে নেই, তখন আমি না হয় একটু হাস্‌লামই না"—এবার গৌরীও হাসিল। লক্ষ্মী কহিল—"কি বল্‌লিলাম জান দিদি, কত ভয়ে যে এসেছি তা আর কি বলব। মা বেঁকে বস্‌লেন, কুটুমবাড়ী যাওয়া হবে না—আরও একটা আপত্তি হ'ল সেই বিয়ের খাতের গোলমালের কথা নিয়ে। মাকে বোঝালাম শরীর সারবার জন্য, হাওয়া বদলানের জন্য বিদেশ যাওয়া যায়, তীর্থ করতে যাওয়ায় দোষ নেই, এমন কি চিড়িয়াখানা কোম্পানীর বাগানে বেড়াতে যাওয়ার কোন দোষ হয় না—যত দোষ শুধু কুটুম বাড়ীর বেলায়। মা বুঝ্‌লেন না। বাবাকে ধরে বল্‌লাম, জোর করেই বলায় মনোবাঞ্ছিত দূর করবার এই অত বড় সুযোগ এখন আপনা হ'তে এসেছে, তখন সেটাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না—বিদায় ভবিষ্যৎ সুখের ভিত ভাঙাতে বল্লাম। বাবা রাজি হলেন—তখন মাকেও রাজি হ'তে হল।"

এতক্ষণ আমি চুপ করিয়া শুনিতেছিলাম। সভ্যতভ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বলিলাম—তোমরা প্রস্তুত হও—এখনি বাবা হয়ত আমাদের দেখিতে চাইবেন। ঠিক এই সময়ে আসিয়া বলিল—"কর্ত্তা খোঁজ করছেন, এঁরা এসেছেন কি না।" আমি বলিলাম—"যেতে বল।" ঝিকে বলিলাম—"বলগে, আমি সবাইকে নিয়ে যাচ্ছি।"

কিন্তু বৌদি গৌরীকে ওদিকে যাইতে দিলেন না—বিয়ের পরে বৌ প্রথমে শ্বশুর বাড়ী প্রবেশ করে, সে সাজ প্রজাপতি তার অদৃষ্টে লিখেন নাই—তবু তাড়াতাড়িতে যতটা পারা যায় সাজাইয়া দিলেন। আসিতে আসিতে আমি তাহার কল্যাণমূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া একবার মাত্র দেখিলাম—বৌদি হাসিয়া কহিলেন—"অত ব্যস্ত কেন, ঠাকুরপো, একবার ভাল করেই দেখ না।" গৌরী লাল হইয়া উঠিল, ঠুং ঠুং করিয়া লক্ষ্মীর হাতের চুড়ী বাজিয়া উঠিল।

গৌরীর হাত ধরিয়া বৌদি বলিলেন—"চল, ঠাকুরপো।" সকলে মিলিয়া পিছু-সরিয়ানে গেলাম। বাবা সে ঘরে পূর্ব্ব হইতেই ছিলেন। শাশুড়ীঠাকরুণ ঘরের দ্বারদেশে দাঁড়াইলেন—ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন না।

বৌদী বাবাকে প্রণাম করিলে, তার মুখের অবগুণ্ঠন ঈষৎ সরাইয়া দিয়া, বৌদি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—"বাবা, এই আপনার ছোট বৌমা।" দু-হাতে দুইটি বোধন দিয়া তিনি কহিলেন—"রাজরাণী হও। আশীর্ব্বাদ করি চিরসুখী হও।" লক্ষ্মী তার দিদির অনুগামিনী হইল—তার হাতেও দুইটি বোধন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"তুমি যুগ যুগের ছোট বৌমা মা লক্ষ্মি।"

বেহাইয়ের দুই হাত ধরিয়া গদ্ গদ্‌কণ্ঠে পিতা কহিতে লাগিলেন—"আজকে যা দেখ্‌লাম ঠিক এ রকম দেখা-শোনা হবে, তা আপনিও ভাবেন নি, আমার কথা ছেড়ে দিন, এ ভগবানেরই খেলা।" এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া সুরমার কহিতে লাগিলেন—"আহা বৌ নয়ত যেন ঠাকুর প্রতিমা! আজ ছেলের বাপের অবস্থার দুর্দ্দশা হয়ে গেছে। ঠাকুর সেই যদি বোকাদে দিন থাকতে বোকাদে না কেন? দুঃখের কষ্টিপাথরে যাচাই হবে, খাঁটি সোনার দাম ঠিক হয়ে গেছে! বেহাই, মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করুন—আমাদের ভুল দেখে তারা এই শিক্ষা করুক যে নিজের দিকের ভালমন্দের দায়-অদায়ের হিসাব জীবনের সর্ব্বস্ব নহে—অন্যের সুখদুঃখের ব্যাপারটাও একেবারে তুচ্ছ নহে। দেখুন বেহাই, একটা কথা বলতে চাই, যেমন করে হোক আমাকে কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—ছেলের বিয়েতে পাটোয়ারী বুদ্ধিতেই যা আমাকে একেবারে অন্ধ করেছিল—দেনা-পাওনা সব চেয়ে বড় হয়ে, আমার মাথায় চড়ে বসে, প্রতিশোধের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব ছারখার দিতে চেয়েছিল। তাই মনে করেছি কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন—দেনাপাওনার অঙ্কে—যারা মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে তার বুকে জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিচ্ছে, সেই সকল লোকদের বিপদ থেকে মুক্ত করাই আমার বাকী জীবনের কাজ হবে—একটা পরিবারকেও যদি বাঁচাতে পারি, মনে কতকটা সান্ত্বনা পাব। আজ আসুন বেহাই, "বুক দিয়ে একবার বুকের ব্যথা বুঝুন"—আলিঙ্গনবদ্ধ দুই বৃদ্ধের অবিরল অশ্রুজলে বহুদিনের সঞ্চিত গরল নিমিষে ধৌত হইয়া গেল। এই করুণ দৃশ্যে সকলের চক্ষু আর্দ্র হইল।

এই সময়ে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং বোধন দুটি তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই গাম্ভীর্য্যতা অর্থভেদ করিতে না পারিয়া, পিতা একটু ক্ষুব্ধস্বরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"বোধন ফিরিয়ে দিলে মা?" ধীরে অথচ দৃঢ়স্বরে সে উত্তর দিল—"মঙ্গলব্রতের অনুষ্ঠানে আপনার অনেক বোধনেরই দরকার হবে, আপনার আশীর্ব্বাদটুকু আমার যথেষ্ট, আপনার দেওয়া বোধন আপনার কাজেই সার্থক হউক—দেবী দেবার মত শক্তি আমার নেই।"

লক্ষ্মীর মাথায় হাত রাখিয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে পিতা কহিলেন—"কি বলে মা দেবার শক্তি তোমার নেই। মা লক্ষ্মি, বুড়ো হয়েছি বলে এখনও বুদ্ধিলোপ হয়নি—হৃদয় থেকে যে দান আসে তা বিধাতার আশীর্ব্বাদেই সিদ্ধ হয়ে আসে, তার কাছে টাঁকশালের ছাপ মারা বোধন সত্যিই মূল্যহীন, একেবারে তুচ্ছ, মা লক্ষ্মীকে ভগবান্ ভিখারিণী করেন নি—রাজরাণীই করেছেন—ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, বুড়োর এই শেষ আশীর্ব্বাদ।"

শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ

দেশের জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী দেশের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মানবধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনে এক অভিনব আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিবে, ইহাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য দেশের তথাকথিত উৎপত্তিমূলক এবং তুলনামূলক জ্ঞানচর্চ্চায় এসিয়াবাসীর সমাজ জীবনের ধারা ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। ইংলণ্ডের পূর্ব্বকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংযত অনুকরণের ফলে আমাদের দেশের ছাত্রগণ ও অধ্যাপকগণ তদ্দেশীয় সমাজ, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধীয় সেই তথ্যগুলি "বিজ্ঞানসম্মত", সার্ব্বজনীন ও সর্ব্ব যুগের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান এবং আমাদের দেশে তাহার অনুকরণে গঠিত যে সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা হইতে কোন সার্ব্বভৌমিক চরম তথ্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে—তাহা হইতে কেবল কতকগুলি আংশিক সত্য ও নিতান্ত অসম্পূর্ণ বা একদেশদর্শী তথ্যই পাওয়া যায় মাত্র। কেননা, পাশ্চাত্য জগতের সেই সব বিজ্ঞানগুলি সমগ্র মানবজীবনের অসম্পূর্ণ পরীক্ষা ও আংশিক পরিচয় ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গঠিত। ভারতবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র জগতের সমাজ, ব্যবসায় ও শিল্পের ক্রমোন্নতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমাজ-জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া ইতিহাসে ভারতের আদর্শ ও অনুষ্ঠানের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে তৎপর হইবে। কেবলমাত্র পাশ্চাত্য খণ্ডের সমাজ-জীবনের ধারা ও অবস্থাদির তুলনা করিয়া যে অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্য তথ্যগুলি আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলির সংশোধন ও ব্যাপক বিধানের একমাত্র উপায় আরোহ-পদ্ধতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার সমাজ-জীবনের অনুষ্ঠান ও আদর্শগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহাদিগকে উৎপত্তিমূলক ও তুলনামূলক বিচারের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লওয়া। ইহার ফলে মানবধর্ম্ম, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, তাহা সার্ব্বভৌমিক হইবে, তাহা যে কেবলমাত্র কোন একটী বিশেষ, সমাজ বা সভ্যতার পক্ষেই সত্য ও জীবন্ত হইবে, তাহা নহে ৮ তাহা সর্ব্বসভ্যতার ও সর্ব্বযুগে প্রযোজ্য হইবে, পরে এই সকল সার্ব্বভৌমিক তথ্য হইতে কোন একটী বিশেষ সমাজের বা দেশের পক্ষে প্রযোজ্য তথ্য অবিরোহ-প্রণালী অবলম্বনে সহজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

তখন মানবধর্ম্ম ও সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন সভ্যতার আদর্শের ও ক্রমবিকাশের বৈচিত্র্যের অনুযায়ী হইয়া সত্য সত্যই তাহাদের উন্নতির পথ ইঙ্গিত করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্বন্ধে মেকলে সাহেব যে সকল নিতান্ত ভ্রম সঙ্কুল একদেশদর্শী মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের অনুযায়ী আদর্শে এখনও যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করা আবশ্যক। তাহা না হইলে বিদ্যানুশীলনে পূর্ব্ব কথিত সার্ব্বজনীন তথ্যসমূহের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। পরন্তু মেকলে সাহেবের মতের পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে পারিলে এসিয়াবাসী ও তাহাদের শিল্পকলা, সামাজিক আদর্শ-অনুষ্ঠান প্রভৃতি যে এতদিন মানববিজ্ঞানের উপেক্ষা পাইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতিবিধান হইবে এবং পাশ্চাত্য মানবসমাজবিজ্ঞান যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নীরস বস্তুতন্ত্রহীন 'abstraction'এ পরিণত হইয়াছে ও ভারতের জীবনধারার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াছে, তাহারও প্রতিবিধান হইবে। ইহার ফলে ভারতসভ্যতার অন্তর্নিহিত ঐক্যবিধান ও গঠনশক্তি

পাশ্চাত্য জগতে অবশ্যম্ভাবী নব্য সমাজতন্ত্রগঠনের সহায়তা করিবে। যুদ্ধের পর এবং মধ্যেই যে পাশ্চাত্য সমাজের আমূল পরিবর্তন দেখা যাইবে, অথবা যাইতেছে, সেই পরিবর্তনবিধানে যদি ভারতের আদর্শ কিছু সহায়তা দান না করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতের সভ্যতা ব্যর্থ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুভার

কিন্তু ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যানুশীলনকার্যের আংশ মাত্র। আমাদের জাতির পথপ্রদর্শক ও ভবিষ্যৎ গঠনকারী বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনের সকল সমস্যার প্রতিবিধান করিবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসকারী শক্তি হইতে সমাজকে রক্ষাকল্পে দেশে আদর্শ গ্রাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সহর, সুস্থ স্বাস্থ্যসম্পূর্ণ পরিবীর প্রভৃতি সুগঠনের জন্য যথাসাধ্য উপায় নিরূপণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিবে। দেশবাসীর শারীরিক অবনতি, তাহাদের কর্মাভাব, মধ্যবিত্তদের মধ্যে জনসংখ্যার হ্রাস প্রাপ্তি, কৃষির অধঃপতন, শিল্প-কলা প্রভৃতির দুরবস্থা, অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় গ্রাম ও রোগাক্রান্ত নগর, গ্রামবাসীদিগের আর্থিক অসচ্ছলতা ইত্যাদির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিতেরা বিষয় ও জীবনের কর্মব্যস্তির মধ্যে আধুনিক যুগে যে একটা বিরাট ব্যবধান থাকিয়া যাইতেছে তাহার উপলব্ধি হইবে। বিদ্যার্থিগণ যাহা শিক্ষা করে, তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারে না। বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় ও জীবনের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাহা নিরাকরণ করিবে এবং অর্জিত বিদ্যা যাহাতে জাতীয় জীবনযাত্রার কার্যে পরিণত হয়, তাহার উপায় করিয়া শিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন করিবে।

জাতীয় শিক্ষা ভারতের জীবনধারার এবং সার্থকতার সম্যক প্রতিষ্ঠা করিবে। ভারতের দুরূহ সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার ও সাধনার সম্মীলনপূর্বক আমাদের দেশের সনাতন সভ্যতাকে সজীব করিয়া তুলিবে। যেসকল বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষাদান করিয়াছে, তাহা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এবং তাহা ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি নিতান্ত উদাসীন। ভবিষ্যতে যে শিক্ষা দান করা হইবে, তাহা দেশের, সমাজের ও জাতির জন্য হওয়া উচিত এবং তাহার কর্তব্য সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতিসাধনের উপায় নির্ধারণ। এখন হইতে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ, জাতি ও সভ্যতার কল্যাণকল্পে নিজের শিক্ষাপ্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করুক।

সম্পাদক

বিশ্বত্রাতা

তৃষিত মানব, আয় ছুটে আয় আজি পতিতোদ্ধারে,
জগত্তারণ জগৎপূরের আসিছে সিংহদ্বারে।
হিমালয়ের শেখরেখা হতে ভেসে আসে তাঁর ত্রাণ,
আকাশে সাগরে ছুটিয়াছে তাঁরি উন্মাদ-সন্ধান।
সেই পূণ্য তোরণ খানি,
কবে খুলে গিয়া নাহি জানি,
জীবন-দেবতা আসিয়া দাঁড়াবে বক্ষে চরণ হানি'।
কেঁদে ওঠে সারাদেশ,
অশ্রুর বানে তরণী বাহিয়া আসে ওই হৃদয়েশ।

পাপ অগণন বিলাস-বহন হিংসাদ্বেষরাগে,
জর্জ্জর ওগো ভক্তের হিয়া আশ্রয় যবে মাগে;
অমনি বিশ্ব-বেদনার রথ আগমনী ঘোষে তাঁর,
আজি সেইদিন,—ধুয়ে ফেল জ্বালা অন্তর-বেদনার।
চির সুখ-স্মৃতি মধুভরা,
রহে মোহন ঘাসের ধরা,
সে অভাগা জাতি বিভুপদ কভু লভেনি বিত্তহরা।
দুখ সে যে শ্রেয় প্রেয়,
চিরন্তনের সাথে সাথে গাথা আছে সদা দুর্জ্জেয়।

দখিনোত্তর পশ্চিমে পূবে মরণের উৎসব,
অম্বর ভেদি' তুলিয়াছে যেই ধ্বংসের কলরব;
বিশ্বমানব। ছুটে আয় মোরা তার তলে গাহি গান,
প্রলয়ের পথে আসে ওই ধাতা করিতে পরিত্রাণ।
চড়ি' বিনাশের রথে কাল,
যত আসিবে সে উত্তাল,
মূর্ত্তি প্রকটি' ধরাল হরির মুছিবে অন্তরাল।
একদিক ভেঙে যায়,
অন্যতীরের দিক ওঠে গড়ি' দীর্ণ সে ধরিত্রীর।

নবীন রচনা নবীন জীবন চেয়েছে জীর্ণ ধরা,
সেতো নহে নাশ, ভূমিকা সে যে গো সৃষ্টির মনোহরা।
জীর্ণতা ভাঙ্গি' আমূল গঠন প্রকৃতির বলে হবে,
বিশ্বনাথের পরমবার্ত্তা এইত মহোৎসবে।
ওই শ্রবণ-রন্ধ্র ঘিরে,
তাঁর চরণের ধ্বনি ফিরে,
না জানি প্রাণেশ কোন্ নিরালায় এসেছের কোন্ তীরে।
আর বেশী দূরে নয়,
নন্দনে ভরা গন্ধিয়া ধরা নন্দিবে দয়াময়।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

পরিণাম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৯)

দ্বিত্র-গৃহিণীর ফিরিয়া আসিতে অনেক রাত্রি হইল। মনে বোধ হয় কেমন একটা অনুতাপ বোধ হইতেছিল, তাই ফিরিয়াই একবার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। পাছে রামপ্রসন্ন জাগিয়া উঠেন এই ভয়ে দিবানী পদাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া খুব ধীরে ধীরেই অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু নিদ্রার আর ঘুম কোথায়? তিনি পদশব্দ শুনিয়া একবার চাহিয়াই তখনই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। দিবানী ধীরাবনকে বলিলেন, "তুই আর কতক্ষণ থাকবি—যা, শুগে যা, আমি ঘরে বসে থাকছি এখন"।

রামপ্রসন্ন শুনিয়া তাড়াতাড়ি চোখ খুলিয়া বলিলেন, "না না, যাও তুমি শোয়গে যাও"।

"তোমার এখনও খুব কষ্ট হচ্ছে নাকি।"

"তাহলে আর কি হবে।"

"তা হ'লে একটু মালিশ দিই।"

রামপ্রসন্ন আপত্তি করিলেন না। মালিশ দেওয়া করাইয়া দিবানী কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর রাত্রি প্রায় তিনটা চারিটা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ চেতনাবস্থায় পড়িয়া রহিলেন বটে, কিন্তু যন্ত্রণার অবসান হইল না। অতিরেকের ঘোরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যে কয়েকজন কদাকার লোক তাহাকে ধরিয়া যেন ঠেলাঠেলি করিয়া একটা কাদা খালির মধ্যে পুড়িতেছে। খালির অপ্রশস্ত মুখে তাঁহার স্থূলোদর ঠুসাঠুসি হইয়া

নিয়াছে, তাহারা যতই ঠেলিতেছে—তাহার কেবল যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র। দেহের বাকী অংশ কোন মতেই গলিবার আরম্ভ হইতেছে না, তবে ও যন্ত্রণায় হাত পা ছুড়িতে ছুড়িতে রামপ্রসন্ন যেন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে হঠাৎ যেন কেমন করিয়া আততায়ীদের হাত ছাড়াইয়া তাঁহার গলিয়াচ্যুত দেহ খানি নীচে পড়িয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হইল, রামপ্রসন্নের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি চাহিয়া দেখিলেন, বিশ্বম্ভর হারাধন তাহার গরম মেরজাই ঢাকা অস্থিচর্মাবশিষ্ট পা-চটটি তখনও কাঁধে করিয়া বসিয়া আছে।

চোখে আলো লাগিবে বলিয়া লাক্ষিয়ামের উপর রেশমের কাপড় লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল সেটি ঠিক তেমনি রহিয়াছে, এদিকে যন্ত্রণাও ঠিক পূর্ব্ববৎ।

রামপ্রসন্ন মৃদুস্বরে বলিলেন, হারাধন, এবার তুমি যেতে পার।

আজ্ঞে যাব কেন—আপনি সুস্থ হন, আমি এখানেই বসে আছি।

"না তুমি এখন যাও।"

রামপ্রসন্ন পা ছড়াইয়া কাত হইয়া শুইলেন—শুইয়া কেবল নিজ ইষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলেন, হারাধন পাশের ঘরে যাইতেই বিরজা আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না। তিনি বালকের ন্যায় অধীর হইয়া অন্তরে কাঁদিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দন যেন আর থামিতে চাহে না। নিজের নিঃসহায় ও অসমর্থ অবস্থা, রোগশয্যার অনন্ত একাকিত্ব, মানুষের নিষ্ঠুরতা, ঈশ্বরের নিরুপায়তা এ সব যতই মনে পড়ে রামপ্রসন্ন ততই কাঁদিয়া আকুল, শেষে কি কারুনিক বিপদিতাও তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন?

রামপ্রসন্ন ঈশ্বরের ন্যায় ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রভু তোমারি কি এই বিচার? কেন আমাকে এ অবস্থায় আনিয়া ফেলিলে। আমি কি এমন অপরাধ করিয়াছিলাম? কেন আমাকে অহরহঃ এই ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছ," কে এ সব প্রশ্নের উত্তর দিবে? উত্তর মিলিবে না বলিয়াই কি নিরাশ্রয়ের এই হতাশ ক্রন্দন?

আবার বেদনা বাড়িতে লাগিল। রামপ্রসন্ন এবার নড়ন-চড়ন বিহীন, আর ছট্‌ফটানী নাই, চীৎকার নাই, চুপ করিয়া পড়িয়া আছেন আপন মনেই বলিতেছেন, "আচ্ছা খুব দাগো খুব বিষাক্ত ঘত পার যন্ত্রণা দাও, ঘত পার আঘাত কর, কেন? কি করেছি তোমার? কিসের জন্য এত আক্রোশ?"

কিছুক্ষণ পরে রামপ্রসন্নের মন আপনা হইতে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে লাগিল, ক্রমে তাহার বেগ থামিয়া গেল। মনের স্পন্দন কমিয়া আসিয়া স্থির হইয়া পড়িল—এত স্থির যে প্রশ্বাস বেগ বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। মনের ভিতর যে তাকপ্রবাহ বহিতেছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া বিরজা অন্তরাত্মায় স্বামীর জন্য লোলুপচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে মনে হইল, ভিতর হইতে কে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কিসের জন্য এত দুঃখ বাপু, কি চাও?"

রামপ্রসন্ন যেন বলিতে লাগিলেন, "কি চাই? চাই—যাতে এ যন্ত্রণাভোগ করিতে না হই, যাতে না আর কষ্ট পেতে হয়, মৃত্যু চাই না—চাই জীবন।"

রামপ্রসন্ন দূরবর্ত্তী একাগ্রচিত্তে শুনিতে লাগিলেন যথার্থিক এই দিকেই মনোনিবেশ করায় দেহের কষ্টও যেন আর সে সময় অনুভূতির মধ্যে আসিতেছিল না। মনে হইল ভিতর হইতে প্রশ্ন হইতেছে "বাঁচিতে চাও, আচ্ছা জীবনই যদি তোমাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তুমি কাটাইবে কি করিয়া?"

"কেন পূর্ব্বের মত—সুখে আনন্দে ভদ্রভাবে।" এবার আর কিছু শুনা যায় নাই শুধু শুনা গেল বেশ বলিয়াছি সুখে—আনন্দে—ভদ্রভাবে। রামপ্রসন্ন এবার মনে মনে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের একটা তালিকা করিতে লাগিলেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য আগে অতীত যেরূপ সুখ-সম্পদ বলিয়া মনে হইত, এখন পুঁজিতেও সেরূপ সুখ মুহূর্ত্তের অধিক পাওয়া গেল না। যা কিছু মনে পড়িতে লাগিল তাও আবার সেই বহু পূর্ব্বের শৈশবকালের কথা। হাঁ তখন বরং জীবনে একটা মিষ্ট বোধ হইত, বাঁচিয়া থাকায় আনন্দ হইত বটে। আহা! আবার যদি সেই শৈশবকাল ফিরিয়া আসে

কিন্তু যে রামপ্রসন্ন শিশুকালে যে সকল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল সেও আর নাই এখন প্রৌঢ়তায় পদার্পণ, তাহাকে যে আপন কেহ বলিয়া বোধ হয়।

শিশু রামপ্রসন্নের পরিণত বয়স রামপ্রসন্ন পরিণতির কথা চিন্তা করিতে গিয়া আপাতদৃষ্টিতে যাহা কিছু সুখস্মৃতি বলিয়া মনে হয় তাহা একে একেই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বিরজা ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি না বুঝিয়া তরুণবয়সে এ গুলিকে সুখ ঠাওরাইয়াছিলাম? এখন যে সবই উল্টা দেখিতেছি, কোন্‌টি বা ক্ষুদ্ধ চপলতা কোন্‌টি বা ক্ষণাবরক শৈত্যমাত্র। রামপ্রসন্ন ভাবিয়া দেখিলেন, শৈশব ঘুরে রাখিয়া যৌবন সীমা হইতে বরাবর বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন তথাকথিত সুখগুলিও তত্তই ফাঁকা ও সন্দেহজনক হইয়া পড়িয়াছে। ধরিতে গেলে "দ" পড়িবার সময় হইতেই ইহার আরম্ভ। প্রথম প্রথম তবুও অনেকটা খাঁটি জিনিষ ছিল। ছাইচিত্ত ব্যর্থ লেখনীর বন্ধন নীরাধীন আশা হইয়া কোনটাই ফেলিবার সামগ্রী নহে। কিন্তু ক্রমেই আইন কলেজের উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া ব্যবহারাজীবশ্রেণীতে প্রবেশ লাভের পথ সময় বরাবর ঘনাইয়া আসিতেছিল, প্রকৃত সুখের সন্ধিলাভও তত্তই কঠিন হইয়া পড়িতেছিল। প্রথম প্রথম লেটেলবেহেটের চাকরী করিবার সময় সুখ আসিয়া মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিতেন বটে কিন্তু বিত্তবাধায় এদিকে চাকরীতে যত পরিপক্কতা লাভ করিতে লাগিলেন, সুখ সৌভাগ্যের কোটার বেকির সংখ্যা তত্তই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ডেঁপোমের ডিক্রের ডিক্রির মুখপ্রায় এক আধটি খাঁটি আনন্দের আবির্ভাব-কণাও দুর্ঘটনা। ক্রমশঃ বছরগুলিও যেমন জলের মত বহিয়া যাইতে লাগিল, রামপ্রসন্নের পক্ষে প্রকৃত সুখ আস্বাদনের অধিক সুযোগও তত্তই বিরলতর হইতে লাগিল। বিবাহ—সেও একটা দৈব-দুর্ঘটনা বলিলেও হয়, তাহার পর কি রাত্রি হইতেই না, মুক্তি লাভ। মোহ হইতে কি ভয়াবহ জাগরণ। স্ত্রীর বিরক্ততার প্রকারণ বিরক্তিজনক ব্যবহার দুর্দিন, কাপড়টা ইহার কোন্‌টিই বা না মুক্তিটে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। সংসার-সুখের এ শোচনীয় পরিণাম ঘটিবে না কেন? তাহাদের সে বন্ধন ত ভালবাসার পবিত্র বন্ধন নহে ইন্দ্রিয় লিপ্সার আবেগমাত্র।

তার পর এই হতভাগা চাকরী—এক এক করিয়া বিশ বৎসর কাটিয়া গেল। তবু কি ছাই অভাব ঘোচে? অর্থকষ্ট অনাটন যেন সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়া আছে। আরও বিশ বছর ধরিয়া এমনি করিয়া প্রাণপাত করিলেও ব্যর্থ নিষ্ফলতা আগেকার ন্যায় অটলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে। একদিনে বিরজার মনে হইতে লাগিল কি ভ্রমেই না পড়িয়াছিলাম—যখন হুড় করিয়া পাতাল পানে নামিয়া যাইতেছিলাম মনে হইয়াছিল শনৈঃ ঊর্দ্ধে শ্রীর পথে অগ্রসর হইতেছি। এমন ভুল ও মানুষের হয়। শেষে কাছে গঙ্গা-বাস হইয়া মনে মনে যখন নিজ কৃতিত্বের বড়াই করিতেছিলাম তখন কি জানি কোন্ ফাঁকে আমার প্রকৃত জীবন দ্যূত-ক্রীড়ার পাশকের ন্যায় নহসা আমার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। আশা ভরসা ত সবই শেষ হইয়াছে, আর বিফা অনুশোচনার ফল কি? এখন পরিণাম শুধু মৃত্যু!

হঠাৎ রামপ্রসন্নের চিন্তাস্রোত উজান বহিতে লাগিল। রামপ্রসন্ন নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—কেন, এও কি কখন সম্ভব হয়? এ অভাজনের কি এতই অপরাধ, আমি কি এতই অযোগ্য। আচ্ছা সত্য সত্যই যদি নির্বোধের ন্যায় অহচিত্তভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকি তাহা হইলেই বা মরিতে হইবে কেন? এর জন্য এত কষ্টই বা ভোগ করিব কেন? ইহার কি কোনও অর্থ আছে, এ কোন্ দেশীয় ব্যবস্থা? (ইহার কি কোনও অর্থ আছে?) না নিশ্চয়ই কোথাও একটা বড় রকম ভুল হইয়া গিয়াছে।

এই বাক্যোক্তির ভিতর বিরজার সন্দেহের অন্ধকার ভেদ করিয়া সত্যের একটা ক্ষীণ আভাস দীপ্তিজটার ন্যায় কিয়ৎক্ষণের জন্য প্রকাশ পাইল কিন্তু তাহাতে আর স্থায়ী ফল কোথায়? সত্য ও অনন্তের এই ক্ষীণরশ্মি-সম্পাতে রামপ্রসন্নের একবার মনে হইল না, বোধ হয় ভুলই করিয়াছিলাম, জীবন যেমনটি করিয়া যাপন করিতে হয় তেমনটি করিয়া হয় তো করিয়া উঠিতে পারি নাই; কিন্তু পরক্ষণেই

বোধ আসিয়া কাণে কাণে বলিতে লাগিল, "সে কি কথা? সন্তানমাত্রের যেটুকু আবশ্যক কোন্ দিন তাহাতে তুমি অবহেলা দেখাইয়াছ?" মিত্রজা ভাবিলেন তাই ত আমিও চিরদিন সমাজ ও লোকমতকে যথাবিধি মান্য করিয়াই চলিয়াছি, তবে আমার জীবন-যাত্রার ভুল করিলাম কোথায়? জীবন ও মৃত্যু সমস্যার যাহা একমাত্র ধ্রুব উপায়, রামপ্রসন্ন তাহার ইঙ্গিত পাইয়াও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। মিত্রজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "আচ্ছা এখন তা'হলে আর চাই কি? শুধু জীবন? সে জীবনই বা কেমনতর? কেন সেই আগেকার আদালতে গিয়া হাকিমী করা, চুকিবার সময় চাপরাসী দারোয়ানেরা উপস্থিত লোকদের সতর্ক করার জন্য চীৎকার করিয়া বলিবে, "এই—চোপরাও হাকিম আতা" সে না হয় হইল; কিন্তু এ দিকে আমার জীবন রামলালের প্রায় প্রায় প্রকাশ হইতে বিলম্ব নাই—তা হলে ত্রিজগতের বড় হাকিম এইবারই বোধ হয় রায়টা দিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আমি দোষী সাব্যস্ত হইতে যাইব কেন? কি অপরাধ আমার? কি করেছি যে দোষী হইব। আমার দণ্ড হইতে হইবে? রামপ্রসন্নের কান্না পূর্ব্বে অনেকক্ষণ হইতেই থামিয়া গিয়াছিল তিনি দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া অধীরভাবে বার বার (নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিলেন) "কেন এ সব সহ্য করিতে হইবে? কেন এ কঠিন দণ্ড-বিধান?" কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া পাশবোড়া দিয়া যতবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনবারই এ প্রশ্নের কোন জবাব মিলিল না। যতবার মনে হইল, জীবন ভালভাবে কাটাই নাই বলিয়াই এখন এতই পাইতেছি। মিত্রজা ততবারই নিজের সম্পর্ক শূন্যভাবে লোকমত মানিয়া চলায় ওজুহাতে এ ধারণা নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বর্জ্জন করিলেন।

(১০)

আর দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে, রামপ্রসন্ন এখন আর বিছানা হইতে উঠিতে পারেন না। এদিকে চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া থাকিতেও ভাল লাগে না। এই কয়দিন এক পাশে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া পড়িয়া আছেন। মন শুধু এই অব্যাখ্যেয় অনুভিসম্ভব রোগ-যন্ত্রণার চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত। এক একবার অধীরভাবে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এ যন্ত্রণার কারণ কি? মরণ ছাড়া কি ইহা হইতে আর অব্যাহতি নাই! যমের ঠাকুর ইহার আর কি উত্তর দিবেন, কেবল বলেন, হা বাপু মরণ ছাড়া আর পথ কোথায়? তা হলে এ যন্ত্রণা ভোগ কেন? যন্ত্রণার ভুগিতেই হইবে তাহার আবার কেন কি? ইহার বেশী আর কোনও জবাবই পাওয়া যায় না। প্রথম ডাক্তার দেখানর পর হইতেই রামপ্রসন্নের জীবন যেন দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধারায় বিভক্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একটী পর্য্যায়ক্রমে প্রবল হইয়া, উঠিয়া অপরটিকে ঘোটেই সামনে আসিতে দিত না। যাবে২ যন্ত্রণা তাহাকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। মৃত্যু সম্বন্ধে অযৌক্তিক ধারণাগুলি তাঁহাকে যেন নিষ্ঠুরভাবে পিষিয়া ফেলিবার উপক্রম করিত। রামপ্রসন্ন কখনও কখনও আবার আশার উৎফুল্ল হইয়া মেহাভাজনদের ঔষধপত্রের ব্যবস্থাদি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ করিতেছিলেন, কখনও এইরূপ দৈহিক অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখিতে গিয়া হঠাৎ মূত্রাশয় ও রোমমূলি (appadix) প্রদাহের কথা মনে পড়িয়া যাইত এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে পুনরায় সেই দুর্ভাবনা ও মৃত্যুভয়ের সন্নিধানে আসিয়াই পৌঁছাইতে হইত। এই চক্রের হাত ছাড়াইয়া যেন পলাইবার উপায় ছিল না।

এই দিকে ব্যারাম বড় বাড়িতে লাগিল, রোগীর মানসিক অবস্থা আর কিছু পরিবর্ত্তন হইল না বটে, শুধু দেখা গেল যে মোটামুটি মূত্রাশয়াদির সংস্থান সম্বন্ধে তাহার সাধারণ ধারণা বড়ই অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। মৃত্যু-ভয় ততই যেন ঘনীভূত হইয়া পড়িতেছে। এই তিনমাসে তাহার শরীরের যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে যে কিরূপ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহা একবার স্মরণ করিলেই রোগমুক্ত হওয়ার দুরাশা আর তাহার মনে স্থান পাইত না। এই কয়দিন নিরুপায় অবস্থায় এক কাইতে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া পড়িয়া থাকিয়া মিত্রজা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে বহু বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন পরিচিত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও

এই জনসমুদ্র মহানগরীর মধ্যে নিজের ন্যায় একাকী বোধ হয় আর কেহই নাই এমন একক সঙ্গহীনতা বুঝি বা সাগরতলে বা নির্জ্জন কুসুমে খুঁজিয়া মেলা অসম্ভব। নিকটে আপনার বলিতে কেহই নাই, আছে শুধু অতীতের স্মৃতিরাশিমাত্র। একটীর পর একটী করিয়া সব জীবনের ঘটনাসমূহ আপনা হইতেই মানসপটে উদিত হইতে থাকে। ভূত বা বর্ত্তমান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সেগুলি সুদূর অতীতে অগ্রসর হয়। রাজফোপের জীব ও চিত্রের ন্যায় এই স্মৃতি গঠিত। সকল স্মৃতি দিয়া গড়া ছবিগুলিও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া উল্টাইয়া যায়। তবে অতীত হইতে বর্ত্তমানে না আসিয়া ভূতকাল হইতে অতীতে চলিয়া যায় এইটুকুই যা পার্থক্য।

অনেক দুঃখের বিষাদ নিবারণের জন্য পথের পরিচিত একদিন দুই একটী আবশ্যকীয় মোরব্বা প্রেরিত হওয়ায় বিমলার বাল্যকালে হরিতকী, আমলকীর মোরব্বা প্রভৃতির আস্বাদ গ্রহণের কথা মনে পড়িতে লাগিল। রামপ্রসন্নের পিতা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী হইলেও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলে যাইতে হইত। একবার তিনি সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষে বীরভূম গিয়াছিলেন। আসিবার সময় বালক-বালিকাদিগের জন্য সিউড়ির বিখ্যাত মোরব্বা কিনিয়া আনিয়াছিলেন। টিনের কৌটার ন্যায় একটি আর্শ সংযুক্ত সাদা সাদা পাতলুনির মোরব্বা, চট্‌চটে রসে ঢাকা কাটা কাটা আমলকীর মোরব্বা প্রভৃতির কথা রামপ্রসন্নের মনে হইতে লাগিল। রামপ্রসন্ন দেখিলেন সদ্যঃকৃত আহার্য্যের ন্যায় সেগুলির আস্বাদ এখনও যেন ঠিক মনে রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে শিশুকালের আরও কত খুঁটিনাটি কথা মনে আসিতে লাগিল। সেই বিধুমুখী ঝি—বুড়ি মা—সেই শৈশব-সঙ্গী ছোট ভাইটী, বাল্যকালের অমূল্য সম্পত্তি সেই ঘুড়ি লুটাইবার ছোট বড় বেলনাগুলি, মোটা হাত পা অলস অঙ্গ সকলের চেয়ে সেইটির উপরই বেশী টান। শেষ জীবনে এই মৈথিক বা মানসিক কষ্টের বৈসাদৃশ্য—সেই অনাবিল শিশুকালের সুখের স্মৃতিগুলি রামপ্রসন্নের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। ঝি মহাশয় হুকুম-সমনে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে শৈশবের সেই কলগানরতা জীবন তটিনীর এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের বিষয় আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। রামপ্রসন্ন কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "না সে আর সেদিনের কথা ভাবিয়া আর কাজ নাই সে আনন্দের স্মৃতিটুকুও আর সহ্য করিতে পারি না।

ক্রমে ঝি মহাশয়ের চিন্তাস্রোত অতীত হইতে বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিল। হঠাৎ চায়ের গন্ধী আটা আরোরুট বেদানারানির উপর নজর পড়ায় মিত্রজা লক্ষ্য করিলেন সিঁড়ি হেলান দেওয়ার ল্যাণ্ডিং-ঘরকো চাবড়ার অনেকটা ভাঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে, বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যেই সেইখানে কাটিয়া যাইবে। হঠাৎ স্মরণ হইল চেয়ারে এই ঘরকো মেরামত লইয়া গৃহিণীর সহিত তাঁহার একবার বিশেষ মতান্তর হইয়াছিল। রামপ্রসন্ন স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন "খরচ করিয়া ও ছাই ঘরকো চাবড়া না লাগাইয়া লইলেই বা কি হইত? শুধু বাহার বই ত নয় টেকেও না। কিছুই না কেবল পয়সা খরচমাত্র সার। তার পর ছেলেবেলাকার একরূপ একটা ঘরমেরামতি ব্যবসার কথা মনে পড়িল। রামপ্রসন্নের পিতার একটি সুন্দর ঘরকো নির্ম্মিত লিখিবার প্যাড ছিল। ছেলেবেলায় দুই ভাই একদিন সেটা লইয়া টানাটানি করিতে থাকায় তাহার সুদৃশ্য আবরণটি ছিঁড়িয়া যায়। সুখের জিনিষটি নষ্ট করার জন্য রামপ্রসন্নের পিতা রাগ করিয়া পুত্রকে প্রহার করিয়াছিলেন। রামপ্রসন্নের স্মৃতির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাই সকল ঘটনা আগাগোড়া মনে পড়িতেছিল, পিতার এই ক্রোধ প্রসঙ্গে স্নেহময়ী জননীর কথাও মনে পড়িল। রামপ্রসন্ন মনে মনে বলিলেন যাহা যে দিন মরিয়াছিলেন বটে কিন্তু মা আমাদিগকে পাড়ায় দেওয়ার ঘর মেরামত হইতে সন্দেশ আনাইয়া দেওয়াইয়াছিলেন। ছেলেবেলাকার কথা এইরূপে পুনরায় স্মরণ-পথে আবির্ভূত হওয়ায় হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করা রামপ্রসন্নের পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠিল। ঝি মহাশয় জোর করিয়া এ সব ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শৈশব-স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের যোগ সংক্রান্ত নানা কথা চিন্তাপ্রবাহে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যাইতে

লাগিল। ব্যায়রামটি কেবল অল্পে অল্পে আরম্ভ হইয়া শেষে কিরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যন্ত্রণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন ক্রমশঃ কিরূপ দুর্ব্বহ হইয়া পড়িতেছে এই সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রে ক্রমেই তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দূর অতীতে জীবনপ্রভাতে যেন একটু সুখের ভাতি দেখা যাইত কিন্তু ঘনাচ্ছন্ন কুহেলী আবার ক্রমেই সে বিমল জ্যোতির ক্ষীণ রেখাটিও গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। অতীতের সুপ্রশস্ত বর্ত্মে রামপ্রসন্নের মুক্তনিবদ্ধ মনশ্চক্ষু যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছিল সে সুখ ও সৌন্দর্য্যের পবিত্র নিদর্শনগুলি কোথায় কোন সুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে, কি'করিয়া গিয়া তাহাদের কাছে পৌঁছাইবার আর উপায় নাই। পর্ব্বত-মূল হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন ক্রমেই অধিকতর বেগে ধায় বা গিরি পার্শ্বস্থ অতল-স্পর্শ গহ্বরে পতিত হইতে থাকে রামপ্রসন্নের দুঃখভার প্রপীড়িত জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনারাশি মৃত্যু ছায়ার ভিতর দিয়া সেইরূপ সমুদ্ধবেগে মরণ বা নিষ্কৃতি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। ক্ষণকালের জন্য চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া রামপ্রসন্ন শূন্য দৃষ্টিতে সোফার পিছন পানে চাহিয়া রহিলেন। সম্মুখের কোন জিনিষই আর নজরে পড়িতেছে না। মন যে কোথায় পড়িয়া আছে তাহার আর ঠিক নাই। শুধু লক্ষ্যহীন অনন্তের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখ দুইটি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মনে উদাস ভাবে যেন শুধু শেষ খেয়ারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। হঠাৎ মিত্রজার মনে হইতে লাগিল যেন তিনি সূত্রের ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে নিম্নে পড়িয়া যাইতেছেন। রামপ্রসন্ন ভয়ে কাঁপিতে২ অঙ্গ বিক্ষেপের দ্বারা এই আকস্মিক পতনরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু করিলে কি হইবে ব্যাধিগ্রস্ত কল্পনা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি সহজে মিলে। মিত্রজার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল এবার আর কালের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন আর যাবন দিতে গিয়া করিব কি? কোন ফলই দেখি না কেবল এই দুঃখ—কিসে কি হইতেছে কিছুই বুঝিলাম না। যাঁরি অপর পাঁচ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ন্যায় সৌজন্য ও ভাবপরায়ণতার খ্যাতি বজায় রাখিয়া সসম্মানে জীবনযাপন না করিতাম তাহা হইলেও না হয় বুঝিতাম নিজের দোষেই ডুবিতেছি। কিন্তু যে অপরাধ জীবনে কখনও করি নাই রোগ দুঃখাদির একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে বলিয়া তাহাই বা অনর্থক স্বীকার করিয়া লইব কি করিয়া? আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কথায় এই দুঃখের উপরও রামপ্রসন্নের শুষ্ক ওষ্ঠে সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। এ হাসিটুকু আত্মবিস্মৃতির হাসি নহে। কেন কাহারও (প্রতি লক্ষ উদ্দেশে রাখিয়াই) উহার উৎপত্তি।

মিত্রজা এ ভাবনা-সাগরে আর থই পাইলেন না। শেষে আশাহীন খিন্নের ন্যায় বলিতে লাগিলেন—"না কোন কারণই খুঁজিয়া পাই না—কেনই বা মৃত্যু কেনই বা যন্ত্রণা এসব কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

(১১)

সপ্তাহখানেক পরে মিত্রজাপত্নির একটি দীর্ঘকাল পোষিত অভিলাষ অবশেষে ফলবতী হইল। নবীন ডেপুটী শ্রীমান্ নলিনচন্দ্র লীলার পাণিপ্রার্থী হইলেন। যে দিন সন্ধ্যাকালে নলিনের পক্ষ হইতে এ প্রস্তাবটি উত্থাপিত করা হইল তাহার পর দিবস মিত্রগৃহিণী কন্যাধীর কাছে কথাটি কি করিয়া পাড়া যায়—এ সুসংবাদের কিরূপ মুখবন্ধ আবশ্যক —তাহাই ভাবিতে ভাবিতে পতিদর্শনে যাইতেছিলেন। গতরাত্রি হইতে রামপ্রসন্নের শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। ঝিয়ানী দেখিলেন মিত্রজা সোফায় (পালঙ্কের) উপর পড়িয়া আছেন। তবে অন্যদিনকার মত "কাইত" হইয়া নহে একবারে "চিৎ" হইয়া। রামপ্রসন্ন বিস্ফারিত-নেত্রে শূন্যদৃষ্টিতে ভিতরকার ছাদের কড়ি বরগার দিকে চাহিয়াছিলেন—কথা কহিবেন কি—তাঁহার কণ্ঠ দিয়া কেবল একপ্রকার অস্ফুট আর্ত্তস্বর মাত্র বাহির হইতেছিল। ঝিয়ানী মিত্রমহাশয়কে ঔষধ খাওয়ার সময় হইয়াছে এই কথাটি মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেই তিনি এরূপ ক্রোধ ও ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে প্রেয়সীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন যে মিত্রগৃহিণীর অর্দ্ধোচ্চারিত কথা আর শেষ করিয়া উঠা হইল না। রামপ্রসন্ন ইঙ্গিতে পত্নীকে কাছে আসিতে নিষেধ করিয়া প্রায়রুদ্ধ বিকৃতস্বরে বলিলেন—"আমাকে

সুস্থ হইয়া ঘরিতে দিতেও কি তোমাদের বিশেষ কষ্টবোধ হইতেছে?

বিসেস্ ঘিত্র চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময়ে কুমারী লীলা পিতাকে সুপ্রভাত জানাইয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা, এখন কেমন আছেন? রামপ্রসন্ন পত্নীর ও ডাঃ কস্তার প্রতিও নিরতিশয় ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত চাহিয়া তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"বাপু, আর তোমরা ব্যস্ত কেন? আমার শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর বেশী দিন তোমাদিগকে কষ্ট দিতেছি না। ইহার পর—মা ও মেয়ে কপাটের আড়াইয়া একত্রেই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে যাইতেই লীলা আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল,—"মা, শুনলে বাবার কথা, যেন আমরাই তাঁর অসুখটা করিয়ে দিইছি—যেন সবই আমাদের দোষ। উনি যে এই কষ্ট পাচ্ছেন তাতে সুখী আর কে আছে; তবে মিছামিছি আর এমন করে বাদবাড়া কেন?

ডাক্তার যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামপ্রসন্ন অন্য কথায় "হাঁ" কি "না" বলিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন—মুখে সর্ব্বক্ষণই সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব।

ডাক্তার মহাশয়ের প্রশ্নমালা শেষ হইয়া চলিয়াছে দেখিয়া—ঘিত্রজা আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন—"মহাশয় জানেন ত এ রোগের সারিবার নয় তবে আর মিছামিছি শেষ সময়ে রোগীকে জ্বালাতন করিয়া লাভ কি?"

ডাক্তার। "ব্যারাম না হয় না সারিল—আমরা অন্ততঃ জ্বালাটাও ত দূর করিতে পারি।"

রামপ্রসন্ন। "তাই বা আর পারেন কোথায়, বাপ করিবেন, আমার আর চিকিৎসার প্রয়োজন নাই।"

ডাক্তার বসিবার ঘরে ঘিত্রপত্নীর সাক্ষাৎ পাইয়া এইবার তাঁহাকে সাফ্ জবাব দিয়া গেলেন। রামপ্রসন্ন আর বড় জোর তিন চার দিন মাত্র বাঁচিবেন—এখন আর চিকিৎসা করা বৃথা—শেষ দুই এক দিন রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—তখন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অহিফেন বা মর্ফিয়া প্রয়োগই একমাত্র ব্যবস্থা।

ডাক্তার যে বলিয়া গিয়াছিলেন রামপ্রসন্নের শেষ কয়দিনে চৈতন্য অবধি থাকিবে না—সে কথা হাতে হাতেই ফলিল কিন্তু শারীরিক সকল যন্ত্রণার চেয়ে নৈতিক বা মানসিক যন্ত্রনাটাই যেন তাঁহাকে সর্ব্বাধিক বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছিল।

গত রাত্রে নিদ্রালু রামপ্রসন্নের সদা প্রফুল্ল মুখখানির দিকে চাহিয়া—ঘিত্রজার মনে এই ক্লেশের প্রথম উদয় হয়। ঘিত্রজাদেবী কেবলই ভাবিতেছিলেন—"সজ্ঞানে—জানিয়া শুনিয়া—জীবনতরণী কি সত্যসত্যই বিপথে চালাইয়াছিলাম।" এখন আয়ুশেষের প্রান্ত বিচারকের যথার্থই বিশ্বাস জন্মিল যে জীবনটা ঠিকভাবে যাপন করা হয় নাই। এ অবস্থায় এ কথা আর পূর্ব্বের ন্যায় অনায়াসে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। জীবনের হিসাব-খাতায় বাস্তবিকই এ বড় রকম একটা ভুল হইয়া গিয়াছে সে বোধ সত্য আজ আর কে অস্বীকার করিবে?

সন্ধ্যের বিমল কিরণ-সম্পাতে রামপ্রসন্নের মনের পুঞ্জীভূত অন্ধকার কেন হঠাৎ কাটিয়া গেল। পূর্ব্বে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নূতন প্রবেশ করিবাই রামপ্রসন্ন কয়েকটি সামাজিক ও সরকারী ব্যাপারে, দেশনায়ক ধনীবৃন্দ এবং সাহিবের উচ্চপদস্থ উপরওয়ালাদিগের অনুমোদিত—তাঁহাদিগের সেই তথাকথিত "অভ্রান্ত" ব্যবস্থাগুলির প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে দুই একবার ভয়ে ভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ চিত্তদুর্বলতার জন্য অচিরেই বিরত হইয়াছিলেন। এতদিনে মনে হইতে লাগিল যে তখনকার সেই নিষ্ফল প্রয়াসই তাঁহার কাছে সত্যপথের প্রেরণা বহন করিয়া আনিয়াছিল। যে শ্রেণীর সরকারী কার্য্যপ্রণালী, যে সকল সামাজিক আচারাদি এবং আত্মীয়বর্গের সহিত যে প্রকার সম্পর্ক ও আদান-প্রদান বজায় রাখাই তিনি "ভদ্রতা" ও "ভদ্রতাসঙ্গত" বোধে এতকাল বুক দিয়া আঁকড়াইয়া ছিলেন "শেষের সে দিন" স্মরাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে সকল ভ্রান্ত ধারণার মূলগুলি আপনা হইতেই খসিয়া পড়িয়া গেল—এখন আর সেগুলিকে ঠিক্ মত চিনিয়া লওয়া কঠিন হইল না।

ঘিত্রমহাশয় পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধীয়করে সান্ত্বনা চেষ্টা করিবাই বুঝিয়াছিলেন যে এতদিন যাহা খাঁটি বলিয়া জানিয়া

আসিয়াছেন তাহা যথার্থই অকিঞ্চিৎকর "বুটা ছিল্" মাত্র বস্তুতঃ এখন সেগুলির শোষকতায় বলিবার বিষয় তিনি আর কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

মিত্রজা অত্যন্ত চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। এখন নিমেষেই সব কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বড়ই 'আপ্‌শোষ' হইতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আপন মনই বলিতে লাগিলেন "শেষে কি এই হইল! সারাজীবনটা নষ্ট করিয়া এত দিনে বুঝিতে পারিলাম যে শুধু খেলায় কাল কাটাইয়াছি। এখন যে ইহার প্রতিকার করি সে উপায়ও নাই। যদি এই নিষ্ফলতার বোঝাই শেষ পথের সম্বল হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলেই বা আর কি করিব?"

রামপ্রসন্ন 'চিৎ' হইয়া পড়িয়া আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ প্রাতে যখন তাঁহার ভৃত্য হারাধন, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা এবং ধর্ম্মনী-লোলুপ ধাকাবাগীশ ডাক্তার মহাশয়—একে একে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছিল তখন তাহাদিগের আকার ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তায় গতরাত্রের সেই জোর করিয়া জাগিয়া হওয়া ভীষণ সত্যের কি প্রত্যেক বর্ণই সমর্থন করিতেছিল না। আজ উহাদের ভিতর দিয়া তিনি আপনাকে ভালরূপেই চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনিও তাহাদেরই ন্যায় লোক দেখান আচরণকেই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেন, কি ভ্রান্তি! কি আত্মপ্রতারণা! আজ সে সকল নিজরূপে প্রকাশ পাওয়ায় কি বিকট, কি ঘৃণিত, কি কদর্য্য বলিয়াই না বোধ হইতেছে। মনশ্চক্ষুর এই আকস্মিক উন্মোচন নিজ পূর্ব্বাপরাধ সম্বন্ধে এই যে অবগতি মিত্রজার আজন্মিক ক্লেশ ও চিত্তবৈকল্যের ইহাই মূলীভূত কারণ। এ কষ্টের যে আর উপশম নাই—ক্রমেই যেন 'দপ্‌দপ্' হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার উপর দেহের যন্ত্রণাও আছেই। আর যে সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। মিত্রজা অস্ফুট আর্ত্তনাদের সহিত বিছানার উপর ছট্‌ফট্ করিয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন। গায়ে আঁটা জামাকাপড় যেন বিষবৎ হইয়া আসিতেছিল। রামপ্রসন্ন তাই সেগুলি জোর করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন—ক্রমে তাঁহার যেন কেমন একটা ঝোঁকের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। শুশ্রূষাকারী ভৃত্যটি বেগতিক দেখিয়া খানিকটা 'ব্রন্ডি' খাওয়াইয়া দিল। মিত্র মহাশয় কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলেন। চৈতন্যের সময় চৈতন্য হইতেই আবার সেই রোখোস্কাস্! মিত্রজা ঘর হইতে সকলকে হাঁকাইয়া দিয়া সোফার উপর পড়িয়া হাত পা ছুড়িতে লাগিলেন। ছট্‌ফটানি, কাপড় ছেঁড়া প্রভৃতি উপসর্গের কথা শুনিয়া হিমশী রামপ্রসন্নের কাছে আসিয়া একটা নূতন কথা পাড়িয়া ফেলিল—বলিল, "যেন অসুখ বিসুখ হ'লে হিষ্টিরা অনেকেই 'প্রোটিষ্টিউ' করিয়ে উপকার পায়—তা আমাদের খৃষ্টানমতেও ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তা করলে দোষটা কি? উপকার না হোক অনিষ্ট কিছুই হবে না। অসুখে না পড়েও ত লোকে এ সব আকছার করে থাকে—তা লক্ষ্মীটি আমার কথাটি রেখে একবার রাজী হও"। রামপ্রসন্ন বলিলেন "বুঝেছি—আমাকে একবারে অন্ত্যেষ্টির সেক্রামেণ্ট নিয়ে তৈরি থাকতে বলছ, কিন্তু তারও প্রয়োজন বড় দেখ্‌ছি না, কেন? আর কে না করেই হোক একবারে—হিমানী উক্তির এই অংশটুকু মাত্র শুনিয়াই কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বাষ্পাবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল, "এত মিনতি করে বল্‌ছি তবু কথাটা রাখ্‌বে না—? যদি বলো তো বুড়ো পাদরী সাহেবকে খবর দিয়ে পাঠাই—দেখেছো তো তিনি কত ভাল মানুষ লোক—"

রামপ্রসন্ন। "আচ্ছা পাঠাও সে ভাও।"

ধর্ম্মযাজক সন্নিধানে মিত্রজা মনের সকল কথা সংশয় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সংশয়ের নিরসন হইতেই যন্ত্রণাও যেন যথেষ্ট কমিয়া গেল—মনে মনে আরোগ্য হইবার আশাও উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। রামপ্রসন্ন পুনরায় পেটের ভিতরকার অন্ত্রাদির অবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে যথারীতি সেক্রামেণ্ট ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। মিত্রমহাশয় সাশ্রুনয়নে পাদরীসাহেবের আশীর্ব্বাদী গ্রহণ করিলেন। ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে 'সোফার' উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণের জন্য মনটা যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। রামপ্রসন্ন আরোগ্য-লাভের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া ইতিপূর্ব্বে প্রস্তাবিত উদর-

মেশে অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিজ মনে বলিতে লাগিলেন—"কাটাইয়া ফুটাইয়া কোন রকমে একবার বাঁচিয়া উঠিতে পারিলে হয়।" "সেক্রামেন্ট" প্রভৃতিতে মানসিক অবস্থার আশু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এইমত একটা কিছু বাধাগতের উল্লেখ করিয়া মিত্রগৃহিণী রামপ্রসন্নের নিকট নিজ অনুরোধ রক্ষা হেতু আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। মিত্রজাকে যেন একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া বিধবা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন আমার কথা সত্য কি না? শরীরটাও মনের সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়ে ভাল বোধ হচ্ছে না কি?" রামপ্রসন্ন পত্নীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া না চাহিয়াই শুধু "হাঁ" বলিয়াই কথা শেষ করিলেন। প্রিয়তমার দেহের ভঙ্গী, মুখের ভাব, গলার স্বর ও পোষাক প্রভৃতি তাঁহাকে সেই একই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। "বাবা এসবই ঝুটা বাহিরে যেমনটি দেখছ ভিতরে তেমনটি নয়। বিদ্যা ও প্রবঞ্চনার ছলে ভুলিয়া তুমিও নিজের জীবন ঠিক এমনি ধারা করিয়াই কাটাইয়াছ। জীবনে মরণে যেটুকু খাঁটি—"সাচ্চা" তাহা মোটেই চিনিয়া লইতে পার নাই।

এই চিন্তাটুকু মনে আসিতে না আসিতেই রামপ্রসন্নের আবার সেই পুরাণো বিদ্রূপ সেই দুর্জ্জয় ঘৃণা ফিরিয়া আসিল। ঘৃণার সহিত পূর্ব্বের সেই শারীরিক যন্ত্রণাও যেন কোনও ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হইল। মৃত্যুর নিশ্চয়তা ও নিষ্কৃতির অনিবার্য্য গতি সম্বন্ধে মিত্রজার সন্দেহের আর কোন কারণই রহিল না। কোথা হইতে আসিয়া ছুটিল কয়েকটি নূতন উপসর্গ যাহা যখন তখন দম্ আটকাইয়া প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইতে লাগিল—আর বোধ হইতে লাগিল যে যেন পেটের ভিতরের খানিকটা অংশ টানিয়া, ছিঁড়িয়া, দাঁতে চিবাইয়া কে তাহা দিতেছে।

রামপ্রসন্ন যখন স্ত্রীর কথায় "হাঁ" বলিয়া জবাব দিলেন সেই সময়ে তাঁহার মুখ এরূপ বিবর্ণ, এমন পাংশুপানা হইয়া গিয়াছে যে হঠাৎ দেখিলে যেন মরা মানুষের মুখ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

একবার হিতৈষীর প্রতি কাতরভাবে চাহিয়া মিত্রজা নিজের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও সোফার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিলেন "যাও যাও আর তোমরা আমাকে দিক্ করোনা।"

(১২)

রামপ্রসন্ন সেই যে বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিলেন তিন দিন ধরিয়া তাহার আর বিরাম ছিল না। কি ভীষণ সে আর্ত্তনাদ—দশবাড়ি দূর হইতে শুনিলেও পিলা চমকাইয়া যায়। স্ত্রীর প্রশ্নে "হাঁ" বলিয়া জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিত্রজাদেবীও স্থির বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই—মৃত্যু সত্য সত্যই তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া। মিত্রজার জীবনের প্রধান প্রশ্নটির সমাধান তখনও হয় নাই এবং শেষ পর্য্যন্তও হইল না। তিনি গোঁ গোঁ গোঁ শব্দের সহিত হুঁ হুঁ হুঁ না না করিয়া দুই বুলিই আওড়াইতে লাগিলেন, দুইয়ের মধ্যে একটা কিছু স্থির করিয়া লইলেন না। তাঁহার জীবনের এই শেষ তিন দিন কালের স্রোত যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোনও অদৃষ্ট অনিবার্য্য শক্তি তাঁহাকে যেন একটা কালো গুহার ভিতর পুরিয়া দিতেছিল আর মিত্রমহাশয় বড় পড়ালি অঙ্গবিক্ষেপের দ্বারা তাহারই প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন। যমদূতের আনিত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি তাহার উদ্ধারের আশা নাই বলিয়া তবুও যেমন জল্লাদের হাত এড়াইয়া পলাইতে চেষ্টা করে—মিত্রমহাশয়ের এই বাধা দিবার চেষ্টা ঠিক তাহারই অবিকল অনুরূপ। রামপ্রসন্নের প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল যে অজ্ঞাত জিনিষটিকে তিনি এতাবৎ কাল ভয় করিয়া আসিয়াছেন তাহা যেন ক্রমশঃই তাঁহার কাছের গোড়ায় সরিয়া আসিতেছে। এত প্রতিরোধ চেষ্টা, এত হাত পা আস্ফালন কিছুতেই তাহার গতিরোধ করা যাইতেছে না। মিত্রমহাশয় সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই কৃষ্ণবর্ণ যবনিকার ভিতরে নিজ দেহ প্রবেশ করাইতে সম্মতি দেন না বলিয়াই তাঁহার এই অসহনীয় কষ্টভোগ ঘটিতেছে। কেহ যেন বাহির হইতে তাঁহাকে ভিতরে ঠেলিয়া দিতেছে বটে কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে তিনি যে এখনও মনে মনে তাঁহার গতজীবন সম্বন্ধে কতকগুলি পুরাতন সংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। কোন

মতেই সে গুলিকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছেন না বলে খলিয়ার অগ্রপশ্চাৎ মুখে আটকাইয়া গিয়া এই ভ্রান্তি ও অসত্যের বোঝা তাঁহার আপনার পিছনে দুইই অনন্তর করিয়া তুলিয়াছে। প্রবাদবাক্যে দুঃস্বপ্নের ত্রাস কাটিতে গিয়া সর্পের যেরূপ ঘটিয়া থাকে তাঁহারও যেন ঠিক সেই অবস্থা। নৈতিক ভ্রান্তির এই সুবিশাল পুঁটুলিটির ভার সোজা হইতে বর্জ্জন করিতে পারিলে তাঁহাকে আর এত ভুগিতে হইত না। তৃতীয় দিনে বিরজাসুন্দরীর হঠাৎ মনে হইতে লাগিল কে যেন তাঁহার বক্ষে ও পার্শ্বদেশে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়ার যন্ত্রণা বিশেষভাবে বাড়িয়া উঠিল—অবশেষে বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি খলিয়ার মুখ দিয়া ভিতরে গলাইয়া আসিয়াছেন। ভিতরের সেই অতলস্পর্শ গহ্বরের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া উষার নির্ম্মল আলোকচ্ছটা যেন ক্রমশঃ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। রামপ্রসন্ন যাহা ভাবিয়াছিলেন এ যেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। রেলগাড়ীতে যাতায়াতের সময় এরূপ ভ্রম অনেকেরই হইতে দেখা যায়। ষ্টেশনে গাড়ী লাগিয়াছে, হয়তো কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক হইয়া বলিয়া আছি, প্লাটফরম হইতে গাড়ী পিছনে হটাইতেছে—তখন চলিতে সুরু করিয়াছে লক্ষ্য করি নাই হঠাৎ মনে হইল আমরা পূর্ব্বের ন্যায় একপথেই চলিয়াছি—ভাল করিয়া দেখি তাহা তো নয়—এযে উল্টা গতি!

এই শেষ অবস্থাতেও বিরজা আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিতেছিলেন—"সংসারপথে না হয় ঠিক মত চলিতে পারি নাই—কিন্তু এখনও প্রতিকারের উপায় আছে। আজ কি করিয়া চলিলে ঘোর হইবে না তাহাই বা কেমন করিয়া বুঝিব।" রামপ্রসন্ন যেন নিজ অন্তরাত্মার প্রতীক্ষায় নীরব হইলেন।

তখন দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে মুমূর্ষুর দেহ-ত্যাগের মাত্র আর ঘণ্টা দুই বিলম্ব। ছেলেটি কখন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি পিতার কাছে আসিয়া বসিয়াছে। হতাশা প্রপীড়িত রামপ্রসন্ন তখনও যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে হাত পা ছুড়িতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার হাতটি একবার পুত্রের মাথায় গিয়া লাগিল। ছেলেটি যখন সেই শীর্ণ হাতখানি নিজ হাতে ধরিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে খুটীর প্রথায় উহা বারম্বার চুম্বন করিতেছিল ঠিক সেই সময় অহিফেন ঘোরাচ্ছন্ন রামপ্রসন্ন খলিয়ার মুখ পার হইয়া সেই ঘটাটোপ অন্ধকারের ভিতর ক্রমশঃ আলোক দেখিতে পাইতেছিলেন, আর গত জীবনের ভুলভ্রান্তি সমূহের সকল সন্দেহ বিসর্জ্জন দিয়া কিসে সেগুলি সংশোধন করা যায় তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। লোকে সংসারে আসিয়া কি নিয়মে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবে এই কঠিন প্রশ্নের সমাধানে তন্ময় বিরজা যখন মগ্ন হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার বোধ হইতে লাগিল কে যেন তাঁহার হাতে চুমা দিতেছে। তিনি চক্ষু খুলিয়াই দেখিলেন ছেলেটি তাঁহার মাথার নিকট হেঁটমুণ্ডে বসিয়া আছে। রোরুদ্যমান অসহায় বালকপুত্রের জন্য তাঁহার বড়ই দুঃখ হইতে লাগিল। তাঁহার স্ত্রীও এইসময়ে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলেন। রামপ্রসন্ন চাহিয়া দেখিলেন ছিয়ানীর শাকসুখও চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। পত্নীর অশ্রু সিক্ত গণ্ডদ্বয় ও কম্পান্বিত অর্দ্ধবিকশিত ওষ্ঠাধর এত দিনে যৌবনের প্রেমকুঞ্জ ও আদর অভিমানের কথা স্মরণ করাইয়াছিল। এতদিনে বিরজা সত্যসত্যই সহ-ধর্ম্মিণীর জন্য শোকাকুলতা করিতে লাগিলেন। একবার মনে হইল "আমার জন্যই উহারা এত কষ্ট পাইতেছে আমি চলিয়া গেলে বরং শান্তি ভোগ করিবে।" ইচ্ছা হইল মনের কথা মুখে প্রকাশ করেন কিন্তু কণ্ঠতালু জুলাইল না। রামপ্রসন্ন নিজের সান্ত্বনার জন্য ভাবিতে লাগিলেন "মিছা মিছি আর এ সব কথা ভাবিতে দিয়া লাভ কি? ইহাতে ও আর কোন কিছুরই পরিবর্ত্তন হইবে না"। শেষে অনেক চেষ্টার পর ক্ষীণ ও জড়িতকণ্ঠে বলিলেন—"খোকাকে বাহিরে তোমার জন্যও কষ্ট—" ইচ্ছা হইল শেষবিদায় গ্রহণ-কালে প্রাণ খুলিয়া বলেন—"আমি চলিলাম, ক্ষমা কর" কিন্তু মুখ দিয়া বাহির হইল শুধু একটা অর্দ্ধোচারিত শব্দ—'থাক যাই' বা এমনি একটা কিছু। বাক্‌শক্তিহীন রামপ্রসন্ন শুধু হাত নাড়িয়া ইসারা করিলেন—বোধ হয় বুঝাইতে চাহিতেছিলেন "আমি মুখ ফুটিয়া তোমাকে কিছু বলিয়া

যাইতে পারিলাম না বটে কিন্তু তিনি অন্তর্যামী যিনি সর্ব্বত্রে তাঁহার নিকট কিছুই অপ্রকাশ রহিবে না।"

এখন বিমলাদেবীর মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্টই মনে হইতেছিল যেন শ্রীভগবানের অপার করুণায় তাঁহার প্রকৃতই আস্থা জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল তথা উদ্ঘাটনে অসামর্থ্য হেতু তাঁহার এরূপ মানসিক উদ্বেগ জন্মিয়া ছিল—যে নিত্য সত্য নির্দ্ধারণের অক্ষমতার জন্য তাঁহার মনঃকষ্টের অবধি ছিল না, এখন, আধ্যাত্মিক জীবনের সেই সকল সত্যগুলি যেন অকস্মাৎ চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহার মনশ্চক্ষুর গোচরে স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। রাধপ্রসন্নের মনের যে বিদ্বেষভাব দূর হইয়াছে—এখন যেন সর্ব্বত্রেই সহানুভূতি। বাটির সকলেই তাঁহার জন্য শোকাকুল—তাই রাধপ্রসন্নের শুধু এই চিন্তা যেন তাঁহার জন্য বাড়ীর অপর সকলের মানসিক কষ্ট অধিক না বাড়িয়া যায়। নিজের দৈহিক কষ্ট নিবারণের ন্যায় প্রিয়জনের দুঃখ নিবারণও যে তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাধপ্রসন্নের মনে হইতে লাগিল —'এখন যে এত সুখের ও সম্বল আসে ও তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। নিজের যোগক্ষেমপ্রসঙ্গে রাধপ্রসন্নের বিধবা দৈহিক অসহায় কথা মনে পড়িল। বিমলাদেবী ভাবিতে লাগিলেন "কৈ এখন আমার কোনও কষ্ট যেন হয় না? সে অভাব ত নাই বা গেল কোথায়? বিজয়া একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া পুনরায় স্বগত বলিতে লাগিলেন— "হাঁ বেদনা জ্বালা এখনও কিছু আছে বটে—কিন্তু তাহাতে আর ক্ষতি কি? রোগের শেষ না হয় একটু থাকিলই বা? কৈ মৃত্যু মৃত্যু করিয়া এত যে ভয় করিতে-ছিলাম মৃত্যুই বা গেল কোথায়?" রাধপ্রসন্ন নিজের পূর্ব্বকালীন মৃত্যুভীতি ও তদ্বিষয়ক ঘোর দুশ্চিন্তার কথা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৈ মৃত্যুই বা কোথায়, তাঁহার সে ভয়ই বা কোথায়?

বিজয়া এখন মৃত্যু কল্পনাতীত। মরণের অস্তিত্ব কি আর তাঁহার নিকট টিকিয়া থাকিতে পারে; এ সম্বন্ধে ভয় বা চিন্তা কিছুই আর তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইতেছিল না। রাধপ্রসন্ন দেখিলেন মৃত্যুরাজের বিভীষিকার স্থানে এখন অমৃতলোকের চিরন্তন জ্যোতি বিরাজ করিতেছে। রাধ-প্রসন্ন বলিতে লাগিলেন—"তাহাইত বটে আগে যে এ সব কিছুই জানিতে পারি নাই! কি আনন্দ! এই মুহূর্ত্তের অপূর্ব্ব সংঘাতেই তাঁহার আত্মার রূপান্তর ঘটিয়াছিল। আত্মীয়জনের চক্ষে তাঁহার শেষ যন্ত্রণা দীর্ঘ দুইঘণ্টা স্থায়ী বলিয়া মনে হইলেও জীবনের এই মুহূর্ত্তৈক বাণী অমৃতের আস্বাদ অজ্ঞাতপূর্ব্ব ভূমানন্দের এই অনুরক্ত আবির্ভাব তিনি মোটেই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

বিমলাদেবীর মুখের কাছে একটা ভয় ভয় শব্দ হইতেছিল—শীর্ণ দেহযষ্টি থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপভরে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ক্রমে সে ধড়-ফড়ানি সে খিচানি সবই থামিয়া গেল, কে যেন বলিয়া উঠিল "সব শেষ হইয়া গেছে।" রাধপ্রসন্ন কথাকয়টি শুনিতে পাইয়া মনে মনে বলিলেন—"মৃত্যু ও শেষ হইয়া গেল না কি? তাহা হইলে মৃত্যুরও কি আর অস্তিত্ব রহিল না?"

বিজয়া পুনরায় একবার গভীর রাত্রে শ্বাস গ্রহণ করিলেন কিন্তু উহা দুই দুই হইতে প্রশ্বাসরূপে আর বাহির হইতে পারিল না। দেহখানি আপনা হইতেই এলাইয়া পড়িল, রাধপ্রসন্নের প্রাণপাখী এবার সত্য সত্যই দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিল।

শ্রীভবদাস সরকার এম্, এ

হিন্দু-চিন্তার বিশেষত্ব

জাতীয় সাধনার ক্রমবিকাশফলে এক একটা বিশেষত্ব জাতিগত হইয়া পড়ে। হিন্দুর চিন্তার বিশেষত্ব হইতেছে, সে বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, অসামঞ্জস্যের ভিতর সমন্বয় আনয়ন করে। সমন্বয়সাধনেই হিন্দুর হিন্দুত্ব। হিন্দু বহুর মধ্যে একেরই অনুসন্ধান করে। শুধু তাই নহে, হিন্দু একেরই বহুরূপ দেখে। হিন্দু বলে একমেবাদ্বিতীয়ম্, হিন্দু ইহাও বলে যিনি এক তিনি বহুও হন। নানা বিরোধী ভাবপুঞ্জের সমন্বয়বিধানই হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব। হিন্দু সব জিনিষেরই বাহিরের আবরণ ছাড়িয়া আসল সত্যটুকু পাইতে প্রয়াস করিয়াছে। সবস্ত ছাড়িয়া হিন্দু যে সত্যের পথ ধরিয়াছে। হিন্দুধর্ম যে বাঙ্গালীর ধর্ম বা পাঞ্জাবীর ধর্ম নহে, হিন্দুধর্ম যে ভারতের ধর্ম বা এসিয়ার ধর্ম নহে, হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম। যাহার নিকট সত্য সনাতন, হিন্দুধর্ম তাহারই ধর্ম। হিন্দুধর্ম আমার নহে, তোমার নহে, ভারতের নহে, এসিয়ার নহে, প্রাচ্যের নহে, পাশ্চাত্যের নহে। হিন্দুধর্ম সার্ব্বজনীন, সর্ব্বজাতীয়। হিন্দুধর্ম বিশ্বমানবের ধর্ম। হিন্দুধর্ম তাই কোন এক বিশিষ্ট মহাপুরুষের সাধনা হইতে জন্ম লয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, মহম্মদের ধর্ম, বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষের জীবনের সাধনার সহিত জড়িত। হিন্দু এমন কোন এক মহাপুরুষ মানে না, যাঁহাকে বাদ দিলে হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা হানি হয়। জগতে হিন্দুধর্মই হইতেছে একমাত্র ধর্ম, যাহার নাম কোন বিশিষ্ট মহাপুরুষের নাম হইতে হয় নাই, যাহারা হিন্দুধর্মকে আশ্রয় করিয়াছে তাহাদের নাম হইতে। ধর্ম্মের জন্য আমরা নহি, আমাদের জন্য ধর্ম বলিয়া হিন্দুধর্ম বিভিন্ন স্থানে হিন্দুধর্মাবলম্বী লোকের প্রকৃতিগত বিচিত্র আকার ধরিয়াছে। হিন্দুর কিছুই বাদ দেয় না, পাথরপূজা হইতে ষট্‌চক্র সবই ইহা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু কখনও একটাকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলে নাই। তাই হিন্দুকে বাহির হইতে দেখিতে গেলে মনে হয়, ইহার ভিতর কত অসামঞ্জস্য। কিন্তু একটা অসামঞ্জস্য-মূলক জিনিষ লইয়া বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখিবে বাস্তবিক ইহার ভিতর কোন বিরোধী ভাব নাই। হিন্দুর পুতুলপূজাকে খুব নিন্দা কর, কিন্তু দেখিবে ইহা শুধু পুতুলপূজা নহে। হিন্দু গার্হস্থ্য জীবনের বিধি নিষেধকে কুসংস্কার বল কিন্তু দেখিবে ইহা শুধু কুসংস্কার নহে। হিন্দুদর্শনের খুঁটিনাটি করিয়া দোষ বাহির কর, কিন্তু দেখিবে ইহা শুধু দর্শন নহে। হিন্দু দেবদেবীর রূপবর্ণনাকে Anthropomorphism বল, দেখিবে ইহা শুধু রূপবর্ণনা নহে। হিন্দু দেবদেবীর স্তোত্রকে তোষামদ বল, দেখিবে ইহা শুধু স্তোত্র নহে। হিন্দুর তীর্থযাত্রাকে প্রকৃতিপূজা বল, দেখিবে ইহা শুধু প্রকৃতিপূজা নহে।

হিন্দুর অভ্যাস সূক্ষ্ম ও গভীর, অভ্যাস সরল ও ব্যাপক। হিন্দুত্বে নানা বিরোধী ভাবের মিলন। নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায় হিন্দুত্বে আশ্রয় পাইয়া তাহাদের মধ্যে বিরোধ ভুলিয়া ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পল্লীগ্রামের শান্ত সুন্দর সন্ধ্যায় গম্ভীরই দেবমন্দিরে আরতি হইতেছে। কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ, ঢাক, ঢোল, দামামা, সবই বাজিতেছে। পুরোহিতের হস্তে পঞ্চপ্রদীপ মন্দির আলোকিত করিয়াছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে পুরুষ স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মুচি, মেথর ভক্তিপূতচিত্তে দণ্ডায়মান। হিন্দুত্বকে সরল ও অকৃত্রিম পল্লীজীবনের এই সুন্দর দৃশ্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হিন্দুত্বের ঊর্দ্ধ শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে অন্তর-রাজ্যের গুহ্য রহস্যের মধ্যে। কিন্তু ইহার মূল রহিয়াছে বাস্তবের অন্তরে। দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে পল্লীগ্রামের অন্তঃস্থলে। হিন্দুর উপাসনা বাস্তবকে কখনই অস্বীকার করে না, বাস্তবের ভিত্তিরেই হিন্দু অমৃতকে খুঁজিয়াছে। মন্দিরপ্রাঙ্গণের

জনতার মধ্যে কেহ নাম করিতেছে, কেহ জপ করিতেছে, কেহ করতালি দিতেছে, কেহ বা স্থির প্রশান্ত ধ্যানলয়। হিন্দুর সহজ সরল নামগান হইতে সূক্ষ্ম ও গভীর ধ্যান পর্যন্ত সবই বরণ করিয়াছে। গাছ ও পাথরপূজা হইতে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' পর্যন্ত হিন্দুর সবই গ্রহণ করিয়াছে, কিছু ত্যাগ করে নাই। শাক, সানাই, ঘণ্টা, স্ত্রীলোকের উলুধ্বনি সকলে মিলিয়া যেমন একটা ঐকতানের সৃষ্টি করে,—কিছুই বেসুরা মনে হয় না, হিন্দুর নানা সম্প্রদায়ে নানাবিধ সাধনার মধ্যে সেরূপ একটা সমন্বয়স্থাপন করিয়াছে। পল্লী-মন্দিরে সেই দেবতার ব্রত হিন্দুর ভারতের বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের বিচিত্র সাধনাকে একমুখী করিয়াছে,—বিরোধী ভাব-সাধনের মধ্যে আজ মঙ্গলময় একের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। হিন্দুর স্বাধীন ও অকৃত্রিমভাবে শুধুই সত্যের পথ ধরিয়াছে,—সত্যের পথ কঠিন পথ, সে পথে পদে পদে বিঘ্ন, 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' কিন্তু হিন্দুর এই আশ্বাসবাণী প্রচার করিয়াছে—যাহা অন্য কোন ধর্ম কখনই করে নাই, সত্যের পথ এক নহে, বহু, একনিষ্ঠ হইয়া একপথে যাইতে পারিলেই তুমি সত্যকে পাইবেই পাইবে—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

এই একের প্রতি নিষ্ঠা, বিরোধের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা, হিন্দুর এই বিশেষত্ব শুধু তাহার আত্মচিন্তা ও আত্মদর্শনকে যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহা নহে, হিন্দুর সমাজ-জীবনও গঠন করিয়াছে।

সম্পাদক

সাহিত্যের দায়িত্ব

সাহিত্যের রূপ যে জীবনেরই অপরূপ প্রতিমা। সাহিত্যের সৌন্দর্য্যের উপাদান ও জীবনই যোগাইয়াছে ও করিতেছে। অলসের জীবন নহে, বোধ ও কল্পনাহীন জীবন নহে, সত্যের সরল জীবন। জীবনই সাহিত্যের সন্ধান করে, জীবনই সাহিত্যকে লালন-পালন করে, আবার সাহিত্যও জীবনের পোষণের ভার লয়। জরাগ্রস্ত পিতার জীবন শিশুতে নবীকৃত হইতেছে, এইভাবে জীবন ও সাহিত্য পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অক্ষয়ভাবে পুষ্ট হইবে। বৃদ্ধ পিতা শিশুর বলে নবজীবন লাভ করিতে পারেন—তাঁহার এই আশা যেন ব্যর্থ না হয়। সাহিত্য যেন তাহার কর্তব্যজ্ঞান, তাহার দায়িত্ব না হারায়। যে সাহিত্য জীবনের বিরোধী, সে কুসাহিত্য, সে ভুয়া সাহিত্য। এখন নীতি ও রীতি বলিয়া সাহিত্যে এমন অনেক সময় প্রশ্রয় পাইতেছে, যাহা জীবনের বিরোধী—যেটা আশ্রয় করিলে যে জীবনের পথে মানুষ সেই আদিম কাল হইতে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, সে পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আদিম বর্বরতা হইতে আধুনিক সভ্যতার পরার্দ্ধ করিয়া মানুষ এটা অন্ততঃ ঠিক বুঝিয়াছে যে, পবিত্রতার আদর্শ খাট করিতে গেলেই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। মানুষ সেই আদর্শ সরু বড় করিয়া রাখিয়াই জীবনে উন্নতিলাভ করিয়াছে। সুতরাং বড় আর্টিষ্ট কখনই পবিত্রতা ও অপবিত্রতাকে সমান চক্ষে দেখেন না।

ভারতের বড় সাহিত্য কখনও কেবলমাত্র বৈঠকখানাকে আশ্রয় করিয়া জন্ম লয় নাই। মহাভারত, রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগবত, চণ্ডী ও বৈষ্ণব-সাহিত্য ভারতীয় জনসাধারণের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিগুলি সমগ্র ভারতীয় জীবনকে আশ্রয় করিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে।

সীতা, সাবিত্রী, রাম-লক্ষ্মণকে আমরা জীবনে ও কর্মে সত্যসুন্দরিয়া আজও তুলিতেছি; কালিদাসের কুমারসম্ভব, মুকুন্দরামের চণ্ডী, চৈতন্যভাগবত অথবা বৈষ্ণব-পদাবলী লোকে দৈনিক জীবনে সাধনার অঙ্গরূপে নিত্য পাঠ করিয়া থাকে। কলেজের সেক্সপীয়ার অথবা সেরেটে বা রবিবাবুর কাব্যসাহিত্যের পাঠের মত নহে।

সম্পাদক

ময়ূরী

ওগো রূপ-গরবিনী ভোগায়ত ললিত শরীরা,
ধনী বধূসম তোমা মাতায়েছে দম্ভের মদিরা।

তারি সম অঙ্গে তব নানাবর্ণে দামী পেশোয়াজ,
স্বর্ণ অলঙ্কার আর হীরামতি জড়োয়ার সাজ,

তারি তৃষা সম কণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে নানারূপ ধরে,
দুলে কদম্বের শাখা গরবিনি, তব পদভরে।

বেশ তৃষা রূপ জ্যোতি বিচ্ছুরিত্রা সবার নয়নে,
বিস্তারি রঞ্জিত পাখা নৃত্য করি ঘুর বনে বনে.

রুক্ষ কণ্ঠা, কণ্ঠ তব নীলবর্ণ কাল কূটে ভরা,
তোমার অপ্রিয় বাণী মুগ্ধ করু করে নাক ধরা।

রূপের লাগিয়া তুমি আলো কর প্রদর্শনী গেহ,
মুখরা ভামিনী বামা লভনিক অন্তরের স্নেহ।

কাস্তালের কালো বধূ কোকিলা সে আভরণ হীনা,
নাহি রূপ নাহি গর্ব্ব লাজে রহে পত্র পুষ্পে লীনা,

মাধুর্য্যে সে তুষ্ট করে কাননের সর্ব্ব পরিজনে,
নারীকের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লভে সেই নিখিলের মনে।

শ্রীকালিদাস রায় বি, এ

প্রেমানন্দ

হে আমার প্রেমানন্দ তুমিই আমার আনন্দ, তুমিই আমার প্রেম!

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি।

তোমার আনন্দ হইতেই আমার ক্রমিক বিকাশ, তোমার আনন্দধারা পান করিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। আমার মৃত্যুর পরেও হে আমার চিরানন্দ, তোমার অপার আনন্দের মধ্যে এই ভৌতিক দেহের অবসান হইবে, আমার প্রেমাত্মা, তোমার পরমাত্মায় বিলীন হইবে। আমার মরণের মধ্যেও যে তোমারি আনন্দ তোমারই প্রেম।

"তুমি আমার প্রেমের গুরু"—আমি তোমার প্রেমদাস। তোমার স্নেহের অনুশাসনের মধ্যে কর্কশ চাহনি নাই, সেখানেও তুমি আনন্দময়! তুমি আমার প্রেমস্বরূপ, তুমি আমার আনন্দ-স্বরূপ!

প্রেম স্বরূপে তুমি আমার অনন্ত, আনন্দ স্বরূপে তুমি আমার অসীম।

হে আমার অখণ্ডানন্দ, তুমি যে আমার রসস্বরূপ।—তাই মনে হয়, আমার উপনিষদ-তত্ত্বজ্ঞ তাত্ত্বিকবর্গ যাঁকে বলেছেন "রসোবৈ সঃ"—আমার কাছে তুমিও তাই! বিপদ যখন তার সহস্রফণা বিস্তার ক'রে আমায় গ্রাস করতে ধেয়ে আসে তখন দেখি তুমি হাসি মুখে আমায় বুক দিয়ে রক্ষা করছ—হে আমার বিপদবারণ এযে তোমারই আনন্দলীলা!

দুর্বহ দুঃখ মৈত্রে যখন অভিভূত হয়ে যাই, তখন দেখি তুমি আমার বুকে মাথা রেখে আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছ;—হে আমার সমদুঃখী, এও যে তোমারই আনন্দলীলা।

গভীর হতাশাসে যখন নিরাশার ঘরে যাই, তখন দেখি তুমি আমার কণ্ঠে বাহুলগ্ন করে আশা-সঞ্জিবনী দিচ্ছ, মৃত্যুপথে আমাকে অগ্রসর হ'তে অনুপ্রাণিত করছ;—হে আমার আশাময়, এও যে তোমারই আনন্দলীলা!

তোমারি আনন্দের মধ্যে আমার বিপদকে বিপদ বলিয়া অনুমান করিতে দাও না, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া জানিতে দাও না, নৈরাশ্যকে নৈরাশ্য জ্ঞান করিতে দাও না।

তুমি যা'র প্রেমাস্পদ, তার আবার বিপদ কি, দুঃখ কি, নৈরাশ্য কি? এই অপরিত অবস্থা ও তাহা বিপর্যয়ের মধ্যেও যদি তোমার প্রেমের লীলা আনন্দময় না হইত, তবে কি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম?

প্রেমের আমার আত্মা! আত্মা অমর, আমার প্রেমও অমর!

আত্মার সম্বন্ধে যেমন বলি—

"দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য"

তেমনি আমার প্রেম সম্বন্ধেও বলিব—

"নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"

প্রেমের সম্বন্ধ আত্মার সঙ্গে, শরীরের সঙ্গে প্রেমের কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মাত অব্যয় "অজো নিত্যঃ" তার মধ্যে আবার স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ কি?

তাই হে আমার পরমাত্মা, তুমি পুরুষ কি স্ত্রী আমি জানিতে চাহি না—সে জ্ঞান আমার থাকিবে কি করিয়া?—তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সেত বাহ্য অবয়বের সঙ্গে নয়!

যদি তোমার ভৌতিক দেহের সহিত আমার প্রেমের সম্বন্ধ হইত তাহা হইলে তোমার আমার সম্বন্ধও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইত।

হে আমার জীবনমরণের প্রেমাস্পদ, তোমার সঙ্গে

আমার যে সম্বন্ধ তা' যে মরণের পরপারেও অক্ষয়, অব্যয়!—জীবন অবসানের পরে সে সম্বন্ধ যে বিরাট বিপুল আকার ধারণ করিয়া এই নিখিল বিশ্বকে ছাইয়া ফেলিবে।

হে প্রেমময়, আমার এ প্রেম যে উদার অনন্ত, নীলাকাশের মত স্বচ্ছ, এ প্রেম যে অমুরক্ত! এপ্রেমের বিচ্ছেদে ক্ষয় নাই, মিলনে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, অবজ্ঞায় সঙ্কোচ নাই, আদরে গর্ব্ব নাই! মৃত্যুতে এ প্রেম উজ্জ্বল; বিবর্ত্তনে ধ্রুবতারার মত স্থির অচঞ্চল, আতিশয্যে পর্ব্বত প্রমাণ!

হে আনন্দময়, এ আনন্দ যে বিপদে সাহস, দুঃখে সান্ত্বনা, নৈরাশ্যে আশাসঞ্জিবনী এ আনন্দের যে শেষ নাই, সীমা নাই, বিরাম নাই—অশেষ, অসীম, অবিরাম—

শুধু আনন্দম্ আনন্দম্

কৃষ্ণানন্দম্।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

যৌবনেরি চুম্বনে

যৌবনেরি চুম্বনে—
উঠ্‌ল মধুর মৃদুল বাতাস না জানি আজ কোন্ বনে।
কোথা থেকে কার ইঙ্গিতে, ভর্‌ল বাতাস কি সঙ্গীতে
রুদ্ধ প্রাণের সুপ্ত আবেগ, লুকিয়ে ছিল কোন্ কোণে—
যৌবনেরি চুম্বনে!

যৌবনেরি চুম্বনে—
রক্ত রবির মত্ত কিরণ ফুট্‌ল রে আজ কার মনে—
সুপ্ত ছিল কোরক যত, রুদ্ধ প্রাণে মরার মত,
জাগ্‌ল তারা, বন্ধহারা, কোন্ দেবতার সিঞ্চনে—
যৌবনেরি চুম্বনে।

ওরে—যে গান শুধু বাজ্‌তরে ওই চিরন্তনের নন্দনে—
অজানা প্রাণ কতই কাঁদে
তবু—সে গান নাহি পড়ত ফাঁদে
আজ—প্রাণের পরে, পড়্‌ছে ঝরে, কোন্ মোহিনীর স্পর্শনে—
যৌবনেরি চুম্বনে!

যৌবনেরি চুম্বনে—
তীক্ষ্ণ সায়ক, তৃষার চাতক, কাঁদছিল রে কোন্ তূণে—
কোন্ বিরহীর নয়ন বাণে, গোপন ছিল স্বপন গানে
কার নিশাসে, উঠ্‌ল হেসে, জাগ্‌ল পাখীর গুঞ্জনে?
যৌবনেরি চুম্বনে!

শ্রীরাধাবল্লভ নাগ

যুক্তিকল্পতরু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৯৩৭—১১৬২ শ্লোক)

রত্নযুক্তি

বৈদূর্য্য

"কল্পাবসান কালে ক্ষোভিত সমুদ্র হইতে যেরূপ গভীর গর্জ্জন উত্থিত হয়, মৃত্যুকালে বলাসুর সেইরূপ গর্জ্জন করিয়াছিল, সেই গর্জ্জনসম্ভব হইতে (১) সুন্দর, উজ্জ্বল, নানাবর্ণ বৈদূর্য্যমণি উৎপন্ন হইয়াছে।

অত্যুচ্চ বিন্ধ্য পর্ব্বতের অনতিদূরে কাবসূত্তিক সীমার প্রান্তভাগে বৈদূর্য্যমণির আকর হইল।

সেই বলাসুরের বিনাশোৎপন্ন বৈদূর্য্যমণির আকর অতি গুণসম্পন্ন ও ত্রিলোকের অলঙ্কার স্বরূপ হইল।

সেই আকরে বলাসুরের বিনাশানুকারী বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় চারুদর্শন বিচিত্রবর্ণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত উজ্জ্বল বৈদূর্য্যমণি সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল।

পৃথিবীতে পদ্মরাগ প্রভৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট মণি আছে, বর্ণ ও প্রভায় বৈদূর্য্য তাহাদিগের সমান।

যত প্রকার বৈদূর্য্য আছে, তাহাদিগের মধ্যে যেগুলির বর্ণ ময়ূরের কণ্ঠ বা বৃন্ত পত্রের সদৃশ সেইগুলি প্রধান; মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—যে বৈদূর্য্যমণির বর্ণ নীলকণ্ঠ পক্ষীর পক্ষের তুল্য, তাহা প্রশস্ত নহে।" (পৌরাণিক কথা)

অন্যত্র আছে—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—বৈদূর্য্যমণি গুরু, দুর্ব্বল এবং ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

বৈদূর্য্যমণি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে চারি জাতীয় হইয়া থাকে।

শ্বেতাভ তপ্তবর্ণ বৈদূর্য্য ব্রাহ্মণজাতীয়, রক্তাভ তপ্তবর্ণ বৈদূর্য্য ক্ষত্রিয়জাতীয়, পীতাভ নীলবর্ণ বৈদূর্য্য বৈশ্যজাতীয় এবং কেবল নীলবর্ণ বৈদূর্য্য শূদ্রজাতীয়।

(১) কল্পান্তকাল ক্ষুভিতাম্বুরাশে—
র্নির্হ্রাদকল্পাদ্বিভিজন্ম নাদাৎ।

বৈদূর্য্যের গুণ

বিড়ালের চক্ষু বা রসোনের মত বর্ণবিশিষ্ট, 'কলিল', স্নিগ্ধ ও 'বাল্য' বৈদূর্য্য দেবভোগ্য।

স্নিগ্ধতা, ঘনতা, অত্যচ্ছতা, কলিলতা ও বাল্যতা এই পাঁচটী বৈদূর্য্যের প্রধান গুণ।

যে বৈদূর্য্য হইতে দীপ্তি উদ্গীর্ণ হয়, তাহার নাম 'সুতার' এবং যাহা আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু ওজনে গুরু, তাহার নাম 'ঘন'।

কলঙ্কাদি দোষবিহীন বৈদূর্য্যকে 'অত্যচ্ছ' বলে।

যে বৈদূর্য্যের গাত্র বিশ্লিষ্ট তাহার নাম 'বাল্য'।

ভাগ্যবান্ বৈদূর্য্যমণি অধিস্বামির সৌভাগ্য বর্দ্ধন করে এবং দোষযুক্ত মণি প্রভুর অনিষ্টসাধক হয়, অতএব মণি যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া লইবে।

বৈদূর্য্যের দোষ

বৈদূর্য্যমণিতে—শর্করা, ভাস, কলঙ্ক ও স্নেহ এই পাঁচ প্রকার প্রধান দোষ লক্ষিত হয়।

শর্করা (পাষাণ চূর্ণ) যুক্ত বৈদূর্য্যের নাম 'শর্করা', যাহার স্পর্শ অতি কঠিন, সেই বৈদূর্য্যকে 'কর্কশ' বলে, ইহা বন্ধুর অনিষ্টকারী।

যে চিহ্ন থাকিলে বৈদূর্য্যকে শুভ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে 'ভাস' বলে; 'ভাস'-যুক্ত বৈদূর্য্য বংশক্ষয়কারক। যাহার মধ্যে বিরুদ্ধ বর্ণ থাকে, তাহাকে 'কলঙ্ক' বলে, এই দোষও অমঙ্গলক। যাহার মধ্যে জল থাকে, তাহাকে 'স্নেহ' বলে; স্নেহদোষ স্নেহক্ষয় করে।

পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহারাজাই হউক, বা বিবেকসম্পন্ন সন্ন্যাসীই হউক, দোষযুক্ত বৈদূর্য্য ধারণ করিলে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

গিরিকাচ, শিগুপাল, কাচ এবং স্ফটিক এই চারিটী দেখিতে বৈদূর্য্যমণির সদৃশ অথচ বিজাতীয় সুতরাং ভ্রান্তিজনক।

(হীরক ভিন্ন) অন্য কোন বস্তু দ্বারা রেখাপাত না হইলেই তাহা কাচ স্থির করিবে এবং লঘুতা দ্বারা শিগুপাল, উজ্জ্বলতার অভাবে গিরিকাচ এবং অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দ্বারা স্ফটিক বলিয়া ধরা যায়।

বিজাতীয় মণি কখনও বিশুদ্ধ মণির সমান বর্ণবিশিষ্ট হইতে পারে না, কেবল সহজে চক্ষে বুঝাইবার জন্যই পার্থক্য উক্ত হইয়াছে।

স্নিগ্ধভাব, তরল, লঘুত্ব এবং মৃদুত্ব এই কয়টী বিজাতীয় মণির চিহ্ন, এই চিহ্ন দ্বারাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পার্থক্য বিচার করিতে পারিবেন।

'গুরুর্ণ' পরিমিত উত্তম ইন্দ্রনীলমণির যে মূল্য, ঐ পল পরিমিত বৈদূর্য্যেরও তাহাই মূল্য।

মণিসংস্কারকের কর্ম্মের নৈপুণ্যের তারতম্যানুসারে মণির মূল্যেরও তারতম্য হয়।

মণির পূর্ব্বাবস্থা ও বর্ত্তমান ভাবে কোন বৈলক্ষণ্য না ঘটিলে অর্থাৎ পুরাতন হইলেও গুণের কোন তারতম্য না বুঝিলে, উত্তম, মণিবন্ধক কর্ত্তৃক যত্নপূর্ব্বক প্রতিবদ্ধ মণির মূল্য নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক হইয়া থাকে।

এই যে মূল্য নিরূপিত হইল, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ব্যবস্থা চলিতে পারে না, কেবল মণির আকরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এবং সমুদ্রের তীরভূমিতে এই নিয়ম।

ইন্দ্রনিল

"যে দেশে সিংহল কামিনীগণ কমলপত্র দ্বারা নবনীত কন্দুকবৎ করিয়া পরস্পর ক্রীড়া করে, সেই দেশে বলাসুরের কমল সদৃশ নয়নযুগল পতিত হইয়াছিল।

ইহারই প্রমাণ স্বরূপ, কেতকবনশোভিত তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের বিস্তীর্ণ তীরভূমি ইন্দ্রনীলমণির আকর হইল।

সেইস্থানে ইন্দ্রনীলমণি নীলপদ্ম, বলরামের পরিধেয় নীলবস্ত্র, পালিত অলি, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, শিবের কণ্ঠ, কদম্ব পুষ্প ও কৃষ্ণাপরাজিতা পুষ্পের মত বর্ণবিশিষ্ট হয়।

কতকগুলি ইন্দ্রনীলমণি—সমুদ্রের নির্ম্মল জল, মযূরের গলদেশ, নীলীরস হইতে উত্থিত ধূম(১) এবং মত্তকোকিলের কণ্ঠ এই সকল পদার্থের মত বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

সেইস্থানে একই প্রকার নির্ম্মল বর্ণ ও প্রভাবিশিষ্ট অতি উত্তম ইন্দ্রনীলমণি সকল উৎপন্ন হয়।" (পৌরাণিক কথা)

ব্রাহ্মণাদি চারি জাতীয় মণি, যথাক্রমে, শ্বেতনীল, রক্তনীল, পীতনীল এবং কৃষ্ণনীলবর্ণ বিশিষ্ট হয়।

চারিজাতীয় ইন্দ্রনীলের ছায়াও চারিপ্রকার হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণজাতীয় ইন্দ্রনীলের ছায়া শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়-জাতীয়ের ছায়া তাম্রবর্ণ, বৈশ্যের ছায়া পীতবর্ণ এবং শূদ্র ইন্দ্রনীল মণির ছায়া কৃষ্ণবর্ণ হয়।

পদ্মরাগের মত (২) ইন্দ্রনীলমণিও তিনপ্রকার হইয়া থাকে।

যে নীলমণির মধ্যে ইন্দ্রধনুর প্রভা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে ইন্দ্রনীল বলে।

যে মণি শতশত ছিদ্রের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেও বর্ণের গাঢ়ত্বযুক্ত স্বীয় প্রভায় সমস্ত ছিদ্রই নীলবর্ণ করিয়া ফেলে, তাহার নাম মহানীল।

মণির মধ্যে ইন্দ্রনীল নীলবর্ণ, পদ্মরাগ রক্তবর্ণ, মরকত (২) স্নিগ্ধনীলাভ শুক্লবর্ণ, কাচাদ মণি রক্ত ও পীতবর্ণে বিচিত্র এবং পুষ্পরাগমণি পীতাভ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে; এই পুষ্পরাগই রক্তাভ হইলে কৌরবক নামে অভিহিত হয়।

ইন্দ্রনীলের গুণ

স্নিগ্ধত্ব, স্নিগ্ধত্ব, বর্ণাঢ্যত্ব, পার্শ্ববর্ত্তিত্ব এবং রক্তত্ব এই পাঁচটী ইন্দ্রনীলের উৎকৃষ্ট গুণ।

ইন্দ্রনীল আকারে ক্ষুদ্র ওজনে গুরু হইলে, তাহাকে 'গুরু' বলে; এই মণি বংশবৃদ্ধিকর। যে মণি হইতে সর্ব্বদা রেহপদার্থ ক্ষরিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়,

(১) ধূমাচ।

(২) মরকতোমণ্যঃ।

তাহাকে 'স্নিগ্ধ' বলে, ইহা অনর্থক। সূর্য্যোদয়ের অভিমুখে ধরিলে, যে মণি হইতে নীলশিখা নির্গত হয়, তাহার নাম 'বর্ণাঢ্য', ইহা ধারণেও ধনধান্য বৃদ্ধি হয়। যে ইন্দ্রনীলের পার্শ্বে (একাংশে) স্ফটিক, রজত, স্বর্ণ বা অন্য কোন তেজস পদার্থের চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহাকে 'পার্শ্ববর্ত্তী' বলে, ইহা সুখ্যাতি বৃদ্ধি করে (১)। যে ইন্দ্রনীল কোনও পাত্রে স্থাপন করিলে, পাত্রটী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, তাহার নাম 'রঞ্জক'; ইহা ধারণে ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও বংশবৃদ্ধি হয়।

ইন্দ্রনীলের দোষ

[এই স্থলে কয়েকটী শ্লোকের মুদ্রিত আদর্শানুযায়ী সন্নিবেশক্রম পরিত্যাগ করিতে হইল।]

অভ্রক, ত্রাস, চিত্রক, মৃদ্‌গর্ভ, অম্লগর্ভ ও রৌক্ষ এই ছয়প্রকার দোষ ইন্দ্রনীলে লক্ষিত হইয়া থাকে।

যে ইন্দ্রনীলের উপরে অভ্রের ন্যায় আবরণ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম 'অভ্রক'; ইহা ধারণে ধন ও জীবন বিনষ্ট হয়।

যে ইন্দ্রনীলের উপরিস্থিত চিহ্ন দর্শনে উহা তপ্ত বলিয়া বোধ হয় (২), তাহাকে 'ত্রাস' বলে; এই দোষযুক্ত মণি ধারণে বংশক্ষয় ভয় জন্মে।

যে ইন্দ্রনীলের মধ্যে বহুবর্ণ লক্ষিত হয়, তাহাকে 'চিত্রক' বলে; ইহাতে বংশনাশ হয়।

যে ইন্দ্রনীলের মধ্যে মৃত্তিকা চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাকে 'মৃদ্‌গর্ভ' বলে; এই দোষযুক্ত মণি চর্ম্ম রোগের উৎপাদক।

যে ইন্দ্রনীলমণির গর্ভে প্রস্তরখণ্ড লক্ষিত হয়, তাহার নাম 'অশ্মগর্ভ'; ইহা সর্ব্বনাশজনক।

যে মণির উপরিভাগ প্রস্তর চূর্ণযুক্ত, তাহাকে রৌক্ষ বলে (৩); ইহা ধারণ করিলে দারিদ্র্য জন্মে এবং দেশত্যাগ করিতে হয়।

ইন্দ্রনীলের ছায়া—নীলীফল, শতমূলীপুষ্প, নবনীপুষ্প, নীলপদ্ম, অতসীপুষ্প, চাষপক্ষ, কৃষ্ণাপরাজিতা, মযূরের কণ্ঠ, মহাদেবের কণ্ঠ, বিদ্যুৎ গাত্র এবং ভ্রমরের পক্ষের মত হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ ইন্দ্রনীল ধারণ করিলে নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, এবং আয়ু, কুল, যশ, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও সৌখ্যবর্দ্ধিত হয়।

পদ্মরাগ ধারণে যে সকল ফল লাভ হয়, ইন্দ্রনীল ধারণেও সে সকল ফল লাভ হইয়া থাকে।

ইন্দ্রনীল পরীক্ষা

কাচ, উৎপল, করবীর, স্ফটিক এবং বৈদূর্য্য এইগুলি ইন্দ্রনীলের বিজাতীয় কিন্তু দেখিতে ইন্দ্রনীলের সদৃশ (সুতরাং ভ্রান্তিজনক)।

গুরুত্ব এবং কাঠিন্য দ্বারাই এই গুলির বৈজাত্য লক্ষ্য করা যায়, কাচ প্রভৃতি উল্লিখিত বস্তুগুলির গুরুত্ব ও কঠিনতা উত্তরোত্তরই অধিক।

তাম্রবর্ণ ইন্দ্রনীল এবং তাম্রবর্ণ করবীর ও উৎপল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।

ইন্দ্রনীলের আকরে ভ্রমরের ন্যায় বর্ণ, দীপ্তি ও ছায়া-বিশিষ্ট যে মণি উৎপন্ন হয় তাহাকে ভ্রামর মণি বলে।

যে ইন্দ্রনীলে রক্তবর্ণ আভা থাকে, তাহাকে ক্ষৌদ্রিক বলে, এই জাতীয় মণি ধারণমাত্র গর্ভিণী স্ত্রী অনায়াসে প্রসব করে।

'মাষ' পরিমিত মহার্ঘ সম্পন্ন পদ্মরাগের যে মূল্য, 'সুবর্ণ' পরিমিত গুরুত্বশালী ইন্দ্রনীলেরও তাহাই মূল্য হইবে।

মন্ত্রকল্প

"সপরিবার বাসুকি বৈতালিক বলাসুরের শিশু গ্রহণ করিয়া সত্বর গমনে যেন নভোমণ্ডল দ্বিধা বিভক্ত করিয়া যাইতেছিলেন।

অকাল বিরোধিনের প্রতাপ উজ্জ্বল গগনদাগরে বাসুকিকে যেন একটী সর্ব্বজনপূর্ণ মহা রোধ হইতেছিল।

এই সময়ে গরুড় পক্ষবিস্তার দ্বারা যেন স্বর্গ মর্ত্য নিরোধ করিয়া সপরিবার বাসুকিকে অ ক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

(১) নীলবর্ণেঃ পার্শ্ববর্ত্তী বর্ণঃপ্রভঃ।

(২) ভেদ সংশয়কৃৎ।

(৩) পর্করাদিশ্চিতঃ যত্তুরৌক্ষং কবিভিঃ স্মৃতং।

বাসুকি ভয়ে সেই পিত্ত পরিত্যাগ করিলে, উহা বলাসুরবক্ষঃশোণিত এবং মণিকাঞ্চনের সঙ্গে সুরক্ষিত মাণিক্য পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে পতিত হইল।

সেইস্থানে পতনকালেই উহার এক অংশ বরাহের অভিরূপ করিয়া লক্ষ্মীর নিবাসভূমিতে পতিত হইল এবং সমুদ্রোপকূল মরকতের আকরে পরিণত হইল।

পিত্তের পতন সময়ে উহা হইতে গরুড় কিয়দংশে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতেই বৃদ্ধিত হইয়া নাগরক্ত দ্বারা উহা পরিত্যাগ করিল।

যে মরকতের বর্ণ কোমল শুকপক্ষীর কণ্ঠ, শিরীষপুষ্প, খদ্যোতের পৃষ্ঠদেশ, তৃণপূর্ণক্ষেত্র, শৈবাল, কলার, নূতন তৃণ এবং ময়ূরপুচ্ছের মত শ্যামল, তাহা অতি শুভপ্রদ।

গরুড়ের নাসিকা হইতে পতিত, বলাসুরের পিত্ত যে স্থানে পতিত হইল, সেই সকল গুণশালী মরকতের আকরভূমি অভিহিত।

মরকতের আকরভূমিতে, যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা সকলই বিষ প্রশমনে সমর্থ হয়।

যে সকল ভয়ঙ্কর সর্পের বিষ নানাবিধ ঔষধি ও মন্ত্রের গুণেও নিবৃত্ত না হয়, তাহা মরকতের স্পর্শমাত্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

মরকতের আকরে উৎপন্ন বস্তু নির্দ্দোষ হইলেই তাহা অতি পবিত্র।

যে মরকত অত্যন্ত হরিতবর্ণ, কোমল, উজ্জ্বল প্রভাষিত এবং যাহার মধ্যভাগ সুবর্ণচূর্ণে পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, যে মরকত সুগঠিত, সর্ব্বত্র সমান উজ্জ্বল এবং যাহা সূর্য্য-কিরণস্পর্শে সন্নিহিত সমস্ত প্রদেশ প্রভায় আলোকিত করে, যে মরকত ছিন্নিল না হইয়া যাহা অন্তর্নিহিত দীপ্তি দ্বারা বিদ্যুৎপ্রভায় আলোকিত নূতন তৃণদলের সদৃশবর্ণ লাভ করিয়া থাকে এবং যে মরকতের দর্শনেই মনে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহাই গুণশালী মরকত—ইহা রত্নজ পণ্ডিতগণের মত।" (পুরাণ)

যে মণি হইতে স্খলিত হইয়া সূর্য্যকিরণস্পর্শে দীপ্ত কিরণে সমুদয় স্থান রঞ্জিত করে, তাহার নাম মহামরকত।

মহামরকত চারিপ্রকার হইয়া থাকে; ছায়ার পার্থক্য দ্বারা এই চারিজাতীয় মণির ভেদ নির্ণীত হয়।

ময়ূরপুচ্ছ, শ্যামপক্ষ, হরিৎকাচ, শৈবাল, খদ্যোতপৃষ্ঠ, অল্পবয়স্ক শুকপক্ষী, নূতন তৃণদল এবং শিরীষকুসুম এই আটপ্রকার পদার্থের বর্ণের মত মরকতমণির আটপ্রকার ছায়া হইয়া থাকে। এইরূপ ছায়াযুক্ত মরকতই শ্রেষ্ঠ।

মরকতের ছায়া—পদ্মরাগের উপরিস্থিত স্বচ্ছ জলবিন্দুর মত নির্ম্মল শ্যামবর্ণ হইয়া থাকে।

মরকত মণির সাতপ্রকার দোষ, পাঁচপ্রকার গুণ থাকিতে পারে।

মরকতের দোষ

যে মরকত ছিদ্র নহে, তাহাকে 'রুক্ষ' বলে, ইহা ধারণ করিলে ব্যাধি জন্মে।

যে-মরকত পীড়কা (ব্রণ) যুক্ত, তাহার নাম 'বিস্ফোট'; ইহা ধারণে শস্ত্রাঘাতের ভয় হয়।

প্রস্তরখণ্ডযুক্ত মরকত ধারণে অর্থনাশ হইয়া থাকে।

ছায়াহীন 'মলিন' মরকত ধারণ নিষিদ্ধ, ইহা ধারণ করিবে না।

পাষাণচূর্ণযুক্ত মরকত কর্কশ নামে অভিহিত হয়, ইহা পুত্রশোকপ্রদ।

কান্তিহীন মরকতকে 'জড়' বলে, ইহা ধারণে দংশন-ভয় ও অগ্নিভয় উৎপন্ন হয়।

বিচিত্রবর্ণ মরকতকে 'শবল' বলে, ইহা মৃত্যুভয়জনক। মরকতমণিতে এই সকল দোষ থাকিতে পারে। প্রধান প্রধান গুণের লক্ষণও কথিত হইতেছে।

মরকতের গুণ

নির্ম্মলতা, গুরুত্ব, স্নিগ্ধতা, পাষাণচূর্ণহীনতা এবং বহুত্ব এই পাঁচটী মরকতের গুণ; এই সকল গুণযুক্ত মরকত সর্ব্বদোষ নাশ করে।

ব্রাহ্মণদিগকে হস্তী, অশ্ব ও রথ দানে যে ফল হয়, একটী বিশুদ্ধ মরকত ধারণে সেই ফল লাভ হয়।

রত্নজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—ধনসম্পত্তিবর্দ্ধনে, যুদ্ধকর্ম্মে, বিষরোগ প্রশমনে এবং অভিচারকর্ম্মে মরকতমণি প্রশস্ত।

পরীক্ষা

মরকতমণির কৃত্রিমত্ব বা স্বাভাবিকত্ব নির্ণয় করিতে হইলে, উহা প্রস্তরে ঘর্ষণ করিবে; উহাতে কৃত্রিম মণি ক্ষয় হইয়া যায়।

অথবা লৌহফলক দ্বারা মণিতে রেখাপাত করিবে এবং চূর্ণ দ্বারা লেপন করিবে, ইহাতে বিশুদ্ধ মণি সমধিক উজ্জ্বল হয় এবং কৃত্রিমমণি মলিন হইয়া থাকে।

তাম্রাভত্ব, পুত্তিকা এবং কাচ মরকতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সুতরাং উহাদিগকে দেখিলে মরকত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কৌষ বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিলে পুত্তিকা মলিন হইয়া পড়ে এবং লবণ দ্বারা কাচের কৃত্রিমত্ব ধরা যায়।

যেরূপ পরিমাণবিশিষ্ট পদ্মরাগ মণির যত মূল্য হয়, তৎপরিমিত সপ্তম মরকত মণির তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্য হইয়া থাকে এবং পদ্মরাগের যে দোষে যেরূপ মূল্য কমিয়া যায়, সেই দোষেই মরকতের মূল্য তাহা অপেক্ষা অধিক কমিয়া যায়।

চারিজাতীয় গুণশালী মণির স্নিগ্ধ, তাম্র এবং তাম্বর এই ত্রিবিধ বর্ণভেদে দ্বাদশপ্রকার মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে।

এক যব পরিমিত মরকতের মূল্য পাঁচশত, দুই যব পরিমিত মরকতের মূল্য সহস্র, তিন যব পরিমিত মরকতের মূল্য দুই সহস্র এবং চারি যব পরিমিত মরকতের মূল্য চারি সহস্র সুবর্ণ।

এই আটপ্রকার প্রধান রত্নের বিষয় কথিত হইল। এখন অন্যান্য রত্নের বিষয় বর্ণিত হইবে।

পুষ্পরাগ

"সেই বলাসুরের ঊর্দ্ধ বিষাণদ্বয়ে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে পুষ্পরাগের উৎপত্তি হইয়াছে।" (পুরাণ)

পদ্ম পুষ্পের ন্যায় কান্তিমান্, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ এবং বিশুদ্ধ পুষ্পরাগ ধারণে বলসুতলাভ হইয়া থাকে।

পুষ্পরাগমণি পদ্মরাগের আকর এবং মরকতের আকর এই দুই আকরেই জন্মে।

রত্নদোষ জ্ঞাতা বলেন—পুষ্পরাগমণি ঈষৎ পীতবর্ণ, নির্ম্মল এবং সুন্দর হইয়া থাকে।

পুষ্পরাগ ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে চতুর্ব্বিধ; ইহার দ্বারাও শুক্ল, পীত, ঈষৎ শুক্ল এবং কৃষ্ণবর্ণ এই চারিপ্রকার হয়।

রত্নপরীক্ষকগণ বলিয়াছেন—ইহার মূল্য ও ধারণফল বৈদূর্য্যমণিরই অনুরূপ; বিশেষ এই যে এই মণি ধারণে স্ত্রীগণের পুত্র সন্তান হয়।

কর্কেতনমণি

"বলাসুরের নখ সকল বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া লিঙ্গদেশে পতিত হইয়াছিল; তাহাতেই পৃথিবীতে উত্তম কর্কেতন মণি উৎপন্ন হইয়াছে।

শোণিত, চন্দ্রকিরণ বা বধূর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কর্কেতন মণি ঈষৎ তাম্রাভশ্বেতবর্ণ অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হয় এবং নীল বা শুক্ল বর্ণবিশিষ্ট অথবা অতি কর্কশ, তন্ন বা দুষ্ট-রেখাদিযুক্ত কর্কেতনের দীপ্তি থাকে না।

যে কর্কেতন স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ, একবর্ণ, পীতাভ, ওজনে গুরু, এবং ভাস (রেখাবিশেষ), ব্রণ, ব্যাধি প্রভৃতি মণিদোষহীন, তাহা অতি পবিত্র!

অতি উজ্জ্বল কর্কেতন মণি স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিয়া হস্তে বা গলদেশে ধারণ করিলে, রোগ এবং পাপ নষ্ট হয় এবং আয়ু, বর্ণ ও সুখ বৃদ্ধি হয়।

যে ব্যক্তি এই বহুগুণসম্পন্ন কর্কেতন মণি অলঙ্কারের জন্য ধারণ করে, সে লোকসমাজে পূজিত, বহুধনের অধিকারী, বহুবন্ধুসম্পন্ন, মহিমান্বিত এবং সুখী থাকে।

কতকগুলি বিকৃতবর্ণ, বিকৃতরূপ, মলিন, তেজ ও দীপ্তি-বিহীন এবং অবিশুদ্ধ আকরে জাত প্রস্তরের আকৃতি কর্কেতনের সদৃশ।

পরীক্ষিত বিশুদ্ধ কর্কেতন নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া থাকে। রত্নজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহার উৎকর্ষানুসারে পরিমাণের অনুরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে।" (গরুড়পুরাণ)

ভীমমণি

"হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে সেই অসুরের বীর্য্য পতিত হইয়াছিল, এইজন্য সেইস্থান উত্তম ভীমমণির আকর হইল।" (পুরাণ)

কলিঙ্গ ও মগধ দেশে এবং যমুনা ও হিমালয় প্রদেশে তীক্ষ্ণত্ব উৎপন্ন হয়, তাহার লক্ষণ কথিত হইতেছে।

তীক্ষ্ণকণযুক্ত শঙ্খ ও পদ্মের ন্যায় শুক্লবর্ণ, দ্রোণাকপুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ হইতে পারে এবং নূতন অবস্থায় হীরকের ন্যায় প্রভাশালী হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি তীক্ষ্ণমণি সুবর্ণ প্রতিবদ্ধ করিয়া প্রভাসহকারে কণ্ঠে ধারণ করে, সে সর্ব্বদা নানা সম্পদ্ লাভ করে।

গুণশালী তীক্ষ্ণত্ব ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ প্রশমিত হয়। যে এই রত্ন ধারণ করে, ঘোটক, বৃক, শরভ, হস্তী, সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ বন্য হিংস্রজন্তুগণও তাহার সম্মুখে আসিতে পারে না।

যে ব্যক্তি উত্তম তীক্ষ্ণমণি যথারীতি অঙ্গুলীতে ধারণ করে, তাহার আপদ বিপদ্‌ও দূরে যায়।

সেই ব্যক্তি তর্পণ করিলে পিতৃলোকের বহুবার্ষিকীতৃপ্তি হইয়া থাকে। এই রত্নের গুণে সর্প প্রভৃতি অণ্ডজজন্তু, মূষিক এবং বৃশ্চিকের বিষ এবং জল, অগ্নি, শত্রু ও চোরের ভয় নিবারিত হয়।

শৈবাল ও মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কর্কশ, শীতাক্ত, হীন-প্রভ, মলিন ও বিবর্ণ তীক্ষ্ণমণিকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দূর হইতে পরিহার করিবেন।

পণ্ডিতগণ দেশকালভেদে এই মণির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন; আকর হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে মূল্যের আধিক্য এবং আকরের সন্নীপবর্ত্তী দেশে মূল্যের অল্পতা হইয়া থাকে।

পুলকমণি

"সর্পগণ মানবাধিপতির নখ সকল লইয়া পবিত্র পর্ব্বত, নদী এবং উত্তরদিক্‌বর্ত্তী দেশে স্থাপন করিয়াছিল।

দশার্ণ ও বাসদত্ত (?) দেশে এবং নর্ম্মদা গর্ভে (১) উৎপন্ন, গুঞ্জাফল (কুঁচের শ্বেতদেশস্থ রক্তবর্ণ), বহ্নি, শৃগাল, কস্তুরীমৃগ, অগ্নি ও কদলীবৃক্ষের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পুলকমণি প্রশস্ত।

পুলকমণি শঙ্খ, পদ্ম, কুন্দ, অর্কফুল প্রভৃতি সুন্দর আকারে কাটিয়া সূত্রবদ্ধ ধারণ করিলে নানাপ্রকার মঙ্গল ও সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

কাক, কুক্কুর, গর্দ্দভ, শৃগাল ও ব্যাঘ্রাদি বিকটাকার জন্তু এবং মাংস ও রুধিরে আর্দ্রমুখ গৃধ্রগণে বেষ্টিত পুলকমণি মৃত্যুজনক; ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে।

এতদ্ভিন্ন পরিমিত পুলকের মূল্য পাঁচশত মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট আছে।" (গরুড়পুরাণ)

রুধিরাখ্যমণি

"অগ্নি সেই দৈত্যের রক্ত গ্রহণ করিয়া নর্ম্মদার নিম্নভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রগোপকীট ও শুকচঞ্চুর ন্যায় রক্তবর্ণ, প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট রুধিরাখ্যমণি এইরূপে দৈত্যের রক্ত হইতে উৎপন্ন হইল।

রুধিরাখ্যের যথার্থ চন্দ্রের ন্যায় বিশুদ্ধ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং এই মণি ওজনে ইন্দ্রনীলের তুল্য হইয়া থাকে। ইহা ধারণে ঐশ্বর্য্য ও কুলবৃদ্ধি হয়। পরিপক্ক পুলকমণির বর্ণ বিদ্যুতের মত হইয়া থাকে।" (গরুড়পুরাণ)

স্ফটিক

"বলরাম বলাসুরের সৈন্য লইয়া কাবেরী তীর, বিন্ধ্য, যবন, চীন ও নেপাল দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহাতেই আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ স্ফটিক উৎপন্ন হইল। ইহা মৃণাল এবং শঙ্খের মত শুক্লবর্ণ হয়। অন্য রত্নের স্ফটিকের তুল্য পাপনাশের ক্ষমতা নাই। শিল্পি কর্ত্তৃক সংস্কৃত স্ফটিকের মূল্য অধিক হইয়া থাকে।" (পুরাণ)

হিমালয় পর্ব্বত, সিংহল দেশ এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের সন্নিহিত ভূভাগে নানাবিধ প্রভাশালী স্ফটিক উৎপন্ন হয়।

হিমালয় পর্ব্বতে চন্দ্রের মত শুক্লবর্ণ চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত নামে বিবিধ স্ফটিক উৎপন্ন হয়।

যে স্ফটিক সূর্য্যকিরণ স্পর্শে অগ্নি উদ্গীরণ করে, রত্নশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে সূর্য্যকান্ত বলেন।

যে স্ফটিক হইতে পূর্ণচন্দ্রের কিরণস্পর্শে অমৃত ক্ষরিত হয় তাহার নাম চন্দ্রকান্ত; ইহা কলিঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য।

(১) যেকদকজ্জকাদৌ।

বিন্ধ্যারণ্যের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে উৎপন্ন স্ফটিক অশোক পল্লবের ন্যায় ছায়াবিশিষ্ট এবং দাড়িম্ববীজের ন্যায় প্রভাযুক্ত হয়, কিন্তু ইহার তেমন উজ্জ্বলা থাকে না।

সিংহলদেশে গন্ধশীলক আকরে কৃষ্ণবর্ণ এবং পদ্মরাগের আকরে নানাবিধ স্ফটিক উৎপন্ন হয়।

যে নির্ম্মল অথচ অগ্নির ন্যায় তেজোবিশিষ্ট স্ফটিক হইতে বিশুদ্ধ জল ক্ষরিত হয়, তাহার নাম 'সূর্য্যকান্তোদ-ভব'। এই স্ফটিকই রক্তবর্ণ হইলে তাহাকে 'রাগাবর্ত্ত', নীলবর্ণ হইলে "রাজমণি' এবং রক্তসূত্রময় হইলে তাহাকে 'ব্রহ্মমণি' বলে।

অয়স্কান্ত

যাহা দূর হইতে বেগে লৌহকে আকর্ষণ করে, তাহার নাম অয়স্কান্ত; ইহা দুইপ্রকার—নির্ম্মল নীলবর্ণ অয়স্কান্ত উত্তম এবং কর্কশ পিঙ্গলবর্ণ অয়স্কান্ত অধম। এই প্রস্তর সমুদ্রতীরেই প্রায় লক্ষিত হইয়া থাকে।

মিশ্রক

মরকতের আকরে মিশ্রক নামক একপ্রকার প্রস্তর উৎপন্ন হয়, ইহার চূর্ণ লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ ব্রণ উৎপন্ন হয়।

শঙ্খ

পারোদ সমুদ্রের তীর, সৌরাষ্ট্র দেশ এবং আরও কোন কোন স্থানে শঙ্খ জন্মে। ইহার বর্ণ তুষারকণের মত এবং প্রভা চন্দ্রের মত শুভ্র হয় এবং মুখগহ্বর সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। ইহা আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ওজনে গুরু হয়।

শঙ্খ বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত ভেদে দ্বিবিধ। দক্ষিণাবর্ত্ত আয়ু, যশ ও ধন বৃদ্ধি করে; এই শঙ্খে যে জলপান করে, সে পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যলাভ করে।

বর্ত্তুল আকৃতি, স্নিগ্ধতা এবং নির্ম্মলত্ব এই তিনটী শঙ্খের গুণ। বর্ণ সংযোগ করিলেই আবর্ত্তজন্য দোষ বিনষ্ট হয়। শঙ্খ আবার ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে চারিপ্রকার। যেগুলি স্নিগ্ধ, মধুর, কোমল ও লঘু তাহা ব্রাহ্মণজাতীয়; ইহা সকল কার্য্যেই শুভপ্রদ।

যাহা অতি কঠিন, ওজনে গুরু, অংশে অংশে বিভক্ত এবং কর্কশাঙ্গ তাহা ক্ষত্রিয়জাতি।

যেগুলি মৃদু, গুরু, দেখিতে মেঘলিপ্তের মত এবং অংশে অংশে বিভক্ত সেগুলি বৈশ্যজাতীয়।

যেগুলি প্রস্তরচূর্ণে লিপ্তাঙ্গ, স্নিগ্ধ ও ওজনে অত্যন্ত গুরু সেগুলি শূদ্রজাতীয়।

এই সকল প্রকার প্রস্তরের লক্ষণ সমাক্‌রূপে কথিত হইল; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিচার করিয়া ব্যবহার করিবেন।

(অলঙ্কার যুক্তি শেষ)

অস্ত্রযুক্তি

দণ্ড বলে রাজা শাসিত হয়, সেই দণ্ড আবার অস্ত্রসাপেক্ষ, সুতরাং অস্ত্রলক্ষণ নিরূপিত হইতেছে—

খড়্গ, চর্ম্ম, ধনুঃ, বাণ, শক্ত, তন্ত্র, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, শক্তি, যষ্টি, পরশু, চক্র, শূল এবং পরিঘ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রের কথা ভোজরাজ বলিয়াছেন।

অস্ত্র দ্বিবিধ—নিশাত এবং যান্ত্রিক। খড়্গ প্রভৃতি নির্ম্মার অস্ত্র এবং অগ্নি, জল, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, শক্ত এবং তপ্তটৈল প্রভৃতি যান্ত্রিক অস্ত্র। খড়্গাদির নাম পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

কবচ

ধনুঃ প্রভৃতিও অস্ত্রের মধ্যেই অন্তর্ভূত, কবচের লক্ষণ কথিত হইতেছে—

কাষ্ঠ বা চর্ম্মদ্বারা এবং কাষ্ঠ-ও-চর্ম্ম উভয়ের সহযোগে কবচ নির্ম্মিত হইতে পারে। তিন প্রকার কবচের মধ্যে—প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় প্রকারের কবচই অধিক গুণশালী।

সর্ব্বশরীরের আবরকত্ব, লঘুত্ব, দৃঢ়তা এবং দুর্ভেদ্যতা এই কয়টী কবচের গুণ এবং সন্ধিস্রাব, অতিগুরুত্ব, দুঃসহত্ব এবং অনায়াসভেদ্যত্ব এই কয়টী কবচের দোষ।

ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে কবচ শুভ্র, রক্ত, পীত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

নিপুণ শিল্পিগণ নানাপ্রকার কবচ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তাহাও জাতিভেদে স্বর্ণ, রজত, তাম্র এবং লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

খড়্গ

খড়্গ পরীক্ষার অঙ্গ, রূপ, জাতি, নেত্র, অরিষ্ট (১), ভূমিকা, ধ্বনি এবং মান এই আট বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক।

যে চিহ্ন অভগ্ন অবস্থায় থাকে, আবার ভাঙ্গিয়া পুনর্নির্ম্মাণের পরও দেখা যায়, তাহাকে 'অঙ্গ' বলে।

খড়্গের নীলত্ব এবং কৃষ্ণত্ব প্রভৃতিকে রূপ বলে। ইহার দ্বারাই আবার জাতি নির্ণয় (২) হইয়া থাকে।

খড়্গে অঙ্গ ব্যতীত আরও চিহ্ন থাকে, তাহার মধ্যে যে সকল চিহ্ন গুণের পরিচায়ক, তাহার নাম নেত্র।

খড়্গের যে সকল চিহ্ন দোষজনক, তাহাদিগকে 'অরিষ্ট' বলে।

অঙ্গ প্রভৃতি চিহ্ন যাহাতে থাকে, তাহার নাম খড়্গের 'ভূমি'।

হস্ত বা দণ্ডাদি দ্বারা খড়্গে আঘাত করিলে যে শব্দ হয়, তাহার নাম 'ধ্বনি' এবং খড়্গের ওজনের নাম 'মান'; ইহাই হইল আটপ্রকার খড়্গজ্ঞান।

প্রথমোক্ত দুইটী (৩) ক্ষত্রিয়ও হইতে পারে, শেষোক্ত ধ্বনি ও মান এই দুইটী খড়্গের স্বাভাবিক গুণ।

অঙ্গ শতপ্রকার, রূপ চতুর্ব্বিধ, জাতি চতুর্ব্বিধ, নেত্র ত্রিপ্রকার, অরিষ্ট ত্রিপ্রকার, ভূমি দুইপ্রকার, ধ্বনি অষ্টবিধ এবং মান বিভিন্ন হইয়া থাকে।

১। শতবিধ অঙ্গ

১। রৌপ্য, ২। স্বর্ণ, ৩। গজ, ৪। উরুবৃক, ৫। রমন (৩), ৬। ঘুন, ৭। অজ, ৮। কৃষ্ণ, ৯। অরুণ, ১০। শ্বেত, ১১। অজোজ, ১২। গয়া, ১৩। তিল, ১৪। অনল, ১৫। কণা (২), ১৬। গ্রন্থি, ১৭। দ্বিজ, ১৮। ত্রিস্রোত, ১৯। যাদা, ২০। জীরক (৩), ২১। শ্রবণ, ২২। ঊর্দ্ধ, ২৩। মরিচ, ২৪। সর্প, ২৫। অশ্ব, ২৬। ময়ূরপিচ্ছ, ২৭। অঞ্জন, ২৮। মধু (৪), ২৯। ক্ষুদ্র, ৩০। মক্ষিকা, ৩১। ক্ষুর, ৩২। খর, ৩৩। শ্রীবি, ৩৪। অতসী, ৩৫। সর্ষপ, ৩৬। সিংহী, ৩৭। তণ্ডুল, ৩৮। সোম, ৩৯। শিরা, ৪০। শিব, ৪১। নখ, ৪২। গ্রাহ, ৪৩। অক্ষি, ৪৪। কেশ, ৪৫। উপল, ৪৬। শ্রোণী, ৪৭। বাক্ষি, ৪৮। কপাল, ৪৯। পত্র, ৫০। কুবরী, ৫১। দিল্লী, ৫২। কলী, ৫৩। সর্ষপ, ৫৪। নীলী, ৫৫। ভক্ত, ৫৬। বচা, ৫৭। ধলোদর, ৫৮। যুবনা, ৫৯। দিল্লী, ৬০। শঙ্খী, ৬১। লোহিত, ৬২। প্রোষ্ঠি, ৬৩। মাহিস, ৬৪। মার্কর, ৬৫। ধূম (৫), ৬৬। অত্রিৎ, ৬৭। মেঘ (৬), ৬৮ অদ্রি, ৬৯। গুহা, ৭০। শর (৭), ৭১। দূর্ব্বা, ৭২। বিষ, ৭৩। মসূর, ৭৪। টুণ্টুক, ৭৫। শটী, ৭৬। মার্জ্জারিকা, ৭৭। কেতকী, ৭৮। মূর্ব্বা, ৭৯। বজ্র, ৮০। কদার, ৮১। চম্পক, ৮২। বলা, ৮৩। বট, ৮৪। বংশ, ৮৫। শাল, ৮৬। জোঙ্গী, ৮৭। দাল, ৮৮। পিপ্পলিকা, ৮৯। মল, ৯০। রজঃ, ৯১। কুষ্মাণ্ড, ৯২। রোম, ৯৩। মূর্ব্বী (৮), ৯৪। কর্কন্ধু, ৯৫। বকুল, ৯। কাঞ্চিক (৯), ৯৭। মহিষ, ৯৮। যজ্ঞ, ৯৯। খড়্গ এবং বজ্র এই শতবিধ খড়্গভেদ কথিত হইয়াছে।

২। রূপ

মুনিগণ বলেন—খড়্গের বর্ণ, নীল, কৃষ্ণ, পিঙ্গল এবং ধূম্র এই চারিপ্রকার হইয়া থাকে।

৩। জাতি

খড়্গ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতীয় হইতে পারে।

---

(১) নেত্রারিষ্টে চ।
(২) তদ্বজাতিরিতি।
(৩) ষড়াজা নিপুণৈঃ।
(৪) গজোরুবৃকরমন।
(৫) ভিলানলকণা।
(৬) জীরাজীরক।
(৭) কৌদ্রক্ষুদ্রমক্ষিকা।
(৮) মার্কবাখুর।
(৯) মেঘাদ্রি।
(১০) গুহাশরাঃ।
(১১) মূর্ব্বারোমাণি।
(১২) বকুলারনাল।

৪। নেত্র

চক্র, পদ্ম, গদা, শঙ্খ, ভ্রমর, ধনুঃ, অঙ্কুশ, ছত্র, পতাকা, বীণা, মৎস্য, শিবলিঙ্গ, স্বস্তি, অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, শূল, ব্যাঘ্র, সিংহ, সিংহাসন, গজ, হাস, ময়ূর, জিহ্বা, দর্পণ, খড়্গ, পুত্রিকা, চামর, পর্ব্বত, পুষ্পমালা এবং সর্প এই ত্রিশটী চিহ্ন খড়্গের নেত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

৫। অরিষ্ট

ছিদ্র, কাকপদ, রেখা, ভেক, মূষিক, বিড়াল, শর্করা, নীলী, শলক, তুষ, সূচিকা, ত্রিবিন্দু, কাণিকা, দাঁতী, কপোত, কাক, খর্পর, শলকী, ক্রোড়ী, কুশপুত্রক, জ্বালা, করাল, ভস্ত, পর্জ্জর, নৃম, পুচ্ছ, খণ্ডিত, দারুণ, পূর্ণ এবং বড়িশ এই ত্রিশটী খড়্গের অরিষ্ট হইয়া থাকে।

৬। ভূমি

খড়্গের ভূমি দিব্য এবং ভৌম ভেদে দ্বিবিধ।

৭। ধ্বনি

নাগার্জ্জুন মুনি বলেন—হংসরুত, কাংস্যনিনাদ, বেণুসদৃশ, চক্রানিনাদ; ভাকের শব্দ, বীণানিস্বন, গর্দ্দভের রব এবং প্রস্তরের শব্দ এই আটপ্রকার ধ্বনির মতে খড়্গের ধ্বনি হইতে পারে।

৮। মান

খড়্গের মান উত্তম এবং অধম এই দুইপ্রকার।

খড়্গ বিষয়ে জ্ঞানের বিষয়ে জ্ঞানের জন্য এই সকল সূত্র কথিত হইল; যে এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারে, সে রাজপূজা প্রাপ্ত হয়।

খড়্গ পরীক্ষা প্রথম অধ্যায় শেষ।

ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গামোহন সাংখ্য-বেদান্তপুরাণতীর্থ

শঙ্খবণিক

নির্ব্বাক হ'য়ে বিশ্বে যে আজি এ চাহে উহার পানে,
তোমার এমন মহাশ্রম ব্রতে আগে কি কেহ তা জানে ?
তুমি যে নিপুণ, সাধক শ্রেষ্ঠ, তুমি যে যক্ষরাজ,
কর্ম্মবীরের সেরা তুমি যে গো এ মহাবিশ্ব মাঝ ;
এ যাগে কুবের ভাণ্ডার তার দিল যে শূন্য করি,
বিলাস দ্রব্যে, বৈভবে, সব অভাব লইলে হরি ; .
হেম হীরা হেরি প্রবাল মাণিক যখন যেদিকে চাই,
শুধু হেরি আছে অর্থ, বিলাস, শিবমঙ্গল নাই ;
বিশ্বের সবে আহ্বানি তুমি আনিলে আপন ঘরে,
রিক্তর গর্ব্বে শিবে না ডাকিলে ঘেন্নায় ঘৃণা করে ;
উপেক্ষিত যে শিবকল্যাণ বিলাস ব্যসন মাঝ,
শিবের অভাবে ব্যর্থ সকলি যত মঙ্গল কাজ ;
লাঞ্ছিতা তাই শক্তি, ধর্ম্ম, শক্তি হারালে তুমি,
তোমার এমন দুর্দ্দশা তাই শ্মশান বন্ধুভূমি !

শ্রীবিভেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ

অদৃষ্টের পরিহাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

নরেশ তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছে ; ম্লান মুখ, ক্লান্ত নয়ন, পারিপার্শ্বিক জগতে তাহার আগ্রহশূন্যতার পরিচয় দিতেছে। গতকল্য সমস্তদিন নানারূপ গোলমালে কাটিয়া গিয়াছে ; মাধুরীর সহিত শেষকর্ত্তব্য, বন্ধুপ্রভৃতির সাহায্যে যথাসাধ্য সমাধান করিয়া আজ সে সুপ্রাবনে আবার নিজের ঘরে উপবিষ্ট ; এই কয়দিনেই তাহার উপর দিয়া কত বড় এক পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, সেইটাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টাই তাহার মুখের ভাবে সঙ্কুচিত হইতেছিল ; জীবনে এতদিন তাহার এক শান্তিময় কবিতা-রাজ্য গঠনের সবিনয়ে কাটিয়াছে ; ক্ষুদ্রতরণীতে মন্দস্রোতা নদীর বক্ষে সে ভাসিতেছিল, নদীর কূল সঙ্গীতে তাহার শ্রবণ পরিপূরিত, তাহার দৃষ্টি সম্মুখে চঞ্চল ঊর্ম্মিশিখরে আলোকরশ্মির ক্রীড়ার প্রতি স্থিরবদ্ধ, দুই তীরের জীবনে. অনন্ত বিষাদ দুঃখ ও শোকসন্তপ্তের ক্রন্দন তাহার নিকট পৌঁছাইতে পারে নাই ; সে গাহিয়া, বিশেষতঃ কাব্যমায়া নিজের চতুর্দ্দিকে একমুহূর্ত্তেই বর্ণ রচনা করিয়াছিল, তাহারই কঠিন স্পর্শে মাধুরী ক্ষতবিক্ষত হইয়া শেষে গভীর নৈরাশ্যে তরঙ্গবক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ; আজ কিন্তু তাহারই ক্ষুদ্র নিরাশ্রয় নৌকার উপর পৃথিবীর সমস্ত আশা মূর্ত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; সে স্তব্ধ ও হতচক্ষু।

নরেশের হস্তে একটী ক্ষুদ্র পুস্তক, রজনীর বাবুর "বাঈ" এইটী জীবনে মাধুরীকে তাহার শেষ উপহার ; পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাতেই সে লিখিয়া দিয়াছিল "মাধুরী দেবীর মানসিক উন্নতিকল্পে, সবত্নে পাঠের অনুরোধ ও আমার আন্তরিক ভালবাসার সহিত তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইল।" ইহারই নিম্নে কলিকাতায় অবস্থান কালে মাধুরী তাহার স্পষ্ট হস্তাক্ষরে সযত্নে লিখিয়াছে, "বাঈ খুব ভাল বই ; দেশপ্রীয়র খুব ভাল বই—সব বই ভাল" কথাগুলি খুব অসাধারণ কিছু না হইলেও তাহার জীবনের সমস্ত অনুরাগ ও ভালবাসা যে ইহারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল নরেশ আজ তাহা বুঝিয়াছে। আজ তাহার নিকট জগৎ একান্তে শূন্য ; এতদিন রাশি রাশি পুস্তক ও কবিতার ভাষার মধ্য দিয়া সংসারের যে যাতনা তাহার মনে বহুদূর হইতেছিল আজ তাহা অপসৃত এখন সে প্রকৃত জীবনের স্পর্শ অনুভব করিয়াছে। মাধুরীর মনের চাঞ্চল্য প্রথম সন্দেহ করিয়া তাহার ওথেলোর কথা মনে পড়িয়াছিল তখন সে অতি বিজ্ঞের মতই নিজের মনে মনে বলিয়াছিল—ওথেলোর অবিবেচকতাই সমস্ত ব্যাপারটাকে ট্র্যাজেডী করিয়া তুলিয়াছে, আমার সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে ট্র্যাজেডী না হয় আর শাস্তি কেবল সংশোধন বিসাবে।" সেইজন্যই সে মাধুরীর মনের Superfluous emotionsকে তাহার প্রলোভনের কারণ ভাবিয়া, হ্যামিলটনের নীতি অনুযায়ী কয়েকদিনের দুঃখভোগ তাহার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিল ; কিন্তু জীবনের গতি কবিও জানীর অভিব্যক্তির যে কত দূরে তাহা সে আজ উপলব্ধি করিয়াছে ; মানুষের জীবন লইয়া সে যে খেলা ভিন্ন আর কিছুই করে নাই ইহা আর তাহার নিকট গুপ্ত নহে। তাহাই নিজের উপর তাহার একটা অসহ্য ক্রোধের উদয় হইয়াছে, তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে নিজের কেশের মুষ্টি ধরিয়া নিজেকে জগতের পথে পাশ ফেলিয়া দেয়, নিজের সমস্ত জীবনটাকে বলপূর্ব্বক দ্বারদেশে পীড়িত করিয়া দেয় ; এইখানেই সাধারণ হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য ; অন্যলোকে এ সময়ে দুঃখে ও শোকে ম্রিয়মান হইয়া চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলিত ; নরেশের কিন্তু কেবল ধীরতা হইতেছিল, অবশ্য তাহার হৃদয়ের বা দুঃখের অভাব নাই তবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়।

সম্মুখের রাশিকৃত পুস্তক তাহাকে চঞ্চুপীড়া দিতেছিল

সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইতেই দেখিল তাহার বহুকালের বন্ধু প্রফুল্ল সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেছে ; তখন তাহার মনে পড়িল যে কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিবার সময় সে বন্ধুকে কিছুই বলিয়া আসে নাই আর সেই জন্যই প্রফুল্ল উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার সন্ধানে এতদূর আসিয়াছে।

প্রফুল্ল আসিয়াই তাড়া দিল, মনের এই অবস্থায় একলা পাড়াগাঁয়ে থাকা সে কোনমতেই হইতে দিতে পারে না, নরেশকে এখন কলিকাতাতেই তাহার নিকট থাকিতে হইবে। নরেশের এই বন্ধুটী অনেক কালের, প্রথম কলেজ প্রবেশের পর যখন সকলেই স্বজনকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় সেই সময়েই এই দুইজনের বন্ধুত্বের সূচনা হইয়াছিল ; তাহার পর নরেশ যখন দিনে দিনে পুস্তক সমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া যাইতে লাগিল তখন অবশ্য দুইজনের মধ্যে একটা ব্যবধান আপনিই পড়িয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় নাই বরং অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় আরও রসময় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রফুল্লের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা নরেশের ছিল না, সে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ যাত্রার কয়েকটী নিতান্ত আবশ্যকীয় আয়োজন করিয়া প্রফুল্লের সহিত কলিকাতার যাইতে প্রস্তুত হইয়া পড়িল ; অবিলম্বে একটী ট্রেণ ছিল, দুই বন্ধুতে তাহারই একটী নির্জ্জন কামরা অধিকার করিয়া লইল।

নরেশের আজ মুহূর্মুহু মাধুরীর সহিত কলিকাতা যাত্রার কথা মনে পড়িতেছে ; মাধুরীর সেদিনকার ব্যবহারে তাহার চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে সে যে কতটা বদ্ধপরিকর, তাহাই প্রকাশিত হইতেছিল ; কেবল নরেশের আপনার পক্ষ হইতে সামান্য বোঝার ভুলে এতবড় একটা বিয়োগান্ত নাটক প্রকৃতজীবনেই হইল, আর এই অনর্থের মূলে তাহার পুস্তক রাশির প্রতি সর্ব্বনাশা পক্ষপাতিত্ব ; আজ সে তীব্র সমালোচনায় তাহার এতদিনের আদৃত লেখকমণ্ডলীকে আপনার মনের মধ্যেই অর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল ; তাহার ম্লান অর্দ্ধনিমীলিত বালকদলের ন্যায় তাহার বাদল চক্ষুর সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল, ট্রেণ অবাধ গতিতে চলিয়াছে, অনেকক্ষণের নীরবতাকে ভঙ্গ করিয়া প্রফুল্লই প্রথম কথা কহিল, "তুমি কলেজ থেকে কিছুটী নিয়েছ, আমার বোধ হয় সাধারণ ভাবে নিয়মমত কাজে লাগিয়া থাকাই তোমার পক্ষে ভাল, মনটা অত চঞ্চল হবে না ; আর যে বিপদ হইয়া গেল এখন তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়া নিজেকে অশান্ত করিয়া আর কি লাভ ; অবশ্য আমি নিরর্থক তোমাকে সমস্ত দুঃখ হৃদয় থেকে সরিয়ে দিতে অনুরোধ কচ্ছি না কিন্তু এর ওপরে নিজেরও কষ্ট করে আর ভার বাড়িও না ; কি করবে তাই মনের দুঃখ মুখের মধ্যে ঠেলে রাখো এইটুকু পরামর্শই আমি তোমায় দিতে পারি।" নরেশ বহির্দৃশ্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া আসিল, অল্পকাল সে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া শেষ করিল "ও সব ভেবে আর কি হবে, আমার জীবনে যা হবার তা হয়ে গেছে এর পর জীবনে আমার আর কি ক্ষতি হইতে পারে ; তবে আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ধারা ফেরাবার জন্যে যে একটা আঙুল ও নাড়ব না, এটা ঠিক, কলেজে পড়ান ও আমার দ্বারা আর হচ্ছে না" "তবে কি করতে চাও, কিছু না করে বসে থাকা আরও অমঙ্গলের হেতু হতে পারে" এই বলিয়া প্রফুল্ল প্রশ্নটীকে আবার উত্থাপন করিয়া বলিল ; নরেশ—"কিছু যে কর্ত্তে হবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, বসে থাকলে একেবারে পাগল হয়ে যাব, তবে কি যে কর্ত্তে হবে সেটা আমাদের দুজনকেই ভেবে বার করে ফেলতে হবে ; আমি যা ভাবছি সেইটাই অসম্ভব হচ্ছে, ভিতরে একটা খুব বড় নাড়াচাড়া হয়ে গেছে।"

প্রফুল্ল—"সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই তবে এখন বিপদটার পরিমাণ অনুসারে আমাদের আয়োজন কর্ত্তে হবে, ব্যাপারটা বড়ই গুরুতর আমাদের তাই শক্তিসংগ্রহ কর্ত্তে হবে, সেদিকও ভুলে চলবে না, একটা না একটা কিছু উপযোগী উপায় উদ্ভাবন করিতেই হইবে।"

নরেশ—"সে তাই তোমার হাত, আমি একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছি, আমার জন্যে তোমাকেই ভাবতে হবে" প্রফুল্ল নিরুত্তর থাকিয়া জানাইল যে এই বিষয়ে তাহাকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করা অন্যায় এবং সে আপনার ক্ষমতায় চেষ্টা করিতে ত্রুটী কখনই করিবে না।

(৬)

আহারাদির পর দুই বন্ধুতে একঘরেই বসিয়া আছে; প্রফুল্ল নরেশের মনকে সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল অথচ প্রসঙ্গের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাহাকে অনেক বিবেচনা করিতে হইতেছে, পাছে কোথাকার অসাবধানতাবশতঃ কোনও আঘাত লাগিয়া যায়; তাহার উপর আবার সে জানিত যে নরেশের যেমন প্রকৃতি তাহাতে সান্ত্বনার সুর বা গন্ধ পর্য্যন্ত তাহার বুকে অপমানের মত বাজিবে, সেইজন্য সে তেমন ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেছিল না; নরেশও যেন চুপ করিয়া থাকিতেই পছন্দ করিতেছিল, সুতরাং কিছুক্ষণ পরেই হইল এই যে তাহারা দুইজনেই নিস্তব্ধ হইয়া গেল; দুইজনের মধ্যে নীরবতার একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর যাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান দুইজনেই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। প্রফুল্ল একবার সাহস করিয়া প্রশ্ন করিল, "এখন কি করবে ঠিক করলে?" নরেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিল, ধীরে হাত নামাইয়া সে চৌকিলের উপর রাখিল এবং দেশলাইয়ের বাক্সটী নাড়িতে নাড়িতে বলিল "সেই কথাই এতক্ষণ ভাবছিলুম কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারছি না; কি যে করব, কোনও কাজের মতেই তখনো যা বল পাচ্ছি না, সবেতেই বিরক্ত মনে হচ্ছে; বলেকে পড়ানো একবারে অসম্ভব, আর কিই বা কর্ব্ব, কেমন করেই বা জীবনের অবশিষ্ট অংশটা কাটাব—খালি অনর্থক ভাবনা হচ্ছে; এভাবেই বা থাকব কেমন করে।" প্রফুল্ল বন্ধুর দিকে চাহিতে পারে নাই সে তাহার অন্তরের ব্যথা বুঝিয়াছিল এবং এই কয়েকটা ছোট কথার মধ্যে বন্ধুর যে কত বড় শোক ও অনুতাপ ফুলায়িত রহিয়াছে তাহাও তাহার নিকট অগোচর নহে। কোমল হৃদয় প্রফুল্ল নিজের কণ্ঠস্বরকে আর বিশ্বাস করিতে না পারিয়া নীরবেই রহিল আবার দুইজনের মধ্যে পূর্ব্বকার সেই অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

হঠাৎ একটা ছোটশব্দে চমকিত প্রফুল্ল মাথা তুলিয়া দেখিল বন্ধুর দৃষ্টিটীর মধ্যে দেশলাইয়ের বাক্সটী দুলিবার হইয়া গিয়াছে। নরেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া প্রফুল্লকে বলিল "অনেক রাত্রি হয়েছে তুমি এবার শুতে যাও" প্রফুল্লও বুঝিল যে দুইজনে বসিয়া থাকিয়া কোনও ফল হইবে না; তাহার অন্তঃকরণ সহানুভূতিতে পূর্ণ কিন্তু তাহার একণে কোনও ক্ষমতাই ছিল না—সে নরেশকে তাহার শয়নকক্ষ দেখাইয়া দিয়া ধীরপদে চিন্তিতমনে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

নরেশ বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে তাহার এখন কর্ত্তব্য কি; মনের স্বাভাবিক শান্তি ফিরাইয়া আনার চেষ্টা পর্য্যন্ত সঙ্গত কি না এবিষয়ে সে এখনও স্থিরসিদ্ধান্ত হইতে পারে নাই, যে অপরাধ সে করিয়াছে তাহাতে হয়ত সে শাস্তিদাতের সমস্ত অধিকারই বর্জ্জন করিয়াছে হয়ত সারাজীবন একটী আকুল ব্যর্থতা উপলব্ধি করাই তাহার উপযুক্ত শাস্তি; পরক্ষণেই কিন্তু আবার তাহার মনে হইতেছে যে এইরূপে জীবনের স্রোতে অলসভরে যদি সে দেহ ছাড়িয়া দেয়, যদি নিজের মনুষ্যত্বের সম্মান রক্ষার জন্য একবারও ঘটনাজালকে ছিন্ন করিতে চেষ্টা না করে তাহা হইলে তাহার কাপুরুষতাই প্রকাশ পাইবে, অপরাধ সে করিয়াছে এখন তাহার উপর কেন আবার অপরাধ বাড়ান; বোধ হয় সমস্ত জীবন আদর্শ মানবের মত নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাওয়াই তাহার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত; যাহা হউক, কিছুই মীমাংসা হইল না তাহার চিত্ত এত চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত যে গভীর চিন্তা এখন একেবারে অসম্ভব, তাহার উপর এইরূপ প্রশ্নের কখনও মীমাংসা মানুষ নিজে করিতে পারে নাই। ঘরের মধ্যে নরেশের অসহ্য বোধ হইতেছিল, চারিদিকের দেওয়াল যেন তাহাকে আরও চাপিয়া ধরিতে চায়, সে তাড়াতাড়ি একটা শাল গায়ে জড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল; উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণকে যদি একটা উদ্দেশ্যের মধ্যে ধরা যায় তাহা হইলে সেইটাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—তখন রাত্রি প্রায় দশটা, বাড়ীর মধ্যে দাসদাসী ভিন্ন আর সকলেই বোধ হয় নিদ্রিত।

নরেশের এই সহসা উদ্ভ্রান্তভাব যদি কেহ লক্ষ্য

করিয়া দেখিত তাহা হইলে তাহার কিন্তু পূর্ব্বের দার্শনিকোচিত সংযত কথাবার্ত্তার মধ্যে যে কতটা বেদনা নিহিত আছে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিত—সে সাগরের মত রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কলিকাতার রাজপথ জনস্রোত ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতেছিল; যাত্রীরা সকলেই প্রায় স্ব স্ব আশ্রয় স্থানের উদ্দেশ্যে চলিয়াছে; কোথায় তাহা কেহই জানে না আর কেন তাহা সে নিজেই জানে না।

রাস্তার উজ্জ্বল আলো নিরপেক্ষ দর্শকশ্রেণীর ন্যায় আপন মনে সমানভাবে জ্বলিতেছে, পাহারাওয়ালারাও নিজ নিজ স্থানে দণ্ডায়মান; রাস্তার দুইধারে ঘুমন্ত বাড়ীর শ্রেণী, সমস্ত দরজা ও জানালা অর্গলবদ্ধ, যেন আভ্যন্তরীণ শান্তিকে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটা সমবেত চেষ্টা; নরেশ পুত্তলিকার মত চলিয়াছে; সকলই তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, কিন্তু কোনও বস্তুই তাহার নিকট হইতে সাড়া পাইতেছে না।

অনেকক্ষণ পরে, সে তখন সরল, বক্র, সংকীর্ণ ও প্রশস্ত অনেকপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহার যেন চেতনা হইল; এতক্ষণ সে নিজের অজ্ঞাতসারে চলিতেছিল এইবার নিজেকে ফিরাইবার জন্য সচেষ্ট হইল, কিন্তু কি যেন এক অদৃশ্যশক্তি তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, সে ইচ্ছাসত্ত্বেও বাধা দিতে পারিল না, অল্পক্ষণ পরেই সে সেই চিত্তরঞ্জনীর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সতীর স্মৃতি এই বাড়ীর সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে, এইখানে মাধুরী তাহার হৃদয়ের সমস্তটুকু ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এখনও বোধ হয় তাহার শেষ নিঃশ্বাসের বায়ু ইহারই প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে তাহাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে। নরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার শরীর, মন, প্রাণ সব একসঙ্গে যেন স্তব্ধ ও চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িল।

সমস্ত-বাড়ীটা একটা মূকতার ক্রন্দন লইয়া ম্লানভাবে রাজপথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান, তাহার মধ্যে যে এক বীভৎস অভিনয় অবাধগতিতে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে তাহারই লজ্জা যেন বৃহৎ অট্টালিকাকে সঙ্কুচিত ও মলিন করিয়া তুলিয়াছে। বোধ হয় হইলে পর নরেশ ধীরে ধীরে সেইস্থান ত্যাগ করিয়া আবার চলিতে লাগিল। আকাশে তখন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়াছে, রাস্তার আলোগুলি প্রাণপণে এই ঘনায়মান আঁধারের সহিত যুঝিয়া কেবল প্রকৃতির বিস্তৃত রহস্যরাজ্যের মধ্যে মানবাধিকৃত স্থানের ক্ষুদ্রতারই প্রতিপাদন করিতেছে। শীতের কনকনে হাওয়া যেন গৃহহীন প্রাণীকেই অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে।

রাস্তার মোড়েই নরেশ দেখিল, একটী স্ত্রীলোক, পরনে একখানি সাদা শান্তিপুরীশাড়ী স্থির আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া আছে, শাড়ীর চওড়া কালো পাড় তাহার সমস্ত শরীরকে সাপের মতন বেড়িয়া বেড়িয়া উঠিয়াছে, শীতল বায়ুতে তাহার দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার মুখে ক্লান্তি ও অভাব স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, শীতের আক্রমণ হইতে স্বল্প শাড়ীর মধ্যে কোনও মতে আত্মরক্ষা করিয়া সে ফুটপাতের দিকে চাহিয়া আছে। মাধুরীকে শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় এই জাতীয় একটী স্ত্রীলোকই তাহার শিয়রের নিকট একটী ছোট সিন্দুরকৌটা রাখিয়া নরেশকে যে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া দিয়াছিল, সেই কথা এখন তাহার মনে পড়িল; অতি দুঃখের সময়ও অন্যের করুণা ও সহানুভূতি মানুষকে অভিভূত করে বিশেষতঃ যদি ইহা একেবারে অপ্রত্যাশিত হয়।

নরেশ রমণীকে না চিনিলেও সে প্রথম দৃষ্টিতেই নরেশকে চিনিয়াছিল; আজ কয়দিন হইল যে বিষাদগাথা তাহার মনে অহরহঃ পীড়া দিতেছে তাহারই নায়ক যে এই ব্যক্তি।—গোলাপীর মনে একটা অবসাদ আসিয়াছে; মাধুরীর স্মৃতি সে অনেক চেষ্টা করিয়াও ভুলিয়া ফেলিতে পারে নাই; তাহার শোকাবহ পরিণাম তাহাকে উতলা করিয়া তাহার দৈনন্দিন জীবনে একটা বিশৃঙ্খলতা আনিয়া দিয়াছিল; তাহার ব্যবসার আজ আর তত সখ নহে, অভাব কিন্তু কিছুই বোঝে না এবং গোলাপী আন্তরিক বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও পরদিনের অন্নসংস্থানের জন্য রাত্রি বেলায় বাহির হইয়াছে, এই যে তাহার একমাত্র এবং অভ্যস্ত পন্থা।

নরেশকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সোনাপী বিভিন্নরূপ আবেগের সংঘাতে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অপ্রীতিকর স্বপ্ন দেখিয়া মানুষ যখন ছট্‌ফট্ করিয়া নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করে এবং অকৃতকার্য্য হইলে তাহার অবস্থা যেমন হয় সোনাপীরও ঠিক সেইরূপ দশা।

নরেশ সোনাপীকে জিজ্ঞাসা করিল "কিগো টাকা চাও?" সদয় স্বরে চমক ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘৃণার তরঙ্গ তড়িৎগতিতে সোনাপীর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বহিয়া গেল। যাহার বক্ষের উপর দিয়া এই সেইদিন ঘটনার নির্মমচক্র এমন নিষ্ঠুরভাবে চলিয়া গেল তাহারই আজ এই প্রবৃত্তি, সংসারে ছলনা বলিয়া কি কোনও জিনিষই নাই।—নরেশ আবার বলিল "দেখ, কিছু টাকা নিয়েই তোমার শুতে যেতে হবে, এখানে থাকতে পাবে না।"

মানুষের ব্যবহারিক জীবনের একটা বিশেষত্ব এই যে সে তাহার নিজের ব্যবসায় সম্বন্ধে একটা অভিমান মনের মধ্যে অক্ষুণ্ণ পোষণ করিয়া রাখে, এই কারণে সমষ্টিগত জীবনে তাহার বিশৃঙ্খলতা ঘটে না। সেই ব্যবসায় যতই নীচ বা ঘৃণিত হউক না কেন, তাহার খাতির বজায় রাখিতে মানুষ সদাই ব্যগ্র; এই অভিমান একটু ক্ষুণ্ণ হইলেই সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। তাহার উপর আবার আজ নরেশ সোনাপীর অতি অন্তরঙ্গ প্রদেশে আঘাত করিয়াছে, যেখানে মানবের সর্বজনয় ব্যক্তিত্ব বহির্জগতের শত শত অত্যাচারের জন্য নিয়ত অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করে সেইখানে আজ আঘাত লাগিয়াছে; সোনাপী সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আমি শুতে যাবো না; আমার যখন খুসী হবে যাবো" নরেশ এইবার টাকা বাহির করিয়া একটু কঠোরস্বরে কহিল "এখ্‌খুনি শুতে না গেলে কিন্তু টাকা পাবে না; যাও টাকা নিয়ে শুতে যাও; অমনি শীতে কষ্ট পাবে কেন।" সোনাপী গর্জ্জন করিয়া উঠিল "কেন আমি কি ভিখিরী নাকি যে শুধু শুধু আপনার টাকা নেবো; আপনাকে দাঁড়াতে হবে না আমি আপনার কাছে যাচ্ছি।"

ম্লানভাবে নরেশ ফিরিয়া দেখিল। আকস্মিক উত্তেজনার, মানসিক চঞ্চলতার এবং তারপর সারাদিনের উপবাসে সোনাপী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; সবাদ, স্বপন, মানব পরিত্যক্তা রমণী জনহীন রাজপথে শীতের রাত্রে একলা দাঁড়াইয়া অপরের সহানুভূতিকে অগ্রাহ্য করিয়া অবশ শরীরে দণ্ডায়মান, নরেশ আবার ফিরিয়া সোনাপীর দিকে চলিল এবং অকস্মাৎ নিজের গায়ের শালখানি খুলিয়া তাহার গায়ে ফেলিয়া দিয়াই দ্রুতপদে সেইস্থান পরিত্যাগ করিল। বহুক্ষণ পরিয়া তাহার কর্ণে রমণীর আর্ত্তনাদ আসিতেছিল। সোনাপী চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে "ওগো তোমার শাল ফিরে নিয়ে যাওগো; আমি এখনি শুতে যাচ্ছি, তোমার শাল আমি নেবো না।"

(৭)

যখন হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা আবেগের আতিশয্য হয় তখন মানবের আচরণে, ব্যবহারে একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হয়। জগতের বস্তু সমূহ, সংসারের ঘটনাবলী তাহাকে আর সাধারণ ভাবে লাগে না; সে যেন পৃথিবীছাড়া হইয়া গতজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। নরেশ আপন মনে রাস্তার পর রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে; প্রচণ্ড শীত ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। নিজের স্বাভাবিক কক্ষচ্যুত হইয়া উল্কা যেমন আকাশ গাত্রে দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে ছুটিয়া যায় নরেশও সেইরূপ চলিয়াছে; তবে তাহার গতি অতি স্বাভাবিক ও সংযত, তাহার অন্তরের ভূগুল কোলাহলের অনুযায়ী নহে এবং সেইজন্যই তাহার বিপদ অধিক; এই অবস্থাতেই মানুষ পাগল হয়।

কোনও একটা বিশেষ ঘটনার উপর আমাদের সুখদুঃখ তত্তটা নির্ভর করে না, আমাদের ব্যক্তিগত স্বভাবও প্রকৃতিই আমাদের সুখদুঃখের পরিমাণও তাহাদের প্রকাশের বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দেয়; নরেশের ন্যায় লোক এই অবস্থায় অন্তরের ব্যথা ওষ্ঠ দন্ত চাপিয়া রুদ্ধ হৃদয়ে সাধারণ পথে চলিতেও পারে না, আবার বিকলহৃদয়ে অবশ শরীরে নিজের দুঃখ সম্ভার অন্যের স্কন্ধে চাপাইয়া করুণা ভিক্ষা করিয়া বন্ধুবর্গের সহানুভূতি যাচিয়া যাচিয়া থাকিতে পারে না; অনুতাপ তাহাকেও দগ্ধ করে বটে, কিন্তু ভস্মীভূত করে

না। এইরূপ মনের অবস্থায় সে সভীর শীতের রাত্রে নিঃসঙ্গ হইয়া রাজপথে চলিয়াছে; তাহার মনের আন্দোলন ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছিল, সে যে কি করিবে তাহাই ভাবিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে, অথচ শত শত ক্ষুদ্র ভাবনা ও চিন্তা তাহাকে নিপীড়িত করিতেছিল, মাঝে মাঝে বাসুকীর কুঞ্চিত কেশদাম ও পাণ্ডুর মৃত মুখখানি তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল; ক্রমশঃ ঘন ঘন এই দৃশ্য তাহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; তাহার মস্তিষ্কের চতুষ্পার্শ্বে যেন এই কুঞ্চিত কেশপাশ ঢেউ তুলিয়াছে আর তাহারই মধ্যে যেন তাহার নিঃসহায় দুর্ব্বল বুদ্ধি আকুল হইয়া বৃথা উদ্ধারলাভের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোনও আশাও নাই; এখনি উপর্য্যুপরি তরঙ্গের তাড়নায় তরঙ্গদলে শিথিলহস্তপদ সমুদ্রের অতলগর্ভে ডুবিয়া যাইবে; তাহার পরই শ্বাসরুদ্ধকারী ঘোর অন্ধকার। পূর্ণ উন্মত্ততা তাহাকে অধিকার করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। একটা বিশেষ লক্ষ্য ও আশা লইয়া মানুষের বুদ্ধিশক্তি গতিশীল, তাহাদের অভাবে মানুষ পাগল।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশ মেঘলা করিয়াছিল, সমস্ত দিন আকাশের পাংশুবর্ণ একটা দুর্য্যোগেরই সূচনা করিতেছিল, এখন বেশ জোরে বৃষ্টি আসিল, কিন্তু তার অপেক্ষা অধিক বিপদ, কন্‌কনে হাওয়া হুহুশব্দে বহিতে লাগিল; নরেশের চোখে মুখে বায়ু তাড়িত বৃষ্টি বিন্দু হীরের মতন বিঁধিতে লাগিল, কিন্তু এখনও তাহার সম্পূর্ণ চেতন নাই।

পৌত্ত মন্থর কুটপাতের উপর গ্যাসের আলোক পড়িয়া বাস্তবজগতের উদ্ভাস করিবার জন্যই যেন এক অপরূপ ছায়ারাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে; জনশূন্য হইলেও এই দৃশ্যে পূর্ণতার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই যেন এই জগতে মানবের অস্তিত্ব নিতান্ত অনাবশ্যক; নরেশের মনের মধ্যে তাহার নিজেরই গোপনে এই সমস্তই আন্দোলিত হইতেছিল; তাহার প্রাণ যেন ক্রমশঃ স্বরূপ হারাইয়া জড়ের সহিত মিলন স্থাপনে ব্যস্ত। চিত্তের আগুন এই বৃষ্টির জলে নিবিবার মতন নহে। আর অল্পক্ষণ হইলেই তাহার সমস্ত বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে তাহার মনোবৃত্তিসমূহ বিকৃত অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে।

অকস্মাৎ বোধ হয় চিরনির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্বের উজ্জ্বলা বিকাশে তাহার নিজের অবস্থাটা সে বুঝিতে পারিল, এতক্ষণ অজ্ঞানে সে চলিতেছিল, আপনার অজ্ঞাতসারেই তাহার এই ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত, কিন্তু নিষ্ঠুর অদৃষ্ট বোধ হয় তাহাতে সন্তুষ্ট নহে; সম্মুখে অবশ্যম্ভাবী বিপদ জানিয়াও আপনার এই ভীষণ গতি রোধ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস উপস্থিত করাই—তাহার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল—নরেশ বুঝিল সে পাগল হইয়াছে; এখনও হয় নাই বটে কিন্তু আর বিলম্বও নাই আর আপনাকে উদ্ধার করাও তাহার সাধ্যাতীত, এই তাহার পরিণাম, আর তাহার রক্ষা নাই, সে ভয় পাইয়া গেল।

সে উন্মাদ হইয়া যাইবে, ভাবিতেও তাহার হৃৎকম্প হইতেছিল, ভয়ঙ্কর অনন্ত শূন্য চক্ষু, পশু অপেক্ষাও হীন; এই কি তার জীবনে সম্ভব; ভগ্ন অবান্তর প্রলাপ দর্শকের হাস্যোদ্রেক করিবে, ক্ষত উৎসৃষ্ট বৃষ্টি তাহাকে বিঁধিতে থাকিবে; উঃ কি ভীষণ, সে শিহরিয়া উঠিল। তারপর একবার মুক্তিলাভের শেষ চেষ্টা, সে নিজের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া আপনাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিল, সহজ ভাবে চিন্তা করিতে চেষ্টিত হইল, কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস, তাহার মানসচক্ষের সম্মুখে কেবল গোছা গোছা কালো চুল ঢেউ তুলিয়া চলিয়াছে, কখনো সেগুলি সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় আবার কখনও বা সহস্র ফণা বাসুকীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, আর তাহারই অন্তরালে এক বিকট দর্শন উন্মাদ যেন হো হো করিয়া হাসিতেছে আর নৃত্য করিতেছে। নরেশ ঘর্ম্মাক্তকলেবর দাঁড়াইল; তাহার হস্তপদ অবশ হইয়া আসিতেছে, সে যেন অনুভব করিতেছিল যে ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞান তাহার বিচারশক্তি, তাহার বুদ্ধি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সে তাড়াতাড়ি এক দুই গণনা করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কে যেন তাহার কর্ণের নিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, "সেরক্সীয়ও খুব ভাল বই।" সঙ্গে সঙ্গে সেও চীৎকার করিয়া উঠিল "সেরক্সীয়ও খুব ভাল বই।" আর গণনা হইল না। এই কি উন্মত্ততার সূচনা।

বন্ধু প্রভৃতির অজ্ঞাত দোষের সম্মুখে দার্শনিকোচিত নিরপেক্ষ ব্যবহারে সে তাহাদের এবং নিজেকে প্রতারিত

করিয়াছে, সে ভাবিয়াছিল, জীবনে কয়েকটা পরিবর্ত্তন করিলেই তাহার দুঃখটা সহনীয় হইবে, কিন্তু এখন প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

নরেশ যেখানে দাঁড়াইয়াছিল তাহার নিকটেই একটি লোহার রেলিং; তাহারই সাহায্যে সে নিজেকে কোনমতে পতন হইতে রক্ষা করিয়া আছে; তাহার পুরী ভূমিতে নিবদ্ধ তাহার চক্ষু নিম্নে কি যেন একটা দেখিয়া উঠিল,—সে ক্ষিপ্রহস্তে সেটীকে তুলিয়া লইল, একটী ছোট কুকুরের বাচ্চা শীতে বৃষ্টির জলে মৃতপ্রায়। নরেশ সেটীকে নিজের বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, আহা তাহারই মত প্রাণী, আর একা; তাহার অঙ্গে হস্ত বুলাইতে কুকুরটী কৃতজ্ঞতাসূচক ধ্বনি করিতে করিতে নরেশের হস্ত লেহন করিতে লাগিল। কি শক্তিই এই ক্ষুদ্র মূক সাথীর শাবকের জিহ্বায় নিহিত ছিল জানি না কিন্তু নরেশের সমস্ত শরীরে একটা পুলক স্পন্দন ছুটিয়া গেল; তরঙ্গের পর তরঙ্গ এই পুলক অনুভূতি তাহাকে আবার সচেতন করিয়া তুলিতেছে; তাহার শিরায় শিরায় আবার প্রাণের স্বাভাবিক রক্ত সহজভাবে প্রবাহিত, তাহার জীবন এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই আর একদিকে ফিরিয়া গেল। নরেশ কুকুরটীকে বক্ষে তাহার গাত্রবস্ত্রের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছে তাহার মনে হইতেছিল, হায় এও আমার মতন একা এই ছুর্দ্দিবের মধ্যে আশ্রয়হীন। হৃদয়ের কাতরতা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই তবে অনুভব করিবার প্রাণ আছে; কুকুরটী যেন নিশ্চিন্তভাবে তাহার আশ্রয় নীচে রহিয়াছে, উদ্ধারকর্ত্তার প্রতি তাহার অটল বিশ্বাস—নরেশের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল; সে সেই রাস্তার উপর বসিয়াই প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

একটা সামান্য ঘটনা আজ তাহাকে রক্ষা করিয়াছে—জীবন এইরূপই অদ্ভুত।

বহুক্ষণ পরে নরেশ চক্ষু তুলিয়া দেখিল আকাশের পূর্ব্বদিকের বর্ণচ্ছটা লঘু মেঘের আগমনের ইঙ্গিতে মলিন হইয়া উঠিয়াছে।

(৮)

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নরেশকে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিল। নরেশ দীর্ঘকালের জন্য দেশভ্রমণই স্থির করিয়াছে; তাহার মুখ ম্লান বটে তবে স্থির; ঝড় যে থামিয়া গিয়াছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। প্রফুল্ল বলিতেছে "যাও, দেশবিদেশ ঘুরলে মনটা ভাল হবে, কিন্তু আমাকে কখন কোথায় কি রকমভাবে থাক সেটা জানাতে ভুলো না—না হলে বড় ব্যস্ত হব।" নরেশ বলিল "তোমাকে জানাব বই কি, সমস্তই তোমায় লিখিব—যাচ্ছি খালি মন ভাল করার জন্য নয়; নিজেকে ভাল কর্ত্তে হবে। আমি বুঝতে পাচ্ছি যে আমি সমস্ত জিনিষেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছি, বিশ্বাসটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, যেন ভিতরে অবিরত একটা ভাল হবার ভাল কর্ব্বার ইচ্ছা বরাবর জেগে থাকে—বাকি কতদূর কি হয়।" প্রফুল্ল বলিল "তোমার মতন লোকের জীবন যে নষ্ট হয়ে যাবে সেটা ঠিক নয় তোমার কাছ থেকে আমরা অনেক আশা করি।" নরেশ চুপ করিয়া রহিল, তাহার ভিতরে একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল।

(৯)

মানুষের এমন একটা অবস্থা মাঝে মাঝে হয় যখন উপর্য্যুপরি বিপদের আঘাতে তাহার মনটা একেবারে আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া যায় জীবনে তাহার ধিক্কার জন্মে; তখন বিপদে আর তাহার ভয় থাকে না, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলে, "মৃত্যুর বেশী ত আর কিছু নাই, তাহার অধিক আর আমার কি হইবে, আমি মরিবই যাই।" এই অবস্থায় মানবের কার্য্যপ্রণালী অতি গূঢ় রহস্যে আবৃত; প্রথম অসাবধান দৃষ্টিতে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ নিরূপণ একেবারে অসম্ভব; রাস্তায় দেখি একটী ভিক্ষুক পড়িয়া আছে, তাহার দেহের অতি সন্নিকট দিয়া মোটর গাড়ী চলিয়া গেল, তাহার খেয়ালই নাই; সে অসঙ্কোচে শত অপঘাত মৃত্যুর সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করিতেছে—কেন সে কি উঠিয়া আর একবারে যাইতে পারে না—ভিক্ষের জন্য তাহার জীবনের প্রতি এ অবজ্ঞা; বিপদসঙ্কুল প্রাণ রক্ষার চেষ্টাই স্বাভাবিক;

কোথা হইতে এই দীন অজ্ঞান তিমুক বিশ্ববিধানকে অবহেলা করিবার বল পাইল, সে কোন্ মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে, না গরল ভক্ষণ করিয়াছে, এবিষ ছাড়া তার, সে কোথা হইতে কুড়াইয়া পাইল ?—এ তাহার সমস্ত বার্থ জীবনের শিক্ষা ; দুর্দ্দান্ত দৈব কঠিন হস্তে তাহার মনে এই ভাব খুদিয়া দিয়াছে ; দিনের পর দিন আশাহীন অন্বেষণ ; সহস্রগুণ সবলের নিকট কৃপাভিক্ষা করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াও সে অব্যাহতি পায় নাই, সেই কারণে যেন এই-প্রবল শত্রুকে ফাঁকি দিবার জন্যই সে নিজের অস্তিত্বটুকুকে ত্যাগ করিয়া কঠিন অচেতন প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে ; এ অবস্থা না থাকিলে ভগবান্‌কে যে এক উন্মাদ জগতের উপর রাজত্ব করিতে হইত।

গোলাপী নরেশের শাল লইয়া ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল ; তাহার নিজের ছোট ঘরটী সহস্র স্মৃতিতে জীবন্ত, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে একটী লালসার স্পর্শ জাগিয়া আছে, তাহার উপর আবার কুৎসিৎ নগ্নতা সেই বিভীষিকার বৃদ্ধি সাধনে তৎপর ; তাহার জীবনের সমস্ত পাপের অনুষ্ঠান আজ শরীরী হইয়া তাহারই স্কন্ধে চাপিতে চায়, সে হতাশভাবে আপনিকার শয্যার উপর বসিয়া পড়িল, সে চিরকালত এমন ছিল না, তাহারও একসময়ে, রুচিপূর্ণ নিষ্কলঙ্ক সমাজে স্থান ছিল, শিক্ষাও সে বঞ্চিত পায় নাই ; তবে কোন্ কুহকের ছলনায় তাহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন। মাধুরীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামীপ্রীতি তাহার এইবার মনে পড়িল, শেষ পর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টিতে কেমন করুণ ভাব জাগিয়াছিল তাহা গোলাপীর মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে ; নরেশের প্রতি তাহার প্রথমে একটা রাগের ভাব ছিল ; কিন্তু মাধুরীর মৃত্যুর পর তাহার গভীর আন্তরিক দুঃখদর্শনে, তাহার করুণার উদ্রেক হইয়াছে এবং আজ সে আপনার অজ্ঞাতসারে, হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য লইয়া নরেশের সম্মুখে নতজানু। তাহার দূষিত জীবন পরিবর্ত্তন করিতে সে কৃতসংকল্প ; কিন্তু কি উপায়ে সে নিজেকে উদ্ধার করিবে তাহার কোনও মীমাংসা হইল না, প্রত্যুত তাহার মনোবৃত্তি সমূহ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, যে পরিখা সে নিজ হস্তে খনন করিয়াছে তাহার উপর এখন সেতু নির্ম্মান করিতে হইবে, কিন্তু উপাদান কোথায় ; সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল ; এইরূপ স্থানে থাকিলে তাহার গতি কিছুতেই হইবে না, আবার এস্থান ছাড়িয়াই বা সে যাইবে কোথায়, অথচ এই জীবন ও তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব একি ভীষণ সমস্যা, এমন সংকটে সে কেন পতিত হইল ; যাইতেও পারিবে না, আবার থাকিলেও চলিবে না, তখন একমাত্র উপায় অবশিষ্ট আছে,সেটা ভবিষ্যৎ চিন্তা একবারে পরিত্যাগ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান জীবন প্রণালী ভয় করা : তাহাতে আবার না ভোটে,শেষ পর্য্যন্ত মরণ, এই রাস্তায় মৃত্যুর অধিক কোনও বিড়ম্বনা ত তাহার ঘটবে না ; হাজার ভাবিয়াও সে যখন প্রতীকারের উপায় দেখিতে পাইল না তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকাই ভাল, যদি প্রতীকার আপনা হইতেই আসে, উত্তম, নতেৎ মন খারাপ করিয়া কি লাভ। মরিলেই ত ইহজন্মের যন্ত্রণার অবসান হইবে ; আর এ পৃথিবীতে তাহার এমন কোন পক্ষ নাই যে তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইয়া তাহার যন্ত্রণার পরিবৃদ্ধি সাধনে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে। গোলাপী এখন স্থির সংকল্প, তাহার রাগ, দ্বেষ, দুঃখ সব নিবিয়া গিয়াছে, সে নিজেই পুলক অনুভব করিতে লাগিল ; মনে মনে বলিল "এতদিন এ সোজা পথটা দেখতে পাইনি, কি মূর্খ আমি ; যাক্ কাল থেকে আর ভাত হজম কর্ত্তে হবে না।"

গোলাপী ধীরপাদে মুক্ত বাতায়নে আসিল ; কক্ষে কক্ষে বহু দীপালোক সন্ধ্যাগমের গভীরতা পথকে আলোকিত করিতে ব্যস্ত, অনেকেরই পরদিনের আয়সংস্থান হইতেছে ; যার নারী তোষামোদে এ স্থানে কে আনিল ? একদিকে অনেক মাতালের সমাবেশ হইয়াছে, দুইটি রমণী তাহাদের মধ্যে বসিয়া হাসিতেছিল,একজনের দাঁত খুব পরিষ্কার এবং সুন্দর; সে সমস্ত যৌবনভার করিয়া হাসিতেছে আর একজনের বুকে ব্যথা, সে সাহস করিয়া হাসিতে পারিতেছে না কেবল মুখ বিকৃত করিয়া হাসির অভিনয় করিতেছে। কয়েকটি কক্ষে অন্ধকার, তাহারই একটির মধ্যে একটি বৃদ্ধা বেশ্যা বসিতেছিল ; সে ঘরের মধ্যে অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিয়া গোলাপী একটী আলো আনিয়া তথায় প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা জল চাহিতেছে, গোলাপী চারিদিকে তাকাইয়া

কোথাও স্নান এ। অল্পকিছু তৈজস পত্র দেখিতে পাইল না ; কেবল দুই তিনটী বড় কাঠের বাক্স তালা লাগান, এককোনে রাখা আছে, শয্যার কিছুই নাই ; বৃদ্ধা এক শূন্য তক্তপোষের উপর শুইয়াছিল, তাহার জিনিষ-পত্র নিজের কাল সমাগত জানিয়া সে আগেই বাক্সবন্দী করিয়াছে ; আপনা, তাহার মৃত্যুর পর অন্যে কেহ সেগুলিকে অধিকার করিয়া বসে ; বোধ হয় গন্তব্য স্থানের ঠিকানা জানিলে সে চিঠি কাগজে লিখিয়া বাক্স দুইটির উপর আঠা দিয়া লাগাইয়া দিত। যাহা হউক ইহাতে তাহাকে জল না দিবার কারণ গোলাপী খুঁজিয়া পাইল না, সে অন্যস্থান হইতে জল আনিয়া বৃদ্ধাকে দিল। বৃদ্ধা যেন তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, নিকটে বসিবার জন্য বার বার মিনতি করিতেছে, তাহার একা থাকিতে যে ভয় করে। গোলাপীর কিছুতেই প্রীতি বা বিরক্তি নাই, সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। বৃদ্ধা বলিতে লাগিল—"দেখ মরিবার আগে একটা কথা বলে যাই ; তুমি এ পথ ছেড়ে দাও, শেষ পর্য্যন্ত গেলে দেখবে কত যন্ত্রণা, আমি যদি আগে জানতাম, তাহ'লে কি আমার এই দশা হয় ; উঃ—আর একটু জল দাও—হাঁ তোমার এখনও সময় আছে, দাদুলে যাও বাছা, পরে আমায় আশীর্ব্বাদ করবে।" গোলাপী হাসিতে লাগিল, "সে মনের ভাব প্রকাশ না করিয়াই বলিল—"আচ্ছা নয় যাবনা ছেড়ে দিলাম, তার পর খাব কি ? গতর খাটিয়ে কি সিরি করা ইজ্জত নেই আর সুবিধাই বা কই ? বৃদ্ধা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে উঠিয়া বসিবার বৃথা চেষ্টা দুই একবার করিয়া উত্তর দিল, "উপায় আছে কিন্তু আমার পক্ষে এখন থাকা না থাকা সমান ; দেখ, তোমার বয়স বেশী নয়, চেহারাও মন্দ কি থিয়েটারে যাও না, যেমন কোরে হোক্ দেটে চুকেলা পর ছুটবে ত ; তার পর আর অনিচ্ছা থাকলেও এই পচা কাজ করতে হবে না, সে তোমার নিজের হাত।" বৃদ্ধা এই বলিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। গোলাপী তাহার অবস্থা বুঝিয়াছে, মুমূর্ষুর প্রতি শেষ দুই একটী কর্ত্তব্য সমাধান করিয়া সে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

গোলাপীর মনের মধ্যে তখন একটা আন্দোলন চলিতেছে ; সে এখন অত্যন্ত ব্যগ্র, উৎসুক। ডুবিবার সময় একখণ্ড ভাসমান্ কাষ্ঠের সন্ধান পাইয়াছে ; নিরাশার শীতল আঘাতে পুনরধিকার করিয়া আবার শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিত সঞ্চালিত। গভীর অন্ধকারের মধ্য হইতে যাহার তরবারী তার তাহার দিকে প্রসারিত, গোলাপী তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত। সে উৎসুক হইয়া পর দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিল ; ছেলে বেলায় একদিন সে থিয়েটার দেখিয়াছিল, সেই কথা মনে পড়াতে সে হাসিল, এইরূপই অদৃষ্টের বিপাক। সামনের বাড়ীর দরজার নিকট দুইজন বসিয়াছিল ; বয়োজ্যেষ্ঠার মুখ দেখিলেই মনে হয় যেন সে দিনরাত কোনও এক ষড়যন্ত্রে রত, অহরহ আপন মনে যেন কাহার ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবন করিতেছে ; সে স্বভাববিদ্রোহী ; অন্তরে যে হিংসা সে গোপন করিতেছে তাহা মুখেতে প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে। কনিষ্ঠা সেইখানে প্রাচীরে ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছিল ; তাহার মতন হতভাগীরা কখনই নিজেদের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে না, সেই জন্য সে আজ অন্ধকার দ্বিপ্রহরে, সহস্র উপদ্রব সহ্য করিয়াও সে নীরব ; প্রতিবিধানের চেষ্টা ত দূরের কথা, সে কথা, মনে কল্পনাও করিতে পারে না ; বস্তুপক্ষে যখন আশ্রয় হইতে আশ্রয়ান্তরে বিতাড়িত হইয়া অবশেষে হইয়া পড়ে এবং পশ্চাদ্ধাবীর প্রতি তাকাইবার সময় তাহার চক্ষে যে ভাবটি ফুটিয়া উঠে, তাহারও চক্ষে সেইটি স্বভাবতঃ লাগিয়া আছে। গোলাপী জানিত, যে ইহারা দুইজনে থিয়েটারে কাজ করিত তবে কোনও কারণে জেঠা সেইখান হইতে বিতাড়িত হইলে, কনিষ্ঠাও কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সে তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিয়া সকল তথ্য অবগত হইতে উদ্গ্রীব হইয়া পড়িল ; তাহার সংকল্পের কথা শুনিয়া জেঠানারী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, "তুমি, থিয়েটারে যোগ দেবে, নাচ্‌তে জাননা গাইতে জান না, তোমায় নেবে কে, ওরকম অনেক এখানে গড়াগড়ি যায়।" যাহা হউক গোলাপী যাহা জানিতে চাহিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিল, এবং শীঘ্রই সকল বন্দোবস্ত শেষ করিতে মানস করিয়া, সেইস্থান পরিত্যাগ করিল। সেই নারীর ব্যঙ্গ ও হাস্য এখনও তাহার কানে বাজিতেছে কিন্তু তাহার মনটা আজ দমিয়া যাইতে একেবারে রাজী হইল না। সে সুখা ভূখা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরদিনের

কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল ; ঘুমের ঘোরে সে কি স্বপ্ন দেখিয়াছে, ঈষৎহাস্যে তাহার ওষ্ঠাধর বিভিন্ন, মুখের অনেক কুটিল রেখা সহজ সরল হইয়াছে, আর প্রদীপের আলোয় সমস্ত মুখমণ্ডল আলোকিত। পরদিনের অভিনয় পরীক্ষার জন্য, আর কি ভাবেই বা সে প্রস্তুত হইতে পারে !

মানবের চিন্তারাজ্যে যে কত রহস্যময় ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই ; তাহার উদ্ভেদ, কোন স্থানে, এবং কি উপায়ে যে সকল চক্ষুর অগোচরে পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহার বিচার করা, আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অসাধ্য। তবে যে সকল কাজে, সকলভাবে, সকল সুরে, এক অসীম মঙ্গলের পথ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে সেইটাই বিশ্বাস করিয়া আমরা সুখী !

(১০)

থিয়েটারের ম্যানেজারবাবু তাঁহার নিজের প্রকোষ্ঠে, একটি চেয়ারে আসীন, সম্মুখে টেবিলের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুস্তকরাশি, কতকগুলি কাগজ পত্র, এবং একটি ঘড়ি ; ম্যানেজারবাবু ধূমপানে নিরত। একটী নূতন নাটকের অভিনয়ের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছেন, সেইজন্য তাঁহার মুখে গভীর চিন্তার রেখাগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার চক্ষু সম্মুখের একখানি চিত্রপটের উপর ন্যস্ত কিন্তু শূন্যদৃষ্টি, তাঁহার মন যে অতি দূরদেশে ভ্রমণ করিতেছিল, তাহারই প্রমাণ। ম্যানেজারবাবুর বয়স কত তাহা ঠিক বলা যায় না, বোধ হয় অভিনয়ের সহিত কোনও রূপে সংস্পর্শে আসিলে, মানুষের বয়সটা স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে ক্রমাগত বাড়িয়া না গিয়া অতি খাপছাড়া রকমের ব্যবহার করে। যাহা হউক ম্যানেজারবাবু এই কাজে চুল ও বুদ্ধি এই দুই জিনিষকে যতদূর সম্ভব পাকাইয়াছেন , তাঁহার ছয় নাম্বের বয়সটা কি রকমের ছিল, এমন কি একেবারে ছিল কিনা, এ বিষয় লইয়া কেহ কখনও গবেষণায় প্রবৃত্ত হয় নাই ; তবে সকলে এবাবৎ লক্ষ্য করিত যে কর্ম্মচারিবৃন্দ প্রথম অবস্থায় তাঁহার শত্রু এবং সর্দ্দা সশঙ্কিত এবং পরে তাঁহারাই তাঁহার প্রধান ভক্ত এবং কুটীসাধনে তৎপর। এ হেন ম্যানেজারবাবুর নিকট যখন খোট্টা চাকর আসিয়া নিবেদন করিল যে —একটো বাবু দেখা করিতে মাংতা—তখন বাবুর কোনও বিশেষরূপ মুখভঙ্গী দ্বারা বহু পুরাতন ভৃত্য বুঝিল যে, তাহাকে তিতরে লইয়া আসিতে হইবে। থিয়েটারের ম্যানেজারের নিকট যত অদ্ভুত ধরণের সাক্ষাৎপ্রার্থী আসে, আর কাহারও নিকট বোধ হয় তত নহে ; দ্বারদেশে শুষ্কমুখে একজন নাটকার পাণ্ডুলিপি হস্তে নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষার ফলের প্রতীক্ষা করিতেছে ; তাহারই পশ্চাতে হয়ত একজন বৃদ্ধা অভিনেত্রী ম্যানেজারকে দুই কথা শুনাইয়া দিতে আসিয়াছে ; এক কোণে হয়ত আবার কয়েকজন হিসাব লইয়া দণ্ডায়মান। ম্যানেজারবাবুর বিচক্ষণ ব্যবসা বুদ্ধি বুঝিয়াছিল, যে সাক্ষাভিলাষীর সহিত দেখা না করা ব্যবসায়ী হিসাবে ঘোর মূর্খতা।

গোলাপী কম্পিতপদে, সন্ত্রস্তহৃদয়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, আজ সে বুঝিবে যে মনুষ্যজীবনে দয়ার অনুভূতি সত্য কি না, ক্ষমা ও উদারতি সুযোগ্য মানুষকে দেওয়া হয়, না জীবনটা কেবল নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র যাহাতে দুর্ব্বল বা ভ্রান্ত ব্যক্তি একেবারে অবনত ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার নবজীবনের, পুনরুত্থানের আশা কেবল বাতুলের কল্পনামাত্র। ম্যানেজারবাবু কিয়ৎকাল যেন তাঁহার উপস্থিতি লক্ষ্যই করিলেন না, এটা ব্যবসায়ী চাল, বস্তুতঃপক্ষে তিনি আগন্তুককে আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া তাহার আগমনের হেতু খুঁজিতেছিলেন ; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া, গোলাপীকে কেন এতক্ষণে দেখিতে পাইলেন, এইরূপ ভাণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি চাও গো ?" গোলাপী তাহার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া আজ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, সে কেবল মিনিট দুই নীরবে থাকিয়া উত্তর করিল, "আমি থিয়েটারে কাজ করিতে চাই, অল্প মাহিনা হাতে আমার কেবল পেট চলে, হইলেই সন্তুষ্ট।" ম্যানেজার—"এর আগে কোন্ থিয়েটারে কাজ করেছিলে, ছাড়লে কেন ?" গোলাপী সঙ্কুচিতা হইয়া, পড়িল, গলা ঝাড়িয়া উত্তর করিল, "কোথাও না, আমার খুব কম মাহিনে দেবেন।" ম্যানেজার—"ওঃ একেবারে নূতন, নাচতে জান, গাইতে পার, বোধ হয় না—" গোলাপী নিরুত্তর, তাহার ইচ্ছা হইতেছে একবার ম্যানেজারের পা দুইটি জড়াইয়া ধরে, তাহার যে এই শেষ অবলম্বন ; ম্যানেজারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহার অঙ্গে অঙ্গে ঘুরিতেছে, তিনি মনে মনে ভাবি-

দেন, "মজুর পেটেন্ট মজুর নয় তবে শিখিয়ে নিতে খরচ লোষাবে না।" গোলাপী নির্ব্বাক্, তাহার প্রত্যেক দৃষ্টি তাঁহারই প্রতি নিবিষ্ট, তাহার হৃদয়ের স্পন্দন অতি দ্রুত। সহানুভূতির স্বরে ম্যানেজার বলিলেন, "দেখ সোজা কথা আমি তোমায় এখন নিতে পারিনা, আমার লোকেরও দরকার নাই, পরে আবার খোঁজ করিও—"তাহাদের সহিত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন করা বৈষয়িক বুদ্ধির অনুমোদিত নহে। গোলাপী নড়িল না, কেবল তাহার দৃষ্টিধনু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল, আর তাহার অজ্ঞাতসারে দুই বিন্দু অশ্রু চক্ষু ফুটিয়া বাহিরে দেখা দিল; সমস্ত সংসার আজ যেন এক অনন্ত বিষাদলীতির সুরে প্রতিধ্বনিত। তাহার কাণে অবিরাম সেই শব্দ আসিয়া লাগিতেছে। ম্যানেজার লোকটা মন্দ নহে, আর মানুষের মনও অনেক সময় তাহার অজ্ঞাত কোনও এক শক্তি দ্বারা পরিচালিত, তাহাই বোধ হয় গোলাপীর অন্তরের ভাষা তাঁহার অন্তরে পৌঁছাইল। গোলাপী গমনোদ্যত, এমন সময়ে বাবুর আহ্বানে ফিরিয়া দাঁড়াইল "দেখ আমি তোমার জন্যে এক কাজ করতে পারি, আমাদের এক নূতন নাটকের অভিনয় হচ্ছে, তুমি নায়িকার ভূমিকা চেষ্টা কর দেখি, অবশ্য তোমায় সত্য সত্য হেঁসে নাচতে হবে না; কাকনই নায়িকা সাজবে, তুমি কেবল দেখ, রোজ তোমায় রিহার্সেলের সময় আসতে হবে, আর যেন একটু শক্ত হবো, যদি ভাল পাওয়া, ওসব চলবে না তা'হলে একেবারে সোজা রাস্তা, আর এই নাও পাঁচটা টাকা, দেখি এর মধ্যে তুমি কিছু করে উঠতে পার কি না—আর দেখ টাকাটা কি বলত লিখে নিই।" ম্যানেজার এতগুলি কথা বলিয়া নোটবুক খুলিলেন, গোলাপী টাকাটা বলিয়া দিল। ম্যানেজারবাবুর দান যে কেবলমাত্র তাঁহার করুণার প্ররোচিত তাহা বুঝিতে তাহার বাকী ছিল না, সে টাকা পাঁচটা শক্ত করিয়া মুঠির মধ্যে ধরিয়া অন্য প্রয়োজনীয় আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। ম্যানেজারবাবু তাহাকে কোথায় যাইয়া কি করিতে হইবে সব বুঝাইয়া দিলেন। গোলাপী মনের অনেকটা ভার নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

প্রতিদিন নিয়মিত সময় সে আসিয়া চুপ করিয়া এক কোণে বসিত ও আগ্রহের সহিত শুনিত। তবুও সে চেষ্টার ত্রুটী করিত না, তাহার সঙ্গীরা কি জানি কেন তাহাকে দূরে দূরে রাখিয়া, তাহার কাজ আরও সহজ করিয়া দিল, সেও আপনমনে একা নিজের সাধনায় নিরত রহিল। প্রথম প্রথম সে এই নূতন কাজটাকে মোটেই পছন্দ করিত না, কখনও যদি পাইত কখনও অত্যন্ত ক্লান্তিজনক বলিয়া মনে হইত। কাকন নায়িকার ভূমিকা করিত, গোলাপী মন দিয়া শুনিত; একদিন কিন্তু সে প্রকৃত রসের আস্বাদন পাইল, তাহার আগ্রহ সহস্র গুণ বাড়িয়া তাহাকে যেন তাতাইয়া তুলিল। কাকনের অভিনয়ে অনেক দোষ দেখিয়া তাহার হৃদয় এমন বিরক্তিতে পূর্ণ, সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি নিজেকে সংযত করিয়া তাহার নিজের কাজ করিয়া যাইত। কেহই তাহার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী নহে, কেবল দুই একজন ছোকরা অভিনেতা, তাহার কোনও বিশেষ দিনের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত, তাহাদের মনে মনে একটা অপমানের আগুন জ্বলিতেছিল। গোলাপী দিনরাত অবিরাম পরিশ্রম করিতে করিতে যখন নিজে বুঝিল যে কাকনের অন্ততঃ সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে তখন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার মন আত্মপ্রসাদে, পুলকে ভরিয়া উঠিয়াছে, কৃতকার্য্য হইয়া সে আরও দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সমস্ত অভিনয় ব্যাপারটার প্রাণের নিকট পৌঁছাইতে যত্নবতী হইয়াছে। অভিনয়ের উন্মাদিনী শক্তিতে সে এখন অভিভূত, তাহার কাছে এখন আর ইহা জীবনের একটা অবলম্বন মাত্র নহে, এখন তাহার সমস্ত প্রাণ ইহারই প্রভাবে সঞ্জীবিত। সে নিজের মধ্যে এক অপূর্ব্ব শান্তরাজ্য গঠন করিয়া তাহাতেই মগ্ন বাস করিতে লাগিল, যে অভিনব আনন্দ সে উপভোগ করিত তাহার অংশীদার করিবার প্রয়োজন সে অনুভব করে নাই, এবং এইরূপে অত্যন্ত সঙ্গীহীন অথচ অচঞ্চল অবস্থায় তাহার সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে অভিনয়ের দিন অতি সন্নিকট হইল, ম্যানেজারের নিকট গোলাপী আহূত হইয়া নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে চলিল; কিন্তু তাহার প্রবেশের পরমুহূর্ত্তেই ম্যানেজার কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করিলেন এবং অন্য একজনকে গোলাপীর অভিনয় শুনিতে বলিয়া তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রকাশ

করিয়া লেলেন। তাহার আত্মসম্মানে আঘাত আজ তাহাকে নূতন করিয়া লাগিল; ম্যানেজার বাবুর কৃপা প্রথমে তাহার নিকট কেবলমাত্র অনুগ্রহই ছিল কিন্তু এখন যে সে আপনার মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহ অনুভব করিয়াছে: সে'ত আজ ভিক্ষুক নহে, সামান্য প্রাণরক্ষার জন্য কৃপাভিক্ষা করিতেছে না; সে অনেক অতীতের কথা তাহার পর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে; সে এখন প্রাণে প্রাণে অভিনেত্রী, নিজের শক্তি বুঝিয়াছে, তাহারই পরিচয় দিতে সে যায়, তাহাই আজ তাহার অন্তর যোগ্যতা পরীক্ষার দাবী করিতেছিল; ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সে এই মর্মনিষ্ঠুর বিচারকের নিকট কোন প্রকারে নিজের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিল, তিনিও তাহাকে অব্যাহতি দিয়া নিজে বাঁচিলেন। গোলাপীকে কেহই বুঝিত না, তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এবং দুঃখময় ভাবের আবরণ ভেদ করিয়া হরকমের চপল জীবগণ তাহার নিকট আসিতে পারিত না; তাহারা বুঝিয়াছিল গোলাপীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, তাহার এমন কি একটা প্রচ্ছন্ন শক্তি ছিল যাহাতে অল্পক্ষণের মেশামেশিতে সে মানুষের প্রাণের মধ্যে একটা অর্থহীন ক্রন্দন আনিয়া দিত, এবং তাহার সঙ্গীরা এটা মোটেই পছন্দ করিত না।

অবশেষে অভিনয়ের দিন সমাগত হইল; বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন, অনেক লোক দর্শনার্থী সমাগত; তাহাদের মধ্যে নূতন নাটক সম্বন্ধে নানারূপ গুরু, লঘু সমালোচনা চলিতেছে; মধ্যে মধ্যে অবিচলিত ড্রপসিনের উপর শত শত বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি পড়িতেছে, কত অভিনব আমাদের উপভোগ্য বস্তু যে ইহারই অন্তরালে বিদ্যমান। অন্যদিকে ম্যানেজার বাবুও তাঁহার স্বাভাবিক ধীরভাব হারাইয়াছেন; সকলকে প্রস্তুত হইতে হইবে, কিন্তু কাহারও যে এখনও দেখা নাই, সে যে নায়িকা সাজিবে, আজ কি সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইবে, মানরক্ষাই বা কিরূপে হয়; সাতপাঁচ ভাবিয়া ম্যানেজার বাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বারবার ঘড়ির প্রতি অসহিষ্ণু দৃষ্টি তাঁহার মনের তৎকালীন অবস্থারই পরিচায়ক; এমন সময়ে কোথা হইতে যেন আশ্বাসবাণী আসিল, কাজল আসিয়াছে। ম্যানেজার বাবু শান্ত হইলেন; কিন্তু একি, গাড়ী হইতে নামিয়া কাজল টলিতেছে যেন মোটেই প্রকৃতিস্থ নহে, অস্বাভাবিক বেশা করিয়াছে, কেমন করিয়াই বা আজ অভিনয় করিবে; কাজল কিন্তু নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ, সে, কেবল সকলের প্রতি একবার সহাস্য দৃষ্টি করিয়াই প্রস্তুত হইবার জন্য সজ্জাঘরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে এক বৈদ্যুতিক শক্তি-প্রভাবে ম্যানেজার বাবুর মস্তিষ্কে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে বুদ্ধি স্থির হইয়া গেল, তাঁহার ইঙ্গিতে একজন কাজলকে অনুসরণ করিয়া গেল; সেও সুযোগ্য নিপুণ পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করিল, আর একজন গোলাপীকে সেখানে লইয়া আসিল। গোলাপী ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু যে আশা সে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, পোষণ করিতে পারে নাই তাহারই এই আকস্মিক, উপস্থিত সম্ভাবনায় সে অত্যন্ত বিচলিত, তাহার মনে বিশ্বাস অতি অল্প; তাহারই উপর আজ সব নির্ভর করিতেছে, সে সজ্জাঘরে প্রবেশ করিল; এই দৈবপ্রেরিত সুযোগকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিবার সাহস বা ইচ্ছা তাহার ছিল না, আর ঘটনাস্রোত যখন তাহারই অনুকূলে বহিতেছে তখন সেই বা কেন তাহার গতিরোধের চেষ্টা করে। এইরূপ এক একটী ক্ষুদ্র ঘটনা মানবের অদৃষ্টে একেবারে আমূল পরিবর্ত্তন আনে, এইটুকু কৌতুক উপভোগ করিবার প্রলোভনকে 'অদৃষ্ট' কিছুতেই পরিহার করিতে পারে না! ঘুরে কোথায় কে ছিল আর কোথাকার অজ্ঞানিত, চির অনাদৃত ভ্রূণপুষ্প সফলতা হইল; একজন অপরিমিত আহার করিল, ফলে ফলেরা হইয়া সে মরিয়া গেল, আহার পুত্র কর্ত্তা হইয়া আপন খুল্লতাতের সহিত মকদ্দমা রুজু করিল, দুই পরিবারের কলহের ফলে দুইজনই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া একজন দীনভাবে থাকিতে লাগিল আর একজন অবস্থার ঘুর্ণোরমি মানসে অসহায় অবলম্বন করিয়া নিজে উদ্ধারে গেল।

গোলাপীর অভিনয়ের প্রশংসায় সমস্ত অডিটরিয়ম আজ প্রতিধ্বনিত; চীৎকারের পর চীৎকার করিয়া মাটাকলা

উপভোগের অভিলাষীরা তাঁহাদের হৃদয়ের আনন্দ ব্যক্ত করিয়াছেন, সকলেই বলিতেছে—"কলনের চেয়ে এই নূতন লোক একশতগুণে ভাল" অভিনয়ের শেষে সোলাপী ভ্রান্তিবশতঃ বসিয়া পড়িল, চতুর্দ্দিক, তাহারই অভিনয়ের যথোচিত সমাদিধ্যা ঘোষণায় মুখরিত। ম্যানেজার বাবুর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসমান দৃষ্টি তাহার নিকট যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া মনে হইল; তাহার উপর আবার নিজের পটুতা ও কৃতকার্য্যতার জ্ঞান তাহাকে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে; আজ অনেক দিনের পর সে আবার সন্তুষ্টভাবে জগতের দিকে তাকাইতে পারিল। ম্যানেজার বাবুর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার মধ্যে সুস্থ-ভাব ও তাহা ছাড়া অন্য অনেক অর্থ নিহিত ছিল; ফলে সোলাপী সেই রাত্রেই বাড়ী যাইবার আগে জানিয়া গেল যে কল্যাবধি সে এই রঙ্গমঞ্চের একজন রীতিমত অভিনেত্রী আর তাহার মাসিক পরিশ্রমের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে দুইশত রৌপ্যমুদ্রা। ম্যানেজার বাবু একটা বারণীল কখনই হইতেন না; তবে কিনা রঙ্গমঞ্চে আসীন, তাঁহাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য এক থিয়েটারের মালিকের লোলুপ দৃষ্টি তাঁহার তীক্ষ্ণ চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে নাই।

দিনে দিনে সোলাপীর উন্নতি হইতে লাগিল; অভিনয়ের মধ্যে সে নিজের ব্যক্তিত্বকে এরূপ ডুবাইয়া ফেলিত যে লোকে মুগ্ধ না হইয়া পারে না, তাহার সাধনা, চেষ্টা সফল হইল। তাহার জীবন এখন সম্পূর্ণ নূতন। যে বহ্নিশিখা অবিরত তাহার বক্ষের মধ্যে জ্বলিতেছিল, যাহার জন্য, সে প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে অনুভব করিয়া সহায়হীন ভাবে চতুর্দ্দিকে তাকাইয়াছে, সেই বহ্নিশিখা আজ নির্ব্বাপিত; এতদিন সে যে একটা ঘৃণা ও ভয়ের চক্ষে জগতকে দেখিত; সেভাবও অন্তর্হিত, সে আবার স্বাভাবিক ভাবে আচরণ করিতে লাগিল।

একটী পরিষ্কার গলির মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র বাড়ীখানি, যেন পবিত্রতার আবাস বলিয়া মনে হইত; কেহই মনে করিতে পারিত না যে এই বাড়ীর কর্ত্রী একদিন পাপের পঙ্কিলতার মধ্যে বিবাহীন চিত্তে বাস করিত। লোক চক্ষেও সোলাপীর একটু বিশেষত্ব ছিল, অভিনয়ের সময় তাহার তন্ময়তা, লোকের মনকে স্বভাবতঃ তাহার প্রতি আকর্ষণ করিত, এবং রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেক আচরণে, ব্যবহারে তাহার হৃদয়ের পবিত্রতা এমনভাবে ফুটিয়া উঠিত যে সাধারণ দর্শকেরা কোনওরূপ অভিমত স্থির করিতে অশক্ত হইতেন, যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত নীরব মন্তব্য আন্দোলনের দ্বারা তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই যে অভ্রান্ত মত প্রকাশ করিতে পারেন—এইরূপ ভাবপ্রকাশে প্রয়াসী হইতেন। উৎসাহী যুবকবৃন্দ মুক্ত হৃদয়ে সোলাপীর প্রশংসা করিত। অনেক উৎসুক ব্যক্তি আবার তাহার ভিতরের জীবনের খোঁজ লইয়া ছিলেন, আর ইহারাই তাহার প্রশংসাকারীর—মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ছোট বাড়ীতে সে এক ঝি লইয়া বাস করে, কোনও আগন্তুক অভ্যাগতের যাতায়াত নাই, তাহার পক্ষে নিজের সহচর্য্যই যথেষ্ট। নিজ হাতে রন্ধন করে ও সমস্ত দিন নিজের কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে এবং নাটক ও নাট্যকলা সম্বন্ধীয় পুস্তক লইয়া কাটাইয়া দেয়। অন্যান্য বিষয়ের পুস্তকও সে মাঝে মাঝে পাঠ করে; দূষিত জীবনের ফলে যে নীচতা ও বর্ব্বরতা তাহার ব্যবহারের মধ্যে আসিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল। কিন্তু এত সুখের মধ্যেও কোথায় যেন একটা অভাব রহিয়া গেল, সেইটা এমন বড় কিছু নহে; তবে সে নিজেই এই অভাব যে কোথায় তাহা ধরিতে পারিল না। ফলে বৃদ্ধা দাসী একদিন বাজার হইতে একটা ভাল পাথরের 'গোপাল' মূর্ত্তি আনিতে আদিষ্ট হইল। একটী জলচৌকী প্রস্তুত কাঠ সিংহাসনের উপর ক্ষুদ্র পুত্তলিকা প্রতিষ্ঠিত; প্রথম দৃষ্টিতেই বেশ অনুমান করা যায় যে গৃহিণীর হৃদয়ের কতকাংশ ইহারই নিকট পড়িয়া আছে।

(১১)

মা ও মেয়ে।

মিঃ বি, সি, রায়,—ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার, এখন কলিকাতায় কর্ম্মহীন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার যে কেমন করিয়া চলিত, তাঁহার পরিচিত ভদ্রলোকেরা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেন না; আসল কথা এই যে, বিশ্বের নিয়ম চলা, তাহার ব্যতিক্রম কিছুতেই ঘটিতে পারে না;

সেই জন্য তাঁহার চলিয়া যাইত; তবে চলাও অনেক রকমের আছে, লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বাষ্পীয় শকট চলে, আমার গ্রামের মোটা ঘোড়া দিয়া গো-শকটও চলে; মিঃ রায়ের বাড়ী ভাড়া থাকা, দোকানে থাকা, চারিদিকে ঋণ; বিদ্যা পয়সায় কি রকম করিয়া বাহিরে অজ্ঞতা রাখিয়া চলিতে হয়, তাহারই উপায়ের উদ্ভাবনে তিনি আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই সবেষণায় নিযুক্ত হইয়া অবধি তিনি জীবন ধারণের অন্যান্য উপায়কে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন; তাঁহার মৌলিক মতবাদের বিরোধীগণের মধ্যে সকলের অগ্রগণ্য ছিল, তাঁহারই কন্যা কনক; কনক বোর্ডিংয়ে থাকিয়া স্কুলে পড়িত, তাহার মাসিক খরচ লাগিত মুড়ি টাকা, এবং এই টাকা সব সময়ে সে ঠিক পাইত না, সেই জন্য সকলের মধ্যে সে বরাবরই; বড় সঙ্কুচিত; তাহার নিকট সকলের চেয়ে অসহ্য ছিল, তাহার সহচরীদের করুণাদৃষ্টি; তাহার কাহিনী সকলেই অবগত এবং পাছে কেহ কখনও তাহাকে অযাচিত সহানুভূতি ও করুণার দ্বারা অপমানিত করে এই ভয়ে সে আপনাকে অত্যন্ত সংযত করিয়া চলিত। শৈশবাবধি সে মাতৃহীনা, এই জন্য সে সকলপ্রকার সাধারণ আমোদ আহ্লাদ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, মনের কোন এক বিশেষ অংশকে অত্যধিক মাত্রায় পুষ্ট করিত; এইটি তাহার অদ্ভুত আত্ম সম্মান জ্ঞান। সমবয়সীদের দূরে রাখিয়া, সে অপেক্ষাকৃত গভীর শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গ কামনা করিতে বাধ্য হইল, ফলে দাঁড়াইল এই যে অন্য বয়সের মধ্যে তাহার সকল কর্ম্মের মধ্যে একটা নৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হইয়া গেল, সে একেবারে গোঁড়া ব্রাহ্ম হইয়া উঠিল। মিঃ রায় আপনার স্বাভাবিক ঔদার্য্য, ধর্ম্ম বিষয়েও ক্ষুণ্ণ করেন নাই; তিনি সকল ধর্ম্মকেই সমান ভাবে গ্রহণ করিতেন, সেই ভাবটা—উপেক্ষা তবে তাঁহার কথাবার্ত্তায় মাঝে মাঝে একটা আধুনিক ধর্ম্মের তত্ত্ব পাওয়া যাইত; যতটা আভাষ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে এই ধর্ম্ম অন্য সকল ধর্ম্মাপেক্ষা এক বিষয়ে অনেক আগে; এই ধর্ম্ম কখনও ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যপ্রণালীকে, কোনও কুসংস্কারবশে নৈতিক গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিতে চায় না। মিঃ রায় চিঠি পড়িতেছেন, সকলগুলিই প্রায় পাওনাদারের চিঠি তাহার মধ্যে একটি ছিল কনকের, সে লিখিয়াছে, যখন পড়ার খরচ সঙ্কুলান হইতেছে না তখন তাহার বাড়ীতে আসিয়া থাকাই ভাল, এবং সে কালই চলিয়া আসিবে। মিঃ রায়ের এটা মোটেই পছন্দ হইল না, তিনি কন্যার সঙ্গ মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না। এক হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ীর নিকট তিনি দুর্দ্দিনের সময় টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, ব্যবসায় অনুন্নত হইয়াও সেই বন্ধু তাঁহাকে টাকা ফিরাইয়া দিতে রাজী হন নাই আর মিঃ রায়ও বেশী জেদ করিতে পারেন নাই, কারণ বন্ধুবর তাঁহাকে প্রত্যেক মাসের প্রথমেই নিয়মিতরূপে আশীটি টাকা গচ্ছিত মূলধনের লাভ হিসাবে পাঠাইয়া দিতেন, বন্ধু মিঃ রায়কে জানিতেন এবং কনকের ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকট অবহেলার বস্তু ছিল না।—এই মিঃ রায় চিরকাল এমন ছিলেন না; বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইবার সময় তিনি দুইটি ডিগ্রি লইয়া আসিলেন—একটি তাঁহার শিক্ষার উপযুক্ত বড় চাকরী আর একটি, তাঁহার, বিলের উপযুক্ত ভাষা বলিতে পারি না, অসম্ভব রকমের পানদোষ। বাকী ইতিহাসটা অনেকস্থলেই দেখা যায় এবং পরিণামও কিছু আশ্চর্য্য রকমের হয় নাই!

পরদিন মিঃ রায় সকাল হইতেই বাহির হইয়া গেলেন; তিনি ঘরে রন্ধনাদির হাঙ্গামা পছন্দ করিতেন না; ঘরে একটী মাত্র বালক ভৃত্য থাকিত। মিঃ রায় কোনও হোটেলে আহারাদির বিড়ম্বনা মিটাইয়া সমস্ত দিন, এদিক ওদিক করিয়া এক বন্ধু ব্যারিষ্টারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন!

এদিকে কনক তাহার ছোট্ট তোরঙ্গখানি লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত, বালকভৃত্য তাহাকে চিনিত না তবে ভয়ে কোনওরূপ বাধা দিল না, কেবল নির্ব্বাক হইয়া এই অত্যাসন্নতার কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিল। কনক তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া এখন ক্লান্ত হইয়াছে—বালকের নিকট উত্তর পাওয়ার প্রত্যাশা, করা বৃথা। ঘরের বন্দোবস্ত দেখিয়া রাগে কনকের কান্না আসিল; সে আসিবে বলিয়া কোনওরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই;

রাত্রে খাইবেই বা কি, খাওয়া নাওয়াও সেখানে কিছুই নাই। মাতৃহীনার বক্ষে পিতার এই উপেক্ষা বজ্রের মত বাজিল; অভিমানে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চায়, কণ্ঠস্বরোধের আবেগে একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল; পিতার মলিন শয্যার উপর পড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল। পৃথিবীতে যে পিতা ছাড়া, আপনার বলিবার কেহই নাই, আজ সেই পিতারই এই ব্যবহার, তাহার বাঁচিয়া থাকা একই অনাবশ্যক; সে কি জগতের উপর এত বড়ই একটা বোঝা, ভাবিয়া কোনও অন্ত পাইল না। অনেকক্ষণ পরে সে উচ্ছ্বসিত আবেগ দমন করিয়া বর্ত্তমানের উপায় ভাবিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সামান্য কিছু পয়সা ছিল, তাহাতেই সে নিজের ও পিতার মত আহার্য্যের যোগাড় করিয়া লইল, বালকভৃত্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া গেল। কনক প্রথমে পিতার জন্য অপেক্ষা করাই সঙ্গত মনে করিয়াছিল; শেষে দেরী দেখিয়া নিজে আহার করিয়া লইল।

অদিক রাত্রে মিঃ রায় বাড়ী ফিরিলেন; কন্যাকে দেখিয়া তিনি প্রথম সম্ভাষণ করিলেন, "কিগো পড়াশুনা বুঝি বড় কষ্ট লাগছিল, তাই বাপ ছেড়ে দিলে।" তিনি তখন অবশ্যই প্রকৃতিস্থ হইয়া ছিলেন না, ব্যারিষ্টার তাঁহাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়াছেন। কনকের অনেক কথা বলিবার ছিল কিন্তু সে নীরবে পিতার সম্মুখে আহারের থালা ধরিল।

মিঃ রায় একবার খাবারের দিকে চাহিলেন, তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অতি বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এসব সন্দীপী করতে কে বলেছিল, সব দিকেই মুস্কিল ঘটে উঠছে; যাও নিয়ে যাও আমার আর দরকার নাই।" কনক থালা লইয়া ঘরের বাহিরে গেল। দোতলায় ৬টি ঘর; অন্যটী সে নিজের থাকিবার মত যথাসাধ্য করিয়া লইয়াছিল। সারারাত্রি অনিদ্রিত অবস্থায় সে শত দুর্ভাবনায় [illegible] কিন্তু তাহার নিশ্চয়কর্ত্তা বোধ হয় তাহার অবিচলিত ভাব অনুমান করিয়াই তাহার গহনে খানিকটা ইস্পাত সংযোজিত করিয়াছিলেন, তাহাই সে বিপদকেও ভয় করিয়া পড়িয়াও পড়িল না, বরং পরদিন [illegible] সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়াই হউক কিম্বা নিজের ভরণপোষণের ভার আপনার স্কন্ধে লইয়াই হউক, এই অনিশ্চিত দুর্ভা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সে কৃতসঙ্কল্প; তাহার আরও এক সুবিধা ছিল, সেটি পরমেশ্বরে তাহার সরল, নিঃসন্দিগ্ধ আত্মসমর্পণ।

সকালে, তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, মিঃ রায় শয্যা-ত্যাগ করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিলেন; দু একবার বৃথা চেষ্টায়, তাঁহার অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল; তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে, শরীর আকর্ষ্য রকমের দুর্ব্বল। বোধ হয় গতরাত্রের আমোদ আজ একবারে সুরসঙ্গত গাওনা আদায় করিতে উপস্থিত। কনক আসিয়া পিতার অবস্থা দেখিল, তাঁহার লাবণ্য, লাবণ্যহীন, যাতনা ক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া সে তখনের সমস্ত অভিমান ভুলিয়া ফেলিল মিঃ রায়ও আজ সহায়হীন এবং গতদিনের ব্যবহারে বোধ হয় একটু লজ্জিত হইয়া থাকিবেন, যাহা হউক তিনি তাঁহার নিকট যে টাকা কয়টী ছিল, সব কনকের হাতে দিলেন, ঘরের কর্ত্রী বলিয়া তাহার স্থান মানিয়া লইলেন।

ডাক্তার আসিয়া কয়েকটী অপ্রিয় কথা শুনাইয়া গেল—রোগীকে কু অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইবেই, নচেৎ মৃত্যু অনিবার্য্য এবং শীঘ্র হওয়াই সম্ভব। তবে এযাত্রা এত ভয়ের কারণ নাই, 'attack is not severe'—

কনক যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিল, সহায় একমাত্র মূর্খ বালকভৃত্য—সে একটী অদ্ভুত জীব, জীবনে সে একটি জিনিষ বুঝিয়াছে, আদেশ পালন করা, সমস্ত জীবন তাহার কেবল আদেশের অপেক্ষা করিয়াই কাটিবে; আদেশদাতা যিনিই হউন না সে যথাসাধ্য পালন করিবেই; বোধ হয় মরণেরও আদেশ না পাইলে কাল ফুরাইলেও, সে মরিতে পারিবে না। এই সকল লোক জগতে একটা চিরন্তন জিজ্ঞাসার চিহ্ন মত বিচরণ করে; কিছুই তাহারা বুঝিতে পারে না, সাধারণ ঘটনাও তাহাদের আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়, মরণেও তাহাদের মুক্ত হইতে এই চির প্রশ্ন দূর হয় না, যেন যমরাজের কীর্ত্তি দেখিয়া তাহারা বিস্মিত।

এই বিপদের সময় কনকের আরও একজন সহায়

ছুটিয়াছিল, সে তাহাদের প্রতিবেশী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত জ্যোতির্ম্ময়। জ্যোতির্ম্ময় পূর্ব্বাপরি মিঃ রায়ের সহিত পরিচিত, সেই সূত্রে সে এখন আসিয়া তাঁহার অসুখের সংবাদ লইত এবং নানাবিষয়ে কনককে সান্ত্বনা করিত। জ্যোতির্ম্ময় এখন M A & B L পাশ করিয়াছে; তাহার পিতা বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক, তাঁহার ইচ্ছা পুত্র হাইকোর্টে ওকালতি করে; কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় এই কার্য্যে তেমন কিছু আকর্ষণশক্তি খুঁজিয়া পাইল না, অন্যান্য সেই গতি তাহাই স্থির করিয়া; সে এখন দুই বৎসর অন্য কোনও কার্য্যের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে; কিন্তু তাহার মনের মত কিছুই হইয়া উঠিল না। সেও তাহার চিরাভ্যস্ত প্রিয় আলস্যময় জীবন নিশ্চিন্তমনে যাপন করিতেছে; পিতা প্রতিমাসে তাহাকে মাসাশ্বরচ পাঠান ও প্রতি সপ্তাহে অবিলম্বে, হাইকোর্টে ওকালতি করিবার ইঙ্গিতপূর্ণ একখানি করিয়া পত্র লিখিতেন। ইঙ্গিত প্রথমে অনুরোধের আকারেই ছিল ক্রমে আদেশের আকার ধারণ করিল কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় তাহাতেও নির্ব্বিকারচিত্ত; সে ছাত্রাবস্থার কয়েকজন কলিকাতাবাসী বন্ধুকে লইয়া, এক আরাম ও আমোদের নীড় রচনা করিয়া জীবনের অমিশ্র উপভোগ করিত। কনক জ্যোতির্ম্ময়কে বিশেষ সুহৃদ্ভাবে পাইয়া, তাহার সদ্গুণ সমূহই প্রথম দেখিতে লাগিল, পিতার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া, সে মনে মনে সেইগুলি লইয়া আলোচনা করিত; ক্রমে তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া যখন সাধারণ পছন্দ অপছন্দ হইতে গভীরতর অনুভূতির জন্য লালায়িত, তখন একদিনের ঘটনায়, তাহার অন্তরের সকল আবেগ মিলিয়া তাহাকে জ্যোতির্ম্ময়ের নিকট ঠেলিয়া দিল, সে মনে মনে জ্যোতির্ম্ময়কে ভালবাসিয়া ফেলিল।

সেদিন মিঃ রায় শয্যা হইতে উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার মনটা আজ অত্যন্ত তিক্ত; জগৎ যে তাঁহাকে এমন অতর্কিতভাবে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত, এই বেয়াদবীটা তিনি কোন ক্রমেই পরিপাক করিতে সমর্থ নহেন; সেইজন্য যখন দিঁড়িতে নামিবার সময় হঠাৎ পায়ে আঘাত লাগিয়া তাঁহার আপাদমস্তক ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল, তখন সম্মুখেই নিরপরাধী ভৃত্যকে দেখিয়া, তিনি তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিলেন; প্রহরের নিদারুণ প্রহার আরম্ভ হইল; বালক অনভ্যস্ত নহে, সে এই বিশেষ অনুভূতিটাকে, তাহার জীবনের একটা স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যেই ধরিত; সে বাধা দিবার কোনও চেষ্টাই করিল না। কনক পিতার ব্যবহার দেখিয়া একবারে স্তব্ধ; বৃথা বাধা দিয়া অপমানকে ঘরে বরণ করিয়া আনিবার সাহস তাহার হইল না, সে দীন-নয়নে কেবল এই পাশবিক অত্যাচার দেখিতে লাগিল; নির্দ্দোষীর পীড়ন তাহার নিকট অসহ্য হইলেও সে নিরুপায়; তাহার আপনার দুর্ব্বলতা ও নারীত্ব আজ তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। সদর রাস্তা হইতে সমস্তই দেখা যায়, জ্যোতির্ম্ময় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল; চকিতে সে মিঃ রায়; বালক ও কনককে দেখিয়া লইল; মিঃ রায়ের কবল হইতে বালককে উদ্ধার করিয়া সে অতি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "মিঃ রায় are you a brute, মনুষ্যত্ব না হয় নাই থাকিল; একটু লজ্জাও থাকা উচিত, আপনার কন্যার সম্মুখে এটা কি ভাল?" মিঃ রায় তাহার দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া; আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে উপরে উঠিয়া গেলেন। কনকের মন কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে বেশী কথা বলিতে নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, সুতরাং মুখে শুধু বলিল, "ধন্যবাদ" কিন্তু তাহার কৃতজ্ঞতা-আপ্লুতচক্ষু, বাক্যের অক্ষমতার অভাব পূরণ করিল, সে ধীরে মুখ নত করিয়া নিজেকে অনেকটা ধরা দিয়া ফেলিল।

তাহার পরে দশ বারদিন চলিয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে জ্যোতির্ম্ময় একবারও তাহাদের বাড়ীর মধ্যে পদার্পণ করে নাই; তাহার এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন কনকের মনে একটা এমন আলোড়ন আনিয়া দিয়াছিল, যেটা তাহার সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে ধরা দিয়া, তাহাকেই সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিত। তাহার মুখ মাঝে মাঝে অকারণে রক্তিম হইয়া উঠিত; তখন সে ভয়ে ভয়ে কেহ দেখিয়াছে কিনা জানিবার জন্য চারিদিকে চাহিত। একদিন সে বাটীর [illegible]

ব্যাপৃত, এমন সময় জ্যোতির্ময় যেন কত অপরাধী, এইভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আপনার বইটা ফিরিয়ে দিতে এসেছি" কনক—"পড়া হয়ে গেল, কেমন লাগল"। জ্যোতির্ময়—"খুব ভাল, আমার অনেক বন্ধুবান্ধবের বেশ জোরে আঘাত লেগেছে; বিশেষ উপকৃত হয়েছি—আমার ধারণা ছিল যে কেশববাবু খুব খাঁটি কথা বলেছেন, কিন্তু কখনও পরখ করে দেখবার সুযোগ হয়নি আপনার অনুগ্রহে আজ হল, সেজন্য আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ; এসব কথা স্থির জোরে ভাবিনি, আপনার সংস্পর্শে এসে আমার অনেক উপকার হল, জানি না এখন কেমন করে শোধ করব।" কনক—"আমি আর আপনার কি করেছি, বইটা শুধু পড়তে দেওয়া ছাড়া নয়, আজ না হয় কাল পড়তেন; তবে যদি যে আপনার ভাল লেগেছে, এতেই আমি সুখী; আপনার মত শিক্ষিত লোকেরা এই রকম চিন্তা না করলে, দেশের আশা কি? আপনারাইত কুসংস্কারের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবেন, অন্ধ পুতুল পূজো উঠিয়ে দেবেন, দেশের ভবিষ্যৎ আপনাদেরই হাতে।" জ্যোতির্ময়—"আমার আর অযথা প্রশংসা করে লজ্জা দেবেন না; আজ তবে আসি।" কনক— "মাঝে মাঝে আসবেন; এতদিন একবারও আসেননি"—"জ্যোতির্ময় "হাঁ, আসব বই কি" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল; কনক একা রহিল।

সন্ধ্যাবেলায় সেদিন ছোকরা চাকর তাহার নিকট একটি চিঠি লইয়া আসিল। কনকের মনের ভিতরে কি যেন একটা নাচিয়া উঠিয়াছে, সে এক অভূতপূর্ব আনন্দ, সে কম্পিতহস্তে চিঠিখানি লইয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল, স্পর্শেও যেন একটা সুখ, অক্ষর তাহার অন্তরই তাহাকে লেখকের নাম বলিয়া দিয়াছিল, অন্তর যদি ভালবাসায় পূর্ণ হয়, তাহা হইলে সে এইরূপ ভবিষ্যৎবেত্তা হইয়া দাঁড়ায়, এইটা স্বাভাবিক। খাম ও উপরের লেখার মধ্যে যেন একটা মার্জিত রুচির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কনক একবার ইতস্তত চাহিল অতি সাবধানে চিঠি খুলিয়া ফেলিল। পত্র এই ভাবে লেখা ছিল—

"আমি আপনার নিকট একটা ঘোর মিথ্যাকথা বলিয়া আসিয়াছি, জানি না আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন কিনা। কিন্তু আমার দোষের জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত এবং মিথ্যা স্বীকার না করিলে আমিও হৃদয়ে শান্তি পাইব না। আপনার নিকট আজ সকালে বলিয়াছিলাম যে, আমি আপনাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইব, কিন্তু তখন আমি ঠিক জানিতাম যে আপনাদের বাড়ীতে আমার আর যাওয়া হইবে না; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে অনেক গণ্ডগোল উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় আমি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, আশা করি যে এই ক্ষণিক দুর্বলতার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। মনে করিবেন না যে আমি নিজে আপনাদের বন্ধুত্ব পছন্দ করি না; আপনার সঙ্গে কথাবার্তায় আমার যে কত উপকার হইয়াছে আমার কতকালের ভ্রান্ত ধারণার আবর্জ্জনারাশি যে দূরীভূত হইয়াছে, সে আমি ছাড়া আর কেহ বুঝিবে না; সেজন্য চিরজীবন আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিব। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, যে এই সব উচ্চ গভীর বিষয় লইয়া আপনার সহিত আরও আলোচনা করি, আপনি বয়সে আমার কম হইলেও আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, যে আপনি আমার অপেক্ষা এবিষয়ে অনেক জানেন তাহার কারণ আমাকে, আপনার পূর্ব্বে আর কেহ এই ভাবে পথ দেখাইয়া দিতে পারে নাই—তবে যাহা হইবার নহে, তাহা লইয়া শেষ করিয়া আর কি লাভ; আপনার শ্বশুর যখন আমার যাওয়া মোটেই পছন্দ করেন না এবং আমাকে বাড়ীতে ঢুকিতে নিষেধ করিয়াছেন তখন আমার সেখানে যাওয়া কোন মতেই উচিত নয়; কিন্তু আপনাকে যে মিথ্যা কথা বলিয়া আসিয়াছি, সেইটার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা আমার কর্ত্তব্য এবং যতক্ষণ আপনি ক্ষমা না করিবেন, ততক্ষণ সুস্থির হইতে পারিতেছি না, আশা করি বিরক্ত হইবেন না আর যদি পারেন তাহা হইলে ওই ধরণের আরো একটা বই পাঠাইয়া দিবেন। ইতি—

ক্ষমাপ্রার্থী জ্যোতির্ময় সরকার

চিঠি কনকের খুব ভাল লাগিল, বিশেষ জ্যোতির্ময় যেখানে নিজের ভ্রমসংশোধনের জন্ত তাহাকেই দায়ী করিয়া তাহার আসন, সমাজসংস্কারকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেইটা তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দিল; অর্ধশিক্ষিতা, ষোড়শবর্ষীয়া এমন কোনও নারী নাই যাহাকে কোন (সুন্দর) পুরুষের ভ্রান্ত ধারণার সংস্কারকের পদ বিচলিত ও উৎফুল্ল করে না, বিশেষতঃ যদি সেই পুরুষই আপনা হইতে ইহা যাচিয়া লয়।

কনকের বুকের মধ্যে হৃদ্‌ নাচিতেছিল, সে যে আজ প্রথম নিজের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে, তাহাই ক্ষণে ক্ষণে অকারণে তাহার গণ্ডদেশ রক্তিমাভ করিয়া উঠিতেছে; খোলা জানালা দিয়া দিগ্বধূ তাহার চঞ্চল মুখপদ্ম দেখিয়া আনিতেছে। কনক একখানি চিঠির কাগজ নষ্ট করিয়া আর একটিতে জ্যোতির্ময়ের পত্রের উত্তর রচনা করিয়া ফেলিল। "আপনি নিজেকে খুব ছোট করে ফেলেছেন, এবং সেই অনুপাতে আমাকেও বড় করে তুলেছেন, অবশ্য দুইটিই আপনার হৃদয়ের মহত্বের পরিচায়ক কিন্তু শেষ দিকটা আমার বড় লজ্জা দিচ্ছে। আমি অতি নগণ্য জীব; আপনার সুমতি, সেই তাঁরই প্রয়োজনার হচ্ছে, আমি অজ্ঞান মূর্খ আমাকে এত বড় কর্তা, এ আপনার ভারি অন্যায়; আপনাকে ক্ষমা করবার কোনও দরকারও দেখছি না, কেননা আমি ত আপনার উপর অসন্তুষ্ট হইনি বরং আপনার চিত্তের দৃঢ়তা ও সততা আমাকে অনেক জিনিষ শিখিয়ে দিয়ে। বাবার কথা বলছিলেন, তাঁর কথা আর কি বলব; তবে যখন সত্য কথা তখন বলতে দোষই বা কি? তাঁর আচরণে আমি নিজেই অতি দুঃখিত। আপনিই বা কেন আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন, বরং বাবার এবং আমার নিজের ত্রুটির জন্তে আমি একশবার আপনার ক্ষমা চাচ্ছি—যে দুঃসময়ে আপনি আমাদের সহায় হয়েছিলেন, তা মনে কর্তে গেলে, আমি এই সমস্ত ভেবে আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছি—আপনি যে বই পড়তে চেয়েছেন, তা পাঠাচ্ছি, এটাও খুব উঁচুদরের বই। বোধ হয় আপনার ভাল লাগবে। আপনাকে চিরকালই বন্ধু বলে ভাব্‌ব আশা করি আপনিও সেই রকম মনে কর্বেন। ইতি—

কনক রায়

(১২)

প্রকৃত নিরপেক্ষ বিচারের চক্ষে দেখিতে গেলে পৃথিবীতে কাহাকেও দোষী বলিয়া ধরা যায় না, যে লোক অন্যকার্য্য হইয়াছে সে সহানুভূতির পাত্র, যে ব্যক্তি অদৃষ্টের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া কেবল হারিয়া যাইতেছে, অগ্রসর হওয়া ত দূরের কথা, দিন দিন পশ্চাদ্‌পদ হইতে দূরেই চলিয়াছে, তাহাকে আমরা করুণা করি, তাহার অনেকত্রুটি, অপরাধ আমরা মার্জনা করিয়া থাকি। তবে যে ব্যক্তি নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করে, উন্মীলিত সজ্ঞান চক্ষু লইয়া, স্ব ইচ্ছায় ধ্বংসের পথে আগাইয়া যায় তাহাকে ক্ষমা করা অনেকটা শক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে দেখিতে গেলে, এই হতভাগারাও পূর্বোক্তগণের ন্যায় আমাদের আন্তরিক করুণার পাত্র; তাহাদেরও এমন একটা কৈফিয়ত আছে, যেটা প্রথমে জানা, খুব শক্ত বটে, কিন্তু তাহা জানিলে আমরা আর কখনও সাধারণভাবে তাহাদের আচরণের শ্রেণীভুক্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। অদৃষ্ট শত শত অদৃশ্যহস্ত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছে, এই জগৎব্যাপী বিরাট অদৃশ্যজালের মধ্যে পড়িয়া, কত মানব আপনাদের স্বাভাবিক পথ হারিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে বসিয়াছে; পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণা অনেকস্থলেই দেখা যায় এবং যদি এই অবস্থা, ব্যক্তিগত চরিত্রের অনুযায়ী না হয় তাহা হইলে বিতৃষ্ণা ঘৃণায় পরিণত হয় এবং সেই মানব উদ্ধারের উপায়ের জন্ত অভিনব পথ অবলম্বন করে; এইটাকেই আমরা ধ্বংসের পথ বলিয়া থাকি। প্রতিবিধানের চেষ্টা অবশ্য বাতুলতা, জীবন-স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে বাসনা, সাহস নহে, দুঃসাহস; তবে কার্য্যতঃ কোনও প্রতিবিধান আমাদের ক্ষমতার অতীত হইলেও প্রাণের সহানুভূতি হইতে হতভাগ্যদের কেহই বা বঞ্চিত করি, পৃথিবীতে আমাদের সাধারণ দুঃখভার নিতান্ত অল্প নহে, তবে পরস্পরের প্রতি

সহানুভূতি করিয়া তাঁহাদের কষ্টলাঘব করাই আমাদের কর্ত্তব্য। জগতের এই সমস্ত জ্ঞানী ও দার্শনিকের চেষ্টা এই পথেই নিয়ত চলিতেছে। আর্দ্রসমাজে এই অনাবশ্যক নাই, কিন্তু সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় আছে।

এহেন হতভাগ্য মিঃ রায় মুর্ছা করিয়া শেষে আবার মনের মেশার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি যে একেবারে নিজের জীবন লইয়া চিন্তা করিতেন না, তাহা নহে; তবে যে পথ তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অন্য উপায় ছিল না, অন্য পথ অবলম্বন এখন দুরাশা। সকল জিনিষেরই অন্ততঃ দুইটি দিক আছে, তাঁহার জীবনেরও ছিল,—একটি মনের গ্লাস, আর একটি জীবনের ব্যর্থতা উপলব্ধি, দুই দিকই অন্ধকারময়, তাঁহার নিজের জীবনকে একান্ত আশাহীন বলিয়া মনে হইত এবং সেইজন্য তিনি আরও বেশী করিয়া মদ খাইতেন; এইরূপে ক্রমাগত, পেণ্ডুলামের ন্যায় তিনি কখনও হাতাশ ও কখনও হতাশ এই দুই ভাবের মধ্যে দোলা খাইতেন; এই গতির আর বিরাম ছিল না। ডাক্তারের সাবধান বাক্য তাঁহার নিকট এখন একেবারে অর্থহীন, পরিণাম বলিয়া যে কিছু আছে, এই কথা তাঁহার স্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত। কিন্তু অসুখের পূর্ব্বে যেমন একটানা নেশার স্রোতে তিনি নিরুদ্বেগে চলিতেন, সেটা তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও এখনও পারেন না, কারণ তাঁহার কন্যা কনকের উপস্থিতি। কনক নীরবে তাঁহার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকিত এবং মিঃ রায়ও তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কোনও উপায় দেখিতে পারিতেন না; অবশেষে হইত এই যে তিনি তাঁহার দুঃখের মূল এই কনকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকেই ব্যঙ্গ ও পরিহাস দ্বারা আঘাত করিতে চেষ্টিত হইতেন। কনক স্থির করিয়াছিল যে যতদিন না পিতা তাঁহার গৃহে আবার কন্যার আসন ফিরিয়া দেন, ততদিন সে অন্য সমস্ত অত্যাচারকে গ্রাহ্যই করিবে না এবং মিঃ রায় শত চেষ্টাতেও তাহার অবিচলিতভাব ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া আরও অধিক সুরাপান করিতেন। কনকও প্রয়োজনমত টাকা পাইত নির্ব্বিবাদে গৃহকর্ম্মে ও পড়াশুনায় লিপ্ত থাকিত।

এইভাবে পিতাপুত্রীর দিন কাটিতেছিল, এমন সময়ে মিঃ রায় তাঁহার কোনও বন্ধুর নিকট হইতে থিয়েটার দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ পত্র পাইলেন। তাঁহার বিলাত প্রত্যাগত বন্ধু কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং থিয়েটারে সেই রাত্রির জন্য একটি বক্স ভাড়া লইয়াছেন। মিঃ রায় কখনও কোনও নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন না, বিশেষতঃ যদি নিমন্ত্রণপত্র ইংরাজীতে লিখিত হয়। কনকও নিমন্ত্রণপত্রে যাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল, বিলাতফেরত বন্ধু সপরিবারেই যাইবেন। কিন্তু কনক কিছুতেই রাজী হইল না; মিঃ রায় অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া বিরক্তির সহিত বাহির হইয়া গেলেন। কনক জ্যোতির্ম্ময়ের তৃতীয় পত্রের উত্তর লিখিতে বসিল। এই চিঠি পড়া ও লেখার মধ্যে সে বেচারী নিজের প্রাণের অনেকটা অংশ বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল; সে এইজন্য কখনও নিজেকে বিন্দুমাত্র অপরাধী মনে করিত না; তাহার মনের স্বাধীনতাভাব এবং জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত অনুরাগ, তাহাকে এই বিষয়ে একেবারে নিষ্পাপ করিয়া দিয়াছিল।

* * * *

অভিনয় বেশ জমিয়া উঠিয়াছে; যিনি নায়িকার ভূমিকা করিতেছেন, তাঁহাকেই দর্শকবৃন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিতেছে; মুহুর্মুহু করতালি ও আনন্দধ্বনিতে অভিনয়গৃহ মুখরিত। বিলাতফেরত বন্ধু মুখের মোটা সিগার নাবাইয়া কহিলেন "অতি সুন্দর; বাংলা অভিনয় যে এমন হইতে পারে, আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতাম না; নায়িকা বিলেতের যে কোনও অভিনেত্রীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে; কতকগুলা কিন্তু একেবারে বাজে, অভিনয়ের কোনও ধারধারই নাই, কেবল পাঠ মুখস্থ করে আর বলে; যখন আর একজন, তার ভূমিকা করিতেছে, তখন সে মনে মনে নিজের ভূমিকা ঠিক তৈরী আছে কিনা দেখিতেছে।" বন্ধু একটু সাহিত্যিক বলিয়া গর্ব্ব রাখিতেন, মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে তাঁহার স্বহস্তে লিখিত Strand হইতে অনুবাদিত প্রবন্ধ বাহির হইত, সেইজন্য তিনি যথাসাধ্য নিজের চিন্তা

বন্ধুভাবায় প্রকাশ করিতে উৎসুক থাকিতেন। মিঃ রায় কোনও উত্তর দিলেন না, তাঁহার মন অন্য এক সুদূর রাজ্যে অবস্থান করিতেছে, বন্ধুবর্গের প্রতি তাঁহার স্থির দৃষ্টি আবদ্ধ; যখন রাত্রিকা প্রবেশ করিতেছে তখনই তাঁহার মন যেন অতীতের বিস্তৃত কাহিনীর মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছে; তাঁহার ভিতরে যে একটা তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা তাঁহার ললাটের স্ফীত শিরা, কুঞ্চিত চক্ষু ও কেশবিরল মস্তকের উপর সঘন অঙ্গুলি সঞ্চালন হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল। এই রমণীকে যেন তিনি চেনেন, কিন্তু কেমন করিয়া কোথা হইতে এবং কি সম্বন্ধে, তাহা স্মরণ করিতে তিনি সম্পূর্ণ অসমর্থ; তাঁহার স্মৃতিপটে কেবল একটি নষ্টপ্রায় ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে, তুলিকার রং এখনও ঠিক আছে কিন্তু লাইনগুলি সব অস্পষ্ট। অভিনয়ের অন্য কিছুতে তাঁহার আগ্রহ রহিল না, কেবল বিখ্যাত অভিনেত্রী গোলাপীর প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যে তাঁহার মন পড়িয়া রহিল। বন্ধুর দুই একটি কথার তিনি কোনও উত্তরই দিলেন না এবং পরিশেষে অভিনয় সমাপ্ত হইলে বন্ধু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন উপভোগ করলে?" তিনি শুধু বলিলেন, "যাক কি, আমার আজকাল আর এরকম হয় কোথায়?" বিচক্ষণ বন্ধু আর কথাটাকে ঘাঁটিলেন না; কখন যে মিঃ রায় তাঁহার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া, সাহায্য চাহিয়া বসেন এই আশঙ্কায় তিনি সন্ত্রস্ত এবং সেইজন্যই মিঃ রায়কে তাড়াতাড়ি "এখন বিদায়" বলিয়া, স্ত্রী, কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী সমভিব্যাহারে মোটরে উঠিলেন; মোটর রাজপথ চকিত, শঙ্কিত করিয়া রাত্রার মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মিঃ রায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলেন; তিনি যতই 'মনের ভুল' বলিয়া অভিনেত্রীর স্মৃতি ভুলিয়া দিতে চান ততই যেন সেই কথা তাঁহাকে উৎপীড়িত করিতেছে" কে এ রমণী, কোথায় ইহাকে দেখিয়াছি"—। বাড়ী ফিরিয়া চিন্তাস্রোতকে স্থগিত রাখিবার জন্য তিনি যথেচ্ছা মদ্যপান করিলেন, অবশেষে কেবল ক্লান্তিবশতঃই তিনি বিছানায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

সকালে নিদ্রা ভাঙ্গিলে মিঃ রায় দেখিলেন, যে রোগ আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে; মনে হইতেছে যেন তাঁহার মাথাটা এখনিই ছিঁড়িয়া পড়িবে; অনন্তকাল ধরিয়া যেন পড়িতেই থাকিবে, থামে কোনও বাধা নাই; মাথার ভিতর হইতে যেন সমস্ত জগৎ নড়িয়া গিয়াছে, এক বিরাট শূন্য কেবল হাহাকার করিতেছে; বুকের মধ্যেও আগুন জ্বলিতেছে, একদিনের সুস্থতা যেন একটা দুঃস্বপ্ন। গোলাপীর মুখ তাঁহার চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময়ে কনক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ রায় সমস্ত ব্যাপার জলের মত বুঝিয়া ফেলিলেন; সীমাহীন জটিল চিন্তার অবসান হইল। প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে যে রমণীকে, অপমান করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, সেই রমণী, তাঁহার স্ত্রীই যে এই বিখ্যাত অভিনেত্রী গোলাপী; জগৎটা নিশ্চয়ই খুব ছোট, না হইলে, যাহার পথ তাঁহার হইতে এত বিভিন্নমুখী, সে আবার কেমন করিয়া সশরীরে তাঁহার সম্মুখে আসিল। তিনি যখন বিলাত হইতে দেশে ফিরিলেন, তখন দেখিলেন যে তাঁহার অন্তর অতীতের প্রতি এক বিজাতীয় ঘৃণায় পূর্ণ, প্রথম প্রথম এই ভাব তাঁহার মনেই গোপন থাকিত কিন্তু ক্রমক্রমে তাঁহার স্ত্রীকে এইজন্য অশেষ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত। নির্য্যাতনের মাত্রা ক্রমশঃ এত বাড়িয়া উঠিল যে, যেদিন সুরাপানে পশুবৎ হইয়া মিঃ রায় কলিকাতার গভীর রজনীতে বেচারীকে প্রহার করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন, সেইদিন সেও স্বামী ও দেড় বছরের শিশুকন্যার মায়া কাটাইয়া, আর কখনও ফিরিবে না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে করিতে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল। মিঃ রায়ও 'আপদ গিয়াছে' বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং চারি বৎসর পরেই কনকের মোহিনী জীবন আরম্ভ হইল।—মিঃ রায় বিষণ্ণ নয়নে কনকের দিকে চাহিলেন; পুরাতন কথা মনে পড়িলেই, কেন জানি না, তাঁহার মন স্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হইত; তখন তিনি সাধারণ পিতার ন্যায় কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেন। আজ আবার তিনি অন্যমনস্ক

আর মৃত্যুর আশঙ্কা তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। কনক পিতার অবস্থা দেখিয়া, গতরাত্রের অত্যাচারের জন্য কোন অনুযোগই করিল না; অবশ্য ঘরে প্রবেশ করিতেই সেই অত্যাচারের মূক সাক্ষী টেবিলের উপর স্তূপ বোতল তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু পিতার সহিত তাহার সম্বন্ধও সাধারণ ধরণের নহে, সে বিশেষ দুঃখিত হইল না তবে পূর্ণ উদ্যমে তাঁহার সেবায় মনোযোগ হইল। ক্রমে মিঃ রায় একটু ভাল হইলেন, তাঁহার মনে এবার আশা হইল, কিন্তু ডাক্তার আসিয়া তাঁহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল— "attack is severe ভালত কিছুই দেখছি না"—। কনক কি ভাবিবে, ঠিক করিতে পারিল না, তবে তাহার সেবায় কোনই ত্রুটি হইল না। মিঃ রায় বিছানায় পড়িয়া সমস্ত অতীত জীবনের সহিত বোঝাপড়া করিতে লাগিলেন। মৃত্যু শিয়রে বসিয়া কোন এক অলক্ষ্য শক্তির ইঙ্গিত অপেক্ষা করিতে লাগিল :

ক্রমশঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবতা-প্রতিষ্ঠা

আজি ধৌত হ'য়ে যাক যত জীবনের
পাপ ধূলা, বাসনার হোক অবসান।
আজি শুভ্র হ'য়ে যাক যত জীবনের
মলিনতা ; পুণ্য প্রেমে পূর্ণ হক প্রাণ॥
হৃদয়ে উঠুক জ্বলি হোমের আগুন
উচ্চারিত হোক শত দেবস্তুতিগান।
কোন কামনার যেন গন্ধ নাহি রয়
প্রাণে আজি দেবতার হবে প্রতিষ্ঠান॥

শ্রীমতী রমলা বসু

গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান'

বলিদান একখানি সামাজিক করুণরসাত্মক নাটক। ইংরাজিতে ইহাকে Social tragedy বলা যাইতে পারে। একটা করুণ বেদনার সুর ইহার প্রত্যেক পাতায় পাতায় ফুটিয়া উঠে, একটা করুণ রাগিণীর মূর্চ্ছনা প্রত্যেক পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। Macbeth পাঠ করিতে করিতে Duncanএর হত্যায় পাঠক হৃদয়ে একটা যাতনার ভার বহন করে, Hamlet বা King Lear পড়িতে পড়িতেও সেইরূপ যাতনা হৃদয়ে অনুভব করিতে হয়, আর বলিদান পড়িবার বা অভিনয় দর্শন করিবার সময় সমাজের অত্যাচার, দেশের অত্যাচার পাঠক বা দর্শকের হৃদয়ে একটা বেদনার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। করুণ রসাত্মক নাটকের সমস্ত গুণই ইহাতে পরিস্ফুট। দুই একটা ঘুড়ার কথা, একটু দুঃখের কথা থাকিলেই তাহাকে করুণরসাত্মক নাটক বলা যায় না। ঐরূপ নাটক পাঠ করিতে করিতে পাঠককে অশ্রুপাত করিতেই হইবে, দর্শক যখন রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে তখনও তাহার হৃদয়বীণায় একটা ঝঙ্কার থাকিয়া থাকিয়া লাগিয়া উঠিবে। সেক্সপীয়র করুণরসাত্মক নাটকের অত বড় সৃষ্টিকর্ত্তা কেন? কারণ "His plays have the force of things upon the mind; what he represents is brought home to the bosom as a part of Experience implanted in the memory".

গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকখানিকে ঐরূপ-ভাবে সজ্জিত করিতে বিস্মৃত হন নাই। সমাজের প্রত্যেক অবস্থা, সমাজের ব্যবহার, অত্যাচার, অবস্থান্তর তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের ভিতর দিয়া বেশ সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। বেশ দক্ষতার সহিত নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহা খাঁটী, যাহা সত্য, যাহা বাঙ্গালার বুকের ভিতর নৈমিত্তিক ঘটনা তাহারই অবতারণা করিয়াছেন stage Effect বা দর্শকগণের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত কোনরূপ অসঙ্গত ব্যাপারের সৃষ্টি করেন নাই।

বলিদান নাটকখানি প্রথম ২৬শে চৈত্র ১৩১১ সাল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ইহাই ইহার বাহ্যিক তথ্য (External evidence) এবং ব্যতীত গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য কীর্ত্তির উল্লেখ ইহার আভ্যন্তরিক তথ্যের (internal evidence-এর) পরিচায়ক। বলিদান নাটকখানি কোনও পুস্তক হইতে গৃহীত হয় নাই। মৌলিকত্ব (originality) হিসাবে গিরিশচন্দ্র কাহারও নিকট ঋণী নহেন। যাহা সত্য তাহাই কবি চিত্রে ফুটাইয়াছেন, প্রাণহীন চিত্রে প্রাণের সাড়া আনিয়াছেন, নির্জ্জীবের মধ্যে সজীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। নাটকের উদ্দেশ্য যাহা তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। 'Dramatic poets more than any other artists reproduce the life of men around them'; exhibiting their aims, hopes, aspirations, passions in their various circumstances'. গিরিশচন্দ্রও ইহা করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। বাঙ্গালীর সমাজ; বাঙ্গালীর গৃহ, বাঙ্গালীর ঘরে ঘর ভাই-বোনকে লইয়া তাহা নাটকরূপ সমাজেরও সেই মূলের দর্পণের ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন।

ইংরাজী নাটকগুলির গুণ বিবেচিত হয় নাটকীয় একতা (dramatic union) রক্ষণে। কিন্তু সংস্কৃত বা বাঙ্গলা নাটকে ইহা প্রয়োজন নহে। তথাপি গিরিশচন্দ্র দুই একটী রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। সময়ের সমতা (unity of time) ঐ ক্ষেত্রে রক্ষা অসম্ভব, সুতরাং তিনি সচেষ্ট হন নাই। এবং সেক্সপীয়রের 'Tempest' বা Miltonএর Samson Agonistesএর মত অত সুন্দরভাবে স্থানের সমতা (unity of place) রক্ষা না করিলেও তিনি কিন্তু পরিবর্ত্তে উহা রক্ষা করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে

পরিস্ফুট করিয়াছেন 'কার্থেজ নগরকে Marloweএর Jamberlane বা Fanteseএর প্রধান উদ্দেশ্য যেমন সাম্রাজ্য ও ক্ষমতার প্রভাব দেখান বলিদানেরও প্রধান উদ্দেশ্য বিবাহে পণ প্রথার কুফল বর্ণনা করা। এই প্রধান উদ্দেশ্যটী Arthurএর মত মধ্যে উপবিষ্ট আর তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী Arthurএর Tableএ উপবিষ্ট।

কেহ কেহ বলিদানখানিকে Occasional নাটক বলেন কিন্তু ইহা ঠিক Occasional নাটক নহে। যে নাটক কোনও একটী ঘটনাবলম্বনে রচিত হয় তাহাকেই Occasional নাটক বলা হয়। Miltonএর Comus কিম্বা গিরিশচন্দ্রের 'হীরকচূর্ণিলি' উভয়ে occasional হইতে পারে কিন্তু বলিদানখানি ঠিক occasional নহে "An occasional drama depends for success on its occasional and away from its occasion its dramatic fine-s cannot be judged'. মিলটনের Comus কিম্বা গিরিশচন্দ্রের হীরকচূর্ণিলি' এ সময়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলে তাহা আর দর্শকের হৃদয়ে তৃপ্তি প্রদান করিতে সমর্থ হইবে না কারণ যে ঘটনাবলম্বনে উহার রচিত হইয়াছিল সেই ঘটনা বহু অতীত হইয়া গিয়াছে। বলিদান যদি occasional হয় তাহা হইলে ইহার আদর বর্ত্তমান সময়ে পরিলক্ষিত হওয়া অনুচিত। কিন্তু ইহা যদি আজ আবার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় তাহা হইলে দর্শকবৃন্দ কখনই না দেখিয়া না কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিবে না। এবং occasional নাটকের প্রথানুযায়ী দর্শকবৃন্দকে আর তাঁহাদের মানসনেত্রে যে ঘটনাবলম্বনে ইহা রচিত হইয়াছিল তাহার সন্ধান করিতে হইবে না। ইহা একটী সামাজিক অবস্থার আলেখ্যের বর্ণনা। যাহা বাঙ্গলার কথা, যে ব্যাপার আজও বাঙ্গলার ঘরে ঘরে নিত্য ঘটিতেছে, যে যন্ত্রণায় আজ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে হাহাকার প্রতিধ্বনিত, যে আর্ত্তনাদে, যে যাতনায়, যে প্রলয়ের হুঙ্কারে নারী সচকিতা, কত পিতা, কত মাতা, কত ভ্রাতা ব্যথিত, যে অগ্নিশিখা তাহার অঙ্গস্পর্শ দিয়া দগ্ধ করিয়া বাঙ্গালী-সমাজে প্রজ্বলিত যে ঘুণকাষ্ঠে কত শত অবলা নারী তাহাদের মস্তক পাতিয়া দিয়াছে বলিদান নাটকখানি সেই অবলা নারীর হাহাধ্বনি, সেই হাহারবের, সেই হৃদয় বিদারক ধ্বনির প্রতিধ্বনি। সবই নাটকগুলি একটী একটী উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হয়। কোনটী রাজনৈতিক, কোনটী সামাজিক, কোনটী ঐতিহাসিক, কোনটী পৌরাণিক প্রসঙ্গের আলোচনায় নিয়োজিত এবং সেই সমস্ত নাটক বা উপন্যাসের ভিতর দিয়া গ্রন্থকার শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলিয়া দেন। সকল সাহিত্যে ইহা প্রচলিত। যেমন ইংলণ্ডে জয় ও ধনের আকাঙ্ক্ষা বেশী তখন Morloweএর Jamberlane এবং Jew of Maltaর সৃষ্টি যখন কঠোর হৃদয়হীনতার প্রভাব ইংলণ্ডে প্রবল তখন Diction তাহার রচিত উপন্যাসের ভিতর একটী করিয়া কঠোর হৃদয় পুরুষের সৃষ্টি করিলেন এবং মানবকে ধর্ম্মের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই রুশিয়ার ঋষি Tolstonএর গল্পের সৃষ্টি। আবার বাঙ্গালার নীলকর বিষধর-দংশকাতর প্রজাসকলের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া দীনবন্ধুবাবু নীলদর্পণ রচনা করিলেন, সমাজের অবস্থা দেখিয়া অমৃতলাল বিবাহ-বিভ্রাট প্রভৃতি প্রহসনের সৃষ্টি করেন এবং কৃপণতার আঘাত যাদব চক্রবর্ত্তীর সৃষ্টি কৃপণের পৃষ্ঠে তীব্র কশাঘাতের জন্য। বলিদানও যথেষ্ট পরিমাণে সমাজকে শিক্ষা দিয়া থাকে। বলিদান লিখিবার উদ্দেশ্য পণ-প্রথা নিবারণ। আধুনিক প্রহসন 'ছবির বাজারের' যে উদ্দেশ্য বলিদানের উদ্দেশ্যও তাহাই। যখন প্রত্যেকের ঘরে ঘরে সেই 'প্রথা প্রচলিত আর কত লোক সে প্রথার চাপে পড়িয়া পেষিত হইতেছিল অমনই বলিদানের সৃষ্টি। বাঙ্গালী পণ-প্রথারূপ ঘুণকাষ্ঠে বিবাহবেদিতে কেমন করিয়া আজ বলিদান, নিজের কন্যার বলিদান স্ত্রীর বলিদান এবং পুত্রের বলিদান লয় তাহাই অবলম্বন করিয়া বলিদান রচিত। তিনি বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন বাঙ্গালার কন্যা সন্তান নহে—বলিদান। আরও গ্রন্থকারের আনুষঙ্গিক শিক্ষার বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত আছে—যেমন বাঙ্গালার বক্তার "Do what I say but don't do what I do" কুশিক্ষা বা কুফলের ফল এবং অন্ধবিশ্বাস যে কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা যোগিতের চরিত্রের ভিতর দিয়া ফুটাইয়াছেন। বলিদান নাটকখানি সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক। ইহার ঘটনা বহু চরিত্রগুলির উপর কোনরূপ অস্বাভাবিকতার

হারা নাই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীসমাজে রমার চরিত্রটী যেমন একটু অস্বাভাবিক রকমের বোধ হয়, কিম্বা দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস নাটক সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নামের উপর দিয়া তরবারি ঘুরানও স্বাভাবিক নহে কিম্বা 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে দিবাকরের সহিত কিরণময়ীর প্রেমালাপ বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয় বলিদান নাটকখানিতে এমন একটিও ঘটনা বা চরিত্র নাই যাহা অস্বাভাবিক। একজন বাঙ্গালী গৃহস্থ অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দিতে বিশেষ কষ্ট পাইয়া অবশেষে গলায় ছুরি দিয়া মরিল এবং তাহার অবিবাহা কন্যা বিধবা হইয়া সতীন-পুত্রদিগের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া পিতামাতার কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিবার আশায় জলে ডুবিয়া মরিল। ইহার বাঙ্গলার ঘরের কথা। আজ-কালকার হিসাবে স্বাভাবিকতার সীমা একটু ছাড়িয়া যায় জলে ডুবিয়া বা গলায় ছুরি দিয়া মরার কারণ কেরোসিন তৈল ঐরূপ আত্মহত্যার পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়াছে আর অজ্ঞান বেতাসক্ত স্বামীর স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার, কিম্বা স্ত্রীর স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও পূজা কিম্বা অস্বাভাবিক আদরে প্রতিপালিত পুত্রের আবার রক্ষা বা বয়ের পিতার বয়স্থ হিসাবে অধিকারী কিম্বা উচ্চ ও সংশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক কিশোরের স্বার্থত্যাগের মধ্যে কোনরূপ অস্বাভাবিকতা নাই। বাঙ্গলার বাঙ্গালীর নিখুঁত ছবি বলিলাম। বাঙ্গালী তাহার কন্যাকে ফাঁসের মত ঘুণকাঠে বলি দিতেছে ইহারই প্রতিধ্বনি বলিদান। যে পণ প্রথা বাঙ্গলার জলে, বাঙ্গলার স্থলে, বাঙ্গলার মাটীতে, বাঙ্গলার বায়ুতে, বাঙ্গলার অণুতে অণুতে মিশিয়া গিয়াছে, যাহা বাঙ্গালীর রক্তমাংসগত সামগ্রীরূপে পরিণত হইয়াছে, যে কুপ্রথার বাঙ্গলার দেবদেবতা বাঙ্গলার সমাজকে শিক্ষা দিবার জন্য আত্মবলিদান দ্বারা দরিদ্র পিতাকে বলিদানের কলঙ্কসাগরের মত ভীষণ প্রাণসংহার হইতে রক্ষা করিয়া একটা মহীয়সী কার্য্যের অবতারণা করিল সেই পণপ্রথার উচ্ছেদসাধনের উদ্দেশ্যেই বলিদান যাহা স্বাভাবিক, তাহা সত্য তাহার চিত্রই বলিদানে আছে। একটী মহীয়ান হৃদয়, অসামান্য চারুত্বশীলতা বাঙ্গালী—শোকে ক্ষয়—অর্থাভাবে ক্লিষ্ট—ভাবনায় জর্জ্জরিত—কন্যাদায়ে বিব্রত—সে সমাজ ভয়ে ভীত—বাঙ্গালীর চিত্রে কিছুই অস্বাভাবিকতা থাকিতে পারে না এবং ইহাতেও তাহা নাই।

জগদ্বিখ্যাত সমালোচক Mathew Arnold বলেন 'Literature is a criticism of life', নাটকখানিকে সুন্দর করিতে হইলে সমস্ত আদর্শগুলিকে অঙ্কিত করিতে হইবে। * শুধু আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। কাব্যের সৌন্দর্য্যের প্রতি নাটকীয় গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখাও বিশেষ প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্র শুধু আদর্শ লইয়াই অবতীর্ণ হন নাই—যথেষ্ট পরিমাণেই নাটকের গুণাবলী বজায় রাখিয়াছেন। করুণাময়, ধনঞ্জয়, মোহিতমোহন, রূপচাঁদ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভিন্ন ঘটনাবলী কেমন দক্ষতার সহিত সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ নাটককার সেক্সপীয়রের Merchant of Veniceএর বিচিত্র ঘটনাসন্নিবেশের রক্ত কেমন সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোনও দৃশ্যই বাদ দেওয়া যায় না। তিনি Senecaএর আদর্শে নাটকখানিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন সমাজের শোচনীয় অবস্থা দেখাইয়া—আত্মহত্যার বীভৎস লীলার প্রকটন করিয়া দর্শকবৃন্দের মনে একটা ভয়, আতঙ্ক ও ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করিয়াছেন বিভিন্ন। গিরিশচন্দ্রের ক্ষমতা অসীম। তিনি জগতের সমস্ত চরিত্রই ভালরূপে দেখিয়াছেন সেক্সপীয়রের মত জগতের ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার লোকের সহিত মিশিয়া চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। Chancer তাঁহার Canterbury Tales যেরূপ উচ্চ হইতে নীচ কোনও রূপ চরিত্র সৃষ্টি করিতে বিরত হন নাই, গিরিশচন্দ্রও সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার চরিত্রেরই সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎকালীন সমাজের সহিত আপনাকে ওতপ্রোতভাবে অঙ্কিত না করিলে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটকের সৃষ্টি হইত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্ত্তমান। অভিজ্ঞান শকুন্তলা

* বলিদানও সম্যক্‌প্রকারে এ বাক্যের যাথার্থ্য প্রদর্শন করিয়া থাকে।

পড়িলেও ইহা বুঝিতে পারা যায়। কণ্ব, দার্ঙ্গরব, শারদ্বত, কঞ্চুকী, দুষ্মন্ত, সহচরদ্বয়, প্রতিহারী, রাজপুরোহিত, ধীবর, প্রহরী এই কয়েকখানি চিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্যচরিত্রের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত কালিদাসের আয়ত্ত। শিশিরবাবুর বর্ণনায় কি ছোট কি বড়, কি উচ্চ কি নীচ সকলশ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি একজন দক্ষ চিত্রকর, আকৃতির, ব্যক্তির, ভঙ্গীর বিশেষত্বে ব্যক্তিত্ব ফুটাইতে আরম্ভ করিয়া মনোভাবটুকুর এমন কি পারিপার্শ্বিক ছবিও কেমন নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। সম্প্রতি 'পরিণীতার' গুরুচরণের মনের মতো যে জড়, যে কুপাত্র উদ্ভিয়াছে তিনি কত নিখুঁতভাবে পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছেন। শিশিরবাবুর অনীম ক্ষমতা পাইয়া বসিয়াছিলেন তাঁহার কল্পনা, তাঁহার কল্পনা, লিখিবার ভঙ্গিমা বলিবার যথেষ্ট পাওয়া যায়। বলিবার পড়িতে পড়িতে সেক্সপীয়রের মত তাঁহাকেও বলিতে ইচ্ছা হয়—

"His pencil like the dyer's hand was subdued to what it worked on."

শ্রীশিবরত্ন মণ্ডল

"ভীরু"

প্রায় বছর পনেরো আগে ঠাকুরাণী আমাদের গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। পতীর ব্রাহ্মণবিধবা, আমাদের গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত বনের সহিত কাশী হইতে আসেন ও সেই অবধি আমাদের গ্রামেই বসবাস করিতেছেন—ইহার অধিক তাঁহার সম্বন্ধে কেহই কিছু জানিত না; কিন্তু গ্রামের সকলেই তাঁহার বিশেষ অনুগত ও বাধ্য ছিল আর তাহা তাঁহার পরোপকারী তেজস্বী স্বভাবের জন্যই। সকলেরি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। যেখানেই দুঃখী, যেখানেই আর্ত্ত, সেইখানেই তিনি তাঁহার অযাচিত করুণার ডালি লইয়া উপস্থিত হইতেন। আর কেহ যদি তাঁহার সেবায় ত্রুটি করিয়া তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিত তাহলে তাহাকে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দেখিতে পারিত। "মা" ডাকে বিমুখ হইতে এমন আর কাহাকেও দেখি নাই কখন।

গত বৎসর গরমকালের আরম্ভে একদিন হয়, অধিকাংশ লোকের যেমন হইয়া থাকে; দেখিতে দেখিতে অগ্নি তাহার লোল জিহ্বা বাহির করিয়া গৃহস্থের সর্ব্বস্ব গ্রাসে মত্ত হইল। যে যাহা পারিল বাঁচাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু অগ্নি আর লোকেরই প্রয়াস সার্থক হইল না। এমন সময় নীলু গয়লার স্ত্রী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল "আমার ছাওয়ালটা কৈ? তাকে তোরা কেউ দেখেছিস্ কি? সে যে ঐ ঘরের ভিতরে ঘুমোচ্ছিল।" অগ্নি তখন সে গৃহের উপর সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; সে হিংস্রক মূর্ত্তির সম্মুখে সাহস করিয়া কে যাইবে? মুরুব্বিরা পরস্পরের মুখের দিকে বিহ্বলনেত্রে তাকাইয়া রহিল, একটা অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস হইল না। নীলুর স্ত্রী পাগলের মত হইয়া সেই অগ্নিমুখে ঝাঁপ দিতে গেল, কেহ কেহ আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল "আমার যা বলতে আর কেউ রইল নারে"—বলিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। সেই ঠাকুরাণী একদৃষ্টে চুপ করিয়া সিমুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, হঠাৎ কেহ বাধা দিবার আগেই—অগ্নি নিবাইবার জন্য যে

জল আনা হইয়াছিল তাহা হইতে এক কলস জল নিজের অঙ্গে ঢালিয়া সেই জলসহ মূর্চ্ছিতা ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কাহারও মুখে একটী কথাও ফুটিল না। কেহ আশা করিল না যে জয়া ঠাকুরাণীকে আর জীবন্তে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।' এমন সময় সকলে দেখিল, তিনি আপন সিক্ত অঞ্চলে শিশুটীকে ভাল করিয়া ঢাকিয়া দ্রুত আঙ্গনের ঘরে দিয়া চলিয়া যাইতেছেন; তাঁহার মাথার চুলগুলি অগ্নিমুখীর শেষশয্যার মত দেখাইতেছে। তিনি মূর্চ্ছিতা মাতার পার্শ্বে শিশুটীকে শোয়াইয়া দিয়া ক্লান্তি ও উত্তেজনা বশতঃ নিজেও জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া গৃহে লইয়া গেল। দেখা গেল হাসপাতাল বেশ অক্ষত অবস্থাতেই আছে, কিন্তু জয়াদেবীর সমস্ত চুল পুড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার সে সোণার বর্ণ আগুনে ঝলসিয়া একেবারে কালী-পানা হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বেশী কিছু ভরসা দিলেন না। পরমযত্নে তাঁহার সেবা চলিতে লাগিল; সকলেই তাঁহার সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত আর সকলেরি মুখে এক কথা "কি অসীম সাহস—কি অসীম সাহস।"

দুদিন অজ্ঞান থাকার পর যখন তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইল তখন আমি বসিয়া তাঁহার শিয়রে পাখার বাতাস দিতেছিলাম তাঁহাকে চক্ষু চাহিতে দেখিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া আনন্দ গদগদকণ্ঠে আমি বলিলাম "মা, আশীর্ব্বাদ করুন আপনার মত অমনি সাহসী অমনি নির্ভীক, হ'তে পারি।" দুই ফোঁটা শুষ্ক অশ্রু তাঁহার রক্ত কপোল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল—আমার হাতখানি নিজের ক্ষীণ হস্ত আনিয়া চিবুক টানিয়া লইয়া বলিলেন "বাছা আমাকে একথা বলিলনে, আমার চেয়ে বেশী ভীরু কেউ আর এ জগতে নেই। আজও আমার বেশীদিন বাঁচিবার আশা—নেই—এখন আমি আপনার ভয়ের অতীত হ'তে চলাম, তাই যাবার আগে আমার ইতিহাসটা তোকে বলে যাব।" বলিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার জীবন-কাহিনী আরম্ভ করিলেন। বাল্যবন্ধুর কাছে অভিজ্ঞাপের মত দেখে এসেছিলাম। কথা লোক মুখ চোখাচোখি করে বসত, তাই আমি সজোরে তাকে অস্বীকার করে আসতাম, একদিনের জন্যেও তাকে আমার কাছে থাকার করিনি; সে যখন সব লজ্জা সব অভিমান টুকু মুছিয়ে দিয়ে চলে গেল, তখনি শুধু চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল—সে আমার—সে আমার অতি আপনার আমার রক্ত মাংস, আমার বুকের পাঁজর দিয়ে তৈরী, কিন্তু তখন সে ইহজগতের,সুখদুঃখের, সমস্ত সম্পর্কের অনেক দূরে। বছরার সে ছোটবেলায় তার নরম দুটী বাহু দিয়ে আমার গলা ধরে "মা" বলে ডাকতে যেত, তখনি তাকে বুকে উঠেছি—মা নয় দাসী, এ সত্যটুকু টুকু পাছে লোকে তার আর এই রাক্ষুসীর মধ্যে কোন সম্বন্ধ দেখতে পায় এই ভয়ে। সে তার সজল দুটী চোখ তুলে আমার মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করত "আমার কি তবে মা নেই?" আমি বলতাম 'না', কিন্তু কুধিত পিপাসিত প্রাণ আমার সেই মা ডাক শুনবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠত; কিন্তু জগতের সামনে সাহস করে ঐ সম্বন্ধটুকু তার সঙ্গে স্বীকার করবার বল আমার ছিল না, এমনি ভীরু আমি। এমনি ভীরু আমি!! ওরে তাই আজ কেউ আমায় মা ডাকে তাকলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনু আমার আপনি নত হয়ে আসে। সে অনেক কথা, সবাই জানে আমি বাল-বিধবা। আমার শ্বশুরবাড়ী ছিল——জিলার একটীন ছোট সহরে; সেখানে আমার শ্বশুর বেশ সচ্ছল অবস্থার লোক ছিলেন। পোড়া বিধাতা আমার কপাল যেমনি মন্দ কিন্তু রূপ দিয়েছিলেন অনেক, সেই রূপে মুগ্ধ হয়ে স্বামী, আমায় নিতান্ত দরিদ্রের ঘর থেকে তুলে আনেন। বাপের বাড়ীতে আমার এক বৃদ্ধ সম্পর্কীয় খুড়ো ও পিসী ছাড়া কেউ ছিল না—তাও আমার অনেক দূরে। আমার স্বামী ছিলেন তাঁদের বংশে একটি। আমার বয়স যখন বছর পনের ষোল তখন তাঁর কাল হল; তার আগে শ্বশুরেরও স্বর্গলাভ হয়। বাপের দিকেও আপনার বলতে কেউ নেই, কাজেই ভাসুরেরা হলেন আমার অভিভাবক। স্বামীর মৃত্যুর কিছু দিন পরেই আমার অংশের জমিদারীর উপস্বত্বগুলি, শ্বশুর আমার করে অনেক গহনা দিয়েছিলেন, সেগুলি, এমনকি আমার স্বামীর বড়ি পর্য্যন্ত চেয়ে, পাঠালেন; ও

একএক করে পাশ: ছুর্নী আলমারী সবই অদৃশ্য হতে লাগল। শুধু মাসিক পাঁচ টাকা তাঁরা যেন দয়া করে আমার বরাদ্দ করে দিলেন, নিতান্ত অনুগৃহীতের মত তাঁদের ঘরে আমার দিন কাটতে লাগল। দাসী চাকরাণীর অধম হয়ে সারাদিন খাটলুম শুধু তাদের মন পেতাম না, গঞ্জনাই ছিল আমার সব পরিশ্রমের উপহার, নীরবে সবি সহ্য করে যেতাম, ভাবতাম বিধাতা যদি আমার অদৃষ্টই ভেঙে দিয়েছেন, তবে এসব তার কাছে কোন ছার। কিন্তু মন কি তা সব সময় মানত? মায়েরা যখন আমারি গায়ের সঙ্গীগুলি সঙ্গে গ্রামের পুজো-পার্বণ ইত্যাদিতে আমোদ করে বেড়াত তখন মনের দুঃখে অনেক সময়ই কেঁদেছি। হায়! তখন বয়েসই বা আমার কি, মাত্র ষোল বছর, যৌবনের সব রক্ত শিরায় শিরায় চলেছে; না একটা তেমন অবলম্বন আছে যা নিয়ে জীবন কাটাই, না তেমন শিক্ষা কি দীক্ষা। সমাজ আমাদের মত বাল-বিধবাদের জন্যে কিছু রাখেনি, শুধু আত্মীয় কিম্বা পরের উপর নির্ভর করে কোন রকমে দিন কাটান ভিন্ন। সেই সময় যদি প্রলোভনে পড়ে শিক্ষার অভাবে কারো পদস্খলন হয়, তবে সে সেই হতভাগিনীর দোষ না সমাজের দোষ? আর পুরুষদের জন্যে সহজ ব্যবস্থা—তারা হাজার দোষ করলেও সমাজ তা সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে রাজী। বন্ধুরা, আমার এই দুঃখের কাহিনী শুনে তুমি ও আর পাঁচটা যুবক মিলে—ভাবলে তোমরাই সমাজের আশার স্থল, এই সব দুঃখিনী বাল বিধবাদের একটা ব্যবস্থা কর। যার তাদের ভাল করে শিক্ষার বন্দোবস্ত করে দে—যাতে তারা মানুষ হ'য়ে নিজেকে রক্ষা করতে, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে শিখতে পারে—না হয় আমি যদি তাদের বিয়ে দিয়ে দে।—কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে আজীবন কাটানর অসহ্য যন্ত্রণার চেয়ে বিধবার বিয়ে শতগুণে ভাল। যাক, এখন আমার কাহিনীটা শেষ করি—অবশ্য কথা বলবার শক্তি আর থাকবে না। আমারও এ অবস্থা একরকম সয়ে যেত, যার মুক্তি? কিন্তু বিধবা আমার ঘর করে ঘরে ফিরছে—যদি না প্রলোভন তার নিত্য নূতন রূপ ধরে আমাকে পঙ্কের দিকে টেনে নিয়ে যেত। তারপর তীর্থ ভ্রমণের অছিলা করে বেড়িয়ে পড়লাম। কয়েক বছর এদিক ওদিক ঘুরে যখন ফিরলাম তখন সে চার বছরের বালক। নিজের দোষে স্বামীর হারিয়ে তখন শ্বশুরের ওপর আমার ভারী লোভ। কলঙ্ককে লোকের মত ভয় করতে লাগলাম। যেমন করে হোক নিজের এ কালীকে ঢেকে রাখতে হবে, সেজন্যে যদি নিজের স্বাভাবিক কোমল বৃত্তিগুলি একেবারে উপড়ে করে ফেলি, ক্ষতি নেই। ফিরে, এসে বল্লাম আমি বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম, সেখানে দূর সম্পর্কের বোন যারা হাওড়াতে তার ছেলেকে বিয়ে দিয়েছি। কেউ কেউ তার মুখে ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলত "দূর সম্পর্কের বোন-পো ও মাসীতে এত আদর খুব কাজেই হবে বোধ হয়?" কেউ কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে দুফোটা চোখের জল ফেলে বলত "তা যাহা বেশ হয়েছে,—তোমার যে তারা কপাল ছোট বৌ—আপনার বলতে বুকে মেরার কেউ নেই—তা যা'হোক এই কুঁড়েটুকু জুড়িয়ে গেছে, ভাল করে রাখ। এবার এসে আমি ওদের ওখানে না উঠে আমার ভাগের বাড়ীটের একখানা ঘর দাবী করে একটু জায়গা বেরাল দিয়ে ঘিরে উনুনের মত করে—দুজনে এসে উঠলাম। মাসিক পাঁচ টাকা তখনো বরাদ্দ আর ঘিয়ে করে স্বচ্ছে চলতে লাগল। এমন সময় একজন সব ডেপুটী সেখানে বদলী হয়ে এলেন। তার স্ত্রী মন্তুকে দেখে প্রথম থেকে বড় ভালবেসে ফেলেন—কারণ কিছুদিন আগেই তিনি ঐ বয়সী একটী ছেলে হারিয়ে ছিলেন। বছর দিনেক পরে বদলী হবার সময় তিনি এসে আমার কাছে বল্লেন "দিদি, তোমার মন্তুকে আমার কাছে দাও না কেন? আমি ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলব। আমার সন্তু থাকলে ঠিক এত বড়টী হোত।" আমি ত বেঁচে গেলাম—ওদের দূর করতে পারলেই যেন আমি বাঁচি—কারণ মন্তুই সে বড় হয়ে উঠছিল, তখনই চারিদিকে কাণাঘুষা হতে আরম্ভ হল তখন তাকে দূরে পাঠাতে পারলেই আমি যেন বাঁচি, ধরা পড়বার ভয় থাকে না তা'হলে আর। কলঙ্কের ভয় যেন আমার অন্তর্নিহিত সমস্ত মাতৃত্বেহ-টুকু শুকিয়ে ফেলছিল। কি ভীষণ! কি কঠিন প্রাণ আমার!

যেমন সে অভিশপ্তের মত এসেছিল তেমনি পোড়া কপাল নিয়েও এসেছিল। অত আদর, অত সুখ তার কপালে সহ্য হল না। দু তিন বৎসর যেতে না যেতে তেপুটী বাবুর স্ত্রী মারা গেলেন। তিনি আবার বিয়ে করলেন। প্রথম স্ত্রীটি তাঁর যেমনি বাটীর মানুষ ছিলেন—দ্বিতীয়টী ঠিক তার বিপরীত প্রকৃতির হলেন, আর বরু প্রথম থেকেই তার বিষ নজরে পড়ে গেল। সেই থেকে তার অশেষ নির্য্যাতন আরম্ভ হল। তেপুটীবাবু তাকে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না কারণ তার মৃতস্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ছিলেন যে তাকে মানুষ করে দেবেন। আমি হতভাগী সব জেনে শুনে ও ভয়ে চোখ কাণ বুজে রইলাম, সহজে তাকে কাছে আনলাম না।

দেখতে দেখতে পূজার ছুটীর সময় বড় কাছাকাছি এসে তাকে একবার আনলাম। একদিন সে স্নান করে একখানা কাপড় আসি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে এমন সময় আমি পিছন দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি আমার ছায়া সেই আসিতে পড়েছে। পাশাপাশি দুখানি মুখে দেখি কি সাদৃশ্য একি মুখ, একি নাক, একি কুঞ্চিত টান, ঠোঁটের ভঙ্গিমা, আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সেইদিনই আবার ঘাটে জল আনতে গিয়ে শুনলাম দুজন মেয়ে আমাদের বাড়ীরই কিসফিস্ করছে, আমাকে দেখে একটু বাঁকা হাসি হেসে চুপ করে গেল। শুনেই আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল আর না, ঢের সাধা হয়েছে—কালই আপদ বিদায় করতে হবে। এবার বুঝি সব মাটী হয়, কেন তার কাঁদা কাটীতে ভুলে খাল কেটে কুমীর আনলাম। ঘরে ফিরে এসে দেখি সে খানিকটা বেলের আঠা ও খবরের কাগজ দিয়ে খুঁড়ী তৈয়ার করছে, দেখেই তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলাম এই রকম করে সময় নষ্ট করার জন্যই বুঝি বাড়ী আসা হয়েছে? বলি ও নবাবের পো, একজামিনটা কি খুড়ী উড়েই পাশ কর্বে? সে আমার কণ্ঠস্বর শুনে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল—ইদানীং সে আমাকে রীতিমত ভয় করতে আরম্ভ করেছিল, কারণ অকারণে তাকে আমি সর্ব্বদা অনেক কঠোর কথা শুনাতে আরম্ভ করেছিলাম—"আমিত সারা সকাল পড়েছি মাসীমা এই একটু খেলতে আরম্ভ করেছি।"

"সারা সকাল পড়লেই হল শুনু—পার সারাদিন রাতে নই? কালই তোকে ফিরিয়ে পাঠাব।" বেচারীর মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল "মাসীমা তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আলো ক'টা দিন থাকতে দাও। কাল থেকে আমি খুব পড়ব। সেখানে "ভাল-বা" ঘরে যাবার পর বড় আই আছি, ছোটমিন্সী আমায় দেখতে পারে না, ভাল করে খেতেও দেয় না। এখানের চারবেলা পেটভরে খেতে পাই, সেখানে আধ পেটায় থাকতে হয়, আর দুনির মা সমস্তক্ষণ কথা শোনায় 'তোর মাসীর জমীদারী এখানে যারা আছে যে তোকে এখানে ফেলে রেখেছে? এতো শীগ্‌গীর ফিরে গেলে রাগ করবে।" তার কথা শুনে আমার চোখ ফেটে জল আসতে লাগল কিন্তু নিজেকে যথাসাধ্য শক্ত করে নিয়ে বল্লাম "সেসব কিছু আমি জানিনে, কালকেই তোকে যেতে হবে।" দুটী চোখ ছল ছল করে সে চিত্তরে চলে গেল। তার পরদিনই তাকে রওনা করে দিলাম। সারা সকাল যে চুপটী করে বসে রইল—যাবার সময় প্রণাম করতে গিয়ে "মাসি গো" বলে কেঁদে আকুল "মাসি গো আবার আর বুঝি দেখে আসবে না?" আমি গুরুকণ্ঠে গুরুকে তাকে বিদায় দিলাম। সে যখন দৃষ্টিপথের অতীত হয়ে গেল তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, আর ধরা পড়বার ভয় নেই রে। তার পর ঘরে ফিরে এসে দেখি মেঝের উপর এক কোণে তার অর্দ্ধ সমাপ্ত পুতুলখানা পড়ে রয়েছে। তখন আর রুদ্ধ অশ্রু বাধা মানল না, মাটীর উপর লুটিয়ে পড়ে সেই পুতুলখানাকে বুকে নিয়ে কান্নার বেগে ভাসিয়ে দিলাম আর চুমনের পর চুমনে ভরিয়া দিলাম। আর তাকে কিছু না বলে না আদরে না আশীর্ব্বাদে বিদায় দিয়েছি! এতদিন যেন মনটাকে শক্ত করে গড়ে তুলে ছিলাম কিন্তু এবার ছুটীতে এসে সে সব সৌধখানা ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছিল। বারে বারেই বাঁধ ভেঙ্গে রুদ্ধ অশ্রু উথলিয়া উঠত।

সে যাবার দিনপনের পরে, আমি বিরক্তিত সন্ধ্যা প্রদীপ ফেলে তুলসী তলায় প্রণাম করতে যাচ্ছি, এমন সময় বাহিরে কে হাঁকিল "টেলিগ্রাম মা ঠাকরান" টেলিগ্রাম আবার কার? বুকের মধ্যে হঠাৎ ধড়াস করে উঠল, আমি অনেক

করে নিজেকে সামলে নিয়ে, টলতে টলতে গিয়ে তার হাত থেকে সেই দুধ দুধের সঙ্কেপাত্রটা নিলাম। তারপর মনে মনে ইষ্ট দেবতার নাম নিয়ে নিয়ে পাশের বাড়ীর দাদের কাছে গেলাম। সে আমাকে দেখে বলে উঠল "এই যাদুর পুতীকে। তোমাকে দেখলে মনে হয় শ্মশানঘাট থেকে উঠে এসেছ—হয়েছে কি?" আমি কম্পিতহস্তে খাবারটা তার হাতে দিলাম, সে আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে বলে "হাবপুর থেকে এসেছে—মরল নাকি আবার ব্যারাম—তোমাকে দেখতে চেয়েছে।" সে রাত যে আমার কি করে কাটল বলতে পারি না, তার পরদিনই ঘরে তালা লাগিয়ে হাবপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। সেখানে গিয়ে দেখি মাছা আমার সোনাস্তরের একখানা একটা নীচু ঘরে শুয়ে পড়ে আছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা যেন আগুন। সন্ধ্যার সময় ডাক্তারবাবু দেখতে এলেন, আমায় দেখে বল্লেন "আপনি কি ওর কেউ হন?" তখনও লোড়া ভয় আমার কণ্ঠরোধ করে রইল, আমি আস্তে আস্তে ঘোমটা টেনে বল্লাম "সম্পর্কে মাসী"। "তা যা হোক আপনি আসাতে আশা করছি সেবাটা হবে ভাল। দেখছেন ত ঘরের অবস্থা; তার পর বিনাপথ্যে, বিনাযত্নে, রোকরাটার এখন অবস্থা হয়েছে যে আমার বেশী কিছু ভরসা দেবার নেই আর—তবু আমার প্রাণপণ যা হয় কর্ব।" এই বলে ব্যবস্থা পত্র করে তিনি চলে গেলেন। পরের দিন সকালে তার একটু জ্ঞান হল, চোখ চাইতেই আমাকে দেখে দুচোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার সেই ক্ষীণ বাহুলতা দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল আর পরম আরামের নিশ্বাস ফেলে বল্ল "মা" আর কিছু দিক্তে তাকিয়ে "মা" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্ল "মা" বলে ডেকেছি বলে রাগ ক'র না মাসী—মরণের সময় কষ্টের সময় মাসির চেয়ে মা বলতেই ভাল লাগে—কি জানি। আমার ও মা নেই তাই তোমাকে মা বলে ডেকেছি কখনও। পাছে তুমি শুনলে রাগ কর তাই মনে মনেই মা বলে ডাকতাম। মা আমার যে বড় মিষ্টি—" এত কথা বলেই সে হাঁপিয়ে পড়ল। আমি তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম কিন্তু লোকলজ্জাভীরু আমি তখনো স্বীকার করতে পারলাম না "ওরে কেউ নয়ে তোর মা নেই, আমি পাষাণীই তোর রাক্ষসী মা। তাই তুই একশো'বার আমায় মা বলে ডাক—ডেকে ডেকে আমার পাষাণ প্রাণ গলিয়ে দে—"কিছুই মুখ দিয়ে বেরুল না, নিশ্চল কাঠ পুত্তলিকার মত চেয়ে রইলাম। সেদিন সন্ধ্যে বেলা সে যখন শেষ আর একবার মা ডাক ডেকে পাশ ফিরে শুল', তারপর সব ফুরল। বড় সাধ ছিল তার মা ডাক ডাকবার, সেই ডাক ডেকেই সে বিদায় নিল। কিন্তু তার শেষ ডাক "মা" ডাকে আমার মৃতপ্রায় মা ডাক শুনবার জন্যে যে সাড়া দিয়ে গেল, সে মা পুরাবারও কিছু রেখে গেল না। তারপর থেকে আর আমি দেশে ফিরে যাইনি, বড় সাধ ছিল তার দেশে যাবার, তাকে ফেলে কি করে সে দেশমুখো হই আর। এবার ফের কাশী গেলাম, তার্থস্থান এবার জগতের যত আর্ত, যত দুঃখী, যত পতিতদের সেবাতেই আপনার ছার প্রাণটা বিলিয়ে দেব, তাতে আমার সেবা পেয়ে যদি কেউ আমায় মা বলে ডাকে, তবেই আমার প্রাণটা শান্ত হবে। এই রকম করে কিছুদিন কাটালাম, এতে নিশ্চয়ই ভগবানের আশীর্বাদে প্রাণে অনেক শান্তি পেলাম। তারপর এখানকার বোম্বাটাকরদের সঙ্গে দেখা হয়, তখন কি জানি কেন বাঙ্গলার শ্যামল পল্লীতে ফের ফিরে আসবার জন্যে প্রাণটা আকুল হয়ে উঠল, তাইতে তাদের সঙ্গ নিয়ে এখানে এলাম। ওরে আজ যে আমি বাঁচি এতে আমার কিছু দুঃখ নেই, কোন বাহাদুরী নেই। একটী মায়েরও মা নাম যখন বজায় রাখতে পেরেছি; তখন এতোদিনে আমার প্রায়শ্চিত্তের শেষ হল। আমি স্বর্গ থেকে আজ সে আমায় কমা করেছে। আর আমার সাহসের কথাও শুনলি এবার? কত বড় ভীরু ছিলাম, আপনাদের ভয়ে আপন সন্তানকেও অস্বীকার করে এসেছি।" এই বলে তিনি ক্লান্ত হলেন। এতটুকু বলিবার জন্যেই যেন তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তিটুকু প্রাণপণে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। সে কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চক্ষু দুটী ক্রমশঃ নিমীলিত হইয়া আসিল।

শ্রীমতী রমলা বসু

বঙ্গবাণী-বন্দনা *

রক্তচরণতলশোভিতশতদলমত্তমধুপকুল-গুঞ্জে,
বিশ্ববিজয়ীনবআসনতল তব ঝলমল মকরতপুঞ্জে ;
জনমননন্দিতকোকিলকুহুকুহুবন্দনরত চিরপাশে,
রঞ্জিতফুলদলপরিমলঅঞ্জলি অর্পণরত মধুবাসে ;
যুগযুগবন্দনব্যাকুল জনগণ আকুলঅঞ্জলিহস্তে,
দেবীসরস্বতী বঙ্গেরি ভারতী নমঃনমঃ মাতঃ নমস্তে।

দর্শনবিজ্ঞানসঙ্গীতবাদনকাব্যকলধ্বনিকণ্ঠে,
বিশ্ববিপুলব্যথানবনববারতা বীণমুখরতব বক্ষে ;
প্রত্নতত্ত্বকত নিখিলশাস্ত্রশত চরণনখরে পড়ি কাঁদে,
ভুবনেরি ছিন্নগৌ নন্দিত নিশিদিন পদযুগমঞ্জীরছাঁদে ;
যুগযুগবন্দনব্যাকুলজনগণ আকুলঅঞ্জলিহস্তে,
দেবীসরস্বতী বঙ্গেরি ভারতী নমঃনমঃ মাতঃ নমস্তে।

বৈষ্ণবকবিকুলশ্লোকপদ্যাবলী ঝরি' পড়ে নিরন্তরছন্দে,
হেমচন্দ্রমধুবঙ্কিম ভরি দিল আসন চন্দনগন্ধে ;
কৃষ্ণবার্ত্তা নবতত্ত্বে প্রচারিল ধন্য সে ভক্তনবীনে,
মন্দিরমহোৎসবকাব্যবজ্রতব শক্তি সমর্পিল দীনে ,
যুগযুগবন্দনব্যাকুলজনগণ আকুলঅঞ্জলিহস্তে,
দেবীসরস্বতী বঙ্গেরি ভারতী নমঃনমঃ মাতঃ নমস্তে।

দ্বিজরাজ'অক্ষয়দেবপ্রমথসুধীসত্যকরুণা তব অঙ্কে,
দিশিদিশিগৌরব ঘোষিছে স্তুততব মন্ত্রিত করি জয়শঙ্খে ;
রক্তকুমুদচিরকোমলপরিমল রঞ্জনধর দিল মাতি,
নবনবরাগিনীমূর্চ্ছনারবমুখরশব্দবিপুলচিরসাথী ;
যুগযুগবন্দনব্যাকুলজনগণ আকুলঅঞ্জলি হস্তে,
দেবীসরস্বতী বঙ্গেরি ভারতী নমঃনমঃ মাতঃ নমস্তে .

* সুর ও তালসহযোগে কোরাসে গীত।

স্বর্ণহেমলতাকামিনীইন্দিরা রাতুলসম্পদদাত্রী,
দেবীপ্রিয়স্বদামানকরোজ্জ্বলে পুলকিত রহ দিবারাত্রি ;
দক্ষিণাকুন্তলিষতীব্রভাবোচ্ছলউত্তালকলকলভাষা,
নির্ঝরঅভ্রশিরভেদিতভৈরবগর্জ্জিত অভিনবআশা ;
যুগযুগবন্দীনব্যাকুলজনগণ আকুলঅঞ্জলি হস্তে,
দেবীসরস্বতী বঙ্গেরি ভারতী নমঃনমঃ মাতঃ নমস্তে।

নিষুতরাজধনরত্নমুকুটশিরসর্ব্বলোকবুধনম্যা,
জ্ঞানতীর্থশতমন্দিরতলতব ভক্তহৃদয়তলগম্যা ;
জগতবন্দ্যারবিকরতলসজ্জিত রাজরাজেশ্বরীসাজে,
শান্তিআনন্দেরি অঞ্জলমন্ত্রগো বিশ্বমুখর করি বাজে ;
যুগযুগবন্দনব্যাকুলজনগণ আকুলঅঞ্জলি হস্তে,
দেবীসরস্বতী বঙ্গেরি ভারতী নমঃনমঃ মাতঃ নমস্তে।

শ্রীগৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার*

অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিম-মণ্ডলের শেষ জ্যোতিষ্ক। বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের যুক্ত সাধনার ফলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিপুষ্ট এবং তারা বাংলাদেশে একটা বিপুল ভাবস্রোত প্রবাহিত। বঙ্কিমযুগের পূর্ব্বে বাংলা-সাহিত্য একটা বিরাট অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ছিল। বঙ্কিম সেই গাঢ় তমসা অপসারিত করিয়া প্রভাতসূর্য্যের ন্যায় নিত্য কিরণধারার মত সাহিত্যের এই নব অরুণালোকের যুগে আবির্ভূত হইলেন। যে সাহিত্যের বীজ মহাত্মা রাজা রামমোহন কর্ত্তৃক রোপিত, ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও শক্তিবলে তাহা পল্লবিত, মুকুলিত ও ফুলফল মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলা ভাষার এই যে পূর্ণাঙ্গ পরিপুষ্টি, ইহার মূলে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগী অক্ষয়চন্দ্র। সাহিত্যচর্চ্চা, সাহিত্যপ্রচার ও জ্ঞান বিস্তারের দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য এই দুই প্রতিভাবান্ পুরুষ আত্মশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

"The child is father of the man" কথাটার সার্থকতা অক্ষয়চন্দ্রের জীবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাল্যকালেও তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। Bernard Smithএর শাস্ত্রকের অঙ্ক অনেকেই কষিতে

* "চুচুড়া সাহিত্য আলোচনা সমিতি"র উদ্যোগে দ্বিতীয় বার্ষিক "অক্ষয় স্মৃতি"-সভায় পঠিত।

অক্ষয় হইতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিতে চাহিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে Genius বলিত। বাল্যকালের প্রতিভা উত্তরকালে আরও সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার প্রতিভার পরিচয় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায়ই প্রদর্শন করিয়াছিলেন: বিশেষতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা রায় ৺সনাচরণ সরকার বাহাদুর মহাশয়ও আজীবন বাণী-সেবা করিতেন এবং মাতৃভাষার সেবাই তাঁহার যথার্থ আনন্দ ও পরিতৃপ্তি ছিল। কলেজে অধ্যয়নকালে একটি অতি উৎকৃষ্ট বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্যরথী স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার বাণী সেবার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যশের আশায় সাহিত্যসেবা করেন নাই, তাই বোধ হয় বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সুপরিচিত নহেন।

অক্ষয়চন্দ্রের বাগ্‌বাদিতা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। কেবল বাণীসেবাই নয়, চরিত্রের দৃঢ়তা ও পবিত্রতা, নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণও তাঁহারই পিতার দান। পিতাই তাঁহার বন্ধু ছিলেন; পিতাপুত্র সম্মিলিত হইয়া সকল বিষয়েই সকল রকম আলোচনা হইত। কাজে কাজেই তাঁহার জীবনের মেরুদণ্ড পিতা কর্ত্তৃকই সুদৃঢ়রূপে গঠিত হয়। তিনি বঙ্গ বাণীর একনিষ্ঠ সাধক; তিনি ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন যে মাতৃভাষার সেবা না করিলে ঘোর অধর্ম্ম আছে "কিন্তু করিলে যে একটা বাহাদুরী আছে" তাহা তিনি জানিতেন না ও মানিতেন না। সেকালে শিক্ষা এত প্রচারতা লাভ না করিয়া থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ের মত ইহা একটা সখের জিনিষ ছিল না। "সাহিত্য ছিল তখন উপভোগের সামগ্রী, আরাধনার বস্তু। ... ভক্তি আনন্দ উচ্ছ্বাস, এই সকল লইয়া তখন সাহিত্যসেবা, সাহিত্যচর্চ্চা, সাহিত্যপূজা। এখনকারমত ছুরি, কাঁচি, বয়বী লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে, সাহিত্যবেষ, সাহিত্যব্যবচ্ছেদ তখন ছিল না।"

শিক্ষা সকল সময়ে সর্ব্বত্র গুরুমুখী—তাঁহার শৈশবে পিতা তাঁহাকে ঠিক নিজের মত করিয়া লইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র নিজেই বলিয়াছিলেন, "পিতা—সরল, সংযমী, সদালাপী, বিদ্যানুরাগী ছিলেন, আমি বালক হইলেও তাঁহারই মত স্বভাব পাইয়াছিলাম। একটা কথা আছে উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত প্রশস্ততর। (Example is better than precept) দৃষ্টান্তে যে শিক্ষা হয় শুধু ফাঁকা উপদেশের দ্বারা তাহা হয় না। পিতার আদর্শে তিনি নিজকে একরূপ বলবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন যে কোনও কুসংসর্গ তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, যে প্রলোভনের আকর্ষণে বঙ্গের বহু মনীষী নিজেদের রক্ষা করিতে পারেন নাই, সেই প্রলোভনেও অক্ষয়চন্দ্র অটল, অচল ছিলেন। জীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার চিন্তা ও কর্ম্মের ধারা সম্পূর্ণ সুবিচিত্র। যাহা তাঁহার কাছে ভাল লাগিয়াছে, সুন্দর বোধ হইয়াছে, যাহা তাঁহার প্রাণের মাঝে একটা সুর তুলিয়াছে, তাহা তিনি শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন, আর কখনও তাহা ছাড়েন নাই। তিনি সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, সাহিত্যকে ভাল বাসিতেন বলিয়া—অর্থ কিম্বা প্রশংসার খাতিরে নয়। বাংলাভাষার অবস্থার কথা ভাবিয়া তিনি অনেক সময়ে অশ্রুপাত করিতেন—ইহাও শুনা গিয়াছে বাঙ্গালাকে তিনি এতই ভালবাসিতেন, বাংলা তাঁহার এতই প্রাণের জিনিষ, দেশ তাঁহার এতই প্রিয়।

বিদ্যালয়ে পাঠের সময় হইতেই বৈষ্ণবসাহিত্য ও বৈষ্ণব-কবিতায় তিনি মুগ্ধ হন। তিনি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বিদ্যাপতির পদাবলী দ্বারা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং সেই ঐশ্বরিক প্রেমানুরাগের প্রভাবেই স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে একযোগে প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ প্রকাশে তাঁহার প্রয়াস।

অক্ষয়চন্দ্রকে চিনিতে হইলে তৎকালীন সমাজের অবস্থাও কিছু কিছু জানিতে হইবে, কারণ "সমাজ মনুষ্যের উপর নিঃশব্দে, বিনা আড়ম্বরে, গুরুগিরি করিয়া থাকে।" সমাজের মূলে পূর্ব্বে ছিল সদ্ভোষ—এখন তাহার ঠিক বিপরীত। ছোট, বড়, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই তখন আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট; অসন্তোষের একটা বিকট ছায়া কিম্বা

সমাজকে ছাড়িয়া ফেলে নাই,—সেই সন্তোষের সুখের সমাজে অক্ষয়চন্দ্র 'সঞ্জীবিটা' হইয়া উঠিয়াছিলেন; কাজে কাজেই সুখ ও সন্তোষ কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

"যে সময় সংস্কৃত-ভাষা ভিন্ন অন্যরূপ বাংলা কেহই গ্রহণ করিত না, তিনি সেই সময়ে চলিত বাংলাই ভাষা, সংস্কৃত-ভাষা বাংলা বাংলাই নয়, এই কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে সাহস করিয়াছিলেন এবং ক্রমাগত কয়েক বৎসর সেই ভাষারই লিখিয়াছিলেন।" এই হিসাবে তিনি খাঁটি বাংলাভাষা প্রবর্ত্তনের প্রথমতী চেষ্টা করেন। তাঁহার "পিতা-পুত্র"তেও তিনি লিখিয়াছেন,"সংস্কৃতানুসারিণী বাংলা-ভাষা অতি সুন্দর হইলেও যদ্যপি কুলীন কন্যার মত কেবল [illegible] হইত, শীঘ্র বিবাহযোগ্যা হউক, আপনার [illegible] আপনি করিতে শিখুক।" অন্যত্র ইহার খুব সুচিন্তিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, "সংস্কৃত আমাদের গুরুজন, কিন্তু গুরু লইয়াই সংসার হয় না। প্রধানতঃ পুত্র, কলত্র, দাস-দাসী, বন্ধু-বান্ধব—এই সকল লইয়াই সংসার। এ সকলের সংস্কৃত নয়—প্রাকৃত, তা' বলিয়া কেবল বিষয় কার্য্যের জন্য প্রাকৃত বা বাংলার প্রয়োজন এমন নহে। জীবন্ত কাব্যের বাঙ্গালাই প্রাণ।"

যথাযথিনী ভাষা প্রচারের সূচনা হইতেই "বঙ্গদর্শন" প্রচারের সূত্রপাত। ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইল। তখন বঙ্কিমচন্দ্র ইহার সম্পাদক; আর অক্ষয়চন্দ্র একজন লেখক। অক্ষয়চন্দ্র প্রথমে "উদ্দীপনা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি ইহাতে খুবই লিখিতেন। তাঁহার "প্রাণ" শীর্ষক প্রবন্ধ অতি চিন্তাপূর্ণ, উৎকৃষ্ট এবং উপাদেয়। ১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক অক্ষয়চন্দ্র "সাধারণী" প্রকাশিত করেন। "সাধারণীর" ভাষা এবং বিষয় বৈচিত্র তখন নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিছুকাল "সাধারণী" কাঁঠালপাড়া বঙ্গদর্শন আফিসেই মুদ্রিত হইত; অক্ষয়চন্দ্র তখন "বঙ্গদর্শনের" প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ১২৮১ সালের প্রথম মাসে তিনি চুঁচুড়াতেই 'সাধারণী' যন্ত্রালয় স্থাপন করেন।

এই রকম সময়েই চুঁচুড়াতে বিদ্যাত দীনবন্ধু মিত্রের 'সীলাবতী' নাটকের অভিনয় হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র "সীলাবতী"কে একরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লেন। ইহাতে ৭৮ টি গান ছিল, তন্মধ্যে কয়েকটি অক্ষয়চন্দ্রের নিজের লিখিত।

"সাধারণী"তে "চেনাচুর" নামে একটি বিদ্রূপাত্মক স্তম্ভ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইত। ইহা এতই সুলিখিত হইত যে শেষে ইহা একটা উপাদেয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতি মাসে সাধারণী বাহির হইবার সময় বহু সহৃদয় পাঠক অত্যন্ত উৎসুক হইতেন। "সাধারণী" প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয়-সেবা ও রাজনীতির আলোচনা; এবং প্রায় ১১ বৎসর, 'সাধারণী' স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিফলকাম হয় নাই। অতিশয়গ্রস্ত বাঙ্গালীর অধিকাংশ অনুষ্ঠানের মতই, অকাল মৃত্যু হইলেও "সাধারণী"র জন্ম সার্থক হইয়াছিল। ইহার প্রথম পাঁচটী বৎসর অক্ষয়চন্দ্র বেশ সবল ও সুস্থ ছিলেন; কিন্তু শেষ পাঁচ বৎসর এতই অসুস্থ হইয়া পড়েন যে ১২৯১ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে সব গুটাইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইল।

"সাধারণী"র পরমায়ু শেষ হইল বটে, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র চুপ করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলেন না; সাহিত্যালোচনায়ই যে তাঁহার প্রাণ—তাঁহার অস্তিত্ব। তিনি প্রকাশিত করিলেন "নবজীবন"। বঙ্গের শ্রেষ্ঠিতনা লেখকগণ প্রায় সকলেই ইহাতে লিখিতে লাগিলেন। "নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যায় তাঁহার "বাঙ্গালীর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম" শীর্ষক একটি অতি প্রীতিপ্রদ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ বাহির হয়। নবজীবন খুব অল্পদিনের জিনিষেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদরের সামগ্রী হইয়াছিল; কিন্তু পাঁচ বৎসর পরেই ইহাও "সাধারণী"র পন্থা অনুসরণ করিল। অল্পায়ু হইলেও ইহার ঐকান্তিক সাধনা ব্যর্থ হয় নাই।

অক্ষয়চন্দ্র এতই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন যে শেষজীবন চুঁচুড়াতেই আসিয়া অতিবাহিত করিলেন; এবং এই শারীরিক অপারগতা বশতই তিনি অধিক পুস্তক কিংবা প্রবন্ধ লিখিতে পারেন নাই। তবে সংখ্যা বা পরিমাণের (quantity) চেয়ে গুণের (quality) মূল্য অনেক বেশী।

বর্ত্তমান সময়ের বহু বিখ্যাত লেখকের শিক্ষা অক্ষয়চন্দ্রের কাছেই হইয়াছিল। প্রগাঢ় পণ্ডিত মনস্বী লেখক, আচার্য্য-প্রবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "হাতেখড়ি" এই অক্ষয়চন্দ্রের "নবজীবনে"। অক্ষয়চন্দ্রের প্রতি তাঁহার একটা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা প্রথম থেকেই ছিল। অক্ষয়চন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে" লিখিত "দশমহাবিদ্যা" নামক প্রবন্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন ;—সেই প্রবন্ধে আমরা অক্ষয়বাবুর বিশেষ মূর্ত্তি দেখিতে পাই। সমস্ত ভারতভূমি যে আমাদের জননী, সমস্ত ভারতকে যে আর্য্যদের মা বলিয়া ডাকিতে হইবে, এই ভাব ও নির্দ্দেশ আমরা দশমহাবিদ্যা হইতে পাই। অক্ষয়বাবু উক্ত দশমহাবিদ্যা প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছিলেন। দশমহাবিদ্যা ভারতের দশটি অবস্থা। • • • অক্ষয়বাবু আশা করিয়াছেন ভারত মাতার এ অবস্থা থাকিবে না।" • • • "অক্ষয়বাবুর আর একটি প্রবন্ধ স্বপ্নে "আমার স্বর্গোৎসব" ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষই দেবী ভগবতীর প্রাকৃতিক প্রতিমা।" অক্ষয়-চন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যার' কথাই পরিস্ফুট হয় সেই অমর জাতীয় সঙ্গীতে যাহা সোণার বাঙ্গালার বক্ষ চিরিয়া, বঙ্কিম-চন্দ্রের অন্তরতম কেহ করিয়া উঠিয়াছিল।

কেবল রামেন্দ্রবাবুই যে অক্ষয়বাবুকে সাহিত্যগুরু বলিয়া সম্মান করিতেন তাহা নহে; বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও নিজেকে অক্ষয়চন্দ্রের 'সাহিত্যশিষ্য' বলিয়া গৌরব বোধ করেন।

বিগত বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে অক্ষয়চন্দ্রের পর-লোক গমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত সভায় অনুবক্তা ও সুসমালোচক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিয়া-ছিলেন, "যে সকল মনীষী "বঙ্গদর্শনে" জাতীয়তার উদ্বোধন করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অগ্রণী। অক্ষয়চন্দ্র সেই পুণ্যগুরুর বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন এবং যাবজ্জীবন আহিতাগ্নিকের মত সেই ভাবের অগ্নি দীপ্ত রাখিয়া-ছিলেন। • • • ।"

"অবকাশ যাপনের জন্য সাহিত্যসেবা বা গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যসেবী হইয়া পড়েন নাই, তাঁহার সাহিত্য-সেবা স্বদেশ-ভক্তি ও জাতিপ্রীতি চরিতার্থ করিবার প্রবল কামনার ফল।" নিজে যদি গ্রন্থ রচনা না করিয়া বঙ্গদেশে বহু গ্রন্থকার ও সাহিত্যিক সৃষ্টি করাতেই তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ের প্রধান নাটককার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কেও তিনিই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ করান। তাঁহার জীবনের প্রথম কবিতা "হরিনাম" যদি অক্ষয়চন্দ্র খুব ভাল করিয়া সমালোচনা না করিতেন ও ক্ষীরোদবাবুকে খুব উৎসাহ না দিতেন, তাহা হইলে বাংলা—সাহিত্য অনেক বিষয়ে বঞ্চিত থাকিত। অক্ষয়চন্দ্রের নিকট এই জন্যই সমস্ত দেশ ঋণী। তিনি শেষ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও গুরুরী ছিলেন।

তিনি নিজের বাড়ীতে বসিয়া সকল নূতনপুরাতন সাহিত্য পাঠ করিতেন। সময়ের স্রোতে আজন্ম হইয়া [redacted] কখনও ত্যাগ করেন নাই। পুস্তক নবসৌন্দর্য্য তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপিকার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত চর্চ্চার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে বীর পল্লীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন।

তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় বঙ্গের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়ই পরিস্ফুট। অক্ষয়চন্দ্রের "শিক্ষানবিশের পত্র" সমালোচনায়ই তিনি বলিয়াছেন, "আমরা তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিব, যে বঙ্গদর্শনের কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত। • • • তাঁহার প্রণীত সেই প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী সমালোচক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশহিতৈষিণা তাঁহার প্রাণ এতই ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিল যে এই "শিক্ষানবিশের পত্রে" ইংলণ্ডের মহাকবি Lord Byronএর স্বদেশানুরাগ ও গভীর ভাব-ব্যঞ্জক অনেকস্থল হইতে বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া-ছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের "সোচারণের পাঠ"ও তাঁহার একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ইহা কোমলমতি শিশুদিগের জন্য লিখিত। ইহার কোনস্থানে যুক্তাক্ষর নাই। ইহাই এই পুস্তকের

প্রধান বিশেষত্ব। আর ইহার স্বাভাবিক আবেগ ও মাধুর্য্যের সাইত্তও ইহার অন্যতম বিশেষত্ব।

অক্ষয়চন্দ্রের শ্রেষ্ঠপুস্তক "সনাতনী"। তাঁহার প্রাণের প্রাণ পরিচয়রূপে ইহাতেই প্রতিফলিত হইয়াছে। 'সনাতনী' "পুরাতনী" হইলেও অপরিবর্ত্তনীয়া। সনাতন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারে না। ইহা শাশ্বত। "পরোপকার ধর্ম্মের একমাত্র সোপান, অপকারই ধর্ম্মের একমাত্র অন্তরায়।" ধর্ম্মকর্ম্ম ও ধর্ম্ম উভয়ই তুল্য প্রয়োজনীয়। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রাণালোচনাতেই অক্ষয়চন্দ্রের স্বরূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্ম কাহারও একচেটিয়া নহে। পুরোহিত কিংবা কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব সামগ্রী নয়। "প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বে কিছুমাত্র সোলযোগ নাই।" পরার্থপরতাই ধর্ম্মের [redacted] শ্রেষ্ঠ সাধনার বন্ধন—সমাজ পরিচালক। [redacted]র মতে তিনি সংসারত্যাগী তিনি সমাজের বন্ধন মানেন না, সমাজের গণ্ডী তাঁহাকে আর বেঁধে রাখিতে পারে না; কিন্তু সংসারে যাহাকে থাকিতে হইবে, তাহাকে সংসারের নিয়ম শাস্ত্রের শাসন মানিয়া লইতেই হইবে। "কর্ত্তব্যত্যাগী হইতে সমাজের বা দেশের কোনই উপকার নাই"। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবনতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়াছিল, তাই তিনি বলিয়াছেন যে সমাজরক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্ম ও স্বার্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। ধর্ম্মই কষ্টিপাথর, ধর্ম্মই মনুষ্যত্বের মেরুদণ্ড, দুঃসাধ্য হইলেও ইহা সর্ব্বতোভাবে পালনীয়।

আজকাল অনেকেই হিন্দুশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। অক্ষয়চন্দ্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ধর্ম্মকে বিজ্ঞানের বেষ্টনীর ভিতরে আনিয়া বোঝান একটা মহা-ভ্রম বলিয়া তিনি মনে করিতেন। আবার ইউরোপীয় প্রভাবে যাঁহারা বলেন যে ধর্ম্ম Practical হওয়া চাই, তাহাদের মতে যাহার যাজন অনায়াসসাধ্য না হয় তাহা ধর্ম্মই নয়। এই ধারণা বর্ত্তমান সমাজে প্রবেশ করিয়া একটা ভীষণ দুর্য্যোগের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার উপর অক্ষয়চন্দ্র তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন, 'এমন ঘোরতর সত্যদ্রোহী মত, ধর্ম্মের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা আর হয় না।"

"ধর্ম্মীয়-চরিত্র সংগঠনের ও সঞ্চালনের আদর্শ ব্যবহার নাম ধর্ম্ম। আদর্শ বলিয়াই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব এবং সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব বলিয়াই উহা আদর্শ।" যে ধর্ম্মের এই নিগূঢ় রহস্য—এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য অবধারণে অক্ষম সেই ধর্ম্মকে করিতে চায় Practical; কিন্তু ধর্ম্ম পূর্ণায়ত্ত করিবার জিনিষ নয়।

"সনাতনী"র ভিতরেই আমরা অক্ষয়চন্দ্রকে একরূপ পূর্ণভাবে দেখিতে পাই, সনাতনীই তাঁহার প্রকৃত জীবন-বৃত্তান্ত, তাঁহার জীবনব্যাপী ভাবনা ও কামনার নিখুঁত ছবি। বাহিরের কতকগুলি ঘটনার মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিতে গেলে ব্যর্থতা ভিন্ন সফলতা হইবে না। সকলে তাঁহার মত গ্রহণ করুক আর নাই করুক, তিনি যে ভাবে যে জিনিষটি দেখিয়াছেন তাহাই স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অবসাদিত জাতির ভীষণ দুর্য্যোগের দিনে তাঁহারই বজ্রমন্ত্রী বাণিয়া উঠিয়াছিল; সমাজের সকল গ্লানি দূর করিয়া দেশ মাতৃকার সেবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, যশের জন্য নয়। তিনি বিবেককে ধর্ম্মের কষ্টিপাথর বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বিবেক ও ব্যক্তিত্ব ইউরোপের বক্ষে একটা প্রলয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। হিন্দু-সমাজে যে পাশ্চাত্যের আধিপত্য ধীরে ধীরে ছড়াইয়া ইহাকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে, অক্ষয়চন্দ্র সর্ব্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া ইহাই রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সমাজ ও শিক্ষায় অক্ষয়চন্দ্র অত্যন্ত সংরক্ষণশীল ছিলেন। তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং নিজ মত পরিপোষণার্থ ফরাসী-দার্শনিক রুসোর মতও ইহাতে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু হিন্দু-বিবাহের সমস্যা করিতে গিয়া "বহুর বিবাহ সুপ্রশংসনীয়" বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। এইখানেই অনেকের ঘোর মতভেদ।

গাইয়া ধর্ম্ম পালন না করার জন্যও যে দেশের দুরবস্থা হইয়াছে তাঁহার জন্যও বিশেষ আক্ষেপ তিনি করিয়াছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে সত্য কিন্তু সাহিত্যেও শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চট্টগ্রাম-অধিবেশনেও সভাপতির অভিভাষণেও তিনি এই কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যে জাতি হৃদয়ের আবেগে আপনার পিতৃ পুরুষের কাছে প্রার্থনা করিতে পারে "আমার বংশে ধাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাক্,——দের বস্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাক", সে হিন্দু-জাতি কখনও অলস হইয়া নিজের নিজত্ব ত্যাগ করিতে পারিবে না, আত্মবিস্মৃত হইয়া মনুষ্যত্বের নিম্নতম স্তরে পড়িয়া থাকিবে না—ইহাই অক্ষয়চন্দ্রের বিশ্বাস—ইহাই তাঁহার আশা। "সনাতনী"র পূর্ব্বপীঠিকায় তিনি বলিয়াছেন "এখনকার দিনে স্বধর্ম্ম যেন কিছু শিথিলবাধ বোধ হইতেছে; এতাদৃশ থাকিবে না, অচিরে স্বধর্ম্ম আবার জীবন্ত ভাবেই পরিদৃশ্যমান হইবে।" যে জাতির জন্য, যে দেশের জন্য, এবং যে ভাষার সেবার জন্য অক্ষয়চন্দ্র স্বীয় মন্ত্র প্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিলেন—অক্লান্ত করিয়াছিলেন, সে দেশ, সে জাতি জাগিবে; সে ভাষা জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। তাঁহার আশা একটা কুহক নয়। এ গাঢ় তমসা কাটিয়া যাইবে, অনন্ত-রাগ-রঞ্জিত উষা একটা নবীন জীবন, নবীন উন্মাদনা, নবীন উৎসাহ ও আশা লইয়া বিশ্বের এই সনাতন ভূমিতে অবতীর্ণ হইবে;—

"সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন;
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে।"

শ্রীহুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ

[redacted]

কারা মুক্তি

ছোট্ না এবার সব ফেলে,
লক্ষ যুগের বন্ধ কারার পাষাণগড়া দ্বার ঠেলে!
দখিন হাওয়ায় মেঘ ছুটেছে,
বন্ধবাধা সব টুটেছে,
আলোর মেশে বান ডেকেছে,
সোনার লগন যায় চলে,
ছোট্ রে এবার সব ফেলে।

দূরের আকাশ ডাক্‌ছে তোরে
মৌন ভাষার ইঙ্গিতে,
কান্না-প্রাচীর লঙ্ঘিতে;
অন্ধ হ'য়ে রইবি কিরে
মোহের ঘন কজ্জল পরে,
চোখের পাতা মুদ্‌বি ধীরে
'ঘুমপাড়ানো' সঙ্গীতে?
তন্দ্রা-অলস তন্ত্রীতে!
আকাশ জুড়ে নীলের খেলা—
সবখানেতে আজ ছুটি!
সাধের বাঁধন আয় টুটি;
পূবের আলো রঙীন সুরে
ডাক দিয়েছে তোদের পুরে
সুরের ধারে উঠ্‌ল দুরে
ফুলের কলি ঐ ফুটি!
সাধের বাঁধন আয় টুটি!

শ্রীকফিকেশ চৌধুরী

স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস

(এডুকেশন গেজেট হইতে সম্পাদিত)

স্বনামধন্য বাঙ্গালীর গৌরব-রবি ২৯এ ডিসেম্বর সোমবার রাত্রি ১০টা ৫০ মিনিট সময়ে ৭৪ বৎসর বয়সে অস্তমিত হইয়াছেন। আসন্নকাল বুঝিতে পারিয়া তিনি একদা কলিকাতায় বাগবাজারস্থ গঙ্গাতীরের বাটীতে মৃত্যুর [illegible] করিয়া [illegible] প্রকার ঔষধ সেবন করেন

গুরুদাস বাবু ৫ই ফাল্গুন ১৮৪৪ অব্দে কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সওদাগরী অফিসে ৫০৲ বেতনে বুক কিপার ছিলেন তিনি চরিত্রগুণে পরিচিত সকলেরই প্রিয় এবং সম্মানের পাত্র ছিলেন। গুরুদাস বাবু পিতামাতার পুণ্যফলে [illegible] কারী হইয়াছিলেন। অল্প বয়সেই গুরুদাসবাবু পিতৃহারা হন। মাতাই তাঁহার পিতামাতার কার্য্য করেন। তিনি অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যা, তাঁহার শিক্ষা প্রণালী উচ্চ অঙ্গের ছিল। তিনি বলিতেন "শৈশবকাল হইতে ছেলেমেয়েদিগের সম্বন্ধে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ওগুলি মাটির পুতুল নহে যে যাহাইচ্ছা গড়াইয়া রাখিয়া দিবে। উহাদিগের মন আছে এবং সেই মনে ভালবাসার সহিত সুশিক্ষার দ্বারা প্রথম হইতেই রেখা দিতে হইবে; উহারা সেই প্রীতির ও জ্ঞানের আতরি ক্রমান্বয়েই লাভ করিতে থাকিবে।" তিনি তাঁর কোন সৌভাগ্যকে বলিয়াছিলেন "ছেলে দুরন্তপনা করিতেছে বলিয়া তুমি বলিলে যে যাইয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিব; কিন্তু ও যখন দেখিবে যে প্রকৃতপক্ষে হাড় ভাঙ্গিয়া দিলে না, কেবল উহার আর তোমার কথায় বিশ্বাস না তোমারি উপর সমস্ত থাকিবে কি? মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া ও যেমন উচিত ঠিক সেইটুকু পালন কর।"—আশ্চর্য্যের বিষয় যে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর্ তাঁহার এডুকেশন বা শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকে ঠিক এই উদাহরণটীই দিয়াছেন!—সত্যপ্রিয়তা হইতে উত্তম শিক্ষকই এই উপদেশ দিতে পারিয়াছিলেন। পিতামাতাকে বিদ্যালয়েই দেখিলে ছেলের শুশিক্ষা যে হইতে পারে না, সত্যপ্রিয়তা হইতে উত্তরেই এই সূত্র ধরিতে পারিয়াছিলেন।

গুরুদাস বাবু শৈশব হইতে আম খাইতে ভাল বাসিতেন তাঁহার চারি বৎসর মাত্র বয়সের সময় একবার তাঁহার মাতা ১লা আষাঢ় তাঁহাকে আম না দিয়া বলিয়াছিলেন "আষাঢ় মাসে আম খাইতে হইবে না, যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইবে তাহাই খাওয়ার জিদ করিতে নাই, তুমি বল "আষাঢ় মাসে আম চাহিব না" অনেক কান্নাকাটি করিলেও তিনি ঘরে আম থাকিতেও তাহা দিলেন না। মারপিট না করিয়া শুধু পাখী পড়ানর চেষ্টার ন্যায় "আম চাহিব না" নিজেই অনর্গল বলিতেছেন দেখিয়া পাওড়ি তাহাকে বলিলেন "মা দিলেই বা—অভিমান করিতেছে।" তিনি একটু ক্ষুণ্ণভাবে উত্তর দেন "মা। আপনি বলিলেই এখনই দিব, কিন্তু আজিকার চেষ্টাতেই ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে জিদ ছাড়িতে শিখিবে। বেশ কাল আম নয়, ব্রাহ্মণের ঘর।" সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যার—একান্ত বশীভূতা মধুর অতিশয় নম্রতাসহ অনুরোধ কখনই উপেক্ষিত হয় নাই, এক্ষেত্রেও হইল না। পিতামহীর সুহিত মাতার মতের মিল দেখিয়া শিশু বলিল "আম চাহিব না, ভুয়াড়ি যাব।" যদি শুরু একমত না হইলে শৈশবে শিক্ষা হয় না। মাতার বিরুদ্ধে পিতামহীর নিকট আপীলে সর্ব্বদা ঘর হইলে শিশুর কর্ত্তব্যজ্ঞান দৃঢ় হয় না। আমি শুরু পিতামাতার প্রতি ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানের মূলে একটু না একটু আঘাত পড়ে।

গুরুদাসবাবু বেথার স্কুলের ও প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৮৭০ অব্দে বি-এ ১৮৭৪ অব্দে পণ্ডিতশাস্ত্রে এম এ উপাধি লাভ করিয়া স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হয়েন এবং ১৮৭৫ অব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। কলেজ হইতে বাহির হইয়া গুরুদাসবাবু জেনারেল অ্যাসিম্বিলি কলেজে এক শত টাকা বেতন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার মাতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি বরাবরই কলিকাতায় থাকেন—বাহিরে না যান। বহরমপুরের আইন অধ্যাপকের কার্য্যে দুই শত টাকা এবং বহরমপুর কলেজে এক ঘণ্টা গণিত পড়াইলে এক শত টাকা পাইবেন বলিয়া মাষ্টারিক সাহেব গুরুদাসবাবুকে বিশেষ জিদ করেন। তাঁহার মাতুল মাতার মত পরিবর্ত্তন করাইয়া বহরমপুর যাওয়ার মত করান। বহরমপুর পৌঁছিবার সেই রাত্রেই গুরুদাসবাবুর মোহিনী নাম্নী পরম-সুন্দরী শিশুকন্যার কলেরায় মৃত্যু হয়।

গুরুদাসবাবু বহরমপুরে সবজেই পসার হয়। টাকা জমাইয়া যখন মাসিক এক শত টাকা সুদের কাগজ হইল তখন তাঁহার মাতা কলিকাতা ফিরিতে বলিলেন। জেনারেল অ্যাসেম্বিলির চাকরীর যেমন সুদা পেনসান পাইলেন এই মনে করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ঢুকিতে মাতা যাহা আদিষ্ট হইলে গুরুদাসবাবু বিরক্ত হইলেন না। গুরুদাস বাবুর মাতা হাতে নগদ বারোশত টাকা রাখিয়াছিলেন যাহাতে সুদের টাকা লইয়া প্রতি মাসে দুই শত টাকা খরচ করিয়াও হাইকোর্টে পসারের পরীক্ষা করিতে পারেন।

১৮৭২ অব্দে গুরুদাসবাবু হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন; ১৮৭৬ অব্দে বি-এল উপাধি লাভ করেন, ১৮৭৮ অব্দে "ঠাকুর ল" প্রফেসর নিযুক্ত হইয়া "হিন্দু বিবাহ আইন ও প্রথা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন; ১৮৭৯ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য, ১৮৮৭ অব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য হয়েন; ১৮৮৮ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ হইয়া জানুয়ারী ১৮৮৯ হইতে জানুয়ারী ১৯০৩ পর্য্যন্ত হাইকোর্টের কর্ম্মিষ্ঠতা করেন। ১৮৯০—৯৪ অব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সলার হয়েন; ১৯০৪ অব্দে নাইট বাসার উপাধি প্রাপ্ত হন।

হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গুরুদাসবাবু দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগী হয়েন। ছাত্রাবাসীর সুখসুবিধার প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী দেখা যাইত। তাঁহার অভাবে ভারতবর্ষ আজ একজন প্রকৃত সৎ উপদেষ্টা হারাইয়াছে। এইখানে পূর্ণ হইয়া সুকলিন। সকল সমাজে সকল লোকেই তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিত—সকলেই তাঁহার অকপট সরলতা ও আড়ম্বর বিহীন জীবনযাত্রা দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তাঁহার সুশিক্ষা, বিদ্যা এবং ইংরাজী চর্চ্চা অসাধারণ ছিল। বড় বড় ইংরাজও তাঁহার ইংরাজী বলিবার ধরণ দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতেন।

তাঁহার শেষের কয়েকটী দিন কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন বাবুর পত্রে আমরা জানিয়াছি—

পরমকল্যাণীয়েষু—

তোমার পত্র রবিবারের পত্র পাঠ করিয়া মনের অবস্থা অনেক দূরাইল। আমার এত শুরুতর হইয়াছে যে তাহা অনুভব করিবার শক্তি আমার এখনও হয় নাই। পিতৃ-দেবের অভাব কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিব।

মহাষ্টমীর দিন তাঁহার পীড়া (dysentry) আরম্ভ এবং পর অবস্থার দিন রাত্রি এগারটার সময় তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু তাঁহের ইচ্ছা মৃত্যুর ন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছিল; প্রভেদ এই যে তিনি উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন না। প্রথমতঃ [illegible] তাঁহার পর কবিরাজী চিকিৎসা হয়। জগদ্ধাত্রী পূজার পূর্ব্বে পীড়ার অনেক উপশম হয়, এবং আমরা আশা করিয়াছিলাম যে মা তাঁহাকে এ যাত্রা রক্ষা করিবেন। কিন্তু তাহার পরে জ্বর হয় এবং রক্তাতিসার পুনর্ব্বার দেখা দেয়। তখন আমাদিগকে বলিলেন যে আমার এখানে থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। গঙ্গার ধারের বাটীতে লইয়া যাইতে আমাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। উক্ত বাটীতে নয় দিন বাস করিয়া দেহত্যাগ করেন। সেখানে প্রতিদিন আমাকে গীতার প্রথম, দ্বিতীয় এবং

একাগ্র অধ্যয়ন পাঠ করিতে বলিতেন। একদিন কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদ (শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু কৃত) পাঠ করিতে শুনেন, আর একদিন Hamlet's Soliloquy এবং Gray's Elegy পাঠ করিতে বলেন। শেষ ছয় দিন কেবল গঙ্গাজল ও তাহার জল খাইয়া ছিলেন। মৃত্যুর পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে তিনবার গঙ্গাজল খাইলেন এবং প্রতিবারে স্পষ্ট স্বরে বলিলেন "এই শেষ।" তাহার পর একটি কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। শুনিলাম মৃত্যুর সময় পুত্র আমাকে বলিল যে তাহার বোধ হইল যেন তিনি ও তৎসং বলিলেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইবার পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে [redacted] প্রাতঃকৃত্যের ব্যবস্থা আনুপূর্ব্বিক বিশদ করিয়া বলিয়া দিলেন। আমরা চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। সে সময়ের কথা এখনও আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সে সকল মর্ম্মস্পর্শী কথা লিখিতে ইচ্ছা করিতেছি না। সাক্ষাতে তোমাকে বলিব; তাহাতে অনেক শান্তি পাইব। আশা করি তুমি কুশলে আছ। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী শ্রীহরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাতের কথা আছে—সেই পত্রখানি অবিকল এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা ২৯। ফাল্গুন ১৩২২।

কল্যাণবরেষু—

আপনার সহর প্রেরিত আপনার পিতৃদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী ও স্বরচিত "সন্দালাপ" নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। যথাসময়ে সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছি।

আপনার 'সন্দালাপ' অতি সুন্দর গ্রন্থ। ইহা কেবল বালক ও যুবকের নহে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরও শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দজনক।

আপনার পিতৃদেবের গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে বাস্তবিক আমার সঙ্কোচ হইতেছে। আমার পঞ্চদশ বর্ষ হইতেই তাঁহাকে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি বলিয়া ভক্তি করিতে আরম্ভ করি, এবং ক্রমে তাঁহাকে যতই ঘনিষ্ঠভাবে জানিতে লাগিলাম এবং তাঁহার সেবা করিতে লাগিলাম ততই সেই ভক্তি প্রগাঢ়তর হইতে লাগিল। বহরমপুর কলেজের আইনের অধ্যাপক হইয়া যে দিন বহরমপুর যাত্রা করি সেই দিন ভূদেববাবুর সঙ্গে হাবড়া ষ্টেশনে প্রথম দেখা হয়। দেখিলাম তিনি একজন সুদীর্ঘকায় বিশাল ললাট গৌরবর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ। তাঁহার অন্তরে উদারতা ও প্রখর বুদ্ধি যেন তাঁহার মুখকান্তিতে বিকাশ পাইতেছিল। আমরা যে গাড়ীতে উঠিলাম সেই গাড়ীতে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হাণ্ড সাহেবও উঠিলেন এবং তিনিই আমাকে ভূদেববাবুর নিকট পরিচিত করিয়া ছিলেন। তাহাতে ভূদেববাবু অতিই অমায়িকতা ও স্নেহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন যে বোধ হইল যেন আমার সঙ্গে তাঁহার কতকালের পরিচয় ছিল। হাণ্ড সাহেব নিজের একখানি ফটোগ্রাফ তাঁহাকে দেওয়াতে তিনি বলিলেন :—

It is a good likeness but I like the original better than the copy.

তাঁহার সঙ্গে হাণ্ড সাহেবের ও আমার নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সে কথাগুলি সকল মনে নাই, কিন্তু ইহা বেশ মনে আছে যে তাঁহার কথাতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব ছিল। এইরূপে হুগলী পর্য্যন্ত যাওয়ার পর তিনি হুগলী ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তাহাতে যে সকল কথার আলোচনা আছে তাহার কতকগুলি কথা লইয়া মতভেদ থাকা বিচিত্র নহে, কিন্তু যতই সময় যাইবে ততই তাঁহার অধিকাংশ কথার যথার্থ সপ্রমাণ হইবে, এবং সমাজ সংস্কারকেরা তাঁহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিবেন। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুরুদাস বাবু দুই কন্যা এবং উপযুক্ত চারিপুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফেসর শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পোষ্টগ্রাজুয়েট টীচিং" সভার সেক্রেটারী; দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তার শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের সভাপতি; তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয় বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং চতুর্থপুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ওকীলবাবুর এক জামাতা।

ভাবী সাহিত্য

ভাবী সাহিত্যের উপাদান যে সকল তত্ত্ব বা সমস্যা হইবে বলিয়া মনে হয় তাহার কতকগুলি এই তালিকাটীতে সাজাইয়া দিলাম।

(ক) পুরাতন ও আধুনিক সাহিত্য

বাস্তব—সূক্ষ্মভাবে ১

আধুনিক চরিত্র-বিশ্লেষণ { বিউটি, রুক্ষকাষ্ঠের উইল, চোখের বালি—, বিরাজ বৌ, স্বর্ণলতা, ছোট কাকী } নিখুঁত হাতে চালাই।

আধুনিক চরিত্র-বিশ্লেষণ { দিদি, বিন্দুর ছেলে } দেশী হাতে চালাই।

(খ) ভাবী সাহিত্য

বাস্তব—ব্যাপকতর সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবন, শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, পরিবার ও নারী-সমস্যা ইত্যাদি।

গোরা, দেবতত্ত্ব-বিষয়ক } নূতন ভাব, দেশী হাতে চালাই।

ম্যাথিউআর্ণল্ড, ফ্রাঁস, রাসিনী, ঐবিলাস } সমাজ-ধর্ম বিষয়কে অগ্রাহ্য করিলে বিদ্যা সংস্কার হয়।

এখনও লিখিত হয় নাই। টুর্গেনিভের Rudin এই সমস্যাটী আংশিকভাবে আছে } বিষয়বস্তু জাতিগত ও সমাজগত বিশিষ্টতাকে অগ্রাহ্য করিলেই সত্য ও জীবন্ত হয়।

ঘরে বাহিরে } পাশ্চাত্য নারী-শিক্ষার আদর্শে চালাই।

এখনও লিখিত হয় নাই। Strindburg এর Marriage ও Hauptmann এর Lonely Lives এক দিকটা কিছু পরিস্ফুট Shaw ও Ibsen এ বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে চিন্তার পুষ্টির সহায়তা করিতে পারেন। } আচ্ছা নারী-জীবনের আদর্শের অনুযায়ী অথচ যুগসমস্যার সমাধান। নারী পুরুষের সহচারী না মাতা হইয়া সমাজের সেবা করিবে?

প্রত্যাবর্ত্তন, বিত্ত-দাস, করির লেখ, লেখ আন্দ্। Hauptmannএর Weavers } দরিদ্র জনসাধারণের সহজ ও সুন্দর জীবনের ছবি।

কিন্তু হয়ো বা উহাতেও অষ্টাচারী অধিকার বিষয় প্রমাণের চিত্তের দিয়া, অসমসাহসের গভীরতম প্রেমতত্ত্ব তত্ত্ব ও শক্তিপুঞ্জ প্রেমিয়া, উহিয়া সমাজের রোগোপশমনে পর্য্যন্ত কিরণ নাড়ীজ্ঞানের তাহার অনুমানও পরিচয় পাই না।

এখনও লিখিত হয় নাই। } নূতন বৈধাবর্শ ও পুরাতন একক সহিত মনের বিরোধ; পুরাতন স্বজন স্বজাতি সমাজের ও নূতন ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতার বিরোধ; বর্ত্তমান শিক্ষার ও প্রাচীন চরিত্রগঠন ও অভাব-জীবনের বিরোধ।

এখনও লিখিত হয় নাই। Tolstoy-Anatole France, Sudderman Hauptmann Balzac প্রভৃতি এই সকল লেখক সম্বন্ধে বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহায়ক হইতে পারেন। } প্রকৃতি ও মনুষ্যের কাব্যের বিনিময়। প্রকৃতিমুখী জীবনের সফলতা ও আনন্দ; প্রকৃতি-বিমুখ জীবনের নিষ্ফলতা ও নিরানন্দ। পল্লী ও নগর-জীবনের প্রকৃতি ও ষ্টীল-নীতি। মনুষ্যের পাপ, হীনতা ও দুঃখের প্রচ্ছন্নতম কারণ নির্ণয়। যৌনসমস্যা। কারখানার শ্রমিক জীবন ও তাহাদের সরল ও সুন্দর জীবনযাত্রা, ধনী ও দরিদ্র-সমস্যা।

সাহিত্যের ভবিষ্য বিকাশের পূর্ব্বে, আর্টের আদর্শের পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়।

পুরাতন আর্ট, রবীন্দ্রনাথ ও সমথ চৌধুরী } আর্ট শুধু আর্টের জন্য। আর্ট নিরাসক্ত। জীবনের অনুসরণ বিদ্যা ও অকল্যাণের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নাই।

ভাবী আর্ট। } আর্ট সাহিত্যজ্ঞানে জীবনকে সংশোধন ও কল্যাণময় করিবে, আর্ট জীবনের শিক্ষক।

সম্পাদক

হিন্দুধর্ম্ম

ভারতের অন্তর্নিহিত গঠনশক্তি চিরদিনই যুগে যুগে আসিয়া উঠিয়া ভেদকে সাম্যে, বিচ্ছিন্নতাকে একতায় পরিণত করিয়াছে। কিন্তু সেই একীকরণশক্তি সর্ব্বদাই—সে চিরদিন বিভেদকে স্বীকার করিয়া বিচ্ছিন্নতাকে 'সূত্রে মণিগণা ইব' গাঁথিয়া তুলিয়াছে। সে কোন দিন বিভেদকে অস্বীকার করে নাই—এমন কি অত্যন্ত অধিক-ভাবেই স্বীকার করিয়াছে। তাই তাহার পক্ষে গড়িয়া তোলা তেমন ঠিক হয় নাই। মানবের সমাজের মধ্যেও আচার-ব্যবহারের যেমন সে বিচ্ছিন্নতাকে 'ধর্ম্মিন্ যেন যথাচারঃ' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, তেমনি মানবের অন্তরের ভাব ও প্রকৃতি-ভেদে মতের ভেদকে স্বীকার করিয়াছিল। অথচ সকলের মধ্যে একটী মূল সূত্রকে প্রবেশ করাইয়া সব মিলাইয়া একটী মহান্ ধর্ম্মের রূপমালা গাঁথিয়াছিল। প্রত্যেককে অস্বীকার করিয়া কেবল একটীমাত্র মতকে স্বীকার করে নাই বলিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম-বুদ্ধির মধ্যে যে উদারতা দেখা গিয়াছিল, এমন আর কোথাও নয়। মানুষের মধ্যে গুণ-কর্ম্মবিভাগ হইতে যে বিভেদের অস্তিত্ব চিরদিনই রহিয়াছে ও চিরদিনই রহিবে, সেই বিচ্ছিন্নতাকে যেমনি সে স্বীকার করিয়াছিল, তেমনি তাহার ধর্ম্মমতের মধ্যে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মপথের বিভাগ শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈবাদির বিভাগ, সংসার ও সন্ন্যাসের বিভাগ এইরূপ কত বিভাগকেই না স্বীকার করিয়াছে। আবার এই নানা মুনির নানা মতের মধ্যে যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সূত্রটী সকলকে 'সূত্রে মণিগণা ইব' এক করিয়া রাখিয়াছে, তাহাও এই মহা রূপমালার হাত দিলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা কৃষ্ণ, তাহা অহং নয়—কিন্তু অহংকে ত্যাগ করিয়াও তাহার অস্তিত্ব নাই। বহুকে লইয়াই সে বিরাট্! সমস্ত বিভিন্নতাকে লইয়া একটা অখণ্ড ঐক্য "দিবি বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ" হইয়া রহিয়াছে। এই বিরাট্ একের সমস্ত অংশই ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অথচ ভারতীয় এই মহাধর্ম্ম-তরু ক্রমাগতই বড় হইয়াছে, ঊর্দ্ধে অম্বরের দিকে শতসহস্র বাহু মেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। প্রতিক্ষণ তাহার প্রত্যেক অংশ নবতর ফলে অভিষিক্ত, নবতর প্রাণে সঞ্জীবিত হইয়াছে ও হইতেছে, অথচ ভারতের এই সুবিস্তৃতমূল ধর্ম্ম-অশ্বত্থ নানা ঝড় নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া ক্রমাগতই "অল্প" হইতে "ভূমার" দিকেই অগ্রসর হইতেছে। গীতার অমর উক্তি—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

ইহাই যেন ভারতীয় ধর্ম্মের মূলকথা—"যে যেভাবেই আমার ভজনা করুক না কেন, আমি সেই ভাবেই তাহাকে ধরা দিব, কারণ আমার পথ ছাড়া মানুষের চলিবার অন্য পথ নাই—সব পথই আমার পথ।" পথ সম্বন্ধে এই পরম উদারতা এমন একটা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যখন শত্রুভাবকেও ভগবদ্ভাবের একটা পথ বলিতে পুরাণকারগণ ভীত হন নাই। তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি ভগবদ্দ্বেষীকেও বিষ্ণুর পরমপদ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই। ইহাদিগকেও মুক্তির অধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট, বি-এল।

লাঞ্ছিতা ভারতী *

লক্ষ পাহাড় বক্ষ বিদারি চীৎকার করি ওকি আজ কারে ডাকে
তুঙ্গ শৃঙ্গ ভেঙ্গে ফেলে দেয়, গহ্বর কাটে ওকি ও কাহার হাঁকে ?
মহীরুহ ভাঙ্গে মড় মড় করি, কুলায় বিহীন পাখী হ'ল দিশেহারা ·
লতা পাতা শাখা উড়াইয়া চলে, বাতাস আজিকে হয়েছে পাগল পারা !

পবন সে আজ পাবন করে না কিপ্ত কটিকা শুধু করে মাতামাতি
প্রান্তরময় দৈত্যদানবে একি মহারণ মহামরণের, সারা দিন সারা রাতি
আকাশ ছাইয়া যেন কালো মেঘ সূর্য্যকিরণ আবরিতে মেলে ডানা
বিদ্যুৎ বিনা একি গর্জ্জন চকিৎ আলোক চমকিয়া দেয় হানা,

বিনা মেঘে হ'বে বজ্রনিপাত শঙ্কিতা ধরা করিছে মূর্চ্ছা ভয়,
অগ্নিদহন প্রতি লোমকূপে এখনি জ্বলিবে এই যেন মনে হয়।

সাগর শুকায়ে মরুভূমি হ'ল, বেলাভূমে আজ শুধু উড়ে চলে বালি
অস্ত রবির তরল শোণিমা শ্যামবীথিকার ঢেলে দিল শুধু কালি।

কাদের বক্ষশোণিত চিহ্ন পশ্চিমমেঘে করিছে মৃত্যু খেলা
কাদের জীবন-মরণ-সন্ধি আজি হ'বে ওরে এমন সন্ধ্যা বেলা ?

ওরে, আকাশে বাতাসে ভবনে ভুবনে ওকি শুনি আজ কার ক্রন্দনরোল ?
নিয়মের মাঝে একি অনিয়ম শান্তির মাঝে কেন এ গণ্ডগোল ?

চারিদিকে যেন ত্রস্তা বিবশা পীড়িতা শান্তি গুমরিয়া উঠে কেঁদে
ক্ষুদ্র মনের বিদ্বেষ দিয়ে কে আজ হায়ে রাখিল এমন বেঁধে।

ভ্রান্তির বশে শান্তি পীড়ন, ধর্ম্মের না ম একি অধর্ম্ম হায়,
মহৎ প্রাণের মহত্তাশক্তি সেও আজ দেখ লজ্জায় মরে যায়।

ধর্ম্ম নহেত পুলক নর্ম্ম তা'রে নিয়ে কেন এহেন কর্ম্ম কর
সত্য দলিয়া মিথ্যা প্রবোধ, নিয়মে ছলিয়া নিয়মদণ্ড ধর,

ধাতার আসন কাড়িবারে চাও কে এমন আজ হয়েছে শক্তিমান
অনাদি কালের নিত্যেরে আজ কি সাহসে বল করিতেছ অপমান
কে তুমি তোমার কতটুকু প্রাণ ? কিসের বল ? কেন এ অত্যাচার ?
কোন্ বলে তুমি ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মের প্রতি কর এই অবিচার ?

* কলিকাতা সি, এম, এস (St. Pauls College) কলেজের ধর্ম্ম-বিপ্লব উপলক্ষে লিখিত। সা, প্র, চ,

বাহুতে তোমার শক্তি থাকুক ধমনীতে থাক উষ্ণ শোণিতধারা
কোন মোহে তুমি হইলে অন্ধ হারাইলে জ্ঞান হইলে বিবেকহারা
তোমার আমার একই আকাশ, একই বাতাসে উভয়ে বাঁচিয়া থাকি,
তোমার দেবতা তোমার মাথায়, আমার দেবতা আমার মাথায় রাখি।

পূব পশ্চিমে একই সূর্য্য একই চন্দ্র এক গ্রহতারা নভে,
বিধাতার মোরা মানসপুত্র বহুকাজ নিয়ে আসিয়াছি এই ভবে।

—তবে কেন শুধু পায়ের দাপটে পথের ধূলায় নিজেরে অন্ধ করি,
হিংসা দ্বেষের কালি আর ঝুলে কেন দিচে তবে হৃদয় উঠিছে ভরি

তোমারা শিখাও সকল-সমতা বিশ্বপ্রেমের কত না মন্ত্রপড়
যে প্রাসাদ গড় থাকে না ভিত্তি, তোমারি মাথায় তাই আজ পড় পড়

আমরা হিন্দু আঁধারের জীব ছোট মন তাই তোমার ধর্ম্ম পড়ি
যাহা কিছু ভাল যাহা সুন্দর তাই নিয়ে মোরা নিজের জীবন গড়ি।

ধর্ম্মচিহ্ন "ক্রশ" মাখে, মনে আলেনা'ক ঘৃণা দিই না বাক্যজ্বালা
মোদের ধর্ম্ম আলোকে নিরখি বিশ্বের মাঝে সকল ধর্ম্ম আলা।

তুমি মনে কর এই অবিচার এই অনাচার তোমারি ধর্ম্মে সবে ?
তোমারি ধর্ম্ম বিবেকবুদ্ধি এই অনিয়ম হাজার কণ্ঠে কবে।
সবার উপর সকল কণ্ঠ ছাপাইয়া কার বুক ভাঙ্গা ক্রন্দন,
ঘুচে গেল ভয় জাগিল অভয়, ভেঙ্গে টুটে গেল সব বাধা বন্ধন।

বঙ্গরাণীর আসন শূন্য ভারতী ছাড়িয়া ভারতের দেবালয়,
বিশ্ব বাণীর মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকট হইল সকল বিশ্বময়।
অঙ্গহানির বেদনা কাঁদিছে বঙ্গ-ভারত-নিখিল-বিশ্বমুখে,
মোদের দৈন্য মোদের লজ্জা, মোদের দীনতা গুমরি উঠিছে বুকে।

ছুটে চল ওরে ছুটে চল ভাই, এক হয়ে দাঁড়া মায়ের চরণ তলে,
কোথায় পঙ্গু কোথায় অসাড় কোথা অক্ষম আয় তোরা দলে দলে।

আজি বিশ্বের দরবার তলে একে একে হবে আমাদেরি সুবিচার,
অপরাধী হই মাথা পেতে নেব অম্লান মুখে শাস্তি হাজার বার।
ফল নাই চাই শুধু এই জানি আমার ধর্ম্ম আমার শোণিত প্রাণ,
কলঙ্কে ভরে তুচ্ছ সে প্রাণ হবি কুল সম হেলায় করিব দান।

অজ্ঞান প্রতি কেন প্রতিশোধ ? আমরা দাঁড়াব মনের শক্তি নিয়া,
মোদের কর্ম্ম শিখাবে ধর্ম্ম, মোদের যজ্ঞ শোধন করিবে হিয়া।

তবে আয় ভাই এক হয়ে দাঁড়া আকাশের তলে পূজা-মণ্ডপে আগে,
মার আহ্বান ওই শোনা যায়, মায়ের করুণ-মূর্ত্তি সমুখে জাগে।

অমৃত পুত্র যে অমৃত তোর গোপন রয়েছে নিভৃত হৃদয় তলে,
যে আগুন তোর পাংশু-আবৃত শিরায় শিরায় আজও ঝিকিঝিকি জ্বলে,
সব নিয়ে আয় সকল শক্তি সকল ভক্তি সকল অগ্নি রাশি
আয়রে বাঙ্গালী, আয়রে আর্য্য,—মার হাসিমুখ আবার উঠুক হাসি!

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

মাসিক কাব্য-সমালোচনা

আমসী ও অর্ঘ্যবাণী, অগ্রহায়ণ—শ্রীপরিমলকুমার ঘোষের—"অন্ধকার"—

"নমস্কার—সহ নমস্কার" এই লাইনটীর মধ্যে যেমন গভীর আবেগ নাই সেজন্য ভাবাবিভাসের জন্য যে গাম্ভীর্য্য টুকুর সৃষ্টি হইতেছিল তাহাও "নমস্কারের" অত্যাচারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১ম শ্লোকে কোনো কবিত্ব নাই। "ধ্যাননিরুচ্ছ্বাস" শব্দটী কর্ণকটু। দ্বিতীয় শ্লোক হইতে একটী করিয়া পংক্তি কম। উহা আরো নিস্তেজ আরো দুর্ব্বল। ও মন্দ নহে। তবে "শুধাস্নিগ্ধের" অপব্যবহার ইহাতে বর্ত্তমান। অর্থে পুনরুক্তি।

"শব্দহীন সাধাহীন, ভাষাহীন স্তব্ধতে বিপুল
অতল রহস্য তলে অবগাহি পুলক আকুল"

ইহার না আছে গঠনভঙ্গি—না আছে কোনো মাধুর্য্য। অন্যান্য শ্লোকগুলি আরো সৌন্দর্য্যহীন। 'অন্ধকার'কে 'গাঢ় তমসার মহাগ্রাস' বলা হইয়াছে—অন্ধকার ও তমসা যেন ভিন্নার্থক। —"শূন্যের এ বক্ষে তব তরঙ্গিত কম্পন হিয়ার।" "তমসা ক্ষীরোদশায়ী যে মহান্ আদিত্য বরণ।" ইত্যাদি পংক্তির কোনো সার্থকতা উপলব্ধ হয় না।

আন্তরিকতা না থাকিলে কোনো কবিতাই হয় না। অন্তরের প্রেরণা ও ভাবের উদ্বেলিত-আবেগ যে কবিতাকে সঞ্জীবন করে তাহা এত নীরস ও নিস্তেজ হইতে পারে না। আজকালকার নবীন কবিগণের অধিকাংশ রচনাতেই তাঁহাদের অন্তরের বিন্দুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। Versificationটা অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া শুধু শব্দের উপর শব্দবিন্যাস করিয়া তাঁহারা সদ্য সদ্য কবিতা

লিখিতেছেন। তাঁহাদের রচিত অধিকাংশ কবিতাতে ছন্দোবন্ধের বিশেষ দোষ দেখা যায় না। কিন্তু কবিতাতে বিশেষ কিছু বলিবার আছে বলিয়া মনে হয় না। নিম্নলিখিত দোষগুলি তাঁহাদের কবিতাতে সাধারণতঃ দেখিতে পাই।

১। আন্তরিকতার অভাব। মাসিকপত্রে নামবাহির করিতে হইবে বলের মধ্যে কবি নাম লইতে হইবে বলিয়া জোর করিয়া রচনা বলিয়া মনে হয়। অন্তরের প্রেরণা বেদনা উদ্বেগের কবিতাগুলিকে জন্মদান করে না—কবিতাগুলি মস্তিষ্ক অথবা কুলের তৈয়ারী পুতুল।

২। শব্দবহুলতা—একটী ভাবপ্রকাশ করিতে যতগুলি শব্দের প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অনাবশ্যক শব্দ ব্যবহার।—তাহাতে ব্যঞ্জনার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। উহা অলঙ্কারযুক্ত শব্দযুগলের বর্জ্জনের মত শুনায়। শুধু কর্ণের উপর মোহজাল সৃষ্টির জন্য অনেক সময় অনুপ্রাসিক শব্দগুচ্ছের অযথা প্রয়োগ। অনেকস্থলে মনে হয় কবি যেন অনুপ্রাস বহুল শব্দপুঞ্জের একখানি খাতা করিয়া রাখিয়াছেন কবিতা রচনা কালে সেগুলির নির্ব্বিচারে ব্যবহার করেন।

৩। নিরর্থকতা—অনেকস্থলে কবিতার বহুপংক্তির কোনো অর্থই হয় না। অর্থ সুস্পষ্ট না হইলেও কোনো সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের কবিতাতে তাহাও একেবারেই নাই। শুধু পাঠক কেন—লেখকও ঐ সকল নিরর্থক পংক্তির কোনো অর্থ করিতে পারে কিনা সন্দেহ।

৪। অনাবশ্যক পংক্তি বৃদ্ধি। যে সকল পংক্তিতে কোনো সৌন্দর্য্য নাই—মাধুর্য্য নাই—চিত্রচাতুর্য্য নাই—কবিতাতে সে সকল পংক্তির প্রয়োজনও নাই—ঐ সকল পংক্তিবর্জ্জন করাই বিধেয়। তাহাতে কবিতার সৌষ্ঠব সৌন্দর্য্য হ্রাস ত হয়ই না—বরং সেগুলি না থাকিলে যেমন এক দিকে কবিতা অর্থবাহী হয় না—অন্য দিকে তেমনি কবিতা চিত্তাকর্ষক হয়।

৫। বিষয় নির্ব্বাচনের দোষ। যে বিষয়কে লইয়া সৌন্দর্য্য ফুটাইতে পারা যাইবে না—যাহার সাহায্যে শিল্প-চাতুর্য্য প্রদর্শিত হইবে না—সে বিষয় লইয়া না লেখাই ভাল। কবিতা শুধু বিষয়ের বিবৃতি নহে—বিষয় বা আখ্যানবস্তুই কবিতার মুখ্য প্রয়োজনার্থ নহে—সৌন্দর্য্য সৃষ্টির উপকরণ ও শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশের সহায়ক হিসাবেই বিষয়বিশেষের প্রয়োজন।

৬। প্রবল অনুচিকীর্ষা। নব্য কবিগণের মধ্যে যে মৌলিক ক্ষমতা কাহারো কাহারো নাই তাহা নহে—তবু তাঁহারা আপন আপন মৌলিকতার প্রকাশনে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন না। যে সকল বিষয় লইয়া পূর্ব্বকবিগণ লিখিয়া গিয়াছেন—সেই সকল বিষয় লইয়াই তাঁহারাও লিখিতে ব্যগ্র। অবশ্য পূর্ব্বচর্চ্চিত বিষয়েও যে সরসতার সৃষ্টি করা যায় না তাহা নহে। কিন্তু তাহা সাধারণশক্তি সম্পন্ন নবীন লেখকের পক্ষে উহা বর্জ্জনীয়—কারণ জ্ঞাতসারেই হোক অজ্ঞাতসারেই হোক্ পূর্ব্ব কবির ভাব একই বিষয়ে রচিত কবিতাতে আসিয়া পড়িবেই। পূর্ব্বকবির ব্যবহৃত বা সংরচিত শব্দগুচ্ছ ও নবীন কবিদের রচনায় প্রায়ই দেখা যায়। আমরা কাব্য সমালোচনার প্রসঙ্গে পূর্ব্বেও দেখাইয়াছি—নবীন কবিদের কোনো কোনো কবিতায় তাঁহাদের কাব্যাগ্রজগণের সমগ্র পংক্তিই গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বকবিগণের কল্পিত উপমা ও অন্যান্য অলঙ্কারও এই সকল কবিগণের কবিতায় খুব বেশী বেশী দেখা যায়। সবচেয়ে যাহা চোখে ও কাণে লেগে—তাহা নবীন কবিগণের রচনাভঙ্গি। সদ্যপ্রতিষ্ঠ রবীন্দ্রোত্তর কবিগণের রচনা-ভঙ্গি অনেকস্থলে উদীয়মান কবিগণ এরূপভাবে অনুকরণ করিতেছেন যে তাঁহাদের অনেক কবিতাতে ভাব যা তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ নিজের হইলেও শুধু ভঙ্গি ও আঙ্গিকের জন্য অনুকরণকে অপকরণ বলিয়া মনে হয়।

কবির পক্ষে পরিবর্জ্জনী প্রবৃত্তির খুব বেশী প্রয়োজন। আহরণী প্রবৃত্তি অপেক্ষা পরিবর্জ্জনী প্রবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা বেশী। পূর্ব্ববর্ত্তী কবির কবিতার দ্বারা পরবর্ত্তী কবির মানসগ্রহণে নিয়ত ধ্বনিত হইবার সম্ভাবনা সর্ব্বপ্রযত্নে সেই দুঃসঙ্গ নবীন কবির পরিহার করা উচিত। পূর্ব্বকবির কবিতায় অনেক সুরুচির শব্দসৌন্দর্য্য ও অলঙ্কারের প্রতি লোভ জন্মিবার সম্ভাবনা—নবীন কবির উচিত ঐ লোভ

সম্বন্ধে। কবি পূর্ব্ব হইতে যে ভাবের বা ভঙ্গির দ্বারা মুহ্যমান বা সম্মোহিত, রীতিমত কঠোর সংগ্রাম করিয়া সেই ভাব ও ভঙ্গি হইতে নিজেকে কাটাইয়া তুলিতে হইবে।

সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আহরণের জন্য নহে—ভঙ্গি অনুকরণ করিবার জন্য নহে,—আপনার সংরচিত ও কল্পিত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বা আপনার অবলম্বিত ভঙ্গি যাহাতে পূর্ব্ব কবিগণের সহিত মিলিয়া না যায় সেই জন্যই আরো নবীন কবিগণের কর্ত্তব্য পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনা মনোযোগ সহকারে পাঠ করা। এইরূপ প্রবৃত্তির সহিত কাব্যরচনা করিলে অনেক কবিতাই আর লিখিতে হয় না—অনেক কবিতা অযথা দীর্ঘ হয় না—মাসিকপত্রগুলিও চর্ব্বিতচর্ব্বণে ভারাক্রান্ত ও ক্লান্ত হয় না। স্বাধীনভাবেই দুইটী কবিচিত্ত যে একই ভাবকে কল্পভাণ্ডারে পোষণ করিতে পারে না তাহা নহে—স্বভাবতঃই দুইটী কবির রচনা ভঙ্গি যে একই রূপ না হইতে পারে তাহাও নহে—কিন্তু সে কথা কোনোযুগের বা কোনোদেশের পাঠকবৃন্দ বিচার করিয়া দেখিবে না।

নবীনকবিগণের কর্ত্তব্য পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ যে প্রকার ভাব বা ভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন সে প্রকার ভাবভঙ্গিকে পরিহার করা। এবং যদি ঐ প্রকার ভাবভঙ্গি আগেই অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনাদিগকে দুর্ভাগা মনে করিয়া ঐরূপ ভাব বা ভঙ্গি অবলম্বনে নিরস্ত থাকাই উচিত। যাঁহারা স্বামী যশঃ প্রার্থনা করেন তাঁহারা আপন আপন ভাবভঙ্গি যতই দুর্ব্বল হোক্ তাহারই প্রকাশন করুন—তাহাই বহু লেখকের অনুকরণীয় হইয়া উঠিবে।

৭। আলঙ্কারিকতার অভাব।

আলঙ্কারিকতার দৈন্য উদীয়মান কবিগণের কবিতার বড়ই লক্ষ্যের বস্তু। বয়োবৃদ্ধি ও অনুশীলনের সহিত ভাষার পারিপাট্য, ভাবের পরিপুষ্টির; ভঙ্গির নবীনতা আরও হইতে পারে, কিন্তু আলঙ্কারিকতা অনুশীলন সাপেক্ষ নহে উহা কৈশোর কাল হইতেই কবিচিত্তে অনুরিত হইবার কথা। অলঙ্করণই শিল্পচাতুর্য্যের সৃষ্টি। অলঙ্করণ ব্যতীত কবিতা শিল্প হিসাবে প্রায়ই সার্থক হয় না। অলঙ্করণের ক্ষমতা থাকিলে একটী ভাব প্রকাশের জন্য কবিকে Stanzaর পর Stanza বাড়াইতে হয় না, একটী উপমাতেই একটী পূরার পঙক্তিত্রয় বাঁচিয়া যায়—কবিতা তাহাতে অযথা দীর্ঘ ও ক্লান্তিজনক হয় না। একটী মাত্র উপমাতেই একটী কবিতা স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে। অলঙ্কার পাঠকের চিত্তে স্থায়ীভাবে দাগ করে ও চিরন্তনীয় হইয়া থাকে নবা কবিগণের কোনো কবিতাকেই উল্লেখযোগ্য বা স্মরণযোগ্য কোনো অলঙ্কার দৃষ্ট হয় না।

৮। নবীনতা ও মৌলিকতার অভাব।—সাবিত্রীপ্রসন্ন, পুলকচন্দ্র, পরিমলকুমার, ধরণীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুরেশানন্দ ইত্যাদি দু-একজনের রচনা কিছু আশাপ্রদ হইলেও অধিকাংশ আজ কবিগণের কবিতায় নূতনত্বের চিহ্ন করিবার মূলে ভঙ্গিতে প্রকাশ করিবার নূতন বিষয় লইয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াসও দৃষ্ট হয় না। প্রয়াস থাকেই সফল হয় না কিন্তু এক দিন না একদিন সার্থকতা লাভ ঘটিতে পারে। কুমুদ মল্লিকের নাথ যা কবি কুমুদরঞ্জন উদীয়মান অবস্থা হইতেই মৌলিক চিন্তা ও মৌলিক ভঙ্গির আভাস দিয়াছিলেন।

৯। শব্দের অর্থাতিরিক্ততার প্রতি অবহেলা। পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনো বলিতেছি—শব্দের অর্থই কবিতার লক্ষ্য নহে। শব্দের ব্যঞ্জনাই কবিতার প্রাণ-স্বরূপ। কবি প্রত্যক্ষভাবে কতটুকু দিতে পারেন? পরোক্ষভাবে তিনি যে দানের কারণ স্বরূপ হন তাহাই তাঁহার বিরাট দান—সে দান অনন্ত। যুগে যুগে চিত্তে চিত্তে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া বিশালরূপ ধারণ করে। অর্থ সীমাবদ্ধ—অর্থের চারি পাশে যাহা আছে তাহা সীমাতীত—কবিতার শব্দ সাহায্যে ঐ সীমাতীতের সন্ধান দিতে হইবে।

১০। নিঃশেষ করিয়া বলিবার প্রয়াস।

উপরিউক্ত প্রসঙ্গের ইহা পুনরালোচনা মাত্র। কবি যদি নিঃশেষ করিয়া সব কথা বলেন তাহা হইলে কবি নিজের প্রতি ও পাঠক সাধারণের প্রতি অবিচার করিলেন বুঝিতে হইবে। নিজের প্রতি অবিচার করিলেন এই হিসাবে যে, কবিতায় তিনি একপ্রকার বলিয়াই দিলেন "ইহা ছাড়া আমার বলিবার কিছু নাই"—তাহাতে পাঠক তাঁহার চিত্ত তাহার সম্বন্ধে অনুরূপই ধারণা করিবে। পরিশেষে করিয়া না বলিলে পাঠক ভাবিবেন কবির বলিবার অনেক কথা আছে—কবির চিত্তের সৌন্দর্য্য তাহার অনুরক্ত—

আমাদিগকে শুধু আহ্বান দিলেন মাত্র—যাহা কবিতায় অঙ্কিত রহিল তাহার সীমা নাই শেষ নাই—যুগে যুগে দেশে দেশে পাঠক তাঁহাতে আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া আপন মতিকের নব নব চিন্তাপুঞ্জ সংযোজন করিয়া তাহাকে বিশালতা ও বিরাটত্ব দান করিবে। কাজেই নির্দেশ করিয়া বলিবার প্রয়াসে কবির হয়েই ক্ষতি। পাঠক সাধারণের প্রতি অবিচার এই হিসাবে যে কবি পাঠককে যেন মনে করিতেছেন তাহাদের ভাবিয়া বাহির করিবার কোনো ক্ষমতা নাই—সৌন্দর্য্যের সমগ্রতা রচনা করিবার জন্য পাঠকের যেন সাহায্য করিবার কিছু নাই—যাহা স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া না হইবে, তাহা যেন পাঠক ভাবিয়া করিয়া লইতে পারিবে না।

কবিতায় নির্দ্দেশ করিয়া বলিবার প্রয়াস দুই ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। বর্ণনাত্মক কবিতায় বর্ণনীয়কে খুঁটানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ করা একপ্রকার। আর একপ্রকার ভাবাত্মক কবিতায় দৃষ্ট হয়—কবিতার মধ্যেই ভাবের টীকা টিপ্পনী ভাষ্য সমালোচনা বিশ্লেষণ বস্তু রসের পরিচ্ছদেই দৃষ্ট হয়। ইহাতে কাব্য আর কাব্য থাকে না—গদ্য হইয়া পড়ে—সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায় চারুর্য্যের অভাব কবিতাকে নিষ্প্রভ ও দুর্ব্বল করিয়া দেয়,—ভাবের তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হইয়া যায়।

স্বাধীন চিন্তা, অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণের অভাব। উপরিউক্ত তিন উপায়ে কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। নবীন কবিগণের মধ্যে অধিকাংশেরই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার প্রয়াস দৃষ্ট হয় না সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নিসর্গের রূপভাণ্ডার ফুরাইবার নহে—স্বাধীনভাবে চিন্তা করিলে বিশ্ব প্রকৃতির ও মানব প্রকৃতির নব নব রূপ মানস চক্ষে উদ্ভাসিত হইবে।

ইতিহাস পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্য পাঠে যে উপাদান আহরণ হয় তাহাকে বর্ত্তমান যুগের সৌন্দর্য্য চারুর্য্য কবিত্বময় ভঙ্গিতে প্রকাশ করিতে পারিলে পরম উপাদেয় হইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ কবিতায় যেন উপনিষদ্ পুরাণ ইতিহাস সাহিত্য হইতে অজস্র উপাদান আহরণ করিয়া নব নব সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতেছেন—তাঁহার কবিতায় যখন ঐ সকলের ইঙ্গিত ও আভাস মধুর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিতেছে allusion সুপ্রযুক্ত হইলে কবিতার গরিমা যে কত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নবোদ্ভিত কবিগণের কাহারো কাহারো কবিতা পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

রবীন্দ্রপূর্ব্ব বঙ্গসাহিত্য ও অন্যান্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থগুলির অধিকাংশই পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদি হইতে আহৃত উপাদানের সাহায্যে সংরচিত নবীন কবিগণের উচিত পুরাতন সাহিত্য ইতিহাস ইত্যাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করা। গভীর অধ্যয়ন ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে সুকবি হওয়া বড়ই কঠিন। অতিরিক্ত অধ্যয়নে কাব্য প্রতিভা ম্লান হইয়া যাইবার আশঙ্কা—কিন্তু বিনা অধ্যয়নে কাব্য প্রতিভা আজ কাল একেবারেই বিকশিত হইবেনা। শুনা যায় অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলে Gray প্রথম শ্রেণীর কবি হইতে পারেন নাই এবং Miltonকে অনেক আহৃত বিদ্যা ভুলিতে হইয়াছিল—কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে—মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলেই তাঁহাদের ভগবদ্দত্ত শক্তিকে পরম প্রজ্ঞালাঞ্ছিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলেই আহৃত উপাদানকে সুজীর্ণ ও নিজস্বীকৃত ও কল্পনার আলোকে সুবিচ্ছুরিত করিতে পারিলে কবি প্রতিভার হানি না হইয়া সমৃদ্ধিই সাধিত হয়। অধ্যয়ন ছাড়াও আর এক উপায়ে কবি প্রতিভার সমৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে—তাহা পর্য্যবেক্ষণ। পর্য্যবেক্ষণ ও একপ্রকার অধ্যয়নই। পর্য্যবেক্ষণ মানব রচিত গ্রন্থ পাঠ নহে—উহা বিধাতৃ রচিত বিরাট নিসর্গ গ্রন্থ পাঠ। মহাকবি Shakespeare ও Wordsworth এই বিরাট গ্রন্থ পাঠ করিয়াই অমিতীয় কবি হইয়াছিলেন। মানব রচিত গ্রন্থ পাঠ অপেক্ষা ভগবানের এই বিরাট গ্রন্থ পাঠ অধিকতর শক্তিসাপেক্ষ। যাঁহারা মানব রচিত গ্রন্থ পাঠ করিতে পরাঙ্মুখ তাঁহারা নিশিদিন এই বিরাট গ্রন্থ পাঠ করুন। কবির চক্ষু লইয়া যিনি জন্মান নাই তিনি শত চেষ্টাতেও কবি হইতে পারিবেন না। যেমন সঙ্গীতের কর্ণ লইয়া না জন্মাইলে কণ্ঠের নিয়ত কসরৎ সত্ত্বেও কেহ গায়ক হইতে পারে না। দার্শনিক দৃষ্ট চক্ষে "বিশ্বসত্য কিংবা

ঐকি" ইহাই মীমাংসা করিবার জন্য ধ্যান করক কিন্তু কবি বলিবে—

"আমি ততক্ষণ বসি নিনিমেষ চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।"

দিনের আলোকে বিশ্বকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইলেই নিশার আঁধারেও কবি Paradise Lost লিখিতে পারিবেন।

এই প্রসঙ্গে দুইজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির নাম করা যাইতে পারে। কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত রচিত গ্রন্থ পাঠে কবিতার উপাদান সংগ্রহ করিয়া যে অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক গ্রন্থ পাঠে যে অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিতেছেন তাহা নবীন কবি মাত্রেরই প্রণিধান যোগ্য।

১২। ভাষার দোষ। ব্যাকরণ দোষত অসংখ্য। ব্যাকরণ দোষের কথা না ধরিলেও ভাষার অজ্ঞাতসারে সকল দোষ দেখা যায় তাহাও অল্প নহে।

নব্য কবিগণের অধিকাংশেরই শব্দ সম্পদ নাই। শব্দ সম্পদের অভাবে মিলের চারুর্যের বড়ই অভাব। একই প্রকারের মিল বহু স্থলে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব কবিগণ যে সকল মিল ব্যবহার করিয়াছেন—সেই সকল মিলই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ইঁহারাও ব্যবহার করেন শব্দ সম্পদের অভাবতা থাকিলে নূতন নূতন মিল দিতে পারিতেন।

শব্দসম্পদের অভাবে অনেক স্থলে ভাবপ্রকাশ অতি কষ্টকৃত বলিয়া বোধ হয়। নব্যকবিগণ অনেক শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত না হইয়াই যথেচ্ছা ব্যবহার করেন—তাহাতে কবিতার কোন অর্থই হয় না। যে স্থানটীর জন্য ঠিক যে শব্দটির ব্যবহার দৃষ্ট, এবং নিষ্ট তাহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না।

অধিক ললিত মধুর শব্দে ভাণ্ডারে না থাকিলে—মাধুর্য্য সৃষ্টি করাও সম্ভব নহে। "মধুবন মধুবন" ও "পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমরে অলি কুঞ্জে কুঞ্জে" জাতীয় কতকগুলি চির প্রচলিত ললিত পদের Permutation ও Combination ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না।

সাহিত্য সৃষ্টির জন্যই যে ভাষার মাধুর্য্য সৃষ্টির জন্যই হউক সুন্দর শব্দ সম্ভার সম্পূর্ণ আয়ত্ত থাকা প্রয়োজন এবং সকল শব্দের যথাযথ অর্থ প্রচলিত অর্থ পুরাণ ও সাহিত্যের সহিত সমস্তরূপ অর্থ সবই জানা থাকা চাই। শব্দের ধ্বনি শব্দের ব্যঞ্জনা, শব্দের ওজঃ ও শক্তি সমস্তই সম্পূর্ণ আয়ত্ত থাকা উচিত, শব্দের ভাসা-ভাসা, ঘোর-ঘোর অর্থজ্ঞান লইয়া শব্দের প্রয়োগ করিতে গেলে তাহার অপব্যবহারই করা হইবে। "পুলক" "ওঙ্কার" "স্পন্দন" "অন্তরতম" "কম্প" "লোল" "ভাষা" "পিনাক" ইত্যাদি কত শ শব্দ যে অপ-প্রয়োগ দৃষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কত সুসংস্কৃত পরি-মার্জ্জিত শব্দের সহিত গ্রাম্য ও ইতর শব্দের একত্র সমাবেশে ওজ-চণ্ডালী দোষের সৃষ্টি হইতেছে তাহারই বা কে হিসাব রাখে?

কবিতার অবয়বের কথা শুনিলে ইঁহার নবীনকবিগণ হাসিয়া বলিবেন "সমালোচনা ইস্কুলের পণ্ডিতী নহে।" কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা যা-খুসি তাই বাক্যবিন্যাস করিয়া যাইবেন তাহার ক্রিয়া কর্ত্তা কর্ম্ম কিছুই ঠিক করিতে পারা যাইবে না—তাহাও সহ্য করা কঠিন। কবিতা লিখিতে বসিলেই মিয়মুণ হইয়া প্রলাপ বকিলেই চলিবে না—কবিতা কবিতা বলিয়াই উহাতে Logical Sequence পর্য্যন্ত থাকিবে না—ইহা যেন কেহ মনে না করেন। পক্ষা-ন্তরে—ভাবোচ্ছ্বাস বা emotionকে logicএর গণ্ডীতে সুসম্বদ্ধ করাই প্রকৃত কবিতা। এই Logical obliga-tion এর জন্যই ভাষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। শব্দ পরম্পরার সাহায্যে মনে সুস্পষ্ট চিত্র আপরিত করা চাই—যেখানে চিত্র ফুটান উদ্দেশ্য নহে সেখানে শব্দ ঝঙ্কার যেন রহস্য ভাণ্ডারের ভূমিকার কাজ করে। যে ভূমি-কাতে যে ভাণ্ডারটীর দ্বার মুক্ত হইবে ঠিক সেই ভূমিকাটি ব্যতীত অন্য সমস্তই ব্যর্থ হইবে—কারণ এক ভূমিকাতে একাধিক দ্বার উদ্ঘাটন হইতে পারে না—যে রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে হইবে তাহারই উপযোগী ভূমিকাই সেখানে প্রয়োজন।

এক শব্দের অনেক গুলি প্রতিশব্দের মধ্যে মূলতঃ সকলেরই অর্থ সমান নহে—ধ্বনি সমান নহে—শক্তি ও ওজন ও সমান নহেই। ভিন্ন অক্ষরের শব্দের প্রয়োজন বলিয়া একার্থ বোধক যে কোনো শব্দ লাগাইলে চলে না—ছন্দের দোষ না হইলেও ভাব প্রকাশের দোষ ঘটিতে পারে। যে

যে ভাষা হইতে যে শব্দের জন্ম হইয়াছে—সে শব্দ সেই অনুযায়ী ভাবের কবিতাতেই ব্যবহার করা উচিত। শব্দ সঙ্কেত মাত্র নহে—শব্দের অর্থ ও শক্তি আছে এবং সে হিসাবে প্রত্যেক শব্দের শক্তি ও অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই জ্ঞানটী ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়া এবং শব্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার লইয়া তবে কাব্য রচনা করা উচিত।

এ সকল বিষয়ে অনেক বলিবার আছে। যথাস্থানে আরো বলিবার ইচ্ছা রহিল এবং সমালোচনা কালে যেমন যেমন প্রয়োজন হইবে—তেমনি-তেমনি সে সকল কথা উত্থাপন করা যাইবে।

আজীর উষা সঙ্গীত। শ্রীঅতুল প্রসাদ সেনের। কাব্য-মাধুর্য্য বিশেষ কিছুই নাই—সঙ্গীতে হয়ত মন্দ শুনাইবে না।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের—"বেহালা।" কবি বলিতেছেন তিনি 'পূর্ব্বজনমে' কোনো গুণীর হাতের বেহালা ছিলেন—এ জনমেও তিনি বেহালাই—তবে কালের কীটে কেটেছে তার,'—এবং ছিন্নতারে টান না সহার জন্ত (শুধু সেই জন্তই কি ?) তাঁর কীণ ছুটো লাল হয়ে ওঠে—

কবি তাই বাজারের মধ্যে "আপনাকে টাঙিয়ে রাখেন।" অর্থাৎ বাজারের মধ্যে উহ্যজনের সাহায্যে পরজন্মের জন্ত চেষ্টা করেন। যাক্। যতীনবাবুর এ কবিতার সৌন্দর্য্য পাইলাম না বোধহয় আমরা গুণী নই বলিয়া "হাতের যন্ত্রণা"কে চিনিতে পারিলাম না।

"বিশ্বরাজের বাজার" ভাল শুনায় না। কবি—

"প্রভাত শিশুর কলরাগে
সন্ধ্যাবধূর গৃহত্যাগে
নিশাযোগীর শুদ্ধ ধ্যানের আসনে"

বেহালাকে সাধনাইতে পারেন না। ইহার সার্থকতা ও সৌন্দর্য্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইল না। কবিতার ভাষা বড়ই এলোমেলো—

"মা" শ্রীসুধীরঞ্জন মল্লিক রচিত। কবিতা অন্তত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতার শেষাংশে কবিবর দেবেন্দ্র নাথের "মা" কবিতার ছায়া পড়িয়াছে।

"ইন্দিরা হয় স্বর্গঘটে"—বোধ হয় "ইন্দিরা হয় স্বর্গঘটে" হইবে কবিতায় ১।১টী পংক্তি মন্দ হয় নাই।

"শিশু" শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন বাবুর অপদার্থ কবিতা—বিন্দুমাত্র বিশেষত্ব নাই—মানসীর এসংখ্যার কবিতাগুলির মধ্যে নিকৃষ্টতম। পৃথিবী কথার প্রতিশব্দগুলি শিখানর জন্তই বোধ হয় এ কবিতা রচিত। এই ১২ লাইন কবিতায় ২টী বসুন্ধরা, ১টী বসুধা, ২টী বিশ্ব, একটী মর্ত্ত, ১টী ধরা বর্ত্তমান। আরো অন্ত লাইন কবিতাটি চালাইলে বোধ হয় মহী, পৃথ্বী ইত্যাদি ২।১টী যাহা বাদ গিয়াছে তাহারো স্থান হইতো। তারপর উপমার বাহার ও বহর দেখুন—

"লক্ষ্মী সম লক্ষ ধারায় করলি সুধাদান"
"তুই যেন ভাই বসুন্ধরায় বসন্তেরি শিক"
"বিশ্ব দোলে নর্ত্তনে তোর চপল নদীর প্রায়"
"নিরাশ প্রাণের জন্ত পটে আশার ছবিখান"

শেষকালে কবি বলিয়াছেন—

"স্নেহের মধুর যৌতুক তুই আর্ত্ত বসুধার"

কবি যখন শিশুকে "ভাই" সম্বোধন করিতেছেন—তখন কবিও বোধ হয় অল্পবয়স্ক। এই সকল কবিতা দেখিয়া মনে হয় "মানসী মর্ম্মবাণীর" কবিতা নির্ব্বাচন আর পূর্ব্বের মত হইতেছে না। যে পত্রিকার সম্পাদক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রসজ্ঞ কবি যে পত্রিকায় আজও সুন্দর সুন্দর কবিতা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে তাহার এদুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয়—

যে সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিগণ মানসীতে নিয়মিত কবিতা লিখিতেছেন—তাঁহারা আজ কোথায় ? মহারাজের সুললিত কবিতাও আর মানসীতে দেখিতে পাই না। মহারাজ নিজেই মানসীকে অঙ্গীকার করিতেছেন না—অপরে মানসীর কাব্যসম্পদ বাড়াইবার চেষ্টাই বা করিবে কেন ? আমাদের অনুরোধ মানসীর সম্পাদকগণ কবিতাবিষয়ে একটু মনোযোগী হউন।—মানসীর মর্য্যাদা রক্ষা করুন—প্রবন্ধ ও গল্প অন্যান্য পত্রিকাতেও ভাল ভাল প্রকাশিত হয়—এক উৎকৃষ্ট কবিতাই মানসী ছাড়া অন্য পত্রিকায় থাকে না।

ভারতী—অগ্রহায়ণ। "এলো শীত ফিরে ফুরালো" শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী। অতি সুন্দর প্রকৃতি গাথা।

ভাষাসৌষ্ঠব—বর্ণনা কলাকুশল—শিশিরাশ্রমের স্নান ধূসর-বৈরাগ্যে সমগ্র রচনাটী গম্ভীরসুন্দর।

অর্চ্চনা—অগ্রহায়ণ। শেষ নদী—শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক চিত্ত। বিশেষত্ব বর্জ্জিত।

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ। এবার সকল পত্রিকাতেই কবিতার অভাব। সম্পাদকগণ কবিতা ভাল বাসিতেছেন না।—না,—কবিরা ভাল লিখিতে পারিতেছেন না:—অথবা কবিরা নীরব হইয়াছেন! কোন্‌টী ঠিক? সবগুলিই কিছু কিছু ঠিক বলিয়া মনে হয়। এবার প্রবাসীর অগ্রহায়ণের পথের সম্বল শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবীর "পাখের।" তাও "দেশের কথাটা" যদি চারু বাবু আর' কয়েক পংক্তি বাড়াইতে পারিতেন তাহা হইলে "পাখেয়ের" স্থান হইত না, "পাখেয়" যে কোন্ বাসের পথের সম্বল হইত তাহাও কিছু ঠিক ছিল না। যাক্—অগ্রহায়ণে শ্রীমতী শান্তা দেবীর দেওয়া "সিঁথির সিঁদুর"টা ছিল আর এই হাতের লোহা—ইহাতেই নিরাভরণা পত্রিকার কোনরূপে সধবা লক্ষণ রক্ষিত হইয়াছে।

কবিতায় আন্তরিকতা আছে—কারুণ্যও আছে—

"মুছিয়া গিয়াছে সন্ধ্যাসিঁদুর
পশ্চিম গগন ভালে
সন্ধ্যা তারকা কম্পিত হাতে
একটী প্রদীপ জ্বালে।"

বড়ই করুণ। সঙ্গীতটির একটী পংক্তিতে একটু ছন্দের দোষ হইয়াছে।

ভারতী ফাল্গুন—শরৎ সুন্দরী অতি সুন্দর কবিতা। সবগুলিই তুলিয়া দিলাম—

হাতে মুখ আড়াল করে'
কে যায় পথের বাঁক দিয়ে।
আঁখি ওর কার পানে ধায়
আঙুলগুলির ফাঁক দিয়ে।
সখীরা জানলে না কেউ
হৃদয়ে উঠ্‌ল কি ঢেউ—
হাসি ওর খুসী ভরা—
ধায় নিকষে আঁক দিয়ে।

দুটী ঠোঁট যায়না ব্যাখা, ব্যাথা ঠিক যায়না হাসি
বাঁকা চোখ মিটির চায় ফোটালে শিউলি রাশি।
কাঁখে ওর কলসী আখির
মেঘেছে দুলটী মোতির
মেঘেছে কোঁকড়ান চুল
চাঁদ কপালে থাক দিয়ে।

গোপনে হাসিটী ওর দেখে কি সাঁজের রবি
পুলকের পাল্লা খানির আকাশে আঁকায় ছবি
মেঘে তাই ভাবে কি ও
সবারে রমণীয়।
ম'ল সব মাতাল আঁখি তোমরা যেন পাক দিয়ে।

আলোকে ঝিলিক ফোটে রূপসীর চলন লীলায়
কুমনে কত যে ওঠে হাসি ওর বেমনি বিলায়'
ও কি গো যাদু মেয়েলী—
হাসে কি যাদুকা থালি
আঁখি ওর চায় না শুধুই যায় নীরবে ডাক দিয়ে।

স্বর্গদূত—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রকাণ্ড কবিতা। কবিবর দেবেন্দ্র নাথের 'বিরাট মঙ্গল' 'ক্ষুদ্র মঙ্গল' জাতীয় বিরাট কবিতা। এতে সব আছে—কন্দর্পের কুসুমশরের অত্যাচার, প্রেমের উদ্বোধনা, প্রলাপ' আলাপ, বিলাপ, শৈশবে তত্ত্বকথা। কতকটা বাহেলী কতকটা ওমার খায়েমী শেষটা একেবারে তত্ত্বথরি। কবির প্রথমাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈরাগীর কোলায় মালা জপ পর্য্যন্ত। যেদিন হইতে কবির মনে অনেক ভাল ভাবনা জন্মিতেছিল সেই এক কবিতাতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, এক কবিতাতেই সব অবয়ব সজল না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় প্রকাশ করিলেই ভাল হইত। অনেক স্থলই ভাল বুঝা যায় না। স্থলে স্থলে বড়ই রমণীয়—

"চাঁদলো গেঁজে ঘরের আড়ী এক চুমুকে
নিশেষিয়া তার
ইন্দ্রিয়েরা বাইরা ঘরে যায়।"

"বুড়ো ঘরেই রেখিলো চাঁদ আমার সাথে-সাথে
মেইদে চুমু খায়ন জোছনাতে

চুমকেরি চীনে চীনেকুসুম যখন ছিন্তে হাতে হাতে
চীন পতিত কুলের মেয়েদিয়াতে
"পুজার সাজির অপরাজিতা ফুটছে আমার
সন্ধ্যাবধির পানে
মিঠা বিষের যখন শেষে আনন্দ সন্ধানে।"

"বিদায়ের পথে"—অনুবাদ,— প্রিয়ম্বদা দেবী রচিত কবিতা। রচনা সুন্দর।

"প্রতি তীর্থ দ্বারে তুমি যে প্রহরী
অধিষ্ঠিত প্রত্যেক মন্দিরে
আমার আরতি পূজা যান চির তরি
জাগে শুধু তোমারে ঘিরে।"

লেখিকার শুষ্কপ্রায় বেদনাতুর চিত্তকুহরে সমবেদনাপন্না বিদেশীয়া লেখিকার হৃদগত ভাবের প্রতিধ্বনি। "চোখ ভরে' দেখি আর"—উক্ত লেখিকারই—। চলন সই।

পরিচ্ছন্নচিত্তিকা পৌষ—প্রথমে সম্পাদিকার "বাতা।" "ঘুমন্ত খোকা" শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের।—লেখার চেষ্টা, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের মত করিবার চেষ্টা হইয়াছে—"একটা যেন" "একটা শোভা ছুটিতে পড়ে" "মূর্চ্ছিত এক বাঁশীর তান" ইত্যাদি শব্দ বিন্যাস অনেকটা দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা স্মরণ করায়ে দেয়।

প্রথম Stanzaতে কবিতার অর্থ করাই কঠিন। কবি "লুকায়নি যা ও লুকায়নি যা"র মিলের লোভে প্রথমেই ভাবটিকে দুরূহ ও দুরারোহ করিয়া তুলিয়াছেন।

"বিপ্রহরের নায়র বুকের ছায়াঘিত পুলক শ্রীতি শুদ্ধ দিমুম বনের স্বপন, অন্তরিত বেণুবীথি" এই অদ্ভুত ভাষা বিন্যাসের আমরা কিছুই সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। "মুকা ফলের মিলায়ে যাওয়া" কিরূপ? ফলের সহিত উপমা দিলে কোনো রূপ মিলাইয়া দিলে চলিবে কেন? কবি এ কবিতায় আলঙ্কারিকতার আত্মপ্রাদ করিয়াছেন। খোকা মানব গৃহের সন্তানদের পুরোহিত, এই পুরোহিতের, (কোপাকুলীর খোঁচার মত) বন্ধুকের বাবে পাতালে গোপবতী প্রবাহিত। খোকার ঘুমের ঘোর মন আলোকের মত জ্বলছে। সব ধ্বংস আমাদের কঠিন ঠেকেছে

"স্বর্গে তোমার কত ফুল কান্না হাসির সামাযোগে
উদয়াস্ত পরাহতি জীবন মরণের ভোগে।" কবি ঘুমন্ত খোকাকে বুঝাইবার জন্য অনেক abstractionএর সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু কোনোটিই সুন্দর হয় নাই।

"কাহার হাতের মণিমণি ছিঁড়ে রেখায় পড়লো এসে
তড়িৎ এক প্রাণের যেন ঘুমায়নাক বকের বেশে
• • •
গৃহের তলে স্থির চপলা, মূর্চ্ছিত এক বাঁশীর গান
একটা মোহন ইন্দ্রধনু, ক্লান্ত নদীর কলতান
ঘুমায় খোকা এক অপরূপ সৃষ্টি যেন নির্বিবেদ
একটা যেন আলিঙ্গনের ব্যাকুল বাহু নিরুদ্বেগ।"

রচনায় স্বতঃ স্ফূর্ততা নাই ছন্দের প্রবাহ নাই ভাষার লালিত্য নাই স্বচ্ছতা নাই সরলতা নাই। সবই আড়ষ্ট ও কষ্ট কল্পিত।

গান। শ্রীমান পরিমল কুমারের। রচনায় মাধুর্য্য আছে। রবীন্দ্র নাথের প্রতিধ্বনিও সুস্পষ্ট।

বন্দী। পুলকচন্দ্র সিংহের "শুধু কভু চন্দ্রবদন মেঘের অভিমানে" "অভিমানের মেঘে" কে মিলের খাতিরে কি কবি 'মেঘের অভিমানে' লিখেছেন? "কঠোর তব বক্ষ-শোণা বুকের ধারে থাকে" সুরচিত নহে। "ভুবন সাদা" বা "বিষলাল" সাধিতা অচল। মোটের উপরও কবিতাটি ভাল হয় নাই। "অপহৃত"—শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা কবিতাটিকে একেবারে অপহৃত না বলিলেও ভাবটিকে আহৃত বলা যাইতে পারে। কবি ১৮ লাইনের উপর এক লাইন কাট দিয়াছেন।

কবি সত্যেন্দ্র নাথ—যৌবনকে জয়মালা দিয়াছিলেন, কবি কালিদাস "বিরহের দান" নামক কবিতায় যৌবনের জয় মালাকে নিজেই পরিয়াছেন। "বিষাদে" শ্রীপ্রভাবতী দেবী। চলনসই।

অন্তঃপুর। "আলোর খেলা" শ্রীরবীন্দ্র মোহন রায়টী সুরচিত। বহুস্থলে লঘুক্রিয়া হইলেও কবিতার রচনা চারুতা পাঠককে মুগ্ধ করিবেই। রচনায় প্রবাহ সুন্দর যথা "অরুণীর স্থির ভিখারীর মত"। শুধু রচনা অভিটীর মত রঙীন বায়ুর কবিতা আমাদের ভাল লাগে। অবশ্য রঙীন

বাবুর দেবার খুব বেশী নাই।—তাঁহার ভাণ্ডারের সম্বাদ্‌টীকা বন্ধ। কাব্য ক্ষেত্রে তাঁহার সাধনা বহুদিনকার। আজ তাঁহার "শিখে শিখে পাকল মাথা দেখে দেখে বৃষ্টি হলো ফাঁক" কিন্তু আজো তিনি কাব্য সাহিত্যে কোনো নবীনত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না। কবিবর রবীন্দ্র নাথের এমন সকল অনুকরণ আর কোনে কবি করিতে পারেন নাই। রচনা ভঙ্গি দেখিয়া রবীন্দ্র নাথের রচনা বলিয়া সহসা ভ্রম জন্মে—অবশ্য সে ভ্রম বেশীক্ষণ থাকে না। কবি রবীন্দ্র মোহনের কবিত্বশক্তি নব নব উন্মেষ শালিনী নহে।

বসন্তকুমার বাবুর উচিত রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় রচনা ভঙ্গীর উন্নতি সাধন করা।

"ঘুমের ঘোরে"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ঘুমের ঘোরে কবি যা লিখে ফেলেছেন তাহার কতক সরস কতক অনরস। মাঝে মাঝে দুএকটি পাইন বেশ সুন্দরই।

"রামধনু দিয়ে জোৎস্না ধুনিয়ে রচ তারে রাঙাবাস"
"অঞ্জনাসরে শত সহস্র নয়ন কমল ধর
তারি পরে ঐ রেখেছ তোমার রক্তচরণ তল।"
"কণ্ঠে দুলালে মিলন মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা
সদা ক্ষীণ শিশু কুসুমের কচি মুণ্ডেরমালা।"

বরং কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কেশ একটু অতিনবত্বের আবেশ আছে। কিন্তু ইনফিনিয়ার কবির তেমন সাধনা কই? নদীয়া জেলার কবিরা সকলেই দেখছি একটু পিছে। গিরিজানাথ বাবুর ও ১২ বৎসর অন্তর পুস্তক বাহির হয়, করুণাবাবুরও প্রায় তাই, রবীন্দ্রনাথের ও এখনো পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এঁদের মধ্যে কবি রবীন্দ্রমোহন একটু দ্রুত। এঁদের তুলনায় বর্দ্ধমান জেলার কবিরা একটু দ্রুততর চলেন। কুসুম কালিদাস বসন্তকুমারের লেখনীর বিশ্রাম নাই। ইহাদের মনে রাখা উচিত—

"বিশ্রাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।"

ভারতী—পৌষ। "চোখের দেখা" শ্রীযোগিন্দ লাল মজুমদার রচিত। কবিতায় প্রথমাংশের সহিত শেষ শেষাংশের সুসঙ্গতি নাই। মনের সহিত কাঁচ পোকার উপমাটি পড়িয়া বড়ই নাড়াচাড়ি হইয়াছে। কবিতায় কয়েকটি লাইন আমাদের ভাল লাগিয়াছে—

"ঠোঁটের রাঙা—চোখের হাসি কালো
নিশীথশাসর দাঁতার দেওয়া বাকা চাঁদের আলো।"
"কুসুম কোথা সুরু কোথায় সন্ধ্যা নাহি চেনে
না ওর ঠাহর চুলের ছায়া তলে।"
"ঘন্টেক স্বপন বকের পাখার মত
চোখের আগে ভিড় করে সব কত।"

যোগিন্দ্রবাবুর হাত বেশ মিঠে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

"কবির তিরোধান"—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কাব্যে কবি গোবিন্দ দাসের মৃত্যুতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ নবীন কবির কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন দেখিয়া পরম সুখী হইলাম। আমরা লক্ষ্য করিতেছি, কবি সত্যেন্দ্রনাথের খাঁটি জিনিসের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ভণ্ডামি ও ফুয়ো জিনিসকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না বলিয়া তিনি অনেকের অপ্রিয়।

কবি গোবিন্দ দাস ছিলেন "স্বভাব কবি" তিনি বিদ্বান ছিলেন না, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছিলেন না। তিনি পুরা কবিদলের কাব্য অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদের প্রভাবে কবিত্ব শক্তি লাভ করেন নাই, তিনি স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্য হইতে কাব্যের উপাদান আহরণ করেন নাই। তিনি ছিলেন স্বয়ম্ভু কবি, প্রকৃতিদেবী তাঁহার কাব্য প্রতিভার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি প্রতিষ্ঠা পিপাসু ছিলেন না, তিনি সময়ের রথচক্রে সভাগৃহে সাহিত্য পরিষদে সাহিত্য সম্মিলনে এমন কি মাসিক পত্রিকাতেও আপন প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন নাই, তিনি কখনো নিজের চক্কা নিজে বাজান নাই, তিনি নিজের রচনা বাজারে যাচাই করেন নাই, তাঁহার বিজ্ঞাপনের খরচা ছিল না।

তিনি চির পল্লীবাসী। বিংশ শতাব্দীর কলাকলার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। ধনী লোকের সহিত বন্ধুত্বের প্রয়াস করেন নাই, নগরবাসের সুযোগ সুবিধাও তাঁহার ছিল না।

তিনি ছিলেন তেজস্বী কবি। তিনি কাহারও উপাসনা করেন নাই, কবিতায় কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষকে তোষামোদ করেন নাই। লোকপ্রিয়তার জন্য তিনি আপনার চিত্তবৃত্তি বিসর্জ্জন দেন নাই, লোকরুচিকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার চিন্তার ধারাকে পরিবর্ত্তিত করেন নাই। আপনার হৃদয়ের ভাবপুঞ্জকে এমন নগ্নভাবে এমন সরল ও নির্ভীক ভাবে কেহই প্রকাশ করিতে সাহসী হয়েন।

তিনিছিলেন খাঁটি কবি। যা সরস্বতীর কোনো সেবক, যা লক্ষ্মীর একতুর অকৃপা লাভ করেন নাই। অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে যে সকল নীচতা হীনতা ও আত্মাবনতির প্রয়োজন হয় তাঁহার তাহার কিছুই ছিল না। বাংলার ধনীলোকেরা অনেক সদনুষ্ঠান করিতেছেন, ধনী সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকগণ সাহিত্যের জন্য বহু ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু হায়! বোধ হয় কবি বলিয়াই তাঁহার দুঃখমোচনের কেহই চেষ্টা করেন নাই। চিরদারিদ্রাই তাঁহার চিরোধানকে নিকটতর করিয়াছিল। দারিদ্র্য ব্যতীত অন্যান্য শতসহস্র যাতনা তাঁহার ললাটে ঘটিয়াছিল, সে সকল কথা আলোচনা করা যায় না। কবি সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতায় সকল কথারই ইঙ্গিত আছে। কবিতার একটী stanzaবড়ই সুন্দর হইয়াছে—

"এই দুনিয়ার এক্‌টী কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের চেয়ে কাঁটার জ্বালা গলে
পাতার ঢাপা সরটুকুনে পুবে হাওয়ার বেহুলা-নীড় ভেঙ্গে
পাকল চাপা রইল কপাল, বাদ্‌লা করে রইল চোখের জলে।"

এই সংখ্যায় ৺অজিতকুমারের শেষ যাদকাবারী আছে। অজিতকুমারের কথা বলিতে চোখের জল সম্বরণ করা যায় না। বঙ্গসাহিত্যের বড়ই দুর্ভাগ্য যে অজিতকুমারের ন্যায় এমন শক্তিশালী লেখক অকালে পরলোক গমন করিল। আমরা এইপ্রতিভাবান লেখকের নিকট কত যে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিয়া বলা কঠিন। চারিদিকে চাহিয়া অজিতকুমারের সমকক্ষ গদ্য সাহিত্যের লেখক খুব অল্পই দেখি। যাঁহারা একজনকে তাহার সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেছে তাঁহারা উত্তরকালে অজিতবাবুকে পরাভূত করিতে পারিবেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। এমন তেজস্বী লেখক নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে ক'জন আছে?

তিনি যাহা সত্য বলিয়া জানিতেন তাহাকে রীতিমত পূজা করিতেন, লোকসাধারণের অপ্রিয় হইলেও তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন তাহা প্রবাদ প্রয়োগ সহ দেখাইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতেন না। তাঁহার যৌবনের তেজস্বী চিন্তা সবই যে অভ্রান্ত ছিল, তাহা আমরা বলিতেছি না, ভগবান তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিলে হয় ত অনেক মতের পরিবর্ত্তন অথবা পরিপোষণ হইত। তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারি নাই, কিন্তু তবু তাঁহার নিকট আমরা খুবই ঋণী তিনি যে সকল আলোচনার অবতারণা ঘটাইয়াছিলেন তাহাতে অনেককেই যেন রীতিমত চিন্তা করিতে হইয়াছিল, অনেক জ্ঞানী ও মনীষীকে রীতিমত আয়াসের সহিত তাহার খণ্ডনের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, অনেক নীরব কর্ম্মীকে মুখর হইতে হইয়াছিল, অনেক নীরব কর্ম্মীকে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল। অজিতবাবুর যুক্তিতর্ক হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার মত দুর্ব্বল ছিল না, তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেককে অনায়াস গবেষণাদি দ্বারা বল আহরণ করিতে হইয়াছিল।

অজিতকুমারের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী, পরম বন্ধু অপেক্ষাও অধিকতর শ্রদ্ধনীয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি প্রতিযোগী হইলেও তাঁহাকে পরম বন্ধু ও সহৃদয় সহযোগী বলিয়াই জানিতাম।

তাঁহার মত তিনি সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অনেক বন্ধু বান্ধবের নিকটও অপ্রিয় ও কটু কথা শুনিতে হইয়াছিল। আজ নিশ্চয়ই তাঁহারা বড়ই অনুতপ্ত।

যাঁহাদের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল যাঁহারা তাঁহার নিত্য সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা যে আজ কিরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছেন তাহা অনুমেয়, কারণ তিনি শুধু সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি সুরসিক মিষ্টভাষী সুকণ্ঠ সুগায়ক বন্ধুবৎসল সহৃদয় চরিত্রবান ও মজলিসী লোক ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের

আধুনিক গানগুলি তিনিই গাহিয়া প্রচার করেন এবং অনেক সাহিত্যিক ও সামাজিক সভাস্থানে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহকারী ছিলেন। তাঁহার রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনা আমরা সাগ্রহে পাঠ করিতাম। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন কথা বলিতেন এবং কবিগুরুর কাব্য-সাহিত্যের সৌন্দর্য্যাবলী তিনি সুনিপুণ লেখনী সাহায্যে আমাদিগকে দেখাইতেন,সেজন্যও আমরা তাঁহার নিকট ঋণী।

ভারতী ও প্রবাসী পত্রিকাকে তিনি তাঁহার বহুমূল্য রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহার লেখনীর সাহায্যে উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের প্রবন্ধ গৌরব বৃদ্ধি পাইতেছিল। আমরা ঐ দুই পত্রিকা পাইবা মাত্র সর্ব্বাগ্রে তাঁহার রচনা সাগ্রহে পাঠ করিতাম।

তাঁহার রচনার আর একটী বিশেষত্ব যে তিনি যাহা কথা বলিতেন না, ইঙ্গিত দ্বারা কথার দ্বারা প্রবন্ধের উদ্দেশ্যকে বেশ জীবন্ত ও সজীব করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন। সংযম যে সাহিত্য রচনার একটী প্রধান গুণ তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। অতি পল্লবিত রীতি যে একটী বিশেষ দোষ তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন এবং সর্ব্বদা বৃথা শব্দাড়ম্বর পরিহার করিতেন।

ইউরোপীয় সাহিত্য তিনি ধীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। নানাদেশের সাহিত্যের রীতিনীতি ধারা ও গতি তিনি সুন্দর রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তুলনামূলক সমালোচনা করিতে পারিতেন। Browning Swinburne ইত্যাদি কবির সাহিত্যসম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছিল। Infinite potentialities নিয়ে এত অল্প বয়সে অপূর্ণ আশা ও অসমাপ্ত কর্ম্ম ফেলিয়া অজিতকুমার চলিয়া গেল। হায় দুর্ভাগ্য দেশ! তুমি তোমার এই সুসন্তানের দ্বারা কতই উপকৃত হইতে পারিতে। দুরদৃষ্ট আমরা, এমন প্রতিভাবান সহযোগীকে অসময়ে হারাইলাম।

আলোচ্য—পৌষ। "ওঁ গুরুজীকা ফতে" শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। কবিতাটী বন্ধ হয় নাই। গুরু গোবিন্দ সিংহের আত্মসংযমের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত

কত বর্ষ পরে
বঙ্গের চারণ কবি নিভৃত অন্তরে
সে মহান্ জয়ধ্বনি করিছে শ্রবণ
আত্মহারা হয়ে আজ। পুণ্য নিকেতন
হে প্রিয় স্বদেশ মোর। গোপন আত্মার
রবি' লও হেন দৃঢ় চরিত্র নিধির
অপূর্ব্ব এ আর্যভাসে। গাব আরবার
মেহারি সোবিন্দসিংহে সম্মুখে তোমার
পরম আনন্দ ভরে নোয়াইয়া শির
"জয় গুরুজীর জয়, জয় গুরুজীর।"

"দুটীদিক"—অপরার্দ্ধ চতুষ্পদী কবিতা। শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ রচিত। আর এক কাব্যতীর্থ অভিলাষচন্দ্রের "জীবনস্মৃতি" সুন্দর কবিতা। পণ্ডিত মহাশয়ের রচনায় মাধুর্য্য আছে।

সুরেন্দ্রবাবুর 'অচিন প্রিয়' চলন সই। এ সংখ্যায় আরো দুটী কবিতা আছে।

পঞ্চমুখ

ত্রুটি স্বীকার—

ছাপাখানার নানারূপ গোলযোগে আমরা এযাবৎ পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারি নাই। সেইজন্য দুই মাসের কাগজ এই সঙ্গে বাহির করিতে বাধ্য হইলাম।

ফাল্গুন, চৈত্র সংখ্যা গ্রাহকগণ চৈত্রের মধ্যেই পাইবেন—আপাততঃ মার্জ্জনা চাই।

বিনীত—ম্যানেজার

পুস্তক-পরিচয়

মহাত্মা গান্ধী। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মহাত্মা গান্ধীর পরিচয়ে বেশী বলিতে হইলে বাঙলা বাহুল্য মাত্র। পুস্তকের বিষয়-সন্নিবেশ কৌতূহলদীপক। বাঙলার ঘরে ঘরে মহাত্মা গান্ধীর স্থান হইলে সৌভাগ্যের বিষয় হইবে। গ্রন্থকার নিষ্ঠাবান ত্যাগী কর্ম্মীর জীবনী লিখিয়া সফল হইয়াছেন।

পিতৃবিলাপ-কাব্য। শ্রীহরীকেশ দত্ত। কবিতার পুস্তক বটে কিন্তু কাব্যবিলাসে বলিবার কিছু নাই। পুত্রহীন শোকার্ত্ত পিতার 'হা হতাশ'! হু' একটী কবিতা মন্দ লাগে নাই।

সুখঅন্বেষণ সুখস্বপ্ন। গ্রন্থকারের চিন্তা-প্রণালীতে কোনও প্রকার মৌলিকতা নাই। প্রতিপাদ্য বিষয়টী কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

পরিক্রমা। লেখক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। একখানি ক্ষুদ্র নাটক! উপরে লেখা আছে প্রহসন কিন্তু পুস্তক পড়িয়া আমরা প্রহসনের কিছু পাইলাম না। নাট্যকলা ও শিল্প-চাতুর্য্য সম্বন্ধে কিছুই নাই। লেখক কলিকাতার কোনও কলেজের ছাত্র—তাঁহার প্রথম লিখার প্রশংসাই বটে। সাধনা থাকিলে ভবিষ্যতে সফল হইতে পারেন।

বেণু। কবিতার পুস্তক। লেখক শ্রীননীগোপাল ঘোষ। নিবেদনে কবি লিখিয়াছেন 'কবিতা লিখিতে আনন্দ হয় তাই লিখি'—কয়েকটী কবিতা পড়িয়া আমরাও আনন্দ পাইয়াছি। কবি ছন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হইত। স্থানে স্থানে ছন্দপতনের জন্য অনেক কবিতার মাধুর্য্য একেবারে মাটি হইয়াছে। কবি ছন্দ ও ভাবের উৎকর্ষ সাধনায় অবহিত হউন।

পদক পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক	প্রবন্ধের বিষয়
(১) হরেন্দ্রকুমারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক	বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।
(২) ঠাকুরদাস দত্ত-সুবর্ণপদক	বঙ্গের পাচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।
(৩) ব্যোমকেশ মুস্তফী-সুবর্ণপদক	প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল।
(৪) কামগোপাল-রৌপ্যপদক	বঙ্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য সমালোচনা।
(৫) শশিপদ-রৌপ্যপদক	জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব।
(৬) ব্যোমকেশ মুস্তফী-রৌপ্যপদক	২৪ পরগণার ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

পুরস্কার

(৭) রাজেশচন্দ্র-জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২০৲)—এবার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত তাহার চিন্তা-প্রণালীর সম্বন্ধ।

(৮) শিশিরকুমার ঘোষাল-পুরস্কার (২৫৲)—নরহরি সরকারের জীবন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য এবং ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্রসভ্যগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। আগামী ২রা বৈশাখ (১৩২৬)তারিখের পূর্ব্বে প্রবন্ধগুলি পরিষদের সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকান্ত সতীশ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
৭ই ফাল্গুন। ১৩২৫।

CALCUTTA UNIVERSITY
Sec. No.....
Book No.....
LIBRARY

উপাসনা

১৪ বর্ষ। | ফাল্গুন, চৈত্র—১৩২৫ | ১১-১২শ সংখ্যা

মাতৃচরণে *

প্রায় প্রবাসী পূর্ব – দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যের গ্রাম প্রান্তর পরিভ্রমণান্তে [illegible] মাতৃচরণে ফিরিয়া আসিয়াছে। এ ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য তীর্থ যাত্রা নহে—কিন্তু ভারতের যে কোন অংশে যে কোন উদ্দেশ্যে ভ্রমণ কর তীর্থ যাত্রা করিতেই হইবে। পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—ভারতের যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করি—প্রতি গ্রামে গ্রামে দেবালয়—সমুন্নত শিখরে কারুকার্য্যখচিত, শিল্পকলার নিদর্শন, [illegible] মন্দির আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। এখন [illegible] কিংবা গ্রাম্যপথে—বৃক্ষান্তরালে অথবা জলাশয় পার্শ্বে—গৃহ কোণে অথবা গ্রামান্তরে, যে স্থানে প্রান্তরাঞ্চল হইতে সন্ধ্যা অবধি ভক্তের ও কর্ম্মকার যাত্র—সেই সেই স্থানে, দেব দেবীর মূর্ত্তি স্থান বিশেষে সেই অধিষ্ঠাতার বিভিন্ন প্রকাশে বিভিন্ন রকমে আমাদের ধর্ম্মের বহু শাখা প্রশাখার মূল যে এক, তাহাই সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিতেছে। উত্তরাখণ্ডের লোক যখন দক্ষিণে যাইয়া দেখে মহীশুর, তানযোর, ত্রিনেভেলীর গ্রামে গ্রামে তাহারই চির-পরিচিতা অন্নকালী, চামুণ্ডা, ভগবতী এবং কালী মূর্ত্তি, তখন তাহার কি বিস্ময়! পার্থক্য এই যে উত্তরে—শাক্ত-শক্তির পূজা উপনিষদ আর বেদান্তের বিশুদ্ধভাবানুযায়ী—আর দক্ষিণে শক্তি পূজার দার্শনিক ভিত্তি তত সুদৃঢ় নহে এবং ইহা তন্ত্রমন্ত্রের উপরই যেন প্রতিষ্ঠিত। তদুপরি ইহা ব্রাহ্মণেতর জাতির উপরই দক্ষিণে ন্যস্ত। কিন্তু, কে জানে, হয়ত কোনও দূর ভবিষ্যতে, ব্রাহ্মণ কিংবা ব্রাহ্মণেতর কোনও আচার্য্য কিংবা গুরু শক্তিপূজার সর্ব্বমুখী বিকাশের আয়োজন করিবেন; এই ধর্ম্ম বিপ্লব, কেবল আধ্যাত্মিক জগতে এক শুষ্ক আনুষ্ঠানিক ও স্মৃতি মূলক একেশ্বর বাদ হইতে প্রকৃতি ও জীবনের বহুমুখীনতার সম্যক জ্ঞানের পরিনতিতেই শেষ না হইয়া, কেবল দেবতার শোভাযাত্রার রথের, কৃত্রিম অনুষ্ঠানাদির ও তুচ্ছবাদানুবাদের পঙ্ক হইতে উদ্ধারেই সীমাবদ্ধ না হইয়া—ইহা সর্ব্বাঙ্গ বিপ্লবে পরিণত হইতে পারে। তাহাতে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই ব্রাহ্মণেতর জাতি, সমাজের আধ্যাত্মিক স্রোত প্রবাহকে প্রখরতর করিতে সাহায্য করিবে। ভারতের জাতীয় জীবনে আচারের বৈচিত্র্যের মধ্যে ধর্ম্মের মূল যে এক, ইহাতে তাহাই সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

কুমারিকাতে—মাতার পাদপদ্মে উপবিষ্ট হইয়া, সকলেই অনুভব করুক যে এখানে এই মাতৃচরণে—সকলেই এক, সকলেই একই মাতার সন্তান।

* সম্পাদকের মাদ্রাজের সভায় সভাপতির অভিভাষণ হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক গৃহীত।

অন্তরীপের দক্ষিণস্থ প্রদেশে, শিলাময় এই ক্ষুদ্রদ্বীপ—ভারত মাতার চরণ মূলে—এখনও মহাসাগর সঙ্গমের বারি রাশি দ্বারা প্রক্ষৌত। জনশ্রুতি এই যে, সাগরের বিস্তার হেতু, দেবীর শিলাময় দীপ আদিনিবাস দুর্গম হওয়াতে তিনি অধুনা তীরস্থ মন্দিরে বিরাজমানা।

এই স্থানে নীল-সিন্ধু-জলধৌত দেবীচরণে উপবিষ্ট হইয়া স্বভাবতই উত্তরস্থ কুমারীব্রত হিমাচলের প্রতি স্থির দৃষ্টিনিবদ্ধ মাতৃমূর্ত্তির কল্পনা চিত্র সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। দাক্ষিণাত্যের উচ্চ নদ আবর্ত্তে সঙ্কট-চূর্ণ-তরঙ্গমালা যে অনন্তের সুর ও ঝঙ্কার অবিরত জাগাইয়া রাখিতেছে—কুটীল প্রবাহিণী—সরস্বতী যমুনা, গোদাবরী ও কাবেরীর কলধ্বনিতে যে সুর সদাই জাগরূক তাহাই আমাদের জননীর আহ্বান। চক্ষেও তাঁহার অনন্তের আলোক দীপ্তি। দুর্গম পর্ব্বতকন্দরে, তপস্বিনীর পরিবৃত সরোবরে, কিংবা সমুদ্রতটে কিংবা মরু-প্রান্তরে, যে যে স্থানে তাঁহার কমনীয়তা বা কঠোরতা কোনও বিশিষ্ট ভাবেতে বিকাশ—সেই সেই স্থানই আমাদের পবিত্র তীর্থস্থান। সীমার মধ্যে অসীমের যে অভিব্যক্তি, তাহাতেই বাণী নানাভাবে, নানারূপে জননী আমাদিগকে শুনাইতেছেন। তীর, সমুদ্র, উপলাকার বিভিন্ন সৌন্দর্য্যে, স্থানীয়, জাতীয়, বহুবিধ মূর্ত্তিপূজায় জননীর এই বীণা ঘোষিত হইতেছে।

কুমারিকা অন্তরীপে মাতৃচরণচুম্বী তীর-সংক্ষুব্ধ বীচিমালা, অনন্ত-প্রসারিণী মহাসাগর, ত্রিবেণীবেলী ও ত্রিবাঙ্কুরের শ্যামল বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র ও দিগন্তবিলীন অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা দর্শনে আমাদের জ্ঞানপটে কি এক অভিনব চিত্র পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। এই স্থানে জননী ঊর্দ্ধর গঙ্গা-তীরের অন্নদাত্রী মাতা অন্নপূর্ণা নহেন—তিনি পাপাসুরের আদ্যাসুরীর সংহারিণী মূর্ত্তি নহেন—তাঁহার লেলিহান রসনা সংসারকে গ্রাসন করে না—এই স্থানে তিনি কুমারী গৌরী কঠোর তপশ্চারিণী—মহা সন্ন্যাসী মহাদেবের তুষ্টি সাধন নিরতা।

প্রাচীন ভারতের উপনিবেশ স্থাপনকারী আর্য্যসন্তানগণের কল্পনাশক্তি কেমন মনোহর এবং তাহাদের সত্যের উপলব্ধি কতখানি গভীর। তাঁহাদের পরিজ্ঞাত ভারতের এই দক্ষিণতম অংশে বসিয়া—নূতন নূতন দেশাবিষ্কারের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তাঁহারা এই স্বীয় লীলানিকেতনী বিদেশিনী—স্বীয় জীবন সম্পদে আত্মহারা এই চিরকুমারীর মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এইস্থানে বিহার অপেক্ষা তপস্যার ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে, কারণ কথিত আছে, রুদ্রমহেশ্বরের সহিত অনন্তকালের নিমিত্ত পবিত্র বিবাহ সূত্রে আবদ্ধা হইবার পূর্ব্বেই—প্রিয়তমের সহিত গৌরীর চির বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। হায়! শুভ মুহূর্ত্ত কখন অতীত হইয়া গেল, মিলন-বিহারী কখন পোহাইয়া গেল—সতত্ত্ব জীবের তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে এই পবিত্র পরিণয় সমাধান হইলনা। সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জননী, সেই তরুণ বয়সেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিলেন। আর্য্য, শক, হূন, মঙ্গল, মোগল কত নূতন জাতি আসিল আবার গেল, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও জননী তাঁহার অনুরূপ শিব প্রেমের কথা বিস্মৃত হন নাই। এক নিমেষের দৌর্ব্বল্যে তাঁহার দৃঢ়ব্রতজীবন গভীর বৈরাগ্যের অঙ্কস্থলে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

তাই তিনি কুমারীর হিমাচলে—তাহার নিজন অন্ধকার গহ্বর মাঝে মুহুর্মুহু দৃষ্টিপাত করেন—দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন সর্ব্বত্রই কি এক অভাব। ক্রোড়সমীপস্থ অসংখ্য পর্ব্বতাবলীর প্রতি নেত্রপাতে কুমারীর দৃষ্টিযুগল স্নেহপুলকে নৃত্য করিতে থাকে; কিন্তু সে চিত্তা তরঙ্গসম আসিয়াই, ফিরিয়া যায়—কোনস্থানেই আনন্দ নাই। শ্যাম-শস্যশালিনী স্রোতস্বতী, শস্যক্ষেত্র সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনশ্চক্ষে দেখেন কত শত দুর্ভিক্ষের স্রোত এইস্থান হইতে উত্থিত হইয়া ধরণ ঊর্ব্বরকারী নদীবক্ষে প্রবাহমানা—শেষে এই চরণেই সকল বারি নিবেদন একীভূত—কিন্তু কোথায় আজ সে আনন্দস্নান? সুরচক্র বালসমীপস্থ সাগরে তরঙ্গশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—আজ তাহা হইতে সমস্ত মঙ্গল দূরে অপসৃত। সব সৎ সব সত্য সব সুন্দর, একমুহূর্ত্তের আলস্যের নিমিত্ত আজ সব অপসৃত। বিধা হইলেও আজ তিনি ভাবোন্মত্তা—বিশ্বমানবের বন্ধনাগারে তিনি পরিত্যক্তা—আজ তাঁহার দর্শনে দেবাদেবতা অমরবৃন্দের মুখে হেলায় হাস্য—সর্ব্বোপরিস্থান তাঁহার প্রেমাস্পদ নিরুদ্দিষ্ট।

তাই বিবাহমন্দিরের 'সোপুরন' এখনও সমাপ্ত হয় নাই—তাহার চারিটী স্তম্ভ—সজ্জাহীন—কারুকার্য্যহীন—নির্জ্জনে অদূরে প্রেতের ন্যায় দণ্ডায়মান। কুমারীর অভিশাপে শিষ্টক ও সরমার পাকের পাত্র পাষাণে পরিণত হইয়াছে। তাই আজও ভারতের শিল্পের প্রাসাদ অসম্পূর্ণ—আর বিশ্ব মানবের মহাযজ্ঞে যে পাত্রে আমাদের মানস নৈবেদ্যের পরিপাক হইত—তাহা পাষাণে পরিণত। শঙ্খ ও অন্নরাজি বালুকাতে পরিণত—তাই সমুদ্রযাত্রীগণ, আজও সাগর বারিতে বালুকার অঞ্জলি প্রদান করে—ইহাই বর্ত্তমান ভারতের বিশ্বমানব সাগর অর্চ্চনার—অর্ঘ্য ও নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে হীন বিনিময়। প্রতি প্রাতে ও প্রান্তে জননী যাত্রীদের এই দৃশ্য দেখিতেছেন—তাঁহার এই অন্তর যাতনা পর্ব্বত-প্রতিঘাত হইয়া দিক্‌চক্রবালে ও সাগরকল্লোলে মিশিয়া গিয়াছে।

কত দীর্ঘ দিবস ও ক্লান্তিমুখরজনী তিনি তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট প্রেয়াস্পদের নিমিত্ত রোদনে অতিবাহিত করিয়াছেন। কত বর্ষ—ব্রতসিদ্ধি আশায় গণনা করিয়াছেন—তিনি নিশ্চিতই আসিবেন—আর কতদিন প্রিয়তমাকে তীব্রবাক্যে ও তুফানসংকুল এই পর্ব্বত সমাকীর্ণ নির্জ্জন সাগরপ্রান্তে—দুর্ভেদ্যতমরাজির অন্তরালে নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করাইবেন? তিনি নিশ্চিতই আসিবেন।

নিশি সমাগমে যখন অতীত বিষাদনিশির সুখস্বপ্নে উতল উতল উন্মাদ হইয়া উঠে, তখন প্রচণ্ড সমুদ্র সর্ব্বনাশী গর্জ্জন করিতে থাকে—তালি বনরাজি বেদনায় মর্ম্মরিয়া উঠে। মানুষ তখন ভাবে, কুমারীদেবী ক্রুদ্ধা হইয়াছেন। শেষে যদি দেবী নিজকে সংযতা করিতে না পারিয়া সাগর-বারিতে প্রাণ দেন—এই ভয়ে ভীত পুরোহিতবৃন্দ মন্দিরের সাগরমুখী পূর্ব্বদ্বার চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

বহুকাল তিনি অপেক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছেন। আশা আর উন্মাদনা, হর্ষ আর সংক্ষোভের আবেগে—'তিনি নিশ্চিতই আসিবেন' এই চিন্তায় শুধু তিনি নিজ মনকে শান্ত করেন। তাই প্রভাতে যেথি রক্ত তীরের কষায়বস্ত্র-পরিহিতা, ধূসরপর্ব্বতশ্রেণীর কেশরাশিমুক্তা, শান্ত সাগর বারির সান্ত্বনা, জননীর তপস্বিনী মূর্ত্তি। দিবাবসানে যেমন নিশি আসে—বিপ্লবের পরে যেমন শান্তি আসে, তাঁহার নিশিবিচ্ছেদ যাতনার পশ্চাদানুসরী যে তাঁহার অনন্ত সাধনা। এ সাধনা কি চিরকালের? তাহা জানেন কেবল তাঁহার নির্দ্দয় প্রেয়াস্পদ। যিনি কুমারীর সৌন্দর্য্যময় কালেরও উচ্ছিন্নত্বের প্রবল ঘাতপ্রতিঘাতে নষ্ট করিয়াছেন—তিনিই ইহা জানেন।

বহুকোটী কন্যাকুমারিকা অপেক্ষা অধিকতর শ্রীশ্রী সম্পন্ন। পুলকস্মৃতিময় সমরজয়গাথাপূর্ণ বহুকোটী আর এক দীর্ঘ যাতনা ও শোকগাথার অনুস্মারক। ভারতের মূর্ত্তিমান শান্তি ও সদাচারব্রতী নৃপতি এইস্থানে বাণাঘাতে সাগরকে পরাজিত করেন—তাই এখানে সাগর সরোবর-সম শান্ত এবং স্থির।

কিন্তু কন্যাকুমারী অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী ও মোহকরী। এই অপূর্ণ-বাসনা আর দুরন্ত বেগের পর্ব্বতশোণিত ঘটিকাক্ষুব্ধ সাগরতীরে—তপ্ত বালুকারাশিবিদ্ধ ভগ্ন-মন্দিরাভ্যন্তরে এবং অসংখ্য তালিরাজিশাখাকৃত কর্কশ-ধ্বনির মধ্যে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য বিরাজমান। আশা যাহার বিষ, বিফলতা যাহার সম্বল—যাহার সান্ত্বনা কেবল নিরাশা—সে এইখানে আসুক, এই পরিত্যক্তা নিরাশা-বিষপায়িনী—চিরকুমারী জননীর—কেন্দ্রিলোজ্জ্বাদধৌত চরণ-তলে ক্ষণিকের নিমিত্ত বিশ্রামনিদ্রা লাভ করুক,—জননীর ক্ষুব্ধোদ্বেলিতবক্ষে আশ্রয় লাভে চিরশান্তি ও স্বরাজ লাভ হইবে। কারণ যে বাক্তি—উত্তালতরঙ্গময় সাগর-কল্লোল এবং উন্নতবটিকাঘনো আলুলায়িতকুন্তলা বিরহ-বিধুরা ধাতুমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, আবার পরদিবস প্রাতে গৈরিকবসনাবৃতা মাকে আর এক দিবসের তপস্যার নিমিত্ত—আর এক আশাঘুমের সন্ধ্যা যাপনের নিমিত্ত—আর এক বিচ্ছেদবেদনাময় নিশিজাগরণের নিমিত্ত তপস্বিনীর বেশে দেখিবে তাহার সকল নিরাশা দূরীভূত হইবে—এক অভিনব বিশ্বাসের এবং অভিনব সংঘমের উল্লাসের উতল আনন্দে।

যিনি সন্ধ্যা শিব সুন্দর তাঁহার সহিত আমাদের জননীও চিরদিন যতদিন না হয় ততদিন যাহের মতন আমাদেরও কত অমাবস্যার নিদ্রিত রজনী যাপন করিতে হইবে, হৃদয়ে ত্রিসমুদ্রতরঙ্গমালার তাণ্ডবনৃত্য ধারণ করিতে

হইবে,—শুধু শিবের আশাপথ চাহিয়া। দেখিনা কি যাকে আমার প্রত্যেক সন্ধ্যায় রজনীর নবযুবা বেশে, প্রত্যেক গভীর রাত্রের অশান্তিতে অনুভব করি না কি তাঁহার অন্তঃকরণের মহাবিচ্ছেদ বেদনায় ত্রিসমুদ্রের মহাসঙ্গীত বিক্ষুব্ধ তাণ্ডবরঙ্গ, আবার প্রত্যূষে তাঁহার কি শান্ত শ্রী, বালার্কবিকশোজ্জ্বলা হইয়া তিনি গায়ত্রী তীর্থে স্নান করিতে বসিয়াছেন, দিগন্ত বিস্তৃত রক্তবর্ণ বেলাভূমি তাঁহার কৌষেয় বস্ত্র হইয়াছে। তখন কি সংযম, কি কঠোরতা কি পবিত্রতার দীপ্তি তাঁহার মুখে ফুটিয়াছে।

ভারতের অমাবস্যা রজনীতে, ভারতের চিরবৈচ্ছেদ-বেদনায়, চাই আমাদের মায়ের মত দিনে দিনে সংযম, দিনে দিনে কঠোরতা। তবে আমাদের সেই মহাব্রত উদ্‌যাপন হইবে আমাদের মা আর সেই চির-কঠোর শিবসুন্দরই জানেন।

মানসী

আজন্ম সাধনালব্ধ মানস-প্রতিমা
ললিত লাবণ্য মাখা তনুর তনিমা
আজ সব ভাষা ছন্দ সব ধ্বনি দিয়ে
তোমারে জানাতে চাই আমি মোর প্রিয়ে,
সারা প্রাণ দিয়া তোমা কত ভালবাসি,
কত রূপে কত ভাবে, অন্তরেতে আসি
বসিয়াছ অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী তুমি,
বিস্তারিয়া সগৌরবে অধিকার ভূমি।
লো মোর মানসী, মূর্ত্ত কল্পনার রাণী
বিশ্বের সঙ্গীত মাঝে কি শুনালে বাণী।
বৈশাখের উগ্রতেজে জ্বালাময়ী রূপে
কি আগুন জ্বালাইলে প্রতি লোমকূপে
জাগাইলে সুপ্ত প্রাণ উন্মত্ত আগ্রহে
অসাড় অবশ ম'ল অনন্ত নিগ্রহে।

বরষায় ধারা জল ঘনঘোর মেঘে
কেশ এলাইয়া এলে কি আকুল বেগে,
শরতের নির্ঝরিণী পূর্ণ প্রাণ লয়ে
শত শুভ কল্যাণের আশীর্ব্বাদ বয়ে
কি আনন্দ বিতরিলে কূলে কূলে তব
দানে দিলে দয়াদান অচিন্ত্য বৈভব।
হৈমন্তিক স্বর্ণলোভা রুদ্ধাবেগময়ী
আবেশ-বিহ্বলা নও চির জ্যোতির্ম্ময়ী ;
শীতের আবিষ্ট ভাবে নিবিড় নিয়ত
আকুঞ্চন প্রসারণে সদা ব্যস্ত কত ;
ছিন্ন পত্র শুষ্ক পাতা জাগাও ফাল্গুনে
প্রবণ জ্বালায় প্রাণ সুরের আগুনে।
নব কিসলয় ফুলে শোভায় সম্ভার
লো বাসন্তী, চিরন্তনী মানসী আমার।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

ভক্তি

এই প্রবন্ধে ভক্তি বিষয় লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে, ভক্তি অর্থে সাধারণতঃ ভগবানের ভজনকেই বুঝাইয়া থাকে, প্রমাণ—"গোপাল তাপনী শ্রুতি"তে কথিত হইয়াছে—"ভক্তিরস্য ভজনং" অর্থাৎ ভগবানের ভজন ক্রিয়াই ভক্তি নামে কথিত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধ লইয়া শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত "শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু" নামক সিন্ধুগ্রন্থে বিশেষ আলোচিত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু বলেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।" (১)

অর্থাৎ যে ভজন ক্রিয়ার অন্তরালে বৈষয়িক ইচ্ছা জ্ঞান ও কর্ম্ম নাই এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উত্তরোত্তর প্রীতি ও অনুকূল অনুশীলন বৃত্তি করেন, তাহাই উত্তমাভক্তি। পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত দুর্গমসঙ্গমনী নাম্নী (২) টীকায়

(১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ১মলহরী ৯ম শ্লোক।
(২) ৯ম শ্লোকস্থ দুর্গমসঙ্গমনী টীকা—

উক্ত হইয়াছে, যেমন শস্ত্রধারীদিগকে আসন কর, বলিলে তৎসঙ্গে শস্ত্রের আসনও সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং শস্ত্রধারীগণকে ভোজন করাও বলিলে, তাহাতে শস্ত্রের ভোজন সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ভক্তি অর্থে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যোচমান প্রবৃত্তিই বুঝিতে হইবে। রাবণাদির ন্যায় প্রতিকূল ক্রিয়া উত্তমা-ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। কথিত শস্ত্রধারীর আসনের সহিত শস্ত্রের আসন এইটি অনুকূল ক্রিয়া আর শস্ত্রধারীর ভোজনের সহিত শস্ত্রের ভোজন প্রতিকূল ক্রিয়া, এক্ষণে বিবেচ্য যদি ভক্তিতে জ্ঞান কর্ম এতদুভয়ের সত্তা না রহিল তবেত ভক্তি জড়রূপা হইলেন, এবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যাহাতে সাংসারিক জ্ঞানকর্মের সত্তা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের ভজন ক্রিয়াগত জ্ঞান ও কর্ম অর্থাৎ ভক্ত্যুত্থ জ্ঞানকর্মের সত্তার পর্য্যাপ্তি লক্ষিত হয় তাহাই উত্তমা ভক্তি নামে কথিত হইয়া থাকে। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং"

হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।

উপরোক্ত শ্লোকে সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত, তৎপরত্ব ও নির্ম্মল শব্দ কয়টি ব্যবহৃত হইয়াছে, সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত শব্দে অন্যাভিলাষিতা শূন্যত্বেরই প্রতিপাদন করেন, কারণ উপাধিশব্দে বৈদান্তিকেরা অবস্তু বলিয়া এই দুইটিকেই লক্ষ্য করেন, ইহার মধ্যে আসল ও নকল অহং মম আছে, যখন অহং ও মম শব্দ দুইটি দেহীর দেহের স্বার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে নকল এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বার্থে প্রযুক্ত হইলে আসল আখ্যা পাইয়া থাকে; উপাধির সহিত উপাধি গত ক্রিয়ার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী, সেইজন্য নকল আমির সহিত নকল উপাধিগত সাংসারিক ক্রিয়ার অর্থাৎ আসক্তি বিজড়িত ক্রিয়ার বিনাশ হয় সেইজন্য সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইলে জীবের শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যে প্রবৃত্তি থাকে না। তৎপরত্ব শব্দে শ্রীকৃষ্ণপরতা বুঝায়, বেদান্তসিদ্ধ "তৎ ও ত্বং" দুইটি পদার্থ "তৎ" শব্দে ঈশ্বর ও ত্বং শব্দে জীবকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তৎপরত্ব হইলে জীবের জীবগত প্রাকৃত ক্রিয়ার বিনাশ এবং ঈশ্বরগত অপ্রাকৃত ক্রিয়ার প্রাদুর্ভাব এই দুইটির সম কালোপত্তি দেখা যায়। নির্ম্মল অর্থে যাহাতে প্রাকৃত জ্ঞান কর্মের লেশ নাই অতএব এক কথায় ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা হৃষীকেশের সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, তৎপরত্ব ও নির্ম্মলভাবে ভজনকেই ভক্তি বলা হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যে কয়েকটী ভক্তি আদি সাধনে ব্যবহৃত হয় শ্রীপাদ বোপদেবকৃত মুক্তাফলের টীকাকার হেমাদ্রি আপন গ্রন্থে তাহাদের বর্ণ আখ্যা দিয়াছেন, সে বিষয় বিশেষভাবে পরে বিবৃত হইবে (১)। উত্তমাভক্তি দুই প্রকার যথা—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।

সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা।" (২)

উদাহরণ দ্বারা এই দুই প্রকারের এক একটি মাধুর্য্য বর্ণিত হইতেছে, ক্লেশঘ্নী শব্দে যাহা আত্মরিক কষ্টকে বিনাশ করেন, কথিত বিনাশ নহে ঔষধের দ্বারা যেমন রোগ নাশ অন্নপানাদির দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণার নাশ হইলেও তাহাদের পুনরুত্থান হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির দ্বারা যাহা জীবের সুখ দুঃখভোগের মূলকারণ স্বরূপ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পুণ্য পাপের বিনাশ পাইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবদুদ্ধব সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—

"যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ

তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ।" (১)

যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি তাহা সকল ভস্মীভূত করিয়া থাকে সেইরূপ মদ্ বিষয়ক ভক্তি যাবতীয় পাপের সমূল বিনাশ সাধন করিয়া থাকে।

তপস্যা ও দানাদির দ্বারা পাপের তাৎকালিক বিনাশ হইলেও একেবারে বিনাশ হয় না, কারণ একব্যক্তি পাপ বিশেষের বিনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তাহাতে পাপের বিনাশ হইলেও পাপ প্রবৃত্তির বিনাশ হয় না, আবার কোন কোন কালে সেইরূপ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখা যায়।

---

(১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ১ম লহরী ১২ শ্লোক।

(২) কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এম, এ, বি, এল, সি, আর, এস মহাশয়ের লাইব্রেরির প্রাচীন "মুক্তাফল টীকা" গ্রন্থ দৃষ্টে।

(১) একাদশস্কন্ধ ১৪ অধ্যায় ১৯ শ্লোক—

বীজের বিনাশ না হইলে অঙ্কুর উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে ভক্তি সেই নিমিত্ত অনর্থের মূলকারণ পাপের সহিত বীজ-রূপা প্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করেন।

"তেস্তাস্তথানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া।" (২)

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন তপস্যা দান ও ব্রতাদির দ্বারা তৎ তৎ পাপের বিনাশ হইলেও হৃদয়ের অধর্ম্ম বীজের বিনাশ হয় না, শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম সেবা করিলে জীব উভয়তঃ পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে।

শুদ্ধা ভক্তি জীবের অশেষ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

"শুভানি শ্রীগনং সর্ব্ব জগতা মনুরক্ততা

যাঁহারা ভগবদ্ ভক্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্ব জগতের প্রীতি ও অনুরাগ লাভ করিয়া থাকেন। সমস্ত গুণই তাঁহাদের হৃদয়াম্বুজে বিরাজ করে। এ বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।" (১)

যিনি নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দেহে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ সমস্ত গুণ-সম্পৎ বিস্তার করিয়া বাস করেন। যাঁহারা ভগবদ্ বিমুখ তাঁহাদের গুণ কোথায়, তাঁহারা অসৎ সংসারে কেবল তুচ্ছ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। ভক্তির একটি নাম মোক্ষ লঘুতাকৃৎ অর্থাৎ পুরুষার্থ চতুষ্টয় শিরোমণি মোক্ষ বাসনা পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়া থাকেন। হরিভক্তি সুধোদয় ও নারদ পঞ্চরাত্রে এই দুইটি শ্লোকে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মোক্ষ লঘুতাকৃৎ।

"মনাগেব প্রকটায়াং হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তৌ
পুরুষার্থস্য চত্বারঃ স্বপ্নায়ন্তে সমন্ততঃ।" (২)

"হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বামুক্তাদি সিদ্ধয়ঃ
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটীকাবদনুব্রতাঃ।" (৩)

অল্পমাত্র ভগবৎ ভক্তি হৃদয় মধ্যে বদ্ধমূল হইলে, ধর্ম্মার্থ, কাম ও মোক্ষ সুখ স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে।

হরিভক্তি মহাদেবীর সর্ব্বমুক্তি আদি সিদ্ধি ও ভোগবাসনা দাসীর ন্যায় পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া থাকে।

জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ এবং যজ্ঞাদি পুণ্যের দ্বারা ভোগ সামগ্রী পাওয়া যায় কিন্তু সাধন সহস্রের দ্বারাও ভক্তি পাওয়া যায় না। এই জন্য ভক্তির প্রকার ভেদে দুষ্প্রাপ্যতা আখ্যা দিয়াছেন। এ বিষয়ে একটী শ্লোকের প্রমাণ পাওয়া যায় যথা:—

"জ্ঞানতঃ সুলভামুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ
সেয়ং সাধন সহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা।" (১)

ভক্তির একটী নাম "লাভা নন্দ বিশেষাঢ্যা" অর্থাৎ যাঁহার নিকট ব্রহ্মানন্দ ও তুচ্ছ হইয়া থাকে।

"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ
নৈতি ভক্তি সুখাম্ভোধেঃ পরমাণু তুলামপি।" (২)

যদি ব্রহ্মানন্দকে দ্বিপরার্দ্ধসংখ্যার দ্বারা গুণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মানন্দটি ভক্তি সুখসাগরের পরমাণুরও তুল্য হয় না। এ বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী ভাবার্থ-দীপিকা নাম্নী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় বলিয়াছেন,—

"যৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমং।" (৩)

কোন কোন প্রেমিক ভক্ত তোমার কথামৃত-সমুদ্রে সর্ব্বদা বিহার করিয়া পরমানন্দে মত্ত হইয়া চতুর্ব্বর্গকে তৃণের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। ভক্তির অপর একটি নাম "শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী"। যিনি সচ্চিদঘন গোবিন্দমূর্ত্তিকে হৃদয়ে বল পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া লেন।

---

(২) শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক।
(১) শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধ ১৮ অধ্যায় ১২ শ্লোক।
(২) হরিভক্তি সুধোদয়—
(৩) নারদপঞ্চরাত্রে—
(১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ১ম লহরী ২৩ শ্লোক।
(২) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ১ম লহরী ২৪ শ্লোক।
(৩) শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ৮৭ অধ্যায় ২১ শ্লোকের ভাবার্থদীপিকা টীকা।

"কৃত্বা দূরিং পেলবভাবং প্রিয়বর্গ সবয়িঃং
ভক্তির্যস্মৈ করোত্যেষি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মতা।" (১)

যাহার দ্বারা প্রকট ও অপ্রকট বিবিধ লীলাকারী ভগবান্ প্রিয়বর্গ অর্থাৎ দাস সখা বাৎসল্য ও মধুর রসের ভক্তগণের ও আত্মীয়ের সহিত ভক্তের প্রেমাধীন হইয়া তদ্গৃহে বাস করেন তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী বলা যায়। যখন প্রহ্লাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির আপনার ভাগ্যের নিন্দা করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীনারদ ঋষি রাজাকে মন্দ্র-মধুরস্বরে বলিয়াছিলেন—

"যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং।" (২)

রাজন্ মনুষ্যলোকে আপনারা প্রচুর পুণ্যবান, কারণ ব্রহ্মাও পবিত্রকারী মুনিগণ আপনাদিগের গৃহে আগমন করিয়া থাকেন, বলিতে কি যাঁহাদের গৃহে পরং ব্রহ্ম ভগবান, মনুষ্যমূর্তিতে মনুষ্যের ন্যায় বাস করিতেছেন।

রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ভগবান সাতিশয় প্রীতিবশে দ্বারকা মহিষীগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছিলেন। আবার ভক্তির এমন একটি মহদ্গুণ আছে যাহার দ্বারা আত্মারাম মুনিগণও বশীভূত হইয়া থাকেন শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণো হরিঃ।" (৩)

আত্মারাম অর্থাৎ যাঁহারা নির্বিকল্প ব্রহ্মসমাধির দ্বারা বহির্বিষয়ের ব্যাপারশূন্য ও মুনিগণ এবং জ্ঞানী সকল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজনশূন্য ভক্তি সাধন করিয়া থাকেন, হরি এমনই গুণ সম্পন্ন, নির্গ্রন্থ শব্দের বহুবীহি সমাসে জ্ঞানী ও মুনি দুই অর্থই বুঝাইয়া দেয়, যাহারা অভিমানরূপ গ্রন্থ অর্থাৎ গাঁইট হইতে মুক্ত হইয়াছেন কিম্বা যাঁহারা গ্রন্থাধ্যয়ন মুক্ত। অতএব ইহার দ্বারায় স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, আত্মারাম, মননশীল মুনি ও মূর্খ ইহাদিগকেও হরিভজন-পরায়ণ হইতে দেখিয়াও, আত্মারাম, ও মুনিগণ স্বয় ব্যাপার বর্জ্জিত হইয়া এবং মূর্খগণ আত্মারাম মুনি হইয়া ভগবদ্ ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন যখন সনকাদি আত্মারাম মুনিগণ জীবের নিস্তার জন্য শ্রীবৈকুণ্ঠের পথ প্রথমাবিষ্কার করে যখন কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিলেন; তখন ভগবানের চরণ পদ্মবিলম্বিত বিশ্রুত তুলসীর গন্ধে পাগল হইয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মসমাধি পরিত্যাগ করিয়া, সবিশেষ অর্থাৎ ভক্তি অঙ্গ যাজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"তদ্বারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ।" (১)

যেমন রাজা কোন স্থানে জয় করিতে যাইলে আপনার আয়ত্বগত স্থানে বাস করিয়া, পরে রাজ্যাধিকার করিয়া থাকেন, বায়ুও সেইরূপ সনকাদি আত্মারাম ঋষির নাসিকা-ভ্যন্তর রূপ স্বস্থানে বাস করিয়া প্রথমতঃ সনকাদি মনরূপ একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মনকে পরাজয় করিয়া, পরে তাহাদিগের ইন্দ্রিয়রূপ সেনা সকল জয় করিয়া তাঁহাদের দেহরাজা শ্রীনারায়ণের চরণারবিন্দতলে সুষ্ঠিত রূপ প্রথা করাইলেন। (২)

"যোগী যোগ ভুলে মুনি ধ্যান টলে—
যায় কাননে কামিনী তেঁতিকুলে।" (৩)

ষড়্দর্শনবেত্তা প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিয়াছিলেন—

এমন সুধামাখা হরিনাম নিমাই কোথা হ'তে এনেছে
নাম শুনে শুক বীনে আপনি বেজে উঠেছে

* * * *

(১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ববিভাগ ১ম লহরী ২৮

(২) শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ ১০ অধ্যায় ৩৭ শ্লোক

(৩) শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায় ১০ শ্লোক।

(১) শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধ ১৫ অধ্যায় ৪৩ শ্লোক।

(২) ১৫:১৫ শ্লোকধৃত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা।

(৩) নৃসিংহ দেবের পদাবলী।

কে যেন মোদের বসেছে কানে কানে
তোদের পায়ের উপায় হ'ল এতদিনে
• • •
আজ যেতে নিবাই তোর সঙ্গে সব
জ্ঞানের গরিমা কর্ম না করিব,
• • •
আজ সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বলে
নাচিতে বাসনা হয়েছে।

যে যে শ্রুতিগণ ভগবানের নির্ব্বিশেষ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, অবশেষে তাঁহারাই আবার সবিশেষও বলিয়া থাকেন, বিচার করিলে সবিশেষ প্রতিপাদনই বলবান্ হইয়া থাকে।

"প্রায়ো বলীয়ান্ সবিশেষবেব।"

সীমাবদ্ধ বস্তুই মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে অসীম বস্তু যাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না, তাহাই আমাদের পক্ষে নিরাকারভাবে দৃষ্ট হয় জ্ঞানীগণ খণ্ডজ্ঞানের দ্বারা চিন্ময় মূর্ত্তিকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া নিরাকার বাদ করেন, পরিশেষে সাধুসঙ্গে যখন ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন উন্মুক্ত অর্থাৎ চেতন যেমন সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়, সেইরূপ ভক্তিচক্ষু বিহীন জ্ঞানীগণ ভগবানের আকার দর্শনে বিমুখ হন। প্রমান শিরোমণি শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন—

"জ্ঞানাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন,
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" (১)

ভক্তিরূপ জ্ঞানাঞ্জনদ্বারা ভক্তিনয়নের দ্বারা সাধুগণ সেই অচিন্ত্যগুণ স্বরূপ শ্যামসুন্দরকে সর্ব্বদা হৃদয়ে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ প্রভাই যে ব্রহ্ম, তাহাও শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন—

"যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটিঃ
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" (১)

যাহার প্রভার প্রভাবে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মাণ্ড সকলের অন্তর্ভুক্ত পৃথিবী; ভিন্ন ভিন্ন অশেষ কোটী কোটী বসুর সহিত অবস্থিতি করিতেছে, সেই অশেষ জীবের আশ্রয়, সমস্ত, অপরিসীম নিষ্কল ব্রহ্ম যে আদি পুরুষ গোবিন্দের অঙ্গবিভূতি তাঁহাকে ভজনা করি। আরও শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" (২)

তত্ত্ববিৎগণ এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদাকারে দর্শন করিয়া থাকেন। অদ্বয় শব্দের অর্থ যাহাতে স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই, যেমন কদম্ব পালতীবৃক্ষের সহিত তাহার পুষ্পের যে ভেদ সেইটী স্বগত, পালতী বৃক্ষের সহিত মল্লিকা বৃক্ষের ভেদ সজাতীয় আর পালতীবৃক্ষের সহিত প্রস্তরাদির ভেদটী বিজাতীয় ভেদ সমস্ত বস্তু বা ব্যক্তিতে এই ভেদ লক্ষিত হয় কিন্তু অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বে সচ্চিদানন্দঘন শ্রীবিগ্রহে এই ভেদ নাই, সাধারণ জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয়ের প্রভেদ আছে কিন্তু অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদত্ব। পরিলক্ষিত হয়—এই অদ্বয় জ্ঞানের দ্বারাই—সেই—চিদানন্দঘন মধুরমূরতি আস্বাদিত হইয়া থাকেন।

"প্রকাশ বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান॥ (৩)
"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি
সে ব্রহ্ম গোবিন্দের প্রভা হয় অঙ্গকান্তি॥
আত্মা অন্তর্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়—
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়

(১) ব্রহ্মসংহিতা—৫ম অধ্যায় ৫৮ শ্লোক।

(১) ব্রহ্ম সংহিতা ৫ম অধ্যায় ১০ শ্লোক।
(২) শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ২অধ্যায় ১১ শ্লোক।
(৩) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদ।

অনন্ত কোটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। (১)

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ।" (২)

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিদাসচট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ

গোবিন্দ স্মৃতি

(১)

আজি, কোথা চলে গেছ মরমী আমার,
ওগো, দরদী আমার!
ঘুরাল কি বাঁকে বাঁকে, খাল বিলে পাঁকে পাঁকে,
অশ্রান্ত সাঁতার!
কত কাঁটা কত ত্রাস, কত বা সাপের বাস,—
শিহরে পরাণ!
রবি ঢালে অগ্নি রাশি, তাও সহিয়াছ হাসি',
সরল মহান্!
সে জলে নরক ভাসে, চৌদিকে প্রেতিনী হাসে,
দুই কূলে চিতারাশি, জনপ্রাণহীন।
ডাঁসে ও মশকে খায়, রক্তধারা বহে গায়,
এমনি জীবনঘাতী ঋণ!
গরজিছে ঊর্দ্ধে তার দৈন্য বিভীষিকা তার
নিত্য অনিবার!
ওগো, মরমী আমার!

(২)

গঙ্গাধর ভোলানাথ, শত শত প্রেত সাথ,
করিছ বিহার,!
পরণে পশুর ছাল, গলে শোভে হাড়-মাল,
উন্মত্ত উদার!

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদ। (২) শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায় ১ম শ্লোক।

চিতাভস্ম ধূলিরাশি, গায় মাখিয়াছ হাসি,
ভোলা দিগম্বর !
মহা সাধনার ফলে, ধুলে ছাদি গঙ্গাজলে,
গুহার উপর
শতদলে বীণাপাণি, পাতিলা আসনখানি ;
তুমি ভাগ্যবান্ !
কি ছার ভবের সুখ, ভূমানন্দে ভরা বুক,
অমৃত পরাণ !
উপরে উইয়ের মাটি, ভিতরে বাল্মীকি খাঁটি,
মহাধ্যানে জপ' রাম নাম ;
বিশ্ব করে পুলকে প্রণাম !

(৩)

হে দেব, হে বন্ধু, ওহে প্রাণ-সখা,
পরশে তোমার
কত যে লোহার খনি, শত কোহিনুরে ধনী,—
যুগ-অবতার !
ওগো, দেবতা আমার !
ওহে বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, এদেশ করেছ ধন্য,
ত্যাগের আধার !
নব তেজে নব বেশে, আমাদেরি এই দেশে,
আসিও আবার !
অস্থানে পড়েছ ব'লে নির্য্যাতনে গেছ ছ'লে,
তোমারে কি সাজে অভিমান ?
হে অমর কবিবর, রবে যুগ যুগান্তর,
তোমার সম্মান !

(৪)

তুমি গেছ, ধন্য দেশ, তোমারি কীর্ত্তির শেষ,
ললাটে তাঁহার !
চির সিন্দুরের বিন্দু, যেন পূর্ণ শরদিন্দু,
সুষমা আগার !
"জয় শ্রীগোবিন্দ" বলি', দিনু অর্ঘ্য পুষ্পাঞ্জলি,
উদ্দেশে তোমার !
বুক-ফাটা হাহাকার, আঁখি-ফাটা অশ্রুধার,
এই জনমের মত রোধিনু এবার !
ওগো, মরমী আমার !!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শেষদশা

(১)

গভীর অরণ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ কাঁদিতেছেন। যখন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নির্ভর করিবার মত আশ্রয়ের সন্ধান মিলেনা, তখন জীব অনন্যোপায় হইয়া বড় ভক্তিভরা প্রাণে ভগবানকে ডাকে। যতক্ষণ আশার ক্ষীণ রশ্মিটুকুও চক্ষে লাগে, ততক্ষণ কিছুতেই প্রাণে ঐকান্তিকতা আসে না, কিছুতেই সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা হয় না। একবার করিয়া ভগবানকে ডাকে, একবার করিয়া গোপনে আড়চোখে আশার আলোকের দিকে তাকায়। ব্রাহ্মণ প্রাণে প্রাণে চিন্তা করিয়া কোন দিকেই খুঁজিয়া যখন মনে শান্তি আনিবার মত কিছুই পাইলেন না, তখন বড় ব্যাকুল, বড় নির্ভরতার কণ্ঠে ডাকিলেন, "হে ভগবান, হে দীনার্ত্ত-দীন পালক, যাহার কেহ নাই, তুমি তাহার। হে বিরাট বিশ্বচক্ষু, আমি তোমার চরণে আমার এ অসার জীবন সমর্পণ করিলাম।" ব্রাহ্মণ নিজে নিজেই কত কি বলিতেছেন ও কাঁদিতেছেন।

অরণ্যমধ্যে নানারূপ পশুর গর্জ্জন শোনা যাইতে লাগিল। বৃক্ষোপরি কদাচিৎ দুই একটী পক্ষীর পক্ষবিধুনন শব্দ কানে আসিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষতলে আসন করিয়া বসিয়াছেন। প্রাণের ভয় যে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার পক্ষে সংসারের কোনও কার্য্যই কঠিন নহে। ব্রাহ্মণ যুক্তকরে মুদিতনেত্রে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। সংসারের প্রতি এত বীতস্পৃহ যে আজ এই ঘোর নিশীথে সর্পদংশনেই প্রাণ যাক অথবা হিংস্র পশুতেই ভক্ষণ করুক কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। ব্রাহ্মণ তীব্র ভগবৎ-চিন্তা দ্বারা, আবিলতাপূর্ণ মোহময় সংসার চিন্তাকে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাতে নানাবৃক্ষ হইতে নানাপাখীর বিবিধ মধুর ঝঙ্কারে বনভূমি ভরপুর করিয়া ফেলিল। মন্দ সমীরণ সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত বনকুসুমের সুবাস চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে লাগিল। প্রভাতরবির লোহিতোজ্জ্বল রশ্মিজাল বৃক্ষশীর্ষসমূহ অনুরঞ্জিত করিল। ব্রাহ্মণের চিত্ত ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে অনেকটা স্থির হইয়াছিল। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের অরণ্যপ্রদেশে যেখানে মনুষ্যসমাগম বিরল, সেইস্থানে সাধু মহাত্মারা অবস্থান করেন। ব্রাহ্মণ কোন একজন সন্ন্যাসী বা সাধুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কেহ কোথাও নাই। কেবল নানাজাতীয় বৃক্ষ একে অন্যকে স্পর্দ্ধা করিয়া যেন নীল আকাশ স্পর্শ করিবার জন্য মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। কত লতা, কত গুল্ম, কত প্রকারের পুষ্প; কেহ শ্বেত, কেহ পীত কেহ বা লোহিতবর্ণ; কাহারও সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত, কেহ বা গন্ধহীন। লতায় পাতায় ফুলে ফলে একেক স্থান এমনি রমণীয় যে দৃষ্টিমাত্রেই চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

ব্রাহ্মণ কোন্‌দিকে চলিয়াছেন জ্ঞান নাই। বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে সে বিষয়েও ভ্রূক্ষেপ নাই, ক্ষুৎপিপাসার কাতর তাহাও মনে আসিতেছে না। এইরূপে চলিয়া একস্থানে এক চন্দন বৃক্ষের নিম্নে একটী মনুষ্যের মত মূর্ত্তি হইল। "বুঝি কোনও সাধু হইবেন' এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণ দ্রুতবেগে তথায় উপনীত হইলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ব্রাহ্মণ যুক্তকরে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সাধু চক্ষু মেলিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ব্রাহ্মণ নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কি প্রশান্ত মূর্ত্তি, যেন নিস্তরঙ্গ সরোবর। চক্ষুর এমন সরল, সহানুভূতিব্যঞ্জক, এমন মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি কখনও দেখেন নাই। "আমি প্রভুর চরণে শরণাপন্ন হইলাম," এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণের অন্তস্তল হইতে যেন ব্যাকুল প্রার্থনা-রব উত্থিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কি বলিয়া হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবেন ভাবিয়া

পাইলেন না। সাধু ধীর, স্থির, অবিচলিত কণ্ঠে তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিলেন। নিকটস্থিত পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীতে দৈনন্দিন সমাপনপূর্ব্বক ফলমূল উপযোগ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া সাধু পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় অতন্দ্রিত হইয়া রজনী যাপন করিলেন।

পরদিবস প্রত্যূষে সাধু আসন পরিত্যাগ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। যখন সূর্য্যের আলোকে কাননপ্রদেশ আলোকিত হইয়াছে, তখন সাধু ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণ তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিলেন। সাধু প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ অশ্রুচক্ষু, যুক্তকরে নিবেদন করিলেন "প্রভো, আমার একটী স্ত্রী, তিনটি পুত্র ও দুইটী কন্যা। আমি দীন দরিদ্র, গ্রামবাসীর দয়ার উপর আমার জীবিকা নির্ভর করে। যে ভিক্ষা প্রাপ্ত হই, তাহাতে এই কয়জনের গ্রাসাচ্ছাদন চলে না। দেশে অন্নের অভাব, কাহারও সংসারে প্রাচুর্য্য নাই, স্বয়ং কষ্ট সহ্য করিয়া পরকে দেয়, এমন মন কাহারও অবস্থা নহে। সুতরাং অর্দ্ধাহারে বড়ই ক্লেশে দিন অতিবাহিত করিয়াছি। নিরন্তর পুত্র কন্যার কাতর ক্রন্দন, ব্রাহ্মণীর মিনতি ও তর্জ্জন গর্জ্জন, যেন আমাকে দিশেহারা করিয়া দিয়াছিল। শুনিয়াছি আত্মহত্যা মহাপাপ, সেইজন্য অনন্যোপায় হইয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছি।"

সাধু স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি তোমার এক্ষণে প্রচুর অর্থলাভ হয়, তবে বাড়ী ফিরিয়া যাও ত?"

ব্রাহ্মণ ব্যগ্রভাবে উত্তর দিলেন "না প্রভো, আমায় ভুলাইবেন না। আমি পুত্রকন্যার চিন্তা করিতে করিতে ভগবানের নাম করিতে পারি না। আমার জপ, তপঃ, পূজা, উপাসনা সমস্তই বিফল। চক্ষু মুদিয়া নারায়ণের চরণে হৃদয়ের তুলসীপত্র অর্পণ করি, মনে ভাবি কখন কোথা হইতে [illegible] আহার্য্য আনয়ন করিতে পারিব। প্রভো, উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, গৃহের চালে খড় নাই, মনে শান্তি নাই। সাংসারিক সুখভোগের আস্বাদ আমি প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছি, আমাকে আর ছলনা করিবেন না।"

সাধু তেমনি শান্ত ও স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, সংসারের সুখভোগ-স্পৃহা অজ্ঞানের প্রভাব তোমার নেত্রে লেপিত রহিয়াছে। এই ক্ষণিক চিত্তবিকার এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইবে। তুমি গৃহে গমন কর।"

ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন। "প্রভো, ভগবানের মধুর নাম করিতে করিতে আমার ভোগস্পৃহা কি করিবে না? আমি যেরূপ করিয়া পারি এখানে থাকিব; হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, কৌটিল্য পূর্ণ সংসারে প্রত্যাগমন করিবার আর আমার বাসনা নাই।" ব্রাহ্মণের চক্ষে জল আসিল।

সাধু বলিতে লাগিলেন "ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে মন্ত্রদান করিব, তুমি এই মন্ত্র গৃহে বসিয়া জপ করিবে। নির্লিপ্তের ন্যায় সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া পাঁচ বৎসর পরে এই স্থানে আসিও; আমি পুনরায় তোমাকে মন্ত্রদান করিব, সেই মন্ত্র জপ করিতে করিতে এই জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিবে। তোমার ভার আমি গ্রহণ করিলাম, যেরূপে হয় আমি তোমার সদ্গতির বিধান করিয়া দিব। তুমি গৃহে যাও, আমার বরে তোমার দারিদ্র্য দূর হইবে।"

ব্রাহ্মণ বড় চিন্তিত হইলেন। 'এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কেমন করিয়া যাপন করিব। পাঁচ বৎসর পরে আসিয়া প্রভুর শ্রীচরণছায়া হ'তে যেন বঞ্চিত না হই।' ব্রাহ্মণ ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মহাপুরুষ প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(২)

বৈষ্ণব কবি প্রেমানন্দ 'মনোশিক্ষায়' কি যন্ত্রনিয়মে জীবের জন্ম অতিবাহিত হইয়া যায়, কিরূপ নানা কার্য্যে দিনের পর দিন কাটিয়া যায়া, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়ে, কিরূপ অপাতমধুর সংসার-সুখে ভুলিয়া মানুষ ভগবানের চিন্তা করিবার অবকাশ পায় না, তাহা অতি সহজ কথায় বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। বালক বালিকা ধূলি কাদা লইয়া সংসার পাতিয়া খেলা করে, বড় হইলেও সেই ধূলির সংসার এমন সাজাইয়া লয় যে তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই আর সুযোগলব্ধি হয় না। কোথায় থাকে ভগবানের নাম, আর কোথায় থাকে

ভগবদ্‌চিন্তা। সেইজন্যই সর্ব্ব দেশে সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা, "ক্ষণে সাধু সঙ্গ করে, পাপ তাপ সৈন্য হরে, কৃষ্ণচন্দ্র করয়ে স্ফুরণ,"। যেমন সংসারে মায়া মোহের বন্ধন অতি কঠিন, সাধুগণ জীবের হিতকামনায় তাহার তেমনি ব্যবস্থাও করিয়াছেন। তবে, যাহার ইচ্ছা নাই, তাহার উপায় কে করিয়া দিবে?

ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহসুখ ভাল লাগে না। সেই ক্ষণিক সাধুসঙ্গ বড়ই প্রীতিপ্রদ মনে হইতে লাগিল। মহাপুরুষের কৃপা মনে করিলেই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে কিছুদিন কাটিল। ব্রাহ্মণ একটি ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। ভগবান যাহার প্রতি বিমুখ, পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাহাকে তাচ্ছিল্য করে; ভগবান যাহার প্রতি অনুকূল, সকলে তাহার সহিত আসিয়া আলাপ করে। আজ ব্রাহ্মণের সুসময় পড়িয়াছে, গ্রামবাসী, স্থির গ্রামবাসী তাঁহার সহিত আত্মীয়তা করিতে ব্যগ্র। ক্ষুদ্র ব্যবসার সূত্রে ব্রাহ্মণের গ্রামে প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। পর্ণকুটীর দূর হইল, সুরম্য অট্টালিকা সেই স্থান সুশোভিত করিল। দাস দাসী, লোক লস্কর, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি বসন্তের কোকিলের কলকূজনে ব্রাহ্মণাবাস দিবারাত্রি মুখরিত হইতে লাগিল। সুখের দিন বড় শীঘ্র কাটিয়া যায়। ইতি মধ্যেই কোন পথে পাঁচ বৎসর চলিয়া গেল। একদিবস গণনা করিয়া ব্রাহ্মণের মুখ শুষ্ক হইল। পাঁচ বৎসর অনেক সময় মনে করিয়া ব্রাহ্মণ কাহাকেও সাধুর কথা বলিয়া চিন্তিত করিবার প্রয়োজনও অনুভব করেন নাই। আজ সেই গণা দিন ফুরাইয়া গিয়াছে, তথাপি ভোগাসক্তি ত বিন্দুমাত্রও কমে নাই; বরং নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা মনে উঠিতেছে। ব্রাহ্মণ কাহাকেও বলিতেও পারিতেছেন না, সহ্য করিবার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও যেন আর চাপিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন সময়ে একদিন অপরাহ্ণে মহাপুরুষ ব্রাহ্মণের গৃহে পদধূলি দিলেন!

নীল আকাশ হইতে বজ্রপতন হইলে মানুষ যেরূপ চমকিত হয়, ব্রাহ্মণ তদপেক্ষা অধিক চমকিত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইলেন। মহাপুরুষ যে তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া কৃপা করিবেন, এরূপ কল্পিত ব্রাহ্মণের কখনও হয় নাই। তিনি কলের পুতুলের ন্যায় সাষ্টাঙ্গ হইয়া চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। সাধু তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া তেমনি মধুর হাস্যে বলিলেন 'বৎস, আর কেন, তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। পাঁচ বৎসর বড় দীর্ঘকাল মনে করিয়া তখন কাঁদিয়াছিলে, এই ত পাঁচ বৎসর ফুরাইয়া গেল। এক্ষণে সংসারে আর প্রয়োজন নাই, চল, উভয়ে নির্জ্জন কাননে বসিয়া বৈকুণ্ঠপতির ধ্যানে পরমানন্দ উপভোগ করিব।'

ব্রাহ্মণ ভয়ে ও বিস্ময়ে প্রথমতঃ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইল, কি কৌশল অবলম্বন করিলে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাওয়া যায় মনে মনে সেই যুক্তি আঁটিতে লাগিলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিতেছেন "প্রভো, আপনার এ দীনের প্রতি অনুগ্রহের সীমা নাই। আপনি এই অকিঞ্চনের গৃহে আসিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিলেন। কিন্তু প্রভো, আমার প্রারব্ধ কর্ম্মের এখনও কিছু পরিশিষ্ট আছে, তাহা শেষ হইলেই আমি যাইব। আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না, আমি নিশ্চয় যাইব।"

সাধু স্থির ধীর কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন "বৎস, সংসারের বন্ধন বড় কঠিন। ভোগাসক্তি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি অপহরণ করে। সাধারণ জীবের কথা কি বলিব, এত বড় রাজচক্রবর্ত্তী ধীমান্, জ্ঞানবান্ যযাতি, ভোগসুখে লালায়িত হইয়া, যাহা একজন প্রাকৃত ব্যক্তি করিতেও হেয়জ্ঞান করে, আপনার পুত্রের নিকট যৌবন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে কি দেখিলাম, যযাতির আত্মগ্লানি ও প্রবল অনুতাপ। বলিতেছেন,

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

ভোগে কখনও কামনার শান্তি হয় না।

ব্রাহ্মণ করজোড়ে নিবেদন করিলেন "প্রভো, আমি ঠিক আর তিন বৎসর পরে শ্রীচরণসকাশে উপস্থিত হইব।"

'তাহাই হউক' বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণ এক মহাবিপদ কাটিয়া গেল মনে করিয়া আরামসূচক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ব্রাহ্মণ এক্ষণে সংসারের সুবন্দোবস্ত করিতে মনোযোগী

হইলেন। পুত্রগণের বিবাহ দিলে তাহাদের স্বতন্ত্র শয়ন কক্ষের আবশ্যক হইবে বিবেচনা করিয়া মিস্ত্রি ডাকাইয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত উপদেশ দিলেন। গৃহের চারিদিকে বাঁশ পুতিয়া ডাক হাক করিয়া তাহারা কর্ত্তার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিল। গোজাদের সহিত জমিজমার বিলি ব্যবস্থা হইতে লাগিল। গৃহপ্রতিষ্ঠিত নারায়ণশীলার জন্য জমিজমা পৃথক করিয়া রাখিলেন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা মানদাকে শিক্ষিত করিয়া সমর্পণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ স্বয়ং তেমন লেখাপড়া শিখা করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার দারিদ্র্য দোষ বর্ত্তমান প্রাচুর্য্যে একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছিল। সংসারে যাহা সর্ব্বত্র নিত্য ঘটিয়া থাকে, এস্থানেও তাহাই ঘটিয়াছিল। এই শিক্ষিত পরিবার হইতেই প্রথমে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। বিবাহের পরে শিক্ষিত জামাতা কেবল পাকে পাকে ধনবান শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে কিছু আদায় করিত। মেয়েটির জন্য তাঁহার এক দুশ্চিন্তা হইল। তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ছোট ছেলেটি তাঁহার বড় বাধ্য। তাঁহারা একত্র শয়ন, একত্র ভোজন ও উপবেশন করেন। তাহার কথা মনে হইলেই আর সেই জঙ্গলে বসিয়া নির্গুণ ভগবানের উপাসনা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। উমাপ্রসাদের সদাপ্রফুল্ল মুখখানি তাঁহাকে সব ভুলাইয়া দিত। উমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার সর্ব্বক্ষণ মনে হইত, তিনি না দেখিলে তাহার খাওয়া হইবে না, তিনি না থাকিলে উমা বাঁচিবে না। কারণ উমা পিতা-অন্ত প্রাণ। তাঁহার অবর্ত্তমানে এই সরল প্রাণ, পিতৃতুল্য নাবালকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের হস্তে কি লাঞ্ছনা হইবে ভাবিয়া তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। বস্তুতঃ, এই শেষ বৎসর কয়েকটি তাঁহার নিতান্ত দুশ্চিন্তা ও কষ্টে কাটিতে লাগিল।

মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। যে পাঁচ প্রকারের কামনা করে, তাহার তাহাতেই অতৃপ্তি থাকিয়া যায়, যাহার শত প্রকারের কামনা, তাহার তৃপ্তি ত কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণের বহু প্রকারের ব্যবস্থার যখন শেষ হয় নাই, তখন তাঁহার জীবনের শেষদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মায়ার কি দৃঢ় বন্ধন, পুত্র কন্যার কি প্রবল আকর্ষণ, সংসারের কি বিষম টান, ব্রাহ্মণ শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়াও কিছুতেই ভগবানের দিকে মন ফিরাইতে পারিতেছেন না। একবার কোন প্রজার কথা, একবার স্ত্রীপুত্রের কথা, পরক্ষণেই অন্য ঘটনা কত এলোমেলো হইয়া স্মৃতিপথে আসিতে লাগিল। শেষে অস্ফুটস্বরে "উমা" "উমা" বলিতে বলিতে তাঁহার দেহত্যাগ হইল।

(৩)

বাটী কাটিয়া, জঙ্গল পরিষ্কার ও নানারূপ অন্তরায় অতিক্রম করিয়া রাস্তা প্রস্তুত করা কঠিন কার্য্য; পথ নির্ম্মিত হইয়া গেলে সেই পথে চলা কিছুই কঠিন ব্যাপার নহে। ব্যবসায়টি দাঁড় করাইতে ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্রগণ ব্যবসায়ের কর্ত্তা হইলেন। অনুগত ও অনুগৃহীত ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদিগকে বড় বাবু, মেজ বাবু ও ছোট বাবু নামে অভিহিত করিতে লাগিল। ঐশ্বর্য্যের আতিশয্যে, ব্যবসায়ের হাঙ্গামায় ও কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে তাঁহারা পিতার প্রতি সম্যক শোক-প্রকাশের অবকাশ পাইয়া উঠিলেন না। ব্রাহ্মণ যতদিন জীবিত ছিলেন কোন বিষয়েই কাহাকেও মাত্রা অতিক্রম করিতে দিতেন না। তাঁহার অবর্ত্তমানে পুত্রগণ বহুবিধ সুখভোগের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন অপরাহ্ণে একটি সন্ন্যাসী তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৌম্য মুখমণ্ডল দীর্ঘ দেহ ও অপূর্ব্ব অঙ্গ সৌষ্ঠব তাঁহারা তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিল। সন্ন্যাসী কোথা হইতে আসিয়াছেন, কি প্রয়োজন কিছুই বলিলেন না। তাঁহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলেন 'আজ প্রায় এক বৎসর হইল তাঁহাদের পিতার দেহান্ত হইয়াছে। তিনি দৈববলে বলীয়ান্ ছিলেন ও খুব ভাল লোক ছিলেন, অনেক টাকাকড়ি রাখিয়া গিয়াছেন। বাড়ী ঘর তৈয়ার করিয়াছেন, প্রথমে যেমন গরিব ছিলেন, তেমনি শেষজীবনে অনেক অর্থব্যয় করিবার পর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।'

মহাপুরুষ একটু চিন্তান্বিত হইলেন। তাইত, ব্রাহ্মণ মরিয়া গেল, তাহার ত সদ্গতি করা হইল না। এমন সময়ে একটা কাল কুকুর যেন পরিচিতের ন্যায় তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। এই "বাঘা" কুকুরটি বড় বাবু হরপ্রসাদের শিশু পুত্রটির রক্ষক বলিলেই হয়। সমস্ত দিন কোথায় লুকাইয়া থাকে, সন্ধ্যা হইবামাত্র আসিয়া বাড়ী পাহারা দিতে আরম্ভ করে। কোথাও একটু টু শব্দ হইলেই, আর রক্ষা নাই। ভীষণ শব্দে সেইদিকে তীরবেগে ছুটিয়া যায়। উহার জন্য বাড়ীতে চোরের ভয় নাই। এদিকে আবার খোকা ওর পিঠে চড়িয়া সারাদিন খেলা করিতেছে। যেন কতই স্নেহ, কতই ভালবাসা।

এইরূপে উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে কুকুর-বাহার শুনাইয়া প্রীত করিতে চেষ্টা করিল। সকলে যখন গল্প খুব জমাইয়া তুলিল, তখন মহাপুরুষ কুকুরের কর্ণ ধরিয়া টানিয়া তাহাকে আতিথ্য করিলেন, বলিলেন "হিন্দে ব্রাহ্মণ,

কর্ম্মদোষে অর্দ্ধ-লালসগ্রস্ত কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ; যথেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এইস্থানেই যবনিকা পতিত হউক। আমার সঙ্গে আইস। আর আপত্তি করিও না আমি তোমার সদ্গতির বিধান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, সেইজন্য বার বার তোমার গৃহে আসিতেছি।"

মনুষ্যের জীবনে অনুকূল মুহূর্ত্ত বহুবার আইসে না। তাহা বুঝিয়া যে সেই শুভ মুহূর্ত্তে কর্ম্মারম্ভ করিতে পারে, তাহার জীবন অন্যরূপ হয়, যে আলস্যপূর্ব্বক সুখঘোরে ভুলিয়া বসিয়া রহিল, তাহার দুর্গতির সীমা থাকে না। ব্রাহ্মণ সংসার-সুখে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে কুক্কুর জন্মই তাহার নিকট শ্রেয় হইয়া দাঁড়াইল। সে কিছুতেই মহাপুরুষ প্রদর্শিত সাধুজনসেবিত পন্থা অনুসরণ করিল না। যে কর্ম্মের যে পুরস্কার, যে ব্রতের যে ফল, তাহার অন্যথা ঘটিবার উপায় নাই। সেইজন্যই সমস্ত জন্মের সার মনুষ্য জন্ম পাইয়া বৃথা ব্যয়িত হইয়া যায়, এই নিমিত্ত জীবহিতকামী মহাত্মারা বারম্বার করিয়া তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে এত ব্যগ্র ও এত যত্নবান্।

মহাপুরুষ প্রসন্নচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

আবার তেমনি করিয়া সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইতে লাগিল। বিশ্বরাজের নিয়মানুসারে প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ পূর্ব্বে ন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সুখে দুঃখে বৎসরাধিক অতীত হইয়া গেল।

একদিন প্রাতঃকালে সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পুনরায় সেই ব্রাহ্মণের আঙ্গনে পদধূলি দিলেন। শুনিবামাত্র বাবুরা ছুটিয়া আসিলেন। লোকজন যে যেখানে ছিল, সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য ধরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী অধিক কথা বলেন না, কিন্তু এমন এক একটী কথা মধ্যে মধ্যে উচ্চারণ করেন, যাহার একটীতে অনেক লোকের অনেক প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়। অধিক বেলা হইল দেখিয়া গৃহস্বামীগণ নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে তাঁহাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন।

সাধু স্নান করিয়া পূজাহ্নিকাদি করিবার নিমিত্ত ঠাকুর ঘরে গিয়া বসিলেন। অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া আসিয়া জ্যেষ্ঠ হরপ্রসাদকে ডাকিয়া বলিলেন "বাবু, তোমাদের ঐ পাশের ঘরটাতে কি হয়?" হরপ্রসাদ বিস্ময়াপন্ন উত্তর করিলেন, "ওটী যে আমাদের দালানা।" সাধু বলিলেন "শীঘ্র ঐ ঘরটার দরজা খোল। উহার ভিতরে তাহার দর্পচূর্ণ করা যাইতেছিল।"

"কি সর্ব্বনাশ" বলিয়া হরপ্রসাদ ছুটাছুটী করিয়া কনিষ্ঠদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। তিন ভ্রাতা তিন ঘটী জলে সন্ন্যাসীর সহিত দালানার দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। লৌহ দ্বার খুলিবামাত্র অল্পে সমস্ত সর্প গৃহকোণ হইতে মধ্যস্থলে আসিয়া ভীষণ ফণা উদ্যত করিতেই হরপ্রসাদের এক আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। বাবুরা অতি মাত্র শিক্ষিত; প্রতিহিংসায় অন্ধ সেই নীলবর্ণ মহাসর্প তাহার গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার লোহিতোজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় যেন তাড়িৎ প্রবাহ সঞ্চালিত করিতেছিল মুহূর্ত্ত মধ্যে দুই ভ্রাতাও তাহাকে আক্রমণ করিল।

মহাপুরুষ তখন তাহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যোগবলে তাহাকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। অমনি সেই ভীষণ সরীসৃপের আলাময় দৃষ্টিতে কাতরতা ফুটিয়া উঠিল। যাহাদের মায়ায় অন্ধ হইয়া সে জন্মে জীবসত্তের নিয়তির তত্ত্বে নাস্তিকেছিল, তাহাকে পীড়ন করিয়া, তাহার প্রাণ বাহির করিয়া আজ তাহাদের কি আনন্দ!

আর বক্তব্য নাই যে মুক্ত করে নতজানু হইবে, আর তাহা নাই যে প্রাণের ব্যাকুলতা, হৃদয়ের দারুণ হাহাকার প্রকাশ করিয়া দয়া ভিক্ষা করিবে। যখন সে সুবিধা ছিল, তখন ইহা মনেও আসিত না; আজ সব হারাইয়া সমস্ত খোয়াইয়া, অনুতাপের প্রবল বহ্নিতে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া হীন সর্পের ভাষায় ডাকিল, "প্রভো, দীনাতিদীন হীনাতিহীন, একান্ত ঘৃণ্য একান্ত উপহাসাস্পদ, তোমার চরণের পূত ধূলিকণা স্পর্শ করিবার অযোগ্য, আজ আমি তোমার করুণ জলধির জলবিন্দুর ভিখারী।"

বেশী কিছু বলিবার অবসর কোথায়? পৃষ্ঠে মুহুর্মুহুঃ লগুড়াঘাত হইতেছে। চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। মৃত্যু ভয়ে প্রাণ বড়ই কাতর। সে যখন মহাপুরুষের অসীম করুণায় নিজের অবস্থা সম্যক অনুভব করিয়া ব্যর্থ হীন জীবন ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়াছিল, তখন কনিষ্ঠ রমাপ্রসাদ যষ্টির আঘাতে তাহার মস্তক বিচূর্ণিত করিয়া সর্প জন্ম হইতে তাহাকে চিরনিষ্কৃতি দান করিল।

মহাপুরুষ সেই আনন্দ কোলাহলপূর্ণ আলয়ে সেই দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক যোগপ্রভাবে হতভাগ্য ব্রহ্মশিষ্যের সদ্গতির বিধান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক, বি, এ

শ্রীবিবেকানন্দ উৎসবে

পূজ্যপাদ সাধু এবং মাননীয় মহোদয়গণ,—

ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি বহুবার বহু সভার নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আজ মহাপুরুষের নাম সংযুক্ত এই মহতী সভায় আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে সৌরবের আসনে বরণ করিয়া আপনারা যে সম্মান দান করিয়াছেন, মুখের একটা কথায় ধন্যবাদ দিয়া তাহার প্রতিদান হয় না। এই জন্য আপনাদিগকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাহি না ; কেবল বলিতে চাহি যে আপনাদের এই উদার অনুগ্রহে আমিই ধন্য হইয়াছি। সাধুসঙ্গ এবং সৎপ্রসঙ্গ আলোচনার সুযোগলাভ আমাদিগের মত কাম-কাঞ্চনলিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সাগর-সঙ্গমে সন্তরণাভ্যাসের ন্যায় পাপহর এবং পুণ্যকর। এই জন্য পূর্ব্ব হইতে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি। আমি এখানে কিছু বলিতে আসি নাই, আসিয়াছি—শুনিতে এবং পারি যদি, কিছু শিখিতে। অতএব উদ্যোক্তারা আমার নিকট কোনরূপ বিস্তীর্ণ আলোচনা প্রত্যাশা করিবেন, তাঁহারা নিরতিশয় নিরাশ হইবেন। ইহা আমার দীনতা নহে, প্রকৃত অন্তরের কথা।

আজ যে পুণ্য প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা ব্যাপৃত, তাহার উচ্চতা—গগনস্পর্শী, প্রসার—অনন্ত, গভীরতা—অতলস্পর্শী।

> "অদ্রিঃ লিখনী দয়ং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধু পাত্রে
> সুর তরু-বর শাখা লেখনী পত্র মূর্ব্বী।
> লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
> তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥"

সুদূরীয় সাগরের আধারে হিমাচলের ন্যায় পুঞ্জীকৃত কজ্জল করিয়া পৃথ্বীর ন্যায় বিশালায়ত পত্রে কল্পতরু শাখার লেখনী দ্বারা স্বয়ং সারদা দেবীর গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, কোথায় সেই গুণসিন্ধু শঙ্করপ্রতিম জগদীশ্বর, আর কোথায় ভক্তিপ্রবর শ্রীবিবেকানন্দ, আর কোথায় আমার মত বিষয়-বিষ-কীট, অধম অজ্ঞজন! আজ যে নামের সৌরব-সৌরভ সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছে, যাহা উচ্চারণ করিলে জিহ্বা পবিত্র হয়, যাহার উচ্চারণে শতশত হৃদয় বাজিয়া উঠে, সেই নামের মহাপ্রাণ, প্রেমিক সন্ন্যাসীর কথা আমি কি বলিব? তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মুক্তি চাহি না, ভক্তি চাহি না, আমি শত নরকে যাব,—বসন্তবল্লোকহিতং চরন্ত :—এই আমার ধর্ম," তাঁহাকে সম্যক্ উপলব্ধি করা ও মুখের কথা, তাঁহার এই পবিত্র বাণী কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিলে মানব ধন্য হয়। সন্ন্যাসীর মুখে ভক্তি-মুক্তির উপেক্ষা শুনিলে আপাততঃ বিসদৃশ মনে হয় বটে, কিন্তু বুঝিলে বুঝা যায় যে শ্রীবিবেকানন্দের উক্ত লোকহিত-অনুষ্ঠান এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নারায়ণজ্ঞানে নরসেবাধর্ম্ম বেলাভূমিপায়ী অদ্বৈত সাধনার বিস্তির পথ যাত্র।

কালের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যে সকল মহাপুরুষ অবতরণ করেন, তাঁহাদের পূত চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে অহৈতুকী প্রেম এবং অলৌকিক লোকহিতৈষণা তাঁহাদের বিশাল বিশ্বব্যাপী হৃদয়ে অম্লান পারিজাতের ন্যায় চির পরিস্ফুট। প্রেম এবং লোক হিতৈষণা ইঁহাদের সকল কার্য্যের প্রেরণা। পরের জন্য জীবন ধারণ ইঁহাদের প্রতিশ্বাসবায়ু পরার্থে উৎসর্গীকৃত। প্রেমের শক্তি ত্রিলোকে অপরাজেয়। এই ক্ষুদ্র জীব নর—ক্ষণভঙ্গুর কলেবর—নিশ্বাস-পবনের উপর যার জীবন নির্ভর সে দেবত্বের উপর ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়—প্রেমে। কেননা, স্বর্গবাসী দেবতা স্বর্গসুখাভিলাষী, আর ঐশী-বিভূতি-ভূষিত প্রেমিক কেবল আত্মদান প্রয়াসী। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান আয়ুধ বজ্র—যার বলে তিনি ত্রিলোক বিজয়ী সেই অশনি, নরমুনি দধিচীর লোক হিতায় অস্থিদানে নির্ম্মিত। আত্মবলিদান প্রেমের নামান্তর মাত্র। মাতা, পিতা, সতী, স্বদেশ প্রেমিক

ভক্ত—যাঁহাদের জন্য ধূলিধূসরা বসুন্ধরা রত্নময়ী আখ্যায় ভূষিতা হইয়াছেন—তাঁহারা সকলেই প্রেম স্বার্থত্যাগ বা আত্ম বলিদানের জীবন্ত বিগ্রহ।" প্রেমের বন্ধনে সংসার স্থাপিত নশ্বর মানব-জীবনে প্রেম পরম ঐশ্বর্য্য—কেননা এই প্রেমই সাম্য, মৈত্র্য সৌভ্রাতৃত্বের মূল এবং অদ্বৈত জ্ঞান পূর্ণ বিকাশের তপন-স্বরূপ। ত্যাগ-বিবেক-বৈরাগ্য বিভূষিত বিবেকানন্দের এই প্রেমই ছিল শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রেমিক নরবর নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে কিরূপ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এই বিপুল মানব-সমাজ স্বার্থপর নরপশুর মৃগয়া ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ, কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া উষ্ণশোণিত পান করিতেছে! কে বলে ইহা তাঁহার প্রাণারাম প্রেমময়ের প্রেমের সংসার? না—না—কখন না! ইহা নরমেধ যজ্ঞশাল! প্রেমিকহৃদয় সন্ন্যাসীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী যে প্রেম তাঁহার প্রেমাস্পদের পূজার জন্য প্রাণের নিভৃত ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দান করিলেন—নরসেবায়। প্রেম তাঁহার ধর্ম, লোকহিত—সাধনা, মোক্ষ—নরসেবা।

কিন্তু এই সেবাধর্ম্ম কি প্রকৃত পক্ষে মোক্ষধর্ম্মের বিরোধী? যে তারত শাস্ত্রে মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে; মুমূর্ষু মানব যেখানে শরীর পরিত্যাগ করিবার জন্য লালায়িত; যাহার জল, স্থল, আকাশ, বাতাস, মোক্ষমূলক অদ্বৈতমন্ত্রে অনুপ্রাণিত, অদ্বৈত সাধনা যাহার সনাতন ধর্ম, সেখানে এ নূতন পন্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন—কালের। এ দেশে যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন নূতন নহে। যুগে যুগে অবতার প্রমুখ যুগাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক তাহাই সাধিত হইয়াছে। এই কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে তপ, জপ, যোগ, সাধনা, বিবেক, বিচার দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অতীব দুঃসাধ্য। সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া নরসেবা বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রকৃষ্ট পন্থা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতে করিতে হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের স্ফুরণ হয়। এই বিশ্বপ্রেম অদ্বৈতপ্রেমের রূপান্তর। মানবমাত্রেই সচ্চিদানন্দের প্রকৃষ্ট বিগ্রহ। যদি মৃত্তিকা, প্রস্তর বা ধাতু-নির্ম্মিত পূজা, শাস্ত্রবলে অদ্বৈতজ্ঞান লাভের প্রথম সোপান হয়, তবে চেতনবিগ্রহ মানব সেবায় তাহা হইবে না কেন?

ইউরোপে যেখানে নরসেবা ধর্ম্ম আচরিত হয় কিন্তু তাহা নারায়ণ জ্ঞানে নহে, দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। দয়াভাবে সেবাধর্ম্মের আচরণে সেবা-সেবকের মধ্যে গুরু লঘু ভাবের উদয় করে বলিয়া অদ্বৈত জ্ঞান বাধিত হয়। যাহা ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ সাধন করে,—"সা চাতুরী চাতুরী।"

বাস্তবিক পারলৌকিক কল্যাণ হাতিয়া দিয়া শুদ্ধমাত্র ঐহিক মঙ্গলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, শিবজ্ঞানে জীবসেবা নরসমাজের পক্ষে পরম হিতকর। ইউরোপীয় মনীষীগণের মত, সংসারের দ্বন্দ্ব, বৈরতা দূর করিয়া, ভূতলে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সাম্য, স্বাধীনতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের স্থাপনা একান্ত আবশ্যক। এইরূপ স্বর্গ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীদেশে ঘৃণিত মানব যে সাম্যের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল এবং তাহার ফলে যে অবিরল রক্তধারায় ফ্রান্স মহাশ্মশানে প্লাবিত হইয়াছিল সে সকলই ফরাসী ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত।

যতদিন না প্রেমের প্রতিষ্ঠায় মানব প্রকৃতি হইতে হিংসা দ্বেষ, কিংবা স্বার্থ প্রভৃতি হিংস্রবৃত্তিগুলিকে নিঃশেষে নির্ম্মূল হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হইবে ততদিন ভূতলে স্বর্গ প্রতিষ্ঠার আশা আকাশ কুসুমের মত সুদূর পরাহত। স্বার্থ বিসর্জ্জনের একতা বন্ধনে পৃথিবীর দ্বন্দ্ব তাপ দৈন্য মোচন করা যদি কখন কল্পনা করিতে পারা যায়, তাহা কেবল মাত্র বিশ্বপ্রেম বা অদ্বৈত-জ্ঞানে সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞানই একতার মূল মন্ত্র। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম মোক্ষলাভের এই তিন সনাতন মার্গ। জ্ঞান, দুর্লভ, ভক্তি দুঃসাধ্য। প্রায় ষষ্ঠী বর্ষ এই ঘোর রজস্তমঃ সংসারে বিচরণ করিয়া প্রতিপদে প্রতিহত বুঝিয়াছি যে ঈশ্বর আছেন ইহা প্রভৃতি ত্রি অনেক দূরের কথা —এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতে কিছুই জানিবার বুঝিবার উপায় নাই। আমি কিছুই জানিনা কিছুই বুঝিনা। এমনকি অন্যাপেক্ষা যাহাকে আমার জানা বুঝা অধিকতর সম্ভব, সেই আমাকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা কম জানি, কম বুঝি। যে

আবাল্য দীর্ঘ সাধনার শাস্ত্র উপদিষ্ট আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে তাহা অতীব দুঃসাধ্য। এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে নিষ্কাম কর্মযোগ, বিশেষতঃ ঐকিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত শিবজ্ঞানে জীব-সেবা যে ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

নরেন্দ্রনাথ যে কেবল কর্ম মার্গানুগত নর-নারায়ণ সেবার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রম উভয়েরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি যেমন জ্ঞানী, তেমন নিঃস্বার্থ কর্মী এবং জ্ঞান কর্ম আবরণে মহাভক্ত ছিলেন। তাঁহার উপদিষ্ট সেবাধর্মের আচরণ সম্বন্ধে আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় তাঁহার অভিপ্রায় ছিল দুর্বলকে বল, নিরন্নকে অন্ন, পীড়িতকে ঔষধ, পথ ভ্রান্তকে পথ দাও, পঙ্গুকে চলিতে শিখাও, অন্ধকে দৃষ্টিদান কর; আত্মা যার মোহ তিমিরাবৃত, তার অন্তরের ঘরে দীপ জ্বালাইয়া দাও, আর তাহাকে বল—অভিঃ! আমি সেবার কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি, এই জন্য যে আমার মনে হয়, এই নিষ্কাম কর্মই আমাদের বর্তমান যুগধর্ম। এই চির দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশ ইহার জীর্ণ, শীর্ণ, দুর্বল নরনারী, আর সর্বোপরি, জ্ঞান ঐশ্বর্যাবয়ী এই ভূমির বর্তমান আধ্যাত্মিক দৈন্য দেখিলে কার না মনে হয় যে, এই যুগধর্মের প্রবর্তনে শ্রীনরেন্দ্রনাথ ত্রিকালজ্ঞ ঋষির জ্ঞানচক্ষুর পরিচয় দিয়াছেন? তারপর হিংসা-দ্বেষ কলুষিত স্বার্থৈক লক্ষ্য বিকৃষিত ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন!—যেখানে করাল অত্যাচার আপনার তাণ্ডব-নর্তন শ্রান্তিতে আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে শোকের আতিশয্যে হাহাকার স্তব্ধ, বিয়োগ বিধুরার উচ্ছ্বাস-বদনে নদীর স্রোত, মহাকাশ আচ্ছন্ন! যেখানে অহি-মালিনী মেদিনীর রক্ত কলেবর অঙ্গ ধারায় ধৌত হইতেছে! সেই শতশত্রুবে আর্ত শোকার্ত ঐশ্বর্যও যারা জীবিত আছে—সেই বস্তুতান্ত্রিক প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রেমবাণীর জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে তাহা আমাদিগকে শুনাইতে হইবে। বলিতে হইবে যে "হিংসায় হিংসা জয় করা যায় না, ঘৃণায় ঘৃণা জয় করা যায় না। বিদ্বেষে বিদ্বেষ জয় করা যায় না ঘৃণা হিংসা বিদ্বেষ জয় হয় কেবল প্রেমে। জলধির গর্জন লঙ্ঘিয়া গম্ভীর মেঘমন্দ্রে অমর সন্ন্যাসীর এই অবিনশ্বর বাণী জগতে ধ্বনিত হউক। সকল স্বার্থ বলি দিয়া সেবাধর্মে দীক্ষিত হইয়া প্রেমের বিজয়নিশান করে নির্ভীক অন্তরে শ্রীবিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। জীবন-সংগ্রামে যে ভীত তাহাকে বলিতে হইবে—অভিঃ! ভয় ? কিসের ভয় ? পূজ্যপাদ স্বামিজী বলিয়াছেন—"ভয়ই মৃত্যু!' বীরের মৃত্যু একবার, কাপুরুষ শতবার মরে।

আজ কোথায় তুমি, মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী! তোমার সেই গৈরিক বসনাবৃত সৌরবপু পরিগ্রহ করিয়া যে নির্ভীক দৃষ্টিতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় জগত জয় করিয়াছিলে সেই নিঃশঙ্ক দৃষ্টি লইয়া, তোমার আজানুলম্বিত বরবাহু দুলিয়া দিঙ্মুখ মুখরিত করিয়া বজ্র নির্ঘোষে আর একবার বল—অভিঃ!

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে
এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর!!"

এস সর্বত্যাগী প্রেমিক নরবর! ভারতের এই ঘোর আধ্যাত্মিক নিশায় প্রাক্‌সূর্যোদয়ের ন্যায় আর একবার উদিত হও, আমরা তোমাকে অভিবাদন করিয়া জীবন ধন্য করি।

শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

"জলদ"

ওগো আছে—ওগো আছে—
তৃষিত হৃদয় মাঝে
পিয়াসের কত বড় জ্বালা।

শুষ্ক কণ্ঠ—ক্ষীণ শ্বাস
কোথা বারি কোথা আশ
মরুভূমি বালুরাশি ঢালা।

বুঝি দূরে—বহু দূরে
মরুস্থ হৃদয় কুঁড়ে
দুই গাছি শ্যাম তৃণ উঠে—
ওথা যদি মেলে জল
পা দুটীতে নাহি বল,
তবু যাই প্রাণপণে ছুটে।

মরীচিকা মুগ্ধ আমি—
ওগো ও জীবন-স্বামী
কেন খেলা! কেন ছল ?

তৃষায় হৃদয় ফাটে
দীপ্ত দুপরে মাঠে
জল শুধু—এক ফোটা জল!

শ্রীঅতুল্যকুমার আঢ্যদী.

পরোপকার

(কথা-নাট্য)

প্রথম দৃশ্য

(স্থান কৃষ্ণচরণের বৈঠকখানা। পাত্র, কৃষ্ণচরণ, গোপীনাথ ও রাঘবরত্ন)

কৃষ্ণচরণ—

দেশের মধ্যে চারিদিকে, কেবল দুর্দশা কেবল হাহাকার ; আর পারা যায় না।

রাঘবরত্ন— (একটান তামাক টানিয়া)

বাস্তবিক, আর সয় না, চারিদিকে কেবল মৃত্যু—কেবল যন্ত্রণা, এর যে কি উপায় হবে, ভেবে পাই না।

গোপীনাথ—

একমাত্র উপায়, পরোপকার ব্রতের উদ্যাপন।

কৃষ্ণচরণ—

এস আমরা অন্য কারোর আশা না করেই, তিন জনেই তিন শ্রেণীর পরোপকার ব্রত গ্রহণ করে আগামী কল্য যজ্ঞেই কর্মক্ষেত্রে নেবে পড়ি,—কি বল ?

রাঘবরত্ন—

ঠিক বলেছ আর বিলম্বে প্রয়োজন নেই। আজই আমাদের পুরোহিত ঠাকুরকে ডেকে, এস তিন জনে মিলে উপকার-যজ্ঞে দীক্ষা নিয়ে ফেলি। দীক্ষা নিলেই, মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার হবে—আমরা রীতিমত কাজ কর্ম্মে পারব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(স্থান—কৃষ্ণচরণের বাটীর প্রাঙ্গণ। পাত্র নীলমণি শাস্ত্রী, গোপীনাথ, কৃষ্ণচরণ ও রাঘবরত্ন)

নীলমণি—

বলিহারি, তোমরা আজ উপকার-যজ্ঞে আমার কাছে দীক্ষা নেবে সংকল্প করেছ—এ বড় আনন্দের বিষয়। বৎস রাঘবরত্ন—তুমি, জাতিতে বৈদ্য, ঔষধিতত্ত্বে তোমাদের অভিজ্ঞতা বেশী,—অতএব তুমি ঔষধ বিতরণের দ্বারা বিশ্বের উপকার সাধন কর। বৎস গোপীনাথ—তোমার পিতা ছিলেন অধিতীয় ব্যাখ্যাকার—অতএব তুমি, তোমাদের বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন সঙ্কল্প করে—জগতের যাবতীয় সাহিত্য এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রকে বৈষ্ণবভাবে ব্যাখ্যা করে—নিজের সমাজের সেই সঙ্গে বিশ্বের উপকার সাধন কর। বৎস কৃষ্ণচরণ, তোমার পিতা, একজন বড় রকমের ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন—সুতরাং তুমি, সকলকে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে—সকলের মনকে সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত-লোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর, তোমার সেই চেষ্টায় দেশের সেই সঙ্গে বিশ্বের পরম উপকার সাধিত হবে।

(সকলে উপুড় হইয়া নীলমণিকে প্রণাম করিলেন।)

রাঘবরত্ন—

ঠাকুর মশায়—বিদায়ের পূর্ব্বে এক ছিলুম তামাক খেয়ে যান।

নীলমণি—

আচ্ছা সাজ—হাঁ একটু কড়া করে সেজো। আগের ছিলুমে তেমন স্বাদ ছিল না।

তৃতীয় দৃশ্য

(স্থান—যতীনের বৈঠকখানা। পাত্র, যতীন্দ্র, নরেশ মনোজ, তরুণ ও বীরেন্দ্র)

বীরেন্দ্র—

চল, আর একবার এ্যাপলোতে থিয়েটার দেখে আসি, শুনছি মিস্ গহর সাবিত্রীর পার্ট নিচ্ছে।

নরেশ—

সত্যি ;—চল যেতেই হবে—শুনেছি মিস্ গহরের এ্যাকটিং বড় সেরা দরের।

রবীন্দ্র—

বাস্তবিক ভাই, "বাপং বীরের ধর্ম কুরুতে"—এই কথাই ঠিক। বিদুরের ধর্মে কেবল বাপেরই কথা বলেচে—ঐ ধরে ভাবছি—ও বাপ খুড়োর ধর্মটা আলাই কর্ব।

তরুণ—

সব ও ঠিক—কিন্তু কে আস্‌চে দেখ্‌তে পেয়েচ?

রবীন্দ্র—

কোথায় কই? কে আবার আস্‌ছে?

তরুণ—

আমাদের গোপীদাদা আস্‌চেন। কেবলা এসেই বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারে লেগে যাবে। ঐ নাকি ওঁর উপকার ব্রত।

রবীন্দ্র—বিলক্ষণ, তাঁর ব্রত প্রচারের বেলায় আমরাও' বিব্রত হয়ে পড়ব না?

তরুণ—বিশেষ রকম বিব্রত হয়ে পড়বে, চুপ্ কর—ঐ এলেন, (ঐ কক্ষে, অঙ্গে নামাবলি জড়াইয়া গোপীনাথের প্রবেশ)

গোপীনাথ—এই যে ভাই সকল, তোমরা ও সকলেই উপস্থিত আছ। কাল রাত্রিরে যখন বিছানায় শুয়েছিলুম—আমার রাত্রি সাড়ে ৯টা হবে—এমন সময় শুনি, আমাদের পাশের বাড়ি, মিষ্টিস্বর, গাইচে—

"তুমি দাঁড়িয়ে আছ আমার গানের
ওপারে
আমার সুর পায় চরণ তোমার আমি পাইনা
তোমারে।

বেড়ে গান, বলতে পার এটা কার গান?

তরুণ—আজ্ঞে হাঁ, এই গানের রচয়িতা একজন—অদ্বৈতবাদ, নাম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গোপীনাথ—আরে—কি ভাব, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অপরূপ। একটু যদি বিশ্লেষণ করে দেখ—দেখতে পাবে, ঐ গানটায়—যমুনা, বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ সবই আছে। সেই সঙ্গে, রবীন্দ্র চরিত্রের কমনীয় ভাব ভাও বেশ আছে। কে বলে রবিবাবু বৈষ্ণব নয়, উনির খাঁটি বৈষ্ণব। আচ্ছা বলি শোন,—

তুমি দাঁড়িয়ে আছো'র—"তুমি"টা শ্রীকৃষ্ণ, আর 'আমি পাইনা তোমারে'র "আমি"টা রাধা, 'গানের ওপারে'র "গান"টা যমুনা। "আমার সুর পায় চরণের" সুরটা রাধার প্রেম, এখন কল্পনা করে দেখ যমুনার এক পারে রাধা অন্য পারে শ্রীকৃষ্ণ, মাঝখানে সঙ্গীতময় জল-কল্লোল, ঐটাই রাধা, তাই রাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলতে পাচ্ছেন না, কিন্তু রাধারই প্রেম—সে কৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়ছে, বল দেখি ভরপুর বৈষ্ণবভাব কেমন ফুটেছে।

বীরেন্দ্র—আপনার বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ছাড়ুন—ও খোল খরতের ফুতের ক্যাচ কেচি আর ভাল লাগে না।

গোপীনাথ—তা বটে, যা শুনলে যা বুঝলে, উপকার হবে তা তোমরা কর্বে কেন?

তরুণ—অনেক উপকার করেছেন, অনেক উপকার আপনার কৃপায় গিলেছি—এখন একটু রেহাই দিন। বেশী যদি উপকার সেলান, অবিলম্বে উপকারের যমালয় হয়ে যাবে।

গোপীনাথ—তা ভাই, তোমরা বিরক্ত হলে কি করব। উপকারই যে আমার ব্রত। ঐ ঘর বন্ধের কবচ করেচি।

বীরেন্দ্র—তা'হলে এখন আসুন, আমরা একটু বাসি গল্প করি।

গোপীনাথ—আচ্ছা তোমরা গল্প কর—ততক্ষণ আমি শুয়ে আরাম টেনে নেই।

নরেশ—(বীরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া)

ভাই বল দাদা, ব্রাহ্মধর্ম ঠিক ধর্ম, জাতি বিচারের কোন বালাই নেই—বায় বিচারের উপদর্গ নেই, বেশ আরামে ঐ ধর্মে থাকা যায়।

গোপীনাথ—আরে মূর্খ, বৈষ্ণব ধর্ম ছেড়ে ব্রাহ্মধর্মে কেন? এখন সহজে কটী বল, কোন ধর্মে নেই। তা ছাড়া বেদান্তের—"অদ্বিতত্ত্বের" সঙ্গে, ব্রাহ্মধর্মের কোন যোগ নেই, ব্রাহ্মধর্মের উপাসনার আর অর্থ আমি ও তুমি। বৈষ্ণবকে স্বীকার করেছে, আর কেন বৈষ্ণবাদ নিয়েই ত—বৈষ্ণবধর্ম। বৈষ্ণবধর্মের রূপান্তর মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ও ব্রাহ্মধর্ম কিছু না—নীলা নিতে চাও বৈষ্ণবধর্মে এস।

তিলক ফোঁটা কাটা আজ কালকার দিনে মানায় না। মাধবলীর সঙ্গে প্রাক্‌হেটেদের সদ্ভাব হবে না।

গোপীনাথ—তা বই কি, মাধবলীর সঙ্গে তোমাদের আর সদ্ভাব হবে কেন? গ্রামোফোন থিয়েটারে বচ দেখ্‌বে গান শুন্‌বে, কাজেই মাধবলীর প্রতি আসক্তিটা তোমাদের বেড়ে চলেছে।

মহেশ—অন্য ধর্ম্মে না হোক—আপনাদের বৈষ্ণবধর্ম্মে এই আসক্তির স্থান অতি উচ্চে, "গীত গোবিন্দ" এই আনন্দেরই তরঙ্গ।

গোপীনাথ—আঃ জ্বালা। তোমরা যে সব তত্ত্ব বোঝ না, সে গুলি কেন আলোচনা কর। জয়দেব যে রসে "গীত গোবিন্দ" রচনা করেছেন তাকে বলে মুগ্ধ আবরণ। তোমরা তো বুঝ্‌বে না, তা তোমাদের ভাল লাগবে না।

বীরেন্দ্র—তার মুগ্ধ তত্ত্ব বুঝি আর না বুঝি, তবু এটা ঠিক যে "গীত গোবিন্দের" যে স্থূল তত্ত্বের পরিচয় পাই সেটা বড়ই চমৎকার—এত চমৎকার যে মনে মনে তার আনন্দ উপভোগ কর্ত্তে পারি—কিন্তু মুখে তা বলতে পারি না।

তরুণ—সাবধান! মুখে যদি "গীত গোবিন্দ" বলে জয়দেবের সাম্‌নে কুমি আওড়াও—অম্‌নি, তোমার পিঠে কিন্তু বজ্রদেব, চরণারবিন্দ প্রণাত করে পড়বে।

গোপীনাথ—তোমাদের কিছু হবে না তোমরা একেবারে মরে গেছ, ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু জান নেই; কেবল শোন গান—কেবল গা—

(এমনসময় গোপীনাথকে বিদ্রূপ করিবার জন্য—তরুণ, চোক মট্‌কাইয়া হেলিয়া দুলিয়া গান ধরিল)

যদি যায়ব জয় তবে গাহিব না"
যদি সরস লাগে মুখে চাহিব না"

গোপীনাথ—আহা আহা বেশ' বেশ বেশ গান, এইত চাই, বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গান জান্‌লে উপকার, গান গাইলে উপকার, তার পর—

তরুণ—তারপর,

যদি বিরলে বালা বাঁধা,
আর লহনা পায় পীন বাধা'

সখি,—তোমার ফুলবনে যাইব না।

গোপীনাথ—অহো, অহো,—"তোমার ফুলবনে যাইব না, (সাশ্রুলোচনে) কি বল্‌লে তরুণ,

তোমার ফুলবনে যাইব না,

মহেশ—ধর ধর তরুণ শীঘ্র গিয়ে ধর—পলায় বুঝি পড়ল।

চতুর্থ দৃশ্য

সময় মধ্যাহ্ন, একটি বট গাছের ছায়ায় বসিয়া, সৌরী, সরলা ও এলোকেশী বসিয়া গল্প করিতেছে। তিন জনের সম্মুখেই জলের কলসী, সম্মুখের দীঘি হইতে তাহারা জল তুলিয়া শীঘ্রই বাড়ী যাইবে।

সরলা—ওমা তারুর-পোর রাগ দেখে কে, দোষের মধ্যে তার বউকে বলেছিলুম "বউমা, দিনে দুপুরে সব সময়, গোয়ালির কোল ঘেঁসে থাকলে লোকে নিন্দে কর্ব্বে।" অমনি বউ আবার সেই কথা তারুর-পোর কাণে লাগালে।

সৌরী—তা বাবু, তোমাদের গায়ে পড়ে নীত্ শিক্ষা দেওয়া কেন? দোষ কি, সব সময় স্বামীর কাছে কাছে থাকে কি ক্ষতি তাতে, স্বামীর চেয়ে লোকের কথা বড়?

এলোকেশী—যাই বল সৌরী, আমি কিন্তু প্রথম প্রথম ওঁর কাছে ঘেঁস্‌তেই লজ্জায় মরে যেতুম।

সৌরী—মরতে তোর কামাই নেই—অমনিতরো ঘরেও দিব্যি বেঁচে আছিস তো।

এলোকেশী—তা সত্যি বলি দিদি,—বাইরে ঠাট বজায় রাখ্‌লে হবে কি, ওঁকে দেখ্‌লেই—মনের ভিতরটা আকুলি বিকুলি করে উঠ্‌ত, কখন দুটো কথা বলব এই ফাঁক খুঁজে বেড়াতুম, কিন্তু ছাই পুরুষগুলো বড় বোকা—একটু ওঁকে যদি কাছে ঘেঁস্‌তুম ও আড়-চক্ষে নেই একেবারে স্থাবর সম্পত্তি করে ফেল্‌তে চায়। বিস্তর টানাটানি করে তবে নিষ্কৃতি পেতুম। এই ঘরে কত দিন আমিও বকুনি খেয়েছি। উনি পুরুষ মানুষ দিব্যি আনন্দে থাকতেন ওঁকে আর কে কি বল্‌বে—হেসেল জন্তে শুন্‌তে আমারি প্রাণান্ত হ'ত। হেঁসেলের ঠেলায়, কিছুদিন ওঁর সাম্‌নে দিনের বেলায় যাওয়াই ছেড়ে দিলুম,—আ, সর্ব্বনাশ আইনা দেখে উনিও

ছেলে বেগুনে চটে গেলেন। আর উনি আর রাস বাড়বেন —বাড়ীর চাকর-বাকরকে যখন তখন গালি দেওয়া, আর এটা ভাল নয় ওটা মন্দ এই ছুতায় যখন তখন বাড়া ভাতের থালা আছাড়ে ছুঁড়ে ফেল্‌তেন। আমিও সব বুঝ্‌তুম। বুঝেই বা কি কর্ব্ব। খণ্ডর মশায়ের মরা মাকি কোন সময় ক্ষেপে গিছ্‌লেন—তাই ওঁর মনে হল বুঝি উনিও ক্ষেপে যাচ্ছেন—এই মনে করে, একদিন ওঁকে ডেকে বল্লেন, তুমি মাছ মাংস খেও না, মাথার ঘতকুমারী বাধ্‌বে।

সৌরী—সেকেলে বুড়োগুলো বাস্তবিক নিতান্তই বোকা, ছেলেটার প্রাণ কোন কুমারী চায় তা না ভেবেই করেন ব্যবস্থা ঘতকুমারী।

এলোকেশী—বলব কি দিদি প্রথম কএক বছর বড়ই যন্ত্রণায় পড়েছিলুম।

সরলা—চল চল ভাই চল—ঐ দেখ—এদিকে আবার কে এক মিন্‌সে আস্‌চে।

সৌরী—মর—বেরেদের ঘাটে আবার কোন্ মিন্‌সে আস্‌চে।

এলোকেশী—ওই রে—সেই সেই রামবল্লভ আস্‌চে।

সৌরী—সেই বোতল পাগলা?

সরলা—বোতল পাগলা, আবার কে?

সৌরী—ঐ মিন্‌সেই—ঐ এক বর অভ্যাস ওঝারেক বোতল বোঝাই ক'রে—তার মধ্যে রাশখানেক ছেতোজল ভরে তাই যাকে তাকে খাওয়ায়—দেখনা, ঘাড়ে পিঠে বোতলের ঘোট, সেই জন্যে ওপাড়ার ছোলেদের ছোট বউ তার নাম দিয়েছে—বোতল পাগলা।

সরলা—তা বোতল পাগলা, আবার এদিকে আসে, কেন? চল চল আমরা যাই (সকলে প্রস্থান করিতেছে দেখিয়া)

রামবল্লভ—দাঁড়াও দাঁড়াও, দেওনা দেওনা, আমি উপকার কর্‌তে আস্‌ছি দাঁড়াও।

সৌরী—(নিজের সঙ্গিনীদের আস্তে আস্তে) আ—মিন্‌সে, লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে উপকার ক'র্ত্তে ছুটেছে—

সরলা—বেটাত বড় বেহায়া, ঘাটের পথে তাড়া করে—উপকার করে।

সৌরী—ঐদিকে চল ঘিস্‌ঘিস চল—এসে প'ল—

রামবল্লভ একটু দয়া কর—মা লক্ষ্মীরা, একটু দাঁড়াও, একটু উপকার করচি। আ-জ্বালা, ঘোমটা তোল, ই কর, পকড়িক দেই খাও, সর্ব্বব্যাধি সেরে যাবে, লজ্জা করো না,

(এমন সময় দীঘির অন্য পার হইতে রামগতি ছুটিয়া আসিয়া রামবল্লভের গালে এক থাপ্পর)

রামবল্লভ—এমন করে আমার গালে চড় মারবার তোমার কি অধিকার আছে?

রামগতি—জান তুমি এই তিন যুবতীর মধ্যে কোন একটি যুবতী আমার স্ত্রী; আর তুমি এদের সাম্‌নে এসে মুখের ঘোম্‌টা তুল্‌তে চাইচ।

রামবল্লভ—তা মুখের ঘোমটা খুলে দোষ কি?

রামগতি—আরে ব্যাটা বেয়াদব চুপ্—বলে কিনা ঘোমটা খুলে দোষ কি?

রামবল্লভ—রাগ কেন করচ ভাই, আমি উপকার ক'র্ত্ত বলেই ত ঘোমটা খুলতে বলেছিলুম।

রামগতি—যাও এখান থেকে, বেরেদের মুখের ঘোমটা সরিয়ে উপকার কর্ত্তেন। বদমায়েস—

পঞ্চম দৃশ্য।

(স্থান—যতীন্দ্রের কামরা, পাত্র, যতীন্দ্র, বীরেন্দ্র ও অবেশ)।

অবেশ—ব্যাপার শুনেছ?

যতীন্দ্র—কি হে ব্যাপারটা কি?

অবেশ—উত্তরপাড়া শুদ্ধ লোককে শু—রামবল্লভ অস্থির করে তুলেছে,—

বীরেন্দ্র—সে পাঁঠাটার কি হল—ওটা আছে না মরেচে?

অবেশ—সে পাঁঠাটা অনেক দিন মরে গেছে এবার গুন্‌ছি এক বাছুর ধরে—তারো আড় বসিয়ে এসেছে।

যতীন্দ্র—কি রকম কি রকম—বল বল ব্যাপারটা খুলে বল?

অবেশ—রামবল্লভের পকড়িকের চোটায়—ও পাড়ার পণ্ডিতের চোল ভেঙ্গে গেছে সেত জান, ছেলেগুলোকে ওঝারেক বেতো ঘোড়া বাইয়ে বাইয়ে দিয়ে পাঠশালা বন্ধ করে,

ওকে দেখ্‌লো, বাপ তাড়ান পরও যত ছেলেগুলো ইতস্ততঃ ঘোর বেড়ায়। গ্রামের মেয়েদের পর্য্যন্ত অস্থির করে তুলেছে, সেদিন ভট্টাচার্য্য মশায় বল্লেন,—বেলা বারটা আন্দাজ, দুপুর রোদে এমন সময় তাঁর বেগুন খেতে এক বকাটী ভীষণ রকম চেঁচিয়ে উঠেছে, ব্যাপার কি ছুটে গিয়ে দেখেন রাঘবরত্নের এক বকাটীকে চিংকরে ফেলে তার মুখের মধ্যে বোতল ভরে—পকড়িক চালচে। ভট্টাচার্য্য মশায় ব্যস্ত হয়ে গিয়ে রাঘবরত্নের হাত ধরে বল্লেন—কর কি কর কি—বিদ্যে প্রশান্ত হাসিতে রাঘবরত্ন জবাব দিলেন—"উপকার করচি।"

যতীন্দ্র—সত্যি নাকি?

তরেণ—কি বিপদ, সত্যি নাত মিথ্যে, সে পাঁঠি সেই দিনই মরেচে তার পর আমার কোন এক ছিপ্পার বাড়ুয্যে ঘরে, তাকেও ঐরকম পকড়িক খাইয়েছে। সে ছিপ্পা সেজন্য বরতভায়াকে বেশ চাঁদিয়েছে।

যতীন্দ্র—আচ্ছা আপাতত আরম্ভ করেছে তো।

ধীরেন্দ্র—আরে রাম বল। পুকুরের জলে হাত মুখ ধোয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

তরেণ—কি মুস্কিল বলত। ঘরে বেঁধে খন্ত, জানোয়ার এবং মানুষকে পকড়িক খাওয়ান দায় হয়েচে—তাই, সব পুকুরঘর রাত্রিতে দুপুরে পকড়িক ফেলে বেড়াচ্ছে।

ধীরেন্দ্র—দুর্বুদ্ধি আর কাকে বলে, সারাটা গঙ্গার জল বেজো করে দেবার চেষ্টায় আছে।

যতীন্দ্র—পাঠাও পাঠাও ওকে বহরমপুরে পাঠাও, (এমন সময় কৃষ্ণচরণের প্রবেশ)

এইযে—কৃষ্ণদাদা?

কৃষ্ণচরণ—মঙ্গল হোক তোমাদের, ধর্ম্ম তোমাদের সকলের উপকার সাধন করুন, জানত দাদা যা যাদু থেকে ধর্ম্ম। ধর্ম্মই সকল মঙ্গলকে বিধান করেন।

ধীরেন্দ্র—আপনি কি উপকার-ব্রত গ্রহণ করেছেন?

কৃষ্ণচরণ—হ্যাঁ ভাই! উপকার করার মতন কি আর ধর্ম্ম আছে। তোমরা, সুস্থ হও, সবল হও—সর্ব্বতুর্ম্মে মনের প্রতি নিষ্ঠাবান হও—তোমাদের উপকার হবে।

যতীন্দ্র—দাদা, উপকার কতপ্রকার?

কৃষ্ণচরণ—উপকার প্রধানতঃ তিনপ্রকার। প্রথমতঃ—বস্তুগত, দ্বিতীয়—শাস্ত্রগত, তৃতীয়—ধর্ম্মগত।

ধীরেন্দ্র—উপকার সাধনপ্রণালী কয়প্রকার?

কৃষ্ণচরণ—সাধন প্রণালী তিনপ্রকার। প্রথম—বাক্যবায়, দ্বিতীয়—অর্থব্যয়, তৃতীয়—শক্তিক্ষয়।

তরেণ—এর সঙ্গে আর একটি প্রণালী যোগ হতে পারে যথা—উপকারসাধন মর্ম্মঘাত, অর্থাৎ উপকারকে জীবের পক্ষে অসহ্য করে তোলা।

কৃষ্ণচরণ অসহ্য কিছু নাই, ধর্ম্মকে আশ্রয় কর—সেবা সহ্য হয়ে যাবে। পরিশেষে পরম উপকার হবে।

ধীরেন্দ্র—আর কতক্ষণ ধরে উপকার করেন? বেলা যে প্রায় এগারটা।

যতীন্দ্র—বাস্তবিক সময় ত আর নেই।

কৃষ্ণচরণ—সময় অনন্ত, জীবন অনন্ত—ধর্ম্ম অন্তহীন, জীবদেহের অস্তিত্ব ক্ষণিক, পলকে পলকে রূপান্তরে চলে যায়—তোমরা ধর্ম্মের চর্চ্চা কর—ধর্ম্মের ভজনা কর, ধর্ম্মের সাধনা কর, তোমাদের পরম উপকার হবে।

ধীরেন্দ্র—আচ্ছা তাই কর্ব্ব।

কৃষ্ণচরণ—আজ আসি, ধর্ম্মের ধ্যানে তোমাদের পরম উপকার হোক এই কামনা করি।

(কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্থান)

যতীন্দ্র—বাস্তবিক এতো, বড় বিপ্রাট হল, খোঁজ নাও তো—এই সর্ব্বনেশে উপকার মন্ত্রে কতন লোক দীক্ষা নিয়েছে?

তরেণ—বেশী নয়, এই তিন তিনেই দীক্ষা নিয়েছে। তিন তাহস্পর্শের জ্বালায় জ্বালাতন করে।

ধীরেন্দ্র—নাহে সত্যি—এরা বেগুনার প্রব্‌লেম্ হ'য়ে উঠেছে। এদের একটু মোরত করা দরকার।

তরেণ—সেজন্যে ভাবতে হবে না। রাঘবরত্নের ব্যবস্থা হয়ে গেছে—সে আশ্বাসক, সেদিন ডিপুটিবাবুর খানসামাকে ঘরে জবরদস্তি ডিপুটির চায়ের পেয়ালায় কতকগুলো পকড়িক ফেলে চা নষ্ট করে দিয়েছে। সেইদিন পাগলা বলে তাকে জুতা-কক্ষা পরান হয়েছে।

ধীরেন্দ্র—আর সেই বৈকুণ্ঠটার কি হ'ল? আর জ্বালাতন, সময় নেই-অসময় নেই যার তার ঘরে ঢুকে পড়ে

আর চকর চকর করে—মাথা-ঘুরে প্রাণ ধরে থাকে, ঘরে চুকলে সহজে আর বার হয় না,—

যতীন্দ্র—বাপরে বাপ—জিনটের কোনটাই সহজ পাত্র নয়।

ভবেশ—তবু বাপু, এরা হুধন ভাল—রাঘবরাও বড় গর্ব্ব-সেদে বলছি, যে—উপকারের ঠেলায় পাঠশালায় ছেলে ঢুকে—গোশালায় গরু ডাকে—পথে ঘাটে কুকুর বকরী থেকে থেকে চমকে ওঠে—ইউরিয়ের বদলে কলসী থেকে কেবল পকতিকের গন্ধ ছাড়ে।

যতীন্দ্র—বাস্তবিক—এদের উপর কড়া একটা ব্যবস্থা না হলে—গ্রামে টেকাই ভার হবে।

বীরেন্দ্র—আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ত বলেছেন—এদের জিনটেকেই—শ্রীরামপুরে বহরমপুরে পাঠাবেন।

ভবেশ—আরে—আরে—আর এক মজার কথা শোন নি। শোন, পরশু দিন ত L K Dhut আমাদের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট ওদের তিনটিকেই ডেকে ছিলেন।—সেখানেও আমাদের কৃষ্ণধন সীতা, গোপীনাথ শ্রীগোবিন্দ আর রাঘবরাও—এক-যোগে পকতিক নিয়ে হাজির হয়েছিল—ম্যাজিষ্ট্রেট ত হেসেই খুন। কোন রকম করে হাসি চেপে তিনি—তাদের তিনজনকেই বল্লেন "তোমরা অতঃপর আর কোন রকমের উপকারি করোনা। যদি কর জেলে দেব।" ম্যাজিষ্ট্রেটের এই কথায়—তিন পাগলেই—সমস্বরে বলে উঠল—

"চলৎ চিত্তস্থ বিস্তংজীবস্য আশার
সংসারে সার কেবলং উপকার।"

ম্যাজিষ্ট্রেট তখন ভাল করেই বুঝলেন—নাগরিক পাগলামীর মধ্যে উপকার করার বাতিকটাও—একটা দেরা পাগলামী।

শ্রীপ্রবাকান্ত রায় চৌধুরী

গ্যালিলিও

ফ্লোরেন্সের বোনাকুটীবংশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ফ্লোরেন্সের সম্ভ্রান্ত সমাজে গণ্যমান্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্যালিলিও নামক একজন বোনাকুটীবংশধরের পত্নিগৃহকার্য এই বংশের নূতন নামকরণ হইল। এই সময় হইতে এই বংশ গ্যালিলী-বংশ নামে খ্যাত হইল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্যালিলিও নামক এই বংশসম্ভূত আর একজন চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ফ্লোরেন্সে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছিলেন। আমরা যাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিতেছি সেই জগদ্বিখ্যাত গ্যালিলিও পিসা নগরে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে এই সুপ্রসিদ্ধ বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্যালিলিওর পিতা ভিন্‌সেন্‌জিও গ্যালিলী অঙ্কশাস্ত্রে এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েক-খানি গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত অথবা হস্তলিখিত অবস্থায় পৃথিবীর সুধী সমাজের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার একখানি পুস্তকে শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, কেননা তাঁহার এই অভিমত হইতেই, তিনি যে নিজের পুত্রের কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, যাহারা কোন বিষয়ের যথার্থ প্রমাণের জন্য স্বয়ং কোনও প্রকার স্বাধীন অনুসন্ধানের চেষ্টামাত্র না করিয়া, কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মতামতের উপর একান্ত নির্ভর করে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত, তাহারা অন্ধ বলা যায়। আমি চাই স্বাধীন অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি, কেননা এই গুণটীই শিক্ষার্থীদের একটী প্রধান গুণ; এই গুণ থাকিলে সত্য আপনি আসিয়া ধরা দেয়। তাঁহার এই সুপরিচিত মতটী গ্যালিলিওর জীবনে একান্তভাবে প্রযুক্ত হইয়া সার্থক হইয়াছিল।

গ্যালিলী-বংশ সম্ভ্রান্ত এবং ধনশালী বলিয়া পরিচিত থাকিলেও ভিন্‌সেন্‌জিও নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনে পুত্রকে কোনও অর্থকরী বিদ্যা দান করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। পুত্রকে অল্পবয়সেই পশমের ব্যবসা শিক্ষাদান করিতে যাইয়া তিনি তাহার অন্তর্নিহিত প্রতিভার নিদর্শন পাইলেও এবং তাহার গৌরবান্বিত ভবিষ্যতের মনোহর ছবি কল্পনা করিয়া সে সংকল্প হইতে বিরত হইলেন। এই সময়ে ফ্লোরেন্সে ভাল শিক্ষক পাওয়া যাইত না, সুতরাং অর্থাভাবে এই সময়ের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের শিক্ষাও তিনি পুত্রকে দান করিতে পারিলেন না। নিজে সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ এবং বিখ্যাত বংশীবাদক ছিলেন বলিয়া তিনি পুত্রকেও ঐ বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অতি অল্পসময়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গ্যালিলিও ঐ বিদ্যায় পিতাকে অতিক্রম করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। তিনি পিতার নিকট অঙ্কশাস্ত্র যৎসামান্য শিক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বংশীবাদনে তিনি অসীম পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। চিত্রবিদ্যাতেও তাঁহার পারদর্শিতা অল্প ছিল না। পরিণত বয়সে তিনি তাঁহার বন্ধুগণের নিকট বলিতেন "যদি আমার উপর আমার শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমি এখন একজন চিত্রকর বলিয়াই সাধারণে পরিচিত হইতাম।" এই বিদ্যায় তাঁহার খ্যাতি এত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে সিগোলি, বোনফিগ্লো, প্যাসিনানো, প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রকরগণ তাঁহাদিগের অঙ্কিত চিত্র তাঁহার নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরণ করিতেন এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী সংশোধন করিতে দ্বিধা করিতেন না।

যখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর ৩ মাস মাত্র তখন তাঁহার উপরিলিখিত বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইল, সুতরাং তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রেরিত

হইলেন। পুত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে ভিন্‌সেন্‌জিওকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে একরূপ বাধ্য হইয়াই এই কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই অল্প বয়সেই লাটিন্ ও গ্রীকভাষায় সুপণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ এবং উত্তম চিত্রকর হইয়া পুত্র তাঁহারই কুলমর্য্যাদার উত্তরাধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল তাহাই নয়, তিনি দেখিলেন যে পুত্রের অঙ্কশাস্ত্রে যুৎপন্ন হইবার ইচ্ছা অন্যান্য বলবতী। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছিলেন যে সে সময়ে অঙ্কশাস্ত্রে বা সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনায় অর্থোপার্জ্জন হওয়া দুষ্কর, সুতরাং পুত্রকে ঐ শিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই তিনি তাহাকে পিসায় প্রেরণ করিলেন। কেবল তাহা নহে তাহাতে গ্যালিলিও অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেন। কিন্তু অবশেষে পুত্রের নির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাহাকে ইউক্লিড কৃত জ্যামিতির প্রথম পুস্তক পাঠের অনুমতি দেওয়া হইল।

পিসায় আসিয়া পিসার চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেও, গ্যালিলিও গোপনে পরম উৎসাহে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ভিন্‌সেন্‌জিও এই সংবাদ পাইয়া যে ভদ্রলোক গ্যালিলিওকে ইউক্লিডের পাঠ দিত তাহাকে শিক্ষা দান করিতে নিষেধ করিলেন। গ্যালিলিও কিন্তু গোপনে জ্যামিতি শিক্ষা করিতে বিরত হইলেন না। পিসার শিক্ষকগণের সহিতও তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। এই সকল পণ্ডিত মনে করিতেন যে আরিষ্টটল্ প্রভৃতি মনীষিগণের গ্রন্থসমূহ উত্তমরূপে কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই একান্ত পারদর্শিতা হইতে পারা যায়। এরূপ সত্যগুলির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ক্ষতি নাই কিন্তু সেগুলি বিচারসহ কিনা পরীক্ষা করিতে যাওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করা তাঁর অমার্জ্জনীয় অপরাধ। গ্যালিলিও, আরিষ্টটল, ইউক্লিড প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণের গ্রন্থে যুৎপন্ন হইলেও এই সকল শিক্ষক গ্যালিলিওর অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি সমূহ গবেষণামূলক পাঠের একান্ত বিরোধী হইয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াউঠিলেন।

পিসায় কিছুদিন অবস্থানের পরই অঙ্কশাস্ত্রের বৃহৎ প্রদীপের অব্যক্ত Oscilation (সঞ্চালন) দেখিয়া মধুরোর নাড়ীর সাধারণত্ব তাৎপর্য্য নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইল। বহু পরীক্ষার পর যখন তিনি এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহা প্রকাশ করিলেন, তখন সেই সময়ের বিজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী এই যন্ত্র সাগ্রহে এবং সানন্দে গ্রহণ করিয়া সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অল্প বয়স্ক যুবক গ্যালিলিওর নাম তখন হইতেই সাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিল।

ইহার কিছুদিন পরেই ইউক্লিডের ষষ্ঠ পুস্তক পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি পিতার নিকট অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পুত্রের সোদর শিক্ষা এবং জ্যামিতির নূতন নূতন Problem আবিষ্কার দেখিয়া ভিন্‌সেনজিও বুঝিলেন যে গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিক, অঙ্কশাস্ত্রও হইতেই অন্নগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে বাধা দিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া তিনি গ্যালিলিওকে প্রার্থিত অনুমতি দান করিলেন। অসীম উৎসাহে অঙ্কশাস্ত্র আলোচনা করিয়া পাঠ করিতে করিতে বাইশ বৎসর বয়সে তিনি Hydro-Static Balance সম্বন্ধে একটী গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সেই সময়ের বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহাদিগের অনুরোধে গ্যালিলিও চব্বিশ বৎসর বয়সে Centre of Gravity- মাধ্যাকর্ষণ- সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন। এই প্রবন্ধের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া টাস্‌কানির গ্রাণ্ড ডিউক প্রথম ফার্ডি-নান্ড এবং তাঁহার পুত্র কস্‌মো ডি মেডিচি গ্যালিলিওর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। এই সময়ে তিনি প্রেরেসের একাডেমির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে তাঁহার এই সম্মানলাভ তাঁহার অসাধারণ-পাণ্ডিত্যের ফলেই হইয়াছিল। পরবৎসর পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ শূন্য হওয়াতে ১৬০ টাকা বেতনে গ্যালিলিও এই পদে নিযুক্ত হইলেন। অঙ্কশাস্ত্রের নির্ভীক গবেষণাকারী বলিয়া যেমন তিনি খ্যাত হইয়াছিলেন, তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ

হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেননা আমরা দেখিতে পাই যে এই তরুণ যুবক পিসা বিদ্যালয়ে সাহিত্য ও কবিতা সম্বন্ধে, তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য লেখকগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যে সকল সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আরিষ্টটল তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছিলেন যে প্রত্যেক পদার্থ তাহার ভারের অনুপাতানুযায়ী সময়ে উপর হইতে নিম্নে পতিত হয়। এতদিন এই মতেই সকল বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইতেছিল কিন্তু গ্যালিলিও পিসার Learing Tower এর উপর হইতে নানা পদার্থ নিম্নে নিক্ষেপ করিয়া আরিষ্টটলের প্রচারিত মত যে কত ভ্রমাত্মক তাহা প্রমাণিত করিয়া পতনশীল পদার্থসমূহের পতনের প্রকৃত নিয়ম (Laws of falling bodies) আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু সেই সময়ের পণ্ডিতমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত নিয়মকে সনাতন বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের এই সনাতন প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধে এই প্রমাণ আবিষ্কারে তাঁহারা গ্যালিলিওর উপর বড় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। পিসার পাদ্রিগণও আপনাকে একজন মহাপণ্ডিত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি এই সময়ে একটী যন্ত্রের উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী হইয়া একটী যন্ত্র স্থাপনে সচেষ্ট হইতেছিলেন, তিনিও গ্যালিলিওর উপর এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে তাঁহার চাকরি অনিষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই সকল কারণে এবং বন্ধুদিগের একান্ত অনুরোধে তিনি পিসা পরিত্যাগ করিলেন এবং পদুয়ার উপস্থিত হইলেন। পদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ এতদিন শূন্য ছিল। এই অল্পায়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত মর্যাদাসম্পন্ন পদটী গ্রহণ করিবার মত উপযুক্ত অধ্যাপক এতদিন ছিল না, কিন্তু গ্যালিলিওর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী প্রধান অভাব মোচন করিলেন। তাঁহারা পূর্ব হইতেই গ্যালিলিওকে ঐ পদগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি বিজ্ঞ অনুস্থানের উচিত মত এই পদগ্রহণ-স্বীকার তখন না করিলেও পরে বাধ্য হইয়া তাহা করিলেন। এই পদে স্থানান্তরের জন্য তিনি প্রথম নিযুক্ত হইলেও পরে কর্তৃপক্ষের একান্ত আগ্রহে ১৬১০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এই পদ অলঙ্কৃত করিয়া পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যা করিয়াছিলেন।

আধুনিক Sextant নামক যন্ত্র,যাহা এক্ষণে বৈজ্ঞানিক-গণের নিত্য ব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই যন্ত্রের আদিম প্রতিনিধি স্বরূপ গ্যালিলিও একটী যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি এই আবিষ্কারটী প্রচার করিলেন, তখন ইহাকে লোকে point compass বলিয়া অভিহিত করিত।

এই সময় গ্যালিলিওর পিতৃবিয়োগ হওয়াতে সংসারের গুরুভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত হইল। সংসারে তিনিই মাত্র এবং একটী ভ্রাতা ব্যতীত একটী অবিবাহিতা ভগ্নীও ছিল। রোমিয় সম্রান্ত সমাজে সেই সময়ে ভগ্নী বা কন্যার বিবাহ দেওয়া আধুনিক বাঙ্গলার কন্যার বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা কোনও অংশেই সুবিধা ছিল না। যে পণ-প্রথার কবলে পড়িয়া আজ বঙ্গদেশ হাহাকার করিতেছে, সেই পণ-প্রথা তখন রোমীয় সম্রান্ত সমাজের অস্থি মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছিল। রোমীয় কন্যা যতদিন বরস্থা না হইত, ততদিন তাহাকে কোনও মঠে রাখিয়া তাহাকে রীতিমত শিক্ষাদান করিতে হইত। শিক্ষা সমাপ্ত অথবা কন্যা বয়স্থা হইলেই তাহাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে হইবে। শিক্ষাবসানে বয়স্থা কন্যা বা ভগ্নীকে কিছুদিনের জন্যও অনূঢ়া অবস্থায় গৃহে রাখিলে গৃহকর্তাকে সমাজে যথেষ্ট নিন্দনীয় হইতে হইত। কেবল তাহাই নয় শীঘ্র পাত্রস্থ করিতে না পারিলে কন্যাকে অপেক্ষাকৃত অল্প পণ দিয়া, চিরকুমারীর মঠে সেবাসেবায় নিয়োজিত করা ব্যতীত গৃহকর্তার আর অন্য উপায় ছিল না। গ্যালিলিও বিশেষ চিন্তিত হইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন যুবক হইলেও কোনও উপার্জ্জন করিত না। সুতরাং অবশেষে এক রুষীয় কাউণ্টের পার্শ্বচরের পদে তাহাকে নিযুক্ত করাইয়া রুষিয়ায় প্রেরণ করিলেন। ভ্রাতার পাথেয় এবং তাহার বিদেশে অবস্থান করিবার ব্যয় বহন করিতেই, তাঁহার পাণ্ডিত্য সমর্থ বিশেষে হইয়া গেল। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে ভ্রাতা বিদেশ হইতে উপার্জ্জনে সমর্থ

সাহায্য করিবে কিন্তু উপযুক্ত ভ্রাতা অর্থ সাহায্য দূরে থাকুক জোহের পত্রের উত্তর দেওয়াও বিরক্তিকর বলিয়া মনে করিত। এদিকে তন্ত্রীকে তাহার অবস্থে চিরকুমারী করিতে অনিচ্ছুক হইয়া গ্যালিলিও ভ্রাতাকে জানাইয়া বই অর্থ ঋণ করিলেন এবং আপনার যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল তাহা এবং ঐ ঋণের অর্থ যৌতুক দিয়া উপযুক্ত পাত্রের করে তন্ত্রীকে সমর্পণ করিলেন। ভ্রাতা এই ঋণের ভার অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইয়াছিল।

সাংসারিক দুঃখ কষ্টের অটিলতা তাঁহাকে অধীর করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সময়েই তিনি Thermometre বা তাপমান যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তি এই যন্ত্র একই সময়ে আবিষ্কার করিলেও, তিনিও স্বাধীন চিন্তাদ্বারা প্রণোদিত হইয়াই এই যন্ত্র সৃষ্টি করেন।

ইহার পরই তিনি জগদ্বিখ্যাত Telescope বা দূরবীন্ যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া জগৎকে উপহার দান করিলেন। কি উপায়ে তিনি এই অদ্ভুতকর্ম যন্ত্রটী সৃষ্টি করেন, তাহা আমরা সবিস্তার জানিনা। তিনি এই সম্বন্ধে তাঁহার এক বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি একদিন একটী জনরবে শুনিয়াছিলেন, যে নেদারল্যাণ্ডবাসী কোন এক ভদ্রলোক এক অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ঐ যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিলে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী পদার্থকে নিকটবর্ত্তী বলিয়া ভ্রম হয়। জনরব শুনিয়া তাঁহার মনে ঐ বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। সেই রাত্রি হইতেই তিনি পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন এবং প্রথম একটী ক্ষুদ্র যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। ইহা দ্বারা দুই মাইল নয় আরও বহুদূরবর্ত্তী পদার্থ বেশ ভাল দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি এই পত্রেই লিখিয়াছিলেন "আমার আশা আছে যে আমি এমন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইব যাহা দ্বারা অনন্ত আকাশের অনন্ত অপরিজ্ঞাত রহস্য আমার নিকট সরল সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।"

যখনই তাঁহার দূরবীন্ যন্ত্রের আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হইল তিনি এই যন্ত্রের বিবরণ সাধারণের নিকট প্রচার করিলেন। কেবল তাহাই নহে, এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি বৃহস্পতিগ্রহের উপগ্রহগুলি আবিষ্কার করিলেন এবং নক্ষত্রমণ্ডলে মানবচক্ষুর অন্তরালে যে আরও কত গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র বিদ্যমান আছে তাহা প্রমাণ করিয়া একটী মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করিলেন। আরিষ্টটল প্রভৃতি তাঁহাদিগের প্রাচীন মনস্বীগণ প্রচার করিয়াছিলেন যে নক্ষত্রমণ্ডলে তাঁহাদিগের বর্ণিত গ্রহ নক্ষত্র ব্যতীত আর গ্রহ নক্ষত্র নাই, কিম্বা তাঁহারা ঐ সকল গ্রহ নক্ষত্রের যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। গ্যালিলিও তাঁহার যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার লিখিত প্রবন্ধে ঐ মতের ভ্রম প্রদর্শন করিলেন। চারিদিকে কলরব পড়িয়া গেল। কেহই এরূপ অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতে চাহেনা। টাস্‌কানির গ্রাণ্ডডিউক এই যন্ত্র দেখিতে চাহিয়া গ্যালিলিওকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। যেদিন গ্যালিলিও এই যন্ত্র লইয়া প্রথম রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন সেদিন তাঁহার যন্ত্রের মধ্যদিয়া দেখিবার জন্য—বিশেষতঃ তাঁহার বর্ণিত বৃহস্পতির উপগ্রহ দেখিবার জন্য—রাজমাতা এতই অধৈর্য্য হইয়াছিলেন যে উদ্ভেজনায় স্থানকাল পাত্র ভুলিয়া যন্ত্রটী ভালরূপে স্থাপন করিবার পূর্ব্বেই তিনি ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। যাহা হউক উপস্থিত সকলেই তাঁহাদিগের কৌতূহল নিবৃত্ত করিলেও, রাজমাতা, গ্রাণ্ডডিউক প্রভৃতি কয়েকজন ব্যতীত অন্য বহু বহু পণ্ডিতেরা তাঁহার বর্ণিত উপগ্রহ সম্বন্ধে সন্দিহান রহিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের বাক্যে এতদূর আস্থাবান্ ছিলেন যে এখন সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে বোধ হয় গ্যালিলিওর দূরবীন্ যন্ত্রের মধ্যেই তাঁহার বর্ণিত উপগ্রহগুলি বর্ত্তমান, তাহাদিগের বস্তুতঃ অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ গ্যালিলিও কেবলমাত্র ভোজবাজী দেখাইতেছে। এ সন্দেহ বড়ই কঠোর, কেননা পাঠকগণ বোধ হয় জানেন, যে সে সময়ে যাদুকর সন্দেহে কত নিরপরাধ ব্যক্তিকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত! কিন্তু যাহাই হউক অতি অল্পসময়ের মধ্যেই নানাদেশ হইতে তাঁহার নিকট হইতে এই যন্ত্র প্রাপ্ত হইবার জন্য নানা প্রার্থনা আসিতে লাগিল। তাঁহার নানা দেশস্থ বন্ধুগণ তাঁহার নিকট হইতে একটী দূরবীন্ যন্ত্র আনয়ন করিবার জন্য তাঁহাদিগের দেশবাসিগণের

দ্বারা অনুরুদ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতাও এতদিন পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পত্রের পর পত্র লিখিতে লাগিলেন কেননা, একটী যন্ত্র না হইলে তাঁহার ধনিসমাজ বজায় থাকে না। গ্যালিলিও বহু অর্থব্যয়ে বহু পরিশ্রমে অনেকগুলি দূরবীন্ প্রস্তুত করিয়া দানাদেশে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার প্রবন্ধাবলী এবং তাঁহার উদ্ভাবিত নবযন্ত্র দর্শন করিয়া ফ্লরান্সী-গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট উচ্চ-সম্মানজনক এবং উচ্চ বেতনের এক পদগ্রহণের অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তিনি জন্মভূমি—স্বদেশের সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন বলিয়া সবিনয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

দূরবীন্ যন্ত্র আবিষ্কারের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে যখন আকাশে একটী নূতন উজ্জ্বল নক্ষত্র সাধারণ মানবের দৃষ্টিগোচর হইল, তখন হইতেই গ্যালিলিও প্রচলিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। নভোমণ্ডলের অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব সম্বন্ধে আরিষ্টটল যে মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া তিনি প্রথমেই যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন এক্ষণে দূরবীন্ যন্ত্র আবিষ্কারের পর, তিনি যখন সূর্য্য মণ্ডলে চিহ্ন এবং বৃহস্পতিগ্রহের উপগ্রহ সকল আবিষ্কার করিলেন, তখন তাঁহার নূতন প্রবন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ করিলেন যে কোপর নিকাসের মত "যদি আমরা মঙ্গল এবং শনিগ্রহ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, তাহা হইলে দেখিব যে তাহাদিগের আকৃতিও চন্দ্রগ্রহের আকৃতির ন্যায় সমাদাই পরিবর্ত্তনশীল"—একথা সত্য। এই সময়েই শনিগ্রহের মণ্ডল বা চক্র আবিষ্কার করিয়া টলেমির স্থিতি-তত্ত্ববাদ বা আরিষ্টটলের মতের বিরুদ্ধে তিনি অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া স্বীয় মত প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

ধর্ম্মযাজকগণ প্রাচীনকাল হইতেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং এক্ষণে গ্যালিলিওর এই সকল আবিষ্কারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তথাপি ১৬১১ খৃষ্টাব্দে যখন গ্যালিলিও তাঁহার যন্ত্র লইয়া রোমনগরীতে পদার্পণ করিলেন তখন তিনি স্বয়ং পোপ, সম্ভ্রান্ত কার্ডিনাল এবং সাধারণ পুরোহিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হইলেন। কার্ডিনাল ব্যাণ্ডিভিরি সিজ্জা সংলগ্ন উদ্যানে তাঁহার যন্ত্র স্থাপিত হইলে কয়েকদিবস ধরিয়া বহু উৎসুক-কার্ডিনাল, পুরোহিতগণ এবং জনসাধারণ সমবেত হইয়া তাহা দ্বারা অনন্ত আকাশের অসীম সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাঁহার প্রবন্ধাবলীও সাধারণে প্রচারিত হওয়াতে জেসুট্ নামধারী শক্তিশালী পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এই আন্দোলনের কারণ জানিতে হইলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল প্রভৃতির ধর্ম্মনীয় বিষয়ের যেরূপ ভাবে তখন শিক্ষা দেওয়া হইত তাহার সহিত টলেমির স্থিতিতত্ত্ববাদের একটী ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইত। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় টলেমিকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিলে ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচলিত শিক্ষাকেও ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করা হয়। সুতরাং যতদিন গ্যালিলিও কোপারনিকাসের মতবাদকে কেবলমাত্র অপ্রমাণিত অনুমানরূপে সাধারণ সমক্ষে প্রচারিত করিতেছিলেন, ততদিন ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন নাই। কিন্তু যখন গ্যালিলিও এই মতবাদকে প্রমাণিত করিয়া টলেমিকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন তখন তাঁহারা আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত মনে করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইলেন। এই আন্দোলনের সময় গ্যালিলিও তাঁহার কোনও বন্ধুকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রচারিত মত ধর্ম্মপ্রযোক্ত মতের বিরুদ্ধ নয়। তাঁহার এই সাধারণ পত্রের একটী নকল যেমন-করিয়া-হউক জেসুট্গণের হস্তগত হয়। তাঁহারা রোমের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ বা ইন্‌কুইজিসন্ নামক বিচারালয়ের নিকট গ্যালিলিও বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে এক অভিযোগ করিলেন যে গ্যালিলিও নিজ ভ্রান্তমতকে ধর্ম্মগ্রন্থ সম্মত বলিয়া প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রচার করিয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন এবং সাধারণকে ধর্ম্মগ্রন্থে আস্থাহীন করিয়া তুলিতেছেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইন্‌কুইজিসনের নিকট তাঁহার বিচার হইল। অতঃপর গ্যালিলিও ধর্ম্মগ্রন্থ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আলোচনা করেন এবং মতবাদকে কেবলমাত্র প্রমাণবিহীন অনুমানরূপেই প্রচার করেন, এই উপদেশ দিয়া ইন্‌কুইজিসন্

তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন। গ্যালিলিও যদিও ইহা এই উপদেশ পালনে স্বীকৃত হইলেও মনে মনে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রহিলেন। এই সময়ে পারিবারিক কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি ঘরেণে প্রত্যাগমন করিলেন।

মেরিনা গ্যাম্বা নাম্নী এক রমণীর গর্ভে গ্যালিলিওর দুইটী কন্যা এবং একটী পুত্র হয়। এই রমণী নিম্নশ্রেণীভুক্তা বলিয়া প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গৃহে রাখিলেও, তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ঘরেণে প্রত্যাগমনের পর মেরিনা সম্ভ্রান্তশ্রেণীর এক ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করে। ইহাতে গ্যালিলিও কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েন নাই। বরং তাঁহার ব্যবহারে জানা যায় যে তিনি এই ব্যবস্থায় অনুমোদনই করিয়াছিলেন। মেরিনা স্বামী গৃহে গমন করিলে গ্যালিলিও পুত্রকে শিক্ষার্থ এক প্রিয়বন্ধুর নিকট প্রেরণ করিলেন, এবং কন্যাদ্বয়কে বহু অর্থব্যয়ে এবং বহু পরিশ্রমে একটী মঠে চিরকুমারী বা সেভেলেরিকা-রূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। গ্যালিলিওর জীবনী আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহার দেবীরূপিণী জ্যেষ্ঠা কন্যা ভগ্নী মেরিয়া সেলিস্তির চরিত্র সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের হৃদয় আকর্ষণ করে। এই সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী পিতাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি এখনও আছে। এই পত্রগুলি পাঠ করিলে আমরা তাঁহার যে সরলতা, সহিষ্ণুতা, ঈশ্বর নির্ভরতা, পরোপকারিতা, সেবাপরায়ণতা, সর্ব্বোপরি যে পিতৃভক্তির পরিচয় পাই, তাহা অতুলনীয়। তিনি পরলোকের ঈশ্বরের সহিত ইহলোকের ঈশ্বর পিতার প্রভেদ করিতে পারিতেন না। এই কন্যা গ্যালিলিওর জীবনে যে শান্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র বা অন্য কেহ তাহার কণামাত্র দান করিতে পারে নাই।

পূর্ব্বোক্ত পত্র পাঠতঃ ইন্‌কুইজিসনের উপদেশমত নিজ মতকে অনুমানরূপে প্রচার করিতে থাকিলেও গ্যালিলিও যেরূপ তীব্র ভাষায় যুক্তিযুক্ত শব্দের দ্বারা ঐ সকল প্রবন্ধ রচনা করিতেন, তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিত যে তিনি নিজের মতকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান করিতে বদ্ধপরিকর। কিছুদিন এইভাবে যাইবার পর গ্যালিলিও যখন অত্যন্ত পীড়িত সেই সময়ে ১৬১৮ খৃঃ অব্দে আকাশে তিনটি ধূমকেতুর উদয় হইল। এই সকল ধূমকেতুর সম্বন্ধে পরবৎসর একটী প্রবন্ধ রচনা করিলেন। ঠিক সেই সময়ে গ্রাসাই নামক একজন জেসুইট ঐ সকল ধূমকেতুকে গ্রহনক্ষত্রাদি গ্রহ সমূহের সমপর্যায় বলিয়া চারিদিকে বক্তৃতা করাতে গ্যালিলিও তাঁহার প্রবন্ধে গ্রাসাই প্রচারিত মতের তীব্র সমালোচনা করিলেন। এই ঘটনায় সমগ্র জেসুইট সম্প্রদায় তাঁহার ভীষণ শত্রু হইয়া উঠিল। এখন হইতে তাহারা গ্যালিলিওর প্রত্যেক প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা করিয়া এবং যাহাতে তাঁহার প্রবন্ধ জনসাধারণ পাঠ না করে তাঁহার নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। গ্যালিলিও ইহাদিগের সমালোচনার উত্তরে যে সকল তীব্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন, তাহাতে তাহারা আরও জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু তাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না, কেননা বড় বড় পণ্ডিতগণ ও আপামর জনসাধারণ গ্যালিলিওর প্রত্যেক প্রবন্ধ পাঠে যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিত, জেসুইট দিগের হিংসাপূর্ণ সমালোচনাকে সেইরূপ ঘৃণার সহিত পরিহার করিত।

১৬২৩ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও পুনরায় রোমনগরীতে গমন করিলেন। এবারে যদিও তিনি বহুদিন চেষ্টা করিয়াও ইন্‌কুইজিসনের আদেশ রদ্ করাইতে পারিলেন না, তথাপি তাঁহার আদর অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটী হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার পুরাতন প্রিয় বন্ধু কার্ডিনাল বারবেরিনি পোপপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করিয়া, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত নানা মতবাদকে তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া "ইল্ সাগিয়াটোর" নামে এক বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করিলেন। জেসুইট সম্প্রদায় এবং অধিকাংশ ধর্ম্মযাজক এই প্রবন্ধ প্রচারে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও স্বয়ং পোপ এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করাতে কেহই তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিল না। পোপ তাঁহার প্রতি এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া গ্যালিলিওর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া এবং যাহাতে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান এবং বৃত্তিভোগ করিতে পান, তাহার জন্য অনুরোধ করিয়া ও টাসকানির গ্রাণ্ড ডিউককে একখানি পত্র লিখিলেন। প্রতিভা দুর্লভ, সুতরাং তিনি

তাঁহার কোনও অনুবিধা ছিল না, কিন্তু যে দিন তিনি প্রথম ইন্‌কুইজিসনে বিচারার্থ আনীত হইলেন। তাঁহার এই কষ্টে বিচলিত হইয়া, ক্রোধান্ধ পোপের ক্রোধকে তুচ্ছ করিয়াও তাঁহার বন্ধুগণ পোপের নিকট তাঁহার মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু জেসুইটগণের প্ররোচনায় পোপ আপনাকে গ্যালিলিও দ্বারা অবমানিত বিবেচনায় এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। যদি গ্যালিলিও কোপারনিকাসের মতকে হেয় জ্ঞান করিতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পোপের অলৌকিক শক্তিবাদ করিতেন তাহা হইলে জেসুইটগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না, কেননা, পোপ আপনাকে অপমানিত জ্ঞান না করিলে, গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে কাহারও অভিযোগ শ্রবণ করিতেন না, যাহা হউক ভগবানের ইচ্ছায় ঐঠার রোমে ভীষণ প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটিল। গ্যালিলিও বন্ধুগণের বহু আবেদনের ফলে ইন্‌কুইজিসনের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া টাস্‌কানির প্রতিনিধির গৃহে নজরবন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন কিছুদিন পরে প্লেগের প্রকোপ প্রশমিত হইলে পর, তাঁহার বিচার সমাপ্ত হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও বিশেষ প্রমাণ না থাকিলেও তাঁহাকে প্রচলিত প্রথানুসারে পত্রে লিখিয়া অঙ্গীকার করিতে হইল যে তিনি প্রচলিত টলেমির পৃথিবীতত্ত্বের প্রতিই আস্থাবান, কোপারনিকাসের মত কে তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না। পৃথিবী একই স্থানে আছে, সে কখনও সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে নাই, করিতেছে না করিবে না—। এই মিথ্যা অঙ্গীকার করিতে তাঁহার যে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা হইয়াছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু ইহা ভিন্ন তাঁহার আর উপায় ছিল না। কারণ তিনি যদি এই অঙ্গীকার না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। গ্যালিলিও প্রাণের ভয় করিতেন না, কিন্তু তিনি ধর্ম্মদ্রোহী নাম অপবাদ বহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলিতেন "আমি আগে খৃষ্টান, পরে বৈজ্ঞানিক।" যাহা হউক কেবলমাত্র অঙ্গীকার গ্রহণ করে তাঁহার বিচিত্র সপ্তম গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাবলী প্রচার নিষিদ্ধ হইল। কেবলমাত্র তাহাকে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার জেরেসেনের বাটীতে বাস করিবার অনুমতি দান করিয়া এই ধর্ম্মযাজকগণ আপনাদিগকে মহান মনে করিয়া মহা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছিলেন।

পিতার প্রতি এই দারুণ নির্য্যাতনের সংবাদ পাইয়া কুমারী মেরিয়া সেলিস্তি হৃদয়ে যে নিদারুণ আঘাত পাইলেন তাহাতে তিনি শয্যাশায়িনী হইলেন। ইহার পূর্ব্বে গ্যালিলিও যখন রোমে বিচারার্থ আনীত হন তখন তিনি পিতার সে সকল পত্রকে ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় পূজা করিতেন সে গুলিকে ভস্মসাৎ করিতে বাধ্য হন, কেন না, মহাপরাক্রমশালী জেসুইট সম্প্রদায়, গ্যালিলিওর প্রত্যেক পত্রের রচনা হইতে যেমন করিয়া হউক, কোনও না কোন ধর্ম্মদ্রোহীতার প্রমাণ আবিষ্কার করিতে তখন নিতান্ত ব্যস্ত। কুমারী এই পত্রগুলি দগ্ধ করায় আমরা কেবলমাত্র গ্যালিলিওর নিকট প্রেরিত তাঁহার লিখিত পত্রগুলির দ্বারাই তাঁহার অসাধারণ পিতৃভক্তি এবং গ্যালিলিও চরিত্রের কিছু কিছু বিশিষ্টতার পরিচয় প্রাপ্ত হই। মেরিয়া পিতার এই নির্য্যাতন নিবারণের পর আর বেশী দিন জীবিতা ছিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর ইহার পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল, তিনিও আর পিতার কষ্ট অধিক দেখিবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া যেখানে হিংসা, দ্বেষ, অন্ধ কুসংস্কার নাই; সেই স্থানে পিতাকে আহ্বান করিয়া লইবার জন্য গমন করিলেন।

নিজ ভিন্নাবাটীকায় আসিয়াও গ্যালিলিও আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীনতা পাইলেন না। বৃদ্ধ বয়সে নানা কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। প্রথম প্রথম তিনি তাঁহার কন্যার জীবিতকালে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন, এবং বন্ধুর অন্যান্য বন্ধু বা শিষ্যগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে পাইতেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এই সামান্য স্বাধীনতাটুকুও লোপ পাইল। জেসুইট সম্প্রদায় তাঁহার এই স্বাধীনতার বিষয়ক গুপ্তচরগণের নিকট পাইয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কি জানি, যদি এই নির্য্যাতিত বৃদ্ধ, তাহার সমস্ত রচনা তাহারা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে, যাহার জ্ঞানের আলোক নির্ব্বাপিত করিতে তাহারা এত ষড়যন্ত্র করিয়াছে, সেই অসহায় বৃদ্ধ বন্ধুবান্ধবকে প্রকৃত সত্যপ্রিয়তাদান করিয়া তাহাদের প্রবল প্রতাপ এবং অন্ধ বিশ্বাসে ঘুণ ধরে, এই ভয়ে

তাহারা পোপের নিকট অভিযোগ করিল। পোপ তাহাদিগের হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকা ছিল মাত্র। সুতরাং অচিরে পোপের আদেশে গ্যালিলিওর যথেচ্ছা ভ্রমণ বা বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আলাপ নিষিদ্ধ হইল। এই ব্যাপারে গ্যালিলিও যত না দুঃখ পাইলেন, তাঁহার অসংখ্য বন্ধু, ভক্ত শিষ্য ততোধিক মনস্তাপ পাইলেন। কিন্তু তাহারা নিরুপায়। সে সময়ে জেসুইটদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া পোপের বিরাগ ভাজন হওয়া এবং বিধর্মী বলিয়া দণ্ডিত করা একই ছিল।

যদিও কোনও মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল না, তথাপি তিনি সেই শুষ্ক বয়সে তাঁর সাধ্বী এবং তরুণী লইয়া একান্ত ভাবে বাণীর সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি এই সময়ে যে পরিশ্রমে একখানি পুস্তক রচনা করেন, এই পুস্তকও কারাগৃহমধ্যে রচিত হইয়াছিল। জেসুইটদিগের সহিত অত্যাচারে উৎপীড়িত হইলেও তাঁহার জ্ঞান পিপাসার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। চন্দ্রের গ্রহণ এবং যুক্তির প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে তিনি যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময় কর। কিন্তু এইরূপ দিবারাত্র অধ্যয়ন এবং মানসিক পরিশ্রমের ফলে তিনি অবশেষে দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া অন্ধ হইলেন। অন্ধ অবস্থায় তাঁহাকে বেশীদিন জীবিত থাকিতে হয় নাই। এই সময় তাঁহার কতকগুলি বন্ধু ও ভক্ত তাঁহাকে নিয়মিত রূপ দর্শন ও সেবা করিতে আসিতেন। তাঁহার জীবনের সন্ধ্যায় দূর দেশান্তর হইতে রাজকীয় দূত তথাকার জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের সহিত তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত মন্দ হইয়া উঠিল এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে তিনি পোপ ও জেসুইটগণের অত্যাচারকে উপহাস করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া যে স্থানে তাঁহার শিরোভূষা করা তাঁহার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর টাস্কানির জনসাধারণ গ্রাণ্ডডিউকের অনুমতি ক্রমে তাঁহার মৃতদেহ মহা সমারোহে সমাধিস্থ করিবার বিরাট আয়োজন করিতে লাগিল কিন্তু জেসুইটগণের প্ররোচনায় পোপ আদেশ করিলেন যে, জীবিতকালে ধর্মদ্রোহী বলিয়া ধর্মযাজকগণ যাহাকে তীব্র সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহার মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে ধর্মযাজকগণের এবং ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইবে, অতএব সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করা হউক। কেবল ইহাই নহে। 'সান্তা ক্রোশী নামক গির্জার অভ্যন্তরে গ্যালিলিওর পূর্ব্ব পুরুষগণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে গ্যালিলিও সেই স্থানে যাহাতে তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ হয়, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু জেসুইটগণের ঘোর প্রতিবন্ধকতায় তাঁহার এ ইচ্ছাও ফলপ্রদ হয় নাই। কেবলমাত্র গ্রাণ্ড ডিউকের নির্দ্দেশানুসারে সান্তা ক্রোশীর গির্জার অতি সাধারণ স্থানে তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হইল।

গ্যালিলিওর সমাধিস্থানের উপর কোনও রূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনেও জেসুইটগণ ঘোর আপত্তি করিয়াছিল। অবশেষে ভাইভানি নামক গ্যালিলিওর একজন শিষ্য বহু চেষ্টার ফলে ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত গ্যালিলিওর একটী অর্দ্ধমূর্ত্তি সমাধির উপর স্থাপনে কৃতকার্য্য হন। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ভাইভানি ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই মর্ম্মে তাঁহার সম্পত্তি দান করেন যে সুযোগ পাইলেই তাহাকে গ্যালিলিওর একটী উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিতে হইবে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন, এই দীর্ঘকালেও জেসুইটগণ তাহাদিগের শত্রুতা বিস্মৃত হয় নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের উত্তরাধিকারী মেলী ও উপরোক্ত সর্ত্তে আবদ্ধ ছিলেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন ফ্লোরেন্স-বাসী একজন কার্ডিনাল রোমে পোপসদে অধিষ্ঠিত হইলেন তখন মেলী সুযোগ বুঝিয়া ভাইভানির ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিলেন। এইরূপে গ্যালিলিওর মৃত্যুর ৯৫ বৎসর পর মহা সমারোহে তাঁহার মর্ম্মরময় স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়া তাঁহার দেশবাসী তাঁহার স্মৃতি পূজা করিয়া ধন্য হইল।

ভাইভানির কার্য্য আলোচনা করিলেই আমরা গ্যালিলিওর প্রতি তাঁহার শিষ্যগণের ভক্তি শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রাপ্ত

যাই। তাঁহার শত শত শিষ্য তাঁহাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সে গুলির প্রতি ছত্রে এই ভক্তি, শ্রদ্ধা ফুটিয়া বর্ত্তমান। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে যে কাণ্টীকার, যে ব্যাখ্যাচ্ছলে, করিয়া শিক্ষা দান করিতেন, তাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইত। শিক্ষার সুবিখ্যাত অষ্টাদশশতাব্দীর মার্সিলি বলিয়াছিলেন "অপরের নিকট তিন বৎসরেও আমি যাহা শিক্ষা করিতে পারি নাই, স্যালিসিঁওর নিকট তিন মাসে তাহা আমি শিক্ষা করিয়াছি।" তাঁহার অপর এক জন বিখ্যাত শিষ্য লিখিয়াছিলেন "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমার গুরুরূপে দান করিয়াছেন।" স্যালিসিঁওর নিকট যে একবার আসিত সে আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিত না। সকলে তাঁহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল না। তিনি প্রায়ই বাত যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। তাঁহার কার্য্যও অসীম ছিল, কিন্তু তিনি সর্ব্ব সময়ে সকলের সহিতই ভাল ব্যবহার করিতেন। বন্ধুবান্ধবের সহিত নানা বিষয়ে গল্প করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। জীবনের প্রথমে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, শেষ জীবন পর্য্যন্ত দরিদ্ররোগীগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা দান করিয়া তিনি সে শিক্ষা সার্থক করিয়াছিলেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র আঢ্য, বি. এ।

আঁখি

হেরি তব আঁখি,
মুগ্ধ মনোমধুকর স্থির হয়ে থাকি।
অমিয় বচন তার সকল পরাণে
জোছনা সুখের মধু স্পর্শ খানি আনে,
ভরি দেয় চিত্তলোক সুধীরে নীরবে
নন্দন বনের নব কুসুম সৌরভে।

বন্দী হিয়া মোর
নন্দন-আনন্দ পায় আঁখি কূলে ভোর;
ওই নয়নের প্রেম শুভদৃষ্টি দিয়ে
চিরদিন বন্দী রেখো আমারে হে প্রিয়ে
সব ভুলি, মুগ্ধ হয়ে, রব শুধু চেয়ে
তব আঁখি পানে;—যেথা স্বর্গ আছে ছেয়ে।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

রাঙ্গামাটি বা কর্ণ-সুবর্ণ *

কোন বস্তু বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে যেমন করিতে জানিতে হয় তেমনি কোন মূর্ত্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে মূর্ত্তি সংগৃহীত স্থানের প্রবাদ ঐতিহাসিক সম্ভাবনা এবং ঐ স্থানের ভাগুতিক অবস্থান প্রভৃতি বিষয় আমাদের প্রথম জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। অতএব বক্ষ্যমান মূর্ত্তিটী যে স্থান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক ও প্রচলিত প্রবাদের চিত্র অঙ্কন করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

প্রাকৃতিক অবস্থান।—মুর্শিদাবাদ হইতে ৮ ক্রোশ এবং বহরমপুর হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম ভাগীরথীর পশ্চীম তীরে গৌরবময়ী অতীত কাহিনীর পরিচয় প্রদান করিবার জন্য গঙ্গাস্রোতোবিধ্বস্ত একটি প্রাচীন নগরী দৃষ্ট হইয়া থাকে পরিখা বেষ্টিত ৪০ কিট উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত ভগ্নস্তূপাগ্র নদীবক্ষ হইতে একটী প্রাচীন দুর্গ প্রাকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই পল্লীর সাধারণ নাম কর্ণ-সুবর্ণ বা রাঙ্গামাটি চাঁদপাড়া। ইহার ভূমি সংলগ্ন ইষ্টকস্তূপ, মৃৎপাত্র চূর্ণ, প্রাচীন মূর্ত্তি সমূহ ও দুই একটী প্রাচীন ভগ্নপ্রায় মুদ্রা দেখিয়া সাধারণতঃ ইহাই প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্বে ইহা একটী সমৃদ্ধশালিনী নগর ছিল।

সুবৃহৎ জোরবাংলার চিহ্ন, ঠাকুর বাড়ী ভাঙ্গা, রাজবাড়ী ভাঙ্গা ও তাহার অর্দ্ধমাইল উত্তর পশ্চিমে আমলাবাড়ী এবং ৩ ক্রোশ পশ্চিমে গোকর্ণগ্রামে রাজা কর্ণের গোশালা ছিল বলিয়া প্রচলিত আছে। এই সমস্ত ও সংগৃহীত কষ্টিপ্রস্তর বিনির্ম্মিত বিষ্ণু মূর্ত্তির অঙ্গভঙ্গি ও প্রকৃতি—পদ্মপলাশলোচন, নিম্নলম্বিত ভ্রূযুগল, তরু চঞ্চু নাসিকা, প্রশস্তমাংসল কণ্ঠ, কপাটবক্ষ, ভগ্নকটি, আজানুলম্বিত ভুজ (যজ্ঞোপবীত দৃষ্টে চম্পকাঙ্গুলি, কমলীকার সদৃশ বিশাল উরু প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা প্রভৃতি—দৃষ্টে বক্ষ্যমান নগরের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা থাকিতে পারেনা। যে সময়ে ইহা ভাগীরথী প্রবাহে বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন ইহার গর্ভে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, প্রাসাদ সমূহের ভগ্নাবশেষ, শঙ্খ ও ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। কালের কুটিল প্রবাহে ভাগীরথী তাহাকে গর্ভস্থ করিতে আরম্ভ করিয়া শেষে বক্ষ্যমান প্রবাদী অগ্নিদেবের ন্যায় নিজেই ভস্ম হইয়া পড়িয়াছেন। সেই জন্য এখন রাঙ্গামাটীর নিম্নে ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহ বিল বা বাওড়রূপে পরিণত হইয়াছে।

প্রবাদাদি।—রাঙ্গামাটী সম্বন্ধে প্রথম প্রবাদ এই যে ইহা দাতাকর্ণ বা কর্ণ সেনের রাজধানী ছিল। কর্ণ স্বীয় পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় লঙ্কাধিপতি বিভীষণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিভীষণ তথায় উপস্থিত হইয়া কর্ণ-বৃষ্টি করায় উক্ত স্থানের ভূমি রক্তবর্ণাভ হয়। ‡ এই জন্য ইহার নাম রাঙ্গামাটী হইয়াছে।

আবার এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে সুবেণ নামক জনৈক ব্যক্তির অত্যাচারে প্রীত হইয়া দেবগণ সুবৃষ্টি করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ লোকমুখে দাতাকর্ণের প্রবাদই সমধিক প্রচলিত।

‡ রাঙ্গামাটী সাধারণতঃ কর্ণসেনের রাজধানী বলিয়া প্রচলিত এবং দাতাকর্ণের পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় বিভীষণ কর্ত্তৃক স্বর্ণবৃষ্টি হয় এ প্রবাদ প্রচলিত সুতরাং কর্ণসেন ও দাতাকর্ণ যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহা প্রবাদ দ্বারাই স্বিকৃত হইয়াছে। কর্ণের পূর্ব্বে নাম ছিল বসুসেন ও তৎপুত্রের নাম বৃষসেন। বসুসেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইন্দ্রকে কবচ দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কর্ণ ও বৈকর্ত্তন নামে অভিহিত হন। অতএব দাতাকর্ণ বা কর্ণসেন একই ব্যক্তি।

* রাঙ্গামাটি হইতে একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি লেখক কর্ত্তৃক রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদে উপহৃত হয়। তৎসঙ্গে এই প্রবন্ধটী রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হয়।

রাঙ্গামাটিই কর্ণসুবর্ণ।—চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাংএর বিবরণ হইতে জানা যায় যে তিনি ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া কী-লো-না-সো-ফা-লা-না-বা (কর্ণসুবর্ণ) নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত সিউকীগ্রন্থে লিখিত আছে যে তিনি কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর নিকট লৌ-টা-বী-চী-সা (রক্তমৃত্তিকা) নামে সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। ফুলিয়ান্, বীল্ প্রভৃতি মনীষী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ উক্ত লো-টা-বী-চী বা রক্তমৃত্তিকাকেই রক্তমৃত্তি অর্থ করিয়া থাকেন। * রাঙ্গামাটীই যে উক্ত রক্তমৃত্তির অপভ্রংশ তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারেনা। দক্ষিণরাঢ়ী ও বারেন্দ্রের কুলজীগ্রন্থে দেখা যায় যে কানসোণার দেবেরা প্রসিদ্ধ ছিলেন। এবং উক্ত কানসোণাই যে মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

—শুন সবে দেব বংশ করি নিবেদন।
কানসোণার দেব হইল বারেন্দ্র গমন।
(বারেন্দ্র ঠাকুর)

এবং কাপ্তেন লিয়ার্ড এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় রাঙ্গামাটীর বিবরণ প্রসঙ্গেইহাকে রাঙ্গামাটী বা কানসোণাপুরী বলিয়া গিয়াছেন।

উইলফোর্ড সাহেব রাঙ্গামাটী ধ্বংসের একটী বিবরণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। বঙ্গাধিপ অথবা সিংহলের রাজা কতকগুলি রণতরী লইয়া বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি রাঙ্গামাটী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তৎকালে রাঙ্গামাটী **ধ্বংসের প্রবাদ।** রাঙ্গালার একটী প্রসিদ্ধ নগরী ছিল ও তাহা কুসুমপুরী নামে অভিহিত হইত। আক্রমণকারীরা দেশ লুণ্ঠন করিয়া নগরের ধ্বংস সম্পাদন করেন। সাধারণতঃ লোক মুখে এরূপ একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। কর্ণসেনের পত্রের অন্নপ্রাশনে লঙ্কাধিপতি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহার লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময় কতিপয় রাক্ষস এই স্থানে থাকিয়া যায়। তাহারা ক্রমে ক্রমে উক্ত নগরের লোকদিগকে ভক্ষণ করিয়া নগরের ধ্বংস সংসাধন করে তাহাদের অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া জনপদবাসীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাণভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং গ্রামটী একটী মরুভূমিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল এমন সময়ে একটী মুসলমান ফকীর কুর্ণসাহেবের আবির্ভাব হয়। ফকীর তাহার দৈবী শক্তি সম্পন্ন যষ্টির প্রহারে রাক্ষসগণকে বধ করিয়া গ্রামকে রক্ষা করিয়াছিল।

এই দুইটী প্রবাদ সত্য হউক বা না হউক ইহার মূলে এইটুকু ঐতিহাসিক সত্যতা নিহিত রহিয়াছে যে লঙ্কাদ্বীপ হইতে আগত শত্রুগণ দ্বারাই এই নগরীর ধ্বংস সংসাধিত হয়। উইলফোর্ডসাহেব লিখিত প্রবাদ অপেক্ষা কৃষকমুখে প্রবাদই অধিকতর সত্য বলিয়া অনুমান হয়, কারণ ঐ গ্রামবাসী কয়েকজন কৃষক ঐ কুর্ণসাহেব প্রদত্ত কয়েক শত বিঘা জমি এখনও ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট হইতে নিষ্কর ভোগ দখল করিতেছে এবং রাক্ষসডাঙ্গা নামক স্থানের নিকট এখনও সেই কবর অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে পূত সলিলা ভাগীরথীর উত্তালতরঙ্গমালা প্রবাহিত হওয়াতে ক'রে ইহার ধ্বংসসংসাধিত হইয়াছে। আবার ইহাও জনপ্রবাদ আছে যে গুপ্তবংশীয় জনৈক রাজা শশাঙ্ক চারুভূভরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের ভয়ে এই কর্ণসুবর্ণ নগরে পলায়ন করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই শশাঙ্ককেই নরেন্দ্র গুপ্ত নামে অভিহিত করেন।

স্থানীয় দর্শনীয় ভোগ্য মূর্ত্তি ও প্রত্নাদি।—পরিশেষে অধিক লিখিয়া এই ক্ষুদ্র লেখকের ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আর বর্দ্ধিত করিব না। সর্ব্বগ্রাসী কালের করাল কবলে সকল নশ্বর বস্তুই ক্রমে ক্রমে লোকলোচনের অতীত হইয়া যায়—রাখিয়া যায় শুধু অতীত স্মরিয়া, সৌরভময়ী অশ্রুপূর্ণ স্মৃতিরাশি।।

তাই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঐশ্বর্য্যময়ী নগরীর আচার ব্যবহার, তাহাদের পূজার পদ্ধতি, দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দেখিতে প্রধান পাইব। ধ্বংসাবশেষ নগরীর কূপগর্ভ হইতে যে সমুদয় কালী, বিষ্ণু, মহিষমর্দ্দিনী ও নদীগর্ভ হইতে স্বর্ণ লক্ষ্মীমূর্ত্তি প্রভৃতি উত্তোলিত হইয়াছে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন করি-

* Redmud-Life of Houen Tsang by S.Beal P.131

ছেলে যে পুরাকালে ঐ নগরের অধিবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ঠাকুরবাড়ী, তাদা রাজবাড়ী ভাঙ্গা, সোকর্ণ, আমলাবাড়ী, কেবার রাজের দীর্ঘী এবং সুবৃহৎ তোরণ দ্বারের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মনোমধ্যে স্বতঃই এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে পুরাকালে এই নগরী ধনধান্যে, ঐশ্বর্যে ও সুখৈশ্বর্যে বাঙ্গালার মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা ও শিল্পচাতুর্য্যের প্রকট লীলা এই সমস্ত মূর্ত্তিতে দেখিয়া হৃদয় স্বভাবতই আনন্দ ও প্রীতিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। তখন হৃদিমধ্যে জাগিয়া উঠিল সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমের অমরবাণী—"পাথর এঁদি করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এ প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমালা-ভরণ ভূষিত বিকশিত চৈলাকল প্রবুদ্ধ সৌন্দর্য্য, সুন্দর গঠন, পুরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলন স্বরূপ সৌম্যমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু?—তখন মনে করিলাম হিন্দুস্কুলে অধ্যয়ন করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

শ্রীহারুচন্দ্র সরকার।

নবান্ন

আজকে নবান্ন গাইছে নেচে বাগ্দীদের ছেলে
মধুতরা এমন গলা কোথায় তারা পেলে।
বাবা তাদের মাদল বাজায়, মামা বাজায় বাঁশী
পুলকে মা আপনি দেখে অন্তে দেখায় হাসি।
কুকুর ভরো চুপটী আছে, নীরব বাছুর গাই
খাঁচায় শালিক গানের মালিক তাহার সাড়া নাই।
মিঠে গলার গিট্ কিরিতে আসলে রাখে মন
ভুল করে দেয় সকল কাজে আনন্দ নর্ত্তন।
কালো ছেলের কচি গলায় একি মোহন সুর
পথের পথিক থামিয়ে রাখে দেয় না যেতে দূর।
বিভোর হয়ে তাকিয়ে আছি প্রাণে তুফান বয়
সত্য হল পুলক সাথে আজ্কে পরিচয়।
এ নহে সে মুসের নাভি নাগার জুয়াচুরী
আজকে আ মে পেলাম খাঁটী আসামী কস্তুরী।
এ নহে যে রঙ করা সে বিলাতেরী মাল
আজকে পুলা পরণ হ'ল কাশ্মীরেরি শাল।
জগৎ খুঁজে যাহার আমি পাইনি দরশন
গুহক গৃহে পেলাম তাঁহার চরণ পরশন।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

হিন্দু-চিন্তার বিশেষত্ব

জাতীয় সাধনার ক্রমবিকাশকল্পে ঐক্য একটা বিশেষত্ব আতিশয্য হইয়া পড়ে। হিন্দুর চিন্তার বিশেষত্ব হইতেছে, সে বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, অসামঞ্জস্যের ভিতর সমন্বয় আবিষ্কার করে। সমন্বয়সাধনেই হিন্দুর হিন্দুত্ব। হিন্দু বহুর মধ্যে একটিকেই অনুসন্ধান করে। শুধু তাই নহে, হিন্দু একেরই বহুরূপ দেখে। হিন্দু বলে একমেবাদ্বিতীয়ম্, হিন্দু ইহাও বলে যিনি এক তিনি বহুও বটে। নানা বিরোধী ভাবপুঞ্জের সমন্বয়বিধানই হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব। হিন্দু সব জিনিষেরই বাহিরের আবরণ ছাড়িয়া আসল সত্যটুকু পাইতে প্রয়াস করিয়াছে। সমস্ত ছাড়িয়া হিন্দু যে সত্যের পথ ধরিয়াছে। হিন্দুধর্ম যে রাজাদ্রীর ধর্ম বা পাঞ্জাবীর ধর্ম নহে, হিন্দুধর্ম যে ভারতের ধর্ম বা এসিয়ার ধর্ম নহে, হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম। যাহার নিকট সত্য সনাতন, হিন্দুধর্ম তাহারই ধর্ম। হিন্দুধর্ম আর্য্যের নহে, ভোমার নহে, ভারতের নহে, এসিয়ার নহে, প্রাচ্যের নহে, পাশ্চাত্যের নহে হিন্দুধর্ম সার্ব্বজনীন, সর্ব্বজাতীয়। হিন্দুধর্ম বিশ্বমানবের ধর্ম। হিন্দুধর্ম তাই কোন এক বিশিষ্ট মহাপুরুষের সাধনা হইতে জন্ম লয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, মহম্মদের ধর্ম, বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষের জীবনের সাধনার সহিত জড়িত। হিন্দুধর্মকে কোন এক মহাপুরুষ বলে না, যাঁহাকে বাদ দিলে হিন্দুধর্মের মর্য্যাদা হানি হয়। জগতে হিন্দুধর্মই হইতেছে একমাত্র ধর্ম, যাহার নাম কোন বিশিষ্ট মহাপুরুষের নাম হইতে হয় নাই, যাহারা হিন্দুধর্মকে আশ্রয় করিয়াছে তাহাদের নাম হইতে। ধর্ম্মের জন্য আমরা নহি, আমাদের জন্য ধর্ম বলিয়া হিন্দুধর্ম বিভিন্ন স্থানে হিন্দুধর্মাবলম্বী লোকের প্রকৃতিগত বিচিত্র আকার ধরিয়াছে। হিন্দুর কিছুই বাদ দেয় না, পাথরপূজা হইতে ষট্‌চক্র সবই ইহা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু কখনও একটাকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলে নাই। তাই হিন্দুধর্মকে বাহির হইতে দেখিতে গেলে মনে হয়, ইহার ভিতর কত অসামঞ্জস্য। কিন্তু একটা অসামঞ্জস্য-মূলক দিদির লইয়া বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখিবে বাস্তবিক ইহার ভিতর কোন বিরোধী ভাব নাই। হিন্দুর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুব বিজ্ঞান কর, কিন্তু দেখিবে ইহা শুধু পুঙ্খানুপুঙ্খ নহে। হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনের বিধি নিষেধকে কুসংস্কার বল কিন্তু দেখিবে ইহা শুধু কুসংস্কার নহে। হিন্দুদর্শনের খুঁটিনাটি ধরিয়া দোষ বাহির কর, কিন্তু দেখিবে ইহা শুধু দর্শন নহে। হিন্দু দেবদেবীর রূপবর্ণনাকে Anthropomorphism বল, দেখিবে ইহা শুধু রূপবর্ণনা নহে। হিন্দু দেবদেবীর ভোজকে ভোয়াজ বল, দেখিবে ইহা শুধু ভোজ নহে। হিন্দুর তীর্থযাত্রাকে প্রকৃতিপূজা বল, দেখিবে ইহা শুধু প্রকৃতিপূজা নহে।

হিন্দুর অঙ্গরাগ সূক্ষ্ম ও গভীর, অত্যন্ত সরল ও ব্যাপক। হিন্দুতে নানা বিরোধী ভাবের মিলন। নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায় হিন্দুতে আশ্রয় পাইয়া তাহাদের মধ্যে বিরোধ ভুলিয়া ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পল্লীগ্রামের শান্ত সুন্দর সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টারব দেবমন্দিরে আরতি হইতেছে। কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ, ঢাক, ঢোল, সানাই, সবই বাজিতেছে। পুরোহিতের হস্তে পঞ্চপ্রদীপ মন্দির আলোকিত করিয়াছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে পুরুষ স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মুচি, ডোম ভক্তির অর্চ্চিতে উপস্থিত। হিন্দুত্বকে সরল ও অকৃত্রিম পল্লীজীবনের এই সুন্দর দৃশ্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হিন্দুত্বের উর্দ্ধ শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে অন্তর-রাজ্যের গূঢ় রহস্যের মধ্যে। কিন্তু ইহার মূল রহিয়াছে বাস্তবের অন্তরে। দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে পল্লীগ্রামের অন্তঃস্থলে। হিন্দুর উপাসনা বাস্তবকে কখনই অস্বীকার করে না; বাস্তবের ভিতরেই হিন্দু অনন্তকে খুঁজিয়াছে। মন্দিরপ্রাঙ্গণের

অনন্তার মধ্যে কেহ নাম করিতেছে, কেহ জপ করিতেছে, কেহ করতালি দিতেছে, কেহ বা স্থির প্রশান্ত ধ্যানমগ্ন। হিন্দুর সহজ সরল নামগান হইতে উচ্চ ও গভীর ধ্যান পর্যন্ত সবই বরণ করিয়াছে। গাছ ও পাথরপূজা হইতে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' পর্যন্ত হিন্দুর সবই গ্রহণ করিয়াছে, কিছু ত্যাগ করে নাই। শাঁক, সানাই, ঈদ্‌, ঈসোনের উলুধ্বনি সকলে মিলিয়া যেন একটা ঐকতানের সৃষ্টি করে,—কিছুই বেসুরা বলে হয় না, হিন্দুর নানা সম্প্রদায় নানাবিধ সাধনার মধ্যে সেরূপ একটা সমন্বয়স্থাপন করিয়াছে। পল্লী-মন্দিরে সেই দেবতার মত হিন্দুর ভারতের বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সাধনাকে একমুখী করিয়াছে,—বিরোধী ভাব-সাধনের মধ্যে শান্ত মঙ্গলময় একের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। হিন্দুর স্বাধীন ও অকৃত্রিমভাবে শুধুই সত্যের পথ ধরিয়াছে,—সত্যের পথ কঠিন পথ, সে পথে পদে পদে বিপদ, 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' কিন্তু হিন্দুর এই আশ্বাসবাণী প্রচার করিয়াছে—যাহা অন্য কোন ধর্ম কখনই করে নাই, সত্যের পথ এক নহে, বহু, একনিষ্ঠ হইয়া একপথে যাইতে পারিলেই তুমি সত্যকে পাইবেই পাইবে—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

এক একের প্রতি নিষ্ঠা, বিরোধের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা, হিন্দুর এই বিশেষত্ব শুধু তাহার আত্মচিন্তা ও আত্মদর্শনকে যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহা নহে, হিন্দুর সমাজ-জীবনও গঠন করিয়াছে।

সম্পাদক

সাহিত্যের দায়িত্ব

সাহিত্যের রূপ যে জীবনেরই অপরূপ প্রতিমা। সাহিত্যের সৌন্দর্যের উপাদান ও জীবনই যোগাইয়া করিয়াছে ও করিতেছে। অলসের জীবন নহে, ভোগ ও কল্পনাস্বপ্নের জীবন নহে, সত্যের সরল জীবন। জীবনই সাহিত্যের সন্ধান করে, জীবনই সাহিত্যকে লালন-পালন করে, আবার সাহিত্যও জীবনের পোষণের ভার লয়। জরাগ্রস্ত পিতার জীবন শিশুতে সঞ্চারিত হইতেছে, এইভাবে জীবন ও সাহিত্য পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবাধীভাবে পুষ্ট হইবে। বৃদ্ধ পিতা শিশুর বলে নবজীবন লাভ করিতে পারেন—তাঁহার এই আশা যেন ব্যর্থ না হয়। সাহিত্য যেন তাহার কর্তব্যজ্ঞান, তাহার ধারিত্ব না হারায়। যে সাহিত্য জীবনের বিরোধী, সে কুসুম, সে ফুটা সাহিত্য। এমন নীতি ও রীতি বঙ্গসাহিত্যে এখন অনেক সময় প্রশ্রয় পাইতেছে, যাহা জীবনের বিরোধী—তাহা আশ্রয় করিলে যে জীবনের পথে মানুষ সেই আদিম কাল হইতে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, সে পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আদিম বর্বরতা হইতে আধুনিক সভ্যতার পরার্দ্ধি করিয়া মানুষ একটা অন্ততঃ ঠিক বুঝিয়াছে যে, পবিত্রতার আদর্শ খাট করিতে গেলেই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। মানুষ সেই আদর্শ যতই বড় করিয়া রাখিয়াই জীবনে উন্নতিলাভ করিয়াছে। সুতরাং বড় আর্টিষ্ট কখনই পবিত্রতা ও অপবিত্রতাকে সমান চক্ষে দেখেন না।

ভারতের বড় সাহিত্য কখনও কেবলমাত্র বৈঠকখানাকে আশ্রয় করিয়া জন্ম লয় নাই। মহাভারত, রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগবত, চণ্ডী ও বৈষ্ণব-সাহিত্য ভারতীয় জনসাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিগুলি সমস্ত ভারতীয় জীবনকে আশ্রয় করিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে।

সীতা, সাবিত্রী, চাঁদ-সদাগরকে আমরা জীবনে ও কর্মে সত্য করিয়া আজও তুলিতেছি; কালিদাসের কুমারসম্ভব, মুকুন্দরামের চণ্ডী, চৈতন্যভাগবত অথবা বৈষ্ণব-পদাবলী লোকে দৈনিক জীবনে সাধনার অঙ্গরূপে নিত্য পাঠ করিয়া থাকে। কলেজের সেন্ট পীয়ার অথবা গেরেটে বা রবিবাবুর কাব্যসাহিত্যের পাঠের মত নহে।

সম্পাদক

অদৃষ্টের পরিহাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৩)

পোষ্টপিয়ন বাড়ীর দুই প্রাণীকে চমকিত করিয়া,গোলাপীর নামে মাঝে মোটা একটী চিঠি দিয়া গেল ; অবশ্য গোলাপী যে কখনই চিঠি পাইত না তাহা নহে তবে সেগুলি খুব কচিৎ আসিত এবং সকলগুলিই পোষ্টকার্ড ; প্রথম প্রথম অবশ্য গ্রামের চিঠির জ্বালায় সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে অনেক অতীতের কথা। সে খাম লইয়া দেখিতে লাগিল ; দুর্ব্বল লোকের হস্তে লিখিত, অক্ষরগুলি জড়াইয়া পড়িয়াছে, যেন তাহাদের শক্তিও নাই। গোলাপী খাম খুলিয়া এক পৃষ্ঠা লেখা চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। এ আবার কি উৎপাত, এ যে তাহারই স্বামীর লিখিত তাহার শান্তির জীবনে আবার কেন এ গণ্ডগোল উপস্থিত হইল এই অতীত অনেকদিন হইল ভুলিয়া বুঝিয়া গিয়াছে ; এখন আবার কেন ইহার এই অযাচিত অবাঞ্ছিত আগমন।—কিন্তু হঠাৎ তাহার এই বিরক্তিপূর্ণ চিন্তা প্রণালী বন্ধ করিয়া একটা নূতন আগ্রহের আলো তাহার মুখ উজ্জ্বল করিয়া দিল, সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়িতেছে"—তোমাকে চিঠি লিখিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কমক, আমাদের মেয়ে,তাহাকে কি মনে পড়ে, সে এখন বড় হইয়াছে, আমিও মৃত্যুর দ্বারে। তাহার কোনও অভিভাবক রহিল না, তা ছাড়া সহায় সম্পত্তিও কিছু রাখিয়া যাইতে পারিলাম না ; আমার সব দেনায় ডুবিয়া গিয়াছে ; এখন কেবল দুইটি উপায় দেখিতেছি ; এক তাহাকে পথে বসাইয়া যাওয়া আর এক তোমাকে তাহার কথা জানান, আমি দ্বিতীয় উপায়ই সমীচিন বিবেচনা করিলাম—"এই পর্য্যন্ত পড়িয়া গোলাপী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না) সে আপনার কক্ষের মধ্যে পদ চারণা করিতে লাগিল—তাহার আপনার কন্যা—ইা একথা তাহার এতদিন মনে পড়ে নাই, সে সত্য সত্যই অবহেলাতে গিয়াছিল ; কিন্তু এখন যখেই অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাই বুঝি আজ ভগবান তাহাকে এই কথা জানাইয়া দিলেন, সে করজোড়ে ভগবানের উদ্দেশে নমস্কার করিল; তাহার বক্ষপঞ্জরের মধ্যে বহুদিনের রুদ্ধ মাতৃত্ব আজ জাগিয়া উঠিয়াছে ; তাহার সকল অভাবকে আজ পূর্ণ করিয়া স্তন্যপ্রবাহ শিরায় শিরায় সঞ্চালিত ; তাহার কন্যা তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিবে এই চিন্তা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, সে কখনও কখনও অস্ফুটস্বরে নিজেই বলিতে লাগিল "মা, মা—মা", নিজের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত এই কথায় সে নিজেই আত্মহারা ; অবাধ, অফুরন্ত প্রীতি তাহার মন ভরিয়া দিল, সে যে 'মা'।

গোলাপীর মন তখন মেল ট্রেণের মত দ্রুতগতিতে চলিতেছে, তাহার মেয়ে কেমন দেখিতে ; সে কতবড় হইয়াছে, বোধ হয় দেখিতে খুব সুন্দরই না হইবে ; কেমন তাহাকে 'মা' বলিয়া জড়াইয়া ধরিবে, এইরূপ শত চিন্তা তাহাকে অস্থির করিতে চায় ; সে মনস্থির করিয়া ফেলিল, যাতা পুরীর দিনের এখনই করিতে হইবে ; কি গাড়ী ডাকিতে আদিষ্ট হইল। গোলাপী কমকের বিষয় আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায় কি না এই উদ্দেশে আবার স্বামীর পত্রে মনোনিবেশ করিল"—তোমার উপর আমার কোনও রাগ নাই, তোমার বর্ত্তমান জীবন প্রণালীর জন্য তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু একটা কথা,—আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি আমার ঘরে আসিও না, তবে বেশী দিন তোমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না, আমি মরিলে তুমিই কমককে দেখিও, আমি আর এই সময় তাহার ভাবনা লইয়া জ্বালাতন হইতে চাহিনা—" কি আশ্চর্য্য যিনি যার গোলাপীকে অযাচিতভাবে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত কিন্তু নিজে যে পনের বৎসর পূর্ব্বে এক বিরাট অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি দুঃখ

প্রকাশও করেন নাই, এইটা মানুষের স্বভাব। সোনাপী কিন্তু এই অবিচার মোটেই গ্রাহ্য করিল না; তাহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা, স্বামীর নিষ্ঠুর আদেশে, আরও কত অনিশ্চিত দিন,দরকার নাই অবশ্য থাকিবে, তাহার কন্যাকে, সে কোলের মধ্যে টানিয়া লইতে পারিবে না, শুধু এইটুকুই তাহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল; স্বামীর বিষয়ে কোন চিন্তা তাহাকে বিচলিত করিল না, তাহার হৃদয়ের; যে অংশে এমনীর স্বামীদের থাকে,সেই অংশটা একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। সে বসিয়া বসিয়া কনকের কথা ভাবিতে লাগিল; তাহার মনের ভাবটা বাধা পাইয়া এমন আকার ধারণ করিয়াছে, যে প্রথমে মনে হয় যেন সে কনকের প্রণয়ী, জননী নয়—কনক হইল প্রাণ, কনক হইল ধ্যান।

গাড়ী ফিরিয়া গেল; সোনাপী কেবল দিন গণিতে লাগিল; তবে মিঃ রায় তাঁহার অসাধারণ ধীরতা শেষ করিলেন,সে আগ্রহের সহিত তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। তাহার চিরদিনের অভ্যস্ত কার্য্যের মধ্যে নানারূপ অহেতুকী বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, সে মিঃ রায়ের সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া লোক পাঠাইত।

প্রেমের সমর্থন করিতে গিয়া একজন, বোধ হয়, কোনিকই বলিয়াছেন যে, একজনকে ভাল বাসিলে, সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে শেখা হয়, ব্যক্তি বিশেষে প্রেম একবার জন্ম হইলে, বিশ্বপ্রেমের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়; কথাটা খুব মধুর এবং আশাপ্রদ; তবে দুঃখের বিষয় জগতে সাধারণতঃ ইহার বিপরীতই দেখা যায়; মানব-চরিত্র অতি অদ্ভুত, সে, যাহা আমরা চাহি, তাহার বিপরীত করিয়া চলে না। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইল—যখন সোনাপী খবর পাইল যে তাহার স্বামীর অবস্থা খুবই খারাপ, তখন তাহার মনে কোনও কষ্ট হইল না, সে বরং কনককে নিজের কাছে আনিতে পারিবে; এই সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—মানুষ এমনিই স্বার্থপর। তাহার দেহ, মন, প্রাণ আজ উদ্বেগ ও ক্ষুধিত, সে এখন শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেও অসমর্থ; তাহার মন আর বাধা মানিতেছে না। সেইজন্য স্বামীর পত্রের আদেশকে বেলার অগ্রাহ্য করিয়া সে একেবারে গাড়ী করিয়া স্বামীর বাড়ী উপস্থিত হইল। তাহার মনে কেবল এক চিন্তা, কনক, তাহারই মেয়ে—অন্য কিছু ভাবিবার অবসর বা সামর্থ্য তাহার ছিল না।

রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতেই, প্রথম তাহার দৃষ্টি শয্যার উপর পড়িল, তাহার স্বামী, পূর্ব্বের ছায়ামাত্র, কঠোর পরিণামের প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাহার দৃষ্টি কিন্তু তিলমাত্র সময়ও সেইখানে অতিবাহিত করিল না, উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি তাহার ঘরের অনুসন্ধান করিতেছিল, এবং পাশে চেয়ারে আসীন কনকের প্রতি পড়িতেই, একটা অস্ফুট আহ্লাদের শব্দ তাহার কণ্ঠ হইতে আপনাই নিঃসারিত হইল, রোগী ও ধাত্রী দুইজনের চক্ষুই তাহার উপর পড়িল, কনককে সোনাপী খুব ভাল করিয়া দেখিল, তাহার কৃতার্থ পানীয় যে তাহারই সম্মুখে সে পান করিতে যাইবে, কনককে কন্যা বলিয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিবে, এমন সময় বিদ্যুৎ গতিতে এক নূতন ভাবনা উপস্থিত হইয়া দুইজনের মধ্যে ধরিতে এক দুরন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া ফেলিল—সে যখন কনককে বলিবে "আমি তোর মা" তখন যদি মেয়ে জিজ্ঞাসা করে, "মা, এতদিন কোথায় ছিলে"—তাহার পায়ের নীচে সমস্ত জগৎ ঘূর্ণায়মান, সূর্য্যের সমস্তরাল রশ্মি যেন কোনও হৃদয়হীনের ব্যঙ্গোক্তির সহিত, অঙ্গুলি নির্দ্দেশের মত; তাহার চক্ষের সামনে সমস্তই ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছে। এমন করিয়াই কি তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে; যদি এই হইবে তাহা হইলে তাহার কন্যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই ভাল ছিল। এমন করিয়া তাহার শেষ আশ্রয় যদি ভয় হয় তবে সে যে একেবারে নিরুপায়। অমানুষিক শক্তি প্রয়োগে আপনাকে সংযত করিয়া সে কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ সকলেই নির্ব্বাক; অবশেষে মিঃ রায় আর কন্যার হৃদয়ের দৃষ্টি লক্ষ করিতে অসমর্থ হইলেন, তিনি অভ্যাসবশে পরিচারিকার স্থানে উপস্থিত এমন সময় স্ত্রীর কাতর দীনদৃষ্টি তাঁহার চক্ষে পড়িল. সোনাপীর শেষ চেষ্টা;—প্রকৃত পরিচয় হইলেই তাহার অবস্থা শোচনীয়, কন্যাকে নিজের বলিবার অধিকারের সহিত হয়ত আজীবন ঘৃণা তাহার ভাগ্যে ঘটিবে; সে কনকের অসহায় স্বামীকে; পরিচয়পূর্ণ ইঙ্গিত করিল, যেন তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ না হয়। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে মানুষ তাহার

স্বভাব-চরিত্র একেবারে পরিবর্তন করিয়া ফেলে, যে মূর্খ তাহাদের মুখে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা শুনা যায়, বোধ হয়, গঙ্গা স্নানের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়াই জীব আগে হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত হয়। মিঃ রায়ও মৃত্যুশয্যায় তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিয়া গেলেন, তিনি কনককে বলিলেন "তোর মাসিমা"। কনক একবার মাসীমার আপাদমস্তক লক্ষ করিয়া পিতার সেবায় প্রবৃত্ত হইল।

মিঃ রায়ের ভূমিকা শেষ হইয়াছে। তিনি জগৎক হইতে অপসৃত হইলেন। কনক কি করিবে কিছুই স্থির করে নাই, তাহার হাত খুব বেশী হয় নাই, এবং হাতের টাকা কনকের পক্ষে একেবারে অপর্যাপ্ত; জ্যোতির্ময় অনেকই তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিল, কিন্তু বর্ত্তমানের কোনও উপায় দেখা গেল না। মিঃ রায়ের বন্ধু বান্ধব ও পাওনাদারেরা আসিয়া দুই দিন ধরিয়া ঘুরু করিল। মিঃ রায়ের যাঁর হাত যে ব্যবসায়ী বন্ধু সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া কোন মতে মাত্র দুই শত টাকা কনককে অর্পণ করিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল কনককে বাড়ী লইয়া যান, কিন্তু যাহাতে তাহার আত্ম-সম্মানে আঘাত করে, সে রকম কোনও কথা বলিতে তিনি ইতস্ততঃ করিলেন। কনকও পরের নিকট সাহায্য লইতে অতিশয় কুণ্ঠিত, তাহাই পিতৃবন্ধুকে দূরে রাখিয়া তাঁহার সাহায্যের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ নিরাশ করিল, সে যে বড় আত্মাভিমানী।

মাসিমার সহিত যাইতে কিন্তু তাহার কোন আপত্তি রহিল না; মাসী একটি বিধবা মাত্র আছে, আর সম্বন্ধটা যে তাহার মাতার দিক দিয়া পিতার দিক দিয়া নহে। তাহার সম্মতির আরোও একটা বিশেষ কারণ এই যে সে ভাবিত, মাসিমার আশ্রয়ে অবস্থিতি অতি অল্পকালব্যাপী হইবে। জ্যোতির্ময় কোনও একটা চাকরীর যোগাড় করিতে পারিলেই সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান হইবে। এই পাঁচ বছরের মধ্যে তাহাদের বন্ধুত্ব অল্প কিছুতে পরিণত হইয়াছিল।

মোলাপী, কনকের আশ্রয়দাত্রী মাসিমার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথম কার্য্য করিল, তাহার বহুকালের বন্ধু ঘিয়েটাদের মনুনেবারকে একখানি চিরস্মরণীয় কৃতজ্ঞতা-পত্র লেখা; এইরূপ অতীতের সহিত নিজের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া সে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইল, তাহার লক্ষ্য, নিজের ভালবাসা ও যাদুস্পর্শে কনককে মুগ্ধ করিয়া তাহার ভালবাসা আদায় করা; যদি এ জীবনে দুর্ঘটনাচক্রে পড়িয়া সে নিজের সন্তানের নিকট আত্মপরিচয় গোপন করিতে বাধ্য হয় তথাপি সে কেন তাহার স্নেহ পাইবে না, সে নিজে যদি কনককে বেঁচের বক্ষে দেখে তবে কনককে কেন না তাহাকে মায়ের অধিকার ছাড়িয়া দিবে, স্নেহ, ভালবাসার পাষাণ গলে আর কনক ত তাহার নিজের সন্তান। তাহার যাদুস্পর্শের সমস্ত ব্যাকুলতা লইয়া আজ সে কনকের নিকট স্নেহ ভিক্ষার উপ-স্থিত।

কনক ও তাহার মাসীমা মুখোমুখী বসিয়া আছে; সে আজ তিনদিন হইল মাসীমার বাড়ীতে আসিয়াছে; এই প্রথম তাহার, মাসীমা কেমন লোক তাহা জানিবার আগ্রহ হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল—"মাসীমা, তুমি খুব কি হিন্দু?" মাসীমা অন্যমনস্ক একেবারে নিরুত্তর। তাহার পর বলিলেন "হাঁ" কনক "তাই বুঝি বাবা ব্রাহ্ম হওয়াতে আমাদের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি" মাসীমা এবার একেবারে নির্বাক; কনক আবার জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা সত্যি বলত আমার আসাতে তোমার কোনও অসুবিধা হ'চ্ছে কি? আমরা ওসব মেনে চলি না তাই তোমার যদি কোনও—"মাসীমার মনের কথা সে ছাড়া আর কে জানিবে; কনক আসাতে তাহার অসুবিধা হইবে, তাহার কারা আসিতেছিল, সে বলিল "তুমি ওরকম মনে করো না।" মাসীমার মুখে যে একটা দ্বন্দ্বের ভাব নিয়ত লক্ষ্য করা যাইতেছিল, তাহাতে কনক আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার সহানুভূতি আসিয়া উঠিয়াছে; তথাপি একটা বাধা সে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিত না; তাহার মাসীমা যে হিন্দু আর তাহার নিকট হিন্দুর অর্থে পৃথিবীতে যাহা কিছু কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা আছে, তাহার সমাবেশ; কিন্তু মাসীমার পরিচ্ছন্নতা, তাহার সযত্নে রক্ষিত পুস্তকগুলি, তাহার পৌত্তলিকেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে; মাসীমা যদি হিন্দু না হইয়া ব্রাহ্ম হইত তাহা হইলে কনক তখনই তাহাকে মায়ের আসনে বসাইত। মাসীমার চক্ষু কনকের স্নেহের প্রলোভ অংশকে স্নেহাভিষিক্ত করিয়া তুলিতেছে। কনকের কিন্তু তখন সংস্কারকের স্পৃহা

উঠিয়া উঠিল—সে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা তুমি যে ঐ গোপাল-মূর্ত্তিকে পূজা কর, এটা ত শাস্ত্রের অনুমোদিত নয়, তোমার কি ওইটে ভুল দিয়ে সারিয়ে নেওয়া উচিত?" বাসীমা—না, আমি পূজা করি না ত, ঐখানিই আছে" কমল—"তাই যদি হয় তাহ'লে আমি তুমি এতে বিশ্বাস করি না, আর যদি বিশ্বাস না কর, মূলমন্ত্রের তোমার দরকার না থাকে, তবুও কেন একটা নিয়মকে রেখেছ, কেনই বা ভুল দিয়ে সেটা সারাও; এই থেকে আমার অনেক কিছু হতে পারে" বাসীমা তাঁহার কথার অর্থের ঠিক মোটেই আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহার মনের মধ্যে সে আত্মহারা, মন্ত্রমুগ্ধের মত উত্তর দিল, "আর রাখব না" কমলের মত উৎসাহী কর্ম্মসংস্কারকও এই আকস্মিক আশাতীত কৃতকার্য্যতায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সত্যসত্যই পরদিন হইতে সেই মূর্ত্তি তাহার এতদিনের আসন হইতে অন্তর্হিত হইল, নিরীহের স্থান এখন যে সকলের অধিকৃত, মূর্ত্তির স্থানে এখন মানুষ প্রতিষ্ঠিত। তাহাদের মধ্যে এই ধরণের কথাবার্ত্তা প্রায়ই হইতে লাগিল, কমল অনর্গল, তাহার উদ্ভট ধর্ম্ম ও সমাজের কথা বলিয়া যাইত, বাসীমা অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে তাহাকে কেবল দেখিত, কথার মূল্যবত্তা তাহার কাছে ছিল।

একদিন বৈকালে জ্যোতির্ময় আসিয়া উপস্থিত; মুখর চেহারা; রুচিপূর্ণ পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন, বাসীমা তাহাকে দেখিয়াই অকারণে রাঙ্গিয়া গেল; কমল কিন্তু অনর্গলে তাহাকে বসাইয়া আপ্যায়িত করিল; ঝি আসিয়া একবার ডাকিল "দিদি, মা খেতে ডাকছেন" কমল হাসিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, "এখন আমার খেতে দি, এই ত খাবার খেলুম, তোর ভুলতে ভুল হয়েছে, যা।" গল্প আবার পূর্ণবেগে চলিতেছে; বাসীমা কেবল আসন ঘরে বসিয়া নিজের ক্রোধে ইন্ধন দিতে থাকে, প্রথমতঃ জ্যোতির্ময়কে তাহার আগেও ভাল লাগে নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহার মনে আশঙ্কা হইয়াছে যুবক তাহার কমলকে অপহরণ করে। নিজের ঘরেও সে নিজেই অসীম; ভবিষ্যতের যা, সেখানে যে তৃতীয় একব্যক্তি উপস্থিত হইবে, সেটা সহ্য করিতে একেবারে প্রস্তুত নয়; এ যে তাহার অন্তরের বাণী; এই সকল বিষয় বাহ্য সাধারণতঃ ঘোর কর্ম্মপর হইয়া থাকে, এইটা স্বাভাবিক, এজন্য তাহাকে দোষী করা যায় না।

জ্যোতির্ময় প্রস্থান করিলে, বাসীমা একেবারে কমলের নিকট সোজাসুজি কথাটা পাড়িল, "আচ্ছা কমল, ঐ ভদ্রলোক কে?" সে নিজের মনের ভাবকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া অতিরিক্ত গলাতেই কথা বলিয়াছিল, কমল কিন্তু জ্যোতির্ময়ের আগমনে বাসীমার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহার জীবনের মধ্যে যে এই অনন্তের বন্ধু আত্মীয়ার একটা স্থান আছে, তাহা সে মনে করে নাই এখন একটু লজ্জিতভাবে উত্তর দিল, "ও আমার পরিচিত একটী বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন" বাসীমা—"তোমার কেমন বন্ধু?" কমল "কলিকাতায় আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন, বাবার অসুখের সময় অনেক সাহায্য করিয়াছেন, আমার খুব নিকট বন্ধু উনি, তুমি নিজেই দেখবে কেমন ভাল লোক, প্রায়ই আসবেন কিনা" "সেটা কিন্তু ভাল দেখায় না, বলোই বা তোমার বন্ধু তবুও এ রকম যেচে-যিশিটা লোকদের চোখে খারাপ দেখায়; ছেলেই ছেলে মানুষ তোমরা।" "না না সে সব কিছু ভাল কোরো না, আমাদের সমাজে এতে দোষ নেই; আমি কি বিধুমুখীর কচি খুকী যে কারুর সঙ্গে মিশতে পারব না; আর উনি আমার জ্যোতির্ময়বাবু খুব লোক ভালো, আমি ওঁকে বিশেষ করে চিনি।"

ইহার পর বাসীমাকে বাদ দিয়া বিস্তর হইতেছিল, নিজের মনের ভাব গোপন করিয়া আর কথা করেও তাহার পক্ষে অসম্ভব এক উপায় তখনই সন্ধ্যেকথা কমলকে বলা কিন্তু তাহা করিতে সে একেবারে প্রস্তুত নহে; কমলকে দূরে চলিয়া যাইবার অবসর দিতে সে একেবারে নারাজ নহে, তাহার মনের ভাব প্রকাশ হইল না বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পরের দিন আবার জ্যোতির্ময় আসিয়া উপস্থিত, কমলের সহিত গল্প করিতে ব্যস্ত; দেখিয়া শুনিয়া বাসীমা একেবারে পাগলের মত হইয়া উঠিল, বাড়ী নিজের শাসনকে তাহার সম্পূর্ণ হইতে আসিয়াছে হইতে দেখিলে কোন অন্তরঙ্গ হয়ে, তাহারও মনের ভাব ঠিক তাহাই, সে

শেষ পর্য্যন্ত নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; কনকের সঙ্গে তাহার সমস্ত প্রাণ যে বাঁধা রহিয়াছে, কনকের অনুপস্থিতি সে যে কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠে। জ্যোতির্ম্ময় বিদায় গ্রহণ করিলে সে, কনককে নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিল, "দেখ, আমরা কালই পুরী যাব, আমার শরীর বড় খারাপ; আর কলকাতায় খরচপত্রও বেশী; আমি আজকেই সব বন্দোবস্ত করব ভেবি" "আমার আর বলা কেন, তোমার আশ্রয়ে যখন আছি, তখন যেখানে নেতে হয় যাবো'। কনকের এই কথার মধ্যে অনেকখানি বেদনা ও অভিমান ভরা ছিল, কিন্তু রাসীরা আজ নির্দ্দয়, কেমন করিয়া সে হৃদয়ের ব্যথাকে কাহে ফুটিতে পারিবে, সেই চিন্তাতে সে আকুল; এই সব লক্ষ করিবার অবস্থা তাহার নহে।

সকাল হইতেই তাহাদের গোছগাছ আরম্ভ হইল, রাসীরার মনের ইচ্ছা যে দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করিলে কনক জ্যোতির্ম্ময়ের কথা ভুলিয়া যাইবে, বন্দোবস্তও সেইভাবে হইতেছিল; কনকের চক্ষু দুটি ছল ছল করিতেছে, তাহার মুখখানি সমস্ত অন্তর গভীরভাবে অনুভব করে, তাহারও মন খারাপ হইয়া উঠিল, রাসীরা তাহার নিকট এখন শত্রু, তাহার কারণমূলের প্রহরী। বৃদ্ধা ঝি তাহার ভাইকে ডাকিয়া আনিল, সেই বিদেশে তাহাদের অভিভাবক ও তৃতীয় এই ছইয়ের স্থানই পূরণ করিবে, ঝি অবশ্যই সঙ্গে যাইতেছে।

(১৩)

অতি প্রত্যূষে কনকের ঘুম ভাঙ্গিল, আজের দিনের ট্রেনের ক্লান্তি, আজ অনুভবে, তাহার ঘরের জানালা দিয়া সমুদ্র দেখা যায়, অস্ফুট আলোকে বড় বড় ঢেউগুলি কোলাকোলি করিতে করিতে তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে; দুই একটি ঝিনুক বালুকা খুঁটিতেছিল। বাহিরের বাতাস একটা স্নিগ্ধ আর্দ্র পরশ দিয়া মন ভাঙিয়া দিতেছে, যেন স্নেহের ধারায় চারিদিক বাঁধা পড়িয়াছে। কনক আর এই সমস্ত সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করিতে অসমর্থ, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, বাড়ীর অন্য সকলে তখনও নিদ্রিত।

বাড়ীর সদরে যাইবার পথ হইতে কলুষের ডাক আরম্ভ হইয়াছে, সে ক্রতগতিতে, একেবারে জলের ধারে উপস্থিত হইল; ঝিনুকগুলি যখন প্রথম ভাঙিয়া পড়িতেছে, তখন তাহাদের কেমন উষ্ণ আস্বাদন, কেমন ভীরু গর্জ্জন, কিন্তু তীরের নিকট আসিতে আসিতে তাহার পাষাণমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, তখন যেন কত নরম ভাব, আর তাহাদের কুল কুল মৃদু সঙ্গীত কেমন মধুর; দূরে আকাশ সাগরের সঙ্গম রেখা তখনও উপযুক্ত আলোকের অভাবে অস্পষ্ট, আকাশের পূর্ব্বদিকের অংশটায় একটা কোনও আয়োজনের আভাস পাওয়া যাইতেছে, সেইখানে সূর্য্যোদয় হইবে। দূরে এক একটী লোক প্রভাতের মধু উপভোগ মানসে বেড়াইতেছে, পল্লীতে যখন তখন তাহাদের শ্রেণীর লোক দেখা যায়; তাহারা অন্য সকলের পূর্ব্বে সমুদ্রের তীরে আসে এবং রাত্রিবেলায় যখন সকলেই বাড়ী ফিরিয়া যায় তখনও সেইখানে পরিভ্রমণ করে না; তাহাদের মধ্যে আছে কয়েকজন কবি বা প্রেমিক কিন্তু অধিকাংশই এক অদ্ভুত শ্রেণীর লোক, তাহারা বিধাতার ভুলে সৃষ্টি; এক কথায় বলিতে হইলে তাহাদের নাম দেওয়া যায় 'বাসা-ছাড়া', ডাক্তারের 'বায়ু-পরিবর্ত্তন' মামুলি উপদেশ হইলেও তাহাদের নিকট বেদবাক্য। ক্রমে আলো হইয়া আসিতেছিল; আকাশের গায়ে, যেখানে পূর্ব্বে, পরিবর্ত্তনের, আয়োজনের আভাস দেখা গিয়াছিল, সেইখানে এক অভিনব ক্রীড়া আরম্ভ হইল, ক্রমশঃ এক একটী রং আত্মপ্রকাশ করিয়া আবার অদৃশ্য হইতেছে, সে এক মনোহর বর্ণবিলাস; সমুদ্রের জলেও এই লীলা প্রতিবিম্বিত। তাহার পর সূর্য্যোদয়; তখন তখন তখনও কিরণের মুহূর্ত্ত পরে যাই, তাই তাহার সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থান সকলেই দেখিতে পাইল, সে যেন এক স্বর্ণরাজ্যের অধিপতি, সাগরজলেও যেন হুকুম করিবার স্বর্ণ ঢালিয়া দিয়াছে, যেখানে তটভূমির নিকট তরঙ্গের খুব আলোড়ন, সেই স্থানে গলিত তরল স্বর্ণ ঝলমল করিতেছে—"পথিক চলে এস।" কয়েকজন উৎসাহী যুবক সেই আহ্বান অবহেলা করিতে অসমর্থ, সেইজন্য তাহারা অন্ত ভোর হইতেই স্নানস্থানে প্রস্তুত।

কনক একেবারে জলের ধারে দাঁড়াইল, তরঙ্গমালা তাহার চরণচুম্বন করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, যার

সখা তুলার বস্ত্র কেশ তাহার পরে জড়াইয়া গেল, কনক একেবারে মোহিত, সে উত্তেজিত হইয়া এই অপরূপ সৌন্দর্যটুকু পান করিতেছে—"জীবন, জীবন তাই, আনন্দ জীবন সত্যেন্দ্রনাথের 'সৌন্দর্য কবির চিঠি' তাহার মনে পড়িল। অকস্মাৎ তাহার অতি সন্নিকটে পশ্চাতে বাসীমার গলা শোনা গেল, "কাউকে না বলে এত ভোরে একলা বেরিয়েছ, এযে একেবারে আচ্ছা আহাম্মকি, সাবধান হওয়া ভাল।" চকিতে সে ফিরিয়া চাহিল, বাসীমা দাঁড়াইয়া আছে, দেহে একটি মোটা গরদের চাদর, মাথার উপর কপাল পর্যন্ত টানা, তাহার নীচ দিয়া একগুচ্ছ চুল কেশ দেখা যাইতেছে; সৌরবর্ণ মুখের সোজা প্রভাতের আলোয় আরও বাড়িয়াছে; বাসীমার গায়ের ঘরে একটা বিশেষত্ব ছিল, সেটা তাহার চিরন্তন নিজস্ব; চোখধাঁধান রূপ তাহার নাই; অনেকের মতে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য থাকে যাহা দেখিলেই মনে হয় সৌন্দর্য এইখানে জাজ্বল্য করিতেছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে সৌন্দর্য হয় বিদ্যুৎ কিংবা তপ্তার বিষয়। কনক ও বাসীমার মধ্যে যে কতটা সাদৃশ্য আছে, সেটা কনক জানিত না; তবে তাহাদের দুইজনকে এই স্থানে এই ভাবে যদি কেহ দেখিত তবে তাহার নিকট এই দুই রমণী, এই প্রভাত দৃশ্যের অনুযায়ী কোনও সুনিপুণ চিত্রের মত প্রতীয়মান হইত।

কনকের হৃদয় বাসীমার বিষয়ে এখন খুব সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, প্রহরীর প্রতি বন্দীর যে ভাব থাকে, বাসীমাকে সে সেই ভাবেই দেখিল, "কেন এতে আর দোষ কি, আমি ত আর হারিয়ে যাব না, পালিয়েও যাব না।" বাসীমার মুখে আর কথা নাই কনকের কথা তাহার অন্তস্তলে আঘাত করিয়াছে, দুইজনেই সমুদ্রের ধারে নীরবে বেড়াইতে লাগিল, কৃষ্ণা কি পশ্চাতে অনুসরণ করিল। প্রায় একঘণ্টা পরে রৌদ্র ও জনতা দেখিয়া বাড়িয়াছে দেখিয়া তাহারা বাড়ী ফিরিল।

মাসাধিকের পর কনকের ইচ্ছা একলা বিসিয়াকে সমস্ত দিবসের কাটাইয়া দিবে, আর জ্যোতির্ময়কে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার করিয়া এক চিঠি লিখিবে, সেই উদ্দেশ্যে সে নিজের ঘরে প্রবেশ করিতেছে এমন সময় কি আসিয়া জানিল। কনক বিরক্তভাবে বাসীমার দিকে তাকাইয়া দেখিল বাসীমা ওইয়া উঠিয়াছে; বাসীমা তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিল সে দাঁড়াইয়া রহিল, "কেন কোন কাজ আছে নাকি?" বাসীমা কোনও কথার কথা ভাবিয়া পাইল না; কনক যে তাহাকে এমন ভাবে বাধা দিবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই; অগত্যা তাহাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইল, কেন না সত্য তাহারই বেশী; সে মুখে একটু বেদনার ভাব ফুটাইয়া বলিল, "হাঁ আমার মাথাটা বড় ধরে ছে, একটু কাছে বসো না; অসুবিধে হবে কি;—এমন কিছুই বা কি?" এ মিথ্যায় কনক প্রস্তুত হইল না কেবল আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু বাসীমার সঙ্গে ব্যবহার সমীচিন নহে, সে শয্যার পার্শ্বে লোজা হইয়া বসিয়া রহিল। বাসীমা অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলাইবার চেষ্টা করিয়া, অকৃতকার্য হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কনক বিনা সেই ভাবে নীরবে বসিয়া রহিল, এবে আত্মসংযমের প্রতি তাহার কর্তব্য এই ভাবে দীর্ঘ বিপ্রহরের অবসান হইল।

আজ রবিবার হইল তাহারা পুরী আসিয়াছে, এ কয়দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু আজ সকাল হইতেই সমস্ত আকাশ ঢেকে ছাইয়া গিয়াছে, কোনও স্থানের একটু নীল দেখা যায় না, বাতাস থামিয়া গিয়াছে, সমুদ্রের গর্জন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর; দিনের আলো দেখিয়া আমোদপ্রিয় চঞ্চল তরঙ্গমালা অজস্র বিদ্রূপের সহিত তটের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

বাসীমা সমস্তদিন কনককে চোখে চোখে রাখিয়াছেন, তাহার অনবরত ভয় কেন যদি সে আবার তাহাদের অগোচরে সে কিছু করে, কোনও চিঠি লেখে, তাহাও অসম্ভব; কনকও বাসীমার এই সজাগদৃষ্টি চক্ষু দুটির অর্থ বুঝিয়াছিল, সে হতাশ হইয়া একদিন জ্যোতির্ময়কে চিঠি লিখিতে পারে নাই, লিখিবেই বা কোন্ সময়ে, বাসীমা যে এক তিলও তাহাকে একলা থাকিতে দেয় নাই।

কিন্তু আজ সমস্ত দিন ঘর বন্ধ থাকিবে দেখিয়া, তাহার সঙ্কল্পের কৃষ্ণা তাহাদের মতলব ভাঁজা চলিল, আর জ্যোতির্ময়ই বা তাহার অকস্মাৎ অদর্শনে কি ভাবিতেছে এই চিন্তা তাহাকে বিব্রত করিল। জ্যোতির্ময়ের সহিত

তাহার নিজস্ব যে এখন অতি ঘনিষ্ঠ, দুইজনের মনের তার এখন আর পরস্পরের নিকট গোপন নহে, দুইজনে উভয়েরই যে ভবিষ্যৎ চিত্র একসঙ্গে বসিয়া আঁকিয়াছে। কনক ধীর অনিচ্ছুক করিয়া লিখিতে বসিল ...

"তুমি বোধ হয় খুবই আশ্চর্য্য হয়েছ; আমার এই আকস্মিক অন্তর্ধানটা অদ্ভুত বটে। হয়ত বোধ হয় তোমার হয়েছে, আমারও হয়েছে, কেন জান? এই জন্যে যে আমি নিজে স্বাধীন নই; একজনের খেয়াল হ'ল আর তার কাছে অমনি কলকাতা ছেড়ে, তোমাকে ছেড়ে এখানে আসতে হ'ল; দিনরাত আমি এখন কয়েদীর মত; বাসীমা অভিভাবকের চোখে আমার সব গতিবিধি লক্ষ করছে, তাতে যে তার কোন বিশেষ উপকার হচ্ছে, সেটা জানা যাবার অসাধ্য, সে বোধ হয় নিজেই জানে না; তবে অভ্যাসই ঐ রকম—ইস্কুলে থাকতে একদিন বিনোদের Old maidএর সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা গিয়েছিল, তারা নাকি খুব উপরাগাপর; তাদের দুর্বলতা নিয়ে সবাই আমোদ করে, তাই বোলে তারা যে নেহাৎ নিরীহ, তা নয়; তাদের মানসিক দোষের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে অন্য লোকের, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কাদের, সুখ তাদের অসহ্য, আর যদি এই সুখটা সেই লোকদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা থেকে হয়, তাহলে আর কথাই নেই। দু একটা ইংরাজী নভেলে দেখেছি যে ধনী দুজন তরুণ-তরুণী পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ, হয়ত বিলম্বার অন্তে তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে, অমনি তাদের মধ্যে বাধা, আর সেই বাধা সৃষ্টি করছে এই Old maid. অবশ্য বাসীমার কাছে আমি অনেক বিষয়ে কৃতজ্ঞ, তবে যে জিনিষ থেকে তিনি আমায় বঞ্চিত করেছেন সেটার তুলনায় অন্যগুলো আমার কাছে অতি তুচ্ছ। তোমার চাঁদ কি এতক্ষণে পড়েছে, যদি না পড়ে থাকে, তাহ'লে সেই আশায় এখন ব'সে আছি। এতদিন চিঠি লিখিনি তার কারণ বুঝতে বোধ হয়। পুরী জায়গাটা বেশ ভাল, তবে আরো অনেক ভাল লাগত যদি তুমিও এখানে থাকতে। জগবান্ধুর কাছে রোজ প্রার্থনা করছি যেন সবার কাছে তোমার মূল্য হয়। তুমি কোন সময়ে আমাকে প্রার্থনা কর; আমি সকাল ৬টা আর রাত্রি ৮টায় করি। আমার মনে হয়েছে, আমি সেই এক রকমই আছি। আমি কখনও হতাশ হব না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একদিন আমরা মিলিত হবোই; প্রকৃত প্রেম কখনও কিছুই দাঁড়াতে পারে না, প্রেম যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান; সাহস কর, পরমেশ্বরে বিশ্বাস রাখো, তারপর আমাদের ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকলে তার মর্য্যাদা রাখতে সমস্ত জগৎ নতে দাঁড়াবে—কনক"

কনক চিঠি চাকরকে ডাকে দিবার জন্য দিল। তাহার মন এখন অনেকটা সুস্থ, এতদিন কিছু করিতে না পাইয়া যে অহরহ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন যাহা হউক জোতির্ময় যখন ব্যাপার বুঝিতে পারিবে, সে তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত।

বাহিরে তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; বাড়ীর বাহির হওয়া একেবারে অসম্ভব; ঘরে বসিয়া থাকাও বেশী শক্ত হইত না; কিন্তু সে প্রতি মুহূর্ত্তে বাসীমার ডাক আশঙ্কা করিতেছিল, তখনই তাহাকে যাইতে হইবে, তারপর সমস্তক্ষণ তাহার নিকটে নীরবে বসিয়া থাকা; একলা বসিয়া থাকিতে কনকের কোনও কষ্ট হয় না, কিন্তু বাসীমা অতি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, সে বুঝিত যে তাহার সঙ্গ কনকের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিজনক, কোনরূপ প্রসঙ্গই তাহাদের মধ্যে হওয়া সম্ভব নহে, তথাপি, সে যেমন করিয়া হউক কনককে কাছে রাখিবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিত। আজ কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল, অনেকক্ষণ কনক নির্ব্বিবাদে বসিয়া আছে; সে বুঝিল যে আজ বাসীমা তাহাকে অব্যাহতি দিয়াছে, কিন্তু সে প্রসন্ন হইতে পারিল না; ঘটিত পরিণাম তাহারই অনুকূল, তথাপি স্বাভাবিক নিয়মেরব্যতিক্রম তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। বাসীমা কি করিতেছে জানিবার জন্য সে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব, আর বাসীমার ঘরেও তাহার একটি বই রহিয়াছে, পুস্তকও যে এখনই তাহার আবশ্যক, নচেৎ সময় কাটিবে কেমন করিয়া।

ঘরের মধ্যে সহসা কনক প্রবেশ করাতে বাসীমা ব্যস্ত হইয়া হাতের চিঠি গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কনকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমস্তই লক্ষ করিয়াছে, তবে এই লইয়া একটা ঘটনা করাও সে অত্যন্ত হীনতা বলিয়া মনে করে, সেইজন্য গম্ভীরভাবে পুস্তকটী লইয়া সে চলিয়া গেল, বাসীমাও লজ্জায় অধোবদনা হইয়া রহিল, কনক ঘর হইতে বাহির

হইয়া যাইবার পর, অর্থাৎ ট্রেনে তবু একবার আসিল—'কনক' কিন্তু কনক তখন নিজের ঘরে বন্ধ করিয়াছে।

যাদবীরা আজ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, সে জোর করিয়া কনককে কাছে টানিতে চায়, কিন্তু জোর করিয়া কে কবে ভালবাসা আদায় করিতে পারিয়াছে, কনকের শরীর তাহার আয়ত্তের মধ্যে, সেখানে ইচ্ছা সেইখানে তাহাকে সে লইয়া যাইতে পারে কিন্তু কনকের অন্তর যে তাহার প্রতি বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

তৃষ্ণার্ত কাঁটা যাদবীর উপর নিয়ত গড়াইয়া পড়িতেছে, অবোধ্যা ফিরিয়া কাজ থাকে যাবার বলিয়া ইঙ্গিতও করিয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের তীব্র একেবারে অসমর্থ। ঘরের মধ্যে একটী তক্তপোষের উপর বিছানা আর এক-দিকে একটী ছোট টেবিল, ঘরে ঢোকবার উপর একটী বিলাতী কম্বল টাঙ্গান হইয়াছে, সমস্ত জিনিষের উপর যেন একটা মলিনতার ছায়া পড়িয়াছে, কোথাও যেন তৃপ্তি নাই। যাদবীরা গভীর চিন্তার বিষয়, আজ সে নিজের সমস্ত গত কার্য্যাবলীকে পর্য্যালোচনা করিতেছে; বিচারক নিজে, অভিযুক্তও নিজে; কঠিন বিচারে যিনি দোষী সাব্যস্ত হইল। তখন কেমন করিয়া এই অপরাধের মোচন হইতে তাহারই ভাবনা আসিয়া উপস্থিত; কনককে আবার সে অন্তরঙ্গ ভালবাসিবে, এ কথা লইয়া আবার বিচারণা করাও চলে না, মুক্তির রক্ত দিয়াও যদি তাহার কোনও উপকার হয় তাহাতেও সে পশ্চাৎপদ নহে, তবে এ প্রবৃত্তি তাহার কেন হইল, তাহার কনককে আজ কেন ভালবাসিবে, একি তাহার একেবারে অসহ্য; কনকের চোখেই তাহার সুখ, তবে কেন সে নিজের সুখকে এত বড় করিয়া দেখিয়াছে, নিজেকে আজ সে ঘোর স্বার্থপর বলিয়া অভিহিত করিল, তাহার একমাত্র কন্যা, তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, যাহাকে সে ভালবাসায়, স্নেহে, দিবানিশি জড়াইয়া রাখিয়াও তৃপ্তি পায় না, তাহার সহিত শত্রুতা, ইহা নিশ্চয়ই তাহার কার্য্যের ফলেই ঘটিয়া সে ভাবিল। কনকের নিকট হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না বলিয়া সে আজ দুঃখিত, কেমন করিয়া সে তাহার মনের বলিষ্ঠকে বুঝাইবে যে সে তাহাকে কত ভালবাসে, এই চিন্তায় সে ব্যাকুল। আপাতত নিজের অবস্থানের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে নচেৎ যে ব্যবধানের সূত্রপাত তাহাদের মধ্যে হইয়াছে তাহা মহাসাগরে পরিণত হইবে। প্রতিবিধানের একটা উপায়ও তাহার মনে হইল।

কনক আপন মনে বসিয়া জোরে ঘুরিতেছিল, হরদয়াল নিকট পথ অতিক্রম করিয়া ট্রেণটি থামিতেই দেখিল সম্মুখে যাদবীরা, অপরাধীর মত বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া। যাদবীরা বলিল "কনক এ জায়গা কই তেমন ভাল নয়, তাই তোমায় বল্‌ছি এলাম, আমরা পরশুই কলকাতা ফিরে যাই কি বল?" কনক নীরবে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল, যাদবীরা এইরূপে সন্ধির প্রস্তাবে তাহার অর্দ্ধেক দুঃখ অন্তর্হিত হইয়াছিল।

অনেক লোক আছে, তাহাদের নিকট যে যতই দোষী হউক না কেন, একবার কমা চাহিলেই তাহারা সেই দোষ সাগ্রহে ক্ষমা করে, ক্ষমা করিয়া তাহারা একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেইজন্য ক্ষমাপ্রার্থীর নিকট তাহারা আপনাদের অজ্ঞাতসারে, কৃতজ্ঞ থাকে, যাহারা ধর্ম্ম ও নৈতিক বিষয় লইয়া অত্যধিক চর্চ্চা করে তাহাদের মধ্যেই এই শ্রেণীর লোক বেশী দেখা যায়, কনকও অনেকটা ইহাদের অন্তর্ভুক্ত, তাহার হৃদয়ে উদারতা অবশ্যই ছিল, সঙ্কীর্ণতা দোষ তাহাকে আরোপ করা ভুল হইবে; যাদবীরার মুখে চোখে যে ক্ষমা-প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে তাহার সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত এবং তাহার উপরও আবার কনক তাহাকে 'রাজ রাণী' এই হিসাবে পূর্ণ সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। চিঠির কথা আর তোলাই উচিত না। কনক, তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনবার্ত্তা জানাইয়া জ্যোতির্ম্ময়কে আর একটি চিঠি লিখিল, এবার অবশ্য পত্র নিরাপদেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইল।

পুরী হইতে বাসা উঠাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে চারিটী দিন অতিবাহিত হইল, তাহার পর তাহারা নির্দ্দিষ্ট দিবসে আবার ট্রেনে উঠিল। ট্রেন ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, এই কয়দিনের স্মৃতি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল; আবার কলিকাতায় যাইবার আনন্দোচ্ছ্বাসে কনকের মুখের ঘন্দ্ব ক্রত পরিবর্ত্তিত হইতেছিল।

বাসীমার মনের ভাব সে নিজে ছাড়া আর কাহারও পক্ষে অনুমান করা অতি কঠিন, সে বাহিরে বসিয়া আছে ; তাহার ব্যবহারে কনককে আপ্যায়িত করিবার যে বৃথা চেষ্টা এতদিন প্রকাশ করিত, তাহাতে সে এখন ক্ষান্ত হইয়াছে, কেবল তাহার বাধিত দৃষ্টি কনকের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। কনকও কিন্তু বাসীমার সুবিধা অসুবিধা ভাবিতে আজ অত্যন্ত তৎপর ; সে জানাইতে চায় যে বাসীমার সমস্ত অপরাধ সে মার্জ্জনা করিয়াছে : দুইজনের মধ্যে যে বৈরীভাব ছিল, তাহা যেন অতীতের বিস্মৃতকাহিনী।

কলিকাতার পৌঁছিতে তাহাদের অনেক বেলা হইয়া গেল, বাসায় গিয়া স্নানাহার করিয়া বিশ্রামের সময় মিলিল না, বাসীমা পূর্ব্ব উদ্যমে গোছগাছ করিতে লাগিল, কনকও অযাচিত ভাবে সকল কার্য্যে তাহার সহকারী ; বৈকাল বেলায় যে ছেলে তাহার আসিবে সেই আশায় সে উৎফুল্ল। বাসীমা সে বিষয়ে কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করিল না ; কনক অন্য সমস্ত বিষয়ে বাসীমার ইচ্ছা পালন করিবে কিন্তু এই একটি বিষয়ে সে একেবারে অটল, দ্বিধাসংকল্প, ইহার উপরই যে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, বাসীমার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য আছে বটে, কিন্তু, তাহার উপরও অন্যান্য কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

যথা সময়ে জ্যোতির্ম্ময় আসিয়া দর্শন দিল ; দুইজনে একটা ঘরে গিয়া বসিল, জ্যোতির্ম্ময়ের শরীর এ কয়দিনে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, সে যেমন চিরকাল তেমনিই রুক্ষ শুষ্ক হইতে সদ্য প্রস্ফুটনের ভাব, প্রত্যেক অঙ্গে, পরিচ্ছদে প্রকাশ করিতেছে ; তাহার সাধারণ ব্যবহারও লোকের মনে, কি কারণে জানি না, ঈর্ষ্যা করার যথেষ্ট জোগাইয়া দিত। কনক বলিতেছিল "পুতীর কথা জিজ্ঞেস করছেন। বেশ জায়গা, সমুদ্রের ধারটা আমার খুব ভাললাগে তবে সহরের ভিতরটা একেবারে জঘন্য, একেবারে কুসংস্কারের ছাড়া, যে দিকে চান একটা না একটা বীভৎস পৌত্তলিকতার নিদর্শন চোখে পড়বেই, বস্তিটা খুবই বড় কিন্তু তার মধ্যে সৌন্দর্য্য আমি মোটেই দেখতে পাই না, তবে বিশাল ভিত্তির তাই মনের উপর খানিকটা ছাপ রেখে যায়। আপনিও সেখানে আসেন, নিশ্চয়ই দেখেছেন না ?" জ্যোতির্ম্ময়—"হাঁ, তখন ছোট ছিলাম, বেশ মনে নেই" কনক "আমার ইচ্ছে হয় সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ী করে সমস্ত জীবন সেইখানে কাটিয়ে দিই" কনকের তরল দৃষ্টি জ্যোতির্ম্ময়ের মুখের উপর স্থাপিত, জ্যোতির্ম্ময় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "ভগবান করুন যেন আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারি" কনক, "কোন রকমেই যে কোনও হয়, সব যেন কাজ কর্ম্মে মেতে চলেছেন, আবার সেটা কর্ত্তে গেলেও বোকামীও হয়ে পড়ে।" এই সময়ে বাসীমা এক থাল খাবার লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল ; পশ্চাতে ঝি জলের গ্লাস ও আসন লইয়া আসিতেছিল ; বাসীমা জ্যোতির্ম্ময়কে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিল ; সে দুই একবার মৃদু আপত্তি করিয়া আসনে বসিয়া পড়িল ; এই আপাতদৃষ্ট অসৌজন্যের সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ; বাসীমাকে সে প্রথম হইতেই সন্দেহ করিয়া চলিত ; কনকের নিকটেও বাসীমার এই ব্যবহার অত্যন্ত শ্রীতিপদ হইয়াছিল, সে কখনও এতটা আশা করে নাই, আর ইহার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বাসীমা সেইখানেই দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময়কে যথাযোগ্য আপ্যায়িত করিতে লাগিল ; অবশেষে জ্যোতির্ম্ময়কে পানের ডিবাটী বাড়াইয়া দিতে সে বলিয়া উঠিল "না মাপ করবেন, আমি খাই না" বাসীমা ঈষৎ হাসিয়া বলিল "আচ্ছা আপনি যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার আজ দেখা করে যাবেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।" বাসীমা এই বলিয়াই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, কনকের মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে প্রশ্ন দৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে চাহিয়া কিন্তু দেখিল, যে সে যেন এই ব্যাপারে তত প্রীত নহে, কিসে যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে কনক তাহাকে যথোচিত উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; বাসীমা যে তাহার ভবিষ্যৎ পথের কণ্টক নহে এবং ইহার আজিকার এই কথা বার্ত্তার উপর তাহাদের দুইজনেরই সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, এইজন্য কনকও আবার ফিরিয়া কখনও বা এই কর্ত্তব্যের গুরুত্ব নির্দ্দেশ করিয়া সে এক প্রকার বল প্রয়োগেই জ্যোতির্ম্ময়কে বাসীমার ঘরে পাঠাইয়া দিল, এবং নিজে উদ্গ্রীব হইয়া ফলাফল জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল ; এই অল্পকালের মধ্যে বাসীমা

যাক যাবহারে সে যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে তাহার মন, খুব আশান্বিত; তাহার একটা বিশ্বাস হওয়া নিতান্তই যে বাণীবার জ্যোতির্ম্ময়কে আকর্ষণ করার তরু তাহারেরই কবিবার সম্বন্ধে একটা স্থির করা, বাণীবাকে মনে-মনেও অনেক ধন্যবাদ দিল। বাণীবা যে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে এই কথা তাহার মনে একবারও হয় নাই; ইহার প্রতিকূলে কিছু ঘটিতে পারে, সেইটা তাহার কল্পনার একেবারে অস্বাভাবিক, সেই জন্যই বলিতে অতি রসিক বেধায়, কারণ মানুষের ইচ্ছা চিরকালই [illegible]

জ্যোতির্ম্ময় কম্পিতপদে বাণীবার ঘরে প্রবেশ করিল। বাণীবা হাতের বই বন্ধ করিয়া তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল; তাহার পর দুইজনেই অল্পক্ষণ নীরব, ঘরের মধ্যে, পাশের বাড়ীর বাগান হইতে একটী প্রজাপতি উড়িয়া আসিয়াছিল, বন্ধ শার্সীর নিকটই সে ক্রমাগত উড়িয়া উড়িয়া বাহির হইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে, জ্যোতির্ম্ময়ের অন্যমনস্ক দৃষ্টি কার্য্যতারে একখণ্ড কাগজের উপর আপনাদের নিপুণতা পরীক্ষা করিতেছিল।

বাণীবা, বাধা তুলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "আজ্ঞা আপনার উদ্দেশ্যটা কি বলুন ত।" এই আকস্মিক প্রশ্নে সে প্রথমে বিব্রত হইয়া চুপ করিয়াই রহিল কিছুক্ষণ পরে আবার প্রশ্ন হইল "কনকলতাকে আপনি বিবাহ করিতে চান কি?" এবার বাধা হইয়া তাহাকে উত্তর দিতে হইল, নিজের কাছেই যে সে কিছু অত্যন্ত ছোট হইয়া পড়িতেছিল, সে উত্তর দিল "হাঁ"। বাণীবা "তবে এই মাসের মধ্যেই সব ঠিক-ঠাক করে ফেল, বিবাহ ত্রিশে তারিখে হবে।" জ্যোতির্ম্ময়—"এত তাড়াতাড়ি, বাবার অনুমতির জন্যেও ত অপেক্ষা করতে হবে" "কিছুদিন পরে কি বাবার অনুমতি পাবেন বলে আপনার মনে হয়?" জ্যোতির্ম্ময় এইবার কথা খুঁজিয়া, বলা বৃথা "না" বাণীবা—"তবে মনে রাখবেন অনুমতির অপেক্ষা করা বৃথা, আর আপনার বিবাহ-সম্বন্ধে বিলম্ব করা এখন বৃথা সময় নষ্ট করে কি লাভ, বিয়ে যদি এক-মাস মধ্যেই হয় তাহলে আমি বলি শীঘ্রই করে ফেলুন; আর কোনও আপত্তি আছে কি?" জ্যোতির্ম্ময়—"না, তবে এত তাড়াতাড়ি করা কি ভাল, একটা কিছু চাকরী যোগাড় করে নিই তারপর এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হবে এখন।" চাকরীটাই এখন সমস্যা, বিবাহের অনেক সময় আছে" বাণীবা "চাকরির জন্যে ভাববেন না, সে বিষয় আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত কর্ত্তে পারি, আমার নিজের কিছু আছে আর আমার কনক ছাড়া আর কোন আত্মীয়ই নেই, যা আছে সব ওরই—বিয়ের আগেই আমি সব লেখাপড়া করে দেব; এরপর আপনি শীঘ্র বিবাহ কর্ত্তে অসম্মত হবেন না।" জ্যোতির্ম্ময় এবার আর আপত্তি করিতে পারিল না, তাহার অদৃষ্টই যখন তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে তখন সেই বা কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে পারে, অবশ্য এত শীঘ্র কোনও মীমাংসা হওয়া তাহার মনঃপূত হয় নাই কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার অন্য গতি ছিল না।

জ্যোতির্ম্ময় যখন কনককে এই সংবাদ দিল, তখন তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না, প্রথম উচ্ছ্বাসে সে যে কি করিবে তাহাই ঠিক করিতে পারিল না, ঐশ্বর্য্যের একটী সীমাংসা হইয়া যাওয়া সে খুব অতিরিক্ত মনে করিত; সে দিন জ্যোতির্ম্ময় একটু বিলম্বে বিদায় গ্রহণ করিল; কনকের দ্রুত কল্পনা শক্তি যে সেইদিন কত স্বপ্নরাজ্য গঠন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ ব্যাপার।

বাণীবা ঘরের মধ্যে একা বসিয়া আছে, নিজেই বাচিয়া সে শাস্তি গ্রহণ করিয়াছে; কিসের আশায়? তাহার পুরস্কার কি? ভালবাসার লোকের জন্য স্বার্থত্যাগে যে আনন্দ তাহাই পুরস্কার। ঘরের মধ্যে তখন যেন অন্ধকার এমন সময়ে কনক ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, বাণীবা কোথায় আছে অনুমান করিয়া একেবারে কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল, বাণীবাও তাহাকে বুকের নিকট আকর্ষণ করাতে সে বাধা দিল না, একেবারে তাহার কোলে শুইয়া পড়িল।

যি লণ্ঠন লইয়া ঘরে ঢুকিতেই দেখিল বাণীবার নিমীলিত চক্ষু দিয়া অশ্রু অবাধে গড়াইয়া পড়িতেছে, আর কনকের চক্ষুও ছলছল করিতেছিল; একটা দোলার মাঝে দীপের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তুলিতে পারে নাই।

(১৫)

কনক আজ সমাজে যাইবে; ইন্দুল ছাড়ার পর এই তাহার প্রথম যাওয়া, বাসীমার অনুমতি হইয়াছে, বাসীমার নিকট অনুমতি আদায় করিবার কৌশল এখন কনকের আয়ত্ত,এই কয়দিনে সে তাহার বাসীমাকে এদেশের অন্য চক্ষে দেখতে শিখিয়াছে,সমস্তির আবরণের ভাব আর নাই তাহার স্থানে সরল বিশ্বাস ও প্রকৃতত্বের প্রতিষ্ঠিতা। জ্যোতির্ময় কনকের সঙ্গে যাইবে, বাসীমাকেও সঙ্গে যাইবার জন্য কনক অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছে, কিন্তু 'আর একদিন হবে এখন' বলিয়া বাসীমা তাহাকে আপাততঃ নিরস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

গাড়ী আসিলে দুইজনে সমাজে চলিয়া গেল, সেদিন খুব ভাল বক্তৃতা ছিল। সমাজ গৃহে প্রবেশ করিতেই কনকের দৃষ্টি তাহার এক পুরাতন শিক্ষয়িত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইল, ইনি আচার্য্য মহাশয়ের ভগ্নী এবং কনককে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; কিন্তু তাহাদের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, প্রার্থনাও আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং নীরব সভাস্থলের অধিক কিছুই সম্ভব হইল না।

সভাভঙ্গের পর শিক্ষয়িত্রী কুমারী মণিবালা পাকড়াশী,বা মিস্ পাকড়াশী একেবারে সকলকে ঠেলিয়া কনকের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহার একটা বিশেষত্ব ছিল,যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন, আশে পাশের পরিচিত লোকেরা সর্ব্বদা ব্যস্ত ও সশঙ্কিত থাকিত,তাঁহার কার্য্য প্রণালীর মধ্যে শৃঙ্খলা মোটেই ছিল না, লোকে যে কাজ কখনও আশা করে না, সেইটা করাই যেন তাঁহার অভ্যাস কিন্তু তিনি কখনও অপ্রতিভ হইতেন না; সকলেই তাঁহাকে সম্মানও স্নেহ করিত কারণ এই সব দুর্ব্বোধ্য আবরণের মধ্যে যে মানুষ ছিল সেইটা খুব খাঁটি ও করুণায় ভরা।

মিস্ পাকড়াশী আসিয়া একেবারে কনকের দুইহাত চাপিয়া ধরিলেন "কিগো, একেবারে ভুলে গেলে নাকি, এই কয়দিনে একবড় হয়ে উঠেছ;—এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে, আমাদের বাড়ীতে চল—যাবে না—সঙ্গে লোক আছে?" জ্যোতির্ময়ের আপাদমস্তক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"ইহাঁকে বাপ করবেন, অনেক দিনের পর দেখা—আমাদের খুব মেয়ের বিয়ে, কনক—বাড়ী পাঠিয়ে দেব ঠিক—মোটেই ভাববেন না—আসি, নমস্কার" কাহারও কিছু বলিবার সময় হইল না, মিস্ পাকড়াশী কনককে গ্রেপ্তার করিয়া একেবারে গাড়ীতে উঠিলেন অগ্রসর বৃদ্ধ আচার্য্য মহাশয় অপেক্ষা করিতেছিলেন, গাড়ী ছাড়িয়া দিল, কনকও একবার জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকাইয়া দেখিল যে সে মোটেই বিরক্ত হয় নাই,সেও অনেকটা নিশ্চিন্ত অনুভব করিল। মিস্ পাকড়াশীর উপর কেন চেষ্টা করিয়াও অধিকক্ষণ বিরক্ত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

আচার্য্য মহাশয়ের গাড়ী হইতে নামিতেই বেয়ারা আসিয়া খবর দিল যে নরেশবাবু বসিবার ঘরে তাঁহাদের অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিতেই নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল,এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কপালে চিন্তার রেখাগুলি আরও গভীর, মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্য্য ও কোমলতার অদ্ভুত মিশ্রনে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, তাহার উপর শরীরও বেশ সুস্থ ও সবল, সেই পাঁচজন বাহির করা, কেতাবকীট এখন অদৃশ্য, দেখিলেই জানা যায় সকল অবস্থায় সকল লোকেই এই ব্যক্তিকে পূর্ণ বিশ্বাস করিবে।

নমস্কারাদির পর মিস্ পাকড়াশী কনকের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিলেন "ইনি কনক যার আমার পুরাতন ছাত্রী —ইনি নরেশবাবু আমাদের নূতন বন্ধু, খুব অমায়িক লোক বিদ্বান্, এমন লোক সাধে মেলে না, আমাদের সমাজের মন তবুও এত উদারতায় আমরা মুগ্ধ, কোনও সঙ্কোচ করবার প্রয়োজন নেই" নরেশ নিজের প্রশংসায় লজ্জিত অনুভব করিতেছিল, সে বলিল "আজ আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি; আমি আবার মাস দুইয়েকের জন্যে কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি" আচার্য্য মহাশয় "কলকাতায় ফিরে এসে আবার নিশ্চয় দেখা করবেন, আপনাকে আমরা কখনই ভুলতে পারবো না, আপনাকে দেখে অবধি আমি বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধকার মনে করি না।"

মিস্ পাকড়াশী—"সত্য সত্যই কিন্তু আমরা এখন এক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছি, যে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু বেশী রকম নাড়াচাড়া করা দরকার হয়ে পড়েছে।"

নরেশ—"হাঁ, আমাদের মধ্যে এখন দুইদল—এক প্রাচীনের দিকে চোখ রেখে আক্ষেপোক্তি করে, আর যাকে যাকে আমরা তাদেরই সন্তান বলে গর্ব্ব করে; প্রত্যেক রীতিনীতির মধ্যে জোর করে একটা ব্যাখ্যা ঢুকিয়ে দেওয়াই যেন তাদের কর্ত্তব্য। আমি বাঙ্গালাদেশকে প্রাণভরে ভালও বাসি আমার আন্তরিক ঘৃণাও করি, আমরা চীৎকার করে বেড়াচ্ছি যে আমরা খুব বুদ্ধিজীবি জাত, আমাদের দেশে সোণা ফলে, আমাদের 'ভিলগ্রকোটী ভূজবলরক্ষবলে, একলা যোদের বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়' এসব সম্বৎসর হলো পুরানো হয়ে গেছে—আমরা পারি কি, নয় একটা কোন পুরাণে রাজার কালে তৈরী মূর্ত্তি দিয়ে বাসিকটা গবেষণা করা, না হয় চাণক্যের রাজনীতি কত জটিল ও সম্পূর্ণ ছিল, বা ঘষিয়া ভবিষ্যতের জন্যে তেবে তেবে শাস্ত্র করে গেছেন, 'সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহারা কত ঔদার্য্য ছিলেন, এই সমস্ত নিয়ে মাসিকে লেখা, কি বড় জোর একটা বই ছাপান।"

কনক উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে প্রশ্ন-করিল "আচ্ছা দলের ধরণটা কি রকম বল্লেন না?"

নরেশ একটু হাসিয়া আবার বলিতে লাগিল—"তাদের অবস্থা অনেকটা বান্দরের মত। অবশ্য কথাটা বড্ড বেশী শক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু উপমাতে কারুরই রাগ করা উচিত নয়—মানুষ বান্দরের চেয়ে অনেক উঁচুতে, তাই বান্দর মানুষকে না বুঝলেও তাদের অনুকরণ করে, তেমি এই দলের লোকেরা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে, তারা বন্দুকের গায় থেকে সমস্ত জিনিষই আমদানী করে ব্যবহার করে, আমাদের দেশের চালনীও টিনের কৌটা করে এসে বাজির হয়; এঁদের আবার একটা বিশ্বাস যে এরা জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলছেন—জিনিষটা কতখানি ঠিক তা ভাবলেই বোঝা যায় —যাই হোক আমাদের এখন একটা নড়বার দরকার হয়েছে, কোন 'দলেই' কিন্তু কর্ত্তে পারবে না।".

আচার্য্য মহাশয়—"যাই বলুন, বন্দুকের গায়ের আমদানী জিনিষ যতই অনিষ্টমূলক হোক তারাটা কিন্তু যে আমাদের খুব পুষ্টিসাধন করেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।"

মিস্ পাকড়াশী—"আমার বিশ্বাস ইংরাজী শিক্ষা আমাদের ভাষার উপকারই করছে, প্রথমতঃ লোকে ইংরাজীর মধ্যে দিয়ে ভাল জিনিষটা বলে, লেখে, তারপর বাংলাতে অনেক ভাব প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য বলে, লোকে ইংরাজী সাহায্য গ্রহণ করে কিন্তু ইংরাজী না থাকলে, নিরুপায় হ'য়ে বাংলার প্রকাশ কর্ত্তে চেষ্টা কর্ত্ত আর তাতে পরিণামে কৃতকার্য্যও হ'ত।"

নরেশ—"আমি এ বিষয়ে আচার্য্য মহাশয়ের দলে, আমার বোধ হয়, ইংরাজী ভাষার কাছে আমরা খুব বেশী ঋণী, এ ঋণ শোধ করা আমাদের ভাগ্যে নেই; প্রথম আমাদের মধ্যে উপযুক্ত ভাষা ও সুরের কথা 'ভাবের' দারিদ্র্যও অল্প ছিল না, কারণ আমরা বরাবরই জগতের সঙ্গে নিঃসম্পর্কীয় ছিলাম, এই সব 'ভাব' বাহিরের জগত থেকে আমরা ইংরাজী ভাষার মধ্যে দিয়ে নিই, তাই প্রকাশ করবার জন্যেও ইংরাজীর সাহায্য নিতে বাধ্য হই, কিন্তু হয় কি, যদি ভাষার মধ্যে প্রাণ থাকে তাহ'লে এই বিদেশী জিনিষটার বন্ধন কখনই টিকতে পারে না, তাই ক্রমশঃ এই ইংরাজী কথাগুলো উঠে যাচ্ছে কিন্তু তাদের 'ভাব' আমাদের ভাষার মধ্যে খাঁটি দেশী আকারে টিকে যাচ্ছে।"

আচার্য্য মহাশয়—"আচ্ছা এই দল ছাড়া তাহলে আর একরকম দলের সৃষ্টি হওয়া দরকার?"

নরেশ—"নূতন একটা দল আজ কাল আবার হ'য়েছে, তারা হচ্ছে নব্য বাঙ্গালী, তাহারা মুখে অবশ্য, প্রাচ্যও চায় না, পাশ্চাত্যও চায় না, কিন্তু তারা যে কি চায় সেটা নিজেরাই স্থির কর্ত্তে পারে নি, আধুনিকদের অনেক ছাত্রের মধ্যেই এরা বেশী, কিন্তু এদের একটা দোষ—যে রকম আদর্শ নেই, সেই জন্য তাদের মানসিক শিক্ষাও বড় অনুপযুক্ত। অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা দিলুম, আজ তবে আসি, দুমাস পরে আবার দেখা হবে, যদি বেঁচে থাকি—এত দিনের ক্রটি সব ভুলে যাবেন।"

নমস্কার করিয়া নরেশ প্রস্থান করিলে কতক্ষণ সকলেই নীরব তাহাদের মন হইতে যেন প্রাণ চলিয়া গিয়াছে; তাহার পর মিস পাকড়াশীর গলা শোনা গেল "এমন স্পষ্ট আমি কোটে দেখিনি,—আমার মনে হয় জীবনে একটা

শোক পেয়ে উনি এখন ঘরে গেছেন, নাহ'লে একটা বেশ ব্যবসাদার লোক হ'তে পার্তেন।"

কনক—"উনি কি করেন?"

মিস্ পাকড়াশী—"সেইখানেইত' যত গোলমাল, কিছুই করেন না কেবল ঘুরে বেড়ান, ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই যেখানে তিনি যাননি—বিষয় সম্পত্তি কিছু আছে, তাতেই বেশ ভবঘুরের জীবন কেটে যায়—সংসারে একা, কিন্তু লোকটা অগাধ পণ্ডিত।"

এইবার সভা ভঙ্গ হইল, মিস্ পাকড়াশী বাড়ীর গাড়ী করিয়া ভাবীকে তাহার আবাসে রাখিয়া আসিতে চলিলেন, পথে কনক তাহার সমস্ত কথা বলিল, শিক্ষয়িত্রীও সকল রকমে তাহাকে উৎসাহিত করিলেন; কনককে তাঁহার স্নেহ ও সহানুভূতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করিয়া এবং মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া তিনি বিদায় হইলেন।

সে রাত্রি কনকের ভাল ঘুম হইল না, অনেকরূপ ভাবনা আসিয়া তাহাকে পীড়িতা করিতে লাগিল।

সকালবেলা হইতেই সে জ্যোতির্ষয়ের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, মাঝে মাঝে কেবল সন্দেহের গভীর চিন্তাপূর্ণ বাকাগুলি তাহার মনে আসিতেছিল। মাসীমা সমস্ত দিন চেষ্টা করিয়াও তাহাকে কোন বিষয়ে আকৃষ্ট করিতে পারিল না; আহারের পর যখন সে বিরক্ত হইয়া আপনার ঘরে বসিয়াছিল তখন কনক তাহার পাশে বসিয়া নানা কথায় মাসীমার অভিমান ভাঙ্গিতে বসিল, তাহাদের মধ্যে মধুরতা এখনই বাড়িয়া উঠিয়াছে, মাসীমার এখন অভিমান করিবার পর্য্যন্ত সাহস হইয়াছে—দ্বিপ্রহর এই ভাবে কাটিয়া গেল।

বেলা চারিটার সময় কি আসিয়া খবর দিল, একজন ভদ্রলোক মাসীমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়, মাসীমাও এই সংবাদের অপেক্ষা করিতেছিল; তাহার পুরাতন থিয়েটারের ম্যানেজারের আজ আসিবার কথা আছে—তাঁহারই নিকট মাসীমার টাকাকড়ি, হিসাবপত্র থাকিত, আজ, কনকের বিবাহের পূর্ব্বে সেইগুলির একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিবার জন্য সেই তাঁহাকে আসিতে খবর দিয়াছে।

ম্যানেজারবাবু মাসীমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এই রমণীর মধ্যে যে কি পদার্থ আছে তাহা তিনি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অবগত ছিলেন সেইজন্য তাঁহার মত সম্মান আর কেহ তাঁহাকে করিত না; ম্যানেজার-বাবু আবার আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন "আপনার টাকা সব সঙ্গেই এনেছি; সুদে আসলে এখন এসার হাজার টাকা হয়েছে" এই বলিয়া তিনি একটী ছোট বাক্স হইতে 'নোট' বাহির করিয়া গুনিতে লাগিলেন।

মাসীমা—"আপনাকে আর গুনতে হবে না, আপনি সব ওইখানে রেখে দিন—আপনাদের এখন খবর কি সব?"

ম্যানেজার বাবু—"খবর আর কি, আপনি ত আমাদের সংস্রব একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন, নতুন দুএকটা যা নাটক বেরুচ্ছে, সেগুলো তেমন জমে না। তবে কলিকটার খুব উন্নতি হচ্ছে, আপনি চলে আসাতে যে কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা অবশ্য না দেখলে বুঝতে পারবেন না; নাটকে ভাল কথা থাকে, তা বলবার লোক নেই আর বায়োস্কোপগুলো হওয়াতে দর্শকও তেমন জমে না।

মাসীমা—"আসল কথা, নাটক তেমন উঁচুদরের না হলে, অভিনেতাও তৈরী হবে না; দেশের লোকে আদরও কর্ব্বে না—নাটক তেমন ভাল, আমি এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় দেখলুম না, তবে কতকগুলোর খুব ওজস্বিনী বক্তৃতা থাকে সেইটে ভাল করে বলতে পারলে, লোকে হাততালি দেয়, কিন্তু আমার মনে হ'তো না যে একটা আস্ত মানুষের অভিনয় কর্চ্ছি, যেন কারুর লেখা বক্তৃতা মুখস্থ বলে যেতে হচ্ছে; এতে বাঙ্গলা থিয়েটার কখনও ভাল হতে পার্বে না।"

ম্যানেজারবাবু—"সে কথা ঠিক—আপনাকে একটা কথা সাহস করে বলছি এটা আমার একটা অনুরোধ—আমাদের হাতে একটা নতুন নাটক এসেছে, সেটা খুব ভালই মনে হল, আপনি যদি কেবল এইটাতে সাহায্য করেন তাহলে অনেক উপকার হয়, আপনার হঠাৎ অভিনয় ত্যাগ করাতে দলকে দল কেপে গিয়েছিল, অনেকে আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করে চিঠিও লেখেন, অনেকের এখনও ধারণা, যে আমাদের সঙ্গে আপনার কোনও কলহ হয়েছে—আপনি এই একবার মাত্র আবার পার্ট নিন্।"

"মাসীমা—আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি যখন একবার

ছেড়ে দিয়েছি তখন আবার এর মধ্যে প্রবেশ কর্ব না আমার জীবনের গতি এখন একেবারে বদলে গেছে। আপনার কথা রাখতে আমি এখন অসমর্থ। আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তা জীবনে কখনও ভুলব না।"

ম্যানেজারবাবু কথার ভাবে বুঝিলেন যে, তাঁহার বিদায় গ্রহণ করিবার সময় হইয়াছে, তিনি আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বাহিরে তাঁহার গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি গাড়ীতে উঠিবার সময় দেখিলেন এক সুন্দর যুবক তাঁহারই দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া আছে; যুবক গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল সে জ্যোতির্ময়।

জ্যোতির্ময় প্রথম গাড়ীর বহরের দাঁড়ী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর ব্যাপার কি জানিবার স্বাভাবিক উৎসৌকাবশতঃ সে কোচম্যানকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোন বাবুর গাড়ী?"

"—থিয়েটারের ম্যানেজারবাবু, ওই যে সোণাপী আজ এইখানে থিয়েটার করছে, তার সঙ্গে দেখা কর্তে গেছেন।"

জ্যোতির্ময় একেবারে স্তম্ভিত, কনকের মাসীমা থিয়েটারের সেই বিখ্যাত অভিনেত্রী, এযে একেবারে অসম্ভব, কিন্তু কোচম্যানকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। এমন সময়ে ম্যানেজারবাবু গাড়ীতে উঠিলেন, সেও যন্ত্রচালিতের মত বাড়ীতে প্রবেশ করিল, দরজা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া, আবার উপর একটা মতামত গঠন করিবার মত অবস্থা এখন আর নহে, সমস্ত বিশ্ব যেন তাহার সাম্নে ওল্ট পাল্ট হইয়া গিয়াছে—সোণাপীর অভিনয়ের প্রশংসা ও সমালোচনা সে কতবার শুনিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তাহারই বন্ধুবর্গ সকলে মুখেই উৎসাহী, সেও উদাসীন ছিল না, বিখ্যাত অভিনেত্রীর বিষয়ে যুবকদল সকলেই নানারূপ অদ্ভুত গল্প বলিত, সেই সমস্ত গল্পের মধ্যে কেবল এইটুকু সাধারণ ছিল যে কোনটাতেই তাহাকে কোনও মন্দকার্য্যে জড়ী করা হইত না—সেই সমস্ত পুরাতন কথা জ্যোতির্ময়ের মাথার মধ্যে আবার জীবন্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিল সেই সোণাপী কনকের মাসীমা, সে এই সংবাদটা পরিপাক করিতে কষ্ট অনুভব।

কনক তাহার মুখ দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিল যে একটা অভাবনীয় কিছু ঘটিয়াছে, সে অতি বিচলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল "কি হয়েছে?"

জ্যোতির্ময় জোর করিয়া আপনার সমস্ত উপস্থিত বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া বলিল "আপনার মাসীমা কে তা জানেন?"

কনক—"কে—?"

জ্যোতির্ময়—"আপনিও তাহ'লে জানেন না, তিনি আমাদের রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত অভিনেত্রী।"

কনক—"হতেই পারে না, আমার মাসীমা কেমন লোক নয়, আপনি নিশ্চয় ভুল শুনেছেন, তাঁকে কখনও কোথাও যেতে দেখিনি।"

জ্যোতির্ময় তখন আদ্যোপান্ত সে কেমন করিয়া এই তথ্য জানিতে পারিয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিল —"তিনি অবশ্য সাধারণ অভিনেত্রীর মত নহেন, অনেক লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, আমি বলতে আমি তাতে তাঁকে উঁচু আসনই দিয়ে এসেছি।"

কনকের কাণে কিন্তু এই কথাগুলির একটাও গেল না; তাহার সমস্ত অঙ্গ তখন এই দারুণ সংবাদে শিথিল, কাছে একটা চেয়ার না থাকিলে সে মাটীতে পড়িয়া যাইত; তাহাই অবলম্বন করিয়া সে কোনরকমে দাঁড়াইয়া রহিল—যুবকও সে ত নরক, আর অভিনেত্রী তাহারাও সেই নরকের কীট, তাহার মাসীমা সেই অভিনেত্রী, এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এই সবের অর্থ কি, তাহার আবাল্যকাল শিক্ষা যে অভিনয়ের প্রতি ঘৃণা, তাহার মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে; এই কি তাহার অদৃষ্ট, তাহারই মাসীমা এই অভিনয় করে, আজিকেও যে সমস্ত শরীর পুলকিত হইয়া আসে, সে যাহাকে, যাহার আসনে বসাইতে যাইতেছিল, সেই এমন ছলনাময়ী, তাহার চোখে অন্ধ মেহ ছিল, বৃদ্ধা সংসারের উপর, আপনার অদৃষ্টের উপর, তাহার দুর্জ্জয় অভিমানের লক্ষণ; এতদিন সে একটা অভিনেত্রীকে স্নেহ করিয়া আসিয়াছে; বাল্যকালে ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রীদিগের উপদেশ, তাহার চরিত্রে গাঁথা হইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা বলিতেন,—রঙ্গমঞ্চগুলি এক একটী পাপের আড্ডা—আজ সেই সমস্ত, তাহার মধ্যে স্নেহ চীৎকার করিতেছে; কিন্তু দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিবার

লোক সে এম—বাসীর সমস্ত ব্যবহার আজ তাহার নিকট একটা অতি নীচ শঠতার আকর বলিয়া মনে হইল; এমন করিয়া সে তাহার সহিত চাতুরী করিয়া আসিয়াছে তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। কনকের কাছে এই অন্যায়টা একটা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার এই দুর্বলতা ক্ষণিক, এখন সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এ অন্যায়ের জন্য যে দায়ী তাহাকে জবাবদিহি হইতে হইবে: ঠিক এই সময় পরিহাসপ্রিয় নিষ্ঠুর ভাগ্য বাসীমাকে সেই ঘরে আনিয়া দিল; বাসীমা কনকের কাঠের মত শক্ত মুখের ভাব দেখিয়া ভীতা ও উৎকণ্ঠিতা হইয়া প্রশ্ন করিতেছিল, কিন্তু বাধা দিয়া সে কঠোরকণ্ঠে কহিল "তুমি থিয়েটারে অভিনয় কর্ত্তে—লুকিয়ে রেখেছিলে কেন?"

বাসীমা, নির্ব্বাক্, তাহার বিশ্বাস যে অতি ভয়ঙ্কর; কনক নির্দ্দয় বিচারকের কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"আমার সঙ্গে এই প্রবঞ্চনা করাতে তোমার কি স্বার্থ ছিল, জানি না, একদিন না একদিন মিথ্যা ধরা প'ড়তই তবে কেন ছেলে ভুলে সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছিলে?"

বাসীমা—"আমি সে পথ এখন একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।"

কনক—"তা হলেও এই প্রবঞ্চনাকে তুমি কিছুতেই সমর্থন কর্ত্তে পার না, আমি তোমায় বিশ্বাস করে আশ্রয় দিয়েছি। আর সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বো না, তোমায় ছেড়ে আমায় যেতে হবে, তাতে মরি বা বাঁচি।" কনক যেন তাহার দারুণ প্রতিজ্ঞা সেই মুহূর্ত্তে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুতোদ্যত, কক্ষের মধ্যে রুদ্ধ বাতাস তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই, বাসীমা কনকের কলুষিতা রমণী, যে তাহার জন্য সহস্র অপরাধ অনায়াসে মার্জ্জনা করিতে পারিলেও এই দোষের জন্য কখনই পারিবে না—বিশেষতঃ সে যে তাহার আপনার বাসীমা।

বাসীমা বিপন্ন বুঝিতে পারিয়া, প্রবল অদৃষ্ট তাহাকে লইয়া এমনিই খেলিতেছে; কিন্তু তথাপি তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার সুখ-দুঃখ সমস্ত এই চেষ্টার ফলাফলের উপর যে নির্ভর করিতেছে; আজ অভিনেত্রী-জীবনের সমস্ত শিক্ষা সম্মিলিত করিয়া সে নতজানু হইয়া কনকের সম্মুখে বসিয়া পড়িল; তাহার দুই চক্ষু দিয়া তখন ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত, তাহার মিনতিপূর্ণ চক্ষু ঊর্দ্ধে কনকেরই মুখে স্থাপিত, সে বলিতে লাগিল "আমার সমস্ত কথা শোন, তা'হলে আমার উপর দয়া হবে।"

কনক এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আরও বিরক্ত হইয়া পড়িল, এই বিড়ম্বনা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে তখন বাসীমা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "আমি তোমার বাসীমা নই।"

বুকের চাপা কান্না চাপিতে গিয়া তাহার গলার স্বর খুব উচ্চ হইয়াছিল, কনক এই নূতন অদ্ভুত সংবাদে যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াই তাহার বক্তব্য শুনিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল, এই রমণী যদি তাহার বাসীমা না হয় তাহা হইলে তাহার দায় যে অনেক লাঘব হইবে; জ্যোতির্ম্ময় নিরপেক্ষ দর্শক, তাহার মনের ভাব কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিতে প্রস্তুত নহে। অধর ঈষৎ প্রম্লান দৃষ্টি কেবল একজনের মুখ হইতে আর একজনের মুখে ভ্রমণ করিতেছে, কনকের ধৃষ্টতার নৈতিক বুদ্ধিও তাহার কাছে যেমন দুর্ব্বোধ্য, বাসীমার অসীম ধৈর্য্যপূর্ণ গভীর হৃদয়ও তাহার নিকট সেইরূপ দুর্গম, তিনজনের মধ্যে সেই কেবল অবিচলিত।

বাসীমা বলিতে লাগিল, "আমি তোমার বাসীমা মোটেই নই, তবে তোমার বাবা আমাকে সেইভাবে তোমার পরিচিত করে দিয়েছেন, তিনি জানতেন যে আমি বাসীমা না হলে তুমি আমার আশ্রয় অগ্রাহ্য করবে। আমি তোমার বাবার কি ছিলুম, তোমাকে ছেলেবেলায় আমিই মানুষ করেছি, নিজের সন্তান ছিল না, তোমার উপর সন্তান মায়া পড়ে গেল, সমস্ত যত্নটুকু দিয়ে আমি তোমাকে, বুকে করে মানুষ, তারপর একদিন তোমার মা, তোমায় আমার হাতে সঁপে দিয়ে সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন—তোমার বাবা অবশ্য খুব মা খেতেন, তাঁর স্নেহ কি রকম ছিল জানি না, কিন্তু ইা জানি কেন আমি তাঁর চোখের দিব্য মুখে দাঁড়াতুম, কিন্তু তোমার দিকে চেয়ে আমি সব সহ্য কর্ত্তুম,

জন্ম থেকে যে তোমার মানুষ হচ্ছি—একদিন কিন্তু তিনি বেশী নেশা করে আমায় মেরে তাড়িয়ে দিলেন, আমার মুখের সামনে বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল, শরীরের বেদনায় আমার মাথা গরম হয়ে উঠেছিল আমি যে দিকে চোখ চায় চলে গেলুম—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে হাঁপাইয়া পড়িল, তাহার সমস্ত শরীর তখন নীরব রোদনের আবেগে থাকিয়া থাকিয়া জোরে কাঁপিতেছে; কিছুক্ষণ সেই ঘরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই: সে আবার বলিতে লাগিল, "তারপর অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে অভিনেত্রী হয়ে উঠলুম, সেদিন স্বীকার করাই ভাল, পাপও কেআমাকে স্পর্শ করে নাই তাহা নহে (এইখানে সোর কুণ্ঠা আসিয়া তাহার গলা চেপিয়া ধরিতে চাহিয়াছিল, নারীর নিকট নারী, জীবন-মরণ সঙ্কট না হইলে এই দোষ স্বীকার করে না বিশেষতঃ যদি তাহাদের মধ্যে সমস্ত এই দুইজনের মত হয়—কিন্তু সে আজ নিজের উপর অত্যন্ত নির্দ্দয়, তাহার হৃৎপিণ্ড টানিয়া ছিঁড়িয়া বহুকাল হইতে যে কলঙ্কের মল পলাইতে হইবে)। —অনেকদিন নরকে বাস করেছি, কিন্তু যেদিন একবার উঠবার, ভাল হবার সুবিধা পেলুম, সেইদিন থেকে পাপের অনেক দূরে থাকতে আরম্ভ করেছি—তোমায় যখন আবার দেখলুম তখন আমার মৃতপ্রায় দেহ জেগে উঠল; আমি তোমাকে নিজের কাছে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেছি, তোমাকে যে আমি আমার নিজের মেয়ে মনে করি—জগতে আর কাকেও ভাল বাসিনি, তাই তোমায় আত্মপরিচয় দিতে সাহস করিনি।"

কমক একেবারে নির্ব্বাক্, এই অদ্ভুত কাহিনী তাহার সমস্ত চেতনাকে বিস্ময়ে পরিণত করিয়াছে; সে যাহা হউক একটা কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সোর্বী তাহার নিজের ভাগ্য এত শীঘ্র জানিতে উৎসুক নহে, যদি কমকের মন না গলিয়া থাকে, এখনও আশা আছে; তাহার শরীর প্রায় অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে অবশিষ্ট আত্মশক্তি একত্রীভূত করিয়া আবার আরম্ভ করিল—"আমি এখন তোমায় ছেড়ে বাঁচতে পারবো না, তোমারই মুখ চেয়ে, তোমাকে জীবনের শেষ অবলম্বন করে আমি আমার পুরানো পথ একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। তুমি যে আমার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে গেছ, সে বাঁধন খোলা যাবে না, আমায় তাড়িয়ে দিলে, আমি আর বাঁচিব না—আমি তোমার কাছে এখন আশ্রয় ভিক্ষা চাচ্ছি, যে কদিন বাঁচিব আমায় দাসী করে তোমাদের বাড়ীতে থাকিতে দিও, আমি আর কিছু চাই না।" সে দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকিল। এই কৌশলে সে নিজের অদৃষ্টকে কিছুক্ষণের জন্যও ফাঁকী দিতে চায়, বিচারবাণী যত বিলম্বে শুনা যায় ততই ভাল। কিন্তু আজ যে সে জয়ী আর তাহার সহায় হইয়াছে তাহার অভিনয়শিক্ষা;—যে পূর্ব্বদিক হইতে অনিষ্টকারী ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা অধিক, সেই পূর্ব্বদিক হইতেই তখন তাহার প্রাণ সঞ্চারক রশ্মি প্রথম প্রকাশ করে। কমক তাহার রাগ অপমান ভুলিয়া এই দুঃখী রমণীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল; রমণীর দুঃখ, প্রায়শ্চিত্ত ও তাহার প্রতি স্নেহ আজ একযোগে তাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে, করুণা ও সহানুভূতি দুইই ক্ষুব্ধপূর্ণ মাসীমার সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

কমক বলিতেছিল "মাসীমা; আমরা তোমাকে মাসী-মাই বলব, তোমার ওপর আর রাগ নেই, তুমি যতদিন ইচ্ছা আমার সঙ্গে থাকতে পার, আমার যদি এতটুকু বাঁধা গুঁজবার জায়গা থাকে, তার মধ্যেও আমি তোমার জন্যে খানিকটা রাখব; তোমার কাছে যে আমি এত ঋণী সেতো এতদিন জানতাম না, আর এত ভালবাসা তাও বুঝতে পারি নি"। তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিল; সেও মাসীমার স্নেহের মূল্য, আপনার ঈপ্সিত বস্তু পাইয়া সুখী—তাহার দাসী হইতে তাহার কোনও সঙ্কোচ নাই; মুখে প্রসন্নের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তথাপি ভয় আশঙ্কাজড়িত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি তা'হলে এ বাড়ী ছেড়ে যাবে না'কমক—"

কমক আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, তাহার মন অতীতে অতি দূরে তাহার মাতার মৃতস্মৃতির অন্বেষণ হইতে চমকিয়া ফিরিয়া আসিল, তাহার আত্মাভিমান আবার জাগিয়া উঠিয়াছে "না, সে হবে কেমন করে; আমার এখন কিছু ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে, আমি আজই মিস্ পাকড়াশীর সঙ্গে দেখা কর্ব। পরে যখন আমাদের নিজের বাড়ী হবে, তখন তোমাকে নিশ্চয় সেখানে নিয়ে যাব, সেটা যে আমার কর্ত্তব্য" এই

বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে সভয়ে চাহিয়া সে আবার বলিল "আমরা তোমার টাকা কিছুতেই দিতে পার্ব্বো না।"

সেই সরল ভাষাধা সতীর বিশ্বাস পূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় স্থির থাকিতে পারিল না, সে আপনার দৃষ্টি অবনত করিল, তাহার এই অপ্রত্যাশিত নিরুৎসাহ ভাবে কনক অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও বিরক্ত হইয়া একটু কর্কশকণ্ঠে আবার বলিল "না কিছুতেই পার্ব্বো না"

কথাটা যামীমার বুকে বেজে লাগিল, অল্পক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, কণ্ঠে আবেগের কোনও চিহ্নই ছিল না "তোমার কাছে আরও একটা দোষ স্বীকার কর্ত্তে হবে; মনে করে ছলুম এটুকু বলব না, কিন্তু না বললে এ দোষ রেখেই যাবে—যখন রাগ করে চলে আসি তখন তোমার যার সমস্ত গহনা নিয়ে পালিয়ে যাই, চুরি করার ইচ্ছা ছিল না কেবল রাগের মাথায় কাজটা করে ফেলুম, তবে বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে তোমার সমস্ত ফিরিয়ে দেবো; নিজেকে চোর বলে ধরা দিতে ইচ্ছা ছিল না কিন্তু সমস্ত না বলিলে তুমি যখন নিজের জিনিষই নেবে না, তখন আমার স্বীকার করাই ভাল;—এখন বোধ হয় আর কিছু আপত্তি হবে না—"

কনক—"দেখ যামীমা লোকে মিথ্যা কথা অনেক উদ্দেশ্য থেকে বলে, সখ করে ঘাড়ে দোষ নেওয়া, উদ্দেশ্য ভাল হতে পারে—কিন্তু নিজের উপর এ অত্যাচার করবার অধিকারও কারুর নেই; মিথ্যা সব সময়েই খারাপ।"

যামীমা—"সত্য বলছি আমায় বিশ্বাস কর এই সমস্ত তোমার যার, আর কারুর নয়, আমার কাছে এখনও তার একটা নিদর্শন আছে, এনে দেখাচ্ছি" যামীমা ত্বরিতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

জ্যোতির্ম্ময় এতক্ষণে প্রথম কথা কহিল—"যখন জানা যাচ্ছে সমস্তই আপনার মার তখন আর কোনও আপত্তি করা ঠিক নয়।"

কনক জ্যোতির্ম্ময়ের নিকট সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের কথা আশা করিতেছিল, সে বলিল "আপনি বুঝতে পারছেন না, ভালবাসা ওকে অন্ধ করেছে ওর জ্ঞান বুদ্ধি জ্ঞান লোপ করে দিয়েছে।"

"অত আমি বুঝি না লোকে নিজের ধন আবার ফেরে নেয় নাকি" এই বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় আবার নীরব রহিল।

যামীমা ঘরে প্রবেশ করিয়া একটা কাগজে মোড়া ধন কনকের হস্তে দিল, তাহার মুখের ভাব দেখে নিশ্চিন্ত জয় বিষাদে সেরাপত্তির যেমন হয় ঠিক সেইরূপ।

সোনার বোতামটী লইয়া কনক দেখিতে লাগিল, নির্ম্মাণের বিশেষত্ব অলঙ্কারের সম্মুখের পরপারে অক্ষরগুলি নির্দ্দেশ করিতেছিল; দুইটী সর্প বৃত্তাকারে বিলম্বিত হইয়াছে, তাহাদের দেহের শল্কগুলি, অতি অল্প নৈপুণ্য সহকারে গঠিত, কতকগুলি চন্দন বেশ চোখে পড়ে অন্যগুলি কতিপয় অক্ষরের সমাবেশ—একটী সর্পের উপর মিঃ রায়ের ও অন্যটীর উপর কনকের মাতার নাম এইরূপে খোদিত ছিল। এই অলঙ্কার মিঃ রায় বিলাত হইতে ফিরিবার সময় অতি অনুরাগের সহিত স্ত্রীর জন্য আনিয়াছিলেন; তখন অবশ্য তিনি অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন—কনক আর যামীমার কথা অবিশ্বাস করিতে পারিল না, সে আপনার পরাজয় নীরবে স্বীকার করিয়া লইল—তাহাকে এই নারীর চরিত্র একেবারে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার প্রাণায়ন তাহাকে এই অবস্থায় এবং এইরূপে প্রত্যর্পণ করাটা যে কতখানি বন্ধুত্বের পরিচায়ক তাহা লোক চরিত্রে অনভিজ্ঞ কনকও বুঝিয়াছিল।

(১৬)

জ্যোতির্ম্ময় ও কনকের মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল; টেবিলের দুই পাশে দুইটী চেয়ারে তাহারা পরস্পরের মুখোমুখী উপবিষ্ট, জ্যোতির্ম্ময়ের মুখে একটা ছায়া পড়িয়াছে, কথাটা যেন তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন সে বলিতেছে "আপনি মনে কর্ত্তেন যে আমি চেষ্টা করি না, তা নয় আমি খুবই চেষ্টা করি কিন্তু কই সুবিধামত চাকরীর সন্ধান একটাও পেলুম না—টাকা গ্রহণ করাও বিবাহের আগের দিন হবে, এত আগে কিছু দরকার নাই, তখন এক সঙ্গেই প্রায় জীবনের দুটো বড় কাজ করে ফেলা যাবে।"

কনক—"আপনি বিবাহের পর কলিকাতায় থাকিবে বাবার কথা বলছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়, এইখানেই থাকা ভাল, তিনজনে যেন একসঙ্গে থাকা যাবে, তোমার মতন

জায়গায় আমার যাব, বাসীমাও কোথাও বেরুতে ভরসা পছন্দ করে না ; বাড়ীটার ওপরও একটা মায়া হয়ে গেছে।"

জ্যোতির্ময়—"এসব ঠিক করার এখনও অনেক সময় আছে ; দুজনে মিলে একটা কিছু স্থির করে ফেলা যাবে, এখনও এক সপ্তাহ আছে।" জ্যোতির্ময় এই বলিয়া সহাস্যে অনকের দিকে চাহিল, তাহার মুখ তখন গোলাপের মতন লাল হইয়া উঠিয়াছে ; সে নিজেই ইহা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় মাথা নীচু করিল ও অঙ্গুলী দ্বারা টেবিলের উপর অর্থহীন কি সব লিখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

এই সময়ে বাসীমা সেই ঘরে প্রবেশ করাতে কনক উঠিয়া গিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল, সে সস্নেহে তাহার কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "কি কথা হচ্ছিল, ঘরকন্না-পাতার সূচি ; তা যে রকমই বন্দোবস্ত কর আমি ঠিক সঙ্গে থাকব, আমার ফেলে কিন্তু হবে না" কনক প্রত্যুত্তরে পিঠে একটী ছোট কীল মারিল, সেটী কিন্তু জ্যোতির্ময়ের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই, সে দুইজনের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা আদৌ সহ্য করিতে পারিত না। একে প্রথম প্রথম সে বাসীমাকে যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলিত কিন্তু যখন জানিল যে বাসীমা, বাসীমা নহে, পুরাতন দাসী মাত্র, তখন সে তাহার প্রতি এতদ্বাতীত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নিজেই লজ্জিত বোধ করিত এবং সেইজন্য দোষী সাব্যস্ত হইল সেই বাসীমাই—সে একটু গম্ভীর কর্তৃত্বের সুরে বলিল "সেটা এখনও ঠিক করা হয় নি ; তোমার বিষয় অবশ্য একটা ব্যবস্থা করা হবে, এত ব্যস্ত কেন," কথাগুলির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন কঠিন ইঙ্গিত ছিল, তাহাদের মধ্যে সম্পর্কটীকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাসীমা হঠাৎ ফ্রতপদে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল, বাহির হইতে কেবল তাহার গলার আওয়াজ আসিল, "অনেক কাজ আছে, যাই তাড়াতাড়ি সেরে ফেলিগে।"

অকস্মাৎ কক্ষমধ্যের একটা কারণ বুঝাইবার চেষ্টা-মাত্র। তার পর কনক ও জ্যোতির্ময় দুইজনেই নীরব, কে আগিয়া কেহ তাহাদের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কে যেন একটা অটল নীরবতার ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। এই যে কৃতীয় ব্যক্তি যাহাকে তাহারা কিছুদিন আগেও আপনাদের সুখদুঃখের মধ্যে গণনাও করিত না, তাহার আজ এমন কি ক্ষমতা হইল যে সে দুইজনের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য অদৃশ্য রেখা এমনভাবে টানিয়া দিবে। অনেকক্ষণ পরে, অনেক চেষ্টার পর জ্যোতির্ময় প্রথম কথা কহিল, "এখন তবে আসি কালকে সব ঠিক করবো।"

"কনক নীরবে ঘাড় নাড়িল, ইহা যে তাহার সম্মতি না অসম্মতির লক্ষণ তাহা অবশ্য বোঝা গেল না, জ্যোতির্ময় ধীরে বাহির হইয়া গেল, একটা দাবানলের মত ক্রোধ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে এরূপ কুণ্ঠা কেন তাহার, একটা সামান্য দাসীর জন্য তাহাকে এমন আত্মসংযম হারাইতে হইল, এইরূপ চিন্তায় সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত অনুভব করিতেছে এবং তাহার ক্রোধের ও মূলের ইন্ধনের সন্ধান হইল ; নিজেকে বড় চোখে দেখা তাহার একটা স্বভাব এবং একটা দাসীর জন্য সে এত খাটো হইয়া গেল, যে কোনও রূপে কনকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে নাই, ইহা সহ্য করা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

অহঙ্কার মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ দোষ, কিন্তু এই সাধারণ জিনিষটার মধ্যে একটা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব থাকে সেইটাতে আঘাত না পড়িলে অহঙ্কার আত্মপ্রকাশ করে না ; কোনও লোকের অহঙ্কার আপনার কবিত্বশক্তির মধ্যে আবদ্ধ, সেই ব্যক্তিকে মুখের সম্মুখে নানারূপ নিন্দা করিলেও সে বাক্‌নিষ্পত্তি করিবে না ; আর নিন্দার অবিচলিত ভাবে লোকের মনে এই ধারণা জন্মিবে যে এই ব্যক্তি অত্যন্ত নিরহঙ্কারী, কিন্তু তাহারই কবি প্রতিভার যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ কেহ মুখফোরেও প্রকাশ করেন, তাহা হইলেই সমূহ বিপদ ; সম্পাদক বাহাদুর এই সব আস্যা যে হাসিমুখে শুনিয়াছে, সামান্য 'নীরদ' এই বিশেষণে সে এত অভিভূত কেন ? ইহা সূক্ষ্ম মানবচরিত্রের রহস্য।

জ্যোতির্ময় কখনও সহজে অপ্রস্তুত হইত না, সে কখন কথোপকথনের মধ্যে রাগিত না, শিষ্ট সামাজিক আলাপে কথার অভাবও অনুভব করিত না, এইখানেই তাহার অহঙ্কারের বিশেষত্ব ; তাহাই মনে মনে সে তাহার সকল বিড়ম্বনার কারণ এই নারীটিকে নিজের পথ হইতে সরাইবার উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত।

আর সেই নারী, যে এই সমূহ আন্দোলনের নির্দোষী কারণ তাহার অবস্থাও শোচনীয়। অনেক কষ্টে যে স্বার্থত্যাগের জন্য সে আপনাকে বাধ্য করিয়াছে, যে বিরাট কাজ সে নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, তাহাতে এই পদে পদে কষ্ট একান্ত অসহনীয়, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত।

একজন বিখ্যাত চিত্রকরের একটী ছবির বিষয় একটী শোক দুঃখে কিন্তু ধৈর্য্যশালিনী নতজানু হইয়া প্রার্থনায় প্রবৃত্ত, তাহার সমস্ত প্রাণ বিনতির জীবন্তরূপ ধারণ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধ আকাশে ভক্ত উচ্চে সমাবিষ্ট হইয়াছে। বিপুল চুলিকা তাহার অবরোহের মৃদু কম্পন পর্য্যন্ত ফুটাইয়াছে. সেই প্রার্থনারতার মুখের বাঁকা চিত্রের নীচে লিখিত "Lord my cross is too heavy to bear—প্রভু, আমার দুঃখ আর বহিতে পারি না যে" গোলাপীও নতজানু হইয়া বসিয়াছিল, তাহার মুখ তখন ঠিক সেই চিত্রাঙ্কিত রমণীর ন্যায়। তাহার চোখের জলেরও বিরাম নাই; সে সমস্তই ত্যাগ করিয়াছে, কোনও ছল করা মেকি দাবী করিতেছে না; কিন্তু এই বিচ্ছেদ আঘাত কেমন করিয়া সহ্য করিবে; ওগো সে যে তাহার সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছে, নিজেকে দাসী করিয়াছে।

কমল এখনও সেই ঘরে সেই ভাবেই বসিয়া আছে, জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া যাইবার পর সে একবার চোখের পলকও ফেলে নাই—এতক্ষণ একস্থানে স্থির হইয়া থাকা তাহার স্বভাবের বিপরীত; দিনের মধ্যে অন্ততঃ কুড়িবার তাহাকে ললাটের উপরিস্থ একগুচ্ছ অলকের বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত দেখা যাইত, কিন্তু এখন সেই অলকগুচ্ছ তাহার মুখের চোখের উপর নির্ব্বিবাদ লুটাপুটি খাইতেছে, তাহার লক্ষ্যই নাই, ঘুইবার শক্তি কিম্বা অবসর মনের অবস্থা আজ তাহার নহে।

গোলাপী সেই ঘরে প্রবেশ করিল, কমলের কাছে গিয়া ডাকিল "কমল", সব কমলের কানে অবশ্য গিয়াছিল, কিন্তু সে কোনও সাড়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই, নীরবে যেমন বসিয়াছিল তেমনিই রহিল; গোলাপী এবার অতি সন্তর্পণে তাহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল "ঘা, একটা কথা রাখবে আমার" কমল অতি বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?" গোলাপী—"আমায় বাঈজী বলে ডেকো না, আমার নাম গোলাপী, তাই বলে এবার থেকে ডেকো কেমন" কমল নিরুত্তর; গোলাপী তখন আবার জিজ্ঞাসা করিল "কেমন, তাই হবে ত" কমল এবার রাগিয়া উঠিল "এই কথা নিয়ে এত কি হয়েছে, বাদি বাদি আমায় জ্বালাতন করোনা।" এই বলিয়া সে সজোরে কক্ষ পরিত্যাগ করিল—গোলাপী এই ব্যবহারের কি অর্থ বুঝিল তাহা সেই জানে।

জ্যোতির্ম্ময় পরদিন সমস্ত বিষয়ে কৃতনিশ্চয় করিয়া উপস্থিত হইল; তাহার চরিত্রের বিশেষত্বই এই ছিল যে কোনও বিষয়ে মীমাংসা করিতে বা কোনওরূপ ঘটনাস্রোতে ভাসাইয়া পড়িতে সে একেবারে বিমুখ, যতদিন না কোনও ব্যবস্থা হয় ততদিন সে যেন থাকে, তীরে দাঁড়াইয়া ঘটনাস্রোতের গতি লক্ষ করাই তাহার প্রিয় কার্য্য; কার্য্য পরিণতির পূর্ব্বে পর্য্যন্ত যে বিশৃঙ্খলা স্বাভাবিক, তাহাই তাহার প্রকৃতির উপযোগী। কিন্তু আজ সে আপনার তন্দ্রা ভাঙ্গাইয়া নিজের স্বভাবে একটু বৈষম্য ঘটাইল, জীবনে যখন কোনও ব্যক্তি নিজেকে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন মনে করে তখনই তাহার মধ্যে এই বৈষম্য লক্ষিত হয়।

জ্যোতির্ম্ময় বিবাহ, দীক্ষা, ভবিষ্যৎ জীবন প্রণালী সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে—তাহার প্রথম কার্য্য হইবে, যে রমণী জ্যোতির্ম্ময়ের স্বাভাবিক শিষ্ট ব্যবহারের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ চঞ্চলতা আনিয়া দিতে পারে, তাহাকে স্থানান্তরিত করা; তাহার ভাবী স্ত্রীর সহিত কোনও সংস্রব যেন সেই রমণীর না থাকে।

গোলাপী সিঁড়ি দিয়া নীচে আসিতেছিল, নীচে জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, জ্যোতির্ম্ময় গলাটা ঝাড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিল "একটু কথা আছে" গোলাপী ঘাড় ফিরাইয়া নীরবে উৎসুক দৃষ্টি তাহার মুখে স্থাপিত করিল।

জ্যোতির্ম্ময়—"এই কথা গুলি অবশ্য আমাদের দুইজনের মধ্যে, কমলের জানবার কোনও প্রয়োজন নেই।"

দাসীরা একটু অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িল, জ্যোতির্ময় পুনরায় বলিতে লাগিল,—"আসল কথা হচ্ছে, আমি চাই না যে আমার ভাবী স্ত্রীর সহিত কোনও একটা অবাঞ্ছনীয় প্রেম জড়িত থাকে; কথাটা খুব সোজা, তোমার এখানে থাকা হবে না; সমাজে এই নিয়ে একটা নিন্দার বিষয় হবে। কনককে যারা স্নেহ প্রদ্ধা করে তাদের সকলেরই কর্ত্তব্য এই বিষয়ে সাবধান হওয়া, আমি আমার অংশটুকু করলাম।"

গোলাপী আর অপেক্ষা করিল না, কথা শুনিতে শুনিতে তাহার মুখ পাথরের মত শক্ত ও ভাবহীন হইয়া গিয়াছিল—বিচারকের কঠিন আদেশ প্রাণদণ্ড, বন্দীকে সমস্ত দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল।

জ্যোতির্ময় সাহস করিয়া কনকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না; অনেক চিন্তা করিয়া, সাহস ফিরিয়া আসিবে, এই আশায় সে তখনকার মত যেমন আসিয়াছিল, তেমনই ফিরিয়া গেল। কনক কিছুই জানিল না।

(১৭)

কনক সেদিন প্রভাত হইতেই অত্যন্ত অস্থির অনুভব করিতেছিল, জীবনের শান্তি আজ সমস্তই অপহৃত, যে অবস্থায় সে আসিয়া পড়িয়াছে তাহার মধ্যে জটিলতা এত অধিক যে নিজেকে তাহার মধ্য হইতে উদ্ধার করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য, আবার সেই চেষ্টা না করিলে সেও সরিয়া হইতে পারিতেছে না; তাহার নিজের আন্তরিক বাসনা সে নিজেই অবগত নহেন, কেবল এক অনির্দ্দিষ্ট অসন্তোষ তার তাহার মনকে পূর্ণ করিয়া তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

এই অবস্থায় সে ঠিক করিল যে মিস্ পাকড়াশীর নিকট পরাজিত হওয়াই সমীচীন, তাহার উপর আবার আর এক বিপত্তি, গোলাপীকে লইয়া। কনক আপনার অজ্ঞাতসারে তাহাকে যে কতটা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে তাহা অনুমানও করিতে পারে নাই,—বোধ হয় প্রকৃতি অলক্ষ্যে বসিয়া আপনার শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেছিল। কনক স্থির করিল গোলাপীকে তাহার সঙ্গে লইয়া যাইবে, পূর্ণ মনের ব্যবহারের জন্য সে নিজেই অনুতপ্ত, মর্ম্মাহত।

কনক এবার ওধার অনেক খুঁজিয়াও যখন গোলাপীকে দেখিতে পাইল না, তখন তাহার গলাটা হঠাৎ বন্ধ করিয়া আসিয়া উঠিল; তাহার এখন বিশ্বাস যে সকলে মিলিয়া তাহার উপর অবিচার করিতেছে, তাহার প্রত্যেক সাজসজ্জা ও বাসনার শত শত বাধার সৃষ্টি করিতে সকলে ব্যস্ত; দাসীদের ঘরে দাসীদাকে দেখা গেল না; গোটা কয়েক কাপড় ও একটী ছোট বাক্সও দেখা গেল না; জীবনে শান্তি বলিয়া যেন কোনও বস্তুর সাক্ষাৎ কনকের অদৃষ্টে নাই, নীরবে বসিয়া সে নিজের দোষ, দুঃখ ও অভিমান উপভোগ করিতে লাগিল।

জ্যোতির্ময় ঘরে ঢুকিতেই, কনক প্রশ্ন করিয়া উঠিল "কি?" যেন তাহার আগমনের একটী ব্যতীত অন্য হেতু থাকিতে পারে। জ্যোতির্ময় এইরূপ অদ্ভুত আচরণ কখনও কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই, সে স্তম্ভিত হইয়া গেল, আজ যে সে তাহার স্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রতা বিসর্জ্জন দিয়া কনককে সুখী করিতে আসিয়াছে। কনক সুলতায় বলিতে লাগিল, "আচ্ছা দেখেছেন মানুষটার কিরকম ব্যবহার, একে বারে বিনিময় পত্র নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন, জিজ্ঞাসা করা দূরের কথা সংবাদ দেওয়াটাও প্রয়োজন মনে হয় নি। পরের মনে যে কতটা আঘাত লাগে তা কেউ বোঝে না, আমাকে একটা মানুষ বলেই ধরা হল না, খুসী হল আর নির্ব্বিকার চিত্তে ছেড়ে চলে গেলেন"

জ্যোতির্ময় সান্ত্বনার সুরে বলিল "আপনার পুরোনো স্ত্রির কথা বলছেন, সে বেশ ভালই হয়েছে, সময়ান্তে পরে এই নিয়ে একটা কথাবার্ত্তা হোতো, সেই বুঝে আমিই ওকে যেতে বলে দিই, যাক সে সব কথা; আমি একটার সব ঠিক করে ফেলেছি, আচার্য্যের সঙ্গে আজই দেখা করা যাক—"

কনক শেষের কথা গুলি কানেই তুলিল না, সে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকাইয়া রহিল—অনেক সময় স্তব্ধ, ঘরে একটী সূচ পড়িলেও বোধ হয় তাহার শব্দ শ্রুতিগোচর হইত, তাহার পরই শোনা গেল কনক খুব

সংযত স্বরে কথা কহিতেছে, ভিতরে যে ঝটিকা বহিতেছিল তাহাকে সে অতি কষ্টে অন্তরের মধ্যেই অবরোধ করিতে সমর্থ; সে এখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, জ্যোতির্ম্ময়ের মনে হইল যেন অনেক উচ্চস্থান হইতে কনক তাহাকে বলিতেছে "আপনি কি অধিকারে তাকে আমার বাড়ী থেকে তাড়িয়েছেন?"

জ্যোতির্ম্ময়ের শেষ চেষ্টা, সে মিথ্যা আত্মনির্ভরতা প্রকাশ করিয়া নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে "তাকে ঠিক তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি—আর আমি তবিষ্যৎ জেনেই কাজ করেছি; আর ভাবী স্বামীর দোষ ধর এতটুকু অধিকার আছে—" শেষ দিকটা খুব অভিমানের সুরেই বাহির হইয়াছিল, যদি কনকের মন গলে, এই আশায়। কিন্তু ফল যাহা হইল তাহা দুইজনের কেহই, এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বপ্নেও ভাবে নাই।

মানুষ আপনার সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা করে, একজন নিজেকে একটী মস্ত সাধুপুরুষ মনে করেন, তাঁহার জীবনের সমস্ত কার্য্যাবলী সজ্জনোচিত, মহত্বের পরিচায়ক, এইটা তাহার ধ্রুব সত্য; হয়ত এই ব্যক্তির ভ্রম এজীবনে আর ভাঙ্গিল না, সে আপনার নিকট এবং অন্য সকলের নিকট সাধু হিসাবে জীবন কাটাইয়া দিল। কিন্তু জীবনে এমন একটা পরীক্ষার মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয় যখন বাহিরের এই মহত্বের চক্‌ আবরণ খসিয়া চুরমার হইয়া যায় আর তখন প্রকৃত ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে; যে এতদিন সাধু বলিয়া নিজেকে জানিত সে আপনার বিষয় বুদ্ধি ও কূটনীতি পরাবশতা দর্শনে নিজেই স্তম্ভিত ও চকিত;—এই গেল সাধারণ জীবনের কথা আমার আমাদের মহত্তর জীবনের একটা বিশেষ অংশ আছে, যেখানে, আমার বিশ্বাস, সমস্তই এই নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণার উপর চলিয়াছে, প্রেম ও ধর্ম্মবিশেষে মিথ্যা এই অংশের মধ্যে পরিসমাপ্ত। একজন ব্যক্তির মনে যেমন করিয়া হউক একবার ধারণা হইল যে সে আর একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে ভালবাসিয়াছে, তাহারপর তাহার সমস্ত কার্য্য কলাপে স্বভাবতঃই পূর্ব্বরাগের সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হইবে; কিন্তু এমন একটা অবস্থা হইতে পারে যখন তাহার পূর্ব্বাপর সমস্ত ভাবের একটা সুসঙ্গতি মিলায় ঘটে; প্রকৃত ব্যক্তি তখন এই ভ্রান্ত ধারণার রচিত কারাগৃহকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাদা চোখে সমস্ত দেখিয়া লয় ও চীৎকার করিয়া উঠে "ওঃ আমি যে ওকে ঘৃণা করি।"

কনক জ্যোতির্ম্ময়ের মুখের দিকে সোজা চাহিয়া বলিতে লাগিল "আপনাকে আর আমার ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে না, আপনার সহিত আমার বিবাহ অসম্ভব; বাপ করবেন" জ্যোতির্ম্ময় নিশ্চল পাষাণের মত হইয়া গেল, সে নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতেছিল যে এই বারই কনক অনুতপ্ত হইয়া কাতর কণ্ঠে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, কিংবা শোকাভিভূত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানের ও পুনর্বিলনের সুযোগ দিবে, কিন্তু কনক প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্থির অটল দাঁড়াইয়া রহিল তাহার কপালের উপর কয়েক গাছি চুল কেবল তাহার মুখে চোখে পড়িয়া তাহার বৃদ্ধি আকর্ষণের বৃথা চেষ্টা করিতেছিল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না।

অপমানটা এবার জ্যোতির্ম্ময়ের মনে সজোরে লাগিয়াছিল, কি কথা বলিবার উদ্যম করিয়া সে আবার আত্মসংবরণ করিল। বিবাহের আশা যখন একেবারে দূরীভূত তখন মুখে মুখে একটা কলহ করিয়া কোনও লাভ নাই, তবে কেন মিছামিছি অশান্তি বাড়ান এইরূপ ভাবিয়াই সে নিরস্ত হইল। তাহার পর একটী সংক্ষিপ্ত নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

কনকের আর বসিয়া চিন্তা করিবার সময় নাই, গোলাপী যে দুর্জ্জয় অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই ভাবনা তাহাকে কশাঘাত করিতেছে; যে এত স্নেহ, এত যত্ন দিয়া তাহাকে চাকিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে সে যে দুর্ব্বিসহ বেদনা নিষ্ঠুর অকরুণ আচরণে মর্ম্মন্তুদ করিয়াছে; তাহার ব্যবহার সংশোধনের সুযোগ অপহরণ করিয়া গোলাপী যে বিনাবাক্য ব্যয়ে তাহার বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, এইসব ভাবনায় সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; সে যে নিজের কাছে এমন ভাবে ছোট হওয়া কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না।

পুরাতন ঝিকে ডাকিয়া কনক তাহার নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ অবগত হইবার চেষ্টা করিল। ঝি প্রথমে কিছু জানে না বলিয়া তাহাকে বিদায় করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, গোলাপী

যে যাইবার সময় তাহাকে পুনঃপুনঃ সমস্ত বলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার এই গোপন করিবার প্রয়াস বৃথা, কনক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মনের ভাব জানিতে পারিয়াছে; বারংবার পীড়াপীড়ি করাতে অবশেষে ঝি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "এই নিন্ মা, এই কাগজে তাঁর ঠিকানা লিখে দিয়ে গেছেন, যাবার সময় বল্লেন,—তোর ইচ্ছে হয় তাহলে আমার কাছে আসিস্—আমি আজই চল্লে যেতুম। —আপনি গেলে কিন্তু বড় দুঃখী হবেন, মা, তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন"

কনক আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না; সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে চাকরকে একটী গাড়ী ডাকিতে আদেশ করিয়া সে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল; টাকাকড়ি, অলঙ্কার সমস্তই তাহার নিকটেই ছিল; সোলাপীর আগ্রহাতিশয্যে সে এইগুলিকে আপনার নিকট রাখিতে সম্মত হইয়াছিল, সোলাপীর নিকট কেবল মাসিক খরচের মত টাকা থাকিত তাহা জানিয়া এবং কলিকাতার মত স্থানে নিঃস্ব রমণীর অবস্থা কল্পনা করিয়াই কনকের বুকের মধ্যে ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছিল। আজ সে সমস্ত বাঁধিয়া লইল তাহার পর মোটা শালে দেহ আবৃত করিয়া নীচে নামিয়া গেল। গাড়ী নীচেই অপেক্ষা করিতেছিল, চাকর আসন হইতে কোচ-বক্সে উঠিয়া বসিল।

(১৮)

একটী সঙ্কীর্ণ কানাগলি, তাহার মধ্যে কোনওরূপে গাড়ী ঢুকিতে পারে না; তাহারই মধ্যে একটী ছোট একতলা বাড়ীতে সোলাপী আশ্রয় লইয়াছে; গৃহস্বামিনী তাহার পূর্ব্বপরিচিতা এবং বহু বার তাহার নিকট সাহায্য প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞ। সোলাপী যখন এই বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইল তখন গৃহস্বামিনী ও তাহার কন্যা দুইজনেই স্বভাবিক বিস্মিত হইয়া পড়িল; সোলাপী যে কেন এই স্থানে আসিতে পারে (যারা কারণ তাহা না হইলে কোনও সাধারণ বিচার-শক্তি সম্পন্ন জীব এই স্থানে বাস করে না) হইয়াছে তাহা তাহাদের বোধগম্য, তবে ধীরভাবে তাহারা তাহাকে স্বাগতম্ সাহায্য করিতে লাগিল।

সোলাপীর মনে এখন কোনরূপ ভবিষ্যৎ চিন্তা নাই, বর্ত্তমানটা কেবল বিরাট দুঃখের রূপ ধরিয়া, তাহার মনের উপর একছত্র রাজত্ব করিতেছে; সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ আশা তাহার মনের 'একা' ভাবটা। সে যে আজ সমস্ত হারাইয়াছে, পৃথিবীতে তাহার আর আপনার বলিতে কেহ নাই; বড় আশায় সে আজ নিরাশ; অদৃষ্ট তাহাকে লইয়া যে নিষ্ঠুর ক্রীড়া করিতেছে তাহা বুঝিয়াও সে নিঃসহায়; আত্মরক্ষার উপায় নাই। পরে কেমন করিয়া কোন্ পথে সে চলিবে তাহা ভাবিতে তাহার মন একেবারে অসমর্থ। কেবল তাহার অন্তর হইতে একটা করুণ আবেদন যেন মূর্ত্ত হইয়া জগতের পদে লুটাইতেছিল,—সে যে একা, কেহই তাহাকে চায় না, তাহার অনুপস্থিতিই সকলে কামনা করে;—বৃত্তিকা নিশ্চিত প্রতিমার যদি সত্যসত্যই অনুভব শক্তি থাকে তাহা হইলে বিসর্জ্জনের পর যখন গভীরজলে জলে জলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রস্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গলিয়া যাইতে থাকে তখন তাহারও মনের ভাব সোলাপীর অনুরূপ হয়। সোলাপী দীর্ঘ শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল, তাহার সমস্ত শরীর ক্রন্দনের আবেগে দুলিয়া উঠিতেছিল।

কনক প্রায় দুই মিনিট ধরিয়া দরজার নিকট নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহারও হৃদয়ের আবেগ কোনও মতে বাঁধ মানিতেছে না, সে সোলাপীর নিকট গিয়া সান্ত্বনে তাহার গলা জড়াইয়া হৃদয়ের বাঁধ খুলিয়া দিল।

সোলাপীর প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই, এত সুখ কি সম্ভব, সত্য সত্যই কি কনক আসিতে পারে, এযে তাহার দুরাশা। প্রথমে সে স্বপ্ন বলিয়া মনে করিয়া, এবং তাহার বিক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থার ফলনা—এইরূপ ভাবিয়া, মাথা তুলিল না; তবে তাহার অনুভূতি, কনকের এক মুখ কেশরাশির উপর সন্দেহে বুলাইতে লাগিল, কেশ-স্পর্শ করিয়া যে নিজের বিভ্রম ঘুচাইবে আর অবসর হইলও স্পর্শে ভুল আর হইতেছিল না।

অকস্মাৎ তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল; তাহার মনে যে ঠিক অনুভূতি, এত কি স্বপ্ন, অলীক ছায়ার চক্ষু হইতে কি উষ্ণ বারি নিঃসারিত হইতে পারে, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, সত্যই কনক তাহার নিকট তাহার

জড়াইয়া ধরিয়া আছে; অন্য ধারায় তাহার গণ্ডদেশ প্লাবিত সোনাপীকে মুখ তুলিয়া চাহিতে দেখিয়া কনক তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার সমস্ত অভিমান আজ বীর শক্তি ঘোষণা করিতেছে।

যখন দুই জনের অন্তর্নিহিত বাধা ক্রমাগত রোদনে অনেকটা লঘু হইয়া আসিল তখন সোনাপীকে ঠেলিয়া দিয়া কনক তাহার পার্শ্বে নিজের স্থান করিয়া লইল এবং সেইখানে শুইয়া পড়িল।

তখন ও সোনাপীর চক্ষু দিয়া মাঝে মাঝে জল পড়িতেছে কনক সযত্নে তাহা মুছাইতে মুছাইতে বলিল "তুমি কিন্তু খুব দুষ্টু, আমার মা বলে চলে এলে কেন আমার মনে বুঝি কষ্ট হয় না; মা আমাকে তোমার হাতে দিয়ে গেছেন, আর আমাকে ছেড়ে তুমি চলে এলে" আবার পর হাসি অশ্রুর অপূর্ব্ব সমাবেশ; সোনাপী বলিল "আর আমি কখনও যাব না" আজিকার মিলনে সমস্ত অন্তরায় অভিমান একেবারে বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়াছে, পূর্ব্বঘটিত ব্যাপারের কোন উল্লেখ হইল না।

কনক—"তুমিই আমার মায়ের মতন, ছেলেবেলা থেকে থেকে মানুষ করা আমি, তুমি না থাকলে বাঁচতুম না।"

সোনাপীর অন্তরে উক্ত শোণিত নাচিতেছে, সে বলিল "ধরে তাড়িয়ে দিলেও আমি আর যাব না"—

কনক—"ও রকম কোরে বলতে পারবে না, আমি তোমাকে যে মায়ের মতন ভালবাসি।" এইবার প্রথমোক্ত কে দূরে থাকা সোনাপীর পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত স্নেহ তখন কাঁপিতেছে; দুরা ফেলিতে ফেলিতে সে কনকের দুই একটী মোটা বাজী কিনিয়া উৎসাহে ও উত্তেজনায় যেমন নিজের সমস্ত পণ করিয়া বসে, সোনাপীর অবস্থা ঠিক সেইরূপ। সে কনককে আরও বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া শক্ত করিয়া ধরিল, পাছে সে হাতছাড়া হইয়া যায়; তাহার পর ধীরে ধীরে আশ্চর্য্য বিশ্বস্ততার সহিত আত্মকাহিনী কনকের নিকট বিবৃত করিল।

কনক অবাক মুগ্ধ ও নীরব; এই কাহিনীর মূলমন্ত্র যেন তাহার মস্তকে কাঁপিয়া লইয়াছে—তাহার পর একে একে দুর্ভাগা রমণীর সমস্ত শত দুঃখের চিত্র তাহার চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল; আর এই অসহ্য শোক তাপ দুঃখ জর্জ্জরিত রমণী তাহারই মা—"দুখিনী মা, আমার" এই বলিয়া কনা মাকে জড়াইয়া ধরিল, মা তখন আত্মহারা বাহ্যজ্ঞান একেবারে লুপ্ত।

"মা, এখন কিরে চল" মা ও মেয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল; গৃহস্বামিনী নিজের বিস্ময় ও উৎসুকা কোনমতে দমন করিয়া একটা গাড়ী আনাইয়া দিল।

গাড়ীতে যাইতে যাইতে কনক যে কথাটী এতক্ষণ একবার বলিতে চেষ্টা করিয়া বলিতে পারে নাই, সেইটী বলিয়া ফেলিল "মা, আমার একটী অনুরোধ রাখতে হবে। বিবাহের কথা আর কিছু বলতে পারবে না" মা অবাক, তাহার মুখ দিয়া কেবল আপনা হইতেই "জোতিশ বাবু" এই কথা উচ্চারিত হইল; কনক মায়ের গলা জড়াইয়া শুধু বলিল "মা, তুমিই আমার স্বামী, আজ তোমাতে আমাতে বিয়ে হয়ে গেল, কি বল?"—এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। মাতা আজ সুখের আঘাতে পীড়িত, উপর্য্যুপরি নূতন নূতন সুখ তাহাকে কৃপা করিতেছে; সে যাহা দুরাশা করে। বলিয়া একদিন নিজেকে শাস্ত করিয়াছে আজ তাহাই অযাচিত ভাবে হইতে চলিল, কনক সমস্ত জীবন তাহারই নিকট থাকিবে এই সুখের কল্পনায় সে শিহরিতে ছিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল—সাবধান এ আমার দুর্লভ স্বার্থ, একে যখন কর্ত্তে হবে—মুখে মেয়েকে বলিল "বিয়ে ছাড়া স্ত্রীর অন্য গতিও নাই, কোনও সমাজেও সে উপায় রাখেনি স্ত্রী পুরুষকে আশ্রয় কর্ত্তে বাধ্য।"

কনক—"কিন্তু পুরুষ জাতকে বিশ্বাস করা তোর মূর্খতা তারা আমাদের চেয়ে নীচ আর স্বার্থপর।"

কন্যা গাড়ী হইতে নামিয়া মাতার হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, মৃতা স্বামী কন্যার নিকট দাঁড়াইয়া কেবল চোখের জল মুছিতেছে; অন্যান্য প্রাণও ইহাদের সমসুখে সুখী; বিলম্বমাত্রে সকলেই স্বভাবতঃ আনন্দিত হয়। তবে দুখিনী মাতা প্রথম কথা কহিল "আজ আমি সম্পূর্ণ সুখী, আর কিছু চাইবার নেই শুধু এক ইচ্ছা আছে একজন

লোককে আমার সুখ দেখাই, সেই লোকের কাছে যে আমি কিছুতেই দোষ কর্ত্তে পার্ব্বোনা, আমার সুখের পরিমাণের সঙ্গে দুখের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে তাঁকে একবার ডেকে আমার সৌভাগ্য দেখাতে পার্লে আমি নিশ্চিন্ত" কমল—"কে মা, সে, তুমি কোথায় থাকেন।"

তখন একটী পুরাতন বাক্স হইতে একটী পুরাতন কিন্তু অতি সযত্ন রক্ষিত খাতা বাহির হইল, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র এক ভাগবতও, মাতুলীর মধ্যের নাম যার তাহারই হাতে লিখিত—এই দুইটী জিনিষই একত্র রক্ষা করা হইয়াছে।

যেই গল্প যখন শেষ হইল তখন কমলের চোখ ছল ছল করিতেছিল সে আঁচলে চক্ষের জল মুছিল।

(১৯)

নরেশ আজ তিনদিন হইল, বহুবৎসরের পর বাড়ী ফিরিয়াছে; এই কয়দিন বাড়ীর মধ্যে একটা শূন্যতা আনিতে পারিয়া গিয়াছে; তাহার ইচ্ছা এখন সে শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন এই প্রাণাধারার স্রোতেই যাপন করে; কলিকাতার সহস্র বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিশিয়া, সমুখে লোকের ভাসিয়া যাওয়া কই ধরিবার সামর্থ্য অপনয়ন করিয়া সে নিজের জীবন যাপন করিতে অভিলাষী—সে আবার প্রথম একজন ষ্টাডিয়স প্রফেসার, তবে সাধারণ লোকে তাহার পুস্তক পড়িতে চাহিত না কারণ সাধারণ লোকে যে কথাগুলি ভুলিয়াও, স্রোতের সমুখে হইতে সরাইয়া রাখিতে চাহে, সেইগুলি এই সব পুস্তকের মধ্যে স্থান পাইত। নরেশ সাদর করিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভালবাসে—আমাদের সমাজই তাহার প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং দেশের শিক্ষা প্রণালী ও বিবাহ সমস্যা, উপরই যেন তাহার আক্রোশ বেশী।

নরেশ বাড়ী আসিয়াই দেখিল একটি চিঠি আজ অনেক দিন তাহারই অপেক্ষা করিতেছে, চিঠির মর্ম্ম প্রথমে তাহাকে সামান্য বিচলিত করিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখে আবার প্রসন্নের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, "নিশ্চয় যেতে হবে" এই কথা বারম্বার উচ্চারণ করিয়া চিঠিখানি সযত্নে ভাঁজিয়া রাখিয়াছে, আজ সেই বাসল সে কার্য্যে পরিণত করিবে, তাহারই একটু তাড়াতাড়ি করিতেছে।

* * * *

* * * *

যখন চাকর দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে আগন্তুক দুই ভদ্রলোককে লইয়া আসিল তখন কমল ও মিস পাকড়াশী সেইঘরে কথোপকথনে নিযুক্ত; আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একজন তাহাদের দুইজনেরই পরিচিত, সে নরেশ, অন্যজন তাহারই বন্ধু প্রদ্যুম্ন। নরেশকে দেখিয়া দুইজনেই অত্যন্ত প্রীত ও বিস্মিত, নরেশ তাহাদের এইখানে দেখিতে পাইবে এইরূপ ভাবেও নাই, সেও বিস্মিত হইয়াছিল। প্রথম বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেলে মিস পাকড়াশী বলিলেন, "নরেশ বাবু, আপনাকে এইখানে দেখিতে পাইব কখনও ভাবি নাই, কমল আমায় ত কিছু বলে নাই" কমলও নরেশের আকস্মিক আগমনের কারণ জানিত না সেও প্রশ্ন করিল "আপনি কেমন করে এখানে এলেন, তা আমিই বুঝতে পার্চ্ছি না" নরেশ অনুমানে কমল যে কে তাহা বুঝিয়াছে এবং পত্র লেখিকার কন্যা তাহার পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া অনেকটা স্বস্তি বোধ করিতেছে সে হাসিয়া বলিল "আপনার বাবার সঙ্গে আমি দেখা কর্ত্তে এসেছি" "তাঁর সঙ্গে আপনার কেমন কোরে আলাপ" উৎগ্রীব কমল প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারিল না—নরেশ নীরবে হাসিতেছিল, ঘটনাবলী তাহার নিকট অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছে সে একটু আড়ম্বর করিয়া জবাব দিল "দেখুন, একটা বড় গাছে অনেক পাতা থাকে নীচের ডালে পাতাগুলি আলোবাতাস না পাওয়ায় মরে আবার উপরের গুলিও আর এক আধ্যে থাকে, একই বৃক্ষের পাতা তারা, কিন্তু শত শত বৎসর একত্রে থাকিয়াও কখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে না—তবে যদি একটা বৃক্ষ বড় ঝড়ে উপর ডালটা একেবারে অন্যরকম হয়, সমস্ত ওলট পালট হইয়া যায়, ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে উপরের পাতা বারংবার নীচের পাতার সহিত ধাক্কাইয়া যায়; অভাবনীয়ের সংঘটন হয়—কথাটা কি রকম হল—"

এই সময়ে কমলের মাতা সেই ঘরে প্রবেশ করিল। আজ সকলেই খুব আনন্দিত, মিস্ পাকড়াশী প্রদ্যুম্নকে স্মিতমুখে

বলিতেছেন—"দেখুন এই যে ঘরের কর্ত্রী তাঁর মত লোক কম—দুঃখ দৈন্য,চরিত্রের অগ্নি পরীক্ষা—মুখ দেখলেই বোঝা যায়—কনক আমার স্ত্রী তার পিতা তিনি এখন আর নাই, অত্যন্ত মাতাল ছিলেন অবশ্য মৃত্যুর সম্বন্ধে কন্যা অতিমত প্রকাশ করা অনুচিত মাতা পুত্রীর বিচ্ছেদ দীর্ঘকাল ধরিয়া হয়—কনক মার কথা আমাদের একদিনও আগে বলেনি, বড় অদ্ভুত মেয়ে এই কনক, বড় চাপা কিন্তু খুব ভাল মেয়ে, সহজে মেলে না—আমি খুব ভালবাসি।"

প্রভুর এই বাক্যপ্রিয় রমণীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার অসংলগ্ন কথা শুনিতেছিল, সে নরেশের নিকট সমস্তই শুনিয়াছে; আগ্রহের সহিত সে কনককে দেখিতে লাগিল।

ঘরের আর এক অংশে মাতাপুত্রী নরেশের সহিত কথাবার্তা কহিতেছিল; তাহাদের প্রসঙ্গের মধ্যে বিশেষ হাস্যকর একটা কিছু ছিল; নরেশের উচ্চহাস্যে মিস পাকড়াশী প্রভুরকে টানিয়া ব্যাপার জানিতে হলের মধ্যে গিয়া বসিলেন। ক্রমশঃ আলাপ জমিয়া উঠিল, কথাবার্ত্তা ও এখন বেশ গভীর বরণের হইয়া উঠিয়াছে; সমাজ ও ধর্ম্ম লইয়া তর্ক চলিতেছে, নরেশ বলিল "আমরা ধর্ম্ম নিয়ে এত বৃথা কষ্ট পাই, ধর্ম্মের চেয়ে সমাজটা বড়; ধর্ম্ম কোনও চরম লক্ষ্য হইতে পারে না, সমাজের মঙ্গলই আমাদের শেষ উদ্দেশ্য, আর তাহার জন্যই ধর্ম্মের সৃষ্টি; তারপর, অবশ্য লোকে ধর্ম্মকে বড় করে তুলেছে কিন্তু আসল লোক আত্মার উন্নতির চেয়ে দশজনের প্রকৃত উপকারে মঙ্গল দেখেন বেশী।"

কনক অবাক হইয়া গেল, তাহার নিকট এই ধারণা যে সম্পূর্ণ নূতন।

মিস পাকড়াশী অল্পক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন "তবে পাপ পুণ্য কি?"

নরেশ উৎসাহিত হইয়া উত্তর দিল "কিছু নয়ে সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে অসামঞ্জস্য দূর করিবার জন্যই এই পাপ পুণ্যের সৃষ্টি;—আমি বিশ্বাস করি না যে এর মধ্যে পারলৌকিক কিছু কথা আছে—'পাপ-পুণ্য' এই সংস্কার পৃথিবীকে অনেকদিন অন্ধকারে ডুবিয়া রেখেছিল কিন্তু আর রাখতে পারে না—একটা বদ্ধ ধারণা যে এই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যটা পাপ, কেবল ঘোর মূর্খতার পরিচায়ক, জগত যে চলছে, বলছে সেটাকে উপেক্ষা করা চলবে না; যে জিনিসটা দশহাজার বৎসর পূর্ব্বে সমাজের অতি কর্ত্ত সেটাকে তখন লোকে পাপ বলত, কিন্তু এখন যদি সেটার সেই অনিষ্টকারী শক্তি লোপ পেয়ে থাকে তবে তার বিষয়ে এ রকম একটা ধারণা পোষণ করা কুসংস্কার মাত্র—এই সব বিচারে কেবল দেখতে হবে, সমাজকে আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা—মনে একটা পাপ মনে মিথ্যাগ্লানি রাখা বোকামী।

কনকের মাতা নিজেকে একবার প্রশ্ন করিল—তাহার মনে কি এখন কোনও গ্লানি আছে—তাহার নিজের দৃষ্টি কনকের উপর পড়িল; কোথায়, তাহার মনের বিন্দুমাত্র গ্লানির অস্তিত্ব ও সে খুঁজিয়া পাইল না। কনক মনে মনে বলিল "লোকটা সেতাই হলেও তাকে ভক্তি কর্ত্তে ইচ্ছা করে।"

(২০)

একমাস কাটিয়া গিয়াছে—ফুল্ল ঘরের উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে খানিকটা রৌদ্র ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে; একটী মাদুরে বসিয়া মাতা আপনমনে কি সিলিতেছে আর সেই রৌদ্র উপভোগ করিতেছে, এমন সময়ে মেয়ে হাসি মুখে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। মায়ের নিকট ঘেসিয়া বসিয়া প্রথমে সে কলম কাড়িয়া লইল, "কি মা দিনরাত লিখছ খালি" এই বলিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত নিজের গলদেশে বেষ্টিত করিল, মাতা কন্যাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিল শেষ হয়ে এসেছে, দেখবি দেখাটা" এই বলিয়া একটী খোটা মাতা কন্যার হাতে তুলিয়া দিল।

মেয়ে পাতার পর পাতা উল্টাইয়া একবার দেখিয়া লইল তাহার পর জোরের জোর করিয়া বলিল, "মা, এই বুঝি তোমার বুদ্ধি, এযে আমাদের গল্প—কেবল নাম জাল দিয়েছ" মা হাসিতে লাগিল মেয়ে ও হাসিতে হাসিতে

বলিল "কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, আর এক পাইসও তোমায় দিবতে দিচ্ছি না" মাতা কন্যাকে সাদরে বক্ষে ধরিল, রৌদ্র কিরণ আপন মনে দুইজনকে স্নান করাইতেছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(সমাপ্ত)

অনুরোধ

ঘুমিয়ে আছি বুঝ্‌ছ যদি তুমি
জাগিয়ে কেন দাও না দয়াময়,
ঘরের আগল তোমার পরশ পেলে
আঁধার কোনে লুকিয়ে কভু রয়?

ঘুমিয়ে আছি তুমি জাগাও যদি
সন্ত্রাস হয়ে রইব নিরবধি!

পথ হারায়ে কাঁটা বনের মাঝে
ঘুরব আমি সারা জীবন ধরে,
ফুটিয়ে কাঁটা পায়ে পায়ে আমার
পথ্ দেখিয়ে দাও না কেন মোরে!

পান্থহারা তোমার আলো পেলে
পথের বাধা দল্‌বে অবহেলে।

পাথার মাঝে সেলাম যদি ডুবে
হাবি ডুবি খেয়েই যদি মরি
তুমি তবে দাঁড়িয়ে কেন কূলে
কাজ কি রেখে খেয়াঘাটে তরী?

অকূল যদি কূলের নাগাল পায়
পাখার সাথে ডুব্‌তে সেকি চায় ?
আঁধার ঘরে রাখ্‌বে যদি মোরে
আঁধারই যে লাগ্‌বে আমার ভালো
লুকিয়ে রব বন্ধ ঘরের কোনে
বাইরে তুমি যতই জ্বাল আলো !

মনের মাঝে তোমার প্রদীপ ধর
ঘুমিয়ে আছি সজাগ তুমি কর !

বুকের উপর ভারী পাষাণ কেন
অনড় হয়ে অবশ করে মোরে ?
মনে বুঝার সুযোগ যদি দিলে
বাঁধন তোমার আরো ধর্‌ জোরে !
আঁখির আগে সজাগ থাক তুমি
ধূলায় লুটে তোমার চরণ চুমি !

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

যুক্তি কল্পতরু

পূর্ব্বানুবৃত্তি

অস্ত্রযুক্তি

(১১৬৫—১৩১০ শ্লোক)

খড়্গের শত প্রকার অঙ্গ

১। যে খড়্গের 'ভূমি' রৌপ্য পত্রের মত এবং 'অঙ্গ' শ্বেতবর্ণ, তাহার নাম 'রুপ্য খড়্গ'; ইহা অতি মূল্যবান্। ইহার অধিকারীর ঐশ্বর্য্য, আয়ু, খ্যাতি ও বল লাভ হইয়া থাকে।

২। যে খড়্গের 'ভূমি' নিকষ প্রস্তরের গাত্রের ন্যায় বর্ণ রেখায় অঙ্কিত, তাহার নাম 'বর্ণ খড়্গ'; এই খড়্গ যাহার থাকে, তাহার আয়ু, ঐশ্বর্য্য ও জয়লাভ হয়।

৩। যে খড়্গের কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' গজ শুণ্ডাকৃতি 'অঙ্গ' লক্ষিত হয়, তাহার নাম 'গজ খড়্গ'; এই খড়্গ শোণিত স্পর্শ মাত্র স্বয়ংই অঙ্গে প্রবিষ্ট হয়। এই খড়্গের জলে অরাতি রোগ প্রশমিত হয় (১)। দুর্ব্বল রাজাও ইহার সাহায্যে পৃথিবী পালন করিয়া থাকেন।

৪। যে খড়্গের 'ভূমি' কৃষ্ণবর্ণ এবং 'অঙ্গ' এরণ্ড বীজের মত, তাহার নাম 'কম্বু খড়্গ।' এই শত্রুসর্ব্বস্বহারী খড়্গ স্পর্শ করিলেই সকল রোগ দূর হয়। কেহ কেহ ইহাকে 'অহিত খড়্গ' বলে।

৫। যে খড়্গে যবনপত্রাকৃতি 'অঙ্গ' থাকে, তাহার নাম 'যবন খড়্গ।' ইহার 'ভূমি' দুই প্রকার—নীলবর্ণ এবং শ্বেত বর্ণ। ইহার মধ্যে নীলবর্ণ খড়্গই শ্রেষ্ঠ। এই খড়্গ-স্পৃষ্টজলেও যবনদের মত গন্ধ হয়। ইহার প্রভাবে রাজা সমগ্র পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন।

৬। নীলবর্ণ মৃদুকায় খড়্গের উপর যদি একটি কৃষ্ণবর্ণ মূল রেখা থাকে, তাহা হইলে সেই খড়্গকে 'মূল খড়্গ' বলে। ইহা থাকিলে ধন ও কীর্ত্তি লাভ হয়। এই খড়্গের আঘাতে উৎপন্ন ক্ষতস্থানে তাড়াতাড়ি পোষ হয় এবং তাহা বহুকাল থাকে। কোন কোন খড়্গতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ইহাকে 'মহান্ খড়্গ' বলেন।

৭। যে খড়্গ ঘর্ষণ করিলে তাহাতে অঙ্গ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার নাম 'অঙ্গ খড়্গ।' ইহার 'ভূমি' কৃষ্ণবর্ণ ও শুক্ল বর্ণ দুই প্রকারই হইতে পারে।

লৌহ প্রদীপে আছে—রৌপ্য পত্রও বণির ন্যায় আভাযুক্ত, কোনরূপ চিহ্নরহিত, দুর্লভ ও বহুমূল্য লৌহের নাম 'ক্ষান্ত লৌহ।'

৮। যে খড়্গের কৃষ্ণবর্ণ গাত্র 'ভূমিতে' পীতবর্ণ যজ্ঞোপবীতাকৃতি 'অঙ্গ' পরিলক্ষিত হয়, তাহার নাম 'কৃষ্ণ খড়্গ'; এই খড়্গাঘাতিত ক্ষত লোহ উৎপাদন করে।

প্রদীপে আছে—যাহার 'ভূমি' কৃষ্ণ বর্ণ এবং 'অঙ্গ' বর্ণাভাযুক্ত ঈষৎ শুক্লবর্ণ সেই খড়্গের নাম 'তাম্রলী খড়্গ', কেহ কেহ ইহাকে 'কাল খড়্গ'ও বলে।

৯। যে খড়্গের কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' অতিসূক্ষ্ম অরুণবর্ণ 'অঙ্গ' থাকে, তাহার নাম 'অরুণ খড়্গ।' ইহা শত্রু নাশে উপযোগী। সূর্য্যরশ্মি স্পর্শ মাত্র এই খড়্গ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হয়। ইহার স্পর্শে রাত্রি কালেও পদ্মকোষ প্রস্ফুটিত হয়। এই দুর্লভ খড়্গ ভাগ্যক্রমে লাভ হইয়া থাকে। ইহা সহস্র যোজন স্থিত বিঘ্ন সকল নাশ করিতে সমর্থ।

১০। যে খড়্গের মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত তিনটী শ্বেতবর্ণ রেখা লক্ষিত হয়, তাহাকে 'শ্বেত খড়্গ' বলে। এই খড়্গ কীর্ত্তি, সম্পত্তি এবং শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

---

(১) অরাতি ব্যাধি শমনম্।

১১। যে খড়্গের কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' পদ্ম পত্রের মত চিহ্ন থাকে, মুনিগণ তাহাকে 'অম্ভোজ খড়্গ' বলেন।

১২। যে খড়্গের 'ভূমি' কৃষ্ণবর্ণ এবং সর্পাকৃতি চিহ্ন শোভিত, তাহার নাম 'গর্পাবজ্র।' এই খড়্গাঘাত হত হইতে শূলরোগের উৎপত্তি হয়।

১৩। যে খড়্গের শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমি' তিলাকৃতি 'অঙ্গে' শোভিত, তাহার নাম, তিল বজ্র।' এই খড়্গ থাকিলে ধন, বল ও খ্যাতি লাভ হয়। ইহার ক্ষত হইতে অধিক পরিমাণে তিল তৈলের ন্যায় রসা ক্ষরিত হয়।

১৪। যাহার কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' অগ্নিশিখার মত চিহ্ন থাকে, সেই শত্রুনাশকারী খড়্গের নাম 'অগ্নিবজ্র'। ইহাতে শীতলজল নিক্ষেপ করিলে, তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। শান প্রয়োগকালে এবং সূর্য্যরশ্মি-সংস্পর্শে এই খড়্গ হইতে অগ্নি নির্গত হয়। এই খড়্গ দ্বারা আহত স্থানে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং রাহুক্ষতের মত ক্ষত হইয়া থাকে। বহু ভাগ্যফলে ইহা পাওয়া যায়।

১৫। যে খড়্গের 'ভূমি' শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ এবং 'অঙ্গ' শিরাকৃতি, তাহার নাম 'কপাবজ্র'। ইহার কয়স্থানে অস্ত্রাঘাত অজ্ঞেয়।

১৬। যাহার কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' গ্রন্থিচিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই শত্রু-ক্ষয়কারী খড়্গকে 'গ্রন্থিবজ্র' বলে। ইহার দ্বারা আহত ব্যক্তির অত্যন্ত দাহ, তৃষ্ণা ও জ্বর হইয়া থাকে।

১৭। যে কৃষ্ণবর্ণ খড়্গে শালপত্রাকৃতি চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'ছিন্নবজ্র' বলে। ইহার আঘাতে কম্প জ্বর হয়।

১৮। যে খড়্গের 'ভূমি' কৃষ্ণবর্ণ এবং 'অঙ্গ' তিত্তিরি-পক্ষাকৃতি, তাহার নাম 'তিত্তিরিবজ্র'। (তৎকৃতে বহুবেদনা?)

১৯। যে খড়্গে বনমালার মত চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহাকে 'মালাজ' বলে। ইহার জল প্রসূতি হইয়া থাকে। ইহাতে উত্তপ্ত জল নিক্ষেপ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ শীতল হইয়া যায়। শিশুরোগের জ্বালা ভিন্ন সকল প্রকার জ্বালার পক্ষে ইহা পরম ঔষধ। ভাগ্যফলে ইহা লাভ হইয়া থাকে।

২০। শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ খড়্গে ক্ষীরকাকৃতি চিহ্ন থাকিলে, তাহাকে 'ক্ষীরকবজ্র' বলে। এই খড়্গের আঘাতে তৎক্ষণাৎ জ্বর হয়।

২১। শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ খড়্গে ভ্রমরাকৃতি চিহ্ন থাকিলে, তাহাকে 'ভ্রমরবজ্র' বলে। ইহার আঘাতে বিসূচিকা রোগ হয়। (তত্র-চেষ্টাদ্যং ভূতং শেষমাখ্যোতি কেবলম্?)

২২। যে খড়্গে পিঙ্গলবর্ণ মুণ্ড (১) চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহার নাম 'ঊর্দ্ধবজ্র'। এই খড়্গ বিষক্রিয়া নাশ করে।

লৌহ প্রদীপে আছে—যে খড়্গে ফণাকৃতি 'অঙ্গ' থাকে, তাহার নাম 'নাগফণ'। ইহার স্পর্শেই সর্পের মৃত্যু হইয়া থাকে।

২৩। যে খড়্গের কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' মরীচাকৃতি 'অঙ্গ' থাকে, তাহার নাম 'মরীচাজ'। ইহার দ্বারা আহত স্থানের রক্ত নষ্ট হইয়া থাকে। এই খড়্গের জলে নাসা-রোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

২৪। যে খড়্গের নির্ম্মল 'ভূমিতে' সর্পের ফণার মত চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'ফণবজ্র' বলে। ইহার দ্বারা আহত স্থানে বিষ যন্ত্রণার ন্যায় ক্লেশ বোধ হয়। ইহার স্পর্শমাত্রে জীবের জীবন নাশ হয়। এইরূপ একখানি খড়্গের প্রভাবে রাজা সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে পারেন।

২৫। নির্ম্মল 'ভূমি' এবং অশ্ব-খুরাকৃতি 'অঙ্গ' থাকিলে সেই ধৃতক খড়্গকে 'অশ্বাজ' বলে। এই খড়্গ স্পর্শ করাইলে অতি বীরেগামী অশ্বও বেগে গমন করিতে পারে। ইহার প্রক্ষালন জলে অশ্বের রোগ বিনষ্ট হয়। ইহার আঘাতে মূর্চ্ছা, দাহ এবং ভ্রান্তি রোগ জন্মে।

২৬। যে খড়্গের কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' ধনুর্দ্দণ্ডাকৃতি অঙ্গ থাকে, তাহার নাম 'ধর্হাজ'। ইহার দ্বারা আহত ব্যক্তির ধনুষ্টঙ্কার রোগ হইয়া থাকে। সর্পগণ এই খড়্গের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। নৃপতিগণ বহু ভাগ্যফলে কোন স্থানে ইহা লাভ করিয়া থাকেন।

২৭। যে খড়্গের 'ভূমি' অঞ্জনের মত কৃষ্ণবর্ণ এবং ধার গুলি শুক্লবর্ণ তাহার নাম 'অঞ্জনবজ্র'। এই খড়্গ অনায়াসেই পাওয়া যায়।

(১) ঊর্দ্ধকং।

লৌহ প্রতীপেও এইরূপই আছে—যে খড়্গের 'ভূমি' কজ্জলের মত কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নে শোভিত হয় এবং ধারগুলি তীক্ষ্ণ হয়, তাহার নাম 'কজ্জলবজ্র'।

২৮। যে খড়্গের 'ভূমির' বর্ণ মধুর মত এবং 'অঙ্গ' মধু বিন্দুর ন্যায়, তাহার নাম 'কৌদ্র'। এই খড়্গ যাহার থাকে, তাহার জয়, ধন ও কীর্ত্তি লাভ হয়।

পার্শ্বদেবও আছে - যে খড়্গের নিরন্তর সর্ব্বদা মধুলিপ্ত বলিয়া বোধ হয়, সেই মধুবর্ণ খড়্গ দেবতাদিগেরও প্রিয়। মক্ষিকাগণ সকল সময়েই এই খড়্গে থাকিতে ভালবাসে।

২৯। কোন যুক্ত খড়্গে ক্ষুদ্র গোল চিহ্ন থাকিলে, সেই খড়্গের নাম নাগার্জ্জুনের মতে 'ক্ষুদ্রবজ্রক' এবং দৌর্ঘবিকারের মতে 'ক্ষুদ্রবজ্র'। ইহার আঘাত স্থানে তাদৃশ জ্বালা হয়।

৩০। যে খড়্গের শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ ভূমিতে মক্ষিকাকৃতি চিহ্ন থাকে এবং যাহাতে দ্রব বস্তু পড়িলে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার নাম 'মক্ষিকাখ্য'।

৩১। যে খড়্গের ভূমি শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ এবং ভূমিচিহ্নে চিহ্নিত, সেই খড়্গকে নাগার্জ্জুন মুনি 'ক্ষুরবজ্র' নাম দিয়াছেন।

৩২। ভূমি কৃষ্ণ বা শুক্লবর্ণ এবং অঙ্গ ধবাকৃতি হইলে, সেই খড়্গকে ধবাখ বলে। এই খড়্গ স্পর্শ করিলে কফরোগ জন্মে। যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল কামনা করে, সে এই নিকৃষ্ট খড়্গ ব্যবহার করিবে না।

৩৩। যে খড়্গের ভূমি ধূম্রবর্ণ এবং অঙ্গ ধান্যপুষ্পাকৃতি, তাহার নাম ব্রীহিবজ্র। ইহার দ্বারা আঘাত স্থানে অত্যন্ত ব্যথা হয়। এই খড়্গ শত্রুর পক্ষে ভীতিপ্রদ।

৩৪। খড়্গের ভূমি শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং তাহাতে অতসী পুষ্পাকৃতি চিহ্ন থাকিলে সেই খড়্গকে অতসীবজ্র বলে; ইহার আঘাতে শিরঃপীড়া জন্মে।

৩৫। যে খড়্গের শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ ভূমিতে লবণ রীজাকৃতি চিহ্ন থাকে, অত্যন্ত ধারযুক্ত এবং কঠিনস্পর্শ লবণাখ্য নামক সেই খড়্গ দুর্লভ।

৩৬। যে খড়্গের ভূমি শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ এবং অঙ্গ সিংহীর আকৃতি, তাহার নাম সিংহীবজ্র। ইহার আঘাতে প্রলাপ রোগ জন্মে। এই খড়্গের জলে কাসরোগ নষ্ট হয়।

৩৭। যে খড়্গের ধূম্র, কৃষ্ণ বা শুক্লবর্ণ ভূমিতে তণ্ডুল চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহার নাম তণ্ডুলাখ্য। এই খড়্গ যাহার থাকে, তাহার খ্যাতি, সম্পত্তি ও শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই খড়্গ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলে, সেই জল দেখিতে চাউলধোয়া জলের মত হইয়া থাকে। লোকে ইহার জলে বিনষ্ট ধন পুনরায় লাভ করে।

৩৮। যে খড়্গের ভূমি আঘাতসহ নহে, যদি তাহাতে গোক্ষুরাকৃতি চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে, সেই খড়্গকে গোক্ষুর বলে। ইহা অতি নিকৃষ্ট খড়্গ।

৩৯। খড়্গের শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ ভূমিতে বৃহৎ বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ শিরা থাকে, তাহার নাম 'শিরাঢ্য'। ইহাও অতি নিকৃষ্ট খড়্গ।

৪০। যে খড়্গে শিবলিঙ্গাকৃতি চিহ্ন এবং অতি শুভ্রধার থাকে, সেই শত্রুনাশকারী খড়্গকে 'শিবাখ্য' বলে।

৪১। যে খড়্গের 'ভূমি' পিঙ্গলবর্ণ এবং 'অঙ্গ' ব্যাঘ্রনখাকৃতি, তাহার নাম 'নখবজ্র'। ইহার ক্ষত হইতে শোথ জন্মে। এই খড়্গ মাংসের সহিত সংস্পর্শ মাত্র বিষেই শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

৪২। ধূম্রবর্ণ যুক্ত 'ভূমিতে' হাঙ্গরের পুচ্ছের মত চিহ্ন থাকিলে, সেই খড়্গকে 'গ্রাহাখ্য' বলে। ইহা শত্রুক্ষয়ে (১) উপযোগী। ইহা স্পর্শ মাত্র সংজ্ঞাশূন্য প্রাণত্যাগ করে।

৪৩। যে খড়্গের শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ ভূমিতে বহ্নির চক্ষুর মত চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'বহ্নিজ' বলে। এই খড়্গ যুদ্ধে জয়প্রদ। ইহার জলে অন্ধ ব্যক্তিরও দৃষ্টিশক্তি জন্মে।

৪৪। যে খড়্গ ধূম্র, শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' কেশের মত চিহ্ন থাকে, তাহার নাম কেশাখ্য। এই খড়্গের অধিকারীর দুঃখ কষ্ট ও কিছুই থাকে না।

৪৫। কোনরূপ চিহ্নহীন স্থূলাকৃতি খড়্গকে 'উপলাখ্য' বলে। এই খড়্গ অনেকস্থলেই দেখা যায়।

৪৬। পদ্মপুরাণে আছে—

যে চিহ্নহীন খড়্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার এবং শাণ প্রয়োগ-

(১) শত্রুবংশপ্রণাশনম্।

কাণে যাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়,তাহার নাম 'শ্রোণীবজ্র'। এই বজ্র দুর্লভ নহে।

৪৭। যে বজ্রের তলপ্রদেশ 'ভূমিতে' কাকপদের চিহ্ন থাকে, তাহার নাম 'কাকাঙ্গ'। আয়ুর্বিজ্ঞেচ্ছু ব্যক্তি এই বজ্র ত্যাগ করিবে।

৪৮। যে বজ্রের অধঃস্পর্শ 'ভূমিতে' কপাল চিহ্ন থাকে, সেই 'কপালাঙ্গ' নামক বজ্র বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরিহার করিবে।

৪৯। অতি ক্ষীণ এবং সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল 'ভূমিতে' বলাপত্রের চিহ্ন থাকিলে সেই বজ্রকে আয়ুর্ব্বেদোক্তপণ্ডিত-গণ 'শক্রবজ্র' বলিয়া থাকেন।

৫০। যে বজ্রের ভূমিতে তুবরীপত্রের মত চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহাকে 'তুম্বরীবজ্র' বলে। এই বজ্রের আঘাত হইতে শিরঃপীড়া জন্মে।

৫১। যে বজ্রের ভূমির বর্ণ বিল্বীপত্রের মত এবং চিহ্নের আকৃতি বিল্বীফলের মত, তাহার নাম 'বিল্বীবজ্র'। ইহার জল পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ বিকার প্রশমনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫২। যে বজ্রের ভূমি ও অঙ্গ যথাক্রমে পিঙ্গলবর্ণ ও প্রিয়ঙ্গুসদৃশাকৃতি হয়, তাহাকে 'ফলবজ্র' বলে। এই বজ্র শাণ দিলে ধূম বাহির হয়।

৫৩। যে বজ্রের শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' সর্পণ পুষ্পের চিহ্ন থাকে তাহাকে 'সর্পণ বজ্র' বলে। ইহা 'শাণ' দিলে অগ্নি নির্গত হয়। ইহা এত নরম যে ভাঙ্গ করা যায়। ইহার প্রভাবে রাজা সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে পারেন।

৫৪। যদি 'ভূমি' নীলবর্ণ এবং অঙ্গ নীল ভ্রমরের মত হয়, তাহা হইলে সেই বজ্রকে 'নীলবজ্র' বলে। ইহা হইতে 'শাণের' সময় অগ্নি নির্গত হয়। এই বজ্র মানুষের বিষ ও ভয় দূর করে।

৫৫। শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' তিনটী রক্তবর্ণ বিন্দু রেখা থাকিলে, সেই বজ্রকে 'রক্তবজ্র' বলে। এই বজ্র শস্ত্রচিকিৎসায় বিশেষ উপযোগী। 'শাণের' সময় ইহা হইতে রক্ত এবং নীলবর্ণ শিখা বাহির হয় এবং রক্ত স্পর্শ মাত্র এই বজ্র স্বয়ংই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই জন্য হইতে রক্তশোথ, তৃষ্ণা এবং দাহ রোগ জন্মে।

৫৬। 'ভূমি' শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ এবং 'অঙ্গ' ষট পদের মত হইলে, সেই বজ্রকে 'ষট্চরণবজ্র' বলে। ইহার আঘাতে শরীরের বিষ নষ্ট হয়। রাজা এই বজ্র যত্নপূর্ব্বক লাভ করিবেন।

৫৭। 'ভূমি' রসোন পত্রের মত এবং 'অঙ্গ' রসোনের মত হইলে, সেই বজ্রকে 'রসোন বজ্র' বলে। এই বজ্র 'শাণ' দিলে অগ্নি বাহির হয়। ইহার জলে আঘাত নষ্ট হয়।

৫৮। যে বজ্রের 'ভূমি' নির্ম্মল, চিহ্নহীন এবং গুরু ও তীক্ষ্ণধারযুক্ত, তাহাকে 'সুখনাবজ্র' বলে। ইহা তেমন দুর্লভ নহে।

৫৯। যে বজ্রের ভূমিতে মঞ্জিষ্ঠার মত রক্তবর্ণ বড় বড় তিনটী রেখা থাকে, তাহাকে 'মঞ্জিষ্ঠাবজ্র' বলে। এই বজ্র বাহিত জল প্রদান করে।

৬০। যে বজ্রের 'ভূমি' মুগ শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ এবং 'অঙ্গ' শমী পত্রের মত, তাহাকে 'শমীবজ্র' বলে। ইহা শস্ত্রচিকিৎসার প্রীতিকর। এই বজ্র 'শাণ' দিলে অগ্নি বাহির হয় এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিলেও ইহা নষ্ট হয় না।

৬১। যে বজ্রের শুক্ল, কৃষ্ণ বা ধূম্রবর্ণ 'ভূমি', রোহিত পক্ষের মত 'অঙ্গ', তীক্ষ্ণ 'ধার' এবং শুক্লবর্ণ রেখা থাকে, তাহার নাম 'রোহিত বজ্র'। ইহা সর্ব্ববিষ দূর করে। অগ্নি স্পর্শে এই বজ্র হইতে 'চিনচিন' শব্দ হয়। ইহা দেবতা-দিগের পক্ষেও দুর্লভ।

৬২। যে বজ্রের শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' মৎস্যপক্ষের চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'প্রোষিবজ্র' বলে। এই বজ্র জলে ভাসিয়া থাকে। ইহা শস্ত্রনাশের পক্ষে অতি উত্তম; এই বজ্র সৌভাগ্য হেতু কদাচিৎ পৃথিবীতে পাওয়া যায়।

৬৩। যে বজ্রের অধোভাগ 'ভূমিতে' মারিষপত্রের চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'মারিষবজ্র' বলে। এই বজ্র দুর্লভ নহে।

৬৪। যে বজ্রের 'ভূমির' বর্ণ তুলরাশি পত্রের মত এবং অঙ্গ তুল-পুষ্পাকৃতি, তাহাকে তুলাঙ্গ বলে। এই বিশ্রী বজ্র কোনরূপ আঘাত সহ্য করিতে পারে না।

৬৪। ধূমের মত তীক্ষ্ণধার 'ভূমিতে' কোনরূপ চিহ্ন না থাকিলে, সেই খড়্গকে 'ধূমাক্ষ' বলে। এই খড়্গ তীক্ষ্ণ আঘাতও সহ্য করিতে পারে এবং শাণে ইহা হইতে অগ্নি বাহির হয়। ইহাও বেশ দুর্লভ নহে।

৬৫। 'অক্ষিবজ্র' নামক খড়্গের 'ভূমি' কখনও নির্মল কখনও মলিন হয় এবং 'ধার' কখনও তীক্ষ্ণ কখনও মন্দ হইয়া থাকে।

৬৬। নীলাঞ্জনের মত কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' জলতরঙ্গের মত চিহ্ন থাকিলে, সেই খড়্গকে 'বেগাঙ্গ' বলে। এই খড়্গ 'শাণে' উত্তপ্ত না হইয়া বরং শীতলই হইয়া যায়। বেগ যেমন সূর্য্যের প্রখরতার লাঘব করে, সেইরূপ এই খড়্গও প্রকৃষ্ট পরাক্রমের হানি করে। নিজের হিতেচ্ছা থাকিলে এই খড়্গ ত্যাগ করা উচিত।

৬৭। যে খড়্গ অত্যন্ত মৃদু এবং ধারহীন, তাহাকে 'দুর্জ্জাত' বলে। ইহা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

৬৮। নীলপত্রবর্ণ 'ভূমিতে' শুভ্রচিহ্ন থাকিলে, সেই খড়্গকে 'নীল বজ্র' বলে। ইহা ঘর্ষণ করিলে উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং শাণ দিলে ইহা হইতে সিন্দূরের মত রক্তবর্ণ কণা বাহির হয়। লোভাগ্নাক্রমেই এই খড়্গ লাভ হইয়া থাকে। এই খড়্গের প্রভাবে সিদ্ধ হয় না, এমন কিছুই নাই।

৬৯। শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' স্থূল শরচিহ্ন থাকিলে, সেই খড়্গকে 'শর বজ্র' বলে। ইহার 'ধার' অতি তীক্ষ্ণ এবং 'শাণ' দিলে ইহা হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হয়। এই খড়্গ রাজার অভীষ্ট সাধন করে।

৭০। দুর্ব্বাদলশ্যাম 'ভূমি', তীক্ষ্ণ 'ধার' এবং খর 'স্বর' থাকিলে সেই খড়্গকে 'দুর্ব্বাবজ্র' বলে। ইহা হইতে শাণে অগ্নি বাহির হয়। এই খড়্গ অতি দুর্লভ।

৭১। শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' বিষপত্র চিহ্ন থাকিলে, সেই খড়্গকে 'বিষবজ্র' বলে। 'শাণ' দিলে ইহা হইতে নীল এবং শীতবর্ণ শিখা বহির্গত হয়। এই খড়্গ দ্বারা শত্রু নাশ করা যায়।

৭২। যে খড়্গের মযূর পত্রের মত 'ভূমিতে' মযূর চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'মযূরাঙ্গ' বলে। শাণে দিলে ইহা হইতে অগ্নি কণা বাহির হয়।

৭৩। কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' শোণ পুষ্পের চিহ্ন থাকিলে, সেই দুর্লভ খড়্গকে 'শোণাঙ্গ' বলে।

৭৪। যে খড়্গের 'ভূমি' শঙ্খ পত্রের মত এবং 'অঙ্গ' শঙ্খ পুষ্পের মত, তাহাকে 'শঙ্খ বজ্র' বলে। এই উৎকৃষ্ট খড়্গ প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়।

৭৫। কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' বিড়ালের লোমের মত চিহ্ন থাকিলে সেই খড়্গকে 'মার্জ্জারাঙ্গ' বলে। এই খড়্গ রোগ শোক এবং ভয়ের কারণ। নিজের মঙ্গল কামনা করিলে এই নিকৃষ্ট খড়্গ অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

৭৬। যে খড়্গের কেতকী পত্রের মত চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'কেতকী বজ্র' বলে।

৭৮। দূর্ব্বাদলের মত শ্যামবর্ণ 'ভূমিতে' দূর্ব্বা লতার চিহ্ন থাকিলে সেই খড়্গকে 'যৌর্ব্বাঙ্গ' বলে। 'শাণে' ইহা হইতে শুক্লবর্ণ শিখা বাহির হয়। এই উৎকৃষ্ট খড়্গ খ্যাতি ও যশ বৃদ্ধি করে।

৭৯। 'বজ্রাঙ্গ' নামক তীক্ষ্ণধার খড়্গ অতি কঠিন হইয়া থাকে। ইহা হইতে 'শাণে' অগ্নিকণা বাহির হয়। এই খড়্গ লৌহ ছেদন করিতে পারে।

৮০। শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' কণার পুষ্পের চিহ্ন থাকিলে সেই খড়্গকে 'কণার বজ্র' বলে। ইহা দ্বারা আহত স্থান পচিয়া থাকে।

৮১। যে খড়্গের শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' চম্পক পুষ্পের চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'চম্পক বজ্র' বলে। 'শাণে' ইহাতে অগ্নি শিখা বাহির হয়। ইহার জল শীতল ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

৮২। যে খড়্গের শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' বর্ণাপত্রের চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'বর্ণা বজ্র' বলে। বাতরোগের পক্ষে ইহা পরম ঔষধ।

৮৩। বট পত্রের মত 'ভূমিতে' বটাঙ্কুরের চিহ্ন থাকিলে, সেই খড়্গকে 'বট বজ্র' বলে। ইহা অতি নিকৃষ্ট খড়্গ। যে ব্যক্তি এই খড়্গ স্পর্শ করে, তাহারও সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়।

৮৪। যে খড়্গের 'ভূমি' বংশের মত নীল এবং 'ধার' তীক্ষ্ণ ও শুভ্র বর্ণ, তাহাকে 'বংশাঙ্গ' বলে। এই খড়্গ কুল-বর্দ্ধক।

৮৫। শাল পত্রের মত 'ভূমিতে' শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র চিহ্ন থাকিলে সেই ফলকে 'শালাক্ষ' বলে। এই ফলা অতীষ্ট প্রদান করে, সুতরাং আদরণীয়। ইহা হইতে 'শাণে' অগ্নি বাহির হয়।

৮৬। শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' ক্ষুদ্র জোড়া চিহ্ন থাকিলে, সেই ফলকে 'জোড়ী বজ্র' বলে। আত্মহিতেচ্ছু ব্যক্তিগণ এই নিকৃষ্ট ফলা স্পর্শও করিবে না।

৮৭। যে ফলের শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' পুরাণ জালের মত চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'জালবজ্র' বলে। এই ফলা অতি উৎকৃষ্ট, ইহা শত্রুর ঐশ্বর্য্য ধ্বংস করিতে পরম উপযোগী। যদি ইহা হইতে 'শাণে' নীলবর্ণ শিখা বা অগ্নিই বাহির হয়, তাহা হইলেই ইহা দুর্লভ, সন্দেহ নাই।

৮৮। যে ফলের শুভ্র বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' পিপীলিকা চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'পিপীলিকাক্ষ' বলে। ইহার আঘাত হইতে কণ্ডুরোগ জন্মে। যদি 'শাণে' মুদ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে এই ফলা অতি প্রশংসনীয়।

৮৯। নল পত্রের মত 'ভূমিতে' নল পুষ্পের চিহ্ন থাকিলে, সেই ফলকে 'নলাক্ষ' বলে। ইহা সকল প্রকার অভীষ্ট প্রদান করে।

৯০। যে নির্ম্মল, চিহ্নহীন ফলা ঘর্ষণ করিলে, অগ্নিকণা উৎপন্ন হয়, তাহার 'ধারা' যদি দৃঢ় ও সূক্ষ্ম হইয়াও আঘাত লক্ষ করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই ফলকে 'মন্দোধ্বজ্র' বলে। এই নিন্দিত ফলা শত্রুকেই বিজয় প্রদান করে।

৯১। শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ 'ভূমিতে' কুষ্মাণ্ডবীজের চিহ্ন থাকিলে, সেই ফলকে 'কুষ্মাণ্ডবজ্র' বলে।

৯২। যে ফলের 'ভূমি' ক্ষুদ্র, শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ এবং 'অঙ্গ' লোমাকৃতি, তাহাকে 'লোমাঙ্গ' বলে। ইহার আঘাতে ব্রণ রোগ হয়।

৯৩। ফলের 'ভূমি' যদি মূষী পত্রের মত হয়, তাহাতে যদি মূষী কণ্টকের চিহ্ন, তীক্ষ্ণধার এবং তীক্ষ্ণ 'ধ্বনি' থাকে তাহা হইলে এই খরস্পর্শ ফলাকে 'মূষক' (১) বলে। ইহার আঘাতে দাহ, তৃষ্ণা এবং বায়ু রোগ জন্মে এবং মুখ, চক্ষু, কর্ণ এবং নাসিকা পচিতে আরম্ভ করে। এই ফলা সর্পের ফণায় স্পর্শ করাইলেই ফণা ভাঙ্গিয়া যায় এবং সর্প মস্তক অবনত করে। ইহার স্পর্শে কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়।

৯৪। যে ফলের 'ভূমি' কর্কন্ধু পত্রের মত এবং 'অঙ্গ' কর্কন্ধু ফলের মত, তাহাকে 'কর্কন্ধু বজ্র' বলে। ইহার আঘাতে দাহ হয় না। শত্রু জয়ের ইচ্ছা থাকিলে এই নিকৃষ্ট ফলা পরিত্যাগ করিবে।

৯৫। যে ফলের বকুলফলাকৃতি 'ভূমিতে' বকুল পুষ্পের চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'বকুলাক্ষ' বলে। এই উৎকৃষ্ট ফলা হইতে 'শাণে' সুলক্ষ বাহির হয়। জগতে এই ফলা দ্বারা অসাধ্য কিছুই নাই।

৯৬। যে তীক্ষ্ণ ধার ও কঠোর 'ধ্বনি' ফলের চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, তাহাকে 'কাঙ্কিকাক্ষ' বলে। ইহা অনেক চেষ্টায় পাওয়া যায়।

৯৭। যে ফলের কৃষ্ণবর্ণ ভূমিতে কোন অঙ্ক থাকে না এবং ধার তীক্ষ্ণ, দৃঢ় ও আঘাতসহ হয় এবং রক্তস্পর্শমাত্র স্বয়ংই অঙ্গে প্রবেশ করে তাহাকে 'বহ্নিবাক্ষ' বলে। ইহা হইতে শাণে অগ্নি এবং অতি ঘর্ষণে মুদ্গ (১) বাহির হয়। ইহা যেমন দুর্লভ নহে।

৯৮। যে ফলের অতি নির্ম্মল ভূমি প্রতি বিদ্ধ দ্রব্যে সমর্থ ধার তীক্ষ্ণ এবং ধ্বনি কর্কশ হয়, তাহাকে বজ্রাক্ষ বলে।

৯৯। এই বজ্রাক্ষ ফলের একটী সরল রেখা থাকিলে, তাহাকে গুরু ফলা বলে।

১০০। বজ্ররেখাযুক্ত বজ্রাক্ষ ফলের নাম বজ্র ফলা।

এই শেষোক্ত তিন প্রকার ফলা অতি উৎকৃষ্ট।

জগতের হিতের জন্য সকল প্রকার ফলের লক্ষণই কথিত হইল।

গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—যদি কোন ব্যক্তির নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক ফলালক্ষণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি সে ব্যক্তির দাসত্ব গ্রহণ করিব।

যে ফলে বহু প্রকার বিভিন্ন চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'বিভ্রাক্ষ' এবং যাহাতে প্রায় সকল প্রকার অঙ্ক থাকে, 'সর্ব্বাক্ষ' ফলা বলে।

(ফলপরীক্ষা দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ)

শ্রীহরমোহন ভট্টাচার্য্য।

(১) মূষল।

(১) মুদ্গর।

বর্ষশেষে

নিদাঘে কাতর আবাহনে, ওগো, পাইনি তোমার সাড়া,—
নূপুর তোমার গাছের পাতায় আছিল রণন হারা।
তপ্ত নিশাসে ছেড়ে গেছ চ'লে ধরণীর পঞ্জর,
বিরহে তোমার ভূবাহীন কত নদী, ক্ষেত প্রান্তর।
ফিরিনু শুধুই ব্যর্থকতার ঘর্ম-বিন্দু ল'য়ে,
কোথায় আপনা গোপন করিলে, গেলেনা কথাটি ক'য়ে!

ডেকেছি তোমারে কাতর হৃদয়ে বরষার দু'টি মাস,
কহ নাই কথা, কাপূটা বাতাসে ফেলেছ দীর্ঘশ্বাস।
প্রাণের বেদনা ঢেলেছ তোমার বাদলের ঝর্ঝরে,
মেঘা-ডাকে বুঝি জানায়েছ মোরে কত ব্যথা অন্তরে।
আমার কথার উত্তরে তুমি তিমিরে ঢেকেছ মুখ;
বহিয়াছি একা শুধু নিয়ে মোর জীবনের ভুল চুক!

শরতে নাকি সে সরিতে হরিতে ছিলে ধরাতল ব্যাপি',
পাই নাই তোমা ক্ষুদ্র আঁখির খণ্ড মাপেতে মাপি'।
বিশ্বের প্রতি অণুতে বাস্ত ছুটেছিল বটে ঠিক্,
তোমারি রূপের মাধুরী সে বুঝি ভরে ছিল দশ দিক্!
কণ্ঠ তবুও পাইনি শুনিতে, ডাকিয়া হ'য়েছি সারা,
ভাঙি' শতখানে আপনারে মিছা ক'রেছি ছন্নছাড়া!

হেমন্তে কোথা ছিলে লুকাইয়া, পথখানি ছিনু চাহি',
ক্ষিপ্র সাঁঝারে ডুবে গেছে পাখী, শিঞ্জিনী শুনি নাহি,
কুয়াসার ছলে অশ্রু ছিল গাছে সে কি তব দুখরাশি?
গণ্ড কি তব করেছিল ম্লান মেঘের খণ্ড আসি'?
ঝরেছি শিশিরে অশ্রু-বিন্দু বিদায় পড়েছে ক'রে,
বিন্দু শুকায়ে প্রভাত-তপনে আশায় ফিরাল মোরে!

বিরহ তোমার সহেছি শিশিরে, পাই নাই কিছু ছোঁয়া,
চেতনে তোমার ঢেকে কি রাখিল দুখার, তুহিন, ধোঁয়া!
তরু-শির হ'তে ঝ'রে গেল পাতা তোমায় শ্রীহীনা করি',
বায়ু সনে তার মরণের ব্যথা মিলাইল মর্ম্মরি';
কি যেন কুহকে সকল ভুবন ক'রে গেল একাকার,—
শুধু দাঁড়ায়ে ছেলেদি শুধুই আঁখির বেদনা-ভার।

বসন্তে, অয়ি, বনের আড়ালে কি কথা কুড়ায়ে পেলে!
দখিণ বাতাসে সোহাগ জানায়ে এতদিন পরে এলে!
বিম্বের বুঝি পাণ্ডু অধরে হাস্য দিয়াছ বাঁটি,
কোমল করের আঙুল বুলায়ে পরশ আকাশ, মাটি।
নূতন মুকুলে ঢাকিবে কি প্রিয়ে, পুরাণ ক্ষতের দাগ?
নিখিল, মধুর নিয়ে এলে যাহা বিরহের অনুরাগ!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খাস্তা

(১)

উঃ-কি ভিড়, এত ঠেলাঠেলি, লোকেরা ঘরে কি একটু বাস্তা ঘরতারও স্থান নেই, কার যে কি হচ্ছে একটু ভ্রূক্ষেপও নেই। দোকানের সামনেই সবাই দাঁড়িয়ে আছে, সকলেই ক্রেতা, মূল্য দিয়ে উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নিজেদের ঘরের যখন জিনিষ কিনে নিয়ে যাবে—উঃ—মানুষের নিশ্বাস কি এত গরম হয়, মুখে কাপড়ে ঘামে হয় যেন পুড়ে গেল, বুকের ঘামো দিয়ে রক্ত আগুন জ্বলছে, বোধ হয়।

নিজেদের মধ্যে আবার দ্রব্যাদিদের গুণাগুণ সম্বন্ধে তুমুল তর্ক চলিতেছে। এক একজন আপনার অধিক বুদ্ধিমান দাবিয়া অন্য দশজনকে তাঁহার মনোমত দ্রব্য ক্রয় করিতে উপদেশ দিতেছেন; কয়েকজন ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া গৌরবে ও উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ বা দশজনে তাঁহার মত বুদ্ধিমানের বাক্য অবহেলা করিল বলিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে নিজের মনোবেদনা কোনও অবহেলাকারী ক্রেতার কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিতেছেন। ভীষণ ঠেলাঠেলি, নির্দ্দয় পেষণে কত লোকের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম, কেহ বা গ্রাহ্য করে।

কয়েকজন একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া কথা কহিবার

ভাব করিতেছে; যেন তাহারা একেবারে নির্লিপ্ত, কেবল ঔৎসুক্যের বশে এইখানে আসিয়াছে; অধরকোণে হাসির রেখা যেন তাহাদের সাধারণ হইতে উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া ঘোষণা করিতেছে—কিন্তু বৃথা এ অভিনয়, মিথ্যা চেষ্টা, সকলেই জানে যে সকলেই ক্রেতা, কাহারও বিক্রয়ের এইখান পরিত্যাগ করিবার অধিকার নাই, সকলকেই কোনও কিছু কিনিতে হইবে—ইহাই এই স্থানের কঠোর নিয়ম—সকলের অদৃষ্ট।

যাহাদের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে; তাহারা আর অপেক্ষা করে না, উৎসুক জনতার বেষ্টন ছিন্ন করিয়া তাহারা চলিয়া যাইতে পারিলেই যেন বাঁচে; নির্জ্জনে আপনার ক্রীত দ্রব্যের তন্নতন্ন পরীক্ষা করিয়া দেখাই যেন তাহারা বাঞ্ছনীয় মনে করে—দশজনের চক্ষের সম্মুখে নিজের বিবেচনাশক্তির গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে কেহই অভিলাষী নহে—এটা একটা সাধারণ দুর্ব্বলতা।

এতলোক অতিপ্রেত দ্রব্য ক্রয় করিয়া চলিয়া যাইতেছে কিন্তু জনস্রোতের বিরাম নাই; কত দূরদেশ হইতে অসংখ্য নূতন ক্রীতার্থী চক্ষে নূতন নূতন দেশের আলোক লইয়া উপস্থিত হইতেছে, কত নূতন রকমের পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে—অসহিষ্ণু জনতা ক্রমশঃ যেন আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে; সকলেই আপন আপন স্থান রক্ষার্থ উদ্‌গ্রীব, কে অগ্রে যাইতে পারিবে, এইটাই সকলের চেষ্টা; কয়েকজন কিন্তু আবার বিপরীত ভাব প্রদর্শন করিতেছে; তাহারাও সমান উৎসুক ও উদ্‌গ্রীব বটে কিন্তু মনের চঞ্চলতায় তাহারা আবার পিছাইয়া পড়িতেছে, যেন এই মুহূর্ত্তের বুদ্ধির উপর তাহারা সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের ফলাফলকে ছাড়িয়া দিতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত—চিন্তা ও চিন্তার পরিণতি, কার্য্যের মধ্যে তাহারা সহস্র সহস্র বাধা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বভাবের দ্বারাই রচনা করিয়া তুলিতেছে; সাধারণে তাহাদের তারস্বরিক দেখিয়া অবসরমত বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে নিরত। নিষ্ঠুর জনতা কতলোকের নয়নে কতবিক্ষত, রক্তাপ্লুত।

কতকগুলি, তাহারা ব্যবসায়ীর স্বভাব লইয়া জন্মাইয়াছে, তাহারা বিনামূল্যে মনোমত বস্তু ক্রয় করিতে চায়, অনেকের আবার সাহস এত বেশী যে তাহারা রিক্তহস্তেই এইখানে উপস্থিত হইয়াছে, অটল বিশ্বাস যে নিজেদের বুদ্ধির প্রভাবে তাহারা দোকানীকে প্রবঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবে—মূর্খ তাহারা।

কত দূরদেশে, মুক্ত আকাশতলে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে, ঘোর অরণ্যে, জনাকীর্ণ নগরে, গগনভেদী প্রাসাদে বা রৌদ্র-বৃষ্টি-বায়ু সংক্ষুব্ধ দীন কুটীরে তাহারা বাস করিতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তাহাদের অদৃষ্ট ভেরী বাজাইয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিল, আর সেইদিন হইতে তাহারা এই বিপণী অভিমুখে যাত্রা করিল; কত বিচিত্র যানে, কত লোক আসিতেছে, কেহ বা পদব্রজে—কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত চিন্তা, কত চঞ্চলতা—সকলেই পণ্য ক্রয় করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে—এই মানবের জীবনস্রোত, ইহারই বৈচিত্র্য ও জটিলতায় দার্শনিক দল হতভম্ব। পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে, অনভ্যস্ত গোলযোগে মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়া স্বাভাবিক; অধিকাংশই নিজের মনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইতেছে, যাহা মনে করিয়া আসা, তাহা করা হইতেছে না কলহ ও সন্ধির বিরাম নাই; সংকল্প স্থির রাখাও দুঃসাধ্য।

চতুর্দ্দিকের এই কোলাহল, দ্বন্দ্ব ও ঠেলাঠেলির মধ্যে দোকানদার কিন্তু অবিচলিত, স্থির, তাহার প্রশান্ত বদনে কিছুমাত্র বিরক্তি বা অনিশ্চয়তার চিহ্ন নাই; সে ধীরভাবে নিজের সমস্ত কার্য্য করিয়া যাইতেছে, কোনও চঞ্চলতা নাই, জনসমষ্টির চীৎকার ও আবেদনে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই—বিধাতাপুরুষের ন্যায় বা প্রস্তরে খোদিত বুদ্ধমূর্ত্তির ন্যায় তাহার আকৃতি সম্মুখস্থ ক্রীতার্থীর বাচালতায় শ্রোত অকস্মাৎ বন্ধ করিয়া দিতেছে—পরস্পরের কোনও কথা নাই, তাড়াতাড়ি, করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা নাই; তাহার সহিষ্ণুতা হিমালয়ের মত বিরাট, অচল। বিচারকের মত কঠিন স্বরে সে দ্রব্য বিশেষের মূল্য বিজ্ঞাপিত করিতেছে যেন সে আমাদের এই জগতের ব্যবসাদার নহে। কাহারও আর ধারণা করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই, নীরবে কম্পিতহস্তে সকলে আপনার প্রয়োজনীয় বস্তু লইয়া প্রস্থান করিতেছে, মূল্য নিষ্পত্তির জন্য তর্ক নাই, সকলকে নিজ নিজ ক্রীত দ্রব্যের মূল্য দিতে

হইতেছে, আরোগ্যের সিদ্ধমন্ত্র নাই। "একদর, যাহে বিক্রয় নাই।"

তুমি যশ, খ্যাতি, গৌরব ক্রয় করিতে চাও, তোমার মনের আভ্যন্তরীণ শক্তিই তাহার মূল্য স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে; জ্ঞানের বস্তু তুমি উৎসুক, সাধারণ লোকের সহানুভূতিতে তোমার যে শক্তিগত স্বত্ব আছে তাহা পরিহার কর; দেহ, প্রাণ, প্রেম তোমার কাম্য বস্তু, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত হইতে স্বার্থের নামগন্ধ লুপ্ত করিয়া দাও। দৈহিক স্বার্থের জন্য যদি লালায়িত থাক তাহা হইলে নিরবিচ্ছিন্ন ও পরিমিতভাবে দৈনিক কার্য্য কর, সকলরূপ অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার বাসনাকে বর্জ্জন কর। উচিত মূল্যে ঈপ্সিত রত্ন ক্রয় করিতে হইবে। মানসিক হইতে চাহিলে অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত থাক, স্বদেশ হিতৈষী হৈতে সহ্য করিবেই আর প্রকৃত বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে সংযম শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। কাহারও নিস্তার নাই।

* * * *

আমি বিস্ফারিতনেত্রে এককোণে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ এই অভিনব বেচা-কেনা দেখিতেছিলাম; কেন যে এইখানে আসিয়া পড়িয়াছি তাহা আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত, কেবল মনে আছে, যে দশ বন্ধুর মধ্যে বসিয়া আমি হাসিতেছিলাম এমন সময়ে মাথার মধ্যে টনক নড়িল, কে যেন আমার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিটাকে সজোরে নির্দ্দয় হস্তে বিলোড়িত করিয়া দিল, তাহাতে আমার স্বাভাবিক চিন্তা প্রণালীর ধারা একেবারে ফিরিয়া গেল; তাহার পর হইতেই আমি আত্মহারা আর যন্ত্রমুগ্ধের মতন এই পথে চলিয়া আসিয়াছি; পথের কথা কিছুই মনে নাই; চমক ভাঙ্গিতে দেখিলাম সম্মুখে এই ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে, কিন্তু এখনও মন্ত্রশক্তির প্রভাব আমার উপর রহিয়াছে; আমায় কে যেন বলিয়া দিয়াছে আমায় কিছু কিনিতেই হইবে, তাহার অন্যথা করিবার ক্ষমতা আমার নাই, আর থাকিলেও তাহার প্রয়োগ করিবার সাহস আমার নাই।

আমি নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে দোকানীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি জানিনা; জনতার ঠেলাঠেলিতে আমি একেবারে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত; সহসা চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম, দোকানীর প্রসন্নময় দুটী চক্ষুর তারকা আমারই মুখের উপর স্থির নিবদ্ধ; শক্তির কেন্দ্র, দুটী ফুলিঙ্গের মত চক্ষুর তারকা-দুটী বিরাট প্রশ্নের মত, অন্য কোনও ইঙ্গিত বা আভাস সহস্র চেষ্টাতেও তাহাদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহারা অবিলম্বে উত্তরের দাবী করে; ইতস্ততঃ করা অসম্ভব।

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম "আমার যাহা আছে তাহার বিনিময়ে আমি যাহা পাইতে পারি তাহাই চাই; এতদিন রুদ্ধ বেদনা ও দুঃখ সঞ্চয়ে অন্তরের মধ্যে পোষণ করিয়াছি অবশিষ্ট সমস্ত জীবন তাহাই করিতে আমি প্রস্তুত। আমি যাবজ্জীবন দুঃখভার সানন্দে বহন করিবার অঙ্গীকার করিতেছি। দিনে দিনে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, নিমেষে নিমেষে আমি প্রাণের মধ্যে নীরবে দুঃখকে অনুভব করিব, আমার বুকের রক্তে তাহাকে সরস করিয়া রাখিব—ইহার বিনিময়ে আমার যাহা প্রাপ্য তাহাই দিন।"

কঠোর স্বরে উচ্চারিত হইল—"বিশ্বাস।"

আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে—আমি এখন মুক্ত।

যাত্রাপথে

হে মোর জীবনদেবতা,
বল, কোন পথে নিয়ে চলেচ আমারে,
কহ আর মুখ চাহিব ?
তোমার সুরের তান লয় মানে
কত আর গান গাহিব ?
কত কথা আমি বলেচি না জানি,
শুধু ভেসে চলা বাধা নাহি মানি,
তবু এ দীর্ঘ সুদূরের খেয়া
কত আর তরী বাহিব ?
না জানি কোন সে মিলনের রাতে,
না জানি কোন সে বরষার প্রাতে,
দিয়াছি আসারে জীবন তরণী
অজানা অকূল পাথারে।
পসরা আমার বহিতে যে নারি
এ তরী কেমনে বাহিতে সো পারি
সব শেষ দিনে সন্ধ্যাবেলায়
ডেকো সো তোমার দুয়ারে।
ঘুচে যাবে মোর সব ব্যথা দুখ,
ডুবে যাবে মোর যত আশা সুখ,
হে দেবতা মোর থেকো শুধু তুমি
আমার জীবন মাঝারে।

শ্রীসুশীলকুমার বাগচী

চেনা চিনির একদিক *

'আমি তোমায় ভালবাসি !'

'আমি চিরকাল তোমায় বুকের মধ্যে রাখবো।'

এই যে একটা ব্যক্তিগত আপন করা ভাব এটা আত্মাগত হওয়ার জন্য ব্যস্ত এবং মানুষও সেজন্য সচেষ্ট। কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখি "ভালবাসা" টা এবং "চিরকাল মনে রাখা"টা সভ্যিকারের খোলস পরে মূর্ত্তিমান Conventional হয়ে পড়েছে তখন কি আমাদের উপযুক্ত পরিচয় পাওয়ার উপযুক্ত appreciation হওয়ার বাকী থাকে ? মানুষে মানুষে এই এক প্রকার আপন করা ভাব পৃথিবীর সৃষ্টির সময় থেকে চলে আসছে, তারই প্রকার ভেদে আমরা বলি 'মনের মানুষ' পাওয়া আর তাই হারানো।

সামান্য একটি ছোট পাখীকে খাঁচায় আটকালে সেটা যেমন ছটফট করতে থাকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য—সেই রকম জীবনে যার সঙ্গে নিজের জীবনের তাল মিলিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি তার মধ্যেকার ঐ খাওয়ানো জিনিষটি আপনাকে একটু দূরে সরিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করবার জন্য, স্বাতন্ত্র্যলাভ করবার জন্য নিজে একটা অদ্ভুত পোষাক পরে যাতে নিজের real-self ঢাকা পড়ে এবং বাইরের সবটাই আমাদের ঠিক বলে চোখটাকে ভুলের ভিতর ফেলে দেয় তারই চেষ্টা করে। তখন বিজ্ঞতা এবং অজ্ঞতা ঠিক এক হয়ে পড়ে, সিঁড়ির দু'দিকই এক সমান। বাইরের জিনিষটাকে আমরা অভ্যর্থনা করি এবং আসল অর্থাৎ real selfটাকে আমরা আসতেই পাই না—সে আমাদের দৃষ্টির বাইরে পড়ে যায়, সে তখন খিড়কির নীচে পড়ে। আমরা ভুল বুঝি কিন্তু সেই ভুলের ওপরেও একটা সভ্যিকারের পোষাক থাকে। এই গেল এক রকম আমাদের অভিজ্ঞতা, এটা অজ্ঞতা।

সভ্যিকারের উপর মিথ্যার ঠিক এমনই একটা আবরণ আমার মনে হয় পৃথিবীতে সব সময় ছেয়ে আছে। সেটা হচ্ছে কবির বীমাংসার ভুল। যার প্রভাবে মানুষটাকে অনেক সময় লাল বলে ভুল পাই। জীবনের সব কাজে এই রকম একটা না একটা ঠিক লেগেই আছে, যাতে কবি অনেক সময় নিজকে ধরা না দিয়ে বাইরের সঙ্গে নিজকে মিলিয়ে নেন আর বলেন—

"বাহির হইতে দেখনা এমন করে
আমায় দেখোনা বাহিরে !
আমায় পাবেনা আমার দুখে ও সুখে,
আমায় দেখনা খুঁজোনা আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবেনা আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথায় সে
নাহিরে।"

তবে দেখছি কেমন যেন একটা আবছা আবছা ভাব সবটাতেই লেগে আছে।

ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে মানুষ যখন আপনার আপনার ব্যক্তিত্ব জাহির করে বসে এবং আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর সন্দিহান থাকে না তখনই তার "superficial structure of the real-self" যা লেখক বলেছেন তাই উপরে। তাকে ঠেলে দেখা যায় সেটা খুবই আপন এবং সেটা খুবই পর হয়ে পড়ে। অনেক সময় এই বাইরের মানুষটিকে জানতে গিয়েই ঘরের মানুষের সন্ধান পাই। তার কারণ হচ্ছে একটা কাজ দেখানো ভাবে করতে করতে অভ্যাস দস্তুর হয়ে পড়ে এই সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের মানুষটিকে না দিতে দিতে তাকে বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে বাধ্য করে। এই দিন করাবার জন্য দম্ভ, এ প্রতিনিয়তই মানুষের ভিতর লেগে আছে এবং তাকে জয়ী করে তোলে অনেক সময় বাইরের জিনিষটা। নদীতে খুব ঝড় উঠলেই তাল মাঝির দরকার। তাই বহির্জগতে ঝড় উঠলে এবং মাঝে মাঝে বাধা পেতে থাকলে অন্তর্জগতে হয়ত বিপ্লব উঠবে। কিন্তু প্রতিনিয়ত

* মাসিক বসুমতীতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত প্রবন্ধ "চেনা-চিনি"র আলোচনা। লেখক।

বিচারের যন্ত্র দিয়া বিশ্বকে চালাতে চালাতে মন বৃদ্ধ হয়ে তাল করে হাল ধরে এবং অন্তর এবং বাহির তখন এক ক'রে দেয়। এই গেল অন্তরের প্রাধান্য। তাই বলে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে খুব একটা কড়া এবং বাঁধাবাঁধির ভিতর দিয়ে সব সময়ে অন্তর এবং বাহিরে চলতে হয়। সাধারণতঃ আমরা দেখি মনটা কেঁদে গুঠে একটু করুণসুরে আস্বাদন পেলেই, কিন্তু তারজন্য ভাবতে হবে না যে বহির্জগতের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে ও কর্ত্তব্যের মধ্যেও আমাদের এই করুণতাই বড় হবে। তাই জন্যই মনটাকে খেয়াঘাটের মাঝি বলেছে। যে আগে তাকেই পার করে দেয়। ছোট বড় মানী জ্ঞানীর পার্থক্য সে করে না।

আসল কথা থেকে অনেকটা বাইরে এসে পড়েছি। এখন কথা হচ্ছে এই মানুষকে চেনা যায় কেমন করে?

বস্তুতন্ত্রতার দিক থেকে দেখতে গেলে সকলই বলবেন কেন? এতো খুব সোজা! যাঁহার মানুষকে চিনবে তাতে আর অত ভাববার কি আছে? তাঁরা বলবেন—কেন? কাজ কর্ম্মের ভিতর থেকে তাকে চিনে নেব, তার সব জেনে নোবো। তারা সকলে জিনিষ নিয়ে ব্যস্ত তাই তাদের যন্ত্র এ রকম; কিন্তু এর ভিতর যে কেবল যন্ত্র নিয়েই কথা নয়—এ যে যন্ত্রহীন হয়েও কেবল একটা মন নিয়েই কাজ চালান তার খবর তাঁরা রাখেন না। কিছু দিন আগে 'বেণারসীতে' ব্রহ্মের শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত একখানা ছবি বেরিয়ে ছিল—তার নাম "বস্তুতান্ত্রিক কাব্য রসিক।" তাঁরা মনোজগতের কিছুই যে খবর রাখেন না এ ভাবটি তারী চমৎকার ভাবে ফুটে ছিল। তাই বক্তব্য যে আপন কথাটা বস্তুগত নয় সেটা সম্পূর্ণ মনোগত। যদিও আগেই বলেছি যে উভয়েই Interdependent—নির্ভরশীল। মানবীয় লেখকও এই কথা ব'লেছেন।

"গ্রহণ্ডিতে ভাবের বিস্তার ছাড়া কখনও কাব্য হয় না—বক্তা এবং শ্রোতা না হ'লে বক্তৃতা বলেই কোন জিনিষ হয় না; গায়ক এবং বাদক না হলে যেমন গানের কিছুই হয় না সেই রকম অন্তরের সঙ্গে বাইরের সম্পূর্ণ সমাবেশ না হলে আমাদের 'চেনা' কিম্বা 'জিনি'র কোনটাই ঠিক ভাবে হয়ে উঠ্‌তে পারে না। আমার মনে হয় নিজকে বিলিয়ে দেওয়াটাই সব চেয়ে সেরা চিন্‌বার উপায়। নিজের self টাকে যদি টুকরা টুকরা করে না কেটে সম্পূর্ণটা বিলিয়ে দেওয়া যায় তবে বোধ হয় গ্রন্থ হৃদয় সাড়া দিবেই। Electric cellএর একটাতে স্পর্শ উঠ্‌লেই সমস্ত whole টাতেই সাড়া দিয়ে উঠে—নিজের বস্তুত্ব বুঝায়—কাজেই হৃদয়ে হৃদয়ে সাড়া পড়লে ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য তখন নীচে চুপ করে থাকবে না। তখন উভয়ের নির্ভরতার ডাক পড়বে—আপনার অস্তিত্ব শেষ হবে ঐ পরের জন্য এবং পরের উপরই।

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

বিশ্ব মানবের অন্তরঙ্গতার এই একরূপ। প্রকার ভেদে বিভক্তার আংশিক পরিস্ফুরণ হয়।

আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাতেই দেখিয়াছি মানুষের যে এই একটা একীকৃত হওয়ার ভাব তার ভিতর কেমন একটা বন্ধন আছে। এরই জন্য জীবনে যত সমস্ত প্রাণের নেশা এবং প্রাণের খেলা। এর থেকে মানুষকে আলাদা করলেই এবং করতে গেলেই সে বেহাল হয়ে উঠবেই উঠবে। তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হবেই হবে। সেটা খারাপ দিকেই বেশীর ভাগ। সেই জন্যই আধুনিক সভ্য-জগতের শাস্তি—যা রবীন্দ্রবাবু বলেছেন cellএ পুরে রাখা, এর থেকেই যত সব আমাদের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়ে পড়ে। সেটা আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নয়।

মানুষের তাই বর্ণই হচ্ছে—

মন দিয়ে কিনে নেওয়া—এর বাড়া সে কিছুই জানে না—এর জন্যই সে সব উৎসর্গ করতে রাজী এবং তৈরী হয়ে থাকে

"Honour, fame, hang upon thy will,
Heart breaths to heart though severed wild
Thoughts live immortal through quill
And there the fires of genius glide."

এই যে প্রাণে স্বর্গের উন্মেষ যার জন্য পৃথিবী আপনার নিজের বন্ধন ঠিক রাখিতে পারিয়াছে তার পরিসমাপ্তি কেবল ঐ—

—"প্রেম দিলে প্রেমে পূরে প্রাণ" এই!

হৃদয়ের সুখ শান্তিও এইখানেই। বাহিরের আনন্দ এবং জড়তার মধ্যে আপন সজীবতা রক্ষা করাই হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে দেরা জিনিষ। এই সজীবতা কেবল সম্ভব আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বন্ধন মনশ্চক্ষুর সাম্নে অন্য মনের সজীব চিত্র খাড়া করা। হৃদয় তখন আপন মন রূপী অনুসন্ধান-তৎপর আলো দিয়ে সব বের করে নেবে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব প্রসার করতে সকলকে হাত দিয়ে ঘিরে রাখবে। এই বহির্জগতকে অন্তরের মধ্যে নিয়ে যাওয়াটাই 'চেনা' এবং 'চিনি'র প্রকৃষ্ট উপায় বলে আমার ধারণা। এই যে একটা আপন করা ভাব, এই যে একটা নিজের নিজত্ব লয় করিয়ে দেওয়ার ভাব এইটাই হচ্ছে জীবনের সুখের সম্বন্ধ। বন্ধন এবং বিচ্ছেদের মধ্যেও ঠিক তাই, এই তার আশা এবং এই তার ভরসা—

"বিলনে নিখিলহারা
বিরহে নিখিলময়।"

বিশ্বকে যে জিনিষ নিজের ভিতর একটা করিয়া টানিয়া লইতে সক্ষম—যার impetus এ হৃদয় পাগল হয়—সেটা হচ্ছে আমাদের অন্তরঙ্গতা অথবা মিলন। প্রকাশ ভেদে অর্থভেদ হয় বটে, কিন্তু প্রাণের যেখন সেটা যে কত বড় তা লিখবার নয় সেটা অনুভূতির জিনিষ। তবে যদি আপনারা কেউ বলেন—

"প্রাণ দিয়ে প্রাণ যায় না পাওয়া
এতত বিষময়।"

সেটা ঠিক কতটা ওজন মত হয়েছে তা নিজেরই বোঝা উচিত। তা কাউকে বলে দিতে হবেনা।

প্রাণের প্রসারতা প্রাণের অনুভূতিতেই বাড়ে সেটা কোন বাধা নিয়মের মধ্যে আটকা নেই। যখন পৃথিবীর সকল জিনিষ কেমন হয়ে পড়ে তখন যদি প্রাণের প্রাণ থাকে তার উপরই নির্ভর করে পথ চলতে হয়—তবেই তার জীবনের এবং 'চেনা-চিনির' পরিসমাপ্তি হয়, তখনই সে সর্বমুখী এবং সর্বকাম নির্মুক্ত।

When wearied with a world of woe
To thy safe bosom I retire,
Where love and peace and truth do flow
Then I contented there expire.

আমি যে সাধারণ ভাবে একদিক ধরে আলোচনা করেছি সেটা অন্য দিক থেকে অনেক বড় বলে আমার মনে হয়।

জীবনের সার্থকতা বিচার করা, তার জীবনের সম্বন্ধ বিচার করা, জীবনের পূর্ণতা বিচার করা এবং জীবনের পরিসমাপ্তি বিচার করা তখনই ঠিক হবে যখন আমাদের অস্তিত্ব বোধ আমরা অন্তের ভিতর দিয়ে করতে পারবো। মানুষের মনের অধিকন্তু যে একটা ভাব আছে যার প্রভাবে আমরা অনেক সময় নিজের উদ্দেশ্যের প্রকার ভেদ করতে পারি না—সেটাকেই বলা আমাদের জীবনের শেষ অর্থাৎ একীকৃত ভাব।

শ্রীসত্যরঞ্জন বসু।

গাভীহারা

ধন দৌলত মধ্যে আমার ছিল শুধু একটি গাই
আজকে আমার শূন্য জগৎ আজ গোহালে সেইটি নাই,
উঠান ভরা আছে শুধু চারটি তাহার ক্ষুরের দাগ,
আজকে আমার ফুরিয়ে গেছে কাজকর্ম্ম বেশীর ভাগ।
বাছুরটীকে বক্ষে ধরে চক্ষুজলে ভিজাই তাই,
হাম্বারব শুন্‌লে পথে অমনি বেগো চমকে চাই,
মা বলে সে দাঁড়াইত ফিরে এসে উঠানটিতে
ভরত না পেট তাহার মাঠে হায়রে গোটা খরানীতে
কাজ ফেলে সব ছুটে যেতাম ভাতের ফেনের হাঁড়ি নিয়ে
গা'র ঘাম যে নিতাম মুছে আপন কাপড় আঁচল দিয়ে,
লকলকিয়ে উঠেচে ঘাস জ্যৈষ্ঠ মাসের বাদলা পেয়ে,
আজকে সবুজ ঢেউ খেলিয়ে পুকুর পগার ক্ষেত্রে ছেয়ে।
পায়ের ভাগে দাঁড়াল জল ধানের চারা উঠলো বেড়ে
আজকে আমার শূন্য গোহাল গড়াগড়ি দুধের কেঁড়ে।
বাগান মুখো হয়নিক সে কভু চারাগাছের টানে,
খোঁয়াড়ে সে যায়নি কভু লয়নি কারো খামার পানে।
মরে গেলেও পরের ক্ষেতে ঘাসটি ছিঁড়ে খায়নি তবু
শিঙ দুটী তার মস্ত ছিল মারেনিক কাউকে কভু।
হাত না দিতে বাঁটে তাহার চালত সে দুধ ঝীরধারে
মোড়টী তাহার দুইটী হাতে ধরতে কেহ পারত নারে।
বাছুরটী তা'র ছুটে বেড়ায় পায়নাক যায় ঘাটে মাঠে
চোখ দিয়ে তার ধারা বহে কাতরে মার হাত পা চাটে।
পাতা কুটাই পেত সদাই পেতনাক ভাবনা তত
দেহ ছিল নাদুস নুদুস নরম ছিল ননীর মত।
ছেলে পুলে নাইক কিছু, মাত্র পুঁজি ছিলই সে যে,
তাইতে আমার গাইয়ের গোয়াল ছিল আপন ঘরের মেজে
তা'র বিহনে শ্মশান গৃহ ফুরাল আজ সকল কাজ
আমার আজি নাইক হাঁড়ি সন্ধ্যাকালে নাহিক সাঁজ।

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রাণ-মন্ত্র

আমার শোণিতময় প্রাণ, তুমি আজ এমন ধারা কেন? আমার শিরায় শিরায় তোমার যে দ্রুত স্পন্দন আজ সংসা মন্দীভূত হয়ে আস্‌ছে কেন? আমার অঙ্গে অঙ্গে তোমার যে শক্তি সঞ্চরণ কেন আজ নিথর হয়ে আস্‌ছে? ওগো আমার সঞ্জীবনী শক্তি, তোমার প্রভাবে রয়েছে আমার অদম্যশক্তি, হৃদয়ে আমার অসীম বল, তুমি আমাকে শক্তিমান করে আজ কেন হীনতেজ হতে চলেছ? আমার নয়নের দীপ্তি, শ্রবণের প্রখরতা, নাসিকার ঘ্রাণশক্তি, জিহ্বার সংগ্রাহিতা, ত্বকের স্পর্শানুভূতি সবই যে তোমার জন্য,—তুমি ছাড়া আমি কি?

তুমিময় আমি; আমার প্রতি বিন্দুতে যে তুমি তোমার সমস্ত সত্তাকে ওতপ্রোতভাবে অধিষ্ঠিত করেছ—তোমার প্রভাবে আমি যে জগতের অসুন্দরকে সুন্দর দেখে নয়নানন্দ লাভ করি, তুচ্ছ হীনকে মহনীয় বলে বরণ করে নেই, আমার ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় জগত-জ্ঞানের মধ্যে তুমি উদ্দেশ্য রূপে আমাকে বৈশিষ্ট্য হ'তে বাঁচিয়ে আন্‌ছিলে—আজ আমায় ত্যাগ করে কোথায় যাবে তুমি?

যে আমার সর্বময়-প্রাণ-প্রতিমা, তোমার অভাবে, আমার নয়নে মধ্যাহ্ন-সূর্য্য হীনপ্রভ, পূর্ণচন্দ্র ম্রিয়মান, শ্রবণে বিশ্বসঙ্গীতের মূর্চ্ছনা-মাধুর্য্য কেবলি কর্কশধ্বনি, যোজনগন্ধী মলয়মারুত শুধু নাসিকায় দুর্গন্ধসঞ্চরণ করিয়া আনে, সাগর-মথিত দেবতার কাম্য অমৃতও আমার জিহ্বায় কটু বিষের তিক্ত আস্বাদের বিরক্তি আনিয়া দেয়, মানবাত্মার উদ্বোধনকারী অমরার ভাবসম্পদও আমার হৃদয়ে শুধু একটা অবসাদ ও নিরানন্দের দীনতা আনিয়া দেয়। —তুমি যে আমার জীবনের সর্বকালে সর্বস্থানে, সর্ব সাধনায় নিজের প্রাণময় প্রকাশ-শক্তি দিয়ে ছেয়ে আছ। তুমি আমায় ছেড় না প্রিয়তম! আমি যে তোমার তুলনাহীন সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়েই জগতকে সুন্দর দেখি, তোমার কল্পনীয় কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য দিয়ে বিশ্বস্বরকে মধুর করিয়া লইয়াছি, তোমাকে লইয়াই আমি ভাব-সাধনার মধ্যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আমার তুমি সুন্দর, তাই নিখিল জগৎ সুন্দর, তুমি মধুর তাই সব মধু—তোমায় ছাড়িয়া যে আমি স্বর্গ সুখেরও কামনা করি না।

তুমিই আমার স্বর্গ, তুমিই আমার অমরত্ব—যে আমার অবিনাশী জীবনী-শক্তি তোমার অনুভূতিতে আমার আমার প্রাণ মন ভরিয়া তোল,—

On my Heaven and Immortality thou,
Oh thou art my indestructible life power
—come come oh thou.

আমার স্বপ্নের মুগ্ধ কল্পনে তোমার স্পর্শানুভূতির অমল আনন্দকে জাগাইয়া দিতে পার কি?

আমার প্রতি অঙ্গুলির মধ্যে তোমার অভাব, নয়নের সমস্ত দৃষ্টিটুকু ছাপিয়া তোমার অসীম বিরহ, আমার অধরে তোমার চুম্বন সুধার জন্য একি অতৃপ্ত তৃষ্ণা—

I will suck your soul through your lips.

তুমি এস প্রিয়ে, এস প্রিয়তম, তেমনি করে আমায় তুমি আমাকে পেয়োপ্লাব কর—

তুমি আমার সহযাত্রী হলে আমি জগত-পথে চির পথিকত্ব হ'তে পারি। তুমি আমার সহকর্মী হ'লে আমি জীবনের কর্ম-মহত্তার মধ্যে সফল হ'তে পারি,—এই সংসার পারাবারের অগণিত তরঙ্গভঙ্গকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারি, জীবনের সমস্ত যুদ্ধ, সব অভিযানে আমি বিজয়মালা নিয়ে ফিরে আসতে পারি—শুধু তোমার হাত ধরে। একা আমি বড় নিরুপায় এস তুমি আমার প্রাণময় শক্তি সম্ভবনী, তুমি এস—আমি সুখিত সিংহের আস্ফালন মানিব না, অতল-স্পর্শ সাগরের গভীরতা বিবেচনার মানদণ্ডে যাচাই করিব না, শুধু তোমাকে আমি চাই—বিরাট অস্তিত্বের দেশিধ্যান

জিজ্ঞাসা করিয়া ভীত হইব না, ভূমিকম্পেও হৃদয় কম্পিত হইবে না, বিপুল বন্যার শুধু আমাদের সোনার তরী সোনার ধানে পরিপূর্ণ করে জগতের যেখানে অভাব, দুঃখ, অবিশ্রাম সমস্বরে ক্রন্দন করে বলছে 'ত্রাহি ত্রাহি'—সেখানে সেই দুর্দিনের দেশে, ফিরে ফিরাব—

মহামারীর করুণ রোদন যখন চারিদিকে শ্মশানের ভয়ানীরবতার মধ্যে শোকার্ত্তের মর্ম্মভেদী চীৎকারের মত থেকে থেকে প্রলয়ের সূচনা করে যাবে তখন সেখানে আমরা যাব আমাদের সেবাধর্ম্মের নিরাময়বাণী নিয়ে—

অত্যাচার অবিচারের মধ্যে আমরা লোক-হিতব্রতে প্রাণ উৎসর্গ করে বলব—

দেবী প্রসন্নাস্যে হয়ে প্রসীদ—

যেখানে স্নেহ নাই অনুকম্পা নাই, প্রেম নাই দয়া নাই সেখানে আমরা, আমাদের দুর্বল প্রাণের পরিতৃপ্ত প্রেমকে আনিয়ে দিয়ে বলব—

ওগো আমরা তোমাদেরই—
শুধু তুমি এস মোর সকল কর্ম্মে
সকল ধর্ম্মে সকল মনন ধন
প্রাণহীন আর প্রেমহীন হয়ে
শ্রেষ্ঠ সাধনা কাহার সফল হয় ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ

কোন দুস্তর প্রাণ-সমুদ্রে উঠিল রে জাগি প্রাণতরঙ্গ ;
কলকল্লোলে দুর্ব্বার স্রোতে জাগিল রে কোন্ বিপুল রঙ্গ !
কত না যুগের আঁধার ভেদিয়া দেখা দিল পূবে নবীন সূর্য্য।
স্বর্গ হইতে ধ্বনিয়া উঠিল মঙ্গলস্বনে বিরাট তূর্য্য।
মহাঅম্বরে বাজে ডম্বরু ছন্দে ছন্দে ভারতবর্ষে—
উঠিল রে আজি ব্রাহ্মণদেব, নাচিল ভারত পুলকে হর্ষে।

হোম-অগ্নিতে পুড়িল সকল চিত্তের যত দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব !
ত্যাগের তিলক ললাটে লেপিয়া সকল চিত্ত হইল নগ্ন !
আলোকের সেই পারাবার তীরে চিত্তের সভা হইল দীপ্ত—
মহামানবের অম্বরতলে নব ব্রাহ্মণ জাগিল বৃত্ত।
বিশ্বসভার চিত্তআসনে বসে ব্রাহ্মণ পূর্ণ ইন্দু।
পূজা গৌরবে আপনার মাঝে উলসি উঠিল বিপুল সিন্ধু।

জপতপ আর দয়াদানধ্যান ভারতে আবার হইল বৃষ্টি—
ত্যাগের বিপুল বিমল আলোকে হইল আবার নূতন সৃষ্টি।
ওঙ্কার সনে বেদসঙ্গীত জুড়াল আবার সকল কর্ণ।
সত্য শুভ্র জ্ঞানের বিভাগে রচিত হইল নূতন বর্ণ!
প্রাণের মাঝারে জাগিল দেবতা-নবব্রাহ্মণ, তনূন্ ধর্ম্ম।
নিখিলের চিরসঙ্গীতরব হইল মানব চিত্ত-বর্ম্ম!

একিরে স্বপ্ন, শুধু মিছে কথা, শুধু কল্পনা অলস চিত্তে—
প্রসব বেদনা অনুভব যাহা—সে কি শুধু মায়া কেবলি মিথ্যে।
জাগরণ-গান-গুঞ্জন-ধ্বনি, সে কি শুধু মোহ, নহে কি সত্য?
বিশ্বাস-হারা রে চিরমূর্খ—বিশ্বাস করা এত কি শক্ত?
সীমা আছে শুধু, নাই কি অসীম, দৃষ্টই শুধু নাই অদৃষ্ট?
ভারতের নরনারী বিশ্বাসে নব ব্রাহ্মণ হবে না সৃষ্ট?

শ্রীরাধাবল্লভ নাগ

চিরন্তনী

সত্যকাম। চমকিত হইয়া জাগিয়া) আছ?—তুমি আছ

অলকনন্দা। এঁ্যা? এতদিন পরে অতিথিও এসেছে দেখছি! ওগো কুটিরের মানুষ অতিথি এসেছে তুমি কি দোর খুলবে না?

সত্যকাম। আমায় চিন্‌তে পারছ না, রাণি? আমি যে তোমারই এক জন আপনার জন।

অলকনন্দা। রাণী! কে রাণী কাকে রাণী বলছ? আমি এই কুটিরস্বামীর দাসী। আমি এই কুটিরের গোয়াল ঝুড়ুনী দাসী।

সত্যকাম। তুমি যা তাই গো! তুমি প্রভাতে কুমারী মধ্যাহ্নে যুবতী, সন্ধ্যায় বৃদ্ধা নিশায় একেবারে সবস্ব, তাই একেবারে অন্নদা! প্রভাতে সুজনরাগে অরুণা, মধ্যাহ্নে পালনের স্নেহে ভাষা, সন্ধ্যায় ধ্বংসের আনন্দে রক্তের মধ্যে শুভ্রা, নিশায় পরাগুহা সর্ব্বরাগবর্জ্জিতা। তোমায় ত চিনিছ গো।

অলকনন্দা। কি বলছ অতিথি! আমি যে দাসী,—আমি গোয়াল ঝাঁট দিয়ে, উঠন নিরকরে, গোবর ঘান তুলে চেঁচি পাড় দিয়ে এই এসে দাঁড়ালাম। কুটিরস্বামী কখন জাগবেন কি আদেশ করবেন সে আশায় দাঁড়িয়ে আছি। ঐ যে ভোর হচ্ছে,—এই যে অতিথি এসেছে ওগো প্রভু কি করতে হবে আদেশ কর! একি সাড়া নেই কেন? কৈ তোমার সেই তরুণ স্বর! কৈ তোমার রুদ্র স্বর তোমার দাসী দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে, আদেশ কর!

গণিত পুরাতত্ত্ব

আমরা গণিতশাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া থাকি বটে কিন্তু ইহার ধারাবাহিক উন্নতি কিরূপে সাধিত হইল সে সম্বন্ধে অনেকেরই জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি গণিতবেত্তার কথা উল্লিখিত হইল। ইহাদের সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা বিশেষ ধৈর্য্যসাপেক্ষ। অপরন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ইহা কতদূর পাঠক সাধারণের রুচিকর হইবে বলিতে পারা যায় না।

ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা অবগত হই যে প্রথমে বেবিলিয়নেরাই এক দুই প্রভৃতি সংখ্যা লিখিবার প্রণালী উদ্ভাবন করেন। তাঁহারা কতকগুলি রেখা সন্নিপাতের সাহায্যে সংখ্যা নিরূপণ করিতেন। কয়েকটী রেখা পরস্পর সাজাইয়া তাঁহারা এক হইতে দশ অবধি লিখিতেন। দুই তিনটী সংখ্যাযুক্ত অঙ্ক তাঁহাদের অনেক পরে ব্যবহৃত হয়। ভগ্নাংশের প্রচলন ইজিপ্টেই প্রথম আরম্ভ হয়। ইহারা পাটীগণিত ও জ্যামিতির কতকটা উন্নতিসাধন করেন। খ্রীঃ অব্দিয়ার ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে আহমিস (Ahmes) নামক এক চিন্তাশীল ব্যক্তি একখানি গণিতঘটিত পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তকখানির কিয়দংশ এখনও ব্রিটীশ মিউসিয়মে রক্ষিত আছে। তাহাতে ত্রিরাশিক সংক্রান্ত নানাপ্রকার জ্যামিতিক প্রশ্নের সমাধান আছে; কিন্তু যে সকল অঙ্কের উত্তর ইহাতে দেওয়া আছে তাহা অনেকস্থলেই স্বীকৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাটীগণিতের যে সকল অঙ্ক দেওয়া আছে তাহার সকলগুলিই প্রায় ভগ্নাংশ সংক্রান্ত।

তৎপরবর্ত্তী যুগে আমরা গ্রীকদিগের নাম পাই। জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি ও বক্ররেখা বিষয়ক গণিতে (conic sections) গ্রীকেরা প্রায় আধুনিক যুগের সমকক্ষ ছিলেন। থেলস (Thales) ও পাইথোগোরাস (Pythogoras) ইজিপ্টে গিয়া অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জ্যামিতি ও বর্গোদ সম্বন্ধে তাঁহাদের দুই একখানি পুস্তক আছে। ইউক্লিডের অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা থেলসের উদ্ভাবিত। ৪৭শ প্রতিজ্ঞা এখনও Pythogoras' Theorem বলিয়া কথিত হয়। পাইথোগোরাস একজন অসামান্য নীতিবিৎ ও দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি একটী সংঘের স্থাপনা করেন, তাঁহাদের মত এখনও Pythogorian School নামে উল্লিখিত হয়। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম সকল তাঁহারা খুব দৃঢ়ভাবে পালন করিতেন। পাইথোগোরাসের মতে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহসকলের ঘূর্ণন সঙ্গীতশাস্ত্রের তাল লয় মানের অনুপাতে। আরকাইটাস (Archytus) নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমেই জ্যামিতিশিল্প ও জ্যামিতিবিষয়ক বিদ্যার নিরোজিত করেন। কথিত আছে তিনিই কপিকল (pulley) সংক্রান্ত যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। প্লেটো (Plato) ইউডোক্সাস (Eudoxus), ইউক্লিড (Euclid) আরকিমিডিস (Archimides) এপোলোনিয়স (Appolonius) এবং হিপারকাস (Hipparchus) ইঁহাদের পরবর্ত্তী। পাইথোগোরাসের ন্যায় প্লেটোও প্রধানতঃ দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন। দর্শনশাস্ত্র ও গণিতের মধ্যে যে অতি নিকট সম্পর্ক আছে তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মতে যাহারা কখনও জ্যামিতি অধ্যয়ন করে নাই তাহারা দর্শনশাস্ত্রের কূটবিচার সকল বুঝিতে পারে না। তাঁহার গৃহের সম্মুখে লেখা থাকিত "যাহারা কখনও জ্যামিতি অধ্যয়ন করে নাই তাহারা যেন তাঁহার গৃহে প্রবেশ না করেন।" প্লেটোর Analysis (বিশ্লেষণ) দর্শন-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।

ইউডোক্সাস (Eudoxus) জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেকগুলি তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথমে প্রমাণ করেন যে গ্রহ উপগ্রহ সকল বর্ত্তুলাকার কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। তিনি ইউক্লিডের বহুপূর্ব্বে জ্যামিতি সংক্রান্ত অনেকগুলি

প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনিই বাস্তবিক প্রমাণের (method of exhaustion) আবিষ্কর্ত্তা। ইউক্লিডের জ্যামিতি তাঁহারই কতকগুলি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অপরাপর কতকগুলি পুস্তকের মধ্যে "Data" (নূতন প্রশ্ন সমাধানের উপায় সম্বন্ধীয় পুস্তক), Phenomena (গোলাধ্যায়), optics (আলোক-বিজ্ঞান) Catoptrica (আলো ও ছায়াঘটিত কতকগুলি সমস্যা) এইগুলিই সুপ্রসিদ্ধ।

আর্কিমিডিসের নাম জগদ্বিখ্যাত। পৃথিবীতে তাঁহার মত চিন্তাশীল ও দর্শনশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত খুব অল্পই জন্মিয়াছে। Mathematics সংক্রান্ত তাঁহার যে সকল পুস্তক আছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানিই উল্লেখযোগ্য।

(১) Equiponderance of plaues.
(২) On sphere & cylinder.
(৩) Conoids & spheroids.
(৪) The Sandcounter.
(৫) On floating bodies.
(৬) On Spirals.

ইনিই law of levers এর আবিষ্কর্ত্তা। একবার সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন "Give me a place to stand, I can move the earth", অর্থাৎ পদরক্ষা করিবার স্থান পাইলেই আমি সমস্ত পৃথিবী কক্ষচ্যুত করিতে পারি। Archimides যে সকল দুরূহ প্রশ্নের সমাধান করেন, তাহা বর্ত্তমান যুগের বড় বড় পণ্ডিতদিগকেও স্তম্ভিত করিয়া দেয়। তাঁহার অনন্ত সাধারণ অভিনিবেশ ও ধৈর্য্য ছিল। কথিত আছে যখন রোমীয় সেনা গ্রীস বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার গৃহ আক্রমণ করিল আর্কিমিডিস তখন এমনই তন্ময়চিত্তে যে মূর্খেরা পশ্চাৎ হইতে শির:শ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার বোধগম্য হয়। মিশ্রপদার্থের মধ্যে রৌপ্যিক ধাতুর পরিমাণ নিরূপণ করার উপায় তিনিই উদ্ভাবন করেন এ সম্বন্ধে গ্রীসের রাজার আদেশঘটিত গল্পটী বোধ হয় সকলেই জানেন। Appolonius আর্কিমিডিসের একজন বিখ্যাত শিষ্য। Conic section (চক্রবেখাঘটিত বিদ্যা) Appolonius এর প্রধান কীর্ত্তি। এ সম্বন্ধে তিনি যে আটখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন তাহার মধ্যে তিনখানি বহুকাল অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল। আরবেরা তাহা তাহাদিগের ভাষায় অনুবাদিত করিয়া প্রথম প্রকাশ করেন। Hipparchus ইঁহার সমসাময়িক ছিলেন, তিনি ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রশ্নের সমাধান করেন। তাঁহাকে একপ্রকার Trignometry'র আবিষ্কর্ত্তা বলা যাইতে পারে।

রোমানদিগের সময়ে গণিতশাস্ত্রের অতি অল্প উৎকর্ষ-সাধনই হইয়াছিল। যদিও সাহিত্যদর্শনে রোমানরা গ্রীক-দিগের সমকক্ষ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহারা উহাদের অপেক্ষা হীনতর ছিলেন। আর্কিমিডিস্ Appolonius এর পুস্তক সকল তাঁহারা আদৌ জানিতেন না। তাঁহারা পাটীগণিতের সাধারণ সাধারণ কতকগুলি প্রশ্নের বেশ সুন্দর সমাধান করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তীযুগে আমরা হিন্দুদিগের অভ্যুদয়ের সূচনা দেখিতে পাই। হিন্দুরা পাটীগণিতের ভূয়সী উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগকে একপ্রকার সংখ্যাগণনার আবিষ্কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। আর্য্যভট্ট ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্যের নাম এখনও গণিতজগতে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকে। আর্য্যভট্ট ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটলীপুত্রে বাস করিতেন। তিনি "আর্য্যভটীয়" গ্রন্থে গণিতের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্তের "ব্রহ্ম স্ফুটসিদ্ধান্ত" ও "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে প্রসিদ্ধ। প্রথমখানি ব্রহ্মগুপ্তের অসাধারণ ধীশক্তির পরি-চয় প্রদান করে। দ্বিতীয়খানিতে ব্রহ্মগুপ্তের আলোচনাজালে অঙ্কশাস্ত্রের অনেক জটিল সমস্যাপূরিত হইয়াছে। ত্রিবারার প্রণীত "গণিতসার" বিদ্বজ্জনসমাজে এখনও আদৃত। পদ্মনাভ বীজগণিত সম্বন্ধে নানা নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্যের কথা অনেকে জানেন, অনেকেই তাঁহার "লীলাবতী" ও "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" (বীজগণিত ঘটিত গ্রন্থ)র কথা শুনিয়াছেন। Indeterminate Equations সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা "লীলাবতী" ব্যতীত অপর কোন পুস্তকে এত নাই। তিনি যে সকল উপায়ে অঙ্কের সমাধান করেন তাহা অতীব অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যজনক। তিনি Surd

(বর্গমূল ও ঘনমূলযুক্ত অঙ্ক) ব্যবহার করিতেন। সরল ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধীয় তাঁহার একখানি পুস্তক ছিল তাহাতে পাওয়া যায়। কলেজের ছাত্রেরা জানেন ত্রিকোণমিতির চতুর্ভুজঘটিত একটি উপপাদ্যকে এখনও Brahmagupta' theorem বলিয়া কথিত হয়। তার পর ত্রিস্কন্ধজ্যোতিষের কথা। এ শাস্ত্রে তাঁহাদের ব্যুৎপত্তি অসাধারণ ছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও ত্রিস্কন্ধজ্যোতিষের এখনও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। ত্রিস্কন্ধ দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের ব্যবহার জানিতেন। তাঁহাদেরও hour circle, altazimuth প্রভৃতি ছিল। কাশীর মানমন্দির এখনও তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহাদের প্রস্তর নির্ম্মিত যন্ত্র সকল দেখিলে আমাদের মন যুগপৎ হর্ষে ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়।

শ্রীজগচ্চরণ মল্লিক এম্ এস সি,

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন ধর্ম্মধারণা

আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকল যত দূর বস্তু গ্রহণে সমর্থ, এবং আমাদিগের চিত্ত যতদূর কল্পনা করিতে পারে, তাহাতে দেখা যায়, নিয়তই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ক্রিয়া চলিতেছে। বিশ্বের তাবৎ বস্তুই এই দুই শক্তির অধীন। বাহ্যজগত ও অন্তর্জগত সর্ব্বত্রই এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে কার্য্য করিতেছে। ভালবাসা ও ঘৃণা, সৎ ও অসৎ, এই বিশ্বে নিয়তই ক্রিয়া করিতেছে। আমরা কাহাকে ভালবাসি, কাহাকে বা ঘৃণা করি; কাহারও আকর্ষণে আমরা আকৃষ্ট হই, কাহারও বা দূরে পলায়ন করি। কি কারণ, অবধারণ করা যায় না, তথাপি সর্ব্বদাই দেখা যায়, আমরা কোন অচিন্তনীয় কারণে প্রতিনিয়তই একজনকে ভালবাসিতেছি, অন্যকে দূর করিয়া দিতেছি। ধর্ম্ম মানবীয় ধারণার উচ্চতম আদর্শ, এই আদর্শেও বহুযুক্ত ভেদ হইয়াছে। "মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যকে ঘৃণা, এ দুই জিনিসই ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। ধর্ম্মের জন্য যত রক্তপাত হইয়াছিল, তত রক্তপাত আর কিছুতে হয় নাই; ধর্ম্মের নামে অনাথ আশ্রম ও অনাথ চিকিৎসালয় যত প্রস্তুত হইয়াছে, এত আর অন্য কিছুতেই হয় নাই। ধর্ম্ম মানুষকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর করে, ধর্ম্মই মানুষকে বিনীত করে। এ সকল এই পৃথিবীতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আবার হইবে।

এই যে বিসদৃশ ভাব, এ ভাবের সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? শতাব্দীর শেষভাগে জগত যেন প্রযুদ্ধ হইয়া উঠিল, সামঞ্জস্যের জন্য ব্যাকুল হইল, সমাজেও নানাপ্রকার সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। লোকে বলিতে লাগিল, জীবনের এ সংগ্রাম বিফল হইবার নহে। এখন যদি এই ধর্ম্মসংগ্রামে সামঞ্জস্য ও শান্তি সংস্থান করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে বাহ্যে উভয়ের সামঞ্জস্য হইলেও অন্তরে কখনই এক হইতে পারে না। বাল্যকাল হইতে ভালবাসা প্রেম, ভ্রাতৃভাব, একতা এবং সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব শুনিয়া আসিতেছি, বলিতেছি, করিতেছি, কিন্তু এ সকল কথা আমাদিগের নিকট অর্থশূন্য প্রলাপ তুল্য; কেননা উহা কখনই আমাদের জীবনে ব্যবহারে আইসে নাই। মহাত্মাগণ যখন এই সকল বাক্য সৃজন করিয়াছিলেন, তখন এ সকল শব্দের অর্থ লোকে জানিত, অর্থের মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিত, এখন আমরা অজ্ঞতাবশতঃ সেই সকল শব্দ লইয়া ক্রীড়া করিতেছি। আমাদের হাতে পড়িয়া ধর্ম্ম এখন খেলার

বিলিন হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম এখন আর ব্যক্তিগত ধর্ম্ম নহে; উহা এখন পিতৃ ধর্ম্ম, দেশের ধর্ম্ম, এমন কি জাতীয়-ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছি, ধর্ম্মের সার্বজনীন-সাধন, একান্ত দুরূহ ব্যাপার।

প্রত্যেক পরিচিত ধর্ম্মই তিন বিভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগ দর্শনশাস্ত্র, আপ্তবাক্য, ধর্ম্মের ধারণা, স্বর্গ কল্পনা, স্বর্গ লাভের উপায় ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিভাগ, পুরাণ। এই সকল পুরাণ মনুষ্যের জীবন-চরিত ও অলৌকিক পুরুষগণের বিবরণে পূর্ণ। বস্তুতঃ পুরাণ, দর্শনের সংক্ষিপ্ত সার। দর্শন-শাস্ত্রের বিষয়ই পুরাণে দৃষ্টান্ত সহযোগে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। আর তৃতীয় বিভাগ, লোকের কুলক্রমাগত লোকাচার। এই হইতেই নানা মূর্ত্তিপূজার উৎপত্তি। যে কোনও পরিচিত ধর্ম্ম অনুসন্ধান কর, এই তিনটী বিভাগ দেখিতে পাইবে।

প্রথম বিভাগের কথা প্রথমে বলি। এই পৃথিবীতে কি কোনও সার্বজনীন দর্শন আছে? না। প্রত্যেক ধর্ম্মই আপন আপন ধর্ম্মবিধানে পূর্ণ, এবং সর্ব্বসম্পন্ন বলিয়া গৃহীত। কেবল তাহাই নহে, প্রত্যেক ধর্ম্মের ধর্ম্মীরাই মনে করে, তাহাদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস না করিলে নিশ্চয়ই নরকে পতন হইবে। কোন কোনও ধর্ম্মের ধার্ম্মিকেরা মুখের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত নহে, তাহারা অপরকে তাহাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করাইবার জন্য তরবারী পর্য্যন্ত ব্যবহার করে। তরবারীর সাহায্যে ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন, এ বড় কৌতুককর ব্যাপার। বস্তুতঃ তাহারা ক্রূরতা নিবন্ধন যে এইরূপ ব্যবহার করে, তাহা নহে। ধর্ম্মিকের পীড়া। (Fanatic) উহাদিগের কথা পাগলের কথা হইতে অধিক মূল্যবান নহে।

এ পীড়া বড় উৎকট। মনুষ্য প্রকৃতিতে যতপ্রকার অপকর্ম্ম আছে, সে সকলই এই পীড়ার উপসর্গরূপে সর্ব্বদাই উপস্থিত হইতে পারে। মানুষ বাঘের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহার সাধারণ, মানুষকে ঠিক মানুষই রাখিবার উপায় যে পুরাণে আছে, তেমন বিশ্বজনীন পুরাণ এ জগতে আছে কি? নিশ্চয়ই নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই আপন আপন পুরাণ আছে। তবে বিশেষ এই, প্রত্যেক পুরাণই বলিতেছে, "আমার বর্ণিত কথা পুরাণ নহে।" খ্রীষ্টি-দিগের বিশ্বাস, ভগবান্ দূরদূরান্তে স্বর্গ হইতে স্বর্গে নামিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, "ইহা ইতিহাস, পুরাণ নহে।" হিন্দুরা বলেন, "ভগবান গো-মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন।" খৃষ্টানেরা বলিলেন, "উহা কুসংস্কারময় পুরাণ, ইতিহাস নহে।" ইহুদীরা ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, যেমন তেমন মূর্ত্তি গড়িয়া, তাহার এক পার্শ্বে স্বর্গদূতের মূর্ত্তি বসাইতে পারিলেই মনে করে, এ মূর্ত্তি পবিত্র হইতেও পবিত্র; কিন্তু যদি ঐ মূর্ত্তিতে কোনও স্ত্রী কি পুরুষের চিত্র অঙ্কিত করা যায়, তাহারা বলে, "এ অপবিত্র মূর্ত্তি, এখনি ভাঙ্গিয়া ফেল।" আমাদের পুরাণে পরস্পর একতা এতদূর। যদি কোনও ব্যক্তি বলে, আমার গুরু এই এই অলৌকিক কার্য্য সকল সাধন করিয়াছেন; ভিন্নধর্ম্মীরা বলিবে, "এ অতি কুসংস্কার, কিন্তু তাহাদের গুরুগণও এইরূপ অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছেন, সে বিবরণ, ইতিহাস।" বাস্তবিক কিন্তু আমি যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে পুরাণ ও ইতিহাস, এ দুয়ের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে, এমন লোক ত খুঁজিয়া মিলে না। বস্তুতঃ ঐ সকল গ্রন্থ, অতি সামান্য ইতিহাসমিশ্রিত পুরাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তার পর লোকাচার। প্রত্যেক জাতিরই লোকাচার ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক জাতিই আপন আপন লোকাচারের প্রশংসা, এবং অন্যান্য লোকের লোকাচারের নিন্দা করিয়া থাকে।

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব, এ কথা অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কতদূর সৌভ্রাত্র কি করিলে সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, কৈ, তাহার চেষ্টা করিতে কাহাকেও ত দেখি নাই। একটী পুরাতন গল্প মনে পড়িয়াছে। তখন ভারতবর্ষে সুরাপান পাতকের মধ্যে গণ্য। দুই বন্ধু একত্র গোপনে একটু মদ্যপান করিবার অভিপ্রায়ে, বাটীর এক নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিল, এবং একজন বলিল, "চুপ, খুড়া যেন শোনে না।" খুড়া বড় গোঁয়ার লোক ছিলেন। ক্রমে সুরা উদরস্থ হইতে লাগিল, উভয়েরই নেশা হইল, তথাপি উভয়েই খুব সতর্ক। সুরাপান করিতে করিতে উভয়েই বলিতে লাগিল "চুপ, খুড়া যেন শোনে না।" সুরার অধিক মাত্রায় ক্রমে মত্ততা জন্মিল, কথা ক্রমে বড় হইয়া আসিল, উভয়েই শেষে চীৎকার করিয়া মত্ততার ঘোরে বলিতে

লাগিল, "চুপ, খুড়া যেন শোনে না।" ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাহার বন্ধুর তীৎকারে খুড়ার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ব্যাপারটা বেশই বুঝিলেন। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব, তাহার সাদা অর্থ, "আমরা সকলেই এক, অতএব সকলে আইন, আমরা একটা জাতি হই।" যখনই এমনই একটা বিশ্বজনীন জাতির উৎপত্তি হইবে, নিশ্চয়ই জানিও, উহার উৎপত্তিতেই ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। মুসলমান বুঝে, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব, কিন্তু যে মুসলমান নহে, তাহার গলা কাটিতে তাহার অসি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। খ্রীষ্টানেরা বলেন, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব, কিন্তু যে অখ্রীষ্টান, তাহাকে নরকের পথ দেখাইতে সতত আগ্রহবান্। কলতঃ আমরা ইহাকে সমধর্ম্ম, সমবর্ণ সমকর্ম্ম লইয়া ত জন্মগ্রহণ করি নাই! শীতের মেঘ সহস্র গর্জ্জন করিলেও বর্ষণ হয় না, অথচ বর্ষার গর্জ্জনহীন মেঘ প্রচুর পরিমাণ বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের কর্ম্মও ঠিক এই প্রকার। যাহারা কর্ম্মী, তাহারা বিকল গর্জ্জনের অবকাশ পায় নাই, কখনই তাহারা ঘুরায় না। যাহারা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের মর্ম্ম বুঝে, তাহারা কথা কহিবার সময় পায় না, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে সমস্ত লোকসমষ্টি লইয়া যে একটা জাতি প্রস্তুত করিবে, এ কল্পনাও তাহাদের মনে কখনো উঠে না। কলতঃ তাহাদিগের ভাব কর্ম্ম, ভাবই শরীর, গমন ভ্রমণ, চলন বলন, এমন কি শয়ন ভোজন পর্য্যন্তও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবময়। তাহারা এই বিশ্বের প্রীতির জন্য জীবন ও ভাবে কৃতকর্ম্ম অকাতরে দান করিতে প্রস্তুত। যথার্থ যাহারা এতাদৃশ ভ্রাতৃভাব অনুভব করিতে পারে, তাহারা বাচলতা করে না, কাজ করে। পৃথিবীতে বাক্যটা বড় বাড়িয়া গিয়াছে। এখন কথা অপেক্ষা কাজই কিছু অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হইয়াছে।

এই অনন্ত মনুষ্যসমাজ, এ সমাজে কি প্রকারে এই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। তুমি আমি উভয়েই মানুষ, কিন্তু আমরা উভয়ে কি এক? যে পাগল, সেই বলে এক। শরীর, শক্তি, বুদ্ধি, এ সকল বিষয়ে তুমি আমি কখনই তুল্য নহি। এক ব্যক্তি অপর হইতে বৃদ্ধ, ইহারা কি এক? একজন অন্ধ হইতে বুদ্ধিমান, ইহারা কি এক? একজন খঞ্জ হইতে ভাল দেখিতে পায়, ইহারা উভয়ে কি সমান? কখনই না। আরও দুইটী উদাহরণ লও। এই আমরা এখানে সকলেই মনুষ্য; কিন্তু ইহার মধ্যে কেহ কাল, কেহ সাদা, কেহ দীর্ঘ, কেহ খর্ব্ব; মনুষ্যজাতির মনুষ্যত্বই বা তবে কোথায়? আমিত খুঁজিয়া পাই না। একটী পুরুষ কি স্ত্রী, সুন্দর কি কুৎসিৎ, কাল কি সাদা, এ অনায়াসে বলিতে পারি, কিন্তু তেমনটী আর দ্বিতীয় দেখিতে পাই না। এই যে সকল ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন কাহারও মুখ ত অন্য জনের অনুরূপ নহে! তবে মানুষের বিশেষত্ব মনুষ্যত্ব থাকিল কৈ? একতা রহিল কৈ? বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবেরই বা অস্তিত্ব কৈ? আমি বুঝি, মনুষ্যজাতির বিশ্বজনীন একতা সেইখানে, যেখানে এই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শরীরের কোনও সম্পর্ক নাই। বর্ণ আকৃতি, বুদ্ধিবিদ্যার সমভাব, দুইজন মনুষ্যেই অসম্ভব, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের সম্ভাবনা কোথায়? তবে এই সমভাব "মনুষ্যত্ব" এই এক বিশেষ সংজ্ঞায় নিবদ্ধ। মনুষ্যের এই মনুষ্যত্বের নামই ঈশ্বর। ঈশ্বরেতেই আমাদের স্থিতি, গতি এবং উৎপত্তি। তাঁহাতেই এবং তাঁহার দ্বারায় আমাদের উৎপত্তি। ইহাতেই কেবল বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের আভাস দেখিতে পাই। মানুষ আর কিছুতেই এক নহে, কেবল এক একতা, ঈশ্বরে। যে যেমন মানুষ কেন হউক না, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস তাহার অস্থি। এ অস্থিরতা কেবল জীবনব্যাপী নহে, অনন্তকালস্থায়ী। "এ সেই একই সূত্র, যে সূত্রে সকল রত্নই গ্রথিত আছে।" প্রত্যেক জাতি এক এক রত্ন। রত্ন ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সূত্রের যিনি অধিকারী, তিনি রত্ন নির্ব্বিশেষে সকলই সেই একই সূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। সে গ্রন্থি কেহ জানে, কেহ জানে না, তথাপি এ গ্রন্থির বন্ধন চিরস্থায়ী। মনুষ্যত্বে তুমি আমি এক কিন্তু তুমি শ্রীঅমুক, এবং আমি শ্রীঅমুক, আমরা উভয়ে এক নহি। তুমি পুরুষ, সুতরাং স্ত্রীলোক হইতে তুমি স্বতন্ত্র, কিন্তু মনুষ্য জাতি বলিলে, স্ত্রী ও পুরুষের কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকে না, কেন না স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েই মনুষ্যজাতি। স্ত্রী, পুরুষ, জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ সকল, কিন্তু জীবন্ত প্রাণী বলিলে, ঐ সকলে কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না, উহারা সকলেই জীবন্ত প্রাণী। আরও একটু বুঝে যাও,

পৃথিবীর সকল বস্তুই স্বতন্ত্র দেখিবে, কিন্তু যখন জগতের অভিন্নসূত্র সমস্ত বস্তু বলিয়া বুঝাইবে, তখন পৃথিবীতে ও তোমাতে কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্যভাব থাকিবে না। সেই স্বাতন্ত্র্য-শূন্যার্থ ঈশ্বর। আর এই সর্ব্বসমবায়ী একতা, এই বিশ্ব। তাঁহার নিকটেই আমরা কেবল সমান, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আমরা সকলেই পৃথক পৃথক। আমাদের কর্ম্ম, আমাদের উৎসাহ, এ সকলই পৃথক পৃথক। বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, উহা এমন একটী ধর্ম্ম, যাহা বিশ্বের সকল লোকেই বিশ্বাস করিতে পারে। পরন্তু ইহা একান্ত অসম্ভব। যদি আমরা এমন কোনও বিশ্ব-বিশ্বাসী পুরাণের আশা করি, তাহাও বিকল্পনা। বিশ্ব প্রচলিত একই লোকাচারেরও কোনও সম্ভাবনা নাই। সে দিন যখন, হইবে, তখন পৃথিবী ধ্বংস হইবে, কেন না বিশেষত্বই জীবনের প্রধান হেতু।

বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিলে আমি কি বুঝি? বিশ্বজনীন দর্শন কি বিশ্বজনীন পুরাণ অথবা বিশ্বজনীন লোকাচারের কথা আমি বলিতেছি না, আমি বলিতেছি, পৃথিবী ঠিক যেমন চলিতেছে, ঠিক তেমনই চক্রে চক্রে চলিয়া যাইবে, এ চক্র অত্যন্ত বিসদৃশ এবং অতিশয় আশ্চর্য্যজনক! সেই চক্র যাহাতে অবাধে চলিতে পারে, আমরা কেবল তাহারই চেষ্টা করিব। সত্তা শত সহস্র প্রকারে প্রকাশিত হইতে পারে, এবং সেই প্রত্যেক সত্তাই সত্তা। একই বৃক্ষ শত সহস্র স্থানে দাঁড়াইয়া নয়নগোচর করা যাইতে পারে, কিন্তু সকলেই সে বৃক্ষ সমভাবে দেখিতে পায়। মনে কর, কোনও এক ব্যক্তি একস্থানে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের প্রাতঃকালের অনুজ্জ্বল সোণাকার মূর্ত্তি দেখিল। সে ক্রমে সূর্য্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং প্রতি সহস্র হাইল পথ গিয়া সূর্য্যের একএকখানি ফটো চিত্র লইল। যখন সে সূর্য্যের নিকটে গিয়া পৌঁছিল, তখন দেখিল, শত সহস্র ফটো চিত্রে শত সহস্র ভিন্ন ভিন্ন আকারের সূর্য্যমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে। সেই শত সহস্র মূর্ত্তিই সূর্য্য মূর্ত্তি, কিন্তু কোনও মূর্ত্তির সহিত অন্য মূর্ত্তির কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। ভগবানও ঠিক তেমনি। কি মহৎ কি ক্ষুদ্র, উচ্চ কি ইতর দর্শন দ্বারায় হউক, উন্নত কি হেয় পাত্র দ্বারায় হউক, কিম্বা সুসংস্কৃত পুরাণ বা সুযুক্তিসম্পন্ন লোকাচার দ্বারায় হউক, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ধর্ম্মী জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, উন্নতি-প্রয়াসী; সেই ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে অভিলাষী। সেই সকল লোকে যাহা কিছু দেখে, সে তাঁহাকেই দেখে, যাহা কিছু ভাবে, সে তাঁহাকেই ভাবে। মনে কর আমরা ভিন্ন ভিন্ন পাত্র লইয়া কোনও সরোবর হইতে জল আনিলাম, কেহ ঘড়া, কেহ ঘটী, কেহ কলসী, এমন প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে করিয়া জল আনিলেও প্রত্যেকেরই আনিত জলই যেমন সেই সরোবরের জল; ধর্ম্মও ঠিক সেই প্রকার। আমাদের চিত্ত সেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জলপাত্র, আর ভগবান্ জল। আমাদের চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন হইলেও এবং আমরা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিলেও তিনি সেই একই ঈশ্বর। বিশ্বের একতা কেবল এই এক স্থানেই আছে, অন্যত্র সম্ভবে না।

এ সকল কথা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষ কোনও ক্রিয়া কি নাই? অতি প্রাচীন কাল হইতেই চেষ্টা চলিতেছে। ভারতে আলেকজন্দ্রিয়ায়, ইউরোপে, চীনে, জাপানে, মিসরে, সর্ব্বত্রই একই ধর্ম্ম সংস্থাপনের বিস্তর চেষ্টা হইয়াছিল, এখনও হইতেছে, কিন্তু ফল তেমন আশাজনক হয় নাই। যুদ্ধের পরিবর্ত্তে ভালবাসার বন্ধনে বাঁধিবার জন্য সর্ব্বত্রই সমধর্ম্ম প্রচলনের চেষ্টা বিফল হইবার একমাত্র হেতু, প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার অভাব। তাঁহারা স্বীকার করেন যে এই সকল ধর্ম্মমত এক, কিন্তু কেমন করিয়া ঐ এক ধর্ম্ম চাষালম্বীদিগকে একই সূত্রে আবদ্ধ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না। সেই প্রত্যক্ষক্রিয়ার অভাবেই এ সংসারে নানাধর্ম্মী ও নানা ধর্ম্মমত সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্ম্মমতে অবিচলিত রাখিয়াও এক স্থানে বিশ্ববাসীর সহিত একতা প্রদর্শন করাই, সেই প্রত্যক্ষ-ক্রিয়া। বিশ্ববাসীর ধর্ম্মমত ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ধর্ম্মের অন্তরাত্মা দেবতা এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না।

আমার উদ্দেশ্য অতি সামান্য। এ উদ্দেশ্য কখনও কার্য্যকরী হইবে কি না জানি না, তথাপি উহা আপনাদিগের সম্মুখে তর্কালোচনার জন্য উপস্থিত করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য, "ধ্বংস করিও না। একদেশদর্শী সংস্কার কখনও

পৃথিবীর উপকার করিতে পারে নাই। তাহাও না, বরং পার ত গড়। পার ত সাহায্য কর, না পার হাত গুটাইয়া বসিয়া থাক; যাহা হইতেছে হইতে দাও।" যদি সাহায্য করিতে না পার, ক্ষতি করিও না। সকল লোকের কৃত-কর্ম্মের উপর সহসা মন্তব্য প্রচার করিও না। মানুষ যেমন আছে, তাহাকে তেমনি থাকিতে দাও। ভগবান্ এই বিশ্বের কেন্দ্রবর্ত্তী এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যে যেখানেই কেন থাকুক না, প্রত্যেকে নিশ্চয়ই কেন্দ্রলগ্ন হইতে পারে। সেই কেন্দ্রলগ্ন হইলেই তখন সকল বিসম্বাদ, সকল বিসদৃশ অবস্থা এবং "সর্ব্বপ্রকার পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়া, কেন্দ্রলগ্ন সকলেই সমভাব প্রাপ্ত হইবে। তাই বলি, ধ্বংস করিও না। আমরা প্রত্যেকে স্বভাবতঃই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে উন্নতি লাভ করিয়াছি, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সেই উচ্চ সত্য হইতে আসিতেছে। এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিজের শিক্ষক। তুমি কি মনে কর যে, একটী শিশুকে শিক্ষা দিবার শক্তি তোমার আছে? শিশু নিজের শিক্ষা নিজেই শিক্ষা করে, তুমি কেবল তাহার শিক্ষাপথের বাধাগুলি সরাইয়া দাও মাত্র। গাছ বড় হয়, তুমি কি তাহাকে বড় করিতে পার? তুমি বেড়া দিয়া দিলে, যাহাতে জন্তুতে গাছটী নষ্ট করিয়া না ফেলে তাহার ব্যবস্থা করিলে, এইমাত্র তোমার কর্ত্তব্য। গাছ আপনিই বাড়িয়া থাকে। মানুষের ধর্ম্মোন্নতির পর্য্যায়ও ঠিক এইরূপ জানিবে। কেহ তোমাকে শিক্ষা দিতে পারিবে না, কেহই তোমাকে ধার্ম্মিক করিতে পারিবে না, তুমিই তোমার নিজের শিক্ষক, তোমার উন্নতি তোমা হইতেই হইবে।

সাংসারিক শিক্ষক কি শিক্ষা দিবেন? তিনি ধর্ম্মপথের বাধাবিপত্তি সকল দূর করিতে পারেন মাত্র। ইহা হইলেই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল। অতএব যদি পার ত সাহায্য কর, ধ্বংস করিও না। তুমি মানুষকে ঐশ্বরিক শক্তি দান করিতে পার, এ কল্পনা পরিহার কর। কেননা উহা অসম্ভব। তোমার নিজ আত্মা ভিন্ন অন্য শিক্ষক আর দ্বিতীয় নাই। ইহাই স্বীকার কর। সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক আছে, সেই সকল ভিন্ন প্রকৃতির লোকের চিত্তও ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবার জন্য এই ভিন্ন শ্রেণীর লোক সমূহকে বিভাগ করিতে হইলে স্থূলতঃ আমি এই মনুষ্য সম্প্রদায় চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। প্রথম—চৈতন্যযুক্ত কর্ম্মীগণ লোক। ইহাদের অতুল উৎসাহ ও প্রভূত শক্তি কেবল কর্ম্মই প্রার্থনা করে, কর্ম্ম করিতে পাইলেই সে কৃতার্থ হয়। দ্বিতীয়—ভক্ত। এ জগতে যাহা কিছু সুন্দর তাহাই সে চিন্তা করে, যাহা স্নিগ্ধ মধুর, তাহারই সেবা করে, প্রীতি এবং প্রীতির ঈশ্বরকে ভাবনা করিতে পাইলেই সে সন্তুষ্ট। পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণের প্রতি তাহার অসীম বিশ্বাস। ধর্ম্মযাজক, সাধু-সিদ্ধ এবং এই পৃথিবীতে ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাই। খ্রীষ্ট ছিলেন কিনা, বুদ্ধ ছিলেন কিনা, এ সকলের প্রমাণ সংগ্রহে তাহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই; বাইবেলের "পর্ব্বতে উপদেশ" কোন তারিখে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার অভ্রান্ত সনতারিখ সংগ্রহেও তাহার লক্ষ্য নাই; সে নিজেকে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াই সুখী। এমনই তাহার ধারণা। প্রণয়ীর প্রকৃতিও ঠিক এইরূপ। সেও ভক্ত। তৃতীয়—জ্ঞানী। আপনাকে আপনি চিনিবার জন্য, মনুষ্য হৃদয়ের ক্রিয়া সকল পরীক্ষার জন্য, আত্মতত্ত্ব দর্শনানুসারে চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া সকল জানিবার জন্য, এই শ্রেণীর লোক প্রয়াসী। চতুর্থ—দার্শনিক। ইহারা সকল পদার্থেরই পরিমাণ পরিমাপ করিয়া থাকেন, এবং দর্শনশাস্ত্রের অতীতেও কখনো কখনো বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ধর্ম্মই এই চারি শ্রেণীর লোক-দিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সক্ষম। মানুষে যাহা চায়, প্রতি ধর্ম্মই তাহা দিতে পারে। মনে কর কোনও জাতির ধর্ম্ম কেবল প্রেম ও ভক্তির উপদেশ দিয়া থাকে। সে ধর্ম্ম, জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুকুমার বৃত্তিরই উপদেশ দেয়; কিন্তু যদি বল, "আমি স্নিগ্ধমধুর প্রেম চাহি না, একটু তীব্র রসের আস্বাদনে আমি প্রয়াসী।" তখন দেখিবে, সে ধর্ম্ম তোমাকে প্রেম ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারিবেনা। অথচ তোমার এই প্রয়াস যাহাতে সম্পূর্ণ বিফল হয়, তাহারই চেষ্টা করিবে।

এইরূপ কোনও দার্শনিক শ্রেণীর নিকট গিয়া বল, "মহাশয়, আমার ঐশ্বরিক শক্তি কিসে লাভ হয়, বলিতে

পারেন?" দার্শনিক হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি যুক্তি জান না, ঐশ্বরিক শক্তির তুমি কি বুঝিবে? ইহারাই উচ্চ দার্শনিক। ইহারা তোমার পথপ্রদর্শক। জড়োপাসককে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তুর অস্তিত্ব, মানসিক শক্তি ও তাহার অবস্থা, এ সকল অতি বিশদভাবে বুঝাইবেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা কর, "আমি দর্শনবিজ্ঞান-জ্ঞানশূন্য সামান্য গৃহস্থ, অত শত বুঝি না; যে কর্ম্ম আমার যোগ্য, আমি যে কর্ম্ম করিতে পারি, তাহাই আদেশ করুন।" জড়োপাসক বিদ্রূপ করিয়া অমনি বলিবেন, "লোকটা কি মূর্খ। সে যে কেহই না, কিছুই না, ইহা বুঝে না? আমরা বলি, তুমি গলায় দড়ি দিয়া মর। তোমার অস্তিত্ব অসারণ।" সংসার অধুনা এইরূপই চলিতেছে। এই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে এক ঘরে পুরিয়া, তাহাদের আত্মসম্ভোষ প্রস্ফুরিত মুখমণ্ডলের ছবিখানি তুলিতে ইচ্ছা হয়।

মনুষ্য প্রকৃতি ও বস্তুর ইহাই স্বাভাবিক। আমি এখন এমন একটী ধর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে চাই, যাহা প্রতি মনুষ্যমাত্রই সসম্ভ্রমে উহা গ্রহণ করিতে পারে। সে ধর্ম্ম সকল জাতিরই দর্শনসম্মত, সে ধর্ম্ম সকল জাতির নিকটেই তুল্যরূপে ভক্তি, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসীল। তোমাদের কালেজী অধ্যাপকেরা, তোমাদের বৈজ্ঞানিক ও শারীরবিদ্যাবিদেরা, সকলেই যুক্তি চাহিবেন। বলিবেন, তোমার সেই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের যুক্তি কোথায়? তাঁহারা যুক্তিজাল যতদূর বিস্তারিত করিতে পারেন, সে ধর্ম্ম তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক যুক্তিরাশিতে পরিপূর্ণ। তাহার এমন একটী সীমা আছে, অধ্যাপকেরা সে স্থানে পৌঁছিয়া নিশ্চয়ই বলিবেন, "আর কাজ নাই।" যদি কেহ কুসংস্কার বলিয়া ত্যাগ করেন, ঈশ্বরের এই প্রকার ধারণা, এবং যুক্তি, কুসংস্কার; আমি তৎক্ষণাৎ বলিব, "মহাশয়, এই দেহই যে সর্ব্বপ্রধান কুসংস্কার! এই নশ্বরদেহ ত্যাগ করুন। এই মরণশীল দেহে আন্তরিক বিশ্বাস, এ যে ঘোরতর কুসংস্কার; কুসংস্কারময় এ শরীর আপনি ত্যাগ করুন। যদি তা না পারেন, নীরব হউন।" একই বিশ্ব, একই পৃথিবী, যে দর্শন ইহা শিক্ষা দেয়; সেই দর্শন যে ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, এমন ধর্ম্মই আবশ্যক। দার্শনিক আইসেন, মনোবৃত্তির পূর্ণবিকাশ সেই ধর্ম্মে দেখিতে পাইবেন; জড়বাদী আইসেন, তত্ত্ব অস্তিনাস্তত্ত্ব সে ধর্ম্ম হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন; ভক্তিমান আইসেন, তাঁহার সম্মুখে ভক্তির উৎস খুলিয়া যাইবে, সে ভক্তিস্রোতে তখন আমরা মনের উল্লাসে ভাসিয়া যাইব; যদি কর্ম্মী আইসেন, তাঁহার সম্মুখে যথাযোগ্য কর্ম্মরাশী স্থাপন করিব, পরন্তু ইহাই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের লক্ষণ। যদি ভগবানের কৃপা হয়, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের মানবমণ্ডলী যদি এক প্রাণ এক মন হয় এবং সেই প্রাণে তুল্যরূপে জ্ঞান, কর্ম্ম, শক্তি ও ভক্তির বিকাশ হয়, এবং যদি ঐ সকল যথার্থ আদর্শ অভিমুখী হয়, আমার মতে তবেই যথার্থ মানুষ হওয়া যায়। ইহাকেই আমি পূর্ণ মনুষ্য বলি। জ্ঞান, কর্ম্ম, শক্তি ও ভক্তি, যাহাদের হৃদয়ে এই চারিটীর তুল্য বিকাশ নাই, তাহারা অংশমনুষ্য। ইহারা যে পথের পথিক, সেই পথ, অন্য পথে গেলে ইহারা প্রায়ই পথ হারাইয়া ফেলে। রোমে পৌঁছিবার যে একটী মাত্র পথ নহে, ইহাদের ধারণায় ইহা আসে না। ফলে প্রত্যেক মনুষ্য উপরোক্ত বিষয় চতুষ্টয় যাহার সাহায্যে তুল্যরূপে আয়ত্ত করিতে পারে, আমি তাহাকেই বিশ্বজনপ্রদর্শীয় ধর্ম্ম বলি। আমাদের দেশে ইহাকেই যোগ বলে। এই যোগ ঈশ্বর ও মনুষ্যকে একত্র যোগ করে, ছোট ও বড়কে একতাবন্ধনে আবদ্ধ করে, যাহারা কর্ম্মী, এই বিশ্বস্থ লোকমণ্ডলীর সহিত তাহার সংযোগ করিয়া দেয়। কর্ম্মী তখন এই বিশ্ববাসী ও আপনি, অন্তর দেখিয়া বিশ্বহিতে স্বীয় কৃতকর্ম্ম ন্যস্ত করিয়া অক্লান্ত-উৎসাহে কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে থাকে। যাহারা প্রেমিক, তাহাদের সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম প্রতিভাত হয়, ইহাতেই নাম যোগ। যাহার সাহায্যে কর্ম্মী কর্ম্ম পায়, জ্ঞানী জ্ঞান পায়, প্রেমিক প্রেম পায়, ভক্ত ভক্তি পায়; তাহারই নাম যোগ। যাঁহারা এই যোগের আচরণ করেন, তাঁহারা যোগী। যাঁহারা কর্ম্মবাদী—কর্ম্মী, তাঁহারা কর্ম্মযোগী, যাঁহারা ভক্তির অন্বেষী, তাঁহারা ভক্তিযোগী; যাঁহারা বিভূতির প্রয়াসী, তাঁহারা রাজযোগী এবং দার্শনিকজ্ঞানের যাঁহারা অভিলাষী, তাঁহারা জ্ঞানযোগী।

প্রথমে রাজযোগের কথাই বলি। রাজযোগ কি? এ দেশের (আমেরিকার) লোক যোগ শুনিয়াছে বটে এক

একটী শব্দের বিশ্লেষণ করে বলাইয়া উহার অর্থ যতদূর বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সকলে আমার কথিত যোগশব্দ বুঝিবেন কিনা, জানি না। যে চারিশ্রেণীর যোগীর কথা আমি বলিলাম, ইহারা কেহই তর্কের ধার কিছুমাত্র ধারেন না, কেহ যুক্তিরও অনুরাগী নহেন, তাঁহারা নিজের তর্ক-যুক্তিতে নিজেই বিভোর।

সকল প্রাণীরই জ্ঞানের তিনটী দ্বার। প্রথম বুদ্ধি—ইহা ইতর সাধারণ সকলেরও আছে, ২য় যুক্তি—ইহা মানুষেরই আছে, ৩য়,—দৈব বিকাশ (inspiration)। পশুবুদ্ধির ক্রিয়ার পরিধির সীমা, যুক্তির ক্রিয়া সুতরাং পশুবুদ্ধির ক্রিয়া হইতে বিস্তীর্ণ, এবং যুক্তির ক্রিয়া হইতে দৈববিকাশের ক্রিয়াবলী অত্যন্ত বিস্তীর্ণ। পশুবুদ্ধি পশুসমাজেই আবদ্ধ, মানবীয় যুক্তি এই বিশ্বস্থ মানবমণ্ডলীর মধ্যে নিবদ্ধ, এবং দৈববিকাশ এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিস্তীর্ণ। এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই দৈববিকাশ হইতেছে।

উদাহরণ স্বরূপে মনে কর, আমাদের অনুভব শক্তি। আমরা জড় ও শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, কিন্তু জড় কি? যাহা শক্তির দ্বারা ক্রিয়াশীল। শক্তি কি? যাহা জড়ের উপর ক্রিয়াশীল। দেখ, কথাটা কতদূর কঠিন। শক্তি না বুঝিলে জড় বুঝিতে পারি না, জড় না বুঝিলে শক্তি বুঝি না, অথচ জড়ের সাহায্য ভিন্ন শক্তিকেও বুঝিতে পারা যায় না এবং শক্তির সত্য পরিচয় না জানিলে জড়ের জড়ত্ব বিষয়েও কিছুমাত্র জ্ঞান জন্মে না; ব্যাপারটী বুঝুন। এই বিশ্বের যেটুকু আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভবে আনিতে পারে, বিশ্বের যতটুকু আমি ভাবিতে পারি—আয়ত্ত করিতে পারি, আমার বিশ্ব সেইটুকু। আমার সেই ধারণাসীমাগত বিশ্বই আমার পক্ষে পূর্ণবিশ্ব। বাস্তবিক কিন্তু উহা অনন্ত বিশ্ব-প্রকৃতির একটী বালুকাকণা মাত্র। এই ধারণাতীত বিশ্ব-সৃষ্টির কতটুকু মানবীয় বুদ্ধি ধারণায় আনিতে পারে, অনুভব করিতে পারে? যে শক্তিবলে মনুষ্য নিজের ধারণার অতীত বস্তুও ধারণা করিতে পারে; যাহার সাহায্যে মানুষ মনুষ্যসাধ্য বুদ্ধির অতীত বস্তুও ধারণা করিতে পারে, তাহারই নাম দৈববিকাশ। সুতরাং পশুবুদ্ধি, যুক্তি ও দৈববিকাশ জানিবার পক্ষে এই তিনটী জ্ঞানের দ্বার। পশুবুদ্ধি পশুর, যুক্তি মানুষের এবং দৈববিকাশ সিদ্ধপুরুষের (Godmen) সম্পত্তি। প্রতি মানুষেরই এই তিনটী জ্ঞানের অঙ্কুর নিহিত আছে, বুদ্ধি, যুক্তি ও দৈববিকাশে সেই সকল জ্ঞানাঙ্কুর বিকশিত এবং পরিণত হইলে এই বিশ্বপ্রকৃতির কিছু অজানা অচেনা থাকে না। পরন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে এই তিনটী এক অপরের পরিণতি। যুক্তির পরিণতি ঘটিলে মনুষ্যে দৈবীশক্তির বিকাশ ঘটে সুতরাং দৈববিকাশ কখনো যুক্তিবিরুদ্ধ হইতে পারে না। যুক্তি যাহা অনুভব করিতে পারে না, ধারণায় আইসে না, দৈববিকাশের বলে তাহা অনুভূত ও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং যুক্তিও কখনো দৈবীশক্তির বিরুদ্ধ হইতে পারে না। এখন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কথা এই যে, অনেকস্থলে পশুসদৃশ বুদ্ধিই দৈববিকাশ নামে নামিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই পৃথিবীতে ঐ দৈবীবিকাশের দোহাই দিয়া কত অকর্মই যে সাধিত হইয়াছে, কত পশুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক অনর্থক দৈবী-বিকাশের ভান করিয়া কত লোককেই যে মজাইয়াছে, কত লোক তাহাদের অনুসরণ করিয়া শেষে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই।

এই সকল উৎপাত নিবারণের কয়েকটী উপায় আছে। পশুর বুদ্ধির বিকাশ কি দৈবীবিকাশ, ইহা জানিবার উপায় আছে। প্রথম পরীক্ষা, ঐ বিকাশ যুক্তির বিরোধী কি না? কেন না কোনও যোগই যুক্তির বিরোধী হইতে পারে না। যাহা যুক্তির সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না, নিশ্চয় জানিও, তাহা দৈববিকাশ নহে।

এ বিষয়ে যত শ্রেণীর জ্ঞান আছে, সকলেরই পরিণতি একাগ্রতায়। একাগ্রতা (Consciousness) না জন্মিলে কোনও জ্ঞানেরই পরিপক্কতা জন্মে না। ক্ষুদ্র বৃহৎ, কীট ক্রিমি হইতে যোগী, একাগ্রতা জন্মিলে সকলেরই সাফল্য ও কৃতকার্য্যের সম্ভাবনা হয়। তীব্র পূর্ণএকাগ্রতায় তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া যখন তেজের গুণ নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন, তখনই সে তেজের যথার্থ গুণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান পরিপক্ক হয়। জ্যোতির্ব্বিদ যখন তাঁহার মানসিক সকল চিন্তাকে একাগ্রবর্ত্তী ও কেন্দ্রীভূত করিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহার তারকা ও গ্রহগত জ্ঞানের তখনই

পূর্ণ পরিণতি ঘটে। প্রতি শ্রেণীর জ্ঞানের পূর্ণতা লাভের জন্য এই একমাত্র পথ। আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিকই যদি একাগ্রতা সহকারে আমার কথা শুনেন, তাহা হইলে এই সভাগৃহে কোথায় কি শব্দ হইল, কোথায় কে উঠিল বসিল, চলিয়া গেল; এ সম্বন্ধে আপনি খুব কমই জানিতে পারিবেন না। কোনও বিষয়ে পূর্ণ একাগ্রতা সাধনে, সেই একাগ্রতার বস্তু ভিন্ন, জগতের অন্য কোনও অন্তরের অস্তিত্ব জ্ঞানই থাকে না। আমি বলিতেছি, কিন্তু যদি আমার এ বিষয়ে একাগ্রতা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার যাহা বলিবার, নিশ্চয়ই আমি তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে পারিব। একাগ্রতা না থাকিলে কে কি বলে, কে কি করে, তাহারই ঠিক থাকে না। অতি হীনকর্ম্মেও একাগ্রতা জন্মিলে, সেই হীনকর্ম্মই উন্নতির দিকে ধাবিত হইতে থাকে। মন দিয়া ঝাঁটিলে সে দিনের রাস্তাও খুব ভাল হয়। মনোপার্জ্জনই বল আর ঈশ্বরচিন্তাই বল, একাগ্রতা না থাকিলে কোনও কার্য্যেই সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের এখনকার যেমন অবস্থা, সংসার স্ত্রী পুত্র, এবং অন্যান্য সহস্র বন্ধনে আমরা যেমন আবদ্ধ, তাহাতে কোনও বিষয় এক মনে চিন্তা করা, আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এক বিষয় চিন্তা করিতে গেলে, যেমন শত সহস্র চিন্তা মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া যেন, কোনও চিন্তাই স্থির হইয়া চিন্তা করিতে অবসর দেয় না। এইজন্যই ধীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না। মনের চিন্তা করি, সে চিন্তায় একাগ্রতা জন্মিতে না জন্মিতে ঈশ্বরচিন্তা আসিয়া উপস্থিত! ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করিব, সহসা, পারিবারিক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত। এইজন্য আমরা কোনও চিন্তাতেই একাগ্র হইতে পারিতেছি না, সুতরাং কি ঐহিক কি পারত্রিক, কি মন কি ঈশ্বর, কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যদ্দ্বারা একাগ্রতা জন্মে, তাহার নাম রাজযোগ।

কর্ম্মই কর্ম্মযোগ। সুতরাং ইহাই কর্ম্মযোগের অর্থ। লোকসমাজে নিষ্কর্ম্মা কেহ নাই, সকলেই কর্ম্মযোগে নিরত। কত লোক আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাল মন্দ কর্ম্ম করিতেছে, মরে আবার কত অসংখ্য আসিতেছে, কিন্তু সংসারে কর্ম্মের বিরাম নাই। সকলেই কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু কর্ম্মে সফল হয়, খুব কম। শত সহস্র লোকের মধ্যে দুই চারিজন লোক যথার্থ কর্ম্মপথে গতিবিধি করে মাত্র। এ কার্য্যে লোকসান গেল, সে কার্য্যে লাভ হইল না, অমুক কার্য্য শরীরে সহিল না, এই কথাই সর্ব্বত্র। ইহার একমাত্র কারণ, যথার্থ কর্ম্মপথের অভাব। কর্ম্ম করিতে সকলেই প্রস্তুত, কিন্তু কোন্ কর্ম্ম তাহার উপযোগী কোন্ কর্ম্মে তাহার জীবনের উন্নতি, সে গুরুতত্ত্ব কেহ জানে না। আমি কতগুলি লোককে বিশ্বাস করিয়াছি, কেহই বিশ্বাস রাখে নাই। আর কি আমি মানুষকে বিশ্বাস করি? আমি যাহাকে যাহাকে মিত্র বলিয়া ভাবিয়াছি, সেই মিত্রই বুকে ছুরি দিয়াছে, আমি আর কাহাকেও কি মিত্র বলি? আমি যখন যে কর্ম্ম করিয়াছি, একটীতেও কৃতকার্য্য হই নাই; কর্ম্মের প্রতি আর কি আমার শ্রদ্ধা থাকে? এই সুপথ না পাইয়া, মন ক্রমেই উৎসাহ শূন্য হইয়া পড়িতেছে। প্রতি-কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া লোকে কর্ম্মপথ ক্রমে কণ্টকপূর্ণ দেখিতেছে। এই অকৃতকার্য্য হেতু কর্ম্মের প্রতি যে অনুৎসাহ, তাহা কর্ম্মযোগ দ্বারা নষ্ট হয়। "কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম করিবে, স্বীয় কৃতকর্ম্মে কিছুমাত্র আসক্তি যেন না থাকে। কর্ম্মের জন্য মাত্র কর্ম্ম করিবে, নতুবা কাহার সাহায্যে, কি উদ্দেশ্যে এবং কোন কর্ম্ম করিতেছ, তাহা জানিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।" ইহাই কর্ম্মযোগের শিক্ষা। কর্ম্মযোগী কেবল কর্ম্ম করিতেই আসিয়াছেন এবং কর্ম্মই করিবেন, তিনি বিশ্বের হিতের জন্য স্বীয় কর্ম্মরাশি অর্পণ করিয়াছেন, সেইজন্যই কর্ম্ম করেন, নিজের জন্য নহে। তাহার কৃত-কর্ম্মের সহিত তাহার নিজের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। ইহাই কর্ম্মযোগীর লক্ষণ। যাহাকে ভালবাসি, তাহা বিয়োগে কষ্ট হয়; যে সংসারকে ভালবাসে, সংসারের বিয়োগে সেইরূপই হয়; নিঃসঙ্গ কর্ম্মযোগীকে সে কষ্ট স্পর্শও করিতে পারে না। কেননা তিনি সংসারের অনুরাগী নহেন, কর্ম্মের অনুরাগী।

যাঁহারা প্রেমিক, যাঁহাদের প্রকৃতি বড়ই কোমল—বড়ই স্নিগ্ধ বড়ই সরল, তাঁহারাই ভক্তিযোগী। তাঁহারা ভগবানকে ভক্তি করেন, পৃথিবীর যাহা কিছু সুন্দর সমস্তই ভালবাসেন, জগতে একাধারে প্রেম বিতরণ করিয়াও তাঁহাদের ভক্তি-

ভাণ্ডার ফুরায় না; তাহারা কি ভ্রান্ত? আপনারা স্মরণ রাখিবেন, যে জাতির পুরাণ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও সম্পূর্ণ, সেই জাতিই ভগবানের বিভূতি দেখিতে পায়। নিঃসংশয়ে যাহারা ভগবানের অর্চনা করে, সেই সকল অপৌরাণিকেরা এ জগতের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র, তৎসমস্তই পদদলিত করিয়া থাকে। এ ধর্ম নিতান্ত শুষ্ক! বিশ্বময়ের মূর্তি বিশ্বের সর্বত্রই প্রতিভাসিত, সুতরাং বিশ্বের দ্বারা বিশ্বেশ্বরকে কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা, ভ্রান্তি নহে। এজন্য পুরাণের প্রতি অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে। পুরাণে যাহার তৃপ্তি পৌরাণিক পূজায় যাহার আনন্দ, তাহাকে সে আনন্দ উপভোগ করিতে দাও, পৌরাণিক বলিয়া পরিহাস করিও না। আমি এ জীবনে যে মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছিলাম, তাঁহাতে সর্বশক্তির বিকাশ হইয়াছিল। তিনিও পুরাণপ্রতিপাদ্য প্রতিমা পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার চরণের নিকট দাঁড়াইবারও যোগ্য নহি।

এই সকল ধারণা মনুষ্য হৃদয়ে কিরূপে কার্য করে, এবং কোন্ ধারণার অনুসরণ এবং কাহাকে বা পরিবর্জন করা কর্তব্য, ইহা স্থির করিব কিরূপে? তুলনায়। প্রত্যেক বস্তুই তুলনায় তুলিলে আর সে আত্মগোপন করিতে পারে না, যে জিনিস সেই জিনিস বলিয়াই ধরা পড়ে। তাই বলি লোককে সকল পুরাণই পড়িতে দাও, ধর্মানুভবের নিদর্শন দেখিতে দাও, কেননা ইহা নিশ্চয়ই জানিও যে, মানুষ সত্যের যে সকল সংস্কার নিয়াছে, ভক্তিস্রোতে তাহা সহজেই ভাসিয়া গিয়া থাকে। যাহা অলৌকিক, তাহা কখনও লৌকিক বিষয়ের অধীন হইতে পারে না। ভক্তিযোগী ঈশ্বরে ভক্তি করিয়াই আনন্দিত। ভক্ত সংসারের ঐশ্বর্য কি স্বর্গেরও প্রত্যাশী নহেন, ভক্ত ধন পুত্রের প্রার্থনা করেন না, তিনি ভক্তির জন্যই ভগবানকে ভক্তি করেন অন্য কিছুর জন্য নহে। তাঁহারা জানেন, ভালবাসাই ভালবাসার পুরস্কার; অন্য পুরস্কার আর কিছু নাই। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বর প্রেমময়, ভক্তিময়, স্নেহময়। তিনি স্রষ্টা, তিনি জীবের পিতামাতা, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জগতের বিধাতা। সর্বোপরি তিনি প্রেমময়। যেখানে প্রেম, যেখানে ভালবাসা, যেখানে স্নেহ, সেইখানেই ভগবানের অধিষ্ঠান। স্বামী প্রীতিভরে প্রিয়ার মুখ চুম্বন করেন, তিনি সে চুম্বনেও অধিষ্ঠিত থাকেন; মাতা যখন স্নেহভরে তনয়ের মুখ চুম্বন করেন, সে চুম্বনেও ভগবান্ থাকেন; বন্ধু বন্ধুর সহিত প্রেমালিঙ্গন করে, সে আলিঙ্গনেও তিনি থাকেন। যেখানে ভালবাসা, সেইখানে ভগবান্। ভগবান্ ভক্তির ভগবান্, ভক্তের ভগবান্। ভক্তি যোগ ইহাই শিক্ষা দেয়।

যাহারা দার্শনিক, মনুষ্য ধারণার অতীতে যাহারা যাইতে চায়, জ্ঞানমার্গের যাহারা পথিক, তাহারাই জ্ঞানযোগী। ঐশ্বিকের কিছুই যাহাদের নিকট কিছুই নহে, ঐশ্বিক কর্মকে তুচ্ছ ভাবিয়া যাহারা পারলৌকিক বিষয় জানিতে সমুৎসুক, তাহারাই জ্ঞানযোগী। দার্শনিকের নিকট ঈশ্বর কেবল পিতা মাতা নহেন, কেবল এই বিশ্বের স্রষ্টা নহেন, তিনি রক্ষা ও পরিপালন কর্তা। ভগবানের পক্ষে এ অতি সামান্য কথা। ভগবান যে তাহার জীবনের জীবন, ভগবান যে তাহার আত্মার পরমাত্মা, তাহাতেই যে ভগবান অধিষ্ঠান। নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলে আর তাহার কিছুই থাকিবে না, থাকিবেন কেবল তিনি, তিনি ঈশ্বর।

এক বৃক্ষে দুই পক্ষী। একটী উচ্চে একটী নীচে। উচ্চের পক্ষী স্থির, ধীর, গম্ভীর, আত্মগৌরবে গৌরবী; নীচের পক্ষী পর্যায়ক্রমে বিষবৃক্ষের ফল খাইতেছে, তালে তালে বেড়াইতেছে, এবং পর্যায়ক্রমে কখনো সুখ কখনো দুঃখ উপভোগ করিতেছে। নীচের পাখী একদিন কটু ফল খাইয়া বিরক্ত হইল, ফলের প্রতি তিতিক্ষা জন্মিল, ফল ভোজনে ক্ষান্ত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখে, আর একটী পক্ষী। কি কটু কি মিষ্ট, এ পক্ষী কিছুই খায় না। এ পক্ষী সুখদুঃখ অনুভবেই আনে না। এ পক্ষী নিজের কেন্দ্রে নিজে আবদ্ধ থাকিয়া স্থির ধীর গম্ভীর। নীচের পাখী ইহা দেখিল, কিন্তু মনে রাখিল না। আবার কটুতিক্ত ফলে উদর ভরিতে লাগিল। নীচের পক্ষী আবার একটা কটু ফল খাইয়া ফলভোজনে বিরত হইল, উপরিস্থিত পক্ষীর অবস্থা দেখিল, কিন্তু মনে রাখিতে পারিল না, সে পুনরায় ফলভোজনে প্রবৃত্ত হইল। সেবার আরও কটু, নীচের পক্ষী উপরের পক্ষীর প্রতি আকৃষ্টিযুক্ত হইল। ঐ অবস্থা লাভে

অন্ত তাহার দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু ফলভোজনে বিরত হইল না, ক্রমে আরও নিকট। নীচের পাখী ক্রমে উপরে উঠিতে লাগিল। উপরের পক্ষীর অবস্থা ভাবিয়া নীচের পক্ষীর অবস্থা ভাবিয়া নীচের পক্ষী ক্রমে উপরে আসিতে লাগিল। ক্রমেই নিকটবর্ত্তী। শেষে যখন উপরের পক্ষীই নীচের পক্ষীর একমাত্র লক্ষ্যস্থানীয় হইল, পূর্ণ একাগ্রতা আসিল, তখন সেই উপরের পক্ষীর সংস্পর্শে ক্রমে ক্রমে নীচের পক্ষী তন্ময়তা লাভ করিল। বস্তুতঃ উপরের পক্ষীই পক্ষী, নীচের পক্ষী উহার ছায়া মাত্র। নীচের পাখী এই যে হাসিল কাঁদিল, কটু তিক্ত ফলভোজন করিল, সুখদুঃখের চক্রে ঘুরিল, ইহা স্বপ্ন। আসল পাখী সেই উপরে সুখ দুঃখের অতীত হইয়া স্থির ধীর গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। এই উপরের পাখী ঈশ্বর, নীচের পক্ষী এই বিশ্ব জীবন।*

তিনি উপরে নির্লিপ্ত হইয়া বসিয়া আছেন, আমরা নীচে থাকিয়া সংসার করিতেছি, সুখ দুঃখের অনুভব করিতেছি, তাঁহার দিকে যাইতে চাহিতেছি, কিন্তু পারিতেছি না; আমরা সেই কটুতিক্ত সংসার-ফল ভক্ষণ করিয়া কেবল যাতনাই ভোগ করিতেছি। নীচের পক্ষীর ন্যায় যদি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া কখনো তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারি, তখন দেখিব, যাহাকে এইমাত্র আপনাদের নিকট এই বিশ্বের জীবন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, যিনি প্রতি পরমাণুতে বিরাজ করিতেছেন, চন্দ্র সূর্য্য হইতে অণু-পরমাণুর পর্য্যন্ত যাঁহার স্থিতি, তিনিই আমাদের জীবনের ভিত্তি, আমার পরমাত্মা, তিনিই আমি। জ্ঞানযোগ ইহাই শিক্ষা দিয়া থাকে। জ্ঞানযোগ মনুষ্যকে পবিত্র করে, এবং মনুষ্য জাতির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন একতার বিকাশ করে, কেন না, জ্ঞানযোগীর বিশ্বাস, প্রতি মনুষ্যেই তিনি বর্ত্তমান, অথবা প্রতি মনুষ্যই তিনি। ঈশ্বরই তুমি আমি রূপে এই ধরাধামে আসিয়াছেন। আমাদের পরস্পরের ঘৃণা কীট হইতে আমরা যে সকল মহাপুরুষ দেখিয়া বিস্মিত হই, এ সকলই ঈশ্বরের প্রতিরূপ মাত্র। শত্রুতা আসিবে কেন?

ফলতঃ এই সমস্ত যোগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কেবল অনুষ্ঠান করিলেই চলিবে না, শ্রবণ মননাদি দ্বারা তাহাকে নিজের জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। মতই কেন সুন্দর কি যুক্তিকর হউক না, যাহা, গ্রন্থে কি যুক্তি দ্বারা এ পর্য্যন্ত কোনও ধর্ম্মেরই উৎপত্তি হয় নাই; তুমি শুনিবে কি স্বীকার করিবে বলিয়া ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই, ধর্ম্ম হইয়াছিল এবং উহা লোকমধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, এই পর্য্যন্ত। মনুষ্যকৃত ধর্ম্মে শত শত নির্জ্জীবতা থাকিতে পারে, সে ধর্ম্মের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু তথাকথিত ধর্ম্মে কিছু মাত্র মলিনতা নাই। ইহাই ধর্ম্ম।*

---

* মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ৩—১—১

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।

* "The Ideal of a Universal Religion" delivered at Hardman Hall New York, Sunday January 12, 1896. "বিবেকানন্দের বক্তৃতা" হইতে প্রকাশিত। যুদ্ধের পরিবর্ত্তে যুযুৎসু জাতিসমূহকে মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধিবার জন্য যাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মের প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের এই যুগ প্রবর্ত্তকের নাম তাঁহাদের মধ্যে চিরস্মরণীয়। সর্ব্বজাতি সংঘের দিনে তাঁহার এই সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যান স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

পতিত ব্রাহ্মণ

ওরে রে ব্রাহ্মণ ! তোরা, শোন ওই প্রলয়ের শেষ অট্টোচ্ছ্বাস !
মেলি চক্ষু দেখ চেয়ে বিশ্বপটে বোধনের মঙ্গল আভাষ।
সারা বিশ্বে শোন আজ কর্ম্মীদের প্রভাতের শুভযাত্রা রোল।
সঞ্জীবনী সুধা ভরে উঠিতেছে দেশে দেশে মঙ্গল কলোল
অভ্র ভেদী মহিমার হৈম হর্ম্ম্য ধ্বংসশেষ শ্রীভ্রষ্ট কঙ্কাল—
অনশনে ভিক্ষাব্রত দাস্যব্রতে তমালসে কাটাবি কি কাল ?
যেই শক্তি যেই তেজ নিয়তির দণ্ডের মতন
ত্রিলোকেরে নেত্রক্ষেপে অনিয়ত করিত শাসন
সেই শক্তি সেই তেজ কোথা লুপ্ত ? আজ তোর দেহ উপাদান
গড়িয়া দিতেছে বুঝি দেবদ্রোহী নর অরি ক্রূর শয়তান
কোথা ছিলি ? কোথা আজ ? কত নিম্নে হের তার আঁধার গহ্বরে
আকণ্ঠ সুপ্তিব্রত লুকাইয়া পশুত্বের পঙ্কিল বিবরে !
কোথা সন্ধ্যা ? সামগান ? কোথা ঋত্বিকের যাগ ? কোথা হোমবেদী ?
কোথা শুভ মহাযজ্ঞ ? কোথা মোক্ষ বিশ্বহিত চিন্তা নিরবধি
কোথা পুণ্য তপোবন ? কোথা শুদ্ধ সুরভিত উটজ প্রাঙ্গন ?
কোথা হবিগন্ধপূত চৈত্যোত্থিত বাষ্পস্তম্ভ কুণ্ডলী কুটিল
কোথা বিল্ব কোবিদার প্রকাশিয়া গুচ্ছশোভা মুক্ত অনাবিল ?
কোথা গেল ? কার দোষে ? ভাব বুঝি প্রকৃতির ব্যঙ্গের খেয়াল
এ মহাপতনমূলে শুধু তোর স্বেচ্ছাকৃত হীন কর্ম্মজাল
কিসের অভাব ছিল ? কামধেনু যোগাইত মধু ক্ষীরধারা
বাধাবিঘ্ন দূরে দিতে ধনুহস্তে নিজে রাজা আছিল পাহারা
কি তোর ছিল না বল ? গর্ব্ব, মান শক্তি বশ তীব্র তপোবল
কোথায় কোথায় ওরে ? কোন্ শমীচূড়ে ফেলি আসিলি সকল ?
বল তোরা বল আরে কোন্ শকুনির ছলে হারিয়া খেলায়
পোড়া উদরের লাগি লোটাস্ গোলামি সাজে যার তার পায়—
আরে ঘৃণ্য, লজ্জাহীন ! মহত্বের প্রাণহীন পাংশু আবর্জ্জনা !
সহিবি কি চিরদিন শিরপতি ক্ষুদ্রচিত্তে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ?

ফিরে যা অতীতে তোর পৌরাণিক যবনিকা কর উদ্ঘাটন
কত উচ্চ সৌধশিরে ছিল তোর স্বর্ণরুচি গর্ব্বিত আসন!
শান্তি-দানি দৈত্যদলে দেবতার ধনমান করিতে রক্ষণ
অতলজলধিজল কেরে বল করেছিল গণ্ডুষে শোষণ?
মায়ামৃগ দনুজেরে জঠর অনলে পুড়ি করি ভস্ম রাশ
কে ঘুচাল মর্ত্ত্যমাকে মানবের মর্ম্মদাহী মরণের ত্রাস?
কারা লঙ্ঘি বিন্ধ্যগিরি অন্ধ তমসার কণ্ঠে দিল ছ্যুতি হার?
রেবা ও কাবেরি তটে কে তুলিল বেদাঙ্গের গম্ভীর ঝঙ্কার?
অপমান লাঞ্ছনার বিধানিত কার বল ন্যায্য প্রতিশোধ
নয়ন-স্ফুলিঙ্গে কার দগ্ধ হয় ষষ্টিলক্ষ নৃপ আত্মাক্রোধ
জগত-পুরিত যবে নৃশংসতা উৎপীড়নে লুণ্ঠনের ভরে
অশ্রু পূর্ণ হাহাকার বিদারি বিমানতন্দ্র উঠে ঘরে ঘরে।
শানিত কুঠার কার রুদ্র দর্পে শত্রু রক্তে সিক্তি ধরাতল
মুহাইল নেত্রগুরিশ্বরণীর রক্তব্যথা আর্ত্ত কোলাহল?
মহীতপী মুনিবর শরাশনে জুড়ি ইষু অব্যর্থ সন্ধানে
কক্ষ্যচ্যুত দিনপথে বাধ্য করে ছত্র দারু পাদুকা প্রদানে।
কর্ত্তব্য ত্রুটির তরে রমানাথ বক্ষে ধরে কার পদাঘাত?
অঙ্গুলি হেলনে কার লুটায় ভূতলে রাজা সৈন্যের প্রপাত?
হেরি মাতৃ নির্য্যাতন গর্ভকোষে অপোগণ্ড উগ্র ক্রোধে জ্বলি,
পড়ি ভূমে বক্ষগণে অক্ষির কটাক্ষে করে দগ্ধ পাংশু বলি,
রোষ দীপ্ত বাসবের অশনি ক্ষেপনরত লৌহ দৃঢ় পাণি।
ব্রহ্ম শক্তি জড়ারষ্ট শুনি ক্ষীন তাপসের তাড়নার বাণী।
তাহাদেরি রক্তস্রোত বহে না কি দৃপ্ত-তাপে ধমণী শিরায়?
ঘৃণিত দলিত তবু কাটাবি জীবন তোরা বিপুল ধরায়।
যাহাদের জটাজাল দ্যুলোক-ভাস্বর দীপ্ত জ্বলন্ত নয়ন
কর্ত্তব্য স্খলন লাগি সম্রাটে যোদ্ধারে সদা করিত শাসন।

তারা তোরা, কে বলিবে ? ব্রাহ্মণ হইলে পরে তোরা কি এমন ?
আশ্রম আচার ভ্রষ্ট তোরা আজ ভিক্ষা জীবি জঘন্য দুর্জন।
সঙ্কীর্ণতা সেবী তোরা চিত্ত আজি স্বার্থ হিংসা করিছে ভক্ষণ
পদাঘাত ঝঞ্ঝালা আজ তোর কিরীটের কনক ভূষণ।
অতীতের লক্ষ্য পানে নব ভাবে যাত্রা কর হুঙ্কার ছাড়িয়া
সকল বিপত্তি বিঘ্ন বীরত্বে হীনতা অরে পেষিয়া ফেলিয়া।
অনন্তের নীলছায়া অতীতের গৌরবের কিরণ বরণে
উঠিবে উজলি পুনঃ ঘোষিবে নবীন উষা নবীন তপনে।

শ্রীননীনাথ মজুমদার, এম্ এ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী বৈশাখ সংখ্যা হইতে উপাসনা নব-প্রতিষ্ঠিত উপাসনা-পরিচালক-সমিতি-কর্তৃক শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল বসু বি, এ, কর্তৃক যথাযথ নিয়মিত-রূপে পরিচালিত হইতেছে। ছাপাখানার অব্যবস্থায় উক্ত পত্রিকা প্রকাশে এইরূপ অনিয়ম হইয়াছে—সে কারণ আমরা বৈশাখ সংখ্যা যথানিয়মে বিলি করিয়া জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইব। সদয় গ্রাহকগণ এই অমার্জ্জনীয় ত্রুটী অনুগ্রহের চক্ষে দেখিবেন ইহাই আমাদের ভরসা।

বিনীত—ম্যানেজার—উপাসনা।